ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৬২

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক

বাৎসরিক ও যাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও যাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ-১৫শে অগ্রহায়ণের পূর্বে মনি-অর্ডার যোগে বাৎসরিক ১২৲ টাকা অথবা যাণ্মাসিক ৬৲ টাকা চাঁদা দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্নে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি. পি. খরচ

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

আষাঢ়—১৩৬২

প্রথম খণ্ড | ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

সংসারে তিন শ্রেণীর মানবের সাক্ষাৎ পাই। এক—গতানুগতিক জীবন; আহার, নিদ্রা, ভয়, প্রজনন, ধর্ম্মপালন এবং মরণের চক্রাবর্ত্তে নিয়ত ভ্রাম্যমান সাধারণ মানব। দুই—ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত, ইতিহাসের আনুগত্যে দীক্ষিত, ইতিহাসের সত্য জীবনে প্রতিফলিত করিতে কৃতসংকল্প অসাধারণ মানব। তিন—জনের স্রষ্টা, গণের নিয়ামক, জাতির কুলদেবতা নরোত্তম—যাঁহার চরণাঙ্কিত সরণী অনুসরণে ইতিহাস আপনাকে ধন্য মনে করে—দেশ-কালের অতিক্রান্ত মহিমায় গৌরবান্বিত যাঁহার দিব্যজীবন লইয়া একটা জাতির অথবা যুগের ইতিহাস রচিত হয়। বাঙ্গালার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই শেষোক্ত স্তরের মহামানব।

কোন বৃহত্তম ঘটনা অথবা মহত্তম আবির্ভাব ভিন্ন জাতি গঠিত হয় না। রাজা দনুজমর্দ্দন দেব কর্ত্তৃক গৌড় সিংহাসন অধিকার বাঙ্গালার ইতিহাসে এক বৃহত্তম ঘটনা: দনুজমর্দ্দন আপন শৌর্য্যে বঙ্গ সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। বাঙ্গালী স্মার্ত্ত বৃহস্পতিকে রায় মুকুট উপাধি দিয়া সমাজসংস্কারের পরিকল্পনায় স্মৃতির নূত নিবন্ধ রচনায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বঙ্গাধিপের সভা বঙ্গভাষা সমাদৃত এবং বাঙ্গালী কবি সম্মানিত হইয়াছিলেন কিন্তু বাঙ্গালার এ সৌভাগ্য স্থায়ী হইল না, বোধনে নিরঞ্জন ঘটিল, রাজনীতির খেলায় বাঙ্গালী হারিয়া গেল বাঙ্গালীর অবস্থা দিনের পর দিন শোচনীয় হইয়া উঠিল।

ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন পরিচ্ছদ, ভিন্ন আচার ব্যবহার, ভি দায়াধিকার—এক জাতি বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিল ছলে বলে কৌশলে তাহারা লোককে ধর্ম্মান্তরিত করিত রাজার স্বজাতি রূপে পরিচিত হইলে, বৃত্তি, ভূসম্পত্তি অথব জীবিকার্জ্জনের জন্য কর্ম্মপ্রাপ্তি ঘটিবে এই প্রলোভনেও অনেকে রাজধর্ম্মে দীক্ষিত হইত। নারীজাতির উপর অত্যাচারে তাহারা সংকোচ বোধ করিত না। সমাজপতিগণ ভীত হইয়া উঠিলেন। তাহারা বিজেতার সঙ্গে অসহযোগ

অবলম্বন করিলেন, কর্ম্মঠবৃত্তি। কচ্ছপ যেমন নিজের কঠিন পৃষ্ঠাবরণের অন্তরালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লুকাইয়া রাখিয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করে, হিন্দুজাতিও তেমনই তুর্কীর সঙ্গে সর্ব্ব সম্বন্ধ বর্জ্জনের সংকল্প লইয়া প্রায় কূপমণ্ডূকে রূপান্তরিত হইয়া গেল। শেষ এমন হইয়া উঠিল যে তাহাদের বলাৎকৃত সংস্পর্শে, তাহাদের পাচিত ব্যঞ্জনের আঘ্রাণেও বাঙ্গালী জাতিচ্যুত হইতে লাগিল। ক্রমে সমগ্র জাতিটারই বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিল। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, মনীষী দেবীবর ঘটক প্রভৃতি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু সমাজের দুঃখ গ্লানি অপনোদন তাহাদের সাধ্যাতীত ছিল। সমাজে অন্ধি-সন্ধিতে সঞ্চিত জঞ্জাল-স্তূপ অপসারণ তাহাদের সামর্থ্যে কুলাইল না। এজন্য এক উদ্দাম ঝঞ্ঝনার প্রয়োজন ছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কণ্ঠোচ্চারিত হরিনামের হুঙ্কারে বাঙ্গালার আকাশে বাতাসে যে আলোড়ন উপস্থিত হইল, তাহার উন্মত্ত আবেগে বাঙ্গালার সমস্ত আবর্জ্জনা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। বাঙ্গালীর অবরুদ্ধ জীবনস্রোতে যে পঙ্কিল আবিলতার উদ্ভব ঘটিয়াছিল, যে শ্বাস-রোধী প্রাণঘাতী বিষবাষ্পের সৃষ্টি হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের বিপুল করুণার প্রবল প্লাবনে সেই বদ্ধ জলার অবরোধ ভাঙ্গিয়া গেল। বাঙ্গালীর বক্ষে এমন এক স্রোতবেগের সৃষ্টি হইল, যাহার কুলপ্লাবী বন্যা হৃদয়ের সমস্ত মালিন্য ভাসাইয়া দিয়া তাহাকে নিষ্কলুষ করিয়া তুলিল। বাঙ্গালী নব জন্মলাভ করিল। শুধু দ্বিজত্ব নয়—বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল দ্বিজ-শ্রেষ্ঠরূপে ব্রাহ্মণেরও বন্দনীয় হইয়া উঠিল। বিশ্বের পটভূমিকায় এই মহদভ্যুদয়ের ইতিহাস আজিও রচিত হয় নাই।

কে বঙ্গাধিকারী কেহ খোঁজ রাখিল না। কোথায় তাহার রাজধানী জানিবার জন্য কেহ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হইল না। আকাদেমি স্থাপন করিয়া গীতবাদ্য নৃত্য শিক্ষার মুখাপেক্ষা থাকিল না। নরনারীকে বৃক্ষ-রোপণে উদবুদ্ধ করিতে বনমহোৎসবের নহবৎ বসিল না। জলাভাব দূরীকরণের জন্য কেহ রাজদ্বারে গিয়া অঞ্জলি পাতিল না। এক কৌপীন-সম্বল সন্ন্যাসীর লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে দেশের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। চৈতন্য-চন্দ্রের প্রেমপীযূষ পানে বজ্রকঠোর নৈতিক আবরণের অন্তরালে তৃণের ন্যায়, বিনম্র তরুর ন্যায় সহিষ্ণু অমানীমানদ জনজীবন এক অনিন্দ্য নির্ম্মলতায় অনাময় হইয়া উঠিল। এক রোদনাবরুদ্ধ কণ্ঠের উচ্চ হরিকীর্ত্তনে দেশ সঙ্গীতময় হইল। এক অভিনব জঙ্গম হেমকল্প তরুর নর্ত্তিত সঞ্চরণে জাতির জীবনে ছন্দ জাগিল। কণ্ঠে কণ্ঠে সঙ্গীত-রোল, চরণে চরণে নৃত্য-চাঞ্চল্য, আনন্দ হিল্লোলে উদ্বেলিত নরনারী নাচিয়া গাহিয়া পরস্পরকে ভালবাসিয়া আপন কুল-দেবতাকে বরণ করিয়া লইল। বাঙ্গালী বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়তিকে রূপদান করিল। বাঙ্গালীর জীবন-ব্রত যাপিত হইল।

আর কিছু না কর, কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছিল, তাহার ইতিহাসটা সংগ্রহ করিয়া রাখ। ফেরঙ্গ সভ্যতা তোমাকে দিশাহারা করিয়াছে। অশনে বসনে আচারে ব্যবহারে নীতি-হীনতার ধর্ম্মহীনতায়—তুমি তো জাতি হারাইয়াছ। ইতিহাসটা থাকিলে হয় তো তোমার ভাগ্যবান কোন ভবিষ্যদ্বংশধরের তাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। দেশ স্বাধীন হইয়াছে। তুমি সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস লিখিতেছ, কংগ্রেস আন্দোলনের ইতিহাস লিখিতেছ। আর আপন জন্মের ইতিহাসটা লিখিয়া রাখিবে না। জন্মদাতার পরিচয়টা লিপিবদ্ধ করিবে না। উপন্যাসের আবরণে কোন উত্তম মধ্যম নামধেয় পুরুষ সূক্ত নহে, ইতিহাস। আমি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রের মহত্তম আবির্ভাবের ইতিহাস খুঁজিতেছি। যোজনান্তর সংস্কৃতি কেন্দ্র, কাব্য-ব্যাকরণ অলঙ্কার, দর্শন, ভক্তিশাস্ত্র, সঙ্গীত, চিকিৎসা, জ্যোতিষ বিবিধ বিদ্যার পঠন পাঠনে মুখরিত থাকিত। খুঁজিয়া দেখ আজিও তাহার কঙ্কাল দেখিতে পাইবে। কান পাতিয়া শোন, আজিও তাহার প্রতিধ্বনি তোমাকে উৎকর্ণ করিবে। গ্রামে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তের অনুষ্ঠানে, বৃক্ষ, বাপী কূপ তড়াগ মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠার, সদাব্রত দানের, সে কি ঈর্ষা মাৎসর্য্যহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা—পল্লীপথে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই আজিও তাহার অসংখ্য বিলুপ্তাবশেষ তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ক্লাব তোমাকে বাঁচাইবে না। পূর্ণিমা সম্মেলনের চায়ের মজলিস ক্ষয়ব্যাধির সংক্রামতা বৃদ্ধি করিবে মাত্র। যদি জাতি রক্ষা করিতে চাও, বাঁচাতে চাও, মন্দিরের আশ্রয় গ্রহণ কর। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের শরণাপন্ন হও।

এ যুগের আগে

আশাপূর্ণা দেবী

গলাবন্ধ কোটের উপর পাক দিয়ে কোঁচানো মিহি উড়নী, পরণে রেলির থান, পায়ে ক্যাম্বিস্ স্থ, বগলে ছাতা, 'মহারাণীর-আমলের বেণে-অফিসের বড়বাবুর একটি প্রতীক হরবিলাসবাবু কর্ম্মস্থল থেকে ফিরেই বড়বাবুজনোচিত মেজাজে ভুরু কুঁচকে স্ত্রীকে বল্লেন—ছাতে কে? আলশে ধরে দাঁড়িয়েছিলো—মনে হলো, মোড়ের মাথায় আমাকে আসতে দেখে চট করে সরে গেলো।

স্বর্ণলতা স্বামীর বৈকালিক আহার্য্যের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত ছিলেন, এ প্রশ্নে গম্ভীরভাবে উত্তর দেন—আচ্ছা, তুমি আগে হাত মুখ ধুয়ে সুস্থির হও। ছাতে কে, সে কথা পরে শুনো।

হরবিলাস যথারীতি বগলের ছাতাটী দালানের দেয়ালের নির্দ্দিষ্ট পেরেকে আটকে রেখে গলার উড়নীটি সযত্নে আনলায় রাখছিলেন, স্ত্রীর উত্তরে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়ে ততোধিক ভুরু কুঁচকে বললেন—তারমানে? ব্যাপারটা কি?

'পরে শুনো' কথাটা গৌরচন্দ্রিকা মাত্র, 'ব্যাপারটা' বলবার জন্যে সারাদিন হাঁপিয়ে মরছেন স্বর্ণলতা। কাজেই সনিশ্বাসে—যেন না বললে নয় এইভাবে বলেন—ব্যাপার বেশ ভালোই, ছাতে বেড়াচ্ছেন—তোমার বড়োমেয়ে!

—বড়োমেয়ে! কে সুবর্ণ?···হরবিলাসের কণ্ঠস্বরে আশঙ্কা—সে কখন এলো? হঠাৎ এলোই বা কেন?

বর্ত্তমান পাঠকের পক্ষে মনে করা স্বাভাবিক, বিবাহিতা মেয়ে হঠাৎ একদিন পিতৃগৃহে বেড়াতে আসার মধ্যে আশঙ্কার কি আছে? এতো বরং আনন্দেরই কথা!

কিন্তু গল্পটা 'মহারাণীর আমলের।' সে আমলে ইচ্ছেমাফিক বাপের বাড়ী বেড়াতে আসার রেওয়াজ মেয়েদের ছিলো না। রীতিমত গিন্নীবান্নী হবার আগে পর্য্যন্ত এতো বড়ো দুঃসাহসের কথা ভাবতেই পারতো না মেয়েরা।

বাপ ভাই গিয়ে আবেদন নিবেদন না করলে কখনো কেউ বৌ পাঠায়? কাজেই বিনা সংবাদে সুবর্ণর এ রকম আকস্মিক এসে পড়ায় আশঙ্কার কারণ আছে বৈ কি!

স্বর্ণলতা গলাখাটো করে বলেন—কেন এলো, সে কথা বলছে কে? মেয়ে তো এসেই ঠরঠর করে ছাতের টঙে গিয়ে বসে আছেন! জিগ্যেস করতে গেলাম বললো কি জানো—'কেন, কি বিত্তান্ত, সে সব জিগ্যেস—কোরো না! জায়গা দিতে পারবে? চিরকালের মতো জায়গা? মনে করো জন্মের শোধ চলে এসেছি দর্জ্জিপাড়া থেকে।"

—বটে! ছেলেখেলা পেয়েছে নাকি?···হরবিলাস চাপা তীব্রস্বরে বলে ওঠেন—'জন্মেরশোধ' চলে এসেছি—ভারী সহজ কথাটা হলো কেমন?···ধুরন্ধর মেয়ে নির্ঘাৎ শ্বশুর বাড়ীতে একটা কাণ্ড বাধিয়ে এসেছেন! নাটক নভেল পড়া ওস্তাদ মেয়ে যে তোমার!···বলি এলো কার সঙ্গে?

স্বর্ণলতা মেয়ের নেমে আসার আশঙ্কায় সিঁড়ির দিকে ভীত দৃষ্টি ফেলে আরো চাপাস্বরে বলেন—সে কথা আর বোলো না! ছোটো গাওরটা এসেছিলো সঙ্গে, সে নেহাৎ বোধ হয় বৌকে একলা রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব বলেই। ভরদুপুরবেলা, সবে তখন খেয়ে উঠেছি, গাড়ীর শব্দ শুনে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি—দোরে একখানা থাড়কেলাশ গাড়ী দাঁড়িয়েছে, তার চালের ওপর জামাইয়ের ছোট ভাই গোপাল।···ভয়ে তো আমার প্রাণ উড়ে গেছে, এই ডনডনে রোদে গাড়ীর মাথাতেই বা বসে আছে কেন কিছু বুঝতে পারি না। যাই হোক্ তাড়াতাড়ি দোরটাতো খুলে দিতে বললাম অন্নকে।······

অন্ন ছুটে এসে বললে—'মা গাড়ীতে দিদি, আর দিদির খুকি।···শুনে মাথা ঘুরে গেলো, বললাম—দিদির ছেলেরা?···অন্ন বললে—'ওরা আসেনি।' বলবো কি তোমাকে আমার তো হাত পা ছেড়ে এলো, না জানি কি

সর্ব্বনাশ ঘটে গেছে! বলির পাঁঠার মতন দোরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, গুণমণি কন্যে আমার গট্‌গট করে নেমে বললেন কি—"মা এ যুগে তো মা বসুন্ধরা দ্বিধা হল না, তাই আবার তোমার কাছেই ফিরে এলাম।"

—হুঁ! কথা অনেক শেখা হয়েছে দেখছি। নাও মেয়েকে আদর করে বঙ্কিমবাবুর বই পড়াও? মাইকেলের কাব্যি পড়াও?

—তোমার ওই এক কথা! আমি পড়িয়েছি?

অসন্তুষ্ট মন্তব্য করেন স্বর্ণলতা!

—প্রত্যক্ষে না পড়াও, পরোক্ষে প্রশ্রয় দিয়েছো! মেয়ে আবদার করলেন—"আমার পূজোর কাপড় চাই না, গ্রন্থাবলী কিনে দাও", মা তা'তেই রাজী! হুঁঃ, ফলছে তো তার ফল? সাধে কি আর বলে—মেয়েমানুষের বারো হাত কাপড়ে—সে যাক গে, মরুকগে, বলি জামাইয়ের ভাইকে—যত্ন-আত্তি করেছিলে?

স্বর্ণলতা সবিস্ময়ে বলেন—শোনো কথা! সে কি গাড়ী থেকে নেবেছিলো নাকি? কচুয়ানটা প্যাটরাটা নিয়ে দুম্‌ করে দালানের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেলো।...সেই অবধি মেয়ে গিয়ে চিলে কোঠায় উঠে বসে আছে। অন্নু বেচারা সারাদিন ওর মেয়েটাকে সামলে মরছে!

হরবিলাস ধৈর্য্যশীল বৈকি।

নইলে এহেন বিবৃতি শুনেও মাথা ঠাণ্ডা রাখেন? সে যুগে পুরুষের পক্ষে এতোটা ধৈর্য্যশীল হওয়া দুর্লভই ছিলো বলা যায়।

মাথা তিনি ঠাণ্ডা রাখেন, শুধু বিবৃতি অন্তে তিক্তস্বরে বলেন—সমস্ত দিনের মধ্যে আর ভেতরের কথাটা আদায় করতে পারলে না?...পেটের মেয়েকে এতো ভয়? বলতে হবে না, বুঝতে পারছি হারামজাদী একটা ঘোরালো ব্যাপার ঘটিয়ে এসেছে! দেখছি তো বরাবর, ছোটো থেকে সকলের সব কথায় মুখে মুখে উত্তুর করার অভ্যেস! উদ্ধত অবাধ্য মেয়ে! নইলে তুলসীর বিয়েতে পাঠালো না, আর এখন শুধু শুধু—তোমার আর কি! আমি ব্যাটাই চোর দায়ে ধরা পড়েছি, যাই এখন দাঁতে কুটো নিয়ে মেয়ে পৌছতে ছুটি।

ঠিক এই সময় অন্ন এসে দাঁড়ালো।

অন্নর বয়েস ন দশের বেশী নয়, কিন্তু সংসার-জ্ঞান তার টনটনে। সুবর্ণর মতো স্বপ্নবিলাসী অবাস্তব-বুদ্ধি মেয়ে সে নয়। সুবর্ণকে সে একহাটে বেচে আর এক হাটে কিনে আনতে পারে।

বাপ কাকার সামনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথাকহা যে বাচালতার সামিল, একথা তা'র জানা, তবু আজ সেও একটু উত্তেজিত, তাই ফট্‌ করে বলে বসলো—রেখে আসবেন কি, দিদি তো জন্মেও আর শ্বশুরবাড়ী যাবে না। কিছুতেই যাবে না।

হরবিলাস বিরক্তি-বিকৃত মুখে বলেন—বটে? কিছুতেই যাবে না! কানে ধরে বলেছে তোমায়, কেমন? এই যে—হচ্ছেন, আর একটি তৈরি হচ্ছেন। বলি, আর কখনো শ্বশুরবাড়ী যাবে না একথা মুখে উচ্চারণ করেছে সে?

অন্ন ম্রিয়মানভাবে বলে—বললো তো!

হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন হরবিলাস—কী বললো?

—বললো যে 'ওদের বাড়ী আর যাবো না'!

—হুঁ! ওদের অপরাধ?

রহস্য ভেদ করে দেবার জন্য প্রাণ ছটফট করছিলো অন্নর, তাই বাবার বিরক্তির ভয় হজম করেও তড়বড় করে বলে ফেলে—ওরা যে ভারী খারাপ! মানুষকে মানুষ মনে করে না। বৌ বলে বুঝি আর তা'র মান অপমান নেই? দিদি কিছু অন্যায় করেনি, তবু জামাইবাবু দিদিকে বলে কি না—শাশুড়ীর পায়ে ধরে মাপ চাইতে।

ধৈর্য্যশীল হলেও ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। হরবিলাসের সহ্যশক্তি তো আর সত্যি সীমার বাইরে নয়, তাই তীব্র একটা ধমকে ছোট মেয়েকে চুপ করিয়ে দিয়ে, স্ত্রীর দিকে জ্বলন্ত ব্যঙ্গের কটাক্ষপাত করে চড়া গলায় বলেন—অ্যাঁ এতো বড়ো অপমানের কথা? শাশুড়ীর পায়ে ধরে মাপ চাইতে বলা? জামাইয়ের তোমার বারো বছর জেল হওয়া উচিত।...হলো কি, সব হলো কি! অ্যাঁ!...শাশুড়ীর পায়ে ধরতে বলেছে বলে, শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবে! হবে বৈকি, এসব তো হতেই হবে। দেশে যে এখন স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হচ্ছে, নারী

জাগরণ হচ্ছে। বেথুন সাহেব বাঙলা দেশের কতো বড়ো উপকার করে গেছে! ইস্কুলে শানায়নি, আবার কলেজ! মেয়েরা পায়ে জুতো মোজা এঁটে কলেজ যাচ্ছেন!

স্বর্ণলতা ঈষৎ আহত স্বরে বলেন, সে, যে যাচ্ছে—সে যাচ্ছে, তোমার মেয়েরা তো আর যায় নি?

—না গিয়েই এই! গেলে বোধ করি আর ঘরে থাকতো না, ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতো। ঘরে বসেই কালের হাওয়ার গুণ ধরেছে। দেখোনা বসে—ভারত-ললনারা তো জেগে উঠেছেন, এইবার ভারতের ঘুম ভাঙলো বলে! যতো সব ইয়ে! অনু ডাক তো তোর দিদিকে, বলগে একখুনি নাবো, বাবা বললেন!

যদিও হরবিলাসবাবু ব্যঙ্গ করেন, বিদ্রূপ করেন, তবুও চলতি হাওয়ার খবর কিছু কিছু রাখেন, নাটক নভেল নামক হতচ্ছাড়া বস্তুগুলোর নাম জানেন। কিন্তু সুবর্ণলতার শ্বশুরবাড়ীর লোকগুলা, সুবর্ণলতার ভাসুর দেওররা আর স্বামী, এরা যেন নীরেট দেওয়াল! ওদের 'বোধে'র জগতে এমন একটা ভেন্টিলেটারও নেই যেখান দিয়ে চলন্ত বাতাসের এক কণাও ঢুকে পড়বে!

কিন্তু সুবর্ণলতা কেন বহির্জগতে বহমান সেই বাতাসের স্পর্শ চায়? এ বাড়ীর মেয়ে আর সে বাড়ীর বৌ হয়েও তার সমস্ত সত্তা মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করে কেন? তার নিজের পরিবেশ কেন তাকে অহরহ পীড়া দেয়, আঘাত হানে। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেও সে, কেন মানুষের কাছে শ্রদ্ধার দাবী করে, সম্মানের দাবী করে?

কই তার বড়ো-জা, মেজ-জা, ন-জা তো ও জিনিসটা নিয়ে মাথা ঘামায় না?...ওরা জানে সুদূর ভবিষ্যতে কোনো একদিন গৃহিণীত্বের গৌরব-আসন ওরাও পাবে, পাবে স্বর্গাদপি গরীয়সীর নৈবেদ্য। সেই স্বর্গবাসের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কোনো আকাঙ্ক্ষা ওদের নেই।

—আচ্ছা তা'র নিজের মা স্বর্ণলতাই বা কি?

একক সংসারে, শাশুড়ীবিহীন সংসারে চিরদিনই তো তিনি গৃহিণী, কিন্তু হরবিলাসের দাপটেই তো ঠাণ্ডা হয়ে আছেন।

সুবর্ণলতারই বা এতো অসহিষ্ণুতা কেন? সংসারের প্রত্যেকটি কাজ, আর প্রত্যেকের আচার আচরণ কেন সে কষতে বসে তার নিজের ন্যায়-অন্যায়-বোধের কষ্টিপাথরে?

অনুর সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো সুবর্ণ।

উস্কো চুল, শুকনো মুখ, পরণে যেমন তেমন একটা শাড়ী আর সেমিজ। তিন ছেলের মা বটে, কিন্তু বয়েস আর কতোই হয়েছে। দেখলে এখনো বালিকা বলেই মনে হয়।

নেমে এসে বাপকে প্রণাম করলো নীরবে।

হরবিলাসবাবুর পিতৃহৃদয় হয় তো একটু কোমল হয়ে আসে, আহা কতোদিন পরে এ বাড়ীতে সুবর্ণর উপস্থিতি চোখে পড়লো। নিজের ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেলো, তাই—একদিনের জন্যে আসতে পেলো না বেচারা। একদেশের মধ্যে থেকে এরকম বঞ্চিত হওয়া কি কম কষ্ট। স্বর্ণলতা তো কেঁদে কেঁদেই মরেছেন।...ব্যাপার কি না, সুবর্ণর শ্বশুরবাড়ীর গুষ্ঠীর সমস্ত মেয়ে মহলেতে নেমন্তন্ন করে হরবিলাস শুধু সুবর্ণকে আনার কথা বলেছিলেন!

মেয়েকে যখন তারা পাঠালো না, তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার ছুটেছিলেন হরবিলাস ত্রুটি পূরণ করতে, কিন্তু সুবর্ণলতার শাশুড়ী মুক্তকেশী বিষ হাসি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ, ওতে আমার বড়ো ঘেন্না বেহাই মশাই। গোড়ায় যখন কুটুম্ব বলে গেরাহ্যি করোনি, তখন বুঝতেই হবে সেটা ইচ্ছে করেই করেছো। এখন নিজের মেয়েটি শক্ত কায়দায় পড়ে গিয়েছে, তাই—দাঁতে কুটো নিয়ে ছুটে এসেছো। তবে এসেছো বলেই যে আমার বাড়ীর বৌ ঝি হ্যাংলার মতো তোমার বাড়ীতে পাত পাততে ছুটবে, তা মনে কোরো না।

মনের রাগ মনে চেপে ফিরে এসেছিলেন হরবিলাস, তারপর থেকে এই একবছর হ'তে চললো, মেয়ে আনার নামও করেননি। সেই দুর্লভ মেয়েকে এমন সুলভ হয়ে এসে দাঁড়াতে দেখে, বাপের মনের দুর্ব্বল জায়গাটায় হয় তো একটু ঘা দেয়, কিন্তু সে দুর্ব্বলতাকে বাইরে প্রকাশ করা সদ্বিবেচনার কাজ বলে মনে করেন না হরবিলাস, তাই গম্ভীরভাবে বলেন—হঠাৎ এরকম চলে এলি যে?

সুবর্ণ মুখ তুলে বাপের দিকে একবারটি তাকিয়েই মুখ নীচু করে শান্তস্বরে বললো—চলে তো আসিনি, ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে।

—কথার কী ছিরি—ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন স্বর্ণলতা—তিন ছেলের বৌ তুই, তাড়িয়ে অমনি দিলেই হলো!

সুবর্ণলতা স্থিরভাবে বলে—হলোও তো দেখলাম! সহজেই হলো। বললো—"ছেলেরা আমাদের বংশধর ওরা আমাদের কাছে থাক, তোমার মেয়ে নিয়ে তুমি বাপের বাড়ী গিয়ে থাকো গে।" তারপর গাড়ী ডাকলো, তোরঙ্গটাকে তুলে দিলো গাড়ীর মাথায়, বড়ো-জা কাঁদতে কাঁদতে এসে খুকীটার গায়ে একটা ঘাগরা পরিয়ে দিলেন, ছোট ঠাওর তাড়া দিয়ে ডাকলো—"দেরী কোরো না সেজবৌ, গাড়োয়ান রাগারাগি করছে।" বাস উঠে এলাম গাড়ীতে।

হরবিলাস ধৈর্য্য ধরে সবটা শোনার শেষে ক্ষোভ আর ক্রোধের সংমিশ্রণে গঠিত একটি প্রশ্ন করেন—বাস উঠে এলাম গাড়ীতে? কেঁদে পড়ে বলতে পারলি না—'ছেলে দুটোকে ছেড়ে কি করে থাকবো আমি?'

—ও কথা বলবো কেন? সুবর্ণ দৃঢ়ভাবে বলে—ছেলে ছেড়ে থাকতে পারবো না, একথার কোনো মানে হয়?

—মানেই হয় না? একথার কোনো মানেই হয় না? হরবিলাস চড়ে ওঠেন, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের কোমলতা অন্তর্হিত হয়ে যায়। তীব্রস্বরে বলেন—বরাবরের জন্যে ছেলেদের ছেড়ে থাকতে পারবি তুই? বলতে মুখে বাধলো না?

—সত্যি কথা বলতে মুখে বাধবে কেন বাবা? থাকতে হলে ঠিকই থাকা যায়। মেজদা যখন মারা গেলো, মা যে তখন—"তোকে ছেড়ে থাকতে পারবো না বাবা", বলে কেঁদে বাড়ী ফাটিয়ে ফেলেছিলেন, থাকতে পারছেন না কি?

তুলনা শুনে বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত হয়ে যান হরবিলাস-দম্পতি। এই রকম ভয়ঙ্কর জিভ মেয়ের! মা হয়ে সন্তানের সম্বন্ধে কল্যাণবোধটুকু পর্য্যন্ত নেই! এই বৌকে যদি সহ্য করতে না পারে তারা, তাহলে তো তাদের দোষ দেওয়া যায় না!

লজ্জায় ধিক্কারে স্বর্ণলতার মুখে কথা জোগায় না, হরবিলাস কটুকণ্ঠে ধমকে ওঠেন—যা মুখে আসছে তাই বলছিস যে? বুকের পাটাটা খুব হয়েছে দেখছি। তোমার মতো বৌকে, শুধু গাড়ী ডেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, গলা ধাক্কা দিয়ে একবস্ত্রে দূর করে দেয়নি, এই তোমার বাপের ভাগ্যি বুঝলে? বলি করেছিলি কি?

—কিছু না!

—কিছু না? তুমি কিছু করোনি, আর তা'রা কথা-বার্ত্তা নেই, গাড়ী ডেকে তুলে দিলো তোমায়? এই কথা বিশ্বাস করবো আমি?

অন্ন এতক্ষণ পিছনে দাঁড়িয়েছিলো—দিদির লাঞ্ছনা তার গায়েও যেন কিছুটা লাগে, তাছাড়া—সারাদিনে দিদিকে প্রশ্নবাণে বিক্ষত করে অনেক তথ্য সে জেনে ফেলেছে, তাই ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বলে—দিদির ননদের বিয়ে দিয়ে, জামাইবাবুদের সংসারে টানাটানি পড়েছে, তাই দিদির শাশুড়ী বলেন কি—"বৌরা—ছেলে-পুলে নিয়ে কিছুদিন করে বাপেরবাড়ী গিয়ে থাকুক!" দিদি তা আসবে কেন? দিদি বলেছে যে—

—থাম্ তুই, দিদি কি বলেছে দিদিই বলুক! হরবিলাস বারদুই মেয়ের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে বোধ হয় 'বিদায় ইতিহাসটা' হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেন, তাই গম্ভীর-স্বরে বলেন—কি বলেছিলি তুই?

—বলেছিলাম, "তোমাদের সংসারে টানাটানি পড়েছে, সে দায় আমার বাবা পোহাতে যাবেন কেন?"

সোজা আর সতেজ জবাব সুবর্ণর।

—এই কথা বলেছিলি তুই?

হতবুদ্ধি হরবিলাস আর স্বর্ণলতা একই সঙ্গে একটি প্রশ্নই করেন—সত্যি বলেছিলি?

—সত্যি কথা, সত্যি বলবো না কেন?

—আর সব বৌরা বলেছিলো?

—আর সব বৌরা?…সুবর্ণর মুখে একটু হাসির আভাস দেখা দেয়, হাসির মতো করেই বলে ও—তারা তো বাপের বাড়ী যাবার নামে নাচছে।

—হুঁ! যা স্বাভাবিক তাই করেছে। তা' তুমিই বা নাচলে না কেন?…এক বছর তো আসোনি এখানে—

—আসিনি, সে ওদের দোষ!…সুবর্ণ উদ্ধতভাবে বলে—দাদার বিয়ের সময় পাঠালোনা, কিনা নেমন্তন্ন

ভালো হয়নি, পাঠালে ওঁদের মান যাবে! আর এখন নিজের অসুবিধেয় পড়ে, যেচে পাঠাতে মান যায় না? ছিঃ! আত্মসম্মান বোধ থাকলে তো।

অম্ল স্পন্দিত বক্ষে দিদির দুঃসাহস লক্ষ্য করে। বাবার মুখের সামনে এভাবে কথা বলা! দাদাও পারে না যে। কিন্তু কেন কে জানে এতো বড়ো ধৃষ্টতা দেখেও হরবিলাস আর বেশী ক্রুদ্ধ হন না, একই রকম গম্ভীরভাবে বলেন—ওদের মান অপমান ওরা বুঝবে। তোমার উচিত ছিলো না, সে চৈতন্য করাতে যাওয়া।···ফাঁকতালে বেশ চলে আসতে, কিছুদিন থাকা হতো!

—ফাঁকতালে পেয়ে যাওয়া কোনো জিনিসে আমার লোভ নেই বাবা!

হরবিলাস যেন একটু চমকে যান। কথাটা কেমন নতুন লাগে তাঁর কাছে। কিন্তু আত্মস্থ হবার ক্ষমতা তাঁর আছে, তাই চমকানিটা ধরা পড়ে না। পিঠের দিকে দুই হাত জড়ো করে দালানে পায়চারি করতে করতে বলেন—বেশী নাটক নভেল পড়লেই বুদ্ধি সুদ্ধি এই রকম হয়। বলি—ওদের কাজেই কৈফিয়ৎ তলব করবার তুমি কে? এই তোমাদের মতো মেয়েকেই বলে 'মেয়ে ডেঁপো' বুঝলে?···যাক্ গে দোষ যারই হোক, এ ব্যাপারের তো একটা ফয়সালার দরকার! বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়!···কই তুমি মেয়েটাকে একটু তোমাদের ওই 'মাছ ভাত' না কি বলে খাইয়ে দেবে তো দাও, আমি ও মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে রওনা দিই। শাশুড়ী মাগীকে একটু তোয়াজ করে রাগ ভাঙিয়ে আজই রেখে আসি মেয়েটাকে।···রাত্রিবাস করলেই ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে যাবে।

—আমি তো আর কখনো ওখানে যাবো না বাবা।

মেয়ের কণ্ঠস্বরে হরবিলাস একটু উদ্বেগ অনুভব করলেন। নাঃ, বকে ঝকে বাগে আনা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। বরাবরই মেয়েটা কেমন যেন উদো-মাদা। বহুদর্শী অভিভাবকদের বুদ্ধি বিবেচনার প্রভাব ওকে যেন স্পর্শই করতে পারে না। কিন্তু ছেলেবেলায় যা ছিলো তা' ছিলো, এখন তো স্বাভাবিক হতে হবে। দেখা যাক, মিষ্টি কথায় কাজ হাসিল হয় কিনা।

বললেন—শোনো একবার ক্ষ্যাপা মেয়ের কথা! এটা আবার একটা কথা না কি রে—পাগলী? ওদের ওপর মান অভিমান করলে চলে? চল মা চল, আজ নিয়ে যাই। অমনি—তোর শাশুড়ী-মাগীকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঁজী দেখে একটা দিন দেখে রাখি, মাস দুইয়ের মতো নিয়ে আসবো—তখন।

—আপনিও তা'হলে তাড়িয়ে দিচ্ছেন বাবা?

স্বর্ণলতা এতক্ষণ নির্ব্বাক দর্শকের ভূমিকা নিয়ে এদের পিতা কন্যার বাক্যালাপ শুনছিলেন, মেয়ের কথায় 'ষাট্ ষাট্' করে উঠে বললেন—কি যে বলিস বাছা! কোনো অকথা কুকথাই কি মুখে আটকায়না তোর? তিন ছেলের মা হলি, এখনো 'ছেলে বুদ্ধি' গেলো না! মেয়ে মানুষের বাপের বাড়ী হলো কুটুমবাড়ী, চিরকালের জায়গা তো নয়? যেটা আসল আশ্রয়—

সুবর্ণ বাধা দিয়ে বলে—আসল আশ্রয়ের আসল দাম তো ধরা পড়ে গেলো মা! মনকে চোখ ঠেরে লাভ কি?

—কি জানি বাছা, তোমাদের ওসব হেঁয়ালির কথা বুঝতে পারি না। মেয়েমানুষকে সব সয়ে নিতে হয়, এই কথাই জেনে এসেছি চিরকাল।···আজ যদি উনি খোসামোদ করে রেখে না আসেন, তিল থেকে তাল হয়ে উঠবে।

—ককখনো না! খোসামোদ কিসের?···কেন? কেন বাবা শুধু শুধু ওদের খোসামোদ করতে যাবেন? কী চোর দায়ে ধরা পড়েছেন?

উদ্ধত প্রশ্ন করে সুবর্ণলতা।

—করতেই হবে—উদাস ক্ষুব্ধকণ্ঠে একটি দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন স্বর্ণলতা—যেদিন থেকে মেয়ের বাপ হয়েছেন সেইদিন থেকেই চোরদায়ে ধরা পড়েছেন। এখন তোমার দুর্ব্বুদ্ধির খেসারৎ দিতে, গলায় বস্তর দিয়ে সাত হাত নাকেখৎ দিতে বললেও মেনে নিতে হবে।

সাধারণ কথা, বাঙালীর ঘরের নিত্য পরিচিত কথা, কিন্তু কি থেকে যে কী হয়! হঠাৎ সুবর্ণলতা একটা অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে। আচমকা ঠাঁই ঠাঁই করে নিজের কপালটা দেওয়ালে ঠুকতে থাকে, আর রুদ্ধনিশ্বাসে বলতে থাকে—কেন? কেন? কেন?

বোধকরি প্রতিবাদের আর কোনো ভাষা খুঁজে পায়না বলেই সুবর্ণলতা ওর আট বছরের বিবাহিত জীবনের পুঞ্জীভূত সমস্ত প্রশ্নকে এই একটি মাত্র শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করতে চায়!···হয়তো বা শুধু তাও নয়, সমস্ত নারী সমাজের নিরুদ্ধ

প্রশ্নকে মুক্তি দেবার দুর্দ্দমনীয় বাসনা সত্যকার কোনো পথ না পেয়ে, এমন উন্মত্ত চেষ্টায় মাথাকুটে মরে।

হয়তো—বিংশ শতাব্দীর এই শেষার্দ্ধেও সভ্যতা আর প্রগতির চোখ-ঝলসানো আলোর সামনে সাজিয়ে রাখা রঙ্‌-চঙে পুতুল-মেয়েদের পিছনের অন্ধকারে, আজও কোটি কোটি মেয়ে এমনিভাবে মাথা কুটে কুটে অদৃশ্য বিচারককে প্রশ্ন করছে—"কেন ?…কেন ? কেন ?"

সুবর্ণলতার যুগ কি শেষ হয়ে গিয়েছে ?

কোনো যুগই কি কোনো দিন নিশ্চিহ্ন হয়ে শেষ হয় ? হয়তো বৃদ্ধা পৃথিবীর শীর্ণ পাঁজরের খাঁজে খাঁজে কোথাও কোনোখানে আটকে থাকে শেষ-হয়ে-যাওয়া-যুগের অবশিষ্ট অংশ !…এখানে ওখানে উঁকি দিলে তার সন্ধান মেলে।

তবু দৃশ্যতঃ মাথা কুটতে থাকলে তার প্রতিকার অবশ্যই হয়।

চকিতের মধ্যেই কাণ্ডটা ঘটে যায়, চকিতের মধ্যেই ধরে ফেলেন স্বর্ণলতা আর হরবিলাস। অন্ন ডুকরে চেঁচিয়ে উঠে জল আনতে ছোটে…সুবর্ণর মাসদশেকের মেয়েটা কিছু না বুঝে সুঝেই কান্না জুড়ে দেয় আর—চৈতন্য ফিরতেই বোধকরি চক্ষু লজ্জা ঢাকতে সুবর্ণ ঘরে গিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে।

কিন্তু বোঝবার যা, তা বুঝে ফেলেছেন হরবিলাস দম্পতি।—মাথার দোষ হয়েছে মেয়েটার !

নইলে সহজ মানুষের সাধ্য কি যে সখ করে উন্মাদের আচরণ করে ?

পাশের ঘরে ফিসফিস শব্দে স্বামী-স্ত্রীর পরামর্শ চলে।

—করা যায় কি !

জ্বরজ্বালা নয় যে, সন্তান স্নেহের বশবর্ত্তী হয়ে খানিকটা দায় পোহাবেন ! এ যে রীতিমত বিপদ ! এখানে স্নেহকে প্রশ্রয় দিতে গেলে, আজীবনের মতো এ বিপদ ঘাড়ে নিতে হবে।

পিতা গম্ভীরস্বরে আক্ষেপ করেন—কেন যে বিদেয় করে দিয়েছে, সে তো বোঝাই যাচ্ছে ! কিন্তু আপাতত উপায় কি ?

—এইবেলা কোনো রকমে গছিয়ে আসতে পারো তো দেখো।

—তা'হলেও আজ নিয়ে যাওয়া যায় না। ভাবছি—একাই একবার ঘুরে আসবো কি না।

—তাই করো বাবু তাহলে। অমনি বেয়ে-চেয়ে দেখে এসো, কি কীর্ত্তিটা করে এসেছেন তোমার কন্যে !

—তাই করতে হবে দেখছি ! শুধু শুধু এখন পাঁচসিকে দেড়টাকা গাড়ীভাড়া। উড়ো বিপদ আর কাকে বলে !

হঠাৎ ছায়ামূর্ত্তির মতো দরজায় এসে দাঁড়ায় সুবর্ণ। গেরস্থঘরে তখনো রেড়ির তেলের প্রদীপ রাজত্ব করছে। দেয়ালে কল টিপে আলো জ্বালার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারতো না।

গোলমালে আজ এখনো সন্ধ্যে জ্বালা হয় নি, সুবর্ণ কখন এসে দাঁড়িয়েছে কে জানে !

যেন অনেক দূর থেকে প্রেতকণ্ঠে উচ্চারিত হয়—মিথ্যে আর দু'দিন যাওয়া আসার ঝঞ্ঝাট করতে হবে না বাবা, আমাকে আজই নিয়ে চলুন।

অপ্রতিভ হয়ে যান স্বর্ণলতা আর হরবিলাস। সবই শুনেছে বোধহয়।

হরবিলাস লজ্জা ঢাকতে তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন—আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে, ভারী একেবারে ইয়ে—রোসনা আজ একবার গিয়ে দেখে আসি—

—কী দরকার বাবা ! দর্জিপাড়ার সেই গলিতে আবার যদি ঢুকতেই হয়, একবেলার তফাতে আর কী এসে যাবে ?

এরপর স্বর্ণলতার চোখের জল ফেলার পালা !

হাজার হোক মায়ের প্রাণ তো !

একটু মাছ-ভাত নিয়ে সাধলেন মেয়েকে, নিয়মরক্ষার্থে এককণা মুখে দিয়ে নিঃশব্দে ঠেলে রাখলো সুবর্ণ। গাড়ীতে উঠলো নিঃশব্দে শুকনো চোখে।

স্বর্ণলতার গর্ভজাত সন্তান, স্বর্ণলতার হাতে গড়া পুতুল, তবু সুবর্ণলতা আর স্বর্ণলতার মধ্যে যেন অপরিচয়ের সুদূর দূরত্ব। সুবর্ণলতা যেন আলাদা জগতের। তবু মাতৃকর্ত্তব্য বিস্মৃত হন না স্বর্ণলতা, মেয়েকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন—একটু নরম হয়ে থেকো মা, মেয়েমানুষ—বেশী তেজ দর্প কি ভালো ? বিনাদোষে শুধু শুধুই যদি মাপ চাইতে বলে থাকে, না হয় চাইলি। গুরুজনের

কাছে মাপ চাওয়ায় লজ্জা কি? শ্বশুরবাড়ী হলো শক্ত ঠাঁই, সেখানে—

অনেকক্ষণের পর এবার মুখ খুললো সুবর্ণ, মৃদুহেসে বললো—কোন ঠাঁইটাই বা শক্ত নয় মা? পৃথিবীটাই বড়ো শক্ত জায়গা! সেটা আগে বুঝতে পারি নি বলেই নিজেও শক্ত হতে ইচ্ছে হয়েছিলো। ভুলটা যখন ভাঙলো নরম হবো বৈকি! নরম কাদা হয়ে ওদের পায়ে পায়ে ঘুরতে হবে। শুধু গুরুজন কেন? গুরু লঘু যেখানে যতো জন আছে, জনে জনে সকলের কাছে ঘাট মানবো। হিসেবের ভুলে ভেবেছিলাম—বিনাদোষে ঘাট মানাতে চায় ওরা, এখন বুঝেছি একটা অপরাধ চোখ এড়িয়ে গেছে। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানোই যে মস্ত বড়ো একটা অপরাধ একথাটা মনে ছিলো না। সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে জীবনভোর সকলের কাছে ঘাট মানতে হবে।

হরবিলাস বললেন—রাত হয়ে যাচ্ছে।

ঘোড়ার গাড়ীর পাখী পর্য্যন্ত এঁটে মেয়ে আর নাতনীকে নিয়ে চললেন হরবিলাস, বলরাম বোসের লেন থেকে দর্জ্জিপাড়ার এক 'বাই'লেনে। দেড় হাত চওড়া গলির ছু'পাশে খাড়া হয়ে আছে—উঁচু উঁচু দেওয়াল। চন্দ্রসূর্য্যের প্রবেশ অধিকার নেই এ গলিতে। তবু সেদিন এই সর্পিল পথের একটা বাঁকের খাঁজে আটকে থাকা জীর্ণ একখানা বাড়ীর রুদ্ধ কপাটের ওপিঠে প্রবেশ অধিকার পেতে কম অপেক্ষা করতে হয় নি সুবর্ণলতাকে।

মাতৃভক্ত ছেলে নেপালচন্দ্র শ্বশুরের সামনে এসে ঘাড় গুঁজে খোঁৎ খোঁৎ করে বলেছিলো—আমার সাফ্ কথা, মায়ের পা ধরে মাপ চাইতে হবে। নইলে—পত্রপাঠ আপনাকে আপনার মেয়ে নিয়ে ফেরৎ যেতে হবে। গাড়ীটাকে একখুনি ছেড়ে দেবেন না।

হরবিলাস না এসে যদি সুবর্ণর দাদা তুলসীবিলাস আসতো সঙ্গে, তা'হলে নিশ্চয়ই ঘটনার গতি পরিবর্ত্তিত হয়ে যেতো, পরিবর্ত্তিত হতো সুবর্ণলতার জীবন ইতিহাস। যোয়ান ছেলে তুলসী এতো অপমান গায়ে মেখে থাকতো না।

কিন্তু হরবিলাসের পাকা মাথা। গরম হয়ে ওঠা রক্ত যে একসময় ঠাণ্ডা হয়ে যায় এ বোধ তাঁর আছে।

শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য ক্ষমাময়ী মুক্তকেশীই রক্ষা করলেন, দরজায় এসে বললেন—দোর ছাড় ক্ষ্যাপলা, লোক হাসাসনে। ...যাও বাছা, বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ো, আর কেলেঙ্কার বাড়িও না।...রাত হয়ে গেছে, তোমাকে আর বসতে বলবো না বেহাই মশাই। মেয়ে যখন রইলো পায়ের ধুলো দিতেই হবে অবিশ্যি। তবে একটি কথা বলছি কিছু মনে কোরো না, আরও একটি মেয়ে তোমার বড়ো হচ্ছে, সময়ে একটু সুশিক্ষা তাকে দিও। পরের ঘরে পাঠাতে তো হবে? আমার মতো আর তাদের সংসারও নষ্ট না হয়, তাই বলা।...অবিশ্যি বেয়ানের আমার যদি গর্ভের তেমন গুণ থাকে, ও তোমার শিক্ষে দীক্ষে ভস্মে ঘী।...তারা ব্রহ্মময়ী! তারা ব্রহ্মময়ী!

ওরই মধ্যে বেয়ানের কান বাঁচিয়ে হরবিলাস বললেন—মনে দুঃখ করিসনে মা, নিয়ে তোকে যাবোই। আর কিছুদিন যাক, একখুনি বলতে পারবো না।

—ও নিয়ে আর ঘাটবেন না বাবা, আমি তো আর যাবো না। বলে হতচকিত হরবিলাসকে একটা প্রণাম করে সরিসৃপের গর্তের মতো স্যাঁৎসেঁতে আর অন্ধকার গর্তটার মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিলো সুবর্ণ।

হ্যাঁ সুবর্ণলতার প্রতিজ্ঞা সুবর্ণলতা রেখেছিলো। বলরাম বোস লেনের সে বাড়ীর চৌকাঠ আর কখনো ডিঙোয় নি সে!

তবে কি?...তবে কি সুবর্ণলতা—?

না না সে কিছু নয়! দর্জ্জিপাড়ার সেই দাঁত-বারকরা দেওয়ালওলা আর কড়ি বরগা ঝুলেপড়া বাড়ীটায়, আরও অনেকগুলো দিন আর অনেকগুলো রাত্রি কেটে গিয়েছিলো সুবর্ণলতার!

সেইদিনের সেই—মাঝরাত্রে উঠে শাশুড়ীর আফিমের কৌটো চুরি করে, মুক্তি পাবার হাস্যকর প্রচেষ্টাটা? সে তো ধাষ্টমো মাত্র!

বস্তা বস্তা নাটক নভেল পড়ে অনেক বড়ো বড়ো কথা হয়তো শিখেছিলো সুবর্ণ, কিন্তু আফিমের মাত্রাটা কতোখানি হ'লে, সেটা ধাষ্টমোর কোঠা ছাড়িয়ে মুক্তিফলপ্রসূ হয়, সে তথ্য শেখে নি!

তা যদি শিখতে পারতো, তা'হলে তো সেদিনেই সুবর্ণলতার ইতিহাসে যবনিকা পড়তো। তাহলে আর—মহারাণীর আমল আর সপ্তম এডোয়ার্ডের মেয়াদ পার হয়ে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের আমলে যখন পুত্রপৌত্র পরিবৃতা গৃহিণী সুবর্ণলতা নেপালচন্দ্রের পায়ে মাথা রেখে স্বর্গে গেলেন, তখন পাঁচজনে তার সৌভাগ্যকে 'ধন্য ধন্য' করবার সুযোগ পেতো কি করে?

বিষের মাত্রাটা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই যদি থাকতো সুবর্ণলতার তা'হলে—কিন্তু ওকথা থাক! নেপালচন্দ্র আর সুবর্ণলতার যে বৃহৎ ফটোগ্রাফ দু'খানা মুখোমুখি টাঙানো রয়েছে ওঁদের বড়ো ছেলের ঘরে, তাকে বেষ্টন করে ফুলের মালা ঝুলছে। ফি বছরের শ্রাদ্ধবার্ষিকীতে শুকনো মালা বদলে নতুন মালা দেওয়া হয়।

নান্নুরের বিস্মৃত মহামহোপাধ্যায়

শ্রীগৌরীশ্বর ভট্টাচার্য

বৈষ্ণব চিত্তের মধুমাধবী কুঞ্জ এই নান্নুর। বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছোট একটি গ্রাম।—বাংলা দেশের অন্যান্য গ্রামের মতোই অত্যন্ত সহজ পথে এবং অনিবার্য কারণে ধ্বংস মুখর। স্বাভাবিক অবস্থিতির দৈন্য, কিন্তু চৈতন্যপ্রেমিক বৈষ্ণব জনের মানসিক অবস্থিতির মহত্ত্ব ও বিশালতাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। আজও সুদূর বাংলার নানা প্রান্তে নিভৃত আখড়ায় বসে বৈষ্ণব মহান্তেরা চণ্ডীদাসের লীলাভূমি নান্নুরের দৃশ্যপট যেন প্রত্যক্ষ করেন, আর তাঁর পদাবলীর অলস রোমন্থনে দিব্য মাধুর্যে অভিষিক্ত হন। সামাজিক বাধা-নিষেধের ঊর্ধ্বলোকে নরনারীর সহজ সরল সম্বন্ধকে প্রাণ মাতানো সংগীতধ্বনিতে যে বিদ্রোহী মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রতিদিনের পথ পরিক্রমায় নান্নুরের ধূলি আজ ব্রজরেণু। চণ্ডীদাসের ধ্বংসপ্রাপ্ত, জীর্ণ বাসভূমি এবং রামী ধোপানীর পাট দেখে আজও বৈষ্ণবের চোখে জল আসে,—আর সহজিয়া সাধক আপন মনের মানুষের সাহচর্যে রোমাঞ্চিত হন।

চণ্ডীদাস ছাড়া নান্নুরের দ্বিতীয় পরিচয় নেই। অন্ততঃ ইউনিয়ন বোর্ডের মানচিত্রের অস্তিত্ব ছাড়া সুধী সমাজ নান্নুর সম্বন্ধে আর কিছুই জানেন না। কবে নান্নুরের প্রতিষ্ঠা,—প্রাক্ চণ্ডীদাস অথবা চণ্ডীদাসোত্তর নান্নুরের সামাজিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা প্রণালী কি ছিলো সে সম্বন্ধে বিস্তৃত কিছুই জানা যায় না! সৌভাগ্যক্রমে বিশ্বভারতী সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহে চারখানি পুঁথির সন্ধান নান্নুরের এক উজ্জ্বল অধ্যায় উদ্ঘাটিত করেছে। চারখানি পুঁথির মধ্যে দু'খানি মূল এবং অপর দু'খানি তাদের টীকা। মূল পুঁথির একখানি কাব্য—"উদ্ধব চমৎকার কাব্য",—অপরটি নাটক,—"প্রতি নাটক।" রচয়িতা—মহামহোপাধ্যায় জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালংকার। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এঁর নাম নেই,—সংস্কৃত পাঠক মহলে ইনি অনাগত! এই পুঁথি চারখানিও সংগৃহীত না হলে মহামহোপাধ্যায় জগদ্দুর্লভ নিরবধিকালের নির্বাক সাক্ষ্যে হয়তো আর এক পংক্তি যোজনা করতেন মাত্র। অবশ্য ইতস্ততঃ তাঁর কয়েকটি ব্যবস্থাদান পত্র, সর্পবন্ধ বা খড়্গবন্ধে অবসর বিনোদনের বা স্তাবকতার টুকরো কাব্য রচনার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে মাল্যরচনায় মালাকরের নৈপুণ্য প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। অপ্রত্যাশিতভাবে এ্যাডাম সাহেবের তদানীন্তন বাংলা দেশের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিত বিবরণীতে জগদ্দুর্লভ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান্ বিবরণ পাই। * বাংলা দেশে বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলায় ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পূর্বে কি ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এ্যাডাম সাহেব তাঁর বিবরণীতে তার বিস্তৃত উল্লেখ করেছেন। কোন গ্রামে কতগুলি চতুষ্পাঠী ছিল, ছাত্রসংখ্যা, অধ্যাপক মশায়ের নাম, অধ্যাপনার বিষয়, এমন কি অধ্যাপক মশায় কি কি গ্রন্থের রচয়িতা,—এ সকল সংবাদই তিনি যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করে সংগ্রহ করেছিলেন। এ্যাডাম সাহেবের বিবরণানুযায়ী মহামহোপাধ্যায় জগদ্দুর্লভ ছিলেন নান্নুরের চতুষ্পাঠীর খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং চারখানি গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থগুলির নাম পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

রচনাগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় না থাকলেও মহামহোপাধ্যায় যে বহু-অধীত পণ্ডিত ছিলেন তা' তাঁর টীকা দু'টি পাঠে বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থকারের নিজের রচিত টীকার মূল্য যে কতোখানি তা' অতি-আধুনিক সাহিত্যরসিকদের অজানা নয়। শব্দের ব্যাখ্যানে এবং শব্দ বিশ্লেষণে তিনি যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা' অনেক সময় কষ্টকল্পিত মনে হলেও তাঁর ন্যায়ালংকার উপাধির সার্থকতা সম্পাদন করেছে। এবং সাহিত্যিক হলেও তিনি যে প্রধানতঃ নৈয়ায়িক একথা তিনি অকুণ্ঠভাবে টীকায় ঘোষণা করেছেন। এ প্রবন্ধে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। কিন্তু তার পূর্বে একটি অতি মূল্যবান্ অথচ পণ্ডিত সমাজে অজ্ঞাত তথ্য সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা দরকার। আমি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সংগে বিশেষ পরিচিত নই, বা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থকার সম্বন্ধে যে বিবদমান মতামত রয়েছে আমি তার বিস্তৃত সংবাদ জানি না। যে বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই সে বিষয়ে আমার অধিকার সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। কাজেই অনভিজ্ঞের মতো সমস্যা ব্যূহের অন্তরে প্রবেশ না করে শুধু আমার পুঁথিতে যে উপাদান মিলছে তাই কৌতূহলী পাঠক সমাজে উপস্থাপিত করছি।

প্রবন্ধের গোড়াতেই উল্লেখ করেছি—নান্নুর চণ্ডীদাসের স্মৃতি-বিজড়িত। বর্তমানে কোনো কোনো পণ্ডিত নান্নুর সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন এবং চণ্ডীদাসকে বীরভূমের অধিবাসী না বলে বাঁকুড়ার অধিবাসী বলতে উৎসাহী হয়েছেন। কোন্ পক্ষের প্রমাণ বলবত্তর বা কি প্রমাণ সাপেক্ষে উভয় দল উভয় মতের সমর্থক আমার তা' বিশেষ জানা নেই, বা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তা' প্রকাশ করা নয়! আমার বক্তব্য এই যে মহামহোপাধ্যায় জগদ্দুর্লভ বৈষ্ণব হয়েও চণ্ডীদাস স্মৃতিবিজড়িত স্বীয় বাসভূমি নান্নুরের উল্লেখ প্রসংগে চণ্ডীদাসের নাম করেন নি। কেন করেন নি,—এই প্রশ্নই বার বার মনকে পীড়া দেয়। তিনি গ্রন্থদ্বয়ের টীকায় বার বার নিজেকে নান্নুরের অধিবাসী বলে (বোধ হয়) অহংকার প্রকাশ করেছেন। নান্নুরের শব্দতাত্ত্বিক গঠনে একটা মনগড়া ব্যাখ্যাও

* এই সংবাদ পরিবেষণের জন্য বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমি ঋণী! Reports on the state of Education in Bengal (1835 & 1838)—William on Adam.—p. 259.

তৈরী করেছেন। অথচ আশ্চর্য চণ্ডীদাসের মতো মহাপুরুষের নামোল্লেখে এ কার্পণ্য কেন? সত্যিই কি চণ্ডীদাসের খ্যাতি নামোল্লেখের অপেক্ষা রাখেনা বলে মহামহোপাধ্যায় নীরবতা অবলম্বন করেছেন? তর্কের খাতিরে মেনে নিলেও প্রতিপক্ষের দলকে আশ্বস্ত করা যায় না। তবু একটা বিষয় লক্ষণীয় যে নান্নুরের চণ্ডীদাস বাদ দিয়ে কি এমন খ্যাতি যে মহামহোপাধ্যায় বার বার তাকে স্বীয় বাসভূমি বলে গৌরব বোধ করেছেন? এ গৌরবের আড়ালে নিশ্চয়ই কোনো সত্য আত্মগোপন করে রয়েছে! জগদ্দুর্লভের নীরবতার সঠিক কারণ নির্দেশ করা বর্তমান ক্ষেত্রে সুকঠিন।

জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালংকার যে বৈষ্ণব ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার প্রথম প্রমাণ তাঁর রচনার বিষয়বস্তু। উদ্ধব চমৎকার কাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। 'প্রতিনাটকে'র নায়ক যদিও রামচন্দ্র তবু বলা যেতে পারে যে বাংলা দেশে রাম ও সীতা বিষ্ণু এবং লক্ষ্মী। মহাকাব্যের নায়ক নায়িকার চারিত্রিক গুণাবলী থেকে তাঁরা ভ্রষ্ট,—সম্পূর্ণ বিভিন্ন জলবায়ুতে বৈষ্ণব মাধুর্যরসে ও কল্পনায় তাঁদের রূপান্তর ঘটেছে। জগদ্দুর্লভ এই রামচন্দ্রকেই চিত্রিত করেছেন। দ্বিতীয় প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর উদ্ধব চমৎকার কাব্যের টীকায়। টীকার প্রারম্ভে বার বার বিষ্ণু স্মরণ করছেন তিনি। এখন একটি প্রশ্ন বার বার সহজেই মনকে আলোড়িত করে,—জগদ্দুর্লভের পূর্বে কি নান্নুরে বৈষ্ণব জীবন সাধনার ধারা প্রবাহিত ছিলো না? তাঁর পূর্বপুরুষদের নাম তালিকায় যথেষ্ট পরিমাণে বৈষ্ণব প্রভাবের নিদর্শন রয়েছে। নান্নুরের বৈষ্ণব সাধনার ইতিহাস আলোচনায় কৌতূহলের প্রচুর অবকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। তন্ত্রসাধনার পীঠভূমি বীরভূমের বুকে বৈষ্ণব সাধনার স্বীকৃতি সমন্বয়ের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত! এর কৃতিত্বের যিনি অধিকারী তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগবে বৈকি। মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস সমস্যাকে প্রকৃত পক্ষে আরও কন্টকিত করে তুলেছেন। মহামহোপাধ্যায়ের কুলদেবতা গোপীনাথ,—আর নান্নুরের গ্রাম্য দেবতা বিশালাক্ষী। এই বিশালাক্ষী দেবীর সংগে কি এমন মাহাত্ম্য জড়িত যে মহামহোপাধ্যায় স্বগ্রন্থ টীকায় দেবীর নাম উল্লেখ করতে প্রয়াস পেয়েছেন? (প্রতি নাটকের টীকায়—অত্র পুরে আদৃতা বিশালাক্ষী পূর্দেবতা গ্রামদেবতা ইতি)। চণ্ডীদাসের আরাধ্যা 'বাশুলী'র 'বিশালাক্ষী' হওয়ায় ভাষাতাত্ত্বিক অসুবিধা থাকতে পারে। উপরন্তু 'বিশালাক্ষী' যে কোনো দেবীর বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হ'তে পারে! হিন্দু দেবদেবীর জগতে 'বাশুলী'র কোনো নিদর্শন নেই। বৌদ্ধ বাশুলীকে হিন্দু মর্যাদায় বিশালাক্ষী করতে ভাষাতত্ত্বের পথ অনুকূল না হলেও মূর্তি তত্ত্বের ইতিহাসে এমন কিছু অঘটন নয়। তবু যতক্ষণ কঠিন প্রমাণ না মিলছে ততক্ষণ অনুমান করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বৈষ্ণব হ'লেও জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালংকার স্বীয় ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের প্রতি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। বীরভূম অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই তাঁর খ্যাতি ছিলো এবং প্রায় সকল গ্রামেই তিনি স্মৃতিনির্দিষ্ট কর্তব্যাদি সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করতেন। তাঁর সেই সকল পত্র কিছু কিছু পাওয়া গিয়েছে। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হয়েও তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি যে বিশেষ কম ছিল না, তারও বলিষ্ঠ স্বাক্ষর আঁকা রয়েছে বিভিন্ন পত্রে। উদ্ধব চমৎকার কাব্যের প্রারম্ভে বিস্তৃত বংশাবলীতে তিনি তাঁর দশ পুরুষের নাম দিয়েছেন। এখানে সেই নামগুলির উল্লেখ অপ্রাসংগিক হবে না মনে করি।
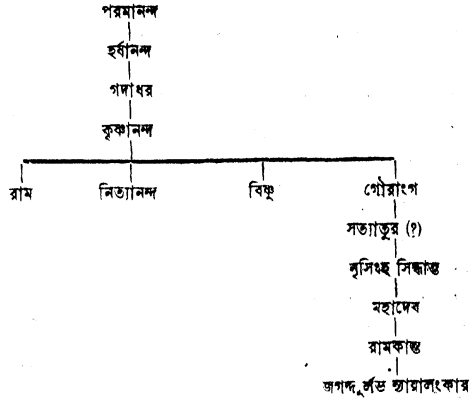
গ্রন্থদ্বয় এবং তাদের টীকায় উল্লিখিত বৎসর থেকে আমরা জগদ্দুর্লভের জীবিতকালের একটা আনুমানিক হিসাব কষতে পারি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গ্রন্থদ্বয় ও তাদের টীকা জগদ্দুর্লভের হস্তলিপি। উদ্ধব চমৎকার কাব্যের পুষ্পিকায় তিনি লিখছেন,—শাকেহষ্টসাগর পয়োনিধে চন্দ্রসংখ্যে বর্ষে শনৌ স্মরতিথৌ মধুকৃষ্ণপক্ষে। কৃষ্ণোদ্ধবাম্বিত চমৎকৃতকাব্যমেতৎ সংপূর্ণতাং গতং নান্নুর নাম্নি ধাম্নি—অর্থাৎ ১৭৪৮ শকাব্দে নান্নুরে তাঁর লেখা শেষ হয়। সমসাময়িক বাংলা সনের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলছেন,—বর্ষে তু যাবনিক আধুনিকে (বাংলা সনের ব্যাপারে এই যাবনিক এবং আধুনিক শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ) সনাখ্যে তু নেত্ররামযুগচন্দ্রসিতে চ চৈত্রে যুগ্মৈকসম্মিত দিনে—অর্থাৎ বাংলা সন ১২৩৩, ১২ই চৈত্র। অর্থাৎ আজ থেকে ১২৮ বছর আগে তিনি তাঁর কাব্য সমাপ্ত করেন। উদ্ধব চমৎকারের টীকা রচনা কাল সম্বন্ধে টীকার শেষে বলছেন—শকেহঙ্কযুগসিদ্ধিন্দু সংখ্যেহব্দে মাসি মাধবে। দ্বাদশেহহ্নিত্রয়োদশ্যাং টীকেয়ং সমপূরি চ॥ শকাব্দ ১৭৪৯ অর্থাৎ বাংলা সন ১২৩৪, ১২ই বৈশাখ টীকা সম্পূর্ণ হয়। 'প্রতি নাটকের পুষ্পিকায় তিনি জানাচ্ছেন যে শকাব্দ ১৭৫৪ অর্থাৎ ১২৩৯ সনের ২১শে ফাল্গুন রচনা শেষ হয়। কাব্য রচনার ছ'বছর পর তিনি নাটক রচনা শেষ করেন। সেই বছরই ১২৩৯ সনের ২৩শে চৈত্র তিনি নাটকটির টীকা রচনা শেষ করেন। এই সকল তারিখের উল্লেখ থেকে স্পষ্টই অনুমান করা যেতে পারে যে মহামহোপাধ্যায় উনবিংশ শতকের পূর্বার্ধে জীবিত ছিলেন।

মুসলমান শাসনের অবসান ঘটেছে তখন,—ইংরেজ ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সিপাহী বিদ্রোহ প্রতীক্ষমাণ। একটা যুগসন্ধিক্ষণ! ভারতের মর্মবাণী পরাজয়ের নীরবতা বরণ করে নিয়েছে,—বিদেশী

শাসকের দম্ভ জাতীয় জীবনের কণ্ঠরোধ করতে উদ্যত। আর আশ্চর্য এই যুগসন্ধিক্ষণে বসেও মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের নবরচনায় উৎসাহী হ'য়ে উঠেছেন। ভাবলেও বিস্ময় জাগে যে এই দেড়শো বছর আগেও সংস্কৃত সাহিত্যে গ্রন্থ রচনা অব্যাহত রয়েছে।

উদ্ধব চমৎকার কাব্য চারটি সর্গে বিভক্ত। যদিও কাব্যটি সংক্ষিপ্তকলেবরের, তবু কবি একে মহাকাব্যের সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট করেছেন। প্রথম সর্গের শ্লোক সংখ্যা ৩২, দ্বিতীয় সর্গের ৬১, তৃতীয় সর্গের ৫০ এবং চতুর্থ সর্গের ৫২। কাব্যের বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যহীন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় শ্রীরাধার বিরহে কাতর। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যপদে নিযুক্ত হয়ে বৃন্দাবনে চলেছেন। বৃন্দাবনেও শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বিরহ বেদনা অনুভব করছেন। উদ্ধব এসে এই সংবাদ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করছেন। কবি নিজেই ঘটনার বৈচিত্র্যহীনতার প্রতি বোধ হয় সজাগ ছিলেন। তাই কাব্য রচনার উপযুক্ত কৈফিয়ৎ কাব্যের প্রারম্ভেই দিয়েছেন—'কবিতাকৃতয়ে ছন্দোজ্ঞানার্থং গৃহ্যতে ময়া', এবং পরে—'স্বচ্ছাত্রবর্গেরুপয়োধিতঃ সন্ গ্রন্থং চিকীর্ষেঽধ্যবসায় এবং'—স্নেহশীল অধ্যাপক ছাত্রদের ছন্দঃ শেখানোর উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচনা করেন। মধ্যযুগীয় রচয়িতাদের মনোবৃত্তি জগদ্দুর্লভেও পরিস্ফুট,—দেবনির্দেশই তাঁর কাব্যরচনার এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনের মূল কারণ,—"গোপীনাথনিদেশতঃ। প্রথক্তর্তঃ" শ্রীগোপীনাথস্য চরিতং কর্তুমীহে॥ ১৪—গোপীনাথের নির্দেশে গোপীনাথের চরিতগাথা আমি বর্ণনা করছি। হয়তো এই গোপীনাথ তাঁদের কুলদেবতা ছিলেন এবং আরাধ্য ছিলেন। জগদ্দুর্লভের বৈষ্ণবতার এও একটা দৃঢ় প্রমাণ। স্বগ্রাম নান্নুর সম্বন্ধে তাঁর মমতা এবং গৌরব বোধ যথেষ্ট। যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই তিনি নান্নুরের উল্লেখ করেছেন। এমন কি টীকাতে নান্নুর শব্দের এক মনগড়া ব্যাখ্যাও জুড়ে দিয়েছেন। উর গতৌ উরতি জানাতীতুর জ্ঞানী, ন উরোঽনুরঃ নান্নানুরোঽজ্ঞানী যত্র স নান্নুরঃ নখাদিত্বান্নঞোঽনভাবঃ॥১৪॥ পণ্ডিতমশায়ের এ উক্তি যদি যথার্থ কথনের সীমা উল্লঙ্ঘন করে না থাকে তবে বুঝতে হবে যে নান্নুর পণ্ডিত জগদ্দুর্লভের মতো আরও অনেক জ্ঞানীর আশ্রয়স্থল ছিলো। সেই জ্ঞানিগণের মধ্যমণি হয়ে চণ্ডীদাস যদি মহামহোপাধ্যায়ের মনের নিভৃত প্রকোষ্ঠ ঝংকৃত করে থাকেন তবে তার বিন্দুমাত্র আভাস দিলে একটা বৃহত্তর সমস্যার কষ্টকর সমাধানের অবসান ঘটানোর সহায়ক হতো।

মহামহোপাধ্যায়ের স্ববিবৃতি অনুযায়ী 'উদ্ধব চমৎকার' কাব্যকে ছন্দোঽনুশাসন বলে গণ্য করা কর্তব্য। কাব্যের মাহাত্ম্য যতোখানিই থাক না কেন উদ্দেশ্য যে ছন্দের উদাহরণ দান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য যে স্বপথভ্রষ্ট হয় ভট্টিকাব্য তার প্রধান উদাহরণ। মহামহোপাধ্যায় যদি উদ্দেশ্যবিহীন একখানি কাব্য রচনা করতেন তাহলে আমরা হয়তো পরবর্তীযুগের একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যের রসাস্বাদন করতে সমর্থ হতাম। জগদ্দুর্লভের সে ক্ষমতা ছিলো। মাঝে মাঝে দু'এক জায়গায় তিনি তার স্পষ্ট স্বাক্ষর এঁকে রেখেছেন।

বাংলাদেশে সংস্কৃত ছন্দের যে গ্রন্থখানি বহু পঠিত তা গংগাদাসের ছন্দোমঞ্জরী। প্রায় সকল চতুষ্পাঠীতেই সাহিত্যের ছাত্রদের এই গ্রন্থ পড়তে হতো এবং এখনও হয়। ন্যায়ালংকার মশাই এই গ্রন্থখানিকে আদর্শ করে তাঁর ছন্দঃকাব্য রচনা করেছেন। এমন কি ছন্দোমঞ্জরীর ভাষা অবিকৃত রেখে ছন্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। ছন্দোমঞ্জরী অত্যন্ত সরলভাষায় লেখা সর্বজনবোধ্য ছন্দোগ্রন্থ। এই গ্রন্থের পর গতানুগতিক পদ্ধতিতে ছন্দোগ্রন্থ লেখার সার্থকতা ছিল না। এতে সময় এবং প্রতিভার অপচয় ঘটেছে। অবশ্য মহামহোপাধ্যায় যে যুগের লোক সে যুগ গতানুগতিকতারই যুগ। তাঁর জন্মগ্রহণের পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষে গতানুগতিকতার সূত্রপাত হয়েছে। নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা যেন সমগ্র জাতির মন থেকে লুপ্ত হয়েছে। শুধু রোমন্থন আর উদ্গীরণ। টীকার উপর টীকাই রচিত হয়েছে,—নতুন কোনো গ্রন্থের সন্ধান নেই। কাব্য রচনা করতে গিয়ে—কৃষ্ণো হৃষ্টঃ। কুড্যাং দৃষ্টঃ।—এই জাতীয় শ্লোকরচনার কি দরকার ছিলো? শুধু ছন্দের খাতিরেই এই জাতীয় রচনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। ছন্দের সংজ্ঞা নির্দেশেও যদি তিনি অভিনবত্বের সন্ধান দিতেন তবুও পাঠক মন পরিতৃপ্ত হতো। একাক্ষর থেকে আরম্ভ করে একবিংশতি অক্ষর পর্যন্ত ছন্দের নির্দেশদান তিনি করেছেন। তাও বিশেষ বিশেষ ছন্দের। সমস্ত ছন্দের উল্লেখ তিনি করেন নি। কাজেই তাঁর কাব্য পড়লে বিভিন্ন ছন্দঃ জানা যাবে না,—উপরন্তু কাব্যপাঠের সম্পূর্ণ আনন্দও মিলবে না।

সংস্কৃতে একাক্ষর ছন্দঃ কি প্রকৃতির—কৌতূহলী পাঠকদের জন্যে জগদ্দুর্লভ থেকেই তার উদাহরণ দিচ্ছি,—শ্রী, বো। ভূয়াৎ ॥২২ (আপনাদের মংগল হোক)। এই প্রসংগে বলি—সংস্কৃত ছন্দঃ প্রধানতঃ দু' প্রকার—মাত্রা এবং বৃত্ত। মাত্রা ছন্দে অক্ষরের মাত্রা অর্থাৎ স্বরের দীর্ঘতা এবং লঘুত্বের গণনা করে শ্লোক রচনা করা হয়। বৃত্তছন্দে অক্ষর সংখ্যা গণনা করতে (এতেও অবশ্য কোন অক্ষর গুরু হবে, কোন অক্ষর লঘু হবে তার নির্দেশ মানতে হয়) হয়,—এবং একটি শ্লোককে সমান চার ভাগে ভাগ করা হয়। এক এক ভাগকে 'পাদ' বলা হয়। এই এক এক পাদের অক্ষর গণনা করে গুরুলঘু গুণানুযায়ী ছন্দের বৈশিষ্ট্য বিচার করতে হয় (সাধারণতঃ সমবৃত্ত স্থলে)। অবশ্য এ ছাড়া ছন্দঃ সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য তথ্য রয়েছে,—এ প্রবন্ধে সে প্রসংগ বাদ দিলাম। আমাদের উপরিলিখিত শ্লোকে শ্রী, বো। ভূ, য়াৎ॥—চারিটি পদ এক এক অক্ষরের। দুই অক্ষরের শ্লোক কৃষ্ণো, হৃষ্টঃ। কুড্যাং, দৃষ্টঃ॥ (অনুস্বার, বিসর্গ বা হসন্তযুক্ত বর্ণ পৃথক অক্ষর হিসাবে গণনা করা হয় না)। এই ভাবে এক এক অক্ষর বাড়িয়ে মহামহোপাধ্যায় একুশ অক্ষরের ছন্দঃ পর্যন্ত তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। সেই একুশ অক্ষরের শ্লোকটির উদাহরণ দিচ্ছি—

নিষ্পন্দা নির্নিমেষা চলবলয়রহিতা নির্ণয়াশক্যরূপা
নির্ব্যাধিপ্রেমবাষ্পপ্রগলিতনয়নোপেত্য দৃষ্টোদ্ধবেন। ইত্যাদি

একুশ অক্ষরের এই ছন্দটির নাম স্রগ্ধরা!

পূর্বেই বলা হয়েছে যে কাব্যটি চারিটি সর্গে বিভক্ত! প্রথম এবং দ্বিতীয় এই দুই সর্গেই ছন্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে এবং সংগে সংগে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সর্গের শেষেই একুশ অক্ষরের

ছন্দের সংজ্ঞা নির্দেশ শেষ হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গে, কাজে কাজেই তিনি স্বাধীনভাবে তাঁর রচনা নিবদ্ধ করেছেন। যদিও প্রথম বা দ্বিতীয় সর্গ ছন্দের সংজ্ঞা এবং উদাহরণের ক্ষেত্রস্বরূপে সীমাবদ্ধ হয়েছে, তবু বলা বাহুল্য যে মূল ঘটনা সমানভাবেই গোড়া থেকে গড়িয়ে চলেছে। তার গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি।

উদ্দেশ্যমূলক কাব্য রচনায় কবির স্বাধীনতা অনেক কম এবং অত্যন্ত ক্ষমতাশালী কবি না হ'লে প্রতিভার নিদর্শন এঁকে যেতে পারেন না। জগদ্দুর্লভ সেই শ্রেণীর ক্ষমতার অধিকারী না হলেও কবি ছিলেন একথা বলা যায়। এই কাব্যের কয়েক জায়গায় নৈয়ায়িক অধ্যাপকের অন্তরাল থেকে কবি মানুষটি দেখা দিয়েছেন। দু একটি উদাহরণ এ সত্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করবে। কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহিণী শ্রীরাধিকার বর্ণনাটি অপূর্ব। যে কোনো প্রথমশ্রেণীর কবির পক্ষে গৌরবজনক। বিরহিণী শ্রীরাধিকা কমলদলে শয়ন করে রয়েছেন,—কিশলয় বীজনে বিরহদগ্ধ দেহ শীতল করছে সখীরা। তিনি অচেতন। সখীরা উৎকণ্ঠায় মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে—বেঁচে আছেন তো? অসহিষ্ণু কোন সখী হাহাকার করে কেঁদে উঠছে, আর তার অশ্রুধারায় শ্রীরাধার উত্তপ্ত দেহ সিক্ত হচ্ছে!

তাসামন্তঃ কমলশয়না পল্লবৈর্বীজ্যমানা
মন্দাক্রান্তা প্রতিমুখহংশাপ্যন্তি নাস্তীতিবীক্ষ্যা।
মৃত্যুপ্রায়া বিরহদহনৈর্দগ্ধদেহেতি কৃত্বা
হাহারাবং নয়নসলিলৈঃ সিচ্যমানা কয়াচিৎ ॥৫৬

আর একটি শ্লোক।—উদ্ধব বিরহকাতর বৃন্দাবনের সংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছেন। ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন শ্রীকৃষ্ণ। 'কি কি দেখলে উদ্ধব সেখানে? কাকে কাকে দেখলে? সকলেই কি কাঁদছে। জননী যশোদাকে দেখলে না? অপূর্ব বর্ণনায় কবি জগদ্দুর্লভ যশোদার ছবি এঁকেছেন। বাৎসল্য রসের এ চিত্র প্রত্যেক রসিক মনকেই আকুল করে তুলবে।

"দূরে অশ্রুআকুল দৃষ্টি জননী যশোদার,—দরজায় দাঁড়িয়ে মাখন হাতে করে ডাকছেন—'আয় বাছা আমার কোলে ফিরে আয়।'—বাৎসল্য স্নেহে স্তনযুগলে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হচ্ছে!"

স্বম্বারি বারি নয়না নবনীতহস্তা
বাস্তা প্রসারিত ভুজা সুতমাহ্বয়ন্তী।
এহ্যেহি বৎস মম কচ্ছ ইতি ব্রুবন্তী
চ্যোতৎ পয়োধরপয়াঃ কিমুকাপি দৃষ্টা ॥১৪।

'উদ্ধব চমৎকার কাব্যের' প্রসংগ এইখানেই সমাপ্ত করে তাঁর অন্য রচনা 'প্রতি নাটক' সম্বন্ধে কিছু বলে এই প্রবন্ধ শেষ করবো। সংস্কৃত সাহিত্যে 'মহানাটকে'র প্রসিদ্ধি আছে।—কলেবরে এবং রচনা পদ্ধতিতে। রামচন্দ্রের জীবনগাথা অবলম্বনে এ নাটক লেখা। এ নাটকের রচনাকার কে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এর দু'টি সংস্করণ বর্তমানে পাওয়া যায়। একটি ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের, অপরটি বাংলাদেশের। উভয় সংস্করণেই শ্রীহনুমান নাট্যকার বলে উল্লিখিত হয়েছেন। সংস্করণদ্বয়ের সংগ্রাহক দুইজন। বাংলা দেশের সংস্করণের সংগ্রাহক মধুসূদন এবং পশ্চিমাঞ্চলের দামোদর। উভয় সংস্করণের বিষয়বস্তুতে কিছু পার্থক্য রয়েছে এবং শ্লোক সংখ্যাও বিভিন্ন। জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালংকার এই মহানাটক অবলম্বন করেই তাঁর প্রতি নাটক লিখেছেন। সাত অংকে পাঁচশো বত্রিশ শ্লোকে তিনি এই নাটক সমাপ্ত করেছেন। 'মহানাটকে' নাটকের রচনা সম্বন্ধে যে কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে জগদ্দুর্লভ তাঁর নাটকের গোড়ায় এবং শেষে সেই কাহিনীই বিবৃত করেছেন। শ্রীহনুমান নাকি নখরেখায় প্রস্তর খণ্ডে মহানাটক রচনা করেন। কিন্তু বাল্মীকির ক্রোধের আশংকায় (যেহেতু বাল্মীকির রামায়ণের বিষয়বস্তুও এক) সমুদ্রের মধ্যে সেই প্রস্তর খণ্ড ফেলে দেন। পরে রাজা বিক্রমাদিত্য (ভোজ) স্বপ্নে তা' জানতে পেরে জেলেদের দিয়ে সে প্রস্তর খণ্ড তোলান এবং সে নাটক উদ্ধার করেন। এই কাহিনী ব্যক্ত করে জগদ্দুর্লভ বলছেন যে তিনি আজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিনাটকে সেই কাহিনী পূর্ণ করেছেন। হনুমান্ কর্তৃক নখের আঁচড়ে প্রস্তর খণ্ডে নাটকলেখা এবং তা' জলে ফেলে দেওয়া সাধারণ পাঠকের কাছে অবাস্তব মনে হলেও অলীক বলে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। পাথরে প্রশস্তি রচনা এদেশে অপরিচিত নয়। মহানাটকের মতো দীর্ঘকলেবরের না হোক্ স্বল্প পরিসরের কাব্য পাথরে উৎকীর্ণ হয়েছে তার প্রমাণ আছে। আর মহানাটকের প্রাচীনরূপ যে বর্তমানের মতো দীর্ঘতর ছিল না একথা স্বীকার করতে বাধা নেই।

প্রতিনাটক মহানাটকের মতোই বৈচিত্র্যহীন। চিরাচরিত প্রথায় রামচন্দ্রের জীবনগাথা এতে বর্ণিত হয়েছে। মহানাটকের ন্যায়ই এতে নাটকীয় ধর্মের সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে। পুরাণের রীতিতে শ্লোকের পর শ্লোকে রামচন্দ্রের কীর্তিকলাপ গেয়ে যাওয়া হয়েছে। মহানাটককে নির্ভর করেই একে প্রতিনাটক বলা হয়েছে। তা না হলে একে নাটক আখ্যা দেওয়ার কোন সার্থকতাই নেই। জন্ম থেকে বৈকুণ্ঠ গমন পর্যন্ত রামচন্দ্রের কাহিনী এতে চিত্রিত হয়েছে। নাটকের শ্লোকগুলিতে এমন কোন বৈচিত্র্য নেই যার ফলে নাটক রচনার শ্রমকে সার্থক বলে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। 'মহানাটকে'ই ঐ জাতীয় রচনার সার্থকতার সমাপ্তি ঘটেছে। 'প্রতিনাটক' লিখে নাটকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র, নাট্যসাহিত্যে অভিনবত্বের চিহ্ন আঁকা যায় নি। জগদ্দুর্লভ যদি মৌলিক সাধনায় নিজেকে যুক্ত করতেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তাঁর জন্যে গর্ব অনুভব করতে পারতাম। মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহিনী শ্রীরাধার যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা' খণ্ডচিত্রের যেন একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই ছাঁচেই যদি সমগ্র রচনাদ্বয়কে তিনি ঢালাই করতে চেষ্টা করতেন তাহলে তিনি ব্যর্থ হতেন না একথা জোর করে বলা যায়।

কবির সাথে

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়

১৭ই জানুয়ারী ১৯৫৫ সাল, বাংলা ৩রা মাঘ ১৩৬১ সন সোমবার, শান্তিপুরের নিকটেই বাগআঁচড়াগ্রাম হতে ফেরার পথে শান্তিপুরে কবির বাড়ীতে দেখলাম কবি করুণানিধান ঘরের মধ্যে বসে আছেন। রাস্তার একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কবিকে গিয়ে প্রণাম করলাম। কবি বললেন—"নাম না বললে, বুঝতে পারছি না। চোখেত আর দেখতে পাই না—বয়স যে ৭৮ হ'ল।"

জিজ্ঞাসা করলাম—শরীর কেমন? উত্তরে বললেন—"আর কেমন, ভালই আছি। তবে হাঁফানীতে কষ্ট পাচ্ছি। আমি কিন্তু এখনও চিনতে পারলাম না।"

কবির সঙ্গে লেখক ফটো—শ্রীসুধীন

উত্তরে নাম বলতেই কবি জড়িয়ে ধরে আশীর্ব্বাদ করলেন। ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন অতিথির জন্যে।—"কি খেতে দেব, কি খাবে, কোথায় বসবে?"—ব্যস্ত হ'য়ে কবি প্রশ্ন করতে লাগলেন।

কবিকে বসিয়ে সম্মুখে বসে দু'একটা কথা চলতে লাগল, আলোচনা চলতে লাগল কবিতা নিয়ে। কবি নিজেই বললেন—শনিবারের চিঠির পৌষ সংখ্যায় একটা কবিতা বার হয়েছে—দেখেছ—শোন বলছি—সবটা মনে নেই—খানিকটা বলছি—

…"কারা-ভাঙার পাগলা ঘণ্টা, শোণিতধারা ক্ষয়,
একশ বছর লড়েছে ফ্রান্স, খণ্ড প্রলয় হয়।"…
…"রক্তমাখা ধূলায় ঢাকা ফ্রান্স ভাগ্যাকাশে
পূর্ণ সূর্য এক-শ বছর ছিলেন রাহুর গ্রাসে।"…
—"বক্ষে তাদের অস্ত্র-ক্ষত, পৃষ্ঠ অ-ক্ষত,
পরদেশীদের নির্যাতনে করবে না শির-নত।"…
—"অবরুদ্ধ দুর্গ হতে বেরোয় অশ্বারোহী,
শহীদ হতে কি আগ্রহ, বুভুক্ষু বিদ্রোহী।
…জাগো রে ভাই, জাগো সবাই, নইলে জাহাজডুবি।
ডাকদিতেছে তোপের ভাষা, ডিণ্ডিম—দুন্দুভি।
বেরিয়ে এস সঙ্গে মেশ, চাইগো দিতে জান,
রক্ত-তিলক পরব মোরা দেশের সু-সন্তান।"…
…"সংগ্রামেই শান্তি পাব ঘুমিয়ে কবরে,
অটল রব, না ডরিব সঙিন-থর্গেরে।"…

সবটা মনে নেই আমার। কবিতাটা পড়ে দেখ—নাম হচ্ছে 'মুক্তিস্নান'। কবিতাটা ছাপানর পর ভয় হচ্ছে পুলিশে এ্যারেস্ট করবে না ত। পড়ে দেখ—সে রকম, কিছু লিখে ফেলিনিত?

কিছুদিন আগেই শনিবারের চিঠি পেয়েছি কবিতাটায় একবার চোখ বুলিয়েছিলাম মাত্র। কাজেই ঠিক মনে ছিলনা। তবুও কবিকে বললাম—"থানা এ্যারেস্ট করার মত সে রকম কিছু লেখেননি। আপনাকে এ্যারেস্ট কে করবে?"

কবি খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'লেন। একথা ও কথার পর বললেন—"গীতা পড়লাম, উপনিষদ পড়লাম। বহু কিছু জানবার বাকী ছিল। বাংলায় লিখেছিও। আজকাল অন্য কিছু আর ভাল লাগেনা। তবে মরতে আমার ভয় নেই। তোমরা মধ্যে মধ্যে এস, তোমাদের দেখলেও আনন্দ হয়। কেমন আছে সব? একটু সুস্থ হয়ে কৃষ্ণনগর যাব একদিন।"

কবিকে প্রণাম করে চলে এলাম। কে জানত যে ইহজীবনে কবির আর কৃষ্ণনগর আসা হবে না। এইত মাত্র কদিনের কথা—দেখলাম, প্রণাম করলাম, আশীর্ব্বাদ নিলাম, কবিতা শুনলাম—আজ আর সেই কবি নেই। মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল কবির মৃত্যু সংবাদ জেনে। মন বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না সে খবর। তবুও বিশ্বাস করতে হল—যে কবি নেই।

এর কিছুদিন আগেই ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৫৫, বাংলা ১০শে পৌষ ১৩৬১ সাল মঙ্গলবার—কৃষ্ণনগর হতে আমরা কয়েকজন সাহিত্যিক,

সাংবাদিক শান্তিপুরে কবিকে দেখতে গিয়েছিলাম। দেখতে ঠিক নয়—কবিকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে গিয়েছিলাম। আমাদের কবি-বন্ধু নীহাররঞ্জন সিংহ কবির উদ্দেশে যে কবিতা লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন—সেটা পাঠ করে শুনিয়ে কবির হাতে দিলেন। কবির সে কি আনন্দ। আমরা ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করলাম—কবি সকলকে আশীর্ব্বাদ করলেন। কবিতা আলোচনা করতে লাগলেন। নিজের লেখা কবিতা কয়েকটা আবৃত্তি করে শোনালেন। এই বয়সেও কবির কণ্ঠে জোর ছিল যথেষ্ট। গল্পের, আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে, মধ্যে মধ্যে বলতে লাগলেন—বয়স হল ৭৮ আর কদিনই বা—আমাদের বংশে ৭৮ কেউ পার হয়নি। তাই বলে মরতে আমার ভয় নেই—আমি প্রস্তুত। শরীর আমার ভালই—তবে হাঁফানীতে একটু কষ্ট হয়। হঠাৎ কবি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—বললেন—"আজ স্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধন হচ্ছে আমাদের, ওরা বলে গেল উদ্বোধনের আগে আমায় বলতে হ'বে। কি বলব—লিখতেও কষ্ট হয়—দেখতেও পাইনা।" কোন রকমে কবি একটা লিখলেন—লিখে বললেন—এইটা কেউ কপি করে নিয়ে চল আমার সঙ্গে—ওখানে গিয়ে পড়ে দেবে। যাবার জন্যে কবি ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। সেই ফাঁকে কবিকে নিয়ে আমরা একটা ফটো তুলে নিলাম। ফটো তোলবার সময় সুধীন্দ্রনাথ সিংহ রায় বললেন—আপনারা কবিকে নিয়ে ফটো তুলছেন, কিন্তু আমি বাদ পড়ে গেলাম। কবির মৃত্যু সংবাদে তিনি বললেন "কবিকে নিয়ে আমার আর ফটো তোলা হ'ল না।" কবিকে নিয়ে যখন শান্তিপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপস্থিত হ'লাম—তখন লোকে লোকারণ্য—সভামঞ্চে গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দ—কবিকে নিয়ে গিয়ে সেখানে দাঁড় করিয়ে দিলাম—কারণ তখন জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছিল। সঙ্গীত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি পকেট হতে লেখা কাগজটা বের করে বললেন—"আমিত পড়তে পারবনা—তোমরা কেউ পড়।" কিন্তু কাউকেও পড়তে হ'লনা—সভায় বক্তৃতা সুরু হ'য়ে গেল। কবি মনক্ষুণ্ণ হ'য়ে বললেন—"পড়া হ'বে না।" খানিকটা চুপ করে বসে থেকে ব্যস্ত হ'য়ে বললেন—"সমীর আমায় বাইরে নিয়ে চল, হাঁফানীতে আমার কষ্ট হ'চ্ছে। ভীড়ে এলেই আমার কষ্ট হয়—সেজন্য কোথাও যেতে চাইনা আমি। এরা ছাড়লনা—বার বার করে বলেছিল আসতে, তাই এলাম। চল চল, আমায় নিয়ে চল।" কবির ব্যস্ততা দেখে বুঝলাম—শারীরিক কষ্ট ছাড়াও কবির মনে আঘাত লেগেছে। তাই তাড়াতাড়ি কবিকে নিয়ে কবির বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এলাম। এর
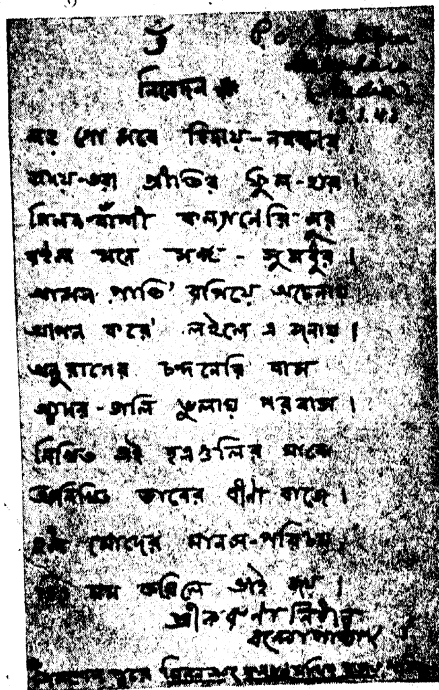
জেমশেদপুরে মিলন এবং কল্যাণ-মন্দির সভায় পঠিত কবির হস্ত লিখিত একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি
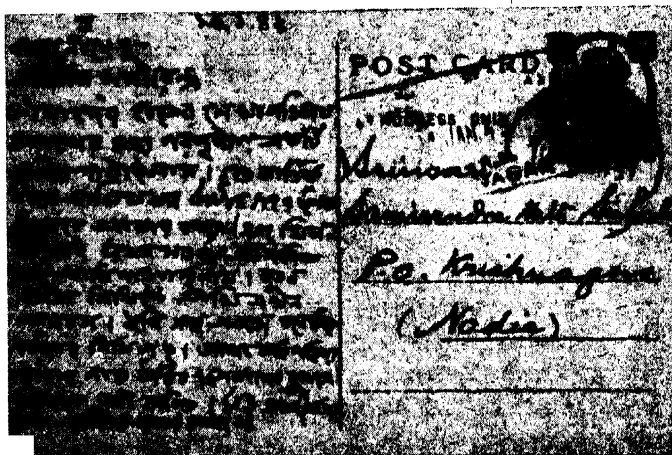
লেখককে লিখিত কবির একটি পত্রাংশ

এর পরেও কয়েকবার কবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, একবার আমার কন্যা জয়শ্রীও সঙ্গে ছিল। তাকে দেখে কবি ছোট ছেলের মত হ'য়ে গেলেন—তাকে নিয়ে গল্প, সুটকেস খুলে বিস্কুট বের করে দিয়ে আদর করে খাওয়ালেন তাকে। কদিন আগেকারই ঘটনা এসব—বয়স সত্যি হয়েছিল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে চলে যাবেন তা আমরা বুঝতে পারিনি। কবির সঙ্গে যিনি মিশেছেন তিনিই মুগ্ধ হয়েছেন তাঁর নিরহঙ্কার, নিরভিমান শিশুর মত সরল ব্যবহারে। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা বাংলার প্রধান কবিদিগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় প্রকৃতির দুলালকে হারালাম।

অনেকদিন আগের কথা, তখন আমরা একটা হাতে-লেখা পত্রিকা বার করছি। কবির সঙ্গে তখন বিশেষ পরিচয়ও হয়নি, দু'একবার দেখা দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিলমাত্র। সেই সূত্রে হাতে-লেখা পত্রিকার জন্য একটা কবিতা চেয়ে পত্র লিখলাম—তার উত্তর যা পেলাম এখানে সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করলাম—

চিরনিদ্রায় কবি করুণানিধান ফটো—গোরা কুণ্ডু

P. O. Santipura
Dattapara (Nadia)
13. 1. 43.

কল্যাণীয়েষু, শ্রীমান সমীরেন্দ্র

তোমাদের হাতে-লেখা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পরপৃষ্ঠায় একটী কবিতা পাঠাইলাম। গত কার্ত্তিক মাসে আমি যখন টাটানগরে ছিলাম ঐ সময়ে তথাকার কল্যাণ এবং মিলন মন্দিরের উৎসব সভায় আমি পড়িয়াছিলাম। নূতন কবিতা লিখিতে আমি এখন অপারগ। তুমি গল্প প্রবন্ধে মনোনিবেশ করিয়াছ লিখিয়াছ। আশা করি পড়িয়া আনন্দলাভ করিব। তোমাদের কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। ইতি—আশীর্ব্বাদক

পুনশ্চঃ—কবিতাটী কোথাও ছাপা হয় নাই।

ওঁ নিবেদন

লহ গো সবে বিদায়—নমস্কার,
হৃদয়-ভরা প্রীতির ফুল হার।
মিলন বাঁশী কল্যাণেরি সুর
রইল মনে সঙ্গ—সুমধুর।
আসন পাতি' বসিয়ে অচেনায়
আপন করে' লইলে এ জনায়।
অনুরাগের চন্দনেরি বাস
আদর—ডালি ভুলায় পরবাস।
লিখিত এই ছত্রগুলির মাঝে
অলিখিত ভাবের বীণা বাজে।
হ'ল মোদের মানস পরিচয়,
চিত্তমম করিলে ভাই জয়।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

আশা করেছিলাম উত্তরই পাবনা, কিন্তু শুধু উত্তর নয়—সঙ্গে সঙ্গে কবি নিজের হাতে লিখে উত্তর ও সেই সঙ্গে কবিতা পাঠালেন ডাকযোগে। কত বড়, কত মহৎ ছিলেন তিনি। কারণ সাধারণ সমাজে এরকম অল্পই দেখা যায়। রচনায়, ব্যক্তিত্বে, এমন কবি-প্রকৃতি খুব কমই দেখা যায়। বিদ্যা, বয়স ও শক্তির তারতম্য কোনদিনই কোন ব্যক্তির সঙ্গে কবির আলাপে, আলোচনায় ব্যবহারে কোন বাধা সৃষ্টি করেছিল বলে জানা নেই। সকলের সঙ্গেই সমান ভাবে মিশতেন—তাঁর মধুর ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করত, তাঁর মত বালকসুলভ স্বভাব, ব্যবহার আমরা আর কারও কাছ হ'তে পাইনি। সেই কবির কণ্ঠ আজ চিরতরে নীরব হয়ে গেল—ইহজগত হতে তিনি বিদায় গ্রহণ করলেও তাঁকে আমরা চিরকাল পাব আমাদের মনে—আর পাব তাঁর লেখায়—বঙ্গমঙ্গল প্রসাদী, ঝরাফুল, শান্তিজল, ধানদূর্বা, শতনরী প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থে।

কৃষ্ণনগর হ'তে আমরা যেদিন কবিকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে গিয়েছিলাম সেদিনকার কথা আজ মনে পড়ছে—কানে বাজছে কবির হাসি-উদ্দীপ্ত কণ্ঠ। সেদিন তাঁকে উদ্দেশ করে যে কবিতা নীহারবাবু লিখেছিলেন, পাঠ করেছিলেন, সেই কবিতার শেষাংশ এখানে উদ্ধৃত করে আমরাও কবিকে প্রণাম জানাই—

করুণানিধান, হে কবির কবি, আমাদের ক্ষীণ সুরে,
কেমনে তোমার জয়গান গাহি? সবার হৃদয়পুরে,
জনমে জনমে তোমার রচনা,
নবজীবনের করিবে সূচনা,
আমাদের তুমি পন্থানায়ক, অতি কাছে অতি দূরে,
রাখিয়া গেলাম প্রণতি মোদের অন্তরপুট জুড়ে।

১৩

দুপুরে চুল বেঁধে—কপালে খয়েরের টিপ পরে একখানি ফরসা শাড়ী হাতে করেছে কমলা—ভগবতী ঘরে ঢুকে বললেন, এখন আবার চললে কোথায় সেজেগুজে ?

কমলা বললে, বাঃরে—জাননা বুঝি, আজ যে গানের মাস্টার আসবেন।

মাস্টার আসবেন—তা তোর কি !

ভগবতীর মুখে এমন রূঢ় স্বর কমলা জীবনে শোনেনি। ও অবাক হয়ে মায়ের মুখের পানে চেয়ে রইল।

ভগবতী বললেন, গানের মাস্টার আসে—মীরা ইরাকে গান শেখাতে—তোমার জন্যে মাস্টার রাখি সে ক্ষমতা কই আমাদের।

মাস্টার মশাই নিজেই তো বলেছেন—আমাকে গান শেখাবেন—আমি কি ওঁকে বলেছিলাম ! কমলার দু'টি চোখ অশ্রুবাষ্পে কোমল হয়ে উঠল।

ব্যথা পেলেন ভগবতী। এগিয়ে এসে মেয়ের মাথায় একটি হাত রেখে বললেন—পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে—এই ভয় করি মা। তা ছাড়া জানিসই তো উনি এসব পছন্দ করেন না। মেয়েদের গান শিখে কি হবে !—সংসার যাতে গুছিয়ে করতে পারিস সেই শিক্ষাই হল আসল শিক্ষা।

মীরা ইরা কি সংসারের কাজ করে না ?

করে। তবে আগের তুলনায় ওদের কাজের চাড় কমে গেছে। সেন-দিদি তো যখন তখন বলেন, কি জানি—ভাল করছি কি মন্দ করছি ! যে কালের যা হাওয়া—সেই মত চলতে হবে তো। সবাই করছে—আমাকেও করতে হবে।

কমলা ক্ষুণ্ণ মনে জানালার ধারে গিয়ে বসল। ভগবতী নিজেই যেন আহত হলেন। আহা—ওরা ছেলেমানুষ—ওরা কি বুঝবে ভাল-মন্দ ! কোন জিনিস খেতে নেই বললেই কি শিশুর বিচারবোধ জন্মায় ? ঠেকে শিক্ষালাভ না করলে—কখনই আসল শিক্ষা হয় না।

কমলার কাছে এসে বললেন, আচ্ছা—আজ না হয় যা।

কমলার দুঃখবোধ নিমেষে অন্তর্হিত হল—সারা মুখ খুসিতে ঝলমল করে উঠল। তাড়াতাড়ি জানালা থেকে উঠে—ফরসা কাপড় জামা টেনে নিলে আলনা থেকে। বললে, মা—মাস্টার-মশাই কত সুখ্যাত করেন আমার গলার। বলেন—শিক্ষা করলে—

চেয়ে দেখলে মা—ঘরের আর এক প্রান্তে চলে গেছেন। ওখানে একখানি জলচৌকিতে কয়েকখানি দেবতার পট আছে। কালী অন্নপূর্ণা নারায়ণ আর মহাদেবের। পটগুলি নিত্য ফুল চন্দনে অর্চ্চিত হয়—স্তোত্র পাঠ করেন বাবা। মা-ও সুললিত অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে স্তবগান আবৃত্তি করেন। ধূপের গন্ধে ঘরের বাতাস শুচি হয়ে ওঠে—পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে যে স্বর্গ রাজ্য তারই মনোরম আভাস যেন ফুল-চন্দন-ধূপের গন্ধে—সুরময় স্তব উচ্চারণে অন্তরের ভাবাবেগ সমাচ্ছন্ন বৃত্তির মধ্যে ফুটে ওঠে। কমলার দু'চোখ কেমন আবেশে—আবেগে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়।

মাগো—ওঁরা কোথায় থাকেন ?—কোথায় সে বৈকুণ্ঠ—কোথায় কৈলাস ?—চোদ্দভুবন কাকে বলে মা ?

আমাদের মাথার উপরে আছে—সপ্তলোক—সাতটি ভুবন—পায়ের নীচেয় আছে আরও সাতটি লোক—সবশুদ্ধ মিলে চোদ্দটি ভুবন। অমরনাথের কথা আবৃত্তি করেন ভগবতী।

আমরা কেন তা দেখতে পাই না ?—

সব কি চোখে দেখা যায় ?

৩

কেন যায় না ? এই প্রশ্ন বহুবার অমরনাথকে করেছেন ভগবতী।

অমরনাথ হেসে উত্তর দিয়েছেন, যে সাধনার দ্বারা সিদ্ধ হয় মানুষ, তা আমাদের কই। এই যে এক রাশ বই তোমার সামনে রয়েছে, ধর এই সংস্কৃত পুঁথিখানি। এখানিতে কি লেখা আছে বলতে পার ?

তা কেমন করে পারব! আমি কি সংস্কৃত জানি।

ঠিক। সাধনা করলে শিক্ষা করলে তুমিও জানতে পারবে। পণ্ডিতরা বলেন—জ্ঞানের সমুদ্র অনন্ত—তা যতই জানবে—ততই আনন্দ। এখন দেখ—মাথার ওপর আমরা দেখছি খালি আকাশ, আকাশ নয়—ওটিও শূন্য—বায়ুস্তর। যতই ওপরে উঠবে—ওই আকাশও উঠবে তত উপরে—ওর শেষ নাই। সাতটি স্বর্গের কল্পনা করেছেন আমাদের শাস্ত্রকাররা—এক এক দেহ ধারণ করে তবে সেখানে পৌছতে হয়। পৌছবার জন্য সাধনার প্রয়োজন। আমরা আছি পৃথিবীতে, স্থূল দেহ নিয়ে। স্থূল আমাদের দৃষ্টি—জ্ঞান। মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম অনুভূতির আলোয় ওই সব লোকের খানিকটা মনে জেগে ওঠে।

ভগবতী মূঢ়ের মত চেয়ে রয়েছেন দেখে অমরনাথ বললেন, আচ্ছা আর একদিন এর ব্যাখ্যা করব। আজ শুনে রাখ ঊর্দ্ধস্থ সাতটি ভুবনের নাম—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ জন মহঃ তপঃ সত্য। আমাদের সাধনা যত এগোয় আমরা ততই ওই সব লোকে পৌছবার যোগ্য হতে পারি।

ও লোকে গেলে—মানুষ আর পৃথিবীতে ফিরে আসে না ?

সে অনেক কথা। তবে এইটুকু জেনে রাখ—এই তৃতীয় লোক অর্থাৎ স্বর্লোক পর্য্যন্ত পৌছেও আত্মা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। কিন্তু স্বর্লোকের ওপারে পৌছলে আর ফিরে আসে না।

আর নীচের সপ্তলোক ? অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল পাতাল—থাক চোদ্দ ভুবনের কথা। এতও জানে মানুষ! কিন্তু কোথায় বৈকুণ্ঠ ? সে আর এক লোক—সেখানে ভগবান বিষ্ণু থাকেন—ক্ষীরোদ সাগরে—অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছেন তিনি। লক্ষ্মী পদসেবা করছেন—শিরে সহস্র ফণা বিস্তার করে আছেন বাসুকী। আর কৈলাস ? সে এই পৃথিবীরই উত্তর দিকে—হিমালয় পাহাড়ের ওপারে যেন। বারোমাস বরফ দিয়ে মোড়া রয়েছে। সে দেশ মানুষের অগম্য। সেইখানে বাস করেন জগতের সর্ব্ব দেবের সেরা দেব—মহাদেব। সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—জ্ঞানময় পুরুষ, তাই পার্থিব ঐশ্বর্য্যে তাঁর রুচি নাই। নিজে পরেন বাঘছাল,—অস্থি সর্প ধুতুরা আর ভস্ম ভূষণ, বাহন অতি বৃদ্ধ বৃষ—সর্ব্বদাই ভাবে বিভোর ঢুলুঢুলু নয়ন। যেন মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন—চেয়ে দেখ কোথায় তোদের মঙ্গল—কিসে তোরা শান্তি পাবি। ঐশ্বর্য্যরসে আনন্দ নাই—মণিকাঞ্চনে সুখ নাই—ভোগের ইচ্ছায় কামনা কেবল বেড়েই চলে—প্রদীপে ঘি দিলে যেমন শিখাটি তার পরিপুষ্ট হয়। শুধু ত্যাগ—শুধু ছেড়ে দেওয়া—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা। ত্যাগের দ্বারা যে আনন্দ লাভ হয়—তাই সর্ব্বোত্তম ভোগ। এই পরম ঐশ্বর্য্যের কথাই আমাদের শাস্ত্রকাররা বলেছেন। বহু যুগ ধরে বলেছেন। দেবতার তিন রূপ কল্পনা করেছেন তাঁরা। কামনাময়—ঐশ্বর্য্যময় আর জ্ঞানময়। কামনার দ্বারা সৃষ্টি করে চলেছেন ব্রহ্মা—ঐশ্বর্য্যে বিষ্ণু করছেন পালন—আর অনিত্য বস্তুর ধ্বংসের দ্বারা জ্ঞানমার্গের পথটি দেখিয়ে দিচ্ছেন মৃত্যুপতি মহাদেব।

হায়—এত শক্ত কথা বোঝবার ক্ষমতা ভগবতীর নাই।

মেয়ের অবোধ প্রশ্ন—ওঁর মনেও কৌতূহল সঞ্চার করে। উনি প্রশ্ন করেন অমরনাথকে। অমরনাথ—তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি মত ব্যাখ্যা করেন। রাত্রির নিরালা মুহূর্ত্তে—চারদিকের কোলাহল মন্দীভূত হলে—মহাভারত নিয়ে বসেন অমরনাথ। মন্ত্রমুগ্ধের মত তার গল্প শোনেন ভগবতী। ব্যাখ্যা আর টীকা আর তত্ত্ব—কোনটিই বাদ দেন না অমরনাথ। ভগবতী নাই বুঝুন—নিজের মনের আবেগে উৎসারিত হয় এগুলি। তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—কোন্ সিদ্ধচারণ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-যক্ষ-দেবতা অধিষ্ঠিত দেবভূমিতে। ভারতবর্ষের মাঝখানেও এক বিরাট অমর লোক—অমৃততত্ত্বের সন্ধানে মুনিঋষিরা যুগযুগান্তর ধরে তপস্যা করে যে লোকে জ্ঞানের বর্ত্তিকা জেলে রেখেছেন। তাঁরা কি শুধু কাহিনীতে বেঁচে আছেন ? নিজ কালের মানুষের মনে ? না—না—তাঁরা ওই দীপ-বর্ত্তিকার মতই অনির্ব্বাণ—চিরকালের আলোক বর্ত্তিকা। এই ভারতবর্ষের জলে স্থলে অন্তরীক্ষে—লক্ষ-লক্ষ মানুষের মনে—কাল পার হয়ে অন্ত

কালে—মন্বন্তর পার হয়ে মন্বন্তরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেই অমর লোক—প্রতিভাসিত হচ্ছে তার আলোক-রেখা।

রাত্রি যেন নূতন এক শান্তিময় রাজ্যে উত্তীর্ণ করে দেয় ভগবতীকে।...

কিন্তু দিনের প্রখর আলোক—সেই শান্তিতে বিঘ্ন ঘটায়।

মা—শনিবারে—এক জায়গায় যেতে দেবে?

কোথায়?

শহরের একটা বড় জায়গায় গানের মজলিস বসবে, অনেক দেশ থেকে আসবেন—সব বড় বড় গাইয়ে—আমাদের নিয়ে যাবেন মাস্টার মশাই।

আচ্ছা—মীরাদিকে ডাক।

মীরা বললে, আমাদের ক্লাবের—একটা শো হবে—টিকিট বিক্রী করে।—মাস্টার মশাই ক'খানা টিকিট পেয়েছেন কিনা—তাই।

তোমরা ফিরবে কখন?

কখন আর—রাত্তির দশটা এগারোটা হবে হয়তো।

তাইত—সে যে অনেক রাত।

মীরা হেসে উঠল, রাত দশটা আবার কলকাতায় বেশী রাত নাকি! একি আপনাদের পাড়াগাঁ—যে সন্ধ্যে হতে না-হতেই শেয়াল ডেকে উঠবে! এখানে সারা রাত্তির আলো জ্বলে রাস্তায়, শহরে রাত হয় না।

আচ্ছা—সে তো পরশু দিন। উনি আসুন জিজ্ঞেস করি।

কাকাবাবু বুঝি এসব ভালবাসেন না? মীরা খানিকটা শ্লেষের সঙ্গে বললে।

না—মা—ভালবাসাবাসির কথা নয়—তোমরা পাঁচজনে যখন যাচ্ছ—, অপ্রতিভ কণ্ঠে ভগবতী সামলে নেবার চেষ্টা করলেন।

জানেন কাকীমা, শহরের সব বড় বড় ঘরের মেয়েরা আসবে মোটরে করে। তাদের অভিভাবকেরা নিশ্চয় বোকা নন। কেউ জজ—কেউ ব্যারিস্টার—কেউ প্রোফেসার—কেউ বা কোটিপতি। মীরা এমনভাবে কথাগুলি বললে—যাতে করে ভগবতীর নগণ্য আপত্তি তোলাই অনুচিত।

ভগবতী বললেন, না—আমার আর আপত্তি কি।

জানেন, বাবা শুনেই তো বললেন—সেকি ওখানে যাবে না তো মেয়েরা কোথায় যাবে! মা আপনার মত খুঁতখুঁত করছিলেন কিনা। যাই বলুন—আপনাদের কালে মানুষের মনের এতটা প্রসার ছিল না।

শেষ আঘাত হেনে মীরা চলে গেল।

ভগবতী বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলেন।

দুয়ার খুলে সেনদিদি বেরুলেন। ওঁকে ওভাবে তাকাতে দেখে বললেন, কি গো কমলার মা—অমন হকচকিয়ে গেছ যে!

না—এই মীরা বলছিল কিনা—কোথায় গানবাজনা হবে—

হাঁ—ওই হয়েছে ওদের হুবুই—ঘরে মন বসতে চায় না। আমি আপত্তি করেছিলাম—কর্ত্তা ঢালাও হুকুম দিলেন—যাক না।

শুনলাম সব বড় বড় ঘরের মেয়েরা আসে—

তবে আর কি—আমরা কেতাথ হয়ে গেলাম! বড় ঘরের মেয়েদের কীর্ত্তি আর জানতে বাকি নেই আমার। সেনদিদি মুখ বিকৃত করলেন। বুঝি সব—কিন্তু কালের গতিক—ঠেকাতে পারি না। যদি বলি, না, মেয়ে দুটো থাবে না—হাসবে না—কথা বলবে না—গুমরোবে মনে মনে। তা যাক গে—আমাদের কাল তো আমাদের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল—ওরা ভাবুক গে ওদের কালের ভাবনা। আয় তো ঘরে—পান থাকে তো একটা দে।

পান তো আমরা খাই না দিদি।

ওমা—ভুলেই গিছলাম যে! তা শহরে হয়ে সভ্যতা শিখবি নে? চা—পান—দোক্তা—নিদেন পক্ষে তামাক পাতা এ যদি না খেলি তো কিসের শহরবাস শুনি?

হাসতে লাগলেন সেনদিদি।

না দিদি—ওইটি পারব না। শহরের নেশা শহরেই থাকুক—

আহা—পাড়াগাঁয়ে যেন কেউ চা খায় না—পান দোক্তার নাম পর্য্যন্ত জানে না! তোমার শ্বশুর ছিলেন পণ্ডিত মানুষ, আলাদা কথা—কিন্তু ক'টা পণ্ডিতই বা পাড়াগাঁয়ে আছে শুনি?

না—কেউ নেই। ভগবতী দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করলেন।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় অমরনাথ একজন লোককে সঙ্গে

নিয়ে বাসায় ফিরলেন। ভগবতীকে একান্তে ডেকে চুপি চুপি বললেন, একটু চা করে দিতে পার?

চা! আকাশ থেকে পড়লেন ভগবতী।

দেখ না—মীরাদের ঘরে যদি হয়—ওদেরই কাপে করে—

ঘরে এনে বসালেন লোকটাকে। বললেন, জায়গা কম। একঘরেই সব কাজ সারতে হয়।

কলকাতায় আবার কার ক'খানা ঘর থাকে—বাসা তো বাসা! বলে লোকটি মাড়ি বার করে হাসতে লাগল। পানের রঙে ছোপধরা দাঁত—কোনটি পোকা ধরা—কোনটি অত্যন্ত বড়। বিধাতা ওর লম্বা মুখের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওগুলিকে অবিন্যস্ত করেছেন বুঝি! বয়স—আর কতই বা—জীর্ণ বেশবাস ও স্বাস্থ্যবঞ্চিত শরীর বয়সের সঠিক অনুমানে সাহায্য করে না—তবু মনে হল অমরনাথের চেয়ে ও বয়সে অন্তত বছর দুইয়ের ছোট।

হাসি থামলে লোকটি বললে, এতদূর এলাম কেন জানেন? আপিসে তো প্রাণ খুলে কথা বলা যায় না—তাই। আচ্ছা দাদা—সবাই যখন ভাগ বসাচ্ছে আপনিই বা বঞ্চিত হচ্ছেন কেন? আপনার হাত দিয়ে যখন বিল পাস হয়—তখন আপনারই ন্যায্য পাওনা—

না মনীশ—উপরি যত ভাল উপায়েই আসুক—ও চুরি ছাড়া আর কিছু নয়। ওভাবে উপার্জ্জন করতে পারব না আমি।

আপনি উপরি নেবেন না—বড় সায়েবকে একটু তোয়াজও করবেন না—তবে সংসারে আপনার সাশ্রয় হবে কি করে শুনি! সায়েবকে তোয়াজ করলে—গ্রেডটা তো বাড়তে পারে।

অমরনাথ উচ্চহাস্য করে বললেন, বাপরে—সায়েব দেখলে আমার ভয় করে।

হাঁ—ভয় যা করে জানি। কিন্তু সবাই যা করে—কেন আপনি তা করবেন না?

ও কেনর উত্তর নেই। এই নাও—চা খাও।

চা—তা দিন। দশটা পাঁচটা তো বিশ কাপ হাফ্ উড়ে গেল—এ আর বেশী কি! চায়ে চুমুক দিতে দিতে মনীশ বললে, বউদি, একটি কথা আপনাকে শুনিয়ে যাই—আসরে নাচতে নেমে ঘোমটা টানার কোন মানে হয় না। চাকরি মানেই—সাধুগিরি নয়—[illegible] নয়—এটি বুঝিয়ে দেবেন দাদাকে। সবাই যা নেয়—তা নেওয়া দোষের নয়—সবাই যা করে—তা করাও পাপ নয়।

মনীশ চলে গেলে পরেও—কথার প্রতিধ্বনি যেন রয়ে গেল। চাকরি-জগতের একটুখানি আভাস পেলেন ভগবতী। বললেন, তাই কি ঠাকুর বলতেন—পরের দাসত্ব করা পাপ!

অমরনাথ বললেন, চাকরির ক্ষেত্রে অনেককালের পাপ হয়তো জমা হ'য়ে আছে—সংসারেও কি নেই? সবাই যা করে—কেউ কেউ তা করে না—তারা প্রতিবাদ করে অন্যায়ের।

তারা কষ্ট পায় তো?

কষ্ট! হাসলেন অমরনাথ, হাঁ—এক হিসেবে কষ্ট বটে, এক হিসাবে পরম লাভ।

যাতে কষ্ট—তাতে লাভ?

তবে আর তোমায় মহাভারত শোনাচ্ছি কি! পাণ্ডবদের কষ্ট কি কম ছিল—কিন্তু লাভ হয়েছিল কতখানি সে হিসাব রাখতে পার?

ভগবান অর্জ্জুনের সখা ছিলেন—এই লাভ তো!

বিদুর বলেছিলেন—হে কৃষ্ণ, আমি ঐশ্বর্য্য চাই না, যা তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তেমন জিনিস নিয়ে কি করব? আমি চাই তোমায়। এর ভেতরের মানে হচ্ছে আত্ম-সন্তুষ্টি। অর্থাৎ যা পেয়েছি—তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। তাতেই কি মানুষের পরম সুখ নয়?

ভগবতী বললেন—মূর্খ মেয়েমানুষ আমি—অত বুঝি না, শুধু জানি—টাকা না থাকলেও অনেক কষ্ট।

অমরনাথ বললেন, আমরাও কম মূর্খ নয় ভগবতী, আমরাও—ওইটি সার জেনে সংসার করি।

তাহলে—সংসারের আয় বাড়াবার জন্য ঠাকুরপো যা বল্লেন—

সংসারের আয় না বাড়ালে সামঞ্জস্য হচ্ছে না—জানি, তবু ওভাবে আয় বাড়াবার চেষ্টা আমার দ্বারা হবে না! অন্য উপায় খুঁজচি।

কি উপায়?

আপিসের পর ছেলে পড়াব।

না—না, তাতে তোমার স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে।

এমন স্বাস্থ্য না থাকাই ভাল। কেষ্টর বাবা কি করছে—ঘণ্টুর বাবা কি করছে?

ওঁদের অভ্যাস আছে।

অভ্যাস গাছ থেকে পড়েই হয় না। এই কাজটা প্রায় সবাই করে।

অতঃপর কমলার গান শুনতে যাবার কথা উঠল।

অমরনাথ বললেন, নিয়তি কেন বাধাতে। আমরা মধ্যবিত্তরা ধ্বংস হবই—রোধ করবার ক্ষমতা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরও নেই!

বেশ তো—বারণ করে দেব।

না—ঘুরে আসুক একদিন। তবে জেনো—উপরের পানে চেয়ে আমরা বাঁচতে পারব না—আমাদের আয়ও ওদের বাহুল্য—এর মধ্যে কখনই রফা হবে না।

১৪

পরের দিন বিপদ ঘটল সন্তকে নিয়ে। সেদিন কি একটি উপলক্ষে আপিস দু'ঘণ্টা আগে বন্ধ হয়েছিল—অমরনাথ কিছু আগে বাড়ী ফিরেছিলেন। তখনও বাড়ীর চৌকাট পার হন্‌নি—বাইরে একদল ছেলে বিকট চীৎকার করে উঠল:

বিশ্বাসঘাতক—

মুর্দ্দাবাদ—

সঙ্ঘের শত্রু

নিপাত যাক—

দূরশ্রুত সমুদ্র কল্লোল—যেমন তীরে আছাড় খেয়ে ভেঙ্গে পড়ে—তেমনি দূরের চীৎকার—গলির প্রান্ত থেকে সহসা তাঁর দুয়ারের সম্মুখে সবেগে আছড়ে পড়ল। সেই তরঙ্গের মাথায় ছোট একটি কুটোর মত সন্ত তাঁর পায়ের কাছে এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠল সে। বাবা গো।

বাইরে ছেলের দল চীৎকার করে উঠল, মুর্দ্দাবাদ।

ব্যাপার কি? সন্তকে ঘরের মধ্যে এনে শুধোলেন।

সন্ত যা বললে—তা শুনে স্তম্ভিত হলেন অমরনাথ।

ইস্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা আসছে—ছেলেদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। এখন খেলাধূলা কি সিনেমার আলোচনা আর জমে না—খালি ওই কথা—কি করে ক্লাসপ্রমোশন পাওয়া যাবে। কোন্ কোন্ বিষয় প্রশ্নপত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এই জল্পনা-কল্পনার বিরাম নেই। সন্ত আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে কেন—ওরা পড়ার চেয়ে—আলোচনা করে বেশী—প্রশ্ন-সম্ভাব্য বিষয়টি পেন্সিল বা কালির দ্বারা চিহ্নিত করে—বিনা পরিশ্রমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করে! কিন্তু তার চেয়েও—ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটেছে কাল। ইস্কুলে যে আলমারির মধ্যে প্রশ্নপত্র জমা রয়েছে—তার দুটো তালাই কে যেন ভেঙ্গে ফেলেছে—প্রশ্নপত্রের কয়েকটি বাণ্ডিলও অন্তর্হিত হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত দু'টি ছেলে ধরা পড়েছে। আজ বোর্ডে তাদের বিচার হ'ল। একটি ছেলে সন্তদের ক্লাসের—আর একটি উঁচু ক্লাসের। পিছনে আরও অনেকে আছে—তাদের পরিচয় ক্রমে হয়ত বার হবে। যাই হোক্—সন্তদের ক্লাসের ছেলেটির নাম প্রমোদ। বয়স পনেরো—দু'বছর একই শ্রেণীতে স্থিতিলাভ করায় ওর মন অস্থির হয়ে উঠেছে। যে কোন উপায়ে ক্লাস-প্রমোশন পাবার জন্য এবার ও উঠে-পড়ে লেগেছে।

একদিন ক্লাসে জাঁক করে বলেছিল, দেখিস্ এবার প্রমোশন নেবই—কারও সাধ্যি হবে না আমায় আটকাতে।

কি করে? পড়াশোনা তো তুই কিছুই করলি না সারা বছর।

তাতে কি!—কায়দা জানলে পড়াশোনার দরকার কি। এবার চিচিং-ফাঁক করে দেব—বুঝলি? ওই আলমারিতে থাকে কোশ্চেন পেপার—বুঝলি?

ছেলেরা ওর বীরত্বে হেসেছিল। বলেছিল, ইস্—তা আর পারতে হয় না?

দেখিস। যদি পারি কি খাওয়াবি বল? বাজী এস। চারটে রসগোল্লা—আর একদিন সিনেমা—

বেশ।

প্রমোদের সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপ মনে পড়ে সন্তর।

কিরে—কোথায় বাড়ী তোর? ও গেঁয়ো! সেখানে ইস্কুল আছে? খুব বন—নয়রে? বাঘ দেখা যায়? সাপ?

সন্ত বিরক্ত হয়েছিল মনে মনে। শহরের সভ্যতার ধারা জানা না থাকাতে কোন প্রতিবাদ করেনি।

আয় ইদিকে এসে বোস। ওখানে সব গুডবয়রা বসে—ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবি নে।

সন্ত ওর কথা শোনে নি।

স্ব-সীমায়, বিরোধের অবকাশ ঘটত না। এখনকার দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়ে তখনকার কালকে বিচার করো না। পুরাকালে বর্ণাশ্রমে গুণ অনুসারে যার বিভাগ হয়েছিল—কালক্রমে গোত্রে বর্ণে জাতিতে তা প্রতিষ্ঠিত হল। ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ হয়েছিল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে—বিদ্যাজ্ঞানের সেবায়—ব্রাহ্মণ ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হল যজ্ঞসূত্রের দাবিতে। যাক—সে সব কথা। একলব্য দ্রোণের অস্ত্রশিক্ষা নিরীক্ষণ করলেন এবং বিজন বনে এসে—দ্রোণের মৃন্ময় মূর্ত্তি গড়ে তারই কাছে ধনুর্বেদ শিখতে লাগলেন। সে শিক্ষার পরিচয় পেলেন পাণ্ডবেরা বন ভ্রমণে এসে। পরিচয় পেয়ে তাঁরা চমকে গেলেন। কি অসামান্য বাণ-শিক্ষার কৌশল! বাণবিদ্ধ সারমেয় রুদ্ধবাক হয়ে সে পরিচয় নিয়ে এল। গুরু চললেন—সশিষ্য বন মধ্যে। গুরুকে দেখে একলব্যের তো আনন্দের সীমা নাই। ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করে বললেন, আমি ধন্য।

এমন আশ্চর্য্য শিক্ষা তুমি কোথায় পেলে বৎস?

আপনারই কাছে গুরুদেব।

সে কি!

ওই দেখুন—শরীরী আপনাকে পাইনি—তাই মূর্ত্তি গড়ে পূজা করেছি। আমার ধনুর্ব্বাণ শিক্ষা আপনারই কৃপায়।

গুরু প্রিয় শিষ্য, অর্জ্জুনের পানে চাইলেন। মুখখানি তার শুকিয়ে গেছে—তার শিক্ষার অহঙ্কারও যেন চূর্ণ হয়ে গেছে। মনে জাগল—বর্ণাভিমান। না, যে করে হোক—ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব রাখতেই হবে।

বললেন, শিক্ষালাভ তোমার সার্থক হয়েছে বৎস। এবার দক্ষিণান্ত কর আমায়।

বলুন—কি চান আপনি?

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ।

একলব্য নির্ব্বোধ নন—গুরুর মনোগত অভিপ্রায় বুঝলেন। বুঝেও অসি উত্তোলন করে হাসিমুখে বললেন, তাই হোক গুরুদেব। আপনি যে চণ্ডালের কাছে দক্ষিণা চেয়েছেন—এইতেই আমি কৃতকৃতার্থ।

ব্রাহ্মণের চাতুরী ব্রাহ্মণকে নীচেয় নামালে বৈকি। কিন্তু সত্যরক্ষার সদ্‌দৃষ্টান্ত অভিজাতদের চমকিত করে তুলল। সেকালের একজন সামান্য চণ্ডালও সত্যকে সমাদর করে চলত—আর এ কালের বর্ণশ্রেষ্ঠরা সেই সত্যকে কোথায় ভাসিয়ে দিয়েছেন।

কাহিনী শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন অমরনাথ।

সন্তু বললে, আপনি কাকেও কিছু বলবেন না বাবা—আমি কাল একাই ইস্কুলে যাব।

ওরা যদি তোমায় লাঞ্ছনা করে?

করুক না—তাই বলে মিথ্যা বলব।

অমরনাথের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, আজ সত্যাশ্রয়ীর অনেক বিপদ—তবু তোমাকে বলব ওরই মধ্যে বাস করতে। আমরা হিন্দুরা বলি—ইহজগৎ কতটুকু—পরজগৎ তার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু সে কি প্রলোভনের কথা। সত্যকে যে আশ্রয় দেয়—সে প্রশংসা বা প্রলোভনের লোভে দেয় না—তার মনের মধ্যে শক্তি নিয়ে গড়ে ওঠে এক জগৎ—আনন্দ হল সেই জগতের পরমায়ু। সেই শক্তিতে সে দুঃখ-কষ্ট অগ্রাহ্য করে।

ভগবতী বললেন—এইবার তোমরা খেয়ে নাও। রাত অনেক হয়েছে—আলোর তেলও ফুরিয়ে আসছে।

তা বটে, অমরনাথ হাসলেন, আলোর তেল ফুরিয়েই আসচে বটে। (ক্রমশঃ)

রাষ্ট্র-সভ্যতার গোড়ার কথা

শ্রীজয়দেব রায়

মানব সভ্যতার প্রথমেই দরকার পড়েছিল প্রকৃতিকে জয় করার। পেট ভরে খাওয়ার জন্যেই একরকম আদিযুগের প্রথম মানুষ সভ্যতার পথে পা বাড়িয়েছিল। পশু শিকারের জন্যে তারা প্রথমে তৈরি করল পাথর দিয়ে নানারকম অস্ত্র, মাছ ধরার জন্যে ধারালো হুক। নানারকম গাছ-গাছড়ার ফল মূল সংগ্রহ করে তারা উদর পূরণ করতে লাগ্‌ল। ক্রমে শস্য ফলানোর দিকে তাদের নজর গেল। নিজের এলাকায় যত্ন করে শস্য জন্মানোর জন্যে তারা কৃষির সূচনা করল।

এর ফলেই গার্হস্থ্য জীবনের সুরু হ'ল, কতকগুলি পশুকে গৃহে পালন করে তাদের দিয়ে নানা কাজ আদায় করতে লাগল, তাদের দুধ মাংস খেতে লাগল। দুর্দিনের জন্যে শস্যাদি সংগ্রহ করে রাখার ব্যবস্থা হ'ল। আবার এই শস্যাদি সংগ্রহ করা থেকেই ক্রমে বিনিময়ের কাজ সুরু হ'ল। তা থেকে বাণিজ্যেরও সূত্রপাত হ'ল।

সংগৃহীত শস্য সঞ্চয় রাখার জন্যেই প্রথম একটা গৃহের প্রয়োজন হয়। তাতেই হ'ল প্রথম সভ্যতার সূত্রপাত। আজকের মানুষ অবশ্য আর সেদিনের মত নিজের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস নিজে প্রস্তুত করে না। বাণিজ্যের আদান প্রদানের সুযোগ প্রবর্তিত হওয়ায় একদল লোক যেমন খাদ্যদ্রব্য তৈরি করে, অন্যদল তাদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে সরবরাহ করে। এভাবেই ক্রমে মানব জাতির মধ্যে একটা ঐক্যের বন্ধন রচিত হয়েছে।

খাদ্যের প্রয়োজন মিটলে পর তখন দরকার পড়ল পোষাকের। গরম দেশে পোষাকের তেমন প্রয়োজন না থাকলেও শীতের দেশের লোকদের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে গরম পোষাক দরকার হ'ল।

সবচেয়ে আগে মানুষ এই শৈত্য থেকে বাঁচার জন্যে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। এখনও এস্কিমোরা সেইভাবেই শীত থেকে আত্মরক্ষা করে।

শীতপ্রধান দেশে সেই কারণে সব আগে লোকে শিকারের সন্ধানে বেরোত। এই পোষাকের জন্যেই ও সব দেশের লোকেরা পশুচারণ সুরু করে। পোষাকের জন্যেই আবার তুলো, শণ, পাট প্রভৃতির চাষ হয়।

আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শিল্প হয়ে রয়েছে এই 'পোষাক বানানো'। শীতপ্রধান দেশেই আবার এ শিল্পের প্রাধান্য, তার কারণ ও সব দেশে গরম দেশের চেয়ে পোষাকের প্রয়োজন বেশি।

খাদ্যদ্রব্য ও পোষাকের পরেই সভ্য মানুষের বিশেষ প্রয়োজন আশ্রয় গৃহ। কত বিচিত্র ঢঙেই না প্রাচীন কালে মানুষ বাসগৃহ নির্মাণ করত।

গরমকালে এস্কিমোরা বাস করে চামড়ার 'টুপিক' কুটীরে, শীতকালে তারা 'ইগ্‌লু' নামে বরফের তৈরি ঘরে থাকে।

রেড ইণ্ডিয়ানরাও চামড়ার তৈরি 'উইগ্‌ওয়াম' নামে তাঁবুতে থাকে। বেদুইনরা তাদের পালিত উটের চামড়া এবং পুরু কম্বলের তাঁবুতে বাস করে। ঘাসের চাপড়ার ছাওয়া ঘরে অনেক অসভ্য লোকেরা বাস করে।

গ্রীষ্মপ্রধান জঙ্গলে ঘাসের কুটীরে, ডালপালার ঘরেও অনেক অসভ্য জাতি এখনও থাকে।

ইউরোপের অনেক দেশেও সভ্যতার গোড়ার দিকে লোকে পাহাড়ের গুহায় এবং গাছের উপরে থাকত।

ইতিহাস যখন থেকে লেখা হচ্ছে প্রায় তখন থেকেই লোকে মাটির এবং কাঠের ঘরে বাস করেছে। প্রথম প্রথম জঙ্গলের ডালপালা দিয়ে ঘর গড়া হ'ত, তারপর ক্রমে ক্রমে কাঠের তক্তা দিয়ে ঘর তৈরি হ'ল।

একটার ওপর আর একটা পাথর সাজিয়ে অনেক দেশে প্রাচীন যুগের মানুষ ঘর গড়তে সুরু করে। পাথরগুলোকে আটকাবার জন্যে ক্রমে তারা কাদা লেপ্‌তে লাগ্‌ল, তারপর চুণ-সুরকি লাগানোর প্রথার আবিষ্কার করল।

শুক্‌নো জলবায়ুর অঞ্চলে রোদে শুকিয়ে নিয়ে কাঁচা ইট দিয়ে অনেকদিন ঘরবাড়ী তৈরি হয়েছে। 'মহেঞ্জোদারো'তে কাঁচা ইটের বাড়ী আবিষ্কৃত হয়েছিল।

কিন্তু এ প্রথা তো বৃষ্টিপ্রধান অঞ্চলে চল্‌ত না। ক্রমে আগুনে সেঁকে নিয়ে যে ইট তৈরি হ'ল, তাতে সব দেশেই পাকা বাড়ী গড়া হতে লাগল।

অবশ্য আগুনের আবিষ্কার যেদিন থেকে হয়েছে মানুষ সেদিন থেকে সভ্যতার পথে অনেকটা এগিয়েছে। আগুনের সাহায্যেই লোকে তাদের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করেছে, আগুনের বেড়া দিয়ে বন্য হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করেছে, আগুনে সেঁকে নিয়েই তারা খাদ্যদ্রব্য রেঁধে খেতে শিখেছে।

আজ সেই আগুনের সাহায্যে তারা কয়লা, লোহার ব্যবহার করছে, নানা রকম শিল্পের কলকারখানা সৃষ্টি করছে। ভাবতে আজ আশ্চর্য্য লাগে, এককালে মানুষ এ আগুনের ব্যবহারই জান্‌ত না।

সভ্যতার গোড়ার দিকে মানুষের একটা নির্দিষ্ট আস্তানা অবশ্য বহুদিন পর্য্যন্ত ছিল না, খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে তারা যেখানে যেত পুরানো ঘর ছেড়ে দিয়ে, সেখানেই আবার নতুন করে একটা বাসা বানিয়ে নিত।

তাতে দেখা গেল একটা নির্দিষ্ট বাসস্থান না থাকায় একটা সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে না। তা ছাড়া এক একটা স্থানের ওপর তাদের মায়া-মমতাও জন্মাতে লাগল। তখন দু'টি সুবিধার দিকে নজর রেখে তারা স্থায়ী বাসস্থান রচনার ব্যবস্থা করল।

একটি খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ স্থানের নৈকট্য, আর একটা শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা—এই দুটির দিকে লক্ষ্য রেখে সেকালের মানুষ ঘর বাঁধতে সুরু করল।

আজও প্রথম সুবিধাটার দিকে নজর রেখেই সভ্যমানুষও ঘর বাঁধে। কৃষিজীবী লোকেরা বাস করতে চায় কৃষিক্ষেত্রের নিকটে, মৎস্যজীবীরা নদী বা সমুদ্রের নিকটে, শিকারীরা থাকতে চায় জঙ্গলের ধারে।

শত্রুকে এড়াবার জন্যে অনেকে একত্রে বাস করতে সুরু করে। শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আদিম যুগের মানুষকে নিজেদের বাহুবলের উপর নির্ভর করতে হ'ত। সভ্যমানুষ কোন শক্তিশালী শাসকের অধীনে বাস করলে সহজেই আত্মরক্ষার চিন্তা থেকে বাঁচতে পারে।

কিন্তু জঙ্গল অঞ্চলে এখনও মানুষকে বন্য শত্রুর আক্রমণ থেকে সর্বদাই বাঁচার জন্যে চেষ্টা করতে হয়। অনেক অসভ্য জাতি গাছের উপরে ঘর বাঁধে, অনেকে আবার জলের উপরে বাসা করে তাতেই সারা-জীবন কাটায়। আমেরিকার পিউব্‌লো (pueblo) ইণ্ডিয়ানরা পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় কিংবা খাদের মধ্যে বাস করে।

ইউরোপের মধ্যযুগে সামন্ত জমিদাররা ঠিক্ এই কারণেই পাহাড়ের দুর্গম স্থানে তাঁদের দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করতেন। চীনের লোকে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে মাইলের পর মাইল প্রাচীর গড়ে তুলেছিল।

কেবলমাত্র শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যই মানুষ অনেক স্থলে জনপদ তৈরি করে একস্থানে অনেকে মিলে মিশে বাস করতে সুরু করে! একস্থানে অনেকে বাস করলে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহে অসুবিধা হয়েছে, হয়ত ছড়িয়ে বাস করলে প্রত্যেকেই প্রচুর খাদ্যদ্রব্য সহজে সংগ্রহ করতে পারত। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যেই এক একদল মানুষ একত্রে বাস করে এক একটা গ্রাম তৈরি করেছে। যে যার জীবিকার জন্যে ছড়িয়ে পড়লেও বিপদের সময়ে সবাই নিজেদের গ্রামে গিয়ে সমবেত হ'ত।

আবার এক সঙ্গে বাস করে নিজেরা শক্তিসঞ্চয় করে প্রতিবেশীদের আক্রমণ করে তাদের ধন সম্পদ লুটও করত। আত্মরক্ষা এবং অন্যকে আক্রমণের জন্যে এক একটা গোষ্ঠীর প্রাদুর্ভাব হ'ল; প্রত্যেক গোষ্ঠীর আবার এক একজন শক্তিশালী লোক এ সমস্ত রক্ষিদল পরিচালনা করত, সেইরূপ শক্তিশালী লোকই এক এক গোষ্ঠীর সর্দার নির্বাচিত হল।

আরও পাঁচটা গ্রাম জয় করে সেই হইত এক একটা অঞ্চলের শাসক। বহু গ্রামকে অধীনে এনে তার শাসনভার পেলেই এক একজন শক্তিশালী লোক রাজা হয়ে উঠল।

এ ভাবেই রাষ্ট্রের প্রথম সৃষ্টি হয়—এ ভাবেই সভ্যতা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়।

পাথেয়

জয়চরণ সরকার

ক্লান্তির কীটেরা সব মরে যাক। তোমার হাসির
পুবালি বাতাস-ঢেউ ছুটে যাক সুরভী নিঃশ্বাসে
আমার মনের নীল আকাশেতে, সে সুরের মীড়
ছড়িয়ে পড়ুক ফুলে মাটিতে, সবুজ পাতা-ঘাসে।
রিক্ত শীতের শেষে বসন্তের কোকিলের মত
মরা দেহ মনে আজ প্রাণ সুরে সুরে জাল বুনে
তেমনি আমার রোদ প্রাণে প্রাণে হোক উজ্জীবিত
নীল আকাশের মত, মেঘ-স্মৃতি না থাকে এ মনে।

জানি ঠিক একদিন মিঠে রোদে সোনালি বিকেলে
সন্ধ্যার ধূসর শ্লেটে মুছে গেলে সব আলো রেখা,
ক্লান্ত ডানার পাখী নীড়ের আশ্রয় খুঁজে পেলে
প্রথম তারার মত সবুজ তোমারও পাব দেখা।
গোধূলি অনেক দেরী এখন রৌদ্রজ্বলা দিন
অসহ্য প্রদাহে কাটে, চোখে শুধু মরীচিকা জ্বলে;
তোমার চোখের আলো তবু সাড়া জাগায় নবীন
তাপকণা সরে যাবে, শান্ত হবে ছায়াবীথি তলে॥

আর্য্যসঙ্গীতে রস

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ বি-এল

সঙ্গীতে রস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু শাস্ত্র বলেন "অরসিকেষু রস মা নিবেদয়।" এই শাস্ত্র উক্তি মানিতে গেলে দেখিতে পাই যে রসিক মাত্র নয় জন, যথা—বিদ্যাপতি লছমী, জয়দেব পদ্মা, বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি, চণ্ডীদাস রামী ও রায় রামানন্দ একাধারে পুরুষ ও প্রকৃতি। কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহ ত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়॥

এই যদি হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে রসিক কেহই নাই। কিন্তু "যস্য ত্রি পূর্ণা মধুনা পদান্।" শ্রীভগবানের ত্রিপাদ হইতে মধুর রস সদাই ক্ষরণ হইতেছে। সেই রস আস্বাদ করিতে সকলেরই বাসনা হয়। তবে কম ও বেশী। কেহ চাহে মাতাল হইতে, কেহ চাহে সামান্য আস্বাদ করিতে। এই রসের স্বাদ লইতে হইলে দেখিতে হইবে রস পদার্থটী কি বা রস কাহাকে বলে। দ্বিজ চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

এই সে রস নিগূঢ় ধন্য।
ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য॥

এমত অবস্থায় রস কাহাকে বলে তাহারই আলোচনা সর্ব্বপ্রথম হওয়া উচিত বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু রসতত্ত্ব অতি বৃহৎ। তথাপি অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি।

সাধারণতঃ যখন কোন দ্রব্য অন্তঃ বা বহিঃ কারণবশতঃ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তদস্থিত যে তরল পদার্থ নির্গত হয় তাহাকে রস নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ যখন তাহার ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে তখন তাহা হইতে যাহা নিষ্ক্রামণ হয় তাহাই রস নামে পরিচিত হয়। সেইরূপ যখন ভুক্তদ্রব্য জঠর মধ্যে পরিপাক হয় তখন তাহা হইতে রস উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বদেহে সঞ্চারিত হইয়া দেহকে পুষ্ট করে। এই হেতু অলঙ্কার শাস্ত্র "রসঃ ইতি কঃ পদার্থঃ" এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন "আস্বাদ্যত্বাৎ"। আরও বলেন "নানা ব্যঞ্জনৌষধি দ্রব্যসংযোগাদ্রস-নিষ্পত্তির্ভবতি" অর্থাৎ নানা উপকরণ, ঔষধি দ্রব্যসংযোগ হেতু রস নির্গত হয়। সেইরূপ মনে নানা সত্ত্বার উদয় হেতু নির্ব্বেদাদি রত্যাদি ইত্যাদি মনোবিকার ঘটে এবং তাহা যখন কথঞ্চিত স্থায়িত্ব লাভ করে তখন তাহা ভাব নামে অভিহিত হয়। সেই ভাব যখন পরিপক্কতা লাভ করে তখন তাহা রসে পরিণত হয়। এই হেতু "Emotion is a state of the mind।" মহামুনি ভরতকে "কোয়ং রসঃ" প্রশ্ন করাতে বলেন—

"বহু দ্রব্যযুক্তৈর্ব্যঞ্জনৈর্বহুভির্যুতম্।
আস্বাদয়ন্তি ভুঞ্জানাং ভক্তং ভক্তবিদোজনাঃ॥
ভাবাভিনয় সংবদ্ধান স্থায়িভাবং স্তথা বুধাঃ।
আস্বাদয়ন্তি মনসা তস্মাৎ রসাঃ স্মৃতাঃ॥"

যেমন লোকে বহু দ্রব্যযুক্ত ও বহু ব্যঞ্জনযুক্ত আহার আস্বাদন করে সেইরূপ ভক্ত ও ভক্তবিদেরা নানা ভাব ও অভিনয়যুক্ত স্থায়িভাব মনের দ্বারা আস্বাদ করা হেতু মনে রসের উদ্রেক হয়। অপিচ—

"ন ভাবহীনোস্তি রসো না ভাবো রসবর্জ্জিতঃ।"—নাট্যশাস্ত্র

কিন্তু ভাবহীন রস হয় না, বা রসহীন ভাব হয় না। পুনশ্চ—

"যথা বীজাঙ্কুবেদ্‌ বৃক্ষো বৃক্ষাত্‌ পুষ্পং যথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্ব্বে তেভ্যোভাবা ব্যবস্থিতাঃ॥"—নাট্যশাস্ত্র

যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে পুষ্প, পুষ্প হইতে ফল—সেইরূপ সকল ভাবের মূল হইল রস। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতেছে ভাব কাহাকে বলে। ভাব হইল "নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া" অর্থাৎ নির্ব্বিকার চিত্তে মনের প্রথম বিকার হইল ভাব। সকলপ্রকার চিত্তবিকার হেতু মানসিক অবস্থার সাধারণ নাম হইতেছে ভাব। "ভাবয়ন্তীতিভাবাঃ। সর্ব্বমেব ভাবিতমিতি।" আধার ভেদে ও সময় বিশেষে ইহা ভিন্ন নামে কথিত হইয়া থাকে।

"বিরুদ্ধা অবিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোহসৌ ভাবঃ স্থায়াতি সম্মতঃ॥"—অলঙ্কারশাস্ত্র

সমস্ত বিরুদ্ধ অবিরুদ্ধ, ও সঞ্চারি ভাবসমূহের অবশেষে অন্তঃকরণে বিকারহীন একপ্রকার মানসিক স্থায়িত্ববৃত্তি অধিষ্ঠিত হয় তাহাই স্থায়ী ভাব। অর্থাৎ কোন বিষয় পাঠ, দর্শন বা শ্রবণ হেতু চিত্তবিকার কথঞ্চিত স্থায়ীরূপ ধারণ করিয়া রসাস্বাদের অঙ্কুর স্বরূপ হয় তখন তাহাকে ভাব বলা হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে অন্তঃকরণে কোন কিছুর সত্ত্বার বিশেষ উদয়ই হইল ভাব।

মনকে সাধারণতঃ চিত্ত বলা হয়। ইহা অন্তঃকরণ ত্রয়ের মিলিতাবস্থা। কিন্তু ত্রিভাগে বিভক্ত অন্তঃকরণের এক মৌলিক অংশ এই মন নহে। তাদৃশ মৌলিক মনের কার্য্য কেবল সংস্কারাধান বা স্থিতি। কারণ জ্ঞান ও চেষ্টা বা প্রখ্যা ও প্রবৃত্তি যখন বুদ্ধি ও অহঙ্কারমূলক তখন অবশিষ্ট স্থিতিরূপ (nascent mind) অন্তঃকরণ ধর্ম্ম মনের হইবে। এই মনেতে বাহ্যকারণ হেতু যে তরঙ্গ উঠে তাহাই ভাব। এই যে তরঙ্গ যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত অর্থাৎ বিচারাদিহীন তাহাই ভাব। এই ভাব যখন স্থায়ী হয় ও রতিযুক্ত হয় তখন তাহা রসে পরিণত হয়। এই মনই ব্রহ্মা।

"বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্ত সঞ্চারিণাতথা।

রসতামেতি রত্যাদি স্থায়ীভাবঃ সচেতসাম্ ॥"—অলঙ্কারশাস্ত্র

বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাব রতিযুক্ত হইয়া স্থায়ীরূপ ধারণ হেতু চৈতন্যের উদ্রেক করত রসে পরিণত হয়। মনে যখন এই রস উৎপন্ন হয় তখন সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয় এবং মন এক অখণ্ড আনন্দে আপ্লুত হয় ও তাহাতে কোন দুঃখ বা কষ্টের স্পর্শ পর্য্যন্ত থাকে না। এই হেতু ইহা ব্রহ্ম আস্বাদের স্বরূপ।

"সত্ত্বোদ্রেকদখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ।

বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ ॥"—অলঙ্কারশাস্ত্র

রসের এই চমৎকারিত্বের জন্য ইহাকে "নারায়ণ" বলা হয়।

"রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্ব্বত্রাপ্যনুভূয়তে।

তস্মাৎ হেতুমেবাহ নারায়ণো রসং ॥"—অলঙ্কারশাস্ত্র

শ্রীভগবানই সকল রসের মূল স্বরূপ। তাঁহার দেহ হইতেই রসসমূহ সদাই নির্গত হইতেছে।

মনই হইল রসাধার। এই মনই ব্রহ্মা। ব্রহ্মার মানসপুত্র কামদেব অনঙ্গ হইয়া সৃষ্টি হেতু হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া সৃষ্টি প্রবৃত্তি প্রদান করে। এই তত্ত্ব কালচক্রে শুক্রের সপ্তম হইতে বিচার করিতে হয়। কারণ শুক্র চ্যুৎ অগ্নি হইতে উৎপন্ন। অগ্নিই গতি দান করে। সপ্তম হইতে গতির বিচার। গতি না থাকিলে রতি হয় না। পুনরায় এই তত্ত্ব চন্দ্রাৎ সপ্তম হইতে দেখিতে হয়। কারণ চন্দ্রই মন। রসতত্ত্বে এই রতি অর্থে অনুরাগ স্থায়ীভাব। স্থায়ীভাব কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এক্ষণে বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের আলোচনা প্রয়োজন।

প্রত্যেক চিত্তবৃত্তির কতকগুলি কারণ আছে। যে সকল কারণে চিত্তবৃত্তির স্থায়িত্ব লাভ করে তাহাকে বিভাব বলে। "বিভাবঃ কারণং নিমিত্ত হেতুরিতি পর্য্যায়ঃ।" ভাবরূপ বৃত্তিই জ্ঞান। জ্ঞান অন্তঃকরণের বৃত্তি। ভাবও তাহাই। জ্ঞান দ্বিবিধ—বৃত্তিজ্ঞান ও ফলজ্ঞান। অন্তঃকরণ জ্ঞেয় বস্তুর আকারে আকরিত হইলেই তাহাকে বৃত্তিজ্ঞান বলা হয়। এবং তাহার পর জ্ঞেয় বস্তুর প্রকাশে যে বিচারজনিত জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা ফলজ্ঞান। স্বপ্রকাশ বিষয়ী আত্মার জ্ঞানই বৃত্তিজ্ঞান এবং আত্মপ্রকাশ্য ঘট-পটাদি বিষয় সকলের জ্ঞানই ফলজ্ঞান। বৃত্তিজ্ঞান বিচার-নিরপেক্ষ অতএব স্বপ্রকাশ, এই হেতু স্বাভাবিক। ফলজ্ঞান বিচার-নিষ্পন্ন, অতএব পর প্রকাশ্য বলিয়া কৃত্রিম। নির্ম্মল নির্বিষয় অন্তঃকরণ আত্মাকারে আকরিত হইলেই তাহাকে আত্মজ্ঞান বা বৃত্তিজ্ঞান বলা হয়। আত্মার ফলজ্ঞান হয় না। অন্তঃকরণ ঘট-পটাদি বিষয়ের আকারে আকরিত হইলে বুদ্ধিস্থিত চিদাভাস কর্ত্তৃক বিচার পূর্ব্বক ঘট-পটাদি বিষয়ক অজ্ঞানের অপসারণে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই ফলজ্ঞান। ভাবরূপা অন্তঃকরণের স্বাভাবিকী বৃত্তি আবার স্বপ্রকাশ আত্মজ্ঞান হইতেও বিশেষ। আত্মজ্ঞান অন্তঃকরণের চিৎসত্তারূপা বৃত্তি। ভাব উহার চিৎসত্তাসাররূপা বৃত্তি। উহা আনুকুল্যাত্মাত্মিকা সুখরূপ আনন্দরূপা বৃত্তি বলিয়াই উহাকে চিৎসত্তাসাররূপা বৃত্তি বলা হয়।

প্রকৃতিপাশ বদ্ধ জীবের প্রকৃতিপাশ হইতে মুক্ত হইবার বাসনায় শ্রীভগবানের গুণাদি শ্রবণমাত্র তাঁহাতে যে অবিচ্ছিন্ন মনের প্রবাহরূপা গতি হয় উহাই ভাব বা ভক্তি। উহা শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষাত্মক অর্থাৎ হ্লাদিনী সমবেত সম্বিৎসার।

অনন্তশক্তিমান ঈশ্বর দ্বারাই জীব ও জগৎ সৃষ্ট। তাঁহার অনন্তশক্তিকে উপলব্ধি করার জন্য ত্রিভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা—চিৎশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। এই চিৎশক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গাশক্তি। এই অন্তরঙ্গাশক্তি হইল স্বরূপশক্তি। ইহা প্রকৃতির শক্তি নহে। এই শক্তি হেতু জীবের অন্তরে চৈতন্যরূপ অন্তর্যামী বিরাজ করেন। ইহাকেই চিৎ বলা হয়।

মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গাশক্তি। ইহাই এককে বহু করে। অর্থাৎ ইহা হইতেই বহুর উৎপাদন হয়। ইহাই হইল প্রকৃতিশক্তি বা অবিদ্যাশক্তি বা পরাশক্তি।

জীবশক্তি—ইহা হইল তটস্থশক্তি। কারণ শুদ্ধ চৈতন্য যদি ভূমি হয় আর অচিৎ যদি প্রবাহমান নদী হয় তাহা হইলে প্রকৃতির বাঁধনে আবিষ্ট ভূমিই হইল জীব। অর্থাৎ প্রকৃতির উপাধিতে উপহিত চৈতন্যই হইল জীব।

শক্তিমান ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ—ইহাই হইল তাঁহার বিভু অর্থাৎ শক্তি। চিৎ হইল সম্বিত, সৎ হইল সন্ধিনী বা সমবেত এবং আনন্দ হইল হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনীর সারাংশ হইল প্রেম।

মনের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপা গতিই হইল ভাব। উহা প্রেমরূপ অংশুমালীর অংশু। উহা প্রেমের অঙ্কুর। উহারই নাম হইল রতি। কারণ জীবের অন্তরে রাধামাধব অবস্থিত। এই কারণে সে আরাধনায় রত হয়। উহাই রতি। এই রতি যখন শ্রবণাদি কর্ত্তৃক উপস্থাপিত বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাব দ্বারা ব্যক্তীকৃত অর্থাৎ আস্বাদযোগ্যতা-প্রাপ্ত হয় তখন ঐ রতি বা ভাব রসে পরিণত হয়। এই রস নাট্যশাস্ত্র মতে অষ্ট প্রকার।

কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্র মতে রস নয় বা দশ প্রকার, যথা—

"শৃঙ্গারাদ্ধিভবেদ্ধাস্তৌ রৌদ্রাচ্চকরুণো রসঃ।

বীরাচ্চৈব অদ্ভুতোত্পত্তিবীভৎসাচ্চ ভয়ানকঃ ॥"

অর্থাৎ শৃঙ্গার, হাস্য, রৌদ্র, করুণ, বীর, অদ্ভুত, বীভৎস ও ভয়ানক। এই আট প্রকার।

"শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানকঃ।

বীভৎসোদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ ॥"

অর্থাৎ শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই আট প্রকার। কিন্তু শান্তকেও রস বলা হয় বলিয়া রস নয় প্রকার। কিন্তু "বৎসলশ্চ রস ইতি তেন স দশমো রসঃ।" যেহেতু বাৎসল্যকেও রস বলা হয় সেই হেতু দশ প্রকার। কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে রস দ্বাদশ প্রকার। এই দ্বাদশ প্রকার রসের মধ্যে সাতটী গৌণ ও পাঁচটী মুখ্য। বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, রৌদ্র ও বীভৎস এই সাতটী গৌণ এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী মুখ্য।

প্রত্যেক রসেরই এক একটী স্থায়ীভাব আছে। উৎসাহ, শোক, বিস্ময়, হাস, ভয়, ক্রোধ ও জুগুপ্সা এই সাতটী বীরাদি—সাতটী গৌণ রসের স্থায়ীভাব এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা এই পাঁচটী শান্তাদি—পাঁচটী মুখ্য রসের স্থায়ীভাব। এই স্থায়ীভাবসমূহ কার্য্যকারণ ও সঞ্চারি ভাব দ্বারা সম্যকরূপে হৃদয়ে অনুভূত হইয়া অন্তঃকরণকে দ্রবীভূত করা হেতু রসে পরিণত হয়। যে সকল কারণে স্থায়ি ভাব উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে বিভাব বলে—"বিভাবঃ কারণং নিমিত্তং হেতুরিতি পর্য্যায়াঃ"। অর্থাৎ যাহা দ্বারা ও যাহাতে স্থায়ীভাবাদির আস্বাদন করা যায় তাহার নাম বিভাব। এই বিভাব দ্বিবিধ—আলম্বন ওউদ্দীপন।

যাহাকে অবলম্বন করিয়া অন্তঃকরণে সুখদুঃখাদি উদিত হয় তাহাকে আলম্বন বিভাব বলা হয়। ইহা আবার বিষয় ও আশ্রয়ভেদে দুই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে রতি উৎসারিত হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিষয়ালম্বন বলা হয়। এবং ঐ রতি শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া ঐ ভক্তগণকে রতির আশ্রয়ালম্বন বলা হয়।

যাহার দ্বারা ভাবের উদ্দীপন হয় তাহাকে উদ্দীপন বিভাব বলা হয়। আলম্বন বিভাবের চেষ্টা, রূপ ও ভূষণাদি এবং দেশকালাদি ভাবের উদ্দীপন করে বলিয়াই ঐ সকলকে উদ্দীপন বিভাব বলা হয়।

যাহা অন্তরস্থ ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে তাহার নাম অনুভাব। এই অনুভাব আবার দ্বিবিধ—মিশ্র ও সাত্বিক। কেবল মানসিক অনুভাবের নাম সাত্বিক অনুভাব এবং কায়, বাক্ ও মানসিক অনুভাবের নাম মিশ্র অনুভাব। নৃত্য, গীত ও হাস্য হইল মিশ্র অনুভাব।

"স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্বিকামতাঃ॥"

—অলঙ্কারশাস্ত্র

স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও মূর্চ্ছা—এই আটটীর নাম সাত্তিক অনুভাব।

যে সকল ভাব স্থায়ীভাবে কখন উন্মগ্ন ও কখন নিমগ্ন (অর্থাৎ আবির্ভূত ও অন্তর্হিত) হইয়া ঐ ভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করে তাহাদিগকে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। এই ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশ প্রকার যথা—

১। নির্ব্বেদ ২। আবেগ। ৩। দৈন্য। ৪। জড়তা ৫। উগ্রতা ৬। মোহ ৭। অপস্মার ৮। মদ ৯। নিদ্রা। ১০। চপলতা ১১। বিরোধ ১২। বিষাদ ১৩। শ্রম ১৪। ঔৎসুক্য ১৫। স্মৃতি ১৬। মরণ ১৭। আলস্য ১৮। স্বপ্ন ১৯। চিন্তা ২০। গ্লানি ২১। ধৃতি। ২২। অসূয়া ২৩। উন্মাদ ২৪। শঙ্কা ২৫। অবহিত্থা ২৬। হর্ষ ২৭। লজ্জা ২৮। মতি ২৯। গর্ব্ব ৩০। ব্যাধি ৩১। সন্ত্রাস ৩২। অমর্ষ ৩৩। বিতর্ক॥

শৃঙ্গার

"শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমন হেতুকঃ।
উত্তম প্রকৃতি প্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে॥
ভ্রূ বিক্ষেপ কটাক্ষাদিরনুভাবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ত্যক্ত্বৌগ্র্যমরণালস্য জুগুপ্সা ব্যভিচারিণঃ॥
স্থায়ীভাবো রতিঃ শ্যামবর্ণোঽয়ং বিষ্ণুদৈবত।

—অলঙ্কারশাস্ত্র

মনমথনকারী মনোভাবের উদ্রেক হেতু উত্তম প্রকৃতির নায়ক নায়িকার অন্তঃকরণে যে রস সঞ্চার হয় তাহাই শৃঙ্গার রস। ইহাতে ভ্রূ বিক্ষেপ কটাক্ষাদির অনুভাব। রতি ইহার স্থায়ীভাব এবং উগ্রতা, মরণ, আলস্য ও জুগুপ্সা ব্যতীত সমস্তই ব্যভিচার ভাব। ইহার বর্ণ শ্যাম ও ইনি বিষ্ণুদৈবত।

শৃঙ্গার-রসের স্থায়ীভাব রতি (অনুরাগ) সকল ভাবের আদিতে উদ্ভূত হয় এবং উহা হেতু আনুষঙ্গিক সকল রসের পুষ্টি হয় এবং সকল ভাবের অগ্রেই অনুরাগ জন্মে। এই কারণে ইহার নাম আদি বা আদ্যরস বা মধুর রস। এই আদিরস দুই ভাগে বিভক্ত—"বিপ্রলম্ভোঽথ সম্ভোগ ইত্যেষ দ্বিবিধো মতঃ"। অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। কিন্তু "যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাভীষ্টমুপৈতি বিপ্রলম্ভোঽসৌ" অর্থাৎ যেখানে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে কিন্তু কেহ কাহাকে লাভ করিতে পারিতেছে না এইরূপ অবস্থায় বিপ্রলম্ভ। "স চ পূর্ব্বরাগ মান প্রবাস করুণাত্মকশ্চতুর্দ্ধা স্যাৎ" অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ—এই চারি প্রকার বিপ্রলম্ভ।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই স্থায়ীভাব রতি আবার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রা ও কেবলা ভেদে দ্বিবিধ। গোকুলে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যা কেবলা রতি এবং বৈকুণ্ঠাদিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা মিশ্রা রতি। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা মিশ্র রতিতে প্রেমের বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না বলিয়া প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যা কেবলা রতিতে প্রেমের বৃত্তি সকল পরাকাষ্ঠা লাভ করে বলিয়া প্রেমের সঙ্কোচ বা বিকার দৃষ্ট হয় না।

এই শৃঙ্গার রস শ্যামবর্ণ ও ইহা বিষ্ণুদৈবত। পদ্মপুরাণে উল্লিখিত আছে যে লক্ষ্মী দেবী নারায়ণের পদসেবা করিতে করিতে তাঁহাকে লোলুপ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে থাকায় নারায়ণ কারণ জিজ্ঞাসা করায় লক্ষ্মী দেবী কহিলেন যে তোমার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে বিহার করিতে একান্ত অভিলাষী। নারায়ণ কহিলেন তাহা অত্যন্ত দুর্লভ। দ্বাপরে আমার অবতারে তুমি শ্রীরাধিকা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। তখন তোমার এ অভিলাষ পূর্ণ হইবে। এই কারণবশতঃ শৃঙ্গার রস শ্যামবর্ণ ও ইহাকে বিষ্ণুদৈবত বলা হয়।

হাস্য

"বিকৃতাকার বাগ্বেশ চেষ্টাদেঃ কুহকাদ্ভবেৎ।
হাসো হাস্য স্থায়িভাবঃ শ্বেতঃ প্রমথদৈবতঃ॥"

বিকৃত আকার, বাক্ বেশাদি চেষ্টা দ্বারা কুহকাদি হেতু যে ভাব সৃষ্ট হয় তাহাই হাস্যরস। হাস্য ইহার স্থায়ীভাব। দেবাদিদেবের অনুচরেরা ঐরূপ করিত বলিয়া ইহাকে প্রমথ দৈবত বলা হয় এবং ইহা শ্বেত বর্ণ।

করুণ

"ইষ্টনাশাদনিষ্টাপ্তেঃ করুণাখ্যোরসো ভবেৎ।
ধীরৈঃ কপোতবর্ণোয়ং কথিত যমদৈবতঃ॥"

ইষ্টনাশ বা অনিষ্ট ঘটিলে করুণ রস হয়। ইহার বর্ণ কপোত এবং ইহাকে যমদৈবত বলা হয়। ইহাকে যমদৈবত বলিবার হেতু এই যে শমন হইল বিচ্ছেদ মূলক। ইহার বর্ণ কপোত অর্থাৎ পাংশু। কপোত হইল অনিষ্টের দূত। পাংশু অর্থে পাপ। পশ্ (পীড়ন করা) বা পনস্ (নাশ করা) কুণ্।

রৌদ্র

"রৌদ্রঃ ক্রোধস্থায়িভাব রক্তো রুদ্রাধিদৈবতঃ।"

রৌদ্র রসে ক্রোধ স্থায়িভাব। ইহা রক্ত বর্ণ। কারণ ক্রোধে লোক রক্ত বর্ণ হয় এবং রুদ্রই হইল শত্রুর পীড়াদায়ক।

বীর

"উত্তম প্রকৃতিবীর উৎসাহ স্থায়িভাবকঃ।
মহেন্দ্রদৈবত হেম বর্ণোয়ং সমুদাহৃতঃ॥"

বীর রসে উৎসাহ স্থায়ীভাব। ইহাকে মহেন্দ্র দৈবত বলিবার হেতু ইন্দ্রই হইল বীর এবং তাহার বর্ণ হেম।

ভয়ানক

"ভয়ানকো ভয়স্থায়ি ভাবঃ কালাধিদৈবতঃ।
স্ত্রী নীচ প্রকৃতিঃ কৃষ্ণো মতস্তত্ত্ববিশারদৈঃ॥"

ভয়ানক রসে ভয় স্থায়ীভাব। এবং কাল হেতু নীচ প্রকৃতি গমন হয় বলিয়া ইহাকে কালদৈবত বলা হয় এবং ইহার বর্ণ কৃষ্ণ কারণ কালই কৃষ্ণ বর্ণ।

বীভৎস

"জুগুপ্সা স্থায়ি ভাবস্তু বীভৎসঃ কথ্যতে রসঃ।
নীলবর্ণো মহাকাল দৈবতোয়মুদাহৃতঃ॥"

বীভৎস রসে জুগুপ্সা স্থায়িভাব, যিনি শ্মশানচারী তিনিই মহাকাল। সেইজন্য ইহাকে মহাকালদৈবত বলা হয়। মহাকালই নীলকণ্ঠ সেই হেতু ইহার বর্ণ নীল।

অদ্ভুত

"অদ্ভুতো বিস্ময় স্থায়ীভাবো গন্ধর্ব্ব দৈবতঃ।
পীত বর্ণো বস্তু লোকাতিগমালম্বনং মতঃ॥"

অদ্ভুত রসে বিস্ময় স্থায়িভাব। অলোকসামান্য বস্তু আলম্বন বিভাব, ইহা পীতবর্ণ এবং গন্ধর্ব্ব দৈবত। গন্ধর্ব্বদিগের সমস্তই অলৌকিক বিস্ময়কর এবং তাহাদের বর্ণ পীত।

হাস্যাদি এই সাতটী রস হইল গৌণ রস। এক্ষণে শান্তাদি পাঁচটী মুখ্য রসের আলোচনা প্রয়োজন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী শান্তাদি পাঁচটী মুখ্য রসের স্থায়ী ভাব। এই স্থায়ীভাবসমূহ কার্য্য কারণ ও সঞ্চারিভাব দ্বারা সম্যক্ রূপে হৃদয়ে অনুভূত হইয়া অন্তঃকরণকে দ্রবীভূত করা হেতু রসে পরিণত হয়।

"কার্য্য কারণ সঞ্চারিরূপা অপি হি লোকতঃ।
রসোদ্বোধে বিভাবাদ্যাঃ কারণাখ্যেব তে মতাঃ॥"—অলঙ্কারশাস্ত্র

শ্রীভগবানের গুণাদি শ্রবণ মাত্র তাঁহাতে যে অবিচ্ছিন্ন মনের প্রবাহ রূপা গতি হয় উহাই ভাব বা ভক্তি। সেই হেতু দেখা যায় যে গতিরূপ তপরাশি মনরূপ চন্দ্রের আলয়ের সপ্তমে অবস্থিত। সপ্তম হইতে রতির বিচার। এবং শ্রবণ রূপ শ্রবণা নক্ষত্র এই তপ রাশির অধিপতি। ইহা আবার ধর্ম্মরাশিস্থ রোহিণী নক্ষত্রের সহিত সম্বন্ধবদ্ধ। ইহার দেবতা প্রজাপতি যিনি বীজ বপন করেন। বীজই জীবে পরিণত হয়। রোহিণী হইল চন্দ্রের জন্ম নক্ষত্র। শ্রবণা যাহার দেবতা বিষ্ণু পুনরায় ঈশ রাশিস্থ ভারতীদৈবত নক্ষত্রের সহিত সম্বন্ধবদ্ধ। এই ভারতীদৈবত নক্ষত্র হইল আর্য্যদিগের একাধারে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী।

যাহাতে এই ভাব বা ভক্তি অবস্থিত তিনিই ভাবুক। ভাবুক কে। যিনি ভাবে উক। যিনি ভাবের অধিকারী তিনিই রসের অধিকারী। কারণ ভাব বিনা রস হয় না এবং রস বিনা ভাব হয় না। "ন ভাবো হীনোস্তি রসো না ভাবো রস বর্জ্জিত।" এবং রসিক কে। যাঁহার মন হরিস্মরণে স—রস। জয়দেব বলেছেন—"হরি স্মরণে সরসং মনঃ"। এই ভাবেরই নামান্তর প্রেম। কিন্তু প্রেম কাম নহে। দুয়েতে তফাৎ যেমন লৌহ আর হেম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে স্থায়ীভাব রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা ভেদে দ্বিবিধা। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা রতিতে প্রেমের বৃত্তি সকল সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কিন্তু কেবলা রতিতে তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। কারণ কেবলার রীতি এই যে তিনি ঐশ্বর্য্য দেখিলেও মানেন না। দেবকী শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দর্শনে ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু যশোদা তাহা সত্ত্বেও তাঁহাকে বন্ধন করিতে যান, কিন্তু করেন নাই। ইহাই হইল কেবলা ভক্তি। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দর্শনে ভীত হইয়াছিল কিন্তু গোপবালকগণ তাঁহার স্কন্ধে উঠিতে দ্বিধা করেন নাই। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্যে ত্যাগ ভয়ে ভীতা হয়েন। কিন্তু শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শান্তরসে শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা। এই হেতু ইহাকে নারায়ণ দৈবত বলা হয়। কারণ তাঁহাতেই নিষ্ঠা।

দাস্য—ইহার গুণ সেবা। ইহা নিষ্ঠা ও সেবা জড়িতাবস্থা।

সখ্য—ইহার গুণ অসঙ্কোচ। ইহা নিষ্ঠা, সেবা ও অসঙ্কোচ জড়িতাবস্থা।

বাৎসল্য—ইহার গুণ মমতা। ইহা নিষ্ঠা, সেবা, অসঙ্কোচ ও মমতা-বিজড়িত অবস্থা। ইহাতে পুত্রবাৎসল্য স্থায়ীভাব। যেমন পদ্মের

অধ্যস্থিত কোমক পদ্ম পাপড়ি দ্বারা আবরিত সেইরূপ স্নেহের দ্বারা আলম্বিত বিষয় আবরিত। দেবী যশোদা লোক-পালনকে অবলম্বন করিয়া বাৎসল্য ভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। সেই হেতু এই রসকে লোক মাতর বলা হয়।

মধুর

ইহা নিষ্ঠা, সেবা, অসঙ্কোচ, মমতা ও আত্মনিবেদন অবস্থা।

আর্য্যসঙ্গীতে সপ্তস্বর ও দ্বাবিংশ শ্রুতি সমূহে এই সমস্ত রস ন্যস্ত করা হইয়াছে। শ্রুতিসমূহ জাতি হিসাবে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহারা যথা—

আয়তা, মৃদু, মধ্য, করুণা ও দীপ্তা। এই যে পঞ্চজাতি হিসাবে বিভক্ত করা হইয়াছে ইহাদের কারণ কি। ইহাদের কারণ ইহাদের বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যায় যে পাঁচটী মুখ্য রসের ভাব ব্যঞ্জন নিমিত্ত ইহাদের পঞ্চজাতি হিসাবে বিভাগ করা হইয়াছে।

আয়তা

আ + যম্ + ক্ত। যম্ অর্থে নিয়মিত সংযমিত। অর্থাৎ নিষ্ঠার সহিত যাহা সাধন করা যায় তাহাই শান্তভাবজ্ঞাপক। সেইজন্য ইহা হইল শান্তরস জ্ঞাপক।

মৃদু

মৃদ্ + কু। মৃদ অর্থে চূর্ণ হওয়া। সমস্ত অহং চূর্ণ করিয়া যে ভাব উদয় হয় তাহাই দাস্য। সেইজন্য ইহা হইল দাস্য বা সেবা ভাব নির্দ্দেশক।

মধ্যা

মন + যক্। মন অর্থে বোধ করা অর্থাৎ আত্মাকে যখন নিজরূপ বোধ করা যায় তখনই সখ্য ভাবের উদয়। সেই হেতু ইহা সখ্য বা অসঙ্কোচ ভাব প্রকাশক।

করুণা

কৃ + উনন্। কৃ অর্থে বিকীর্ণ করা, ছড়ান। যখন স্নেহ অপরে ছড়ান হয় তখনই বাৎসল্য ভাবের উদয় হয়। সেই হেতু ইহা বাৎসল্য ভাব জ্ঞাপক।

দীপ্তা

প্রজ্জ্বলিত, স্বর্গীয়। যখন সর্ব্বভাবযুক্ত সমিধ সহিত অগ্নিরূপী আত্মায় আধার রূপ অহমায় আহুতি প্রদান করা হয় তখনই তাহা দীপ্ত। সেই জন্য ইহা হইল আত্মনিবেদনের মধুর ভাব জ্ঞাপক।

এই কারণে অগ্নি দৈবত কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় মধুর ভাব জ্ঞাপক রাসলীলা কৃত হইয়া থাকে।

এই মধুর রসে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ, বাৎসল্যের মমতা ও কান্তার নিজাঙ্গ দ্বারা সেবন এই পঞ্চ গুণই দৃষ্ট হয়। সঙ্গীতে এই রসই বিশেষ ভাবে প্রদর্শিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু প্রচলিত সঙ্গীত এখন কণ্ঠের ব্যায়াম ক্রীড়ায় ও হস্তের কসরদে পরিণত হওয়ায় এই সমস্ত ভাবের ও রসের অভাবই পরিলক্ষিত হয়। সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য সেই পরব্রহ্মের স্বাদ আস্বাদন।

বস্তুতঃ সঙ্গীতের মাধ্যমে মধুরাদি রসের অলৌকিক আস্বাদ সময়ে দেশ অদৃশ্য হইয়া যায়, কাল বিন্দুতে পরিণত এবং বিশ্বের সমস্ত জাগতিক বস্তু তিরোহিত হয়। দর্শনাচার্য্য হেগেল বলেন—"Music is entirely independent of time and space"। এই সময়ে যোগীজন-বেদ্য এক অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। জীবনে যাহা পূর্ব্বে কখনও অনুভূত হয় নাই এইরূপ বর্ণনাতীত বিস্ময় বা অলৌকিক চিচ্চমৎকৃতি প্রতিক্ষণই এই অবস্থায় সমুৎপাদিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন রসেরই বৈখরী প্রকাশ স্বরূপ হওয়াই হইল সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য। দার্শনিক সোপেনহাওয়ার বলেন—"Music is an immediate revelation of the infinite Substance or "Thing-in-Itself," independent of phenomenal mediation"।

সঙ্গীতে যে রসের পরিবেশ হইয়া থাকে সেই রসই হইল ব্রহ্ম—রসো বৈ সঃ॥

শিবম্

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

২৪

সৌভরি মুনি

সৌভরি ঋষি জলমধ্যে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতেন। কিন্তু যোষিৎসঙ্গ-তৃষ্ণায় জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া পঞ্চাশৎ রাজকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। বহুকাল স্ত্রীসঙ্গ ভোগেও তাহার তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হওয়ায় তিনি পুনরায় সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। ভোগের দ্বারা রাগের শান্তি হয় না। প্রকৃতি ও তাহার কার্য্য উভয়ের দোষ-দর্শন করিবার পরে সৌভরি মুনির রাগের শান্তি হইয়াছিল।

ন ভোগাৎ রাগশান্তিঃ মুনিবৎ।

দোষ দর্শনাৎ উভয়োঃ।

সাং কা—৪।২৭-২৮

২৫

মোহগ্রস্ত অজরাজ

প্রিয়পত্নী ইন্দুমতীর বিরহে শোকতপ্ত অজরাজকে কুলগুরু বশিষ্ঠ অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ফলোদয় হয় নাই। মলিন চিত্তে উপদেশ-বীজ অঙ্কুরিত হয় না।

মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিম্বের আভাস মাত্রও দৃষ্ট হয় না, তেমনি মলিন চিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের আভাস স্ফুরিত হয় না। চিত্তের মালিন্য দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবে।

ন মলিনচেতসি উপদেশবীজপ্ররোহঃ অজবৎ।

সাং সূ—৪।২৯

নাভাসমাত্রমপি মলিনদর্পণবৎ। সাং সূ—৪।৩০

২৬

পঙ্ক ও পঙ্কজ

কোনও বস্তু হইতে যখন অন্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, তখন দ্বিতীয় বস্তু সকল সময়ে প্রথম বস্তুর স্বরূপ হয় না। পঙ্ক হইতে পঙ্কজের উৎপত্তি হইলেও উভয়ের মধ্যে স্বরূপতা নাই। সংসার মলিন বটে, কিন্তু সেই সংসারে উৎপন্ন সকলেই যে মলিন-চিত্ত হইবে, কেহই মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে না, তাহা নহে। মলিন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া অনেকে মোক্ষলাভ করিয়াছেন।

ন তজ্জস্যাপি তদ্‌-রূপতা পঙ্কজবৎ। সাং সূ—৪।৩১

২৭

দেবগণের অকৃত-কৃত্যতা

উপাস্য দেবতাগণ যেমন অণামাদি সিদ্ধিলাভ করিয়াও কৃতকৃত্য হন নাই, তেমনি তাহাদের উপাসনা দ্বারা যে সকল বিভূতি লাভ হয়, তাহা দ্বারাও জীব কৃতকৃত্য হয় না।

ন ভূতিযোগেঽপি কৃতকৃত্যতা উপাস্য সিদ্ধিবৎ

সাং সূ—৪।৩২

২৮

গোবৎস ও পুরুষ

বৎসের পোষণের জন্য, গাভীর স্তন হইতে যেমন অচেতন দুগ্ধ ক্ষরিত হয়, তেমনি পুরুষের মোক্ষসাধনের জন্য প্রধানের স্বতঃই প্রবৃত্তি হয়। দুগ্ধ আপনা হইতে ক্ষরিত হয়। তাহার লক্ষ্য যদিও বৎসের পোষণ, তথাপি এই উদ্দেশ্য সচেতনভাবে গাভীর মনে উদিত হয় না। প্রকৃতির মধ্যেও পুরুষের মোক্ষসাধনের জন্য কোনও সচেতন উদ্দেশ্য থাকা সম্ভবপর নহে, কেননা প্রকৃতি অচেতন। তাহা হইলেও পুরুষের মোক্ষের জন্য আপনা হইতেই প্রকৃতির মধ্যে চেষ্টার উদ্ভব হয়।

বৎস-বিবৃদ্ধি-নিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিঃ অজ্ঞস্য।

পুরুষ-বিমোক্ষ-নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য।

সাং কা—৫৭

২৯

ঔৎসুক্যনিবৃত্তি ও পুরুষের মোক্ষের জন্য প্রকৃতির চেষ্টা

মনে কোনও বস্তুপ্রাপ্তির জন্য ঔৎসুক্য হইলে, তাহা পাইবার জন্য লোকে যে ভাবে চেষ্টা করে, সেইভাবেই প্রকৃতি পুরুষের বিমোক্ষের জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতি

[প্র]য়োজন। সুতরাং পুরুষের মোক্ষসাধনের জন্য কোনও [অ]চেতন ইচ্ছা তাহার নাই।

ঔৎসুক্য-নিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে লোকঃ।
পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বৎ অব্যক্তং।
সাং কা—৫৮

৩০

নর্ত্তকী ও প্রকৃতি

রঙ্গালয়ে দর্শকদিগকে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া নর্ত্তকী যেমন নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তেমনি প্রকৃতি পুরুষকে আপনার রূপ প্রদর্শন করিয়া নিবৃত্ত হয়।

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ।
সাং কা—৫৯

৩১

প্রকৃতির পরার্থপরতা

পুরুষ প্রকৃতির কোনও উপকার করে না। তবুও প্রকৃতি নানাবিধ উপায়ে পুরুষের উপকার করে। পুরুষ গুণহীন, কিন্তু প্রকৃতি গুণবতী। এই গুণহীন পুরুষের অর্থ প্রকৃতি নিঃস্বার্থভাবে সাধন করে।

নানাবিধৈঃ উপায়ৈ উপকারিণি অনুপকারিণঃ পুংসঃ
গুণবত্যগুণস্য সতঃ তস্যার্থং অপার্থকং চরতি।
সাং কা—৬০

৩২

প্রকৃতির লজ্জাশীলতা

প্রকৃতি অতিশয় লজ্জাশীলা। তাহা অপেক্ষা অধিকতর লজ্জাশীলা কেহ নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস। কুলবধূ যেমন পরপুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবামাত্রই লজ্জা-বশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, আর বাহির হয় না, প্রকৃতিও তেমনি পুরুষ কর্ত্তৃক একবার দৃষ্ট হইয়াই, "আমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে" ভাবিয়া পুরুষের দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া যায়। আর তাহার সম্মুখে আসে না।

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতিঃ ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনঃ ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য। সাং কা—৬১

৩৩

তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরে পুরুষের প্রেক্ষক রূপ

তত্ত্বাভ্যাসের ফলে বিমল জ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রকৃতি তাহার প্রসবকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়। ভোগ-ও-বিবেক-সাক্ষাৎকার এই দুইটিই প্রকৃতির প্রসবের বিষয়। প্রথমে ভোগ, পরে বিবেক সাক্ষাৎকার যখন শেষ হয়, তখন প্রকৃতির প্রসোতব্য আর কিছুই থাকে না, সুতরাং প্রকৃতি প্রসব কার্য্য হইতে তখন নিবৃত্ত হয়। বিবেক-জ্ঞান রূপ যে অর্থ তাহার ফলে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য—এই সপ্তরূপ-বিবর্জ্জিত অবস্থায় প্রকৃতিকে তখন পুরুষ দর্শন করেন এবং তিনি সুস্থ হইয়া প্রেক্ষকবৎ অবস্থান করেন।

প্রেক্ষকের সহিত এই উপমাটি খুব সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতি কোনও পুরুষ সম্বন্ধে যখন নিষ্ক্রিয় হয়, তখন পুরুষের দেখিবার শক্তিই থাকে না। সুতরাং তখন তাহাকে প্রেক্ষক বলা যায় না। সেইজন্য বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, তখনও কিছু সাত্ত্বিক বুদ্ধি পুরুষে যুক্ত থাকে, রজঃ ও তমঃ কর্ত্তৃক কলুষিত বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত না হইলেও কিঞ্চিৎ সাত্ত্বিক বুদ্ধি পুরুষের যুক্ত থাকে।

তেন নিবৃত্ত-প্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপ-বিনিবৃত্তাম্
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ।
সাং কা—৬৫

তত্ত্বজ্ঞানী

পুরুষ রঙ্গালয়ে প্রেক্ষ রূপ।

সাংখ্যদর্শনে বন্ধ ও মুক্তি

বন্ধ ও মুক্তিই সাংখ্যদর্শনের প্রধান কথা। বন্ধের অর্থ দুঃখ-সংযোগ। ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাতে জীব অবসন্ন। এই দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় নির্দেশ করাই সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য। দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় জানিতে হইলে দুঃখের উৎপত্তি কেন ও কিরূপে হয়, তাহা জানার প্রয়োজন। তাই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে কিরূপে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে—জীবসমন্বিত জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে।

সাংখ্য মতে মূল বস্তু দ্বিবিধ—প্রকৃতি ও পুরুষ; প্রকৃতি অচেতন, পুরুষ চেতন। প্রকৃতি এক, তাহা হইতে এই

জীবোপেত জগতের উদ্ভব হয়। পুরুষ বহু, তাহা হইতে কিছুই উদ্ভূত হয় না। "অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ ইতি" (সাং সূ—১।১৫)। পুরুষ বা আত্মা সর্ব্বপ্রকার সঙ্গবর্জ্জিত ও নির্গুণ। প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বন্ধও নাই, মোক্ষ ও নাই।

তস্মাৎ ন বধ্যতে, ন মুচ্যতে, নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে, মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ।
সাং কা—৬২

পুরুষের বন্ধও নাই, মুক্তিও নাই, জন্মান্তরও নাই। জন্মান্তর, বন্ধ ও মুক্তি হয় নানা পুরুষোশ্রিত প্রকৃতির। (বন্ধ-মোক্ষ-সংসারাঃ পুরুষে উপচর্য্যন্তে—তত্ত্বকৌমুদী ৬২)। কিন্তু এই কারিকার পূর্ব্বের এক কারিকায় আছে—

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যানিবৃত্তেঃ, তস্মাৎ দুঃখং স্বভাবেন। সাং কা—৫৫

লিঙ্গদেহের অনিবৃত্তিবশতঃ দেহে অবস্থিত চেতন পুরুষ অবশ্যম্ভাবী জরা ও মৃত্যু নিবন্ধন দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। লিঙ্গদেহে আত্মবোধহেতু এই দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই আত্মবোধ বিনষ্ট হইলে দুঃখেরও বিনাশ হয়। এই দুঃখই বন্ধ। ইহারই কয়েক শ্লোক পরে উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে বলা হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে বন্ধ প্রকৃতির, পুরুষের নহে। দুই সূত্রের মধ্যে বিরোধ সুস্পষ্ট। কিন্তু বন্ধ যদি পুরুষের না হয়, তাহা হইলে—

বৎসবিবৃদ্ধি-নিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষ-বিমোক্ষ-নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য।
সাং কা—৫৭

এই কারিকায় যে "পুরুষ-বিমোক্ষে"র কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ কি? বৎস-বিবৃদ্ধির জন্য যেমন অচেন গাভী-দুগ্ধ আপনা হইতে ক্ষরিত হয়, সেইরূপ পুরুষের—মোক্ষের জন্য প্রধানের (প্রকৃতির) চেষ্টা আপনা হইতেই উপজাত হয়। প্রকৃতি প্রথমে পুরুষকে বশ করে, পরে তাহার মুক্তির জন্য চেষ্টা করে। ৬২ কারিকায় বলা হইয়াছে প্রকৃতির চেষ্টার ফলে প্রকৃতি নিজেই বশ হয়। মুক্তও হয় প্রকৃতি। পুরুষ চিরকালই মুক্ত। তাহার বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই। তাহার পরিণাম বা পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। এই জন্যই বলা হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বন্ধ ও নাই, মোক্ষও নাই। কিন্তু তাহা যদি না থাকে, তাহা হইলে সমগ্র সাংখ্যদর্শন "অপার্থ" (নিরর্থক) হইয়া পড়ে। পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ না হইলে বন্ধ হয় না। এই সংযোগ স্বীকার করিতে সাংখ্যকার কুণ্ঠিত। কেননা তাঁহাকে মতে "চিতিশক্তি অপরিণামী" এই তথাকথিত সংযোগকে "সান্নিধ্য" মাত্র বলা হইয়ছে। এই সান্নিধ্যবশতঃ বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয় এবং পুরুষে বুদ্ধির প্রতিবিম্ব পতিত হয় বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রতিবিম্ব-পাতের ফলেই হউক, অথবা বুদ্ধির সহিত পুরুষের প্রকৃত সংযোগের ফলেই হউক, বুদ্ধিতে উপজাত দুঃখ ও অন্যান্য ভোগ যদি পুরুষকে স্পর্শই না করে, তাহা হইলে পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষের কথা উঠিতে পারে না। আর অচেতন প্রকৃতির বন্ধ কি, তাহাও বোধগম্য হয় না। চৈতন্য-রূপীপুরুষের আলো প্রকৃতির উপর পতিত না হইলে বুদ্ধি, অহংকার ইন্দ্রিয়াদির উদ্ভব হয় না। কিন্তু বুদ্ধি, অহংকার, ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পুরুষের উপর কোন ক্রিয়াই উৎপন্ন হয় না বলিলে সাংখ্যদর্শনের প্রয়োজনই অস্বীকৃত হয়। পুরুষের ভ্রান্তি হয়, পুরুষে অহংকারের উদ্ভব হয় এবং পুরুষ আপনাকে বুদ্ধির সহিত অভিন্ন মনে করিয়া বুদ্ধিতে অনুভূত সুখ দুঃখ নিজে অনুভব করে, ইহা স্বীকার না করিলে বন্ধও মোক্ষের কোনও অর্থই হয় না। এইজন্যই পাতঞ্জল-সূত্রে ব্যুত্থানকালে বুদ্ধির সহিত পুরুষের বৃত্তি সারূপ্য স্বীকৃত হইয়াছে। "বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র" (পাঃ সূঃ ১।৪) পুরুষ যখন স্বরূপে অবস্থান করে না, তখন চিত্তের সহিত তাহার বৃত্তি-সারূপ্য হয়; অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি ও পুরুষের বৃত্তি এক-প্রকার হয় এবং চিত্তে যে দুঃখ উদিত হয়, পুরুষ তাহা নিজের দুঃখ বলিয়া অনুভব করে। এই দুঃখ-ভোগই বন্ধ। পুরুষ যখন সমাধিকালে স্বরূপে অবস্থান করে, তখন অহংকার মুক্ত হয় এবং চিত্তের সহিত তাহার সংশ্রব থাকে না, কিন্তু অন্য সময়ে "একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্ (দর্শন=চৈতন্য, খ্যাতি=বুদ্ধিবৃত্তি। চৈতন্য ও বুদ্ধিবৃত্তি অভিন্ন) পঞ্চশিখের এই সূত্রানুসারে পুরুষ আপনাকে বুদ্ধির সহিত অভিন্ন মনে করে এবং বুদ্ধির দুঃখকে নিজে অনুভব করে। এই অনু-ভূতি হইতে মুক্তিই মোক্ষ। এই দুঃখানুভূতি সত্য এবং বিবেকজ্ঞান দ্বারা ইহা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সুতরাং সাংখ্যকারিকার "ন বধ্যতে, ন মুচ্যতে, ন সংসরতি (৬২)

এই কারিকার উপর শুরুত্ব আরোপ করা যায় না। লিঙ্গদেহ জরা-মরণ-দুঃখ ভোগ করিতেছে। পুরুষ এই দুঃখকে তাহারই মনে করিতেছে—কেননা তাহার বোধ বুদ্ধির বোধের সহিত অভিন্ন। লিঙ্গদেহের ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত এই বোধ থাকে। পুরুষে দুঃখের অনুভূতি যদি না থাকিত, বুদ্ধির সহিত তাহার বৃত্তি-সারূপ্য যদি সত্য না হইত, তাহা হইলে সর্ব্বদাই পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করিত। বন্ধও মোক্ষের কথা উঠিত না। বন্ধ, মোক্ষ, জন্মান্তর যদি কেবল লিঙ্গ শরীরেরই হয়, পুরুষ সর্ব্বদাই স্বরূপ অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে যাহার মোক্ষ হয়, তাহার ঐকান্তিক বিনাশ বা "সর্ব্বোচ্ছিত্তি"ই মোক্ষ।

সাংখ্যসূত্রে বন্ধ সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা এই : "ন স্বরূপতঃ বদ্ধস্য মোক্ষ সাধনোপদেশবিধি—" সাং সূ ১।৭ পুরুষ স্বরূপতঃ বদ্ধ নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তাহার মোক্ষসাধনের উপদেশ বৃথা হইত।

স্বভাবস্য অনপায়িত্বাৎ অনুষ্ঠান-লক্ষণম্ অপ্রমাণ্যম্।
নাশক্যোপদেশবিধিঃ উপদিষ্টেঽপি অনুপদেশঃ॥

সাং সূ—১।৮-৯

কেননা, যাহার যাহা স্বভাব, তাহা কখনও অপগত হয় না। তাহার স্বভাবের বিনাশের সঙ্গে তাহার নিজেরই বিনাশ হয়। আত্মা যদি স্বরূপতঃ বদ্ধ হইত, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে মোক্ষসাধনের উপায় বর্ণিত আছে, তাহার অনুষ্ঠান নিষ্ফল হইত। আবার যাহা অসাধ্য, তাহার সাধনের জন্য উপদেশ পালন করা অসম্ভব। তাহার জন্য উপদেশ দেওয়া না দেওয়ারই সমান।

শুক্ল-পট-বীজবৎ চেৎ। (সাং সূ—১।১০)

শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ (সাং সূ—১।১১) সত্য বটে শুক্লপটের উপর অন্য বর্ণের প্রয়োগ করিলে, তাহার শুক্লত্ব বিদূরিত হয়। আবার অগ্নিদগ্ধ বীজেরও অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বস্তুর স্বভাবের বিনাশ প্রমাণিত হয় না। বস্তুর এক প্রকার শক্তির উদ্ভব এবং অন্যপ্রকার শক্তির অপ্রকাশ প্রমাণিত হয়। পটের শুক্লত্ব ধর্ম্ম তিরোহিত হয়, অন্য ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। বীজেরও অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি তিরোহিত হয়। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে রজক ঐ রঞ্জিত বস্ত্রকে পুনরায় শুক্ল করিতে পারিত না এবং যোগিগণ অগ্নিদগ্ধ বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপাদন করিতে পারিতেন না। এই দুই স্থলে যাহা অসাধ্য, তাহা সাধিত হয় না।

বন্ধ যদি পুরুষের স্বভাবসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহার উদ্ভব হয় কিরূপে ?

ন কালযোগতঃ ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ।

সাং সূ—১।১২

ন দেশ-যোগতোঽপি অস্মাৎ। সাং সূ—১।১৩

কালের ও দেশের সহিত সংযোগবশতঃ পুরুষের বন্ধ হয় না। পুরুষ নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ; সুতরাং সর্ব্বকালের সহিতই নিত্য সংযুক্ত। সে সংযোগের বিনাশ হইতে পারে না।

ন অবস্থাতো, দেহধর্ম্মত্বাৎ তস্যাঃ। সাং সূ—১।১৪

ন কর্ম্মণা অন্যধর্ম্মত্বাৎ অতি প্রসক্তেশ্চ। সাং সূ—১।১৬

বিশেষ অবস্থায় পতিত হইয়া যে আত্মার বন্ধ হয়, তাহাও নহে, কেননা অবস্থা দেহেরই ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে। আত্মা অসঙ্গ ও অপরিণামী। কর্ম্মদ্বারাও আত্মার বন্ধ হয় না, কেননা কর্ম্ম স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে। কর্ম্মকে আত্মার ধর্ম্ম বলিলে অতি-প্রসক্তি দোষ হয়।

বিচিত্র ভোগানুপপত্তিঃ অন্য-ধর্ম্মত্বে (সাং সূ—১।৩৭) এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন, দুঃখ তো চিত্তের ধর্ম্ম। তবে তাহাকে পুরুষের ধর্ম্ম বলা হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। দুঃখকে যদি শুধু চিত্তধর্ম্ম বলা যায়, তাহা হইলে বিচিত্র সুখের অনুপপত্তি হয়। প্রত্যেক জীবের সুখদুঃখ অন্যান্য জীবের সুখদুঃখ হইতে ভিন্ন দেখা যায়। "ভোগ" অর্থে যদি কেবল সাক্ষাৎকার ধরা যায়, দুঃখযোগ অর্থে যদি কেবল দুঃখ সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক চিত্তের দুঃখের সহিত সকল পুরুষেরই সাক্ষাৎকার হইতে পারে, কোন্ পুরুষের কোন্ দুঃখ, তাহার নিয়ামক কিছুই থাকে না। সুতরাং দুঃখযোগরূপ বন্ধ যে পুরুষের, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে বুদ্ধিতে উদ্ভূত দুঃখ পুরুষের দুঃখে পরিণত হইতে পারে, বিজ্ঞান ভিক্ষু তাহার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক পুরুষের উপাধি চিত্তের দুঃখ পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়, ইহার কোনও

সুবোধ্য অর্থ পাওয়া যায় না। আবার সেই প্রতিবিম্ব হইতে অসঙ্গ পুরুষে দুঃখবোধ উৎপন্ন হইতে পারে কিরূপে, তাহাও বোঝা সহজ নহে। এই জন্যই বোধ হয় সাংখ্য-কারিকার ৬২ কারিকাতে বলা হইয়াছে যে পুরুষের বন্ধ বাস্তবিক নাই। বিজ্ঞান ভিক্ষু বুঝিয়াছিলেন পুরুষের দুঃখযোগ প্রকৃত, ইহা স্বীকার না করিলে সমগ্র সাংখ্যদর্শন ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু পুরুষের যে সংজ্ঞা সাংখ্যদর্শনে আছে, তাহাতে তাহার দুঃখের সহিত সংযোগ অসম্ভব। ইহার পরে সাংখ্য সূত্রে আছে—"প্রকৃতি নিবন্ধনাৎ চেৎ, ন, তস্যাপি পারতন্ত্র্যম।" (সাং সূ—১।১৮) প্রকৃতি কর্তৃকও আত্মার বন্ধ হইতে পারে না, কেননা প্রকৃতি পরতন্ত্র। এখানে "পারতন্ত্র্যঃ" শব্দের অর্থ বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে "সংযোগ-পারতন্ত্র্যম্", বন্ধকত্বে সংযোগ পারতন্ত্র্য, যাহার কথা পরবর্ত্তী সূত্রে বলা হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত বিশেষ প্রকারের সংযোগ ব্যতীত পুরুষের বন্ধ হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে প্রলয়কালেও দুঃখবন্ধ হইতে পারিত। তখন সংযোগ থাকে না, কিন্তু প্রকৃতি থাকে। কিন্তু "পর" শব্দে এখানে "পর আত্মা" বলা যাইতে পারে। প্রকৃতি পরমাত্মা বা ঈশ্বরের অধীন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রকৃতিকে মায়া এবং মহেশ্বরকে মায়ী বলা হইয়াছে। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরং। (৪।১০)। তাহাকেই আবার পরবর্ত্তী এক শ্লোকে (৫।৫)। "সংযোগ-নিমিত্ত হেতুঃ" বলা হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের ৫৫ সূত্রে প্রকৃতিকে "পরবশ" বলা হইয়াছে (অকার্য্যত্বেঽপি তদ্‌যোগঃ পারবশ্যাৎ)। এখানে অনিরুদ্ধ "পরঃ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "আত্মা", যিনি সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বকর্ত্তা (৩।৫৬)। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও 'পারতন্ত্র্যম্" শব্দের অর্থ পরমাত্মা করা সঙ্গত। সাংখ্যসূত্রের সকল সূত্রই মহর্ষি কপিলের প্রণীত নহে, ইহা মনে করিবার কারণ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সূত্রটি মৌলিক সাংখ্যসূত্রে ছিল বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। ইহাতে ঈশ্বরের স্বীকৃতি আছে।

কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুরে ১২৬১ সালে ৪ঠা মাঘ কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

> 'ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা ভাওয়াল আমার প্রাণ।'
> শত স্বর্গ শত কাশী তার চেয়ে ভালবাসি,
> ওই যে অরণ্য-পূর্ণা জননী আমার।
> শত গঙ্গা হতে ভাই পুণ্যতোয়া ও'চিনাই'
> শত ঘাট ওর তীরে মণিকর্ণিকার।

নির্ব্বাসিত নির্য্যাতিত স্বদেশপ্রাণ কবির শতবার্ষিকী জন্মোৎসব হইয়া গেল। তাঁহার কয়েকজন ভক্ত ও কতকগুলি যুবকের উৎসাহে!

গোবিন্দচন্দ্রের কবি-প্রতিভা অনন্যসাধারণ—তিনি খাঁটি বাঙালী কবি। তাঁর অমার্জ্জিত কবিতারাজি "খনির মণির মত ম্লান মনোহর" এমন সহজ সরল উপমা, এমন স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুপ্রাস, ভাষার এমন লালিত্য, অনুভূতির এমন তীব্রতা ও নিবিড়তা সুদুর্লভ।

তিনি বিশেষ করিয়া প্রেমের কবি, যৌবনের কবি। তাঁহার প্রিয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

> "আমি তারে ভালবাসি রক্তমাংস সহ"
> সে সলাজ হাসি মুখ কিবা লাল টুক টুক
> খেয়েছি স্বর্গের সুধা প্রত্যেক চুম্বনে,
> উন্মত্ত ঝটিকা দিয়া আস্ফালিয়া আলিঙ্গিয়া,
> ঢেলে দিল পদ্মবন প্রতি আলিঙ্গনে।
> যতদিন বেঁচে থাকি রাখিব স্মরণে।"

অন্য কবিতায়—

> সে করেনি বি-এ পাস,
> বেথুন-কেতনে বাস,
> করেছে বাসর-বাস বিয়ে ফাঁসে হায়,
> সে পড়েনি ক্লিওপেট্রা,
> মেরী রাণী এট্রসেট্রা
> প্রকৃত প্রণয় বল শিখিবে কোথায়?

তাঁহার "আয় বালিকা খেল্‌বি যদি এ এক নূতন খেলা" 'কারে বেশী ভালবাসি কে বেশী সুন্দর?'. 'আয়রে ভোলা আমার কাছে আমার কাছে

আয়' 'জালিয়া যুবতী' 'বিক্রমপুরে বসন্ত' 'উলঙ্গ রমণী' প্রভৃতি অসংখ্য কবিতায় কিছু অশ্লীলতার ছাপ আছে সত্য, কিন্তু সেগুলি "কিউপিড ও সাইকীর" ছবির ন্যায় অপরূপ। তখনকার দিনে এই রুচি লইয়া বেশ হৈ চৈ উঠিয়াছিল। ইহার প্রতিবাদে 'নব্যভারতের' তেজস্বী ও Puriton সম্পাদক যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

"গোবিন্দচন্দ্রের ন্যায় চরিত্রবান ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। গোবিন্দচন্দ্র দরিদ্র, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গবাসী, এজন্য এক শ্রেণীর হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি রুচি ধরিয়া তাঁহাকে কাব্যজগৎ হইতে অপসৃত করিবার চেষ্টায় আছেন। রবীন্দ্রনাথের রুচি ধরিয়া ভয়ে কেহ কথা বলিতে সাহসী হইল না, কিন্তু দরিদ্র গোবিন্দচন্দ্রকে লইয়া কেহ কেহ বড়ই মাথা ঘুরাইতেছেন। গোবিন্দচন্দ্রকে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়া ক্লান্ত হইয়াছি তিনি কিছুতেই কাহারও কথায় চলিতে চান না। ফুল ফোটে, চাঁদ হাসে, পাখী গায়, সাগর গর্জ্জন করে—কাহারো কথা মানে না, কবি সেই তালে যখন তাল মিলাইয়া জগতের উপর উঠেন তখন তিনি কেন জগতের কথা শুনিবেন? গোবিন্দচন্দ্র স্বাধীন স্বভাব কবি।"

শত নিন্দায় অবিরল গোবিন্দচন্দ্র ঐ সব রুচিবাগীশদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"রুচি ফোবিয়ার আমি ফরাসা পাস্তর।"

কবি দেহাতীত প্রেমের কথা ও বলিয়াছেন—

"সেই মম নববর্ষ আনন্দ আহ্লাদ হয়,
বিনোদ বৈশাখে নব চম্পক চন্দন।
উষার কদম্ব কেলি, সাঁজের ফুটন্ত বেলি,
নিক্ত-বেণামূল-গন্ধী শীত সমীরণ।
সেই মম প্রিয় নারী নবীন মেঘের বারি,
অবনীতে শ্যাম শোভা করে আনয়ন।
শিখী নাচে, পাখী গায় আনন্দে চাতক ধায়
উল্লাসে ভরিয়া যায় সমস্ত অবনী।"

তার পর তাঁর দুই পত্নী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"প্রেমদা পদ্মার কূলে কোমল শেফালী ফুলে
করিয়া বাসর সজ্জা ডাকিছে আমায়।
"সারদা" চিনাই তীরে আম কাঠ দিয়া শিরে
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা বিছানায়।
নাহি নিশি নাহি দিন, দুজনেই নিদ্রাহীন,
দুই দিকে দুই সিন্ধু গজ্জিছে সমানে,
পাষাণ হৃদয় স্বামী 'পানামা' যোজক আমি
ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নামি দুজনার বাণে।

গোবিন্দচন্দ্র একদিকে গোঁয়ার গোবিন্দই ছিলেন, তাঁর কুসুমবর্ষী লেখনী সময় সময় অনলবর্ষী হইয়া উঠিত। বাঁশী সহসা অসি হইয়া দাঁড়াইত। পরাধীন দেশে অত বড় গণতান্ত্রিক মন বিস্ময়ের বস্তু। তিনি বলিতেন "আমার বিচার কর জনসাধারণ।" তাঁহার অনমনীয় তেজস্বিতা তাঁহার যত দুঃখ কষ্টের মূল। তিনি অন্যায় অত্যাচার ও অসত্যের সঙ্গে আপোষ করিতে শিখেন নাই। এই উদযান-বোমা ও দারুণ গণতন্ত্রের যুগেও দেখি—ব্যক্তি কি জাতি তো দূরের কথা, অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করিতে না পারিলে রাষ্ট্রও অচল। ফরমোজাকে (Formosa) পৃথক চীন স্বীকার করিয়া সন্ধি না করিলে, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও ধ্বংস অনিবার্য্য। গোবিন্দচন্দ্রকে ঐরূপ কিছু করিতে বলিলে করিতেন না, বরং আত্মহত্যা করিতেন। এরূপ বিপদজনক প্রকৃতির লোক শান্তি স্বস্তি কেমন করিয়া পাইবেন? তিনি বলিতেন—"ধনু রাশিতে আমার জন্ম তাহার ফলও তদনুরূপই পাইতেছি। একটা তীর ও ধনু লইয়া জীবনভরা যুদ্ধই করিলাম।

গোবিন্দচন্দ্রের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান বড় প্রবল ছিল। বড়লোককে তিনি এড়াইয়া চলিতেন। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিতে সাহসী হন নাই। অথচ তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে কি গভীর ভক্তি করিতেন। তাঁহার বিয়োগে এমন এক কালজয়ী কবিতা লিখিয়াছিলেন যাহার তুলনাই হয় না।

"সায়াহ্ন ছাব্বিশে চৈত্র তেরশত সন
একপায় দুইপায় বসন্ত চলিয়া যায়
শ্যাম মমতায় মেগে বন উপবন।" ইত্যাদি

কবি খাঁটি স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। উৎপীড়িত ও অত্যাচারিতের বন্ধু ছিলেন। পরের জন্যই তাঁর দুর্ভোগ। দেশ ও জাতির প্রত্যেক হিতকর আন্দোলনে তিনি যোগ দিতেন। তাঁহার শাণিত ও অননুকরণীয় শ্লেষ ও বিদ্রূপে সব সামাজিক অত্যাচার ও অনাচার প্রশমন করিবার চেষ্টা করিতেন।

তিনি তাঁহার যোগ্য সম্মান পান নাই, কিন্তু তাঁহার কবিপ্রতিভা সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছিল। দেশজোড়া নাম হইয়াছিল।

কবির চির-মেঘাচ্ছন্ন জীবন আকাশে 'নব্যভারত' সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের অক্লান্ত প্রীতি ও অকৃপণ আনুকূল্যের স্মৃতি রামধনুর ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া আছে।

কবি দেহত্যাগ করেন ১৩২৫ সালে; তাঁহার বন্ধু কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ লেখেন—

"গোবিন্দদাস চলে গেছে আসবে না সে আর,
ভাতের অভাব ঘুচলো এবার, ঘুচলো হাহাকার।
মাসের ভেতর বেশীর ভাগই থাকতো চিঁড়ে খেয়ে,
জীবনভরা জীবন জ্বালা দেখলে না কেউ চেয়ে।"

আর দরদী কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিলেন—

"এই দুনিয়ার একটী কোণে কাঁটার বনে জন্মেছিল সে,
ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডেরায় কাঁটার মাল্য গলে।
পাতায় চাপা গন্ধটুকুন পূবে হাওয়ায় বেরুলো নীড় ত্যেজে,
পাথর-চাপা রইল কপাল, বাদলা করে রইলো চোখের জলে।
মরমী কেউ বাসতো ভাল, কল্পনা তা দেখতো প্রীতির চোখে,
গান গেয়ে সে গেছে চলে—রেশ রয়েছে সারা দেশের বুকে।"

এখনকার পাঠকপাঠিকাদিগকে গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার অশ্রুসিক্ত জীবন কাহিনী, তাঁহার তেজোগর্ভ কবিমানস তাঁহাদের আলোচনারযোগ্য। তাঁরা আনন্দিত ও উপকৃত দুইই হইবেন। কবি অমর কীর্ত্তি রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় কবির চিতার উপর মর্ম্মর মঠ উঠাই উচিত। অন্য দেশ হইলে এতদিন হয়ত উঠিত। আমরা তাঁহার জন্য কিছুই করি নাই।

প্রতিভা-পরিচিতি

সুরশিল্পী বেঠোফেন

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চরিত্রবলে যাঁরা বলীয়ান, নিজেদের প্রতিভা সম্বন্ধে যাঁরা আত্মপ্রতিষ্ঠ, পৃথিবীতে নিজেদের মূল্য সম্বন্ধে তাঁদের সচেতনতা বিস্ময়ের বস্তু নয়। তাঁদের গর্ব্ব অন্তঃসারশূন্য দাম্ভিকের আত্মশ্লাঘা নয়, তা তাঁদের বিরাট ব্যক্তিত্বের সহজাত প্রকাশ। কীট্‌স ঘোষণা করেছিলেন, মৃত্যুর পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে তাঁর আসন সুনির্দ্দিষ্ট থাকবে, শেক্সপীয়র নিজের অমরত্ব সম্বন্ধে নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সদ্য-স্বর্গত আইনস্টাইন বহুদিন আগেই বলেছিলেন, বিজ্ঞানের খুঁটি নাটি মানুষ হয়ত ভুলবে, কিন্তু তাঁকে মনে রাখবার মানুষের অভাব হবে না এ জগতে।

অমর সুরশিল্পী লাড্‌উইগ ফন বেঠোফেনের জীবনেও এই আত্ম-প্রত্যয়ের প্রকাশ দেখা গেছে একাধিকবার।

একদা দুই বন্ধু সহরের পথ অতিক্রম করছেন। দুই বিরাট প্রতিভাধর ব্যক্তি, বেঠোফেন ও গ্যেটে। হঠাৎ দেখা গেল, পথের অপরদিক থেকে এগিয়ে আসছে রাজকীয় শকট। গাড়ীর উপর স্বয়ং সম্রাট আসীন। গাড়ীর পুরোভাগে রয়েছে বিচিত্র বর্ণাঢ্য ভূষণে সজ্জিত অশ্বারোহীর দল। উভয়েই থমকে দাঁড়ালেন। বেঠোফেন কী একটা প্রশ্ন করলেন বন্ধু গ্যেটেকে। কিন্তু গ্যেটের তখন উত্তর দেবার সময় কোথায়? সামনে এসেছে রাজার গাড়ী! তিনি টুপী খুলে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হেঁটমাথা বন্ধুর ভাবাতিশয্য দেখে বিরক্ত হলেন বেঠোফেন। উত্তপ্ত হল মন। কেনই বা এতখানি নুয়ে পড়া! আমিই কি কম! মাথার টুপী মাথায় রইল, সোজা এগিয়ে গেলেন বেঠোফেন! সম্রাটের গাড়ীর গতি মন্থর হয়েছে। একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন বেঠোফেন। তাঁর খ্যাতি তখন জগৎজোড়া। নিমেষে চিনতে পারলেন সম্রাট। মাথা হেলিয়ে দেশের রাজা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পীকে অভিবাদন জানালেন আগে।

চলে গেল রাজকীয় শকট। তারপর বেঠোফেন বন্ধুকে নিয়ে পড়লেন। বেশ নিলেন এক হাত। যা বললেন, তার মর্ম্মার্থ হল চাণক্যের সেই অতিপরিচিত শ্লোক—"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচনঃ। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

*　　　*　　　*

অদ্ভুত এই মানুষটির চরিত্র। সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন দুঃখের সঙ্গে, ব্যাধির সঙ্গে, অদৃষ্টের নির্ম্মম বিধানের সঙ্গে। কোন অন্যায় কখনো করেন নি। কোন অন্যায়কে সহ্যও করেন নি কখনো। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সয়, এই দুইএর প্রতিই তাঁর ছিল অপরিসীম বিরাগ। তাঁর কাছে সততার স্থান ছিল সবার উপরে। সবার উপরে

ভিয়েনার যাদুঘরে স্থাপিত বেঠোফেনের মর্ম্মর-মূর্ত্তি

সততা সত্য—এই বাণী তাঁর জীবনের প্রতিপদক্ষেপে, তাঁর বহুবিধ লেখার ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

১৭৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জার্মাণীর বন্ নগরে তাঁর জন্ম। ১৭৩২ সালে তাঁর পিতামহ লুই বেঠোফেন আন্টোয়ার্প থেকে বন-নগরের সভাকবি রূপে ঐ সহরে এসে বসবাস শুরু করেন। লুই বেঠোফেন উঁচুদরের সুরকার ছিলেন।

বেঠোফেনের পিতারও নানা গুণ ছিল। কিন্তু চরিত্রদোষে সব গুণই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। টাকা-পয়সা উড়িয়ে পুড়িয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীপুত্রদের যারপরনাই শোচনীয় অবস্থায় ফেলেছিলেন। সারা জীবন ধ'রে বেঠোফেনকে পিতার সেই উচ্ছৃঙ্খলতার খেসারৎ দিতে হয়েছিল।

অতি ছোটবেলা থেকেই সুরের প্রতি এবং বাজনার প্রতি বেঠোফেনের স্বাভাবিক দক্ষতা জন্মেছিল। অর্থলোলুপ পিতা পুত্রের সেই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে টাকা রোজগারের চেষ্টায় পাঁচ বছরের বালক বেঠোফেনকে সারাদিন ঘরের মধ্যে আটকে রেখে পিয়নো বাজানো অভ্যাস করাতে লাগলেন। সে এক দুঃসহনীয় পরিবেশ! চিলকোঠার একটা ছোট ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বালক বেঠোফেন গৎ বাজিয়ে চলেছেন, মনের মধ্যে দারুণ বিতৃষ্ণা। কিন্তু উপায় নেই! বাবা বলেছেন, গৎ বাজিয়ে টাকা আনতে না পারলে, মা আর ভায়েরা সব উপোস করে থাকবে। পিয়ানোর পর বেহালা। বেহালার ছড়ির টান যেমন শুরু হত, দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতো একটি মাকড়সা। সেই প্রাণীটিই ছিল তাঁর নিরানন্দ পরিবেশের একমাত্র সঙ্গী। মাকড়সাটিকে দেখে আনন্দ লাগত বেঠোফেনের। তাকেই শোনাবার জন্যে যেন আরও মধুর ক'রে ছড়িতে টান দিতেন তিনি। প্রত্যহ এমনি ঘটত।

গির্জায় গির্জায় পিয়নো আর বেহালা বাজিয়ে ছোটকাল থেকেই বেঠোফেন অর্থ উপার্জন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সব অর্থ-ই তাঁর পিতা আত্মসাৎ করতেন। তবুও সংসারের দুর্দ্দশা মোচন হত না। শেষে একদিন বাধ্য হয়ে বেঠোফেন গেলেন সরকারী তোষাখানায়। পিতার মাসিক পেনসন আসতো যে বিভাগ থেকে সেইখানে গিয়ে লজ্জায় অধোবদন হোয়ে কর্ম্মকর্ত্তাকে জানালেন যে তাঁর পিতার পেনসনের টাকা তাঁর হাতে না দিয়ে যেন বেঠোফেনের হাতে দেওয়া হয়, কারণ তাঁর পিতা স্ত্রীপুত্রদের দেখেন না, সব টাকা নিজেই উড়িয়ে দেন, ফলে তাদের দিন কাটছে কোনদিন অনশনে, কোনদিন বা অর্দ্ধাশনে। বেঠোফেনের কথা শুনে কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হয়েছিলেন এবং পর মাস থেকে সেই পেনসনের টাকা সরাসরি বেঠোফেনের মার নামে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বেঠোফেনের বাকদত্তা প্রণয়িনী থেরেসা ফন ব্রান্সুউইক

সুরসাধনায় সমাহিত বেঠোফেন

* * *

ক্রমে খ্যাতিলাভ করলেন বেঠোফেন। পৃষ্ঠপোষকদের আনুকুল্যে পরিবারের অর্থাভাবের কষ্ট কতক পরিমাণে দূর হল। বাইশ বছর বয়সে তরুণ শিল্পী নূতন পথে ভিয়েনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী মোজার্ট তখন খ্যাতির শিখরে সমাসীন। তিনি বেঠোফেনকে কাজ যুগিয়ে দিলেন। পিয়ানোবাদক রূপে বেঠোফেন প্রচুর অর্থ ও প্রচুরতর যশ অর্জ্জন করতে লাগলেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল।

মধ্যে একবার কিছুদিনের জন্য বন্-এ বসবাস ক'রে ১৭৯২ সালে তিনি স্থায়িভাবে ভিয়েনায় তাঁর আস্তানা স্থাপন করলেন। ভিয়েনার অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়তে লাগল। প্রিন্স কার্ল লিচনোভস্কি তাঁকে আমন্ত্রণ ক'রে তাঁর প্রাসাদে এনে রাখলেন। তাঁর জন্য আলাদা একটা মহল নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হল।
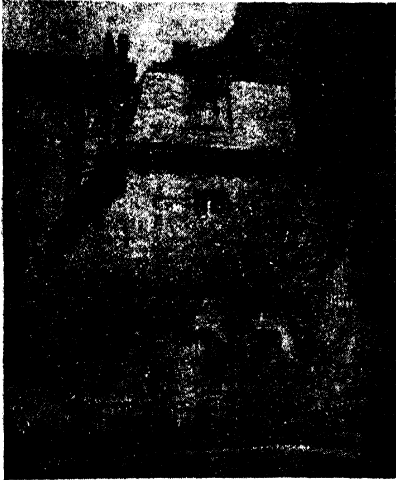
জার্ম্মানীর বন্-নগরে বেঠোফেনের বাসভবনটি এক্ষণে একটি জাতীয় শিল্পগৃহে রূপান্তরিত হয়েছে। এই শিল্পভবনে বেঠোফেনের ব্যবহৃত জিনিষপত্র এবং বাদ্যযন্ত্রগুলি সংরক্ষিত আছে

নিজের ইচ্ছা ও রুচিমতো খেয়ালী সুরশিল্পী রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে তাঁর সুরসাধনায় মগ্ন হলেন। মধ্যে মধ্যে নিজের বদ্ধদ্বার মহল থেকে বেরিয়ে নীচে নামতেন। বিরাট হলঘরে তখন হয়ত নগরের শ্রেষ্ঠ বিলাসী নরনারীর সমাগম হয়েছে। বেঠোফেন সকলকে নীরব সম্ভাষণ জানিয়ে পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসলেন, মুহূর্ত্তে কলগুঞ্জন স্তব্ধ হল। অপূর্ব্ব সুরমাধুরীতে ঘরের বাতাস হল মন্থর। সকলকে মুগ্ধ চমৎকৃত করে গৎ-এর পর গৎ বাজিয়ে চললেন বেঠোফেন। সবগুলিই তাঁর নিজের রচনা, নিজের সৃষ্টি।

সম্মান ও প্রতিপত্তির অন্ত নেই, সেই সঙ্গে টাকাও আসছে আশাতীত, কিন্তু সেই সৌভাগ্যে বেঠোফেন বিন্দুমাত্রও স্ফীত বোধ করেন নি কোনদিন। তাঁর চালচলন এবং জীবনযাত্রায় কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি অবস্থার পরিবর্ত্তনে। বাপ এবং ভায়েরা প্রতিনিয়ত তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করে আনন্দ পাচ্ছে। নির্ব্বিবাদে তিনি তাদের জঘন্য মনোবৃত্তিকে ক্ষমা করে চলেছেন। বন্ধু বিপদে পড়ে তাঁর কাছে এসেছে। অনেক টাকার তার দরকার। এত টাকা তো তাঁর হাতে নেই। বন্ধুকে পরামর্শ দিলেন, সেই পরামর্শ মতো বন্ধু এক বেঠোফেন-বৈঠকের আয়োজন করলেন! ঘোষণা করা হল, সেই বৈঠকে বেঠোফেন কয়েকটি সদ্য-রচিত সুরসৃষ্টি পরিবেশন করবেন। টিকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হল এবং একদিনের মধ্যেই সব টিকেট নিঃশেষ হোয়ে গেল। দু'ঘণ্টা ধরে অপূর্ব্ব সুরজাল সৃষ্টি ক'রে বেঠোফেন সকলকে মুগ্ধ বিহ্বল করে দিলেন। বৈঠকের শেষে থলিভর্ত্তি টাকা নিয়ে বন্ধু উধাও হল। যাবার সময় একবার তাঁর সঙ্গে দেখাও করে গেল না! কিন্তু তাতে দুঃখ বোধ করলেন না তিনি। বন্ধুর উপকার তো হয়েছে!

কিন্তু সেই সুদিনের মধ্যে আবার যে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনের মেঘ ঘনাচ্ছে তার আভাস গত কয়েকমাস ধরে পেয়ে তিনি যেন হতভম্ব বিহ্বল বোধ করছেন মাঝে মাঝে! ভগবান কি শেষ পর্য্যন্ত এমনি ভাবেই তাঁর প্রতি বিরূপ হবেন? তাঁর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয় শেষ পর্য্যন্ত বিকল হবে? তিন বৎসর ধরে তিনি তাঁর সন্দেহ আর আতঙ্ককে মনের মধ্যে চেপে রাখলেন। কিন্তু আর কোন উপায় নেই। তাঁর শ্রবণশক্তি যে ধীরে ধীরে কমে আসছে, তাতে আর সংশয় নেই। অর্কেষ্ট্রা পরিচালনা করবার সময় মৃদু আওয়াজগুলি তাঁর কানে প্রবেশ করে না। ফলে অনেক সময় ভুল হোয়ে যায়!

১৮২২ সালে একদিন তিনি তাঁর বিখ্যাত পালা "ফিডেলিও"-র আয়োজন করেছেন। তখন তাঁর বধিরত্বের খবর অনেকেই জেনেছে। কিন্তু তবুও তিনি পরিচালকের দণ্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। শুরু হল বাজনা। সুর আরম্ভ করলেন তিনি। কিন্তু প্রতি পদে ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। বাজনার আওয়াজ তাঁর কানে যাচ্ছে না। ফলে সুরের সঙ্গে বাজনার তাল থাকছে না বারবার। বন্ধুরা হতাশভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে, বাদকের দল বিমূঢ় বোধ করছে। কে তাঁকে জানাবে যে সব কিছুই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, কানে শুনতে না পেলে সঙ্গীত পরিচালনা করা চলে না? সে এক মর্ম্মান্তিক দৃশ্য আর পরিবেশ! অবশেষে এক বন্ধু একটি কাগজের টুকরোয় লিখে তাঁর কাছে পাঠালেন—"বাড়ী যাও।"

লেখাটার দিকে কিছুক্ষণের জন্য হতভম্বের মতো তিনি তাকিয়ে রইলেন। তারপর হাতের ছড়ি ফেলে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। বাড়ী পৌঁছে সোফায় মাথা গুঁজে এলিয়ে পড়লেন। পিছনে পিছনে বন্ধুরা গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে-আঘাত, সে-বেদনা কোনদিন ভুলতে পারলেন না তিনি।

* * *

আর শুধুই কি ইন্দ্রিয়-বৈকল্য তাঁকে আঘাত হেনেছে? তাঁর কোমল স্নেহশীল প্রাণে আঘাত দিয়েছে একাধিক রমণী, যাদের প্রতি তিনি তাঁর অন্তরের স্নেহ ভালবাসা উজাড় ক'রে দিয়েছিলেন।

ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন তিনি। নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি যাঁর ভালবাসা ছিল অফুরন্ত, সে-মানুষ কোনদিন নিজের ঘরে বাইরের মানুষ আনতে পারলেন না, স্ত্রীর কামনা করেছিলেন, চেয়েছিলেন পুত্রকন্যা। কিন্তু সে-বাসনা তাঁর জীবনে চরিতার্থ হয়নি।

তাঁর যৌবনের বন্ধু ছিলেন কাউণ্ট ষ্টীফানব্রিউনিং। তাঁর কন্যা রূপসী এলিওনোর বেঠোফেনের চিত্তহরণ করেছিলেন। কিন্তু খ্যাতির জয়মাল্য পেলেও বেঠোফেন কোনদিন বাকপটু হয়ে উঠতে পারেন নি। আয়তলোচনা তন্বী এলিওনোরের পাশে ব'সেও তিনি তাঁর মনের কথা কোনদিন তাঁকে শোনাতে পারলেন না। ফলে এলিওনোর অপেক্ষা ক'রে অধীর হোয়ে শেষ পর্য্যন্ত এক ডাক্তারকে বিবাহ ক'রে দূরে চলে গেলেন।

১৮০১ সালে জুলিয়া গুইকিয়ার্ডি নামে এক লাস্যময়ী তরুণী সরলমনা সুরশিল্পীকে তার মোহজালে আচ্ছন্ন করেছিল। বেঠোফেনের জগৎ-বিখ্যাত সঙ্গীত "মুনলাইট সোনাটা" এই তরুণীর প্রেরণায় রচিত হয়েছিল। জুলিয়া ছিল ছলনাময়ী, কপটচারিণী। কিছুদিন বেঠোফেনের সঙ্গে মিথ্যা খেলা ক'রে সে অন্য এক ধনী প্রণয়ীর ঘরণী হয়ে চলে গেল। দ্বিতীয়বার কঠিন আঘাত পেলেন বেঠোফেন!

কাটলো কিছুদিন। তারপর তাঁর স্নেহাকাঙ্ক্ষী মন আবার ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হল।

কাউণ্ট ফ্রান্জ ছিলেন বেঠোফেনের বিশেষ বন্ধু। তাঁর ভগ্নী থেরেসা কিশোর বয়স থেকেই মনে মনে বেঠোফেনকে ভালবেসেছিলেন, তাঁকে পূজা করতেন বললেও অত্যুক্তি হবে না। ভিয়েনায় বেঠোফেন যখন প্রথম গেলেন তখন থেরেসাদের বাড়ীতে তিনি অনেকদিন অতিথিরূপে বাস করেছিলেন এবং সেই সময় কিশোরী থেরেসা তাঁর কাছে কিছুদিন গান বাজনা শিখেছিলেন।

তারপর বেঠোফেন চলে গেলেন দূরে। অভিজাত-সম্প্রদায়ের মজলিশে আর গান-বাজনার সমারোহের মধ্যে হারিয়ে গেলেন তিনি। থেরেসা তাঁর কাছ থেকে রইলেন অনেক দূরে। বহু দিন পরে যখন আবার দেখা হল তখন থেরেসা পরিপূর্ণ-যৌবনা আর বেঠোফেন যৌবনের শেষ সীমায় আর যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপনীত।

দেখা হল দু'জনের অপূর্ব্ব রোমাণ্টিক পরিবেশে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোয়েছে। সদ্য-উদিত শুক্লা-চতুর্দ্দশীর চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। মৃদু আলোর নীচে পিয়ানোর সামনে বেঠোফেন বসেছেন—আর অদূরে সোফায় বসে আছেন থেরেসা, নির্ব্বাক এবং বিমুগ্ধ। ধীরে ধীরে পিয়নোর উপর আঙুল চালালেন বেঠোফেন, যে-গানের সুর বাজালেন তার কথাগুলির আরম্ভ হ'ল এই:—"যদি তোমার হৃদয় আমাকে দাও, গোপনেই দিও তোমার সে-দান।"

উভয়ের মধ্যে বাকদান পর্য্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু বিবাহ হয় নি। কেন যে হয় নি, সে এক রহস্য, যা আজো অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে।

* * *

বেঠোফেনের নিঃসঙ্গ জীবনের শেষ কয়েক বছর পারিবারিক কলহ আর হাঙ্গামার মধ্যে কেটেছে। তাঁর এক উচ্ছৃঙ্খল বড় ভাইএর ছেলে কার্ল-এর প্রতি তিনি তাঁর অন্তরের সব ভালবাসা ও স্নেহ অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু এই ভাইপোটি ছিল যেমন অকৃতজ্ঞ তেমনি অপদার্থ। ভায়ের সঙ্গে মামলা করে তিনি ভাইপোকে মানুষ করবার অধিকার আদায় করেছিলেন, কিন্তু শত চেষ্টাতেও মানুষ তাকে করতে পারলেন না। পরীক্ষার পর পরীক্ষায় সে ফেল হতে লাগল। তার দুর্নামে কান পাতা দায় হল। কিন্তু তবুও বেঠোফেন হাল ছাড়লেন না। শেষ পর্য্যন্ত আশা করেছিলেন, তাঁর স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র সুপথগামী হবে, সততাকে অবলম্বন ক'রে জীবনকে সুপরিচালিত করবে।

১৮২৭ সালের ২৬শে মার্চ্চ পৃথিবীর এই অসাধারণ সুরশিল্পী এক আনাড়ী ডাক্তারের হাতে দেহে অস্ত্রোপচারের পর তিনমাস রোগের সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে চিরকালের জন্য চোখ বুজলেন।

মৃত্যুর আগে বিখ্যাত সুরকার শুবার্ট তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সংবাদ এনেছিলেন, বিলাতের এক সমিতি তাঁর চিকিৎসার জন্য অর্থ-সাহায্য প্রেরণ করেছেন। শুবার্ট-এর কথা শুনে বেঠোফেন মৃদু হেসে বলেছিলেন—"ভগবান তাঁদের কল্যাণ করুন।" সেই তাঁর শেষ কথা।

প্রকৃতি সেদিন অত্যন্ত অশান্ত আকার ধারণ করেছিল। সারাদিন দমকটার পর সন্ধ্যা থেকে ঝড় উঠেছিল ভীষণ! সেই ঝড়ের তাণ্ডব যখন প্রচণ্ডতম অবস্থায় পৌঁছেচে তখন দেখা গেল বন্ধ ঘরের মধ্যে বেঠোফেনের জীবনের দীপ ধীরে ধীরে নিভে আসছে।

নিখিল-ব্রহ্ম বঙ্গীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

ডক্টর শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ চৌধুরী (রেঙ্গুন)

নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীদের জীবনে আনে নবীন উৎসাহ, নবচেতনা ও সংহতি। তজ্জন্য ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রই এই সম্মেলনকে এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই সম্মেলন বহুকাল ধরিয়া ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীদের জীবনকে প্রোদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এই উপলক্ষে পূর্ব পূর্ব বৎসরে বহু মনীষী ইতঃপূর্বে বাঙ্গালাদেশ হইতে রেঙ্গুনে আসিয়া সকলের উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিগত ২রা, ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল শনি, রবি ও সোমবারে এই সম্মেলনের বর্তমান বৎসরের সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং এতদুপলক্ষে ব্রহ্মদেশে বিশেষতঃ রেঙ্গুনের সর্বত্র যে প্রাণচাঞ্চল্য, কর্মোদ্দীপনা ও ভাবোদ্বেলতা দেখা গিয়াছে, এইরূপ পূর্বে কোনও দিন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ব্রহ্মপ্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে সমাগত সুধীবৃন্দ

এইবারের অধিবেশনের প্রচ্ছন্ন কর্মনায়ক ছিলেন ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালী সুধীপ্রবর ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়। তাঁহারই পরিকল্পনানুসারে "বঙ্গীয় সাহিত্যে"র সঙ্গে "বঙ্গীয় সংস্কৃতি" ও সংযুক্ত হয় এবং সমস্ত কার্য-তালিকাও তদনুসারে নির্মিত হয়।

বর্তমান বৎসরের সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন সুবিখ্যাত সাংবাদিক "যুগান্তর"-সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি ডক্টর রমা চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি: পাকিস্থান হইতে জনাব জসীম উদ্দিন, ভারতবর্ষ হইতে ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এবং ব্রহ্মদেশ হইতে বঙ্গভাষাবিদ্ ব্রহ্মদেশবাসী উ আউঙ্ চ জান। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ব্রহ্মদেশের মাননীয় সংস্কৃতি-মন্ত্রী উ উইন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১লা এপ্রিল তারিখে বিমানযোগে রেঙ্গুনে উপস্থিত হন। পরের দিন ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও তাঁহার বিদুষী সহধর্মিণী ডক্টর রমা চৌধুরীও ইণ্ডিয়া এয়ার লাইনস্ করপোরেশনের এক ডাকোটা প্লেনে মধ্যাহ্ন সময়ে রেঙ্গুনে আসিয়া পৌছেন। এই উভয় দিনেই রেঙ্গুনের বহু খ্যাতনামা বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী তাঁহাদিগকে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। যেদিন প্রথম দিনের অধিবেশন, সেই দিনই যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী বা বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীরূপে সাধারণে পরিচিত চৌধুরী-দম্পতী রেঙ্গুনে উপস্থিত হন বলিয়া তাঁহাদের আর বিশ্রামের সময় হয় নাই—দুই ঘটিকার সময় সভা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তাঁহারা সভামণ্ডপে দর্শনদানে সকলের আনন্দবর্ধন করেন।

মাননীয় সংস্কৃতি-মন্ত্রী উ উইন মহাশয় সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন "ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে বাঙ্গালা দেশই অগ্রণী হইয়াছে, একথা সর্বজনবিদিত"। তিনি আরও বলেন, "নবভারত গঠনের ইতিহাসের প্রতি আগ্রহশীল প্রত্যেক ছাত্রই অবগত আছেন যে রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফলে যে নবভারতের সৃষ্টি হইয়াছে, বাংলা-দেশই তাহার নেতৃত্ব করিয়াছে।" উ উইন মহাশয় স্বভাবতই বঙ্গদেশের প্রতি অনুরক্ত; তাঁহার প্রাণস্পর্শী ইংরাজীতে লিখিত ভাষণে সকলেই অত্যন্ত উৎফুল্ল হন।

অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ গুহ সম্পাদকীয় বিবৃতি পাঠকালে বর্তমান বৎসরের সম্মেলনের আনুপূর্বিক ইতিহাস ও কর্মপ্রণালী বিবৃত করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি খ্যাতনামা আইনজীবী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকান্ত বসু মহাশয় ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বঙ্গদেশের যুগ-যুগান্তরের কৃষ্টির সংযোগের বিষয় অতি সুন্দর ভাবে অবতারণা করেন; আইন শাস্ত্রে উভয় দেশের পারস্পরিক সংযোগ কি ভাবে সূচিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবে বিশ্লেষণ করেন।

সদ্য-আগত প্রধান অতিথি ভারতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা বিদুষী, দার্শনিক-প্রবরা কলিকাতাস্থ সরকারী লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের খ্যাতনাম্নী অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী অতঃপর তাঁহার এক ঘণ্টাব্যাপী পরম চিত্তাকর্ষক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ মৌখিক ভাষণ প্রদান করেন। বক্তব্য বিষয় ছিল তাঁহার—"বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে ভারতীয় দর্শনের দান"। ডক্টর চৌধুরী বলেন যে ভারতীয় দর্শন শ্রেষ্ঠ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে বেদান্তে।

কাজেই বেদান্তের প্রভাব প্রদর্শনই তাঁহার অভিপ্রেত। তিনি বাঙ্গালার রাজনীতি, ধর্মদর্শন ও সাহিত্যে কি নিগূঢ়ভাবে বেদান্তদর্শন অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার অতি মনোরম আলেখ্য সর্বজনসমক্ষে উপস্থাপিত করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—যে সকল বঙ্গীয় বীরেরা হাসিতে হাসিতে ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন আহুতি দিলেন, তাঁহারাও বেদান্তের প্রভাবে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মূলমন্ত্রের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন পূর্ণমাত্রায়। বাঙ্গালার সংস্কৃতি একান্তভাবে বেদান্তবিদ্যাবিজৃম্ভিত, তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত। রাজা রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই একই প্রাণধর্মে ও জীবনদর্শনে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ডক্টর রমা চৌধুরীর শান্ত স্থির সমাহিত বাচনভঙ্গি, সুললিত ভাষা ও অতি তথ্যপূর্ণ মৌখিক ভাষণ সকলকেই বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

ব্রহ্মদেশবাসী বঙ্গভাষাবিদ উ আউঙ্ চ জান জনসভায় বক্তৃতা দিতেছেন

ব্রহ্মদেশীয় বঙ্গভাষাবিদ্ উ আউঙ চ জান মহাশয় বলেন যে, তিনি মনে প্রাণে বাংলাদেশকে ভালবাসেন। তাঁহার শিক্ষা বঙ্গদেশে—বিশেষ করিয়া ৮ মনীষী ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয়ের শ্রীচরণতলে। বঙ্গদেশের সঙ্গে তাঁহার আত্মিক যোগ রহিয়াছে। তাঁহার সুন্দর লিখিত বাংলা ভাষণে তিনি বলেন যে, তিনি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে ব্রহ্মদেশের সংস্কৃতির উপর বাঙ্গালাদেশের প্রভূততম প্রভাব বিদ্যমান।

পরিশেষে সভাপতি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ লিখিত ভাষণ পাঠ করিয়া সকলকে বিশেষ তৃপ্ত করেন। তিনি এই ভাষণে বঙ্গসাহিত্যের প্রগতির ধারা ও বাংলাদেশের বর্তমান জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির বিভিন্নদিক্ ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। উপসংহারে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক আশার বাণী ধ্বনিত করিয়া বলেন—"সেই আগামীদিনের শোভাযাত্রীদের অস্পষ্ট পদধ্বনিই আজকের সাহিত্যে দূরাগত সমুদ্র-কল্লোলের মত শুনতে পাচ্ছি। এই পদধ্বনি যেদিন স্পষ্ট হবে, প্রত্যক্ষ হবে—সেদিন ভূত ও ভগবান্, ভিখারী ও গণিকা এবং যুদ্ধবাদী ও মুনাফাজীবীর ঊর্ধ্বে সাধারণ মানুষের জয় নিশ্চিত হবে। আজকের সাহিত্য সেই বাস্তবতাকে গ্রহণের জন্য উন্মুখ!"

সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে লোক-সংগীতের অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে কবিগান, পালাকীর্তন, মণিপুরী পৌনা কীর্তন, যাত্রা প্রভৃতি সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করে।

সভার তৃতীয় অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল—"বাঙ্গালী ও বাঙ্গালার সংস্কৃতি।" এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন মূলসভার বিশেষ অতিথি সুবিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিশারদ, বহুভাষাবিদ্, সংস্কৃত-প্রচারেকব্রত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃত-শিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। রবিবারের সকাল—রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটীর ত্রিতল হর্ম্যস্থ দ্বিতীয় তলে সুবৃহৎ সভাকক্ষে তিলধারণের

বিশিষ্ট অতিথি ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী বক্তৃতা করিতেছেন

স্থান নেই। ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সুপণ্ডিত ডক্টর চৌধুরী তাঁহার মৌখিক ভাষণে বলেন—বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে বঙ্গদেশের খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্ত-ভাগ এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের অবস্থা তুলনীয়। অদ্বৈত প্রভুর চোখের জলের ধারে ভগবান্ পতিতপাবন জনার্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন শ্যামলরূপ পরিহার করে সর্বগণ-সমভিব্যাহারে ধরণীর ধূলিতে গৌররূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যের সীমা নেই—দেশ খণ্ডবিখণ্ড, অত্যাচার-জর্জরিত। কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে এবং নামমন্ত্রদান ও প্রেম মাহাত্ম্য প্রচারের ফলে নিখিল বঙ্গ এবং ভারত-ভূতলের বহুলাংশ প্রেমমন্ত্রে হলেন দীক্ষিত। ধরাধামে দিব্য আনন্দ মূর্তরূপ পরিগ্রহ করল। হিন্দু-মুসলমান সকলেই হলেন সত্যসন্ধী, হিংসাদ্বেষ কলুষবিরহিত। চাঁদকাজী, সৈয়দ মর্তুজা, ফকীর হবীব প্রভৃতি বহু মুসলমান কবিও শ্রীকৃষ্ণচরিত মাধুর্য এবং গৌরলীলার প্রতি হলেন সমাসক্ত। পল্লী ও নাগরিক জীবনে ভ্রাতৃভাব হইল দৃঢ়ীভূত। জাতীয় জীবনে বঙ্গদেশ হল সুসংহত। সেই

প্রেমমন্ত্রের পুনরনুশীলনে এখনও বঙ্গদেশ হবে পুনরায় ধন্য। বঙ্গীয় সংস্কৃতির মৌলিক সৌষ্ঠব প্রেমমন্ত্রপ্রসূত।

স্থানীয় সুধীবর্গও এই বিষয়ের আলোচনায় যোগদান করেন। এই আলোচনায় ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ও ভারতীয় রাষ্ট্রদূতাবাসের শ্রীযুক্ত এস-সি-ভট্টাচার্য মহাশয় যোগদান করায় আলোচনা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়। রবিবার বিকালে চতুর্থ অধিবেশন হয়—বিষয় ছিল "বাঙ্গালী সমাজ ও ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালী।" এই অধিবেশনে শ্রীঅচলা বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্মেলনের সহযোগী সম্পাদক শ্রীসুশান্ত চৌধুরী ও শিশিররঞ্জন গুহ, পণ্ডিত ভিক্ষু ধর্মাধার মহাস্থবির প্রভৃতি সুধীবৃন্দ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

অটোগ্রাফ লিখনরত ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী, পার্শ্বে উপবিষ্ট রেঙ্গুনের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ কনকপ্রসূন সরকার

সোমবারের শেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল পূর্ব-পাকিস্থানের সুপ্রসিদ্ধ পল্লীকবি জনাব জসীমউদ্দিন সাহেবের। কিন্তু পূর্বপাকিস্থান সরকার তাঁহাকে আসিতে অনুমতি দান না করায় তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য সুবিখ্যাত পল্লীগীতি-গায়ক জনাব বেদারুদ্দিনকে প্রেরণ করেন। এই শেষ অধিবেশনে জসীমুদ্দিন সাহেবের ব্যাখ্যাসহ একটী পূর্ববঙ্গীয় লোকসঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়। বেদারুদ্দিন সাহেবের অতি সুমধুর পল্লীগীতি সকলকে পরিতৃপ্ত করে।

পরিসমাপ্তি ভাষণে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর রমা চৌধুরী, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, জনাব বেদারুদ্দিন সাহেব সকলেই একবাক্যে সম্মেলনের পরিকল্পনা ও পরিপূর্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়া আমাদিগকে অত্যন্ত উৎসাহিত করেন। ডক্টর রমা চৌধুরী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুললিত ভঙ্গিতে বলেন যে, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী; সেজন্য সত্য, শিব, ও সুন্দরের পূজারী প্রবাসী বাঙ্গালীদের বিজয় সুনিশ্চিত। তাঁহার এই শুভেচ্ছা ফলবতী হউক।

বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলন উপলক্ষে এই তিনদিন সমগ্র রেঙ্গুনে একটী আনন্দোৎসবের সাড়া পড়িয়া যায় এবং প্রত্যহ বিশিষ্ট অতিথিগণের সংবর্ধনার্থে নানারূপ সভাসমিতির অনুষ্ঠান করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্রহ্মসরকারের মাননীয় মন্ত্রী উ উইন মহাশয়ের প্রদত্ত ভোজ ও সঙ্গীতানুষ্ঠান সভা, বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের জলযোগ অনুষ্ঠান ও সাধারণ সভা, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স ও চট্টল সমিতির সভা প্রভৃতি। অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকান্ত বসু, ডাঃ কনক প্রসূন সরকার, শ্রীযুক্ত এস-সি ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত পি, কে, বসু প্রভৃতিও অতিথিবর্গকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া রেঙ্গুনবাসিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। বেঙ্গলী এসোসিয়েশন কর্তৃক আহূত ও রামকৃষ্ণমিশন সোসাইটী হলে অনুষ্ঠিত সভায় ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী শ্রীশ্রীমাসারদা, ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী স্বামী বিবেকানন্দ ও মূল সভাপতি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালীর সমস্যাসম্পর্কে আলোচনা করিয়া সকলকে বিশেষ আনন্দদান করেন।

এই কয়দিন আমাদের ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালী সকলের যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল। হৃদয়ের মধ্যে জননী বঙ্গভূমির নীরব পূজারীর যে আনন্দরোল ক্ষীণভাবে প্রকাশ পাইতেছিল, সকলের সম্মেলনে, বিশেষতঃ অতিথিবৃন্দের আগমনে, সে আনন্দরোল সমুদ্র-কল্লোলে যেন ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। জননী বঙ্গভূমির মুখচ্ছবি প্রতিফলিত দেখিলাম সর্বজনবদনে—দিগ্‌দিগন্তে। জননী বঙ্গভূমির শ্রীশ্রীচরণ-কমলে কোটি কোটি প্রণতি নিবেদন করি!

বন্দে মাতরম্‌॥
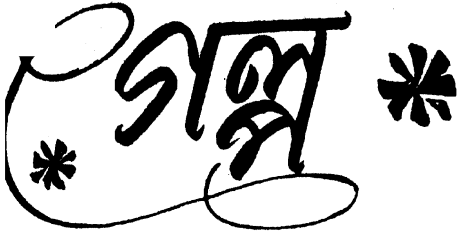
স্বপ্নলোকের নাতি-নাতনী

শ্রীগুরুদাস সরকার

কয়দিন হইতে শরীরটা ভাল নাই। বাড়ীতে বুড়া বুড়ী আমরা দুই জন। গৃহিণীর পায়ে বাতের বেদনা। ছোট একটা তোলা উনুনের উপর তাঁর জন্য একটা প্রলেপ গরম করা হইতেছে। ছেলে কয়দিন যাবৎ দিল্লী গিয়াছেন, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের চাকরি, বেতন বেশী না হইলে কি হয় বদলীর রেওয়াজটা বহাল আছে। এবার বুঝিবা নয়াদিল্লীই তাঁহার কর্মস্থল হইবে। দিল্লীতে বড় খরচ, বাড়ীও নাকি সহজে পাওয়া যায় না, তাই গৃহিণী এই সকল অসুবিধার জন্য একমাত্র পুত্রকেও এবার চক্ষুছাড়া না করিয়া চলিবে না এ কথা কতকটা বুঝিয়াছেন। পঙ্গু হইলেই পরভরসা—যেমন খট্বা ভাঙ্গিলেই ভূমি শয্যা। একমাত্র ভরসাস্থল কেষ্টর মা। সে দুকথা শুনাইয়া দিলেও প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই! সেদিন কথাপ্রসঙ্গে নীরদবাবু বলিতেছিলেন, নাতি-নাতনীরা যাই একটু কাছে আসে, তাই তাদের সঙ্গে কথা বলিয়া প্রাণটা বাঁচে। নীরদবাবুর লক্ষ্মীর সংসার, অভাব-অনটন নাই। আমাদের একদিক সামলাইতে আর একদিকে টান ধরে, অল্প আয়, রাখিয়া ঢাকিয়া খরচ করিবার উপায় নাই। তিন কুড়ি দশ পূর্ণ হইয়াছে, সকাল সন্ধ্যায় ছেলে পড়াইয়া যে দুপয়সা আয় বাড়াইব সে শক্তিও গিয়াছে। দিনের মধ্যে আট ঘণ্টা তো শুইয়াই কাটে—ডাক্তার বলিয়াছে, অধিক নড়াচড়া হাঁটাচলা করিবেন না। যে কয়দিন আছি, অল্প হউক যাহা হউক পেন্সনটা তো বজায় আছে।

এক একবার ভাবি, বধূ যে ঘরে আসে নাই ভালই হইয়াছে—বন্ধু মণিময়ের মাতুল বলিতেন, "বাবা, বিবাহ করিও না, বাতাসা মুখে দিয়াও জল খাইতে পাইবে না।" তাঁহারও ছিল সেই একটিমাত্র পুত্র। হরমোহনদাদা পিতার সে উপদেশ শুনেন নাই, ফলে পরবর্তী জীবনে কষ্ট পাইয়াছিলেন কি না জানিনা। তখন চাউল পাঁচ টাকা মণ, ঘৃত টাকায় আঠার ছটাক, পাঁচ আনা সের সরিষার তেল, দুই টাকা জোড়া কাপড়, মাছ মিলিত অপর্য্যাপ্ত—পঁচিশ টাকা বেতনেও রাজার হালে না হউক নির্বিবাদে চলিয়া যাইত। এখন সব কিছুরই মূল্য চতুর্গুণ, তাহার উপর বাড়ী ভাড়ার তো কথাই নাই। তবুও বাড়ীটা কেমন যেন খাঁ খাঁ করে। মণির মামার মত সকলেই misogynist ছিলেন না—পূর্ণর পিতা বলিতেন, যে বাড়ীতে শিশু নাই, বিড়াল নাই, নারায়ণ-শিলা নাই, সে বাড়ী বাড়ীই নয়। বৃদ্ধকে যেন চোখের সম্মুখে দেখিতেছি সদানন্দ পুরুষ, চুল ভুরু সবই পাকা, হুঁকা হাতে করিয়া দোকানের ধারে ছোট একটি মোড়ার উপর বসিয়া আছেন। ছেলেরা ব্যবসা চালাইত, উপার্জ্জন করিত, তিনি ছিলেন শুধু দর্শক মাত্র। হায়রে সেকাল! এখন বসিয়া থাকা ঘোরতর অপরাধ। "আই হাজ"-এর কেদার-দাদুর আমলেও অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধকে বসিয়া না থাকিয়া সজিনার ফুল কুড়াইবার উপদেশ শুনিতে হইত। এই সব ভাবিতে ভাবিতে কখন ঝিম আসিয়াছে জানি না। আহারের পর হাজার চেষ্টা করিলেও জাগিয়া থাকিতে পারি না। সেদিনও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। খানিকটা আগে পাশের ফ্ল্যাটের মাদ্রাসীদের ছোট্ট মেয়েটি আসিয়াছিল। সে আমাকে 'তাতা' বলিয়া ডাকে, আপন ভাষায় কত কি বলিয়া যায়, তাহার কথা আমি একবর্ণও বুঝি না। আমি বুঝি তাহার মিষ্ট হাসিটুকু, তাহার নাচ, পাখীর কাকলির মত তাহার অবোধ্য মধুর গান। গান-নাচ সে আপন মনেই করে, অনুরোধ উপরোধের ধার ধারে না। তাহার পিতা মাঝে মাঝে বলেন, খুকী হয়তো গিয়া আপনাকে বিরক্ত করে, আমি বলি আমার নিঃসঙ্গ জীবনে সে আনন্দের আলোক বহিয়া আনে। চারি বৎসরের শিশু, কিন্তু সে যে আদি-মাতা ইভেরই কন্যা। তাহার হাস্য, তাহার লাস্য, তাহার ছন্দোময় চলন ভঙ্গী, আমার অবচেতনে যে এরূপ সুস্পষ্ট, এরূপ সুদৃঢ় ছাপ রহিয়াছে তাহাতো জানিতে পারি নাই।

ঘুমের ঘোরে দেখিতেছি যেন বাহিরের আরাম কেদারায় বসিয়া আছি—প্রাতঃকালীন চা-পর্ব তখনও শেষ হয় নাই। আমার কিশোরী পৌত্রী প্রবেশ করিল—আমার শিশু-পৌত্রটিও তাহার সঙ্গে টলিতে টলিতে আসিতেছে। নাতনী কল্পনাতপ্ত কাঞ্চনবর্ণা না হইলেও ফরসাই বটে—মার চেয়েও তাহার রং উজ্জ্বল। তাহার পরণে গোলাপী সালোয়ার, গায়ে সবুজ পিরান, জরদা রঙের একটা চাদরও আছে—মাথার চুলে লাল ফিতার বাহার।—খোকনের পরণে ঘিয়ে রঙের রেশমের নিকার-বোকার, পায়ে ব্রাউন চামড়ার "নটিবয়" জুতা—বোধহয় সব চাইতে ছোট সাইজের। খোকন দিদির মত ফরসা নয়, চিক্কণ শ্যামবর্ণ। নাম তার কালোবরণ—ডাকা হয় ভোঁদড় বলিয়া। আমাদের এ শ্যামশ্যামার দেশ, আমি একটু শ্যাম বর্ণেরই পক্ষপাতী। আমি কালো মানুষ, বাবার রঙও কালোই ছিল, ঠাকুরদাদাকে দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই, তবে তিনি যে গৌর বর্ণ ছিলেন না তাহা আমি একরূপ হলফ করিয়া বলিতে পারি। যাহার দ্বারা বংশধারা রক্ষা হইবে, পিতৃ-পিতামহ যাহার হাতে জলগণ্ডুষ পাইবেন, সে শিশু যে কালো, ফরসা নয়, তাতে বরং আমি খুশীই হইয়াছি।

পাশের চেয়ারে পৌত্রীকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এই সাতসকালে সেজেগুজে কোথায় যাওয়া হয়েছিল? তোমার মাও ছেলেবেলায় পাঞ্জাবী মেয়েদের মত পোষাক পরতে ভালবাস্‌তেন। তাদের স্কুলে অনেকগুলি পাঞ্জাবী মেয়ে পড়তো কি না। কল্পনা বলিল—আজ রবিবার নাচের ক্লাস ছিল, আজ একটা নতুন নাচ শেখা হয়েছে—এই বলিয়া সে আপনা হইতেই নূতন নাচটা যে কত সুন্দর, উহা তাহার কিরূপ অধিগত হইয়াছে তাহাই দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল। পায়ের নূপুর জোড়া স্কুলেই ফেলিয়া আসিয়াছে কিন্তু তাহাতে বিশেষ আটকাইল না। খোকন আর থাকিতে পারিল না। কোল হইতে নাবিয়া পড়িয়া সেও বিচিত্র ভঙ্গীতে নাচিতে আরম্ভ করিল। আমি বলিলাম, কল্পনা! মিনতি মাকে একবার ডাকিয়া আন, ভোঁদড় নাচটা একবার দেখাইয়া দেই। কল্পনা বলিল, আপনি কার কথা বলছেন দাদু? মিনতি তো আমার মা নয়, তাঁর যে বিয়ে হয়েছিল লক্ষ্ণৌয়ের সেই ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে—বলিতে বলিতে সে আর তার শিশু ভাইটি কোথায় মিলাইয়া গেল—এমন করিয়া তাহারা যে স্বপ্নরাজ্যে বিলীন হইবে তাহা তো ভাবি নাই।

চট্ করিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—দেখি কল্পনারাজ্যের বাসিন্দা তাহারা দ্রুত কল্পনালোকেই প্রয়াণ করিয়াছে। স্বপ্নলোকের নাতি-নাতনী সেই যে দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল—হায় আর তো ফিরিয়া আসিল না।

ব্যবধান

প্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

কী এক স্বপ্নের ছায়া আজো আসে ভেসে—
মৃত্যুনীল ঘোলাটে আকাশে:
ঘুরেছি অনেক দিন,
কত রাত্রি খুঁজেছি তোমারে
পথে পথে ধূসর প্রান্তরে।
সে হৃদয় নেই আজ
লুপ্ত দিন, সেই পরিবেশ—
অরণ্যে কী হ'লো তার শেষ?

তোমার হৃদয় ঘিরে
কত দীপ। জ্বেলেছি মনের—
সে গান কী শুধু ক্ষণিকের!
রঙিন্ স্বপ্নের দিন
ধীরে হ'লো ক্ষয়,
আঁধারে উধাও হ'লো জীবনের পরিধি প্রত্যয়।
মুখোমুখি বসে আছি তবুও তো অনেক প্রভেদ,
হারানো দিনের সাথে এ দিনের হ'লো কী বিচ্ছেদ!

রত্নাকর-কৃত হরবিজয়-কাব্য

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

কাশ্মীর ভূস্বর্গ, কাশ্মীর প্রকৃতির লীলানিকেতন—কাশ্মীর-জননী বিমানী-কৃতহংসা বীণাবাদিনী বাগ্‌দেবীরও চিরবিহারভূমি। কাশ্মীরের কলহণ, জল্‌হণ, শিল্‌হণ, বিল্‌হণ—কাশ্মীরের শিবস্বামী, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত, জয়ন্তভট্ট—এঁরা সকলেই সারস্বতধুরন্ধর—নিখিল ভারত এঁদের গৌরবে গৌরবান্বিত। রত্নাকরও ছিলেন কাশ্মীরের অন্যতম সারস্বতশ্রেষ্ঠ—আনন্দবর্ধনেরই সমসাময়িক। কাশ্মীরের রাজা চিপ্পট জয়াদিত্যের সময়ে (খ্রীষ্টীয় ৮৩২-৮৪৪ সাল) তার কবিত্বশক্তির প্রথম স্ফুরণ ; তার ফুল্লতম বিকাশ পরবর্তী রাজা অবন্তিবর্মার সময়ে (৮৫৫-৮৮৪ সাল)। (১) কল্‌হণ তার রাজতরঙ্গিণীতে বল্‌ছেন—(৫-৩৪)—

মুক্তাকণঃ শিবস্বামী কবিরানন্দবর্ধনঃ।

প্রথাং রত্নাকরশ্চাগাৎ সাম্রাজ্যেঽবন্তিবর্মণঃ॥

অর্থাৎ রাজা অবন্তিবর্মার সাম্রাজ্যে মুক্তাকণ, শিবস্বামী, কবি আনন্দবর্ধন এবং রত্নাকর প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সূক্তিমুক্তাবলী ও সুভাষিত হারাবলী গ্রন্থে রত্নাকর-সম্পর্কে কবি রাজশেখর-কৃত নিয়োদ্ধৃত প্রশস্তি-মূলক কবিতাটি দৃষ্ট হয়—

মাস্ম সন্তু হি চত্বারঃ প্রায়ো রত্নাকরা ইমে।

ইতীব স কৃতো ধাত্রা কবিরত্নাকরোঽপরঃ॥

অর্থাৎ বিধাতা যেন মনে করলেন—চার চারটি রত্নাকর বা সমুদ্রের প্রয়োজন কি? একটা সমুদ্রেই সকলকে এক স্থানে সমবেত করি—এই ভেবেই তিনি কবি রত্নাকরের সৃষ্টি করলেন। এই প্রভূত যশোভাজন কবি রত্নাকর খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে (কারণ রাজা অবন্তিবর্মার রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় ৮৫৮-৮৮৪ সাল) প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থের প্রত্যেক সর্গের অন্তে লিখিত আছে—

ইতি শ্রীবালবৃহস্পত্যনুজীবিনো বাগীশ্বরাঙ্কস্য বিদ্যাধিপত্যপরনাম্নো মহাকবে রাজানকশ্রীরত্নাকরস্য (২) কৃতৌ রত্নাঙ্কে হরবিজয়ে মহাকাব্যে...ইত্যাদি। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি বালবৃহস্পতির অনুজীবী ছিলেন। কে এই অল্পবয়স্ক বৃহস্পতি? কহলণ তাঁর রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গের ৬৭৬ শ্লোকে (দুর্গাপ্রসাদের সংস্করণ—১৫৩ পৃষ্ঠা) ৩ বল্‌ছেন—

"শ্রীচিপ্পটজয়াপীড়ো বৃহস্পত্যপরাভিধঃ।

ললিতাপীড়জো রাজা শিশুর্দেশ্যস্ততোঽভবৎ"॥

অতএব নিঃসন্দেহ যে রাজা অবন্তিবর্মার পূর্ববর্তী শিশুদেশ্য বা বাল রাজা চিপ্পটজয়াপীড়—যিনি ললিতাপীড়ের পুত্র এবং যাঁর অপর নাম বৃহস্পতি—এই চিপ্পটজয়াপীড় (৮৩২-৮৪৪ খৃষ্টাব্দ) ছিলেন কবি রত্নাকরের বালবৃহস্পতি।

পূর্ব কথিত পুষ্পিকা থেকে এও প্রমাণিত হয় যে তাঁর উপাধি ছিল বাগীশ্বর বিদ্যাধিপতি—উভয় উপাধিই প্রায় সমার্থক। এই গ্রন্থের যতদূর পর্যন্ত তিনি লিখে যেতে পেরেছেন, তার থেকেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় কেন তিনি তাৎকালিক পণ্ডিতসমাজে এই নামে অভিহিত হয়েছিলেন—তাঁর এই উপাধিদ্বয় সম্পূর্ণ অন্বর্থক।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কবি তাঁর গ্রন্থের পর্বশেষে স্বীয় পরিচয় কিছু লিপিবদ্ধ করে গেছেন—তিনি বল্‌ছেন—

শ্রীদুর্গদত্তনিজবংশহিমাদ্রিসানু-

গঙ্গাহ্রদাশ্রয়সুতামৃতভানুসূনুঃ।

রত্নাকরো ললিতবন্ধমিদং ব্যধত্ত

চন্দ্রার্ধচূড়চরিতাশ্রয়চারু কাব্যম্॥

তিনি ছিলেন দুর্গদত্তবংশোদ্ভূত ; তাঁর নিবাস ছিল হিমালয়ের সানুতে অবস্থিত গঙ্গাহ্রদে ; তাঁর পিতার নাম অমৃতভানু।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু

এই গ্রন্থ পঞ্চাশ সর্গে সমাপ্ত এবং এর শ্লোক সংখ্যা ৪৩২১। দুর্ভাগ্যক্রমে কবি রাজানক রত্নাকর এই গ্রন্থের শেষের কিয়দংশ সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। গণপতি শেষাংশ রচনা করেছেন। ছয়চল্লিশ সর্গের অর্ধভাগ পর্যন্ত রাজানকের রচনা। এই অংশ পর্যন্ত অলক ও টীকা করে গেছেন।

এই বিপুল-কলেবর গ্রন্থে কবি শিব-কর্তৃক অসুর অন্ধকের পরাজয়-বৃত্তান্ত বিবৃত করেছেন। পার্বতী যখন স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা শিবের চক্ষুদ্বয় আবৃত করেন, তখন অন্ধক অসুর অন্ধ হয়েই জন্ম পরিগ্রহ করেন। দিতিপুত্র ছিলেন পুত্রাভিলাষী, কাজেই শিব স্বীয় পুত্র অন্ধককে তাঁর হস্তেই লালন পালনের জন্য সমর্পণ করেন। শিবতনয় অন্ধক স্বীয় অন্ধত্বের বিরুদ্ধে করেন বিদ্রোহ ঘোষণা ; কঠোর তপস্যার বলে তিনি স্বীয় অন্ধত্ব বিদূরিত করেন স্বয়ং ব্রহ্মার বরলাভ করে।

কিন্তু এতে অন্ধকাসুরের হলো না শান্তি। প্রভূত তপোবল তিনি করলেন দেবতাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত। দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হলো ; স্বয়ং বিষ্ণুও হলেন পরাজিত। অবমানিত দেবতারা

(১) খ্রীষ্টীয় ৮৪৪ সালে ৮৫৫ সাল পর্যন্ত এ অন্তর্বর্তী সময়ে কাশ্মীরে কর্কোটবংশীয় তিনজন ক্ষুদ্র নৃপতি রাজত্ব করেন।

(২) রাজানক রাজদত্ত উপাধি—অর্থ "রাজসদৃশ"। তৎকালে কাশ্মীরের রাজগণ পাণ্ডিত্যের সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশিষ্ট পণ্ডিতগণকে এ উপাধি প্রদান করতেন। রাজতরঙ্গিণীর ৬-৬৭৫ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৩) বোম্বে সংস্কৃত সীরিজ সংস্করণ ১৮৯২।

হলেন স্বর্গভ্রষ্ট। অন্ধকাসুরের করতলগত হলো ত্রিভুবন। অবশেষে শিব অসৎ পুত্রের নিধন করে জগতে শান্তি স্থাপন করলেন।

এই ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে রত্নাকর হাজার হাজার শ্লোক রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন—অলঙ্কারশাস্ত্রপ্রদত্ত মহাকাব্যকারদের সুযোগ সুবিধা নিয়ে। দণ্ডী বলেছেন—

"নগরার্ণবশৈলর্তুচন্দ্রার্কোদয়বর্ণনৈঃ॥ ইত্যাদি। অর্থাৎ মহাকবিরা প্রয়োজন অনুসারে মহাকাব্যে নগর, সমুদ্র, পর্বত, ঋতু, চন্দ্রোদয়, সূর্যোদয় প্রভৃতি বর্ণনা করতে পারবেন। রত্নাকর ও গণপতি এই বিধির চূড়ান্ত সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

মঙ্গলাচরণ শ্লোকে কবি জানালেন ধূর্জটি দেবাদিদেব মহাদেবকে স্তুতি—প্রার্থনা করলেন তিনিই যেন সকলের হিতসাধন করেন, যিনি নীলেন্দীবরচ্ছবি কালকূট কণ্ঠে ধারণ করেন, যে কালকূটরেখাকে দেখ্‌লে মনে হয় যেন হর নিজেই পূজোপহাররূপে প্রদত্ত ধূপোত্থ ধূম পান করেছেন বলেই তাঁর কণ্ঠদেশ হয়ে গেছে মলিন—

কণ্ঠশ্রিয়ং কুবলয়স্তবকাভিরাম-
দামানুকারিবিকটচ্ছবিকালকূটাম্।
বিভ্রৎ সুখানি দিশতাদুপহারপীত-
ধূপোত্থধূমমলিনামিব ধূর্জটির্বঃ॥ ১১

অগ্রসর হলেন তিনি মন্দরপর্বতস্থিত শিবের রাজধানী "জ্যোৎস্নাবতীর" বর্ণনা করতে, সঙ্গে সঙ্গে করলেন শিবের মাহাত্ম্য বর্ণন। জ্যোৎস্নাবতীর বর্ণন প্রসঙ্গে কবি বল্‌লেন—

যত্রাশ্মগর্ভকময়ূখশিখাপ্রকাশ-
শ্যামীকৃতা ভবনপুষ্করিণীতটেষু।
চেতো হরন্তি পরিণামি চিরোপভুক্ত
শৈবালসংহতিরসা ইব হংসযূথাঃ॥ ২৯॥

জ্যোৎস্নাবতীর ভবনসংলগ্ন পুষ্করিণীতটে মকরতমণির কিরণশিখা বিচ্ছুরিত হয়ে হংসবৃন্দকে করেছে শ্যামবর্ণে-রূপান্তরিত; মনে হচ্ছে যেন নিপীত শৈবালসমূহের রসে তারা হয়ে গেছে শ্যামবর্ণ—অতুলনীয় এ শোভা সকলের করছে চিত্তহরণ। দ্বিতীয় সর্গে শিবতাণ্ডব-বর্ণন। তৃতীয়ে ঋতু, চতুর্থে ও পঞ্চমে মন্দর-বর্ণন। ষষ্ঠ সর্গে প্রস্তুত বিষয়ের প্রথম অবতারণা। অন্ধক অসুর থেকে ঋতুরা এলো পালিয়ে—শিবের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে। বসন্ত ঋতু ঋতুদের মুখপাত্র হয়ে শিবের কাছে তাদের দুঃখ করুণভাবে নিবেদন করলেন। শিবকে স্তুতি জানালেন শৈবদর্শন-সংবলিত এক সুদীর্ঘ স্তবে। সপ্তম সর্গে অন্ধক-কর্তৃক স্বর্গ বিজয়ের সংবাদে শিবের গণগণের আত্যন্তিক বিক্ষোভ বর্ণন। এই দুর্দিনে কি নীতির অনুসরণ তাঁরা করবেন—তদ্বিষয়ক বর্ণনা অষ্টম থেকে ষোড়শ সর্গ পর্যন্ত। কালমুসল, প্রভাময়, বহ্নিগর্ভ, অগ্নিদংষ্ট্র, অট্টহাস, চণ্ডেশ্বর এবং পুষ্পহাস প্রমুখ গণাধিপগণ এই সকল সর্গে মুখ্য বক্তৃরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। ফলে কবির নীতিশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য পেয়েছে প্রকাশ। গণাধিপগণের মধ্যে আলোচনার ফলে কালমুসল অন্ধকের দরবারে দূতরূপে প্রেরিত হলেন। দূত গণাধিপ কালমুসল অন্ধককে স্বর্গরাজ্য দেবগণকে প্রত্যর্পণের জন্য অনুরোধ জানালেন।

পরবর্তী ১৩ অর্থাৎ ১৭-২৯ সর্গে গ্রন্থের মূল বিষয়ের কোনও প্রসঙ্গ নেই। আছে শিবের গণসমূহের আনন্দ-আহ্লাদের অফুরন্ত বিবরণ, সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়, চন্দ্রোদয় ও বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বর্ণন। এখানে শিবের অর্ধনারীরূপ পরিগ্রহণের ইতিহাস সুন্দর ভাবে বিবৃত হয়েছে। গণসমূহের আনন্দ-আহ্লাদ কামশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারেই হয়েছে বর্ণিত—সেই পুষ্পচয়ন প্রভৃতি। ফলে এই কয়টি সর্গে কবির কামশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য হয়েছে প্রকটিত।

ত্রিশ সর্গে কালমুসলের জ্যোৎস্নাবতী থেকে স্বর্গ গমনের বর্ণন। একত্রিংশ অন্ধকের বসতি স্থান স্বর্গের বর্ণনা। বত্রিশ থেকে ৩৮ সর্গে কালমুসলের দৌত্য, অসুরগুরু উশনার উদ্ধত প্রত্যুত্তর, কালমুসলের ক্রোধোক্তি, অন্ধকের গর্বোক্তি, অসুর কনকাক্ষ ও বজ্রবাহুর উক্তি এবং সর্বশেষে কালমুসলের শেষ প্রত্যুক্তি লিপিবদ্ধ হয়েছে। স্বর্গধাম পরিত্যাগ কালে কালমুসল বীররস-বিজৃম্ভিত বাক্যাবলী বলে গেলেন—

তাবদ্বাষ্পাম্বুপূর-প্লুত-নয়নযুগ-স্বর্গনারী-করাগ্রে-
জ্যোৎস্নাগৌরত্বিষোঽমী তব সদসি ধুতাশ্চামরা বিস্ফুরন্তি।
যাবৎ সংহারবেলামিব ন গণচমূমাগতাং সপ্তলোকী-
চিত্রাকার-ব্যবস্থা-বিঘটন-চতুরামীক্ষসে চন্দ্রমৌলেঃ॥

যে পর্যন্ত তুমি, সপ্তভুবনের বিচিত্রাকার ব্যবস্থার ওলট-পালট করিতে সুনিপুণ মহাদেবের গণসেনাদিগকে আসিতে না দেখিতেছ, সেই পর্যন্তই তোমার সভায় বাষ্পজলাপ্লুতনেত্রা স্বর্গনারীদিগের হস্ত দ্বারা চালিত হইয়া জ্যোৎস্না শুভ্র চামরগুলি শোভা পাবে॥ (৩৮।৮৯)

সংপ্রত্যেব ক্রোধবহ্নৌ পতংগা জাতা গেহেনর্দিনো যন্ন যূয়ম্।
তন্মে নাজ্ঞামণ্ডলস্রগ্বিভূষাং প্রাপ্তো মূর্ধা ধূর্জটের্দৈত্যনাথাঃ॥

গেহেনর্দী (নিষ্ফল গর্জনকারী) তোমরা যে এখনই আমার ক্রোধবহ্নিতে পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরিতেছ না—হে দৈত্যপতিগণ, এজন্য আমার মস্তক মহাদেবের আজ্ঞারূপ মালার দ্বারা শোভিত হয়ে আছে। অর্থাৎ আমার উপর মহাদেবের আদেশ আছে বলে তোমরা আজ রক্ষা পেলে॥৯০

ইত্যাক্ষিপ্য প্রগল্‌ভং দনুতনুজপতীন্ রোষরক্তারুণাক্ষাং-
স্তৎকালালঙ্ঘ্য-তেজঃপ্রসরগুরুভরব্যাহতার্কপ্রকাশঃ।
পিংষন্ রত্নাঙ্গদালীং ধুতকপিশরজঃ কল্পিতাশাঙ্গরাগাং
সাঙ্গারাপাঙ্গদৃষ্টিঃ কথমপি কুপিতস্তৎসভাং দূত ঔজ্‌ঝীৎ॥

VV, ৪৭-৭। Canto 38. P. 502

ক্রোধপরুষ-রক্তনেত্র দৈত্যপতিদিগকে এইরূপ উদ্ধত ভাবে তর্জন করে তৎকালপ্রসূত অলঙ্ঘ্য তেজের গুরুভারে সূর্যতাপ ব্যাহত করত [হস্তস্থিত] রত্নবলয় পেষণ করিতে করিতে জ্বলদঙ্গারবৎ অপাঙ্গ দৃষ্টি-বিশিষ্ট শিবদূত [গমনবেগে] উত্থিত কপিশবর্ণ ধূলি দ্বারা [সভার] চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে কোনমতে সেই সভা পরিত্যাগ করলেন॥৯১॥

ঊনচত্বারিংশ সর্গে কালমুসল শিবের নিকট অন্ধকাসুরের দুর্বিনীত

প্রত্যুক্ত বাক্য জানালেন। এই সর্গের শেষাংশ এবং ৪০, ৪১ ও ৪২ সর্গে শিবের বাহিনীর রণসাজসজ্জা, যুদ্ধপ্রস্তুতি এবং শত্রুপুরী আক্রমণ বিবৃত হয়েছে।

গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশে অর্থাৎ ৪৩-৫০ সর্গে যুদ্ধ-বর্ণন। ঘোরতর যুদ্ধ; কোন পক্ষ জয়লাভ করবে—এর যেন নিশ্চয়তা নেই। চণ্ডিকা, বিষ্ণু এবং অন্যান্য দেবতারাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন। সিদ্ধ ও সাধ্যেরা চণ্ডীর ভীম বিক্রম প্রকাশ প্রচার মানসে ৪৭ সর্গে শ্রীশ্রীচণ্ডী-স্তোত্র পাঠ করলেন—সমগ্র সর্গই একটী চণ্ডীস্তোত্র।

জননী চণ্ডিকা যখন যুদ্ধে অবতীর্ণা হয়েছিলেন, তখন ধরিত্রী কীদৃশী অবস্থা ধারণ করেছিলেন, তার বর্ণন করতে গিয়ে কবি ৪৬ সর্গের অন্তিম শ্লোকে বলছেন—

রত্নাদ্রৌ চণ্ডিকায়া বিকটকরিকটাট্টালকুট্টালকোটি-
ক্রুটাট্টটাঙ্কারিটঙ্কক্রকচকরকরারাবগুর্বী রণোর্বী,
প্রেঙ্খৎখড়্গাগ্রকৃত্তপ্রকটভটশিরঃপীবরস্কন্ধচক্র-
ক্রীড়াসক্তৎকবন্ধক্রমবিধুরধরাধারিবন্ধা তদাভূৎ ॥৮১॥

সুমেরু পর্বতে চণ্ডীদেবীর করিগণ্ডরূপ অট্টালিকার বিদারণকারী টঙ্কের অগ্রভাগ ভঙ্গজনিত টাঙ্কার শব্দ এবং ক্রকচের করকর শব্দ দ্বারা রণভূমি পরিব্যাপ্ত, ও বিস্ফুরিত অসির অগ্রভাগ দ্বারা ছিন্নমস্তক ও স্থূলস্কন্ধ সমূহ লইয়া ক্রীড়ামত্ত কবন্ধগণের পদসঞ্চালনে তৎকালে ঐ রণভূমির আধার বন্ধন (অথবা রণভূমির ধারণ বন্ধন) শিথিল হয়ে পড়েছিল।৪৬।৮১

তাই ৪৭ সর্গের প্রারম্ভে সিদ্ধসাধ্যেরা সুরু করলেন চণ্ডীস্তুতি—

সংগ্রামমূর্ধ্নি দলিতাসুরচক্রবালা-
মালোক্য তত্র বিকসৎপুলকপ্রবন্ধাঃ।
আবদ্ধগোচরপরিস্থিতবাক্‌প্রপঞ্চং
সংতুষ্টুবুর্ভগবতীমিতি সিদ্ধসাধ্যাঃ ॥৪৭।১ (পৃঃ ৬৮১)

রণক্ষেত্রে অসুরমণ্ডলীকে দলন করিতে দেখিয়া রোমাঞ্চিতগাত্র সিদ্ধ সাধ্যগণ স্তুতিবিষয়ে নিপুণ (অর্থাৎ স্তুতিযোগ্য) বাক্‌প্রপঞ্চ রচনাপূর্বক এইরূপে (বক্ষ্যমাণ প্রকারে) ভগবতীর স্তুতি করিতে আরম্ভ করলেন ॥ ৪৭।১

কিং চিত্রমত্র দলিতং রিপুচক্রবাল-
মেতত্ত্বয়া জননি যৎপ্রসভং রণাগ্রে।
নির্ভিন্দতী ভবনবর্তিনিশান্ধকার-
মাশ্চর্যধাম নহি দীপশিখা কদাচিৎ ॥ ৪৭।২

সমগ্র রিপুচক্রবালকে জননী রণে জয় করবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই; যেমন দীপশিখা গৃহস্থিত নিশান্ধকার বিদূরিত করবে—এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই ॥ ৪৭।২

চন্দ্রমুখী শঙ্করহৃদঙ্কগতা ভৈরবীকে ধ্যান করেই বহু সঙ্কটশোকগ্রস্ত ব্যক্তি শঙ্করতা প্রাপ্ত হন—

যোগেশ্বরীরুচিরচক্রকরালনাভি-
বদ্ধাস্থভৈরবহৃদঙ্কগতাং জনস্ত্বাম্।
ধ্যায়ন্নসংকলিতসঙ্কটশোকশাঙ্কু-
শঙ্কঃ শশাঙ্কমুখি শংকরতামুপৈতি ॥ ২৮

যোগেশ্বরীর মনোরম গভীর নাভিচক্র আশ্রয় করিয়া অবস্থিত ভৈরবের হৃদয়ে তুমি অবস্থান করিতেছ—প্রাণিগণ এইরূপে তোমাকে ধ্যান করিলে তাহাদের সঙ্কট ও শোকশল্যের আশঙ্কা বিদূরিত হয় এবং হে চন্দ্রমুখি, তাহারা শিবত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৭।২৮

একমাত্র জননী চণ্ডিকার প্রতি ভক্তিই বহু দুঃখ পরিপূর্ণ সংসার-কাননের কঠোর-কুঠার-ধারা; জননীই পরাৎপরা, তাঁর প্রতি ভক্তিই সারাৎসারা—

ক্লেশপ্রতানগহনাপ্রতিপন্নপার-
সংসারকাননকঠোরকুঠারধারা।
স্ফূর্জত্যনুত্তরতিরস্কৃত-তাপবন্ধ-
মেধামৃতস্রুতিরহো ত্বয়ি ভক্তিরেকা ॥ ৩১ ॥

হে দেবি, তোমার প্রতি একমাত্র ভক্তিই ক্লেশসমূহ দ্বারা দুর্গম অপার সংসার-কাননের কুঠারধারারূপে এবং সম্পূর্ণ ভাবে তাপমার্গের উচ্ছেদ-কারিণী মেধারূপ অমৃত-বৃষ্টি রূপে স্ফুরিত হয় ॥ ৪৭।৩১ ॥

পুরাতত্ত্ববিদেরা এই জননী চণ্ডিকাকে স্বর্গ-অপবর্গ-ফলসম্পদের অনন্যহেতু বেদমাতা বলেই জানেন,, সেই রূপেই ঘোষণা করেন—

তত্ত্বত্রয়ীকৃতপদাষ্টবিভেদবর্গ
নিঃশেষবাঙ্‌ময়নিবন্ধনবর্ণরাশিম্।
স্বর্গাপবর্গফলসংপদনন্যহেতু-
মাম্নায়মাতরমুশন্তি পুরাবিদস্ত্বাম্ ॥৪৫॥

পরা পশ্যন্তী ও বৈখরীরূপ তত্ত্বত্রয়ে অবস্থিত, যাবতীয় বাঙ্‌ময়ের কারণীভূত অষ্টবর্গে বিভক্ত—বর্ণরাশিরূপিণী তোমাকে পুরাবিদগণ স্বর্গ ও অপবর্গের ফলীভূত, কারণশূন্য (নিত্য) বেদমাতা বলিয়া কীর্তন করেন। অথবা স্বর্গাপবর্গরূপ ফল সম্পদের অনন্যসাধারণ কারণরূপে এবং বেদমাতা-রূপে কীর্তন করেন ॥৪৭।৪৫॥

জিনশাসনপ্রণেতারা জননীকে সর্ব-দুঃখাপহারিণী সন্তাপবিনাশিনী ভাবনা এবং অভ্যাস যোগের প্রভাবে জিনগণের আলোক হেতু রূপে বর্ণন করেছেন—

ক্লেশেন্ধনোৎকরনিরর্গলদাববহ্নি-
জ্বালাঃ স্তাবতমসা কিল ভাবনা ত্বম্।
অভ্যাসযোগবশতো জননী জিনানা-
মালোকহেতুরুদিতা জিনশাসনজ্ঞৈঃ ॥ ৪৯

ভাবনারূপিণী তুমি ক্লেশরূপ ইন্ধনসমূহের [দহনকারী] সদা-প্রজ্বলিত দাবানলের শিখারূপে অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া থাক। জৈন পণ্ডিতগণ তোমাকে জৈনদিগের অভ্যাসযোগজনিত আলোক হেতু (জ্ঞান কারণ) বলে থাকেন ॥৪৭।৪৯॥

জননী বোধির প্রকর্ষ প্রাপ্ত জিনের মুদিতাদি ভূমি সোপানপংক্তি, জননী চণ্ডিকাই সর্বপ্রকার সমাধির অধিষ্ঠাত্রী, জননী চণ্ডিকাই জৈনদের বারংবার কথিত ভবভঙ্গ হেতু প্রজ্ঞা—

প্রজ্ঞা ত্বমেব হতসংতমসাম্ব তস্ত

জৈনৈরভীক্ষমুদিতা ভবভঙ্গহেতুঃ ॥৫১॥

[হে মাতঃ! মোহময়ী তুমিই জিনদেবের ক্লেশরূপ ইন্ধনপুঞ্জঘটিত আশ্রবমার্গ (বিষয়মার্গ) রূপ বহ্নিজ্বালা এবং] তুমিই তাহার সংসারোচ্ছেদকারিণী অজ্ঞানান্ধকারনাশিনী প্রজ্ঞা বলিয়া জৈনগণ কর্তৃক নিরন্তর কথিতা হয়েছ ॥৫১॥

জননী চণ্ডিকাই বৌদ্ধদিগের অভয়নিরাত্মকতাসলগ্নরূপা মতি-পারমিতা—

ত্বং কীর্তিতাভয় নিরাত্মকতারলগ্ন-

রূপা ভবানি মতিপারমিতেতি বৌদ্ধৈঃ ॥৫২

সুগতের অষ্টাঙ্গ মার্গ দেখিয়ে দিয়েছেন তো আমাদের জননী করালবদনা চণ্ডিকাই—

ক্লেশপ্রতানগহনপ্রতিবন্ধশূন্য-

স্কন্ধপ্রবাহপরিহারিনিমিত্তমেকঃ।

অষ্টাঙ্গ এষ পরিনির্বৃতয়ে ত্বয়ৈব

সংদর্শিতোঽতিগহনঃ সুগতস্য মার্গঃ ॥৫৩

তুমিই পরিনির্বাণের (মোক্ষের) জন্য বৌদ্ধদিগের অতি দুর্জ্ঞেয় [সেই] অনন্যসাধারণ অষ্টাঙ্গ পথ দেখিয়েছ—যাহা ক্লেশের বিস্তার বশতঃ গহন নিরঙ্কুশ স্কন্ধসমূহের (বৌদ্ধদের মতে রূপাদি পাঁচটি স্কন্ধ আছে) পরিহারের কারণ ॥৫৩

অবধূতেরা জননীকে বলেন অক্তকুলপ্রসূতি তারা (৪৭।৫৪) কেও বা জননীর উপাসনা করেন "সর্ববস্তুলাখিলদৃষ্টিসংজ্ঞা" বিদ্যারূপে ; কেও বা তাঁকে ডাকেন "সংকর্ষণা" বলে (৫৫) ; একায়নেরা তাঁকে বলেন—অলিঙ্গা ভগবতী (৫৬)। এরূপে নিখিল ভারতবর্ষে যুগে যুগে যত প্রকারের ধর্মসম্প্রদায়, দর্শনসম্প্রদায় উদ্ভূত হয়েছে, জননীই যে যুগে যুগে তাঁদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে স্বীয় বিভূতি দানে ধন্য করেছেন—কবি তার অতুলনীয় বর্ণনা প্রদান করেছেন, এরূপে তৈত্তিরীয়করা তাঁকে রসাদি কোষচক্রের হেতু বলে জানেন (৭০) ; শাব্দ দার্শনিকেরা জননীকে জানেন স্ফোটরূপে (৮১) ; বাগীশ্বর প্রণবই জননীর মুখ (৯২) ; তিনিই বৈষ্ণবী (১৪০) ; তিনিই মাহেশ্বরী (১৪১)। কবি বন্দনার অন্তিম ভাগে জননীর কাছে যে প্রার্থনা জানালেন—তা একান্তই তাঁর মনের কথা—অর্থাৎ জননীই হচ্ছেন সর্বজ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির আদি নির্বাণ ; জননীই বৌদ্ধ, জৈন, সর্ববিধ জ্ঞাতৃবৃন্দের নির্বাণ মোক্ষ প্রভৃতির একমাত্র কারণ—ভিন্ন মার্গে অগ্রসর হয়েও একই পরমারাধ্যা জননীর অভয় চরণে নির্ভয় স্থান লাভে ধন্য হন—তাই কবি সিদ্ধ ও সাধোরা নিরন্তর প্রার্থনা জানিয়েছেন—হে জননি! পুণ্য যদি কিছু করে থাকি, তবে সেই সব কিছুর বিনিময়ে তোমার প্রতি কেবল "ভক্তি" টুকুই দাও, আর কিছুই চাইনে মা—

ইতি তব গুণবাদতঃ কিলাস্মাজ্জননি যদর্জিতমস্তি পুণ্যজাতম্।

প্রতিসমরমিহং ত্বদঙ্ঘ্রিপূজাভিরতিফলা ত্বয়ি তেন নোঽস্ত ভক্তিঃ ॥

অতঃপর শম্ভু নিজেই অন্ধক অসুরের বধ সাধন করলেন।

কবি রত্নাকর বাণভট্টের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন তা' নিজেই স্বীকার করেছেন এবং বাণভট্টই ছিলেন তাঁর আদর্শ। ফলে রচনাশৈলী ও ভাষা প্রায় তদনুযায়ীই হয়েছে। রচনায় সমুদায়ক, পদ্মবন্ধ, প্রতিলোমানুলোম, প্রতিলোমবিলোমার্ধপাদ প্রভৃতি কৃত্রিমতার আদর্শ অনুসৃত হয়েছে। কয়েকটী সর্গে যমকের বহুল প্রয়োগ রয়েছে। জটিল ছন্দের অবতারণাও অপরিমিত। সবই সত্য। তা হলেও বলতে হ'বে—কবির আদর্শের প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধাপরায়ণ—তাঁদের এরচনায় ক্লান্তিবোধ হবে না, আনন্দ উপভোগ তাঁরা করতে পারবেন। কবির ছন্দঃপ্রয়োগ-বিষয়ে তো কাশ্মীরের প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাস স্বয়ং তাঁর সুবৃত্ততিলক গ্রন্থে রত্নাকরের প্রশস্তি লিপিবদ্ধ করে গেছেন—

"বসন্ততিলকারূঢ়া বাগ্‌বল্লী গাঢ়সঙ্গিনী।

রত্নাকরস্যোৎকলিকা চকাস্ত্যাননকাননে" ॥

ফলতঃ বসন্ততিলক ছন্দের প্রতি রত্নাকরের বিশেষ অনুরাগ ছিল, সেটী তাঁর গ্রন্থ পর্যালোচনাকালে স্বতঃই দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁর কবিখ্যাতির অন্যতর বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে শাঙ্গধর পদ্ধতি,(১) শ্রীধরদাসের সদুক্তি-কর্ণামৃত(২) প্রভৃতি বিশিষ্ট কোষ-কাব্য গ্রন্থ সমূহে রত্নাকরের কবিতা সগৌরবে সমুদ্ধৃত হয়েছে। তন্মধ্যে একটী কবিতায় তালপদের বিশেষ সৌন্দর্যবিমণ্ডিত প্রয়োগের জন্য কবি "তালরত্নাকর" পদবীতে বিভূষিত হয়েছিলেন—

অস্তাবলম্বিরবিবিম্বতয়োদয়াদি-

চূড়োন্মিষৎসকলচন্দ্রতয়া চ সায়ম্।

সন্ধ্যাপ্রবৃত্তহরহস্তগৃহীতকাংস্য-

তালদ্বয়ীব সমলক্ষ্যত নাকলক্ষ্মীঃ ॥

(শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, ১১৭, ২)

সায়ংকালে রবিবিম্ব অস্তাচলে যাচ্ছেন বলে এবং উদয়াদ্রির শিখরে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়েছেন বলে তাৎকালিক স্বর্গশোভা যেন সন্ধ্যাপ্রবৃত্ত মহাদেবের দুই হাস্ত ধৃত দুইটি কাংস্য তালের (অর্থাৎ, করতালের) ন্যায় দৃষ্ট হয়েছিল। (শার্ঙ্গধর পদ্ধতি—১১৭, ২—)

এ সকল প্রাচীন গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ পর্যালোচন-কালে একটী বিস্ময়কর অনুভূতি আমাদের হৃদয়ে জাগে স্বতঃই—সেটা হচ্ছে এই—এঁরা এক একজন কত অনন্ত বিদ্যার অধীশ্বর ছিলেন—কত অগাধ ছিল এঁদের পাণ্ডিত্য। রত্নাকর আলোচ্য বর্তমান গ্রন্থ ব্যতীত বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা ও ধ্বনিগাথা পঞ্জিকাও রচনা করেছিলেন। তাঁর এই দুই গ্রন্থের কথা ছেড়ে দিলেও এক হরবিজয় মহাকাব্য গ্রন্থেও তিনি অলঙ্কার, ছন্দঃ, ব্যাকরণ, ধর্ম, দর্শন, প্রয়োগ-পদ্ধতি সর্ব বিষয়ের কি অপরিসীম পাণ্ডিত্যই প্রকাশ করে গেছেন। কোন পদ্ধতিতে বিদ্যানুশীলনের ফলে এই অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন সম্ভবপর হয়? বর্তমান স্বাধীন ভারতেও কি তাদৃশ বিদ্যানুশীলন সুদূরপরাহত! কবি রত্নাকর তাঁর গ্রন্থে আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন সাধনপ্রভাবে এমন কি শিশু অকবিও কবি হয়, ক্রমে কবি মহাকবি হয়। হরবিজয় মহাকাব্য রচনার সময়ে এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা।

হরবিজয়মহাকবেঃ প্রতিজ্ঞাং শৃণুত কৃতপ্রণয়ো মম প্রবন্ধে।

অপি শিশুরকবিঃ কবিঃ প্রভাবাদ্ ভবতি কবিশ্চ মহাকবিঃ ক্রমেণ ॥

(পৃঃ ৭০৮, শ্লোঃ ৭)

কবির শাশ্বত সারস্বত সাধনা চিরকাল দেশকে ধন্য করেছে। আনন্দবেদ্যা পরমা জননীর এই পরম ভক্ত কবিকে আমরা তাঁর শত শত বৎসর পরের উত্তরাধিকারিবৃন্দ আমাদের ভক্তিবিনম্র পরম শ্রদ্ধা অর্ঘ্য নিবেদন করি ॥

---

(১) কাঞ্চীগুণৈর্বিরচিতা ইত্যাদি (শা, প, ৯৮, ৬০)

(২) ২, ৬১৬—অথ রতিরভসাৎ ; ২, ৫৬৮ এষা গতৈবং ; ২, ৬৮৮ প্রত্যগ্রদংশজনিত ; ৫, ৫৭ বীচীসমীরধূত ; ২, ৬৩২ সলীল নিধূত ; ১, ৪৬ স্তনপরিণরভাগে—শার্ঙ্গধর পদ্ধতি, ১২৯ ১

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিষয়—তাঁহার জীবনী, উপদেশ প্রভৃতি সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ পূর্ব্বেই বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কবি ও উপন্যাসিক শ্রীমান্ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত 'পরম-পুরুষশ্রীরামকৃষ্ণ' বাঙ্গালা সাহিত্যে এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষা, চরিত্র-বিশ্লেষণ, ঘটনার সংস্থান এবং বর্ণনা অপরূপ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য মণ্ডিত। সরস ও সুন্দর কবিত্বপূর্ণ ভাষায় লিখিত হওয়ায় পরমহংসদেব সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার গ্রন্থ নিচয় বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান,—তাহা কেহ কি অস্বীকার করিতে পারেন? 'শ্রীম' কথিত রামকৃষ্ণকথামৃতের ন্যায় অচিন্ত্যকুমারের গ্রন্থনিচয় ও বাঙ্গলার সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা সেকথা বিশেষরূপেই অবগত আছি। আমাদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। সেকালের 'ধর্ম্মতত্ত্বে' ও বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানের তৎসমকালের যে সমুদয় পত্রিকা হইতে পরমহংসদেব সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাইতেছি, আমরা এখানে তাহা প্রকাশ করিতেছি। হয়ত ইহা পূর্ব্বেও প্রকাশিত হইতে পারে, তথাপি ইহা উল্লেখযোগ্য মনে করিতেছি।

ধর্ম্মতত্ত্ব ১৮০৩। ১৬ জ্যৈষ্ঠ,। ১৫ ভাগ।
৯ম সংখ্যা, শনিবার।

সম্প্রতি কলিকাতা হইতে বাষ্পীয় পোতে আচার্য্য মহাশয়ও প্রায় ৮০।৯০ জন ব্রাহ্ম দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মহাশয়ের সহিত সাধুসঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন। পরমহংস মহাশয় যেরূপ ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ কথা কহিয়া থাকেন ও ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা ভাব গীত নৃত্য ও সমাধি দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব। ১৬ই আষাঢ়। ১৫ ভাগ ১১ সংখ্যা।
বুধবার ১৮০৩ শক।

দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস বলেন যে লোকে ঘুনি পাতিয়া রাখে, আর মৎস্য সকল জলস্রোতে তাহার মধ্যে গিয়া নিপতিত হয়। ঘুনির দ্বার বন্ধ না থাকিলেও মৎস্যসকল আর বাহিরে পলায়ন করেনা। ঘুনির ভিতর জল ক্রীড়া করিতে থাকে আর তাহারা সেই সঙ্গে ক্রীড়া করে। অনেক প্রকার মাছ এক স্থানে দলবদ্ধ হয়, সুতরাং তাহারা পরস্পরের প্রতি আসক্তিবশতঃ পথ খোলা থাকিলেও কোনক্রমে বহির্গত হয় না। তবে দৈবাৎ কখন এক আধটা মাছ পলায়ন করে। মাছগুলি ঘুনির ভিতর মহা আমোদে থাকে, শেষে ঘুনিস্বামী আসিয়া ঘুনি তুলিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদিগকে চড়চড়ি রাঁধিয়া আহার করিয়া ফেলে। পৃথিবীর সাধারণ লোকদিগের এই প্রকার অবস্থা। সংসার-রূপ ঘুনির মধ্যে পড়িয়া তাহারা অনিত্য সুখ তরঙ্গে নানাপ্রকার কেলী ও আমোদ করিতে থাকে এবং দারাপুত্র পরিবারের মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ হইয়া তাহারা ধর্ম্ম সাধনরূপ পথ খোলা থাকিলেও কোন ক্রমে সংসার হইতে মুক্ত হইতে চায়না। শেষে শমন আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া চড়চড়ি রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে। কেবল দুই এক সুচতুর ব্যক্তি সংসার ঘুনি হইতে সময়ে পলায়ন করিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করে।

ধর্ম্মতত্ত্ব ১লা শ্রাবণ। ১৮০৩ শক। শুক্রবার।
১৫ ভাগ। ১২ সংখ্যা।

দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস যথার্থ-ই শিশু। এমন শিশুর ন্যায় নির্দ্দোষ সরল চরিত্র ব্যক্তি কুত্রাপি দেখা যায় না। তিনি মধ্যে ষ্টীমারে চড়িবার সাধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে সকল পদার্থকে তিনি তুলনার স্থল করেন, সেইগুলি এক একবার স্বচক্ষে দেখিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা। সমুদ্রকে সর্ব্বদা দৃষ্টান্ত স্থল করেন বলিয়া তাঁহার ইচ্ছা একবার সমুদ্রও দর্শন করেন। ইনি যে মিথ্যা কল্পনা প্রিয় নহেন, তাঁহার এ প্রকার ইচ্ছায় তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার দেবতা কাল্পনিক নহে, তিনি যোগ বলে আপন ইষ্টদেবতাকে দর্শন করেন; এবং তিনি এ প্রকার সত্যপ্রিয় যে তিনি যে সকল দৃষ্টান্ত দেন তাহাও কল্পনা হয় না, তাহা প্রত্যক্ষ বস্তু হয়, তাহার তুলনা দিতে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কোচ উপস্থিত হইতে না পারে। এই প্রকার মহৎ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই অতি বালকের ন্যায় তিনি ষ্টীমারে চড়িবার সাধ প্রকাশ করেন। বিগত শ্রাবণ, শুক্রবারে আমাদিগের আচার্য্য মহাশয় কতকগুলি ব্রাহ্মবন্ধু সঙ্গে বর্ষাকালের প্রশস্ত এবং তরঙ্গসঙ্কুল গঙ্গার বক্ষে ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংসকে তুলিয়া লন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নদীবক্ষে ধর্ম্মালাপ ও ব্রহ্মসংগীতে সকলে মহানন্দ সম্ভোগ করেন। শেষে ভক্তদিগকে প্রচুর পরিমাণে মুড়ি নারিকেল বিতরিত হয়। পরমহংসকে একজন দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়া দেখিতে বলিলেন, তিনি এই উত্তর প্রদান করিলেন, তুমি বল কি, আমার মন এখন ঈশ্বরে রহিয়াছে আমি তাহা হইতে উঠাইয়া লইয়া এই দূরবীণে বদ্ধ করিব? তিনি ষ্টীমারের কল দেখিতে অনুরুদ্ধ হইলেও তাহা দেখিলেন না, তিনি ষ্টীমারের ঝক্ ঝক্ শব্দ শুনিবার জন্য উৎসুক ছিলেন তাহা শুনিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। গঙ্গা বক্ষে ষ্টীমারে চড়িয়া সাধুগণ হরি প্রসঙ্গে আমোদ করেন ইহা অপেক্ষা এ সংসারে অধিক সুখ কি হইতে পারে। এই প্রকার সু-আমোদ কবে ভারতবাসীসকল করিতে শিখিবে?

ধর্ম্মতত্ত্ব। ১৬ই শ্রাবণ, শনিবার ১৮০৩।
১৬ ভাগ ১৩ সংখ্যা।

দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস বলেন যদি কোন ধনী জমিদারের বাড়ীতে কেহ ভৃত্য থাকে হয়ত তাহার ইচ্ছে হয় প্রভু যদি একবার তাহার

বাটীতে পদার্পণ করেন তাহা হইলে তাহার গ্রামে কিঞ্চিৎ মান্য হয় এবং সে কৃতার্থও হইতে পারে। সে একদিন সাহস করিয়া তাহার প্রভুকে তাহার ইচ্ছা বিদিত করিল। প্রভু একটু হাস্য করিয়া তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার ভৃত্যের অবস্থা তিনি সকলই অবগত, সুতরাং দিন স্থির হইলে তিনি তাহাকে কিছু অর্থ দান করিয়া তাহার বাটির চতুষ্পার্শ্বস্থ বন পরিষ্কার করিতে আদেশ করিলেন। যে স্থানে গিয়া বসিবেন তাহাও প্রশস্ত এবং পরিচ্ছন্ন করিতে অনুমতি করিলেন। পরে নিজ গৃহ হইতে বসিবার শয্যাসকল পাঠাইতে লাগিলেন, ঝাড়-লণ্ঠন, তামাক খাইবার গুড়গুড়ি, ভোজনার্থ রৌপ্য-নির্ম্মিত তৈজস সকল পাঠাইয়া দিলেন, শেষে ভার ভার আহারের সামগ্রী গেল, এইরূপে সমস্ত আয়োজন সুসম্পন্ন করিয়া শেষে যানে আরোহণপূর্ব্বক বহু লোকজন সঙ্গে ভৃত্যের ভবনে গমন করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিলেন। তদ্রূপ, ভক্ত যখন তাহার প্রভু পরমেশ্বরকে তাহার হৃদয় গৃহে আসিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিতে বলেন, তখন দয়াময় হরি আপনি ব্যবস্থা করিয়া তাহার অন্তরের পাপরূপ বন জঙ্গল সমস্ত পরিষ্কার করিয়া দেন, তাহার হৃদয়কে প্রশস্ত এবং পরিমার্জ্জিত করিয়া লয়েন, ভক্তি প্রেম-পুণ্যের ঝাড়-লণ্ঠন সজ্জা ও আহারীয় সকল আপনার ভাণ্ডার হইতে পাঠাইয়া দেন, এইরূপে ভক্তের কাজ সকলই নিজে করিয়া আপনি অনন্ত মহিমার যানে আরোহণপূর্ব্বক মহাত্মা সাধু প্রভৃতি বহু লোকজন সঙ্গে তাহার হৃদয়ধামে উপস্থিত হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা করেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব। ১৩ ভাগ। ২।৩ সংখ্যা। ১৬ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৮০০ শক।

উনপঞ্চাশত্তম সাংবাৎসরিক উৎসব।

১২ই মাঘ শুক্রবার বেলঘরিয়া তপোবনে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস যাহা বলেন, তাহার সংক্ষিপ্তসার এই :—

১। ঈশ্বরকে ভুলিয়া স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া মত্ত থাকা অবিদ্যার খেলা। ভক্ত সঙ্গে ঈশ্বরপ্রসঙ্গে আমোদিত হওয়া বিদ্যার খেলা। সংসারাবদ্ধ জীবেরা কিরূপে দুই পয়সা অর্জ্জন করিবে, সর্ব্বদা এই ভাবে। বিদ্যার খেলা তাহাদের ভাল লাগে না। তাহারা আপনারাও হরিগুণ গায় না, অন্যকেও হরিগুণ গান করিতে দিতে চায় না, বন্ধুবান্ধবদিগকেও মায়া-হ্রদে ডুবাইতে চেষ্টা করে।

২। যেমন হুঁকোর জল এক দিক দিয়া আসে এবং অন্য দিক দিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ মুক্ত জীবের হস্তে যে বিষয়সম্পদ আসে, তাহা সদ্ব্যয়ে নিঃশেষিত হইয়া যায়।

৩। মুমুক্ষু জীব সংসার ভোগ করে; কিন্তু সে জানে ঈশ্বরই কেবল সত্য, স্ত্রীপুত্রাদিপূর্ণ এই সংসার মিথ্যা—এই জন্য সে মনে মনে সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া কিরূপে ঈশ্বরকে পাইবে এই জন্যই ব্যস্ত থাকে।

৪। যেমন উকীলকে দেখিলে কাছারীর কথা মনে পড়ে, সেইরূপ ভক্তকে দেখিলে জগতের রাজাকে মনে পড়ে।

৫। বড়লোকের মাল বিষয় অনেক, তাঁহারা অনেক লোককে তাহা বিতরণ করেন, স্বার্থপর সাধক কেবল নিজেই আমটি খায়। মহাজন ষ্টীম্ বোটের ন্যায় অনেক লোককে আপনার সঙ্গে বাঁধিয়া শান্তিধামে চলিয়া যান।

৬। সাধু লোকের স্বভাব প্রদীপের ন্যায়। সাধু শত্রু মিত্র উভয়ের নিকট তাঁহার সাধুতার সৌরভ বিস্তার করেন, যেমন প্রদীপ স্বভাবতঃ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠক এবং জালকারী উভয়কেই আলোক দেয়।

৭। প্রেমাভক্তিতে অহং ত্যাগ হয় এবং ঈশ্বরেতে সমতা জন্মে।

৮। গুজরত খোদ সোনার প্রতি লোভ করিবেন দূরে থাকুক যে তাঁহার নাম লয় সেও বিষয় সুখকে কাজের বিষ্ঠাবৎ হেয় মনে করে।

৯। একজন ভক্ত ঈশ্বরকে বলেছিলেন, তোমার চিন্তা করে আমি পাগল হইয়াছি, এখন কিছুকাল তুমি আমার চিন্তা কর।

১০। জ্ঞানের রূপ পুরুষ, ভক্তির রূপ স্ত্রী।

১১। ভগবানের শক্তি লক্ষ্মী সকলকে ধনসম্পদ দান করেন, তাঁহার শক্তি সরস্বতী বিদ্যা দান করেন।

১২। অগ্নি সর্ব্বত্র আছে; কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নির উজ্জ্বল প্রকাশ হয়, সেইরূপ মা সকল জীবের শরীররূপ চিকের ভিতর ধনীর কন্যার ন্যায় লুকাইয়া আছেন, কেবল বৈরাগীই তাঁহাকে দেখিতে পায়। যতদিন বিবেক বৈরাগ্য আগুনে মায়া রস শুকাইয়া না যায় ততদিন মাকে কেহ ভালরূপে দেখিতে পায় না।

১৩। মকরধ্বজ জমিয়া গেলে বোতল ভাঙ্গিয়া ফেলে, সেইরূপ প্রভুর ইচ্ছা সম্পন্ন হইয়া গেলে মনুষ্য শরীরের আর প্রয়োজন থাকে না। সোণার প্রতিমা ঢালা হলে আর মাটির ছাঁচে (শরীরের) প্রয়োজন কি?

ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই ফাল্গুন। ১৮০৩। সোমবার। ১৬ ভাগ। দ্বিতীয় সংখ্যা।

১২ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তা জোসেফ কুক সাহেবের সম্মানার্থ প্রেরিত মণ্ডলী এবং কতিপয় বন্ধু সমবেত হইয়া বাষ্পীয় শকটযোগে দক্ষিণেশ্বর গমন করেন। এই সঙ্গে মানার্হা মিস্ পিগটও ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংস মহাশয়কে বাষ্পীয়শকটে তুলিয়া লওয়া হয়। তাঁহার ভাবাবেশের ঘোর সমুদায় সময়ের মধ্যে একবারও প্রায় তিরোহিত হয় নাই। ভাবাবেশে প্রার্থনা উপদেশ সঙ্গীত সকলই মধুর এবং জ্ঞানদ। তিনি দেবীকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া যে প্রার্থনা করেন তাহা অতি জীবন্ত। তাঁহার দেবতা তাঁহাকে কেবলই ধর্ম্ম প্রচারার্থ পীড়াপীড়ি করেন। ইনি কিছুতেই মাথা দিতে চাননা। শুদ্ধসত্ত্ব দু চারিজন যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগের দ্বারা এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। জোসেফ কুক সাহেব এবং কুমারী পিগট তাঁহার আশ্চর্য্যভাবে প্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

এখানে ভ্রমক্রমে বাষ্পীয়পোতকে বাষ্পীয় শকট বলা হইয়াছে। এখানে 'আচার্য্য' বলিতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে বুঝাইতেছে।

দুঃস্বপ্ন

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অর্থের অস্বচ্ছলতা প্রযুক্ত কিছুদিন যাবৎ ভগবৎ-ভক্তির প্রকটতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গৃহে সর্ব্বদা নাই-নাই। গৃহিণী দিবারাত্রি তারস্বরে তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছেন—পার্থিব জগতে চাহিয়া বা পরিশ্রম দ্বারা উদরান্ন সংস্থান করা অন্ততঃ মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে এবং বর্ত্তমান ভারতে একেবারেই অসম্ভব। অতএব অদৃশ্য অজ্ঞাত মহাশক্তিধর শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে।

বৈশাখের খর রৌদ্রে সকাল সকাল স্নান করিয়া, ভগবানের নাম করি। গীতা পাঠ করি, সুখে দুঃখে সমজ্ঞান করিয়া প্রজ্ঞাবান হইবার চেষ্টা করি—কিন্তু জ্ঞানের সাম্যটা ঠিক উপলব্ধি হয় না। গৃহদেবতা কেহ নাই, তবে ছেলেরা মেলায় গণেশ, মহাদেব, মা দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতির পুতুল কিনিয়া একটা প্যাকিং বাক্সে সাজাইয়া রাখিয়াছে—তাহারই সামনে বসিয়া বিশ্বব্যাপী নারায়ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু চারি পাশে কল-কোলাহলে মনটা বিভ্রান্ত হইয়া যায়। উঠিবার সময় বলি,—বাবা বিশ্বনাথ, মা মঙ্গলময়ী, অর্থ দাও, দুই এক লাখ টাকা দাও—নইলে এই চাকুরী আর এই সংসার যে বহন করিতে পারি না।

ভগবানের কর্ণে সে কথা পৌঁছায় কিনা জানি না,—তবে তাহার সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়াই বলি। মাঝে মাঝে বলি,—বাবা বিশ্বনাথ, তোমার পৃথিবীতে বিরাট অট্টালিকার ছায়ায় বসিয়া ভিখারী ভিক্ষা করে কেন? সাহেবের মাহিনা ও কেরাণীর মাহিনায় এত তফাৎ কেন? মন্ত্রী ও মাষ্টারের মাহিনায় এত পার্থক্য কেন? বড়লোকে ছানার খাবার খায়, আর গরীবের ছেলে দুধ পায় না খেতে—কেন?

মাসের শেষে আর্থিক অবস্থা যতই শোচনীয় হইতে লাগিল—ভগবৎ ভক্তিও সেই পরিমাণ উৎকর্ষতা লাভ করিল। রাত্রিতে শয়নকালে ভগবানের নাম ও বীজমন্ত্র জপ করিয়া বলিলাম, কালকার হাটটা চালিয়ে দিও বাবা বিশ্বনাথ। মা করুণাময়ী কাল যেন দোকানদার ধারটা অন্ততঃ দেয়—ভগবানের চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাইয়া শুইয়া পড়িলাম এবং বলা বাহুল্য ঘুমও আসিল।

বৈশাখের গরমে ভাল ঘুম না হওয়াটাই স্বাভাবিক, হঠাৎ বোধ হয় স্বপ্ন দেখিলাম—আমি চলিতেছি, নগর কান্তার অতিক্রম করিয়া বিপুল গতিতে শূন্যমার্গে চলিতেছি। কতক্ষণ জানি না,—চলিতে চলিতে হঠাৎ পথ রুদ্ধ হইল, দেখিলাম সম্মুখে ভাস্বর হিমালয়। প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি-সমুজ্জ্বল তুষারকিরিটী হিমালয় শৃঙ্গ; তাহার উপরে জ্যোতির্ম্ময় দেবাদিদেব মহাদেব আসীন, হস্তে ডমরু, শৃঙ্গ,—পার্শ্বে তুষারের মাঝে প্রথিত কনকবর্ণ সূচ্যগ্র ত্রিশূল।

অশ্রুপ্লুত চোখে গদগদ কণ্ঠে কহিলাম—প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং। করজোড়ে নিল-ডাউন হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ বাদে দেবাদিদেব মহাদেব চক্ষুরুন্মিলন করিয়া কহিলেন,—কেয়া বেটা? কেয়া মাংতা?

বিনীত কণ্ঠে কহিলাম, প্রভু আমি বাঙালী,—রাষ্ট্রভাষা এখনও শিখ্‌তে পারি নি। দয়া করে যদি বাংলায় বলেন তবে বুঝতে পারি।

দেবাদিদেব মৃদু হাস্য করিলেন—মনে হইল তাঁহার হাসির অর্থটা এইরূপ যেন আমি হিন্দি শিখিতে পারি নাই বলিয়াই আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, কি বাপু, কি চাইছিস্? বার বার এত ডাকাডাকি কচ্ছিস্ কেন?

—বাবা, আমি বড় গরীব। অন্নবস্ত্র চলে না, তোমার পায়ে আশ্রয় চাই বাবা—

বাবা কহিলেন,—অন্নবস্ত্র কার চল্‌ছে বল্? বিরলা,

গোয়েঙ্কা, টাটা তাদেরও চলে না—তাইত রোজ বল্‌ছে।

—আজ্ঞে তাদের চলা আর আমার চলার মাঝে তফাৎটা কি আপনিও দেখ্‌তে পান না? না হয় একবার ভারত-ভূমিতে যেয়ে দেখে আসুন—

দেবাদিদেব দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন,—না, মর্ত্ত্যে আর যাবো না, ধ্বংস কার্য্যটা এতদিন আমারই ছিল—এখন তোরা এটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করেছিস, এখন আর আমার দরকারটা কি? আমার কাজটা ত তোরাই পারবি

—আজ্ঞে সেটা আমরা পারবো। বোমা ব্যতীতও পারতাম, তবে ওটায় একটা সুবিধে হল, তাড়াতাড়িই কার্য্য সমাধা হবে—

বাবা হাসিয়া কহিলেন—তবে?

—আজ্ঞে আমার ছেলে চ'ণ্ডে আর তার মা এরা বড় কষ্টে আছে। কাপড় নেই—জামা নেই। একদিন সিনেমায় যেতে পারে না, রেডিও নেই। বড় কথা শোনায়। তোমার নাম যখন করতে বসি তখন গালাগালি করে। যদি কিছু দিয়ে দিতেন তবে এ জন্মটা একটু দুধে-ভাতে কাটাতে পারতাম—

বাবা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—কি দেবো? টাকা? আমার কি টাকার মিণ্ট আছে, না নোট ছাপার কারখানা আছে? টাকা পাবো কোথায়?

আমি ভীত হইয়া চুপ করিলাম। যে লোক নেংটি পরিয়া, ছাই মাখিয়া বসিয়া আছে তাহার কাছে টাকাই বা চাহি কোন লজ্জায়! বরং দশপ্রহরণধারিণী সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা মা'র কাছে চাইলেই ভাল হইত।

বাবা কহিলেন,—তবে আমরা দেই বটে—

—আজ্ঞে কি করে বাবা?

—হ্যাঁ তবে শোন্ বলি। আমি আর তোদের মা যাচ্ছি, দেখি বনের মধ্যে গণেশের মন্দির। গরীব এক ব্রাহ্মণ কোনমতে পূজো করে, খাওয়ার কষ্ট হয়। তিনি বল্লেন পূজোরী বামুন যখন ভক্তিমান তখন ওকে কিছু দিয়ে দাও। বললুম—দিয়ে দেবো। কালই সূর্য্যাস্তের মধ্যে লাখ টাকা দেব। বনের মাঝে ছিল এক ধনকুবের মাড়োয়ারী—সে শুনলে। সে বামুনকে ধরলে, 'কাল যা পাবে আমাকে দেবে'। তোমাকে হাজার টাকা দেব। বামুন নিতে চায় না—শেষে সে পঞ্চাশ হাজার দিতে রাজি হল। বামুনও নিলে। ফাট্‌কায় রাতারাতি পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ। মাড়োয়ারী পরদিন তক্কে তক্কে ঘুরছে কখন লাখ টাকা আমি দেব। সূর্য্য ডুবু ডুবু—তখন পঞ্চাশ হাজারের শোকে অভিভূত হয়ে গণেশকে মারলে লাথি,—ব্যাটা দেবতারাও মিথ্যাবাদী। গণেশ ঠ্যাং ধরে রাখলে ফাঁপা পেটের মাঝে। তোমার মা জিজ্ঞাসা করলে—বামুনকে লাখ টাকা দিলে? আমি বললুম,—পঞ্চাশ হাজার দিয়েছি, আর পঞ্চাশ হাজারের জন্যে ঠ্যাং ধরে রেখেছি। আমরা এই ভাবেই ত দিই বাবা,—আমাদের ত নোট ছাপার কারখানা নেই।

আমি প্রণাম করিয়া কহিলাম,—বাবা, ঐ ভাবেই না হয় কিছু দাও।

বাবা মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—কি চাস্? জমিদারী—

—আজ্ঞে জমিদারী নিয়ে কি করবো! সে ত গভর্ণমেণ্ট কেড়ে নেবে। মাঝে থেকে রিটার্ণ দিতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে—জমি জরিপের সময় মাঠেই হয়ত দেহটাও যাবে—

—তবে কি চাস্—বল্—

আমি মাথা চুলকাইয়া কহিলাম—দুই চার মণ সোনা দিয়ে দিলে হত না বাবা?

—ওরে গাধা, আমার কি সোনার খনি আছে? আর তা দিলেও ত তোকে ১০৭ ধারায় ফেলে জেলে দিয়ে দেবে—

—আজ্ঞে বাবা, না হয় একটা কিছু করুন। গণেশ ঠাকুরকে যেমন করে দিয়েছিলেন তেমনি করেই না হয়—

দেবাদিদেব কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—কি করিস্?

—আজ্ঞে মাষ্টারী করি, গুরুগিরি—

—উপরি টুপরী কেমন? আজকাল ত শুনতে পাই সব চাকুরেরই উপরী পাওনা বেশ পাওয়া যায়—

—আজ্ঞে তা সত্যি, তবে মাষ্টারীতে এখনও উপরী পাওনা তেমন কিছু হয় নি—

দেবাদিদেব কহিলেন,—তবে কি করে তোকে বড়লোক করি বল ? তোদের আর কোনো উপায় নেই—

আমি বক্তৃতা দিবার ভঙ্গিতে কহিলাম,—ঠাকুর, আমরা এই নিম্ন-মধ্যবিত্তরাই সংস্কৃতি ও কৃষ্টির বাহন। আমরাই জেল, ফাঁসি বরণ করে স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছি, আর আমরা এতটুকু তার ভাগী হব না—

—সেই ত নিয়ম। তোদের মা সকলকে খাইয়ে বেড়ান, নিজের বেলা কাঁচা লঙ্কা, নুন আর তেঁতুল। যে রাঁধে সে কি খায় ? তবে একটা হাঁড়ি তোকে দিতে পারি, যা বলবি সেই খাবার হাঁড়িতে ভর্ত্তি থাকবে—

—আজ্ঞে খাওয়াটা না হয় চললো—কিন্তু সিনেমার পয়সা, জর্জ্জেট শাড়ী, স্যাণ্ডেল জুতো এসব কোথায় পাবো ? তাতে বিপদ আরও বেশী, তবুও রান্নাবান্নায় কিছু সময় চ'ণ্ডের মার যায় তাই কোনমতে টিঁকে আছে। যদি রান্নাও না থাকে—সর্ব্বনাশ ! সে কল্পনাতীত ! আচ্ছা ঠাকুর—একটা এম, এল, এ করে দিতে পারেন না ? একটা মন্তর দাও যা পড়লে সকলে ভোট দেবেই—

—হাজার দশ টাকা আছে ?

—আজ্ঞে সেইটেই ত চাইতে এসেছি—

—এম, এল, এ, হ'তে নির্ব্বাচন কেন্দ্রে অন্ততঃ দশ বিশ হাজার খরচ ত ক'রতে হবে, তা না থাকলে ভোট হবে কেন ? তবে যদি এম, এল, এ হ'তে পারিস্ তারপরে মন্ত্রী একটা না হয় করে দিতে পারি—

মনে মনে রাগ হইল। যদি তাহাই পারিব, তবে তোমার কাছে আসিব কেন ?

মহাদেব ভাবিয়া কহিলেন,—তবে তোর ভাগ্যে নেই। আমি কি করবো—

—ঠাকুর, তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা, তুমি ভাগ্য-নিয়ন্তা তুমি আবার পারবে না—একি একটা কথা হল। না হয় একটা ব্যবসা কিছু করে দাও—

—তোরা বাঙালী, ব্যবসা তোদের দ্বারা হবে না। তোরা খেয়েই সব সাবাড় করবি।

মনে মনে স্থির করিলাম, বাবার মাথাটা হয়ত ঠিক নাই। অত্যধিক নেশায় মাথাটা ঘুরিতেছে—মা ঠাকরুণকে ডাকিলে হয়ত একটু বুদ্ধি বাহির হইতে পারে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে না ধরিয়া তাহার গিন্নিকে ধরিলে ধরাটা জোরালো হয়। তাই সভয়ে কহিলাম,—মাকে একবার ডাকলে হয় না, যদি তিনি কিছু বিধি-ব্যবস্থা করিতে পারেন।

বাবা নন্দীকে ডাকিয়া মা-কে আসিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরেই মা জগদম্বা আসিয়া দাঁড়াইলেন। 'সঞ্চারিণী-পল্লবিনী-লতেব' আর নাই, একটু যেন স্থূলকায়া হইয়াছেন। দশখানা হাত যেন আর ম্যানেজ করিতে পারিতেছেন না। আমি ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম—মা, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো মা—মঙ্গলময়ী।

মা একটু পিছনদিকে তাকাইলেন, পরে কহিলেন,—কে রে ? তুই ত কোনদিন পূজো কোরিস্ নি আমার। আর পূজো করলেই বা কি ? দাদা দিয়ে সব হোম করছে, এমন কি ওঁরও অম্বলে ধরলে—

—মা, আমি ত তিনবার তোমার পূজার জোগাড় করেছিলাম কিন্তু চ'ণ্ডের মা ফলমূল খেয়ে দিলে তার আমি কি করবো ?

—তুমি কি করবে ? কেমন পুরুষ মানুষ—তবে কে করবে ?

আমি কহিলাম—মা যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলি

—বল—

—আজ্ঞে আপনার নামের ফল মূল নৈবেদ্য-চ'ণ্ডের মা খেয়ে দিলে। আপনি শুম্ভ নিশুম্ভ বধ ক'রেছেন, রক্তবীজ বধ করেছেন, মহিষাসুর বধ করেছেন, কিন্তু চ'ণ্ডের মার ত কিছুই করতে পারলেন না।

—রক্তবীজ আর চ'ণ্ডের মা এক হল বুঝি ?

দেবাদিদেব হাসিয়া কহিলেন,—চ'ণ্ডের মা'র কিছু করার যো নেই বাবা। কৈলাসে সিনেমা হয়নি তাই রক্ষে, নইলে আমার বাঘছালও বেচে ফেলতে হতো—যাকগে। ছেলেটা কিছু টাকাকড়ি চাচ্ছে কি করা যায় ?

মা কহিলেন,—মানুষ বড়লোক হয়, পরে না হয় চরে। পরের পেলে বড় হয়, না হয় নদীর চর দখল করতে পারলে হয়। বঙ্গ ভঙ্গের পর চর ত আর নেই, এখন পরেরই দিতে হবে—

দেবাদিদেব বুঝিতে পারিয়াছেন এমনিভাবে কহিলেন,—হাঁ হ'য়েছে, শোন্। তোকে একটা মন্তর দিচ্ছি সেটা পড়লেই অদৃশ্য হ'য়ে যাবি। তারপরে ব্যাঙ্কে বা কোন বড় আড়তে যেয়ে, যা দরকার নিয়ে আস্‌বি?

আমি মাথা চুলকাইয়া কহিলাম,—আজ কুড়ি বছর মাষ্টারী করেছি, আর ছেলেদের নকল ধরে ঠেঙ্গিয়েছি—আমি চুরি করবো কি করে বাবা? অভ্যাসই ত নেই, আর পারিও না—আমাদের যুগে ওসব শিক্ষা করাটা ছিল না।

বাবা রাগান্বিত হইয়া কহিলেন,—কিছুই পারবি না অথচ সখটি আছে। তবে বুঝি তোর 'জন্যে আমি চুরি করবো—ব্যাটা পাজি—

—আজ্ঞে, আপনি ত এমনিই দিতে পারেন—

—আমার টাকার মিণ্ট আছে—দেখি ত নন্দী ত্রিশূলটা—বাবা সহসা রাগান্বিত হইয়া ডমরু বাজাইয়া দিলেন—ধক্ করিয়া ত্রিনেত্র জ্বলিয়া উঠিল।

পিছাইতে যাইয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম—

জাগিয়া শুনি ডমরু নয়, মর্ণিং স্কুলের ওয়ার্নিং ঘণ্টা বাজিতেছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

আজু গোঁসাই

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমদনমোহন গোস্বামী এম-এ, ডি-ফিল্

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের বাঙলার কৃষ্টিকেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর। এই কেন্দ্রের মধ্যমণি ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁর আভিজাত্য, ঐশ্বর্য ও রাজসভার কথা আজ সুবিদিত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে অমর করে রেখে গেছেন, অন্ন ও আশ্রয়দাতার ঋণ সুদ সমেত শোধ দিয়ে গেছেন সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। যে কয়টি রত্ন মহারাজের রাজসভায় ছিলেন, তাঁর পোষকতা পেয়ে আপনাদের প্রস্ফুটিত করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন অন্যতম। ভারতচন্দ্র সভাজনের, রামপ্রসাদ সভাজন ও অভাজন সর্বজনেরই; একজন মুষ্টিমেয়ের, অপরজন জনসাধারণের সর্বপ্রথম চারণ-কবি। একজন সুখ্যাত, অপরজন সুবিখ্যাত। রামপ্রসাদকে নিয়ে সম্প্রতি কিছু গবেষণা হয়েছে, দু'একটি মূল্যবান্ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের জগতে বহু রচনার বংশপরিচয়ের মূলে নিরুত্তর জিজ্ঞাসা রয়ে গেছে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন গোপাল উড়িয়া নামে এক অভিনেতা। এই গোপাল উড়িয়ার নামে যে বিদ্যাসুন্দর যাত্রাপালাটি ছিল, এককালে তা বাঙলা দেশকে মাতিয়ে রেখেছিল। সম্প্রতি আমার সম্পাদনায় বিদ্যাসুন্দর সঙ্গীত-সংগ্রহ কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু কথাটা হল, গানগুলি গোপালের নামে চললেও, রচনা অন্য লোকের। কয়েকটা গানের রচয়িতাদের সন্ধান পাওয়া গেছে, বাকীটা পাওয়া যায় নি। আরও একটি লোককে নিয়ে এই রকম সমস্যা উঠেছে। লোকটি স্বনামখ্যাত গোপাল ভাঁড়। গত আশ্বিন মাসে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে গোপাল ভাঁড় দিবস অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেই সভায় এই কথা বলেছি যে, লোকটি থাকুক বা না থাকুক, তার নামে প্রচলিত গল্পগুলি কিন্তু আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে। ভারতচন্দ্র অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে ভাঁড়ের উল্লেখ করেছেন তাঁর রচনায় কৃষ্ণনগর বর্ণনা প্রসঙ্গে, সমাচার দর্পণে (৬-২-১৮০) ভাঁড়ের উল্লেখ আছে মহারাজের প্রসঙ্গে। বাকী শুধু একটি দলিল কিংবা ঐ জাতীয় কিছু আবিষ্কার, যা' নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দেবে গোপালের অস্তিত্ব। সাহিত্য জগতে এমনি আর একজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁর চিহ্ন শুধু আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি। এই ব্যক্তি আজু গোঁসাই।

নাম থেকেই সুরু করা যাক্। এঁর নাম কেউ বলেছেন অযোধ্যানাথ, আউলিয়া প্রকৃতির জন্য নামটি নাকি প্রবাদে পরিণত হয়েছে [জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান। পৃঃ ২১৮৬]; আবার কেউ বলেছেন অযোধ্যারাম বা অচ্যুতানন্দ [দুর্গাদাস লাহিড়ী সঙ্কলিত—বাঙ্গালীর গান, পৃঃ ৫৩॥ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও বঙ্গবাসী প্রকাশিত—সঙ্গীত-সার সংগ্রহ। ১৩০৬ সাল। ২য় খণ্ড। পৃঃ ৮২৫-২৭]। এখন কথাটা হ'ল এঁর নাম ও পদবী নিয়ে। গোস্বামী অর্থাৎ গোঁসাইরা নিঃসংশয়ে বৈষ্ণব, আজুর নামে প্রচলিত গানগুলি থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু গোস্বামী কোন কৌলিক পদবী নয়, গোস্বামী উপাধিধারীদের বিভিন্ন কৌলিক পদবী থাকে। আর গোস্বামী উপাধি ব্রাহ্মণেতর জাতেরও হতে পারে। এর থেকে বোঝা শক্ত, আজু আদৌ ব্রাহ্মণ ছিলেন কি না। নামের অবস্থাটি দেখা যাক্। আউলিয়া প্রকৃতির ছিলেন বলে যে আজু নাম হয়েছে, এ ব্যাখ্যা নিতান্ত দুর্বল। কারণ পরিপাটি করে ব্যঙ্গ কাব্য রচনা, আর যার দ্বারাই হ'ক না কেন,

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

স্থির

ফটো :—কার্ত্তিক দেবনাথ

'গগনে গরজে মেঘ'—
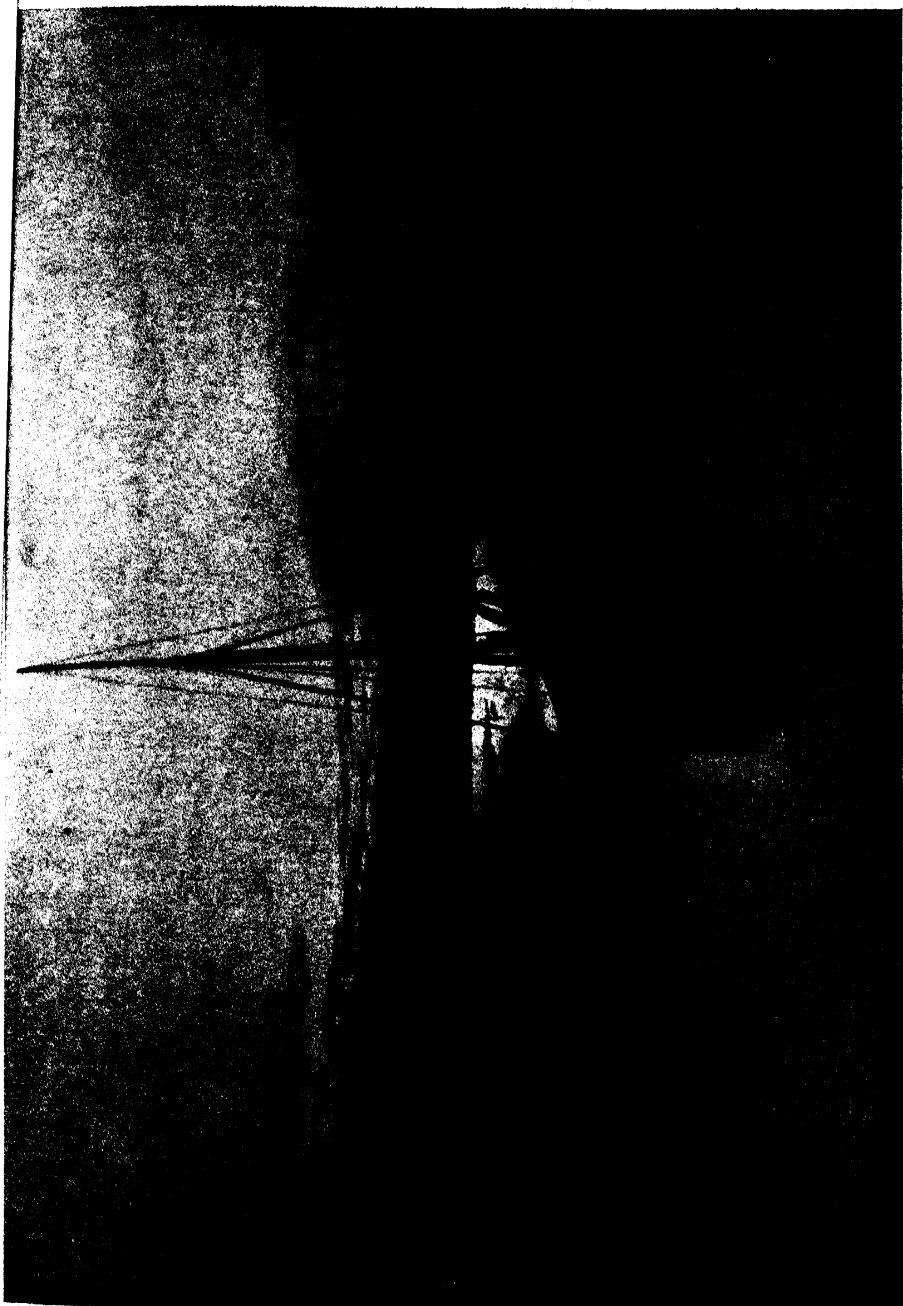
অন্ততঃ ক্ষেপাটিয়া লোকের দ্বারা সম্ভব নয়। যথার্থ নাম আজু হলে তার মূল রূপ অযোধ্যারাম বা অযোধ্যানাথ হওয়া সমীচীন নয়। কারণ, সাধারণতঃ দেখা যায়, নামের মধ্যে কুলধর্মের ছাপ রাখা সেকালের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বৈষ্ণব গোঁসাইয়ের নামের গোড়াতে অযোধ্যাস্মৃতি থাকবে, এটা কোনক্রমেই স্বীকার্য নয়। কাজে কাজেই এই নাম দুটিকে বাতিল করতে হয়। অচ্যুতানন্দ নামটি তবুও গ্রহণ করা যেতে পারে। অচ্যুত নামটির উচ্চারণবিকারে আচু থেকে আজু হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত নয়। অজিতকৃষ্ণ হলে আরও সুবিধার হত। আজুর অস্তিত্বের স্বপক্ষের প্রমাণপঞ্জীও বিশেষ সবল নয়। ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের নাম অন্নদামঙ্গলে করেন নি, কারণ তাঁর অভ্যুদয় রায়গুণাকরের পরে হয়েছিল। গোপাল ভাঁড়ের কথা আগেই বলেছি। ভারতচন্দ্রের রচনায় আজুর উল্লেখ নাই। এমন কি তাঁর নামোচ্চারণ করেন নি, তাঁরই ব্যঙ্গ কবিতার নায়ক স্বয়ং রামপ্রসাদ। প্রসাদের গানে কিংবা অপর কোন রচনাতেই আজু অনুপস্থিত। অথচ আজুর যত তামাসা, সমস্তই কবিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে। শোনা যায়, উভয়েই জন্মেছিলেন কুমারহট্ট গ্রামে। দুই জন সমসাময়িক, সম্পর্ক রসঘন অথচ একজনের লেখাতে অপর জনের বেমালুম অনুল্লেখ, আশ্চর্যের বিষয় নয় কি? নিত্যানন্দবংশাবলীতে আজুর অস্তিত্ব নাই, অন্য কোন গোস্বামী বংশাবলীতে আছে কি না তাও ঘোর সন্দেহের বিষয়, এমন কি তাঁর কোন বংশধর বর্তমানে আছেন কি না তাও অপরিজ্ঞাত। বিশ্বকোষকার আজুর প্রসঙ্গে কোন কথা বলেন নি। নাম ও ধামের উল্লেখ পেয়েছি যে তিনটি বইয়ে তা পূর্বেই বলেছি। আর আছে গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত গল্পে। দুচারটি গল্পে গোপাল ও আজুর বুদ্ধির কসরৎ বর্ণিত হয়েছে। আজু সম্বন্ধে যদি কেউ কোন কার্যকরী হদিশ দিতে পারেন, তবে সাহিত্যের তথা ইতিহাসের একটি জিজ্ঞাসার উত্তর মিলতে পারে।

কিন্তু মালিক না থাকলেও তার সম্পত্তি রয়ে গেছে। গোপাল ভাঁড় নাই, আছে তার গল্পগুচ্ছ; আজু হয়তো নাই, আছে তার নামে প্রচলিত আটটি গান। সঙ্গীত-সার সংগ্রহের আটটা গানের মাত্র দুটি পাওয়া যায় বাঙ্গালীর গানে।

বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ কবিতা হালের জিনিষ নয়। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ছন্দের খেলায় রঙ্গরস কি ভাবে ঢেলে দিয়েছেন, বিদগ্ধজনের তা না জানার কথা নয়। নানা ভাষা মিলিয়ে, নানা অলঙ্কার দিয়ে বাক্‌পতি কবি অতি সাধারণকে অনন্যসাধারণের পর্যায়ে উন্নীত করে গেছেন! একমাত্র নাগাষ্টকে তাঁর লক্ষ্য ব্যক্তিবিশেষের উপর পড়েছে। নাগপাশাবদ্ধ কবি শিখরিণী ছন্দে কালীয়দমনে আহ্বান করেছেন স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রকে। আজ বিংশ শতকের ব্যঙ্গ কবিতা ও চিত্রের সঙ্গে আমরা বিশেষ পরিচিত। অবশ্য এ কথা সত্য, বিখ্যাত ও বিশিষ্ট না হলে ব্যঙ্গের অঙ্গস্পর্শ করা যায় না। কৃষ্ণচন্দ্রের আমলেই রামপ্রসাদ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাই আজু গোঁসায়ের গানে তাঁর খ্যাতির বিড়ম্বনাটুকু রয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ভারতচন্দ্রকে নিয়ে কেউ এমনতরো রঙ্গ করে নি, অথচ ভারতচন্দ্রের নামডাকও প্রচুর ছিল। আজুর গানের ভাষা বিশুদ্ধ বাংলা, মুসলমানী আগন্তুক শব্দ একটিও নাই। গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা সেরেছেন আজু, রামপ্রসাদের ছন্দেই রামপ্রসাদকে এক হাত নিয়েছেন। উপরন্তু আর একটি মজা রয়েছে। বাচনভঙ্গীর উপর গানগুলির মর্যাদা অনেকটা নির্ভর করে। আজুর গানের ভাষায় চলিত প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ গানগুলির ব্যঙ্গরসকে গাঢ় করেছে। কিছু নমুনা দেওয়া যাক্—যেমন মন তেমন ধন; চূণপুঁটি; ঝালে ঝালে মজা মারা; পাকা ঘুঁটি কাঁচানো; অতি লোভে তাঁতী নষ্ট; কাঁঠালের আমসত্ত; কলা দেখা; গালে কালি-মাখা, মাঠের মাঝে মারা যাওয়া; মাঝ গাঙেতে ভরা ডুবি; বাঁশ বনে ডোম কানা; পরের বুলি বলা। অলঙ্কার প্রয়োগ নিতান্তই কম। আজুর গানে নিরাবরণ একটি ব্যঙ্গকে আমরা পেয়েছি। কোন আবরণ-আভরণের বালাই আজুর নাই। আক্রমণ কখনও বা সোজাসুজিই হয়েছে, কোন বিনয়ের ব্যভিচার সেখানে আমল পায় নি। যেমন, প্রসাদ-কবি কারণামৃতের মাঝে মাঝে মাত্রাধিক্য করতেন আর 'সুধা খাই জয় কালী বলে' সম্মানে সামলে নিতেন। আজু এই দুর্বলতার উপর টিপ্পনী দিলেন—'ও তুই মদের ঝোঁকে করতে পারিস্ মাঝ গাঙেতে ভরা ডুবি', তা ছাড়া আর কিছু করা প্রমত্তের দ্বারা সম্ভব নয়। রামপ্রসাদ আদর্শবাদী, আজু বাস্তবের বুনিয়াদে আদর্শে আস্থাবান্। প্রসাদের অন্ধ আদর্শবাদ আজু সহ্য করতে পারেন নি। তাই কথায় কথায় বাস্তবের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রামপ্রসাদকে সচেতন করবার চেষ্টা করেছেন। বৃদ্ধ বয়সে প্রসাদ-কান্তা সন্তান-সম্ভবা হলে, আজু কালীভক্তের এই অকাম্য আসক্তির উপর মন্তব্য করলেন—'তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা, কাঁচায়েছ পাকা ঘুঁটি,' আবার তত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপদেশও তিনি কবিরঞ্জনকে বিতরণ করতে কার্পণ্য করেন নি। ভারতীয় আদর্শের মূল কথা, বাঁশী ও অসির একাত্মতা, শ্যাম ও শ্যামার অভিন্নতা, তিনি একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। যেমন—'অভেদ জেনো শ্যামের পদ শ্যামা মায়ের চরণ দুটি; ডুবিস নে মন ধরগে ভেসে শ্যাম কি শ্যামার চরণতরী; ভক্তি-গাছে মুক্তি ফলে সে ফল উড়ে খাওগে দেখি, খেলে মাথার ফাঁদে পড়বে না আর শমন-ব্যাধে দিবে ফাঁকি'।

গানের প্রতিষ্ঠাপনের দিকটা এইবার লক্ষ্য করা যাক্। সঙ্গীতের আসরে 'জবাব' বড় উপভোগ্য হয়। বিশেষতঃ এই জবাব যদি ব্যঙ্গ-রস পরিবেষণ করে, তা হলে তো গজদন্ত সুবর্ণমণ্ডিতের মতই হয়। আখড়াই গানের প্রতিযোগিতা, কবির লড়াই, এইসব কতদূর উপভোগ্য হত, তা আজকে অনুমান করা যেতে পারে। বাংলা গানে কথা ও সুরে শিবশক্তি মিলন, যা অন্য যে কোন গানে সুদুর্লভ। গায়কের বাচনভঙ্গী গানগুলির রসাস্বাদনে সহায়তা করে। বঙ্গ সংস্কৃতির এই একটি অনুপম উপাদান। সুর-সর্বস্ব গানে বাঙালী কোনদিন ঈপ্সিত আনন্দকে খুঁজে পায় নি। গানের আনন্দলোকের সন্ধানে বাংলা গানের রথ তাই জুড়ি ঘোড়ার। রামপ্রসাদ ও আজুর জবাবী গানেও এই অশ্বিনীকুমার যুক্ত হয়েছে বলে এত উপভোগ্য হতে পেরেছে। সঙ্গীত-সার সংগ্রহে আজুর গানগুলির উপরে রাগরাগিণীর কোন পতাকা লাগানো হয়নি। মাত্র দুটি গানে একতালা-র সঙ্কেত রয়েছে। যাই হ'ক্ না কেন, সাজ আমাদেরই।

আজু থাক্ বা না থাক্, সেটার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমরা আট-আটটা ব্যঙ্গ গান পেয়েছি। বাঙ্গালীর গানের এই সঞ্চয়টিকে বরবাদ করলে তো কোন লাভ হবে না। রামপ্রসাদের কাব্যচন্দ্রিমাতে নেহাৎই যদি এই আটটি কলঙ্ক বিন্দু থেকে যায়, তবু তো এইগুলি অলঙ্কৃত কলঙ্ক, নীলকণ্ঠের গলার বিষ। ভারতচন্দ্রের কলঙ্ক আছে, রামপ্রসাদেরও না-হয় রইল। ক্ষতি কি! আর খ্যাতির সুদূরপ্রসারী যাত্রাপথে ব্যঙ্গগুলিই তো হল আশা ও অভীষ্টনৈকট্যের মাইলস্টোন।

আজুর 'নামে প্রচলিত গানগুলিকে একত্রে সঙ্কলিত করা গেল। জবাবী গান বলে রামপ্রসাদ ও আজুর গান পরপর দেওয়া হল। বাঙ্গালীর গানে প্রদত্ত গানদুটিকে * তারকাচিহ্নিত করা হয়েছে। সব কটি গানই সঙ্গীত-সার সংগ্রহ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয়, আজুর গান-গুলিতে কোন ভণিতা নাই। অসম্ভব নয়, গানগুলি ঊনবিংশ শতকের কোন গুপ্ত-পরিচয় কবিওয়ালার কীর্তিস্তম্ভ, অন্ততঃ রচনারীতির দিক থেকে এই কথা বলা যেতে পারে।

*॥ ১ ॥

রামপ্রসাদ সেন :

এই সংসার ধোঁকার টাটি। ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি ॥
এরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটি ॥
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি।
যেমন শরীর জলে সূর্য-ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি ॥
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটি ॥
রমণীবচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি।
আগে ইচ্ছা সুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি ॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটি।
ওমা, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর মা, তুমি গো পাষাণের বেটী ॥

আজু গোঁসাই :

এই সংসার রসের কুঠি। ওরে খাই দাই আর মজা লুটি ॥
যার যেমন মন, তার তেমনি ধন, কর রে পরিপাটি ॥
ওহে সেন অল্পজ্ঞান বুঝ কেবল মোটামুটি।
তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা, কাঁচায়েছ পাকা ঘুঁটি ॥
ওরে শিবের ভাবে ভাবনা কেন, শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত, পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটি ॥
জনক রাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিল না ত্রুটি।
শেষে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেতে পেত দুধের বাটি ॥
মাহামায়ায় বিশ্ব ছাওয়া; ভাবছ মায়ার বেড়ী কাটি।
তবে অভেদ জেনো শ্যামের পদ, শ্যামা মায়ের চরণ দুটি ॥

॥ ২ ॥

রামপ্রসাদ সেন :

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥
হৃদকমলে ধ্যানকালে আনন্দসাগরে ভাসি।
ওরে কালীরপদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥
কালীনামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা,
অনলে দাহন যথা হয় রে তুলা রাশি ॥
গয়ায় ক'রে পিণ্ডদান, পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ,
যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি ॥
কাশীতে ম'লেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় তার দাসী ॥
নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
চিনি হওয়া মন ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
ওরে চতুর্বর্গ করতলে, ভাবিলেরে এলোকেশী ॥

আজু গোঁসাই :

পেসাদে তোরে যেতেই হবে কাশী।
ওরে তথা গিয়ে দেখ্‌বি রে তোর মেসো আর মাসী ॥
ঘরে যদি থাকিস্ বসি, ধরবে তোকে যক্ষ্মা কাশি,
ওরে এই বেলা নে তল্পী বেঁধে, পথের সম্বল রাশি রাশি ॥

॥ ৩ ॥

রামপ্রসাদ সেন :

মুক্ত কর মা মায়া-জালে।

আজু গোঁসাই।

বদ্ধ করো মা ক্ষেপ্‌লা জালে।
যাতে চুণপুঁটি এড়াবে না, মজা মারবো ঝালে ঝোলে ॥

॥ ৪ ॥

রামপ্রসাদ সেন :

ডুব দে মন কালী বলে। হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন দু'চার ডুবে না ধন পেলে।
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে, শিবযুক্তি মতন চাইলে ॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলুদ গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে ॥
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিল্‌বে রতন ফলে ফলে ॥

আজু গোঁসাই :

ডুবিস্ নে মন ঘড়ি ঘড়ি। দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি ॥
একে তোমার কফো নাড়ী, ডুব দিয়ো না বাড়াবাড়ি।
তোমার হলে পরে জ্বর জাড়ি, যেতে হবে যমের বাড়ী ॥

অতি লোভে তাঁতী নষ্ট মিছে কষ্ট কেন করি।
তুই ডুবিস্ যে মন, ধরগে ভেসে, শ্যাম কি শ্যামার চরণতরী ॥

॥ ৫ ॥

রামপ্রসাদ সেন :

গিরীশগৃহিণী গৌরী গোপবধূবেশ। কষিত কাঞ্চন কান্তি প্রথম বয়েস ॥
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু। পাতাল হইতে উঠে শুনে মার বেণু ॥
সুচিত্র বসন মণি-কাঞ্চন ভূষণ। ত্রিভুবন দীপ্তি করে অঙ্গের কিরণ ॥
রাঙ্গা যুগল হর সুরনদীকূলে। স্বয়ম্ভু পূজেন নিত্য কর-পদ্ম ফুলে ॥
নাভিপদ্ম ভেদি ক্রমে বেণী ক্রমে ক্রমে। লোমাবলীছলে চলে করীকুম্ভ-ভ্রমে ॥
ঈশ্বর-মোহন ইষু নয়ন তরল। বিধি কি কজ্জল ছলে মাখিল গরল ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরীর কি কাণ্ড। ফেরে করে লয়ে ছাঁদ-ডোর দুগ্ধভাণ্ড ॥
ভালেতে তিলক শোভে সুচারু বয়ান। ভণে রামপ্রসাদ মার এই এক ধ্যান ॥

আজু গোঁসাই :

না জানে পরমতত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত, মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরাবে রে।
তা যদি হইত, যশোদা যাইত, গোপালে কি পাঠায় রে ॥

॥ ৬ ॥

রামপ্রসাদ সেন :

এবার কালী তোমায় খাব। (খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার,
গণ্ডযোগে জনমিলে সে হয় মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা করে যাব ॥
ডাকিনী যোগিনী দুটা তরকারি বানিয়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা দিব ॥
হাতে কালী মুখে কালী সর্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কষে, সেই কালী তোর মুখে দিব ॥
খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে মনোমানসে পূজিব ॥
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে কালী বলে, কালেরে কলা দেখাব ॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভালমতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন নয় শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥

আজু গোঁসাই :

সাধ্য কি তোর কালী খাবি।
ও যে রক্তবীজের বংশ খেলে, তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি ॥
সর্বাঙ্গে নয় উভয় গালে ভুষো কালি মেখে যাবি।
আবার কালেরে দেখাতে কলা, নিজে যে কলা দেখিবি ॥

॥ ৭ ॥

রামপ্রসাদ সেন :

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরু তলে গিয়ে, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তির সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি ॥
অশুচি শুচিকে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি ॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতামাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহগর্তে টেনে লয়, ধৈর্য-খুঁটা ধরে রবি ॥
ধর্মাধর্ম দুটা অজ তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না নিষেধ মানে, তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি ॥
প্রথম ভার্যার সন্তানে দূর হইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মতন মন হবি ॥

আজু গোঁসাই :

একতালা।

কেন মন বেড়াতে যাবি ?
কারো কথায় কোথাও যাস্‌নে রে তুই, মাঠের মাঝে মারা যাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরে মন নিজে কভু না চিনিবি।
ও তুই মদের ঝোঁকে করতে পারিস্ মাঝ গাঙেতে ভরাডুবি ॥
বাঁশবনে গিয়ে ডোম কানা হয়, এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি।
শেষে কল্পতরু তলায় গিয়ে কি ফল নিতে কি ফল নিবি ॥

* ॥ ৮ ॥

রামপ্রসাদ সেন :

মন রে আমার এই মিনতি। তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি ॥
যা পড়াই তাই পড় মন, পড়লে শুনলে দুধ-ভাতি।
ওরে জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি ॥
কালী কালী কালী পড় মন, কালীপদে রাখ প্রীতি।
ওরে পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনের কর গতি ॥
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে গাছের ফলে ক'দিন চলে, কর রে চার ফলের স্থিতি ॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন, শুন যুকতি।
ওরে বসে মূলে কালী বলে, গাছ নাড়া দাও নিতি নিতি ॥

আজু গোঁসাই :

একতালা

হৈও না মন পড়া পাখী। ওরে বন্দী হলে হয় না সুখী ॥
পাখী হ'লে তত্ত্ব ভুলে দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি।
তুমি মুখে বলবে পরের বুলি, পরম তত্ত্ব জানিবে কি ॥
ভক্তি-গাছে মুক্তি ফলে, সে ফল উড়ে খাওগে দেখি।
খেলে মায়ার ফাঁদে পড়বে না আর, শমন-ব্যাধে দিবে ফাঁকি ॥

নরেন্দ্র দেব

(প্রাচীন চীন, পূর্বানুবৃত্তি)

সরাইখানা থেকে বিদায় নেবার আগে শু সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটির নাম জিজ্ঞাসা করলে। তিনি বললেন—আমার নাম লিয়ু ছুন্ চিং। আমি চেংচাও শহরে ছিলুম।

সেই রাত্রে কথায় কথায় ওয়াঙ্ চিন্ ন্যু যেই শুনলে যে লোকটি চেংচাওয়ের অধিবাসী এবং তার নাম লিয়ু ছুন্ চিং—ওয়াঙ্ চিন ন্যুর দুই চোখ জলে ভরে এল। হারানো স্বামীর কথা স্মরণ করে তার প্রাণটা যেন হাহাকার করে উঠলো। সারা রাত তার আর ঘুম হল না! সেই প্রথম জীবনে নূতন পাওয়া স্বামীর সুগভীর প্রেম, তাঁর বুকভরা ভালবাসা মনে ক'রে ওয়াঙ্ চিন ন্যুর মন কেঁদে কেঁদে উঠতে লাগলো। পূর্ব স্বামীর সেই আদর সোহাগ যতই তার স্মৃতিপথে জেগে ওঠে সে ততই ব্যাকুল হ'য়ে পড়ে।

পাছে শু তার মনের অবস্থা জানতে পেরে কষ্ট পায়, এই ভয়ে সে উঠে গিয়ে একান্তে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলো। হ্যাঁ, শু তাকে যত্ন করে ঠিকই। সে না দয়া করলে ওয়াঙ্ চিন ন্যুর আজ কি অবস্থা হ'ত? কিন্তু এও ঠিক—অনুকম্পা আর ভালবাসা তো এক বস্তু নয়। শু তার স্ত্রীকে আজও ভুলতে পারেনি। রোজই তার নানা গুণের কথা নিয়ে সে গল্প করে। স্ত্রীর প্রতি তার গভীর ভালবাসা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। এ সব দেখে শুনে ওয়াঙ্ চিন্ ন্যুর বড় লজ্জা করে। সে বুঝতে পারে এখানে সে এক আশ্রিতা অসহায়া নারী মাত্র! শুধু দয়ার পাত্রী ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু, কৃপা—সে যতই অকৃপণ হোক, সে কি নারীর অন্তরের সুগভীর প্রেমের ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে?

ভোর হয়ে এল! পাখীদের কলরবে শু'র ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখে পাশে ওয়াঙ্ চিন্ ন্যু নেই! শয্যা শূন্য!

শু'র মনের ভিতরটায় কেমন যেন ছাঁৎ করে উঠলো! এত ভোরে ওয়াঙ্ চিন ন্যু কোথা উঠে গেল? একটা অজানা আশংকায় মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। পালিয়ে যায় নি তো? শু তার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো।

ওয়াঙ্ চিন্ ন্যু চোখ মুছে কিছু প্রকৃতিস্থ হয়ে ঘরে এসে বললে—ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই এমন সোরগোল শুরু করেছো কেন?

শু বললে,—বাঃ! তোমার বুঝি মনে নেই? আজ সেই সরাইখানার নতুন বন্ধুটি যে সস্ত্রীক আমাদের কাছে আসছেন। তাঁর আর আমার একেবারে সমান অবস্থা বুঝলে? তিনিও পালাবার পথে স্ত্রীকে হারিয়ে ফেলেন। পরে একটি নিরাশ্রয়া মহিলাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, এবং তার গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকেই দ্বিতীয়বার পত্নীরূপে গ্রহণ করেছেন। ঠিক আমার মতো অবস্থা, বুঝলে?' ঠিক আমার মতো!

বলে শু খুব খানিকটা হেসে উঠলো!

ওয়াঙ্ চিন্ ন্যু বিনীতভাবে বললে, অতিথি সৎকারের যথাসাধ্য চেষ্টা করবো বলেই আজ ভোরে উঠে এসেছি। আপনার আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি আমি হতে দেবনা জানবেন।

বলতে বলতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার গতিভঙ্গীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে শু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুলো। তার মনের মধ্যে কত কি যে আবোল তাবোল উদ্ভট চিন্তা আনাগোনা করতে শুরু করলো তার যেন আর শেষ নেই!

* * *

প্রাতরাশের সময় হল। শু'কে অতিথিদের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। যথাসময়ে লিয়ু সস্ত্রীক এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে একটি বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক। শু ছুটে গেল ফটকের ধারে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে। কিন্তু, লিয়ুর স্ত্রীর দিকে চোখ পড়বামাত্র শু আনন্দে বিস্ময়ে একটা চিৎকার করে উঠলো! লিয়ুর স্ত্রীও ছুটে এসে শু'র পায়ের ওপর কেঁদে লুটিয়ে পড়লো!

ওদিকে ওয়াঙ্ চিন্ ন্যুকে দেখা গেল লিয়ুর বুকে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলছে—তুমি কেমন করে এতদিন আমাকে ভুলে ছিলে?

শু তার হারানো পত্নীকে ফিরে পেয়ে আনন্দে বিহ্বল হয়ে তাকে বুকে চেপে ধরলে। যুচেঙে এসে তাদের পরস্পরের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হবার পর শু'র পত্নীকে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আশ্রয় দিয়েছিল। তার বাড়ী শীয়েনকাঙে। সেখানে সে তার কিছু গহনা বেচে তিনমাস চালিয়েছিল। বুড়ির অবস্থা এমন নয় যে সে তাকে খেতে দিতে পারে। এই তিনমাস ধরে সে চারিদিকে 'শু'র খোঁজে লোক লাগিয়ে অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছে। গহনা-গাঁটি যখন সবই প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল, বুড়ি তখন লিয়ুকে বিবাহ করবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি শুরু করলে। লিয়ুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলে। আমাদের উভয়েরই সমান অবস্থা জেনে একটা সহানুভূতি জাগলো। লোকটিকেও ভাল বলে মনে হল। তখন, নিরুপায় অবস্থায় পথে পথে ভিক্ষা করে বা অসৎ নারীর জীবনযাপন করে বেঁচে থাকার চেয়ে বিবাহ করাই শ্রেয়

মনে করে সে লিয়ুকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছে। শু' কি তার অপরাধ ক্ষমা করবে না?

শু' তখন তার নিজের কাহিনীটা সমস্ত পত্নীকে শুনিয়ে বললে, আমিও যে তোমার কাছে অপরাধী হয়েছি! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে? ভগবান যখন এক আশ্চর্য উপায়ে আজ আবার হারানো দম্পতিদের পরস্পরকে একত্র করলেন, তখন আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া খুবই দরকার।

বোঝাপড়া হ'ল।

দম্পতি যুগল কেবল যে পরস্পরের সঙ্গেই আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন তাই নয়, শু ও লিয়ু পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি ক'রে বললে—আজ থেকে আমরা দুটি ভাই! পরস্পরের সঙ্গে সোদরের স্নেহসম্পদে আবদ্ধ হলুম!

বুড়ি বললে—উহুঁ! তোমরা দুজনে পরস্পরের ভায়রা ভাই! ভাই কি ক'রে হবে? তোমাদের বৌয়েরা যে এর মধ্যেই দুজনে দুজনের একেবারে যমজ বোন হ'য়ে গিয়েছেন?

বুড়ির কথা শুনে সবাই আনন্দোজ্জ্বল কণ্ঠে হেসে উঠলো!

সারাদিন তারা স্ফূর্তিতে কাটিয়ে সন্ধ্যার আগে পরস্পরের স্ত্রীর অদল বদল ভেঙে নিলে। এর পর থেকে এই উভয় পরিবারের মধ্যে এমন একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপিত হ'ল যা দূরকাল পর্যন্ত বংশ পরম্পরার মধ্যে চলেছিল।

পত্নী এবং পতির যখন
　　অদল বদল ঘটে,
দুর্ঘটনা হলেও সেটা
　　মজার ব্যাপার বটে!
কিন্তু যখন শুধরে বদল
　　মেলে যে যার সাথে,
আনন্দ দেয় আপনি ধরা
　　পরস্পরের হাতে।

এই ক'টি লাইন লিখে চীনের প্রাচীন কবি তাঁর কাব্যকাহিনী শেষ করেছেন।

চীন-সাহিত্যের বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন এ কাহিনী নিছক কবি কল্পনা নয়। একদা চীনের রাষ্ট্র-বিপ্লবের দুর্যোগে এরূপ ঘটনা না কি প্রকৃতই ঘটে ছিল। তাঁদের এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, অবিকল এই ঘটনা অবলম্বনেই চীনের একাধিক প্রাচীন কবি ও সাহিত্যিক নূতন নূতন কাব্যকাহিনী, গাথা ও গল্প রচনা করেছিলেন।

'জোড়া আয়না' শীর্ষক কাব্যকাহিনীই একমাবদ্বিতীয়ম নয়। আর একটি উপাখ্যান আছে "পতি পত্নীর অদল বদল"! এটিও খুব চমৎকার। দাম্পত্য প্রেমের অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এর মধ্যে দেখা যায়। তাছাড়া, নীতির দিক দিয়ে নারীর সতীত্ব রক্ষার ও পাতিব্রত্যের আদর্শও এতে বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে। প্রাচীন চীনা সাহিত্যিকগণের রচনার মূল নীতি ছিল—

"মন খুশী করা খোশ্‌গল্প যা—
　　সরল ভাবেই লেখো,
অন্তর যদি ছুঁতে চাও তবে
　　নীতি কথা কিছু রেখো!"

আকাশ-মৃত্তিকা

শান্তশীল দাশ

মাটির পৃথিবী আকাশের পানে চায়,
আকাশের আলো মাটির বুকেতে ঝরে;
এমনি করেই কত দিন কেটে যায়;
কারো বন্ধনে কেহ ধরা নাহি পড়ে।
তবু প্রতিদিন এ মাটির পানে চেয়ে
আকাশ রয়েছে অতন্দ্র আঁখি মেলে;
আকাশের ছবি মাটির বুকেতে ছেয়ে
আছে নিশিদিন প্রাণের প্রদীপ জেলে।
এই মিলনের, এই বিরহের শেষ
হয়নি তো কভু, হবেনাকো কোনদিন;
ধরা দিয়ে কেহ হবেনাকো নিঃশেষ:
বন্ধন মাঝে রবে বন্ধন হীন।
বিস্ময়ে চেয়ে থাকি আকাশের পানে,
বিস্ময় জাগে মাটির করুণ গানে।

গান

ভালবাসা সে কি মিছে হয়।
তবু তুমি কেন শুধু মিছে কর ভয়!
দেখো না কি রাতের আকাশে
তারাগুলো জ্বল্ জ্বল্ হাসে—
রাতের সাথে যে আছে তারার প্রণয়!

তুমি আমি বাঁধা আছি একটি সূতায়—
দূরে কাছে সব পড়ে বাঁধন-সীমায়!
তুমি রাত, আমি ছোট তারা
তোমারি গহনে আমি হারা—
এ যে ভালবাসা প্রিয় নয় অভিনয়!

সুর ও স্বরলিপি ঃ রমেন মৈত্র

কথা ঃ গোপাল ভৌমিক

II জ্ঞা পা পদা পা | মজ্ঞা রা ণ্া সা I মা -া -া -সা | পা -া পা পা I
ভা ল বা॰ সা সে॰ কি মি ছে হ ॰ ॰ ॰ য় ॰ ত বু

পা ধা ণা র্সা | ণা ধা পা -া I জ্ঞা মা পণা পা | মজ্ঞা -া -া -া II
তু মি কে ন শু ॰ ধু ॰ মি ছে ক॰ রো ভয়॰ ॰ ॰ ॰

II মা পা -জ্ঞা মা | পা না র্সা র্রা I ণা পা র্রা -া | র্রা -া -া -া I
দে খো না কি রা তে র ॰ আ কা শে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

না র্সা র্রা র্সা | ণা -পা ণা -মা I পা -জ্ঞা পা -া | পা -া -া -া I
তা রা গু লো জ্ব ল জ্ব ল হা ০ সে ০ ০ ০ ০ ০

না র্সা র্জ্ঞা রা | র্সা ণা ধা পা I জ্ঞা ণা ধা পা | মজ্ঞা -া -া -া II
রা তে র সা থে যে আ ছে তা রা র প্র ণ০ য় ০ ০

I সা গা গা গা | গা মা রা সা I রা ণ্া সা রা | মজ্ঞা -া -া -া I
তু মি আ মি বাঁ ধা আ ছি এ ক টি সূ তা০ য় ০ ০

পা পা পা পা | পদা পা মা মা I পা মা জ্ঞ রা | সা সা -া -া I
দূ রে কা ছে স০ ব প ড়ে বাঁ ধ ন সী মা য় ০ ০

পা র্সা -া র্সা | র্সা র্রা র্সা ণা I পা না র্সা র্জ্ঞা | র্রা -া -া -া I
তু ০ ০ মি রা ত আ মি ছো ট তা ০ রা ০ ০ ০

পা র্রা র্রা র্জ্ঞা | র্সা র্জ্ঞা র্রা র্সা I ণা ধা র্সা র্সা | র্সা -া -া -া I
তো মা রি গ হ নে আ মি হা ০ রা ০ ০ ০ ০ ০

র্সা না দা র্সা | না দা পা পা I জ্ঞা মা পণা পা | মা জ্ঞা -া -া II
এ যে ভা লো বা সা প্রি য় ন য় অ০ ভি ন য়

জলধর-প্রসঙ্গ

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
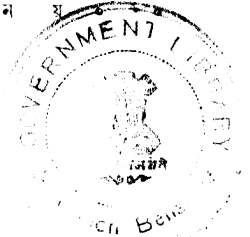
প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগে জলধর সেন বিডন ষ্ট্রীটে থাকিতেন। সে সময়ে আমি তাঁহার সঙ্গলাভ করি। একদিন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি আসিয়া জলধরবাবুকে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের বাসায় লইয়া যান। আমিও তাঁহাদের অনুবর্তী হইয়াছিলাম। এইরূপে আমারও দীনেন্দ্রকুমারের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। এই তিনজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের মধ্যে কি আলাপ হইয়াছিল, এখন আর তাহা মনে পড়ে না। সুরেশবাবুর সঙ্গে অনেক পূর্বেই আমার পরিচয় হইয়াছিল। তখন আমি সবেমাত্র থার্ড-ইয়ারে পড়ি। সেই সময় হইতে "সাহিত্যের" জন্য আমি কিছু কিছু লিখিতাম। আমি এই তিনজন মহারথীকে একত্র দেখিবার সুযোগ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম।

ইহার কিছুদিন পূর্বেই আমার "অবগুণ্ঠিতা" নামক কবিতা "প্রদীপে" প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার বোধ হয় বৈকুণ্ঠনাথ দাস অথবা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সে-সময়ে উহার সম্পাদক ছিলেন। শুধু এইটুকু আমার মনে আছে, জলধর দাদা ঐ কবিতার এক প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করেন। কবিতাটি ছোট এবং তাহার যে প্রশংসা হইয়াছিল, সে প্রশংসা আমার প্রাপ্যের কিঞ্চিৎ অতিরিক্তই হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এই সম্বন্ধে আমার একটি মজার কথা মনে হইতেছে। সে ১৯০১ সালের কথা। রাজসাহী কলেজে আমি অধ্যাপক হইয়া যখন যাই, তখন আমার বয়স নিতান্ত অল্প। সেই সময়ে "প্রদীপে" আমার "অবগুণ্ঠিতা" কবিতা প্রকাশিত হয়। আমি যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়াইতে যাই, তখন দেখিলাম টেবিলের উপর বড় বড় অক্ষরে কে একজন লিখিয়া রাখিয়াছিল "অবগুণ্ঠিতা"। তখনও আমি জানি না যে কবিতাটি বাহির হইয়াছে। সে সময়ে আমি অত্যন্ত লজ্জিত ছিলাম,—অল্প বয়সের অধ্যাপকের যেমন হয়। সুতরাং অবগুণ্ঠিতা দেখিয়াই আমি হাতের রেজেষ্ট্রী খাতা চাপা দিলাম। এবং তৎক্ষণাৎ খড়ি লইয়া পিছন ফিরিলাম। ব্ল্যাক বোর্ডে Barbara Celarent—বা ঐরকম

কিছু যাহার মাথা মুণ্ড নাই লিখিতে ব্যাপৃত হইলাম। এইরূপ ভাবে কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইলে আমার কুণ্ঠিতভাব কতকটা কাটিয়া গেল, এবং তারপরে ক্লাসে যথারীতি বক্তৃতা দিলাম। কিন্তু দেখিলাম যে ছাত্রদের মধ্যে সে সময়েও কিঞ্চিৎ গুঞ্জন চলিতেছে। ইহাদের ইঙ্গিত-ইসারায় আমি যে ধরা পড়িয়াছি সেই ভাবই প্রকটিত হইল। ছেলেদের নিকট মাষ্টার মহাশয়দের কোনও কিছু গোপন থাকে না।

ইহার পর আমি কৃষ্ণনগর কলেজ হইয়া যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়াছি, তখন জলধর সেন "ভারতবর্ষের" সম্পাদক। তাঁহারই প্রসাদে আমার অনেকগুলি লেখা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে। জলধরবাবু সকাল বেলায় আমার বাড়ীতে আসিয়া চায়ের পেয়ালা লইয়া বসিতেন এবং তাহা শেষ হইলে মস্তবড় এক সিগারে অগ্নিসংযোগ করিতেন। তাঁহার একটি লেখা চাই। আমাকে আদেশ করিতেন, "কিছু লেখো"। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে থাকিতাম এবং বলিতাম "কিছু তো মনে আসে না দাদা"। জলধরবাবু বলিতেন, "ওসব বাজে কথা রেখে দাও। এখন লেখো।" আমি অমনি "বাজে কথা" এই শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ রচনায় মন দিলাম। তিনি যখন দেখিলেন যে আমার কলম চলিতেছে, তখনই তিনি বিদায় লইয়া আপিসে যাইতেন। "বাজে কথার" সুখ্যাতি হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে তাঁহার কৃপা যে কত রকমে পাইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।

জলধরবাবু আমাকে ভালবাসিতেন, এবং সেই সূত্রে যাহা কিছু আমি লিখিতাম তাহাই তিনি আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিতেন।

জলধরবাবুর এ প্রকার উদারতা এবং নূতন সাহিত্যিকদের প্রশ্রয়-দানের কথা অনেকেই বলিতে পারিবেন। কিন্তু আমি আজ যেকথা বলিতেছি সে সম্বন্ধে আজ আর অনেকে বোধহয় জানেন না। ১৯১৬ সালে আমি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ি। প্রায় প্রতিদিন প্রত্যুষে জলধরদাদা আমার বাড়ীতে যাইতেন এবং রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া গান করিতেন। জলধরবাবু যে সভাসমিতিতে কখনও গান করিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমার রোগশয্যাপার্শ্বে তাঁহার সঙ্গীত অপূর্ব মাধুর্য্যময় হইয়া উঠিত। কাঙ্গাল হরিনাথের গান তিনি জানিতেন। অথবা কোন শ্যামা বিষয়ক গান তিনি করিতেন। গানের শেষে উভয়ের চক্ষু দিয়া অনর্গলভাবে অশ্রুধারা বহিত। দারুণ ব্যাধির মধ্যে কি যে সান্ত্বনা পাইতাম তাহা বুঝাইবার সাধ্য নাই। কোথায় যেন পড়িয়াছি যে গানের সুরের প্রভাবে একজন দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছে। তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ হইল জলধরবাবুর সুমধুর সঙ্গীতে যখন আমার রোগমুক্তি হইল। যখন আমি রোগ হইতে অব্যাহতি পাইলাম তখন আমি হয়ত গান করিতাম এবং তিনি হইতেন শ্রোতা। আমি ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার পর প্রথম যে গান গাহিয়াছিলাম "ওকে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়" তাহা আমার মনে আছে। জলধরদাদার সঙ্গীতের সুরে আমি রোগ হইতে মুক্ত হইলাম সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই এবং মনে মনে তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

অনেক কবি ও সাহিত্যিকের গান শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। কিন্তু জলধরদাদার মত এমন আকুলকরা সুর আমার কানে বেশি যায় নাই। আমি যাঁহাদের গান শুনিয়াছি, এই প্রসঙ্গে যদি তাঁহাদের নাম করি তাহা হইলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গানের রাজা। চার পাঁচ সহস্র বা তাহার চেয়েও বেশি লোক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার গান শুনিত। বন্ধুবর রজনীকান্ত সেন ছিলেন অতি জনপ্রিয় এবং অক্লান্ত গায়ক। একদিন আমাকে গান শুনাইতে গিয়া আমাদের উভয়ের খাবার ঠাণ্ডা বরফ হইয়া গিয়াছিল। তখন শীতকাল। নিমন্ত্রণকর্ত্তা ডাকিয়া ডাকিয়া হয়রাণ হইয়া পড়িলেন। যখন আমরা খাইতে উঠিলাম তখন সে খাবার মুখে দেওয়া যায় না। তাহাই আনন্দে কোনরূপে গলাধঃকরণ করা গেল। অতুলপ্রসাদ সেনের গানে একটা মাদকতা ছিল। সুমিষ্ট সুরে তিনি যখন তাঁহার মিষ্ট মিষ্ট গান করিতেন, তখন শ্রোতারা আকুল হইয়া শুনিত। তিনি দিলীপ রায়ের সঙ্গে অনেকদিন আমার এখানে গান করিয়াছেন। দিলীপের কণ্ঠের সত্যই তুলনা হয় না। আমি তাঁহার পিতৃদেব ডি এল রায়ের গান শুনিয়াছি এবং কোন কোন দিন যোগদান করিয়াছি। দীনবন্ধু মিত্রের বাসভবনে তিনি যখন গান ধরিলেন "বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ" তখন সেই সভা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কাজী নজরুলের বিদ্রোহী বীণা আমার ভবনে শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। আমাদের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিককে যখন নিপুণ কলারসিক দেখি এবং আমাদের শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্টকে কলারসের রসিক দেখি তখন আমরা সত্যই গৌরব বোধ করি, কিন্তু আমার মনে পড়ে সেই সেদিনকার কথা, যখন জলধর সেনের "সারা বছর দেখিনি ওমা উমা তুই কেমন ধারা" এই গান আকুল নয়নে এবং আকুল করা সুরে গান করিতেন।

জলধরদাদা আজ প্রায় ১৬ বছর পূর্ব্বে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি রবিবাসরের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। দশ বৎসর যাবৎ তিনি রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষতা করিয়াছেন। তাঁহার পরেই ১৩৪৬ সালে বৈশাখ মাসে তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে আমার উপর সেই কাজের ভার পড়ে। জলধরদাদার ন্যস্ত কার্য্যভার আমি যথাশক্তি করিয়া যাইতেছি। ইহাতে নরেনবাবু আমার প্রধান সহায়। সম্পাদকীয় ভার স্কন্ধে লইয়া যে বিপুল অধ্যবসায় ও সময়ে সময়ে যে কলা-কৌশলের আবশ্যক হয়, তাহা তিনি সুচারু ভাবেই পালন করিয়া আসিতেছেন। গত বৎসর আমরা রবিবাসরের রজত জয়ন্তী উৎসব করিয়াছি। ইহা তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টার ফল। কিন্তু জলধরদাদার কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে এই জন্য যে সদস্যদের ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তন হইলেও, যে রবিবাসর এখনও টিঁকিয়া আছে সে কৃতিত্ব সর্বাংশে তাঁহার প্রাপ্য। সৌম্যমূর্ত্তি, অমায়িক ব্যবহার প্রত্যেক সদস্যের সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত স্নেহশীলতা আমাদের এতদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আমি অসুস্থ এবং সম্পূর্ণ অশক্ত তাহা হইলেও জলধরদাদার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার এই সুযোগ আমি ছাড়িতে পারিলাম না।

বাঘের বাচ্চা

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলারাজ)

পৌষ মাস—কনকনে ঠাণ্ডা—সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে শয্যায় বসেই ঠাকুরের নাম নিচ্ছি—খবর পেলাম খাবাড়ের জঙ্গলে একটা বাঘ সন্ত আশ্রয় নিয়েছে। এটা হচ্ছে লালগোলায়—আমাদের রাজবাড়ীর পশ্চিমে ছোট দেউড়ীর বাবুদের আমবাগান। ব্যস্—আর চাই কী! এক নিমেষেই চেষ্টারফিল্ড চড়িয়ে নিলাম। শিকারের সাজসরঞ্জাম নিয়ে তখুনি খিড়কীর দরজা খুলে চট্‌পট্ বেরিয়ে পড়লাম।

জন পঞ্চাশেক সেপাই সাজ পোষাক করে বন্দুক হাতে সব প্রস্তুত হচ্ছিল—দৈনন্দিন প্যারেডের জন্যে—সেটা বাতিল করে তাদেরও সবাইকে ডেকে নেওয়া হল। যে লোকটি খবর এনেছিল—সে ত' আছেই—পেছনের দরজায় একটা লম্বা চওড়া শিখ প্রহরী কম্বল মুড়ি দিয়ে দণ্ডায়মান। দুই গালে তার সুন্দরবনের ঘন জঙ্গল—বন্দুক টোটা তার হাতে দিয়ে তাকেও সঙ্গে নিলাম।

বাহিনীটা নেহাৎ মন্দ হ'ল না। আমাদের সেই জঙ্গী অভিযান দেখে অত ভোরেও কতিপয় পথচারী সেপাইদের দলেই ভিড়ে গেল। এরা সকলেই শিকার-দর্শনেচ্ছু বীরপুরুষ।

বাড়ীর পেছন দিয়ে হাঁটা পথে প্রায় দশ মিনিট লাগে।

গিয়ে দেখি একটা ফুটবল খেলার মাঠের চেয়েও ছোট সেই জঙ্গলটা—কতকগুলো লোক শুকনো কাঠ কুড়োতে এসে বাঘের খবর পেয়েই বাইরে হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে।

তখন সকালের কাঁচা মিষ্টি রোদ এসে আমাদের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

সেপাইদের বল্লাম—এই ছোট্ট জঙ্গলটাকে ঘেরাও করে একসঙ্গে ওধার থেকে তোমরা এগিয়ে এস—আর দু'দশটা ফাঁকা আওয়াজ চালাও—আমি রইলাম এধারে।

হুকুম তামিল করতে তাদের একটুও দেরী হয় নি।

জঙ্গল-'বিট্' হতে না হতেই দেখলাম—একটা বাঘ চোরের মত বেরিয়ে এল—সঙ্গে একজোড়া বাচ্চা। একটা টাল খেয়ে বাঘের সঙ্গেই পালিয়ে গেল—অপরটী একটু খুঁড়িয়ে চলায় তার মায়ের কোল ছাড়া হয়ে ছিট্‌কে পড়ল।

ব্যাঘ্রশাবকের লোভে আমার ঐ বাঘটাকে আর গুলী করা হোল না। কারণ, অন্য এক জঙ্গলে এমনি আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। বাঘকে খতম করে তার সঙ্গের বাচ্চাকে জ্যান্ত ধরবার বহু প্রয়াস করেছিলাম—কিন্তু কোথায় যে জঙ্গলে লুকিয়ে গেল, হাজার চেষ্টা করেও আর সেটার পাত্তা পাওয়া গেল না। তাই, ইচ্ছে করেই তখনকার মত বাঘকে রেহাই দিলাম—ঝট্‌পট্ শিখ সর্দ্দারের গা' থেকে তার মোটা আচ্ছাদনীটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে সেই বাচ্চাকে কম্বলচাপা দিলাম। তারপর যেমন বেড়ালছানাকে ঘাড় ধরে তোলে, তেমনি একটু আদর জানিয়ে শিখের জিম্মায় দিয়ে বল্লাম—

—এটাকে বাড়ী নিয়ে যাও।

নাওয়া খাওয়া দূরে থাক—পেটে একবিন্দু জল নেই—এমনি কি সকালে হাত মুখ ধোয়াও হয় নি। আমার সেপাইদেরও ঐ একই অবস্থা—তফাৎ এইটুকু—ভোরের কাজগুলো তারা সব আগেই সেরে নিয়েছে—মায় সাদা অঙ্কুর গজানো পোয়াটেক ভিজে ছোলা-সমেত ভরপুর এক লোটা পাণি।

যাই হোক, এ জঙ্গল সে জঙ্গল···এধার ওধার···তচ্‌নচ্ করে খোঁজাখুঁজি, কত হাঙ্গাম হুজ্জুৎ—বেলা ৯টে পর্য্যন্ত কত না হয়রানি—তবুও বাঘিনীর মোলাকাৎ পাওয়া গেল না।

মজা মন্দ নয়—এবার—বাচ্চা পাওয়া গেল—জননীকে হারাতে হোল।

তবে সেবার সেই বিরামপুর জঙ্গলে বাঘের বাচ্চা পাওয়া না গেলেও, বাঘের দুধ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। 'বিট্' সুরু হবার আগেই—আমি উল্টো দিক দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে দেখি—বাঘিনী নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে আছে আর বাচ্চাটা তার পেটে লুটোপুটি খাচ্ছে। ওদিকে হৈচৈ সুরু হওয়ায় গা ঝাড়া দিয়ে উঠতেই আমার এক গুলীতে তিনি কুপোকাৎ। ছুটে গিয়ে দেখি একদম শেষ—বাচ্চা পলাতক। হয়ত সন্ত স্তনপায়ী ব্যাঘ্রশিশু দুধ ছেড়ে কোথায় ঘন জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে—আর এদিকে, তার মায়ের দুধের বোঁটায় তখনও টাট্‌কা একবিন্দু দুধ জ্বল্ জ্বল্ করছে···ঈষৎ নীলাভ যেন তার রং। কথায় বলে—'বাঘের দুধ'—স্বচক্ষে দেখলাম—তবুও ধন্য হই নি। মনটা আমার কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। কী করা যায়? গতস্য শোচনা নাস্তি!

তারপর বাঘের কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সেই বাচ্চাটাকে পোষ মানাতে চাইলাম। আদর যত্নে শশীকলার মত দিন দিন বাড়তে থাকেন, আমার পালঙ্কের নীচেই নিদ্রা যান। বিড়াল দেখলেই বিষম রাগ—তখুনি পশ্চাদ্ধাবন—মাসীকে তাঁর কিছুতেই সহ্য হয় না। ক্রমে মাঝারী কুকুরের মত বড় হয়ে উঠলেন। জাতের বুলি ছাড়েন নি'—কোনও বিষয়ে বিরক্তি বোধ হলেই হাউ মাউ করেন। আমি যখন পদব্রজে প্রাতঃকালীন ভ্রমণে যেতাম, তিনিও থাকতেন সঙ্গে। রাস্তার লোক সভয়ে পথ ছেড়ে একেবারে চম্পট। দূর থেকে দেখেই দোকানপাটের ঝাঁপগুলো সব বন্ধ হয়ে যায়—চতুর্দ্দিক জনশূন্য।

অনেকের সইকরা দরখাস্ত আমার কাছে পেশ হল। আমি যেন তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বাঘ সঙ্গে নিয়ে আর বেড়াতে না যাই—নইলে তাদের কেনাবেচার বড়ই অসুবিধে হয়—লোকজনও নাকি বাজারে আসতে চায় না।

আমিও অগত্যা মহাপ্রভুকে নিয়ে বাইরে যাওয়া ছেড়ে দিলাম। হুড্-খোলা মোটরে যখন বৈকালিক পরিক্রমায় বের হ'তাম, তিনিও কুকুরের মত আমার পাশে বসে বেশ "আরামসে" হাওয়া খেয়ে আসতেন, তবে "শেরকে বাচ্চা শের"—তাই মাঝে মাঝে ছাগল ভেড়া দেখলেই ঝাঁপ দেবার পৈতৃক নেশাটা প্রবল হয়ে উঠতো—তখন বহুকষ্টে তাকে সামলে রাখতাম।

হাজার হলেও বাপের রক্ত—বংশের ধারা যাবে কোথায়? একদিন আমার ভৃত্য তাকে মাংস হাড় দিতে দেরী করায় বাঘটা তার হাতে থাবা বসিয়ে দেয়। এই লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিলাম। লৌহপিঞ্জরে বেচারী আজীবন কারারুদ্ধ হলেন।

আর সেই বাঘিনী?

বাচ্চা—হারাণোর শোকে, তার উপদ্রবটা বেড়ে গেল—সেই আক্রোশে গরু, ভেড়া, ছাগল, মোষ সে একধার থেকে উজাড় করে যায়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে হুমকী দেখিয়ে ছুটে বেড়ায়—গভীর রাতে আমাদের বাড়ী থেকেও সেই হৃতশাবক ব্যাঘ্রীর ভীষণ ডাক শোনা যেতো। কয়েক রাত্রি ধরে তার গর্জ্জনে সবারই মনে আতঙ্ক—গ্রামবাসীদের চোখে ঘুম নেই। তারপর, হপ্তাখানেকের মধ্যেই, বেট বাঁধিয়ে এক মাহেন্দ্রযোগে সেই সন্তানহারা বাঘিনীর ক্ষুব্ধ বিক্রমকে ইহজন্মের মত স্তব্ধ করে দিলাম।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের চৈতন্যচরিতামৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষ জীবনের ও বৈষ্ণবতত্ত্বনিরূপণের শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত। চৈতন্যচরিতামৃতের গম্ভীরালীলার বর্ণনায় কবিরাজ মহাশয় যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাতে কৃষ্ণবিরহকাতরা শ্রীরাধার অসীম ও অসহ বিরহ-বেদনা দিব্যোন্মাদময় মহাপ্রভুর আর্তির মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রে এবং বৈষ্ণবমহাজনগণের পদাবলীতে শ্রীমতীর বিরহের যে বর্ণনা আছে তাহা যে বাস্তব সত্য, তাহা যে কবি-কল্পনামাত্র নহে তাহা মানুষ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছে মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলা দেখিয়া। অশ্রুপ্লাবিত না হইয়া কেহই সে বর্ণনা পড়িতে পারে না। কিন্তু আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবি যে চৈতন্যচরিতবর্ণনায় সিদ্ধহস্ত এই কবি মহাপ্রভুর সহধর্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সম্বন্ধে একেবারে নির্বাক। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে, নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তি-রত্নাকরে ও ঈশানের অদ্বৈতপ্রকাশে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শেষ জীবনের যে অতি সামান্য বর্ণনা আছে তাহাতে তাঁহার তীব্র বৈরাগ্যের, অতুলনীয় তপস্যার ও সীমাহীন বিচ্ছেদ-ব্যথার ছবি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

"প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রেতে,
কদাচিৎ নিদ্রা হইলে শয়ন ভূমিতে।
কনক জিনিয়া অঙ্গ—সে অতি মলিন
কৃষ্ণচতুর্দশীপ্রায় দেহ অতি ক্ষীণ।"

ভক্তিরত্নাকর, চতুর্থ তরঙ্গ

যে সুবর্ণ-প্রতিমা প্রভু-বিরহে কৃষ্ণা চতুর্দশীর শশিকলার মত শীর্ণা হইয়া বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেন, কদাচিৎ কোনও দিন তন্দ্রা আসিলে ভূমিতেই পড়িয়া থাকিতেন তাঁহার কথা কৃষ্ণদাস কবির মনে একবারও উদিত হইল না! দেবীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা বর্ণনায় জয়ানন্দ বলিয়াছেন :—

"অরুণ-উদয়কালে গঙ্গাস্নান করি,
মন্দিরে আসিয়া দিব্য ধৌত বাস পরি,
একমুষ্টি আতপ তণ্ডুল ভূমে ফেলি,
একটি তণ্ডুল লইয়া হরেকৃষ্ণ বলি
হরিনাম বত্রিশ অক্ষর হইলে
সেই তণ্ডুল গুটি রাখে গঙ্গাজলে।
এই মত তিন প্রহর হইলে পরে
রন্ধন করিয়া প্রভুরে নিবেদন করে
সেই অন্ন-ভক্ষণ হয় দেহ-রক্ষা হেতু
প্রিয়ার চরিত্র লোকের ধর্মশিক্ষা সেতু।"

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

রামায়ণে জনকনন্দিনীর রাম-বিরহের কথা আছে, শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে গোপীগণের কৃষ্ণ-বিরহের বর্ণনা আছে কিন্তু দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার গৌরাঙ্গ-বিরহ হইয়াছিল তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক মর্মন্তুদ। পতি-পরিত্যক্তা হইয়াও সীতা জানিতেন রামচন্দ্রের জীবন সীতাময়, অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইলে রামচন্দ্র স্বর্ণসীতা নির্মাণ করেন। শ্রীরাধা ও অন্যান্য গোপী দুঃসহ হৃদয়-ব্যথার কথা পরস্পরের কাছে বলিয়া হৃদয়ের দুঃখভার লাঘব করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ "পুনরায় ফিরিয়া আসিব" বলিয়া যে আশ্বাস বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন তাহার উপর নির্ভর করিয়াও থাকিতে পারেন কিন্তু দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা কি হইয়াছিল? যতদিন শচীমাতা জীবিত ছিলেন তিনি চোখের জল ফেলিতে পারেন নাই, পাছে পুত্রবধূর দুঃখ দেখিয়া মাতা অধিক কাতর হইয়া পড়েন।

নিদারুণ হৃদয়-বেদনার উপর পাষাণ চাপাইয়া "অন্তর্গূঢ়ঘনব্যথা"য় আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাকে জীবন কাটাইতে হইত। সন্ন্যাসী স্বামী যে আর কোনও দিন ফিরিয়া আসিবেন না বা আসিলেও পত্নী-দর্শন করিয়া যতিধর্মচ্যুত হইতে যাইবেন না তাহাও তিনি নিশ্চিতরূপেই জানিতেন। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর সকল মানুষের সঙ্গ হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পতিগৃহের নির্জনতার মধ্যে একক জীবন-যাপন করিতেন। এই বিরহকৃশা পতিগতপ্রাণা তপস্বিনীর মূর্তি কৃষ্ণদাসবর্ণিত গম্ভীরাস্থিত আর্তিময় গৌরাঙ্গমূর্তির পাশে দাঁড় করাইবার মত—তাহা হইতেও অধিক বাস্তব। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সমগ্র চৈতন্যচরিতামৃতে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার বর্ণনা ত দূরের কথা তাঁহার নাম একবার মাত্র উচ্চারিত হইয়াছে!

কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ই নহেন, চৈতন্যভাগবতকার শ্রীবৃন্দাবনদাস মহাশয় অথবা অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেহই বিষ্ণুপ্রিয়ার এই কঠোর বৈরাগ্যবতী মূর্তি অঙ্কিত করেন নাই, এমন কি উল্লেখও করেন নাই। মনে হয় যেন একটা ষড়যন্ত্র করিয়াই তদানীন্তন বৈষ্ণব-নেতৃবৃন্দ মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মত ব্যাখ্যাতা বলিয়া প্রখ্যাত তাঁহাদের মধ্যেও কেহই এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন না। কেহ কেহ বলেন, মহাপ্রভুর নবদ্বীপত্যাগের পর তিনি যখন কোনওদিন বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই, কদাপি বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম উচ্চারণ করেন নাই, তখন বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে স্বেচ্ছাকৃত এই বিস্মৃতি চৈতন্যচরিতকারগণের পক্ষে ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তি বিচার-সহ নহে। যেখানে গোস্বামিগ্রন্থে ছোট বড় অগণিত গৌরাঙ্গ ভক্তের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রেষ্ঠ ভক্তিমতীর কথা শুধু তিনি গৌরাঙ্গের সহধর্মিণী বলিয়াই কি বর্জিত হইবে? যেন গৌরাঙ্গপত্নী না হইলে তাঁহার কথা বলা যাইত!

বৃন্দাবনদাস মহাশয় চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভু-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

এই মত চাপল্যকরে করেন সবাসনে
সবে স্ত্রী-মাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টিকোণে।
"স্ত্রী" হেন নাম প্রভু এই অবতারে—
শ্রবণো না করিলা—বিদিত সংসারে!
অতএব যত মহামহিম সকলে
"গৌরাঙ্গ নাগর" হেন মুখে নাহি বলে।

অতএব কি আমরা মনে করিব যে বিষ্ণুপ্রিয়ার তপস্যার কথা বর্ণনা করিলে গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ-নাগর হইয়া যাইতেন ভয়ে তাঁহারা নির্বাক থাকিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসব্রতধারীর স্ত্রী তপস্বিনীর মত জীবন-যাপন করিলে সেই সন্ন্যাসী কখনই নাগর হইয়া উঠেন না, ইহা সহজবোধ্য। পক্ষান্তরে যতদিন মহাপ্রভু গৃহী ছিলেন, তিনি আদর্শ গৃহীই ছিলেন। ছাত্ররূপে, পুত্ররূপে, পতিরূপে, বন্ধু ও সখারূপে তিনি যেমন ছিলেন আদর্শ মানুষ সন্ন্যাসধর্মের কঠোরতাপালনেও তিনি ছিলেন তেমনই আদর্শ। সেই জন্যই তিনি সার্থকনামা পুরুষোত্তম। সুদূর নবদ্বীপের নির্জন গৃহে স্ত্রী তাঁহারই ধ্যানে, তাঁহারই আদর্শ-পালনে কঠোর নিষ্ঠাময় জীবন যাপন করিলে শ্রীচৈতন্যের আদর্শ চরিত্র যে কিরূপে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, তাহা কল্পনাতীত। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে উপেক্ষিতাদের কথা বলিয়াছেন কিন্তু বৈষ্ণবচরিতকাব্যে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার মত উপেক্ষিতা আর কে আছে?

বৈষ্ণব চরিতকাব্যের কবিরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলোকসামান্য চরিত্রের কথা বলিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহারা চিরনমস্য। তথাপি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের আচরণ যে অমার্জনীয় তাহা অনস্বীকার্য। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবি বংশীবদন ও বৈষ্ণব সমাজে অনাদৃত কবি জয়ানন্দ দেবীর জীবন সম্বন্ধে যে সামান্য আলোকপাত করিয়াছেন সেজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। বর্তমান সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-সঙ্গিনী সারদামণির স্মরণোৎসবে সমগ্র দেশ মাতিয়া উঠিয়াছে কিন্তু যে মহীয়সী মহিলা ভারতীয় নারী-আদর্শের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সেই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা স্মরণ ও আলোচনা করা ত দূরের কথা অনেকেই তাঁহার সম্বন্ধে কোনও প্রকারের কৌতূহলও পোষণ করেন না। ভারতীয় জীবনাদর্শে স্ত্রীর এক নাম সহ-ধর্মিণী। স্বামীর ধর্মাচরণে সহায়তা করার জন্য অনুকূল অবস্থা ছিল সারদামণির। স্বামীর ভাগবতজীবনের পার্শ্বে আসিয়া ভাগবতজীবন যাপনের পরম সৌভাগ্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন। অন্যদিকে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর ব্রতরক্ষায় তাঁহার নিকট হইতে চিরবিচ্ছিন্ন হইয়াও দূরে থাকিয়া নিজের দৈনন্দিন জীবনের দ্বারা, জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্রবৃহৎ আচরণের দ্বারা স্বামীর মহৎ জীবনে প্রেরণা দান করিয়াছেন। শকুন্তলার প্রতি মহর্ষি কণ্বের উপদেশচ্ছলে কালিদাস ভারতীয় নারী-আদর্শের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপংগমঃ"—স্বামী রোষবশতঃ রূঢ় আচরণ করিলেও বিরুদ্ধতা করিবে না "কিন্তু স্বামী পরিত্যাগ করিলেও যে কেমন করিয়া সেই স্বামীর চিত্তবৃত্ত্যনুসারিণী হইতে হয় দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। কলিতে জীবের মলিন জীবনকে উজ্জ্বল ও কৃষ্ণাভিমুখী করার জন্য স্বামী চাহিয়াছিলেন হরিনাম প্রচার এবং শ্রীরাধার অত্যুজ্জ্বল প্রেমরস আস্বাদনের জন্য তিনি লইয়াছিলেন নীলাচলের গোপন গম্ভীরায় আশ্রয়। এই দুইটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি তাঁহার অতি প্রিয় নবদ্বীপ, প্রিয়া ভার্য্যা, পুত্রগতপ্রাণা জননী ও অগণিত ভক্তকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসের দ্বারাই বৈরাগ্য ও প্রেমের অচিন্তনীয় যোগসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস-প্রয়াগে আসিয়া বৈরাগ্যগঙ্গা ও প্রেমযমুনা মিলিত হইল আর এই মিলনের বারি পান করিয়া তৃষিত মানবাত্মা চিরপবিত্র ও ধন্য হইল।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া পতির এই দুইটি উদ্দেশ্যই পরিপূর্ণভাবে সিদ্ধির পথে আগাইয়া দিলেন—লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া। তিনি জনশূন্য গৃহে নিভৃতে যে নাম-সাধনা আরম্ভ করিলেন, তাহার কথা অচিরে নবদ্বীপস্থ অসংখ্য ভক্তের নিকট পৌঁছিল এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব আলোড়নের সৃষ্টি করিল। বৈষ্ণব চরিতকারগণ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেও বাংলা দেশের অগণিত নরনারী চোখ কান বন্ধ করিয়া ছিল না। নবদ্বীপচন্দ্র বাংলা দেশের আকাশে ছিলেন না বটে কিন্তু তাঁহারই নবদ্বীপস্থ গৃহকোণে যে বৈদ্যুতিককেন্দ্র রাখিয়া গেলেন, তাহার অপূর্ব তাড়িত প্রবাহের প্রভায় সমগ্র দেশ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মানুষকে ভালবাসিয়া স্বামী সংসারের সকল সুখ বিসর্জন দিয়া সন্ন্যাসের তীব্র বৈরাগ্যময় পথ ধরিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সংসারে থাকিয়া সন্ন্যাসিনীর পূর্ণ জীবন যাপন করিয়া তাঁহারই পথের পথিক হইলেন। গৃহ-সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর তিনিই সংসারস্থিতা সন্ন্যাসিনী সহ-ধর্মিণী।

সুদূর নীলাচলে স্বামী যে রাধাপ্রেম আস্বাদন করিয়া নয়নের জলে অহরহ ভাসিয়া যাইতেন, সেই প্রেমেরই আস্বাদন করিয়াছেন তেমনই চোখের জলে ভাসিয়া নবদ্বীপে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। আজ অসংখ্য নরনারী শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া পূজা করেন—সেই ভাবে সেই পূজার আরম্ভ করেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত মনোহরণ মূর্তি আজিও নবদ্বীপের মহাপ্রভুর মন্দিরে থাকিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে আনন্দ, প্রেম ও ভক্তির সঞ্চার করিতেছে।
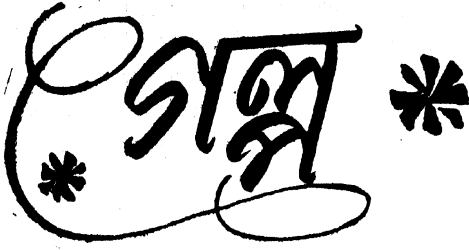
বেকার

শ্রীযামিনীমোহন কর

দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পাশ করেছি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে। বৃত্তি পেয়ে গবেষণা করছি আমাদের অধ্যাপক পুরন্দর চক্রবর্ত্তীর অধীনে। পণ্ডিত লোক, কিন্তু অত্যন্ত কৃপণ। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ধুরন্ধর চক্কোত্তি নামে খ্যাত। এই নামটা আমদানী হয়েছে কবে এবং কি ভাবে সেটাও এক গবেষণার বিষয়। শোনা যায়, পূর্ব্বে যে পাড়ায় থাকতেন সেখানে সকলেরই মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গেছেন। সেই থেকেই নামের উৎপত্তি। যাই হোক, সম্প্রতি তিনি লেকের কাছে বাড়ী করেছেন, মানে সস্তায় পুরানো বাড়ী কিনে মেরামত করিয়ে নিয়েছেন। অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে যাওয়াতে ক্রণিক বদ্‌মেজাজে ভুগছেন। তাঁর কাছে গবেষণা করছি সুতরাং আমার অবস্থা অনুমেয়। সরে পড়ছি না কেন? তার কারণ তিনি নন, আমার গবেষণাপ্রীতিও নয়; আসল কারণ তাঁর কন্যা সুমনা, যেমন সুন্দর দেখতে তেমনই সুন্দর মন। ভারী সুইট।

অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী এক বিরাট পুস্তক প্রণয়ন করছেন। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনঃসমীক্ষণের তুলনামূলক ইতিহাস।" আমার কাজ হয়েছে তাঁর রচনা শোনা, আর ফেয়ার কপি করা। অবশ্য সুমনাও কপি করতে সাহায্য করে এবং সত্যি কথা বলতে কি, সেইটাই আমার গবেষণায় উৎসাহের কারণ। রোজই অধ্যাপকের বাড়ী সকাল বিকাল যাই। ধীরভাবে অধ্যাপক মহাশয়ের পাতার পর পাতা রচনা শুনি। ঘাড় মুখ গুঁজে পাতার পর পাতা কপি করি। সেই সঙ্গে মধ্যে মধ্যে অধ্যাপকের তর্জ্জন গর্জ্জনও সহ্য করতে হয়। আমার ভাবটা প্রায় মার্টারের মত। কিন্তু উপায় কি? প্রবাদই রয়েছে 'নন্ বাট দি ব্রেভ ডিজার্ভস্ দি ফেয়ার'। সাহস প্রয়োজন বই কি। লোকে বাঘের মুখে যায়, রাক্ষসের কবলে পড়ে আর আমি তো মাত্র—

এই সময় বাবা বদলী হয়ে গেলেন। মেসে উঠব ঠিক করেছি অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী বললেন,—"না, মেসে-টেসে নয়। তুমি আমার বাড়ীতে থাক। তোমার গবেষণার সুবিধা হবে। মেসের চেয়ে ভাল থাকবে। আর তোমার আত্মসম্মানে যদি বাধে তো না হয় হোটেল মনে করে খাওয়া ঘর ভাড়া ইত্যাদি জন্য মাসে শ'খানেক টাকা দিও।" শ' কেন দুশ' দিতেও রাজী। এমন সুযোগ ছাড়া যায়। সব সময় সুমনার সান্নিধ্য। তখনই রাজী হয়ে গেলুম। অধ্যাপকও খুশী হলেন। যখন তখন লেখা শোনাতে পারবেন আর কিছুটা খরচও উঠে আসবে। উভয়পক্ষের খুশীর আবহাওয়ার মধ্যে আমি 'চক্রবর্ত্তীধামে' গিয়ে আস্তানা গাড়লুম।

হঠাৎ কি এক কাজে অধ্যাপক চক্রবর্ত্তীকে কলিকাতার বাইরে যেতে হ'ল দিন দু'য়েকের জন্য। যাবার সময় আমার ঘাড়ে একগাদা কাজ চাপিয়ে দিয়ে গেলেন। মনটা আনন্দে ভরে উঠল। সমস্ত দিন সুমনার সঙ্গে কাটাব। রাত জেগে লেখা কপি করব। সুমনার মা আমাকে ভালবাসেন, পছন্দ করেন। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত নির্ব্বিবাদী। সুতরাং—

প্রথম দিনটা সুন্দর কাটল। সকালে লেকে বেড়ানো, দুপুরে ক্যারম খেলা, বিকেলে সিনেমা, রাত্রে ফিরে এসে গান বাজনা। তারপর রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে অধ্যাপক মহাশয়ের লেখা কপি করতে বসলুম। কপি করতে করতে কখন যে লেখা বন্ধ হয়ে গেছে জানি না। অন্যমনস্ক হয়ে কতক্ষণ যে সুমনার চিন্তা করেছি তারও হিসেব নেই। চমক ভাঙ্গল ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজতে। এদিক ওদিক চেয়ে হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। ঘরের এককোণে অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী দাঁড়িয়ে। ওখানটায় আলো কম বলে চেহারাটা একটু অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। কিন্তু এ কি করে সম্ভব! তিনি কলিকাতার বাহিরে আছেন। তা ছাড়া ঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে। ঘরের মধ্যে এত রাত্রে তিনি কি করে এলেন!

মূর্ত্তি বা অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী (?) ধীরে ধীরে আমার কাছে

এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "ভয় পেয়ো না। আমি অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী নয়। তাঁর প্রেতাত্মা।"

প্রেতাত্মা তো এই বলে খালাস, কিন্তু আমি তখন ভয়ে রীতিমত কাঁপছি। শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করলুম—"কিন্তু তিনি তো এখনও বেঁচে।"

প্রেত উত্তর দিলে,—"আরে সেইখানেই তো মুস্কিল হয়েছে। আমি এখন চাকরী হীন অর্থাৎ বেকার। আর বল কেন দুর্গতির কথা!"

আমি তো বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছি। ক্ষীণভাবে বললুম,—"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কিসের চাকরী?"

ম্লান হেসে প্রেত বললে,—"তাহলে সবটা শোন, বলছি। আমরা সাধারণতঃ হাওয়ার মত সূক্ষ্মভাবে থাকি। কোন রূপ নেই। সে অবস্থাটা খুবই কষ্টকর। স্থিতিহীন হয়ে ভেসে বেড়ান। কেউ মৃতপ্রায় হলে আমরা তার রূপ ধারণ করতে পারি। বছর দুই আগে অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী প্রায় পটল তুলেছিল আর কি। সেই সময় আমি ওঁর রূপ ধারণ করি। মরে গেলেই স্থিতি হ'ত। কিন্তু লোকটা বেঁচে উঠে আমাকে মেরে রেখেছে। এখন ভেসে বেড়াচ্ছি। তোমার সঙ্গে কথা কইব বলেই অতি কষ্টে এই রূপ ধারণ করেছি। তাই বলছিলুম, আমি বেকার।"

প্রেতটিকে ভালই মনে হ'ল। ততক্ষণে মনেও কিছুটা সাহস এসেছে। প্রশ্ন করলুম,—"বেকার হয়ে থাকবার কারণ কি? কত লোকই রোজ মরছে—"

বাধা দিয়ে প্রেত বললে,—"উহুঁ, সেটি হবার জো নেই। আমাদের একটা চাকুরী সংস্থা অর্থাৎ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আছে। নাম রেজিষ্ট্রী করে রাখতে হয়। ক্রমিক সংখ্যা হিসেবে কাজ পেতে হয়। অবশ্য গুণেরও প্রয়োজন থাকে। আমি পূর্ব্বজন্মে একটু লেখাপড়া শিখেছিলুম। পি, আর, এস; পি, এইচ, ডি, উপাধি ছিল। তাই এই কাজটা পেয়ে গেলুম। কিন্তু তীরে এসে তরী ডুবল। পেয়েও পেলুম না। এখন নতুন কাজ পেতে বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে। আবার কিউ লাগাতে হবে। অর্থাৎ একেবারে শেষে নাম বসবে। সুতরাং কবে যে একটা হিল্লে হবে বলা শক্ত।"

"আপনাদের ওখানেও কি চাকুরীপ্রার্থীর ভীড় খুব বেশী?"

"এত বেশী যে তুমি ধারণাও করতে পারবে না। মৃত্যুহার এখন কিছুটা কমেছে। তাতেই আমাদের এই অবস্থা। চাকরীর অভাব। যুদ্ধের সময় বেশ সুবিধা ছিল। এখন এই অধ্যাপকটি না মরলে আমার কাজের কোন আশাই দেখছি না।"

প্রশ্ন করলুম,—"ওঁকে তো আপনি ইচ্ছে করলে মেরেও ফেলতে পারেন?"

"না, তাতে সুবিধা হবে না। সাধারণ মৃত্যু এবং অপঘাত মৃত্যু দুটো আলাদা বিভাগ। যুদ্ধের সময় দুটো এক হয়ে যায়। চট্ করে যুদ্ধ লাগবে না ভেবে সাধারণ মৃত্যুবিভাগে নাম রেজিষ্ট্রী করিয়েছে। অন্য বিভাগে চাকরী দেবে না।"

"তাহলে আমায় কি করতে বলেন?"

"কি আর বলব। তুমি মেরে ফেললেও তো অপঘাত মৃত্যু হবে। তাতে কোন লাভই হবে না। দু'বছর বেকার বসে আছি। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিশতে লজ্জা করে। তাই এই বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াই। একলা থেকে থেকে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছে। রোজ রাত্রে তোমার সঙ্গে একটু গল্প করতে চাই। তোমার কোন আপত্তি আছে কি?"

ভদ্রতার খাতিরে বলতে হ'ল—"বিন্দুমাত্র না।"

প্রেত বললে,—"আজ রাত হয়েছে, ঘুমোও। কাল একটু সকাল সকাল এসে গল্প করা যাবে। তোমার প্রেমের ব্যাপারেও সাহায্য করব।"

এই বলে মুচকি হেসে ঘরের কোণে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

আমিও শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

পরদিন সমস্তক্ষণই প্রেতের কথা মনে পড়তে লাগল। সুমনার সঙ্গে কথা কইতে কইতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লুম। সুমনা অভিমান করলে, রাগ করলে। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলুম। আবার বিমনা হয়ে গেলুম।

রাত্রে অপেক্ষা করতে লাগলুম প্রেতের আবির্ভাবের। লিখতে চেষ্টা করলুম, বিশেষ সুবিধা হ'ল না। কখন চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়ছি, হঠাৎ খুট করে একটা শব্দে

ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখি আমার সামনে চেয়ার টেনে প্রেত বসবার ব্যবস্থা করছে। চোখ খুলতে দেখে, হেসে বললে,—"ঘুমিয়ে পড়েছিলে ?"

উত্তর দিলুম,—"মনটা ভাল নেই। আপনার কথা চিন্তা করতে গিয়ে সুমনার বিরক্তি ঘটিয়েছি—"

বাধা দিয়ে সে বললে—"আরে সে জন্য ভাবনা কি ? আমি সব ঠিক করে দেব। তোমাদের মিলন হবেই।"

বললুম,—"কিন্তু অধ্যাপক মহাশয়ের মেজাজ—"

প্রেত উত্তর দিল,—"কিছু ভেব না। সব আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। তোমাদের এই তো আনন্দ করবার বয়স।"

"কিন্তু কালই তো তাঁর ফিরে আসবার কথা।"

"কালই সব বন্দোবস্ত করে ফেলব," প্রেত হেসে উত্তর দিলে। "তুমি এ সব লিখ কি ?"

করুণ কণ্ঠে উত্তর দিলুম,—"আর বলেন কেন ? এই সব গন্ধমাদন বসে বসে কপি করতে হচ্ছে।"

প্রেত বললে,—"তা হলে তোমায় আজকে আর বিরক্ত করব না। নিজের কাজ কর। অধ্যাপককে হাতে রাখতে হবে তো। তবে কিছু ভেব না।"

এই বলে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন সকালেই অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী বাড়ী ফিরলেন। সেদিন বিশেষ কথাবার্ত্তা হ'ল না। একবার শুধু কতটা লেখা হয়েছে খোঁজ করলেন। সুমনার সঙ্গেও বড় একটা দেখা সাক্ষাতের সুযোগ মিলল না। রাত্রে হতাশ হয়ে বসে আছি এমন সময় প্রেত এসে হাজির। একগাল হেসে বললে,—"আমি তোমায় দুটো-সুখবর দিতে এলুম। প্রথম তোমাদের বিয়ের ব্যাপারে অধ্যাপক রাজী হয়েছেন।"

আগ্রহসহকারে জিজ্ঞেস করলুম,—"কি করে হল ?"

"ভয় দেখিয়ে। বললুম, আমি তোমার প্রেতাত্মা। চেহারা দেখেই নিশ্চয় বুঝতে পারছ। বিয়ে দাও চলে যাব, না দাও তোমার মৃত্যু অবধারিত। তিনি রাজী হয়েছেন।"

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কণ্ঠে বললুম,—"ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। অন্য সুখবরটা কি ?"

প্রেত উত্তর দিলে,—"কাগজে দেখ নি, রাশিয়ায় ষ্টালিনের মৃত্যুর পর কত লোক মরল, কত লোক সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হ'ল। এক নির্বাসিত অধ্যাপক মারা গেছেন। আমি তার প্রেতের পোষ্টটা পেয়েছি। বেকারত্ব ঘুচেছে। বিদায়, বন্ধু বিদায়।"

আনন্দে দু'পাক ঘুরে প্রেত হাওয়ায় মিশিয়ে গেল।

আমি হব তারই কবি

পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়

ওরা সব চলে যাক, জীবন-কাহিনী লিখে লিখে
পৃথিবীর কলরব, ভেসে যাক দিক হতে দিকে।
আমি শুধু বসে থাকি, শব্দহীন মুক্ত বাতায়নে।
স্মৃতির সলিল মাঝে রব একা নিস্তব্ধ শয়ানে।
আমি হব তারি কবি, চাঁদ যেথা চায় মুগ্ধ চোখে
প্রবাসী প্রিয়ের ছবি প্রেমিকার আঁখির আলোকে।

আগামী দিনের লাগি রাত্রি চলে মৌন অভিসারে,
জেগে ওঠে বিরহিনী, তন্দ্রালসা নিশা-স্বপ্ন ঘোরে।
জীবনের যত ব্যথা, যত আশা, যত হাসি গান,
মিলনের অভিসার, বিরহের রচা অভিমান।
তারি গান গেয়ে যাব, জীর্ণ বীণা লয়ে হাতে মোর
জীবন রজনী শেষে, যতদিন নাহি হয় ভোর।

সুন্দরের বেদিতলে বসি একা, দীর্ঘ দিনমান
গেয়ে যাব একই সুরে, যে সুরের নেই সমাধান।

ভারতীয় মুদ্রার কথা

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

প্রয়োজনের তাগিদে জগতে যে সব জিনিষ সৃষ্টি হয়েছে মুদ্রা তারই একটি। ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই এর প্রয়োজনটা অনুভূত হয় সবচেয়ে বেশী। কারণ, দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য অর্থাৎ 'বার্টার' ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অসুবিধা অনেক। সেই অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই প্রধানত মুদ্রার সৃষ্টি।

এই মুদ্রা কবে আবিষ্কার হয়েছিল এবং কেই বা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন তা এখন জোর করে বলা শক্ত। অনেকে মনে করেন, খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে মুদ্রার প্রথম প্রচলন হয়। তারপর তা ধীরে ধীরে সভ্য জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আবার অনেকে বিশ্বাস করেন, ভারতেই মুদ্রার চল হয় সবার চেয়ে আগে, খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে। কিন্তু এ-ও জোর করে বলার উপায় নেই। তবে বৈদিক যুগে ভারতে যে মুদ্রার প্রচলন ছিল তার প্রমাণ আছে। ঋগ্বেদে 'নিষ্ক' নামে এক-ধরণের মুদ্রার উল্লেখ দেখা যায়। বৈদিক সাহিত্যে আরও একটি মুদ্রার কথা উল্লেখ আছে, তা হচ্ছে 'শতমন'। এই মুদ্রাগুলি লম্বা ও বাঁকানো। ওজন প্রায় ৫৬০ গ্রেণ। এর এক পিঠের দু'ধারে সূর্যের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল আর অন্য পিঠ ছিল সম্পূর্ণ শাদা। এই অতি দুষ্প্রাপ্য মুদ্রাটির দু'একটি নিদর্শন কোন কোন মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

'নিষ্ক' ও 'শতমন' ছাড়া আরও অন্তত তিন প্রকার মুদ্রা বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। সে মুদ্রাগুলির সম্ভাব্য নাম হচ্ছে, 'সুবর্ণ' 'পদ' ও 'কৃষ্ণালা'। এই পাঁচটি মুদ্রাই ছিল স্বর্ণ মুদ্রা।

বেদোত্তর যুগে অর্থাৎ মগধ সাম্রাজ্যের উত্থান থেকে সুরু করে মৌর্য সাম্রাজ্য পর্যন্ত ভারতে যে সব মুদ্রা চলিত ছিল 'কর্ষপন' তারই একটি। তা ছাড়া, 'নিষ্কা', 'কাকনিক', 'মাষা', 'আধা মাষা', 'সুবর্ণ মাষা' প্রভৃতি মুদ্রা চালু ছিল বলে জানা যায়। পাণিনির সূত্রে ও জাতকে এদের উল্লেখ আছে। ঐ সব মুদ্রার কোনটি ছিল সোনার, আবার কোনটি হচ্ছে রূপার বা তামার। এগুলোর ওজন ও আকারের যথেষ্ট তারতম্য ছিল।

মনু তাঁর রচনায় 'পুরাণ' বা 'ধারণ' বলে একধরণের মুদ্রার উল্লেখ করে গেছেন। ঐ মুদ্রাটির ওজন এবং ওগুলো কোন্ ধাতু দিয়ে তৈরী হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে রৌপ্য নির্মিত 'পুরাণে'র কথাই বেশী উল্লেখ পাওয়া যায়। ওর ওজন ৩২ রতি ছিল বলে অনেকে বলেন। যাহোক, এই মুদ্রাগুলি দেখতে ছিল গোল। অথচ এর আগে বা সমসাময়িক যে সব মুদ্রা প্রচলিত ছিল তা বেশীর ভাগই গোল নয়, তবে ঐ সব মুদ্রার সঙ্গে 'পুরাণে'র সাদৃশ্য হচ্ছে এই যে সেগুলোর মত 'পুরাণ'ও ছিল কলার সাহায্যে খোদাই করা। তাই এগুলোকে বলা হয় খোদাই করা মুদ্রা। এই সব মুদ্রার দু'পিঠেই সূর্য, হস্তী, গরু, রথ, ঘোড়া, শিয়াল, বৃক্ষ, ব্যাঘ্র বা সিংহ, ধর্মচক্র প্রভৃতির চিহ্ন খোদাই করা থাকত। এসব মুদ্রায় কখনও রাজার নাম বা কোন সন তারিখ মুদ্রিত থাকত না। কিন্তু পরবর্তীকালে রোম ও গ্রীকদের সংস্পর্শে আসার ফলে ভারতে প্রচলিত মুদ্রার চেহারাও পরিবর্তিত হয়। মুদ্রায় গ্রীক দেবদেবীর এবং রাজার আবক্ষ প্রতিমূর্তি ও তারিখাদি অঙ্কিত হতে থাকে। মৌর্য বংশের পতন ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের মাঝামাঝি সময়ে এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

(২)

খৃষ্টপূর্ব ২৫০ সনের কথা। অশোক তখন সিংহাসনে। সে সময় আলেকজাণ্ডারের অন্যতম সেনাপতি সেলুকস ব্যাকট্রিয়া ও সিরিয়াতে গ্রীক রাজ্য স্থাপন করেন। ব্যাকট্রিয়ার গ্রাকগণ পরে নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। এই ব্যাকট্রিয়ার রাজা ডিমেট্রিয়াস ভারত আক্রমণ করে পাঞ্জাবে তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন। এই বংশেরই অন্যতম রাজা হচ্ছেন মিনাণ্ডার। তিনি মগধ সাম্রাজ্য পর্যন্ত আক্রমণ করেন। এই ইন্দো-গ্রীক রাজারা যে সব মুদ্রা তাঁদের শাসিত অঞ্চলে প্রবর্তন করেন তা অন্য অঞ্চলের প্রচলিত মুদ্রার উপরেও প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাবের ফলে ভারতীয় মুদ্রার যে পরিবর্তন হয় তা পূর্বেই বলেছি। মিনাণ্ডারের যে সব মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায়, মুদ্রার এক পিঠে দক্ষিণ হস্তে বর্শা নিক্ষেপের ও রাজার আবক্ষ মূর্তি এবং অপর পিঠে বজ্র নিক্ষেপোদ্যত গ্রীক দেবীর মূর্তি রয়েছে। রাজার সঙ্গে দেবদেবীর মূর্তিও মুদ্রাতে স্থান পেয়েছে।

যাহোক, বেশী দিন এ প্রভাব থাকেনি। কারণ, ইন্দো-গ্রীক রাজাদের অনেকেই শক, পহলব, ইউচি প্রভৃতি যাযাবর শক্তির আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। উত্তর ভারতের সীমানা থেকে গ্রীকদের প্রভাব খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে সেখানে কুশান সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে থাকে। তাঁরা দেশে প্রচুর স্বর্ণ ও তাম্র মুদ্রা প্রচলন করেন। সেই সময় থেকেই মুদ্রায় ভারতীয় ছাপ আবার যেমন ফিরে আসতে থাকে তেমনি ওতে ভারতীয় শিল্পনৈপুণ্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মুদ্রার এক পিঠে থাকত সাধারণত রাজার আবক্ষ মূর্তি আর অপর পিঠে দেবদেবীর মূর্তি। সেই সময় মুদ্রায় খোদিত লিপিরও পরিবর্তন হল।

কুশান সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন কনিষ্ক। তাঁর সময় প্রচলিত মুদ্রার এক পিঠে বেদীর সম্মুখে পূজারত রাজার মূর্তি খোদিত ছিল এবং গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল 'শা কনেস্কি' (রাজা কনিষ্ক) মুদ্রাটির অপর পিঠে ছিল বায়ুর দেবতার প্রতিকৃতি।

এই বংশেরই অপর রাজা হচ্ছেন বাসুদেব। ইনি ছিলেন শিবের

শুরু। তাঁর সময়কার মুদ্রার একপৃষ্ঠে বেশ আঁট করে পোষাক পরা একজন রাজার আবক্ষ প্রতিমূর্তি ও অপর পৃষ্ঠে ষাঁড়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান শিবের মূর্তি খোদিত ছিল। দেবতার পরিচয় লেখা ছিল ইরাণী ভাষায়। মোট কথা, কুশান বংশের রাজাদের মুদ্রার এক ধারে থাকত রাজাদের আবক্ষ মূর্তি আর অপর ধারে গ্রীক, রোমান, জোরাষ্ট্রিয়ান, হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি ঠাঁই পেত। এই ধরণের মুদ্রাই পরবর্তী হাজার বছর কাল উত্তর ভারতে চালু ছিল।

মৌর্য বংশের পতনের পর ভারতের শাসন-ঐক্য ভেঙ্গে পড়ে। দেশের উত্তর-পশ্চিম দ্বারপথ দিয়ে বহু অসভ্য বর্বর-জাতি ভারতে প্রবেশ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশ, উত্তর-মধ্য পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করে। তাছাড়া, দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কোন কোন বংশ শক্তিশালী হয়ে শাসন করতে থাকে। শতবাহন বংশও সেই সময় দক্ষিণ ভারতে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের রাজ্য সীমানা দক্ষিণে বর্তমান মহীশূরের উত্তর দিক থেকে উত্তরে নর্মদা নদী পর্যন্ত এবং পূর্ব-পশ্চিমে গোদাবরী নদী হতে পশ্চিম ঘাট পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সিমুক নামে জনৈক ব্যক্তি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেও তাঁর ছেলে প্রথম শতকর্ণী ছিলেন অধিক শক্তিশালী শাসক। এই বংশের রাজারা প্রধানত সীসার তৈরী মুদ্রার প্রচলন করেন। রূপার মুদ্রার বদলে রূপা মেশান তামার মুদ্রাও তাঁরা তৈরী করান। এগুলোকে বলা হত 'পোটিন'। শুধু তাম্র মুদ্রার প্রচলনও তখন ছিল।

শতবাহনদের মুদ্রাগুলি দেখতে তেমন সুন্দর ছিল না, তবে ঐ মুদ্রা গুলি থেকে তাদের সময়কার ইতিহাস পরিষ্কার জানা যেত। ঐ সব মুদ্রার এক পিঠে হাতি, ঘোড়া, সিংহ অথবা চৈত্য খোদিত থাকত আর অপর পিঠে থাকত তথাকথিত 'উজ্জয়িনী নিদর্শন' অর্থাৎ একটি ক্রশ চিহ্ন এবং উহার বাহুর চার মাথায় চারিটি বৃত্ত। চতুর্থ শতকর্ণীর যে মুদ্রা পাওয়া গেছে তার এক পিঠে শুঁড় তোলা হাতীর মূর্তি এবং অপর দিকে 'উজ্জয়িনী নিদর্শন' রয়েছে।

(৩)

এরপর গুপ্তযুগে প্রচলিত মুদ্রার কথা বলা যায়। এই যুগকে হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুত্থানের যুগ বলা যেতে পারে। কারণ পূর্বেই বলেছি, মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতনের পর চীন, গ্রীস প্রভৃতি দেশ থেকে আগত বিভিন্ন বর্বর জাতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে শাসন চালিয়েছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে (খৃষ্টাব্দ ৩২০ থেকে ৫০০ আনুমানিক) ঐ সব শক্তি হীনবল হয়ে পড়ে এবং ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঐক্যবদ্ধ হয়।

গুপ্তরাজাদের মুদ্রা প্রধানত ছিল সোনার। তবে তামার ও রূপার মুদ্রাও তাঁরা চালু করেন। সেই সময় বিবিধ প্রকারের এবং মূল্যের মুদ্রাও চালু ছিল। কোন মুদ্রার পৃষ্ঠে পূজারত রাজার দণ্ডায়মান মূর্তি, আবার কোন কোনটিতে রাজার বীণাবাদন রত, অশ্বমেধ যজ্ঞরত, অশ্ব বা হস্তীর উপর আরূঢ়, সিংহ বা ব্যাঘ্র বা গণ্ডারকে হত্যারত অথবা কৌচের উপর উপবিষ্ট মূর্তি খোদিত আছে। মুদ্রার অপর দিকে ছিল সিংহাসনা-রূঢ়া অথবা পদ্মাসনা লক্ষ্মীমূর্তি, অথবা রাজ্ঞীর মূর্তি। এই সময় সংস্কৃত মুদ্রালিপি প্রচলিত ছিল।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তিনি লিচ্ছবি রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। এই শুভদিনটিকে স্মরণীয় করার জন্য তিনি সে-সময় যে মুদ্রা চালু করেন তাতে তাঁর ও রাজ্ঞী কুমারদেবীর মূর্তি খোদিত করান। তাঁর ঐ স্বর্ণমুদ্রার একদিকে রাজা ও রাণীর মুখোমুখি দণ্ডায়মান মূর্তি ছিল। রাজা যেন রাণীকে একটি আংটি দিচ্ছিলেন। এদিকে চন্দ্রগুপ্ত নামটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা ছিল। অপর পিঠে পদ্মের উপর শায়িত সিংহের উপর উপবিষ্ট দেবীমূর্তি খোদিত ছিল। সংস্কৃতে লেখা ছিল লিচ্ছবিয়া।

এই বংশের দ্বিতীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত বহু দেশ জয় করেছিলেন। তিনি নর্মদা নদী পর্যন্ত গুপ্তসাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি ছিলেন শিক্ষা ও শিল্পের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। তিনি কোন দেশ জয়ের পর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করতেন বলে উল্লেখ আছে।

বিভিন্ন দেশ জয় করে তিনি বহু ধনদৌলত ও স্বর্ণ সংগ্রহ করে-ছিলেন। যে সকল স্বর্ণ থেকে তিনি মোট আট প্রকার সুবর্ণ-মুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞকে অবিস্মরণীয় করার জন্য নূতন ধরণের মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। তাঁর একটি মুদ্রায় দেখা যায়, রাজা দণ্ড হস্তে পূজাবেদীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বেদীর পেছনে একটি গরুড় মুখাকৃতি দণ্ড রয়েছে। সেখানে লেখা আছে সমুদ্রগুপ্তের যশোগান। অপর দিকে ছিল পদ্মাসনা লক্ষ্মীমূর্তি।

সমুদ্রগুপ্তের পর সম্রাট হন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। ইনিও সমুদ্রগুপ্তের মত শিক্ষা ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁর সময়কার প্রচলিত মুদ্রাতে দেখা যায় ; রাজা দক্ষিণ হস্তে তীর ও বাম হস্তে ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাছাড়া গরুড়ের মুখাকৃতি একটি দণ্ডও আছে। তাতে সংস্কৃত ভাষায় লেখা আছে দেব শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত। মুদ্রাটির অপর দিকে পদ্মাসনা রাজ্ঞীর মূর্তি খোদিত রয়েছে এবং তাতে লেখা আছে শ্রীবিক্রমা।

গুপ্তসাম্রাজ্যের অপরাপর বিখ্যাত সম্রাট হচ্ছেন প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত। কুমারগুপ্তের রাজত্বকালের সুরু থেকেই হূণরা উপদ্রব আরম্ভ করে। রাজত্বের শেষভাগে হূণদের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে রাজভাণ্ডার শূন্য হলে তিনি নাকি 'তাম্রমিশ্রিত সুবর্ণমুদ্রা ও তাম্রের উপরে রজতের ক্ষীণাবরণযুক্ত রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর সময়কার মুদ্রায় কোনটির একপিঠে ধনুর্বাণ হস্তে রাজমূর্তি বা অশ্বারূঢ় বা রাজার মৃগয়ায় চিত্র বা হস্তীপৃষ্ঠে রাজমূর্তি বা ময়ূরকে আহার্য প্রদানরত রাজমূর্তি এবং অপর পিঠে লক্ষ্মীমূর্তি, পদ্মাসনা লক্ষ্মীমূর্তি, সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি প্রভৃতি খোদিত থাকত। তিনিও সমুদ্রগুপ্তের মত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং সে উপলক্ষে নূতন ধরণের মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন।

তাঁর পরে স্কন্দগুপ্ত গুপ্তসাম্রাজ্যকে রক্ষা করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন কিন্তু মধ্যএশিয়া থেকে আগত হূণদের আক্রমণ সহ্য করার মত

শক্তি তাঁর ছিল না। গুপ্তসাম্রাজ্য তাই ভেঙ্গে পড়তে থাকে। যতদূর জানা যায়, এই সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট ছিলেন বুদ্ধগুপ্ত—তাঁর পরেই হুণরা তোরমান ও তাঁর পুত্র মিহিরগুলের অধীনে উত্তর-পশ্চিমে ও পশ্চিম-ভারত জয় করে শাসন করতে থাকেন। কিন্তু পরে ছোট ছোট রাজাদের কাছ থেকে তাঁরা রাজ্যবিস্তারে বাধা পান। সর্বশেষ তারা মন্দশোরের যশোধর্মদেবের নিকট পরাজিত হন। তাঁদের শক্তি খর্ব হবার পর সমগ্র আর্যাবর্তে আপন ক্ষমতা বিস্তরের জন্য যশোধর্মদেব মৌখরিরা ও পালবংশ চেষ্টা করেন। এখানকার কথা বলার আগে পশ্চিম ভারতে প্রচলিত মুদ্রার কথা কিছু বলিনি।

মগধ সাম্রাজ্যের পতনের পর শক্ পহলব পার্থিয়ান ও ইউচি বা কুশানরা মধ্য এশিয়া বা চীনের বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে যে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল তা পূর্বেই বলেছি। এই সব বহিরাগত আক্রমণকারীদের মধ্য শকেরা খৃষ্ট শতাব্দীর প্রথম দিকে শকস্থানের প্রতিষ্ঠা করে। এই শকদের দুইটি শাখা 'ক্ষহরত' ও 'কর্দমক' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এরা পশ্চিম ভারতের মালব, গুজরাট ও কাথিয়াবাড় জুড়ে তাঁদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। এঁদের বলা হত পশ্চিমী ক্ষত্রপ বা সত্রপ (সত্রপ মানে হচ্ছে গবর্ণর)। এই অঞ্চলে প্রথম শাসন করেন ক্ষহরত বংশ। এ বংশের দু'জন রাজার নাম পাওয়া যায়, যথা' ভূমকা ও নহপান। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে চস্তনা কর্দমক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, চতুর্থ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিমী ক্ষত্রপ বংশের ধ্বংস সাধন করেন।

এঁদের যে সব মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে অনেক ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া গেছে এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের যোগসূত্র স্থাপনে সহায়ক হয়েছে। সেই সব মুদ্রাকে অনেকটা আধুনিক মনে হত—কারণ মুদ্রাগুলির একদিকে রাজার আবক্ষ মূর্তি খোদিত ছিল। বোধহয় রোমান অথবা গ্রাক প্রভাবেই তাঁদের মুদ্রাঙ্কন-নীতি প্রভাবিত হয়েছিল। মুদ্রার অপর দিকে ছিল বৌদ্ধদের স্তুপ বা চৈত্যের প্রতিকৃতি। এ যে শতবাহনদের মুদ্রার নকল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এগুলো ছিল স্বর্ণমুদ্রা, কিন্তু গুপ্তদের হস্তে পরাজিত হবার পর তাঁরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাজ্যে রৌপ্যনির্মিত মুদ্রার প্রচলন করেন।

এবার আবার গুপ্তসাম্রাজ্যের যুগে আসা যাক। হুনদের কথা উল্লেখ করেছি আগেই। এঁরাও বহুপ্রকার মুদ্রার প্রচলন করেন। সেগুলো পারস্যের শাসনীয় গুপ্ত ও কুশান রাজাদের মুদ্রারই অনুকৃতি ছিল বলা চলে। হিন্দু রাজত্বের পুনরুত্থান পর্যন্ত ঐ সব মুদ্রাই উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়।

হুণদের ভারত থেকে যাঁরা বিতাড়িত করেছিলেন থানেশ্বর ও কনৌজের বর্দ্ধন বংশই তাঁদের মধ্যে প্রধান। অবশ্য এর পূর্বে উত্তর ভারতের অন্যান্য হিন্দু রাজারা যেমন যশোবর্মন ইত্যাদি বিদেশী শক্তি-সমূহকে ভারত থেকে বিতাড়িত করার জন্য চেষ্টা করেন। যা হোক বর্দ্ধনবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হচ্ছেন হর্ষ। প্রায় সমস্ত উত্তর ভারতে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন ভারতের তিনিই শেষ (৬০৬-৬৪৮ খৃঃ অঃ) হিন্দু সম্রাট। তিনি নিজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং শিক্ষানুরাগী ছিলেন। নিজেও খুব শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর (শুধু তাঁর কেন বর্দ্ধন বংশের সমস্ত মুদ্রার) মুদ্রার একদিকে ছিল রাজার আবক্ষমূর্তি। সেই সব মুদ্রার এক পিঠে লেখা থাকত 'শ্রীশিলাদিত্য বিশ্বজয়ী স্বর্গজয়ী'।

হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে ভারতের বৃহদংশ এক রাজার শাসনাধীনে আসে এবং শাসনিক ঐক্য গড়ে ওঠে। কিন্তু ৬৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে তার মৃত্যুর পর ঐ রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং সামন্ত রাজারা আবার বিভিন্ন এলাকা জুড়ে রাজ্য স্থাপন করে। এই সময় থেকে উত্তর ভারতে মুসলমান শাসন কায়েম হওয়া পর্যন্ত যে সব হিন্দু সামন্ত রাজা ক্ষমতাশালী হয়েছিলেন এবং ইতিহাসের ঘটনা-পরম্পরায় নিজেদের রাজত্বের খ্যাতি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে—(১) মালাবারের চেরা বংশ; (২) কনৌজের প্রতিহার বংশ; (৩) কাঞ্চীর পল্লব বংশ; (৪) কল্যাণের চালুক্যগণ; (৫) সুদূর দক্ষিণের চোল বংশ; (৬) কর্ণাটক ও হায়দরাবাদের চালুক্য বংশ এবং (৭) তাঞ্জোরের পাণ্ড্য বংশ। এই সব বংশের তথ্য তৎকালীন ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য। তবু যতটুকু জানা যায় এবং যে সব মুদ্রা পাওয়া যায়, তা থেকেই সে-সময়কার বিভিন্ন রাজরাজড়াদের মুদ্রার পরিচয় দেওয়া গেল। বলে রাখা ভাল এই বর্ণনায় কালের ধারাবাহিকতা রক্ষা সম্ভব হয়নি।

দক্ষিণ ভারতে যে সব মুদ্রা প্রচলিত ছিল তা অন্য সব মুদ্রা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমত চালুক্য বংশের কথা বলা যাক্। প্রথম পুলকেশী খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর রাজধানী ছিল আধুনিক বিজাপুরে। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে কল্যাণীতে রাজধানী করে অপর একটি চালুক্য বংশ স্থাপিত হয়। এঁদের বলা হত পশ্চিম চালুক্য বংশ। এঁদের মুদ্রার এক পিঠে কোন মন্দির বা সিংহ মূর্তি অঙ্কিত থাকত, আর অপর দিক থাকত সাদা। রাজার নাম লেখা কানেড়ি ভাষায়। এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজার নাম হচ্ছে প্রথম জয়সিংহ। তাঁর মুদ্রার একদিকে নয়টি জায়গা পাঞ্চ করা থাকত। মাঝখানে স্তম্ভের উপর স্থাপিত একটি বড় গম্বুজওয়ালা মন্দির এবং মন্দিরের গায়ে বিষ্ণুচক্র খোদিত থাকত। এদিকেই নানা জায়গায় শ্রী ও রাজার নাম দু'লাইনে লেখা থাকত। মুদ্রাটির অপর পিঠ ছিল সাদা।

প্রথম পুলকেশী যে চালুক্য বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাষ্ট্রকূটগণ তাহাদের গদীচ্যুত করেন। পরে ঐ বংশেরই দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র বিষ্ণুবর্দ্ধন পূর্ব চালুক্য বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। চোলরা এঁদের পরাভূত করেন। এই বংশের মুদ্রার মাঝখানে থাকত বরাহ মূর্তি এবং তার চারধারে রাজার নামের প্রতিটি অক্ষর। মুদ্রার অপর দিক থাকত সাদা। বরাহ যেমন ছিল এই বংশের নিদর্শন, তেমনি দক্ষিণ ভারতের মধ্যযুগের শেষের দিকের রাজবংশদের পৃথক পৃথক নিদর্শন ছিল। যেমন, মালাবারের চেরাদের হাতি, পাণ্ড্যদের মাছ। কিন্তু চোলদের তেমন কোন নিদর্শন ছিল না। তাঁদের সময়কার মুদ্রার দেখা যায় উত্তর ভারতের প্রভাব।

চোল বংশ দু'শতাব্দীরও অধিককাল দক্ষিণ ভারতে ক্ষমতাশালী ছিল। তাঁরা একদিকে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত, অপর দিকে সমগ্র সিংহল দখল করে নেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাঁদের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

এই বংশের তিনজন প্রসিদ্ধ সম্রাট হচ্ছেন, রাজারাজা দি গ্রেট, তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র এবং প্রথম রাজেন্দ্র কলুতুঙ্গ। রাজারাজার অনেকগুলো মুদ্রা দেখা যায়। একদিকে রাজার দণ্ডায়মান মূর্তি এবং অপর দিকে উপবিষ্ট মূর্তি। সবগুলোর মুদ্রালিপি ছিল সংস্কৃত। রাজেন্দ্র চোলের নিদর্শন ছিল মৎস্য আর ব্যাঘ্র। তৃতীয় বিখ্যাত সম্রাটের মুদ্রাতেও দণ্ডায়মান সম্রাট ও অপর দিকে উপবিষ্ট দেবীর মূর্তি পাঞ্চ করা ছিল। তাছাড়া কোন কোন মুদ্রাতে মাঝখানে ব্যাঘ্র এবং দু'পাশে মাছ ও ধনুক অঙ্কিত ছিল। এঁদেরই সব মুদ্রার অপর পিঠ থাকত সাদা।

তাঞ্জোরের পাণ্ড্যবংশের ইতিহাস খুবই রোমাঞ্চকর। তাঁরা স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পর প্রথমে পল্লবদের নিকট পরাজিত হন। পরে আবার ক্ষমতা হস্তগত করেন কিন্তু চোলরা তাঁদেরকে পরাজিত করেন। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কিছু সময়ের জন্য তাঁরা দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য লাভ করেন। পাণ্ড্যদের মুদ্রা ছিল সমচতুষ্কোণ। এগুলো ঢালাই করা। এর একদিকে ছিল হাতীর মূর্তি, অপর দিক সাদা। ৭ম ও ১০ম শতাব্দীর পাণ্ড্যদের মুদ্রায় মৎস্য অঙ্কিত থাকত। মুদ্রায় অঙ্কিত মৎস্যের সংখ্যা কখনও কখনও দুটিও থাকত। আবার মৎস্যের সঙ্গে অন্য নিদর্শনও অঙ্কিত হত। রূপা ও সোনার মুদ্রায় সংস্কৃতে ও তামার মুদ্রায় তামিল ভাষায় পরিচয় লেখা থাকত।

এই তো গেল মোটামুটি দক্ষিণ ভারতের মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রচলিত মুদ্রার পরিচয়। এবার বম্বে, রাজপুতানা, বিজয়নগরে যে সব মুদ্রা প্রচলিত ছিল তার কথা সামান্য বলব।

রাজপুতরা প্রধানত স্বর্ণ বা তাম্র অথবা রৌপ্য ও তাম্রমিশ্রিত ধাতু দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করাতেন, খাঁটি রূপার মুদ্রা তাঁরা খুব কমই প্রস্তুত করাতেন। রাজপুতরা যে দু'ধরণের মুদ্রা তৈরী করাতেন তার একটির এক ধারে রাজার নাম সংস্কৃতে লেখা থাকত এবং অপর ধারে থাকত দেবীমূর্তি। অপর ধরণের রৌপ্যমুদ্রার এক পিঠে থাকত একটি উপবিষ্ট ষাঁড় ও অপর পিঠে একজন ঘোড়শোয়ারের মূর্তি।

'বিজয়নগরের হিন্দু রাজারা নানা দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত স্বর্ণ ও তাম্রের বহু ক্ষুদ্র মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতে যে মুদ্রা বিশেষ ভাবে চলেছিল তার উপর বিজয়নগরের মুদ্রার প্রভাব পড়েছিল যথেষ্ট।

বঙ্গদেশে পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে বিনিময় মাধ্যম হিসাবে মুদ্রার প্রচলন ছিল কিনা এবং থাকলেও তা কেমন ছিল সে সম্বন্ধে নানা মত বর্তমান। সুতরাং ও নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই।

(৫)

এবার মুসলিম আমলের মুদ্রার কথা নিয়ে সামান্য আলোচনা করব। আরব আক্রমণকারীরা ভারতের দ্বারদেশে এসে উপনীত হয় অষ্টম শতাব্দীতে এবং সিন্ধুতে তাঁদের রাজ্য স্থাপন করে। সেখানে তারা ওমরায়েদ ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করে। একাদশ শতাব্দীতে গজনীর মামুদ পাঞ্জাব অধিকার করে সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এই মুসলিম বিজয়ের ফলে ভারতীয় মুদ্রায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়। মূর্তি অঙ্কন ধর্মমতে নিষিদ্ধ বলে মুদ্রায় রাজার আবক্ষ মূর্তি বা প্রতিকৃতি উৎকীরণ বন্ধ হয়ে যায়। মুদ্রার দুই দিকেই রাজার নাম, উপাধি এবং হিজরী সাল উৎকীর্ণ থাকত। দিল্লীর সুলতানী আমলেই প্রথম ভারতীয় মুদ্রায় টাকশালের নাম ও তারিখ মুদ্রিত হয়। তাছাড়া, মুদ্রায় মুসলমানদের ধর্মমত বিশেষ করে 'কলিমা'র উৎকীরণও এই সময় থেকে সুরু হয়।

দিল্লীর সুলতানদের আমল থেকে রৌপ্য মুদ্রা তঙ্কা বা টাকা (১৭৮ গ্রেইন) চালু হয়। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার ফলেই উহা চালু হয়। এ ছাড়া স্বর্ণ, তাম্র এবং রৌপ্য মিশ্রিত ধাতুর মুদ্রাও এঁরা প্রচলন করেন। আলাউদ্দিন খিলিজির সময় স্বর্ণমুদ্রা সবচেয়ে বেশী প্রচলন হয়। আলাউদ্দিন মুদ্রার ডিজাইন পরিবর্তন করান। মিশ্রধাতুর মুদ্রাতে তিনিই প্রথম তারিখ মুদ্রিত করান।

শের শাহ্ ভারত শাসন করেন ১৫৪০ খৃঃ থেকে ১৫৪৫ খৃঃ পর্যন্ত। তিনি পূর্বতন মুদ্রানীতির পরিবর্তন সাধন করেন। খাঁটি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছাড়াও তিনি নূতন ধরণের তাম্রমুদ্রা প্রচলন করেছিলেন এবং ব্যবহারে সুবিধার জন্য এক-চতুর্থাংশ, এক অষ্টমাংশ ও এক ষোড়শাংশে তা বিভক্ত করেন। তাঁর সময়কার মুদ্রা ছিল গোলাকৃতি। মুদ্রালিপি ছিল ফার্সী ও দেবনাগরী ভাষায়। তিনি টাকার যে ওজন ঠিক করেন তা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্ত চালু ছিল।

এই সঙ্গে মহীশূরের সুলতানদের মুদ্রার কথাও সামান্য উল্লেখ করব। কারণ, হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের মুদ্রাগুলি কারুশিল্পের দিক থেকে ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্যাগোডা ছাড়াও হায়দর তাঁর মুদ্রায় শিব-পার্বতীর মূর্তি অঙ্কিত করান। টিপু সুলতান ডবল টাকা ও ডবল পয়সার প্রচলন করেন। ডবল পয়সার একদিকে শুঁড় উপরের দিকে ওঠানো একটি হাতীর মূর্তি এবং তার পশ্চাদভূমিতে তারকাখচিত পতাকা অঙ্কিত ছিল। অপর দিকে ফার্সী ভাষায় লেখা ছিল 'একটি উসমানী' (ডবল পয়সা)।

তারপর মোগল আমল বা বাদশাহী পর্ব। মোগল সম্রাটগণের, বিশেষ করে আকবর ও জাহাঙ্গীরের সৌন্দর্যবোধ মুদ্রায় প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা মুদ্রাকে ধর্মপ্রচারের মাধ্যম হিসাবেও ব্যবহার করেছেন। মোহরই ছিল মোগলদের ষ্টাণ্ডার্ড স্বর্ণমুদ্রা। অর্ধ ও একচতুর্থাংশ মোহরের প্রচলনও তখন ছিল। শের শাহের রূপার টাকা এবং আধুলি, সিকি, দু'আনি ও এক আনিও তাঁরা চালু রেখেছিলেন। 'দাম' বলে যে তাম্র মুদ্রা (ওজন ৩২০ থেকে ৩৩০ গ্রেইন) শের শাহ্ প্রচলন করেন তাও চালু ছিল। আকবর ১৫৭৯ সালে ইলাহী মুদ্রা প্রচলন করেন।

জাহাঙ্গীরের সময়কার মুদ্রাই ছিল সবচেয়ে সুন্দর। নূরজাহানের

নাম তিনি কোন কোন মুদ্রায়, যেমন, 'নুর-শাহী' 'নূর-দৌলত', 'নূর-সুলতানী' ইত্যাদি ক্ষোদিত করান। তাঁর রাশিচক্র খোদিত মুদ্রাগুলিই ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। হিজরী সাল ছাড়া স্ব স্ব সিংহাসন আরোহণের বৎসরও তাঁরা মুদ্রায় অঙ্কিত করাতেন। এই সময়কার মুদ্রালিপি ছিল ফার্সী। জাহাঙ্গীরের সময়কার মুদ্রায় আরও একটি জিনিষ দেখা যায়, সে হচ্ছে ফার্সী কবিতার উদ্ধৃতি।

বাদশাহী আমলের শেষে সারা ভারতে আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। বিভিন্ন স্থানে রাজারা স্বাধীন হয়ে শাসন করতে লাগলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য করতে এসে এই সুযোগে ভারতের শাসনক্ষমতা হস্তগত করলেন। তখন যেমন নানা মূল্যের মুদ্রার প্রচলন ছিল, তেমনি তা মুদ্রিত হত বেসরকারী কেন্দ্র থেকেও। ফলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হতে লাগল। কোম্পানী মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সচেষ্ট হলেন। তারা তিন স্বামী প্যাগোডা (অর্থাৎ তিনটি দেবদেবী মূর্তি অঙ্কিত), পুরানো স্টার প্যাগোডা, স্বর্ণ-মোহর এবং এক স্বামী প্যাগোডা প্রভৃতি অঙ্কিত মুদ্রা প্রকাশ করতে লাগলেন। ১৭৪১ সালে সর্বপ্রথম রৌপ্য স্টার প্যাগোডা মুদ্রিত হল। অতঃপর, ইংরেজ ফ্যাক্টরীগুলি মোগল আমলের টাকা ও আর্কট টাকা প্রচলন করলেন। পরে স্টার প্যাগোডার মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সব টাঁকশাল ছিল তা-ও তুলে দিতে লাগলেন। বহু অসুবিধার মধ্য দিয়ে তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, সারা ভারতের জন্য একই প্রকার মুদ্রার প্রচলন বাঞ্ছনীয়। তাই ১৮৩৫ সালে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রজতমান প্রবর্তিত হল। রূপার টাকা যা বাজারে চালু হল তার এক ধারে রাজার নাম এবং অপর ধারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কথাটি মুদ্রিত হল। ১৮৬২ সালে আবার আইন করে মুদ্রার একধারে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মূর্তি এবং অপর দিকে 'ইণ্ডিয়া' কথাটি ইংরাজী ভাষায় মুদ্রণের ব্যবস্থা হল। এই ধরণের মুদ্রাই আজকালও চালু আছে তবে শাসকদের রাজা বা রাণীর মূর্তি সেখানে নেই, স্থান পেয়েছে অশোক স্তম্ভ। ভারত যে আজ স্বাধীন! তবে ইংরেজ আমলে রূপোর টাকায় যতখানি রূপো ছিল আজ কিন্তু তা নেই। পরিমাণ অনেক কমে গেছে। যাক, সে অন্য কথা।

সে যে নেই

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

নেই মোর কোন কাজ হাতেতে,
কি সকাল, কি দুপুর, রাতেতে।
একা, একা, শুধু থাকা,
মনে মনে শুধু আঁকা,
কল্পনা কত কিছু রঙেতে
কি সকাল, কি দুপুর, রাতেতে।

আঙিনায় আসে রোদ সকালে,
গাছে গাছে হাসে ফুল ফি ডালে।
আমি শুধু চেয়ে থাকি,
দেখি ফুল, দেখি পাখী
শিউলিতে, কামিনী আর পিয়ালে,
আঙিনায় আসে রোদ সকালে।

বুলবুলি চুলবুলি ওড়ে যে,
কামিনীর ফল খেতে মাতে যে ;
টুনটুনি বেনে-বৌ—
মিঠে স্বরে কত মৌ—
মনে পড়ে মধু-ভরা সে-ও যে,
আসে নাকো এই ক্ষণে
কেন সে।

দেখাতাম তারে কত সোহাগে,
ভালো তার ফুল-পাখী কী লাগে!
এ যে শুধু মিছে আশা,
বোবা মনে কোথা ভাষা,
সে যখন কাছে নেই সকালে,
কী বা ক্ষতি সব কাজ হারালে ?

চারিদিক নিঝুম দুপুরে,
কপোতের গুঞ্জন কি সুরে!
মনে হয় তার কানে,
সুর তুলি গানে গানে,
কোথা পাব,—সে যে নেই কাছেতে
মিছে আশা জাগে শুধু মনেতে।

সন্ধ্যার পরে আসে রাত্রি,
আমি একা স্বপনের যাত্রী।
মিছে জাগা, বসে থাকা,
আকাশেতে শশী রাকা,
জোছনায় উছলিত রাত্রি ;
আমি একা নিরাশার যাত্রী।
সে যে নেই, সে যে নেই, কাছেতে—
কি সকাল, কি দুপুর, রাতেতে।
জীবনের সব কাজ,
হারায়েছি তারি মাঝ,
তাই তারে শুধু ডাকি আসিতে,
সব ক্ষণে, সব দিবা-নিশিতে।

পরিচালক—উপানন্দ

জীবনের আদর্শ ও কর্ত্তব্যজ্ঞান

মানুষ মাত্রেরই জীবনে কোন না কোন লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি স্থির রেখে মানুষের পথ চলা সুরু হয়, সে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যায়, লক্ষ্যস্থলে যাতে সুন্দরভাবে উপনীত হোতে পারে। এর জন্যে সে প্রাণপণে পরিশ্রম করে। জীবনের এই লক্ষ্যকেই জীবনাদর্শ বলা হয়। আদর্শ শব্দটী পূর্ণতাজ্ঞাপক, কিন্তু জীবনের আদর্শ প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ নয়। যতই মানুষ উন্নতির পথে এগিয়ে যায়, ততই তার আদর্শ উচ্চতর ও মহত্তর হোতে থাকে।

আদর্শ বল্লেই যে কেবল দেহধারী জীব বুঝোবে তা নয়, কোন অশরীরী মহাপুরুষ বা কোন উচ্চভাব ও আদর্শস্বরূপ হোতে পারে। আদর্শ দেশকালপাত্র অনুসারে ক্রমোন্নতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। গ্রাম্য পাঠশালার পড়ুয়ার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবক আদর্শ স্বরূপ হোতে পারে, কিন্তু সেই পড়ুয়া যখন একদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষিত হয়ে বেরিয়ে আস্‌বে তখন তার কাছে আরো উন্নততর আদর্শই হবে অবলম্বন, আর তাকেই অবলম্বন করে সে উন্নতির পথে অগ্রসর হবে।

জীবনে সুখ সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্যে আদর্শ বিশেষ প্রয়োজন। যার পথ চলার কোন স্থিরতা নাই, আর গম্য স্থান অনির্দ্দিষ্ট, তার পক্ষে উন্নতিশীল হওয়া অসম্ভব। তার হৃদয় উৎসাহশূন্য, তার কাজও অব্যবস্থিত। উচ্চ লক্ষ্য নেই যার, সে কেমন করে বড় হবে। তার চরিত্রে পরিশ্রম, অধ্যবসায়, কর্ম্মতৎপরতা ও কর্ত্তব্য জ্ঞান আদৌ স্ফুরিত হয় না, শেষ পর্য্যন্ত তার জীবন বিড়ম্বিত হয়,—লক্ষ্যশূন্য জীবন তৃণখণ্ডের মত সংসারের স্রোতে ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। উন্নত লক্ষ্য নিয়ে সংসার পথে চল্‌তে শিখ্‌লে শেষে উপলব্ধি হবে এই পৃথিবীকে সুখময় কর্ম্মক্ষেত্র-রূপে, আর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ভিতর দিয়ে উন্নতির উচ্চ স্তরে উঠে শেষে যশোমুকুট পরিধান করা সহজ হবে, আর জগতেও একজন আদর্শ পুরুষ বলে সমাদর পাওয়া যাবে।

পূর্ণবিকশিত পলাশ পুষ্প প্রকাণ্ড গাছেই জন্মায়, আর দেখ্‌তেও খুব সুন্দর; কিন্তু পলাশ পুষ্পের গন্ধ নেই বলে যেমন কেউ তাকে আদর করে নেয় না, তেম্নি আদর্শবিহীন মূর্খ লোক রূপযৌবনসম্পন্ন অভিজাত ও বিত্তবান হোলেও লোকসমাজে অবজ্ঞার পাত্রই হয়ে থাকে। মার্কিণ রাজনৈতিক কৃতী পুরুষ ডগলাস ম্যাক আর্থার বলেছেন—

Nothing great is ever achieved without the exercise of prolonged self discipline'—(অর্থাৎ দীর্ঘকাল ব্যাপী আত্ম-আজ্ঞানুবর্ত্তিতার অনুশীলন ব্যতীত কখনও মহৎ কিছু লাভ করা যায় না)

মানুষের হৃদয়ে দু'রকম প্রবৃত্তি আছে—(১) সুপ্রবৃত্তি (২) কুপ্রবৃত্তি। যাদের হৃদয়ে সুপ্রবৃত্তি নেই, তারা কোন মহত্তর আদর্শের স্পর্শ পায় না, তাদের জীবনও মহান্‌ হবার কোন সূত্র অবলম্বন কর্‌তে পারে না। কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় তারা পাপাসক্ত হয়, মনে শান্তি পায় না, সংসারে প্রচুর শাস্তি ভোগ করে—আর দুঃখে কষ্টে মৃত্যু বরণ করে, তারা মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য, পরস্বহরণ, হিংসা, নৈষ্ঠুর্য্য প্রভৃতি অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে নিজেদের আত্মা কলুষিত করে আর পৃথিবীতে মনুষ্যসমাজে ঘৃণ্য হয়ে থাকে। তারপর যখন নিজেদের ভুল বুঝ্‌তে পারে তখন তাদের অন্তর দিনরাত অনুশোচনার দুঃসহ দহনে দগ্ধ হোতে আরম্ভ করে।

আদর্শের বিভিন্নতা আছে। সকলের আদর্শ একরূপ হয় না। লোকের প্রবৃত্তি, সংসর্গ ও শিক্ষা অনুসারে আদর্শের তারতম্য ঘটে থাকে। দরিদ্র নিরক্ষর কৃষকের আদর্শের সঙ্গে শিক্ষিত পরিমার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন যুবকের আদর্শ এক নয়। অনাহারক্লিষ্ট কৃষক হয়ত কায়ক্লেশে নিজের ও নিজ পরিবারের দৈনিক অন্ন সংস্থান কর্‌তে পার্‌লেই খুসী, কিন্তু শিক্ষিত যুবকের কাছে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর কোন মূল্য নেই, সে শুধু শারীরিক অভাব মোচনে সন্তুষ্ট হয়ে থাকে না, সে কেমন করে দেশের ও দশের অভাব দূর করে তাদের মঙ্গল সাধন কর্‌তে পার্‌বে তারই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়। একজন কেরাণীর আদর্শের সঙ্গে একজন বণিকের আদর্শের মিল হ'তে পারে না। যে ব্যবসায়ী সে সাগরও দেখে, আবার মরুভূমিও দেখে—কিন্তু কেরাণী সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থেকে কোন রকমে দু কুড়ি সাত বজায় করে সংসার চালিয়ে পৃথিবী থেকে চলে যায়—তার

জীবন-নদীর স্রোত ক্ষীণভাবে বয়ে যায়, তার নদীতে জোয়ার ভাঁটা খেলে না। যখন মানব সমাজ উচ্চলক্ষ্যবিহীন হয়ে পাপে ডুবে যায়, তখন লোকশিক্ষা ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যে ভগবান জগতে মহাপুরুষ প্রেরণ করেন।

জীবনের আদর্শ নির্ব্বাচন করে পথ চলা সুরু করবার উৎকৃষ্ট সময়ই হচ্ছে কৈশোর। এর জন্যে সদ্‌গ্রন্থ ও মহাপুরুষের জীবনী পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য, যাতে তোমাদের জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য হয়—মহত্তম আদর্শ। চঞ্চল মনকে সংযত করা আবশ্যক, এর জন্যে বহুকালের অভ্যাস চাই। জীবনে উন্নতি করতে হলে কাম, লোভ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ও কলহপ্রিয়তা বর্জ্জন করা দরকার। জীবনের গতিপথে প্রীতি, শ্রদ্ধা, দয়া, কৃতজ্ঞতা ও পরার্থপরতা প্রভৃতি বিবিধ পবিত্র ভাব যাতে অন্তরে সঞ্চারিত হয় সেদিকে সচেষ্ট হতে হবে।

কর্ত্তব্যবোধ যার নেই, তার পক্ষে কোন মহৎ আদর্শের অনুগামী হয়ে উন্নতির শিখরে আরোহণ করা একপ্রকার অসম্ভব। অন্যের প্রতি বা আপনার প্রতি যা করণীয়, তা-ই হচ্ছে কর্ত্তব্য। নিজের ও অপরের মঙ্গল সাধনই কর্ত্তব্যের উদ্দেশ্য। কর্ত্তব্যজ্ঞানই মানুষের বিশেষত্ব। এই জ্ঞান যার আছে, সেই মানবিকতার প্রতিষ্ঠা করতে পারে, আর তার পথ চলা কোন দিন প্রতিহত হয় না। সে যশ ও জয়মাল্যের অধিকারী হবেই। দুর্গম পথের ভেতর দিয়েও সে অনায়াসে অগ্রসর হয়ে দুর্ল্লভকে লাভ করতে সক্ষম। নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য, আর সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য—এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য না থাকলে, আর এর কোন একটীকে অবহেলা করলে, মানব জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা হয় না; ফলে কর্ত্তব্যবোধের অভাবে জীবনের কোন আদর্শও লাভ হয় না। 'অন্যের কাছ থেকে তুমি যে রকম ব্যবহার পেতে ইচ্ছা কর, অন্যের প্রতিও তুমি সেই রকম ব্যবহার করো—' এই সারগর্ভ নীতিবাক্যটী সর্ব্বদাই অনুসরণ করতে হবে। কর্ত্তব্য-সাধনাই প্রকৃত ধার্ম্মিকতা, কর্ত্তব্যজ্ঞানই উন্নতির পক্ষে, শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে, আর আদর্শের পক্ষে একমাত্র সহায়ক। ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদ, খৃষ্ট ধর্ম্মের সংস্কারক মার্টিন লুথার, প্রেম ধর্ম্মের উদ্‌গাতা শ্রীচৈতন্য ও স্বাধীন ভারতের জনক মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তাঁরা শত্রুগণ পরিবেষ্টিত হয়েও কর্ত্তব্য পথ থেকে এক পদও স্খলিত হ'ন নি। ইংলণ্ডের বিচারপতি গ্যাসকইন কর্ত্তব্য-পরায়ণতা গুণে জগন্মান্য হয়েছেন। চতুর্থ হেনরির রাজত্বকালে তিনি যুবরাজ পঞ্চম হেনরিকে রাজবিধি অবমাননার জন্যে কারাগারে প্রেরণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। জগতে যাঁরা মহান, তাঁরা কর্ত্তব্যেরই পূজা দ্বারা মানবিকতার প্রতিষ্ঠা করে অমর হয়েছেন। মানসিক নির্ভীকতাই কর্ত্তব্যজ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। জীবনের আদর্শ গঠন করতে হোলে ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। বহু উত্থান পতন, ঘাতপ্রতিঘাত, বহু অশ্রুপাত, বহু জয় পরাজয় আর সফলতা বিফলতার মধ্য দিয়ে মানুষকে মানুষ হোতে হয়। সংসারে প্রলোভনের অন্ত নেই—চরিত্র-গৌরব লাভ করবার জন্যে তোমরা অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত আপাতমধুর সহস্র প্রলোভন বর্জ্জন করে আদর্শ লাভের উদ্দেশ্যে ছেলেবেলা থেকেই কায়মনোবাক্যে সৎ হবার তপস্যা করবে, কর্ত্তব্যজ্ঞান অর্জ্জন করে সংসার পথে মানসিক নির্ভীকতার সঙ্গে অগ্রসর হবে, আর নিজেদের জীবনকে আদর্শসম্পন্ন করবে। মনে রেখো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের চরিত্র বজ্রের মতো কঠোর আর কুসুমের মত কোমল। তোমরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হয়ে সমাজ ও জাতির গৌরব হও বিশ্ব সমাজে পুরুষোত্তম হও, এই আশাতেই এত কথা বললাম।

কাগজেরই নৌকো ভাসাই

স্বপনবুড়ো

পয়লা আষাঢ় সকাল হইতে নাম্‌ল জলের ঢল
কাগজেরই নৌকো ভাসাই···দল বেঁধে সব চল॥
আল্‌তো করে আয়রে টিয়ে
নৌকো সাজাই নিশান দিয়ে
স্রোতের জলে ছোট্ট ডিঙি চল্‌বে কেমন বল!
কাগজেরই নৌকো ভাসাই···দল বেঁধে সব চল॥

এই কাগজের নৌকো যাবে সাত সাগরের পার
খুকুর তরে আন্‌বো কিনে গজমোতির হার।
সাগর মাঝে উঠ্‌লে তুফান
সমস্বরে গাইবো রে গান,
জিন্‌বো জগৎ,—না হয় যাবো অসীম সাগরতল।
কাগজেরই নৌকো ভাসাই···দল বেঁধে সব চল॥
প্রীতির-রাখী দিয়ে মোরা জগৎ নেবো জিনে
জয় করা কি যায় মানুষে—মন-বিনিময় বিনে!
এই কাগজের নৌকো খানি
সবার তীরে লাগবে জানি—
ফিরবো নিয়ে নৌকোতে ভাই—সোনারি ফসল—
কাগজেরই নৌকো ভাসাই—দল বেঁধে সব চল॥

আষাঢ়ে

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

আষাঢ় মেঘে আকাশখানি কাজল-রঙে সাজলো রে,
অরুর কোলে খোকন-সোনা একটু হেসে নাচ্‌লো রে।

কচি-সুরের বন্যা ছোটায় আধো-কথার জাল্-বুনে,
ছন্দ তারি বুঝতে হবে তারই সুরে তাল্-গুণে।

আজ আষাঢ়ে কোন দরদী মন গেয়েছে কাব্য-গাথা,
কোন সে কবির মন দুলেছে হাত ভরেছে খাতার পাতা।
পাঠশালাতে কোন পড়ুয়া পাঠ ভুলে গান গাইলো রে,
কিসের তরে পাখিরা সব আকাশ পানে চাইলো রে।

আজ আষাঢ়ে দেখছি উষায় বাদল ঝরে পাতায় ঘাসে,
পুলক-লাগা মিষ্টি ফুলের গন্ধ আসে ভোর-বাতাসে।
আজ ধরণী কা'র পরশে নতুন সাজে সাজলো রে,
কা'র বিহনে আজ আষাঢ়ে ছুটির বাঁশি বাজলো রে।

দেবদত্তা

ডাঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী এম-এ, পি-আর-এস,
পি-এইচ-ডি

কেদার-বদরীর রাস্তায় যোশী-মঠের চটিতে যখন পৌছলাম তখন দারুণ ঝড় বৃষ্টি। ঠাণ্ডাও প্রচণ্ড। চড়াই-উৎরাই করতে করতে শরীর বেশ কাহিল হ'য়েই পড়েছিলো, তার ওপর এই রকম আবহাওয়া অসহ্য হ'য়ে কি রকম হলো তা সকলেই বুঝতে পারবেন। বুড়ো মানুষ—চাকরী হ'তে অবসর নিয়ে তীর্থে বেরিয়েছি—এতোটা যে কষ্ট হবে তা জানতাম না। যাক্ চটির একটা কোনে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। সঙ্গের কুলীটাকেই বলে দিলাম, যা হয় একটা কিছু সেদ্ধ কোরে দিতে। শুয়ে আছি—সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে এলো। এমন সময় একজন পাহাড়ী লোক এসে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে বললে, "আপনি কি বাঙালী?" বললাম, "হাঁ!" সে তখন আমার কাছে এসে ঝুঁকে বিশেষ অনুনয় কোরে বললে, "বাবুজী! তাহলে একবার দয়া কোরে উঠে আমার সঙ্গে চলুন। কাছেই আমাদের বাড়ী—সেখানেই খাওয়া-দাওয়া কোরবেন।" আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম, "কেন বলো তো—এমন ভাবে অনুরোধ করছ? সেখানে কি কোনও বাঙালী আছেন?" সে বললে, "না বাবুজী, বাঙালী সেখানে কেউ নেই—তবে একটা দরকারী কাজে আপনার একটু সাহায্য চাই···সে আপনি গেলেই জানতে পারবেন।" অগত্যা আমায় উঠতে হলো। লোকটি ছাতা মাথায় ধরে, আলো দেখিয়ে আমায় নিয়ে এলো একটা বাড়ীতে। বেশ বড়ো কাঠের বাড়ী। সিঁড়ি দিয়ে উঠে, ফালি বারান্দাটুকু পার হয়ে সুমুখেই যে বড়ো ঘরখানি—সেই ঘরে আমরা ঢুকলাম। ঘরের একপাশে একটি মোটা শতরঞ্চি পাতা রয়েছে দেখলাম—একটি বড়ো উজ্জ্বল আলো জ্বলছিলো। লোকটি আমায় অতি বিনীতভাবে সেইখানে বসতে অনুরোধ করলে। আমিও শতরঞ্চির ওপর বসে পড়লাম—একটু কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে এদিক ওদিক চাইছি—এমন সময়ে একটি ষোলো সতেরো বছরের অপূর্ব সুন্দরী পাহাড়ী বালিকা থালায় গরম গরম পুরী, হালুয়া ও অন্যান্য মেঠাই সাজিয়ে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। আমার সামনে থালাখানি নামিয়ে ঈষৎ সলজ্জ ভঙ্গীতে সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে আমায় খেতে অনুরোধ করলো। তার সঙ্গে একটি ঝিও ছিলো। সে এর মধ্যে একখানি খাটিয়া এনে আমার জন্য ঘরের অন্য পাশে বিছানা করতে লাগলো। লক্ষ্য কোরে দেখলাম বেশ ফরশা বালিশ, লেপ, চাদর ইত্যাদি। যে লোকটি আমায় নিয়ে এসেছিলো সে তদারক করছিলো। আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম কিন্তু মুখে কোনও ভাবপ্রকাশ না কোরে খেতে আরম্ভ কোরে দিলাম। মেয়েটি মধুর হাসিভরা মুখে তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীর অনুনয়ে আমায় জোর কোরে অনেক খাইয়ে দিলো। উপরন্তু একবাটি গরম দুধও খেতে হলো ফাউ স্বরূপ। যাক খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত আরামে লেপের তলায় প্রবেশ কোরে চোখটি বুজবো বুজবো করছি—এই সময়ে মেয়েটি একটি ছোট চাকরকে সঙ্গে নিয়ে আবার ঘরে এলো। চাকরটি একটি ছোট থালার ওপর কোরে গরম তেলের বাটি এনে মেঝেয় রাখলো আমার পায়ের দিকে। পার্বতী (পরে জেনেছিলাম মেয়েটির নাম পার্বতী) তাকে আমার পায়ে তেল মালিশ কোরে দিতে বলে—নিজে আলোটা আমার মাথার কাছে একটা টুলে রেখে আমার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালো। একটু ইতস্ততঃ কোরে সে বললে, "বাবুজী! অনুগ্রহ কোরে একবার আমার এই চিঠি দুখানি জোরে জোরে পড়ুন।" এই দুর্গম তীর্থের

পার্বত্য-পথে নাটকীয় আতিথ্যে ও কিশোরী আতিথ্য-কারিণীকে দেখে আমি এতোক্ষণ সত্যই অবাক হয়েই ছিলুম মনে মনে—তবে বুড়ো মানুষ, চাঞ্চল্য দমন কোরে চলাটাই এখন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখন এই নাটকীয় পরিস্থিতিতে এমনই অবাক হলাম যে সবিস্ময়ে উঠে বসলাম বিছানার ওপর। পা দুটি রইলো চাকরের হাত ও গরম তেলের জিম্মায়। পার্বতীর হাত হ'তে চিঠি দুখানি নিলাম। দুখানি চিঠি। একটি বাংলায় ও অপরটি হিন্দীতে লেখা খুবই প্রয়োজনীয় ও গোপনীয় চিঠি বলে মনে হলো। প্রথমে বাংলা চিঠিখানি পড়লাম :

"কল্যাণীয়া মা আমার!

তোমার ওখানে যতোবার গিয়েছি—তোমার বাবা ও তুমি আমায় এতো আদর-যত্ন করেচো যে বলবার নয়। তোমরা আমায় আমার জীবনের কথা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেছ—কিন্তু আমি সামান্য সংক্ষিপ্ত উত্তর ছাড়া আর কিছু কথা বলিনি। যদিও আমি প্রকৃত সন্ন্যাসী-অর্থে যা' বোঝায়—ঠিক তা' নই—তবু পুরাণো জীবনটা আমার একরকম মুছেই ফেলেচি। আজ এখানে—এই জ্বালামুখী-তীর্থে, একটা গাছের তলায় শুয়ে শুয়ে হঠাৎ আমার তোমাদের কথা খুব বেশী কোরে মনে পড়চে। বিশেষ কোরে যেন মনে হচ্চে—যেন তুমি আমার খুব আপনার জন কেউ। তুমি বোধহয় খুবই অবাক হচ্চো মা? কিন্তু আজ আমার জীবনের রহস্য-টুকু তোমায় জানিয়েই রাখি—কেননা আর হয়তো তোমাদের ঐ গিরি-তীর্থ-পথের কুটীরে যাওয়া আমার সম্ভব হয়ে উঠবে না। বয়সও তো হলো—এবার যেন শরীর আরও ভেঙ্গে পড়েছে। আমার গল্পটি এই!

—পূর্ব-বাংলার একটি গ্রামে আমার কিছু জমি-জমা ছিলো (এখনও আছে)। সেখানে আমি ও আমার স্ত্রী থাকতাম। আমার কয়েক ঘর যজমান ছিলো—তাদের বাড়ী পূজাপাঠ কোরেও কিছু আয় হতো। বহুদিন আমাদের কোনও সন্তান হয়নি—এজন্যে আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মনমরা হয়ে থাকতাম। শেষে আমাদের বিবাহের চোদ্দ বৎসর পরে আমাদের অতৃপ্ত জীবনে সুধার ধারা ঢেলে দিয়ে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করলো। ফুটফুটে ফরসা শিশুটিকে পেয়ে আমাদের জীবন-মন যেন কানায়-কানায় পূর্ণ হয়ে উঠলো। তাকে নিয়ে আমরা দিনরাত্রিই বিভোর থাকতাম। আমাদের অদৃষ্টে কিন্তু এতো সুখ বেশী দিন সইলো না। খুকীর যখন দু' বৎসর বয়স তখন ওর সর্বাঙ্গে একরকম চুলকোনী হলো। অনেক রকম ওষুধ-বিষুধ, টোটকা, কবিরাজী—সব কোরেও কোনও ফল হলো না। অনবরত চুলকে-চুলকে খুকী সর্বাঙ্গে ঘা কোরে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর, আর—সে কি কান্না! কিচ্ছু খেতে চাইতো না—বাছা আমার রোগের জ্বালায় শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেলো। এই রকমভাবে সে প্রায় মাস চারেক ভুগলো। আমরা খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়েচি—এমন সময় খবর পেলাম যে ক্রোশ তিনেক দূরে কালী-তলায় একজন তান্ত্রিক সাধু এসেছেন—তিনি নাকি কতো লোকের কতো রোগ ভালো কোরে দিচ্ছেন। কাতারে-কাতারে লোক নাকি যাচ্ছে তাঁর কাছে ধর্ণা দিতে। একথা শুনেই আমি ছুটে গেলাম সাধুর কাছে। ভীড় ঠেলে গিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ে পড়তেই, তিনি সস্নেহে আমায় আশ্বাস দিলেন। পরদিন ভোরেই আমি মেয়ে কোলে কালী-তলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। তার মায়ের শরীর অসুস্থ—আর তাছাড়া সে অতোদূর কষ্টকর রাস্তায় হাঁটতে পারবে না বলে বাড়ীতেই রইলো। ভেবেছিলাম দিনেদিনেই ফিরে আসবো। গরুর গাড়ীর পথ ছিলো অনেক ঘুরে—তাই সোজা মাঠ দিয়ে দিয়েই চললাম। সাধু খুকীকে কোলে নিয়ে আশীর্বাদ দিলেন, তারপর এক চিমটি ধুনীর ছাই বেলপাতায় মুড়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "নে বেটা, বাড়ী পৌঁছেই এইটে কবচ কোরে দিস—এ ফাঁড়াটা কেটে গেলে আর তোর কোনও ভয় থাকবে না—জয় কালী।"

কালীতলা হ'তে বেরিয়ে আবার আমি তাড়াতাড়ি বাড়ীর পথ ধরলাম। যতো তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরবো মনে করেছিলাম—কাজে তা' হলো না। তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। আশ্বিন মাস—কখন একটা জলভরা মেঘ সূর্যের আলো আড়াল কোরে দাঁড়িয়েছিলো এসে জানিনা। মেয়ে বুকে আমি মেঠো আল ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছুটেছি—এমন সময়ে ঝরঝর কোরে বৃষ্টি নামলো—আর সঙ্গে সঙ্গে একটা উতলা হিম বাতাসের ঝলক বয়ে

এলো। অসুস্থ মেয়ে নিয়ে আসি ঊর্দ্ধশ্বাসে এদিক ওদিক আশ্রয়ের সন্ধানে চাইতে চাইতে কাছেই একটা পোড়ো বাড়ী দেখে উপায়ান্তর না দেখে সেখানেই ঢুকে পড়লাম। খুকী হবে বলে ছাগল পুষেছিলাম—রোজ প্রায় দেড় সের দুধ দিতো—বাড়ী হতে কালীতলা যাবার সময়ে খুকীর মা সেই দুধ চিনি দিয়ে জাল দিয়ে একটা বোতলে ভরে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলো। সেই দুধের খানিকটা কালীতলা পৌছেই খাইয়ে দিয়েছিলাম খুকীকে—দেশলাই আর ঝিনুক-বাটিও তার মা দিতে ভোলেনি। এতোক্ষণ মেয়ে লোকজন চারদিকে দেখে বেশ চুপ কোরেই ছিলো। এই আধভাঙ্গা জঙ্গলে-ভরা নির্জন বাড়ীটায় ঢুকেই খুকী কাঁদতে লাগলো। অস্ত সূর্যের ম্লান বিষণ্ণ আলো অন্তহীন মাঠ আর গাছপালায় স্তিমিত হয়ে আসছে, আর অবিরাম ঝর ঝর কোরে বৃষ্টি পড়ছে। নানান্ দুর্ভাবনায় আর ফেরবার মুখে এই দুর্যোগে বড়ই মনটা দমে গেলো। মেয়ে কেঁদে ওঠায়, তাকে বুক হতে না নামিয়েই দুটি শুকনো কাঠ-পাতা সংগ্রহ কোরে আনলাম। দেশলাই জ্বেলে আর একটু দুধ গরম কোরে নিয়ে খুকীকে খাইয়ে দিলাম। মেয়েকে দুধ খাওয়ানোয় ওর একটু ঘুম এলো। বাছা আমার কোলেই ঘুমিয়ে পড়লো। আমি তখন এদিকে সরে এসে সেই পোড়ো বাড়ীর ভেঙ্গে-পড়া দাওয়াতে ঠেশ দিয়ে বসে পড়লাম। সারাদিনের হয়রানিতে শরীর যেন ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়চে। কোলে ঘুমন্ত মেয়ে নিয়ে বসে বসে কেমন ঢুলুনী এলো। হঠাৎ যেন কার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দে চমকে চোখ মেলতেই যেন মনে হলো কে যেন পোড়ো বাড়ীর ভাঙ্গা ঘরের অন্ধকারে সরে গেলো। আমি উঠে দাঁড়িয়ে এক হাঁক দিয়ে যতোটা সম্ভব অনুসন্ধান কোরেও কারুকে দেখতে পেলাম না। হয়তো কালীতলা-ফেরৎ কোনও সমাজে অপাংক্তেয় ভিখিরী—আমায় দেখে ভয়ে পালিয়েচে জঙ্গলে। এই মনে কোরে আবার দাওয়ায় বসলাম। বৃষ্টি তখনও পড়চে। খুকী ঘুমাচ্ছে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেচে। সারাদিন খুকীকে কোলে নিয়ে হাত দুটোয় ঝিঁঝিঁ ধরে গিয়েছিলো। খুকী জেগে উঠলেই বেরিয়ে পড়বো এই মনে কোরে চাদরটা মোটা কোরে দাওয়ার ওপর বুকের কাছে পেতে মেয়েকে শুইয়ে তার গায়ের ওপর হাত রেখে পাশে শুয়ে পড়লাম। হায় ভগবান! কখন যে তন্দ্রা এসেছে আর কতোক্ষণ যে ঘুমিয়েচি তা জানিনা। হঠাৎ তন্দ্রাঘোরেই যেন মনে হলো বুকের কাছটা আমার শূন্য হিম হয়ে গেছে। সেই আমার ছোট্ট মা-মণির তুলতুলে কিশলয় দেহের মৃদু মধুর তাপ যেন সরে গেছে! চোখ মেলে দেখি সত্যই সে নেই! পাগলের মতো চারদিকে দৌড়োদৌড়ি কোরে খুঁজতে লাগলাম—কেউ কোথাও নেই। ভেঙ্গে-পড়া বুক দুহাতে চাপড়াতে-চাপড়াতে সারা মাঠে হাতড়ে বেড়াতে লাগলাম আমার বাছাকে। সমস্ত শরীর অসহ্য দুঃখে থরথর কোরে কাঁপতে লাগলো—কি করবো কিছুই স্থির করতে পারলাম না। হাহাকার কোরে একবার এদিকে ছুটে যাই—একবার ওদিকে ছুটে যাই "মণি! মণি! মামণি!" যে ডাকে মেয়ে আমার তিনমাস বয়স হ'তেই সাড়া দিয়ে উচ্ছ্বসিত হেসে হাত বাড়িয়ে চলে আসতো—আজ সে ডাক নিস্ফল বেদনায় বিজন মাঠে মাথা কুটতে লাগলো। রাত তখন ঘন হয়ে এসেছে—টিপটিপ বৃষ্টি তখনও পড়ছে। আমি আচ্ছন্নের মতো আবার সেই পোড়ো বাড়ীতে ফিরে এলাম—তারপর কি হলো জানি না। আমি আর বাড়ী ফিরিনি। পরদিন ভোর হতেই আবার বেরিয়ে পড়লাম মেয়েকে খুঁজতে। আমার বুকের কাছ হ'তে কে যেন তাকে চুরি কোরেছে—এই বিশ্বাসই আমায় উন্মাদের মতো পথে পথে অনুসন্ধান করিয়ে বেড়িয়েছে। এই চৌদ্দ-পনেরো বৎসর খুঁজেছি সমস্ত ভারতবর্ষ—কতো ছোট বড়ো জায়গায় মাঠে জঙ্গলে—কোনো পোড়ো বাড়ী দেখলেই তাতে পাগলের মতো উঁকি মেরে দেখেচি। অনবরত ঘুরেচি—সেইটাই অভ্যাস হয়ে গেলো। বাড়ীর কথা প্রথম কয়েক বছর মনেই পড়েনি—তারপর জানিয়েছিলাম স্ত্রীকে যে মেয়ের রোগ বেড়ে যায়—তাকে বাঁচাতে পারিনি। সে সেই গ্রামের বাড়ীতেই দুঃখে কষ্টে দিন চালাচ্ছে। আমি মাঝে মাঝে জ্যোতিষ কোরে কিছু পেলে পাঠিয়ে দিই।

আমার সুখের সংসারটা এই রকম ভাবে নষ্ট হয়ে গেলো। আমার মেয়ে যদি বেঁচে থাকে তো সে ঠিক তোমারই বয়সী হবে। তোমাকে দেখলেই কেন জানি না আমার সেই মেয়ের কথাই মনে হয়। এই চিন্তাই যেন আবার আমায় নূতন কোরে পেয়ে বসচে। কাল ভোর-

রাতে স্বপ্ন দেখলাম যে আমার হারানো মামণি ফিরে এসেচে—বড়ো হয়েচে—দেখলাম সে তুমিই মা! হয়তো এসবই আমার মনের ভুল। আমার আশীর্বাদ তোমরা জেনো—তোমার বাবাকে শ্রদ্ধা-প্রীতি দিয়ো। ভালো হয়ে উঠলে একবার দক্ষিণে যাবো ইচ্ছা আছে। যদি আরও বাঁচি তাহলে একবার আবার তোমায় দেখে আসবো।

ইতি—আশীর্বাদক

তোমাদের বাঙালী বাবা।"

পার্বতী চুপ কোরে দাঁড়িয়ে শুনছিলো—চিঠির প্রতি লাইনের মর্ম তাকে হিন্দীতে বলছিলায়। তার বড়ো বড়ো কালো চোখে বিস্ময় ও তার সঙ্গে সঙ্গে বেদনার অশ্রু ভরে এসেছিলো।

দ্বিতীয় চিঠিখানি হাতে নিয়ে বললাম, "তাহলে এবার হিন্দী চিঠিখানি পড়ি?" তুমি তো বোধহয় হিন্দী জানো তাহলে চিঠিখানি কি পড়ো শুনি?

"হ্যাঁ বাবুজী পড়েচি—তবু আপনি আর একবার পড়ুন।" খুব মৃদুস্বরে পার্বতী বললে। চাকরটি চলে গিয়েছিলো। হিন্দী চিঠিটি এই :—

"পরম কল্যাণিয়া পার্বতী—মা আমার!

আমি রামেশ্বরে এসে আটকে পড়েচি। শরীর খুব অসুস্থ হয়ে পড়েচে। তোমায় কয়েকটি দরকারী কথা লিখে জানাচ্ছি—ভয় নেই—নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবো—তবু শরীরের ওপর বিশ্বাস নেই। তুমি বুঝতে পারো না কেন আমি তীর্থ-তীর্থ করি। এবার আসবার সময়ে কতো কাঁদলে, তবু আমি শুনলাম না। এই চিঠি হতে কিছু বুঝতে পারবে। ষোলো বছর পূর্বে আমি সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য গুরুর আদেশ নিতে গেলে তিনি বললেন—আগে কাশী-দর্শন কোরে এসো। সেখানে ভিক্ষায় জীবনধারণ কোরে—এবং নানা সাধুসঙ্গ ও নিত্য দেব-দর্শনে তিন মাস কাটিয়ে এলে তখন তিনি আদেশ দেবেন। আমি মহা আনন্দে কাশী-যাত্রা কোরলাম। সেখানে বিশ্বনাথের মন্দির আর ভক্তের ভীড় দেখে তো বিস্ময়ে-আনন্দে আমার দু'চোখ বয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। মন্দিরের বাইরে এসেও মন্দিরের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে মনে ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন অবনত হয়ে এলো—আমার সমস্ত জীবন যেন সার্থক হয়ে গেলো। আমার মনের মধ্যে যেন কে বলে উঠলো—সাধু! এই অসীম আনন্দের পরিবর্তে তুমি ভগবানকে কি ভাবে সেবা কোরবে? ঠিক সেই মুহূর্তে চোখ পড়লো এক কদর্য্য ভিখারীর কোলে একটি ছোট্ট রুগ্ন দু'বছরের মেয়ের ওপর। মেয়েটির সমস্ত দেহ ঘা-চুলকানিতে ভরে গেছে—সে অনবরত কাঁদছে আর চারিদিকে অসহায়ের মতো তাকাচ্ছে। একটি লালপেড়ে শাড়ীপরা বাঙালী মহিলা তার সমুখ দিয়ে যেতেই সে তাঁর দিকে দু'হাত বাড়িয়ে আধো-আধো স্বরে "মা" বলে জোরে কেঁদে উঠলো। আমার খুব মনে হলো যে এ মেয়ে কখনও ঐ ভিখারীর নয়—নিশ্চয়ই কোনও ভদ্র-ঘরের মেয়ে, কোনরকমে পেয়েছে বা চুরি করেছে। আমি শিশুটির আরও কাছে এগিয়ে যেতেই—আমার দিকে চেয়ে শিশুটি কেঁদে উঠে হাত বাড়িয়ে আসতে চাইলে। আমার মনের মধ্যে এইবার কে স্পষ্ট বলে উঠলো—সাধু! একে উদ্ধার করাই তোমার পরম ব্রত! আমি তখনই শিশুটিকে ভিখারীর কাছ হতে টেনে নিয়ে বুকে তুলে নিলাম।—কোথা হ'তে একে চুরি কোরেছিস—শীঘ্র বল্!—বলে ভিখারীর দিকে চাইতেই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে গেলো। আমি শিশুটিকে নিয়ে সোজা আলমোড়ায় গুরুর কাছে চলে এলাম। গুরু তার চিকিৎসার ব্যবস্থা কোরে দিলেন, আর আমায় হেসে বললেন, "বেটা তোর আর সন্ন্যাস-গ্রহণ হলো না।" মাসখানেক পরে সেই রুগ্ন মেয়ে সুন্দর গৌরবর্ণ স্বাস্থ্যবতী মেয়েতে পরিণত হলো। আমি তাকে নিয়ে বাড়ী চলে এলাম—(আলমোড়ারই কাছে এক গ্রামে আমার পৈতৃক বাড়ী—তা তো তুমি জানো)। বুড়ী পিসীমা ছাড়া আমার আর কেউ ছিলেন না। তিনিই শিশুকে মানুষ কোরতে লাগলেন, আর আমি জমিজমার কাজ দেখতে লাগলাম। আমার সমস্ত জীবন অপূর্ব মধুর রসে ভরে উঠলো। পিসীমাকে কখনও রহস্য কোরে বলতাম "জানো পিসী—ও আমারই মেয়ে—ওর মা ওর জন্মের পরই মারা যায়!" "তার আর আশ্চর্য কি বাছা? সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেলে—ফিরে এলে বছর দুই পরে এই সুন্দর বাচ্চা কোলে।" বলে হেসে পিসীমা শিশুকে বুকে চেপে ধরতেন। তিনি খুব স্নেহপ্রবণা ছিলেন। তুমিই যে সেই

মেয়ে তা এতোক্ষণে বুঝতে পেরেছ বোধহয়। পিসীমা যতোদিন বেঁচেছিলেন—তাঁর কাছে তোমায় রেখে তবু মাঝে মাঝে তীর্থে তীর্থে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতাম—কিন্তু তাও বেশীদিন পারতাম না—তোমার কচি মুখখানির জন্য এতো মন কেমন করতো।

তোমায় আমার মেয়ে বলেই অনেকে জানে—তুমিও তাই জানতে। আজ মা তোমায় প্রকৃত কথা জানিয়ে দিলাম। তোমার বিবাহ আমি আর্যসমাজী-মতে রঘুনাথের সঙ্গেই দেবো—সেও রাজী আছে। সে বিদ্বান ছেলে—তুমি সুখী হবে। যদি আমি না ফিরি তাহলে তাকে এ চিঠি দেখিয়ো ও তোমরা বিবাহ কোরো। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার নামে উইল করা আছে। আমার সিন্দুকে সে সব কাগজ-পত্র পাবে, আর আলমোড়ার মনোহরবাবু উকীল সব জানেন। অধিক আর কি! আমার ঐকান্তিক আশীর্বাদ জেনো। ভগবান তোমায় চিরসুখী করুন।

ইতি—নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমার বাবুজী।"

চিঠি পড়া হয়ে গেলেই পার্বতী অসহায় ভাবে ব্যাকুল-স্বরে বলে উঠলো "বাবুজী! আপনি আমায় সাহায্য করুন! এঁদের দুজনকেই যতো শীঘ্র পারেন খবর দিয়ে এখানে আনিয়ে নিন।"

আমি একটু ভেবে বললাম, "আচ্ছা! তুমি ভেবোনা মা! আমি কালই একটি লোককে নীচে পোস্ট আফিসে পাঠাচ্ছি—চার পাঁচটি টেলিগ্রাম লিখে। দুটি টেলিগ্রাম এই দুই পত্রলেখকের নামে, আর দুটি এই দুই জায়গার পুলিশ-অফিসারের কাছে। আমি নিজে পুলিশের লোক—সুতরাং কাজ হতে পারে—দুই তীর্থযাত্রী সাধুকে শীঘ্র খুঁজে এখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বলে দিচ্ছি।—তুমি ভেবো না—আমি একাজের ভার নিচ্ছি।"

পরদিন সকালে টেলিগ্রামগুলি ঠিকভাবে পাঠিয়ে দিয়ে পার্বতীকে বললাম, "তাহলে আমি এখন আসি মা? তোমার আতিথ্য—"

"না বাবুজী আপনি যাবেন না—" বাধা দিয়ে বলে উঠলো পার্বতী। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো—"এইজন্যই আপনাকে এতো কষ্ট দিলাম। আমার এখানে কেউ নেই! রঘুনাথ হরিদ্বারে পড়াশুনা করে—আর এখানে আমার আপনার বলতে কেউ নেই।"

আমি সস্নেহে হেসে পার্বতীর মাথায় হাত দিয়ে বললাম, "তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা—তোমার দুই সাধু-বাবা এখানে এসে পৌছবার আগেই আমি বদরিকাশ্রম-দর্শন কোরে ফিরে আসবো। তাঁদের আসতে হপ্তা দুয়েক তো লাগবেই। আমাদের তিনজনের পরিচর্যায় তুমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে!"

বাবা বদরীনারায়ণের কৃপায় বেশ ভালোভাবেই শ্রীবিগ্রহ-দর্শন কোরে ফিরে এলাম তিন সপ্তাহ পরে—সারা প্রত্যাবর্তনের পথ পার্বতীর করুণ চাউনী একবারও ভুলতে পারিনি। খবর দেওয়াই ছিলো—বেশ খুশী মনে পার্বতীর বাড়ীর পথের বাঁক ঘুরতেই হাসিহাসি মুখে পার্বতী এসে প্রণাম করলো, তারপর হাত ধরে বাড়ী নিয়ে এলো।

বড়ো ঘরটায় ঢুকেই দেখি—এক বৃদ্ধ সাধু গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার কোরে হিন্দীতে বললাম, "কোথা হতে এলেন সাধুবাবা? পার্বতীর 'তার' পেয়েছিলেন?"

সাধু প্রতি-নমস্কার কোরে বাংলায় বললেন, "ও আপনিই এসব ব্যবস্থা কোরেছেন খবর দেবার? ধন্যবাদ! কিন্তু দেখুন ব্যাপার! ঘনশ্যাম তো বেঁকে বসেচে—বলচে ও মেয়ে ছাড়বে না। তাছাড়া ও বলচে যে আমার প্রমাণ কই যে মেয়ে আমারই? দেখুন আপনিই এখন ভরসা দারোগাবাবু।"

এমন সময় পার্বতী ঘনশ্যাম অর্থাৎ তার প্রতিপালক-সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলো হাসিমুখে। সে তো এসেই আমার খাওয়া ও পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমার দিকে চেয়ে পার্বতী হেসে বললে, "দেখুন বাবুজী! আপনিই না হয় এবার আমায় আপনার কাছে নিয়ে রাখুন। এরা দুজনে তো যবে হতে এসেছেন—কেবল ঝগড়া কোরছেন—দুজনেই আবার সাধু! বাঙালী বাবা বলেন, তিনি আমায় বাংলা-দেশে নিয়ে যাবেন—সেইখানেই বিয়ে দেবেন—এতোদিন পরে আবার ঘরে ফিরবেন—আবার সংসার বাঁধবেন (এখানে পার্বতীর গলা কাঁপতে লাগলো—চোখে জল ভরে এলো) দেশে চিঠি দিয়েচেন।··· আমার মা এখনও বেঁচে আছেন।" একটু থেমে মাতৃস্নেহ

স্বর্গ-বিচ্যুতা কিশোরী খানিক আত্মসম্বরণ কোরে, ম্লান হেসে বললে, "এদিকে আমার বাবুজীই বা ছাড়বেন কেন? তিনিও আমায় এখানেই রাখবেন, আর এখানেই বিয়ে দেবেন।……আপনি একটা কিছু সমাধান কোরে দিন বাবুজী…!"

সে আমার যুক্তি, বিদ্যা আর বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষাই বটে! দেখলাম দুই সাধুই কোনও যুক্তি মানতে চান না। ঘনশ্যাম বলেন—ও যে ব্রাহ্মণের মেয়ে তা' ওকে দেখেই বোঝা যায়, আর বাঙালী সাধুবাবাও ব্রাহ্মণ। আর যে সময় ওঁর মেয়ে হারিয়েছিলো তার মাস খানেকের মধ্যেই আমি মেয়ে পেয়েছিলাম; আর সত্যই উনি যে রকম বলছেন—মেয়ে সেই রকমই ছিলো।—তবু! অন্য কারুর যে মেয়ে নয় তার প্রমাণ কি? ঘনশ্যাম গোঁ-ভরে চুপ কোরে বসেন। আমি তখন তার কোল ঘেঁসে বসে শুধোলাম, "সাধুজী! সত্যই কি আপনার সন্দেহ হচ্ছে?"

"খুব সন্দেহ নেই বাবুসাহেব—তবে আমি আরো প্রমাণ না পেলে পার্বতী-মাকে ছাড়তে পারবো না। বাঙালী সাধুবাবা মাইজীকে নিয়ে এখানে এসে থাকুক না—আমি তাতে ভারী খুশী হবো! আমি ওই মেয়ের জন্য সন্ন্যাস ছেড়ে দিয়ে এই সংসার নিয়ে রইলাম, আর আজ সব এক কথায় ছেড়ে কি কোরে দিই?"

"আর আমি যে আমার সংসার ভাসিয়ে দিয়ে চিরজীবন বিবাগী হয়ে রইলাম ঘনশ্যাম?" ক্ষুব্ধ অভিমানের স্বরে বাঙালী বাবা ঘনশ্যামের দিকে চেয়ে বললেন, "আমিই বা কি কোরে হারামাণিক ফিরে পেয়ে ছেড়ে দিই বলুন তো?

বাঙালী মেয়ে সে—এই পাহাড়ে সমস্ত জীবনটা কাটাবে কেন?…তুমি চলো না ঘনশ্যাম…থাকবে আমার ওখানে…ভাঙ্গা সংসার আমার আবার ভরে উঠবে…?" বৃদ্ধের গলার স্বর বুঁজে ওঠে আবেগে।

আমি নীরব হয়েই রইলাম—এই হৃদয়াবেগের ওঠা-পড়ার ভেতর বুদ্ধিবৃত্তির কি কোনও ঠাঁই আছে?

এমনিতে দেখলাম—ঘনশ্যামে আর সাধুতে খুব ভাব। ঘনশ্যাম সাধুর সেবাযত্নের তদারক সব নিজেই করেন, আর মিষ্টি কোরে বলেন, "সাধু বাবা আপনি বুড়ো হয়েছেন—এখানেই থেকে যান—আমি গিয়ে মাইজীকে নিয়ে আসি। পার্বতীর বিয়ে দিয়ে তাহলে আমি একটু তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই। এখন তো আমার দায়-উদ্ধার হয়ে এলো। আমার আর কি!…এখন তো সন্ন্যাস গ্রহণ করতেও পারি!"

ওদের দুজনের বনিবনা আছে, অথচ বোঝাপড়া করবে না; এদিকে আমায়ও বাড়ী যেতে দেবে না। ভালো খাওয়া-দাওয়া আর আদর-যত্নে মনে হ'তে লাগলো আমিও আর এক "বাঙালী বাবা" হয়ে গেছি। দুর্গম তীর্থ পর্যটনে ক্লান্ত শরীরটা অল্প কয়দিনেই বেশ সেরে উঠলো। পার্বতীর ওপর খুব মায়া পড়ে গেছিলো। হিন্দী ভজন সে মাঝে মাঝে শোনাতো। চমৎকার মিষ্টি গলা! …এর মধ্যে গাঁয়ের এক আত্মীয়ের সঙ্গে পার্বতীর মাও এসে পড়লেন। চিরজীবন স্বামী কন্যা-হারা অভাগিনী বৃদ্ধার এই জীবনের শেষ অধ্যায়ে হারানো প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলনের সে করুণ বেদনাঘন দৃশ্যে আমাদের সবার চোখেই জল এসেছিলো। স্বামী ও পার্বতীকে তিনি আর ছাড়তে চাইলেন না—অথচ আজন্ম-অভ্যস্ত বাংলা দেশের সেই গ্রামের কুটীরখানিও ছাড়তে পারবেন না। সমস্যা জটিল—উপায় কি? পার্বতীর মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে পার্বতীর গায়ে কোনও বিশেষ চিহ্ন-টিহ্ন আছে কিনা? শোকে-তাপে জর্জর পার্বতীর মা সে কথাও মনে কোরতে পারলেন না। তবে নিঃসন্দেহ প্রমাণ একদিন ঘনশ্যাম নিজেই পেয়ে গেলেন। পার্বতীর শিশু-বয়সের খেলনা-গুলিই পার্বতীর মার একমাত্র স্মৃতির সান্ত্বনা ছিলো—ঐগুলি তিনি সর্বদাই সঙ্গে রাখতেন। পার্বতীকে একদিন কোলের কাছে বসিয়ে তিনি গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে গল্প কোরছিলেন (পার্বতী এ কয়দিনে একটু একটু বাংলা বুঝতে ও বলতে শিখে গিয়েছিলো)। হঠাৎ মা তাঁর তোরঙ্গটি খুলে একটি ছোট্ট পুঁটুলী বার কোরে কয়েকটি খেলনা হাতে কোরে সজল চোখে মেয়েকে দেখাচ্ছিলেন ও তাঁর সেই হারানো-দু'বৎসরের শিশুর নানা কথা বলছিলেন। এমন সময় ঘনশ্যাম সেখানে এসে দাঁড়ালেন ও তাঁর চোখ পড়ে গেলো পার্বতীর হাতের একটি মাটির খেলনার ওপর। ঘনশ্যাম বিষণ্ণ মুখে ধীরে ধীরে বললেন, "বেটি! আর কোনও সন্দেহ নেই—ঐ খেলনার জুড়িটা আমার কাছে আছে।" বলেই তাঁর নিজের ঘরের আলমারী হতে সেটা এনে দুটিকে এক জায়গায় রেখে

বললেন, "এই যে প্রমাণ!" দেখা গেলো একটি ছোট্ট মাটির শিল, আর তারই মাপের সেই মাটিরই একটি নোড়া। কালীতলায় বাবার কোলে চড়ে যাবার সময়ে পার্বতী (তখন খুকীর নাম ছিলো মণিমালা) নোড়াটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে নিয়ে গেছিলো—একথা তার বাবার তখুনি মনে পড়ে গেলো। শিশুর হাতের মুঠি—সহজে শিথিল হয় না—আর যে-কারণেই হোক খুকী তার প্রিয় খেলনা ঐ নোড়াটি হাতের মুঠির মধ্যেই রেখেছিলো। ভিখারীও মেয়ে চুরি কোরে তার গায়ের পোষাক খুলে দিয়েছিলো—ধরা পড়বার ভয়ে—কিন্তু ছোট্ট নোড়াটি ফেলে দেয় নি। বোধ হয় ভিখারীরা নোড়াটিকে ওকে ভোলাবার জন্য ব্যবহার করতো—সুতরাং সেটি হারায়নি। এই সময় পার্বতীর বাবাও এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। নোড়াটি হাতে নিয়ে সজল চক্ষে বললেন "হ্যাঁ! এই দেখো একটুখানি ভাঙ্গা—মামণি এটিকে খা'ল কামড়াতো, বোধ হয় দাঁত বেরোচ্ছিলো বলে।" ঘনশ্যাম স্নিগ্ধ হেসে বললেন, "এটিকে প্রথম দিনই ও ঘুমিয়ে পড়লে আমি ওর হাত হ'তে নিয়ে কেন জানি না—ভালো কোরে তুলে রেখে দিয়েছিলাম—মনে হলো আমার 'দেবদত্তা'র এইটিই একমাত্র সম্পত্তি—ওটি আমি হারাবো না, ওকে পরদিন কাশীর অনেক খেলনা কিনে দিই।"

আমার কাহিনীর শেষটুকু এবার বলি। আমি ওদের সমস্যার সমাধান কোরে দিতে পেরেছিলাম। পার্বতীর বাবা-মাকে বোঝালুম যে মেয়েকে বাংলাদেশে নিয়ে গেলে ওর শরীর টি'কবে না—পাহাড়ে হাওয়ায় গড়া পার্বতীর দেহ মন—রঘুনাথই ওর উপযুক্ত স্বামী, আর এই "পাহাড়িয়া বাপের" ঘরই তাকে সত্য আদরে রাখতে পারবে। "বাঙালী বাবা ও মা" মেয়ের সঙ্গে এখানেই আনন্দে থাকুন ও শেষ-বয়সে যতো ইচ্ছে হরিদ্বার আর কেদারবদরী-তীর্থ করুন।—এতেই হবে সকলেরই মঙ্গল। ঘনশ্যাম তো খুব খুশী। রঘুনাথও এসে পড়েছিলো—তারও মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো দেখলাম। কিন্তু ওদের বিয়েতে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি।

পাঁচ বৎসর পরে আবার ওদের কাছে গিয়েছিলাম। পার্বতীর বারে বারে আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারি নি। পার্বতীর মা কেদারনাথ-দর্শনে গিয়ে সেখানেই শেষ-নিঃশ্বাস-ত্যাগ কোরেছেন খবর পেয়েছিলাম। পার্বতীর কোলে দু' মাসের ছেলে দেখে তিনি যান। আমি গিয়ে দেখি ঘনশ্যাম একটি বছর দেড়েকের ফুটফুটে দুরন্ত শিশুকে সামলাচ্ছে। তার নাতি! দুঃখু কোরে বললে, "আর বাবুজী! বাঙালীর ছেলে তো বড়োই দুষ্টু! ওকে আমি ছাড়া কেউ সামলাতে পারে না। পার্বতী আমায় কোথাও যেতে দেবে না। কোনও তীর্থ-ধর্ম হলো না। বাঙালী বাবা তো সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্চেন—নাতির ওপর কোনও মায়া নেই···! আমি এই হরিদ্বার গেলেই একদিন টে'কতে পারি না। বছর দুই গ্রামেও যেতে পারি নি। জামাই হরিদ্বারে কাজ করচেন—টাকা পাঠিয়ে-পাঠিয়ে দিচ্চেন।···আমার এ-জীবনটাই পরের সংসার কোরে কাটলো···বাবুজী···"

ঘনশ্যামের তৃপ্তিভরা মুখের পানে চেয়ে আমি বললুম, "সাধুজী! আপনি তো ভালোই আছেন—ভগবান যাকে যে রকম কাজের মধ্যে রাখেন—সেই কর্মসাধনের ভিতর দিয়েই তার মুক্তি এনে দেন।"

ঘনশ্যাম বললেন, "তা বাবুজী—আপনি এক রকম ঠিকই বলেছেন! ভগবান আমায় কোনও দিন দুঃখ দেন নি। বিশ্বনাথজী যেদিন পার্বতী-মা-কে আমায় দিয়েছেন—সেদিন হ'তে আমার সকল অন্তর পূর্ণ হয়ে আছে···ও সত্যই 'দেবদত্তা'···!"

বলতে বলতেই পার্বতী এসে হাজির।—তার পরেই শুরু হয়ে গেলো আমার আদর-আপ্যায়ন। কদিন আনন্দে কাটিয়ে ফিরবো-ফিরবো করচি—এমন সময় পার্বতীর বাবা এসে পড়লেন। মেয়ে-হারানোর দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে একা বেরিয়ে পড়ে যে সহধর্মিণীকে দ্বিগুণ দুঃখের বোঝায় এক সাথে ভারাক্রান্ত করেছিলেন—তিনি নেই! আজ সত্যই "বাঙালী বাবা" একা! গ্রামে আর জীবনে ফিরলেন না···কুঁড়েটুকু পার্বতীর নামে লিখে দিয়েচেন। তাঁকে বললাম, "আপনি তো এখন মেয়েকে ফিরে পেয়েচেন—তবু কেন এতো ঘুরে বেড়ান?" একটু চুপ কোরে থেকে তিনি উত্তর দিলেন, "আমার মাথাটা বোধ হয় একটু খারাপই হয়ে গেছে—কারণ এখনও আমার মনে হয় সেই প্রায় দু' বছরের রুগ্ন মেয়ের কথা—মনে হয় যেন কোথায় সে আমায় খুঁজছে···অসহায় শিশু—ভাষা-

ারা দু'চোখে খুঁজছে তার স্নেহময় পিতার পরম নির্ভরভরা ারিচিত মুখটি !···যে-মেয়েকে আমি হারিয়েচি—সে তো ı নয়! আমি যদি তাকেই আবার যথাসময়ে খুঁজে পতাম—তাহলেই বোধহয় আমার জীবন আবার সহজ াতি ধারণ করতো।—এখন উপায় নেই! 'মামণিকে ফরে পেয়েচি'—এ কথা মনে মনে বারবার আওড়াই—বু দুঃসহ বিয়োগ-স্মৃতি জুড়োয় না।···ঘুরে বেড়ালে তবু একটু শান্তি পাই।"

সহানুভূতির স্বরে ঘনশ্যাম বলেন, "সত্যই বাবুজী—াধুবাবা তাঁর মেয়েকে সত্যই হারিয়েচেন, আর আমি াকে পেয়েচি। কোথাও দূরে তাকে ছেড়ে গেলে াগেই মনে হয় সেই দু' বছরের রুগ্ন ঘা-চুলকানীতে সর্বাঙ্গ-রা অসহায় মেয়েটির কথা—যেন আমায় ছাড়া সে এক হূর্ত বাঁচবে না। সারা রাত জেগে ওর দেখাশোনা কারেচি···কতো ভুলিয়েচি! সেইটাই মনে পড়ে!··· বই ভগবানের লীলা!"

স্বপ্নমঙ্গল

[একাঙ্ক শিশু নাটিকা]

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "হিং-টিং-ছট্"
অবলম্বনে রচিত)

শ্রীব্রজেন রায়

প্রথম দৃশ্য

হবুচন্দ্র ভূপের স্বপ্ন দর্শন

স্থান—শয়নকক্ষ। মহারাজ হবুচন্দ্র গভীর নিদ্রামগ্ন। বেদে, মহারাজ হবুচন্দ্র ও বুড়ি।

বেদে। এত কষ্ট করে ধরলাম পাখীটা। তা উড়ে াল? এখন কোথায় পাবো অমন লাল-রঙের সুন্দর াখী? ছাতু দিলাম, বন থেকে কত সুন্দর সুন্দর মিষ্টি ল দিলাম। তাতেও থাকলো না পাখীটা? হাতে ায়েও ফসকে গেল—?

সহসা লাল বস্ত্রাচ্ছাদিত হবুচন্দ্র ভূপকে শায়িত দেখিয়া

আরে, এই আমার পাখী। বাঃ, দিব্যি আরামে রাজ-বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছো? দাঁড়াও, এবার মজা দেখাচ্ছি তোমাকে। এই লোহার শেকল দিয়ে বাঁধলাম তোমাকে। এবার কি করে পালাবে বাছাধন? (একটু থেমে) বাব্বা! নিশ্চিন্তি হওয়া গেল এবার। অনেক হেঁটেছি, এবার একটু জিরিয়ে নিই এখানে। (ক্লান্তিসূচক শব্দ করে বসে পড়লো)

হবুচন্দ্র। কি বিপদ! আমাকে এমন করে আষ্টে পৃষ্ঠে শেকল দিয়ে বাঁধলো কে? পায়ে এমন করে সুড়সুড়িই বা দিচ্ছে কে? (বুড়িকে দেখতে পেয়ে, ধমকের সুরে) এই বুড়ি—আমাকে অমন করে সুড়সুড়ি দিচ্ছিস কেন? দেখবি, তোকে এই মুহূর্তে শূলে চাপিয়ে দেবো?

বুড়ি। বারে, কি বোকা তুমি। তোমার হাত-পা যে বাঁধা। তুমি আমাকে শূলে দেবে কি করে?

হবুচন্দ্র। বাঃ! ঠিক বলেছিস তো? আচ্ছা বুড়ি, আমার এমন অবস্থা কে করেছে বলতে পারিস?

বুড়ি। তুমি কি চোখে দেখতে পাওনা? ওই তো শুয়ে রয়েছে বেদেটা। ওই তো তোমাকে তার হারিয়ে-যাওয়া পাখী মনে করে বেঁধে রেখেছে।

বেদে। আরে অত ছটফট করছিস কেন? এই নে—শান্ত হ' এবার।

মগ্ন আবৃত্তির সুরে "হিং-টিং-ছট্" ধ্বনি

॥ সাময়িক বিরতি ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

হবুচন্দ্রের স্বপ্নভঙ্গ

[মহারাজ হবুচন্দ্র, ভৃত্য জরদ্গব ও প্রধান-অমাত্য গবুচন্দ্র]

হবুচন্দ্র। (পরম আলস্য ভরে হাই তুলিয়া) বাব্বা! কি বিশ্রী স্বপ্নটাই না দেখেছিলাম এতক্ষণ। আমি তো ভাবলাম সত্যি সত্যি বুঝি সাঁওতাল বেদেটা দাঁড়ে বসিয়ে আমাকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। (আদেশের সুরে) এই কে আছিস?

ভৃত্য। আজ্ঞে আমি জরদ্গব।

হবুচন্দ্র। এই শোন জরদ্গব—রাজ্যের প্রধান-মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দে। এক্ষুণি। বুঝলি? যা। (প্রধান-মন্ত্রী

গবুচন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া) আরে আসুন আসুন গবুচন্দ্র ! নাম করতে করতেই দেখছি আপনি এসে গেছেন। বসুন। আপনার সঙ্গে ভীষণ দরকারী কথা আছে। (ভৃত্যের প্রতি) এই জরদ্গব—তুই শিগ্‌গির রাজসভার পণ্ডিতদের এক্ষুণি সভায় আসতে বলে দে। আমার হুকুম। বুঝলি ?

ভৃত্য। যে আজ্ঞে মহারাজ।

প্রস্থান

গবুচন্দ্র। কিন্তু কি ব্যাপার মহারাজ ? আপনাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে। কাল রাত্রে কি আপনার সুনিদ্রা হয় নি ?

হবুচন্দ্র। না মন্ত্রীমশায়, নিদ্রা ভালই হয়েছিল—আর তাই তো সারারাত ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখেছি। চলুন, বলছি সব আপনাকে।

উভয়ের প্রস্থান

॥ সাময়িক বিরতি ॥

তৃতীয় দৃশ্য

হবুপুরের রাজপথ

রাজ্যের ঘোষক ও চারজন নাগরিক

রাজ্যের ঘোষক। (ডুগডুগি বাজাইয়া) শোন হবুপুরের অধিবাসিগণ—তোমাদের মধ্যে যে কেউ মহারাজের স্বপ্ন-দর্শনের ব্যাখ্যা করে 'হিং-টিং-ছট' কথার মানে বলে দিতে পারবে—মহারাজ তাকে খুশী করে দেবেন।

আবার ডুগডুগির শব্দ

প্রথম নাগরিক। শুনছ ভায়া, যত বড় বড় রাজ্যের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হার মেনে গেল—আর আমরা চুনোপুঁটি হয়ে রাজার স্বপ্ন দর্শনের ব্যাখ্যা করে দেবো ?

দ্বিতীয় নাগরিক। ও সব রাজ-রাজড়াদের কাণ্ড। আমাদের মাথাব্যথা করে লাভ কি ?

তৃতীয় নাগরিক। কিন্তু, এদিকে যে সব্বাই "হিং-টিং-ছট" করে করে অন্নজল ত্যাগ করেছে। তার তো একটা উপায় বের করতে হবে ?

চতুর্থ নাগরিক। ওসব বাদ-বিসম্বাদ না করে চলো না সব্বাই আমরা রাজসভায় যাই। আজ তো নানা দেশ থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা এসেছেন—তাঁরা কি মীমাংসা করেন, এস স্বচক্ষে দেখেই আসি না কেন ?

প্রথম নাগরিক। উত্তম প্রস্তাব। চল ভাই, আমরা রাজসভায় যোগদান করি।

॥ সাময়িক বিরতি ॥

চতুর্থ দৃশ্য

হবুচন্দ্র, গবুচন্দ্র, অন্যান্য অমাত্যগণ, পণ্ডিতগণ ও নাগরিকগণ

হবুচন্দ্র। তাহলে অযোধ্যা, কনোজ, কাঞ্চী, মগধ ও কোশলের পণ্ডিতগণ—আপনারা পর্য্যন্ত আমার স্বপ্ন দর্শনের ব্যাখ্যা করতে পারলেন না ?

পণ্ডিতগণ। (সমস্বরে) না মহারাজ। আমরা নানা শাস্ত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে এর কোন অর্থ পেলাম না। আমরা এজন্য লজ্জিত মহারাজ।

হবুচন্দ্র। তাহলে সকলেই আমাকে নিরাশ করলেন ? গবুচন্দ্র—ম্লেচ্ছদেশ থেকে যে সমস্ত পণ্ডিতগণকে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই এসেছেন ?

গবুচন্দ্র। মহারাজ ! আপনার আদেশে ম্লেচ্ছ পণ্ডিতেরা অনেক আগেই উপস্থিত হয়েছেন। ওই যে ওঁরা সকলেই আপনার আদেশের অপেক্ষায় বসে আছেন।

হবুচন্দ্র। উত্তম। হে ম্লেচ্ছ পণ্ডিতগণ—আপনাদের ভেতরে এমন কেউ আছেন কি, যিনি আমার কথার সদর্থ বলতে পারেন ? উচিত পুরস্কার পাবেন আপনারা।

যবন পণ্ডিত। (উত্তেজিত ভাবে) কী মহারাজ, আমাকে ডেকে এনে অপমান করছেন অমন বিদ্ঘুটে কথার মানে জিগ্‌গেস করে ?

হবুচন্দ্র। এই কে আছিস—বেটাকে শূলে দে।

যবন পণ্ডিতের আর্ত চিৎকার ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল

ফরাসি পণ্ডিত। (বিনীত ভাবে) মহারাজ ! আপনি যা স্বপ্ন দেখেছেন—তা রাজযোগ্যই বটে। এমন কি এ ধরণের স্বপ্ন একটা ইতিপূর্বে আর কোন রাজা দেখেছেন কিনা সন্দেহ। তবে একটা কথা কি—যদি অভয় দেন তো বলতে পারি—

হবুচন্দ্র। আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন ফরাসি পণ্ডিত।

ফরাসি পণ্ডিত। মহারাজ ! অনুমান হচ্ছে ওটা শুধু

।প্নই। রাজকোষে অর্থের অভাব নেই—কিন্তু রাজ-স্বপ্নের অর্থ মাথা খুঁড়ে মরলেও পাওয়া যাবে না? তাই বলছিলাম কি মহারাজ—

হবুচন্দ্র। (রাগতঃ স্বরে) থামো উজবুক!

সকলে। (সমস্বরে) ধিক্ ধিক্। কোথাকার গণ্ডমূর্খ পণ্ডিতকে ধরে এনেছে। যা বেটা নরকে যা। পুণ্যি হবে।

গবুচন্দ্র। বেটা মহামূর্খ! রাজার স্বপ্নকে স্বপ্ন বলে দিচ্ছে। দিনে দুপুরে ডাকাতি করতে চায় বেটা।

হবুচন্দ্র। (রাগত স্বরে) গবুচন্দ্র! এদের জ্যান্ত কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। নীচে-ওপরে আচ্ছা করে কাঁটা সাজিয়ে মাটি চাপা দিন। তবে মূর্খদের উচিত শিক্ষা হবে।

গবুচন্দ্র। যে আজ্ঞে মহারাজ।

হবুচন্দ্র। আর শুনুন, গৌড় দেশ থেকে যে পণ্ডিত এসেছেন, তাঁকে পাঠিয়ে দিন আমার কাছে।

গবুচন্দ্র। তিনি হাজির মহারাজ!

গৌড়-পণ্ডিত। কী জন্যে আমাকে স্মরণ করেছেন মহারাজ? সমস্ত খুলে বলুন—তাহলে দু'চার কথায় ব্যাখ্যা করে দিতে পারি। উল্টে-পাল্টে ব্যাখ্যাও করতে পারি মহারাজ।

হবুচন্দ্র। হে মহাপণ্ডিত! আশা করি আমার স্বপ্ন দর্শনের কথা শুনেছেন। বর্তমানে 'হিং-টিং-ছট্' কথার সদর্থ প্রকাশ করে আমাকে চিন্তামুক্ত করুন। এই আমার অনুরোধ।

গৌড়-পণ্ডিত। (একটু চিন্তা করিয়া) একথা আর শক্ত কি মহারাজ? খুব সহজ অর্থই করে দিচ্ছি। এর ভাবটা অনেক আগের, তবে নতুন আবিষ্কার করেছেন আপনি। এর সরল অর্থ হচ্ছে (আবৃত্তির সুরে):—

ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ,
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি,
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি,
আণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্মাবিদ্যুৎ,
ধারণা পরমা শক্তি দেখায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট,
সংক্ষেপে বলিতে গেলে 'হিং-টিং-ছট্'॥

সমবেত সকলে। সাধু সাধু। এত পরিষ্কার অর্থ যে জলের মত বোঝা যায়। (জয় ধ্বনি) জয় গৌড়-পণ্ডিতের জয়! জয় গৌড়-কবির জয়!! জয় মহারাজ হবুচন্দ্রের জয়!!!

হবুচন্দ্র। হে গৌড়-দেশের মহাকবি। আপনি আমাকে দুশ্চিন্তা সাগর থেকে উদ্ধার করলেন। আপনার প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করছি আমার মাথার এই তাজ আপনার মাথায় পরিয়ে দিয়ে। প্রধানমন্ত্রী গবুচন্দ্র, আপনি এই মুহূর্তেই কবিশ্রেষ্ঠ এই বাঙালী-কবিকে সম্বর্ধনা করার ব্যবস্থা করুন।

সমবেত সকলে। জয় বাঙালী কবির জয়! জয় মহারাজ হবুচন্দ্রের জয়!! জয় রাজ-স্বপ্ন 'হিং-টিং-ছট'এর জয়!!!

—সমাপ্তি—

মজার ম্যাজিক

যাদুকর মৃণাল রায়

চীনের পেয়ালা

আমার ছোট বন্ধুরা, তোমাদের কাছে আজ আমি একটা নূতন ম্যাজিক হাজির করছি। ছুটীর দিনে বা বাড়ীতে নিমন্ত্রিত লোকজন এলে তাদের এই খেলাটা দেখিয়ে আনন্দ দিতে পারবে। খেলা আরম্ভ করবে একটা ট্রেতে তিনটা চিনে মাটীর কাপ ও একটা ম্যাজিক ওয়াণ্ড নিয়ে সামনের একটা টেবিলে রাখবে। ও তার পর বলবে "আমি চীন ঘুরে এলাম, দেখে এলাম নূতন চীন থেকে আসবার দিন একজন চীনে যাদুকর ভারতের যাদুকরদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমায় দিলে তার যাদু পেয়ালা, আর এক চৈনিক মন্ত্র—সেই মন্ত্রের বলে আজ আমি আপনাদের একটা নূতন যাদু দেখাচ্ছি। এই বলে তিন জনের হাতে তিনটা পেয়ালা তুলে দেবে, তার পর বলবে—"এবার ভাবুন আপনারা কি পান করতে চান!" মনে কর একজন বল্লেন চা, আর একজন দুধ, অপর জন বল্লেন জল, তখন তুমি বলবে বেশ চুমুক দিন। যখন তারা খালি পেয়ালায় চুমুক দিতে চাইবেন না, তখন তুমি এক এক জনের হাত থেকে পেয়ালা নেবে ও একটা মন্ত্র বলে পেয়ালার মধ্যে একবার যাদু দণ্ডটা ঘোরাবে ও তার

পরে ফেরত দেবে, আর তাঁরা অবাক হয়ে দেখবেন তাতে তাঁদের বাঞ্ছিত পানীয়। তাঁদের হতবাক করে দিয়ে তুমি ট্রেটা নিয়ে চলে যাবে নমস্কার করে। কি বল, ভাল লাগবে না।

এবার তোমাদের বলে দিই কি কি করতে হবে। আসল কারসাজি কিন্তু যাদুদণ্ডে। প্রথমে একটা টিনের ফাঁপা নল নাও, তার মধ্যে টিনের মিস্ত্রী দিয়ে তিন বা চারটী পার্টিশান করে নেবে, আর এই চোঙ্গের এক মুখে থাকবে তিনটী বা চারটী ছিদ্র, আর এক মুখে থাকবে একটা চাপা মুখটা বা খাপ। এই নলের গায়ে চারদিকে বা তিনদিকে থাকবে তিনটী ছোট ছিদ্র, এবার গায়ের ছিদ্রগুলি মোম দিয়ে আঁট, তার পর উপরের খাপটা খুলে এক এক পার্টিশান থেকে এক একটা পানীয় ঢেলে আঁট করে খাপ বন্ধ করে দাও। ব্যস্ হয়ে গেল এবার, মন্ত্র পড়ার ছলে যাদুদণ্ড পেয়ালায় না নিয়ে এক একটা মোমের শিলখুলে দাও—দেখবে পেয়ালায় পানিও পড়ছে। কেবলমাত্র মনে রাখবে কোন ফুটোয় কি আছে। তাও মনে রাখা এমন কিছু শক্ত নয়। তার জন্যে দুইটী সহজ উপায় তোমাদের বলে দিচ্ছি:—নলের গায়ের বাঁশীর ফুটোর মতন তিনটে বা চারটে ফুটো একটু উঁচু নিচু করে নেবে। তাহলে সহজেই মনে থাকবে। না হলে নলটার চার রকম রং করে, এক এক রং-এর দিকে এক একটা ফুটো কর। মনে কর সাদা দিকে জল, লাল দিকে দুধ, নীল দিকে চা, আর হলদে দিকে সরবৎ। তোমরা যেখানে খেলা দেখাবে, সেখানে সাধারণ এই চার রকম ছাড়া অন্য কিছু কেউ চাইবে না। আর যাদুদণ্ডর দিকে লোকে সাধারণত নজর দেবেনা সবাই ভাববে পেয়ালার কারসাজি, সেই ফাঁকে তুমিও ওটা বদলে নিতে পার।

ভাল ভাবে খেলা দেখালে খুব সুন্দর খেলা এটা। আমি বড় ষ্টেজেও এই খেলাটী দেখিয়ে সুনাম পেয়েছি।

রাঁধতে জানলে রাঁধা যায়

তোমরা যারা আমার মতন খিদে পেলে মা, দিদিদের বিরক্ত কর, তাদের জন্যে আমি একটা খাবার তৈরির ম্যাজিক এনে হাজির করেছি। মনে কর মা বা দিদি রান্না ঘরে ব্যস্ত আছেন। এমন সময় তোমার যা দণ্ডটা নিয়ে তুমি সেখানে হাজির হয়ে চিৎকার আরম্ভ করলে—"খাব দাও তাড়াতাড়ি, ভীষণ খিদে পেয়েছে"। মা বল্লেন "একটু দাঁড়া খোকা, তরকারিটা একটু দেরি আছে।" তুমি বল্লে 'সে কি? এখন দেরি আছে?' দিদি হয়ত বল্লেন "যাঃ, যাঃ, রান্না করা কি অত সোজা?' 'সোজাই তো' তুমি বল্লে "রাঁধতে জানলেই রাঁধা যা এমন কি হাওয়া থেকেও খাবার তৈয়ারী হয়।" মা, দিদি হে উঠলেন তোমার কথায়। তুমি তখন খালি কড়াটা উনুনে চাপি দিলে, আর ইরিং বিরিং করে একটা অবোধ্য মন্ত্র বলে ঐ কড়ার মে তোমার হাতের যাদু দণ্ডটা নাড়তে লাগলে। কড়ার মধ্যে ছ্যাঁক্ ছ্যাঁ আওয়াজ শুনে মা আর দিদি তাড়াতাড়ি দেখতে গেলেন। তখন কি তুমি কড়া থেকে ডিম ভাজা নামাচ্ছ একটা ডিসে। অবাক হ দাঁড়িয়েছিলেন তোমার মা ও দিদি—কিন্তু মা নিশ্চয় চিৎকার কা উঠবেন, "ওরে খোকা খাসনি, ও ডিম খাসনি বাবা।" তখন তু চামচে কেটে মুখে তুলছ, তুমি কিন্তু নির্ভাবনায় খেয়ে নেবে। অব দিদির হাতে একটু দিও, কিন্তু দিদি তখন খাবেন কি, অবাক হ চেয়ে আছেন।
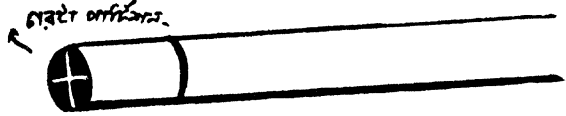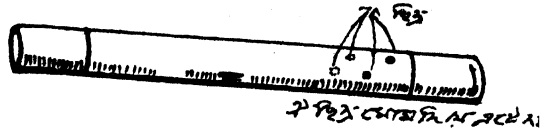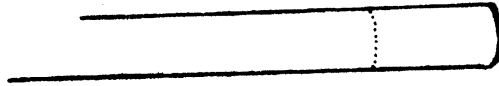
আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, এখুনি যে ছুটলে, আগে কৌশলটা বলে দি।

একটা টিন বা পেতলের ফাঁপা নল নেও, আর তার একটা মুখ বন্ধ করে দাও। এইবার খোলা দিক দিয়ে 'অমলেটের' মতন ডিম গুলে ঢেলে দাও, আর মুখটা একটু জমান মাখন দিয়ে চেপে বন্ধ কর। এবার মাখনের দিকটা গরম কড়ায় ঠেকালেই গলে যাবে আর সেই সঙ্গে ডিম-গোলা বেরিয়ে আসবে, তখন ঐ নলটা নেড়ে ভেজে নেবে। তবে সাবধান মাখন চেপে বেশিক্ষণ গরমের কাছে থেক না, তা হলে ডিম-গোলা বেরিয়ে যাবে মাখন গোলে গিয়ে।
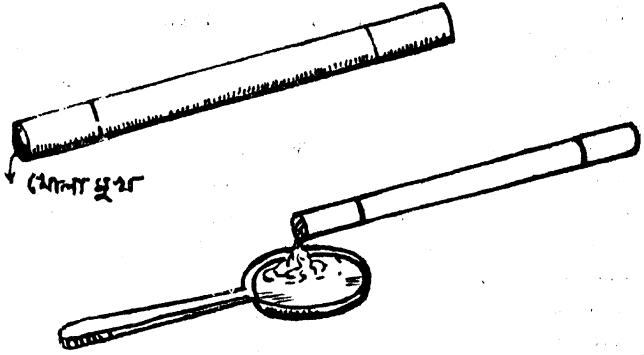
সুধু রান্নাঘরে নয়, বন্ধুদের সঙ্গেপিক্নিকে গিয়ে বা বসবার ঘরেও দেখাতে পার, তবে 'ম্যাটার' বা বক্তৃতাটা কিন্তু সময়-উপযোগী করে নেবে।

গীতায় অহিংসার বাণী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

কুরুক্ষেত্রে প্রাচীন যুগের প্রচণ্ড যুদ্ধের আয়োজন। গীতা সে ক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলেছেন। সমরের আয়োজন মাত্র জ্ঞাতি-বিরোধ নয়। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশের বীর রাজন্যবর্গ যুদ্ধকামী। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ক্ষত্রিয় সেনা স্বপক্ষের জয়লাভের শুভ সাধনায় জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সারথী সখা অর্জুনের। তিনি ক্ষণিক মোহাচ্ছন্ন পাণ্ডব বীরকে প্রণোদিত করছেন যুদ্ধে। রণ-বিরতি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অকীর্তিকর। হৃষিকেশ বল্লেন—তুমি যদি এই সংগ্রামরূপ ধর্মে প্রবৃত্ত না হও, তাহলে স্বর্গ এবং কীর্তি বিনাশ ক'রে তুমি পাপ অর্জন করবে।*

মোট কথা মহাভারতের এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য বীর পার্থকে সমর-সংকল্পে দৃঢ়মন করা। তাই সহজেই মনে হয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অহিংসা নীতির পরিপোষক নয়। মানুষের চিত্তে ক্ষত্রিয়ভাব, সমর-লিপ্সা, ন্যায়-যুদ্ধে শত্রুর প্রাণনাশ প্রভৃতি শিক্ষা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অন্যতম লক্ষ্য। অর্জুনের শৈথিল্য নিরাকরণের জন্য ভগবান বলেছেন—মরিলে স্বর্গলাভ, রণে জয়ী হলে পৃথিবীর রাজ্যভোগ! অতএব কৌন্তেয় ওঠ, যুদ্ধের জন্য কৃত নিশ্চয় হও।

তার পর বহু উপদেশের মধ্যে শুনি—সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, জয়-পরাজয়কে সমান ভেবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তা'হলে পাপ গ্রহণ করতে হবে না।*

উত্তেজনা সমর্থনের জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে মানুষের আত্মা অবিনশ্বর। বেশ পরিবর্তন মাত্র দেহের পরিবর্তন। মৃত্যুরূপ বিভীষিকা অযথা জীবের প্রাণে। আত্মা শাশ্বত। পূর্ণ বিচারে নিঃসন্দেহ উপলব্ধি হয় যে দেহের বিনাশে আত্মা বিনষ্ট হয় না। এ শিক্ষার পরই বলা হয়েছে—অতএব যুদ্ধ কর, জীবনের উপাদান কর্ম। কর্মত্যাগ কায়মনো-বাক্যে অসম্ভব, তাই ভগবান শিক্ষা দিলেন নিষ্কাম কর্মের। যুদ্ধ বিনাশ কিন্তু সে কর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। সে কর্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হ'লে মনকে লাভালাভের ক্ষণিক সুখদুঃখের গণ্ডীর বাহিরে নিয়ে যায়। যুদ্ধরূপ হিংসাত্মক কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য, যেথায় ধর্ম এবং সাংসারিক অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা—সংগ্রাম অনিবার্য্য।

সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত যে গীতার শিক্ষা সকল ক্ষেত্রে একান্ত অহিংসার শিক্ষা নয়। কিন্তু সমস্ত গীতাশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করলে প্রশ্ন ওঠে—সে নির্দেশ হিংসা-প্রবৃত্তির, না হিংসা-নিবৃত্তির।

গীতা শিক্ষা দিয়াছেন ব্রহ্ম তাঁর স্বভাব বা প্রকৃতির কর্মে ভূত-সৃষ্টি

* অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
তত স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপং অবাপ্স্যসি। ২।৩৩

* গীতা ২।৩৭-৩৮

করেন এবং সেই সৃষ্টির মাঝে নির্লিপ্তভাবে তাঁর অধিষ্ঠান। আমাদের শাশ্বত অবস্থা লাভের যে ক্রিয়া তার সচেতন অনুষ্ঠাতা অধিদেবতা। সেই অধিদেবতা ঈশ্বর। ব্রহ্ম অক্ষর। পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়-উপভোগ্য জগৎ-ক্ষর। জ্ঞান ভক্তি এবং যোগের সাধনায় জীব ক্ষর ভাব এড়িয়ে পঁহুছিতে পারে অক্ষর। অন্তকালে তাঁকে অনুস্মরণ করলে মুক্তি পাওয়া যায়।

এই দার্শনিক তত্ত্ব উপদেশ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—যে ভাব স্মরণ করে মানুষ দেহত্যাগ করে অন্তে সে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সদা সেই ভাব চিন্তার ফলে। সুতরাং সর্ব্ব সময়েই আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। আমাতে মন এবং বুদ্ধি সমর্পণ ক'রে (যুদ্ধ করলে) নিশ্চয়ই আমাতেই মিলিত হবে।*

এর সার শিক্ষা—যেহেতু কর্ম জীবনের সাথী এবং যুদ্ধ যেহেতু কর্ম, আবশ্যক হলে যুদ্ধ করতেই হবে। কিন্তু চিরদিন শ্রীকৃষ্ণে মন সমর্পণ করে জীবনপথে পরিভ্রমণ করে জীব, মরণের সময় রণক্ষেত্রে প্রাণদান করলেও তার মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী, যদি মৃত্যুকালে যোদ্ধা এক অক্ষর ব্রহ্মকে স্মরণ করতে পারে। তেমন অনুস্মরণও অসম্ভব নয়। কারণ মানুষ সর্বদা যে মূল চিন্তায় আত্মনিয়োগ করে, মৃত্যুকালে তার মনে উদয় হয় সেই চিন্তা। অতএব সদা ঈশ্বরের কথা চিন্তা করা নিজের চিন্তা-ধারার প্রধান বেগ ভগবদ্-চিন্তাকে নিজের ভাবধারার মধ্যে বহানোই মুক্তির উপায়। ভগবান স্মরণ ক'রে মৃত্যু রণস্থলে হ'ল কি মন্দির-প্রাঙ্গণে হ'ল—তাতে কিছু প্রতিবন্ধক বা সহায়তা লাভ হয় না মোক্ষ পথে। জ্ঞান প্রদর্শিত পথে ভক্তিপাথেয় নিয়ে নিষ্কাম কর্মে নিযুক্ত রাখতে পারলে আপনার কল্যাণময় হবে সংসারের পথ।

এই মর্মের শিক্ষা গীতার অন্যত্র দেখি। বিশ্বরূপ দর্শনের পরও অর্জুন শুনলেন—অতএব তুমি ওঠ। যশলাভ কর। শত্রু জয় ক'রে সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর। এরা পূর্ব হতে আমাকর্ত্তৃক নিহত হয়েছে। অতএব সব্যসাচী, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শেষে অর্জুনের মুখে আমরা যে কথা শুনি তা' হ'তে প্রতিপন্ন হয় যে যুদ্ধ করা অন্যায়, এরূপ যে মোহ তার চিত্তবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করেছিল সেটা একান্ত ভ্রান্ত মনোভাব। তা নষ্ট হ'য়েছে। কারণ পার্থকে বলতে শুনেছি—তোমার অনুগ্রহে মোহান্ধকার নিরাকৃত হওয়াতে আমি স্মৃতিলাভ করেছি। আমার সকল সন্দেহই দূর হয়েছে। তুমি যে উপদেশ দিলে আমি এখন তার অনুষ্ঠান করব।†

মোহগ্রস্ত অর্জুনের যুদ্ধপ্রবৃত্তির পুষ্টি গীতার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু সে প্রবৃত্তিকে নিষ্কাম ও অহিংসক করবার ব্যবস্থা সারা গীতা জুড়ে। সমর-ক্ষেত্রে এবং বিশ্ব-সংসারে কিরূপে মানসিক শান্তি লাভ করতে পারা যায়, সে শিক্ষাতে এ শাস্ত্র পূর্ণ। বিশদ তালিকা আছে কর্ত্তব্যের—যার সাধনায় মুক্তি অনিবার্য্য। সংসার নিত্য কর্মের কুরুক্ষেত্র।

অর্জুনকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—যার দ্বারা কোনো লোক সন্তপ্ত হয় না, অন্য লোক হ'তেও যে সন্তাপ পায় না, হর্ষ, অসহিষ্ণুতা, ভয় এবং উদ্বেগ হ'তে যে মুক্ত সে আমার প্রিয়।

আরও বলেছেন—অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথা হ'তে যিনি মুক্ত, যে ভক্ত সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী সে আমার প্রিয়।*

অনপেক্ষ হিংসামুক্ত। কারণ নিন্দা স্তুতি বা বৈরিতা তার চিত্তের স্থিরতায় চাঞ্চল্য আনতে পারে না। দ্বেষের একটা কারণ উপেক্ষা-জনিত নিরাশা। অনপেক্ষ নিস্পৃহ, কামনা-শূন্য। সদাই আমরা কামনা করি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু মিত্র বা রাষ্ট্র-শক্তির সহায়তা। অনায়াসলব্ধ অভিপ্রেতে মানুষ তুষ্ট নয়। প্রেম বা সাহচর্য্যে তার তৃপ্তি হয় না, যার কাম্য পরের সহায়তা। সে কামনার ব্যর্থতা আঘাত করে তাকে, সহায়তা যার কাম্য। প্রত্যাশীকে মাত্র কাতর ক'রে এ নিরাশা বিলুপ্ত হয় না। পরিণাম নিরাশা উদ্রেক করে ক্রোধ। পরের উদাসীনতা ব্যর্থতা আনে। মনে জন্মে বিরাগ। বৈরিতা জন্মে চিত্তে। অনপেক্ষের সে ভয় নাই। তেমনি বৈরিতা হ'তে মুক্ত শুচি দক্ষ, উদাসীন ও গতব্যথের মানস ক্ষেত্র।

তাই নিষ্কাম কর্মের নির্দেশ। কারণ ভগবান বলেছেন—বিষয়ের চিন্তায় আসে আসক্তি। আসক্তি উৎপন্ন করে কামনা। কামনা হ'তে জন্মে ক্রোধ। ক্রোধ পরিণত হয় সম্মোহে। সম্মোহ হ'তে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হ'তে বুদ্ধিনাশ—যার অনিবার্য্য ফল বিনাশ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্তের লক্ষণ বর্ণনায় সেই বাণী শুনি, যে বাণী শ্রীমদ্ভাগবৎ তাঁর মুখে শুনিয়েছেন প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে।

সর্ব্বভূতের প্রতি দ্বেষহীন, সর্ব্বজীবে যাঁর মৈত্রী ও করুণা, যিনি স্বার্থ শূন্য নিরহঙ্কার, সুখে দুঃখে যিনি সমভাব, যিনি ক্ষমাশীল, সদাতুষ্ট, যোগী, যতাত্মা, দৃঢ়-নিশ্চয় এবং যাঁর মন ও বুদ্ধি আমাতেই অর্পিত সে ভক্ত আমার প্রিয়।‡

বৌদ্ধ শাস্ত্রে ভগবানে মন সমর্পণের ব্যবস্থা নাই। সে ধর্ম নিরীশ্বরবাদ; সুতরাং ঈশ্বরের প্রিয় হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন ওঠেনা। কিন্তু অহিংসা, মৈত্রী, করুণা, নির্বৈর ভাব প্রভৃতি আচরণ আর্য্য ও বৌদ্ধ ধর্মে সমভাবে বর্ণিত মুক্তি বা নির্বাণের উপায় নির্দেশে।

এই চরম নীতি আরও বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন—শত্রু ও মিত্রে, মানে ও অপমানে, শীতে ও উষ্মে যাঁর সমভাব যিনি সঙ্গবর্জ্জিত, নিন্দা ও স্তুতি যাঁর কাছে তুল্য মূল্য, যিনি মৌনী, যিনি যে কোনো অবস্থায় সন্তুষ্ট যিনি অনিকেত, স্থিরমতি এবং ভক্তিমান, এমন ব্যক্তি আমার প্রিয়।§

* গীতা ৮-৭

† গীতা—১৮।৭৩।

* গীতা—১২।১৪।১৬।

† গীতা—২।৩২।৩৩।

‡ অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ সুখ ক্ষমী।
সন্তুষ্ট সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়।১২।১৩।১৩

§ গীতা ১২।১৮-১৯
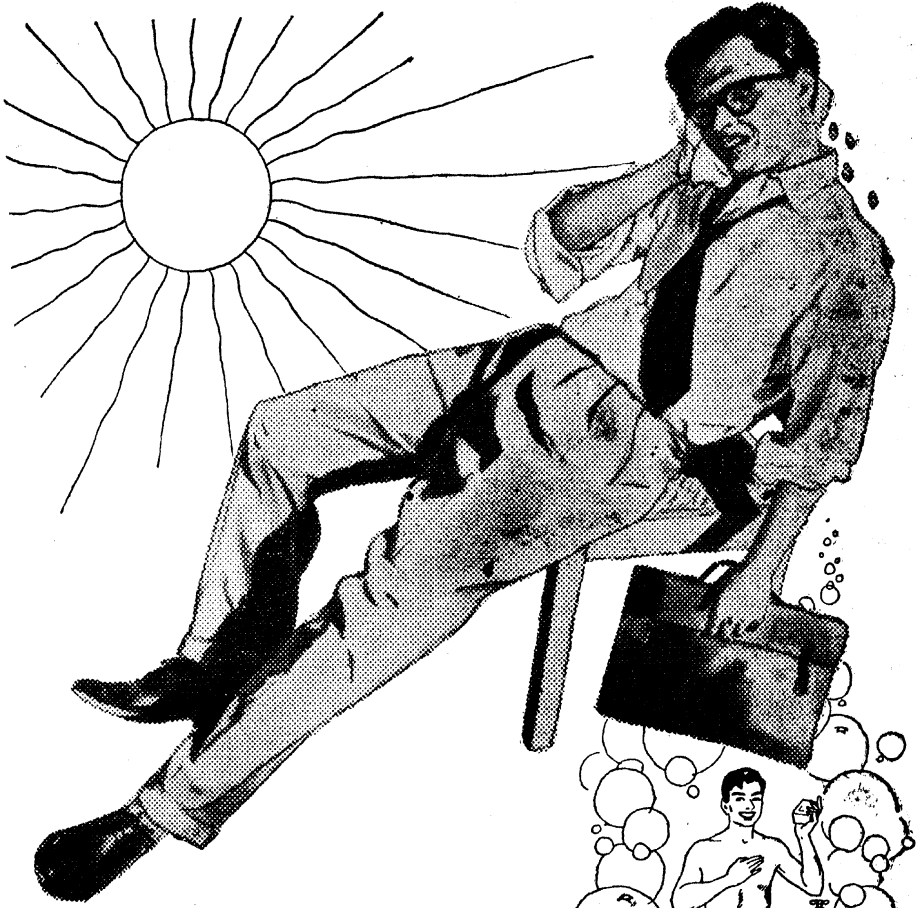
"লাইফবয় সাবান
দিয়ে এইবার চান্ করতে হবে"
-এটি সেই ঝরঝরে
তাজা ভাব এনে দেয়!
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
ভারতে প্রস্তুত
L. 253-X52 BG

দৈনিক জীবনে নীতির এ আদর্শ সকল যুগে সকল দেশে মানুষকে উন্নত করে। এ আদর্শ মনের পটে গেঁথে জীবন পথে যাত্রা হয় কল্যাণকর এবং মনোরম। কারণ আনন্দ ভূমায় এবং এ নীতি আত্ম-বিস্তারের অমোঘ আয়োজন। শত্রু মিত্রে সমভাব থাকলে তো হিংসার অবকাশ থাকে না। মানাপমান নিন্দাস্তুতির উর্দ্ধে থাকলে অবমানকারী বা নিন্দুকের উপর হিংসার উদ্রেক অসম্ভব। নিরীশ্বরবাদীর পক্ষেও এ বিধান শান্তির প্রস্রবণ। সকল জীবে সমতা সমদৃষ্টি। একতা বোধ বিশ্ব-বোধ। বিশ্ব-চেতনা ব্রহ্মবোধ। মান-অপমান, নিন্দা স্তুতি আপনাকে ঘিরে। আপনাকে বিস্তার করলে, পর হয় আপনার। অহংবোধ না থাকলে আমার স্তুতি বিশ্বমানবের স্তুতি।

আপনাকে জগতের কেন্দ্র হতে তুলে নিলে, সারা জগত হয় আমার, আমি এই বিশ্বব্যাপী, এ নীতি আরও বোঝাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—যে না মানে হর্ষ, না মানে দ্বেষ, যে শোকও করেনা, কামনাও করেনা, যে শুভ এবং অশুভ উভয়কেই পরিত্যাগ করে, এমন ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়। *

আমাদের নৈতিক জীবনের সাধনা সরল হয় মনের মাঝে ভক্তির দীপ জ্বেলে রাখলে। নীরস ভাব আনন্দের বরিষণে সরস হয়। আনন্দ যে ব্রহ্মের উপাধি। সে বরিষণের কারণ হয় ভক্তি। আনন্দ ভূমায়—বিরাটে মহতে। মহতের চিন্তায় বিরাটের সান্নিধ্য-বোধে সাধন ভজন হয় আনন্দধামে বিচরণ। মনের পটভূমিতে তাঁর মৈত্রী ও করুণার ছায়া থাকলে, পৃথিবীর স্বল্পায়ু আপাত-মনোরম অবস্থা প্রাণে হর্ষ আনতে পারেনা—কারণ মন পরিণত হয় শাশ্বত আনন্দ প্রয়াসে। যা সংসার-বুদ্ধিতে অপ্রিয় তার অনুভূতি আমাদের বিশাল যাত্রাপথ হ'তে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনা।

আত্ম-বিস্তৃতির প্রধান উপায় বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ—যার আলোচনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অহিংসা জীবনের মহাব্রত।—যিনি সর্বত্রই আমাকে দেখেন এবং আমাতেই সমস্ত দেখেন, আমার অস্তিত্ব তাঁর দৃষ্টিতে নাশ হয় না। আমি তাঁর পরোক্ষ হই না, তিনিও আমার পরোক্ষ হন না। *

অবশ্য এ অবস্থা যোগ-সাধনার পরিণাম। এ কথা বলা হবে বাতুলতা যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনীসেনা যারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিযুক্ত হয়েছিল তারা ছিল যোগী এবং তাদের দৃষ্টি ভঙ্গী ছিল যোগীর। কিন্তু দেশে সকল অবস্থায় যদি সর্বদা অহিংসা ও ভক্তির বাণী ধ্বনিত হয়, মানুষ একান্ত তুচ্ছ স্বার্থের হিংসাত্মক কু-প্রবৃত্তির উর্দ্ধে উঠতে পারে।

(ক্রমশঃ)

* গীতা ১২।১৭।

* যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।৬।৩০

কনট্রোল বিল্ডিং

শ্রীনীলাপদ ভট্টাচার্য্য

নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, বরিশাল,
মৈমনসিং, যশোর, খুলনা,
এক সাথে মিশেছে এখানে।
পাকা বড় সড়কের দুই পাশে সারি সারি বাড়ী,
ছোট ছোট অগণিত খাঁচার মতন।
নদী নেই, বন নেই, মাঠ নেই, পুকুরেও জল নেই
কেবল কলের ধারে দলে দলে ভীড়
অশোক নগর, কনট্রোল বিল্ডিং।
এখানে একটা ঘরে আমিও এলাম,
ছোট এই ঘর, এঘর আমার, এঘর ত' আমারই
তবু কেন মনে হয়
এই ঘর—এ ঘর আমার ত' নয়!

বর্ডার পার হয়ে দূরে বহু দূরে
নদীর কিনারে মন খুঁজে ফেরে,
কার ঘর?
অশোক নগরে দেখি লালফুল ফুটে আছে
অনেক অশোক গাছে।
সকাল বেলার রোদে ফুলগুলি
হাসে আর হাসে।
শিশুরা জাগিছে দলে দলে।
সরকার বেঁধেছে অনেক ঘর,
এই ঘর আমাদের নাই যদি হয়,
হবে জানি,
আমাদের শিশুদের।

শয়তান

শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ঠিক রুগীর পায়ের কাছটিতে, ডাক্তারের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছিল কৃষকটি। বৃদ্ধা রুগী মরা দৃষ্টি নিয়ে শুনছিল তাদের কথা। মৃত্যু তার আসন্ন, তাই সঠিক রোগটা জানবার জন্যে তার আকুল আগ্রহ। মরবে সে নিশ্চিত। এ তারও বিশ্বাস। বয়স তো আর কম হোলো না। বিরানব্বুইর ওপর।

খোলা জানালা দিয়ে জুলাইয়ের প্রচণ্ড রোদের হলকা মাটির মেঝেতে পড়ে ঘরের আবহাওয়া আরও গুমোট করে তুলেছে। গরম হাওয়ায় পোড়া মাটি আর সোঁদা ঘাসের গন্ধ ভেসে আসছে। বাইরে ফড়িং জাতীয় পোকা মাকড়ের একটানা ফর্‌ফর্‌ শব্দে আশপাশটা মুখর, সচকিত। অনেকটা বায়না করে করে ঘুমিয়ে-পড়া ছোট ছেলেদের ভীত নিস্তেজ একটানা নাক ডাকার মত।

ডাক্তার উত্তেজিত স্বরে বলছিল : দেখ হে, এ অবস্থায় তোমার মাকে কিছুতেই একা ফেলে যাওয়া উচিত নয়। যে কোন সময় এর মৃত্যু ঘটতে পারে।

: কিন্তু আমার যে এখুনি গম আনার প্রয়োজন? কৃষক শঙ্কিত হয়ে তার কথার পুনরাবৃত্তি করলে, একেই তো দেরী হয়ে গেছে। তবু আবহাওয়াটা এখন অল্প ভালো আছে। মা তোমার কি মত?

বৃদ্ধা এক পলক তার প্রতি চেয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে তার কথায়।

কিন্তু ডাক্তার ততক্ষণে ধৈর্য্য হারিয়েছে। মাটিতে পা ঠুকে চিৎকার করে বললে, তুমি একটি পশু। শুনতে পেলে কথাটা? আমি তোমাকে বারণ করছি অমন কাজ করতে। সত্যি যদি তুমি আজ গম আনতে যাও, তবে চালাকি বাদ দিয়ে অন্তত মাদার রেপেটকে এনে রেখে যাও। এটা আমার হুকুম। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? নইলে, আমি তোমাকে কুকুরের মত মরতে বাধ্য করবো, যখন তোমার অসুস্থতার পালা আসবে। ও হে—

কৃষকের লম্বা চওড়া মোটা দেহটা একবার নড়ে উঠলো। মনে মনে সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো ডাক্তারের ওপর। কারণ, মাদার রেপেটকে আনতে গেলেই আবার খরচা। তবু তো তো করে বললে, তা কত দাবী করবে মাদার রেপেট?

: তার আমি কি জানি। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো ডাক্তার। তুমি কতক্ষণ তাকে রাখবে, তার ওপরই খরচা নির্ভর করে। খরচার কথা বাদ দাও। বরং তার সঙ্গে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে এসো। মনে থাকে যেন, তোমার বেরুবার আগে এবং একঘণ্টার মধ্যেই কিন্তু তাকে নিয়ে আসতে হবে। শুনতে পেলে আমার কথাটা?

: বেশ। লোকটা যেন একটু সজাগ হোলো এবার। বললে—আপনি রাগবেন না। আমি যাচ্ছি।

: হ্যাঁ, যাও। পায়ের ওপর একবার পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে ডাক্তার। তোমার অবশ্য আরও যত্ন নেওয়া উচিত। দেখ, মেজাজ বিগড়ে গেলে কারুর নিন্দাকেই গ্রাহ্য করি না আমি। ওসব ভাঁড়ামী আমার নেই। এই আমার সোজা কথা।

ডাক্তার চলে যেতেই মা'র কাছে এগিয়ে গেল কৃষক। করুণ স্বরে বললে, আমি এখুনি মাদার রেপেটকে নিয়ে আসছি। তুমি কিছু ভেবো না।

পরক্ষণে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মাদার রেপেট জাতে ধোপা। সেই সঙ্গে তার আর

একটা কাজ ছিল আশে পাশের বাড়ীর এবং গ্রামের রুগী এবং মৃতের উদ্ধারক করা। ধোপার কাজটা তার গৌণ, তবে ভড়ং ছিল। কোন সম্ভাব্য খরিদ্দারকে তার উদ্দেশে আসতে দেখলেই সে এমনভাবে ইস্তিরি ঘসা বা কাপড় কাচা শুরু করে দিত, দেখলে মনে হবে যেন তার মরবার পর্য্যন্ত সময় নেই। মুখখানা সর্ব্বদা গম্ভীর করে রাখতো। যেমন ছিল দম্ভ, তেমনি খিটখিটে তার মেজাজখানা। মায়া দয়া বলতেও তেমন কিছু ছিল না। এমন কি কারুর চরম ক্ষতি হলেও তার কিছু আসতো যেতো না। বরং উল্টে তার বিরূপ সমালোচনা করে বসতো। আর সর্ব্বদাই তার মুখে নিজের বিজ্ঞতার কথা, কর্ম্মক্ষমতার কথা লেগেই ছিল। শিকারীদের মতই সে খুঁটে খুঁটে তার ইতিহাস বলতো যার তার কাছে।

যখন কৃষক বনটেম্পস তার বাড়ী ঢুকলো, মাদার রেপেট তখন কতকগুলি জামা-কাপড়ে নীল দিচ্ছিল। চোখাচোখি হতেই বনটেম্পস বললে—এই যে নমস্কার। আশা করি শরীর সুস্থ আছে।

যেন হঠাৎ দেখলে কৃষককে মাদার রেপেট। অস্ফুটে বললে, "ওঃ, তা—তা তুমি ?"

: হাঁা, আমি ভালই আছি। কিন্তু মা'র অসুখটা বড় বেশী সুবিধের নয়।

: তোমার মা'র ?

: হাঁা, আমার মা'র।

: কি হয়েছে তার ?

: প্রায় যায় যায় অবস্থা। টেঁকে কিনা বলা দায়।

মাদার রেপেট নীল জল থেকে হাত দু'টো তুলে, খানিক চেয়ে রইলো আঙুল চুইয়ে পড়া নীল ফোঁটাগুলির দিকে, তারপর সহানুভূতির সুরে প্রশ্ন করলে, "অবস্থা কি খুবই খারাপ ?"

: ডাক্তার তো বললে, বিকেল পর্য্যন্ত টেঁকে কিনা সন্দেহ।

: তা'হলে তো খুবই খারাপ অবস্থা। মাদার রেপেট হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

কৃষক একটু ইতস্তত করলে। সোজাসুজি কথাটা বলতে চায় না সে। তবু শেষ পর্য্যন্ত মনস্থির করলে। নীচু স্বরে বললে, "তা, রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত তুমি কত দাবী কর ? তুমি তো জান আমার অবস্থা। সামান্য একটা চাকর রাখাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কিছু বা করতে পারি মার জন্যে বল।

: দু'রকমের মূল্য সাধারণত আমি দাবী করে থাকি। ব্যবসায়ী-সুলভ স্বরে উত্তর দিলে মাদার রেপেট। উচ্চ মধ্যবিত্তদের জন্যে দিনে দু' ফ্রাঁ, রাত্রে তিন ফ্রাঁ। আর ছাপোষা লোকদের দিনে এক ফ্রাঁ এবং রাত্রে দু' ফ্রাঁ। এটাই আমার বাঁধা নিয়ম। তা তুমি না হয় শেষেরটাই দিও।

কৃষক বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো মাদার রেপেটের কথা শুনে। কারণ সে ভালোভাবেই জানে, তার মা এখনও বেশ সুস্থ। ডাক্তারের মতে একদিন কেন, কম করে অন্তত এক সপ্তাহও বাঁচতে পারে রুগী !

অনেকটা সময় ভেবে নিয়ে এক সময় মুখ খুললে কৃষক। বললে, না। বরং তুমি একটা সঠিক দর দাও, যাতে শেষ পর্য্যন্ত চলতে পারে। অবশ্য তোমার সঙ্গে এই দর কষাকষিটা আমার কাছে জুয়া খেলার মত মনে হচ্ছে, কিন্তু কি কোরবো বল। রুগীর দিকেও তো চাইতে হবে। ডাক্তার অবশ্য নোটিশ দিয়েই গেছে। যদি সত্যি তাই হয়, তা' হলে তোমার পক্ষেই মঙ্গল এবং বলতে লজ্জা পাচ্ছি, আমার পক্ষে দুঃসংবাদ বিশেষ। অবশ্য উল্টোটিও হতে পারে।

এবারে চিন্তিত হবার পালা মাদার রেপেটের। মৃত্যু পর্য্যন্ত চুক্তি তার কাছে এই প্রথম। এ যেন সত্যি এক ধরণের জুয়া খেলা। তাই একটু ইতস্তত করে বললে: "দেখ রুগী না দেখে, আগে থেকে এ সম্বন্ধে কোন কথা দিতে পারি না আমি।"

: বেশ তো ? বললে কৃষক। দেখে শুনেই না হয় একটা দর দিও ?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দু'জনে এসে পথে নামলো। মাদার রেপেট আগে আগে, বনটেম্পস পেছনে পেছনে। কিন্তু পথে কোন কথা হোলো না দু'জনের।

কিন্তু বাড়ীতে পা দিয়েই অস্ফুটে আর্ত্তনাদ করে উঠলো কৃষক: ভয় হচ্ছে, এর মধ্যেই না বুড়ি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে।

মনে হোলো, অবচেতন মন তাতে উৎফুল্ল হয়েই সায় দিল। আহা, সত্যি যদি এর মধ্যে একটা কিছু হয় ?

কোট খুলে রাখতে
লজ্জা করে
মোহন কোটি খুলছেনা কেন?
শুনছ! কোট খুলে ফেল!
আমি পারব না!
কেন কি হয়েছে?
আমার শার্ট
যে ছেঁড়া—
আর কেনবার
হুঁঃ! নিশ্চয়ই ঠিক-মত কাচা হয়নি!
কিন্তু আমার স্ত্রী ত যথারীতি আছড়ে কাচে।
যা বলছি শোনো, আছড়ে কাচলে যে কোনও কাপড়েরই সুতা কেটে যায় আর তা ফেঁসে ও ছিঁড়ে যায়। না আছড়ে সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনায় কেচে দেখ, কখনই অত শীগ্‌গির ছিঁড়বে না।
বাধিত হলাম, ভাই!
মিসেস মোহনঃ
সানলাইটে সত্যিই না আছড়ালেও কাপড় সাদা ও ঝকঝকে ক'রে কাচা যায়। এখন আমাদের কাপড়-চোপড় টেঁকেও বেশীদিন। সানলাইট পয়সা ও পরিশ্রম বাঁচায় বটে!
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে
ভারতে প্রস্তুত

কিন্তু বুড়ি তখনো মরে নি। দিব্যি সে পেছনের একটা ভাঙা তোরঙ্গে হেলান দিয়ে শুয়ে রয়েছে ক্লান্ত হয়ে।

মাদার রেপেট এগিয়ে গিয়ে দেখতে লাগলো বুড়িকে। হাতের নাড়ি টিপলো, বুকে শব্দ করে পরীক্ষা করলো, গম্ভীর ভাবে নিরীক্ষণ করলো শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রণালী। তারপর কোন কথা না বলে গম্ভীর ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালো। ভেতরে ভেতরে সে বেশ বুঝেছে, বুড়ির আয়ু আর বেশীক্ষণ নেই। তবু সেটুকু প্রকাশ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

: কেমন মনে হচ্ছে? আস্তে কাছে এসে প্রশ্ন করলে কৃষক। বাঁচবে কি আর?

: হ্যাঁ। মনে হচ্ছে যেন আরো দিন দুই বাঁচবে বুড়ি। তিন দিনও হতে পারে। বললে মাদার রেপেট। অতএব সবসুদ্ধ ছ ফ্রাঁ পেলে আমি কাজ করতে পারি।"

: ছ' ফ্রাঁ? যেন আর্ত্তনাদ করে উঠলো কৃষক। বল কি! তুমি কি পাগল? আমি তো আগেই বলেছি —আজকের দিনটাই বুড়ির কাটে কিনা সন্দেহ।

মাদার রেপেট কিছুতেই একচুলও নড়লো না তার কক্ষ থেকে। বেশ কিছুক্ষণ তাই নিয়ে তুমুল বচসা চললো, কিন্তু হোলোনা কিছুই। শেষ পর্য্যন্ত ঐ ছ' ফ্রাঁতেই রাজী হতে হোলো কৃষককে। বললে: বেশ, ঐতেই আমি আমি রাজী। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমায় তোমার কর্ত্তব্য করে যেতে হবে।

তারপরই লম্বা লম্বা পা ফেলে বনটেম্পস বেরিয়ে গেল মাঠের উদ্দেশে।

মাদার রেপেট আবার ফিরে এলো ঘরে। দরকারী ব্যাগটা হাতেই থাকে তার। তার মধ্যে রুগীর জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র থেকে শেলাইর ছড় কাঁটা পর্য্যন্ত। শেলাইটাও তার ব্যবসার একটি অঙ্গ বিশেষ। সেই ব্যাগটি একপাশে রেখে বুড়িকে প্রশ্ন করলে মাদার রেপেট: "মাদার বনটেম্পস, তুমি কি আগেই তোমার প্রার্থনা শেষ করেছ?"

বৃদ্ধা মরা ছাগলের দৃষ্টি তুলে তাকালো তার দিকে একবার, তারপর অসম্মতি জানালে ঘাড় নেড়ে।

: এ্যাঁ? সর্ব্বনাশ! কি বলছো তুমি! মরতে চললে, অথচ এ কাজটাই করনি এখনো। মুহূর্ত্তে লাফিয়ে উঠলো ধর্ম্মপরায়ণা মাদার রেপেট। তারপরই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বকতে বকতে চলে গেল: এখুনি আমি পুরুত মশাইকে ডেকে নিয়ে আসছি।

ভাবখানা এই, যেন, এখুনি বুড়ি মরে যাবে।

গির্জ্জায় গিয়ে সব কথা বলতেই পুরুত মশাইও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বহির্বাস চাপিয়ে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে পড়লো মাদার রেপেটের পেছু পেছু। পেছনে তার গাইয়ে শিষ্য একজন। ঘণ্টার আওয়াজ শুনে আশে পাশের সবাই শোকের আভাস পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। তারপর বুকে ক্রশ এঁকে করলে প্রার্থনা। কেউ কেউ টুপি খুলে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানালে।

কৃষক বনটেম্পস মুখোমুখি পড়তেই সে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে "ফাদার, এখন ব্যস্ত হয়ে চললেন কোথায়?"

একবার থমকে দাঁড়ালো পুরুত। অবাক হয়ে বললে: সে কি, তুমি জান না? তোমার মা'র কাছেই তো যাচ্ছি।

: ও, তাই হবে। বললে কৃষক। কিন্তু অবাক হয়েছে বলে মনে হোলো না তাকে। বরং আবার সে নিশ্চিন্তে তার কাজে মন দিল।

মাদার বনটেম্পস ধর্ম্ম সাক্ষী করে তার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে প্রার্থনা জানালে যিশুর কাছে। মৃত্যু-যাত্রীর এটাই নিয়ম। আর মাদার রেপেট তখন ঘন ঘন রোগীকে দেখে ভাবতে লাগলো, বুড়ি যদি আবার বেশী করে বাঁচে? ভাবতেও কাঁটা দিয়ে উঠলো তার সারা দেহ। তা হলেই তো চরম ক্ষতি।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চমৎকার আরামের বাতাস আসছে বাইরে থেকে। সে হাওয়ায় উড়ছে ঘরের ফ্যাকাশে হলদে পর্দ্দা, এটা ওটা।

মাদার রেপেট বসে বসে দেখছে বুড়িকে। কোন পরিবর্ত্তনের লক্ষণ নেই তার মুখে চোখে। যেন নিশ্চিন্তে সে মৃত্যুরই অপেক্ষা করছে।

একটু রাত করেই বাড়ী ফিরলো কৃষক। মা'র কাছে গিয়ে দেখলে, ঠিক সে বেঁচে আছে। খুব খুসী হোলো না সে। তবু উদাস হয়ে জিজ্ঞেস করলে, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি? কিন্তু তার উত্তর শুনবার জন্যে অপেক্ষা না করেই মাদার রেপেটকে উদ্দেশ্য করে বললে, দেখছি

বেঁচেই আছে বুড়ি। আজ তুমি যেতে পার, কিন্তু কাল সকালেই তোমায় আসতে হবে।

: ঠিক আছে। বললে মাদার রেপেট। ঠিক পাঁচটায়ই আসবো আমি। তারপর বেরিয়ে গেল সে।

পরদিন ঠিক সময়েই এলো। কৃষক মাঠে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে প্রশ্ন করলে—আশা করি আজও সে বেঁচেই আছে?

: হ্যাঁ। গম্ভীর হয়ে কথাটা উচ্চারণ করেই সে তর্‌তর্‌ করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রথমটা গুম্‌ হয়ে রইলো মাদার রেপেট। তারপর কাছে গিয়ে বুড়িকে প্রশ্ন করলে, কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছো কি?

বৃদ্ধা উত্তর দিল না। মাদার রেপেট কিন্তু বুঝলো, আজ কেন, দু' এক দিনের মধ্যেও তার যাবার ঠিক নেই। মনে মনে সে যেমন শঙ্কিত হোলো, তেমনি হয়ে উঠলো কুটিল। তবু সে তার কর্ত্তব্য করে যেতে লাগলো। আর ঘন ঘন বুড়িকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

কৃষক একবার দুপুরের দিকে এসেছিল। তখন তাকে বেশ প্রফুল্লই দেখাচ্ছিল। মনে হয়, ভাল গম উঠেছে এবার।

মাদার রেপেট ক্রমশ উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল বুড়ির ওপর। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। ত্রস্তে বুড়ির কাছে গিয়ে বললে, আচ্ছা, তুমি কোনদিন শয়তান দেখেছো? শয়তান?

মাদার বনটেম্পস অস্ফুটে বিরক্তি প্রকাশ করে বললে, না।

এই সুযোগ। মনে মনে আশান্বিত হয়ে উঠলো মাদার রেপেট। গল্পের ছলে শুরু করলো মৃত্যুর সময় যমদূত কি বিকট রূপে মৃতের সামনে উদয় হয়ে ভয় দেখায়। ঘন ঘন আসা যাওয়া ক'রে রুগীর মনের জোর একদম ভেঙ্গে দেয়। রূপটাও বললে। হাতে থাকে একটা ঝাঁটা, মাথার ওপর রান্না করবার অকেজো পট, মুখখানা বীভৎস। তাই নিয়ে রীতিমত সে যুদ্ধ শুরু করে দেয় রোগীর সামনে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেশ রসিয়ে অভিনয় সহযোগে এ সব বললে মাদার রেপেট। বুড়িও বেশ মন দিয়েই শুনলে সব। তারপরই অকস্মাৎ লাফ দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসেই ভয়ে চিৎকার করে উঠে দরজার দিকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে রইলো।

আর সেই সুযোগে মাদার রেপেট ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়ে একটা কাঠের বাক্স থেকে মাথায় তুলে নিলে একটা অকেজো পট, দরজার পাশ থেকে নিলে ভাঙা ঝাঁটা বাঁ হাতে, আর ডান হাতে নিলে একখণ্ড কাঠ। তারপর সেই কাঠ দিয়ে মাথার ওপরকার পটটা পিটতে শুরু করে দিলে। সেই সঙ্গে এটা লাথি মেরে, ওটা কাঠের আঘাতে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ফেলতে লাগলো। আর ফাঁকে ফাঁকে বাঁ হাতের ঝাঁটাটা বুড়ির মুখের সামনে নিয়ে ভয় দেখাতে লাগলো।

বুড়ি পেছন ফিরে সে দৃশ্য দেখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিকট এক চিৎকার করে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লো।

বেশ খানিকটা পরে মাদার রেপেট সব কিছু আবার আগের মত গুছিয়ে রেখে বুড়ির কাছে গিয়ে ভালো করে তাকে পরীক্ষা করলো। ক্রমে তার মুখে হাসি ফুটলো। হ্যাঁ, তার আশা পূর্ণ হয়েছে। সব শেষ।

এবার সে তার কর্ত্তব্যানুযায়ী বৃদ্ধার ভীত বিহ্বল চোখের পাতা দু'টি বুজিয়ে দিয়ে বেশ মন দিয়ে প্রার্থনা করলে, যাতে বুড়ির আত্মা যিশুর কোলে আশ্রয় পায়। তারপর পাত্র থেকে খানিকটা জল নিয়ে ছিটিয়ে দিলে বুড়ির দেহে। এখন মাদার রেপেটকে দেখে আর চিনবারই উপায় নেই।

কৃষক বাড়ী ফিরে দেখলে মাদার রেপেট প্রার্থনা করছে একমনে। ব্যাপারটা বুঝতে তার দেরী হোলো না। সঙ্গে সঙ্গে তার মন দুঃখের বদলে হুতাশে ভরে উঠলো। কারণ দিনক্ষণ অনুযায়ী তার খরচ কমই হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাদার রেপেটের সঙ্গে দিনক্ষণ ছাড়াই দরদস্তুর হয়েছে এবং তা ঐ দু'ফ্রাঁ। দিনের হিসেবে যা হওয়া উচিত পাঁচ ফ্রাঁ।

মনে মনে একবার গভীরভাবে অনুতাপ করলে কৃষক। এত হিসেব করে, চালাকি করে, এমন কি সাবধান হয়েও সত্যি সত্যি তার নগদ একটি ফ্রাঁ লোকসানই হোলো।*

---

* গী দ্য মোপাসাঁর ডেভিল অবলম্বনে

কানাইলাল ঘোষের 'শরৎচন্দ্র'

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

(১)

কানাইবাবু বলেছেন, শরৎচন্দ্র অল্প বয়সে যখন ভাগলপুরে তাঁর বাবার কাছে থাকতেন, তখনই তিনি একজন ঘোরতর মদ্যপ হয়ে উঠেছিলেন। এ সম্পর্কে কানাইবাবু লিখেছেন—"ঘরের একটা কোণে ভাঙা একটা বাক্সের মধ্যে স্তূপাকার করা মদের বোতল।...ঘুরছেন ফিরছেন আর একবার করে চুমুক দিচ্ছেন বোতলে।" শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে ছিলেন, তখনকার কথায় কানাইবাবু আবার এক গল্প ফেঁদে শরৎচন্দ্রকে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মদ্যপ করে ছেড়েছেন। কানাইবাবু লিখেছেন—এক গোয়ানীজ সাহেব চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, সারা এশিয়ায় এমন কেউ নেই যে, তাঁর সঙ্গে মদের নেশায় প্রতিযোগিতা করতে পারে। শরৎচন্দ্র এই কথা শুনে তাঁর সঙ্গে বাজী লড়তে গিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতায় বসে দুজনে একটানা বোতলের পর বোতল মদ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ভোরের দিকে সাহেব মদ খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত মারা গেলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু অটল রইলেন।

কানাইবাবু তাঁর গ্রন্থে পার্বতী নাম্নী একটি বিধবা যুবতীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রেমের এক দীর্ঘ চিত্র এঁকেছেন। এতে কানাইবাবু লিখেছেন—শরৎচন্দ্র শীতকালে রাতদুপুরে ঘোড়ায় চড়ে তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছেন। যেতে যেতে ঘোড়া-শুদ্ধ নদীর জলে পড়ে গেলেন, তবুও ফিরলেন না। সেই শীতের রাতে ভিজে জামা কাপড়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতেই পার্বতীর কাছে গেলেন। পার্বতী যদিও শরৎচন্দ্রের ঐ আগমনবার্তার কিছুই আগে জানতো না, তবুও সে বাড়ীর সকলকে লুকিয়ে ঠিক ঐ সময়টাতে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল। সামনে এসেই পার্বতী চমকে উঠলো। বললে—একি? এত রাতে চান করে এলে যে?

শরৎচন্দ্র খুশিভরা হাসি হাসলেন। বললেন—সবই কপাল পারু। নইলে ঘোড়াটা পড়লো জলে ঝাঁপিয়ে?

পার্বতী চঞ্চল হয়ে উঠলো। লোকলজ্জার কথা ভুলে গেল। বললো—আর একটি মিনিটও এখানে নয়। চলো ওপরে।

বাড়ীর দাস-দাসী থেকে আরম্ভ করে সকলেই গভীর নিদ্রাসুখে মগ্ন। শুধু দুটি প্রাণী উঠে এলেন নিঃশব্দে। পার্বতী নিজের হাতে পোষাক বদলে দিল। তারপর ধীর পদক্ষেপে উভয়েই নীচের খাবার ঘরে প্রবেশ করলেন।

মোমের বাতিটা জ্বালিয়ে আসন পেতে দিল পার্বতী। বললো—একটু বসো। খাবারগুলো গরম করে নিই।

শরৎচন্দ্র বাধা দিয়ে বললেন—আর মোটেই দেরী সইছে না। পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো জ্বলে যাচ্ছে—কখন খেয়েছি সেই সকালে। দাও কিছুতো অন্ততঃ পেটে দিই। একটু থেমে বললেন—কিন্তু আমি যে আসবো, তোমায় তাকে জানিয়ে দিল পারু?

পার্বতী হাসলো। বললো—আমার মন।

শরৎচন্দ্র আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে সাহসী হলেন না। কারণ ভালবাসার রীতিই তো এই। নিঃশব্দে আহার শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন।

পার্বতী বাতিটা এগিয়ে দিয়ে বললো—সবই সাজিয়ে রেখে এসেছি। এবার শুয়ে পড়গে যাও। অনেক রাত হলো।

আর একটি গল্পে কানাইবাবু লিখেছেন—"শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময় তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে শহর থেকে দূরে জাহাজে পাড়ি দিয়ে কোন এক স্থানে এক পতিতালয়ে যেতেন।" একবার শরৎচন্দ্র সেখান থেকে প্লেগ নিয়ে ফিরলেন। বাড়ীতে এসে শরৎচন্দ্রের "পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়। নিরুপায়ে কাতরাতে থাকেন। উত্থানশক্তি রহিত জ্ঞানও রয়েছে একটু। অসহ্য যন্ত্রণায় একবার ওঠেন, একবার বসেন শেষে মরিয়া হয়ে পাশের র‍্যাকে যে দু বোতল কেরোসিন তেল ভর্তি ছিল, তাকে জল ভেবে ঘট্ ঘট্ করে সবটুকু শেষ করে ফেললেন।"

এই ধরণের বহু আজগুবি গল্প রচনা করে কানাইবাবু তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। গল্পগুলি একেবারেই যে মিথ্যা ও অবাস্তব তা পড়লেই বোঝা যায়। যেমন—শরৎচন্দ্র তাঁর ১৭।১৮ বছর বয়সের সময় যখন তাঁর বাবা, ভাই ও বোন সকলের সঙ্গে একত্র থাকতেন, সেই সময় ঘুরছেন ফিরছেন মদের বোতলে চুমুক দিচ্ছেন এবং এত মদ খাচ্ছেন যে ঘরের কোণে মদের বোতল স্তূপাকার হয়ে যাচ্ছে—একথা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোকে বিশ্বাস করতে পারেন না। প্রথমতঃ শরৎচন্দ্রের বাবা সব সময়েই বাড়ীতে থাকতেন, (তিনি কোন কাজ করতেন না।) তাঁর সামনে শরৎচন্দ্র মদ খেতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ ঐ সময় শরৎচন্দ্রের পিতা যেমন অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, শরৎচন্দ্রও তেমনি তখন কিছুই উপার্জন করতেন না। অতএব অত মদের পয়সা আসবে কোথা থেকে? পার্বতীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রেমের কাহিনীটিও এমনি এক অবিশ্বাস্য ঘটনা বলেই মনে হয়। কাহিনীটির মধ্যেকার অবাস্তবতা ও সঙ্গতি-হীনতা থেকেই সে কথা বলা যেতে পারে। আর পতিতালয়ে গিয়ে সেখান থেকে প্লেগ নিয়ে এসে, সজ্ঞানে দু বোতল ভর্তি কেরোসিন তেল ঘট্ ঘট্ করে খেয়ে নেওয়া—এ কাহিনীও একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হয়।

কানাইবাবুর বইয়ের আগাগোড়া ভর্তি এই আজগুবি গল্পগুলির প্রত্যেকটি ধরে আলোচনা করতে গেলে কানাইবাবুর বইয়ের ন্যায় আর

একটি বই হয়ে যায়। ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় সেরূপ বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নয়। তাই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কানাইবাবুর রচিত আর একটি মাত্র আজগুবি গল্পের আলোচনা করে এইখানেই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।

গত মাসের ভারতবর্ষে আমি দেখিয়েছি যে, কানাইবাবু সামান্যমাত্র সূত্র পেলেই, তা থেকে বানিয়ে বানিয়ে কেমন গল্প রচনা করতে পারেন। এখন দেখাচ্ছি সূত্র ছাড়াই সম্পূর্ণ মিথ্যা করে বানিয়ে কি ভাবে গল্প রচনা করেছেন। আর এই মিথ্যা গল্পে রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত জড়াতে একটুও ইতস্ততঃ বোধ করেন নি। এখানে কানাইবাবুর রচিত ঐ গল্পটি হুবহু উদ্ধৃত করা গেল। কানাইবাবু লিখেছেন—

"…সেবার ঠিক হ'ল শিবপুরে রবীন্দ্রনাথের একটা জয়ন্তী উৎসব করা হবে। উদ্যোগী হলেন অনুরূপবাবু, নীলরতনবাবু, আরও পাড়ার উৎসাহী যুবকবৃন্দ। তাদের পাণ্ডা হলেন শরৎচন্দ্র। তিনি নিজে চিঠি দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আনানোর ব্যবস্থা করলেন।

লক্ষ্ণৌ থেকে আনা হ'ল বাইজী, তারই সঙ্গে এলো পরিচিত আট দশ বছরের একটি বাঙালী মেয়ে।

ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ। কিন্তু বিঘ্ন ঘটালো তবলচী। কথা ছিল আসার, কোন কারণবশতঃ তা আর সম্ভব হয়ে উঠলো না। কলকাতার নামজাদা বাজিয়েদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হ'ল।

নাচ সুরু হ'ল। রবীন্দ্রনাথ সামনে বসে আছেন তাকিয়াটা হেলান দিয়ে। মেয়েটি নাচতে নাচতে মাঝে মাঝে থেমে যেতে লাগলো—মুখে ফুটে উঠতে লাগলো বিরক্তির ছায়া!

সবাই বুঝলেন তাল কেটে যাচ্ছে। অথচ সে আসরে তাঁর সামনে তবলা ধরতেও সাহসী হচ্ছে না কেউ।

দুবার মেয়েটি নাচতে নাচতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল! রবীন্দ্রনাথের অসম্মান করা হচ্ছে ভেবে শরৎচন্দ্র আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। একটি হাই তুলে ডাক দিলেন, অনুরূপ!

অনুরূপবাবু ছুটে এলেন। শরৎচন্দ্র বললেন—একটু আফিং নিয়ে এসো। নীলরতন গেল কোথায়? তাকে মাঝে মাঝে বরং একটু চা যোগাতে বলো।

নাচ সুরু হ'ল। তাল আর কাটে না। সভা নিস্তব্ধ হয়ে পড়লো। শুধু শোনা যেতে লাগলো—তবলার বোল আর ঘুঙুরের ঝুম্ ঝুম্ শব্দ।

এলো পেশাদার বাইজী। শরৎচন্দ্র অটল-অচল। নাচ যখন থামলো, তখন ভোর হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলেন তাঁর এই অসাধারণ শক্তির পরিচয় পেয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন—এমন সুন্দর বাজাতে কোথায় শিখলে শরৎ?

শরৎচন্দ্র উত্তরে মৃদু হাসলেন। বললেন, আমার যা কিছু সঞ্চয় সবই বর্মামুলুকে, ভারতী!

অনুরূপবাবু ও নীলরতনবাবু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন—কার কাছে শিখেছিলেন?

শরৎচন্দ্র সহাস্যে উত্তর দিলেন—শিখেছিলাম লক্ষ্ণৌর এক তবলচীর কাছে। তিনি বলতেন—এটা হ'ল, হয় আমীর, না হয় ফকিরের কাজ। আমি তো সেখানে ফকিরই ছিলাম নীলু!

উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে হাসিতে যোগ দিতে পারলেন না।

বৈকালে রবীন্দ্রনাথ সকলকে এসরাজ বাজিয়ে শোনালেন। শেষে এসরাজটি পাশে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, বোধ করি এ রসে তুমি বঞ্চিত, শরৎ?

শরৎচন্দ্র মিষ্টি মধুর হাসি হেসে বললেন—এ অভাগার কোন কিছুতে বঞ্চনা নেই, ভারতী! একটু যদি অপেক্ষা করেন—আমি আপনাকে সেতার শোনাতে পারি। অনুরূপ এক নম্বর এক্স একটু এনে দাও তো!

অনুরূপবাবু কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। তিনি সেটুকু গলাধঃকরণ করে সেতারখানা কোলে তুলে নিলেন। ঘরটা মূর্চ্ছনায় ভরে উঠলো।

বহুক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র সেতারখানা নামিয়ে রাখলেন। কিন্তু শ্রোতৃবর্গের কারও তখনও চমক ভাঙেনি।

ভারতীর তন্ময়তা কাটলো বহুক্ষণ পরে। তিনি শরৎচন্দ্রের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন—তুমি যে এত গুণের অধিকারী, তা আমার জানা ছিল না, শরৎ! সত্যই তুমি সরস্বতীর বরপুত্রই বটে!"

কানাইবাবুর এই গল্পের খুঁটিনাটি কথাগুলো বাদ দিয়েও মূল কথা থাকে এই—রবীন্দ্রনাথ শিবপুরে তাঁর জন্মতিথি উৎসবে গিয়ে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে সারারাত্রি ধরে বাইজীর নাচ দেখলেন। পরদিন বিকালে আবার নিজে তো এসরাজ বাজালেনই, এমন কি শরৎচন্দ্রের সেতার বাজনাও শুনলেন। আর শরৎচন্দ্র সেতার ধরবার আগে রবীন্দ্রনাথের সামনে বসেই এক নম্বর এক্স অর্থাৎ মদ টানলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে যাঁরা সামান্য মাত্রও চিনেছেন বা দেখেছেন, তাঁরাই জানেন—নিজের জন্মতিথি উৎসবে দুদিন ধরে যোগ দেওয়া এবং সারা রাত্রি ধরে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বাইজীর নাচ দেখার লোক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। আর যে-শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন, তাঁর সামনে বসে কখনই মদ টানতে পারেন না। কানাইবাবু জানেন না যে, মদ তো দূরের কথা, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এত বেশী শ্রদ্ধা করতেন যে, তাঁর সামনে ধূমপানও করতেন না। এ সম্পর্কে তবে একটা ঘটনা বলি। এই ঘটনাটি শরৎচন্দ্র নিজেই তাঁর স্নেহভাজন শ্রীহীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একদিন বলেছিলেন। হীরেনবাবু এই কাহিনীটি অধুনালুপ্ত "মাসিকপত্র" কাগজের ১৩৫৬ সালের মাঘ সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন। কাহিনীটি এই—

রবীন্দ্রনাথ এক সময় যখন চন্দননগরে গঙ্গার উপর বোটে বাস করতেন, সেই সময় শরৎচন্দ্র একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে

যান। কবির সঙ্গে সেবার শরৎচন্দ্রের অনেক বছর পরে দেখা। বহুদিন পরে দেখা বলে, কবি শরৎচন্দ্রকে তখনি ছাড়তে চাইলেন না। শরৎচন্দ্র ঘণ্টা দুই কবির কাছে ছিলেন। কবি তো শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের বিপদ হ'ল এই যে, তিনি ঘন ঘন ধূমপায়ী হয়েও কবির সামনে আদৌ ধূমপান করতে পারলেন না। শরৎচন্দ্র যে অত্যন্ত ধূমপায়ী—কবি একথা জানতেন। তাই শরৎচন্দ্র ধূমপায়ী হয়েও তাঁর সামনে ধূমপান করছেন না দেখে, কবি ঠিক আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর চা, খাবার, এটা ওটার নাম করে শরৎচন্দ্রকে সামনে থেকে সরিয়ে তাঁর সেক্রেটারী অনিল চন্দের কাছে চালান করে দিতে লাগলেন। আর ঐ অবকাশে শরৎচন্দ্র বাইরে গিয়ে ধূমপান করে আসতে লাগলেন।

ঘন ঘন ধূমপায়ী হয়েও শরৎচন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথের সামনে আদৌ ধূমপান করতেন না, একথা আরও অনেকে—যাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়কে অনেকক্ষণ ধরে একত্র থাকতে দেখেছেন তাঁরাও—বলে থাকেন। যে-শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে একটা সিগারেট পর্যন্ত খেতেন না, তিনিই তাঁর সামনে বসে মদ খাচ্ছেন এ কি কখনো সম্ভব?

কানাইবাবু রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এই সব কথা কি করে যে লিখলেন, তাই ভাবি! কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন দেখি যে আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলি কানাইবাবুর এই মিথ্যা আজগুবি-ভরা বইটির উচ্চ প্রশংসা করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-আর-এস, পি-এইচ্-ডি, উপাধিধারী কোন প্রখ্যাত অধ্যাপক—ইনি বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসও লিখেছেন—এই বইয়ের উচ্চ প্রশংসা করে ভূমিকা লিখে দেন। এঁদের এই সব ভ্রান্ত প্রশংসার ফলেই কানাইবাবুর এই বইটি সংস্করণের পর সংস্করণ হয়ে চলেছে। অথচ বইখানি যে মিথ্যা আজগুবি কাহিনীতে ভরা সে কথা আর কেউই বলছেন না। যে বইয়ে শরৎচন্দ্রকে এই ভাবে মিথ্যা করে হীন প্রতিপন্ন করে প্রচার করা হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথকেও খেলো করা হয়েছে, সে বই এখনই বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমি বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ, শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেশের সাহিত্যিকবৃন্দ ও সুধীজনসাধারণ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বইয়ের প্রচার বন্ধ করবার জন্য এঁরা সরকারকে চাপ দিন এই অনুরোধ করি।

(পূর্বানুবৃত্তি)

—চার—
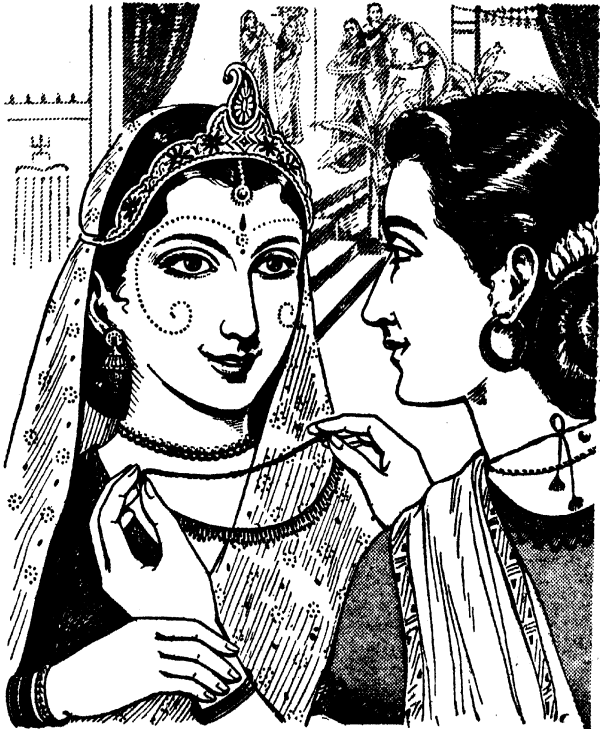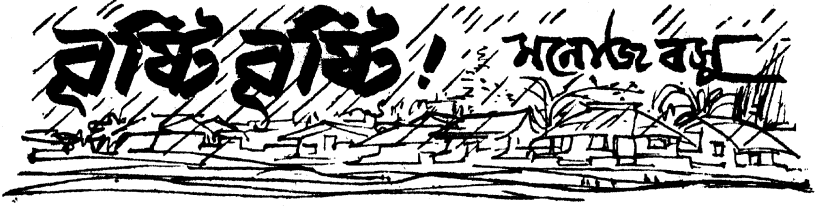
দোতলায় একখানা মাত্র ঘর—যার নাম হয়েছে তপোবন। বাকিটুকু ছাত। আর সিঁড়ির মাথায় সঙ্কীর্ণ চিলেকোঠা। তপোবনের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের শোওয়া-বসা লেখাপড়া সমস্ত। পুরাণো ছবি দু-চারখানা ঝুলছে দেয়ালে—আর বই কাগজ। পোকায়-কাটা পুরাণো দলিলপত্র, খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা—হীরা-মাণিক লোকে অত যত্ন করে রাখে না। বইয়ের উপর বই সাজিয়ে প্রায় ছাত সমান উঠে গেছে, মেজের উপরেও বই। তার মাঝখানে মাদুরের উপর হাত দুয়েক জায়গা নিয়ে বিশ্বেশ্বর কাজ করেন। রাত্রিবেলা গুটিসুটি হয়ে শোনও ঐ জায়গায়। ডাকাত ইরা শোনে না—ঝগড়াঝাটি করে এদিক-ওদিকের আর দু-পাঁচখানা বই সরিয়ে দিয়ে ঐখানেই একটু মশারি খাটায়।

ছাতের উপরে সম্বর্ধনার জোগাড় হচ্ছে। 'যুগচক্র' লেখক-গোষ্ঠীর কয়েকটা ছেলেমেয়ে সকাল সকাল এসে সতরঞ্চি পেতে ফেলেছে। একপাশে নিচু তক্তাপোশ পেতে তার উপরে বালিশ ও ভেলভেটের তাকিয়া সাজিয়ে হয়েছে বিশ্বেশ্বরের বসবার বেদি। একটু চাঁদোয়াও খাটিয়ে দিয়েছে ঐখানটায় মাথার উপরে। নগ্ন নিরাবরণ আকাশের নিচে আজকের দিনে মাননীয় অতিথিকে বসানো যায় না।

আর কি কি করতে হবে, মেয়ে ক'টি ইরাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল। ইরা হেসে বলে, কিচ্ছু নয় ভাই। অনেক খেটেছ। সভাশোভন করবে এবার সতরঞ্চিতে বসে বসে। আর যা করতে হয় আমিই পারব।

তার বাবার জন্য বাইরে থেকে এসে এরা এত করছে—ইরার ইচ্ছে করে, এদের বুকে জড়িয়ে ধরে, এদের কাঁধের উপর তুলে নাচায়। এদের মতো আপন মানুষ কে আছে কলকাতা শহরে!

বলে, হারমোনিয়াম নিয়ে তুমি বরঞ্চ একটা গান ধরো মাধুরী, মানুষজন জমে ওঠবার আগে। যেটা দিয়ে সভার শুরু হবে, সেটা নয়—অন্য একটা। খাবার গোছাতে গোছাতে আমি চিলেকোঠায় বসে শুনব।

পঞ্চানন যতদূর ভয় পেয়েছিল, তা নয়। ছাত একরকম ভরতি। পাড়ার অনেকে এসেছেন; অরুণাক্ষ এসেছে। সেই যে দীপক আর পরিতোষ আনা বারো চাঁদা দিয়ে কৃতার্থ করেছিল, তাদেরও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যা গতিক, শেষ অবধি হয়তো নিমন্ত্রিতের জায়গা দেওয়াই মুশকিল হয়ে উঠবে।

তপোবনের দরজা ভেজানো। কৃতান্ত দরজায় টোকা দিল। সাড়া নেই। আস্তে আস্তে একটুখানি দরজা ঠেলে অবাক। দেয়ালটুকুর বাইরে এতবড় ব্যাপার, আর কোন লোকে উনি এখনো? লিখছেন, তদ্গত হয়ে লিখেই যাচ্ছেন! সে এমন অবস্থা, কৃতান্ত হেন কাজের মানুষও মিনিটখানেক থমকে দাঁড়িয়ে দেখে।

মৃদুস্বরে ডাকল, দাদা! সবাই এসে গেছেন দাদা। উঠতে হয় এবারে।

বিশ্বেশ্বর কৃতান্তর দিকে মুখ তুলে তাকালেন। এখনো অতীতের রাজ্য—কৃতান্ত কি বলছে, বুঝতে পারছেন না ভাল করে। তার পরে যেন চটকা ভেঙে বলে উঠলেন, ও—হ্যাঁ, তাই তো! চলো—

সশব্দে খাতা বন্ধ করলেন। তবু কিন্তু ওঠেন না। বললেন, বুঝলে কৃতান্ত, এক মোক্ষম অবস্থায় এসে পড়েছি। লালদীঘির উত্তর-পূব কোণে গির্জেটা আছে না—আরে, তোমাদের রাইটার্স-বিল্ডিঙের পূব-দিকটায় গো—ওখানে ধুন্দুমার লড়াই বেধে গেছে। নবাবের সৈন্য তুলো-ধোনা করছে ক্লেটনের দলটাকে—

কৃতান্ত একটু হেসে বলে, করুক তুলো-ধোনা। তাড়িয়ে সবসুদ্ধ গঙ্গার গর্তে ডুবোতে পারে তো আরো ভাল।
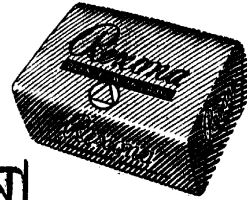
পাশাশির ঝামেলাটা হয় না। তা চলতে থাকুক ওদিকে। এর মধ্যে সম্বর্ধনার কাজটুকু চুকিয়ে আসুন। ঘণ্টা দুই-তিন পরে আবার এসে জমবেন। এত লোকে হা-পিত্যেশ বসে আছে, আপনি চলে আসুন।

একটু ঝাঁজও আছে শেষ দিককার কথায়। বেকুব হয়ে—তা বটে! তা বটে!—করতে করতে বিশ্বেশ্বর উঠলেন। কৃতান্ত বলে, এ কি, এই ময়লা ধুতি-ফতুয়া পরে যাবেন কি রকম?

বিশ্বেশ্বরও রাগ করে বলেন, তাই দেখ মেয়েটার কাণ্ড! তুমি বললে বলে কৃতান্ত, নয় তো এই বেশে গিয়ে বসতে হত। ওরে ইরা—

ইরা সাড়া দেয় চিলেকোঠা থেকে এবং সঙ্গে সঙ্গেই যেন পাখীর মতন উড়ে এসে ঘরে ঢুকল।

কি বাবা!

দেখ্ দিকি, আজকের দিনে কী জামা-কাপড় পরে আছি আমি!

এই যে গরদের জোড় রেখে গিয়েছি। পরতে বললাম, তুমি কানে নিলে না। তোমায় তো বিশ্বাস নেই বাবা, লিখতে লিখতে হয়তো বা দোয়াতের কালি ঢেলে বসবে কাপড়ের উপর। তাই ভাবলাম, দেরি আছে যখন, সাত সকালে সেজেগুজে বসে থেকেই বা কি হবে!

বিশ্বেশ্বর বকে ওঠেন, দেরি কিসের, দেরি আর নেই। এতগুলো মানুষ হা-পিত্যেশ বসে রয়েছে। কোন দিকে যদি একটু হুঁশ থাকে মেয়ের!

কৃতান্ত ইরার দিক হয়ে তাড়াতাড়ি বলে, সে কি, অমন কথা কক্ষণো বোলো না দাদা। মা আমাদের দু-খানা হাতে দশ হাতের খাটনি খাটছে, দুটো চোখে দশ দিকের খবরাখবর করছে।

ইরা হেসে বলে, না কাকাবাবু, আমারই দোষ—বাবা ঠিক বলেছেন। বসে বসে খাবার সাজাচ্ছিলাম, এদিককার খেয়াল ছিল না। আচ্ছা, দশটা মিনিট সময় দেন, সমস্ত গোছগাছ করা আছে—আপনি গিয়ে বসুনগে, বাবাকে নিয়ে আমি যাচ্ছি।

ইরার দিকে চেয়ে কৃতান্ত বলে, তুমিই বা কি সাজে রয়েছ! যেমন বাবা, তেমনি মেয়ে! রান্নাবান্না করছিলে বুঝি?

কি বলছেন, রান্নাঘর হল মায়ের এলাকা। এক মিনিট উনুনের দখল ছাড়বেন তিনি!

রান্না নয়, ঝি কিশোরীবালা একা কত সামলাবে। একবার গিয়ে ইরা ইতিমধ্যে খানিকটা হলুদ বেটে দিয়ে এসেছে। আঁচলময় সেই হলুদের দাগ। কোথায় যে নেই আজকের দিনে ইরাবতী! যে দিকে অকুলান, ছুটে গিয়ে সে পড়ছে। আর হাসি ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে বাড়িময়। কোঁচানো গরদের ধুতি হাতে নিয়ে এসে বলে, পরে ফেল বাবা। কোঁচাটা আগে মুঠো করে ধরো; ছড়িয়ে না যায়।

কৃতান্ত বলে, মা যেমন-যেমন বলেন, ভাল ছেলে হয়ে মুখ বুঁজে করে যাও দাদা। মায়ের মতন কে পারবে? তা নিজের দিকেও একটু কিন্তু নজর দিও। মা বটে আমাদের সকলের—তা বলে 'আস্থি বুড়ি মাথায় শনের নুড়ি বয়েস সাড়ে চার কুড়ি' তো নও!

কপালে চন্দনের ফোঁটা, পরণে গরদের জোড়। সাজিয়ে গুজিয়ে বাপের হাত ধরে ইরাবতী তক্তাপোশের উপর এনে বসাল। মেয়ে ক'টি একদিকে। ইরা তাদের মধ্যে গিয়ে বসে পড়ল। নিজে সে পরেছে ধবধবে একখানা তাঁতের ধুতি, আর কিছু নয়। অনাড়ম্বর সাজ-পোষাকে এমন খাসা দেখায় ইরাকে! ছাতের কোণ থেকে অরুণাক্ষ এক নজরে তাকিয়ে আছে। চোখোচোখি পড়তে দৃষ্টি ফিরিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের কেন্দ্র বিশ্বেশ্বরের দিকে তাকাল। ফুল আর ফুল! নিমন্ত্রিতেরা সকলেই ফুল নিয়ে এসেছে। ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন করে দিল বিশ্বেশ্বরের অস্থিসার দেহ। শেষ অবধি ঠিক হয়েছে, সভাপতি কেউ হবে না। কৃতান্ত তার একটু ভূমিকা করে দিল। নিতান্তই ঘরোয়া অনুষ্ঠান আজকের—এখানে সকলের বড় আসন ঐতিহাসিক-প্রবর বিশ্বেশ্বর সরকার মশায়ের। আমাদের বিশ্বেশ্বরদা'র। সবাই আমরা নিচে। সভাপতি রূপে অন্য কারো মাতব্বরি বরদাস্ত করতে রাজি নই আমরা।

বিস্তর চেষ্টাচরিত্র করেও তেমন কাউকে পাওয়া গেল না—এই হল আসল কথা। সেটা পঞ্চানন জানে এবং ঝানু কেউ কেউ আন্দাজ করেছে। বক্তৃতার বড় বড় কথায় তারা মুখ টিপে হাসে।

কৃতান্ত তার পরে লিখিত অভিনন্দন পড়তে শুরু করে।

যাবতীয় উৎকৃষ্ট বিশেষণ বিশ্বেশ্বর সম্বন্ধে—অভিনন্দন-পত্রের যেরকম দস্তুর আছে। ইরা বাপকে অনেক করে বুঝিয়ে দিয়েছে, ঐ সময়টা নিরাসক্ত ভাব দেখাতে হবে—একেবারে কিছুই যেন কানে যাচ্ছে না। অথবা কাচুমাচু ভাবে না-না—করাও চলে। কিন্তু ফূর্তির চোটে বিশ্বেশ্বর সব ভুলে মেরে দিয়েছেন। এক একটা ভাল কথা আসছে আর হেসে ঘাড় দুলিয়ে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করেন সেটা। কেউ মালা দিতে গেলে নিজেই হাত বাড়িয়ে নিয়ে গলায় পরছেন। ইরা লজ্জায় মরে যায়।

বাবা—

কি রে? লাল গোলাপগুলোর গন্ধ কি রকম, দেখ না শুঁকে! দেখ—

এর পরে কি-বলা যায় এত মানুষের মধ্যে! একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে! ভাবতে গিয়ে ভালও লাগে—নিষ্পাপ শিশুর মতন হলেন তার বাবা। মনে এক, মুখে অন্য ভাবের অভিনয় তিনি পারেন না।

সম্বর্ধনার উত্তরে যা-যা বলতে হবে, ইরা তিন-চার দিন ধরে তালিম দিয়েছে। কিন্তু কোথায় কি! রোজ যেমন-ধারা লাইব্রেরিতে হয়ে থাকে, এখানেও ঠিক তেমনি। অপরের গালমন্দ, আর নিজের সম্বন্ধে একশ'খানা করে বলা। লাইব্রেরির সেই ছেলেগুলোর কয়েকটি দেখা যাচ্ছে—হতে পারে, সেইজন্যে স্থানকাল ভুলে ক্ষেপে উঠেছেন।

রামতারক মুখুজ্জে কে জানো? জানো না—নামই শোননি। ঐ যে বললাম, ওরা ইতিহাস লেখে! হাত-পা ঘাড়-গরদান বাদ দিয়ে লিখে গেলেই হল—গবর্নমেণ্টের আইনে মানা নেই তো! রামতারক হলেন বড় মুৎসুদ্দি—লর্ড ক্যানিং যাঁর বাড়ি পুতুলের বিয়েয় নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেন। লাখ টাকা খরচ করে পুতুলের বিয়ে—আর সেই বিয়ের তারিখ দিয়েছে কিনা বাইশে ডিসেম্বর, শনিবার। হ্যাঁ, দেখাবো তোমাদের—দিগ্‌গজ পণ্ডিতের লেখা বইতে আছে। নিজের চোখে না দেখে কি বলছি?

এতক্ষণ কাছাকাছি চেয়ে ছিলেন। এবারে গোটা হাতের উপর নজর ঘুরিয়ে ফলাও করে বলতে লাগলেন, পৌষ মাসে বিয়ে হয় কখনো, বলুন আপনারা? হলই বা পুতুলের বিয়ে—পুরোপুরি শাস্ত্রসম্মত ভাবে হচ্ছে, তার অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। তারিখ হল বাইশে ডিসেম্বর নয়, বাইশে জানুয়ারি। বাইশে ডিসেম্বর শনিবার হয় না, বুধবার। মাসটা জানুয়ারি হলে মাঘ মাস পড়ে যাচ্ছে, দিনটাও শনিবার দাঁড়াচ্ছে। বুঝুন, কি সর্বনাশ! আমার 'ভারতে ইংরাজ'-এ চ্যাপ্টারের আধখানা জুড়ে রয়েছে পুতুলের বিয়ের তারিখ নিয়ে আলোচনা। আমি শেষ কথা বলে দিয়েছি, তার উপরে তিলেক আর সন্দেহের ব্যাপার নেই। কি মেহনত হয়েছে শুধু ঐ তারিখটা বের করতে, বাইরের মানুষ কেউ তা ধারণায় আনতে পারবেন না।

ইরা উঠে দাঁড়াল। সারাক্ষণ বসে বসে শোনবার সময় কোথা? অরুণাক্ষ তখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, কী মণীষা—কি রকম সত্যদৃষ্টি! তাজ্জব হয়ে যেতে হয়।

বিশ্বেশ্বর বলেন, পড়েছ তুমি বাবা?

অরুণ বলে, পড়েছি মানে? লাইন-কে-লাইন মুখস্থ। বলে যেতে পারি। লেখক তো কতই আছেন, কিন্তু আপনি অদ্বিতীয়। লোকে চিরকাল আপনাকে মাথায় তুলে রাখবে। আজকেই তার এই নমুনা দেখতে পাচ্ছেন।

বিশ্বেশ্বর গদগদ হয়ে বলেন, আমায় নয় বাবা, আমার বই—'ভারতে ইংরাজ'। তাই বা কেন—লোকে মাথায় রাখুক সত্যকে। 'ভারতে ইংরাজ'-এ যদি ভুল বেরিয়ে পড়ে, সেদিন এ বই নর্দমায় ছুঁড়ে দিয়ে যিনি ভুল বের করলেন তাঁর বই মাথায় নেয় যেন দেশের মানুষ।

তার পর হেসে উঠলেন, জানো বাবা, দু-দণ্ড চুপচাপ বিশ্রাম নিতে পারি নে। ঘুমিয়ে সোয়াস্তি নেই—সেকেলে আজব পোশাকের পুরুষরা, আজব গয়না-পরা মেয়েরা এসে চলাফেরা করেন। ইরা রাগারাগি করে, কেন তুমি ঘুমোও না—উঠে উঠে বোসো, ঘুমের মধ্যে কি সব বলো···আরে, আরাম করতে আমার কি অনিচ্ছে? ঘাড় ধরে যদি তুলে বসিয়ে দেয়, আমি কি করতে পারি বলো?

সেই পরমোৎসাহী পটলাও এসে বসেছে অরুণের পিছনে। সে বলে, ভৌতিক ব্যাপার দস্তুর মতো। গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে উঠছে।

বিশ্বেশ্বর বলেন, ঠিক তাই। ঘাড় ধরে তুলে তারা কাজে বসিয়ে দেয়। কথা বলে, আমি স্পষ্ট শুনি, কান্নাকাটি করে এসে আমার কাছে—বাতাসে ভেসে

ভেসে বেড়াচ্ছি, বাঁচাও আমাদের। তোমার ক্ষমতা আছে, তুমি পারবে। ওগো, বাঁচাও।

হাসতে হাসতে বললেন, চাকরি ছেড়ে দিলাম কেন জানো? ভয় হল, রামপ্রসাদের মতন না হই; লেজার-বইয়ে 'ভারতে ইংরাজ' লিখতে না বসে যাই।

ইরা শুনছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। অরুণাক্ষকে লক্ষ্য করে হঠাৎ বলল, আপনি আসবেন ভাবতে পারিনি।

সে কি কথা! আপনি নিজে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন, আমি ছিলাম না দুর্ভাগ্যক্রমে—

ইরা বলে, সেদিন যাঁদের বাড়ি গিয়েছিলেন, আজকেও তো সেখানে যাবার কথা। আমি থাকতে থাকতে সুনন্দা গিয়েছিলেন।

হেসে উঠে বলে, রবিবার রাত্রে সেখানে খাবেন, বাবু ফিরে এলে আমায় বলতে বললেন। তারপরে দেখা হয় নি, তাই বলতে পারি নি। সে রবিবার কিন্তু আজ।

অরুণাক্ষ বলে, এটা সেরে তারপরে যাব শ্যামবাজার। নিমন্ত্রণ আমি পারতপক্ষে ছেড়ে দিই নে।

ইরা বলে, এ তো ফাঁকা নিমন্ত্রণ। খানিকটা কথাই শুধু।

অরুণ বলে, দেখা যাক ইরা দেবী চিলেকোঠায় বসে প্লেটে প্লেটে শুধু কথাই সাজাচ্ছেন, না আর-কিছু—

ইরা চলল এর পর চিলেকোঠায় নয়, নিচের তলায়। মনের স্ফূর্তিতে এক সঙ্গে জোড়া-সিঁড়ি লাফ দিচ্ছে।

ও মা!

মা কোথায়, সাড়া নেবার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। সে তো জানাই আছে। জানলাহীন আধ-অন্ধকার রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, মাগো, তোমার পুরানো পচা বাড়িতে মানুষজন আজ ভেঙে এসেছে বাবার নামে। তুমি একটিবার চোখের দেখাও দেখলে না মা?

সরমা বলেন, সবাই দেখলে—গিয়ে বসলে এদিককার কি হবে? কৃতান্ত ঠাকুরপোর চোলে পড়ে এত বড় দায় ঘাড় পেতে নিলি, আমায় একবার মুখের কথাটা জিজ্ঞাসা করলি নে—

মায়ের সঙ্গে এই নিয়ে এখন কথা-কাটাকাটি করবার সময় নয়। যতই বকো, ইরা মুখ ভার করবে না। মা'কে জড়িয়ে ধরে রান্নার পিঁড়ি থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে যায় এক নজর তুমি দেখে এসো মা—

সরমা ছড়া কাটেন, পাচি যাবেন বৃন্দাবনে—ঘুঁটে কুড়োবে কে? সর্ সর্—ঘি পুড়ে জলে গেল।

ইরা হেসে বলে, ঘুঁটে কুড়োবার মানুষ এই তো হাজির হয়েছে মা। আমি ভেজে দিচ্ছি, যাও তুমি একবার রাতদিন বাবার নিন্দেমন্দ করো। অফিসের এক কেরানি ছিলেন—ছাকরি ছাড়ার দুঃখ আজও ভুলতে পারলে না কে চিনত তাঁকে? দেশের বড় বড় মানুষেরা আজকে কি বলছে, শুনে এসো।

বড়মানুষেরা বলবে না কেন? তাদের কিছু তো ক্ষতি লোকসান নেই, ক্ষেপিয়ে দিলে হল। বাহবা দিয়ে দিয়ে তো চাকরিটা ছাড়াল। ঘন-আঁটা দুধ ভালবাসিস তোরা বাপ আর মেয়ে। আজ আষাঢ়ের দিনে একটা দিন তোদের পাতের কাছে একটু আঁব-দুধ এনে ধরতে পারলাম না।

শেষ দিকটা গলার স্বর ভারী হয়ে আসে। কড়াইর দিকে ঝুঁকে পড়ে ঘিয়ের মধ্যে সশব্দে ঝাঁঝরি নাড়তে লাগলেন।

ইরা ক্ষণকাল মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। বাবার উপর বকাবকি করে, সেজন্য ভাল লাগে না—তবু মায়ের ব্যথা বুঝতে পারে সে। তাই তো পাশের খবর না বেরুতে ট্যুইশানি জুটিয়ে নিয়েছে, চাকরির জন্য আফিসে আফিসে টহল দিচ্ছে। ট্যুইশানি করে ক'টা টাকাই বা দেওয়া যায়! তার উপরে খামোকা এই লম্বা খরচ। বাবার নামে না ভেবেচিন্তে এত বড় দায়টা ঘাড়ে নিয়ে বসল।

কিশোরীবালা লুচি বেলে দিচ্ছিল সরমার পিছন দিকে বসে। চাকি-বেলুন তার হাত থেকে টেনে নিয়ে ইরা বলল, তোলা-উনুন ধরে গেছে। তুই ভাই চায়ের জল চাপিয়ে দে এবার। লোকজন আর বেশিক্ষণ থাকবে না। জল হয়ে গেলে চিলেকোঠায় নিয়ে চা ভিজিয়ে দিবি। কাপ-প্লেট সমস্ত সাজিয়ে রেখে এসেছি। আমরাও যাচ্ছি চটপট লুচি ক'খানা ভেজে নিয়ে।

সরমাকে বলে, হাত চালিয়ে ভাজো মা, আমি বেলছি। আমায় যদি হারাতে পারো তবে বলব, হ্যাঁ—রান্না শিখেছ বটে তুমি!

DALDA
ডালডা

সরমা এবারে হাসলেন একটু।

তার মানে নিয়েই যাবি আমায় ?

হ্যাঁ মা, একটু তোমায় না শুনিয়ে ছাড়ব না। চিলে-কোঠায় খাবার গোছাতে গোছাতে কিছু তো কানে আসবে ! তোমার সংসারে অনেক দুঃখ-কষ্ট। এই কষ্ট-দুঃখের বদলে যা পাচ্ছ, সেটা টের পেলে তবু অনেকখানি শান্তি পাবে। সত্যি সত্যি যদি কিছু না পেয়ে থাকে, এত মানুষ কি জন্যে খোসামোদ করতে আসবে ? বাবার কাছে কি প্রত্যাশা তাদের ?

বিশ্বেশ্বর একটানা বকেই যাচ্ছেন। একটু যখন কমা-দাঁড়ির লক্ষণ দেখা যায়, যে-কেউ একটু খুঁচিয়ে দিলে হল। আবার চলল পুরা দমে। এখন আর লোকে বিশেষ শুনছে না—দু-জনে চার জনে এক একটা দল করে নিজেদের ভিতর কথাবার্তা বলছে। গলা খাঁকারি দিয়ে উঠে পড়ছে কেউ কেউ—অর্থাৎ থুতু ফেলতে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি না একেবারে। উপায়ও নেই চলে যাবার। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থেকে কৃতান্ত আপ্যায়ন করছে, সে কি কথা ! একটা দিন দাদাকে নিয়ে একটু বসেছি—বসতে না বসতে আসর ভেঙে দিলে, হবে কেন ? চা খেয়ে যেতে হবে একটু। শুধু-মুখে গেলে গৃহস্থর মনে কি রকমটা হবে !

আবার এ ঘাঁটিও যদি জো-সো করে ছাড়িয়ে যাও, সিঁড়ির নিচে পঞ্চানন। কাজকর্ম শেষ না হওয়া অবধি একটা পিঁপড়ে গলতে দেবে না। উঠে আসতে পারো স্বচ্ছন্দে, নেমে বেরুবার জো নেই। আঃ, মেয়েলোকের ব্যাপারই আলাদা ! দু-খানা লুচি আর দু-কুচি আলুর দমের নামে রাত কাটিয়ে দেবে নাকি ? মানুষজন কতক্ষণ ধরে রাখা চলে এমনধারা এক ব্যাপারে !

চিলেকোঠার ওধারটায় দেয়ালের আড়াল হয়েছে। টেনেটুনে দু-তিনটে চেয়ারও নিয়ে গেছে সেখানে। ছোকরারা গিয়ে দু-টান সিগারেট টেনে খানিক গল্প-সল্প করে চাঙ্গা হয়ে আবার এসে বসছে। ঘোরফেরাটা বড্ড বাড়ছে, কেউ আর স্থির বসে থাকতে চায় না। গতিক বুঝে কৃতান্ত হাঁক দিয়ে বলে, ও মাধুরী, কত আর বকাবে দাদাকে। জানি, জানাতে বঝাতে এসেছ সকলে। কিন্তু সকলের জ্ঞানের ক্ষুধা মেটাতে বুড়োমানুষের যে জান থাকে না। গান ধরো একটা—দাদা ততক্ষণ জিরিয়ে নিন।

অরুণাক্ষ পড়ে গেছে একেবারে সামনে। এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ফলস্বরূপ বিশ্বেশ্বরের দৃষ্টি ঘুরে ফিরে তারই উপরে। দীপক বসেছিল, সে দিব্যি উঠে পড়েছে ; উঠে ঐ আড়ালের দিকে গেছে। অরুণের উপায় নেই, মুখের দিকে চেয়ে অনবরত কথা বলতে থাকলে ওঠা যায় কেমন করে ?

হেনকালে কৃতান্তর ঐ প্রস্তাবে যেন ঐশী প্রত্যাদেশ—ও মাধুরী, গান ধরো এইবার।

অরুণ সঙ্গে সঙ্গে প্রবল সমর্থন জানায়, হ্যাঁ, গানই হোক। ওঁর বড় কষ্ট হচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর হেসে ঘাড় নেড়ে বলেন, কিছু না, কিছু না। সমস্ত রাত্তির ধরে আমি এমনি বলে যেতে পারি—একবিন্দু কষ্ট হবে না।

অরুণাক্ষ মুখ কালো করে বলে, হচ্ছে কষ্ট। ঘেমে গিয়েছেন, আর বলেন কষ্ট হচ্ছে না ! কষ্ট হল না হল, সে কি আর বুঝতে পারেন আপনি ?

মাধুরী হারমোনিয়ামের চাবির উপর আলসে আঙুল বুলিয়ে গেল। পরের প্রতি করুণা, হয়তো বা নিজেরই কান বাঁচানোর তাগিদে। আরম্ভের গানটায় বেশ জমিয়ে নিয়েছিল—ছাতসুদ্ধ কৃতজ্ঞ মেয়েটার উপর। অরুণাক্ষ এই ফাঁকে উঠে পড়েছে। আড়াল জায়গার এক ভাঙা চেয়ারে বসে পড়ে সে দুরন্ত দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল, বাব্বাঃ—

দীপক বলে, রবিবার বিকালটা কি করা যায় বসে বসে. তার উপর চাঁদা দিয়ে ফেলেছি—জলটল খেয়ে তাই উশুল করতে এসেছিলাম। যা গতিক, আবার একদফা চাঁদা দিতে রাজি আছি কৃতান্তবাবু সিঁড়ির মুখটা একটু যদি ছেড়ে দেন।

বলার ভঙ্গিতে সকলে হেসে উঠল। অরুণাক্ষ বলে, ভদ্রলোকের মাথা একদম খারাপ হয়ে গেছে। গবর্নমেণ্ট বাইরে ছেড়ে দিয়ে রেখেছে—দেশসুদ্ধ লোকের মাথা খারাপ করবেন।

চিলেকোঠার মধ্যে খাবার গোছাতে গোছাতে ইরাবতী স্তব্ধ হয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে মায়ের দিকে তাকাল। সরমা

কম কথার মানুষ—তিনি কিছু বললেন না। কিম্বা শুনতেই পান নি হয়তো।

দীপক অরুণাক্ষকে বলে, এখন এই বলছেন—আপনিই তো আগডম-বাগডম বলে আরো আকাশে তুললেন। অদ্বিতীয় লেখক, লোকে মাথায় তুলে রাখবে—উঃ, পাগল ক্ষেপানো আর কাকে বলে!

অরুণাক্ষ হেসে বলে, অদ্বিতীয়—সে কি আর মিছে কথা? সারা দেশে মানুষটির দোসর মিলবে না!

ইরা সন্ত্রস্ত হয়েছে। মা মোটে আসতে চাচ্ছিলেন না—কেন যে তাঁকে টেনেটুনে নিয়ে এলো! তাদের দুঃখকষ্টের বদলে দেশের মানুষের কাছ থেকে কি পাচ্ছেন, তাই শোনাবার জন্য। শুনে ফেললেন নাকি? ঠিক বোঝা যায় না—একটুখানি করুণ হাসি যেন মুখের উপরে। হায় হায়, না শোনেন—না শুনতে পান যেন কোন কিছু!

পটলাও এবারে বিড়ি টানতে টানতে এসে দাঁড়াল। পাড়ার মানুষের নিন্দেয় তার লেগেছে। বলে, বিশ্বেশ্বর-বাবু বকেন একটু বেশি, কিন্তু সাচ্চা লেখক—হেলাফেলার বস্তু নন।

দীপক হেসে উঠে বলে, লেখকই নন মোটে। আমার কাকার সঙ্গে কালেকটরেটে লেজার লেখার কাজ করতেন—লেখক ছিলেন তখন, লিখতে লিখতে আঙুল ব্যথা হয়ে যেতো। ঐতিহাসিক হবার পর তো কলম ছেড়েছেন।

এককপি 'ভারতে ইংরাজ' ভাল করে বাঁধিয়ে বিশ্বেশ্বরের বেদির উপরে রেখে দিয়েছে। আসল কাজে কৃতান্তের ভুল হয় না। এই উপলক্ষে বইটা চর্মচক্ষে দেখা হল উপস্থিত সকলের। কেউ কেউ দু-পাঁচ পাতা উল্টেও দেখছেন। দীপকের কথায় পটলা চটে গিয়ে বলে, কলম ছেড়ে দিয়েছেন অমন ঢাউস বই তবে কি মন্তোরে বেরিয়ে গেল মশায়?

দীপক বলে, ওতে কলম লাগে কি করতে? গঁদের আঠা আর কাঁচি—দুই বস্তু নিয়ে কারবার। যেখানকার যত পুরানো পচা লেখা এক জায়গায় এনে আঁটা। নিজের কি আছে বইয়ের ভিতরে?

তা ঠিক, ভাবতে গেলে তা-ই বটে! হাসির হররা উঠল। চমক লাগে সহসা। চিলেকোঠায় অনতিস্ফুট আর্তনাদ। সরমা কি হল, কি হল—করে ওঠেন। ইরা চা করছিল, গরম জল ঢেলে পড়েছে। কৃতান্ত ছুটে এলো। বাইরের এরাও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

না—যতটা ভাবা গিয়েছিল, তা নয়। গরম জলের ডেগচি উলটে পায়ে তত বেশি নয়—লুচি-হালুয়া-সন্দেশের উপরে সমুদ্দুর খেলছে। তখন সরমা ক্ষেপে গেলেন, কাজ দেখাতে এসেছেন! পারিস সভাশোভন করতে, তাই করগে যা বসে বসে। কে তোকে এদিকে আসতে বলেছে?

ইরা শান্ত কণ্ঠে বলে, গরম জল খাবারে না পড়ে গায়ের উপর পড়লেই কি ভাল হত?

তা বটে, কি সর্বনাশ হতে হতে বেঁচে গেছে! সরমা নরম হলেন। ডেগচি উলটে যদি মেয়ের উপর পড়ত! কিন্তু আসে কি জন্য এ সমস্ত কাজে? এত হচ্ছে আর তোলা-উনুন থেকে ডেগচিটা নামাতে পারতাম না? নয় তো কিশোরীবালাকেও তো বলতে পারত! এখন উপায় কি, জলে-ভেজা এই বস্তু কেমন করে প্লেটে প্লেটে তুলে দিই?

কৃতান্ত বলে, বকবেন না বৌদি। ইরা-মা'রই তো সব চেয়ে বেশি আগ্রহ। হাত ফসকে পড়ে গেল, ও তার কি করবে? ইচ্ছে করে তো ফেলে নি।

ইরা অমনি ফোঁস করে ওঠে, ইচ্ছে করে ফেললেও কিছু অন্যায় হত না কাকাবাবু—

কৃতান্তর বিস্ময়-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে সামলে নেয়। হাসির ভাব করে বলে, যাকগে যাকগে। বাবার ভক্তেরা ভক্তি-শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন। অসীম দয়া এঁদের। শ্রদ্ধা জানানো হয়ে গেছে—বাস, বিদেয় হয়ে যান। লুচি-টুচি কি হবে—আকাশের অবস্থা সুবিধের নয়, চলে যান ওঁরা।

সরমা অবাক হয়ে বলেন, শোন কথা। তোরই তো গরজ বেশি। নিজে টাকা বের করে কিশোরীবালাকে দিয়ে ঘি-ময়দা আনালি। আমি কি এর মধ্যে ছিলাম। না, একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলি আমায়?

ইরা বলে, তা ভালই তো হল মা, জিনিষপত্রের অপব্যয় হল না। নর্দামায় ফেলে দাও—কাকে ও কুকুরে খাবে। তারা অনেক ভালো, কথা বলে না—মনে এক, মুখে অন্য বলতে পারে না।

গরগর করতে করতে বেরুচ্ছে। সবাই সরে গেছে ইরাবতীর তেমন-কিছু হয় নি দেখে। যায় নি শুধু অরুণাক্ষ—দরজার ওদিকটায় একলা সে দাঁড়িয়ে। শুনে ফেলেছে নাকি মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা? শুনেছে তো বয়েই গেল—শোনা উচিত ওদের। বেহায়া মানুষটা আবার জিজ্ঞাসা করে, পুড়েটুড়ে গেল নাকি? জ্বালা করছে?

হ্যাঁ—বড্ড জ্বালা, বড্ড—বড্ড— (ক্রমশ)

অশ্বমেধ যজ্ঞের ক্ষেত্র আবিষ্কৃত—

ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ উত্তর প্রদেশের ডেরাডুন জেলায়—ডেরাডুন হইতে ৩৬ মাইল দূরে যমুনা তীরে কলসীর নিকট অশ্বমেধ যজ্ঞের একটি ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। গত ৬ মাসে ঐরূপ আরও দুইটি যজ্ঞক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। গরুড়াকৃতি একটি গাঁথনীর ৮ খানি খোদিত ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে। উহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞকারী হিসাবে পোবা বংশের বৃষগণ গোত্রীয় রাজা শিলীবাহনের নাম খোদিত আছে। বৈদিক যুগের সামাজিক জীবন কিরূপ ছিল—এই আবিষ্কারের ফলে সে সম্বন্ধে গবেষণা করা যাইবে। কাঞ্চী কামকোটি পীঠের শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রেরিত পণ্ডিত তাতাচার্য্য ঐ কার্য্যে সরকারী কর্মচারীদিগকে সাহায্য করিতেছেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের বহু উপকরণ এই ভাবে নানাস্থানে মাটী চাপা পড়িয়া আছে। স্বাধীন ভারতের নায়কগণ সেগুলির পুনরুদ্ধার করিলে ভারতের ইতিহাস আরও গৌরবান্বিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে সেচ ব্যবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেচ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ফরাক্কা বাঁধসহ ৮৫ কোটি টাকার খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। বাঁকুড়া মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতী পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ৮ লক্ষ একর জমী সেচের জল পাইবে—এজন্য ২৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে—তন্মধ্যে ১৮ কোটি টাকা আগামী ৫ বৎসরে ও বাকী ৫ কোটি টাকা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যয় হইবে। তাহা ছাড়া ফরক্কা বাঁধের জন্য ৩০ কোটি টাকা, কলিকাতার উত্তর ও দক্ষিণে লবণ হ্রদ পুনরুদ্ধারে ১৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা, বর্ষার জল বহিষ্কারে ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা, আবর্জ্জনা হইতে গ্যাস উৎপাদনে ২ কোটি টাকা, সুন্দরবনে বাঁধ নির্ম্মাণে ৬ কোটি টাকা, বৃহত্তর কলিকাতার জল নিকাশে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, সোনারপুর আরাপাঞ্চের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে, সাত্রাগাছি, ঘুর্ণি—বাগজলা ব্যবস্থায় ও ময়ুরাক্ষী ব্যবস্থায় ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা, হাওড়া কেদুয়া বিল নিকাশে ৫৮ লক্ষ টাকা, জলপাইগুড়ি করতোয়া-টানিমা সেচের জন্য ৪৮ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ও মেদিনীপুর-দোলকী সেচে ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

উদ্বাস্তুদের জন্য জমি সন্ধান—

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে জমির সন্ধান করিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সহিত পরামর্শ করিয়া এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। এক এক স্থানে ৫ শত হইতে এক হাজার উদ্বাস্তু পরিবার যাহাতে একত্র বাস করিতে পারে বিভিন্ন রাজ্যে তাহার উপযুক্ত জমী সন্ধান করা হইবে। ঐ কমিটীতে পরিকল্পনা কমিশনের আঞ্চলিক উপদেষ্টা, পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ অফিসার ও পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রতিনিধি থাকিবেন। উদ্বাস্তুরা যাহাতে বাসের জমির সঙ্গে কাজ পায়, সে কথা পূর্ব হইতে চিন্তা করা ও তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। এই কমিটী শীঘ্রই বিভিন্ন রাজ্যে যাইয়া স্থান পরিদর্শন করিবেন। বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে বহু খালি জমি পড়িয়া আছে—সেখানে যাইলে উদ্বাস্তুরা সুখে বসবাস করিতে পারিবে।

গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন—

গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন দ্বারা গ্রাম-বাংলার সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি সাধন ও গ্রামবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান—এই লক্ষ্য মোটামুটী সম্মুখে রাখিয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়নের চেষ্টা হইবে—দার্জিলিংয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মন্ত্রিসভার সাম্প্রতিক বৈঠকে পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই মূল নীতি গৃহীত হইয়াছে। এই নীতি অনুসারে কাজ করার জন্য রাজ্য সরকার পল্লী ও কুটীর শিল্পের উন্নয়ন ও উহার পুনরুজ্জীবনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বহরমপুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভাতেই শ্রীজহরলাল নেহরু এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। সহরমুখী সভ্যতা যে জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, তাহা সকলে ক্রমে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর গত ৮ বৎসরের সকল কাজে আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। এমন বহু ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাহা গ্রামকে ধ্বংস করিতে সাহায্য করিতেছে। গান্ধীজির আদর্শের কথা আমরা মুখে যতই বলি না কেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করার সময় পশ্চাদপদ হইতেছি।

শ্রীনেহেরুর মস্কো যাত্রা—

গত ৫ই জুন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু মস্কো যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ১৬ দিন ধরিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শন করিবেন। রুশিয়া ছাড়াও তিনি যুগোশ্লাভিয়া, পোলাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও মিশরে শুভেচ্ছামূলক ভ্রমণ করিবেন।—সেখানে তাঁহার প্রায় ৫ সপ্তাহ লাগিবে। যাইবার সময় তিনি বলেন—"রাজনীতিক বা অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া আমি রুসিয়া বা পূর্ব-ইউরোপীয় দেশসমূহে যাইতেছি না কোন রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর সহিত কোন ব্যাপারে কোনরূপ চুক্তি সাধনের উদ্দেশ্যও আমার নাই বা কোন সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিতেও আমি ইচ্ছুক নই বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সহিত আমি আলোচনা করিব, তাহাদের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। পৃথিবী আজ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে সেগুলি সম্পর্কে তাহারা আমার মত জানিতে চাহিলে তাহা প্রকাশ করিব। বর্ত্তমান যুগে কোন দেশই বিশ্বরাজনীতি হইতে দূরে থাকিতে

পারে না। ভারত কদাপি অন্য দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার জন্যই ভারত স্বীয় প্রভাব প্রয়োগ করিবে।" শ্রীনেহরুর এই উক্তি শুধু ভারতবাসীদের নহে, সমগ্র বিশ্ববাসীর বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার এই নীতি জগতের সম্মুখে নূতন পথ প্রদর্শন করিবে।

পরলোকে এন-এম-যোশী—

ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক, বোম্বায়ের খ্যাতনামা প্রবীণ দেশসেবক এন-এম-যোশী গত ৩০শে মে বিকালে ৭৫ বৎসর বয়সে বোম্বায়ে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি সুস্থ ছিলেন—হঠাৎ তাঁহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। পূর্বদিনও তিনি তাঁহার এক সম্বর্দ্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সর্বদা নিজেকে দলাদলির উর্দ্ধে রাখিতেন। তিনি মহামতি গোখলের শিষ্য ছিলেন এবং নিজে বহু বৎসর বস্তি অঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ সালে তাঁহার জন্ম হয়—নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া ১৯০৯ সালে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হন। ঐ সময়ে তিনি গোখলে প্রতিষ্ঠিত ভারতভৃত্য সমিতির সদস্য হন ও ৮ বৎসরকাল শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করিয়া শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। বিদেশে শ্রমিক আন্দোলন দেখিবার জন্য বহুবার তিনি ইউরোপে গিয়াছিলেন। তাঁহার মত নিষ্ঠাবান কর্মীর মৃত্যুতে দেশ আজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

গঙ্গা ও ভাগীরথীর মধ্যে স্থায়ী খাল—

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স গঙ্গা ও ভাগীরথীর মধ্যে একটি স্থায়ী খাল খননের প্রস্তাব করিয়া ভারত সরকারের নিকট পত্র দিয়াছেন। উত্তর ভারতের সহিত পশ্চিমবঙ্গের সরাসরি কোন নদীসংযোগ নাই। যখন ভাগীরথীর অবস্থা ভাল ছিল, তখন কলিকাতার সঙ্গে উত্তর ভারতের সরাসরি নদীপথে সংযোগ ছিল। প্রস্তাবিত খাল হইলে পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের অবশিষ্টাংশের মধ্যে কয়লা, পাট, চামড়া, কাঠ, তৈল প্রভৃতি দ্রব্য আনা-নেওয়ার বিশেষ সুবিধা হইবে। সে জন্য ফারাক্কায় গঙ্গার বাঁধ নির্মাণ এবং ভাগীরথী ও গঙ্গার মধ্যে খাল খনন করিলে যানবাহনের অসুবিধা দূর হইবে। এই বিষয় লইয়া সর্বত্র আলোচনা চলিতেছে। বৎসরে ১০ মাস ত্রিবেণীর উত্তরস্থ ভাগীরথী নদীতে জল থাকে না—ফলে নৌকা বা ষ্টিমার যাতায়াত করে না। ভাগীরথী ১২ মাস বহতা থাকিলে যান ও মানুষ যাতায়াতের অনেক সুবিধা বাড়িবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর সত্বর এ বিষয়ে ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

মাকালু শৃঙ্গে আরোহণ—

মে মাসের প্রথম ভাগে জেন ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে ফরাসী অভিযাত্রীদল মাকালু শৃঙ্গের ২৭৭৯০ ফিট উচ্চে আরোহণ করিয়াছেন। হিমালয় পর্বত অভিযানের ইতিহাসে পূর্বে আর কোন সমগ্রদল পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করিতে পারে নাই। অভিযাত্রীদল ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই মে পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেন। আবহাওয়া অনুকূল ছিল, তাহা হইলেও শীর্ষে পৌঁছিতে যথেষ্ট অসুবিধা হইয়াছিল। সুইস-জার্মান পরিচালিত ধবলগিরি অভিযান ব্যর্থ হইয়াছে। ৫নং শিবির ২২৪০০ ফিটে স্থাপন করা হইয়াছিল ও প্রচুর বরফপাতের জন্য অভিযান বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখনো ফরাসী, জার্মান, সুইস প্রভৃতি অভিযাত্রীদল আসিতেছে—স্বাধীন ভারতীয় যুবকগণ কি এ কাজে অগ্রসর হইবে না?

বারাসত বসিরহাট রেল—

স্থির হইয়াছে যে আগামী ১লা জুলাই হইতে বারাসত বসিরহাট রেল বন্ধ হইয়া যাইবে—এখনই সে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সে জন্য যাত্রীদের অসুবিধা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কলিকাতার স্থানচ্যুত প্রাইভেট বাস-মালিকগণকে ঐ অঞ্চলে বাস চালাইবার অনুমতি জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতেই দেওয়া হইবে। কলিকাতার লরীগুলিকে ঐ এলাকা হইতেই নগরীতে মাল আনা-নেওয়ার অনুমতিও দেওয়া হইবে। অতিরিক্ত বাস ও লরী চলিলে আর অসুবিধা থাকিবে না। লাইট রেলের যে সকল কর্মী বেকার হইবেন, তাঁহাদিগকেও ইষ্টার্ণ রেলে চাকরী দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এ সকল সংবাদ আনন্দের সন্দেহ নাই। রেল বন্ধ হইলে কেহই যদি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তবে অনর্থক ক্ষতি করিয়া রেল চালানো আদৌ যুক্তিযুক্ত হইবে না। আমাদের বিশ্বাস, সরকার এ বিষয়ে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া কাজ করিবেন।

দুর্গাপুরে কোক চুল্লী স্থাপন—

২রা জুন দিল্লী হইতে খবর আসিয়াছে যে কলিকাতা হইতে ১৪০ মাইল দূরে দুর্গাপুরে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কোকচুল্লী স্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন, তাহা সরকারীভাবে অনুমোদিত হইয়াছে। কোকচুল্লীর সঙ্গে উহা হইতে উপজাত যথা—অ্যামোনিয়া, সালফিউরিক এসিড, আলকাতরা, বেনজল প্রভৃতি উৎপাদনের সাহায্যকারী কারখানা ও একটি আলকাতরা শোধন কারখানা স্থাপনেরও ব্যবস্থা হইবে। ইহার ফলে পশ্চিম বঙ্গের বহু লোকের বেকার সমস্যার সমাধান হইবে। আসানসোল মহকুমার জঙ্গলপূর্ণ স্থানগুলিতে নূতন কারখানা হইলে পশ্চিমবঙ্গের বহু প্রকার উপকার হইতে পারিবে।

নূতন ভাইসচ্যান্সেলার—

কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন—তিনি জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁহার নামের সহিত অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের নাম সুপারিশ করিয়াছিলেন—চ্যান্সেলার অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক সিদ্ধান্তকে নিযুক্ত করিয়াছেন। অধ্যাপক সিদ্ধান্ত কৃতী ছাত্র ও কৃতী অধ্যাপক ছিলেন তাহার পর দেশসেবার কার্য্যে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। ১৮৯০ সালে তাঁহার জন্ম হয় ও কলিকাতায় তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন

তাঁহার নিয়োগ সকলের সমর্থন লাভ করিবে এবং আমাদের বিশ্বাস, ডাক্তার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের মত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানে প্রয়াসী হইবেন।

কবি নজরুলের জন্ম-জয়ন্তী—

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কলিকাতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাংলার শাশ্বত তারুণ্যের বাণী-বাহক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৫৭তম জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সর্বত্র দেশবাসী প্রার্থনা করিয়াছে—কবি যেন সত্বর রোগমুক্ত হইয়া নিজের পূর্বজীবন লাভ করেন। বহু বৎসর ধরিয়া কবি স্নায়বিক দৌর্বল্য রোগে শয্যাগত আছেন। তাঁহার চিকিৎসার বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হয় নাই। কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে ঐ উপলক্ষে সভায় শ্রীপবিত্র গাঙ্গুলী সভাপতিত্ব করেন এবং পাকিস্তান হাই-কমিশনার অফিসের অনুষ্ঠানে অধ্যাপক শ্রীকালিদাস নাগ সভাপতিত্ব করেন। কাজি নজরুল ইসলামের নামে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদক প্রদানের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আমরাও বিদ্রোহী কবির সত্বর আরোগ্য কামনা করি ও প্রার্থনা করি, তিনি পূর্বজীবন লাভ করিয়া আবার সুরঝঙ্কারে বঙ্গবাণী সমৃদ্ধ করুন।

তমলুক সুতাহাটায় নির্বাচন—

মেদিনীপুর জেলার তমলুক-সুতাহাটা হইতে নির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য শ্রীকুমারচন্দ্র জানা ভূদান যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করার জন্য পদত্যাগ করায় যে পদ শূন্য হইয়াছিল, তাহাতে নূতন সদস্য নির্বাচনের ফল গত ২৫শে মে ঘোষিত হইয়াছে। কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী শ্রীহৃষীকেশ ত্রিপাঠী তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু মহাসভাপ্রার্থী শ্রীসূর্য্যকুমার চক্রবর্তীকে ১৬ হাজার ভোটে পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হইয়াছেন। জানা মহাশয় প্রজাসমাজতন্ত্রী দলভুক্ত ছিলেন। ত্রিপাঠী মহাশয়ের জন্ম ১৯০১ সালে, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বি-এল এবং স্থানীয় বহু সমাজ-সেবার কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট।

পশ্চিমবঙ্গে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়—

পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে তিনটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া পশ্চিম বঙ্গে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় নাই। একটি দার্জিলিংয়ে, একটি বর্দ্ধমানে ও একটি কল্যাণীতে নূতন আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হইবে। পশ্চিম বঙ্গে মোট যে ৪ শত কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪ কোটি টাকা এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ব্যয়িত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক নহে বলিয়া এখানে ছাত্রদের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ করার অসুবিধা রহিয়াছে। ছাত্রগণকে অধ্যাপকদিগের অধীনে সর্বসময়ের জন্য রাখিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে কেতাবী শিক্ষা ছাড়াও তাহাদের নৈতিক চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা হইবে। এইরূপ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় যত অধিক হইবে, ততই দেশে উপযুক্ত মানুষ তৈয়ারী হইবে।

দশ হাজার শিক্ষক নিয়োগ—

বেকার সমস্যার আংশিক সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৫-৫৬ সালে আরও দশ হাজার শিক্ষক নিযুক্ত করিবেন। ম্যাট্রিক হইতে এম-এ পাশ পর্য্যন্ত যে কোন ব্যক্তি শিক্ষক হইতে পারিবেন ও নিজ যোগ্যতা অনুসারে বেতন পাইবেন। তাঁহাদের প্রত্যেককে পল্লী অঞ্চলে কাজ করিতে হইবে—তাঁহারা যে অঞ্চলে কাজ করিবেন, সেখানে তাঁহাদের বাসোপযোগী স্থান থাকা বাঞ্ছনীয়।

ভারতে যথেষ্ট চাউল মজুত—

ভারত সরকারকে বর্তমান বৎসরে (১৯৫৫-৫৬) বিদেশ হইতে কোন চাউল আমদানী করিতে হইবে না। গভর্ণমেণ্টের হাতে যথেষ্ট চাউল মজুত আছে—মজুত চাউলের পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ টন। ব্রহ্ম সরকারের সহিত চুক্তি মত ব্রহ্মদেশের চাউল ভারতে আসিয়াছে। ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতে এখনও সকল খাদ্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। পর্য্যাপ্ত খাদ্য উৎপন্ন না হইলে খাদ্যের মূল্য হ্রাস সম্ভব হইবে না।

নূতন প্রিন্সিপাল—

কলিকাতা আর-জি-কর মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ এস-কে-সেন পরলোক গমন করায় কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী ঐ কলেজের নূতন প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাঃ রায়চৌধুরী ১৯১৬ সাল হইতে ঐ কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট—বর্তমানে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার চেষ্টায় কলেজ আরও উন্নতিলাভ করিবে।

পশ্চিমবঙ্গে ৯টি জেলায় অন্নাভাব—

চাউলের মূল্য কম না হওয়ায় প্রতি বৎসর এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বহু স্থানে অন্নাভাব দেখা যায়। এবারও ৯টি জেলায় অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে—গত ১লা এপ্রিল হইতে ঐ সকল স্থানের লোকদিগকে সরকার কাজ দিয়া সাহায্য বাবদে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন—মেদিনীপুরে ১ লক্ষ লোককে কাজ দিতে হইয়াছে—২৪পরগণা, বাঁকুড়া, কোচবিহার, মালদহ, বীরভূম, জলপাইগুড়ী, হুগলী ও হাওড়ায় দুস্থদিগকে কাজ দিয়া সাহায্য করা হইতেছে। এ সময়ে ১৯৫২ সালে চাউলের মণ ছিল ৩০।৵০—১৯৫৩ সালে ২২॥০ ও ১৯৫৪ সালে ১৬॥০ ছিল—এ বৎসর ১৫৸৵০ হইয়াছে। কিন্তু লোকের ক্রয় ক্ষমতা না থাকায় ঐ দরেও চাউল কিনিতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গ অর্থ কর্পোরেশন—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ অর্থ কর্পোরেশনে নিম্নলিখিত তিনজনকে পরিচালক মনোনীত করিয়াছেন—(১) শ্রীবি-এম-বিরলা (২) শ্রীজি-বসু (৩) শ্রীএন-এন-মজুমদার। তাহা ছাড়া ঐ কর্পোরেশনে আছেন—(১) শ্রীধীরেন মিত্র (২) সার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় (৩) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (৪) শ্রীকে-কে-রায় (৫) শ্রীসি-ডি-খান্না ও (৬) শ্রীএইচ

ন্দ্যোপাধ্যায় ম্যানেজিং পরিচালক। ইহারা পশ্চিমবঙ্গে শিল্পসমূহকে র্থ সাহায্য বন্টন করিবেন।

উড়িষ্যায় আমের প্রাচুর্য্য—

কটকের সংবাদে প্রকাশ যে উড়িষ্যা প্রদেশে এ বৎসর যত বেশী াম ফলিয়াছে, গত ১৫ বৎসরের মধ্যে কখনও তত আম ফলে নাই। াজেই সেখানে আম খুব সস্তা হইয়াছে। খুচরা আট আনায় একশত ও পাইকারী ৫ আনায় একশত আম পাওয়া যাইতেছে। ভাল আম ঠিলে তাহা কলিকাতায় প্রেরণ করিয়া আম-ব্যবসায়ীরা লাভ করিবে াশা করিতেছে। খনার বচনে আছে—আমে ধান—কাজেই ধানও রূপ বেশী ফলিলে ভারতের খাদ্যাবস্থার উন্নতি হইবে।

হাইকোর্ট আপীলে দণ্ড বৃদ্ধি—

বিহারে নামকুম ভ্যাকসিন ইনিষ্টিটিউটের ১৮ লক্ষ টাকা চুরি করার অপরাধে শ্রীশান্তকুমার মিত্র ও শ্রীসুধীরকুমার বসু দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পাটনা হাইকোর্টে আপীল করিলে দণ্ড বর্দ্ধিত হইয়াছে। শ্রীমিত্রের অর্থদণ্ড ৫ লক্ষ স্থলে ১৫ লক্ষ টাকা করা হইয়াছে ও ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বহাল আছে। শ্রীবসুর ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ বহাল রাখা হইয়াছে। পূর্বে ছোটনাগপুরে অতিরিক্ত জুডিসিয়াল কমিশনারের নিকট বিচার হইয়াছিল, জাল-জুয়াচুরি প্রভৃতি অপরাধে এরূপ কঠোর দণ্ড প্রদত্ত হইলে লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হইবে এবং দুর্নীতি কমিয়া যাইবে।

উদ্ধবের প্রতি গোপী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

স্বাতির বিন্দু দরশনও বিনা চাতকেরে বঁধু রাখে তৃষায়।
কেন গেল ব্রজ ছেড়ে সে বলো না?
　　কেন থাকে দূরে আজো সে হায়?

আজ সুন্দর মথুরার পুরে করে সে বসতি—সবে কহে।
নয় তো গোপাল সে-নন্দলাল—রাজা হ'য়ে সেথা আজ রহে।
বনমালা নাই সে-বনমালীর, রতনমালিকা দোলে গলায়।
সেজে রাজসাজে নূপুরে তার কি গেছে ভুলে
　　বঁধু আজ সেথায়?
মুরলীও আর ভায় না অধরে? শোভে না কি শির
　　শিখী চূড়ায়?
কেন গেল ব্রজ ছেড়ে সে বলো না? কেন থাকে দূরে
　　আজো সে হায়?

নাই হেমসিংহাসন হেথায়—প্রেমের যমুনা বহে শুধু।
প্রতি ব্রজবাসি-মনোমন্দির আলো ক'রে আজো শ্যাম বঁধু।
"আমি আমি" হেথা নাই—আমাদের তনুমনধন
　　তারি কেবল।
গোকুলে কে নয়া প্রেমের পূজারী—
　　চায় না কে সখা, চির-শ্যামল?
তারি তরে সবি গেছে ভেসে—ছেড়ে আমাদের
　　শ্যাম গেল কোথায়?

কেন গেল ব্রজ ছেড়ে সে বলো না? কেন থাকে দূরে
　　আজো সে হায়!
কদম্বতলে আজো রাধারাণী করে নামগান শুধু তারি।
গোপীসখীদল মধুবনে নিতি তারি নাম গায় ঝংকারি'।
বিষণ্ণ ধেনু, বিহগকূজনো ব্যথাভরা সুরে বাজে হেন!
কুঞ্জে কুঞ্জে কাঁদে সমীরণ, ফোটে কলি ভয়ে ভয়ে যেন!
বারেকো সে দেখা দেবে না কি?—বোলো:
　　একবার যেন আসে হেথায়।
কেন গেল ব্রজ ছেড়ে সে বলো না? কেন থাকে দূরে
　　আজো সে হায়?

বোলো বঁধুয়ারে: তুমি বিনা নাথ, আমাদের
　　আর নাই কেহ।
নাই আশা, নাহি ভরসা, কামনা—নাই পরিজন, ঠাঁই গেহ।
ভালো বা মন্দ জানি না—সে জানো তুমি নাথ অন্তরযামী!
বোলো তারে—যদি ভুলি হে তোমারে, রবে না প্রাণ
　　এ-দেহে, স্বামী!
জনম জনম পথ চেয়ে মীরা—কোনোদিন দেখা দেবে কৃপায়।
কেন গেল ব্রজ ছেড়ে সে বলো না? কেন থাকে দূরে
　　আজো সে হায়?

(শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর সমাধিশ্রুত হিন্দি ভজনের অনুবাদ)

পাট ও পীঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

শিশু চলচ্চিত্র নির্ম্মাণের জন্য সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। জানা গিয়াছে, শীঘ্রই পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করা হইবে। শিশু চিত্র প্রযোজনা ও প্রদর্শনী এই উভয়বিধ ব্যবস্থাই পরিকল্পনায় আছে। এ পরিকল্পনায় কোন লাভালাভের উদ্দেশ্য নাই। কেবলমাত্র চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা ও মনোরঞ্জন বিধান উদ্দেশ্যেই পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই

হিন্দি নাগিন চিত্রে বাংলার খ্যাতিমান সংগীত পরিচালক শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় যে সুনাম অর্জন করিয়াছেন বাংলা কথা-চিত্র 'শাপমোচনে' তাহার সে সুনাম অক্ষুন্ন আছে। ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

সকল চিত্রের দৈর্ঘ্য ৩,৫০০ ফুটের অধিক হইবে না। চিত্র-শিল্প সংক্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে উৎসাহিত হন তজ্জন্য সরকার এই সকল চিত্রের প্রমোদকর বর্ত্তমানের নির্দ্ধারিত প্রমোদকর অপেক্ষা কম করিয়া ধার্য্য করিবেন। যাহাতে সকল শিশুই এই চিত্রগুলি দেখিয়া জ্ঞান ও আনন্দলাভ করিতে পারে তজ্জন্য সরকার ইহার প্রবেশ মূল্য ৵০ আনা হইতে ৷৷০ আনা ধার্য্য করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই পরিকল্পনাটির সাফল্য কামনা করিয়া বলিয়াছেন—"এই সকল ছবি আশাকরি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভে সমর্থ হবে। শিশুদের জন্য ভ্রমণ-কাহিনীমূলক ছবি তোলা হ'লে সহজেই তা সকল দেশ ও সকল সমাজের লোককে আকৃষ্ট করতে সমর্থ্য হবে।" শিশু-সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখকগণকে গল্প ও কাহিনী

বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত খ্যাতনামা আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীবিদ্যাপতি ঘো[illegible] রাণী রাসমণি কথাচিত্রের চিত্রগ্রহণে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তা[illegible] অবিস্মরণীয়। সম্প্রতি তিনি ছায়াসঙ্গিনী নামক একটি চিত্র পরিচালনা দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যা[illegible]

রচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার শীঘ্রই এতদুদ্দেশে আহ্বা[illegible] করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আমরা এই পরিকল্পনাটি সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

*　　*　　*　　*

দিল্লী-রাজ্যসরকারের বুরো অফ ইকনমিক্স এ[illegible] স্টাটিস্টিক্ প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায় [illegible]

মধ্যবিত্ত সমাজের লোকেদের নিকটই চলচ্চিত্রশিল্প অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। সেই তুলনায়, সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট এই শিল্প ততটা জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। বুরোর বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ ২৷৷০ আনার দর্শক সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। ১৯৫৪ সালে এই শ্রেণীর দর্শক সংখ্যা ছিল শতকরা ৭৫ জন, ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে ছিল ৬০ জন এবং ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে যে কোয়াটার শেষ হইয়াছে তাহার সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৫৬ জন মাত্র। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে যে কোয়াটার শেষ হইয়াছে তাহার দর্শক সংখ্যা ২৫,৭৪,৮৩০

মেক-আপের পূর্ব্বে দেবী-মালিনীর নায়ক ও নায়িকা বসন্তকুমার ও কাবেরী বসু। ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোয়াটারের দর্শক সংখ্যা ছিল ২৫,৮৪,০৩৫ জন। ইহার মধ্যে ১।০ আনা ও তন্নিম্ন শ্রেণীর দর্শক সংখ্যাই বেশী। সিনেমা এবং রেডিও যে মধ্যবিত্ত সমাজের নিকট অধিক আদরণীয় তাহা বুরোর বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কার-ভাবে বুঝা যায়। এখন আর এক বিষয়ে অনুসন্ধান করা আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। সেটি হইতেছে বড়-লোকদের সিনেমা রেডিওর মাধ্যমে আনন্দ উপভোগের প্রয়োজন হয় না কেন? আর কেনই বা অন্ত্যোজ ধণুর্গু্ণেরা সিনেমা রেডিরও মাধ্যমে আনন্দের আস্বাদের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়?

* * * *

বিগত চার বৎসরে সারা পৃথিবীতে অনেকগুলি নূতন চিত্রগৃহ নির্ম্মিত হওয়ায় ২,৫০০,০০০ জন নূতন দর্শক পাওয়া গিয়াছে। ইউনাটেড ষ্টেটের কমার্স ডিপার্টমেণ্টএর এক রিপোর্টে প্রকাশ, আমেরিকায় বর্ত্তমানে ১০৮,৫৩৭টি সিনেমা গৃহ আছে। ১৯৫১ সালে সিনেমা গৃহের সংখ্যা ছিল—৯৯,৫৪৩ এবং প্রায় প্রত্যেক শো-তেই এই সময় "হাউস ফুল" হইত। সে সময় দর্শক সংখ্যা ছিল ৫৬,৭৪৫,-৪৫১ জন। চার বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র চিত্রগৃহের বসিবার

কৃষ্ণ-সুদামা চিত্রে আলোক চিত্রশিল্পী ও গায়ক শ্রীপান্না সেন

আসন সংখ্যা ছিল—৫৪,০০০,০০০! এক ভারতবর্ষেই ১,১৪২টি নূতন চিত্রগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯৫১ সালে ভারতে চিত্রগৃহের সংখ্যা ছিল ২০৫৮। সারা পৃথিবীতে চিত্রগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় হলিউডের প্রচুর আয় বাড়িয়াছে। সমগ্র চিত্র-শিল্পের শতকরা ৪০ ভাগ মুনফা হলিউড গ্রহণ করিয়া থাকে!

* * * *

চলচ্চিত্র শিল্পে ভারত বর্ত্তমানে তৃতীয় স্থানাধিকারী। ১৯৫৩ সালে আমেরিকায় প্রযোজিত ছবির সংখ্যা ছিল

৩৬০, জাপান ৩০২, ভারত ২৫৯, হংকং ২০০, ইটালী ১৫০, ব্রিটেন ১৩৮, ফ্রান্স ১১১ এবং ওয়েষ্ট জার্ম্মানী ১০১।

*　　*　　*　　*

গত এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত কলিকাতায় মুক্তি-প্রাপ্ত ভারতীয় চিত্রের সর্ব্বমোট সংখ্যা—৫৩। ইহার মধ্যে হিন্দী ও অন্যান্য ভাষায় তোলা ছবির সংখ্যা ৩৯ এবং বাংলা ছবির সংখ্যা ১৪। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ছবির সংখ্যা ছিল ৩৫ এবং বাংলা ছবির সংখ্যা ছিল ১৮। উভয় বৎসরেই সর্ব্বসমেত মোট ছবির সংখ্যা ৫৩। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে বাংলা ছবির সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে।

*　　*　　*　　*

১৯৫৪ সালে ২৭৪টি ভারতীয় চিত্র সেন্সর-সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে। ১৯৫৩ সালে সেন্সর-সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা ছিল ২৬০। ইহার মধ্যে ১১৮টি হিন্দি ছবি। অর্থাৎ শতকরা ৪৩ ভাগ হিন্দী ছবি। ১৯৫৩ সালে বোম্বাই-এ প্রযোজিত ছবির সংখ্যা ছিল ১২২, ১৯৫৪ সালে প্রযোজিত ছবির সংখ্যা হইয়াছে ১৩৮। ১৯৫৪ সালে বোম্বাই-এ ১১৩টি হিন্দি, ১৮টি মারাঠি, ১টি বাংলা, ৩টি পাঞ্জাবী, ২টি ইংরাজী ও ১টি কানোদী।

*　　*　　*　　*

ভারতও পাকিস্থানের মধ্যে ভারতীয় চিত্র ব্যবসা সম্পর্কিত যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার নিরশনের জন্য ৩রা মে ইণ্ডিয়ান মোসান পিক্‌চার্স প্রোডিউসারস্ এ্যাসোসিয়েসন কর্ত্তৃক এক সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মিঃ এম, কে, বাতিল। উক্ত সভায় মিঃ বাতিল, মিঃ এম্ কে, মোদী ও মিঃ কিশোর সাহুকে লইয়া একটী ভারতীয় চিত্র-ব্যবসায়ী ডেলিগেশন্ গঠিত হয় এবং স্থিরীকৃত হয় যে এই ডেলিগেশন্ পাকিস্থান পরিভ্রমণ করিয়া যাহাতে এই অচল অবস্থার নিরসন করা যায় তৎসম্পর্কে চেষ্টা করিবেন। জানা যায় যে, শীঘ্রই এক আপোষ-মীমাংসা হওয়ার সম্ভবনা আছে। ভারতীয় পাকিস্থানের হাই কমিশনার রাজা গজনফর আলি খাঁ ও পাকিস্থানের ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ সি, সি, দেশাই-এর মধ্যে এতৎ সম্পর্কে আলোচনা চলিয়াছে। ব্যবসা-বিরোধ মীমাংস হোক্, আমরাও এই প্রার্থনা করি।

*　　*　　*　　*

পরিচালক বিনয় রায় শরৎচন্দ্রের দেবদাসের হিন্দী চিত্ররূপদান করিতেছেন। বাংলার প্রখ্যাতা-শিল্পী—শ্রীমতী সুচিত্রা সেন উক্ত চিত্রের নায়িকায় অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়া গত ২রা জুন বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। হিন্দী দেবদাসের ভূমিকালিপি এইরূপ :—দেবদাস—দিলীপকুমার, পার্ব্বতী—সুচিত্রা সেন, চন্দ্রমুখী—বৈজন্তীমালা, চুনীলাল—মতিলাল। দেবদাসের সঙ্গীত পরিচালনা করিবেন শ্রীশচীন দেববর্ম্মণ।

*　　*　　*　　*

পশ্চিম বঙ্গ যুব সম্মেলন যে সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে কুমারী সুপর্ণা লাহিড়ী রবীন্দ্র সঙ্গীতে বালিকাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছেন। ইনি শান্তিনিকেতন পাঠ-

কুমারী সুপর্ণা লাহিড়ী

ভবনের ছাত্রী এবং ইণ্ডিয়ান পালপ্ এণ্ড পেপারের সম্পাদক ও জার্ণালিষ্ট শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। আমরা ইহার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

শতাব্দীর পৃথিবী

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

এ পৃথিবী উত্তাল ফেনিল,
বিষ বাষ্পে পিঙ্গল-কপিশ ;
ধূমাচ্ছন্ন দক্ষিণ পবনে
ভেসে আসে ত্রাস।
কুয়াশা কুহেলি ঢাকা দিগন্ত-বলয় ;
তবু ওই পূর্বাচলে
অরুণ আভাস !
এ শতাব্দী উলঙ্গ উষর :
নীল চক্ষু হরিণীর মত
সৌরভ-কস্তুরী-মত্ত ভ্রান্ত বন পথে
করিতেছে মৃত্যুর সন্ধান।
রক্তে তার কামনার জ্বলে বহ্নিশিখা ;
চঞ্চল উদগ্র স্নায়ু,
মৃত্যু তৃষা অবনত প্রাণ।
এ শতাব্দী সংগ্রামের—বিপ্লব ধূসর !
কালের ললাটে ন্যস্ত
মহাকাল ঊর্ণ জটাজাল।
রক্তক্ষরা স্বেদবিন্দু
প্রেয়সীর ওষ্ঠপুটে দোলে :
ধরিত্রী বিস্ময়-স্তব্ধ,
শ্বাসরুদ্ধা আতঙ্ক-বিহ্বলা,
তেজস্ক্রিয় তরঙ্গ-হিল্লোলে।
বক্ষে তার বহ্নিমান চিতা :
—ত্রস্ত পলে পলে।
দিকে দিকে লোলুপ শ্বাপদ,
শব তৃষা অসহ উল্লাস !
তবু তীর্থ এ পৃথিবী,
শতাব্দীর এ মহাশ্মশান !
উদয় দিগন্তে ওই
নবতম জীবনের অরুণ আভাস !
এ শতাব্দী মানুষের :
রক্ত স্নানে হবে আজি অভিষেক তার।
বঞ্চিতের নিরন্ন নিঃশ্বাসে
কাঁপে তাই স্বর্ণলঙ্কা-চূড়া !
নবতম মহাযুগ আসন্ন-সংকেতে
সৃজন-কম্পিতা ব্যথাতুরা।
এ পৃথিবী তীর্থ আজি,
—শতাব্দীর লগ্ন এ মহান্ :
প্রায়শ্চিত্ত হোমানলে
হবে তার মহাপাপ ক্ষয়।
এ শতাব্দী মানুষের—এ পৃথিবী সুন্দর শ্যামল !
হবে সেথা জীবনের জয়।

পশ্চিমবঙ্গে ভূদান যজ্ঞ—

ভূ-দান যজ্ঞ সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সংযোজক শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী পশ্চিমবঙ্গে এ পর্য্যন্ত ৩৯০০ মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন। কোচবিহার জেলায় শ্রীভাণ্ডারীর ৮ দিনের পরিক্রমায় মোট ২৬০ বিঘা জমী সংগৃহীত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ভূদান যজ্ঞে ৩০ হাজার বিঘা জমী দানস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। ৫শত লোক সারাজীবন তাঁহাদের আয়ের এক ষষ্ঠাংশ দান করিবেন। তাহাতে বাৎসরিক ১৮ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে। এককালীন দান হিসাবে ১৬০০ টাকা ও ১৮ ভরি সোনা পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ভূদান যজ্ঞে ৩২জন জীবন-দানী আছেন। বাঁকুড়া জেলায় কৃষ্ণপুর, রামপুর ও গান্ধীগ্রাম ও মেদিনীপুর জেলার কুকাই গ্রাম ভূদান যজ্ঞে উৎসর্গীত হইয়াছে। শ্রীভাণ্ডারী অতঃপর দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ী মহকুমায় পরিক্রমা করিবেন। শ্রীভাণ্ডারী আজীবন দেশকর্মী—তিনি বিধানসভার সদস্য পদ ত্যাগ করিয়া ভূদান যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ আদর্শ অতি কম। শ্রীবিনোবা ভাবের নেতৃত্বে সারা ভারতে যে ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন চলিতেছে, তাহা পশ্চিমবঙ্গেও উপযুক্তভাবে প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন।

ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণ ও ধর্মের আদর্শ—

গত ২৯মে মে বাঙ্গালোরে প্রধান প্রধান ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়নের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করিতে যাইয়া ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণ বলেন—"ধর্ম মানব জীবনে পূর্ণতা দেয়, ধর্মের ভিতর দিয়া মানুষ এমন এক উপলব্ধি লাভ করে যেখানে তাহার জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশ সম্ভব হয়। এজন্য প্রয়োজন শুধু চেতনার পরিবর্তন, পুনর্জন্ম লাভ, অন্তরের বিকাশ এবং ধীশক্তির বিকাশ। ধর্ম ইন্দ্রজাল বা যাদুবিদ্যা নয়, ইহা হাতুড়ে বিদ্যা নয় অথবা কুসংস্কার নয়। পুরাতন গোঁড়ামি বা কুসংস্কারের সহিত ইহাকে এক করিয়া দেখা চলে না। ধর্মের প্রয়োজন আছে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন আছে—তাহা বুঝিয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। সম্রাট অশোকের দ্বাদশ উপদেশ এই যে—"যিনি নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন এবং অপর সম্প্রদায়ের প্রতি বীতরাগ—তিনি নিজ সম্প্রদায়ের ক্ষতি করেন।" ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণের মত দার্শনিক ও রাজনীতিক আজ যে ধর্মের কথা প্রচার করিতেছেন, সে বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে হইবে।

খাদি ও গ্রাম্য-শিল্পের উন্নতি—

ভারত সরকার সম্প্রতি খাদি ও গ্রাম্য-শিল্পের উন্নতির জন্য বহু সাহায্য ও ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। নিখিল ভারত খাদি ও গ্রামোদ্যোগ বোর্ডকে খাদি শিল্পের উন্নতির জন্য ৯৬৫৪৪০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই টাকা হইতে খাদি বিক্রয় ও উৎপাদন, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ জন্য খাদি ক্রয় ইত্যাদি যে কোন উদ্দেশ্যের জন্য বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত রেজিষ্টার্ড সমিতি বা প্রতিষ্ঠানকে ৮০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইবে। ব্যাপক আকারে গ্রাম্য-শিল্পের উন্নতির জন্য ৩৫টি নির্বাচিত এলাকার ক্ষেত্র-সমিতিগুলির মধ্যে বণ্টনের জন্য বোর্ডের হাতে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। উন্নত ধরণের হস্ত নির্মিত কাগজ-শিল্পের উন্নতির জন্য বোর্ডকে ৩৩৫০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে। হস্ত-চালিত ও বলদ-চালিত ময়দা চাকীর উন্নতি সাধনের জন্য বোর্ডের হাতে ২৫৩৬০০ টাকা সাহায্য স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। পাটের সুতা কাটার দশটি চরকা ক্রয়ের জন্য সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠানকে এক হাজার টাকা এবং মুঞ্জ ঘাস হইতে সুতা কাটা ও বয়ন শিক্ষাদানের জন্য ২২শত টাকা ব্যয় করা হইবে।

গোয়া সমস্যা ও শ্রীনেহরু—

রুসিয়া যাত্রার পূর্বে শ্রীজহরলাল নেহরু পুনায় এক জনসভায় বলেন—"গোয়া সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার সৈন্য প্রেরণ বা পুলিসী ব্যবস্থার ন্যায় কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না। কাহারও মনে যদি এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে যে গোয়াকে পর্তুগীজ আধিপত্য হইতে মুক্ত করার জন্য ভারত সরকার পুলিসী ব্যবস্থা অবলম্বন বা বলপ্রয়োগ করিতে যাইবেন, তবে তিনি ভুল করিতেছেন। এ ধরণের কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইবে না। শান্তিপূর্ণ উপায়ে গোয়া সমস্যা সমাধানের নীতিই অনুসরণ করা হইবে এবং তজ্জন্য প্রয়োজন হইলে কয়েক মাস বা দুই এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। শান্তিপূর্ণ ও নিয়মসম্মত উপায়ে সকল আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই ভারত অগ্রসর হইতেছে। পর্তুগাল, পাকিস্তান বা সিংহল—যাহারই সহিত ভারতের যে কোন বিষয়ে বিরোধ থাকুক না কেন, সেগুলির সমাধানেরজন্য ভারত সংগ্রামের পথ গ্রহণ করিবে না। গোয়া সমস্যার সমাধান সুনিশ্চিত—তবে সে জন্য কিছু সময় লাগিতে পারে।" শ্রীনেহরুর এই উক্তিতে ভারতবাসীর মনে স্বস্তি ফিরিয়া আসিবে।

হাওড়া জেলা-বোর্ড—

গত ২১শে মে হাওড়া জেলা বোর্ডের নবনির্বাচিত সদস্যদের প্রথম সভায় ডাঃ মণিলাল বসু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। শ্রীঅবনীকুমার বসু (উলুবেড়িয়া) ও শ্রীভূদেব মল্লিক (আমতা) উভয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন। গত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল জেলা বোর্ডের সকল আসনই দখল করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কৃষি উন্নয়নের প্রস্তাব—

২৮শে মে দিল্লীতে বিভিন্ন রাজ্যসরকারের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারীদের সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের জন্য ৩৪টি প্রস্তাবের মধ্যে ২৫টি প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় ৫ হাজার নলকূপ খনন করা হইবে। তাহার মধ্যে ২ হাজার ৬ শত ৫০টি পরীক্ষিত স্থানগুলিতে খনন করা হইবে। উপযুক্ত পরীক্ষার পর নূতন স্থানে বাকী ২৩ ০ নলকূপ বসানো হইবে। জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকগুলির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ১৯৬০ সালের মধ্যে প্রায় ৩৮ হাজার গ্রাম-সেবক তৈয়ার করা প্রয়োজন। এ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ৪৪টি শিক্ষণ কেন্দ্রে মাত্র ২৫ হাজার গ্রাম-সেবককে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। আরও নূতন শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। ঘৃত, দুগ্ধ, মাখন প্রভৃতি উৎপাদনের উন্নয়ন ব্যবস্থার কথা সম্মিলনে আলোচিত হইয়াছে। সহরাঞ্চলে ৩০টি ও গ্রামাঞ্চলে ১০টি দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র খোলা হইবে, দুগ্ধ শুষ্ক করার জন্য ৪টি যন্ত্র স্থাপন করা হইবে। কৃষি গবেষণা কাজের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। সরকারী কৃষিবিভাগগুলি এ সকল বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই মঙ্গলের কথা।

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়—

রকফেলার ফাউণ্ডেসনের সহযোগিতায় ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটুট অব আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রির ডিরেক্টর শ্রীঅজিত

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

মুখোপাধ্যায় আগামী ৩০শে এপ্রিল শিক্ষা-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে

বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন। ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে তাঁহার চারিমাসব্যাপী অবস্থানকালে তিনি রোম, মিলান, জুরিখ, প্যারী, স্টকহলম, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, টোকিও, জাকর্তা প্রভৃতি স্থানের শিল্প-সংগ্রহশালা এবং হাতের কাজের ও নক্সা নমুনার বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করিবেন। এতদ্‌ভিন্ন তিনি আধুনিক শিল্পধারা ও ব্যবহারিক শিল্প আন্দোলনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিতও সাক্ষাৎভাবে সংযোগ স্থাপন করিবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমুখোপাধ্যায় ভারতীয় শিল্প ও প্রত্নতত্ত্বে একজন সুপণ্ডিত ও একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা।

কলিকাতায় বৃহত্তম জল-নিকাশ ব্যবস্থা—

বৃহত্তর কলিকাতার বৃহত্তম জল-নিকাশ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা ১৯৫৬ সালের জুন মাসের মধ্যে শেষ করা হইবে স্থির হইয়াছে। উহার ফলে ভাঙ্গড়, হাড়োয়া, রাজারহাট, দমদম, খড়দহ ও বরাহনগর থানা এলাকার ১১৬ বর্গ মাইল জমীর উন্নতি সাধিত হইবে। ঐ অঞ্চলের প্রায় ৪০ বর্গ মাইল জমীতে চাষ-আবাদ হইবে ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাসোপযোগী উপনগরী স্থাপিত হইবে। এখন ঐ অঞ্চলে প্রত্যহ তিন হাজার লোক খাল খুঁড়িতেছে। উহা যাত্রাগাছি-ঘুণি-বাগজলা পরিকল্পনা নামে পরিচিত। উহার জন্য প্রায় ৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ১৭ বর্গ মাইলে সহর ও ৯৯ বর্গ মাইলে গ্রামাঞ্চল থাকিবে। এই বিরাট পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে কলিকাতা সহরের উত্তর ও পূর্বদিকের বহুলাংশ এবং দক্ষিণের কতকাংশ জলাজমির উদ্ধার হইবে। এই অঞ্চলে খাদ্যাদি উৎপাদন ও বর্দ্ধিত হইয়া সহরের খাদ্যাভাব বহুলাংশে দুরীভূত হইবে।

শ্রীনেহরুর মস্কো যাত্রা—

গত ৫ই জুন ভারতের প্রধান-মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু মস্কো যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ১৬ দিন ধরিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শন করিবেন। রুসিয়া ছাড়াও তিনি যুগোশ্লাভিয়া, পোলাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও মিশরে শুভেচ্ছামূলক ভ্রমণ করিবেন। সফরে তাঁহার প্রায় ৫ সপ্তাহ লাগিবে। যাইবার সময় তিনি বলেন—"রাজনীতিক বা অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া আমি রুসিয়া বা পূর্ব-ইউরোপীয় দেশসমূহে যাইতেছি না। কোন রাষ্ট্রজোটের সহিত কোন ব্যাপারে কোনরূপ চুক্তি সাধনের উদ্দেশ্যও আমার নাই বা কোন সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিতেও আমি ইচ্ছুক নই। বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সহিত আমি আলোচনা করিব, তাহাদের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। পৃথিবী আজ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, সেগুলি সম্পর্কে তাঁহারা আমার মত জানিতে চাহিলে তাহা প্রকাশ করিব। বর্তমান যুগে কোন দেশই বিশ্বরাজনীতি হইতে দূরে থাকিতে পারে না। ভারত কদাপি অন্য দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার জন্যই ভারত স্বীয় প্রভাব প্রয়োগ করিবে। শ্রীনেহরুর এই উক্তি শুধু ভারতবাসীদের নহে, সমগ্র বিশ্ববাসীর বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তাঁহার এই নীতি জগতের সম্মুখে নূতন পথ প্রদর্শন করিবে।

কাঞ্চনজংঘা জয়—

ডাঃ চার্লস ইভান্সের নেতৃত্বে একটি বৃটিশ অভিযাত্রীদল এ পর্য্যন্ত অপরাজিত—বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম পর্বত শিখর ২৮১৪৬ ফিট উচ্চে পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজংঘায় আরোহণ করিয়াছেন। ২৫শে মে ৯ জন সদস্য লইয়া গঠিত দল তথায় গমন করেন। এই শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর পর্বতশৃঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর দুরারোহ। সিকিমের অধিবাসীরা কাঞ্চনজংঘা গিরিশৃঙ্গকে তাহাদের দেবতার আবাসভূমি বলিয়া মনে করে বলিয়া অভিযাত্রীদল পর্বতশৃঙ্গের শীর্ষ দেশে না উঠিয়া চূড়ার কয়েক ফিট নিচেই থামিয়া যান।

পাক-আফগান বিরোধ—

মিশরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ণেল আজওয়ার সাদাত পাক-আফগান বিরোধের মীমাংসার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত ৫টি দেশের প্রতিনিধি লইয়া সালিসী কমিশন গঠন করিয়াছেন—(১) ইরাণ (২) মিশর (৩) ইরাক (৪) তুরস্ক ও (৫) সৌদী আরব। শীঘ্রই কমিশনের বৈঠক বসিবে। তৎপূর্বে রাজা ইবন সৌদী পাকিস্তান ও

আফগানিস্তানে দূত পাঠাইয়া বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করিতেছেন।

বালিকার কৃতিত্ব—

এই বৎসর উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ, পরীক্ষায় কুমারী কাজল পালিত বালক ও বালিকাদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাহার বর্ত্তমান বয়স ষোল

কুমারী কাজল পালিত

বৎসর মাত্র। কুমারী কাজল কথক, ভারতনাটাম্ প্রভৃতি নৃত্যেও সবিশেষ পারদর্শিনী এবং বোম্বাইএর গন্ধর্ব্ব মহা-বিদ্যালয় মণ্ডলের সঙ্গীত প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রী শ্রী সি, ডি, দেশমুখ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডাঃ ভি, বি, কেশকার এবং উড়িষ্যার রাজ্যপাল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কুমারী কাজলের নৃত্য দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়াছেন। কুমারী কাজল পালিত উড়িষ্যার রাজ্যপালের সেক্রেটারী শ্রীসুনীলচন্দ্র পালিতের কন্যা।

রুশিয়া যুগোশ্লাভিয়া মিতালী—

রুশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া এবং বিশ্বশান্তি দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে যুক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাহাদের ৭ বৎসরের মনোমালিন্যের অবসান ঘটাইয়া এক ঘোষণায় স্বাক্ষর করিয়াছে। সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন ও মার্শাল টিটো ঐ যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। আলোচনার ফলে মানবতার ভিত্তিতে উভয় দেশের নাগরিকদের নিজ নিজ দেশে ফিরাইয়া দিবার ব্যাপারেও ঐক্যসত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পরলোকে স্নেহময় দত্ত—

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক স্নেহময় দত্ত গত ১লা জ্যৈষ্ঠ সোমবার অপরাহ্ণে তাঁহার কলিকাতা বালীগঞ্জস্থ বাসভবনে
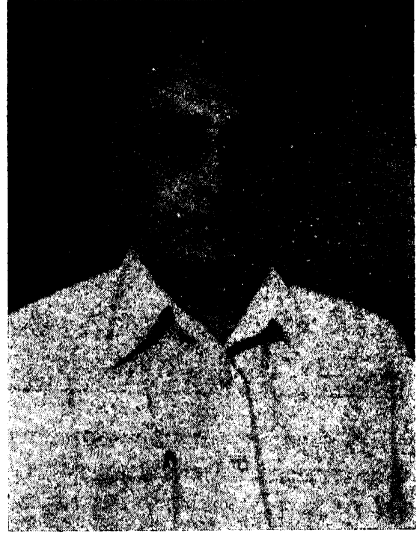
স্নেহময় দত্ত

৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তিনি দীর্ঘকাল ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন। চিকিৎসার জন্য গত মার্চ মাসে তিনি লণ্ডনে যান ও ২৫শে এপ্রিল ফিরিয়া আসেন। ১৯১৫ সালে এম-এসসি পাশ করিয়া তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালে লণ্ডন হইতে তিনি ডি-এসসি হইয়া আসেন ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সালে তিনি শিক্ষা বিভাগের ডেপুটী

সেক্রেটারী ও ১৯৪৭ সালে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার নিযুক্ত হন। অবসর গ্রহণের পর ১৯৫১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার নিযুক্ত হইয়া ১৯৫৪ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত ঐ কাজ করিয়াছিলেন। শিক্ষাব্রতী ও পণ্ডিত হিসাবে তিনি সর্বজন পরিচিত ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যুতে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল (জন্মদিন উপলক্ষে গৃহীত আলোক-চিত্র)

উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমদনমোহন গোস্বামী কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের উপর প্রবন্ধ লিখিয়া বর্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-ফিল উপাধি লাভ করিয়াছেন

দেওঘরে রবীন্দ্র জন্মোৎসব—

দেওঘরের রাজনারায়ণ বসু পাঠাগারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৯৫তম জন্ম-উৎসব পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ঢাকা নিবাসী শ্রীআশুতোষ রায় উক্ত পাঠাগারকে রবীন্দ্রনাথের একটী আবক্ষ মূর্তি দান করেন। মূর্তিটী পাঠাগারের বিস্তৃত হলে স্থাপিত হইয়াছে। প্রবীণ সাহিত্য সেবী শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। কবির জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

আরিয়াদহ রামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গলের শিশু বিভাগ উদ্বোধন উপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগের প্ল্যানিং অফিসার শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কবিগুরুর মূর্তিটী প্রস্তত করিয়াছেন শ্রীরাধিকা রায়চৌধুরী। পাঠাগারের উদ্যোগী যুবকদের দ্বারা রবীন্দ্র সাহিত্য সংগ্রহ ও প্রচার করা হইয়াছিল।

পরলোকে বিজয়রত্ন মজুমদার—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বিজয়রত্ন মজুমদার গত ২রা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টার সময় ৬১ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা বালীগঞ্জের বসতবাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্মাহত হইলাম। তিনি কিছুকাল হইতে অসুস্থ ছিলেন। 'বাংলা' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া সম্পাদক ছিলেন এবং তিনি বহু বাংলা ও ইংরাজি প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। ভারতবর্ষে বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহার বহু লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি একজন সমাজসেবী কর্মী ছিলেন এবং ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহার অমায়িক ও মধুর ব্যবহার এবং বন্ধু-প্রীতি তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করি ও তাঁহার আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।
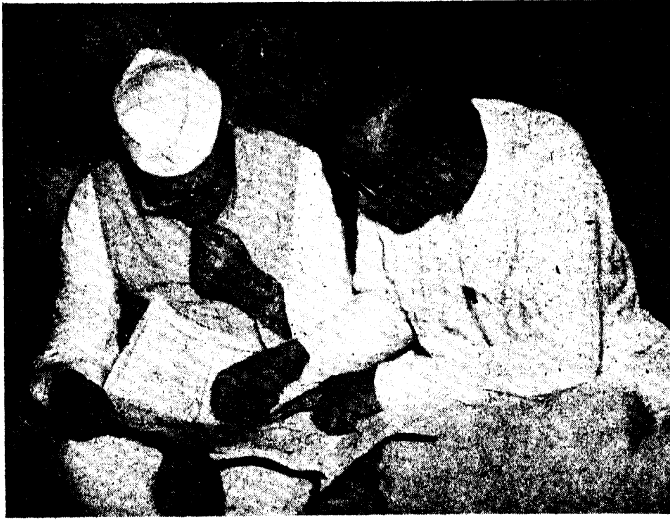
কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

অনিবার্য্য কারণে গত সংখ্যায় ও বর্ত্তমান সংখ্যায় "মেয়েদের কথা" বিভাগ প্রকাশ করা হয় নাই। আগামী সংখ্যা হইতে নিয়মিত ভাবে ও উন্নতরূপে প্রকাশিত হইবে।

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

অষ্ট্রেলিয়া-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ক্রিকেটঃ
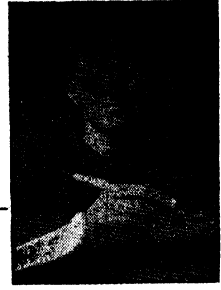
অষ্ট্রেলিয়াঃ ৬৬৮ (কিথ মিলার ১৩৭, আর লিণ্ডওয়াল ১১৮, আর আর্চার ৯৮, আর হার্ভে ৭৪, এল ফেভাল ৭২ ; ডিউডনি ১২৪ রানে ৪ উইঃ) ও **২৪৯** জনসন ৫৭, ফেভাল ৫৩ ; এ্যাটকিনসন্ ৫৬ রানে ৫ এবং স্মিথ ৭১ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজঃ ৫১০ (ডি এ্যাটকিনসন ২১৯, ডেপিজ ১১২) ও **২৩৪** (৬ উইকেটে। ওয়ালকট ৮৩)

ব্রিজ টাউনে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ৪র্থ টেষ্ট খেলা ড্র গেলে অষ্ট্রেলিয়া 'রাবার' জয়ী হয়। অনুষ্ঠিত চারটি টেষ্ট খেলার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া ২টিতে জয়ী হয় এবং ২টি খেলা ড্র যায়। ফলে ৫ম টেষ্ট খেলার আগেই টেষ্ট সিরিজে হার-জিতের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায়।

আলোচ্য টেষ্ট খেলার ১ম ইনিংসে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক এ্যাটকিনসন এবং উইকেট রক্ষক ডিপিজ ৭ম উইকেটের জুটিতে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ্ব রেকর্ড (৩৪৪ রান) করেন সাক্সেস দলের রঞ্জিৎ সিংজী (২৩০) এবং নিউহাম (১৫৩) ১৯০২ সালে এসেক্সের বিপক্ষে।

আগা খাঁ কাপঃ

বোম্বাইয়ের আগা খাঁ হকি টুর্ণামেন্টের ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিস ২-১ গোলে লুসিটানিয়ান্স দলকে পরাজিত করে। এখানে উল্লেখযোগ্য, লুসিটানিয়ান্স দল ১৯৫৩ সালে কাপ জয়ী হয়। ১৯৫৪ সালে প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকে ; কারণ আগা খাঁ কাপ টুর্ণামেন্টের উদ্যোক্তা, বোম্বাই জিমখানার সঙ্গে বোম্বাই প্রভিন্সিয়াল হকি এসোসিয়েশন-এর প্রতিযোগিতার স্থান এবং তারিখ নিয়ে মতবিরোধ হয়।

এশিয়ান ভলিবল চ্যাম্পিয়ানসীপঃ

টোকিওতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান ভলিবল প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। মোট চারটি দেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে—ভারতবর্ষ, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং চীন। এশিয়ান নিয়মে খেলে জাপান দক্ষিণ কোরিয়া এবং চীনকে হারায় এবং চ্যাম্পিয়ানসীপ পায়। আন্তর্জাতিক নিয়মে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় ভারতবর্ষ জাপানকে হারায়।

ডেভিস কাপঃ

ইউরোপীয় জোনের ২য় রাউণ্ডে ভারতবর্ষ ৫-০ খেলায় ঈজিপ্টকে পরাজিত করে।

টমাস কাপঃ

তৃতীয় বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন (টমাস কাপ) প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে মালয় ৯-০ খেলায় ডেনমার্ককে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি তৃতীয়বার টমাস কাপ জয়ী হয়েছে। প্রতিযোগিতার আরম্ভের বছর থেকেই মালয় টমাস কাপ পেয়ে আসছে।

আলোচ্য বছরের খেলায় ভারতবর্ষের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গতবার সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ ৪-৭ খেলায় আমেরিকার কাছে হেরে ছিল। কিন্তু এবার ভারতবর্ষ ৬-৩ খেলায় আমেরিকাকে হারিয়ে ইণ্টার জোন ফাইনালে ওঠে। ইণ্টার জোন ফাইনালে ডেনমার্ক ৬-৩ খেলায় ভারতবর্ষকে হারিয়ে গত বছরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়।

ওবেদুল্লা গোল্ড কাপ ঃ

অল্-ইণ্ডিয়া ওবেদুল্লা গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে উত্তর প্রদেশ ১-০ গোলে ডি-এস-এ মিরাট দলকে পরাজিত করেছে।

৪ মিনিটের কম সময়ে ১ মাইল দৌড় ঃ

গত ২৮শে মে তারিখে ইংলণ্ডের হোয়াইট সিটি ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বৃটিশ গেমস প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরীর লাসলো তাবোরী, ইংলণ্ডের সি চ্যাটাওয়ে এবং ব্রেন হিউসন চার মিনিটের কম সময়ে এক মাইল দূরত্ব অতিক্রম করার গৌরব অর্জন করেছেন। এ পর্য্যন্ত মাত্র নীচের পাঁচজন দৌড় বীর ৪ মিনিটের কম সময়ে ১ মাইল পথ অতিক্রম করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

(১) রোগার ব্যানিষ্টার (ইংলণ্ড)—সময় ৩ মিঃ ৫৯.৪ সেঃ। ১৯৫৪ সালের মে মাসে অক্সফোর্ডে ৪ মিনিটের কম সময়ে ১ মাইল পথ অতিক্রম করার সর্ব্বপ্রথম রেকর্ড স্থাপন করেন।

(২) জন ল্যাণ্ডি (অষ্ট্রেলিয়া)—সময় ৩ মিঃ ৫৮ সেঃ (বিশ্বরেকর্ড)। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে ফিনল্যাণ্ডে।

(৩) লাসলো তাবোরী (হাঙ্গেরী)—সময় ৩ মিঃ ৫৯ সেঃ।

(৪) সি চ্যাটাওয়ে (ইংলণ্ড) সময় ৩ মিঃ ৫৯.৮ সেঃ।

(৫) ব্রেন হিউসন (ইংলণ্ড) সময় ৩ মিঃ ৫৯.৮ সেঃ।

রামনাথন কৃষ্ণাণ ঃ

১নং ভারতীয় লন টেনিস খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণাণ ম্যাঞ্চেষ্টারে অনুষ্ঠিত নদার্ণ লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপের খেলায় উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান জরোশ্লাভ ড্রবনীকে ষ্ট্রেটসেটে হারিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উক্ত প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে তিনি বৃটনের তরুণ ডেভিস কাপ খেলোয়াড় রোগার বেকারের কাছে হার স্বীকার করেন।

১৮ বছর বয়স্ক তরুণ খেলোয়াড় কৃষ্ণাণের কাছে প্রবীণ খেলোয়াড় ড্রবনীর পরাজয় টেনিস খেলায় অন্যতম অপ্রত্যাশিত ফলাফল হিসাবে বেশ কিছুদিন স্মরণ থাকবে।

ফুটবল লীগ ঃ

ক'লকাতার মাঠে ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেল চলছে। ফুটবল লীগের প্রধান আকর্ষণ হ'ল প্রথম বিভাগের খেলা। গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব চারটি পয়েন্ট নষ্ট করেছে ১০টা খেলায় ১৬ পয়েন্ট। হার রেলওয়ে স্পোর্টস দলের কাছে ০—১ গোলে। ড্র করেছে মহমেডান স্পোর্টিং এবং এরিয়ান্সের সঙ্গে। মোহনবাগান-রাজস্থানের খেলাটি পূরো সময় পর্য্যন্ত খেলানো হয়নি। কারণ সবুজ গ্যালারীর একশ্রেণীর দর্শকদের বিক্ষোভের ফলে রেফারী খেলাটি বন্ধ করে দেন। এই খেলা সম্পর্কে আই এফ এ এখনও কোন সিদ্ধান্ত করেননি। খেলায় রাজস্থান ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। রাজস্থানের এই গোলটি অফ্ সাইড থেকে হয়েছে—এই ধারণা নিয়ে সবুজ গ্যালারী থেকে এক শ্রেণীর দর্শক মাঠে জুতো এবং ইট ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানায়।

লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের পাল্লা থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বেশ কয়েক ধাপ পিছিয়ে গেছে—১১টা খেলায় ১৩ পয়েন্ট।

কালীঘাট, রাজস্থান, খিদিরপুর এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের কাছে তারা হেরেছে। রাজস্থান ক্লাব বর্ত্তমান ফুটবল মরসুমে ভাল খেলছে। এদের আক্রমণ এবং রক্ষণভাগ সমান শক্তিশালী। রাজস্থানের ৮টা খেলায় জয় ৭টা এবং হার ১টা।

লীগের খেলায় একমাত্র মহমেডান স্পোর্টিং দলই এখনও পর্য্যন্ত অপরাজেয় আছে। তাদের ৯টা খেলায় জয় ৪, খেলা ড্র ৫টা—পয়েন্ট ১৩।

সাহিত্য সংবাদ

পিতামহ ঃ বনফুল

সম্প্রতি প্রকাশিত ""পিতামহ" পুস্তকখানি উপন্যাস সাহিত্যে বনফুলের অভিনব প্রচেষ্টার একটি মনোহর উদাহরণ। আঙ্গিক নূতন, বিষয়বস্তু নূতন, প্রকাশ ভঙ্গীও নূতন। আমি বহুবার বলিয়াছি—সাহিত্যের রস, আর যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত সম্প্রদায়ের অন্বেষনীয় বেদান্ত প্রতিপাদিত রস মূলে এক। রসশাস্ত্রকারগণ সাহিত্যের রসের পরিচয় দিয়াছেন—সত্ত্বোদ্রেককারী, অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দ চিন্ময়, বেদান্তর স্পর্শশূন্য এবং ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর। পিতামহ উপন্যাসে আমার উক্তির সমর্থন মিলিবে। ব্রহ্মা বাণীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"অন্ধকারটাই বা কি, আমিই বা কে"? সরস্বতী উত্তর দিতেছেন—"অন্ধকার অনিশ্চয়তা, আপনি জিজ্ঞাসা। অন্ধকার পতিত ভূমি, আপনি হলায়ুধ কৃষক, আপনি যাচাই করছেন নিজের শক্তিকে, রূপ দিতে চাইছেন অনন্ত কল্পনাকে। সংক্ষেপে নিজেকেই খুঁজছেন আপনি আপনার সৃষ্টির মধ্যে"—ব্রহ্মা বলিলেন "চার্ব্বাকের বিরুদ্ধে আমার রাগটা তাহলে মেকী বল"! বাণী বলিলেন "আপনার রাগ অনুরাগ কিছু নাই। আপনি নির্ব্বিকার স্রষ্টা। নিজেকে নিয়েই খেলা করছেন অনাদি কাল থেকে। খেলনাগুলোও আপনার খেলার উপলক্ষ মাত্র। কখনো সেগুলো সাজাচ্ছেন, কখনো আবার অবহেলাভরে ফেলে দিচ্ছেন। কখনো ভাঙছেন, কখনো গড়ছেন।" সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিতেই আনন্দ। মানব, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ সর্ব্বত্রই সেই রসস্বরূপ যে আপনার আনন্দে আপনি বিলসিত হইতেছেন, তরু লতায় আকাশে বাতাসে তাহারই আনন্দ হিল্লোলিত হইতেছে, পিতামহেও তাহার নিদর্শন আছে। খদ্যোত ও শশাঙ্কে, কোকিলে ও পেচকে, সিংহ গর্জ্জনে ও প্রণয় কূজনে সেই একই আনন্দের অভিব্যক্তি। সাধু ও তস্করের জীবনে তাহার সমান বিলাস। অবশ্য এই সমস্ত অতি পুরাতন কথাগুলি বলিবার জন্যই লেখক পিতামহ রচনা করেন নাই। তাহার সৃষ্ট চার্ব্বাক, কালকূট, সুন্দরানন্দ, মিন্মির কুলিশপাণি, কমলকিশোর, শিখর সেন, সুরঙ্গমা, বর্ণমালিনী, মেঘমালতি ধারাবতী, নীলোৎপলা, তানে, অবন্ধনা, আলেয়া আপন আপন স্বাতন্ত্র্য লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; বিকশিত হইয়াছে এবং অতি স্বাভাবিক ভাবেই আপন আপন বৈশিষ্ট্য অনুরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে। আনুসঙ্গিক যে সমস্ত ঘটনা ও যে বাতাবরণের পথে এই প্রকাশ বিকাশ ও পরিণতি সংঘটিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও কোনরূপ কৃত্রিমতা নাই। উপরে উদ্ধৃত তথাকথিত পুরাতন কথাগুলি এই সমস্ত চরিত্র, ঘটনাবলী ও বাতাবরণে অতি স্বাভাবিকভাবেই মাত্র আর একবার নূতন করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

পিতামহ লিখিবার জন্য লেখককে পুরাণ তন্ত্র উপনিষদ আদির গহনে প্রবেশ করিতে হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার মধ্যে অপরিপাক-জনিত পাণ্ডিত্য উদ্গারের কোন ক্ষুদ্রতম প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হয় না। লেখক দেখাইয়াছেন পুরাণের চার্ব্বাক, পুরাতনী ধারামতী আজিও আছে। সুরঙ্গমা বর্ণমালিনী মেঘমালতী কায়া বদল করিয়া যুগের পর যুগ জন্মগ্রহণ করিতেছে। একালের আলেয়া অবন্ধনা তাহাদেরই যুগোপযোগী সংস্করণ মাত্র।

ব্রহ্মাই আদি কবি। সাগরাম্বরা ধরণী, তারকিত নীলাকাশ, ধরণীর নদী পর্ব্বত কানন কান্তার উপবন সরোবর, আকাশ বজ্র বিদ্যুৎ, এ সমস্ত তাঁহারই কবিকৃতি। রূপে বিচিত্র, সৌন্দর্য্যে মনোহর, লাবণ্যে উজ্জ্বল, প্রচণ্ডতায় ও প্রাবল্যে ভয়াল, বিরাট বিশাল তাহার রচনা। কিন্তু পিতামহেরও প্রতি স্পর্দ্ধী আছে। বৈদিক সময় হইতে আধুনিক কালের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, অতীতের ঋষিগণ এবং অধুনাতম কবিগণ সকলে পিতামহেরই সগোত্র, এমন কি অনেকে তাহারই অংশ সম্ভূত। তাঁহাদের রচনাও, সৌন্দর্য্যে, বৈচিত্র্যে, বিশালতায় মনোহারীত্বে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমার তো মনে হয় বিধাতার রচনা এবং মানবের রচনা একে অন্যের পরিপূরক। একজন না থাকিলে অন্যজন অসম্পূর্ণ। অনেক সময় একের রচনা দিয়া অন্যকে বুঝিতে হয়। পিতামহের মত একালের স্রষ্টারও সৃষ্টিতেই আনন্দ। অন্ধকারে ও আলোকে তাহার কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। পাপে পুণ্যে তিনি সমান উদাসীন। হত ও হত্যারকের জীবনে রসের আস্বাদনে তিনি কোন পার্থক্য অনুভব করেন না। আবার এই কবির মধ্যেও পিতামহই আপন সৃষ্টির সম্পূর্ণতা দান করেন। রচয়িতা পিতামহে আমার এই কথার সাক্ষ্যদান করিবেন। তাহার শিখর সেন, কমলকিশোর, আলেয়া, অবন্ধনা—পিতামহ-ব্রহ্মার চার্ব্বাক, কালকূট, সুরঙ্গমা ও বর্ণমালিনীর প্রতিযোগী সৃষ্টি মনে করিতে কোন বাধা নাই।

জগৎ এবং জীবন লইয়া উভয়েরই কারবার। কালকূট বর্ণিত কাপালিকের শব সাধনা, অথবা চার্ব্বাকের সৌন্দর্য্য সাধনা—পিতামহে বর্ণিত এই দুইটী সাধন পথে—বিভিন্ন উপায়ে জগৎ এবং জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে। অবশ্য সাধন পথ আরো অনেক আছে, কিন্তু সে কথা আমাদের আলোচ্য নহে। চার্ব্বাককে লইয়াই বনফুল তাহার উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছেন। চার্ব্বাক বনফুলের অভিনব এবং অনবদ্য সৃষ্টি। চার্ব্বাক নাস্তিক, চার্ব্বাক বাস্তববাদী, সত্যনিষ্ঠ, কিন্তু পার্থিব সৌন্দর্য্য তাহার মনোহরণ করে। সৌন্দর্য্য ললামভূতা রমণী সৌন্দর্য্যে সে মুগ্ধ হয়। যেখানে সুন্দর সেইখানেই আনন্দ, সুতরাং সুরঙ্গমা

সুন্দরানন্দের বাহু বন্ধনে বন্দিনী হইলেও অবশেষে চার্ব্বাকের আলিঙ্গনে তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। চার্ব্বাকের কল্পনা, চার্ব্বাকের কৌতুহল মায়া নদী সন্ধান থেকে লেখকের তুলিকায় সাকার এবং সাবায়ব হইয়া উঠিয়াছে, প্রাণ পরিগ্রহ করিয়াছে। লেখকের আর একটী সুন্দর সৃষ্টি সুরঙ্গমা। রূপ গুণশালিনী এই রমণী। বুদ্ধি তাহার লাবণ্যের মতই দীপ্তিশালিনী, হৃদয় তাহার লালিত্যের মতই কোমল, কমনীয়।

সংবাদপত্রে দেখিলাম, স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয় বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধে হতাশা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় বর্ত্তমান সাহিত্যের সঙ্কটে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। আমার মনে হয় স্যর যদুনাথ অধুনা প্রকাশিত বহু পুস্তকই পাঠের অবসর করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি ঐতিহাসিক মানুষ। শ্রীমান শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালের মন্দিরা এবং গৌড়মল্লার পাঠ করিলে তাঁহার ভরসা জাগিতে পারে। শ্রীমান্ সুবোধ ঘোষের সম্প্রতি প্রকাশিত ভারত প্রেম কথার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রায় মহাশয়ও রসজ্ঞ সমালোচক, কিন্তু সঙ্কট ত্রাণের পথ নির্দ্দেশে তাঁহাকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিবার পক্ষে মতভেদ ঘটিতে পারে। নব নব সৃষ্টির তপস্যায় তন্ময় বনফুলের মত মনস্বী ও যশস্বী লেখক বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষেত্রে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইহা কম ভরসার কথা নহে। বনফুলের কল্পনা দূর প্রসারী, প্রকাশ ভঙ্গী স্বচ্ছ ও সুন্দর, রচনা কবিত্বপূর্ণ। তাঁহার সৃষ্টি নিত্য নূতন। বনফুলের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমি তাঁহার রচনা সম্বন্ধে বলিতে পারি—"নূতন অজানা পথে চলতে পারেন কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা নূতন সৃষ্টির আগ্রহে।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ; ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—৬৲ টাকা]

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

দাস্য-মধুর : শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ :

তুলসী দাস ও মীরা বাঈ-এর জীবনী অবলম্বন করিয়া এই ভক্তি-রসাত্মক নাটকখানি রচিত।

বৈষ্ণব দর্শনের সার প্রেম ধর্ম। পার্থিব যে প্রেম নরনারীর জীবনকে করে আনন্দময়, সেই প্রেম যখন যোগসূত্র স্থাপন করে মানুষের সঙ্গে দেবতার, তখনই হয় তাহার পূর্ণ বিকাশ ও সার্থকতা। সাধনভক্তিকে বৈষ্ণব সাধকগণ দুইটি ধারায় বিভক্ত করিয়া বিচার করিয়াছেন। একটী বৈধি, অপরটি রাগানুগা :

এই তো সাধনভক্তি দুই তো প্রকার।
এক রাগানুগা ভক্তি বৈধি ভক্তি আর ॥

বিধিমতে জপতপ পূজা-অর্চনাকে বৈষ্ণব সাধকগণ বলিয়াছেন 'বৈধি ভক্তি' এবং প্রেমধর্মাশ্রিত ভক্তিকে ব্যাখ্যা দিয়াছেন 'রাগানুগা'। 'রাগানুগা' ভক্তিকে তাঁহারা চারিটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন : দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য। আলোচ্য নাটকখানিতে এই দাস্য ও মাধুর্য রসের পর্য্যাপ্ত পরিবেশন করিয়া গ্রন্থকার এক অপূর্ব ভক্তি-প্রেমের প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছেন। নাটকের ঘটনা সংস্থাপন ও মধুর সংলাপ পাঠকের চিত্তকে শুধু আকর্ষণ করে তাহাই নয়, রসানুভূতিতে অন্তর আর্দ্র করিয়া দেয়। দৈনন্দিন সংসার জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে মুক্ত হইয়া পাঠকের মন এক অপরূপ স্বপ্নলোকের স্পর্শ পায় ও ভক্তিপ্লুত হইয়া উঠে। বৈষ্ণবগণের নিকট এই নাটকখানি বিশেষ সমাদর লাভ করিবে। এই শ্রেণীর নাটক মঞ্চস্থ হইলে লোকশিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বাগচী মহাশয় নাটকখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন।

[প্রকাশক—কিঙ্করনারায়ণ দাস। মূল্য ২৲ টাকা]

নতুন দিনের গান : শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য :

সমবায় আন্দোলন, তাহার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতাকে অবলম্বন করিয়া লেখক এই কাব্যগ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি উদ্দেশ্য ও প্রচারমূলক। কিন্তু স্থানে স্থানে অনুভূতির প্রাচুর্য হেতু যে কাব্যরসের স্ফুরণ হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। সমবায় আন্দোলনের প্রচারকল্পে এই শ্রেণীর কাব্য বা গীতি-রচনার উপযোগিতা আছে।

[শ্রীমতী শোভনা ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড। ১৬, আমীর আলি এভেনিউ : কলিকাতা।]

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

বাঘিনী কন্যা : আর, এস, র‍্যাটরে রচিত। শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনূদিত।

পৃথিবীর প্রায় সবদেশের আদিম ও অরণ্যবাসী মানুষদের মধ্যে নরনারীর মিলন সম্পর্কে কঠিন বিধি-নিষেধ ও নীতিবোধ বর্তমান রয়েছে। তাদের সে নীতির ভিত্তি হ'ল totem সিগমণ্ড ফ্রয়েড totem কি তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন,

"As a rule it is an animal, either edible and harmless or dangerous and feared, more rarely the totem is a plant or a force of nature (rain, water) which stands in a peculiar relation to the whole clan. The totem is……Almost every where

where the totem prevails there also exists the law that the members of the same totem are not allowed to enter into sexual relations with each other; that is that they cannot marry each other." গ্রন্থপরিচিতি থেকে জানা যায় এ গ্রন্থের প্রণেতা র‍্যাটরে নৃতত্ত্ববিদ্। তিনি নিগ্রোসমাজের একটি তরুণ তরুণীর নিষিদ্ধ প্রেমের করুণতম কাহিনী নিয়ে তিনি totemism এর জলন্ত উদাহরণ, তুলে ধরেছেন। ওপোকু ও আমালাগানে একই বংশের তরুণ ও তরুণী। চিতাবাঘের বংশে জন্ম তাদের। তাদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক নিষিদ্ধ। হৃদয়ের টান টোটেমের বাধা অর্থাৎ টেবু (taboo) মেনে চলল না। মুক্ত আকাশ তলে ধরণীর উপর মিলন হ'ল তাদের, নিষিদ্ধ মিলন। ঘটল আমালাগানেও ওপোকুর ও শোচনীয় পরিণাম।

বন্য জীবনের চিত্র চমৎকার অংকিত হয়েছে র‍্যাটরের কলমে। কিন্তু তবু কোথায় কোথায় মনে হবে নিছক মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব-বিশেষকে প্রমাণ করবার জন্যেই চরিত্রগুলির মুখে কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ওপোকুর প্রতি তার বাপের উপদেশের উল্লেখ করা যেতে পারে। সে উপদেশের ভাষা ও বিষয় এক এক জায়গায় এমন যে পাঠকের শালীনতায় আঘাত লাগার ভয়ে তা এখানে, উদ্ধৃত করা গেল না। ফ্রয়েড কথিত একটি কমপ্লেক্স বিশেষকেই তার দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে। কাহিনীর সৌন্দর্য-এর দ্বারা নষ্ট হয়েছে অনেকখানি। যা হোক, এ দোষের জন্য অনুবাদকদ্বয় দায়ী নন। বরং অনুবাদের উজ্জ্বল ভাষা, ও গ্রন্থের মনোজ্ঞ ভূমিকার জন্য যথেষ্ট প্রশংসাই তাঁদের প্রাপ্য।

[প্রকাশক—ইষ্টলাইট্ বুক্ হাউস, ২০ ষ্ট্রেণ্ড রোড, কলিকাতা। দাম—২৸০ আনা]

কুসুমের স্মৃতি ঃ অমরেন্দ্র ঘোষ

গ্রাম্য জীবনের কাহিনী নিয়ে উপন্যাস ও গল্প রচনায় লেখকের খ্যাতি রয়েছে যথেষ্ট। এ গল্প সংকলনের কোনও গল্পই লেখকের সে খ্যাতি নষ্ট করেনি একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। বরং কুসুমের স্মৃতি বাঁদী, ফেরারী, কসাই প্রভৃতি গল্প লেখকের কাহিনী রচনায় বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়েছে। বাঁদী গল্পে লেখক যেন তাঁর 'চরকাশেমের আবেষ্টনে ফিরে গিয়েছিলেন মনে হয়। গল্পরসিক পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই এ সংকলন দেখে খুশি হবেন।

[প্রকাশক—নবভারতী, ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২, মূল্য—২।০ আনা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ভাস্কর প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "রুল অফ্ থ্রি"—২॥০
রমেশ গোস্বামী প্রণীত নাটক "কেদার রায়" (১১শ সং)—২॥০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীকান্ত" (১ম—১৯শ সং)—৩৲,
"শ্রীকান্ত" (৪র্থ—১২শ সং)—৩৲, "বৈকুণ্ঠের উইল" (১২শ সং)—১॥০, "কাশীনাথ" (উপন্যাস—১২শ সং)—২॥০, "নিষ্কৃতি" (৩১শ সং)—১॥০, "বিন্দুর ছেলে" (উপন্যাস—২৫শ সং)—১৲, "গৃহদাহ" (৯ম সং)—৪॥০, "পরিণীতা" (৩৯শ সং)—১॥০
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "শ্যাম-সোহাগিনী"—১॥০
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রাজ্যের রূপকথা"—৭৲
আশাপূর্ণা দেবী প্রণীত গল্পগ্রন্থ—"আর এক দিন"—৩৲
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "যাত্রা হ'ল শুরু"—২॥০
গোপাল ভৌমিক প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "বসন্ত বাহার"—১॥০
শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "কলিকা"—॥৵০
শ্রীসুধেন্দুকুমার রায় প্রণীত "গান্ধীজীর জীবন গীতার বীক্ষণাগার"—১৲
শ্রীযোগেশচন্দ্র গণচৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "অভিশাপ"—৪৲
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার প্রণীত "ছোটদের আইনষ্টাইন"—।০
শশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "মোহনের বজ্রজ্বালা"—২৲,
"ঘূর্ণাবর্তে মোহন"—২৲, "ঘূর্ণি-ঝড়ে মোহন" "আজমীরে স্বপন"—২৲
শ্রীমুরারিমোহন বিট প্রণীত রহস্যোপন্যাস "নীল চোখের সঙ্কেত"—১॥০
শ্রীঅতুলানন্দ রায় প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "সবার মা সারদা"—৩৲
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "অন্ধকারের আগন্তুক"—১॥০
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মুক্তিপথে কৃষ্ণা"—১॥০
শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "ছায়ার আর্তনাদ"—॥০, "রাঙ্গাজবা"—॥০
শ্রীঅলককুমার ঘোষ-সম্পাদিত "ছোটদের আনন্দমঠ"—৸০, "রাম-রাবণের গল্প"—৸০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রথম খণ্ড | ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

মেঘদূত

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

মানব-মনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির অতি নিগূঢ় সুমধুর সম্বন্ধের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন ঋতু-সমাগমে মানব-হৃদয়ের বিভিন্ন ভাবলহরীর উন্মেষে। পুনরায়, সমস্ত ঋতুর মধ্যে, বর্ষার সঙ্গেই যেন মানবের প্রাণের বন্ধন ঘনিষ্ঠতম—ভারতবাসীদের ক্ষেত্রে একথাটী বিশেষভাবেই সত্য। স্মরণাতীত কাল থেকে, ধরণীর তাপহারিণী বর্ষা ভারতবাসীর মর্মোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে এসেছে। সেজন্য, মানব-সভ্যতার প্রথম ঊষাগমে, ভারতের পুণ্যশ্লোক আর্য ঋষিরা জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে বর্ষার দেবতা পর্জন্যকে "যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুস্তিস্রো দ্যাবস্ত্রেধা সস্রুরাপঃ" (ঋগ্বেদ ৭-১০১-৪)—'যাঁতে সমস্ত ভূতসমূহ বর্তমান, যাঁর মধ্যে ত্রিলোকের স্থিতি, যাঁর থেকে ত্রিধারায় জল প্রবাহিত হয়"—বলে স্তুতিবাদ করেছেন। এমন কি, বর্ষাকালের "মত্ত দাদুরীর" ডাককে তাঁরা সোমযাগকারী ব্রাহ্মণদের পূত মন্ত্রোচ্চারণ ধ্বনির সঙ্গেও তুলনা করতে কুণ্ঠিত হননি (ঋগ্বেদ ৭-১০৩-৮)। আদিকবি বাল্মীকি রামায়ণে (চতুর্থ কাণ্ড, অষ্টাবিংশ সর্গ) বর্ষার আগমনে জগজ্জনের অশ্রুর উৎসের সৃষ্টি করে গেছেন, যখন তিনি বিরহী রামচন্দ্রের মুখে বর্ষাকে সীতার ন্যায় শোকসন্তপ্তা ধরণীর অশ্রুধারারূপে বর্ণনা করেছেন—

"সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি" (৪-২৮-৭)

বঙ্গদেশের অমর কবি জয়দেবও মেঘমেদুর, শ্যামল বর্ষার স্তুতিগান করেছিলেন—"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ" (গীতগোবিন্দ১-১)—এই সুললিত ছন্দে। এইভাবে, সহস্র সহস্র বৎসর ধরে, অগণিত কবি-মানস বর্ষার বন্দনাগান করে গেছেন। কিন্তু বর্ষার কবি কালিদাসের কাছে অন্য সকলেই যেন নিষ্প্রভ হয়ে যান। বর্তমান যুগের আরেকজন শ্রেষ্ঠ বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুর

মিলিয়ে আমরাও বলতে পারি: "মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্ব-গাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে" (নববর্ষা)।

কালিদাস "ঋতুসংহারের" দ্বিতীয় সর্গে এবং "মেঘদূতের" পূর্বার্ধে বর্ষাঋতুর প্রশস্তি গান করেছেন। "মেঘদূতে" হৃদয়ের অর্গল তিনি সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন—ভাবের পূর্ণ অভিনবত্বে, ভাষার স্বচ্ছ সৌন্দর্যে, সর্বোপরি, কল্পনার অসীম বিস্তৃতিতে এই কাব্য তুলনাবিহীন। "ঋতু-সংহারে" কিন্তু বালক-কবির সেই কল্পনার অলকা সুদূর থেকেই কেবল দৃষ্ট হয়—এতে কেবল কবিসাধনার হিমাচলে পৌছাবার প্রথম সোপানই রচিত হয়েছে মাত্র—তার বেশী নয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, "ঋতুসংহারের" দ্বিতীয় সর্গের আটাশটী কবিতায় বালক-কবি তাঁর নবীন তুলিতেও বর্ষাধৌতা ধরণীর যে অনুপম ছবিটী অঙ্কিত করেছেন, তারও সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। গ্রীষ্মের অবসানে বর্ষাগম—"প্রচণ্ড সূর্যাতপ-তাপিতা মহী"র (১-১০) অরাতিসদৃশ নিদাঘ-কালকে দমন করে, প্রদগ্ধা ধরণীতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আসছেন দিগ্বিজয়ী রাজার বেশে বর্ষাঋতু। নীলোৎপল-পত্র ও অঞ্জনরাশিতুল্য পুঞ্জীভূত ঘনকৃষ্ণ মেঘ তাঁর বিজয়ী হস্তিযূথ; স্ফুরণশীল, শুভ্র বিদ্যুৎ তাঁর বিজয়-বৈজয়ন্তী; মুহুর্মুহুঃ বজ্রনিনাদ তাঁর বিজয়-দুন্দুভি, ইন্দ্রধনু তাঁর বিজয় ধনু (২-১, ৪)। রাজার আগমনে উল্লসিতা পৃথিবী হয়েছেন নববেশে সজ্জিতা—বৈদূর্যমণিতুল্য সুনীল তৃণগুচ্ছ, হরিৎ বৃক্ষলতা ও রক্তবর্ণ ইন্দ্রগোপ কীটে সমৃদ্ধা ধরিত্রী ত্রিবর্ণ রত্ন-বিভূষিতা রমণীরই ন্যায় আজ শোভমানা (২-৫)। ধারাতৃপ্ত বনভূমির অতুল হর্ষ-বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি তাঁর অনবদ্য ভঙ্গীতে বলছেন—

> "মুদিত ইব কদম্বৈর্জাতপুষ্পৈঃ সমন্তাৎ
> পবনচলিতশাখৈঃ শাখিভির্নৃত্যতীব।
> হসিতমিব বিধত্তে সূচিভিঃ কেতকীনাং
> নবসলিলনিষেকচ্ছিন্নতাপো বনান্তঃ" (২-২৩)

অর্থাৎ দাবদগ্ধ বনানীতে ফিরে এসেছে অক্ষয় আনন্দ—প্রস্ফুটিত কদম্বে ফুটে উঠেছে তার রোমাঞ্চ, হিন্দোলিত বৃক্ষ-শাখায় লেগেছে তার নৃত্য-দোল, কেতকীর মঞ্জরীতে বিকশিত হয়েছে তার স্মিতহাস্য।

"বহুগুণরমণীয়, সর্বজনচিত্তহারী, তরুলতাবান্ধব, বিশ্ব-জগতের প্রাণসদৃশ" (২-২৮) বর্ষাকালের এই প্রাণবন্ত বন্দনা মহাকবির পরবর্তী পরিণত রচনার তুলনায় কিছু নিষ্প্রভ ও অপূর্ণ বলে বোধ হলেও, অন্যান্য কবিদের রচনার তুলনায় এটী একটী সার্থক সৃষ্টিরূপেই চিরদিন রসবেত্তাগণের তৃপ্তিসাধন করবে, নিঃসন্দেহ।

বিশ্বজনবিমোহন "মেঘদূতে" মহাকবি কালিদাস খণ্ড-কাব্যের আকারে বিশ্ববাসীর চিরন্তন বিরহের মহাকাব্য রচনা করেছেন। মতভেদে ন্যূনাধিক, মাত্র ১১৮ কবিতায় সম্পূর্ণ, সুললিত মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত এই অনুপম কাব্যগ্রন্থ আলঙ্কারিকের পরিভাষার দিক্ থেকে "খণ্ড" বা "ক্ষুদ্র" কাব্য হলেও, হৃদয়ের দিক্ থেকে—পূর্ণতম রসানুভূতি ও সার্বজনীন আবেদনের দিক্ থেকে, মহাকাব্য-শ্রেণীভুক্ত হবে নিশ্চয়ই। "মেঘদূতের" বিষয়বস্তু কেবল সংস্কৃত সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও অভিনব। রামায়ণ, মহাভারত ও বৌদ্ধজাতকে অবশ্য জীবন্ত প্রাণীকে দূত করে প্রাণের সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা কবিরা করেছেন। যেমন, রামায়ণে রাম সীতার কাছে হনুমানকে ও মহাভারতে দময়ন্তী নলের কাছে হংসকে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু প্রাণহীন বস্তু বিশেষের মাধ্যমে কবিজনোচিত বার্তা প্রেরণ জগতের সাহিত্যে এই প্রথম। মল্লিনাথ প্রমুখ টীকাকারেরা অবশ্য বলেছেন: "সীতাং প্রতি রামস্য হনুমৎসন্দেশং মনসি নিধায় মেঘসন্দেশং কৃতবান্ ইত্যাহুঃ।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কালিদাসের "মেঘদূতে"র পরিকল্পনা ও বস্তুবিন্যাসপ্রণালী সম্পূর্ণ নূতন ও নিজস্ব। বিখ্যাত আলঙ্কারিক ভামহ তাঁর "কাব্যালঙ্কার" নামক গ্রন্থে (১-৪২, ৪৪) কালিদাসের প্রাণহীন মেঘকে দূতরূপে প্রেরণকে "অযুক্তিমৎ" বা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক—এমন কি, কবিকে "উন্মত্ত ইব ভাষতে" বা উন্মত্তবৎ প্রলাপকারী বলতেও পশ্চাৎপদ হন নি। কিন্তু কালিদাস নিজেই এর উত্তর দিয়ে দিয়েছেন:—

"কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু" (৫)

প্রেমার্ত, বিরহক্লিষ্ট ব্যক্তিরা চেতন অচেতনের মধ্যে প্রভেদ করতে পারেন না। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, মরমী কবি কালিদাসের মায়াস্পর্শে "ধূমজ্যোতিঃসলিল-

মরুতাং সন্নিপাতঃ” অচেতন মেঘও হয়ে উঠেছে প্রাণময়, চৈতন্যময়, আবেগময়—প্রাণীর চেয়েও প্রাণবন্ত।

কালিদাসের এই অপূর্ব পরিকল্পনা যুগে যুগে শত শত কবিকে একই ভঙ্গীতে রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। ফলে “দূতকাব্য” শীর্ষক একটী সমৃদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃতে গড়ে উঠেছে। কেবল বঙ্গদেশেই ধোয়ীর “পবনদূত,” বিষ্ণুদাসের “মনোদূত,” রুদ্রপঞ্চাননের “ভ্রমরদূত,” রূপগোস্বামীর “হংসদূত,” কৃষ্ণনাথ সার্বভৌমের “পদাঙ্কদূত” প্রমুখ বহু দূতকাব্য আজও আমরা পাই। কিন্তু সেই প্রথম সৃষ্টি, অননুকরণীয় “মেঘদূতই” সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে বিরাজ করছে।

মধ্যভারত থেকে বিরহের মেঘ চলেছে উত্তরদিকে কল্পনার কল্পলোকে—কৈলাস পর্বতস্থিত চির-আনন্দময়, অমরপুরী অলকায়,যেখানে মর্ত্যের মানুষমাত্রেরও চিরনিবাস, যেখান থেকে কিছুকালের জন্য আমরা এই মর্ত্যের মাটীতে নির্বাসিত হয়েছি মাত্র। প্রভুর শাপে এই স্বর্গভূমি অলকা থেকে নির্বাসিত যক্ষ বিরহকাতর জীবন যাপন করছেন রাম-সীতার পদরজঃপূত রামগিরি পর্বতে। “আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে” কেলিমত্ত গজের নববর্ষার মেঘখণ্ড দেখে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ গেল ভেঙ্গে, কারণ—

> “মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ।
> কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।” (৩)

মেঘ দর্শনে সুখী লোকেরও চিত্ত অস্থির হয়, বিরহী ব্যক্তির ত কথাই নেই।

এই মেঘকেই পাঠাচ্ছেন যক্ষ দূত করে প্রিয়তমার নিকট সুদূর অলকায়। কিন্তু অশেষ দূরের গহন পথ—সেজন্য সমস্ত পথের বিবরণ প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। বন্ধুজন ব্যতীত দূর পথে গমন নিষেধ, কিন্তু চক্রাকারে আবর্তমান “আবদ্ধমালাঃ” বলাকাবৃন্দ এবং মানসসরোবরে গমনোৎসুক রাজহংসগণ মেঘের পথের সঙ্গী হবে (১০-১১)। দীর্ঘপথ ভ্রমণে ক্লান্তি অনিবার্য, যক্ষ কতভাবে সে ক্লান্তি অপনোদনের উপায় বলে দিচ্ছেন। মেঘকে যেতে হবে রামগিরি থেকে মালভূমির মধ্য দিয়ে আম্রকূট পর্বতে; তার পর রেবানদী (নর্মদা) দর্শন করে, বেত্রবতী নদী-তীরস্থ দশার্ণ জনপদের রাজধানী বিদিশায় বিশ্রাম করে, নির্বিন্ধ্যা নদী অতিক্রম করে শিপ্রানদীতীরস্থ উজ্জয়িনী নগরীতে সে উপস্থিত হবে। সেখান থেকে দেবগিরি যাবার পথে গম্ভীরা নদী ও চর্মণ্বতী নদী অতিক্রম করে যথাক্রমে কুরুক্ষেত্র, কনখল ও ক্রৌঞ্চগিরিতে এসে, সে কৈলাসপর্বতে মানসসরোবরের পার্শ্বস্থ অলকায়—গন্তব্যস্থানে—অবশেষে উপনীত হবে। এই পর্যন্ত “পূর্বমেঘ।”

“উত্তরমেঘে” আছে “হরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা (৭) মহাদেবের মস্তকের চন্দ্রকিরণে সর্বদাই আলোকিতা, পুণ্যতোয়া গঙ্গাপরিবেষ্টিতা অলকাপুরীর অপূর্ব বর্ণনা। মেঘ যখন অলকায় পৌছাবে, তখন তাকে বিরহিণী যক্ষ-পত্নীর নিবাস খুঁজে বের করে নিতে হবে। এই অলকায় সর্ব সময়ে সর্ব ঋতু বিরাজমান—একই সময়ে এখানকার সুন্দরীরা মর্তাধামের বিভিন্ন পুষ্পে সুসজ্জিতা হন। সেই সুখপ্রদেশে দুঃহবিরহখিন্না বন্ধুপত্নীকে মেঘ দেখতে পাবে—

“তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।” (৮৫) “শিশিরমথিতা পদ্মিনী”র ন্যায় (৮৭) “কলামাত্র অবশিষ্ট চন্দ্রের” ন্যায় (৯৩) পরিম্লানা, দুঃখিনী যক্ষিণীকে মেঘ এই বার্তা প্রদান করবেন যে, সুদূর প্রবাসে তাঁর প্রিয়তম এখনও মিলন প্রত্যাশায় কোনো রকমে প্রাণধারণ করে আছেন, সেই আশায় তিনিও যেন অবশিষ্ট চারমাস কাটিয়ে দেন—

> “শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মিলয়িত্বা” (১১৪)
> অবশেষে, “প্রাতঃকুন্দপ্রসবশিথিলং জীবিতম্” (১১৭)

প্রাতঃকালের কুন্দফুলের ন্যায় যক্ষের ক্ষণস্থায়ী, মলিন জীবনরক্ষার জন্য, মেঘ যেন পুনরায় প্রিয়ার প্রতিবচনসহ, রামগিরিতেই প্রত্যাবর্তন করেন।

মহাকবি কালিদাস যে কেবল আকাশচারী, কল্পনা-বিহারী কবিই ছিলেন না, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিলেন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক ও গভীর ভৌগোলিকজ্ঞানসমৃদ্ধ, তার প্রমাণ আমরা পাই এই “পূর্বমেঘে”। মধ্যপ্রদেশ থেকে হিমাচল পর্যন্ত প্রাচীন ভারতের বহু প্রসিদ্ধ নগর, জনপদ, নদনদী, পর্বত প্রভৃতির প্রত্যক্ষদৃষ্ট বর্ণনা আছে “মেঘদূতের” এই অংশে।

কিন্তু “পূর্বমেঘের” বড় কথা এইটীই নয়—এর প্রথম

ও প্রধান কথা—যা' পূর্বেই বলা হয়েছে—জড়ের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার, চেতন ও অচেতনের মধ্যে নিগূঢ় সখ্য ও সহানুভূতির অপূর্ব বন্ধন স্থাপন। "পূর্বমেঘের" কেবল দূতরূপী মেঘই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে, মেঘের পথিস্থিত পর্বত, নদী প্রভৃতি সবই যেন অনুভূতিশীল, জীবন্ত প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। মানব এবং অন্যান্য চেতন প্রাণীর (পশু-পক্ষী, বৃক্ষলতাদির) মধ্যেই কেবল নয়, মানব এবং অচেতন বস্তুর (পর্বত, নদী প্রভৃতির) মধ্যেও সীমারেখা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ করে তোলা দরদী কবি কালিদাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু "মেঘদূত" এদিক্ থেকে কালিদাসেরও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। "পূর্বমেঘ" পাঠকালে মনেই হয় না যে, জড়বস্তুমাত্রের ভৌগোলিক বিবরণী পাঠ করছি ;—মনে হয় যেন, যক্ষেরই সমদুঃখী মেঘ, আকাশ, বাতাস, ভূমি, কন্দর, গুহা, পর্বত, নদী, সরোবর, নগর, অট্টালিকা প্রভৃতির সুখদুঃখময় বিচিত্র কাহিনীই আমাদের সম্মুখে মূর্তরূপে প্রকাশ লাভ করেছে। যেমন, মেঘ-সমাগমে রামগিরি পর্বত বন্ধুস্পর্শজনিত আনন্দাশ্রু বর্ষণ করছে বৃষ্টিধারা বাপদেশে (১২) ; আম্রকূট পর্বত পথশ্রান্ত মেঘকে শৃঙ্গে সাদরে ধারণ করছে (১৭) ; উজ্জয়িনীর সৌধরাজি মেঘকে কোলে রাখবার জন্য সাগ্রহে আহ্বান করছে (২৯) ; নদীগুলি সবই জলদকে সপ্রেমে আহ্বান করছে—তরঙ্গক্ষোভিতা, সাহসিকা নির্বিন্ধ্যা লীলাভঙ্গিমা দ্বারা (২৮) ; স্থিরসলিলা, গম্ভীরা শফরীরূপ কটাক্ষ দ্বারা (৪২), বেত্রবতী তরঙ্গভঙ্গিতে ভ্রূভঙ্গি দ্বারা। জড়-অজড় নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বচরাচরে, প্রতি অণু-পরমাণুতে, প্রতি ধূলিকণায় সেই "প্রাণানাং প্রাণাঃ" পরমাত্মা অন্তর্লীন হয়ে আছেন, তাকে স্বীয় প্রাণের স্পর্শে প্রাণবন্ত করে তুলছেন—এ বিশ্বাস অবশ্য ভারতীয়দের স্বভাবগত। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস ও দর্শন আলোচনার গণ্ডির বাইরেও, কেবল কাব্যের মাধুর্যের মধ্যেও, এরূপ সরল, স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক-ভাবে জড়কে অজড়ে উন্নীত করার দৃষ্টান্ত অন্যত্র বিরল।

"পূর্বমেঘে" যেমন প্রকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে মানবহৃদয়, "উত্তরমেঘে" ঠিক তেমনি মানবহৃদয় বিশ্লেষণ মানসে প্রকৃতির বর্ণনা করা হয়েছে। "উত্তরমেঘে" বিরহ ও মিলন, প্রেমিকজনের এই দুটী প্রধান অবস্থার যে জীবন্ত চিত্র আমরা পাই, তা' সত্যই অনুপম।

কিন্তু "মেঘদূত" একটী পরিপূর্ণ রসঘন কাব্যশ্রেষ্ঠ হলেও এবং কেবল নর-নারীর প্রেমমূলক নিছক কাব্য-রূপেও আমাদের যথেষ্ট আনন্দদান করলেও, শুধু তাতেই আমাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কারণ, রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, "মেঘদূতের" অনিন্দ্য বিরহগাথার মধ্যে আমরা আভাস পাই আরেক গভীরতর বিরহব্যথার, যা চিরন্তন ও সার্বজনীন। মর্ত্যের সীমারেখা ছাড়িয়ে কোন এক সুদূর, দুর্গম আনন্দময় অমৃতলোকে আমাদেরই জন্য অপেক্ষা করে আছেন আমাদের সেই চিরারাধ্য জন, যাঁর সঙ্গে মিলনের জন্যই মানবমনের শাশ্বত এই আকূতি। দু' একজন আধুনিক সমালোচক "মেঘদূতের" যক্ষ-যক্ষিণীর ক্ষণস্থায়ী বিরহ অবলম্বনেই এরূপ একটী কাব্যরচনাকে নিরর্থক, অবাস্তব ও আতিশয্যবহুল বলতেও ত্রুটী করেন নি—তাঁদের মতে, যক্ষ-যক্ষিণীর মিলন যখন সুনিশ্চিত ও অনিবার্য, তখন তা' নিয়ে এরূপ বিলাপ-পরিতাপ ও করুণ-রসের সৃষ্টি করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সুনিশ্চিত মিলনের মধ্যেও যে মিলনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, এমন কি, মিলনের সময়েও বিরহবেদনারও শেষ হয় না, আশঙ্কারও উপশম হয় না—এই সত্যটাই কালিদাস অনবদ্যভাবে এই মহাগ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। সেজন্য সেই চিরপ্রিয়ের জন্য আমাদের আকুল বেদনাও শাশ্বত। তাঁর বরাঙ্গ স্পর্শ করে, তাঁরই বার্তা বহন করে যে সমীরণ—সেই আনন্দলোক থেকে প্রবাহিত হয়ে আমাদের কাছে ছুটে আসছে, তাকেই আমরা নিরন্তর আলিঙ্গন করি—

"পূর্বস্পৃষ্টং কিল যদি ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি"

বিরহ সমুদ্রের পরপারে যিনি, তাঁরই স্পর্শ লাভের মধুর প্রত্যাশায়।

হয়ত এই হচ্ছে "মেঘদূতের" সত্যদ্রষ্টা মহান্ ঋষির মর্মোত্থ বাণী।

ন্যায় দণ্ড

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার ভাগ্যে যা ঘটেছিল তা খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। একই জেলায় পর পর আমি হয়েছিলাম জেলা জজ ও জেলা শাসক। তার ফলে একবার এমন এক অস্বস্তি-কর অবস্থায় পড়েছিলাম কি বলব।

ছাত্র জীবনে লণ্ডনে 'ওল্ডবেইলি' বিচার গৃহের গাত্রে খোদিত একটি মূর্ত্তি দেখেছিলাম। তা আমার মনে গভীর-ভাবে রেখাপাত করেছিল। হিন্দুরা নানা শক্তি বা আদর্শকে রূপ দান করে বিগ্রহের রূপে পূজা করে। এখানে ইংরেজ জাতি ন্যায়ের সম্বন্ধে তাদের আদর্শকে রূপে ফুটিয়ে তুলেছে। মূর্ত্তিটি এইরূপ ; একটি নারী মূর্ত্তি আছে। তার দুই চক্ষু কাপড় দিয়ে বাঁধা। এক হাতে তার একটি তুলা দণ্ড, অপর হাতে অসি। তার তাৎপর্য্য হল ন্যায়-দেবী এক হাতে দোষ ও গুণের বিচার তুলাদণ্ডের সাহায্যে করে নেবেন এবং বিচারে যদি আসামী দোষী সাব্যস্ত হয় তখন অসির সাহায্যে তার দণ্ড দেবেন। বিচারের সময় ও দণ্ড দেবার সময় নিরপেক্ষভাবে কেবল বুদ্ধি শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে। একদিকে মায়া বা মমতা বোধ এবং অপরদিকে ভয়কে সম্পূর্ণ পরিহার ক'রে নির্ভয়ে এবং নির্ম্মমভাবে বিচার করতে হবে। এই কারণেই ন্যায় দেবীর দুই চক্ষু ঢাকা। আমি যার বিচার করছি সে দোষী সাব্যস্ত হলে, তার দণ্ড হলে তার পরিবারের কি হবে এ ভাবনাকে পরিহার করতে হবে। আমি যার বিচার করছি সে প্রভাবশালী ব্যক্তি, তার দণ্ড হলে সে আমার ক্ষতি করতে পারে—এমন কি জীবনকেও বিপন্ন করতে পারে—এই ভয়কেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হবে। যন্ত্র-চালিতের মত কেবল বুদ্ধিশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে দোষের বিচার করতে হবে এবং দণ্ডের বিধান করতে হবে।

জেলা জজ হিসাবে দায়রার বিচারে অনেক সময় আমার অনেক আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করতে হয়েছে এবং দণ্ডাদেশও করতে হয়েছে। সে ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে নিজের বুদ্ধিমত এই ন্যায়ের আদর্শ পালন করতে চেষ্টা করেছি। অনেক সময় নির্ম্মমভাবে দীর্ঘ মেয়াদের আদেশ দিয়েছি। এখন আর দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা চালু নাই। তারা সাধারণত স্থানীয় জেলেই মাসের পর মাস তাদের দীর্ঘ মেয়াদ কাটিয়ে দেয়। এখন এই ধরণের পরিচিত কয়েদী যার কারাবাসের জন্য নিজে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী হয়েছে, তার সঙ্গে দেখা হওয়াটা বেশ অস্বস্তিকর ব্যাপার। তার ওপর সে যদি আমাকে চিনে ফেলে এবং আমার দণ্ডাদেশের ন্যায়ানুবর্ত্তিতায় সন্দেহ প্রকাশ করে, তা হলে অবস্থাটা হয়ে পড়ে আরও অস্বস্তিকর।

জেলা শাসকের অন্য নানারকম আনুষঙ্গিক কাজের মধ্যে একটা কাজ হল জেল পরিদর্শক সভার সভাপতিত্ব করা। প্রতি জেলাতেই একটা করে বড় জেল আছে। সেই জেলের জন্য একটি পরিদর্শক সভা আছে। তাতে কতকগুলি সরকারী কর্ম্মচারী ও সদস্য থাকেন, আবার স্থানীয় বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিও সদস্য থাকেন। তাঁদের কর্ত্তব্য হল পালা ক'রে একা একা জেল পরিদর্শন করা, কয়েদীদের অভাব অভিযোগ শোনা এবং যুক্তিসঙ্গত মনে করলে কর্তৃপক্ষের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তা ছাড়া প্রতি মাসে এই পরিদর্শক সভার একটি অধিবেশন হয়। তাতে সকল সভ্যেরই যোগদান করতে হয় এবং জেল সংক্রান্ত নানা ব্যাপার সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিতে হয়। এই দিন সকল সভ্যের এক সঙ্গে মিলে অভাব অভিযোগ শোনবার জন্য কয়েদীদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার ব্যবস্থা আছে।

সেদিন ছিল পরিদর্শক সভার মাসিক অধিবেশনের দিন। ডাক্তার সাহেব বা সিভিল সার্জ্জন এই জেলের অধ্যক্ষ এবং এই সভার সম্পাদক। তিনি উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন ঘোষ মশাই, বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেব এবং আরও কয়েকজন যাঁদের আর মনে পড়ে না। ঘোষ

মহাশয় স্থানীয় বিশিষ্ট উকিল এবং বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেব একাধিক চা বাগানের মালিক।

জেলাধিকারিক আগে আগে চলেছেন জেলের বিভিন্ন অংশে আমাদের ঘুরিয়ে নেবার জন্য। যারা বিচারাধীন কয়েদী তাদের কোন কাজ নাই, তারা এক জায়গায় বসে আমাদের প্রতীক্ষা করছিল। তাদের সঙ্গে আলাপ হল। দেখা গেল তাদের কেউ কেউ দীর্ঘকাল ধরে বিচারাধীন রয়েছে। তাদের বিচার তাড়াতাড়ি শেষ হওয়া উচিত। তারাও সেই ইচ্ছা প্রকাশ করল। আমরা তাদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিবরণ লিখে নিলাম।

যাদের বিচার শেষ হয়ে গিয়েছে এবং বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে, তারা নানা কাজে ব্যস্ত। কেউ রান্না ঘরে রান্নার কাজে নিযুক্ত, কেউ ফুল বাগানে বা সবজী বাগানে কাজ করছে, কেউ জেলের গরুগুলির তত্ত্বাবধান করছে। যারা হাতের কাজে পটু তারা বেতের কাজ করছে, কেউ সতরঞ্চি বুনছে, কেউ বা কাপড় বুনছে। যারা দেহে শক্তি ধরে তারা ঘানি টানছে। যে যে কাজে অভিজ্ঞ বা পারদর্শী, তাকে সেই কাজ দেওয়া হয়েছে। নানা দিক ঘুরে আমরা এসেছি সেইখানে যেখানে বেতের কাজ হচ্ছে।

সেখানে এক কয়েদী ছিল। সে হঠাৎ আমাকে দেখে বলে উঠল, সেলাম হুজুর। ক্যা আব মুঝকো পছন্তে নেহি?

আমি প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলাম। তবে আমার মুখ দেখে চিনে ফেলবার শক্তি বিলক্ষণ আছে। স্মরণ-শক্তির দরজায় করাঘাত করতেই মনে পড়ে গেল। সত্যই ত একে আমি চিনি। সে এক বিহার হতে আগত মুসলমান। নাম তার সোভানি না? হাঁ ঠিক তাই তো। বেশ কয়েক মাস আগে দায়রায় তার বিচার করেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে বেশ লম্বা কারাদণ্ডেরও আদেশ দিয়েছিলাম। বোধ হয় পাঁচ বছর।

আমি উত্তর দিলাম, হাঁ ইয়াদ হয়েছে। তোমার নাম সোভানি না?

জী হাঁ।

ঘোষ মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, একে চেনেন নাকি?

আমি বললাম, বিলক্ষণ চিনি।

সে কি রকম?

দায়রায় তার বিচার করেছিলাম কয়েক মাস আগে। বিচারে দোষী সাব্যস্ত ক'রে সাজাও দিয়েছিলাম। বোধ হয় পাঁচ বছর। জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন না।

ঘোষ মশাই জিজ্ঞাসা করলেন সোভানিকে—তার কত বছর জেল হয়েছিল।

সে বলল, পাঁচ বরস।

তারপর আমাকে দেখিয়ে দিয়ে ঘোষ মশাইকে লক্ষ্য ক'রে আর ও বলল, হুজুর ত সব জান্তে হেঁ। উনকো পুছিয়ে না। সেরা উকিলবাবু নে বোলা কি এতনা মেয়াদ যস্তি নেহি হুয়া।

আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম আসামীর মুখে আমার দণ্ডাদেশের এই রকম প্রতিকূল সমালোচনা শুনে। ঘোষ মশাই ত তার ওপর একটু অসন্তুষ্ট হয়েই পড়লেন এবং তাকে ভংর্সনা করে বললেন:

এই সা কেঁও বোলতা। ক্যা, কসুর কিয়া নেহি?

সেও বেশ সপ্রতিভভাবেই উত্তর দিল। বলল, কসুর ত জরুর কিয়া। লেকিন উসনে ত মেরা জেনানাকো বেইজ্জৎ কিয়া। উস লিয়া মেরা মালুম থা কি জিয়াদা সাজা নেহি হোগা। উকিল বাবুসে ভি এইসা উম্মেদ মিলা।

ঘোষ মশাই পেশায় উকিল। তিনি আইনসঙ্গতভাবেই তাকে উপযুক্ত উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন:

এইসা মালুম হো ত হাইকোর্ট মে আপিল পেশ করো না।

কিন্তু হায় রে, ভাগ্য তার প্রতি সদয় হয় নি। আপিল সে করেছিল, কিন্তু বিচারে দণ্ড হ্রাস হয় নি। সেইটাই তার বিশেষ আপশোসের কারণ। ঘোষ মশাইকে এই সে জানাল।

আমার মনটা কিন্তু অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। জেল পরিদর্শন শেষ ক'রে আমরা সকলে জেলখানার আপিস ঘরে ফিরে গিয়ে বসলাম। দেখা গেল এই ব্যাপারটার পর পরিদর্শকরা সোভানীর বিষয় বিস্তারিত খবর জানতে উৎসুক হয়েছেন। আমার যেমন মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক, এঁদেরও তেমন কৌতূহলী হওয়া স্বাভাবিক।

ডাক্তার সাহেব তখন তাঁদেরই মনোভাব ব্যক্ত করে

আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ব্যাপারটা কি বলুন ত? এই লোকটার বিচারের বিষয়টা কি ছিল?

বিচার ক'রে আমি যেন নিজেই একটা আসামী হয়ে পড়েছি। আমার অবস্থাটা তখন সেই ধরণের হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই এই রকম প্রশ্ন উত্থাপন হওয়াতে আমার তখন ভালই লাগল। নিজের সাফাই দেবার একটা অদম্য ইচ্ছা মনের মধ্যে পাক খেয়ে উঠছিল। সে ইচ্ছাটা আত্মপ্রকাশের একটা সুযোগ পেল। আমি তখন বললাম:

আপনারাই শুনুন না তা হলে সমস্ত গল্পটা এবং দীর্ঘ মেয়াদের যে সাজা দিয়েছি সেটা ঠিক হয়েছে কিনা বিচার করুন।

এই প্রস্তাবটি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করে তখন সকলেই আমাকে ঘিরে বসলেন। সভার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওদিকে ছুটির দিন ছিল বলে কারও ফিরবারও তাড়া ছিল না। জেলের আধিকারিক সাহেব বেশ অতিথি-বৎসল লোক। তিনি আমাদের সকলকে চা পরিবেশন করলেন। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে আমি গল্প সুরু করলাম।

সোভানি ছিল এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের ছুতোর মিস্ত্রি। যেখানে তার বাস সেখানে যথেষ্ট বন আছে, কাজেই কাঠের কাজের অভাব নাই। এই জেলায় আছে, বড় বড় বন, বড় বড় চা বাগান, আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখানে ছোট ছোট গ্রাম। তারা ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। বাংলা দেশের অন্য কোথাও এমন নয়। বাংলার দক্ষিণে সমুদ্রের কোল ঘেঁসে সুন্দর বন আছে। সেখানে অবস্থা এরকম নয়। সে অঞ্চলে যেখানে বন আছে সেখানে বনই আছে, মাইলের পর মাইল, অবিচ্ছিন্ন বন, তার শেষ নাই। যেখানে বন আছে সেখানে তা নিরেট ভাবেই আছে। যেখানে বন শেষ হয়েছে সেখানে সুরু হয়েছে চাষের জমি আর জনপদ। তাও একবার যেখানে সুরু হয়েছে তার শেষ নাই। মাইলের পর মাইল জুড়ে তার বিস্তার।

এখানে সে রকম নয়। এই কয়েক মাইল ধরে একটা গ্রাম এবং তার সংলগ্ন চাষের জমি। তারপর সুরু হল জঙ্গল। এমন জঙ্গল তার তুলনা হয় না। এ জঙ্গলের আভিজাত্য আছে। ঝোপ নয়, ঝাড় নয়, বড় বড় দীর্ঘ ঋজু শাল গাছ, ঘন বিন্যস্ত দাঁড়িয়ে, ওপরে প্রায় একশত ফুট পর্য্যন্ত উঠে গিয়েছে। দুপুর বেলাও তাদের ডালের পর্দ্দা ভেদ ক'রে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশের পথ পায় না। একেই বলা যায় অরণ্যানী। এখানে বাস করে শুধু বুনো-শূয়োর আর চিতাবাঘ নয়। এখানে বাস করে হাতি, গণ্ডার, আর ডোরাদার বাঘ। মাত্র কয়েক মাইল পরেই তা শেষ হয়ে গেল। তারপর হয় ত সুরু হল চা-বাগান। সেখানে ঢেউ খেলান জমির ওপর থাকে থাকে সাজান চা গাছ। বহু শত বিঘা জুড়ে তার বিস্তার, আর মাঝখানে দ্বীপের মত কুলীদের ছোট ছোট কুঁড়ে, কয়েকটা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী আর কারখানা ঘর। চা বাগান, জনপদ আর জঙ্গল পরম প্রীতির সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধে সেখানে বদ্ধ। একটানা রাজ্য কারও নয়।

এমনি এক জঙ্গলে-ঘেরা গ্রামে সোভানির বাস। ছোট একখানি কুঁড়ে আশ্রয় ক'রে, স্ত্রী আর একটি ছোট্ট খুকি নিয়ে তার ছোট সংসার। সংসার তার ভালই চলে যেত, যদি তাদের জীবনে হঠাৎ স্থানীয় জোতদারের না আবির্ভাব হত।

এ অঞ্চলে জোতদারদের অনেক জমি থাকে, কারো কারো হাজার হাজার বিঘা খামারের জমি থাকে। সেই জমি ভাগে চাষ করিয়ে ভাগের ফসলের মালিক হয় তারা। খুবই সমৃদ্ধ হয় তারা।

এই জোতদার একবার একটি কাজ দিতে সোভানির বাড়ীতে নিজেই এসে হাজির হয়েছিলেন। সোভানি বাড়ী ছিল না। অগত্যা তার স্ত্রীকে ডাকিয়ে তার কাছেই প্রয়োজনীয় উপদেশ রেখে এসেছিলেন। সোভানির ওপর ভার পড়েছিল একটা ভাল টেবিল করে দেবার।

সোভানি ভাল কারিগর। টেবিল সে একটা ক'রে দিয়ে এল জোতদারদের বাড়ীতে। জোতদার তার কাজের খুব তারিফ করলেন। সে জোতদারের সুনজরে পড়ে গেল। ফলে ভাগ্যদেবী তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে উঠলেন। সোভানি জোতদারের কাছ হতে প্রায়ই কাজ পায় এবং মোটা হারে তার মূল্যও পায়। সোভানির চালা ঘর এবার টিনের ঘরে পরিণত হবে আর কি।

কিন্তু অবিমিশ্র সৌভাগ্য খুব কম মানুষের কপালেই লেখা থাকে। হঠাৎ সোভানির আচরণে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা গেল। সে কোনকালে বিশেষ ধার্ম্মিক ছিল

না হঠাৎ ভারি ধার্ম্মিক হয়ে পড়ল। তার মন উদাস, মুখ বিষাদমণ্ডিত। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে —সংসারে তার বিরাগ এসে গেছে, দুনিয়ায় সবই ত ঝুটা। মাঝে মাঝে আবোল তাবোল অর্থবিহীন কথা বলে, অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে আলাপ করে থাকে। প্রায়ই মালা জপ করতে বসে যায়। একবার বসে ত ঘন্টার পর ঘন্টা তার মালা জপ চলে।

তার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে তার স্ত্রী ব্যাকুল হয়ে পড়ে। জোতদার তাদের এখন মুরুব্বি। তাঁর কাছে গিয়ে বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করে। জোতদার তাকে অভয় দিলেন। ভাল হাকিম ডাকিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হল না।

কিন্তু এত চিকিৎসায়ও সোভানির কোনও সুফল হয়েছে বলে মনে হল না। রোগের লক্ষণ যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলল। তার অপর পাশে এক ফকির আস্তানা নিয়েছিল। সোভানি সেখানে গিয়ে তার কাছে মাঝে মাঝে বসতে লাগল। সময় মত ঘরে ফিরবার আর খেয়াল থাকে না। অসময়ে ফেরে, খাওয়া-দাওয়া নিয়মিত হয় না, এমন কি মাঝে মাঝে খাওয়া বাদও পড়ে যায়। তার স্ত্রী তার শরীর অনশনে ও অনিয়মে দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছে দেখে উদ্বিগ্ন হয়। তাকে কত অনুনয় বিনয় করে, নিয়মমত বাড়ী ফিরতে, খাওয়া দাওয়া করতে বলে, কিন্তু কোন ফল হয় না। তার এক কথা দুনিয়া ঝুটা হ্যায়। বেশী পীড়াপীড়ি করলে ভয় দেখায়—একেবারে বিবাগী হয়ে চলে যাবে।

এইভাবে কিছুদিন চলে। ফকিরের প্রতি আকর্ষণ যেন তার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। তার কাছে তার অবস্থিতির কাল এখন দীর্ঘতর হয়েছে। এমনও এখন মাঝে মাঝে হয় যে রাত্রি কাটিয়ে সে ফকিরের কাছ থেকে বাড়ী ফেরে।

একদিন সন্ধ্যার দিকে সে ফকিরের আস্তানায় যাবার জন্য বাড়ী হতে রওনা হল। তার স্ত্রীর ভয় হল। বনে ডোরাদার বাঘ থাকে এই সন্ধ্যাবেলায় তার মধ্য দিয়ে যাওয়া ত নিরাপদ নয়। কি জানি যদি বাঘে আক্রমণ করে।

সোভানি কিন্তু ভীষণ জিদ ধরেছে সে যাবেই। তার অনুনয় বিনয়ে কোন ফলই হল না। উদাসীন মানুষ সে শুধু হাতেই চলেছে। অগত্যা তার স্ত্রী ছুটে ঘরে গিয়ে তার কুকরীটা এনে তার হাতে তুলে দিল। বিপদের সময় কাজে লাগাতে পারে ত। সে সেটা কোমরে গুঁজে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর যা প্রমাণে পাওয়া যায় তা একটি অপূর্ব্ব নাটকীয় পরিস্থিতি। রাত তখন দশটা হবে। সোভানির শোবার ঘরে স্তিমিত দীপের আলোয় দেখা গেল তার বিছানায় আসীন একটি দম্পতী। তাদের একজন হল সোভানির স্ত্রী এবং অপরটি হল আর কেহ নয় স্বয়ং সোভানির জোতদার। আরও বিস্ময়ের বিষয় খাটের তলা হতে আবির্ভাব ঘটল একটি তৃতীয় ব্যক্তির। সে হল সোভানি।

এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। যবনিকার অন্তরালে যে খেলা গোপনে চলছিল তা প্রকট হয়ে গেল সোভানির কাছে। প্রকাশ হয়ে গেল, যে জোতদারের তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি মোটেই অহৈতুকী নয়। তার কারণটা অতি স্থূল, তার কারণটা অতি জঘন্য। সে যা সন্দেহ করেছে অথচ প্রমাণ পায় নি, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সে হাতে নাতে পেয়ে গেল।

অপরপক্ষে জোতদারের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে সোভানির পাগলামি ও ধর্ম্ম অনুরাগ দুটোই কৃত্রিম, অভিনয় মাত্র। সামান্য ছুতোর মিস্ত্রি হলে কি হবে? পেটে পেটে সে গভীর বুদ্ধি ধরে। আরও বড় কথা, কি নিপুণ অভিনয়ও করতে পারে সে। তার স্ত্রী, তার প্রতিবেশী, স্বয়ং জোতদার সকলকেই সে ধোকা দিয়ে একেবারেই বোকা বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

শুধু বোকা বানিয়ে ছেড়ে দিলেও ক্ষতি ছিল না। এ যে একেবারে হাতেনাতে চোর ধরে ফেলেছে। তার মান এখন চুলোয় যাক, এখন তার জান থাকলে অনেক ভাগ্য বলতে হবে। কি বিপদ যে নিজের বোকামির জন্য জোতদার নিজের ওপর টেনে এনেছে তা ভেবে সে কি রকম অভিভূত হয়ে পড়ল। না রইল তার বাকশক্তি, না রইল চলনশক্তি। ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গেল। এতটুকু নড়বার শক্তি রইল না।

এদিকে সোভানি তাদের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে থাকে। হাতে তার স্ত্রীর দেওয়া কুকরী, চোখ ঠেলে

বেরিয়ে আসছে, দাঁতে দাঁত চাপা, সমস্ত মুখখানি জুড়ে একটা দারুণ প্রতিহিংসা-লোলুপতার প্রকাশ।

ঘোষ মশাই বললেন, বুঝেছি। সোভানি বুঝি সেই জোতদার আর স্ত্রীকে সেই কুকরীর আঘাতে খুন করল?

আমি বললাম, পরিণতিটা এই রকম হওয়াই বোধ হয় স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ট্র্যাজেডিটা একটু স্বতন্ত্র ধরণের রূপ নিয়েছিল। শুনুন না প্রায় শেষ হয়ে গেল।

তারপর আবার গল্পটার সূত্র ধরলাম।

সোভানি তার স্ত্রীকে কিছুই বলল না। সে জোতদারকে টেনে বিছানা থেকে মাটিতে নামিয়ে নিল।

মানুষের প্রাণের দায় বড় দায়। তার জন্য একবার শেষ চেষ্টা না ক'রে কেউ ছাড়ে না। দেহে কণামাত্র বল তার নাই, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। তবু সেই সঙ্কট মুহূর্ত্তে সে অভাবনীয়রূপে সোভানির পা দুটো জড়িয়ে ধরলে এবং বললে।

তোমার পায়ে পড়ি। আমার জান নিও না। আমায় মেহেরবাণি কর।

সোভানি কিন্তু কোন উত্তর দিল না। সে অবজ্ঞাভরে নিজের মতলব মত কাজই ক'রে যেতে লাগল। তার কাপড় ছিঁড়ে তাই দিয়ে ঘরের এক খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেলল। তারপর এক বিরাট মুখভঙ্গি ক'রে তার কুকরীটা সে হাতে তুলে নিল। বুঝি বা তাকে জবাই করে।

জোতদার ওষ্ঠাগতপ্রাণ নিয়ে আবার শেষ মিনতি করল, পায়ে পড়ি, আমার জান নিও না।

হঠাৎ অনুনয়ের যেন সাড়া পাওয়া গেল। এতক্ষণ সোভানি কোন কথা বলেনি। সে যেন তার উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তন করল। সে বলল, আচ্ছা তুমহারা জান নেহি লেঙ্গে। মগর তুমকো ল্যাংড়া বনায়কে ছোড়েঙ্গে।

যেমন বলা তেমন কাজ। ছেড়ে তাকে দিল বটে, তার বাঁধন কেটে দিয়ে। কিন্তু তার আগে সেই কুকরী দিয়ে দিল তার পায়ে একটা প্রচণ্ড আঘাত।

জোতদারের আর্ত্তনাদ আর সোভানির চিৎকার প্রতিবেশীদের জাগিয়ে তুলল। জোতদারের বাড়ী খবর গেল। তার প্রতিপত্তির বা লোকবলের অভাব নাই। ডাক্তার এল, চিকিৎসার বন্দোবস্ত হল। কিন্তু সেই আঘাতের ফলে এমন প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল তাতেই সে মারা গেল, চিকিৎসার আর অবসর মিলল না।

ঘোষ মশাই বললেন, লোকটার আচরণটা কেমন যেন খাপছাড়া মনে হয় আমার। এই অবস্থায় স্ত্রীকে পেয়েও তার কোন শাস্তি দিল না। তার উপপতিকে সোজাসুজি ও আঘাত করলে না হয় আচরণ খানিকটা স্বাভাবিক হত। তাকে কিনা ধীরে সুস্থে বাঁধল এবং খানিকটা ক্ষমা করতেও যেন প্রস্তুত হল।

ডাক্তার সাহেব বললেন, মানুষের মনটা বড় জটিল বস্তু। কোনটা কোন অবস্থায় স্বাভাবিক আচরণ, আর কোনটা নয়, তা ঠিক করে বলা যায় না।

সারনাথে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সার্দ্ধদ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বেকার কথা।
সেদিন হেথায় তুমি দিলে সে বারতা
সত্যের দীপ্তিতে তাহা আজও জ্যোতির্ম্ময়!
অহিংসা পরম ধর্ম্ম—মিথ্যা নয়, নয়।
তোমার যে বাণী—সে তো জীবনের বাণী।
সে বাণী ভুলিনু, তাই এই হানাহানি;

সর্ব্বধ্বংসী কুরুক্ষেত্রে মৃত্যুর ছায়ায়
ভয়ে তাই কাঁপে বিশ্ব। মর্ম্মের গুহায়
বর্ব্বর ঘুমায়ে ছিল। আজি সে জাগিয়া
হাইড্রোজেন বোমা হস্তে অন্তরীক্ষে গিয়া
বোমারু হইতে মৃত্যু বর্ষিতে উদ্যত।
আসন্ন ধ্বংসের তীরে, তাই, তথাগত,

তোমারে স্মরণ করে ভয়ার্ত্ত ভুবন।
তোমারই বাণীর মাঝে অনন্ত জীবন।

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ হইতে বন্ধ হয় বলিয়া সূত্রকার আবার বলিতেছেন—

ন অবিদ্যাতোঽপি, অবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ।

সাং সূ ১।২০

বস্তুত্বে সিদ্ধান্তহানিঃ। সাং সূ ১।২১

বিজাতীয় দ্বৈতাপত্তিশ্চ। সাং সূ ১।২২

অবিদ্যা হইতে বন্ধ হইতে পারে না, কেননা অবিদ্যা অবস্তু, কোনও বস্তু নহে। যদি বল অবিদ্যা সৎবস্তু, তাহা হইলে তাহার বিনাশ হইতে পারে না, কেননা যাহা সৎ, তাহার বিনাশ নাই। সুতরাং মোক্ষ অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবিদ্যা যদি আত্মা হইতে ভিন্ন বস্তু হয়, তাহা হইলে তাহা বিজাতীয় দ্বিতীয় বস্তু হইল। তাহা বৈদান্তিক মতের যেমন বিরোধী, তেমনি ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদেরও বিরুদ্ধ। কেননা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে এই জগৎ বিজ্ঞান-সন্ততি বা বিজ্ঞান প্রবাহ এবং এই প্রবাহের প্রত্যেক বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের সজাতীয়। কিন্তু অবিদ্যা যদি সৎ ও অসৎ উভয়রূপা হয়?

বিরুদ্ধোভয়রূপা চেৎ? (সাং সূ ১।২৩)

ন, তাদৃক্ পদার্থাপ্রতীতেঃ। (সাং সূ ১।২৪)

না, তাহা হইতে পারে না, কেননা পরস্পর-বিরুদ্ধ-রূপবান্ কোনও পদার্থের প্রতীতি হয় না।

ন বয়ং ষট্‌পদার্থবাদিনঃ বৈশেষিকাদিবৎ।

(সাং সূ ১।২৫)

অনিয়তত্বেঽপি অযৌক্তিকস্য সংগ্রহঃ।

অন্যথা বালোন্মত্তাদি সমত্বম্। (সাং সূ ১।২৬)

সত্য বটে, বৈশেষিক দর্শনে মাত্র ছয়টি পদার্থ স্বীকৃত আছে। কিন্তু যাহারা বৈশেষিক দর্শনের অনুগামী নহে, তাহাদিগের পক্ষে ষট্ পদার্থের অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকারে বাধা নাই। ইহা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া সৎ ও অসৎ এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মান্বিত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। পদার্থের সংখ্যা অনিয়ত হইলেও ন্যায় ও যুক্তিতে যাহা অসিদ্ধ, তাহা স্বীকার করিতে কেবল বালক ও উন্মাদেই পারে। সুতরাং অবিদ্যা-সংযোগ হইতে আত্মার বন্ধ হয়, ইহা যাহারা বলেন, তাহাদের মত অগ্রাহ্য।

ন অনাদিবিষয়োপরাগ-নিমিত্তকঃ অপি অস্য।

(সাং সূ ১।২৭)

নাস্তিক ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীদিগের মতে প্রবাহরূপে বর্ত্তমান আত্মার অনাদি বিষয়বাসনা হইতেই বন্ধ হয়। এমতও গ্রাহ্য নহে। কেননা—

ন বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ উপরঞ্জ্যোপরঞ্জক-ভাবোঽপি,

দেশ-ব্যবধানাৎ। শ্রুঘ্নস্থ-পাটলিপুত্রস্থয়োরিব।

(সাং সূ ১।২৮)

আত্মা যেমন "আমি", "আমি", "আমি" ইত্যাকার ক্ষণিক জ্ঞান-প্রবাহ, বাহ্য বিষয়ও তেমনি ক্ষণিক পরিবর্ত্তন-প্রবাহ। প্রবাহরূপে বর্ত্তমান বাহ্যবিষয় কর্ত্তৃক উপরঞ্জিত হইয়া, আত্মা বন্ধন-প্রাপ্ত হইতে পারে না। কেননা অভ্যন্তর-প্রবাহ ও বাহ্যপ্রবাহ বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বলিয়া উপরঞ্জ্য ও উপরঞ্জক ভাব তাহাদের মধ্যে থাকা সম্ভবপর নহে। শ্রুঘ্নদেশে অবস্থিত বস্তু ও পাটলিপুত্রে অবস্থিত বস্তুর মধ্যে দেশ-ব্যবধান-বশতঃ যেমন একটি কর্ত্তৃক অন্যটি উপরঞ্জিত হইতে পারে না, সেইরূপ।

দ্বয়োঃ একদেশ-লব্ধোপরাগাৎ ন ব্যবস্থা।

(সাং সূ ১।২৯)

দ্বয়োঃ = বদ্ধ-মুক্তয়োঃ।

কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ যেমন তাহাদের বিষয়ের নিকট গমনের ফলে, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ বিষয় কর্ত্তৃক উপরঞ্জিত হয়, সেইরূপ আত্মাও বিষয়ের নিকট গমনের ফলে, বিষয় কর্ত্তৃক উপরঞ্জিত হইতে পারিবে না কেন? ইহার উত্তর এই যে তাহা যদি হইত, তাহা হইলে বন্ধ ও মোক্ষের কোনও ব্যবস্থা থাকিত না, মুক্ত আত্মা ও বদ্ধ আত্মা উভয়েরই বিষয়-সংযোগ ও তাহার ফলে বন্ধ হইতে পারিত।

অদৃষ্ট-বশাৎ চেৎ ? (সাং সূ ১।৩০)

ন, দ্বয়োঃ এককালযোগাৎ উপকার্য্যোপকারক-ভাবঃ।
(সাং সূ ১।৩১)

পুত্রকর্ম্মবৎ চেৎ ? (সাং সূ ১।৩২)

নাস্তি তত্র স্থির এক আত্মা, যো গর্ভাধানাদি-
ক্রিয়য়া সংস্ক্রিয়তে। (সাং সূ ১।৩৩)

কিন্তু এমনও তো হইতে পারে, যে মুক্ত আত্মা ও বদ্ধ আত্মা উভয়েরই বিষয়-সংযোগ হইলেও, অদৃষ্টবশতঃ কেবল বদ্ধ আত্মারই বিষয়ে অনুরাগ জন্মে, মুক্ত আত্মার অনুরাগ জন্মে না। হইতে পারে না, তাহার কারণ উপকার্য্য ও উপকারকের একই কালে অবস্থিতি না হইলে কোনও কার্য্যই সম্ভবপর হয় না। ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদে সর্ব বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, উঠিবামাত্র বিলয়প্রাপ্ত হয়। যাহার ধ্বংস হয়, ধ্বংসের পরক্ষণে উদিত বিষয়ের উপর তাহা কোনও ক্রিয়া করিতে পারে না। গর্ভাধানাদি ক্রিয়াদ্বারা অজাত পুত্রের যেরূপ উপকার হয়, পূর্ব্বক্ষণ-স্থিত বিষয় দ্বারা সেইরূপ আত্মার উপরাগ সংঘটিত হয়, ইহাও বলা চলে না। কেননা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে "স্থির এক আত্মা" নামক কিছু নাই। এই মতে গর্ভাধানদ্বারা ভাবী পুত্রের কোনও রূপ সংস্কার অসম্ভব। গর্ভাধানের দৃষ্টান্ত এক্ষত্রে প্রযোজ্য নহে।

ন গতিবিশেষাৎ। (সাং সূ ১।৪৮)

নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ। (সাং সূ ১।৪৯)

কঠোপনিষদে আত্মার গতির কথা আছে। "আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ"। কিন্তু গতিবিশেষ দ্বারা—শরীরপ্রবেশরূপ গতিদ্বারা—আত্মার বন্ধ হয় না। কেননা প্রকৃতপক্ষে আত্মা নিষ্ক্রিয় ও বিভু (সর্ব্বব্যাপী)। তাহার পক্ষে দেহপ্রবেশাদি কার্য্য স্বীকার করা যায় না।

মূর্ত্তত্বাৎ ঘটাদিবৎ সমানধর্ম্মাপত্তৌ অপসিদ্ধান্তঃ।
(সাং সূ ১।৫০)

আত্মা অচেতন ঘটাদির সমানধর্ম্মী হইতে পারে না। ঘটাদির ন্যায় মূর্ত্ত ও পরিচ্ছিন্ন বলিয়া আত্মাকে স্বীকার করিলে, তাহাকে অবয়ব-যুক্ত ও বিনাশী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইহা অপসিদ্ধান্ত।

গতি-শ্রুতিঃ অপি উপাধি-যোগাৎ আকাশবৎ।
(সাং সূ ১।৫১)

নির্গুণাদিশ্রুতিবিরোধশ্চেতি। (সাং সূ ১।৫৪)

আত্মার গতিসম্বন্ধে শ্রুতিতে যাহা আছে, তাহা উপাধিযুক্ত আত্মা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যেমন সর্ব্বব্যাপী ও অমূর্ত্ত আকাশ ঘট প্রভৃতি উপাধি যোগে সাবয়ব, পরিচ্ছিন্ন ও গতিশীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তেমনি দেহরূপ-উপাধি-যোগে আত্মা দেহে প্রবিষ্ট (দেহ-প্রবেশরূপ গতি-বিশিষ্ট) বলিয়া প্রতীত হয়। ঘট একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইলে তাহার মধ্যগত আকাশও যেমন স্থানান্তরিত হয় বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ দেহের গতিতে আত্মারও গতি আছে বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং দেহযোগে আত্মার বন্ধ হয় না। দেহযোগে আত্মার বন্ধ হয়, ইহা স্বীকার করিলে শ্রুতিতে আত্মাকে যে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহার বিরোধ হয়।

তদ্‌যোগোঽপি অবিবেকাৎ। ন সমানত্বং।
(সাং সূ ১।৫৫)

তদ্‌যোগ — প্রকৃতির সহিত পুরুষের যোগ।

১।১৯ সূত্রে বলা হইয়াছে প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগের ফলেই পুরুষের বন্ধ হয়। এই সংযোগ স্বাভাবিক হইতে পারে, কালাদিযোগেও হইতে পারে। তাহা হইলে মুক্ত পুরুষেরও তো বন্ধ হইতে পারে। এই আশঙ্কার নিরসনের জন্য সূত্রকার বলিতেছেন প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের কারণ অবিবেক। ইহা স্বাভাবিক নহে, কালাদিযোগ-নিমিত্তও নহে। এই সংযোগের নিমিত্ত অবিবেক। আপত্তি উঠিতে পারে—এই শ্লোকে অবিবেক শব্দের অর্থ তো প্রকৃতি-পুরুষের অভেদ-সাক্ষাৎকার নহে। কেননা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে তাহার উদ্‌ভব সম্ভবপর নহে। এখানে অবিবেক শব্দের অর্থ বিবেকের প্রাগভাব বা অবিবেকাখ্য জ্ঞান-বাসনা। কিন্তু ইহারা উভয়ই তো বুদ্ধির ধর্ম্ম, পুরুষের ধর্ম্ম নহে। বিভিন্ন ধর্ম্মীর মধ্যে সংযোগ হইতে পারে কিরূপে? ইহার উত্তরে বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলেন, বিষয়তা-সম্বন্ধে অবিবেক পুরুষধর্ম্ম এবং "প্রকৃতিঃ বুদ্ধিরূপা সতী যস্মৈ স্বামিপুরুষায় তত্ত্বং বিবিচ্য ন দর্শিতবতী, স্ববৃত্তিদর্শনার্থং তদীয় বুদ্ধিরূপেণ তত্রৈব পুরুষে সংযুজ্যতে।" অর্থাৎ বুদ্ধিরূপা হইয়া প্রকৃতি যে স্বামি-পুরুষকে স্বীয় তত্ত্ব প্রদর্শন করেন নাই, আপনার বৃত্তি-

প্রদর্শনের জন্য তিনি সেই স্বামি-পুরুষেরই বুদ্ধিরূপে তাহাতে সংযুক্ত হন। কিন্তু ইহা কবিতামাত্র, দার্শনিক যুক্তি নহে।

সাংখ্য মতে অবিদ্যা বন্ধের কারণ নহে। কিন্তু পাতঞ্জল সূত্রে (২।২৪) অবিদ্যাকেই প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের কারণ বলা হইয়াছে। অবিবেক যদি প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের কারণ হয়, তাহা হইলে অবিবেক ও অবিদ্যা সমার্থক বলিতে হইবে। ব্যাস-ভাষ্যে "অবিদ্যার" অর্থ "বিপর্য্যয় জ্ঞান বাসনা" বলা হইয়াছে। ইহাই অবিবেক। সাংখ্য মতে এই অবিবেক হইতে সংযোগ হয়, এবং সংযোগ হইতে বন্ধ হয়। অবিবেক বা অবিদ্যা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বন্ধের কারণ নহে বলিয়া অবিদ্যা হইতে বন্ধ হয়না, বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যে ভোগ্য-ভোক্তৃভাব অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান, তাহাকে সংযোগের হেতু বলা হয় নাই এবং কর্ম্মকেও বলা হয় নাই কেন? ইহার উত্তরে ভিক্ষু বলেন—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুংক্তে প্রকৃতিজান গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসৎ-যোনি-জন্মসু।

গীতার এই শ্লোকে "সঙ্গ" নামক অভিমানকে সংযোগের হেতু বলা হইয়াছে॥ এই সঙ্গই অবিবেক। কর্ম্মের সহিত পুরুষের সম্বন্ধও অবিবেকজাত। অবিবেক পুরুষ আপনই ছেদন করিতে পারে; কর্ম্মাদির ছেদন করিতে প্রথমে অবিবেকের ছেদনের প্রয়োজন।

নিয়ত কারণাৎ তদুচ্ছিত্তিঃ ধ্বান্তবৎ। সাং-সূ ১।৫৬
প্রধানাবিবেকাৎ অন্যাবিবেকস্য তদ্ধানে হানং। ১।৫৭

কেবল নির্দ্দিষ্ট কারণ দ্বারাই অবিবেক বা অবিদ্যার উচ্ছেদ হইতে পারে, যেমন অন্ধকারের উচ্ছেদ কেবল আলোক দ্বারা হয়। এই কারণ "বিবেক।" "বিবেকখ্যাতিঃ অবিপ্লবা হানোপায়ঃ" (পাতঞ্জলসূত্র ২।২৬)। প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে অবিবেকের নাশ হইলে অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন এই জ্ঞান হইলে, অন্য অবিবেকেরও নাশ হয়।

বন্ধ সম্বন্ধে এত কথা বলিয়া অবশেষে সূত্রকার বলিতেছেন—

বাঙ্‌মাত্রং নতু তত্ত্বং, চিত্তস্থিতেঃ। সাং-কা ১।৫৮

বন্ধ ও মোক্ষ বাক্যমাত্র, পুরুষের বন্ধও নাই মোক্ষও নাই। বন্ধ ও মোক্ষ আছে চিত্তে—প্রকৃতিতে। জবাফুলের সান্নিধ্যে স্ফটিক যেমন লোহিতবর্ণে রঞ্জিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বন্ধ ও মোক্ষ তেমনি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র। প্রকৃতিস্থ চিত্ত পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। অবিবেকযুক্ত চিত্তের প্রতিবিম্ব সুখ-দুঃখাদির প্রতিবিম্ব। বন্ধরূপবৃত্তি যদিও চিত্তেরই তথাপি পুরুষে দুঃখের যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাই ভোগ এবং তাহার উচ্ছেদই পুরুষার্থ (বিজ্ঞান ভিক্ষু)।

কিন্তু বন্ধ যদি বাঙ্‌মাত্রই হয়, তাহা হইলে শ্রবণ-মনন দ্বারাই তো তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে, অন্য চেষ্টার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর—

যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে, দিঙ্‌মূঢ়বৎ অপরোক্ষাৎ ঋতে। সাং-সূ ১।৫০

বাঙ্‌মাত্র হইলেও যতদিন আত্মসাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন এই বোধ হয় না। দিঙ্‌মূঢ় ব্যক্তিকে সত্য দিকের নির্দ্দেশ করিয়া দিলেও যেমন তাহার দিক্‌বৈপরীত্য অপগত হয় না, তেমনি কেবল শ্রবণ ও মননদ্বারা বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয়না, যুক্তি দ্বারাও অবিবেক বিদূরিত হয় না। এই অবিবেক, এই ভ্রান্তি পুরুষের নহে, বুদ্ধির। বুদ্ধির সহিত পুরুষের অভেদ জ্ঞান আছে বুদ্ধিতে, পুরুষে তাহা নাই। পুরুষে সেই অবিবেক, সেই ভ্রান্তি, প্রতিবিম্বিত হইলেও তাহা বুদ্ধিরই অবিবেক, বুদ্ধিরই ভ্রান্তি। সুতরাং বন্ধ পুরুষের নহে, প্রকৃতির।

দুঃখ-সংযোগ বন্ধ, দুঃখ হইতে মুক্তিই মোক্ষ। দুঃখ-মুক্তি ও সুখ এক নহে। সাংখ্য মোক্ষকে সুখের অবস্থা বলিয়া স্বীকার করেন না। সে অবস্থা—দুঃখ ও সুখ উভয়েরই অতীত অবস্থা—কিরূপ, তাহার ধারণা আমরা করিতে পারি না। যাঁহারা মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন সে অবস্থা কিরূপ। অথবা মোক্ষ যদি লিঙ্গশরীরেরই হয়, তাহা হইলে তাঁহারাও তাহা জানেন না, কেননা সে অবস্থায় লিঙ্গশরীরের অস্তিত্বই থাকে না। পুরুষ চিরমুক্ত, তাহার বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই। জীবই বুদ্ধ্যাদি সমন্বিত লিঙ্গ-দেহে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার বিনাশ হয়।

সমাধি-সুষুপ্তি-মোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা। সাং-সূ ৫।১১১

সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষ এই তিন অবস্থাতে ব্রহ্মরূপতা-প্রাপ্তি হয়। কাহার? জীবের নহে। পুরুষের। কেন না মোক্ষে জীবের অস্তিত্বই লুপ্ত হয়। প্রকৃতির সংসর্গ-বিমুক্ত অবস্থাই

ব্রহ্মরূপতা। কিন্তু প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ যদি সত্য না হয়, (যাহা সাংখ্য বারংবার বলিয়াছেন) তাহা হইলে এই ব্রহ্মরূপতা পুরুষের কখনই অপগত হয় না। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান-ভিক্ষু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও মনে হয় না যে প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ বাস্তবিকই হয় এবং তাহাতে পুরুষে মালিন্য-সৃষ্টি হয়। "ব্রহ্মত্বমেব পুরুষাণাং স্বভাবঃ, নৈমিকত্বাভাবাৎ। স্ফটিকস্য শৌক্ল্যমিব। বুদ্ধিবৃত্তি-সম্বন্ধকালে তু পরিচ্ছিন্ন-চিদ্-রূপত্বেনাভিব্যক্ত্যা পরিচ্ছেদাভিমানঃ, তথা বুদ্ধি-প্রতিবিম্ববশাৎ দুঃখাদিমালিন্য-মিব চ ভবতি, ইতি তৎ সর্ব্বমৌপাধিকমেব।" "ব্রহ্মত্ব পুরুষ-দিগের স্বভাব, স্ফটিকের শুক্লতার মতো। বুদ্ধিবৃত্তির সহিত সম্বন্ধকালে পরিচ্ছিন্ন চিদ্রূপে অভিব্যক্তিবশতঃ পুরুষের আপনাকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া অভিমান হয়; দুঃখপ্রতিবিম্ব-পতনের ফলে দুঃখাদি মালিন্য যেন (ইব) হয়। সকলই ঔপাধিক। কিন্তু যোগশাস্ত্রের "বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র" এই সূত্রে পুরুষেরও বুদ্ধির মতই বৃত্তি হয়। ফলতঃ এই বৃত্তি-সারূপ্য স্বীকার না করিলে সমাধি, সুষুপ্তিও মোক্ষে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি হয় "এই বচনের কোনও যুক্তিসম্মত অর্থ থাকে না। বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার উপরিউদ্ধৃত ব্যাখ্যায় একবার পুরুষের পরিচ্ছিন্নতা স্বীকার করিতেছেন, পরি-চ্ছেদাভিমান স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু শেষে "ইব" শব্দের প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন যে দুঃখাদিমালিন্য "যেন" হয়।

সমাধি ও সুষুপ্তির সহিত মোক্ষের ভেদ এই যে সমাধি ও সুষুপ্তিতে বন্ধের বীজ থাকে, মোক্ষে সে বীজেরও ধ্বংস হয়।

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ সত্য। তাহার ফলে পুরুষে ভ্রান্তির উদ্ভব হয় এবং পুরুষ আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে। এই ভ্রান্তি যখন বিদূরিত হয়, তখন পুরুষ আপনার প্রকৃত স্বভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হয়, এবং ভ্রান্তি সম্ভূত দুঃখ হইতে মুক্ত হয়। ইহাই বন্ধ ও মুক্তির অর্থ। পুরুষ সত্যই আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে। ইহা স্বীকার না করিলে, সাংখ্যদর্শনের প্রয়োজনই থাকে না।

ভারতীয় শিল্পের মূলধন সমস্যা

শ্রীরাধাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীন ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'শিল্পোন্নয়ন' বিষয়টি অন্যান্য আর্থিক পরিকল্পনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। যুদ্ধোত্তর যুগে পৃথিবীব্যাপী আর্থিক উন্নয়নের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে (১৯৩৯-৪৫) উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলির অর্থনীতিক কাঠামোয় ভাঙ্গন ধরিয়াছে এবং তজ্জন্য, বিশেষ করিয়া অনুন্নত দেশগুলিকে কেমন করিয়া শিল্পময় (Industrialisation) করিয়া তোলা যায়, তাহার নানা পরিকল্পনা ইতিমধ্যে কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই সকল অনুন্নত দেশগুলিকে শিল্পময় করিয়া তুলিবার পথে কতকগুলি সমস্যা দেখা দিয়াছে: (১) নিয়োগ ও আয়, (২) শ্রম এবং মূলধনের অসম্পূর্ণ ব্যবহার, (৩) উৎপাদন পদ্ধতির গঠনমূলক অনমনীয়তা, (৪) মূলধন-আমদানী ও ঋণ দান, ও (৫) মূলধনের চাহিদা। মোটামুটি এই কয়টি হইল প্রধান সমস্যা। আমরা জানি অর্থনীতির মূল সূত্র কোন বিশিষ্ট দেশ বা কালের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ইহা সর্বকালের এবং সর্বদেশের আর্থিক সমস্যা সমাধানে যুগোপযোগী নূতন অর্থনীতিক সূত্র রচনায় আপন সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের সন্ধান রাখিয়া যায়। ইহার গতি সাবলীল। তাই, আধুনিক কোন কোন অর্থনীতি-বিদগণের মতে* খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ 'কীন্‌সে'র নিয়োগ-সূত্র (Theory of Employment) এই অনুন্নত দেশগুলির আর্থিক সমস্যার সমাধানে পর্য্যাপ্ত নহে। ইহার জন্য চাই নূতন অর্থনীতি—যে অর্থনীতি অনুন্নত দেশের সম্পদ ও শ্রমের যথোপযুক্ত নিয়োগের প্রকৃত তত্ত্ব এবং তথ্যের নির্দ্দেশ দিতে পারে। শিল্প-বিস্তার, উৎপাদন, খাদন, বণ্টন, আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় প্রভৃতি অর্থনীতির মূলসূত্রগুলি নূতনভাবে, নূতন ছাঁচে ঢালিয়া অনুন্নত দেশগুলির আর্থিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। আজ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির প্রধান লক্ষ্য হইল উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন দিয়া অনুন্নত দেশগুলির অর্থনীতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা। কারণ, এই সকল কৃষিপ্রধান অনুন্নত দেশগুলি যদি দরিদ্র থাকিয়া যায়, যদি তাহাদের প্রচুর ক্রয়-ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে উন্নত দেশগুলিরও

* Article in the Indian Economic Journal, October, 1954,

K. S. Gill-Keynesian Economics and Under-developed countries.

অর্থনৈতিক কাঠামো যে অদূর ভবিষ্যতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে শিল্পের উন্নতি, ইহার প্রসার ও নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য এ পর্য্যন্ত বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অর্থনীতির দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ভারতবর্ষ একটি কৃষি-প্রধান অনুন্নত দেশ। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হইল ভারত-বর্ষকে শিল্পময় করিয়া তুলিবার জন্য মূলধনের কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

ভারতীয় শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের দুই প্রকার ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে ঃ (১) দীর্ঘ মেয়াদী (Long term) ও (২) স্বল্প মেয়াদী (Short term)। এই প্রসঙ্গে, বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মূলধন যোগানের জন্য শ্রফ কমিটি (Shroff Committee) যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রারম্ভেই উক্ত সমিতি বলিয়াছেন, "যদিও নূতন মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, তথাপি ইহা আশানুরূপ হয় নাই; এবং পরিকল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে, নূতন মূলধনের বার্ষিক বিনিয়োগ ১৯৫১-৫৩ পর্য্যন্ত বৎসরের প্রায় দ্বিগুণ উন্নীত করিতে হইবে।" সংক্ষেপে, রিপোর্টে এই কয়টি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে ঃ (১) আর্থিক নীতি, (২) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ, (৩) "বিল" বাজারের পরিকল্পনা, (৪) দেশীয় ব্যাঙ্ক, (৫) আর্থিক সঙ্ঘ (Finance Corporation), (৬) ক্ষুদ্র শিল্প ও (৭) পণ্যের বাজার। দীর্ঘমেয়াদী অর্থ সরবরাহ উক্ত সমিতির মতে একটি প্রধান সমস্যা। দেশীয় মূলধনের যথাযোগ্য বিনিয়োগ ব্যবস্থা এবং মূলধনের উপযুক্ত বাজার প্রতিষ্ঠা করা এই দুইটিই সমভাবে দীর্ঘমেয়াদী পন্থা। সমিতি প্রধানতঃ ছয়টি অধ্যায়ে বৃহৎ, মধ্যম ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থের ন্যূনতা ও আনুষঙ্গিক আর্থিক বিধিগুলি গভীর মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে, বেসরকারী শিল্পের ও মূলধন বিনিয়োগের জন্য সর্বোপরি অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করা প্রয়োজন। অবাধ বাণিজ্য নীতিতে (Laissez-faire) দেশকে শিল্পময় করিবার জন্য পাশ্চাত্য দেশে প্রয়োজনীয় আর্থিক সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; যদিও, সামাজিক পুরোভূমির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি ইহার কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছে। ভারতবর্ষের লক্ষ্য হইল বৃহদাকারে দেশকে শিল্পময় করিয়া তোলা অথচ কয়েকটি কারণে—মূলধন সংগঠনে সর্বশিল্প ধারণ শক্তি, অনুন্নত ও অসংলগ্ন আর্থিক সঙ্ঘ ও সামাজিক রীতি-নীতি—উদ্যোক্তার ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ প্রতিহত হইতেছে। মোটের উপর, উক্ত সমিতির রিপোর্ট হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সরকার, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্মিলিত-ভাবে অথবা এককরূপে এ সম্পর্কে নানাবিধ কল্যাণমূলক কাজ করিতে পারেন।

বহুদিন ধরিয়া ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রাধান্য আমাদের দেশে ক্ষুণ্ণ হইতেছে। গত কয়েক মাসে এই বিষয়টি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হইয়াছে; বিশেষ করিয়া এই জন্য যে বৃহৎ শিল্পগুলি দেশের ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে নাই। বস্তুতঃ, ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ক্রমাগত উপেক্ষিত হইয়াই আসিয়াছে অথবা সরকারী ও বেসরকারী কোনরূপ ন্যায্য বিবেচনা ইহার প্রতি করা হয় নাই। শ্রফ্ কমিটি বলিয়াছেন যে এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলি গ্রাম্য অর্থনীতির (Rural Economy) সহিত একত্রিত নহে এবং ইহারা এমন কতকগুলি 'একক'এর (Units) সমষ্টি যাহার সম্পত্তির পরিমাণ ১০,০০০্ টাকা এবং ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে। শিল্পের উৎপাদন এবং জনগণের নিয়োগের সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে যথাযথভাবে অনুধাবন করিবার জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী, জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি এবং 'ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের' সৌজন্যে একটি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা সঙ্ঘ (International Planning Team) আমন্ত্রণ করিয়াছেন। উক্ত সঙ্ঘ ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শনকালে যে সকল অভিযোগ শুনিতে পাইয়াছেন তন্মধ্যে আর্থিক অসংকুলানই প্রধান। তাঁহাদের মতে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির মূলধন অনটনের একমাত্র কারণ উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি। ক্ষুদ্র শিল্পগুলির অর্থ যোগান বৃদ্ধি করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির অধিকতর সম্মিলিত চেষ্টা করা উচিত। ঠিক ভাবে অর্থ যোগান ব্যতিত ক্ষুদ্র শিল্পগুলির সুষ্ঠু পরিকল্পনা, মাল খরিদ অথবা উৎপাদন, লেনদেন ও ন্যায্য লাভ কিছুই সম্ভব নহে। প্রকৃত অর্থ যোগান (Supply of Real Finance) বলিতে যাহা বুঝায় বর্ত্তমানে তাহা আদৌ নাই বলিলেই হয় এবং মূলধন ও ঋণদানের ন্যূনতা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। কাঁচামাল অথবা উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কোন কার্য্যকরী মূলধন (Working Capital) নাই। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ঋণদানে সমর্থ নহে। অধুনা ক্ষুদ্র শিল্পগুলির আর্থিক দুরবস্থা এরূপ চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে যে সুফল লাভ করিতে হইলে যথাশক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে কেবল আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং জনশক্তির উন্নত ব্যবহার করার নিমিত্তই যেন আর্থিক ঋণ দেওয়া হয়। মূলধন সরবরাহের জন্য আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা সঙ্ঘ নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন ঃ (১) ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ঋণ দেওয়ার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের শাখা ব্যাঙ্কগুলির উপর অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ করিতে হইবে এবং সাধারণ ভাবে তাহারা যেন ঋণ-ব্যবসায়ে 'বি-কেন্দ্রীয়'করণের দিকে কাজ করিতে থাকে। (২) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কয়েকটি স্থানীয় কার্য্য-নির্ব্বাহকমণ্ডলী' (Local Boards of Directors) গঠন করিবে, অথবা তাহা সম্ভব না হইলে, কয়েকটি 'স্থানীয় পরামর্শমণ্ডলী' (Local Advisory Boards) স্থাপন করা দরকার। এই দুইটি সংস্থার মতানৈক্য ঘটিলে ঋণ দরখাস্তের সিদ্ধান্ত উৰ্দ্ধতন কর্ত্তৃবর্গের নিকট পাঠাইতে হইবে; (৩) স্থাবর সম্পত্তি জামিনের (Security of Real Estate Mortgages) উপর ভিত্তি করিয়া কিরূপে ঋণ-প্রথার প্রচলন করা যায় তাহা বিবেচনা করিতে হইবে; (৪) সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে শিল্প-ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করিতে

হইবে ; (৫) মূলধনের ঝুঁকি লওয়ায় উৎসাহ দানের জন্য ব্যবসা পরিচালনার পারিপার্শ্বিক সাধারণ আবহাওয়া অনুকূল হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং ন্যায্য লাভের সুন্দর সুযোগ দেওয়া অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে ; (৬) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য যে পরিমাণ উপযুক্ত সরকারী অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা গুরুত্বপূর্ণ মূলধনের (Venture Capital) নিমিত্ত পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে এবং ইহার একটি সুনির্দ্দিষ্ট অংশ রাষ্ট্রীয় অর্থসঙ্ঘের (State Finance Corporation) নিকট রাখিতে হইবে ; (৭) সকল রাজ্যে এইরূপ 'রাষ্ট্রীয় অর্থসঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং তাহাদের অর্থের কিয়দংশ ক্ষুদ্র শিল্পগুলির সাধারণ ঋণ হিসাবে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করিবার জন্য পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে ; (৮) ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ঋণ দরখাস্ত সমূহ যাহাতে রাষ্ট্রীয় শিল্প তত্ত্বাবধায়কগণের (State Directorates of Industries) কর্তৃত্বাধীনে থাকে তাহার জন্য একটি কার্য্যকরী সঙ্ঘের (Field Organisation) প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় অর্থসঙ্ঘগুলির প্রতিনিধি হইয়া এই সঙ্ঘটি কাজ করিবে ; (৯) আধুনিক ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি এবং ভোগ্য-সামগ্রী (Consumer goods) ক্রয়ের জন্য কিস্তিবন্দিতে অর্থ সরবরাহের সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যক্তিতান্ত্রিক পুঁজিবাদীর অবসান ঘটিয়াছে। ইহার ফলে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার ন্যায় ধনিকতন্ত্র দেশে বিরাট মূলধনের অধিকারী পুঁজিপতির সংখ্যা আজকাল খুব কম দেখা যায়। প্রাতিস্বিক উদ্যোক্তার মূলধন বিলুপ্ত হওয়ায় নূতন শিল্প গঠনে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন মিটাইতে এবং বর্ত্তমান শিল্পগুলির সম্প্রসারণ ও আধুনিক করণের দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করার নিমিত্ত কয়েকটি বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে। আজ পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই অনুরূপ প্রতিষ্ঠান আছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষেও 'শিল্পোন্নয়ন সঙ্ঘ' (Industrial Development Corporation) প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হইতেছে।

১৯৪৮ সালে 'ভারতীয় শিল্প অর্থ-সঙ্ঘ' নামে একটি শিল্পোন্নয়ন সঙ্ঘ সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয়। ইদানীং ইহার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে এদেশের শিল্পোন্নয়নের অগ্রগতির পথে উক্ত সঙ্ঘটির দান অমূল্য। যদিও আশানুরূপ আর্থিক সাহায্য ইহার নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই, তথাপি আনুমানিক ২০·৭৩ কোটি টাকা ঋণদানে ইহা সমর্থ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। এই ঋণের অর্দ্ধেকের কিছু কম অংশ নূতন শিল্পগুলিকে (অর্থাৎ যে সকল শিল্প স্বাধীনতা লাভের পর উৎপাদন আরম্ভ করিয়াছে) দেওয়া হইয়াছে। এ দেশের শিল্পগুলিকে আর্থিক সুবিধাদানের আলোচ্য সঙ্ঘটি যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রাকারের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্প ও কৃষির আর্থিক সংকট নিরাকরণে বহু সংগঠনমূলক কাজ করিতে পারে। এখন ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক ছয়টি রাষ্ট্রীয় অর্থসঙ্ঘ, জাতীয় শিল্পোন্নয়ন সঙ্ঘ এবং শিল্প ঋণ ও অর্থসঙ্ঘ নামে দুইটি বৃহৎ আর্থিক সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ইংরাজী বৎসরের আরম্ভেই তিনটি বৃহৎ শিল্প-অর্থ-সঙ্ঘ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে : (ক) আই, এফ্, সি, আই, (খ) এন, আই, ডি, সি, ও (গ) আই, সি, এণ্ড্ এফ্, সি। প্রথমোক্তটির মালিকানা রাষ্ট্র এবং বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের করায়ত্ত থাকিবে, দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের এবং তৃতীয়টি কেবল বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধিকারে থাকিবে। 'আই, এফ, সি, আই' প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য হইল বর্ত্তমান শিল্পগুলির সম্প্রসারণে ও পুনঃ সংস্কারে মধ্যমাকারে আর্থিক সাহায্য দান করা। সম্প্রতি ইহা ২লক্ষ হইতে ৩লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত এরূপ অল্পপরিমাণে ঋণ দান করিয়া আসিতেছে। একক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণদানের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ হইল ১ কোটি টাকা, কিন্তু সরকার কর্ত্তৃক ঋণদানের সময় ইহা প্রযোজ্য নহে। 'এন, আই, ডি, সি' প্রধানতঃ একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। সরকার কেবল যে ইহার মালিক তাহা নহে, রাষ্ট্র কর্ত্তৃক যে সকল পরিকল্পনা রচিত হইবে তাহার আর্থিক সুরাহা করাও ইহার অন্যতম প্রধান কাজ। এক কোটি টাকা মূলধন লইয়া গঠিত আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনানুসারে সরকারের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিবে এবং যে সকল পরিকল্পনা দেশের অর্থনীতিক দিক দিয়া ইহার বিবেচনায় বিশেষ জরুরী এবং যাহা বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে, কেবল এইরূপ ক্ষেত্রেই ইহা অর্থ সাহায্য অনুমোদন করিবে। তবে ইহা বে-সরকারী শিল্পগুলির সম্প্রসারণে বা নূতন শিল্প স্থাপনায় মূলধন ও অন্যান্য আর্থিক সম্পদ দিয়া সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে ভারত সরকার বে-সরকারী শিল্পগুলির মধ্যে পাট ও বস্ত্র শিল্পের আধুনিক করণের নিমিত্ত আর্থিক সুব্যবস্থাকে সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

'আই, সি, এণ্ড, এফ্, সি' প্রতিষ্ঠানটি কেবল বে-সরকারী শিল্পের অধিকারে থাকিবে। ইহার আদায়াকৃত মূলধন ৫ কোটি টাকা হইবে। এই মূলধনের ৩·৫ কোটি টাকা ভারতীয়গণের দ্বারা মঞ্জুরীকৃত হইবে এবং অবশিষ্ট ১·৫ কোটি টাকার দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১ কোটি টাকা বৃটিশ বিনিয়োগকারীগণ ও এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৫০ লক্ষ টাকা আমেরিকার বিনিয়োগকারীগণ গ্রহণ করিবে। বে-সরকারী ক্ষেত্রে নূতন শিল্প স্থাপন অথবা বর্ত্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণ এবং পুনঃ সংস্কারের জন্য ঋণ দিয়া শিল্পোন্নয়নে উৎসাহদান করা ইহার প্রধান কাজ। যে সকল শিল্প নূতন ঝুঁকি লইয়া দেশকে শিল্পময় করিয়া তুলিবার কাজে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক তাহাদের মূলধনের কিছু 'অংশ' (Share) ইহা গ্রহণ করিবে। তাহা ছাড়া, প্রয়োজন হইলে, শিল্প সম্বন্ধীয় ব্যাপারে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞগণকে বিদেশ হইতে আনিয়া এই সকল শিল্পের উন্নতিবিধানে সহায়তা করিবে। দেশীয় শিল্পের মূলধনের অংশ গ্রহণ করিলেও শিল্প পরিচালনা সম্বন্ধে ইহা আপন কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিতে তৎপর হইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে ইহার উদ্দেশ্য যে মহৎ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু উক্ত সঙ্ঘ সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্পগুলির ক্রিয়া-কলাপ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে আর্থিক সাহায্যের অপচয় হইতেছে না এবং তাহা প্রকৃত লাভজনকরূপে প্রযুক্ত হইতেছে। 'আই, সি, এণ্ড এফ্ সি'র সাফল্য দুইটি জরুরী বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে : (ক) ইহাকে বাণিজ্যিক নীতির উপর ভিত্তি করিয়া চালু রাখিতে হইবে, ইহা যেন আপনাকে কোন রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত না করে ; (খ) ভারত সরকার এমন একটি আর্থিক নীতি অবলম্বন করিবেন যাহা বে-সরকারী ক্ষেত্রে মধ্যম ও বৃহদাকারের শিল্পগুলির প্রসার, উন্নতি ও 'সঞ্চয় গঠনের' (Formation of Savings) সহায়ক হয়।

পূর্ব্ববর্ণিত মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টাকে কতদূর সাফল্যমণ্ডিত করিবে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমরা তাহা দেখিতে পাইব। এখানে একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে কেবল মূলধনের বিনিয়োগের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না। এই বিনিয়োগ যাহাতে 'আদর্শ বিনিয়োগরূপে' পরিণত হয়—যদি দেশের অগণিত বেকার শ্রমশক্তির পূর্ণ নিয়োগের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিয়া দেশে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের এক কল্যাণমূলক ভিত্তি রচনা করিয়া দেয়—তবেই সকল প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা সার্থক হইবে।

১৫

রাত্রির প্রথম যামে—হেরিকেনের অনুজ্জ্বল আলোয় বসে গল্প শুনতে ভালই লাগে। সে গল্প আদর্শ-ঘেঁষা হলে—মনের মধ্যেকার অতি নাটকীয় সত্তাগুলি···তাকে আত্মসাৎ করে নেয়। প্রতিজ্ঞা-পাঠের শক্তিও যেন অর্জ্জিত হয় সেই সঙ্গে।

সকালে উঠে সন্ত একলব্যের গল্পটি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। শুধু একলব্যের গল্প নয়—বাবার মুখে সে অনেক কাহিনী শুনেছে—যাঁর বীর নায়করা সত্যরক্ষার জন্য অনায়াসে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছেন। সেকালে সত্য পালন ছিল—শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। না হলে অমিতবলশালী যুবরাজ পিতৃসত্য পালনার্থে বনে গিয়েছিলেন কেন? কেন দ্যূতক্রীড়ায় পণবদ্ধ পাণ্ডবরা রাজ্য সম্মান খুইয়ে হয়েছিলেন ক্রীতদাস? কর্ণ আর শিবি রাজার উপাখ্যান?

আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রতধারী দেবব্রত? আর এই কালেও সেই সত্যকে কষ্টিপাথরে ফেলে পরীক্ষা করেছেন গান্ধীজী। আফ্রিকার সত্যাগ্রহ থেকে নোয়াখালির পরীক্ষা,—সত্য সন্ধানের এমন দৃষ্টান্ত ভূ-ভারতে আর কই! তিনি বলতে শিখিয়েছেন—অভী। কিসের ভয়? সন্তই বা ভয় করবে কেন অন্যায়কে—অসত্যকে।

মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির করে নিয়ে সন্ত উৎফুল্ল হ'ল। যথানিয়মে পাঠ শেষ করে—স্নান করলে। স্নান করে আহারে বসবে—এমন সময় বাইরে কোলাহল উঠল, দেশের শত্রু—নিপাত যাক।

সন্তর বুক কেঁপে উঠল—কল্পনার চক্ষুতে অগ্নিপরীক্ষার মহত্ত্ব মুহূর্ত্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এই চীৎকারের অর্থ—বাক্যবাণের তীব্রতাও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলে সে।

ভগবতী বললেন, বাইরে বুঝি কিসের মিছিল যাচ্ছে?

সেনদিদি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, মীরা ছাদ থেকে দেখে এল—কতকগুলো বাচ্চা বাচ্চা ছেলে—এইদিক পানে মুখ করে হাত নাড়ছে—আর চেঁচাচ্ছে। এই বাড়ীটা বুঝি দেশের শত্রু?

সন্ত শুকনো মুখে বললে, না জ্যাঠাইমা—ওরা আমাকে বলছে।

তোকে বলছে? কেন—কি অপরাধ তোর? সমস্ত শুনে···ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, আ মলো যা—এখনও গলা টিপলে দুধ বেরোয়—তাদের ভিরকুটি দেখে আর বাঁচি নে। ছোঁড়াগুলোকে নাচালে কোন অলপ্পেয়ে? তার যদি দেখা পাই—

কেষ্ট দোর গোড়ায় এসে বললে,—হ্যাঁরে সন্ত—ওরা চেল্লাচ্ছে কেন রে? ওদের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস বুঝি?

—নারে—শোন আমিই বলি। সেনদিদি খুলে বললেন।

কেষ্ট রেগে উঠে বললে, ওরা কোন্ পাড়ার ছেলে রে? জানে না বুঝি শুঁড়িপাড়ার ছেলেদের? মেরে টেংরি খুলে নেব—তক্তা বানিয়ে ছেড়ে দেব।

সন্ত তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, তুমি একা যেয়ো না কেষ্টদা—ওরা তোমাকে মারবে।

আমাকে মারবে—পাড়ায় এসে।···দেখি তো বাছাধনরা কত ভাত দুধ দিয়ে খেয়েছে! বলে কেষ্ট বারান্দা থেকে লাফ দিলে সিঁড়িতে—তিন চার লাফে সিঁড়ি থেকে গিয়ে পড়লো এক তলায়।

তারপর কোলাহলটা বেড়ে গেল। মেয়েরা তাড়াতাড়ি ছাদে উঠলেন—এ-বাড়ী ও-বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল অনেক লোক। সকলের গলা ছাপিয়ে কেষ্টর গলা তখন

শোনা যাচ্ছে। পাড়ায় এসে রংবাজী। এক একটি থাপ্পড়ে বদন বিগড়ে দেব বাছাধনদের। গেট আউট—গেট আউট—

কেষ্টর দল ভারি দেখে ছেলেরা সরে পড়ল।

বীরদর্পে কেষ্ট ফিরে এল বাড়ীর মধ্যে। বললে—কেমন অল ক্লিয়ার তো? যা পড়তে যা সন্তু।

সন্তু বললে, পাড়ার বাইরেও যদি ওরা—

কেষ্ট বললে, চ—আমি তোকে পৌঁছে দিয়ে আসব—আবার চারটের পর আমার সঙ্গেই আসবি।

বে-পাড়াতে তোমাকেও মারতে পারে ওরা?

মারুক না দেখি! এ্যাইসা ফরমা ঝাড়ব—আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে সব। তুই ভাবিসনে সন্তু—আমারও দল আছে। তারা রীতিমত ডাম্বেল বারবেল করে—আসন শেখায়—আখড়ায় মাটি মাখে—বেশী চালাকি করলে—কেষ্ট অশ্লীল কথায় ওদের গালি দিলে।

কেষ্টকে দেখে কেউ শ্লোগান ঝাড়লে না—কোথায় যে লুকিয়ে রইল—কে জানে। এমনি করে সপ্তাহখানেক কেষ্টর রক্ষণাধীনে নিরাপদে ইস্কুল যাতায়াত চলল।

কেষ্ট বললে, কাল থেকে আর তোর সঙ্গে যাব না, ওরা কিছু বলবে না তোকে—জানে তো কার বন্ধু। আর যদি বলে, শূন্যে একটা ঘুঁষি উঠিয়ে হেসে উঠল।

আরও ক'টা দিন কাটল নিরাপদে।

সেদিন অমরনাথ বললেন—আয় তো আমার সঙ্গে—ময়দির দোকানটা তোকে দেখিয়ে দিই—ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে ডালটা নিয়ে আসবি।

দু'জনে পাড়া ছাড়িয়ে খানিকটা দূর এসেছে—গলির মোড়ে কয়েকটি ছেলে এমনই চেঁচিয়ে উঠল, দেশের শত্রু—নিপাত যাক।

চমকে উঠলেন অমরনাথ, কে রে সন্তু?

ওরা আমাদের ইস্কুলের ছেলে—চুপি চুপি ভীতস্বরে বললে সন্তু।

অমরনাথ তাদের পানে ফিরে বললেন, এই শোন—এদিকে এস তো।

কেউ কাছে এল না—শ্লোগান দিতে দিতে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

অমরনাথ বললেন, ওরা ভারি ভীরু তো।

সঙ্গে সঙ্গে একখানি আধলা ইঁট ওঁর পায়ের গোড়ায় এসে পড়ল।

সন্তু বললে, বাবা—ওরা ইঁট ছুড়ছে।

গলিপথটা জনবিরল—এদিক ওদিক চাইলেন অমরনাথ।

বার বার কয়েকখানি ইঁট এসে পড়ল—সন্তুকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে অমরনাথ হাঁকলেন, তোমরা ইঁট ছুঁড়ছ কেন—? একি।

ধাঁ করে একখানি ইঁট এসে লাগল তাঁর মাথায়—পথের ওপর ঘুরে পড়ে গেলেন তিনি। সন্তু চীৎকার করে কেঁদে উঠল। দু-চারজন লোক এ-বাড়ী ও-বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন।

কে—কে—ব্যাপার কি? ইস—মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে যে।—জল—জল—নিয়ে আয়—

অমরনাথ ততক্ষণে সামলে নিয়ে উঠে বসেছেন।—কোঁচার খুঁট দিয়ে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে বললেন,—কাছে পিঠে কোন ডাক্তারখানা নেই? আমাকে দয়া করে একটু দেখিয়ে দিন না।

আসুন—আসুন। চার পাঁচজন এগিয়ে এল।

আচ্ছা—আপনার কি কারও সঙ্গে শত্রুতা ছিল? না হলে এমন করে—

সন্তু অগোছালো ভাবে ঘটনাটা খুলে বললে।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন—আর বলবেন না মশাই—আজকালকার ছোঁড়াগুলো হয়েছে বদের শিরোমণি। না মানে বাড়ীর কাউকে—না মানে মাস্টারদের। আমরাও সিগ্রেট বিড়ি খেয়েছি—লুকিয়ে লুকিয়ে। বাপের বয়সী কাউকে দেখলে ফেলে দিয়েছি—অনেক বয়াটেগিরি করেছি—কিন্তু কাউকে অসম্ভ্রম করিনি। ধন্যি বাবা স্বাধীনতা!—এর চেহারাই আলাদা!

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বাড়ী ফিরে এলেন অমরনাথ। ভগবতী দেখে কেঁদে উঠলেন।

থাম—থাম, এমন কিছু হয়নি। সামান্য একটু লেগেছে—দু' একদিনেই ঠিক হয়ে যাবে।

ভগবতী অবুঝের মত বললেন, ভাল হয়ে বাড়ী ফিরে চল—এ শহরে আর নয়।

অমরনাথ হেসে বললেন, কোথায় যাবে ফিরে, তোমার সে গ্রাম আর নেই।

না—না—আমাদের সেইখানেই ভাল।

তিনদিন আপিস কামাই হ'ল। আপিসের সহকর্মী মনীশ এল দেখা করতে। বললে, ছোঁড়াগুলোর নামে এক নম্বর ঠুকে দিলেন না কেন—দাদা?

আপিসের খবর কি?

ভাল।…ঘোষ কি বলছিল জানেন? বলে, বাঁড়ুজ্জের মর‍্যালিটির পরীক্ষা হবে এবার। সত্যিকারের অসুখ হয়েছে বলে ও বিশ্বাস করে না।

নাই বা করলো বিশ্বাস। অমরনাথ হাসলেন।

না দাদা—বোঝেন না। নিজে…এর ওর কাছ থেকে ঘুষ নেবে—আবার গলা ফাটিয়ে গাল দেবে অপরকে যে ঘুষ নেয় না।

ওরা-যে কাপুরুষ—তাই অমন করে। অমরনাথ হাসলেন।

না দাদা—ওরা ভাবে—ঘুষ নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। যারা নেয় না—তারা নির্বোধ। দৃষ্টান্ত দেখায় বড় বড় রথীদের। যারা ঘুষের টাকায় দশ বারো তলা বাড়ী তুলে ফেললে সহরে—ব্যাঙ্কে জমালে লক্ষ লক্ষ টাকা। আবার বলে—একটা পান—একটা সিগারেট—এক এক ঠোঙা খাবার—একি ঘুষ নাকি।

'বলুক—ওসব কথা নিয়ে আলোচনা ভাল নয়। কি জান, আমাদের ভারতবর্ষের বড় মানুষদের আদর্শ আলাদা—তাঁদের কথা রামায়ণ মহাভারতে অনেক আছে। ধনের সম্মান সে কালে ছিল—তার ওপরে ছিল বিদ্যার সম্মান। আবার সব বিদ্যার ওপরে ছিল পরা-বিদ্যার সম্মান।

কিন্তু একালের ভারতবর্ষ—

অসত্যের ওপর কখনো সম্মানের প্রতিষ্ঠা হয় না। এ কালের পৃথিবী যাই হোক,—সত্যকে কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। আচ্ছা—সুখ কি?…বাইরে না মনে?

ওসব বড় বড় কথা আমরা বুঝতে পারি না দাদা। দু'-চোখে যা দেখি—তাই বা অস্বীকার করি কেমন করে। টাকা থাকলে যে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়—সেটা তো স্বীকার করতেই হবে।

ভাল কথা।—কিন্তু যেন তেন উপায়ে টাকা রোজগার করাটাই তা বলে জীবনের কাম্য নয়। জীবন চায় এমন এক সুন্দর—জিনিস—

—মনীশ অদ্ভুত চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল অমরনাথের দিকে।—তারপর বললে, এইবার উঠি—আর এক কাপ খাওয়াতে পারেন—বউদি?…হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায় বললে, ওহো—আজ যে আরও এক জায়গায় যেতে হবে—চলি। বলে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হল।

ভগবতী বললে—ঠাকুরপো হঠাৎ অমন করে চলে গেলেন কেন?

…আমিই বুঝি তাড়ালাম ওকে।—মৃদু হাসি ফুটল—অমরনাথের মুখে।

তুমি।

কি…জানি—তাই মনে হচ্ছে। ভাল কথা—তত্ত্ব কথা—ওসব আলোচনা আরম্ভ হলেই—সাধারণ মানুষ কেমন দিশেহারা হয়ে যায়।—এমন তো ছিল না—আমাদের ছেলেবেলায়।—আমি এক এক সময়ে ভাবি—আমাদের বাইরের অভাব বেড়েছে বলেই মনের এই দৈন্য—না—মনের অভাবেই বাইরেটা এমন—খাটো—হয়ে এল!

আচ্ছা বলত ভগবতী—টাকাটাই পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বস্তু?

ভগবতী বললেন—টাকায় তো অনেক কিছু হয়।

অনেক কিছু হয়—একটি বস্তু ছাড়া।…মনের মধ্যে যাও—ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা কর—তাহলে বুঝতে পারবে—টাকায় সে ব্রহ্মাণ্ড কেনা যায় না। শোন—অনেকদিন আগে—তোমারই মত এক ব্রাহ্মণ-পত্নী বলেছিলেন।

যেনাহং নামৃতাস্যাম, কিমহং তেন কুর্য্যাম?

কেন বলেছিলেন জান?—ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিল।—তিনি বানপ্রস্থ নেবার আগে তার সম্পত্তি সমান ভাগে…দুই পত্নীর মধ্যে ভাগ করে দিয়ে বললেন, এর দ্বারা তোমাদের অভীষ্ট লাভ হবে।

পত্নী মৈত্রেয়ী বললেন—কি অভীষ্ট লাভ হবে? এই সম্পদের দ্বারা আমি কি ভগবানকে লাভ করব?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, পার্থিব অভীষ্ট লাভ হবে। অশন-বসন…দেহ ধারণে কোন ক্লেশ থাকবে না—এই সম্পত্তি থাকলে।

তার উত্তরে মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, যার দ্বারা পরমার্থ লাভ

করা যায় না—তেমন সম্পদে আমার প্রয়োজন কি।—আপনি আমাকে এমন সম্পদ দিন যাতে করে সেই পরমপুরুষকে জানতে পারি—তাঁকে লাভ করতে পারি।··· ব্রহ্মজ্ঞান লাভই ছিল সে কালের সবচেয়ে—শ্রেষ্ঠ সম্পদ—।

একটু থেমে বললেন, হয়তো বলবে—সেকালে জীবন-ধারণ সমস্যা এমন জটিল ছিল না—ক্ষত্রিয়শক্তি বাহুবলে করত রাজ্য রক্ষা—আর প্রজা সংরক্ষণ, নিজ নিজ বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে মানুষ ছিল নিশ্চিন্ত।

ভগবতী তাকের ওপর থেকে মহাভারতখানা পেড়ে এনে বললেন, একটু পড় না—শুনি।

অমরনাথ বললেন, বুঝেছি—মনীশের হাওয়া গায়ে লেগেছে তোমার!

একটি কথা বলব—যদি রাখ। ভগবতীর কণ্ঠে অনুনয়।

অমরনাথ বললেন, ব্যাপার কি!—এমন কি জিনিস চাই তোমার—

আমি চাই না।···আর একটু কাছে ঘেঁযে চাপা গলায় বললেন ভগবতী; সহরের বাস যখন ছাড়তেই পারবে না—তখন মেয়েটীর যাতে গতি হয় তেমন ব্যবস্থা করতে হবে তো?

হ্যাঁ—যথাসময়ে সুপাত্র সন্ধান করে দেওয়া—

শুধু সন্ধান করলেই কি আজকাল ছেলে পাওয়া যায়—ছেলেরা যাতে মেয়ে পছন্দ করে তেমন গুণও তো থাকা দরকার মেয়ের মধ্যে।

তাই নাকি! তা কি এমন গুণ থাকা দরকার যা আমাদের মেয়ের নাই।

আমি বলছি না—সেন দিদিই বলেন—মেয়েকে লেখা-পড়া গান-বাজনা শেখানো—পাঁচ জায়গায় মেলামেশা করা—

অমরনাথ—গম্ভীর স্বরে বললেন, তুমি কি মনে কর? ওই সব গুণ—না থাকলে মেয়ের পাত্র জুটবে না?

জুটবে না কেন—তবে আমরা যেমনটি চাই—তেমনটি হয়তো পাব না।—

···অমরনাথ বললেন, তোমরা, মেয়েরাই তো বল—জন্ম মৃত্যু বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে। ঐ সব গুণ অর্জ্জন করেও—যেমনটি আশা করা যায়—তেমনটি কি পাওয়া যায়?···আমি ওর গান শেখায় মত দিইনি—তোমার মনে হয়তো কষ্ট হয়েছে—

সত্যি বলছি।—আমার মনে একটুও দুঃখু হয়নি। আমার ওসব ভালই লাগে না।

তাহলে মেয়ের মনে দুঃখু হয়েছে?

মিথ্যে বলব না—হাজার হোক কম বয়েস—পাঁচজনের যা দেখবে—ঝোঁক তো সেইদিকেই হবে—

হুঁ।···মনে হল একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপলেন অমরনাথ। ভুল কোথা থেকে আরম্ভ হয়েছে—কে দেবে তার উত্তর! এদের গ্রামের পরিবেশ থেকে টেনে এনেছেন শহরে—এখন শহরের পরিবেশ থেকে বাঁচাবেন কোন্ উপায়ে? শিক্ষার ধারা আজ আমূল বদলে গেছে। বহির্মুখী মনের গতি নদীস্রোতের মতই নিম্নমুখী—তাকে পাষাণ অবরোধ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা বৃথা।

আজ এক জায়গায় গান বাজনা হবে—কমলাকে ওরা নিয়ে যেতে চায়।—কি বলব?

বেশ ত—যাক।

তোমার অমত নেই তো?

একাল···সেকালের মতামতকে গ্রাহ্য করবে কেন! তবে···বঙ্কিমবাবু এক জায়গায় বলেছেন—পতঙ্গ বহ্নিমুখ বিবিক্ষু হলে—কে তার গতিরোধ করবে!

তাহলে বারণ করে দিই গে।

না—যাঁরা সঙ্গে যাবেন—তাঁদের অসম্মান হবে। আজ থাক—পরে বুঝিয়ে বলো—আমাদের মত ঘরে এসব শোভা পায় না।

অনেক রাত্রিতে কমলা ফিরে এসে বললে, মা—কি চমৎকার গান—আর বাজনা। তুমি যদি যেতে তো ভারি ভাল লাগত।

আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত কমলাকে নূতন বলে মনে হচ্ছিল। মেয়ের পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ভগবতী বললেন, সবার মাঝখানে বসে গাইতে লজ্জা করল না মেয়েদের?

লজ্জা করবে কেন—সবাই কত সুখ্যাতি করলেন।—ফুলের মালা—মেডেল—বই—এক একজন যা উপহার পেয়েছে!—ওদের মনে খুব আনন্দ হয়েছে, না মা?

ভগবতী মেয়ের দু' চোখের দৃষ্টিতে নূতন আলোর সন্ধান পেলেন—কণ্ঠে শুনলেন নূতন সুর।···জন-প্রশংসা লাভের উদ্দীপনায় কমলার চিত্তও বুঝি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গলার

স্বর নামিয়ে বললেন, আনন্দ তো হবেই। যাক এখন ওসব গল্প। উনি এইমাত্র ঘুমিয়েছেন—আস্তে আস্তে কাপড় জামা ছেড়ে—হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।

আর খাবনা মা—একটা ভাল দোকানে ঢুকে যা খাইয়ে দিয়েছেন—মাষ্টার মশাই। তাইত এত দেরী হ'ল।

আচ্ছা—শুয়ে পড়।

১৬

এর জের এইদিনেই মিটল না। পরের শুক্রবার দুপুর বেলা ইরা এসে ডাকলে—কমলা—শোন তো রে?

ভগবতী বেরিয়ে এলেন—ঘর থেকে। বললেন, কমলা টুন্টুকে ঘুম পাড়াচ্ছে।···দুষ্টু ছেলে—সারাদিন কিছু খায়নি —খালি বায়না করেছে—। এই মাত্তর তাকে গল্প শুনিয়ে —ভুলিয়ে ভালিয়ে—খাওয়ালে।

ও—তা ঘুম পাড়ানো হলে একবার পাঠিয়ে দেবেন তো? আর দেখুন কাকীমা—কাল একটা শো হবে—একজনের বাড়ীতে। এমনি দেখাবে—টিকিট ফিকিটের হাঙ্গামা নেই। মাষ্টার মশায় বলে দিলেন—কমলা যেন আমাদের সঙ্গে যায়।

ভগবতী বললেন, বেশ তো—তোমরাই যাওনা, ও আর নাইবা গেল।

মাষ্টার মশাই বলেছিলেন, তাই বলতে এলুম। ও তো আর কচি খুকী নয়—যে চ্যাংদোলা করে ধরে নিয়ে যাব আমরা।···ইরা—উষ্মাভরে কথা বলে পিছন ফিরল।

ভগবতী তাড়াতাড়ি বললেন, তা রাগ করিস কেন মা—

ইরা পিছন ফিরে বললে, রাগের কথা নয়—আপনাদের পুরণো মনগুলি ভারি সঙ্কীর্ণ। মারও দেখেছি—পুরুতগিন্নি রমার মা—কেষ্টর মা—কার না দেখছি। সবাই ভাবেন—বাইরে বেরুলে, সিনেমা দেখলে—কি গান শিখলে, কি অজানা পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা কইলে বুঝি আমরা খারাপ হয়ে যাব।

ভগবতী স্তম্ভিত হয়ে ইরার অনুযোগ শুনলেন। না শুনে উপায় কি! ওরা আজকালের শিক্ষিতা মেয়ে—শহরে থাকে—অনেক দেখেছে শুনেছে—অনেক পড়েছে; ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথা কইবেন সে ক্ষমতা তাঁর কোথায়।

ঘরে এসে দেখলেন—খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে কমলা যেন এই দিকেই আসছে। ওঁকে দেখে সে বললে, ইরাদি কি বলছিল মা?

কোথায় গান হবে—তাই শুনতে যাবার জন্য বলতে এসেছিল তোকে। মেয়ের কাছে কথাটা গোপন করতে পারলেন না তিনি। মিথ্যা বলতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে আজও।

কমলা বললে, কবে—মা?

কাল।

যেতে দেবে তো মা? আব্দারের ভঙ্গি ওর স্বরে।

ভগবতী সরাসরি 'না' বলতে বেদনা পেলেন। বললেন, দেখি—উনি কি বলেন।

কমলা কোন কথা বললে না—ওর উৎসাহদীপ্ত মুখখানির আলো কেমন ম্লান বোধ হ'ল।

দুঃখ হল ভগবতীর। কেন ভগবান তাঁর সংসারে এমন অভাব দিয়েছেন? কেন ছেলে মেয়েদের সামান্য সাধ পূরণ করবার সাধ্য তাঁর নাই? এই দারুণ শীতে পুরনো ছেঁড়া আলোয়ান গায়ে দিয়ে সমস্ত শীত কাটাচ্ছে। একটা ভাল গেঞ্জি, তাই কি দিতে পেরেছেন ছেলেদের? ওখানে কেউ কোন দিন বলেনি ভাল জামার জন্য। রোদ না-ওঠা পর্য্যন্ত একই কাঁথার মধ্যে ঠাসাঠাসি শুয়ে শীত কাটিয়েছে—রোদ উঠলে—একটা সামান্য সুতির জামা গায়ে দিয়ে—একখানা আলোয়ান একসঙ্গে গায়ে জড়িয়ে ক' ভাই-বোনে গিয়ে বসেছে দাওয়ায়। প্রথম সূর্য্য উঠলে—ওই পূবমুখী দাওয়া রোদে ভরে যায়। এখানে ফাঁকা দাওয়া নেই—রোদ নেই। ছাদটাও চার পাশের উঁচু তিনতালা-চারতলা বাড়ীর আড়ালে পড়ে রোদ অভাবে কাঁপতে থাকে—সে মানুষকে আশ্বাস দেবে কি? অন্য ছেলেরা সোয়েটার পরে আলোয়ান গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়—এরাও খুঁত খুঁত করে। ছেলেদের মন—কতকাল আর দুঃখ দারিদ্র্যের দোহাই দিয়ে—সামলে রাখা যায়!

প্রাচুর্য্য সামনে বলেই অভাব যেন তীব্র হয়ে ওঠে। মনে হয়—কেন এমন করলেন ভগবান? একজনকে দিচ্ছেন—আর একজনকে কেন বঞ্চিত করছেন? তাঁর এই লীলা বোঝা ভার।

অমরনাথ সমস্ত গম্ভীরভাবে শুনে বললেন,···বুঝেছ

তো—এর শেষ হবার নয়। এইবার যাও—এর পর বলো না—এ প্রত্যেকবারই শোনাতে হবে।

ভগবতী বললেন, বাছাদের না পারি ভাল খাওয়াতে, না দিতে পারি পরণের কাপড় জামা। কত সাধ আহ্লাদ করে ছেলেমেয়েরা। 'না' বলতে তাই বাধে।

অমরনাথ বললেন—কষ্ট কিসে বেশী—সে ঠিক করা ভারি কঠিন। আমাদের মনের কতকগুলি নরম বৃত্তি নিয়ে আমাদের সুখদুঃখের পাল্লাটিকে ভারি করি। আমরা তাকাই ওপর দিকে—সুখের কাঙালপনা তাই ঘোচেনা, কিন্তু নীচের দুঃখ যদি বুঝতে পারি—তাহলে অর্দ্ধেক দুঃখ আমাদের কমে যায়। ভারতবর্ষের যা আদর্শ—সে কবে হারিয়ে ফেলেছি আমরা।

ভগবতী এসব কথা ভাল বোঝেন না—চুপ করে শোনেন।

সেদিন কমলা সকাল-সকাল ফিরে এল। কি চমৎকার নাচলে ছোট মেয়েরা—এমন সেজেছে—যেন দেবকন্যা।

সাড়া পেয়ে সেন-দিদি দরজায় এসে ডাকলেন, কমলা তুই ফিরে এলি—মীরা ইরারা ফিরল না?

কমলা দুয়ারের কাছে এসে বললে, ওরা বললে ফিরতে রাত হবে। বড়দের গান আর নাচ হবে এর পরে। —ইরাদি—মাস্টার মশায়কে বললেন—বেশী রাত হলে ওর মা ভাববে—ছেলেমানুষ তো, তাই কেষ্টদার সঙ্গে মাস্টার মশায় আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

কেষ্টা কোথায় গেল?

সেতো আমাকে দোরগোড়ায় পৌছে দিয়েই দে-ছুট্। ওর যে অনেক কাজ। পরদা ফেলা তোলা—আলো জ্বালা কমানো—ওই সব করে কিনা।

হুঁ—অরগুণ নেই বরগুণ আছে! তা শো ভাঙ্গবে কখন শুনে এলি?

রাত একটা দু'টা হবে তো শুনলাম।

নাও—এখন সামলাও ঠেলা।...মুখ ভঙ্গী করে সেন-দিদি পিছন ফিরলেন।

কমলা ডেকে বললে, আর জেঠিমা ওরা—বললে ফিরতে অনেক রাত হবে—খাবার টাবার যেন না রাখেন মা।

হুঁ—রেশনের মাপা চাল আটা—নষ্ট হলে ওদের আর কি। ওঁদের হুকুমের অপেক্ষায় রাত ন'টা অবধি রান্না না করে বসে আছি কিনা।—গজ গজ করতে করতে সেনদিদি চলে গেলেন।

অমরনাথ বললেন, শুনলে?

ভগবতী বললেন, দিদি কেন বারণ করেন না মেয়েদের।

তুমি কেন বারণ করনি কমলাকে?

ভগবতী চুপ করে রইলেন।

কমলা বাপ মায়ের কথোপকথন শুনলে।—নির্ব্বোধ মেয়ে নয়—সবটা না বুঝলেও—কোথায় ওর মধ্যে যেন ত্রুটী রয়েছে মনে হল। তা ছাড়া আজকের গানের মজলিসে কয়েকটি ছেলের ব্যবহার ওর ভাল লাগেনি।...তাই তাড়াতাড়ি ও চলে এসেছে। সেবার ইরামীরারা ওর পাশে বসেছিল—কেউ অশিষ্ট ব্যবহার করার সুযোগ পায় নি। আজ কমলাকে একটী চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ওরা চলে গেল ভিতরে—কতক্ষণ যে রইল সেখানে।—ইতিমধ্যে তার দু'পাশে কয়েকটি ছেলে এসে বসেছে।—তারা এত বাজে বকছে—আর হাসছে—একবার কটা ফুল যেন এসে পড়ল ওর কোলে।

ফুলটা ওর কোল থেকে মাটিতে পড়তেই ডানপাশের ছেলেটি হেঁট হয়ে সেটি তুলে ধরলে ওর সামনে, আপনার এই ফুলটি পড়ে গেল।

কি করা উচিত ভেবে পেলে না কমলা। ফুলটা যে তার নয়, একথা জানাতেও এমন লজ্জা বোধ হচ্ছে!

ছেলেটি বললে, তাহলে এ ফুলটি আমি নিলুম। আপনাকে নতুন একটা এনে দিই—কেমন?

আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল কমলা।—

সত্যিই উঠে গেল ছেলেটি এবং খানিক পরে সুন্দর একটি ফুলের তোড়া এনে বললে, দেখুন তো—পছন্দ হয়?

চমৎকার তোড়াটি।...চার দিকে আট দশটি মরসুমি ফুলের মাঝখানে সুন্দর একটি রক্তবর্ণের গোলাপ। কমলার চোখে নীরব প্রশংসার আলোয় ছেলেটি উৎসাহিত হয়ে বললে, নিন—এটি আপনার জন্যই আনলুম।

পাশের একটি ছেলে টিপ্পনি কাট্লে, বরাত দাদা—বরাত। . বসবা. . . .নে

কমলা স্ব-ইচ্ছায় হাত বাড়া। ফ্লোরেন্সে তখন গানবাজনার খুব এসব ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছাটা.

ওর হাতের মধ্যে এসেই গেল—গোলাপের মৃদু মিষ্ট গন্ধ মনটিকে আবিষ্ট করে তুললে। কানে গেল ছেলেটির অত্যন্ত মৃদু স্বর, আপনি তো ইরাদির সঙ্গে এসেছেন? আপনার নামটি—

এমন সময় ঘণ্টা বেজে যবনিকা উঠল—মঞ্চের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল—এদিকের আলো এল স্তিমিত হয়ে। অনেকগুলি মেয়েকে দেখা গেল অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে উজ্জ্বল আলোর মত শোভা পাচ্ছে। আরম্ভ হ'ল নাচ—গান। কমলা পাশের অস্বস্তিকর আবহাওয়া ভুলে তন্ময় হয়ে অভিনয় দেখতে লাগল।

যবনিকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইরা মীরা দুজনেই এল।

কিরে—কেমন লাগছে?

সুন্দর।

বাঃ—তোর হাতে চমৎকার তোড়াটি তো! কে দিলে?

পাশে চেয়ে দেখে ছেলেটি কখন উঠে গেছে। আশ্চর্য্য, ইরাদির না চেনা ছেলেটি?

সব শুনে ইরা মুচকি হেসে বললে, আচ্ছা—আজ তুই বাড়ী যা—আমাদের ফিরতে রাত হবে। মাকে বলিস··· হাঁ—এই তোড়াটি আমি নিলুম—তোর মনে কষ্ট হবে না তো?

মোটেই না।···শুধু শুধু তোড়া দিলে—ভালই লাগছিল না ইরাদি।

···শুধু শুধু নয়। ইরা ফিক্ করে হাসলে। যাই হোক—এর পর কেউ কিছু দিতে এলে বলবি—ইরাদিকে বলুন, কেমন?

মীরা বললো, আহা ইরাদি যেন ওর গার্জ্জেন!

এ কথায় দুজনেই খুব হাসলে।

সত্যি বলতে কি ওদের হাসিও ভাল লাগেনি কমলার। বয়ঃসন্ধিকালে পৌছে···মেয়েরা যে অজানা রহস্যের রাজ্যে —কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে—তার সামান্য কিছু চোখে পড়লেই পুলকে আতঙ্কে আবিষ্ট হয়ে ওঠে—মীরা ইরার হাসিটি যেন সেই···অজানা বস্তু আবিষ্কারের কৌতুকে ভরা।

তা তোমরা হাসছ কেন?

কেন হাসছি। দু'জনে আরো হেসে উঠল। ফুল ফোটার সময় না হলেও যার ভাগ্যে ফুটন্ত ফুল জোটে—তাকে নিয়ে লোকে হাসে—না কাঁদে রে? আরে—চোখদুটো তোর ছল ছল করে উঠল যে। ঠাট্টাও সইতে পারিস নে? দূর।

সমস্ত পরিবেশটাই অস্বস্তিকর ঠেকেছে—না হলে কমলাই কি গানের আসর ছেড়ে আসত! মীরা ইরারা··· এদিকের আলো নিবলে আবার ভিতরে চলে যাবে—ফিরে আসবে সেই ছেলেটি। বলবে, একি—ফুলের তোড়া কোথায় গেল? তখন তো নামই জানায় নি—এখন যদি—

কমলা তাই তাড়াতাড়ি চলে এসেছে এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে—আর কোনদিন মীরা ইরার সঙ্গে গান শুনতে যাবে না। মা বাবাও তাকে কত অবাধ্য মনে করেছেন? ছি!

কি রে—তোর কাপড় ছাড়া হ'ল? খাবি তো?

খাব। কমলাকে নিয়ে ভগবতী খেতে বসলেন। বললেন—চুপ করে খেয়ে যাচ্ছিস যে? সেদিন তো কত গল্প করলি হ্যান্ হলো—ত্যান্ হলো—

বললাম তো—ছোট ছোট মেয়েরা নাচলে—গাইলে—চমৎকার।

মেয়ের নিরুৎসাহ ভাব লক্ষ্য করে মা আর ও সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করলেন না।

খানিক পরে বললেন, দেখ, একটী কথা বলে রাখি তোকে। এই যখন তখন নাচ গান দেখা—উনি পছন্দ করেন না।

কমলা বললে, আর কোনদিন ওদের সঙ্গে যাব না মা।

ভগবতীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খুসির স্বরে বললেন, তোর মনে কষ্ট হবে না?

না।···জবাব দিয়ে কমলা আসন ছেড়ে উঠল।

ভগবতী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আপনমনে বললেন, বাঁচলুম। (ক্রমশঃ)

প্রতিভা-পরিচিতি

কারুশিল্পী চেল্লিনি

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সোনা, রূপা, তামা আর ব্রোঞ্জ, ইতালীয় কারুশিল্পী বেন্‌ভেনুটো চেল্লিনির হাতের যাদুস্পর্শে এমন অপূর্ব্ব রূপলাভ করত, পৃথিবীতে যার তুলনা আজো নেই। সামান্য স্বর্ণকার তাঁর অসামান্য ধীশক্তির সাহায্যে পৃথিবীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের মধ্যে আসন গ্রহণ করেছেন।

ইতালীর ফ্লোরেন্স সহরের শিল্পসংরক্ষণশালায় রক্ষিত বেনভেনুটো চেল্লিনির মর্ম্মরমূর্ত্তি

ইতালীর এই অদ্ভুতকর্ম্মা কারুশিল্পীর জীবন যেন এক চমকপ্রদ নাটক। দুঃসাহসিকতা, দাঙ্গাবাজী আর বেপরোয়া জীবনযাত্রায় চেল্লিনি ছিলেন, যাকে বলে, একের নম্বরের ওস্তাদ। আর-একদিকে ছিলেন তেমনি শিল্পগতপ্রাণ কাজের মানুষ! তাঁর চরিত্রের এই পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর সমগ্র জীবনকে প্রতিনিয়ত বিচিত্র রূপে উদ্‌ঘাটিত করেছে।

ছেলেবেলায় চমৎকার বাঁশী বাজাতে পারতেন। পিতা জিওভ্যানি চেল্লিনির বিশেষ আশা ছিল, পুত্র তাঁর সঙ্গীতজ্ঞ রূপে নাম করবে। সেজন্যে তিনি তাঁকে আদর আর উৎসাহ দিতেন প্রচুর। কিন্তু পুত্র বললেন, বাঁশের বাঁশীর চেয়ে সোনা রূপার পাতের দিকে তাঁর বেশী ঝোঁক। ছোট ছোট বাটালি, হাতুড়ি আর নরুণ নিয়ে একটি রূপার

পোপ ক্লেমেণ্টকে চেল্লিনি তাঁর একটি শিল্পকাজ উপহার দিচ্ছেন। বৃদ্ধ পোপ চোখে পরকলা লাগিয়ে সাগ্রহে জিনিসটি দেখছেন

তালকে পিটে সরু করে নিজের ইচ্ছামত তাকে নিয়ে যখন নিজের কল্পনাকে রূপ দেন—তখন তিনি যে আনন্দ বোধ করেন, বাঁশীর সুর সে আনন্দ মনে আনে না। অতএব বেনভেনুটো চেল্লিনি হবেন স্বর্ণকার, কারুশিল্পী।

পিতা জিওভ্যানি প্রথম জীবনে ছিলেন স্থাপত্যশিল্পী। ভয়ঙ্কর পারিবারিক কলহের পর নিজের বিষয় ভাগ ক'রে নিয়ে দেশ থেকে স্ত্রীপুত্র সঙ্গে ক'রে তিনি ফ্লোরেন্সে এসে বসবাস শুরু করেন। সেখানে ১৫০০ সালে বেন্‌ভেনুটোর জন্ম। ফ্লোরেন্সে তখন গানবাজনার খুব

কদর। জিওভ্যানি নিজে ছিলেন গান-পাগল। তাই তাঁর সাধ ছিল তাঁর বড় ছেলে গানবাজনা শিখবে। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হল না। বাঁশী বাজানো ছেড়ে বেন্‌ভেন্যুটো স্বর্ণকারের শিল্পশালায় শিক্ষানবীশ রূপে ঢুকলেন।

* * *

চেল্লিনি-বংশের অনেকেরই ছিল মাথা গরম। কথায় কথায় দাঙ্গা বাধাতে আর ডুয়েল লড়তে তাদের জুড়ি ছিল না বললেই হয়। বেন্‌ভেনুটো আর তাঁর ছোট ভাই কেশিনোর মধ্যেও ছিল সেই দুর্দ্দম প্রবৃত্তি। ছোট ভাইটি ছিল এককাঠি সরেস। চৌদ্দ বছর বয়সেই সে বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন পালোয়ানের সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে ডুয়েল লড়েছিল। পালোয়ান যখন প্রায় কাৎ হয়েছে তখন তার দলের লোকরা কেশিনোকে

চেল্লিনির এক পৃষ্ঠপোষক কোসিমো দা মেদিচির ব্রোঞ্জনির্ম্মিত আবক্ষমূর্ত্তি। চেল্লিনির বিস্ময়কর শিল্পপ্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে এই শিল্পকাজটিকে গণ্য করা হয়

লক্ষ্য ক'রে পাথর ছুঁড়তে লাগল। বেন্‌ভেনুটো কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। ভাইএর অবস্থা দেখে তিনিও তলোয়ার নিয়ে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন! জখম করলেন দু'তিনজনকে। তারপর কতোয়াল এসে সবাইকে তাড়া করলে এবং দু'ভাইকে ধ'রে কতোয়ালিতে চালান দিলে।

বিচারে দুইভাইকে ছ'মাসের জন্যে ফ্লোরেন্স থেকে বহিষ্কারের আদেশ হল। ছ'মাস পরে কেশিনো বাড়ী ফিরলো। কিন্তু বেন্‌ভেনুটো গৃহে না ফিরে পিসায় গিয়ে এক বড় স্বর্ণকারের কাছে কাজ নিলেন।

কাজ দেখে মনিব তো অবাক! সামান্য তামা বা ব্রোঞ্জের উপর যে এমন অপূর্ব্ব কারুশিল্প খোদিত হোতে পারে তা ইতিপূর্ব্বে কোন শিল্পীই বোধ করি কল্পনাও করতে পারে নি। বেন্‌ভেনুটোর নাম দেখতে দেখতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বড় বড় ভূম্যধিকারীরা তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে নানা জিনিসের অর্ডার দিতে লাগলেন। অতি অল্প বয়সেই অনেক টাকা রোজগার করতে লাগলেন তিনি।

প্রবাসে সুখের দিনে বাপ মা ভায়েদের কথা তিনি বিস্মৃত হন নি। যা রোজগার করতেন তার বেশীর ভাগই নিয়মিত পিতার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। পিতামাতার প্রতি ভক্তি এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন তা তাঁর সমগ্র জীবনকে একটি বিশেষ মহিমা দান করেছে।

কিন্তু সুসময় বেশী দিন স্থায়ী হল না। ঈর্ষ্যাকাতর সহকর্মীরা পিছনে লাগল। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তুচ্ছ কারণে তারা নিত্য বেন্‌ভেনুটোর সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে লাগল। অনেক দিন চুপ করে সহ্য করবার পর

শিল্পীর শেষ জীবনের প্রতিকৃতি

একদিন ফেটে পড়লেন তিনি। একজন প্রতিপক্ষকে ধরে দিলেন বেদম প্রহার। লোকটা নালিশ রুজু করলে। ফলে বেন্‌ভেনুটো পিসা থেকে নির্ব্বাসিত হলেন।

চলে গেলেন রোমে। সঙ্গে নিয়ে গেলেন নিজের তৈরী অনেকগুলি কারুকার্য্যখচিত রূপার জিনিষ। তার মধ্যে যে রৌপ্য-নির্ম্মিত আধার এবং বাতিদান ছিল তাদের তুল্য কারুশিল্পের কাজ পাশ্চাত্য জগতে আর কোথাও কখনো দেখা যায়নি। পোপ ৭ম ক্লেমেন্ট সেগুলি দেখে মুগ্ধ হলেন। সেগুলি উপহার পেয়ে আরও খুসী হলেন এবং বেন্‌ভেনুটোকে তাঁর কাছে রেখে তাঁকে বহু রাজন্যবর্গের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

* * *

অল্পকালের মধ্যেই বেন্‌ভেনুটো রোমে তাঁর শিল্পশালা প্রতিষ্ঠিত করে

অভিজাত-সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হলেন। বেনভেনুটো চেল্লিনির নাম রোমের কোন ধনী ও বিলাসীর ঘরে অপরিচিত রইল না। কিন্তু আবার ভাগ্য হল বিরূপ। এবার নিজের দোষে নয়। অন্তর্বিপ্লবে রোম আলোড়িত হল। বুরবন-রাজ্যপালের সঙ্গে পোপের বৈরিতা ছিল অনেক দিনের। সুযোগ বুঝে বুরবন রোম আক্রমণ করল।

অন্যান্য অনেকের মতো বেনভেনুটো পোপের পক্ষে যুদ্ধের খাতায় নাম লেখালেন এবং শুধু তাই নয়, এক সৈন্যদলের পুরোভাগে নগর-রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। সে-যুদ্ধে তিনি যে অসমসাহসিকতা আর বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সে-কথাও তাঁর দেশের ইতিহাস-লেখক স্বীকার করে গেছেন।

যুদ্ধের পর তিনি পুরস্কার স্বরূপ দেশে ফেরবার অনুমতি পেলেন। কিন্তু দেশে ফিরে তাঁর মতিগতি আর দুর্মদ স্বভাবের পরিবর্তন হল না। বরং তাঁকে নিয়ে নিত্য নূতন হাঙ্গামার সৃষ্টি হতে লাগল। ১৫২৯ সালে তিনি এবং তাঁর ভাই কশিনো একটা ভয়ংকর দাঙ্গায় জড়িত হলেন। সেই দাঙ্গায় কশিনো এক গুপ্তশত্রু কর্তৃক নিহত হন এবং বেনভেনুটো সেই শত্রুকে খুঁজে বার ক'রে তাকে বধ ক'রে ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

এই ঘটনার পর আর দেশে থাকা চলল না। ১৫৩৭ সালে তিনি ফ্রান্স অভিমুখে পাড়ি দিলেন। সঙ্গে ছিল একাধিক পরিচয়-পত্র এবং তাঁর শিল্পকাজের কয়েকটি অতুলনীয় নমুনা। ১ম ফ্রানসিস তখন ফরাসী দেশের রাজা। তাঁর কাছে খবর পৌঁছোলো ইতালীর সর্বশ্রেষ্ঠ এক কারুশিল্পী রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী। রাজা ফ্রান্সিস্ শিল্পের কদর জানতেন। সমাদরের সঙ্গে বেনভেনুটোকে গ্রহণ করলেন। তাঁর কাজের সুবিধার জন্য সকল ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। রাজপ্রাসাদেরই এক অংশে নির্দিষ্ট করে দিলেন তাঁর আস্তানা। কয়েক বছর বেনভেনুটো ফরাসী দেশে পরম সুখে এবং প্রচুর অর্থাগমের মধ্যে দিনযাপন ক'রে রোমে প্রত্যাবর্তন ক'রে একটি বড় শিল্পশালা খুললেন। বহু কারিগর তাঁর অধীনে নিযুক্ত হোয়ে তাঁর নির্দেশমতো হরেক রকমের বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত ধাতুর জিনিষ তৈরী করতে লাগল।

* * *

দিন কাটছে ভালই। হঠাৎ একদিন এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটল। চারজন সৈন্য নিয়ে এক কতোয়াল তাঁর শিল্পশালায় ঢুকে পোপের পরোয়ানা দেখিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল! বেনভেনুটো বিহ্বল হোয়ে গেলেন। কি জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল তা তাঁর বোধগম্য হল না। ইদানিং তিনি তো কোন দাঙ্গাহাঙ্গামায় জড়িত ছিলেন না!

ফরাসী সম্রাট ফ্রানসিসের পৃষ্ঠপোষকতায় প্যারিসে চেল্লিনি যে শিল্পশালা খোলেন সেখানে স্বয়ং সম্রাট প্রায়ই শুভাগমন ক'রে শিল্পীকে উৎসাহিত করতেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে চেল্লিনি তাঁর একটি সদ্য-নির্মিত রৌপ্যাধার সম্রাটকে অর্পণ করছেন

সান্ত্ এঞ্জেলো দুর্গে তাঁকে কয়েদ ক'রে রাখা হল। জানা গেল, চুরীর অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই দুর্গেই কিছুদিন আগে পোপের আদেশে তিনি কতকগুলি মূল্যবান অলঙ্কারের জড়োয়ার কাজ মেরামত করবার জন্য কয়েক দিন এসেছিলেন এবং সেই সময় তিনি নাকি অনেকগুলি গহনা চুরী ক'রে নিয়ে গেছেন!

চেল্লিনির শিল্পকর্ম্মের আরও কয়েকটি নমুনা

নির্জ্জলা মিথ্যা অভিযোগ! স্পষ্টই বোঝা গেল, তাঁর পুরাতন শত্রুরা তাঁকে ভুলতে পারে নি ষড়যন্ত্র ক'রে তাঁকে পাকে ফেলেছে। বিচারের সময় আত্মপক্ষসমর্থন ক'রে বেনভেনুটো যে দীর্ঘ সওয়াল করলেন, ভাবের-আবেগে আর যুক্তির অগণ্ডনীয়তায় তা সকলকে অভিভূত করেছিল। কিন্তু ছাড়া পেলেন না। নানা ভাবে তাঁর বিরুদ্ধে নানা দোষারোপ ক'রে তাঁকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে আটক-বন্দী ক'রে রাখা হল।

কিন্তু বেনভেনুটোর মতো প্রখর বুদ্ধি আর অমিত সাহস সম্পন্ন ব্যক্তিকে বেশীদিন কয়েদ ক'রে রাখা সম্ভব ছিল না। প্রথম দিন থেকেই পলায়নের পথ আবিষ্কারের জন্যে তাঁর উর্ব্বর মস্তিষ্ক সক্রিয় হল। যে-প্রকাণ্ড ঘরে তাঁকে আবদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছিল, তার একটি দরজার হুড়কো ভিতর থেকে খোলবার ব্যবস্থা এবং কৌশল দু'চার দিনের মধ্যেই তিনি ঠিক ক'রে ফেললেন।

প্রহরী অষ্টপ্রহর তাঁর ঘরের সামনে পাহারা দিচ্ছে। তার নাকের উপরেই বেনভেনুটো তাঁর পালাবার পথ তৈরী করছেন। হেসে হেসে প্রহরীর সঙ্গে কথা বলছেন। বলছেন—"দেখো বন্ধু, পাহারা দিতে দিতে যেন ঘুমিয়ে প'ড়ো না! খুব সাবধানে পাহারা দাও। একটু ফাঁক পেলেই আমি সটকাবো।"

সুযোগ এলো একদিন। সেদিন রাত্রে চাঁদ ওঠেনি। থমথমে মেঘে আকাশ পরিব্যাপ্ত। দিগ্বলয়ে ঝড়ের সূচনা। পিছনের দরজার হুড়কো নিঃশব্দে খুলে বেরিয়ে পড়লেন বেনভেনুটো। এক-খানা মোটা চাদর ফালা ফালা ক'রে ছিঁড়ে দড়ি বানিয়ে রেখেছিলেন। সেই দড়ির বাণ্ডিল বগলে নিয়ে আল্‌সের ধার দিয়ে অগ্রসর হলেন। তাঁর কারা-কক্ষটি ছিল ছাদের এক কোনে। সিঁড়ি দিয়ে তো নামা যাবে না। নীচে অন্য সব নগররক্ষীর দল সজাগ হোয়ে আছে। সুতরাং দড়ির সাহায্যে নীচে পিছন দিকে বাগানের মধ্যে নামতে হবে। আল্‌সের সঙ্গে দড়ির এক প্রান্ত শক্ত ক'রে বাঁধলেন। তারপর ধীরে ধীরে দড়ি ধ'রে ঝুলে পড়লেন। মাঝ রাস্তায় দড়ি গেল ছিঁড়ে। সশব্দে মাটির উপর ধরাশায়ী হলেন। ডান পায়ে মোক্ষম চোট লাগল। কিন্তু সে-আঘাতের দিকে নজর দেবার ফুরসৎ নেই। অদূরে কুকুর চীৎকার করতে শুরু করেছে। তেড়ে এলো বুঝি সবাই! কোনক্রমে পাঁচীল ডিঙিয়ে নদীর ধারে গিয়ে পড়লেন। তারপর আর তাঁকে পায় কে!

কিছুদিন এক বন্ধুর বাড়ীতে লুকিয়ে রইলেন। দেশ ছেড়ে সরে পড়বার সব আয়োজন প্রস্তুত করেছেন এমন সময় আবার ধরা প'ড়ে গেলেন। এবার তাঁকে এক সাধারণ কয়েদখানার অন্ধকার কুঠুরির মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখা হল!

অদ্ভুত দেশের আইন। দোষী জানল না তার অপরাধ। অথচ বিচার হোয়ে গেল। পরবর্তীকালে নিজের আত্মজীবনীতে চেল্লিনি মর্ম্ম-স্পর্শী ভাষায় তাঁর নিগৃহীত জীবনের ছবি এঁকেছেন। লিখছেন—"একেই বলে কয়েদখানা! জানলার বালাই নেই। লোহার দরজাটা কাপে কাপ বন্ধ ক'রে দিলে, ঘর একেবারে আলো-বাতাস শূন্য অন্ধকূপ। ঘরের দেওয়ালে কড়িকাঠের ফাটলে বড় বড় বিষাক্ত পোকামাকড় বাসা বেঁধে আছে পুরুষানুক্রমে। অন্ধকার হলে তারা বেরোয়। তাদের আক্রমণের পদ্ধতি এমনি কৌশলপূর্ণ যে কখন্ কোন্ দিক দিয়ে তারা কোন্ স্থান যে আক্রমণ করবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই! শুনেছি, ইতিপূর্বে এখানে যাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই শেষ পর্যন্ত পাগলা-গারদে স্থানান্তরিত হয়! কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। মাসখানেক এখানে থাকলেই সেই অবস্থায় উপনীত হওয়া যাবে সহজেই। মাথার মধ্যে যখন গোলমাল হ'য়ে যায় তখন মনে মনে কবিতা রচনা করি। দেওয়ালের গায়ে নখ দিয়ে ছবি আঁকি। চোখ বুজে ভাবি, সূর্য্যোদয় হয়েছে, আকাশে রঙের কি সমারোহ!"

* * *

ফরাসী-সম্রাট ১ম ফ্রানসিস্-এর চেষ্টায় বেনভেনুটো চেল্লিনি শেষ পর্যন্ত কয়েদখানা থেকে মুক্তি লাভ করলেন এবং প্যারিসে চলে গেলেন। তারপর ফরাসী-সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় প্যারিসে একটি শিল্পশালা খুলে তিনি বহুবিধ অসাধারণ সূক্ষ্মকাজমণ্ডিত সোনা রূপা তামা ও ব্রোঞ্জের জিনিষ তৈরী করলেন। সম্রাট ফ্রানসিস গুণীর আদর জানতেন। প্রায়ই তিনি বেনভেনুটোর শিল্পশালায় উপস্থিত হোয়ে তাঁকে উৎসাহিত করতেন।

পাঁচ বছর ফ্রান্সের রাজসভায় রাজানুগ্রহপুষ্ট শিল্পীরূপে বেনভেনুটো চেল্লিনি ফরাসী রাজসভা এবং রাজ-অন্তঃপুরকে তাঁর অনন্যসাধারণ শিল্পপ্রতিভার নানা নিদর্শনে মণ্ডিত করলেন। পৃথিবীর নানা স্থান থেকে রাজন্যবর্গ সেই সব শিল্পকাজ দেখবার জন্যে ফ্রান্সে আসতেন। সেই সময় বেনভেনুটো যশ ও সম্মানের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন।

কিন্তু সে-সৌভাগ্য বেশীদিন টিকল না। আবার শুরু হল ঈর্ষাদগ্ধ পারিষদবর্গের চক্রান্ত। এবারকার শত্রুতায় প্রধান অংশ গ্রহণ করলেন একটি রমণী। তাঁর নাম ডাচেস দ্য এতাম্প্স্! রাজসভায় সেই সৌন্দর্য্যশালিনী ধনবতী মহিলার প্রতিপত্তি বড় কম ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন, বেনভেনুটো চেল্লিনি তাঁর হুকুমমতো চলবেন, তাঁর ফরমায়েস আগে তামিল করবেন। কিন্তু বেনভেনুটো চেল্লিনির প্রকৃতিতে কারুর অন্যায় জবরদস্তি মেনে চলবার সহনশীলতা ছিল না। মোহময়ী ডাচেস কোন মতেই তাঁকে এঁটে উঠ্তে না পেরে রাজার কাছে তাঁর নামে মিথ্যা নালিশ জানালেন, ডাচেসকে বেনভেনুটো নানা ভাবে নাকি অপমান করেছেন এবং তাঁর প্রতি ঘোর অসৌজন্য প্রদর্শন করেছেন, এই ছিল অভিযোগ। অনেক অমাত্য ডাচেসের পক্ষ হয়ে একই সুরে পোঁ ধরলেন। রাজা গতিক বুঝে দুঃখিত মনে শিল্পীকে বিদায় দিতে বাধ্য হলেন।

বেদনাহত চিত্তে ফ্লোরেন্সে ফিরে বেনুভেনুটো চেল্লিনি সহরের কোলাহল থেকে দূরে স'রে গিয়ে আপনমনে তাঁর শিল্পসাধনায় মগ্ন রইলেন। সেই সময় তিনি যে কয়েকটি ব্রোঞ্জের স্ট্যাচু নির্ম্মাণ করে-ছিলেন সে-ধরণের বৃহদাকার ব্রোঞ্জমূর্ত্তি যে তৈরী হোতে পারে তা ইতিপূর্ব্বে কল্পনা করা যায় নি। সেই সব ধাতুমূর্ত্তি নির্ম্মাণের কাজে তিনি ঢালাই করবার যে নবতর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন তার দ্বারা তাঁর পরবর্ত্তী শিল্পীরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন।

বেনভেনুটো চেল্লিনি অকৃতদার ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি তাঁর এক বিধবা ভগ্নীর কাছে ছিলেন এবং তাঁর ছ'টি ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছিলেন।

১৫৭১ সালে তাঁর মৃত্যু হয় এবং দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সম্মানিত ব্যক্তিরূপে রাজসরকারের তরফ থেকে মহাসমারোহে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

গান

শ্রীরাধাকিশোর পাল এম-এ

চাহিব না প্রতিদান,
যদি নাহি পাই তোমারে জীবনে
জানাব না অভিমান।

বিকশিত মোর প্রেম-শতদল,
তোমার পরশে গন্ধ-বিভল,
তোমা পানে যবে চেয়ে থাকি সখি
উথলিয়া ওঠে প্রাণ।
স্বপনের মাঝে হবে চিরপ্রিয়া,
মরম-মাঝারে চির-মরমিয়া
জীবনে মরণে মানসী আমার
কল্পনা মম গান।
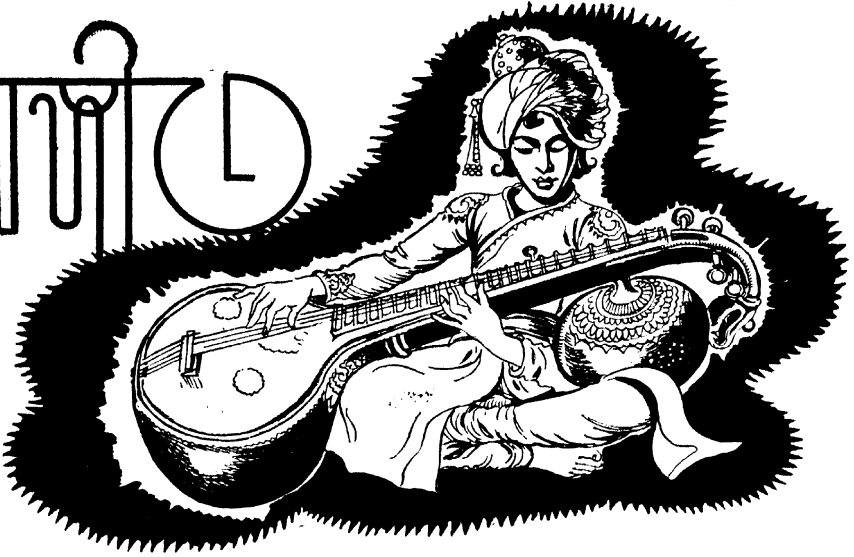
রাগ প্রধান

প্রেমের গোলাপে কেন
কাঁটার মালা !
কেন বুক ভাঙ্গা শোণিতে সে রাঙ্গা
কেন এত জ্বালা !
হে প্রিয়, তোমায় ভালোবাসে যারা,
বলো, কেন এত বাধা পায় তারা ?
কেন বেদনায় ধুলাতে লুটায়
আকুল অনুরাগের তনুর ডালা ।

তোমায় ভালবাসার পূর্ণ চাঁদে কেন
রাহুর ছায়া ?
কমল সুখে হাসে কেন কাঁদে তার
মৃণাল কায়া ।
উদয়াচলে কেন মেঘের মাঝে
নিখিল প্রভাতের অরুণ রাজে ?
অমর মিলনের জীবন বাসরে
কেন এ মরণের গরল ঢালা ॥

কথা : নিশিকান্ত (পণ্ডিচেরী) সুর ও স্বরলিপি : তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

গমা পা পমা | ঋা -া সা -া II র্সা ণদা -া পা | মা গা মা -া I
প্রেমে র গো লা ০ পে ০ কে ন ০ কাঁ টার্ মা লা ০

I -া সা -ঋা মা | পা পা -পধণা -ধণা I -া ণা র্সা ঋ্া | ণদা দা পা -া I
০ কে ০ ন বুক্ ভা ঙ্গা০০ ০০ ০ শো ণি তে সে০ রা ঙ্গা ০

I ০ ণা র্সা ঋ্া | ণদা দা পদা মপা I "কেন কাঁটার মালা" II
০ কে ন এ ত০ জ্বা লা০ ০

II -া পদা মা মা | পা -া পধণা -ধণা I া ণর্সা র্সা ণদা | ণা ঋর্া র্সা -া I
০ হে০ প্রি য় তো ০ মা০০ ০য়্ ০ ভা ল বা০ সে যা রা ০

I -া র্সঋর্ মর্া মর্া | জ্ঞর্মর্া -া জ্ঞর্ঋর্া র্সা I -া ঋর্া -া ণা | -দা ণদা পা -মপা I
০ ব০ লো কে ন ০ এ ত ০ বা ০ ধা পায়্ তা০ রা ০

I -া মা -া মা | পা পা পধণা -ধণা I -া দা -পা মা | গা পা মগা -রগা I
০ কে ০ ন বে দ না০০ ০য়্ ০ ধু ০ লা তে লু টা০ য়্

I -া গমা দা মা | ঋা ঋা সা -া I -া সঋা মা মা | মপা -ণদা দপা -মপা I
০ আকু ল অ নু রা গে র্ ০ ত০ নু র ডা০ ০০ লা০ ০

"কেন কাঁটার মালা" II

II সা ঋা -া ঋা | সা ণদা সা -া I -া সঋা গা গা | মা -া মা পমা I
তো মা য়্ ভা লো বা০ সা র্ ০ পূর্ ণ চাঁ দে ০ কে ন০

I -গা গা মা দমা | ঋা -া সা -া I র্সা র্সা -দা ণা | র্সা -ণা র্জ্ঞা র্সা I
০ রা হু ০র ছা ০ য়া ০ ক ম ল্ সু খে ০ হা সে

I -া ণা ণা র্সা | ণর্রা -র্র্সা ণা -দা I গা মা -দা মা | ঋা -া সা -া I
০ কে ণ কাঁ দে০ ০ তা র্ মৃ ণা ০ ল কা ০ য়া ০

I -া পদা মা মা | পা -া পা -পধণা I -ধণা ণর্সা র্সা ণদা | ণা ঋর্া র্সা -া I
০ উদ য়া চ লে ০ কে ন০০ ০০ মে ঘে র০ মা ০ ঝে ০

I -া র্সঋর্া মর্া মর্া | জ্ঞর্মর্া -া জ্ঞর্ঋর্া র্সা I - র্সঋর্া ণা দা | র্সা -া র্সা -া I
০ নিখি ল প্র ভা ০ তে র ০ অ০ রু ণ রা ০ জে ০

I -া মা মা মা | পা -া পধণা -ধণা I -া দা পা মা | গা পা মগা -রগা I
০ অম র মি ল ০ নে০০ ০র্ ০ জী ব ন বা স রে০ ০

I -া গমা দা মা | ঋা -া সা -া I -া সঋা মা মা | মপা -ণদা দপা -মপা I
০ কেন এ ম র ০ গে র্ ০ গ০ র ল ঢা০ ০০ লা০ ০

"কেন কাঁটার মালা" IIII

ভক্ত গিরীশ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরা পাপকাশিনী
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্ত চাকশীহি

হে রুদ্র, হে গিরিশন্ত—তোমার যে দক্ষিণমুখ পাপবিনাশক তনু তাইতেই তুমি প্রকাশিত হও।

প্রাচীন ঋষিদের এই অভ্রান্ত উক্তির পুনরাবির্ভাব দেখেছি আমরা একালের দক্ষিণ দেবতার পাদপীঠে দক্ষিণেশ্বরে। ইতিহাসের এক নির্মম যুগসন্ধিক্ষণে এই রূপান্তর ঘটেছিল বাংলার এক অখ্যাত পল্লীবাটে। তারই একটি ছোট্ট আলেখ্য আজ আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করবো। ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগ—আসছে জীবনে একটা নবসংস্কৃতি, নতুন দিগদর্শন, কালের স্রোত বেয়ে পশ্চিমের খরবেগ এসে ধাক্কা দিচ্ছে ভারতবর্ষকে, বিশেষ করে বাংলা দেশকে। দেশের জ্ঞানী গুণী চিন্তাশীল মনস্বী যশস্বীরা আত্মসম্বিৎ যেন ফিরে পাচ্ছেন। ভারতপথ পথিক বাংলা দেশ নতুন গল্প শুনছে, নতুন রহস্যে জেগে উঠছে, নতুন কথা বলছে—কোথা থেকে এলো এক রসসঞ্জীবনী প্রাণবন্যা—দুকূল ছাপিয়ে চলে যায়। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন সংঘাতে ভরা বিচিত্র রস সন্ধানকে আমরা নাম দিলাম নব জাগৃতির যুগ, রেঁনাসাসের দিন। কিন্তু বাংলার সত্যিকার প্রাণের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন বেত্তার দরদ দিয়ে তাঁরা জানেন বাঙালী চিরকালই সমন্বয় সন্ধানী, তার রক্তের উত্তাল স্রোতে মিশেছে নানা ধারা, যুগে যুগে তার মন্ত্র হচ্ছে—

"শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই"
"কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা—নরবপু তাহার সহায়"
"কি আর বলিব রে, কে করিবে প্রত্যয়
এই মানুষে আছে সত্য নিত্য চিদানন্দময়"

এই মানবতাবাদের কর্ষিত ভূমি ছিল বলেই পশ্চিমের বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নিরীশ্বরবাদ, হারবার্ট স্পেন্সার, জনস্টুয়ার্ট মিল, কাঁত, কোঁত, মোক্ষমূলরের যত কিছু শিক্ষা বাঙালী আত্মসাৎ করে রূপান্তরিত করে নিলে এক রসময় সৃষ্টিতে।

একদিক থেকে দেখতে গেলে জাতীয় চিত্তের আলোড়নে রামমোহন থেকে বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ তারই বহির্মুখীন প্রকাশ। এই পরিবেশের মধ্যেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, আবিষ্কৃত, স্বীকৃত হয়েছিলেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব। এও এক অপূর্ব্ব রহস্য। তার সঙ্গে স্বামিজীর মিলন সেও আর এক অপূর্ব্বতর রহস্য। কিন্তু অপূর্ব্বতম হচ্ছে গিরীশচন্দ্রের সঙ্গে তার সম্বন্ধ। একে শুধু ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক বা পতিতপাবনের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মবিধি বলে ধরে নিলে হয়ত সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। এর তথ্য বা তত্ত্ব আরো গভীর, আরো ব্যাপক আরো মর্ম্মস্পর্শী। কাব্যে পুরাণে ইতিকথায় শাস্ত্রে বলে—ভগবান দুষ্কৃতিপরায়ণদের শাস্তি দেন, ভক্তদের কাছে টেনে নেন। জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন মহাপ্রভু। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু মধুকৈটভ রাবণ তিন জন্মেই সাযুজ্য লাভ করেছিল। কিন্তু তিনি পতিতপাবন হতে পারেন, তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে—যদি তিনি সর্ব্বব্যাপী বাসুদেব হন, সর্ব্বগত শিব হন, তাহলে কে পতিত আর কে অপতিত। সুহ বা সুহ বা সুহ বা সুহ—তিনিই তিনি তিনিই তিনি। তাই তার এক নাম হচ্ছে সর্ব্বতোভদ্র—সব নিয়ে সব মিলিয়ে, সকলের জন্য ব্যাপ্তির বিলুপ্তিতে যিনি কল্যাণময়, ময়োভব ময়োস্কর। তাই পতিতকে উদ্ধার করা শুধু পতিতের কল্যাণেই নয়, ভগবানের লীলার অঙ্গও—তারও প্রয়োজন। তোমার মাঝে শুধু আমার লীলা নয়, আমার মাঝেও তোমার লীলা। একই কক্ষপথের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন।

গিরীশচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই উৎকট সংঘর্ষের যুগের একটি পরিণত ফল, যে যুগে ইয়ংবেঙ্গলরা অনাচার, কদাচার ও অসংযমকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা বলে প্রচার করতেন, মুক্তির হোমশিখা বলে কামনার লেলিহান অগ্নিতে সপ্রত সমিধ অর্পণ করতেন। অথচ তাঁদের মন ছিল নরম, দৃষ্টি ছিল সর্ব্বাঙ্গীণ, জীবনের পরম অভিব্যক্তিতে ছিল না কার্পণ্য, রূপে রসেভরা চাঞ্চল্যে যৌবন সরসী নীরে তারা অবগাহন করতেন সানন্দে। সে সংসার সমুদ্র মন্থনে উঠতো হলাহল, উদ্গীরিত হতো কটুতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, কিন্তু অধিকারীর হাতে অমৃত ও উঠতো, লক্ষ্মী আসতেন কল্যাণী রূপে, শুধু লাস্যতরলা হাস্যচপলতা কামকৌতুকময়ী যৌবন অচঞ্চলা উর্ব্বশীরাই নয়। মধুসূদনের হাতে গিরীশচন্দ্রের কাছে আমরা সেই অমৃত কুম্ভই পেয়েছি। গৈরীশী ছন্দে শুনেছি অমৃতময় বাণী, দেখেছি বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল, বলিদান, শাস্তি কি শান্তি। আবার দেখেছি রাজর্ষি অশোককে, নিমাইকে, শঙ্করকে। দেখেছি শিবাজীকে, মীরকাশিমকে, প্রহসনের বিফল প্রয়াসকে পঞ্চরংএ। মায়াবসান তখনও হয়নি। নীলকণ্ঠের কণ্ঠে সে বিষ আটকে গেছে। দ্বিজ নৃপগণিকা পুষ্পমালা পতাকা নিয়েই রসসৃষ্টির চৌষট্টি কলা। এরই একটা বিশিষ্ট রূপ আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যকলার ইতিহাসের অঙ্গনে পেয়েছি এবং সেই রঙ্গমঞ্চেই গিরীশচন্দ্রের আগমন—শুধু আগমন নয় আবির্ভাব। এর প্রথম অধ্যায় তখন শেষ হচ্ছে। রামনারায়ণ, মাইকেল, দীনবন্ধু, উপেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মনোমোহন সভা বিদায় নিচ্ছেন—প্রবেশ করছেন ললাটে রাজটীকা নিয়ে গিরীশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি। শুধু নট নয় নাট্যকারও। কালিদাস সেক্সপিয়রের যোগ্য উত্তরাধিকারী। গিরীশচন্দ্রের জীবনে ছিল একটা Dramatic

Movement। সেখানে উজ্জ্বল নীলমণির প্রথম সূত্র "নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিকারঃ" কাজ করে চলেছে। একদিকে বলেছি বিষয়-বিষবিকার জীর্ণ তরঙ্গপ্রবাহ কামনার ফেনিল উচ্ছ্বাস, আর একদিকে চলেছে অগ্নিশুদ্ধির শোধন যজ্ঞের প্রথমা ব্যাহৃতির মন্ত্র, যা শেষজীবনে মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসে "হা রামকৃষ্ণ হা রামকৃষ্ণ" এই মহামন্ত্রে পরিণত হলো। এই মিলন সংঘটিত হলো কি রকমে তারও একটা অপূর্ব্ব অনুভূতিময় রসচিত্র আছে। পরমহংস বলে একজন সাধু সন্ন্যাসীগোছের লোক দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির বাগানে আস্তানা গেড়েছেন এমন একটা কথা তখনকার দিনের বাঙালী শিক্ষিত-সমাজে অনেকেই জানতেন। আরো জানতেন যে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা তাঁকে নিয়ে হৈ চৈ করেন, ইণ্ডিয়ান মিররে তাঁর অদ্ভুত সরল অনাড়ম্বর নিরুপাধিক জীবনযাত্রার কথা অনেকেই পড়েছেন। তবু সংশয় যায় না, সন্দেহ ঘোচে না, যাচাই করে নিতে ইচ্ছা হয়—সত্যই কি ইনি—কেউ বলে বুজরুকী, কেউ বলে পাগল, কেউ বলে ভণ্ড। পাষণ্ডের দল বলে পরমহংস নয় রাজহংস। গিরীশচন্দ্রেরও সেই দশা। এমনি সময়ে গিরীশ শুনলেন—পরমহংসদেব আসছেন দীননাথ বসু মহাশয়ের বাটীতে। গিয়ে পৌছলেন তিনি শুধু অতৃপ্ত কৌতূহল নিয়ে নয়,অনির্বাণ আহিতাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গও সঙ্গে নিয়ে। দেখবো বুঝবো, জানবো এ তৃষ্ণাও ছিল। তখন সন্ধ্যা হচ্ছে, আকাশ কালো হয়ে আসছে, সোনার আঁচল খসে তন্দ্রালসা নামছেন। ঠাকুর ভাব-বিভোর—কে এক ভক্ত সামনে এসে রাখলে একটি প্রদীপ, জ্বলে উঠলো আলো। পরমহংসদেব বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—কি গো সন্ধ্যা হয়েছে। স্থূলভাবে দেখতে গেলে অন্ধকার হয়ে আসছে, আলো জ্বালা হলো—একটি অতি সাধারণ জাগতিক ঘটনা—কোন বৈশিষ্ট্য নেই। হয়তো তাই কিম্বা অতি সূক্ষ্মের বিচিত্র রহস্যে সেই প্রশ্নের মধ্যেই একটি অমৃতবীজ ছড়িয়ে দিলেন তিনি। সন্ধ্যা মানে পরম সন্ধির ক্ষণ, আলো আর অন্ধকার মিশছে, যে আঁধারের মধ্যে মহাতামসী বাস করেন, যে আলোর মধ্যে নিত্য দীপ্ত শুদ্ধ মুক্ত পরম জ্যোতিষ্ময় আছেন। আলো আর অন্ধকার সে যে এক অনন্তের সীমাহীন অদ্বৈতের দুই বিভিন্ন রূপ। আলোর সঙ্গে আঁধারকে মিশতেই হবে—মহাপ্রকৃতির এই অলঙ্ঘ্য নিয়ম। তাই মহাপ্রকৃতির সাধকের কাছে সৎ অসৎ কিছুই নেই—কোথায় আলো, কোথায় অন্ধকার, কোথায় রাত্রি, কোথায় দিন, শিব এর কেবলং। নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপ রাশি এ শুধু কবির কল্পনা, আস্তিক্য বুদ্ধি প্রণোদিত স্বীকার নয়, পরম বৈজ্ঞানিক সত্য। তাই সেদিন সেই বীজই ছড়িয়ে দিলেন তিনি—কি গো সন্ধ্যা হয়েছে—প্রত্যেকের মনে অধিকারী-ভেদে জীবনছন্দের নৃত্যের ক্রমে জ্ঞানের মাধ্যমে তার বিভিন্ন ক্রিয়া হয়। গিরীশচন্দ্রের মনের প্রথম প্রতিক্রিয়া—এ একটী অসহ্য ন্যাকামী।

চলে এলেন গিরীশ। মাসের পর মাস যায় বছরের পর বছর। স্বীকার করবেন না তিনি পরমহংসদেবকে তবু মনে কোথায় একটা খোঁচা লেগে থাকে। শুনলেন বলরাম বসুর বাটীতে আসছেন পরমহংসদেব। আবার গেলেন তিনি। গান হচ্ছে আসরে—বিধু কীর্ত্তনীয়া গাইছে। নামকরা বাইজী। চমকে উঠলেন গিরীশ। এ কী? সংযতাত্মা, দৃঢ়েন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী মহাযোগী এক অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর নৃত্যগীত শুনছেন, ভাবে বিভোর হচ্ছেন পতিতপাবনের নাম শুনে। খটকা লাগে মনে—কি পাবক আছে এর মনে যে ভয় লোভ, কাম কামনা বাসনার অতীত হয়ে আছেন এই নির্বিকার মুক্ত পুরুষ। সকল লোকের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশছেন, নমস্কার করছেন, কথা কইছেন—কই ইনি ত চেলা-কাঠ নিয়ে কারুকে তাড়া করেন না, বিদ্যার গরমে বেদবেদান্ততন্ত্র আওড়ান না, বিভূতিময় হয়েও কোন বহিপ্রকাশ নেই। কে এই সহজ সাধক, সব মতের প্রতি যার অকুণ্ঠ ভক্তি, সব পথের প্রতি যার নিরাবিল শ্রদ্ধা, সব মানুষের প্রতি অসীম মমতা—যত মত তত পথ সে, জীবই যে শিব—নারায়ণই যে মানুষের মনে—সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট—সব পথ এসে মিশে গেছে শেষে তোমার দুখানি নয়নে—উপরে উঠতে হবে, সিঁড়ি দিয়েই উঠি আর ভারা বেয়েই উঠি—ওঠাই হচ্ছে কাম্য—জলকে পানিই বলি আর নীরই বলি জল জলই—হেলে দুল্লেও সে জল, স্থির থাকলেও সে জল।

এরই পুনরাবৃত্তি দেখেছি স্বামীজীর চরিত্রে। খেতরীর রাজার দরবারে নৃত্যবাসর চলেছে। নর্ত্তকী নাচছে—ব্রহ্মচারী স্বামীজীর মনে দ্বিধা জাগছে, সংশয় জাগছে—এ কী। সেদিন নর্ত্তকী গেয়েছিল—

প্রভু মেরা অবগুণ চিত না ধরো
সমদরশী হৈ নাম তিহারো, চাহে ত পার করো
এক লোহা পূজামে রাখত
এক রহত ব্যাধ ঘরপর
পরশকে মন দ্বিধা নহী হৈ
দুহুঁ এক কাঞ্চন করো

গণিকার কণ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ সাধক সুরদাসের বাণী বীর সন্ন্যাসীর চিত্ত আকুল করেছিল, অমিত বিত্তে উথলে দিয়েছিলো—জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।

গিরীশের দল একটু একটু করে দক্ষিণপাণি দক্ষিণ দেবতার দিকে এগোয়। গিরীশ নাকি চমৎকার অভিনয় করে—মিশুক্ না নটনটীর সঙ্গে—পতিত যারা অবজ্ঞাত যারা তিনি শুধু অন্তরের শুদ্ধ দীপ জ্বালিয়ে দেখাবেন সেই নিত্যকে যার গায়ে পাপপুণ্যের কর্ম্ম বাগুলোর আঁচড়ও লাগে না। চৈতন্যলীলা…মহাপ্রভুর কাহিনী—নিমাইএর সন্ন্যাস—বিষ্ণু-প্রিয়ার প্রেম—এ দেখাবে গিরীশ—চলো দেখতে যাই। ঠাকুর নমস্কার করেন গিরীশকে, গিরীশ প্রতি নমস্কার করেন। প্রতিযোগিতার পালা চলে—ভক্ত আর ভগবানে, ভৈরবে শিবে, চণ্ডমুণ্ডের সঙ্গে চণ্ডাতীতের। কিন্তু একী হলো গিরীশের—একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে ভক্ত হৃদয় ঠাকুর জয় করে নিলেন নাকি? আবার একদিন দেখা বলরাম বসুর বাটীতে। সেইদিন তিনি বললেন—তোমার গুরু হয়ে গেছে।

গুরু কি জান—ঘটক্—যোগ করিয়ে দেন যিনি—না, না ঢং নয়।

প্রহ্লাদ চরিত্র দেখতে যাচ্ছেন তিনি দলবল নিয়ে। প্রহ্লাদকে রূপায়ন করা কী সোজা—যিনি প্রতি অনুতে রেণুতে প্রত্যক্ষ করেছেন

সেই পরমকে চরমজপে। দ্বারী হাঁকিয়ে দিলে—না, না, এতো লোক নিয়ে থিয়েটার দেখা হয় না—ঠাকুর বলেন—গিরীশ যে বলেছিল, যখন খুশী এসো—গিরীশের কথাতেই বলি—'তার' মুখপদ্ম দেখে আমার পাষাণ হৃদয় গললো—তিনি বললেন তোমার মনে বাঁক আছে, বিশ্বাস করো। কিন্তু অভিমান, অহমিকা, দ্বন্দ্ব কি এতো সহজে যায়, তারপর দেখা আবার রামদত্তর বাড়ী। চলেছে কীর্ত্তন "নদে টলমল টলমল করে গৌর প্রেমের হিল্লোলে"। এই সমাধিস্থ অবস্থাতেই তিনি গিরীশের সামনে এসে দাঁড়ালেন। হলো শেষ আত্মসমর্পণ, চরণ ধূলির স্পর্শ পেলেন গিরীশ। 'সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে'। বারে বারে জিজ্ঞাসা করেন—আমার মনের বাঁক যাবে ত—অন্য লোকে বিরক্ত হয়, মনে করে ঠাকুরের কাণ্ড দেখো, এই মাতাল চরিত্রহীন লোকটাকে নিয়ে একী বাড়াবাড়ি—হাঁ রে যাবে, যাবে।

গিরীশ নিজেই বলেছেন—"ইহার পর অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, মদ্যপান করিয়া ইহাকে গালি দিয়াছি—ভাবিয়াছি একী আপদ, গুরুর কৃপায় অমূল্য রত্ন পাইয়াছি—অহেতুকী কৃপাসিন্ধু কৃপা করিয়াছেন—পতিত পাবনের অপার দয়া, ভগবানের অপার করুণা—জয় রামকৃষ্ণ'।

ভক্তগণ সমক্ষে স্বামিজী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন গিরীশকে—গিরীশ তুমি কি চিরকালই থিয়েটার নিয়ে থাকবে—

হ্যাঁ ভাই ঐ থিয়েটারের মধ্য দিয়েই আমি কাজ করে যাব—আর পরকালের কথা ও ত ঠাকুরের উপর ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত আছি—

যোগ্যতমের হাতেই এই আমমোক্তার নামা দিয়াছিলেন তিনি।

* দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের গিরীশচন্দ্র স্মৃতি বার্ষিকী সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

'গীতায় বিরোধ ও সমন্বয়' প্রসঙ্গে

আবদুল আলি খান

গত ভাদ্র ১৩৬১ সালের 'ভারতবর্ষে' শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি,টি, ডি এস, ই, মহোদয় 'গীতায় বিরোধ ও সমন্বয়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন—খৃষ্টান বা মুসলমান ধর্ম্মের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্ম্মের এইখানেই একটা বিরাট পার্থক্য আছে। ঐ সব ধর্ম্ম বুঝিয়াছে যিশু ছাড়া গতি নাই, মহম্মদ ছাড়া গতি নাই। সুতরাং যাহারা ইহাদের আশ্রয় লইল না তাহাদের আর মঙ্গল নাই। সুতরাং মারিয়া ধরিয়া রক্তপাত হত্যা প্রভৃতি করিয়াও সকলকে ধর্ম্মান্তরিত করিবার জন্য ইহাদের মাথা-ব্যথা আছে। গীতার মধ্যে এই জাতীয় মাথাব্যথা নাই, গীতা তাহার উদার দৃষ্টি দিয়া সব মতকে মানিয়া লইয়াছে। সব পথ সে স্বীকার করিয়াছে এবং সব প্রণালীর অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতা দিয়া সকলের মধ্যে সমন্বয় বিধান করিয়াছে।*

মুসলমানেরা মহম্মদকে পূজা করে না। মহম্মদ ছাড়া গতি নাই—একথাও কোন মুসলমান স্বীকার করে না। তারা স্বীকার করে সর্ব্বশক্তিমান খোদাতা'লা ছাড়া গতি নাই। একমাত্র তাঁরই উপাসক তারা। মোহাম্মদ একজন সামান্য মানুষ—পথ প্রদর্শক মাত্র।

তারপর মারিয়া ধরিয়া রক্তপাত হত্যা প্রভৃতি করিয়া ধর্ম্মান্তরিত করা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ডাঃ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, পি এইচ ডি, ডিলিট মহোদয় ১৩৫৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতবর্ষে' ৪৯০ পৃষ্ঠায় 'মধ্যযুগ সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে যা লিখেছেন তাই এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম। 'মুসলমানেরা যে উদার প্রকৃতির ছিল তার দু'একটি দৃষ্টান্ত এই স্থলে দিতেছি। কুতবমিনারের নির্ম্মাণ কার্য্য বার খৃষ্টাব্দের শেষে আরম্ভ হয়। তাহার প্রথম তলের শিলালিপিতে কুরান হইতে উদ্ধৃত আয়াতের মধ্যে "লা একরাহা ফি অদদীনে" এই বাক্যটি আছে। ইহার অনুবাদ এইরূপ—"ধর্ম্মে কোনও প্রকারের জুলুম বা জবরদস্তি নাই"। তাই যখন পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর মুহম্মদ গোরী দিল্লী অধিকার করেন তখন হিন্দুদিগকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। আবার জৌনপুরে যখন স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হয় সেখানেও প্রথম হইতে কোনও একটা বড় মসজিদে ঐ বাক্যটি ক্ষোদিত করিয়া মুসলমানবর্গকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় যে তাহারা যেন হিন্দু প্রজার প্রতি কোনও প্রকার গোঁড়ামী না দেখায়।' 'বাবর নিজ জীবন চরিতে লিখিয়া গিয়াছেন যে গোয়ালিয়রে হিন্দু মন্দিরাদি দর্শন করিয়া তিনি আনন্দ বোধ করেন। আবার বিহার অভিযানের পথে এক স্থানে উনি দেখেন যে মুসলমানেরা হিন্দু যোগীর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষালাভ করিতেছে; তাহাতেও কোনওরূপ নিষেধাত্মক বিধান প্রচার করেন নাই।'

'আরও দুই একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলিতে চাহি, প্রথমতঃ যে যুক্তপ্রদেশে ভারতের মুসলমান বাদশাদের রাজধানী স্থাপিত ছিল সেই প্রদেশে আজও মুসলমানেরা সংখ্যায় হিন্দুর তুলনায় অতি অল্প। কেবলমাত্র শতকরা চৌদ্দ বা পনর। যদি মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিত তাহা হইলে কি তাহারা সংখ্যায় এত অল্প থাকিত!'

'আর একটি কথা। ইতিহাস আমাদের ইহাই বলে যে দ্বাপর

* ভারতবর্ষ—ভাদ্র ১৩৬১ পৃঃ ২৭নং দ্বিতীয় কলম তৃতীয় প্যারাগ্রাফ।

যুগের বৃন্দাবনের ধ্বংস শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর অল্প দিনের মধ্যে সাধিত হয়। আজিকার সমৃদ্ধিশালী বৃন্দাবনের সংস্থাপনও মুসলমানযুগে হইয়াছে। যত বড় বড় পুরাতন মন্দিরাদি আজ সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় কোনওটাই তাহার ষোল খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের নয়। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে কি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না যে দিল্লীর মুসলমান বাদশাহেরা সকল সময়ে গোঁড়ামীর পক্ষপাতী ছিলেন না বরং উদার নীতিই অবলম্বন করিতেন।'*

সত্য কখনও গোপন থাকে না।

তারপর গীতার যে অংশ নিয়ে শ্রদ্ধেয় লেখক মহোদয় ইসলাম এবং খৃষ্ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেছেন—তা হ'ল গীতার ঈশ্বর সর্ব্বভূতে সমদর্শী। তার দ্বেষও নাই—প্রিয়ও নাই। যে তাহাকে ভক্তির সহিত ভজনা করে তিনি তাহাকেই কৃপা করেন (৯।২৯।৩০), শুধু তাই নহে, অন্য কোনও দেবতাকে যদি কেহ ভক্তি করে তাহা হইলেও গীতার ভগবান তাহাতে সন্তুষ্ট হ'ন। (৯।২৩) যে যে ভাবে তাহাকে ভজনা করে সে সেই ভাবে তাহাকে পায়।'

তিনি যা গীতার ভেতর পেয়েছেন—তেমনি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা সেই একই তথ্য তাদের ধর্ম্মগ্রন্থেও পেয়ে থাকে। কোরান শরীফের প্রথম পারা 'সুরা বকরা'র প্রথম কয়েকটি ছত্র পড়লেই বুঝতে পারবেন। প্রথম ছত্র হ'ল—'আমি আল্লাহ্ জ্ঞানময়।' তার পরবর্ত্তী ছত্র হ'ল 'কোরাণ শরীফ' সম্বন্ধে 'ইহা সেই মহিমান্বিত গ্রন্থ-সংযমশীলদিগের জন্য যাহা সৎপথের পরিচালক।' তার পরবর্ত্তী ছত্র—সংযমশীল কারা তার পরিচয়—'যাহারা লোকচক্ষুর অগোচরে সর্ব্বশক্তিমানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। যে সব ধর্ম্মগ্রন্থ পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের উপর আস্থা রাখে। সর্ব্বশক্তিমান তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহার মধ্য হইতে কতকাংশ অপরকে দান করিয়া থাকে ইহারাই হইতেছে সংযমশীল এবং পরকালে ইহারাই মোক্ষলাভ করিবে।'(১) এই ক'টি ছত্র থেকে সম্ভবতঃ বুঝতে কারও অসুবিধা হ'বে না যে ইসলাম কোনও ধর্ম্মসমন্বয়কে অস্বীকারও করে নি, বরং সম্মানের সর্ব্বোচ্চ শিখরে স্থান দিয়েছে।

তারপর এই মহিমান্বিত গ্রন্থ কোরাণ শরীফ, ইসলাম এবং তার শিক্ষা ও আদর্শ গ্রহণ করে একজন মুসলমান কবি প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম নিয়ে সমানে হানাহানি চলছিল—যা বলেছেন এখানে তাই তুলে দিলাম :

মন্দিরে কি মসজিদে ভাই
প্রভেদ কিছুই নাই ;
উভয় গৃহই ভক্তগণের
উপাসনার ঠাঁই।
ক্রুশের প্রতীক কোশাকুশী
কিম্বা জপের মালা,
শঙ্খ প্রদীপ ধূপ ধুনা বা
চেরাগ বাতি জ্বালা ;
সকলই সেই একজনেরই
পূজার উপচার
বিশ্ব জুড়ে ভিন্ন প্রথায়
অর্চ্চনা হয় যার।' (২)

বিশ্ববাসীকে দ্বিধাহীন চিত্তে মুক্তকণ্ঠে একথা শুনিয়েছেন ওমর খৈয়াম।

* ভারতবর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল, ৪৯০-৪৯১ পৃষ্ঠা।

(১) এখানে বাংলা অনুবাদ দিলাম—মূল আরবী এখানে দিলাম না।

(২) "ওমর খৈয়াম"—নরেন্দ্র দেব। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

সূর্যমুখী

সমীর লাহিড়ী

রাত্রি শেষে
দূর হ'তে ভেসে আসে
চন্দন কুমকুম গন্ধ
আভরণ শিথিল সিঞ্জন।
আকাশের গায়ে—
মিটি মিটি শুকতারা !
অস্তাচল গত কোন শশি-কলা
বিগত প্রেমের মত ম্লান
শুধু স্মৃতি মুখরিত—
তৃপ্তিতে ভরা।
ক্ষণে ক্ষণে জেগে ওঠে প্রাণ,
দীপালীর দীপ্ত-দীপ শিখা।
বায়ুঘাতে তরঙ্গিত কম্পিত কায়া,
স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত সুনিবিড় আশা।
এই পথ চাওয়া
নিশীথ স্বপ্নের এই অসীম তপস্যা
স্তব্ধ হবে প্রভাতের আলোক পরশে ;
তবু যেন শেষ নাই তার।
নিদ্রাহীন রাত্রের সাধনা,
তৃপ্তিহীন গভীর কামনা
নিষ্ফল লুব্ধতায় আপনি গোপন—
স্বপ্নের নিভৃত জাল করে উন্মোচন।

সোঞ্জালি ও আঞ্জেলিকা

প্রশান্তকুমার চৌধুরী

যদি কোনদিন পিটুলীর রাধাশ্যামের মন্দির দেখবার সাধ হয় তোমার, তাহলে ট্রেনে না গিয়ে বাসেই যেয়ো। বাসে গেলে হাঁটা-পথটা কম হবে। বাস থেকে নেমে কিছুদুর এগিয়েই বড়তলা। রাস্তার মাঝখানে দেখবে, প্রকাণ্ড একটা বুড়ো বটগাছ তার অসংখ্য ডালপালা মেলে দিয়ে নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে ঝিমোচ্ছে। গাছটা বড়ো বলেই ও-জায়গাটার নাম বড়তলা, অথবা বটতলা থেকেই বড়তলা হয়েছে, এসব জানতে গিয়ে সময় নষ্ট কোর না; শুধু পথচারী কাউকে ডেকে জেনে নিয়ো গঙ্গা কোন্ দিকে, তারপর শুধু সেইদিকে লক্ষ্য কোরে হেঁটে চলো।

চলতে চলতে মাঝপথে বোষ্টুমীপাড়ার ভেতর দিয়ে যাবার সময় যদি চোখেই পড়ে যায় পদ্মা বোষ্টুমীর পানের দোকানটা, তাহলে সঙ্গে নিতে পারো দু-আনার সাজা-পান;—মন্দিরের ত্রিসীমানায় কোন দোকান-পত্তর নেই তো। কিন্তু ঐ পান নিতে যতক্ষণ দাঁড়াতে হয়, ততক্ষণই দাঁড়িও পদ্মা বোষ্টুমীর সামনে—তার বেশি নয়। মেয়েটা কথায় কথায় হাসে, আর হাসলে ওর গালে অদ্ভুত একটা টোল্ পড়ে—

আর, পদ্মা যদি বলে—"ঘেমে রাঙা হয়ে উঠেছে মুখ; এই ছাতিটা নিয়ে যান ফেরবার পথে দিয়ে যাবেন"—নিও না। তোমার ফেরবার সময় সন্ধ্যে হয়ে যাবে। আর সন্ধ্যের আলো-আঁধারে পদ্মার গালের টোল্ আরো রহস্যময় হয়ে উঠবে।

এগিয়ে চলো বোষ্টুমীপাড়া ছেড়ে, এগিয়ে চলো দ্বাদশ শিবের ভাঙ্গা মন্দিরের পেছনকার বাঁশবনের তলা দিয়ে—এগিয়ে চলো। চলতে চলতে একটা হৃষ্টপুষ্ট কুকুর যদি তোমার সঙ্গ নেয়, আর যদি দেখ তার একটা কানের রঙ্ কালো, তাহলে তাড়িয়ো না তাকে। ও' তোমাকে রাধা-শ্যামের মন্দিরের ফটক অবধি পৌছে দেবে ঠিক।

কুকুরটাকে অনুসরণ করো নির্ভয়ে। আর, যেতে যেতে শিবদাসের মুড়ি-মুড়কির দোকান থেকে লুকিয়ে কিনে নিয়ো চার পয়সার মুড়কি; কুকুরটা যেন ঠিক দেখতে না পায়। তারপর, কিছুক্ষণ হাঁটবার পর একটা টিউব্-কলের কাছে এসে কুকুরটা যখন দু-তিনবার অবোধ্য ভাষায় কি বলবার চেষ্টা কোরে বোসে পড়বে এবং তুমি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে ছোট্ট ছোট্ট ইঁটের একটা ভাঙ্গা থিলেন, তখন ঐ ঠোঙাটা খুলে মুড়কিগুলো ছড়িয়ে দিও কুকুরটার সামনে। ও' মুড়কি খেতে ভালবাসে কিনা—তাই বলছি।

এবার তুমি ঐ থিলেন দিয়ে ঢুকে পড়ো। ডানপাশেই দেখবে দেয়ালের গায়ে একটি বড় শ্বেতপাথরে লেখা আছে তাঁরই নাম, ১২৬৮ সালে রাধাশ্যামের এই মন্দিরটির যিনি সংস্কারসাধন করেছিলেন। কলিকাতার পটলডাঙ্গা নিবাসিনী আশ্চর্যময়ী দাসী তিনি। সেই শ্বেতপাথরের নিচে জুতোজোড়া খুলে রেখে খালি পায়ে অনেকগুলো নামের-পাথর মাড়াতে মাড়াতে এগিয়ে চলো।—রামনারায়ণ ঘোষাল, ব্রহ্মকিশোর শর্ম্মা, সুখময়ী দেবী, শশিবালা দাসী—তেরশ' দুই, বারশ' সাতান্ন, বারশ' সাতাশী, তেরশ' চুয়াল্লিশ!—চলতে চলতে যেখানে দেখবে একমাত্র শিশুপুত্রের আত্মার শান্তিকামনা করে বিধবা জননী গড়ে দিয়েছেন একটি পাথরের তুলসীমঞ্চ, সেইখানে দাঁড়িয়ে একবারটি তাকিয়ো সামনে। ঐখান থেকে নাটমন্দিরের থামের ফাঁক দিয়ে মূল-মন্দিরের রাধাশ্যামের বিগ্রহ ভারি সুন্দর দেখায় কিনা—তাই বলছি।

তারপর, ঐখানে দাঁড়িয়ে দেবতাকে তোমার প্রথম প্রণাম জানিয়ে উঠে যেয়ো মূল-মন্দিরের কালো পাথরের ঠাণ্ডা চত্বরে। আর একবার ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম জানিয়ো রাধাশ্যামকে, তারপর কেমন একটি আশ্চর্য্য সৌরভ-

মাখানো চরণামৃত পান কোরো ভক্তিভরে। একটু পরেই সুরু হবে আরতি। খুনখুনে এক কুঁজো বুড়ী এসে কাঁসর বাজাবে। আর, ওপাশে তাকালে দেখবে প্রায় ১১।১২ বছরের রোগা একটি মেয়ে—আদুড় গা—কেবল একটি ছেঁড়া ইজের আছে পরণে—রোদে কালো শীর্ণ পিঠটা দিয়ে বোসে দড়ি টেনে টেনে মস্তবড় একটা ঘণ্টা বাজাচ্ছে। এগিয়ে যেয়ো ঐ বাচ্চা কচি রুগ্‌নো মেয়েটার দিকে; তার হাত থেকে চেয়ে নিয়ো ঘণ্টার দড়িটা—তারপর নিজেই বাজিয়ো ঘণ্টা তালে তালে। মেয়েটা বড্ড রোগা কিনা, বড্ড কচি কিনা, আর রোদটাও বড় চড়া কিনা,—তাই বলছি।

শক্ত মোটা কাঠের একটা ফ্রেমে ঝোলানো সেই বড় ঘণ্টাটাকে বাজাতে বাজাতে যদি তোমার মনে হয় ঘণ্টাটার গায়ে কি যেন লেখা রয়েছে, তাহলে আরতির শেষে ঘণ্টাটার দিকে তাকিয়ো ভাল কোরে। দেখতে পাবে ঘণ্টার গায়ে খোদাই করা আছে দুটি নাম—সোঙ্গালি ও আঙ্গেলিকা।

রাধাশ্যামের এই জরাজীর্ণ প্রাচীন মন্দিরের চত্বরে এই অদ্ভুত একটি ঘণ্টা ঝুলতে দেখে যদি তোমার একটুও কৌতূহল হয় মনে—তাহলে কান পেতো ঐ ঘণ্টার মুখের কাছে। যদি পাতো, শুনতে পাবে সেই অশ্রান্ত সমুদ্রের দূরাগত কলধ্বনি, যে-সমুদ্র ছড়িয়ে রয়েছে পর্ত্তুগাল থেকে বাংলাদেশ অবধি। আর শুনতে পাবে একটি গল্প।

* * *

কাপ্‌তান্ পিমেন্তা প্রথম চোখ খুলেই দেখতে পেলে মাটির দেয়ালে টাঙ্গানো একটি পট;—বিরাট এক সর্পের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে নাচছে একটি অপরূপ সুন্দর কিশোর, হাতে বাঁশী, গায়ের রং আকাশের মত নীল।

পিমেন্তা ডান পাশ ফিরলে। মাটির ঘরের ছোট একটি জানলা, তারি ভিতর দিয়ে ভোরের বাতাসটুকু রাঙা আলো গায়ে মেখে ঢুকে পড়েছে ঘরে। দেখা যাচ্ছে একটি হিন্দু মন্দিরের চুড়ো। সুপ্তোত্থিত পাখীদের কলকাকলী ভরিয়ে তুলেছে ভোরের আকাশ।

বাঁ দিকে তাকালে পিমেন্তা। কাঠের একটি খোলা দরজা। তারি ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঝকঝকে কোরে নিকোনা একটি আঙিনা। মাঝখানে একটি মঞ্চে একটি চারা গাছ। যে-গাছ পিমেন্তা এদেশের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ীতেই দেখেছে। ঐ গাছকে এরা পুজো করে। সন্ধ্যায় আলো জ্বালে ঐ গাছের তলায়। নাম তুলসী।

আঙিনার ওপারে একটুখানি মাটির দাওয়া। তারি কোলে একটি খড়ো চালের ঘর। একটি কর্ম্মচঞ্চলা কিশোরী আনাগোনা করছে। দাওয়ার একধারে বোসে একটি প্রৌঢ় চক্ষু মুদে কি যেন আবৃত্তি করে চলেছেন আপন মনে।

উঠতে চেষ্টা করলে পিমেন্তা। পারলে না। মাথাটা পাথরের মত ভারী, পা-দুটোয় অসহ্য যন্ত্রণা, সারা দেহে অপরিসীম ক্লান্তি।

এ কোথায় এল পিমেন্তা?—পর্ত্তুগীজ জলদস্যু কাপ্‌তান্ পিমেন্তা শুয়ে শুয়ে ভাবতে চেষ্টা করলো—কি কোরে সে এখানে এল?

চাট্‌গাঁর কাছে ডিয়াঙ্গা বন্দর। সেইখান থেকেই তো আসছিল পিমেন্তা তার জাহাজে। বেশ মনে আছে তার, পথে ফ্রাঁসোয়া ফার্ণাদেজ্‌কে নামিয়ে দিয়েছে সে শ্রীপুরে—ডোমিনিক্ সোসাকে নামিয়েছে বাক্‌লায়—জাঁ আঁদ্রে বুএজ্‌কে নামিয়েছে চাঁদেকান্-এ। বেশ মনে আছে, ডোমিনিক্ সোসা সঙ্গে নিয়েছিলেন কয়েক ঝুড়ি বাছাই-করা 'অরেঞ্জেস্ ডি লা রেস্ ডি বেরিঙ্গান্'—বেরিঙ্গান্ কমলালেবু,—বাক্‌লার রাজা রামচাঁদকে উপহার দেবার জন্যে।

জেস্যুইট্ পাদ্রী ওঁরা। পর্ত্তুগাল্ থেকে বাংলাদেশে এসেছেন গীর্জে তৈরী করতে, এখানকার অসভ্য অশিক্ষিত লোকগুলোকে অন্ধকার থেকে খৃষ্টধর্ম্মের উদার আলোকে নিয়ে যেতে—আর সেইসঙ্গে এদেশের অন্ধকার খনির সোনাকে পর্ত্তুগালের আলোকিত সমুদ্রতটে স্তূপীকৃত করতে তো বটেই!

জাহাজ যখন প্রায় গোবিন্দপুরের কাছাকাছি এসে পড়েছে—পিমেন্তা তার কাম্‌রার ছাদে শুয়ে চোখ মেলে দিয়েছিল দু'ধারে। চমৎকার দৃশ্য দু'ধারের আলোকিত তটে। কোথাও ছাখো একদল ত্রস্ত হরিণ কোন্ অজানা আশংকায় ছুটেছে, কোথাও ছাখো চঞ্চল বানরগুলোর কলরবে দিবানিদ্রারত বৃদ্ধ বনদেবতার তন্দ্রা ভেঙ্গে যাচ্ছে বারবার, কোথাও ছাখো বনস্পতির উদারবক্ষে নিশ্চিন্তে

বৃহৎ মৌচাক গড়েছে অস্থির মৌমাছির দল, কোথাও ন্যাখো বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র তার স্বর্ণাঞ্চল বিছিয়ে দিয়েছে মধুর আলস্যে। দেখতে দেখতে কখন্ তন্দ্রা নেমে এসেছে পিমেন্তার চোখে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। পিমেন্তা চোখ মেলে দেখলে, তার ঘুমিয়ে পড়ার ফাঁকে কখন্ কোন্ অদৃশ্যহস্ত চারিদিকের সবকিছুকে ঢেকে দিয়ে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের একটা ঘন কালো রঙের পোঁচ্ টেনে দিয়েছে! কী বুকচাপা অন্ধকার!

দুপুরের অতখানি আলোর পরেই আচম্কা এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে জেগে উঠে পিমেন্তার যেন নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। চারপাশের ঘনান্ধকার যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলবে তাকে!

এ যে সেই অন্ধকার!—হুবহু সেই অন্ধকার!—এগারো বছর আগেকার সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার ঠিক তেমনি করে যেন এসে দাঁড়িয়েছে পিমেন্তার চোখের সামনে!

এগারো বছর আগে, সেদিনও এমনি যাচ্ছিল পিমেন্তা জাহাজে। সঙ্গে ছিল সোঙ্গালি—পিমেন্তার তরুণী পত্নী। আর ছিল ছোট্ট একটি ফুটফুটে শিশুকন্যা—আঞ্জেলিকা। আঞ্জেলিকা খেলা করছিল পিমেন্তার বিশাল বক্ষের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে।

তারপর?

সোঙ্গালির হাতের ছোঁয়ায় ঘুম ভেঙ্গে উঠে পিমেন্তা দেখেছিল এমনি মসীকৃষ্ণ অন্ধকার চারিদিকে। সেই অন্ধকারে সোঙ্গালি আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিল: আঞ্জেলি কই?

আঞ্জেলি?—আঞ্জেলি?—আঞ্জেলিকা?

আঞ্জেলিকাকে পাওয়া যায়নি সেদিন। সারা জাহাজ তোলপাড় কোরেও নয়। দু'পাশের গ্রাম তছ্নছ্ কোরেও নয়।

সোঙ্গালি পাগল হয়ে গিয়েছিল তারপর। বাঁধা থাকতো জাহাজে পিমেন্তার কাম্রায় লোহার শিকল দিয়ে। দশ বছর অমনি বাঁধা থাকবার পর গেল বছর মারা গেল সোঙ্গালি। যাবার সময় একটি অনুরোধ করে গেল পিমেন্তাকে: কোনো ধর্ম্মস্থানে আঞ্জেলির নামে একটা ঘণ্টা ঝুলিয়ে দিও। রোজ বাজবে সেই ঘণ্টা। তার আত্মার সদ্গতি হবে।

হতভাগিনী সোঙ্গালির সেই শেষ ইচ্ছা পূরণ করবার জন্যই তো এতদিনের দুর্দ্দান্ত দুর্দ্ধর্ষ দস্যু পিমেন্তা চাট্গাঁ থেকে চলেছিল হুগলী বন্দরের দিকে। সেখানে দু' বছর হল ব্যাণ্ডেল-গীর্জা তৈরী করেছিলেন ফাদার বিল্ললোবস্। সেই গীর্জেয় টাঙ্গাবার জন্যে পিমেন্তা সঙ্গে নিয়েছিল চাট্গাঁর বিখ্যাত কারিগরের তৈরী ঘণ্টা। তাতে উৎকীর্ণ দুটি নাম—সোঙ্গালি ও আঞ্জেলিকা। মা ও মেয়ে দুজনের আত্মাই শান্তি পাক্।

মাঝপথে এগারো বছর আগেকার সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারটা সামনে এসে দাঁড়াল। ঘিরে ধরল পিমেন্তার জাহাজকে।

কাপ্তান্ পিমেন্তা নিজের কাম্রায় ঢুকে ঢক্ ঢক্ কোরে বেশ খানিকটা মদ খেয়ে নিলে। কিন্তু তবু তো কৈ এগারো বছর আগেকার সেই মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনার স্মৃতি সরতে চাইছে না মন থেকে! আরো খানিকটা মদ ঢেলে দিলে গলায়। কিন্তু তবু যে শোনা যাচ্ছে উন্মাদিনী সোঙ্গালির আর্তনাদ: আঞ্জেলি কই?—আমার আঞ্জেলিকা?

নাঃ!—এই অন্ধকারটা কি পিমেন্তাকেও পাগল কোরে দেবে নাকি?

বন্দুকটা তুলে নিলে পিমেন্তা। অন্ধকারে দড়াম্ দড়াম্ কোরে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়লে কয়েকবার। কিন্তু তবু তো কৈ অন্ধকারের বুকচাপা মসীকৃষ্ণ পর্দ্দাটা ছিঁড়ল না!

উন্মাদিনী সোঙ্গালির হাত-পায়ের শিকলগুলোর আওয়াজ যেন শোনা যায়! যেন শোনা যায় দু' বছরের একটি তুলতুলে নরম শিশুকন্যার অস্ফুট কলকাকলি। যেন শোনা গেল, ভারী জলের ওপর একগোছা ফুলের তোড়া পড়বার মত একটি শব্দ—ঝুপ্!

পাগল হয়ে যাবে পিমেন্তা!

: আমার বোট্ নামাও।—চীৎকার কোরে হুকুম দিলে পিমেন্তা মাল্লাদের।

বোট্ নামলো। সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে একা সেই ছোট্ট বোটে উঠে দুটো সবল পেশীবহুল হাতে দাঁড় টেনে

জাহাজকে পেছনে ফেলে কোথায় এগিয়ে গেল পিমেন্তা। জাহাজটার মতো এগারো বছর আগেকার সেই দুর্ঘটনার স্মৃতিটাকেও যে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায় সে!

হঠাৎ সমস্ত অন্ধকারকে চিরে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা বিদ্যুৎরেখা চকিতের জন্যে ঝল্‌সে উঠলো। মেঘ ডেকে উঠলো গুড় গুড় কোরে। তারপরেই দৈত্যের মতো এল ঝড়।

তারপর?

আর মনে পড়ছে না কিছু পিমেন্তার।

তারপরেই চোখ মেলে দেখলে, এই এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিতা একটি ছবির মতো সুন্দর পরিচ্ছন্ন মাটির কুটীরে শুয়ে আছে সে।

আবার বাঁদিকে তাকালে পিমেন্তা। সেই প্রৌঢ়ের আবৃত্তি থেমে গেছে তখন। আর সেই কর্ম্মচঞ্চলা কিশোরীটি ফুলের সাজি নিয়ে চলেছে কোথায়।

: এই।

ভারী গলায় চীৎকার কোরে উঠলো পিমেন্তা।

দৌড়ে ছুটে এল কিশোরীটি। পরণে গরদের শাড়ী। হাতে ফুলের সাজি। এই সকালেই স্নান হয়ে গেছে। সাজিতে চাঁপা ফুল। যেন তারি রঙ্‌ তার সর্ব্বাঙ্গে—তারি সুবাস তার ভিজে চুলে। হাসি-হাসি মুখে বললে: কি গো? ঘুম ভেঙ্গেছে?—একটু অপেক্ষা করো। আমি এই ফুল কটা মন্দিরে দিয়ে আর একটু চন্দন ঘষে দিয়েই আস্‌ছি। য়্যাঁ?

চন্দন ঘষে দিয়েই মেয়েটি আসতো ঠিকই, কিন্তু বাধা দিলে সুদাম। রাধাশ্যামের মন্দিরের পূজারী শ্রীধর—তারই ছেলে। ডাকলে : এই।

: কি?

: চলে যাচ্ছিস যে বড়ো?—যাবি না আজ পদ্ম তুলতে?

: না।

: না কেন?

: বাড়ীতে আমার রুগী রয়েছে যে একটা।

: রুগী?—তোর রুগী?—হরিশ জ্যাঠার জায়গায় তুইই বুঝি কোব্‌রেজী করছিস আজকাল?

: করছিই তো। বাতের ব্যথা হয়ে থাকে তো বলো, 'হীরকদ্যুতি' পাঠিয়ে দেবখন তিন পুরিয়া।

বলতে বলতে হেসে ওঠে মেয়েটি। কথায় কথায় হাসে ও'। হরিণীর মতো চঞ্চল। নাম রাধারাণী।

সুদাম বলে: রুগী যাবে কখন্‌?

রাধা বলে: যাবে কি গো? যাবার জো আছে নাকি তার? কাল রাতে রাখালদা যখন ওপার থেকে ফিরছিল, দেখলো একটা মানুষ ভেসে যাচ্ছে। তাই তুলে নিয়ে এল বাবার কাছে। সেরে উঠতে এখনো ছ'-সাত দিন তো বটেই।

একটু থেমে বলে রাধা: লোকটা কিন্তু আমাদের জাতের নয় সুদামদা—হার্ম্মাদ্।

হার্ম্মাদ্!—শুনেই শিউরে ওঠে সুদাম। এ নাম শুন্‌লেই কেঁপে ওঠে বুক।

: হার্ম্মাদ্ কিরে!

: হাঁ, সত্যিকারের জ্যান্তো হার্ম্মাদ্। এই বড় চেহারা, এই বড় নাক, কটা চোখ, লাল চুল। বুকখানা কতবড়ো জানো সুদামদা—ঐ বুকের ওপর বালিস পেতে আমি ঘুমোতে পারি দিব্যি। গলায় মস্ত একটা সোনার চেন, আর তাতে ঝুল্‌ছে একটা যিশুখৃষ্টের ক্রশ্‌।

: তুই যাস্ নি যেন ওর কাছে।—সাবধান কোরে দেয় সুদাম: মানুষ খুন করা ওদের স্বভাব। শুধু শুধু মানুষকে মেরে ওরা মজা পায়।

: মারবার ক্ষমতাই নেই ওর। নড়তেই পারবে না এখন তিন দিন। তাছাড়া ওর কোমরবন্ধ থেকে মস্তবড় ছোরাটা কাল রাত্রেই খুলে নিয়েছে রাখালদা।—লোকটা জেগে উঠেছে একটু আগে। আমাকে ডাকছিল। চলো না সুদামদা, গল্প করি একটু হার্ম্মাদের সঙ্গে।

: বাপ্‌রে!—শিউরে ওঠে সুদাম: হার্ম্মাদের সঙ্গে খোশ্‌গল্প? আমি ওর মধ্যে নেই।

পালায় সুদাম। আর, মনে মনে রাধারাণীর আসন্ন বিপদের কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। রাধা একাই দৌড়ে আসে নিজেদের বাড়ীতে।

ততক্ষণে রাখাল গরম চা খাইয়েছে পিমেন্তাকে। তারপর রাধারাণীর বাবা হরিশ কবিরাজকে ধরে ধরে এনে বসিয়ে দিয়েছে পিমেন্তার বিছানার পাশে।

অন্ধ হরিশ কবিরাজ। রাখালই তার ডান হাত। নামেই চাকর; আসলে ছেলেরই মতন। বিপত্নীক হরিশ কবিরাজ ঐ একটিমাত্র কন্যা রাধারাণীকে নিয়ে দিন কাটান।

হরিশ কবিরাজ নাড়ি দেখেন পিমেন্তার। ওষুধ দেন। বলেন: ভয় নেই, তিন দিনেই ভাল হয়ে উঠবে।

রাধারাণী আসে। কিশোরী রাধারাণী। এসে বসে পিমেন্তার শয্যাপ্রান্তে। প্রচণ্ড কৌতূহল ওর এই হার্ম্মাদদের সম্বন্ধে। বড় বড় ডাগর চোখ তুলে বলে: আচ্ছা, সেই কোন্ দূর দেশ থেকে কত কষ্টে সুমুদ্দুর পেরিয়ে আসো তোমরা—তা মানুষের সঙ্গে ভাব না কোরে এমন কোরে তাদের মারো কেন? মানুষের সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে করে না তোমার?

কোন জবাব খুঁজে পায় না পিমেন্তা। এই কিশোরী মেয়েটার কাছে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় তার—বড় যেন ছোট—বড় যেন দুর্ব্বল।

রাধা বলে: এতদিন দূর থেকেই শুনেছি তোমাদের কথা। আমাদের এখানে এর আগে কখনো কোন পর্ত্তুগীজ আসেনি তো। ভেবেছিলুম, নিশ্চয়ই তোমাদের চেহারায় কোন একটা বড় রকমের তফাৎ আছে আমাদের সঙ্গে। এখন দেখছি, তোমরা তো ঠিক আমাদেরই মতো। তবু তোমরা আমাদের মতো ভাল নও কেন বলতো?

উত্তর দেওয়ার চেষ্টাও করে না পিমেন্তা।

এদিকে ঘরের বাইরে জমে গেছে কৌতূহলী ছেলের দল। সুদাম তাদের মাঝখানে। ভয়ে ভয়ে উঁকি মারছে তারা ঘরের মধ্যে, আর রাধারাণীর দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে।

ওদের দেখতে পায় রাধা। চুপি চুপি বলে: ওরা তোমাকে দেখতে এসেছে হার্ম্মাদ্। ভয়ে সেঁধুতে পারছে না। ঐ যে ফর্সা ছেলেটাকে দেখছো—ঐ যে যার মাথায় কোঁকড়া বাবরি চুল—ওরই নাম সুদাম। ওতে আর আমাতে রোজ পদ্ম তুল্তে যাই রাধাশ্যামের মন্দিরে দেবার জন্যে। বড্ড ভাল ছেলে। ডাকবো?

উত্তরের অপেক্ষা না কোরেই এক ছুটে ঘরের বাইরে গিয়ে সুদামকে হাত ধোরে টেনে আনে রাধা। বাকি ছেলেরা পালায়। সুদামকে জোর কোরে পিমেন্তার শয্যার এক পাশে বসিয়ে দিয়ে রাধা বলে: ওগো হার্ম্মাদ্, চুপচাপ বোবার মতন শুয়ে না থেকে সুমুদ্দুরের গল্প বল না শুনি।

সুমুদ্রের গল্প জমে ওঠে। দুস্তর পারাবারের গল্প। অবাক হয়ে শোনে সুদাম আর রাধা পাশাপাশি বোসে। বেশ লাগে পিমেন্তার। এমন কোরে এর আগে কাউকে গল্প বলেনি সে কোনদিন। নিশ্চিন্তে গল্প বলবার নিরুদ্বেগ অবসর ছিল কোথায় পিমেন্তার? আর, এমন কোরে গল্প শোনবার শ্রোতাই বা সে পেয়েছে কবে?

সংসার-বিমুখ ছন্নছাড়া পিমেন্তার মনে হয়, এমনি একটি শান্তির সংসারের কর্ত্তা হয়ে ছেলেপুলেদের কোলের কাছে টেনে নিয়ে গল্প বলতে পারলে বেশ হোত।

গল্পের মাঝখানে অন্ধ হরিশ কবিরাজের আবির্ভাব হয় আবার। হেসে বলেন: ওরে বাঁদরী, মানুষটাকে বকাচ্ছিস বুঝি তখন থেকে?—পালা।

পালায় রাধা। পালায় সুদাম। যাবার সময় পিমেন্তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে রাধা ফিস্‌ফিসিয়ে জানায়: বাবা চলে গেলে আবার আসবো আমরা। তখন আবার গল্প বলতে হবে কিন্তু।

পিমেন্তা ঘাড় নেড়ে জানায়—নিশ্চয়ই।

সন্ধ্যে হয়। বেজে ওঠে রাধাশ্যামের মন্দিরে আরতির শঙ্খ-ঘন্টা-কাঁসর। ঘরের ভেতর একা শুয়ে শুয়ে শোনে পিমেন্তা।

একটু পরেই রাধারাণী এসে ঢোকে। হাতে একটি তাম্রপাত্র। পিমেন্তার শিয়রের কাছে হাঁটু গেড়ে বোসে বলে: হাঁ করো গো হার্ম্মাদ্।

: কি হবে?

: খাবে। আবার কি হবে! চন্নামেত্তর খেতে হবে না বুঝি? শুধু বুঝি বাবার ওষুধেই ভাল হয়ে যাবে তোমার শরীর? তাহলে আর ভাবনা ছিল না। নাও, হাঁ করো।

হাঁ করে পিমেন্তা। রাধা বিন্দু বিন্দু কোরে চরণামৃত ঢেলে দেয় মুখে অতি সন্তর্পণে। তারপর সিক্ত পুষ্পটিকে ছুঁইয়ে দেয় পিমেন্তার মাথায়, বুকে।

বাধা দেয় না পিমেন্তা। একরত্তি একটা কিশোরীর কাছে দুর্দ্দান্ত একটা বন্য সিংহ যেন কোন্ যাদুবলে পোষা বিড়ালটির মতোই শান্ত নিরীহ হয়ে উঠেছে।

সারারাত ধরে গল্প চলে ওদের। রাধা শোনায় তাদের রাধাশ্যামের মন্দিরের অলৌকিক সব কাহিনী—পিমেন্তা শোনায় সমুদ্রের। পাশের ঘর থেকে অন্ধ হরিশ কবিরাজ বলেন: হ্যাঁরে বাঁদরী, নিজেও ঘুমোবিনি, অসুস্থ মানুষটাকেও ঘুমোতে দিবিনি?

রাধা বলে: হার্ম্মাদ্ যে থাকবে না বেশিদিন এখানে। সেরে উঠেই যে চলে যাবে। রাত জেগে না শুনলে সব গল্প শেষ হবে কি কোরে?

পিমেন্তা বলে: আর যদি না যাই? যদি থেকেই যাই এখানে?

: কেন মিথ্যে বলছো বাপু?—ঘাড় বেঁকিয়ে অভিমানের সুরে বলে রাধা: ঘুম পেয়ে থাকে তো ঘুমোও না তুমি—বাধা দিচ্ছে কে?—হাত বুলিয়ে দেব কপালে? বাবাকে যেমন দিই ঘুম পাড়াবার জন্যে?—বোলে, উত্তরের অপেক্ষায় না থেকেই রাধা তার নরম মিষ্টি হাত বুলিয়ে দেয় পিমেন্তার কপালে। ক্লান্ত দস্যু ঘুমিয়ে পড়ে কখন্ এক সময়।

ঘুম ভাঙ্গে প্রায় অর্দ্ধ-রাত্রে। ওঠবার ক্ষমতা নেই। পা-দুটোয় অসহ্য ব্যথা। ঘোর-লাগা চোখে তাকিয়ে থাকে পিমেন্তা একা ঘরে। মাত্র একটা দিন তো এসেছে সে এখানে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন রাধারাণীর সঙ্গে ওর কতদিনের জানাশোনা। অদ্ভুত মেয়েটা!

হঠাৎ জানলা দিয়ে দেখা যায় দূরে একটা মশালের আলো। আলোটা যেন ধীরে ধীরে কাছে আসছে। যেন পিমেন্তারই ঘরের দিকে। এত রাতে কে আসে?

: আমি কোয়েল্-হো কাপিতান্।—

সেলাম কোরে দাঁড়ায় কোয়েল্-হো। পিমেন্তার সহকারী।

চাপা সুরে ধম্‌কে ওঠে পিমেন্তা: আস্তে কথা ক' কোয়েল্-হো—ওঘরে ঘুমোচ্ছে সবাই।

কোয়েল্-হো এবার ফিস্‌ফিসিয়ে বলে: এই গ্রামেরই একজন ঠিকানা বাৎলে দিলে আপনার। আপনাকে কি এরা আট্‌কে রেখেছে এখানে?

আট্‌কে!—ম্লান হাসে পিমেন্তা।—হ্যাঁ, আট্‌কেই রেখেছে বটে!—ঐ রাধারাণী তার কিশোর-মনের সরল ভালবাসা দিয়ে বেঁধে ফেলেছে যেন পিমেন্তাকে এক দিনেই। যাদু জানে এদেশের মেয়েরা—শুনেছিল পিমেন্তা। মানুষকে নাকি ভেড়া কোরে রেখে দেয়। ঐ একরত্তি মেয়েটাও ভালবাসা দিয়ে একেবারে বেঁধে রাখবে নাকি শেষকালে দুর্দ্ধর্ষ পিমেন্তাকে? ভুলিয়ে দেবে নাকি উত্তাল জলধির দুরন্ত আহ্বান?—পর্ত্তুগীজ দস্যু কি শেষ অবধি বাঙালী গেরস্থর মতো ঘরে বোসে বোসে পরকালের পারাণীর কড়ি গোছাবে নাকি?

পিমেন্তা বললে: আমায় তুলে নিয়ে যেতে পারবি কোয়েল্-হো জাহাজ অবধি? তাহলে এখনি চলে যাই এখান থেকে।

সকালের আলো ফোটবার আগেই পালাতে চায় পিমেন্তা। নৈলে, সকাল হলেই রাধারাণী এসে হাজির হবে। আর তখন, কি জানি, যাওয়া সম্ভব হবে কি না পিমেন্তার!—তাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে সে।

: যাবার সময় একটাও ঘর পোড়াবো না? একটা কাউকে খুন করবো না কাপিতান্?—প্রশ্ন করে কোয়েল্-হো।

: কিছু না।—শুধু চুপি চুপি পালিয়ে যাব আমরা। কেউ জানতে না পারে।

: কাকে তোমার এত ভয় কাপিতান্?—কাপিতান-এর চোখে মুখে এতখানি ভয় এর আগে কোনোদিন দেখেনি কোয়েল্-হো।

: ভয়?—হাঁপায় পিমেন্তা: আয়, কাঁধটা এগিয়ে দে।

কোয়েল্-হোর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় পিমেন্তা অতি কষ্টে। তারপর কি ভেবে বলে: যাবার আগে আমাকে একবার ঐ ঘরে পৌঁছে দিতে পারবি কোয়েল্-হো চুপিচুপি?

কোয়েল্-হো পৌঁছে দেয় পিমেন্তাকে সেই ঘরে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে রাধারাণীর কচি মুখে। শয্যায় পাশাপাশি ঘুমোচ্ছে পিতাপুত্রী পরম শান্তিতে। একদৃষ্টে ঘুমন্ত রাধারাণীর পবিত্র মুখটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পিমেন্তা গলা থেকে খুলে ফেলে মস্ত সোনার চেন্‌টা। তারপর ধীরে ধীরে ঘুমন্ত রাধারাণীর প্রসারিত করকমলে উপহার দেয় সেই সোনার হারছড়াটি।

কিন্তু একি!—রাধারাণীর ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলটি নেই কেন? চম্‌কে ওঠে পিমেন্তা। মনে পড়ে যায় অনেকদিন আগেকার একটি ঘটনা।

আঞ্জেলিকা তখন সবেমাত্র হামা টান্‌তে শিখেছে। এক

দিন হামা টানতে টানতে কখন্ যে পিমেন্তার ছোরাটাকে টেনে নিয়েই খেলা করতে সুরু করে দিয়েছে সে, টেরই পায় নি কেউ। আচম্‌কা মেয়ের কান্নায় পিমেন্তা ফিরে দেখলে ধারালো ছোরায় ডান হাতের কড়ে আঙুলটি কেটে গেছে আঞ্জেলিকার।

ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে থাকে পিমেন্তার। দেয়াল ধোরে ধোরে বাইরে এসে কোয়েল্-হোকে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে: বাপ্‌টাকে তুলে আনতে পারিস্ মেয়েটার পাশ থেকে? যেন টের না পায় মেয়েটা। মুখে হাত চাপা দিয়ে নিয়ে আসিস্—যেন চেঁচাতে না পারে।

ঘুমন্ত হরিশকে তুলে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় কোয়েল্-হো পিমেন্তার সামনে। উত্তেজিত পিমেন্তা চেপে ধরে হরিশ কবিরাজের কামিজ: তোমার মেয়ের হাতের আঙুল কাটলো কি কোরে কবিরাজ?

অন্ধ হরিশ চম্‌কে ওঠেন!—কেন?—একথা কেন?

: সত্যি কথা বলো কবিরাজ। তোমরা তো সত্যি বৈ মিথ্যে বলোনা শুনেছি। তোমাদের ঐ মন্দিরের ভগবানের দিব্যি। রাধারাণী······

: আমার মেয়ে নয়।—অন্ধ হরিশের ভেতর থেকে আর একজন কেউ যেন জবাব দেয়। সম্পূর্ণ অন্য কণ্ঠ!

: নয়!!—উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে পিমেন্তা: তবে বলো, ওকে কি পেয়েছিলে আমারই মত নদীর জলে?

: হ্যাঁ।

: দশ বছর আগে?

: হ্যাঁ।

: ওর গলায় একটা লকেট্ ছিল কি?

: ছিল।

: তাতে লেখা ছিল, সোঞ্জালি?

: হ্যাঁ। তখন আমি অন্ধ ছিলুম না।

: তারপর?

আর নয়। আর কিছু বলতে পারবেন না অন্ধ হরিশ। দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে তাঁর হুহু কোরে।

দু'পায়ের সমস্ত যন্ত্রণাকে উপেক্ষা কোরে পিমেন্তা টল্‌তে টল্‌তে এসে দাঁড়ায় আবার ঘরের মধ্যে। ঘুমোচ্ছে রাধারাণী। চাঁপার মতো রং। পরণে বৃন্দাবনী ছাপা শাড়ী। প্রসারিত করপল্লবে জড়ো করা রয়েছে পিমেন্তার সেই মস্ত সোনার চেন্‌টা।

ঐ তার আঞ্জেলিকা?—ঐ?

অন্ধকারে দাওয়ায় একা দাঁড়িয়েছিলেন অন্ধ হরিশ। চোখের জল বাধা মানছে না। এখনি তো পিমেন্তা নিয়ে যাবে তার মেয়েকে তুলে। তারপর? কী নিয়ে থাকবেন অন্ধ হরিশ? কী নিয়ে বাঁচবেন? কি কোরে বাঁচবেন?

পিমেন্তা এসে দাঁড়ায় অন্ধ হরিশের পাশে। ধরা ধরা গলায় ডাকে: কবিরাজ?

চম্‌কে ওঠেন হরিশ: ও, নিয়ে যাচ্ছ তোমার মেয়েকে? এখনি?

: না কবিরাজ। তোমার মেয়েকে তোমার কাছেই রেখে যাচ্ছি।—একটা পবিত্র দৈববাণীর মত শোনায় যেন পিমেন্তার কণ্ঠস্বর!

পরের জিনিষ কেড়ে নেওয়াতেই যার আনন্দ—পরের প্রাণ হরণেই যার স্ফূর্তি—আজ তার নিজের জিনিষ সে স্বেচ্ছায় পরকে দান কোরে যাচ্ছে!

: কবিরাজ, আঞ্জেলি তোমার রাধারাণী হয়েই থাক্। ভেবেছিলুম তুলে নিয়ে যাবো ওকে আমার জাহাজে; কিন্তু নিলুম না। তোমার জন্যে নয় কবিরাজ—অতখানি ভাল লোক ভেবো না আমায়। আমার আঞ্জেলির জন্যেই।—আজ বারো বছর তোমার এখানে থেকে ও' তোমাদেরই মতন হয়ে উঠেছে। এই রাধাশ্যামের মন্দিরকে ঘিরে ও' একটা আলাদা দুনিয়া গড়ে তুলেছে। ঐ সুদাম, এই তুমি, ঐ মন্দির, ঐ পদ্মদীঘি, এসব থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে ও' বাঁচবে না। তাই ওকে তোমার কাছেই রেখে গেলুম কবিরাজ। আমি আর দাঁড়াবো না কবিরাজ। কেড়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের স্বভাব কিনা—যদি তোমার রাধারাণীকে তার ঐ রাধাশ্যামের মন্দির থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে কোন্ সময়?

আমি চললুম কবিরাজ। যাবার আগে তোমার কাছে আমার একটা আর্জি আছে—রাখবে?

জাহাজে পৌঁছে একটা ঘণ্টা পাঠিয়ে দেব তোমায়। তোমাদের ঐ রাধাশ্যামের মন্দিরের কোথাও ঝুলিয়ে দিও ঐ ঘণ্টাটা, আর তোমার রাধারাণীকে বোলো রোজ একবার কোরে যেন বাজায় ঘণ্টাটাকে। রাখবে কবিরাজ আমার এই অনুরোটা?

অন্ধ হরিশ জড়িয়ে ধরেন কাপ্‌তান্ পিমেন্তার হাত দুটো গভীর আবেগে। ঝরঝর কোরে গড়িয়ে পড়ে চোখের জল।

: ডাকবো না একবার তোমার আঞ্জেলিকে? যাবার আগে কথা বলে যাবে না দুটো?—অন্ধ হরিশ আর্দ্রকণ্ঠে বলেন।

: পাগল!—শিউরে ওঠে পিমেন্তা: পাগল নাকি! পাগল নাকি!—সে হয় না, সে হয় না, সে কিছুতেই হয় না!

কোয়েল্-হোর কাঁধে ভর দিয়ে অন্ধকারে মিশিয়ে যায় কাপ্‌তান পিমেন্তা।

* * *

পিটুলীর রাধাশ্যামের মন্দিরে সেই থেকে বাজছে ঘণ্টাটা!

আগাছা

রায়বাহাদুর রাজেশ্বর দাশগুপ্ত আই-এ-এস, এম-আর-এ-এস (ইংলণ্ড)

আগাছা যে কৃষকের কত বড় শত্রু তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। ইহা বহুপ্রকারে ফসলের ক্ষতি করে এবং ক্ষেত্রে একবার ছড়াইয়া পড়িলে ইহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যে কিরূপ শক্ত তাহা কৃষকমাত্রেই জানেন। যে কোন গাছই অস্থানে অর্থাৎ অন্যান্য গাছের সঙ্গে—যেখানে তাহা অপ্রয়োজনীয় সেখানে—জন্মিলে তাহাকে আগাছা বলিয়া অভিহিত করা হয়। এমন কি আমরা বহু পরিশ্রমে যে সকল ফসলের চাষ করি, সে সকল ফসলের গাছও যদি অন্য ফসলের ক্ষেতে জন্মায় তাহাকেও আমরা আগাছা বলি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—বেগুনের ক্ষেতে ধানগাছও আগাছা বলিয়া গণ্য হয়।

গাছ যেমন বর্ষজীবী, দ্বিবর্ষজীবী, বহুবর্ষজীবী হইতে পারে, আগাছাও তেমনি তিন শ্রেণীরই হইতে পারে।

আগাছাকৃত কুফল বা অনিষ্ট

আগাছা যে কতপ্রকারে ফসলের অনিষ্টকরে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। নিম্নলিখিত কুফলগুলিই প্রধানতঃ দেখা যায়ঃ—

(১) আগাছা ক্ষেত্রের অনেকখানি স্থান অযথা অধিকার করিয়া থাকে। ফলে সেখানে আর চাষের ফসলের গাছ জন্মিতে পারে না এবং স্বভাবতঃই ফলন কমিয়া যায়। এই আগাছাগুলি ফসলের আলোবাতাস বহুল পরিমাণে আটকাইয়া দেয় এবং তাহাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে দেখা যায় তণ্ডুলজাতীয় শস্যের ক্ষেত্রে বর্ষজীবী আগাছা বহুল পরিমাণে জন্মাইলে গাছগুলি দীর্ঘ, ক্ষীণ ও পাণ্ডুর (Etiolated) হইয়া পড়ে, আলোর অভাবে এইসকল গাছের ফেঁকড়ী বাহির হইতেও দেরী হয়। আগাছাগুলি আলো বাতাস এবং উষ্ণতা আটকাইয়া, যে সকল ফসল ধীরে ধীরে বাড়ে যথা—গাজর (Carrot) ইত্যাদি এবং লুসারণ প্রভৃতি কতকগুলি পশুখাদ্যজাতীয় ফসলের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি করে। শেষোক্ত ফসলগুলি এবং অন্যান্য অনেক ফসলের অঙ্কুরোদ্গম হইতে যথেষ্ট সময় লাগে এবং পরে চারাগুলিও খুব বেশী বড় হয় না। এই সময় ঠিকমত যত্নের অভাবে, হাপরে আগাছাগুলি এই ক্ষুদ্র চারাগুলিকে অনেক সময় ছাপাইয়া উঠে এবং ইহার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চারাগুলি আর পরে স্বাভাবিকভাবে বাড়িতে পারে না। তবে যে সকল গাছ বেশ বড় হয় এবং তাড়াতাড়ি বাড়ে তাহাদের ক্ষেত্রে আগাছাগুলি তত ক্ষতি করিতে পারে না। তবে আগাছা কতখানি ক্ষতি করিবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে, আগাছা কি জাতীয় তাহার উপর—কারণ কতকগুলি আগাছা আছে যাহারা খাড়াভাবে বাড়িতে থাকে এবং আলোবাতাস আটকায়, আবার কতকগুলি আছে যাহারা খাড়া হয় না, মাটির উপরেই চারিদিকে বিস্তৃতি লাভ করে এবং শস্যের অনেকখানি স্থান হানিকরভাবে অধিকার করিয়া থাকে। আবার কতকগুলি আগাছা আছে যাহারা শস্যের গাছগুলিকে জড়াইয়া বাড়িতে থাকে এবং ঠিকমত আলো-বাতাস লাভ করিবার জন্য গাছটিকে এমনভাবে জড়াইয়া থাকে, যে উহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি আটকাইয়া যায়। অনেকগুলি আগাছা যথা—হ্যাকুটা, শস্যের গাছটিকে ঠিক জড়াইয়া না উঠিয়া আকর্ষী বা আঁকড়ি (Tendril) কাঁটা প্রভৃতির সাহায্যে গাছটি আশ্রয় করিয়া বাড়িতে থাকে; ফলে অনেক সময় আশ্রয়টি দুর্ব্বলকাণ্ড হইলে, যেমন তণ্ডুলজাতীয় শস্যের গাছ, উহা আগাছার ভারে পড়িয়া যায়।

(২) আগাছা যে শুধু আলোবাতাস আটকায় তাহাই নহে, শস্যটিকে বহুলপরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও সার হইতেও বঞ্চিত করে। ইহা ছাড়াও ইহারা যে বহুবিস্তৃত মূলপ্রশাখা দ্বারা শস্যের বৃদ্ধি কল্পে জমিতে প্রদত্ত সারের বহুনাংশ গ্রহণ ক'রে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। আগাছাগুলি আবার মাটি হইতে জলগ্রহণ করে; ফলে মাটি শুষ্ক হইয়া পড়ে এবং চাষের শস্য প্রয়োজনীয় জলের অংশ হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শস্যের অপরিণতি এবং স্বল্প ফলনের জন্য আগাছাগুলি বহুলাংশে দায়ী। দেখা গিয়াছে যে, আগাছার উৎপাতে অনেক শস্যের স্বাভাবিক ফলন প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে।

(৩) অনেক সময় ঠিকভাবে হো দ্বারা বা অন্যভাবে, আগাছা তুলিয়া ফেলিলেও তাহারা ধান ইত্যাদি শস্য কাটিবার সময় কাটা পড়ে এবং মাড়াইয়ের সময় উহাদের বীজ শস্যের সঙ্গে মিশিয়া যায়। এইরূপে আগাছার বীজ মিশ্রিত থাকার ফলে যে কিরূপ অনর্থের সৃষ্টি হয় তাহার উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, গমের সহিত আগাছার বীজ মিশ্রিত থাকিলে উহা হইতে ময়দার রং আর সাদা থাকে না, কালো বা ঐরূপ রং হইয়া যায়; ইহা ছাড়া অনেক সময় উহাতে বিশ্রী গন্ধের সৃষ্টি হয় ও স্বাদ নিকৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া বপনের সময় শস্যের বীজের সঙ্গে আগাছার বীজ মিশ্রিত থাকিলে ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে আগাছা জন্মাইবার আশঙ্কা থাকে। এই সকলের জন্যই শস্যের সহিত আগাছার বীজ মিশ্রিত থাকিলে উহার দাম অনেক কমিয়া যায়।

(৪) কতকগুলি আগাছা আবার গাছের উপর পরগাছারূপে বিরাজ করে। অর্থাৎ ইহারা মাটি হইতে খাদ্য সংগ্রহ না করিয়া গাছের কাণ্ডের ভিতর শোষণমূল প্রবেশ করাইয়া গাছের সংগৃহীত খাদ্য গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করে। স্বর্ণলতা, বেণে বৌ প্রভৃতি এই জাতীয় আগাছা।

(৫) উপরিউক্তরূপে ছাড়াও শস্যের পোকা, ক্ষতিকর পরগাছা ও অন্যান্য শত্রুর আশ্রয়স্থল রূপেও আগাছাগুলি শস্যের যথেষ্ট ক্ষতি করে।

(৬) অনেকগুলি আগাছা থাকে বিষাক্ত এবং পশ্বাদির পক্ষে

মারাত্মক হয়। আবার কতকগুলি আছে, যেগুলি গরুতে খাইলে দুগ্ধের স্বাদ নিকৃষ্ট হইয়া যায় এবং বিশ্রী গন্ধযুক্ত হয়। যেমন—বুনো রসুন।

আগাছা কিরূপে ছড়ায়

(১) অধিকাংশ আগাছার বীজই অজ্ঞাতে কোনক্রমে উপ্ত হইয়া ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়ে। সুবিধা পাইলে সকল আগাছাই বীজ প্রদান করে; তন্মধ্যে বর্ষজীবী ও দ্বিবর্ষজীবী আগাছাগুলিরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীজ জন্মায়। আগাছার বীজও সাধারণ গাছের বীজের ন্যায় নানাভাবে ছড়াইয়া পড়ে।

(২) সাধারণ ভাবে ছাড়াও শস্যের বীজের সহিত মিশ্রিতভাবে আমাদের নিজেদের অজ্ঞাতে আমরা অনেক সময় আগাছার বীজ বপন করি।

(৩) অনেক সময় আমরা আগাছাগুলি পরিষ্কার করিয়া গোবর ও অন্যান্য সারের গাদার উপর ফেলিয়া দিই—মনে করি রাসায়নিক বিকৃতি সন্ধান (Fermentation) জনিত তাপে উহার বীজগুলির অঙ্কুরণ ক্ষমতা বিনষ্ট হইবে। ইহার ফলে বহু আগাছার বীজ বিনষ্ট হয় সত্য, কিন্তু অনেক বীজই অবিকৃত থাকিয়া যায় এবং সেই সার যখন ক্ষেত্রে ছড়ানো হয় তখন তাহা হইতে আগাছা পুনরায় জন্মাইয়া অশেষ দুর্গতির সৃষ্টি করে। বহুক্ষেত্রে কোনও আগাছাকে অপরিণত অবস্থায় মাটি হইতে উপড়াইয়া ফেলিলে, মাটির সংস্পর্শ বিনাই উহার বীজগুলি পাকিয়া যায়। দ্বিবর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী আগাছাগুলির পরিপুষ্ট কাণ্ডে ও মূলে বহু খাদ্য সঞ্চিত থাকে এবং সেই সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ করিয়া এরূপ ঘটে। এই আগাছাগুলিকে সারের গাদার উপর ফেলিলে প্রকারান্তরে ইহাদের বংশধরকেই ক্ষেত্রে পুনঃ সংস্থাপিত করা হয়।

গোয়ালের আবর্জ্জনায় (Litter) অনেক সময় আগাছা ও তাহার বীজ থাকে এবং তাহাই গোবরের সহিত মিশ্রিত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। অনেক বীজেরই বাহিরের খোসা যথেষ্ট কঠিন থাকে। এই সকল বীজ অনেক সময়ে ভুষি, খড় ইত্যাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া গোমহিষাদি এইগুলি পরিপাক করিতে পারে না—ফলে ইহারা অবিকৃত অবস্থায় গোবরের সহিত বাহির হইয়া আসে ও উপরিউক্ত ভাবে ছড়াইয়া পড়ে।

আগাছার প্রতিকার

আশানুরূপ ফসল উৎপাদনের পক্ষে একটি প্রধান অন্তরায় আগাছা। সুতরাং আগাছার প্রতিকার কৃষকের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা।

ঠিকমত আগাছার প্রতিকার করিতে হইলে আগাছাগুলির—জীবন-বৃত্তান্ত বংশবিস্তারপ্রথা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আগাছা বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং তাহাদের বৈসাদৃশ্যও প্রচুর। সুতরাং বিভিন্ন প্রকারের আগাছার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে সঠিক উপায় উদ্ভাবন করিয়া আগাছার প্রতিকার করা সম্ভব হয়। তবে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট সাফল্যের সহিত আগাছার প্রতিকার করা যায়।

(১) যাহাতে আগাছাগুলি বীজধারণ করিতে না পারে এবং বীজগুলি কোনক্রমেই যাহাতে জমিতে পড়িতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অর্থাৎ পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বেই আগাছাগুলিকে বিনষ্ট করিতে হইবে এবং যত ছোট থাকিতে বিনষ্ট করা যায় ততই সুবিধা। কতকগুলি বর্ষজীবী আগাছা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এমন কি পত্রোদ্গমেরও পূর্ব্বে পুষ্প ও বীজধারণ করে। শুধু Inflorescenceটি কাটিয়া ফেলিলেই ইহাদের বিনাশ হয় না, সমগ্র গাছটিরই সমূলে বিনাশ আবশ্যক হয়, এবং তাহাও যত শীঘ্র সম্ভব হয় ততই মঙ্গল। কারণ অধিক দিন বৃদ্ধি পাইলে ইহা আপন কাণ্ড ও মূলে যথেষ্ট খাদ্যসঞ্চয় করিয়া লয়, যাহার ফলে মাটি হইতে আর খাদ্যসংগ্রহ না করিয়াও বীজগুলি পাকিয়া উঠিতে পারে। এই সূত্রে বলা আবশ্যক যে শুধু ক্ষেত্রটিকে আগাছাশূন্য করিলেই চলে না, ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী সকল স্থান, রাস্তার উপর, বেড়ার ধার প্রভৃতিও আগাছা হইতে মুক্ত রাখা কর্ত্তব্য।

(২) যাহাতে অজ্ঞতা বা অনবধানতাবশতঃ শস্যের বীজের সহিত কোনও আগাছার বীজ ক্ষেত্রে উপ্ত না হয় সেদিকে বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। বপনের বীজে যাহাতে কোনও প্রকার ভেজাল না থাকে বা আগাছার বীজের সহিত মিশ্রণ না হয় তাহা লক্ষ্য করা উচিত। বস্তুতঃ যাহা কিছুই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইবে তাহাই আগাছার বীজ হইতে মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে সার, গলিত সার (Compost) আবর্জ্জনা পরিষ্কার প্রভৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সারের গাদার উপর পচিবার জন্য আগাছা কাটিয়া ফেলিলে কিরূপে আগাছার পুনর্বিস্তৃতির আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আগুন জ্বালাইয়া আগাছাগুলিকে পুড়াইয়া ফেলিলে বা কোন উপায়ে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিতে পারিলেই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ হওয়া যায়।

(৩) আগাছার বীজ যদি একবার ছড়াইয়া পড়ে তবে তাহাদের বিনাশের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

(ক) প্রথমতঃ আগাছার বীজগুলির অঙ্কুরণের উপযোগী ব্যবস্থা করা, পরে বীজগুলি অঙ্কুরিত হইলে, চারাগুলি লাঙ্গল, হো, আরো, ইত্যাদির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করিয়া দেওয়া। এইভাবে বহু আগাছা বিশেষতঃ বর্ষজীবী, বহুবর্ষী আগাছা নির্মূল করা যাইতে পারে।

(খ) বীজগুলিকে লাঙ্গল দ্বারা অত্যন্ত গভীরভাবে পুঁতিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ফলে বীজগুলি বায়ুর অভাবে অঙ্কুরিত হইতে পারে না, বা হইলেও অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় ও মাটি পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। তবে এই প্রথায় বীজগুলি অনেক সময় ঘুমন্ত থাকে, কালক্রমে গভীরভাবে চাষের ফলে (Deep cultivation) সুবিধা পাইলে পুনরায় অঙ্কুরিত হইবার আশঙ্কা থাকে। বীজ এইভাবে ভবিষ্যতে অঙ্কুরিত হইয়া অনেক সময় অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া থাকে।

(৪) উপরিউক্ত উপায়গুলি ছাড়া যে সকল আগাছা ক্ষেত্রে রহিয়াছে তাহাদের নিম্নলিখিত উপায়ে বিনাশ করা যাইতে পারে।

(ক) লাঙ্গল দ্বারা সকল বর্ষজীবী আগাছাকে এবং দ্বিবর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী আগাছার চারাকে গভীরভাবে মাটিতে প্রোথিত করিয়া দেওয়া

যাইতে পারে। তবে দ্বিবর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী আগাছা একটু বড় হইয়া গেলে প্রোথিত করিলে সে তাহার খাদ্য গ্রহণ করিয়াই নূতন কুঁড়ি হইতে নূতন চারা উদ্গত করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং তাহার বিনাশের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

(গ) কর্ত্তন—লাঙ্গল, কাস্তে, হো ইত্যাদি দ্বারা ঠিকভাবে কর্ত্তন করিতে পারিলে সকল আগাছাকে বিনষ্ট করা যায়। এলোমেলোভাবে কাটিলে সফল অপেক্ষা বিফল হইবার সম্ভাবনাই থাকে অধিক, সুতরাং আগাছার কোন্ অংশ কি ভাবে কাটা উচিত তাহা ভালভাবে জানা উচিত। যখন কোন গাছের বীজপত্রে উপরের অংশ কাটিয়া ফেলা হয় তখন গাছটি সাময়িকভাবে আর ফুল ফল ধারণ করিতে পারে না এবং কর্ত্তিত অংশটিও রৌদ্রে ফেলিয়া দিলে ক্রমশঃ শুকাইয়া মরিয়া যায়। কিন্তু ইহাতে মূলসংলগ্ন কাণ্ডাংশের পত্রকক্ষস্থ সুপ্ত মুকুলগুলি অক্ষত মূল এবং কাণ্ডাংশে হইতে পূর্ণমাত্রায় জল ও খাদ্য লাভ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কালক্রমে একটি কাণ্ডের স্থলে বহুকাণ্ডের সৃষ্টি হয়; তবে কোনও বর্ষজীবী আগাছাকে শরৎকালে অঙ্কুরোদ্গমের ঠিক পরেই একবার উপযুক্তভাবে কাটিলে ইহা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পরে পার্শ্ব মুকুলগুলি শাখারূপ ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে আর একবার ঐভাবে কাটিলে গাছটি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যায়। দ্বিবর্ষজীবী আগাছাগুলির প্রথম বৎসরে ক্ষুদ্র কাণ্ড থাকে এবং কচি থাকিতেই বীজপত্রের উপরের অংশ কাটিয়া ফেলিলে তাহারাও বর্ষজীবী আগাছাগুলির ন্যায় সহজেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মের শেষদিকে বৃদ্ধি পাইবার পরে দ্বিবর্ষজীবী বা বহুবর্ষী আগাছার বীজপত্রের উপরের অংশ কাটিলে আর কোন ফল হয় না, তখন তাহাদের এত সঞ্চিত খাদ্য থাকে যে কাণ্ডাংশে পুনরায় পত্রাচ্ছাদিত হইয়া পূর্ণোদ্যমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রমশঃ পর পর যদি গাছের বর্দ্ধিতাংশ কাটিয়া ফেলিয়া গাছকে আর ক্ষতিপূরণ করিয়া লইবার সুযোগ না দেওয়া যায় তবে বর্ষজীবী, দ্বিবর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী সকল গাছকেই সমানভাবে বিনষ্ট করা যায়। এইভাবে প্রতিবার ক্ষতিপূরণের প্রচেষ্টায় সঞ্চিত খাদ্যও নিঃশেষ হইয়া যায় ও গাছটি মরিয়া যায়।

কর্ত্তন—বসন্তকালে নূতন সপত্রকাণ্ড উদ্গত হইলেই কর্ত্তন আরম্ভ করিতে হয়। যখনই নূতন মুকুল বা শাখা উদ্গত হয় তখনই পুনরায় কর্ত্তন করিতে হয়। ইহার পরিবর্ত্তে গ্রীষ্মকালে দ্বিতীয়বার কাটিবার জন্য অপেক্ষা করিলে গাছকে মূলে ও কাণ্ডে খাদ্য সঞ্চয় করিবার জন্য অযথা সুযোগ দেওয়া হয় এবং পরে আবার কাটিলে সাফল্যের সম্ভাবনা কম থাকে। বীজপত্রের উপরে কাটিবার পরিবর্ত্তে বর্ষজীবী বা দ্বিবর্ষজীবী আগাছাগুলিকে বীজপত্রের ঠিক নিম্নের অংশ বা মূল বরাবর কাটিলে কর্ত্তিত অংশ সঙ্গে সঙ্গেই মরিয়া যায় এবং মূলের অবশিষ্ট অংশও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বন্য গাজর, পারস্নিপ ইত্যাদি আগাছাকে বীজপত্রের উপরে কাটিলে উহারা যেমন বহু শাখাবিশিষ্ট হইয়া উঠে তেমনি আবার নিম্নের অংশ কাটিলে ইহারা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

বহুবর্ষী আগাছাগুলি সাধারণতঃ এই সকল উপায়ে বিনষ্ট করা যায় না। কারণ অধিকাংশ সময়েই বহুবর্ষী গাছের মুকুলিত কাণ্ড মাটির তলায় থাকে এবং উপরের অংশ কাটিলে পুনরায় সপত্র কাণ্ড উদ্গত হয়। এমন কি মাটির তলায়ও কাণ্ড মূল হইতে আস্থানিক মুকুলের উৎপত্তি হয় ও তাহা হইতেই সপত্র কাণ্ড উদ্গত হয়। কৃষির ক্ষেত্রে আগাছা কাটিয়া ফেলিলেই হয় না, কর্ত্তিত অংশগুলি ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া ফেলাও প্রয়োজন। এই সূত্রে লক্ষ্য করা করা উচিত যে কর্ত্তন যন্ত্রের কর্ত্তিত অংশগুলি ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে এবং উহাদের সংলগ্ন মুকুল হইতে কাণ্ড ও মূলের উৎপত্তি হয় ও একটি নূতন গাছ জন্মলাভ করে। কর্ত্তনের পরিবর্ত্তে গো মেষাদির দ্বারা ঠিকভাবে আগাছাগুলিকে মুড়াইয়া দিলে আগাছার কবল হইতে সাময়িকভাবে রক্ষা পাওয়া যায়।

(ঘ) আগাছাগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারিলেই ইহাদের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। বিশেষ কতকগুলি আগাছা আছে যেগুলির বীজ হওয়া যে কোন প্রকারে বন্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজন কিন্তু তাহাদের কাস্তে, হো ইত্যাদি দ্বারা কর্ত্তন করা সম্ভব নয়। সেই সকল আগাছা ব্যতীত অন্য সকল বর্ষজীবী ও দ্বিবর্ষজীবী আগাছাই উপরিউক্ত উপায়ে বিনষ্ট করা যাইতে পারে। তবে বহুবর্ষী আগাছা সর্ব্বদাই এই উপায় বিনষ্ট করা প্রশস্ত। হাতে টানিয়া, কোদাল ইত্যাদি দ্বারা খুঁড়িয়া বা নিড়ানি দ্বারা উপড়াইয়া ফেলা এবং সম্ভব হইলে আরো দ্বারা অন্যভাবে সেগুলি তুলিয়া লওয়াই সুবিধাজনক।

(ঙ) জমি যদি জলমগ্ন থাকে তবে অনেক সময় পানাজাতীয় কতকগুলি আগাছা জন্মায়। ঠিকমত জল নিকাশের ব্যবস্থা করিলে ইহারা মরিয়া যায়।

(চ) রাসায়নিক প্রতিষেধক :—অনেক সময় বিশেষ কতকগুলি সার বা রাসায়নিক দ্রব্য জমিতে প্রয়োগ করিলে সাফল্যের সহিত আগাছা বিনষ্ট করা যায়। এই রাসায়নিক প্রতিষেধকগুলির গঠন ও নানাপ্রকার বৈশিষ্ট্যের ফলে প্রয়োজনীয় শস্যটি রক্ষা পায় কিন্তু আগাছাগুলি বিনষ্ট হয়। সুতরাং সুবিবেচনার সহিত প্রয়োগ করিলে অত্যন্ত সুফল লাভ করা যায়। চূন প্রয়োগ করিলে দেখা যায় একদিকে যেমন শিম্বিজাতীয় ফসলের উন্নতি হয় তেমনই অনেক অনাবশ্যক গাছ মারা পড়ে। এইরূপ ভাবে আগাছা নষ্ট করিবার জন্য অনেক খনিজ সার প্রয়োগ করা হয়। ইহাদের মধ্যে লবণ, চূণ ও জিপ্সাম, অস্থিসার ইত্যাদি বিশেষ সুফল প্রদান করে। তবে সাধারণতঃ শস্যক্ষেত্রে বিষাক্ত রাসায়নিক প্রতিষেধকগুলি প্রয়োগ করা হয় না। আগাছার প্রতিষেধক রূপে আয়রণ-সালফেট, কপার-সালফেট, নাইট্রেট, ক্লোরাইড, এ্যাসিটেট এবং সাইনক্স নামক জৈব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। সাইনক্স একপ্রকার হলুদ রং, একবার জামাকাপড়ে বা গায়ে লাগিলে সহজে উঠে না। ইহা ছাড়া অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যগুলি ক্ষারক এবং ক্ষারক হিসাবেই আগাছাগুলিকে বিনষ্ট করে। এই সকল রাসায়নিক প্রতিষেধকগুলি গাছের উপর ছিটাইয়া দিতে হয়—ফলে বিস্তৃত পত্রী আগাছাগুলি সহজেই বিনষ্ট হয় এবং যে সকল শস্যের পত্র সিকথিক ও সরু তাহারা প্রতিষেধক ঘনমাত্রায়

প্রযুক্ত না হইলে রক্ষা পাইয়া যায়। এই সকল বিষাক্ত প্রতিষেধক যাহাতে প্রয়োগ করিবার সময় গাত্রে অথবা বস্ত্রে না লাগে সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

উত্তেজক রস ভিত্তিক প্রতিষেধক :—উত্তেজক রস সম্বন্ধীয় গবেষণার ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক কতকগুলি সংশ্লেষক রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়। পরে দেখা যায় যে এইগুলি আবার অবস্থাভেদে কতকগুলি বিশেষ উদ্ভিদকে মারিয়াও ফেলিতে পারে। ইহা হইতেই আগাছা প্রতিষেধক আবিষ্কারে গভীরতর গবেষণার ফলে 4—Chloro 2—Methyl Phenoxy, acetic acid (মেথ্‌ক্লোন্ নামে প্রচলিত) এবং 2, 4—dichlorophenoxyacetic acid (২, ৪—ডি নামে প্রচলিত) নামক দুইটি মারাত্মক আগাছা প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কৃত হয়। ইহা ছাড়া (১) Cornox (২) N, O. C. (Di Nitro, Ortho —cresol) এবং (.) T. C. A (Dichlor. Acetic Acid) প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়।

এই রাসায়নিক পদার্থগুলি অতি অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে যেমন গাছের বৃদ্ধির সাহায্য করে তেমনই অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা তলপত্রী আগাছাগুলির উপরই বিশেষ-কার্য্যকরী হয় এবং তীক্ষ্ণ পত্রী গাছের উপর সেরূপভাবে কার্য্যকরী হয় না। সুতরাং তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যশস্যের কোনও ক্ষতি করে না। ঘাসজাতীয় তীক্ষ্ণপত্রী গাছ আগাছারূপে জমিতে থাকিলে সাধারণতঃ শস্যের বীজ বপনের পূর্ব্বে ঘনমাত্রায় মিথ্‌ক্লোন বা ২।৪ ডি প্রয়োগ করা হয়। ইহাদের কোন ক্ষারক গুণ নাই এবং ইহাতে মনুষ্য বা গো মহিষাদির কোনরূপ ক্ষতি হয় না। এই উত্তেজক রসভিত্তিক মারকগুলি তরলদ্রবণে অথবা গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করা যায়। ইহারা মূল বা পত্রের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া গাছের উত্তেজক রসের উপর কার্য্যকরী হয়, গাছের ভিতরের কোষ-মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে থাকিলে গাছটি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যায়।

এই সকল রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য সুতরাং ইহাদের প্রয়োগের পূর্ব্বে চিন্তা করা আবশ্যক যে ইহাদের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে তাহা অপেক্ষা ফলন বৃদ্ধির দরুণ যে পরিমাণ আয় বাড়িবে তাহা অধিক হইবে কিনা। রাসায়নিক প্রতিষেধকগুলি ব্যতীত উপরিউক্ত অন্যান্য প্রথাগুলি অনেক স্বল্প ব্যয়সাধ্য; তাহা ছাড়া সুবিবেচনার সহিত মিশ্র ফসল উৎপাদন করিলে অথবা শস্যাবর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারাও বহুল পরিমাণে আগাছা প্রতিরোধ চলিতে পারে। সুতরাং যে স্থানে আগাছার উৎপাত অত্যধিক নয় সে স্থানে ব্যয়সাধ্য রাসায়নিক প্রতিষেধক অপেক্ষা অন্যান্য উপায়গুলি প্রয়োগ করাই অধিকতর লাভজনক। তবে আবার ইহাও সত্য যে ঠিকভাবে দুই একবার রাসায়নিক প্রতিষেধক প্রয়োগ করিলে শস্যক্ষেত্র বহু বৎসর আগাছামুক্ত থাকে।

কলা-নবগ্রাম ঃ নবশিক্ষার কর্মকেন্দ্র

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বর্তমান ভারতে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রূপও যে দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে, তাহার ধারণা আমাদের অনেকেরই নাই। অথচ একথা বড়ই সত্য যে বিরাট সমাজদেহে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, সমাজ-চেতনা এখন দেশকে নূতন করিয়া গড়িতে চায়। সে গড়ার জন্য যে মামুলী শিক্ষায় চলিবে না, নূতন ধরণের শিক্ষা চাই, ইহাও সমাজ বুঝিয়াছে; না হইলে ইংরাজি শিক্ষার ঔজ্জ্বল্য যে এখনই কিছুটা পরিম্লান হইয়াছে, ইহা সম্ভব হইত না। সমাজ চাহে বাঁচিতে, সমাজ চাহে নূতন পথে চলিতে, কারণ নূতন পথে চলা বাঁচার জন্যই দরকার। তাহার জন্য চাই সংহত ঐকান্তিক চেষ্টা, এত বড় দেশ সহজে মোড় ফিরিতে চাহে না, জাগিয়াও ঘুমায়।

বর্ধমানের মধ্যে ছোট একটি গ্রাম, তাহার নাম কলা-নবগ্রাম। নবগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন আছে, ইহা সে নবগ্রাম নহে। ইহা কর্ড লাইনের পাল্লারোড স্টেশন হইতে মাইল দেড়েক দূরে অবস্থিত। এখানে প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে তিনজন বিশিষ্ট কর্মী গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে চলিয়া আসেন। কিন্তু গান্ধীজীর আহ্বানে একক বা ব্যাপক সত্যাগ্রহে তাঁহারা রাজনীতির আবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়েন। যে কয়বৎসর তাঁহারা কলা-নবগ্রামে ছিলেন তাহারই মধ্যে গ্রামে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। এই তিনজন কর্মী, বিলাস বর্জন করিয়া, অকৃত্রিম দেশভক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, বিদ্যালয়ে দিনের পর দিন প্রাণভরা ভালবাসা লইয়া শিক্ষাদান করিতেছেন, তাহা দেখিয়া গ্রামবাসীর মনে শ্রদ্ধা জাগে। কিন্তু যেমন বলিয়াছি, রাজনৈতিক কর্ম আসিয়া এই শিক্ষাব্রতের অন্তরায় হইল।

এই তিনজনের মধ্যে একজনের নাম শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য। বিয়াল্লিশ সালে কারাবরণের পর যখন তিনি মুক্তি পাইলেন তখন তিনি বুনিয়াদি শিক্ষার কর্মে অধিক মন দিতে থাকিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত, কলিকাতা হইতে ট্রেনে এক ঘণ্টার মত সময়ের মধ্যে অবস্থিত, হোটর (২৪ পরগণা) মর্যাদা জাতীয় বিদ্যালয় এখনও বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু নানা বিপর্যয় পার হইয়া বিজয়কুমার পুনরায় কলা-নবগ্রামের নিকটবর্তী স্থানে কেন্দ্র করিয়া বসিয়াছেন। এই কেন্দ্রে যে প্রতিষ্ঠান

তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার নাম শিক্ষা-নিকেতন। সাতজন কর্মীকে লইয়া ইহার কর্মপরিষদ গঠিত।

১। শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন—সভাপতি।
২। শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য। } —যুগ্ম কর্মসচিব
৩। শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা। }
৪। শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়।
৫। শ্রীনির্মলকুমার বসু।
৬। শ্রীপঞ্চানন বসু।
৭। শ্রীমতী সাধনা ভট্টাচার্য।

বর্তমানে শিক্ষা-নিকেতনের পরিচালনাধীনে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান চলিতেছে :

১। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় : এই বিদ্যালয় বর্ধমান জেলা স্কুল বোর্ডের অধীন। শিক্ষা-নিকেতনের তত্ত্বাবধানে ইহা পরিচালিত হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ে বিশেষভাবে অনুন্নত সম্প্রদায়ের বালক-বালিকারা শিক্ষালাভ করে। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রায় অর্ধেক অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত। এখানে আবশ্যিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু অনুন্নত শ্রেণীর অতি অল্পসংখ্যক ছেলেমেয়েই পড়িতে যায়। ইহাদের স্বতন্ত্র অনেক সমস্যা আছে। তাহার সমাধান না হইলে শিক্ষার দিকে ইহাদের আকর্ষণ হইতেছে না। শিক্ষা-নিকেতন ইহাদের বিশেষ সমস্যাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। শিক্ষা-নিকেতন হইতে এই নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের দুঃস্থ ছাত্রগণকে বস্ত্র ও ঔষধাদি দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৫ জন শিক্ষক আছেন। ইহার ছাত্রসংখ্যা ৬০।

২। উচ্চ বুনিয়াদী ও নিম্ন শিল্প-বিদ্যালয় : বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল আট বৎসর। পূর্বে আট বৎসর বুনিয়াদী শিক্ষালাভ না করিলে এই শিক্ষার মূল্য যথাযথভাবে বুঝা যায় না। সেইজন্য নিম্ন বুনিয়াদীর পার্শ্বে এই উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। অষ্টম শ্রেণীর পাঠ সমাপনান্তে অধিকাংশ ছেলেরই বিদ্যালয়ের লেখাপড়া সাঙ্গ হইয়া থাকে। তারপরও যাহারা পড়াশোনা করিতে চায় তাহাদের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষাধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিম্ন শিল্পবিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কারণ, যাহারা উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ করিয়াছে, চলতি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিন্ন পদ্ধতিতে তাহাদের লেখাপড়া ঠিকমত হয় না। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তিনটি এবং নিম্ন শিল্পবিদ্যালয়ে দুইটি শ্রেণী আছে। নিম্ন শিল্পবিদ্যালয়ে ছাত্রেরা খানিকটা উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষার সুযোগ পায়। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকসংখ্যা ৭ এবং ছাত্রসংখ্যা ৬১।

৩। সমাজ-শিক্ষা-কেন্দ্র : দুইটি সমাজ-শিক্ষা-কেন্দ্র আছে—একটি মেয়েদের ও অপরটি পুরুষদের জন্য। এই কেন্দ্রে অক্ষর শিক্ষা দিয়া পরে শিক্ষিতগণ যাহাতে লেখাপড়া কতকটা বজায় রাখিতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। তাহা ছাড়া অর্জিত শিক্ষাকে নানাভাবে জীবনের কাজে প্রয়োগ করিবার চেষ্টাও করা হইয়া থাকে। এই সমাজ শিক্ষা-কেন্দ্রের একটি পৃথক পরিচালন-সমিতি আছে। শিক্ষা-নিকেতন ইহার কাজ পরিচালনায় তাঁহাদের সহায়তা করে। এই শিক্ষা-কেন্দ্র দুইটির শিক্ষক-সংখ্যা ৪ এবং ছাত্রসংখ্যা ৪৪।

৪। সমাজ-সেবা-কেন্দ্র : এই অঞ্চলের সামাজিক জীবনের উন্নতির জন্য একটি সমাজ-সেবা-কেন্দ্র আছে। একজন কেন্দ্রকর্তা এই কেন্দ্র পরিচালনা করেন। এই কেন্দ্রে গ্রামের যুবকদের সাহায্যে গ্রামের বনজঙ্গল পরিষ্কার এবং রাস্তাঘাট মেরামত করা হয়। অসুখে বিসুখে গ্রামবাসীদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামের যাত্রা-গান ও খেলাধূলা সম্পর্কেও নানাভাবে উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে। এই কেন্দ্র হইতে পার্শ্ববর্তী দুইটি গ্রামে দুইটি বয়স্ক-শিক্ষা-কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। এই দুইটি শিক্ষা-কেন্দ্রের শিক্ষকসংখ্যা ২ এবং ছাত্রসংখ্যা ৩৫। এই কেন্দ্রে সমাজ-কল্যাণ ও সামাজিক সংস্কৃতির বিষয়ে কর্মীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

৫। গ্রন্থাগার-মণ্ডল : এই অঞ্চলের জন্য একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও তাহার সহিত যুক্ত ৮টি শাখা-গ্রন্থাগার আছে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হইতে শাখা-গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক দেওয়া হয়। ইহার সহিত যুক্ত একটি পাঠকেন্দ্রও আছে। সকলে আসিয়া সেখানে পুস্তক এবং সংবাদ- ও সাময়িক-পত্রাদি পাঠ করেন। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ২৬০০ পুস্তক আছে। শাখা-গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক-সংখ্যা ৫২৭৪। এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য একজন গ্রন্থাগারিক ও একজন সহকারী আছেন।

৬। বাণী-চিত্রে শিক্ষা-প্রচার : জনসাধারণের মধ্যে সবাক চিত্রের সাহায্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য একটি সবাক-চিত্র-যন্ত্র আছে। একটি জিপগাড়ি সহযোগে এই যন্ত্রের সাহায্যে এ অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে শিক্ষা প্রচার করা হইয়া থাকে। বর্ষার পর হইতে এ পর্যন্ত ১৫টি জায়গায় ছবি দেখান হইয়াছে।

৭। বুনিয়াদী শিক্ষণ-বিদ্যালয় : এখানে শিক্ষা-নিকেতন-প্রদত্ত জমির উপর একটি বুনিয়াদী শিক্ষণ-বিদ্যালয় আছে। ইহা পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। শিক্ষা-নিকেতন ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। এই অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি একে একে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে, এই শিক্ষা-বিদ্যালয়ে ঐসকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শিক্ষালাভ করিবেন এবং ইহারই তত্ত্বাবধানে তাঁহারা কাজ করিবেন, এইরূপ আশা করা যাইতেছে। পরিকল্পিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়-গুলির প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া সমাজ-শিক্ষাকেন্দ্র ও গ্রন্থাগার থাকিবে। প্রত্যেকটি কেন্দ্র শিক্ষাব্যবস্থার দিক হইতে স্বয়ংপূর্ণ হইবে। সকলগুলিই শিক্ষা-নিকেতনের পরিচালনাধীনে থাকিয়া শিক্ষা, সেবা, সংস্কৃতি ও খেলাধূলা প্রভৃতি ব্যাপারে পরস্পরের সহিত সংযোগ রক্ষা করিবে। এই শিক্ষণ-বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৪ জন অধ্যাপক ও ৬০ জন ছাত্র আছেন।

৮। ছাত্রাবাস : শিক্ষা-নিকেতনের শিক্ষার্থীদের থাকিবার জন্য একটি ছাত্রাবাস আছে। পল্লীর স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে, মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে তাহার স্থান করা হইয়াছে।

৯। শিশু-ভবন : বিদ্যালয় গমনের পূর্ববর্তী বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। ইহাদের শিক্ষার জন্য একটি শিশু-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শীঘ্রই ইহার কাজ আরম্ভ হইবে।

১০। যুব-শিবির : গ্রামের যুবকদিগকে সমবেত সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত করিবার এবং গ্রাম-সেবার কাজে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য স্থানে স্থানে যুবশিবির গঠন করা হইতেছে। এই বৎসর শিক্ষা-নিকেতনেও একটি যুবশিবির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাতে ৮০ জন যুবককে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

গত ৭ই মার্চ তারিখে সোমবার মহামান্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এখানে শুভ পদার্পণ হয়। এ পর্যন্ত শিক্ষা-নিকেতনের কোনও উৎসবই হয় নাই। রাজ্যপাল শুভাগমনে আনন্দের সাড়া পাওয়া গেল। তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতে গিয়া বলা হইল—

"কর্মের মধ্যে উৎসবের প্রয়োজন আছে—উৎসব প্রেরণা দেয়, কাজে আনন্দ দেয়। আপনার কাছ থেকেই আমরা সর্বপ্রথম সেই প্রেরণা পাব, সেই আনন্দের উৎস খুঁজে পাব। আপনি শিক্ষকতা করে জীবনের অধিক ভাগ কাটিয়েছেন, এখনও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোভাগে আপনার স্থান। পল্লীজীবনের সরলধারা আপনার চিরদিনই অন্তরের বস্তু, তাই আপনাকে আমরা ডেকেছি এই গ্রামের কাজের মধ্যে। গান্ধীজীর চিন্তাপ্রবাহ ও কর্মপদ্ধতি দুই-ই আপনার প্রিয়বস্তু, সে কারণেও আমরা কর্মব্যস্ত অবসরবিরল আপনার দিনচর্যায় ব্যাঘাত ঘটাতে সাহস করেছি।

পশ্চিমবাংলার নব শিক্ষাপ্রচেষ্টার ইতিহাসে কলা-নবগ্রামের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে বাংলার এই নিভৃত পল্লীতে কর্মীরা কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন, সেই যজ্ঞের খানিকটা ফল আমরা শিক্ষানিকেতনের এখনকার কর্মধারার মধ্যে দেখতে পাব বলে আশা করি।

খেলার মধ্য দিয়ে নয়, হাতের কাজের মধ্য দিয়ে দেশের ছেলেমেয়েরা কি ভাবে শিক্ষাকে নিজের করে নিতে পারে, কি ভাবে তারা হাসিমুখে কাজকে গ্রহণ করে, কাজে অভ্যস্ত হতে পারে, তার পরিচয় এখানে পাবেন। বুনিয়াদী শিক্ষা শুধু নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষা নয়, গান্ধীজী বলেছিলেন, সারা জীবনব্যাপী শিক্ষা, এখানে নিম্নপ্রাথমিকের গণ্ডী ছাড়িয়ে সে শিক্ষাকে কি প্রকার রূপ দেওয়া যেতে পারে সেদিকে চেষ্টা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলেও এর প্রভাব আশা করি গৌণভাবে পড়ছে।"

হরিজন পত্রিকার সম্পাদক ও শিক্ষানিকেতনের কর্মপরিষদের বিশিষ্ট সদস্য শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বুনিয়াদী শিক্ষার সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, আমরা নিজেদের ততখানি এই সব বিষয়ে দিই না বলিয়া নিজেকে দুর্বল করিয়া রাখিয়াছি। গ্রামকে ফিরে দিতেও হবে—আজ পর্যন্ত গ্রাম থেকে আমরা শুধু নিয়েছি—ছেলেরা High School থেকে পাশ করে গ্রাম ছেড়েছে—আর গ্রামের দিকে ফিরে চায়নি।

বুনিয়াদী শিক্ষা অখণ্ড একটানা আট বৎসর চলিবে। ইহার মধ্যে উচ্চ বুনিয়াদী ও নিম্ন বুনিয়াদী ভাগ করা ভুল হইয়াছে। বুনিয়াদী জাতীয় শিক্ষা—ইহাকে সার্বজনীন করিতে হইবে। নিম্ন বুনিয়াদী ৫ বৎসর পড়িয়া যাহারা বুনিয়াদী ছাড়িয়া এখনকার উচ্চ বিদ্যালয়ে যাইতেছে, তাহারা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিন্ন শিক্ষাধারার মধ্যে খুব অসুবিধা ভোগ করে. তাহাদের শিক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হইবে। এই অসামঞ্জস্য দূর করিতে হইবে।

শিক্ষানিকেতন ভবিষ্যতে গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইবে, এই আমাদের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন সফল হইলে, গ্রামের এক একটি ক্ষেত্রে যথার্থ শিক্ষার দীপ যথার্থভাবে জ্বালিতে পারিলে অন্য ক্ষেত্রেও সেই দীপ জ্বলিবে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজের মধ্য দিয়া মস্তিষ্ক ও হাত পায়ের চালনা তখন সাধিত হয়—শিক্ষক ও ছাত্রের নিত্য সম্পর্কের মধ্যে হৃদয়ের বিকাশ হয়। কাজের বা শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিয়া ছেলেরা ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন ও আত্মনির্ভরশীল হইবার সুযোগ পায়।

রাজ্যপাল ডক্টর মুখোপাধ্যায় শিক্ষানিকেতনের কার্যকলাপ দেখিয়া বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং মানুষ যে স্বাবলম্বী হইলে কতখানি শক্তি অর্জন করে, তাহা তাঁহার সরল ভাষায় ও মনোজ্ঞ কাহিনী সহকারে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার বর্ণিত বাঁকুড়ার একটি অল্পবয়স্ক ছেলের দানের কথা সকলের হৃদয় স্পর্শ করে। রাজ্যপালের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায় হস্তশিল্পের প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। রাজ্যপাল তাহার পর বুনিয়াদী শিক্ষা বিদ্যালয়ের ভবন ও কেন্দ্রীয় পাঠাগার পরিদর্শন করেন। সর্বত্রই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে কর্মিগণ পরিতুষ্ট হন। কেন্দ্রীয় পাঠাগারের পুস্তকতালিকা ও পুস্তক পাঠাইবার ব্যবস্থা তাঁহার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীসাবনা দেবী সর্বত্র সুশৃঙ্খলার সহিত এই অনুষ্ঠান পরিচালিত করেন। ডক্টর মুখোপাধ্যায় বেলা এগারোটার পর বর্ধমানে ফিরিয়া যান।

কলানবগ্রাম ও দাদপুর গ্রামের পার্শ্বে একটি নূতন পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই পল্লীটি শিক্ষা-নিকেতন নামে পরিচিত হইয়াছে। ইহার চতুষ্পার্শ্বে ২০ বর্গমাইলব্যাপী স্থানে ১০ হাজার লোকের মধ্যে শিক্ষা-নিকেতনের কার্য ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বহু কর্মী শিক্ষা-নিকেতন হইতে পল্লী-সেবার প্রেরণা পাইতেছেন, এবং বাহিরের অনেক শিক্ষাব্রতী মাঝে মাঝে শিক্ষা-নিকেতনে আসিয়া এখানকার শিক্ষা-সম্পর্কীয় পরীক্ষা ও কার্যাদি লক্ষ্য করিতেছেন।

শিক্ষা-নিকেতন বন্ধু ও হিতৈষীদের দানের উপর নির্ভর করিয়া প্রথম কার্য আরম্ভ করে। ইহাদের মধ্যে কলানবগ্রামের শ্রীশ্রীপতি চক্রবর্তী ও দাদপুরের স্বর্গীয় ফকিরচন্দ্র ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে রাজ্য সরকার নানাভাবে এখানে অর্থসাহায্য করিতেছেন এবং তাঁহাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই ইহার কাজ চলিতেছে। কিন্তু ইহার কাজ যেভাবে বিস্তৃত হইতেছে তাহাতে কেবলমাত্র সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। আমরা আশা করি, দেশের জনসাধারণের অকুণ্ঠিত সাহায্য শিক্ষা-নিকেতনের সকল অভাব দূর করিয়া বিজয়কুমারের নেতৃত্বে যে কার্য আরম্ভ হইয়াছে তাহার অগ্রগতির পথে উত্তরোত্তর সহায়তা করিবে।

রাঢ়ের সাহিত্য-সাধক

শ্রীপ্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

। যুগে কাব্যালোচনা অথবা সাহিত্য সাধনা বর্ত্তমান কালের ন্যায় গৌরব-াতির বরমাল্য মণ্ডিত ছিল না, সেই যুগে ক্ষীণ প্রদীপালোকে সাহিত্য-াধনা সত্যকার সাধকোচিত সাধনা বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। াহিত্য জাতির সজীবতার লক্ষণ—প্রাণের অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনা! ইংরেজী ভ্যতার নিরঙ্কুশ প্রভাবের চাপে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইউরোপীয় ড়বাদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। অবশ্য, যুগধর্ম্মকে কোন ়ের মানবসমাজ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারে না,—তেমনি মানব-ষ্ট সাহিত্যও যুগের ভাবধারা হইতে বিশ্লিষ্ট হইতে সক্ষম হয় না।

রাঢ়ের ঐতিহাসিক মূল্য আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ়াপুরে দশ সহস্র বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার প্রকাশ— রাঢ়ীয় সভ্যতার প্রাচীনতার এক বৈজ্ঞানিক নজীর। সুপ্রাচীন ইতিহাস ধারার সঙ্গে —রাঢ়ীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের একটা যোগাযোগ বিদ্যমান রহিয়াছে। ও সুদূর প্রাচীন সংস্কৃতির পুণ্যধারায় রাঢ় বঙ্গ পরিপ্লাবিত রহিয়াছে। থায়-সাহিত্যে-গাথায় এবং প্রাচীন দেব-দেউল ও শিল্প-সাধনায় সেই থারই সন্ধান পাওয়া যাইবে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন আসিয়া টিতেছে। বাংলা সাহিত্য যেদিন তাহার স্বকীয় সত্ত্বা হইতে বিচ্যুত হইবে, সেদিন বাংলা সাহিত্যের এক অন্ধ-তামস যুগের সূচনা হইবে। াংলার ভাব-ভাবনায়, চিন্তায় ও মননশীলতায় যেদিন বিজাতীয় ও বিদেশীয় ভাবের সংমিশ্রণ সম্পূর্ণ হইবে—সেইদিন দীর্ঘ দিনের তপোলব্ধ াংলা সাহিত্যের স্বকীয়তার বিলোপ ঘটিবে। বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে—এদেশের সৃজনীসমৃদ্ধ মেধা ও বোধী চিন্তার রাজ্যে এক অখণ্ড অমৃত-সত্ত্বার রচনায় সমৃদ্ধ রহিয়াছে। এই জন্যই—তত্ত্ব ও দার্শনিকতায়, দেশাত্মবোধ ও ভাগবৎ-শ্রদ্ধায়, শিল্প বিজ্ঞানের চমৎকারিত্বে এবং চরমোৎকর্ষতায় বাংলার সাহিত্য আজও প্রাণের সাহিত্যরূপে বর্ত্তাইয়া রহিয়াছে।

রাঢ়ের অতীত ঐতিহ্যের স্মৃতি এখনও শুভ্র সমুজ্জ্বল। সেলিমাবাদ পরগণা মোগল রাজত্বের একটি উল্লেখযোগ্য পরগণা ছিল। সেলিমাবাদ কোথায়—এ জিজ্ঞাসা ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসুদের এখনও ব্যাকুল করিয়া তোলে। 'চণ্ডীকাব্যে'র কবি রাঢ়ের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। রাঢ়ের সমাজ ও ধর্ম্ম-জীবনের একটা অখণ্ড ইতিহাস এই চণ্ডীকাব্য। মোগল শাসনকালে রাঢ় কয়েকটী পরগণায় বিভক্ত ছিল। সেলিমাবাদ পরগণা দামোদরের দক্ষিণ তীরে। দামুন্যা গ্রাম সেলিমাবাদের অন্তর্গত। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ নামেই যেন সমধিক খ্যাত।

দামুন্যার কবি দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ছিলেন। মুকুন্দের পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র, পিতা হৃদয় মিশ্র। মিশ্র ও চক্রবর্ত্তী উপাধি ইঁহাদের বংশের। "কবিকঙ্কণ" উপাধিটি জনগণপ্রদত্ত উপাধি। কবিকঙ্কণের ভ্রাতা কবিচন্দ্রও একজন প্রখ্যাত কবিরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মুকুন্দরামকে দামুন্যা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তৎকালে যবনের অত্যাচার এতই প্রবল ছিল যে, তাঁহার পক্ষে দামুন্যায় বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কোন্ বয়সে কবি স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন তৎবিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কবি মেদিনীপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর আশ্রয় লাভ করেন। এই ভূস্বামীর নাম বাঁকুড়াদেব বা বাঁকুড়া রায়। মুকুন্দরাম বাঁকুড়া রায়ের পুত্রের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কবি বলিয়াছেন :

> সহর সেলিমাবাজ তাহাতে সুজন রাজ
> নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ,
> তাহার তালুকে বসি দামুন্যায় চাস চসি
> নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥

অর্থাৎ ছয় সাত পুরুষের ভিটামাটি কবিকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন : "শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক" শ্লোকটি মুকুন্দরামের স্বরচিত নয়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে, রাজা রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকালে এবং তাঁহারই উৎসাহে মুকুন্দরাম কাব্য রচনায় প্রোৎসাহিত হন। ১৫২৫ শকের কোন এক সময়ে চণ্ডীকাব্য রচিত হয়। মতান্তরে ১৪৯৯ শক অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে চণ্ডীকাব্য লিখিত হইয়াছিল।

কবিকঙ্কণের এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র শিবনাথ ও কন্যা যশোদা। মনীষী রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছেন : "কবিকঙ্কণ নিঃসংশয়ে বাংলা ভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি। কি মানব স্বভাব পরিজ্ঞান, কি বাহ্য জগদ্বর্ণনা-নৈপুণ্য, কি কারুণ্য রসের উদ্দীপনাশক্তি, কি সুকল্পনা সকল বিষয়েই তিনি অদ্বিতীয়! * * * বিশেষতঃ প্রতিভা বিষয়ে তিনি বাংলা ভাষার অদ্বিতীয় কবি। কবিকঙ্কণের দুইটি মনোহর লক্ষণ এই যে, তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন, দরিদ্র জীবন যেমন তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, অন্য কোন কবি সেরূপ করিতে পারেন নাই। "দরিদ্রের কবি" এই গৌরবাস্পদ উপাধি যেমন তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন, তেমন অন্য কোন কবি প্রাপ্ত হইতে পারেন না।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা।)

চণ্ডীকাব্যকে একটা ঐতিহাসিক ও সামাজিক আলেখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। দামুন্যা বর্দ্ধমানের রায়না থানার দক্ষিণ প্রান্তে। দামুন্যার কবির ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, বিশ্বের বহু মনীষীর ভাগ্যেই তাহার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাসের

ভাগ্যও এই ভাবে বিড়ম্বিত হইয়াছিল। মুকুন্দরামের প্রথম কাব্য-শক্তির প্রকাশ—'শিব কীর্ত্তনে'। চণ্ডীকাব্যে সমাজ জীবনের যে চিত্র চিত্রিত হইয়াছে, উহা রাঢ়ের কথা হইলেও সার্ব্বিকভাবে উহা সমগ্র বাংলার সমাজ-চিত্র। মধ্যযুগের বাংলার এক অনবদ্য নিরিখ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য।

ক্ষেমানন্দ বা ক্ষমানন্দ—সপ্তদশ শতকের মঙ্গল কাব্যের কবি। ক্ষমানন্দই যে কেতকা দাস এ বিষয়ে বহু সাহিত্যরথী ঐক্যমত হইয়াছেন। দক্ষিণ রাঢ়ের সেলিমাবাদ পরগণার কাঁথড়া গ্রামে কবির বাস ছিল। পণ্ডিত রামগতির অভিমত—ক্ষমানন্দ বা কেতকাদাস পৃথক কবি। ক্ষমানন্দ কেতকাদাস জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। ইনিই 'মনসামঙ্গল' বা 'মনসার ভাসান' রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন: "ক্ষমানন্দের গ্রন্থে কেতকাদাসের ভণিতা দৃষ্টে অনেকেই ক্ষমানন্দ ও কেতকাদাসকে দুই জন ও ইংরেজ কবি যুগল বোমেণ্ট ফ্লেচারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উভয় নামই অভিন্ন ব্যক্তির বলিয়া জানিয়াছি।

মনসা শব্দের অপর নাম কেতকা।

> বনের ভিতর নাম মনসা সুন্দরী।
> কেয়াপাতে জন্ম হইল কেতকা সুন্দরী॥ (ক্ষমানন্দ)

গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য বেহুলার উপাখ্যান। রাঢ় অর্থাৎ বর্দ্ধমানের বহু প্রাচীন জনপদ ও নদীর নামের উল্লেখ আছে মনসামঙ্গলে। বাঁকা নদী, বেহুলা বা বহুলা নদী, চম্পাই নগর প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কসবা চম্পাই নগরে প্রতি বৎসর শীতকালে একটি করিয়া মেলার অনুষ্ঠান হয়। মেলা তলার নিকটেই এক বিরাট শিবলিঙ্গ রহিয়াছেন। জনপ্রবাদ যে কালাপাহাড়ের আক্রমণে উক্ত শিবলিঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। এইখানেই সতীরাণী বেহুলার বাসর ঘর ছিল। স্থানীয় ব্যক্তিরা সেই স্থান আগন্তুকদের এখনও দেখাইয়া থাকেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে—অর্থাৎ বারা খাঁর মৃত্যুর পর (১৬৪০ খৃঃ) মনসা-মঙ্গল রচিত হয়। বারা খাঁ সেলিমাবাদ পরগণার শাসক ছিলেন।

রাঢ়ীয় সাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব নহে। বাংলার সমাজ ও ইতিহাসের অজস্র নজীর প্রাচীন সাহিত্য ও কাব্য-সাধনার শব্দ সমূহে লুক্কায়িত রহিয়াছে। অনেকের ধারণা, ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের অনুকরণে 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন। এক্ষেত্রে আরও একটি কথার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়াই মনে করি। বাংলা ভাষায় "ফিরিঙ্গী" শব্দের বহু প্রচলন করিয়াছিলেন—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। কিন্তু মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী 'ফিরিঙ্গী' শব্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন পর্ত্তুগীজদের লক্ষ্য করিয়া।

মহাভারত রচনাকার কাশীরামদাস জাতিতে কায়স্থ। স্বরচিত মহাভারতের আত্মপরিচয়ে বলিতেছেন:

> ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপরস্থিতি
> দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে—ভাগীরথী।
> কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিগ্রাম
> প্রিয়ঙ্কর দাসপুত্র সুধাকর নাম॥

ইন্দ্রাণী পরগণা রাঢ় অর্থাৎ বর্দ্ধমানের একটি ঐতিহাসিক জনপদ। ইন্দ্রাণী কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত। সিঙ্গিগ্রাম ব্রাহ্মণী নদীর তীরে। কাশীরামের প্রপিতামহ প্রিয়ঙ্কর, পিতামহ সুধাকর ও পিতা কমলাকান্ত। কমলাকান্তের মধ্যমপুত্র কবি কাশীরামদাস। কাশীরামের আরও দুই ভাই ছিলেন। কৃষ্ণদাস ও গদাধর। তিন ভ্রাতাই কবি-খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণ বিলাস' নামে ভাগবতের একটি অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। গদাধর ১৫৬৪ শকে (১৬৪২ খৃঃ) 'জগন্নাথ মঙ্গল' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

> দ্বিতীয় শ্রীকাশীরাম ভক্ত ভগবান।
> রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণ॥
> তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস।
> জগৎ মঙ্গল কথা করিল প্রকাশ॥

সিঙ্গীগ্রামের দক্ষিণে কাশীরামের বাস ছিল। সিঙ্গিতে 'কেশেপুকুর' নামে একটি পুষ্করিণীও রহিয়াছে—উহা কাশীরামের নিবাত নামে পরিচিত। 'কেশেপুকুর' সম্ভবতঃ কাশীরামের নামানুসারেই খ্যাত হইয়া থাকিবে। কাশীর পুত্র নন্দরাম দাস ও একজন কবি ছিলেন। মহাভারত ছাড়া কাশীরাম তিনটী ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। স্বপ্নপর্ব্ব, জলপর্ব্ব ও নলোপাখ্যান কাশীরামের কিশোর বয়সের রচনা বলিয়া অনেকের অনুমান।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ | প্রপাত | ফটো :—সমরেন্দ্রনাথ মিত্র

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ আবেগ ফটো :—অর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

ভাষার উন্নতির উপায়

ধীরানন্দ ঠাকুর

উন্নতির মানে অভাব-অসুবিধার বিদূরণ, অসুখ-অস্বস্তির অপসারণ ; আর, সুখ-সুবিধার গুণন, স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের বর্ধন। ভাষার উন্নতি, মানে, ভাষার মধ্যেকার অভাব-অসুবিধা-দূর, আর তার স্বাচ্ছন্দ্য-আনন্দের বৃদ্ধি : ভাষায় যে-সব বাধাবিপত্তি ও ত্রুটিবিচ্যুতি আছে সেগুলির অপসারণ ও শোধন-সংস্কার, আর, তার শক্তি ও কান্তি বাড়িয়ে স্বাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য-সাধন।

ভাষার মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে ভাবের প্রকাশ ; একমনে অনুভূত ও চিন্তিত বিষয়ের অন্যমনে বহন। এটা তার স্থূল প্রয়োজনের দিক। কিন্তু, এই স্থূল প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত-অথচ-কিছু অতিরিক্ত আর-একটা দিক আছে। সেটা হচ্ছে তার সৌন্দর্য্য তার লাবণ্য ও অলংকার। ভাষার এই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য অবশ্যই তার মুখ্য লক্ষ্যপ্রকাশকে আনুকূল্য করে ; তার ব্যাঘাত ঘটিয়ে আসল বক্তব্য বস্তুকে অপরিস্ফুট করে তোলা তার পক্ষে সংগত নয়। নিবেদ্য বিষয়ের স্ফুটতা-সাধনের নিমিত্তই ভাষার সৌন্দর্য্য-রচনার মৌল আবশ্যকতা। ভাষার উন্নতি হওয়ার অর্থ হচ্ছে তার প্রকাশ-ক্ষমতা-বৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য-সংরচন ; ভাষায় যে-অস্পষ্টতা ও আড়ষ্টপনা আছে তার দূরারিতি, আর, যে কান্তিশ্রী ও শ্রুতিলালিত্য আছে নিহিত হয়ে তার আবিষ্কৃতি।

যে-কোন বিষয়ের উন্নতি করতে।হলে, প্রথমেই, সে-বিষয়ের সম্পদ এবং উন্নতির সম্ভাবনা-সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিশ্বাস থাকা চাই ; তার পর থাকা চাই উন্নতির ইচ্ছা ও উপায় উদ্‌ভাবনের চেষ্টা এবং সেই চেষ্টাকে চাই কাজে পরিণত করা। ভাষা-বিষয়েও এর ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। ভাষার উন্নতি করতে হলে, ভাষার গলদ ও দোষ কোথায়, তার মধ্যে অসুবিধার ও বাধাবিপত্তির কি আছে, তা জানতে হবে এবং, কেমন-করে এই সব দোষত্রুটি ও অভাব-অসুবিধা মোচন করা যায় তার উপায় উদ্‌ভাবন করতে হবে ভেবেচিন্তে ; আর, দেখতে হবে, ভাষার শক্তি সম্পদ কি আছে, কি নেই : যা আছে তাকে কেমন করে রক্ষা ও উন্নততর করা যায়, আবার যা নেই তারই-বা কেমন-করে আমদানী করা-যায়, করে আপনার করে-নেয়া যায়। ভাষার প্রকাশ শক্তি বাড়াতে হলে, এবং এর জন্যে তার সৌন্দর্য্য ফোটাতে হলে ভাষা-সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও ধারণা থাকা চাই।

ভাষার উন্নতি ঠিকমত ও অবিলম্বিত হতে হলে ভাষা-চেতনা থাকা চাই বিশেষ করে। আপনা হতে ভাষার গলদ ও অসুবিধা দূর হয়ে-যাবে কালক্রমে, এবং তার শক্তি সম্পদের বৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য-সাধন হবে আপনা-আপনি—এমন কথা মনে করে চুপ করে বসে-থাকলে চলবে না। সচেতন প্রয়াসে তার দোষবাধা দূর করে উন্নতির উপায়গুলিকে সজ্ঞানে গ্রহণ করতে হবে।

ভাষা শুধু ধ্বনি নয়, ভাব বা জ্ঞানের ধ্বনিরূপ। ধ্বনি বা শব্দ ভাব ও জ্ঞানের বাহনমাত্র, যেমন, আর-একটা বাহন হচ্ছে হরফ বা লিখনরূপ। সুতরাং, আসল বস্তু হচ্ছে ভাব ও জ্ঞান। এই ভাব ও জ্ঞান না থাকলে শব্দ বা পদ নিরর্থক ; তা প্রয়োজনহীন। অতএব, ভাব ও জ্ঞানের উন্নতি ছাড়া ভাষার উন্নতি হবার কথা ধর্তব্যই নয়। ভাষার উন্নতি করতে হলে ভাব ও জ্ঞানের উন্নতি চাই-ই চাই। তার মানে, ভাষার উন্নতি হতে হলে সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন হতে হবে। কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলা চলে, সাংস্কৃতিক মান উন্নীত হলে ভাষার উন্নতি হবার পরিবেশ তৈয়ের হবে। যত বহুবিচিত্র ভাব ও জ্ঞানের সাধনা-কল্পনা হবে তত ভাষার উন্নতির উপায় হবার সুযোগ হবে।

আবার, এই সংস্কৃতির মান উন্নয়ন করতে হলে জীবনে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য, শান্তি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য থাকার আবশ্যকতা স্বীকার না করে উপায় থাকে না ; অর্থাৎ, কিনা, আর্থিক ও বৈষয়িক আনুকূল্য থাকা চাই সাংস্কৃতিক ও ভাষিক উন্নতির জন্যে। আবার, সাক্ষাৎভাবেও, অন্য যে-কোন-রকমের উন্নতির জন্যে যেমন—তেমনি ভাষার উন্নতির জন্যেও দরকার আর্থিক আনুকূল্য ও স্বাচ্ছল্য : ভাষা-বিষয়ে চর্চা ও গবেষণা, আলোচনা-পাঠনা-প্রচারণা, গ্রন্থ-রচনা ও প্রকাশনা প্রভৃতিও অর্থসাহায্য-সাপেক্ষ।

ভাষার উন্নতির জন্যে আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনের আবশ্যকতার পরেই ধরা যায় ভাষায় শব্দ সম্পদের প্রাচুর্যের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু, শব্দসম্পদ-ব্যাপারে শুধু সংখ্যার কথাটাই একমাত্র কথা নয়। পদের প্রয়োগ-সৌষ্ঠব ও ব্যবহার-সংগতি থাকা চাই। জ্ঞানবিজ্ঞান-সাহিত্যকলার সাধনায় নানা সমৃদ্ধ ভাষা হতে যোগ্য পদ আত্মসাৎ করার আগ্রহ ও তৎপরতা থাকা ভালো, বিশেষ, সেইরকম পদ যদি না থাকে ভাষায় ; অনুরূপ পদ ভাষায় থাকলেও অপর ভাষা হতে ঐ রকম পদ-গ্রহণে ক্ষতি নাই, কেননা, তাতে সমার্থক পদের সমৃদ্ধিতে ও ধ্বনিবৈচিত্র্যের সম্ভাবনায় ভাষার উন্নতির ক্ষেত্র তৈরির হয়। আমদানী-করা জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিষয় ঠিকঠিক প্রকাশের জন্যে আপন ভাষা হতেও পদ নির্মাণ করা যেতে পারে---বিদেশী পদের নিরুক্তির নিরিখে স্বভাষার তদর্থক নিরুক্তি নির্ণয় করে। ভাষাকে এমনি নমনশীল হবার সুযোগ করে দেয়াই ভালো। এইসব নবগঠিত বা আমদানী-করা পদের অভিধান, কি, নির্ঘণ্ট, রচিত হলে পদগুলির ব্যবহার-সংগতি ও প্রয়োগ-সৌষ্ঠব রক্ষিত হবে। এজন্যে কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে।

পদের সম্পদশীলতা তার অর্থবৈচিত্র্যে অর্থাৎ, বিভিন্ন অর্থে তার প্রয়োগ। এক তো, একই পদের বাচ্য বা মুখ্য অর্থই হতে পারে একাধিক ; তাছাড়া, লক্ষ্যার্থ বা আলংকারিক অর্থও হতে পারে তার।

সাহিত্যে, তারও বেশি কাব্যে, পদের এই বিশিষ্ট ব্যবহার ও আলংকারিক প্রয়োগের সুযোগের আধিক্য। তাই, সাহিত্যিক ও কবিদের পদের এমনি নিপুণ ও সুন্দর ব্যবহারে ভাষার সরসতা-সৃষ্টি ও চমৎকৃতি। কিন্তু, পদের এই অর্থবৈচিত্র্যময় ও বিশিষ্টার্থক প্রয়োগে সতর্কতা থাকা চাই, যেন অর্থবিভ্রাট ও অর্থজাটিল্য ঘটে প্রকাশ ও বোধ্যতার বাধা না হয়।

ভাষার প্রসারমাত্রই যে ভাষার উন্নতি তা অবশ্য নয়; কিন্তু, ভাষার প্রসারও কখনো-কখনো উন্নতির সূচনা করে। ভাষার প্রসারে ভাষার উন্নতি হতেও পারে; পারেই না এমন নয়। তাতে ভাষার অবনতির যে-আশংকা থাকে তা অতি অল্প; তার চেয়ে উন্নতির আশাই বেশি। তাই, ভাষার প্রসারের জন্যে সচেষ্ট থাকা বুদ্ধিমত্তা। কিন্তু, ভাষা যাতে প্রসারিত হতে পারে ভাষার সে-গুণ থাকা চাই। সে-উদ্দেশ্যে ভাষার সবচেয়ে বড়ো গুণ হচ্ছে ভাষার সহজতা ও সারল্য, আর, তার সম্পদশালিতা। ভাষার সহজতা-গুণের সংগে সম্পদশালিতা-গুণের বিরোধ নেই; অর্থাৎ, ভাষা সহজ হয়েও সম্পদশালী হতে পারে, আবার, সম্পদশালী হলেও ভাষার সহজ হতে বাধা হয় না। ভাষা সহজ হওয়া মানে, প্রথম তার পদের বানান, উচ্চারণ ও হরফ সোজা হওয়া, তারপর তার বাক্য-গঠনেও সারল্য সম্ভবমত থাকলে ভালো হয়। ভাষার প্রসারের জন্যেই নয় শুধু, উন্নতির জন্যেও তার সহজতার দরকার। পদের জটিল বানানে ও কঠিন উচ্চারণের জন্যে ভাষার আয়ত্তকরণ, কথন ও লিখনে অনর্থক যে বেশি উদ্যম, সময় ও স্থানের অপচয় হয় ভাষার প্রসার ও উন্নতি-বিষয়ে তার হিসেব করতে হয়। তুলনায় কম উদ্যম, সময় ও স্থান ব্যবহার করেও যদি সেই বিষয় ঠিক সেইমত প্রকাশ করা যায়, তবে, বেশি উদ্যম, সময় ও স্থানের ব্যবহার অপচয় নয় কি? এর জন্যে ভাষার বানান ও উচ্চারণের সংস্কার করতে হলে তাও করা উচিত। ভাষার মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়ের প্রকাশ; বানান ও উচ্চারণের জটিলতা যে তার সহায়ক, এমন-কথা মনে করবার হেতু খুঁজে পাওয়া দায়। এই জটিলতার সমর্থনে ভাষার নিয়ম ও শৃঙ্খলা রীতির যুক্তি তোলা-হলে বলা-যাবে, সব নিয়মের মত ভাষার নিয়মও পরিবর্তনশীল; প্রয়োজন ও সুবিধার তাগিদে তার সংস্কার হতেই হয়। তা ছাড়া, অন্য সব বিষয়ের মত এখানেও, নিয়মটাই যে লক্ষ্যবস্তু নয়, লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় মাত্র, সে-কথা ভুললে অনেক অনিষ্ট হবে। আসল লক্ষ্যে পৌঁছবার সহজতর উপায় আবিষ্কৃত হলে তাকে গ্রহণ করা যাবে না, এ ধারণা কুসংস্কারের জিদ ছাড়া কিছু নয়। বরং, লক্ষ্যে উপনীত হবার সহজতর উপায় আবিষ্করণের চেষ্টা সর্বদাই থাকা বাঞ্ছনীয়, কেননা, তাই হচ্ছে মানুষের বিশেষ সাধ্যবস্তু। লক্ষ্যে উপনীতির চরম উপায় আবিষ্কৃত হয়ে গেছে অতীতেই, আর তার চেয়ে সুবিধার উপায় বার করা যেতে পারে না, এমন ধারণা মানুষের সমস্ত ভাবী সাধনাসিদ্ধির ওপর সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সমান, এ-ধারণা অতীত-সম্বন্ধেও সত্য-জ্ঞান-লাভের দ্যোতক নয়: এ নিছক ভ্রান্ত প্রবৃত্তি।

জাতিতে-জাতিতে মেশামিশির ফলে ভাষায়-ভাষায় নানা বিদেশী কথা তো আসেই, আসে বিদেশী 'উপসর্গ' আর 'অনুসর্গ'ও। কোনো-কোনো সমস্ত-পদে এক একটী বিদেশী পদ থেকে পদসংকরের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবে, অভ্যাসের জড়তা, অথবা, মিছে অছুৎপনার জন্যে এ-গুলো আসার পথ তেমন অবাধ হয় না। কিন্তু, সুবিধামত এই রীতির অবলম্বন করতে পারলে ভাষার উন্নতিই হয়। অপর ভাষায় এমন উপসর্গ বা অনুসর্গ থাকতে পারে যাদের সাহায্যে উপযুক্ততর বা সুন্দরতর পদ গঠন করা যায়। তাছাড়া, এমন উপসর্গ-অনুসর্গ বিজাতীয় ভাষায় থাকা সম্ভব যা আপন ভাষায় নেই; সেখানে ঐজাতীয় উপসর্গ-অনুসর্গ ইচ্ছে করেই আমদানী করা ভালো, করলে ভাষার উন্নতিই হতে পারে। এমন অনেক বিদেশী অনুসর্গ থাকতে পারে যাদের সাহায্যে পদ গঠন করলে কবিতায় নোতুন নোতুন চরণান্তিক মিল জোগাবার উপায় সহজলভ্য হয়। অনেক বিজাতীয় ভাষার উপসর্গ-অনুসর্গের কল্যাণে নানা শব্দালংকার জোটবার সুবিধা হতে পারে। শুধু বিদেশী ভাষা থেকে কেন, অনেক উপভাষা বা তদ্ভব ভাষা থেকে উপসর্গ-অনুসর্গ গ্রহণের রীতিও ভাষার উন্নতির সহায়ক হতে পারে। সুতরাং, সেদিকেও সচেতন থাকতে হবে।

এমনটা সাধারণত দেখা যায় যে উপভাষা বা পরভাষা থেকে যে পরিমাণে বিশেষ্যপদ গৃহীত হয় সে-পরিমাণে হয় না অন্য জাতের পদ। হতে পারে, অন্য জাতের পদ তেমন খাপ খেতে চায় না; কিন্তু, শুধু তাই নয়। হতে পারে, গোঁড়ামি আর ভয় ওদের সংগে পরিচয় সহজ ও অবাধ হতে দেয় না। এমন সব অন্য জাতের পদ থাকতে পারে যা অধিকতর প্রকাশক্ষম, যা নেই নিজেদের ভাষায়। এমন জায়গায় গোঁড়ামি ও ভয় নিশ্চয় ক্ষতিকর। উপভাষীয় ও পরভাষীয় যে সব বিশেষণ ক্রিয়াজাত বিশেষণ, অব্যয় পদ প্রভৃতি ভাষার সংগে খাপ খেতে পারবে বা খাপ খাইয়ে নিলে ভাষায় কাজের সুবিধা বাড়বে সে সব পদ যেখান থেকে হোক নেয়াই যুক্তিযুক্ত।

একই পদকে একাধিক অর্থে ব্যবহার করায় যেমন ভাষার শক্তিবৃদ্ধি প্রকাশ পায়, একই পদকে বা একই পদ থেকে গঠিত পদকে বিভিন্ন প্রকারের পদরূপে ব্যবহারেও তেমনি ভাষার সম্পদশীলতার কথা বোঝা যায়। সম্ভব ও সুবিধামত বিশেষ্যপদকে বিশেষণ বা ক্রিয়াপদ রূপে, এবং বিশেষণপদকে বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ রূপে ও তেমনি ক্রিয়াপদকে বিশেষ্য ও বিশেষণপদ রূপে ব্যবহার করেও ভাষার শক্তিসম্পদ বাড়ানোর উপায় মিলতে পারে।

ভাষার উন্নতির জন্যে কখনো কখনো কোনো কোনো 'অবসলিট্' পদকে একটু ঝালাই করে, বা যেমনকার তেমনি আকারে ফের ব্যবহার করতে সুরু করা যেতে পারে। তেমনি আবার, অযোগ্য অচল অথচ ব্যবহৃত পদকেও সাবেক ভাষার মিউজিয়ামের কুলুঙ্গিতে রাখতে সংকোচ না করাই উচিত।

কথা বা পদই যদিও ভাষার আদি-অন্ত, মানে, কথা দিয়েই যদিও ভাষার শুরু আর সারা, তবু, ঠিক তাই নয়। অর্থাৎ কথা শুধু কথাতেই সম্পূর্ণ নয়; অর্থপ্রকাশের পূর্ণতায় তার সংগতি ও পূর্ণতা। এই অর্থ-প্রকাশের পূর্ণতার জন্যে পদে পদে বা কথায় কথায় যোজনা ও অন্বয়

ঘটে যে-রূপ হয় তাই বাক্য। পদের বাক্যবর্তী হওয়ায় বা পরিপূর্ণ অর্থপ্রকাশের গৌরব-পাওয়াতেই সার্থকতা। অনুভূতি ও চিন্তার প্রকাশ বাক্যে। অনুভূতি ও চিন্তা নানা প্রকারের। বাক্যও তাই হয় নানা আকার ও প্রকারের। পদের বিশিষ্ট ও আলংকারিক রীতিতে ব্যবহারের জন্যে বাক্যের অর্থগৌরব ও রীতিসমৃদ্ধি প্রকাশ পায়। বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষায় পদ বা বাক্যের আলংকারিক প্রয়োগের ধারাধরণ যে সর্বত্র একরকম হয় তা নয় ; অনেক জায়গায়,'এক-একটা ভাষার বিশিষ্ট অলংকরণ-রীতি দেখা যায়। যে-ভাষায় তেমন রীতি নাই সে-ভাষায় তার প্রবর্তন করে ভাষার সম্পদ বাড়ানো যেতে পারে। এমনি, অন্য ভাষার বা নানা উপভাষার 'ইডিয়ম্' ও প্রবচনও অনুবাদ করেও চালানো যেতে পারে। অপর ভাষা ও উপভাষার ইডিয়ম ও প্রবচনের সবগুলিই যে আপন ভাষায় আমদানি করা মানানসই হবে তা নয় ; তাই, ওগুলির মধ্যে খাৎসই ও জুৎসই যেগুলি সেইগুলিই আনা যেতে পারে। অথবা, এমনও হতে পারে বিচার করে না আনা হলেও, ওগুলির মধ্যে যেগুলি নিজের ভাষার সংগে মিশ খাবে না সেগুলি কালে আপনা হতেই খসে পড়বে। কিন্তু, মান রাখবার কথাটা হচ্ছে এই যে, এক ভাষার বা অনুন্নত কি অমার্জিতরূপ উপভাষার ইডিয়ম, প্রবচন যে অপর ভাষায় খাপ খায়ই না, এমন ধারণা ভ্রমাত্মক। নানা ভাষার তুলনামূলক আলোচনায় জানা যাবে, পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত ভাষাসমূহে শুধু পদই অপর ভাষা হতে গৃহীত হয় নি, হয়েছে ভাষার অলংকরণ-রীতি, প্রবচন ও ইডিয়মও। কিন্তু, তা হয়েছে অবচেতন-ভাবে, অর্থাৎ আপনা আপনি ; কেন না এখানেও সেই ভয় ও গোঁড়ামি বাধা হয়েছে উদারভাবে ও সব স্বীকরণের পথে। ভাষার দ্রুত সমৃদ্ধিতে সব থাকলে এ-বিষয়ে সচেতন হতে হবে। তাছাড়া, প্রতিভাশালী লেখকের উদ্‌ভাবিত ইডিয়ম্, রেটরিকও ভাষার সম্পদ বাড়ায়। তাঁদের রচিত অনেক দামী কথাও কালে প্রবাদবাক্যের মর্যাদা পায়। নানা উৎস হতে বাহিত এই সব ভাষাসম্পদের একত্র আহরণ বিশেষ দরকার। অর্থাৎ, ইডিয়ম, প্রবচন প্রভৃতির যথারীতি ব্যবহার হয়ে প্রসারণ হতে হলে এবং ভাষার স্থায়ী সম্পদরূপে গণ্য হতে হলে ইডিয়ম, প্রবচন প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন কোষগ্রন্থ বা নির্ঘণ্ট্‌ রচিত হওয়া একান্ত দরকার।

পদ্য-সাহিত্যের চর্চাতে ভাষার সমৃদ্ধি হয়। পদ্যের ছন্দ ও বিশেষ শোভাসৌন্দর্যের দাবিতে পদ্যের ভাষায় কিছুকিছু বিশেষ পদ বা কথা সৃজিত হয়ে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয়। এইসব কথা যে শুধু পদ্য বা কাব্য সাহিত্যেরই সম্পদ বাড়ায় তা নয়, গদ্যের, এমন কি, সাধারণ-ব্যবহারের ভাষাতেও সে-সম্পদ কাজে লাগে। কবিতার ছন্দ ধ্বনিতরঙ্গ-সৃষ্টির দ্বারা শ্রুতিসুখকর সুন্দর কথাকে সহজেই স্মরণীয় করে তোলে। সুতরাং, একথা বলবার হেতু পাওয়া যায় যে পদ্য সাহিত্যের নিয়ম-নির্ধারিত ছন্দ ভাষার শক্তিসম্পদ ও রম্যতা-সাধনে বেশ আনুকূল্য করে। এইজন্য ভাষায় ছন্দসাধনারও বিশেষ দরকার। পদ্যসাহিত্যের ছন্দবৈচিত্র্য ভাষার উন্নতির বিধায়ক। তাই, যত নবনব ছন্দ নির্মিত হয় ভাষার পক্ষে ততই কল্যাণ। ভাষায় যদি মৌলিক নোতুন-নোতুন ছন্দ আপন ঐতিহ্যক্রমে রচিত হয় তো ভালোই ; না-যদি হয় তো অপরভাষা থেকে এমন-সব ছন্দ বা ছন্দের ঝংকার, আভাস ও দোলা আনলে দোষের হয় না—যাতে-করে পদ্যসাহিত্যের ছন্দসম্পদ আরও ঐশ্বর্যবান হতে পারবে, এবং, পরিণামে ভাষার উন্নতি হবার উপায় হবে।

দরকারী বলে পুনরুক্তি দোষের ভয় সত্ত্বেও, ফের বলতে হচ্ছে যে ভাষার উন্নতি হতে হলে জাতির ভাষা-সচেতনতা থাকা অতি অবশ্য অবশ্য চাই। অর্থাৎ, এর উন্নতি যে জাতির উন্নতির জন্যে নিতান্ত দরকার, এর গৌরবে যে জাতির গৌরব, আর, এর উন্নতি যে সাধনা-সাপেক্ষ—একথা অবহিত হওয়া চাই। ভাষার গবেষণা, আলোচনা, চর্চার সবরকম অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের পক্ষে ঠিক সম্ভব ও সাধ্য নয়, তার জন্যে চাই জাতির সামগ্রিক সংকল্প। সরকারের পক্ষেই তা করা সুবিধা ও সম্ভব। অতএব, তা করতে হবে সরকারকে। দেশে নানা বিদেশী ভাষা শেখবার সুযোগ রাখতে হবে, যাতে কতিপয় ধীমান ব্যক্তি বহু বিদেশী ভাষা হতে ভালোভালো জিনিস সংকলন করে আপন ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। তেমনি আবার, আপন ভাষার প্রতি অপরভাষী লোককে, বিশেষ, আগ্রহী লোককে আকৃষ্ট করে সে-ভাষা শেখাবার সুযোগ রাখা চাই ; অর্থাৎ, আপন ভাষার প্রচার এবং প্রসারও চাই বইকি। জাতির তরফ থেকে এ-লক্ষ্যেও সুপরিকল্পিত চেষ্টা ও ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ভাষার উন্নতি-বিষয়ে সবার সারকথা হল ভাষীর শক্তিমত্তা ; শুধু ভাষার নয়, ভাষীরও। সে-শক্তির মূল শক্তি হচ্ছে ভাষার প্রকাশ শক্তি, আর, ভাষার চিৎ-শক্তি। ভাষার প্রকাশ-শক্তির মানে ভাষার স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা, ঋজুতা, বলিষ্ঠতা ও সৌন্দর্য-মাধুর্য। ভাষীর চিৎ-শক্তির মানে ভাষীর জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পকলা-সাধনের সাধ ও সাধ্য, এবং সে-সব প্রকাশ ও প্রচারের বাসনা ও ক্ষমতা।

নতুন-চীনের কৃষি-সংস্কার

শঙ্করপ্রসাদ মিত্র এম-এ (ক্যাণ্টাব), ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল, এম-এল-এ

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা নবা-চীন বিশেষ সাফল্যের সহিত সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। লোকায়ত্ত চীন সরকারের ভূমি সংস্কার নীতির দুইটি বিশেষ দিক আছে। (১) গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে পরিবর্তন চিহ্নিত হয়েছে ভূমিসংস্কার দ্বারা, এবং (২) কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধিত হয়েছে (ক) সমবায় সংস্থা গঠন ও (খ) কৃষির যান্ত্রিককরণের মধ্য দিয়ে।

১৯৫০ সালের জুন মাসে লোকায়ত্ত চীন-সরকার ভূমিসংস্কার আইন ঘোষণা করেন। জমিদার ও বিত্তবান চাষীদের জমি বাজেয়াপ্ত করে সেগুলি দরিদ্র ও ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে পুনর্বণ্টনের উদ্দেশ্যে এই আইন প্রবর্ত্তিত হয়। কয়েকটি জাতীয় সংখ্যালঘু অঞ্চল ছাড়া ভূমিসংস্কারের কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মোট ৪ কোটি ৭০ লক্ষ হেক্টর (২½ একার এক হেক্টর) জমি ৩০ কোটি কৃষকের ভেতর বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া সরকার যে সমস্ত কৃষি যন্ত্রপাতি এবং গৃহপালিত পশু বাজেয়াপ্ত করেন, সেগুলিও বণ্টন করা হয়।

ভূমিসংস্কার পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্ভবপর হয়েছে একমাত্র জনসাধারণের ভেতর আন্দোলনের সৃষ্টি করে। ভূমিহীন দরিদ্র চাষীরাই এই আন্দোলনের শক্তিসঞ্চার করেছে। চীনের সমগ্র কৃষক সমাজের শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগই ছিল দরিদ্র ভূমিহীন এবং ভাড়াটে চাষী।

মধ্যবিত্ত চাষীদের সহযোগিতায় ভূমিসংস্কার আইনকে কার্য্যকরী করা হয় এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন চাষীরা হয় এই সংস্কার আন্দোলনের মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি হয় মধ্যবিত্ত চাষীদের সমর্থনে। কৃষকদের এই সংহতিকরণের ফলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করবার উৎসাহে চাষীরা মনে প্রাণে অনুপ্রাণিত হয়। তিন বৎসরের ভেতর ফসলের উৎপাদন যুদ্ধ-পরবর্ত্তী উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যায়।

১৯৫২ সালে যে শস্য উৎপাদন করা হয়েছিল তা' ১৯৪৯ সালের চেয়ে ৪৫% ও ১৯৩৭ সালের চেয়ে ৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫২ সালের তুলা ১৯৪৯ সালের তুলনায় তিনগুণ বেশি হয়েছিল।

যে কৃষকদের উচ্চহারে খাজনা দিতে হত এখন তাদের কোন খাজনা দিতে হয় না। কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা ১৯৫০ ও ১৯৫৩ সালের ভেতর ৭৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভূমিসংস্কার ব্যাপারে মধ্য-চাষীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করা হয়নি। মধ্যচাষীর জনপ্রতি জমির পরিমাণ গড়ে ৫ একর বা ১৫ বিঘা। যে জমি ধনী কৃষক নিজে চাষ করে, সেই সব জমি ভূমিসংস্কার আইনের ভেতর পড়েনি।

কৃষিকার্য্যের সমাজীকরণ ভূমিসংস্কার আইনের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পড়েছে। জমি পুনর্বণ্টনের পর ছোট জমির টুকরাগুলি কৃষকদের ব্যক্তিগত অধিকারে পড়েছে। ১১০ মিলিয়ন ইউনিট কৃষক পরিবারকে পরিকল্পনাধীন সমাজীকৃত উৎপাদনে লাগান হবে। ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন—নবা চীনের ইহাই উদ্ভাবিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতির তিনটি স্তর আছে—(১) পারস্পরিক সাহায্যকারী দল (Mutual aid teams) (২) কৃষি উৎপাদকের সমবায় সমিতি (Co-operatives), (৩) সংঘবদ্ধ উৎপাদন সংস্থা (Collective Farms)।

পারস্পরিক সাহায্য বলতে বোঝায় ৫ থেকে ৭টী পরিবার কর্ত্তৃক একত্রে কৃষিকার্য্য সম্পাদন, কিন্তু জমি ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকবে ও শস্য জমি অনুসারে বিভক্ত হবে।

কৃষি উৎপাদকদের সমবায় সমিতি ২০টি পরিবার বা তদধিক দ্বারা গঠিত। সমবায় সমিতিগুলি সমস্ত জমির ব্যবস্থা একত্রেই সম্পাদন করে এবং জমির মালিকানা ও শ্রমনিয়োগ হিসাবে সকল উৎপাদিত শস্য ভাগ করে দেওয়া হয়। গড়পড়তা হিসাব জমির মালিকানা অনুযায়ী ১৫% ও শ্রমনিয়োগের জন্য ৮৫%। ইহাকে বলা হয় অর্দ্ধসমাজবাদী, কারণ ইহা কতকাংশে ব্যক্তিগত ও কতকাংশে একত্রে সম্পন্ন করা হয়। পারস্পরিক সাহায্যকারী দলের উৎপাদনের চেয়ে সমবায় সমিতির উৎপাদন গড়ে ২০% বেশী। সমবায় সমিতিতে কৃষির উন্নতির পরিকল্পনার ওপর জোর দেওয়া হয়, এবং জমির মালিকানা কৃষকদের হাতে থাকায় তাহারাও এই ব্যবস্থায় সহজেই রাজী হয়।

সমাজবাদী পরিবর্ত্তনের তৃতীয় ও চূড়ান্ত স্তর সংঘবদ্ধ উৎপাদন সংস্থা। চাষীদের নিজেদের চেষ্টায়ই ইহা প্রবর্ত্তিত হয়। সংঘবদ্ধ উৎপাদন সংস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা আর থাকে না। শ্রমানুযায়ী উৎপাদিত শস্য বিতরিত হয়। মালিকানা সাধারণ এবং ব্যবস্থা সংঘবদ্ধ। শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় মূলধন সংঘবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থার যান্ত্রিকীকরণের জন্য সুলভ্য হয়েছে।

আমরা কেন্দ্রীয় লোকায়ত্ত সরকারের কৃষিমন্ত্রী শ্রীশি-লি-আওর কাছ থেকে শুনেছিলাম যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষদিকে নবা চীনে কৃষি ব্যবস্থার সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিকীকরণ হবে। বর্ত্তমানে ২শত থেকে ৩শত সংঘবদ্ধ কৃষিসংস্থা প্রচলিত আছে। বৃহত্তম কৃষিসংস্থা—১০০০ কৃষি পরিবার লইয়া সিয়াংসি প্রদেশ গঠিত। প্রায় ৬০% পরিবার পারস্পরিক সাহায্যকারী দল বা সমবায় সমিতিতে যোগদান করেছে, কিন্তু তাতে ২০ থেকে ৩০টি পরিবার এবং ৫০০ মাউ বা ৮৩ একর বা ২৪৯ বিঘা জমি তাদের আছে।

কৃষি উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্র দুই ধরণের সাহায্য দান করেন (১) আর্থিক ও অর্থনৈতিক (২) যান্ত্রিক।

রাষ্ট্র প্রতি বৎসরে ০৭৫% হার সুদে ধার দেন। গড়ে প্রতি সমবায়

সমিতিকে ১৫ মিলিয়ন য়ুয়ান বা ৩০০০ টাকা ধার দেওয়া হয়। পারস্পরিক সাহায্য দলকে রাষ্ট্র আরও কম ধার দেন।

কৃষিকর জনপিছু উৎপাদনের ৬% থেকে ১০% পর্য্যন্ত ধাৰ্য্য হয়।

১৯৫৪ সালের ১১ই অক্টোবর আমরা মুকদেনের নিকট কাস্‌কান বা গাওথান গ্রামের একটি সংঘবদ্ধ কৃষিসংস্থা পরিদর্শন করি। ঐ গ্রামে ১৬০টি পরিবারে ৭৭৭জন বাস করে। সম্পূর্ণ স্থানটি ২২৬৮'১ মাউ। মুক্তির পূর্ব্বে গ্রামের ৯০% ভাগ জমি জমিদারদের হাতে ছিল। কৃষকদের সম্বৎসরের খাদ্য থাকতো না। ভাড়াটিয়া কৃষকদের উৎপাদনের যন্ত্র ছিল, কিন্তু জমি ছিল না। প্রতি কৃষকের গড়ে ২৭ দান আয় ছিল। ভূমিকরের জন্য ১৩ দান, জাপানী আক্রমণকারীদের দিতে হত ৬ দান, রাজস্ব ২ দান এবং জমির মালিককে পুরস্কার স্বরূপ ১ দান দিতে হত। ফলে কেবলমাত্র ৫ দান অবশিষ্ট থাকতো, কৃষকের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য। মুক্তির পর ভূস্বামীদের অধিকৃত জমি ও ধনী কৃষকদের উৎপাদন-যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয় ও উহা দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের ভেতর বিতরিত হয়। ১৯৫১ সালে কৃষকেরা ৭টি পারস্পরিক সাহায্যকারী দল গঠন করে। ১৯৫১ সালের শরৎকালে জমির গড় উৎপাদন প্রতি মাউএ ৭৭০ ক্যাটি থেকে ৪০০ ক্যাটি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৯৫২ সালে কৃষকগণ উৎপাদকদের সমবায় সমিতি গঠন করে এবং আধুনিক যন্ত্র ও উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। প্রতি মাউএর উৎপাদন ৪২০ ক্যাটি থেকে ৪৪৫ ক্যাটি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৩ সালে চাষীরা ট্রাক্টর ও উৎপাদন যন্ত্র লাভ করে এবং উৎপাদন প্রতি মাউএ ৬৭৭ ক্যাটি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। শতকরা ৮০ ভাগ জমি এখন ট্রাক্টর দ্বারা কর্ষিত হয়।

মুক্তির পূর্ব্বে জমি উর্ব্বর ছিল কিন্তু শোষণের জন্য উৎপাদনের হার ছিল নিম্ন। অধিবাসীরা এখন টালির ছাদযুক্ত ৬৩টি গৃহ, ৩০টি কুটীর, ১টি স্কুল, ১২টি আস্তাবল ও ৮টি গোলা নির্ম্মাণ করেছে। ৪টি ক্রেতা সমবায় সমিতি স্থাপিত করেছে। পূর্ব্বে গ্রামে একটিমাত্র কূপ ছিল। এখন পাম্পযুক্ত ৪০টি কূপ হয়েছে। কৃষকদের সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক মান উন্নীত হয়েছে। একটি নৈশ বিদ্যালয়ে দুই বৎসরে একজন কৃষক ২৫০০ শব্দ শিখেছে এবং সংবাদপত্র পড়তে পারে। সাত বৎসরের সকল বালক বিদ্যালয়ে যেতে পারে। প্রাচীন চীনে এই গ্রামে মাত্র দুইজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। এখন সেখানে ২১জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র আছে এবং ইহাদের মধ্যে তিনজন উর্দ্ধতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। শিশুদের জন্য একটি সেবাসদন আছে, একটি কৃষি-নির্দ্দেশক ষ্টেশন এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে। ৮টি জমিদার পরিবার দরিদ্র ও ভাড়াটিয়া কৃষকদের মত একই পরিমাণ জমি পেয়েছে। কৃষিসংস্থার আয় থেকে কৃষিকর ও উৎপাদনের জন্য যে অর্থ-বিনিয়োগ করা হয়েছে তাহা বাদ দেওয়া হয়। কৃষি সমবায় সংস্থাকে যে সকল ভূমি কৃষকেরা দিয়েছে, তার জন্য সংস্থা তাদের ভাড়া দেয়। এই দিক থেকে দেখলে প্রকৃতপক্ষে ইহা কৃষি সমবায় সংস্থা নয়, কারণ ব্যক্তিগত ভাবে কৃষকেরা জমি নিজেদের স্বত্বে এখনও রাখে। সংস্থার প্রত্যেক সভ্যও '১৫ মাউ জমি নিজের ব্যবহারের জন্য রেখেছে। সংস্থার প্রত্যেক সভ্য নিজের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অংশটি রেখে উৎপাদনের নিজের অংশ রাষ্ট্রের নিকট বিক্রয় করে। ১৯৫১ সাল থেকে রক্ষিত শস্যের জন্য রাষ্ট্র যোগ্য মূল্যই দেয়। গড় উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ কৃষকদের ভাড়াস্বরূপ সংঘবদ্ধ কৃষিসংস্থা থেকে দেওয়া হয়। পুরাতন জমিদারদের এই সংস্থায় যোগদান করতে দেওয়া হয় না।

১৯৫৪ সালের ১৮ই অক্টোবর আমরা সিয়ানের নিকটবর্ত্তী কুয়োটিপুটিয়ে গ্রামে যাই। এই গ্রামটির ব্যবস্থাপনা করে একটি সমবায় সমিতি। স্বাধীনতার পূর্ব্বে জমিদারদের পাঁচটি পরিবার, তিনটি ধনী কৃষকপরিবার এবং ১০০টি দরিদ্র কৃষক পরিবার এই গ্রামে ছিল। ১৩২৫ মাউ ভূমিতে ৫৮২ জন লোক বাস করে। স্বাধীনতার পূর্ব্বে ২৮২'৮ মাউ জমি ৪৭ জন জমিদারের ব্যক্তিগত ভোগদখলে ছিল এবং গড়ে ৬'১ মাউ জমি মাথা পিছু ধার্য্য ছিল। একুশজন ধনী কৃষকের জনপ্রতি গড়পড়তা ৫'৬ মাউ জমি ছিল এবং পাঁচশত গরীব কৃষকের জনপ্রতি জমি ছিল গড়পড়তা ১'৮ মাউ। অনাহার এবং শীতকালে বরফ জমানো ঠাণ্ডা ও ছিল। শতকরা সত্তরজন কৃষক অনাহারে এবং শতকরা নব্বুইজন সব সময়ে মৃত্যুভয়ে ভীত থাকতো। ভাড়াটিয়া শ্রম ও ঋণের ওপর উঁচু সুদ ধার্য্য করে জমির মালিকেরা বিলাস ব্যসনে জীবন কাটাত। কুওমিংটাং সরকার গুরু করভার চাপিয়েছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে কিছু ক্যাটিজ তুলা ধার করবার জন্য একটি কৃষককে জমিদারের কাছে তাহার কন্যা ও আঠার মাও জমি বিক্রয় করতে হয়েছিল। পুরাতন সমাজে উৎপাদনের অর্দ্ধাংশ খাজনা হিসাবে দিতে হত এবং তারও ওপর ছিল কর। ১৯৫০ সালে ভূমিসংস্কার আরম্ভ হল। ১৯৫১ সালে শ্রেণী বিভাগ তৈরী হল এবং নিয়মিত ভাবে জমি বাজেয়াপ্ত করা হল। দুইশত আশি মাও জমি, ছয়টি পশু (খচ্চর এবং গরু), দুইশতর বেশী কৃষিযন্ত্র, নয়টি ঘর, পাঁচ হাজার একশত কুড়ি ক্যাটিজ শস্য এবং এক হাজার তিনশত পঞ্চাশ ক্যাটিজ তুলা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। কৃষকেরা তখন বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি বিতরণের জন্য একটি কমিটি নির্ব্বাচিত করল। আটষট্টিটি জমিহীন দুঃস্থ পরিবার জমি পেল, পাঁচটি পরিবার বাড়ি পেল, নব্বইটি পরিবার কৃষিযন্ত্র পেল। জমিদারদেরও সমান পরিমাণ জমি, কৃষিযন্ত্র এবং পশু দেওয়া হল, যাহাতে তাহারা শ্রমের ভেতর দিয়ে নিজেদের সংস্কার করতে পারে। ১৯৫১ সালে সতেরটি পারস্পরিক সাহায্যদান সমিতি গঠিত হল। গ্রামবাসীর শ্রম ও পশুশক্তির সমস্যার সমাধান করল এবং ১৯৫২ সালে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হল। ১৯৫৩ সালের শীতকালে কুড়িটি পরিবার, দুইশত ষাট মাও জমি, দশটি পশু এবং দুইটি গরু নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠিত হল। এখন একশত তিন পরিবার অর্থাৎ ধনী কৃষক ও জমিদার পরিবার ব্যতীত আর সমস্ত পরিবারই সমবায় সমিতিতে যোগদান করেছে। সমবায় সমিতি গঠিত হলে পর বিভিন্ন মাটির উপযোগী বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনের ব্যবস্থা হল। শ্রমবিভাগ ও পেশা বিভাগের ব্যবস্থাও চালু হল। গভীর ভাবে জমি কর্ষণ, গভীর ভাবে বীজবপন, ঘনভাবে চারা রোপণ এবং উৎকৃষ্ট বীজ নির্ব্বাচনের জন্য সমবায় সমিতিগুলি উন্নততর অভিজ্ঞতা আহরণ করতে চেষ্টা করছে। ১৯৫৪ সালে মাও প্রতি তিনশত

চুরাশি ক্যাটিজ গম উৎপন্ন হয়—১৯৫২ সালে যখন পারস্পরিক সাহায্য সমিতি ছিল তখন থেকে একশত বার ক্যাটিজ বেশী এবং গ্রামগুলি যখন বিশৃঙ্খল ছিল তখন থেকে দুইশত চার ক্যাটিজ বেশী গম উৎপন্ন হলো। ১৯৫১ সালে মাও প্রতি ছেচল্লিশ ক্যাটিজ তুলা উৎপন্ন হয়। ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে যথাক্রমে একষট্টি এবং সত্তর ক্যাটিজ হয়েছিল; ১৯৫৪ সালে মাউ প্রতি একশতদশ ক্যাটিজ তুলা আশা করা হয়।

প্রতি পরিবারেই এখন একটি করে থার্মোফ্লাস্ক এবং রবারের জুতো এবং কাহারও কাহারও টর্চ্চলাইট আছে। ৫৩টি ঘর এবং ৩৫টি মাটির বাড়ী নতুন করে তৈরী হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংখ্যা ২ থেকে ১৪ জন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৫৪ থেকে ৮৫ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অশিক্ষা দূরীকরণের বিদ্যালয়ে ২৮ জন ও শীতকালীন বিদ্যালয়ে ৬১ জন যোগ দিয়েছে। "Mass" নামক সংবাদপত্রের তিন কপি গ্রামে আসে, আর আসে "সান্সীর কৃষক" পত্রিকার ৮ কপি, "উইমেন্স পিক্টোরিয়াল" পত্রিকার ১৪ কপি এবং "ইয়ুথ" পত্রিকার এক কপি। বৎসরে তিনবার করে কৃষকদের কলেরা প্রতিষেধক ঔষধ দেওয়া হয়, বৎসরে একবার করে শিশুদের টীকা দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে জনসংখ্যা ৭১০, গড়প্রতি জমিস্বত্ব ১·৮ মাও থেকে ২·৮ মাও পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়েছে।

একজন পুরাতন জমিদারের বাড়ীতেও আমরা গিয়েছিলাম। তিনি বললেন যে পূর্ব্বে তাঁহার ৬০ মাও জমি ছিল। এখন ১৮·৩৪ মাও তাঁর অধিকারে আছে। তাঁহার ২৫টি কৃষিযন্ত্র ছিল, ২টি পশু ছিল, একটি গরুর গাড়ী এবং একটি জলচাকা ছিল। এখন তাঁহার ১৬টি কৃষিযন্ত্র, এক তৃতীয়াংশ গরুর গাড়ী এবং জলচক্রের দশভাগের চারভাগ আছে। ৯টি ঘরে ১১ জন পরিবারের লোক তাঁহার আছে। তাঁহার একটি ঘরও বাজেয়াপ্ত হয় নি। তিনি কোন ভাড়াটিয়া কৃষক পান না এবং নিজের জমি তাঁকে নিজেকেই চাষ করতে হয়। তিনি বললেন, মুক্তির পূর্ব্বে তিনি ৩২০ ক্যাটিজ গম প্রতি মাওএ উৎপন্ন করেছেন, এখন তিনি সেইস্থলে ৪১৬ ক্যাটিজ গম উৎপন্ন করেন। সমাজে তাঁহার কোন স্থান নেই এবং ভোটাধিকার তিনি হারিয়েছেন।

তাঁহার সম্মুখদ্বারে চীনাভাষায় একটি প্লাকার্ড দেখলাম। দোভাষী সেই লেখাটিকে অনুবাদ করলেন—"বায়ু পরিবর্ত্তন।" আমরা তাঁহার স্নানাগার দেখলাম, উহা প্রাচীন কিন্তু পরিষ্কার। গ্রামের কনজারভেন্সি ব্যবস্থা চীনে দেখলাম, এখনও আদিম প্রকৃতির রয়েছে। আমরা কোনও গ্রামেই সেপটিক ব্যবস্থা দেখিনি।

উপরে প্রদত্ত বিশেষ ধরণের দুইটি উদাহরণ গ্রামের পুরাতন সমাজ এবং ভূমিসংস্কারের পর যে সব পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তার নিদর্শন দেয়।

নব্য চীনে আমাদের সাত সপ্তাহ ভ্রমণকালীন যে সকল ভূমিসংস্কারকের সহিত সংযোগ হয়েছিল, তাঁরা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করাতে চেষ্টা করলেন যে চীনের গণসরকার কৃষক সমাজের ওপর বলপূর্ব্বক কৃষির সমবায়তা চাপানো বিশ্বাস করেন না। সমাজতন্ত্রে ক্রমিক রূপান্তরই তাঁদের নীতি এবং শিক্ষা, উপদেশ ও সমবায় সংস্থার জনকল্যাণের জন্য উপযোগিতার প্রচার দ্বারা কৃষককুলকে তাঁরা ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে তাঁদের প্রচারিত নীতিতে বিশ্বাস করাতে ইচ্ছা করেন।

নীস্

শ্রীরাধাভূষণ বসু

একজন বিদেশী ভূপর্য্যটকের ভ্রমণকাহিনীতে পড়েছিলাম—"Nice by name, Nice by nature" অর্থাৎ নামে সুন্দর, স্বভাবেও সুন্দর। কথাটী বহুদিন ধরে মনে গাঁথা ছিল এবং অনেকদিন ধরে ইচ্ছা ছিল যে সুযোগ পেলেই এই "NICE" নামক স্থানটীকে দেখতে হবে। সুতরাং দক্ষিণ ফ্রান্সে বেড়াতে বেড়াতে সুযোগ যখন এসে গেল, তখন আর অবহেলা করা উচিত মনে করলাম না।

এই NICE হল দক্ষিণ ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরোপকূলস্থিত একটী মাঝারি আকারের সহর। ইংরাজী উচ্চারণ "নাইস্" হলেও এই সহরটীকে "নীস্" বলা হয়। আজকাল আবার এটী "নীজা" (NIZA) নামেও পরিচিত।

দক্ষিণ ফ্রান্সে ভূমধ্যসাগরোপকূলে অবস্থিত মার্শাই বন্দর হতে সুরু করে বরাবর ইটালী সীমান্ত পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূলস্থিত স্থানটী ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা (French Riviera) নামে পরিচিত। এই ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা সারা পৃথিবীর ভ্রমণকারীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের স্থান এবং আন্তর্জ্জাতিক ভ্রমণ তালিকায় ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার স্থান প্যারিসের পরেই। ফ্রান্সে গিয়ে ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা বাদ দিলে ফ্রান্স ভ্রমণ সম্পূর্ণই হয় না। "রিভিয়েরা" কথাটীর উৎপত্তি ইংরাজী কথা "রিভার্" হতে। "রিভার্" মানে নদী। সারা ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরাতে সমুদ্র এত শান্ত এবং সমাহিত যে মনে হয় এ যেন ঠিক একটী নদী—শুধু জলের রং নীল—এই যা তফাৎ। এই ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরাতে অনেকগুলি ছোট এবং মাঝারি আকারের সহর আছে। এই সহরগুলির প্রত্যেকটী এত সুন্দর এবং নিখুঁত ভাবে সাজানো যে মনে হয় এ যেন পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনও জগৎ। এই সহরগুলির মধ্যে নীস্ (NICE), কান্ (CANNES), মন্টি কার্লো (MONTE CARLO), মেণ্টন্ (MENTON) প্রভৃতির নাম বিশ্ববিখ্যাত।

মন্টি কার্লো অবশ্য আরও একটী কারণে বিশ্ববিখ্যাত—সেটী হচ্ছে,

এখানকার জুয়াখেলার আড্ডা। মন্টি কার্লোর জুয়াখেলার এত প্রসিদ্ধি যে পৃথিবীর যত বড় জুয়াড়ী হোক না কেন, তাকে মন্টি কার্লোতে আসতে হবেই জুয়াখেলাতে। মন্টি কার্লোতে অন্ততঃ একবাজী না খেলতে পারলে জুয়াড়ীর পক্ষে কৌলিন্য মর্য্যাদা লাভ করা কঠিন।

কান্ সহরটী ছোট এবং ছোট বলেই বেশী সুন্দর। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এটী খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে ১৯৩৬ সালে, যখন অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর ইংলণ্ডাধিপতি অষ্টম এডোয়ার্ড সিংহাসন ত্যাগ করে তাঁর প্রণয়িনীকে নিয়ে এসে এই কান্ সহরে একটী ভিলায় বাস করতে থাকেন। সেই হতে তিনি সস্ত্রীক কানেই আছেন এবং এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন।

ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার সহরগুলির মধ্যে নীসই সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং ফ্যাশনের স্থান। সেই জন্যে বিদেশী ভ্রমণকারীরা ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরাতে আর কোথাও না যান, নীসে একবার আসবেনই। নীস্ হল ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরাতে একমাত্র হাল ফ্যাশনের কেন্দ্র—তাই প্যারিসের কয়েকটী বিখ্যাত এবং অভিজাত দোকানের একমাত্র শাখা নীসে অবস্থিত। সারা ফ্রান্সে এই দোকানগুলির আর কোনও শাখা নেই। বিদেশী ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্যে নীসে একটী বিমান বন্দরও আছে।

বার্সেলোনা (Bercelona) ভ্রমণ শেষ করে ফ্রাঙ্কো-স্প্যানিশ সীমান্তে অবস্থিত সেরবেরে (Cerebere) নামক স্থান হতে কন্টিনেন্টাল্ এক্সপ্রেস ট্রেণযোগে বেলা নটায় নীসে পৌছানো গেল। ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মী মঁশিয়ে দ্য মিন্‌ভিল্ (DeMinville) সাহেব কাজ হতে অবসর গ্রহণ করে নীসেই বাস করছেন। ভদ্রলোক জাতিতে খাটী ফ্রেঞ্চ হলেও ইংরাজীতে যথেষ্ট পারদর্শী এবং প্রায় চল্লিশ বছর কর্ম্মজীবন কাটিয়ে গেছেন বাংলাদেশের পলাশী গ্রামে। মিন্‌ভিল্ বাংলাও বেশ পরিষ্কার বলেন। বিদেশে, বিশেষ করে ফ্রান্সে, তাঁর অপেক্ষা ভাল গাইড্ পাওয়া অসম্ভব। তার ওপর, আমরা "পার্লে ফ্রাঁসে" (Parle Francaise)র ধার ধারিনে অর্থাৎ কিনা ফ্রেঞ্চ ভাষার কিছুই জানিনে। সুতরাং মঁশিয়ের সৌজন্যে এবং সাহায্যে ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরাটী বেশ ভাল ভাবেই দেখা গেল।

নীস্ সহরটীর সমুদ্রের ধারে বিস্তৃতি প্রায় তিন মাইল। এই—তিন মাইল ধরে সমুদ্রোপকূলের ধারে অতি মনোরম ষ্ট্রাণ্ড (Strand) আছে এবং তারই পাশ দিয়ে চলেছে প্রশস্ত রাজপথ। এই রাজপথ শুধু নীসেই নয়—সারা ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা জুড়ে ইটালী সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই রাজপথের ধারেই একেবারে সমুদ্রের ওপর অবস্থিত আছে আধুনিকতম এবং আভিজাত্যপূর্ণ সুবৃহৎ হোটেল শ্রেণী, নানা জাতীয় বিপনী, কাফে প্রভৃতি। এই হোটেলগুলি এক একটী প্রাসাদের মত এবং সেখানকার আহার, বিহার, আরাম প্রভৃতির ব্যবস্থার তুলনা হয় না।

নীসের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। উপরে অনন্ত নীল আকাশ, নীচে নীলজলরাশি বেষ্টিত সমুদ্রোপকূল, স্থানে স্থানে খেজুর, পাম্ জাতীয় নানা রকম নাতিশীতোষ্ণদেশ সুলভ গাছপালার সমাবেশ—সব মিলিয়ে মনে হয় এ যেন ইউরোপ ছাড়া কোনও দেশ। একমাত্র লোকজন, হোটেল এবং বিপনী শ্রেণী ভিন্ন ইউরোপীয় সহরসুলভ কোনও নিদর্শনই নেই এখানে।

নীসের আবহাওয়াও খুব আরামদায়ক এবং উপভোগ্য। নীসের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ অর্থাৎ খুব ঠাণ্ডা নয়, আবার খুব গরমও নয়। খুব একটা ভীষণ রকম শীত কখনও নীসে দেখা যায় না—আবার, গরমকালেও ভয়ানক রকম গরম হয় না। এই জন্যে শীতকালে সারা উত্তর ইউরোপে যখন বরফ পড়ে এবং ইউরোপীয় শীতঋতুসুলভ বৃষ্টি, কুয়াশাতে মন-মেজাজ বিরক্ত হয়ে ওঠে, তখন উত্তর ইউরোপের লোকেরা দলে দলে ছুটে আসেন ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরাতে—বিশেষ করে নীসে। ডিসেম্বর, জানুয়ারী মাসেও নীসে দিনের বেলা মেঘমুক্ত আকাশ এবং প্রচুর সূর্য্যের আলো থাকে—রাত্রেও অগণিত তারকাখচিত চাঁদনী রাত পাওয়া যায় প্রায়ই।

নীসের এই উপভোগ্য শীতকালীন আবহাওয়ার জন্যে ইংলণ্ডের রাজ-পরিবার অনেকদিন পর্য্যন্ত শীতকালে নীসে এসে বাস করতেন। শীতকালে ইংলণ্ডের আবহাওয়া যখন বৃষ্টি, কুয়াশা, বরফ প্রভৃতির জন্যে অস্বাচ্ছন্দ্যকর মনে হত তখন তাঁরা নেমে আসতেন নাতিশীতোষ্ণ এই ছোট সহরটীতে—যদিও এটী বিদেশ। এই জন্যে নীসের একটী অভিজাত পল্লী একেবারে ইংরেজদের দখলে বললেই হয়। এই অংশে ইংলণ্ডের রাজাদের বাসোপযোগী প্রাসাদ, রাজ-অতিথি, কর্ম্মচারী প্রভৃতির থাকার বাড়ী ইত্যাদি নিয়ে একটা সম্পূর্ণ মহল্লা খাস ইংরাজদের দখলে। ইংলণ্ডের রাজাদের মধ্যে যাঁরা নিয়মিতভাবে নীসে এসে শীতকালে বাস করতেন তাঁদের মধ্যে সপ্তম এডোয়ার্ডই প্রধান। রাণী ভিক্টোরিয়াও প্রায়ই আসতেন। সপ্তম এডোয়ার্ডের পরে ইংলণ্ডের কোনও রাজা আর নীসে এসে থাকেন নি। নীসে অবস্থিত ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদ দেখার যোগ্য এবং আকৃতি ও গঠন-নৈপুণ্যে বাকিংহাম্ প্রাসাদ অপেক্ষা ভাল। রাজপ্রাসাদের সামনে রাজপথের ওপর রাণী ভিক্টোরিয়ার এক মার্ব্বেল ষ্ট্যাচু আছে। গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নীস্ কয়েক বছর জার্ম্মান্ সৈন্যবাহিনীর দখলে ছিল। তখন এই রাজপ্রাসাদ জার্ম্মান্ সামরিক কর্ম্মচারিগণের বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হয়। জার্ম্মানদের দখলাধীন থাকা অবস্থায় রাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্তিটীর যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এটীর আবার সংস্কার করা হয়েছে যুদ্ধের পরে।

নীসের আবহাওয়া সুদূর রাশিয়ার লোকদের পর্য্যন্ত প্রলুব্ধ করেছে এবং নীসে একটি রাশিয়ান্ কলোনীও আছে। এই রাশিয়ান্ কলোনীর সূত্রপাত বা স্থাপনা হয় রাশিয়ার "জার" অথবা রাজার ভাইএর জন্যে। রাশিয়াতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকার সময়ে জারের এক ভাইএর টিউবার্ কিউলেসিস্ হয়। নীসের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া এই রোগ হতে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে অনুকূল মনে করে চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি নীসে এসে থাকেন। ভদ্রলোক অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত নিরাময় হতে পারেন নি কিন্তু পরোক্ষভাবে তিনি নীসে একটী রাশিয়ান্ কলোনী প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। রাজকুমারের সঙ্গে লোকজন কিছু এসেছিলেন রাশিয়া হতে। রাজকুমার নীসে দেহ রাখার পরেও তাঁরা নীসেই থেকে

গেলেন। ক্রমশঃ তাঁদের আত্মীয়-স্বজন এবং অন্যান্য অনেক রাশিয়ান্ এসে নীসে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন। এইভাবে গত ষাট-সত্তর বছরে নীসে বহু রাশিয়ান্ এসে গেছেন—যার ফলে এখন নীসে একটী স্থায়ী রাশিয়ান্ কলোনী গড়ে উঠেছে। এই রাশিয়ান্ কলোনীর রাস্তাগুলির নাম পর্য্যন্ত রাশিয়ান্। এখানে তাঁদের নিজস্ব একটী গীর্জ্জাও আছে। এই গীর্জ্জাটীর স্থাপত্য বিশুদ্ধ রাশিয়ান্ এবং নীসের অন্য কোনও গীর্জ্জার সঙ্গে এটীর সাদৃশ্য নেই। নীসের বসবাসকারী এই সকল রাশিয়ান্ রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী এবং পাদরী তথা অন্যান্য অনেকেই গুম্ফশ্মশ্রু-বিভূষিত। এই রাশিয়ান্ গীর্জ্জায় একটী রবিবার সকালে উপাসনার সময়ে আমাদের উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটেছিল। গীর্জ্জাটী ছোট হলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অপূর্ব্ব। গীর্জ্জার ভিতরে উপাসনার সময়ে রাশিয়ান্ ভাষায় বাইবেল পাঠ এবং দলে দলে রাশিয়ান্ নর-নারীর প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি হস্তে প্রবেশ—পরিবেশটী যেন মধ্যযুগীয় বলে মনে হয় এবং মনে গভীর রেখাপাত করে।

নীসের প্রাকৃতিক দৃশ্য, জল-বায়ু সব কিছুই উপভোগ্য নিঃসন্দেহ, কিন্তু নীস্ একটী ব্যয়সাপেক্ষ স্থান। এমন কি প্যারিসের মত মহার্ঘ স্থানের তুলনায় নীসে আহার, বিহার, বাসস্থান প্রভৃতির সেলামী অনেকাংশে বেশী। এরকম অবস্থার প্রধান কারণ প্যারিসের মত নীসে নানা দেশীয় বিদেশীভ্রমণকারীদের ভীড়। নীসে ভ্রমণকারীরা বারো মাসই আসেন···সুতরাং বছরের সকল সময়েই ভ্রমণকারীদের ভীড় লেগেই আছে। দ্বিতীয়তঃ নীসের নিজস্ব কোনও শিল্প-বাণিজ্য না থাকাতে নীস্‌কে সব কিছুই বাহির হতে আমদানী করতে হয়···সুতরাং সেজন্যে জিনিষপত্রের দাম বেশী পড়ে যায়।

নীসে থাকাকালীন এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল। মাদাম্ মিন্‌ভিল্ কখনও বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ অথবা সেখানকার লোক-জন দেখেন নি। অথচ মঁসিয়ে বাঙ্গালী বনে গিয়েছেন বললেই হয়··· তিনি বাঙ্গালী পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার প্রভৃতিতে পারদর্শী। তখন নীসের এক সিনেমাতে বিশ্ববিখ্যাত "রিভার্" (River) চিত্রটী দেখানো হচ্ছিল। মাদাম্‌কে এই চিত্রটী দেখাতে নিয়ে যাওয়া গেল···মঁশিয়েও বাদ গেলেন না। "রিভার্" চিত্রটীতে বাংলাদেশের নদীর ঘাট পাটের ব্যাপারী, দোকানী, দুর্গাপূজা প্রভৃতি বহু বিশুদ্ধ বাঙ্গালী দৃশ্য আছে এবং এটী তোলাও হয় কল্‌কাতায়। এই ছবিটীর আর একটী বিশেষত্ব হল যে এটাতে বাংলাদেশের দৃশ্যে বাঙ্গালীর মুখে বাংলা ভাষাতেই কথা বলানো হয়েছে—যাতে করে স্বাভাবিক ভাবটী বজায় থাকে। যথাসময়ে মঁশিয়ে এবং মাদাম্ মিন্‌ভিল্ ও সহধর্ম্মিণী এবং অগ্রজপত্নীসহ নিজে এই পাঁচ জন আমরা সিনেমা হাউসে উপস্থিত হলাম। সঙ্গিনী দুজন বিশুদ্ধ বাঙ্গালী সাজে সজ্জিত এবং তাঁদের এই সাজসজ্জাই বিদেশীদের কাছে কৌতূহলের কারণ হয়ে দাঁড়াল। হলের ভেতর যাওয়া মাত্রই দর্শক-মহলে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল···কারণ অবশ্য বুঝতে দেরী হল না। শো আরম্ভ হওয়ার একটু পরেই ক্রমশঃ বাংলাদেশের দৃশ্য তথা শাড়ী-পরিহিতা বঙ্গললনাদের দেখা গেল। সমবেত দর্শকদের দৃষ্টিও সেই আধা আলো আধা অন্ধকার পরিবেশের মধ্যে আমার সঙ্গিনী দুজনের প্রতি সমধিক নিবদ্ধ দেখা গেল। পরে যখন বাংলা কথা ছবির মধ্যে শোনা গেল তখন আমরাও নিজেদের মধ্যে ছবির বাংলা কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করতে লাগলাম। বহুদিন দেশ ছাড়া···তার ওপরে বিদেশে ছবিতে বাংলা কথা শুনে সত্যিই আনন্দের বেগ সংবরণ করা কঠিন। মিন্‌ভিল্ সাহেবও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আর যায় কোথা! দর্শকমণ্ডলী তখন ছবি দেখা ফেলে আমাদের দিকেই চেয়ে আছেন বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে। ছবি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আলো জ্বলে উঠল, চতুর্দিক হতে দর্শকমণ্ডলী আমাদের ঘিরে দাঁড়ালেন। তাঁদের নানা রকম প্রশ্নের উত্তর ফ্রেঞ্চ ভাষায় মিন্‌ভিল্ সাহেবই দিলেন। তাঁদের সবারই প্রধান প্রশ্ন, আমরা, বিশেষ করে সঙ্গিনী দুজন ছবিতে দেখানো দেশের লোক কিনা। উত্তরে, মিন্‌ভিল্ সাহেব "হ্যাঁ" বলাতে দলে দলে দর্শকেরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে সঙ্গিনী দুজনকে দেখতে লাগলেন। এমন জানলে আমিও বাঙ্গালী বেশে সিনেমা হাউসে যেতে প্রস্তুত ছিলাম! ছোটখাটো এক্সিজিবিশন মত হয়ে দাঁড়ালো সিনেমা হাউসে এবং সঙ্গিনী দুজন দর্শন দেওয়ার গর্ব্বে বেশ গর্ব্বিতা মনে হল। সে রাত্রে সিনেমা দেখে হোটেলে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা—বিদেশে সব কিছুই সম্ভব। আজও মনে হলে হাসি পায়।

নীসের মত প্রাকৃতিক দৃশ্য বা আবহাওয়া ভারতের সুদীর্ঘ সমুদ্রোপকূলে অনেক স্থানেই আছে কিন্তু আমাদের দেশে নীসের মত প্রকৃতি ও মানুষের যৌথ অবদানপুষ্ট মনোরম স্থান আজও দেখা যায় না। স্বাধীন ভারত সরকার ট্যুরিষ্ট ইন্‌ডাষ্ট্রির প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন—এটী একটী শুভ লক্ষণ নিঃসন্দেহ এবং অদূর ভবিষ্যতে ইণ্ডিয়ান রিভিয়েরা দেখতে পাওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৫, ২৭শে মে তারিখে বাগ্মীপ্রবর, ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক, যুব-আন্দোলনের অগ্রদূত, দেশভক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দেহত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র যুব-উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইউরোপে পোলাণ্ডের ওয়ারস নগরে বিশ্ব-যুব-উৎসবের জন্য যে বিরাট আয়োজন করা হইয়াছে তাহাতে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হইতে যুব-প্রতিনিধিরা যোগদান করিবেন। ভারতও তাহাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয়, ভারতের রাজধানী কলিকাতা নগরীতে যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ ছাত্র ও যুবকদিগের চরিত্র গঠন ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আজ হইতে ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে "দি সোসাইটি ফর দি হাইয়ার ট্রেনিং অফ ইয়ংমেন" প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন তাঁহার নাম পর্য্যন্ত আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। প্রতাপচন্দ্র ঐ প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীগণের দ্বারা নানা বিষয়ে বক্তৃতা এবং বিবিধ সদনুষ্ঠানের দ্বারা যুব ও ছাত্রসমাজকে সংঘবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানই পরে "কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউট" নামে রূপান্তরিত হইয়া ছাত্রসমাজের একটি উল্লেখযোগ্য গঠনমূলক সংস্থা হিসাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সম্প্রতি প্রাদেশিক সরকার এই মঙ্গলকর প্রতিষ্ঠানের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত 'ইনিষ্টিটিউটে'র বিশাল ভবনের কোথায়ও ভাই প্রতাপচন্দ্রের একটি মূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি-চিত্রও স্থান পায় নাই। বর্ত্তমান তরুণ সদস্যদের অধিকাংশ তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানেন না।

প্রতাপচন্দ্র ১২৪৭ সালের ১৬ই আশ্বিন তারিখে (১৮৪০, ২রা অক্টোবর) হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী সহরের বিপরীত দিকে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে গরিফা গ্রামে পৈতৃক বাসভূমিতে ইঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। কেশবচন্দ্র সেনের নিবাসও ছিল এই গ্রামে। তিনি প্রতাপচন্দ্রের দুই বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা দুইজনে বাল্যকালেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। উত্তরকালে প্রতাপচন্দ্র কেশবচন্দ্রের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন। গ্রামের পাঠশালায় প্রতাপচন্দ্রের প্রথম বিদ্যা শিক্ষা হয়। হুগলী কলেজে এক বৎসর শিক্ষালাভের পর ইনি কলিকাতায় আসিয়া হেয়ার স্কুল এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৮ অব্দে প্রতাপচন্দ্রের বিবাহ এবং ১৮৫৯ অব্দে কলেজে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হয়। অল্প বয়সে ইনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একটি সামান্য চাকুরীতে নিযুক্ত হন। কথিত আছে, ভক্ত রামপ্রসাদের মত ইনি সময় পাইলে অফিস-গৃহে ঈশ্বর প্রার্থনা ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিন্তা কাগজে লিখিয়া রাখিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ১৮৫৯ অব্দে প্রতাপচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

২৫ বৎসর বয়স হইতেই প্রতাপচন্দ্র ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রথমে ইনি বাংলা ও হিন্দী ভাষাতেই বক্তৃতা করিতেন, পরে ইংরাজী ভাষাতেই দেশ-বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে প্রতাপচন্দ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ইউরোপে ও আমেরিকায় তিনবার পরিভ্রমণ করেন। জাপানেও একবার গিয়াছিলেন। সকল

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

স্থানেই তিনি বক্তৃতার দ্বারা প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার রচিত "A Nation in Making" গ্রন্থে প্রতাপচন্দ্রের বাগ্মিতা শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কলিকাতায় ব্রাহ্মমন্দিরে, টাউনহলে, এ্যালবার্টহলে বা আপার-সারকুলার রোডস্থ "শান্তিকুটীরে" ভাই প্রতাপচন্দ্রের উপাসনা ও বক্তৃতাদি সে যুগের নব্যশিক্ষিত যুবকবৃন্দের পক্ষে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। যাঁহারা উপাসনা ইত্যাদিতে নিয়মিত ভাবে যোগদান করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, নীলরতন সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হইতে তখন যে সকল মনীষী ভারত ভ্রমণে আসিতেন, তাঁহারা সকলেই প্রতাপচন্দ্রের "শান্তিকুটীরে" আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং ভারতের বিবিধ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিতেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পরিপুষ্টিত বোলপুরের শান্তিনিকেতন আশ্রমের সহিতও প্রতিষ্ঠা-কাল হইতেই ভাই প্রতাপচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তিনি প্রায়ই আশ্রমের উৎসবাদিতে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া আচার্য্যের কার্য্য ও নানাভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী

শিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতাকালীন

কালে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর পরিকল্পনায় প্রতাপচন্দ্রের উদার সংস্কৃতি ও ভাবধারার প্রভাব যে অনেকখানি ছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রতাপচন্দ্রের অন্যতম শিষ্য অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের সহচর ও সহকর্ম্মী হিসাবে শান্তিনিকেতনের সহিত বহুদিন ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিতও প্রতাপচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পরমহংসদেবকে প্রথম (১৮৭৫, ১৫ই মার্চ্চ) বাংলার শিক্ষিত জনসাধারণের সহিত সুপরিচিত করেন। প্রতাপচন্দ্র কখনও কেশবচন্দ্রের সহিত বা কখনও একা প্রায়ই পরমহংসদেবের নিকটে যাইতেন এবং ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন। পরমহংসদেব যে তাঁহাকে কিরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন তাহা প্রতাপচন্দ্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়।—"প্রতাপ আর অমৃত—এই সব শাঁক বাজে, আর যা সব শোন বিশেষ আওয়াজ নাই।" "কেশব আর তুমি যেন গৌর-নিতাই" ইত্যাদি। ১৮৭৯ অব্দের অক্টোবর সংখ্যায় "থীষ্টিক কোয়াটারলি রিভিউ" পত্রিকায় প্রতাপচন্দ্র "A Hindu Saint" নামে একটি অতি সুন্দর প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। পরে উহা পুস্তিকাকারে প্রচারিত হয়। উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার পরমহংসদেবের প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৮৯৬ অব্দের ৮ই আগষ্ট সুইজারল্যাণ্ড হইতে একটি পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছিলেন :—"আমি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের প্রবন্ধ পড়েছি। ছয়মাস পূর্ব্বে যখন উহা লিখেন, তখন তাঁর নিকট প্রতাপ মজুমদারের ক্ষুদ্র পুস্তিকা ছাড়া লিখিবার আর কোন উপাদান ছিল না। সুতরাং সে হিসাবে তাঁর প্রবন্ধটি ভালই হয়েছে বলতে হবে।" ("পত্রাবলী" ২য় ভাগ ১৩৩৬, পৃঃ ১১৭)।

স্বামী বিবেকানন্দ নিজেও আমেরিকায় তাঁহার গুরুদেবের নামপ্রচারে প্রতাপচন্দ্রের রচিত পুস্তকের সাহায্য লইয়াছিলেন :—"ভাল কথা, তুমি মজুমদারের লেখা রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত খানকতক চিকাগোয় পাঠাতে পার? কলকাতায় অনেক আছে।" (পত্রাবলী ১ম খণ্ড, ১৩৩৫, পৃষ্ঠা ১৯৫)।

১৮৭৪ অব্দে ২৬শে মার্চ্চ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রথম ইউরোপ যাত্রা করেন। তাঁহার পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষিত জনসাধারণ রাজা রামমোহন রায় ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মারফৎ ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। এ যাত্রায় তিনি ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান অঞ্চলে বক্তৃতাদি করেন। প্রোটেষ্টানদিগের একটি বিশেষ সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি জার্ম্মেনীতেও গিয়াছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার, ডাঃ কার্পেণ্টার, ডীন্ ষ্ট্যানলী, মন্‌সিওর কন্‌ওয়ে প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের সহিত প্রতাপচন্দ্রের পরিচয় হয়। বিলাতের বহু খ্যাতনামা সংবাদপত্রে তাঁহার সভাসমিতির পূর্ণ বিবরণ ও প্রশংসাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রায় নয় মাস পরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করা হয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ প্রতাপচন্দ্র পুনরায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বজনীন ধর্ম্মের বার্ত্তা লইয়া পৃথিবী পরিক্রমায় যাত্রা করেন। প্রথমে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন নগরে বক্তৃতাদি করিয়া, ১৫ই আগষ্ট তারিখে ইংল্যাণ্ড ছাড়িয়া, ২৮শে আগষ্ট তারিখে তিনি আমেরিকার বোষ্টন নগরে উপস্থিত হন। বোষ্টনে খ্যাতনামা দার্শনিক এমার্শনের পত্নী প্রতাপচন্দ্রকে বিশেষ সমাদর প্রদর্শন করেন এবং আমেরিকার তৎকালীন পণ্ডিত-সমাজের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া দেন। প্রতাপচন্দ্রই আমেরিকায় প্রথম ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারক। তিনি বোষ্টন, সারাটোগা, কঙ্কর্ড, সান্‌ফ্রান্সিস্কো, চিকাগো ও নিউইয়র্ক সহরে বক্তৃতাদি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম ও ভারতীয়

সংস্কৃতির বাণী শুনিবার জন্য সভা-সমিতিগুলিতে প্রচুর জনসমাগম হইত। আমেরিকার প্রধান সংবাদপত্রগুলিতে প্রশংসাসহ তাঁহার বক্তৃতাবলীর পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

তিন মাস আমেরিকায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে প্রতাপচন্দ্র জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুর, কলম্বো প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিয়া একজন ভারতীয় আচার্য্য ও ধর্ম্মপ্রচারকরূপে সবিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক "প্রাচ্যখৃষ্ট" (Oriental Christ) সেই সময় (অক্টোবর মাসে) বোষ্টন হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার বিখ্যাত 'চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভায়' (Chicago Parliament of Religions) উপদেষ্টা সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ এবং 'উদার হিন্দু ধর্ম্মে'র (Liberal Hinduism) প্রতিনিধি হিসাবে উক্ত সভায় যোগদানের জন্য প্রতাপচন্দ্রকে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ করা হয়। তিনি সে আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেন এবং ১১ই জুলাই তারিখে পুনরায় বিদেশ যাত্রা করেন। লণ্ডনে কিছুকাল অবস্থান ও বক্তৃতাদি করিয়া প্রতাপচন্দ্র ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে চিকাগোতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পৃথিবীর সমস্ত দেশ হইতে সকল সম্প্রদায়ের বহু গণামান্য মনীষী ধর্ম্মমহাসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ অব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর মহাসমারোহে অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতীয় প্রতিনিধিগণের মধ্যে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সর্ব্বপ্রথম বক্তৃতা করেন। প্রথম দিনেই বিদেশী শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে গভীর রেখাপাত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর মহাসভার অধিবেশন তিনিই পরিচালনা করেন। ঐদিন তিনি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল তাঁহার ২২শে সেপ্টেম্বর প্রদত্ত প্রধান ভাষণ। বিষয় ছিল, 'এশিয়ার নিকট পৃথিবীর ধর্ম্মঋণ' (World's Religious Debt to Asia)। ঐদিন সভায় অন্যান্য দিন অপেক্ষা অনেক বেশী জনসমাগম হইয়াছিল। শেষ অধিবেশনের দিনেও (২৭শে সেপ্টেম্বর) প্রতাপচন্দ্র বক্তৃতাদান হইতে রেহাই পান নাই।

ধর্ম্ম মহাসভার পরও প্রতাপচন্দ্রকে তিন মাস আমেরিকায় থাকিয়া সর্ব্বসমেত দুই শত বক্তৃতাদান করিতে হইয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষকে ও তাহার সংস্কৃতিকে পরম গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ১৮৯৪ অব্দের প্রথম দিকে স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'সোসাইটি ফর দি হাইয়ার ট্রেনিং অফ্ ইয়ংমেন'এর সদস্যবৃন্দ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক মহতী অভ্যর্থনা সভায় তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। উহাতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে কলিকাতার পাঁচ শত শিক্ষিত নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

প্রতাপচন্দ্র সাংবাদিক এবং গ্রন্থকার হিসাবেও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি সম্পাদনা করিয়াছেন:—(১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (২) Indian Mirror, (৩) Sunday Mirror, (৪) Theistic Annual (৫) Theistic Quaterly Review, (৬) পরিচারিকা, (৭) Interpreter (পরে Interpreter and the Young man). তাঁহার রচিত "The Heart Beats," "The spirit of God," "The Oriental Christ" প্রভৃতি ইংরাজি এবং "আশীষ" "স্ত্রীচরিত্র" প্রভৃতি পুস্তকাবলী সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়াছিল।

প্রতাপচন্দ্র বরাবরই কেশবচন্দ্রের ভক্ত অনুচর ও দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। মাঘোৎসব উপলক্ষে কেশবচন্দ্র প্রতি বৎসর টাউন হলে বা অপর কোন প্রকাশ্য স্থানে একটি করিয়া বক্তৃতা দিতেন। কেশবচন্দ্রের তিরোধানের পর প্রতাপচন্দ্র কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত সেই প্রথাটি বজায় রাখিয়াছিলেন। সন ১৩১২ সাল ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (১৯০৫, ২৭শে মে) তারিখে ৬৫ বৎসর বয়সে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বর্গারোহণ করেন। *

* এই প্রবন্ধের উপাদান ও চিত্র সংগ্রহে শ্রীমান সুরথ চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।—লেখক

অতৃপ্ত

অমলকান্তি ঘোষ

আমার আসন নয়'ক হেথায়
অন্ধকারের কারার মাঝে।
দিগ্বিজয়ীর সুপ্ত সাজে
ঘুমিয়ে আছে যে-জন চিতে
আজ নিশীথে,
অতর্কিতে
ভাঙ্গবে যখন ঘুমের নেশা
আলোয় মেশা
নিশার শেষে,
অরুণ রবি
উঠবে হেসে।

আমার আসন নয়'ক হেথায়
অন্ধকারের কারার মাঝে।
বাধার বাঁধন মান্‌ছে না যে
চিত্ত আমার; ভৃত্য সে নয়;
নৃত্য প্রণয়,
নেই অভিনয়
মোদের মাঝে। তাই ত তারে
আজ আঁধারে
পথ দেখাতে,
যাত্রী হ'লাম
কৃষ্ণা রাতে।
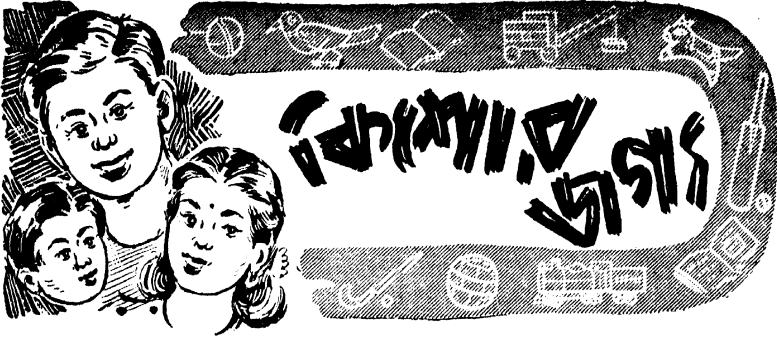
পরিচালক—উপানন্দ

সঙ্গনির্ব্বাচন ও ভবিষ্যতের কথা

সঙ্গ দ্বারা মানুষের চরিত্র বিচার হয়। কার চরিত্র কিরূপ তা জানতে হোলে সে কিরূপ লোকের সংসর্গে থাকে তাই লোকে বিবেচনা করে। কীট ফুলের সংসর্গে এসেই মানবের মস্তকে আরোহণ করে। অসাধু ব্যক্তিও সাধুসঙ্গে এলে সম্মানের পাত্র হয়। পরোপকারী ব্যক্তিও চোরের সঙ্গে থাক্‌লে পরস্বাপহারী হয়। এজন্য কিশোর বয়স থেকেই তোমরা সঙ্গনির্ব্বাচনে খুব সতর্ক হবে। চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র না রাখলে জগতে বড় হওয়া যায় না। জেনে রেখো চরিত্র গঠনে সংসর্গের অসাধারণ শক্তি। তোমরা বোধ হয় জানো কবিগুরু বাল্মীকি সাধুসঙ্গ প্রভাবেই জগদ্বরেণ্য হয়েছিলেন। তাঁর পূর্ব্ব নাম ছিল রত্নাকর দস্যু। তিনি দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যা করে তাঁর স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করতেন কিন্তু যেদিন কয়েকজন মহাত্মার সংস্পর্শে এলেন আর তাঁদের উপদেশ লাভ করলেন, সেদিন তাঁর চৈতন্যোদয় হোলো! সেই অবধি তিনি সাধুসঙ্গ প্রভাবে ও নানাবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন করে ক্রমশঃ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন। তিনিই ভারতের আদি মহাকবি।

একদিন এই ভারতবর্ষে পবিত্র-চরিত্র ঋষিগণ তাঁদের তপোবনে ব্যাঘ্র ও মৃগকে একসঙ্গে লালনপালন করেছেন—একই নিঝরে তারা জলপান করেছে, একই সঙ্গে তারা অবস্থান করেছে। ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদগণ তাদের নিজ নিজ হিংস্র স্বভাব ত্যাগ করেছে ঋষিদের সঙ্গপ্রভাবে। পবিত্রতা ও সাধুতার এমনই মোহিনী শক্তি যে তার দ্বারা বন্যজন্তুও বশীভূত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ যখন অরণ্যে তপস্যা করতেন নির্জ্জনে পর্ব্বতের ওপর, তখন কত ব্যাঘ্র, সর্পই না তাঁর আসনের কাছে এসে মৌন বিস্ময়ে চেয়ে দেখেছে তাঁকে,—তারা ভুলে গেছে মানুষের সঙ্গে তাদের খাদ্যখাদক সম্বন্ধ। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আসন ঘিরে থাকতো বিষধর সর্প,—তাঁর সংস্পর্শে এসে সর্পও ভুলে যেতো তার সহজাত ক্রূর ধর্ম্মকে, কাউকে দংশন করতো না,—থাকতো তাঁর চরণপ্রান্তে প্রণামের মত হয়ে। সাধুসঙ্গের অলৌকিক প্রভাবে যদি তোমরা প্রভাবান্বিত হও, তা হোলে তোমরা নিশ্চয়ই একদিন মহামানবে পরিণত হবে।

মানুষ সামাজিক জীব। নিঃসঙ্গ অবস্থায় সে একক থাকতে পারে না—এজন্যেই সে সঙ্গীর সন্ধান করে। কেননা সে চায় অন্যের কাছে মনের কথা দুটি বলতে, সে চায় অন্তরের ভাববিনিময় করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে, সে চায় তার দুঃখেসুখে কেউ সহানুভূতি প্রকাশ করুক, সমবেদনা জানিয়ে তার মনের বেদনা লাঘব করুক—তোমরাও ঠিক এই রকমই চাও। গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত, কারাদণ্ডে দণ্ডিত মানুষকেও দীর্ঘকাল নির্জ্জন কারাবাসে রাখা হয় না—পাছে সে উন্মাদ হয়ে যায়। সাধক, ভাবুক ও উন্মাদ শুধু থাকে একাকী। তারা মানুষকে চায় না।

সংসারে তোমরা নানা রকমের মানুষের সংস্পর্শে এসে এখন থেকেই বুঝতে পারছ মানুষ বলতে কি বুঝোয়—সব মানুষই তো সৎ নয়, ভদ্র নয়, সভ্য নয়। তা যদি হোতো, তা হোলে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য নেমে আসতো। পশু ও মানুষের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য এই যে, মানুষের জ্ঞানই অধিক। জ্ঞান যার আছে, সেই সত্যব্রত হয়ে ইহলোক ও পরলোকে সুখী হোতে পারে। এজন্য সৎসঙ্গ, জ্ঞান-অর্জ্জন ও একনিষ্ঠ অধ্যয়ন তোমাদের একান্ত আবশ্যক। অজ্ঞান তমোগুণের কাজ। পশুসদৃশ মূঢ় অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই জগতে মহাদুঃখ ভোগ করে থাকে। যেমন কার্পাস বীজ তন্তু দ্বারা পরিবৃত থাকে, মানুষ তেমনই যতদিন জীবনধারণ করে ততদিন নানা প্রলোভনের মধ্যে এসে, নানা অসৎ সংসর্গে মিশে ও নানাপ্রকার সংসারের ঘাতপ্রতিঘাত পেয়ে অশেষ লাঞ্ছনাও কষ্টভোগ করে, তারপর পৃথিবী থেকে চলে যায় বহু যন্ত্রণা ভোগ করে। পৃথিবীতে দুঃখার্ত্তের সংখ্যাই বেশী, যাদের সুখী বলে বোধহয়, বিশেষ অনুসন্ধান করে দেখলে বেশ বুঝতে পারা যাবে তাদের সুখ নামমাত্র। প্রকৃত সুখী সে-ই ব্যক্তি যে জ্ঞানী, সৎ ও সত্যব্রতী। এঁরা সংখ্যায় খুব বেশী নয়।

সর্ব্বদা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সাধুসঙ্গ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সৎ আলোচনার দ্বারা পরিশুদ্ধ শুভবুদ্ধি উদয় হোতে পারে। এই শুভবুদ্ধির উদয় হোলেই জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত হবে। এই পথে চল্‌তে চল্‌তে শেষে চৈতন্যের প্রভাবে আত্মশক্তির বিকাশ হবে, এই শক্তির বিকাশ হোলেই তোমাদের মহাজীবন লাভ হবে। দেবজীবন ও মহাজীবনে কোন পার্থক্য নেই। সাধুসজ্জন ব্যক্তিদের উপদেশ অনুসারে সৎপথ অবলম্বন করে কায়মনোবাক্যে যে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাকেই পৌরুষ বলে, এছাড়া আর সব কাজই উন্মত্ত চেষ্টার মত বিফল। পৌরুষ ব্যতীত পৃথিবীতে উন্নতি লাভ করা যায় না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি যে বিষয়ের অভিলাষী হয়ে তা'তে সবিশেষ যত্ন প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই তার ফল পায়, অন্ততঃ অর্দ্ধফল তো পাবেই। তোমরা পৌরুষের অভিলাষী হয়ে সম্যক্‌ভাবে পুরুষকার প্রয়োগ করবে—আর প্রয়োগের ব্যাপারে যত্নপ্রকাশ করবে। কাল যে কাজ করতে হবে, আজই তা সম্পন্ন করবো, এইরূপ নিশ্চয় দ্বারা নিরালস হয়ে কাজ করলে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হোতে পারে।

বাল্যকাল থেকে সৎশাস্ত্র অধ্যয়ন, সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুণাদি অভ্যাস করলেই অভিলষিত অর্থ ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর দৈন্যদশা পেয়ে নির্ধনতা প্রযুক্ত অনন্ত দুঃখভোগ করতে হয় না। যেমন সিংহ নিজের উদ্যোগ দ্বারা পিঞ্জর থেকে বেরিয়ে পড়ে, সেইরকম উদারস্বভাব যত্নশীল ব্যক্তি নিজের পৌরুষ বলে পৃথিবীতে বরেণ্য হয়ে থাকে। তোমরা সিংহের মত উদ্যোগী পুরুষ হও।

তোমরা জেনো আমাদের দেশের মধ্যে প্রাণের হাওয়া বয়েছে—এই হাওয়া বয়েছে বলেই আমাদের জড়তা ভেঙেছে। আমাদের যদি জড়তা না ভাঙতো, তা হোলে আমরা পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম সভ্য হয়ে জীবনের গান শোনাতে পারতাম না, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমাদের জন্যে যে সব জীবনের বাণী রেখে গেছেন, সেই সব বাণী তোমাদের গ্রহণ করে তোমরা তার ভেতর থেকে নব নব বাণী, নব নব তথ্যের সন্ধান দেবে এই আশাই আমরা করি। এজন্যে তোমরা ছেলেবেলা থেকে এম্নিভাবে নিজেদের তৈরী করে তোলো—যাতে জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পকলায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য হোতে পারো। আজ যারা ছাত্রজীবনে পিছিয়ে পড়ছে তারা হয়তো ভাবতে পারছে না তাদের ভবিষ্যতের কথা। তারা হেসে খেলে বেড়িয়ে ভাব্‌ছে এম্নি দিনই যাবে, কিন্তু যখন তাদের সম্মুখে ভবিষ্যৎ মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা এসে দাঁড়াবে, তখন তারা কেঁদে কেঁদে অসহায় অবস্থায় পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে—কেউ সান্ত্বনা দেবে না, কেউ সাহায্য করবে না। জগতে সবাই তো বুদ্ধ, বিবেকানন্দ হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। তাই বল্‌ছি সময় অপব্যয় করে অসৎসঙ্গের প্রভাবে নিজেদের সর্ব্বনাশ করো না, সৎসঙ্গ করো আর অধ্যয়ন-রূপ তপস্যায় ব্রতী হয়ে মহাজ্ঞানী হও। নির্ভীক হৃদয়ে নিজেদের কর্ত্তব্যপালন করো, প্রশংসা, নিন্দা, ভয়, বাধা-বিপত্তিকে গ্রাহ্য করো না। তোমরা দেশের অলঙ্কার ও গৌরব স্বরূপ হও।

কাঁটালপাড়া

শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার

বঙ্গভূমে যে আনিল সাহিত্যের মন্দাকিনীধারা,
সে-বঙ্কিমে বক্ষে ধরি' ধন্য তুমি, হে কাঁটালপাড়া।
সত্যদ্রষ্টা ঋষিকবি—এইখানে জন্ম হোলো তার,
বাণীতীর্থ তুমি তাই, বারংবার লহ নমস্কার॥

বর্ষা

(কিশোর রচনা)

শ্রীমান মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

সব দিল ধুয়ে মুছে
এসে গেছে বর্ষা,
আসিয়াছে নব মেঘ
দিতে যেন ভর্সা।
কাঠফাটা রোদ্দুরে
হতেছিনু দগ্ধ,
সারাদিন ছিনু মোরা
ঘরে হয়ে বদ্ধ।
ময়ূর পেখম তুলে
নাচিছে এখন,
বর্ষা এসেছে বলে
আনন্দিত মন।
কৃষক ভাইরা সবে
রোপিতেছে ধ
আশায় তাদের আজ
হরষি
নদী জল ছলছল
কে
পাড়ে খেলা ক
ে

খাল বিল নদী নালা
উঠিয়াছে ভরে,
নানা ফুল নানা ফল
গাছেতে সে ধরে।
বর্ষা নিয়েছে ভাই
সব দুখ হরি,
আয় ভাই আয় সবে
বরষারে বরি।

সৎকাজ কর

(পুঁথি পুরাণের গল্প)

শ্রীসুলতা কর এম-এ

সেকালে অবন্তীনগরে দুরাত্মা নামে এক চোর ছিল। শুধু চুরিই নয়—এমন খারাপ কাজ নেই, যা সে করত না। তার স্বভাব এত খারাপ হয়েছিল যে তার চোর বন্ধুরা পর্য্যন্ত তার মুখ দেখত না। বন্ধুবান্ধব সবাই ছেড়ে যাওয়াতে সে বেশী চুরি করতে পারত না, টাকা কড়ির টানাটানি হত।

এক রাতে তার এমন অবস্থা হয়েছে যে হাতে একটিও টাকা নেই। তখন সে মরিয়া হয়ে অবন্তীনগরের এক বিখ্যাত শিবের মন্দিরে চুরি করবার জন্যে ঢুকে পড়ল।

তখন মাঝ রাত। চোর দুরাত্মা মন্দিরে ঢুকে দেখে ...িকে ঘোর অন্ধকার। মন্দিরে যে প্রদীপ-জ্বলে তার ...ড়ে যাওয়াতে নিভে গেছে। দুরাত্মা কোন রকমে ...ড়ে একটি সলতে তৈরী করে প্রদীপে লাগিয়ে ফেলল। প্রদীপের আলোয় শিবমূর্ত্তি উজ্জ্বল ...াত্মা একটুক্ষণের জন্য পাপ কাজ ভুলে গিয়ে ...য়ে ভক্তিভরে প্রণাম করল। কিন্তু তখনি ... মনে পড়ল। আস্তে আস্তে মূর্ত্তির ...াসনগুলি তুলে নিয়ে একটুকরা ...াল। এদিকে প্রদীপ জ্বালবার ...ল তাতে পূজারী ব্রাহ্মণের ঘুম ...তোলার ঝন্‌ঝন্ শব্দ হতেই ...ল চীৎকার করতে করতে লাঠি হাতে নিয়ে দুরাত্মাকে তাড়া করলেন। দুরাত্মা ভয় পেয়ে ছুটে মন্দির থেকে বার হয়ে গেল। কিন্তু পূজারীর চীৎকারে ততক্ষণে নগররক্ষীরা জেগে উঠেছে। তারা হৈ হৈ করে ছুটে এসে দুরাত্মাকে জাপটে ধরল।

নগররক্ষক রেগে প্রচণ্ড জোরে তার মাথায় লাঠি দিয়ে মারল। এক ঘায়েতেই চোর দুরাত্মা মারা গেল। মারা যাবার পর দুরাত্মা যমালয়ে গেল। যমরাজার হিসাব-রক্ষক চিত্রগুপ্ত খাতা খুলে হিসাব দেখে যমরাজকে বললেন—"এ লোক সারাজন্ম পাপকাজ করেছে, একে ভীষণ নরকে রাখা উচিত বলে মনে করছি।" যমরাজ চিত্রগুপ্তের খাতার হিসাব দেখে বললেন—"না চিত্রগুপ্ত, তোমার হিসাব দেখা ঠিক হয়নি। এ লোক কোন নরকে যাবে না, এ গান্ধার দেশের রাজা হয়ে জন্মাবে।" চিত্রগুপ্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কেন, এ কি পুণ্য করেছে যে রাজা হবেই?"

যমরাজ বললেন—"এ যদিও নিজে জানে না তবু একটি ভাল কাজ করেছে। চুরি করতে গিয়ে অন্ধকার আচ্ছন্ন শিবের মন্দিরে আলো জ্বালিয়েছে।—

আর যদিও এক মুহূর্ত্তের জন্যে, তবু সেই আলোতে উজ্জ্বল দেবতার মুখ দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করেছে।" ক্ষুব্ধ সুরে চিত্রগুপ্ত বললেন—"তবে তাই হোক্।"

তখন চোর দুরাত্মা গান্ধার দেশের রাজা হয়ে জন্মাল। তার নাম হল সুদুর্ম্মুখ।

এ জন্মেও রাজা সুদুর্ম্মুখ কেবল পাপকাজ করতে লাগলেন। প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে লাগলেন। রাজা সুদুর্ম্মুখের নাম করলে লোকে ঘৃণা বোধ করত। কিন্তু এত পাপকাজ করা সত্ত্বেও গতজন্মে যে ভাল কাজ করেছিলেন তার স্মৃতি তাঁর মনের মধ্যে থেকে গেছল। সেজন্য রোজ একটি পুণ্যকাজ তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে করে যেতে লাগলেন।

প্রতি সন্ধ্যায় রাজা একবার করে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ফুল দিয়ে শিবের পূজা করতেন। ঘোর মূর্খ হওয়ার জন্যে মন্ত্র অবশ্য তিনি জানতেন না, তবু মনের ভক্তি দিয়েই পূজা করতেন।

এমনিভাবে কতদিন কাটল। এত পাপকাজ সেই রাজা সুদুর্ম্মুখ করতে লাগলেন যে চারদিকে সবাই শত্রু হয়ে গেল। শত্রুরা সব সময় তাঁকে মারবার চেষ্টা করত। শীঘ্রই

তাদের সুযোগ মিলে গেল। রাজা সুদুর্মুখ খুব মৃগয়া করতে ভালবাসতেন।

একদিন মৃগয়া করতে করতে নির্জ্জন বনের মধ্যে একা এসে পড়েছেন এমন সময় শত্রুরা তাঁকে দেখতে পেল, আর তখনি রাজাকে মেরে ফেলল।

যমরাজার প্রাসাদে রাজার আত্মা এল। চিত্রগুপ্ত খাতা খুলে বিচার করতে বসলেন। দেখে শুনে তিনি যমরাজাকে বললেন—"এ জন্মেও এ রাজা কেবল পাপকাজ করেছে। একে অনন্ত নরকে রাখা হোক।" যমরাজা এবারেও চিত্রগুপ্তের খাতা দেখে বললেন—"তুমি ভুল করছ চিত্রগুপ্ত। এবারে এ পরম ধার্ম্মিক বিশ্রবামুনির ছেলে হয়ে জন্মাবে।"

অবাক হয়ে চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন—"কেন প্রভু, এই রাজা কি পুণ্য করেছে যে এর এত সুখ হবে?"

যমরাজা বললেন—"এ অনেক পাপকাজ করেছে বটে, কিন্তু গত জন্মের ভাল কাজের কথা এর মনে ছিল। সেজন্য রোজ ফুল, নৈবেদ্য, ধূপ দিয়ে ভক্তিভরে শিবপূজা করেছে।

যতক্ষণ পূজা করেছে ততক্ষণ এই রাজার মন নির্ম্মল ছিল, ভগবানে ভক্তি ও ছিল। এইটুকু ভাল কাজ করেছে বলেই এর এত সুখ হবে।"

কি আর করেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিত্রগুপ্ত পাপী রাজাকে সাধু বিশ্রবামুনির ছেলে করে জন্ম দিলেন। গত দুই জন্মের ভাল কাজ করার কথা বিশ্রবামুনির ছেলের মনে জেগে রইল। এ জন্মে সে আর কোন পাপ কাজ করল না। খুব ধার্ম্মিক আর সাধু হল। একটু বড় হয়েই তপস্যা করতে চলে গেল। হাজার বছর ধরে বিশ্রবা মুনির ছেলে মহাদেবের তপস্যা করল। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে দেখা দিয়ে বললেন—"কি বর চাও বল।" বিশ্রবা মুনির ছেলে বলল "—প্রভু, আমি আপনার ভক্ত ও সখা হয়ে থাকব শুধু এই বর চাই।" মহাদেব আরও সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—"তোমার তপস্যায় আমি খুব সুখী হয়েছি। তোমাকে আমি তিনটি বর দিলাম। তুমি আজ থেকে কুবের নামে বিখ্যাত হবে, আর সমস্ত যক্ষদের রাজা হবে এই হল প্রথম বর। দ্বিতীয় বরের ফলে তুমি দেবতাদের ধনাগারের রক্ষক হবে। তৃতীয় বরের ফলে আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও সখা হয়ে মনের আনন্দে কৈলাসে থাকবে।"

এমনিভাবে চোর দুরাত্মা সামান্য একটা ভাল কাজ করে পরের জন্মে রাজা হয়ে জন্মাল। আর সে জন্মেও অতি সামান্য ভাল কাজ করে পরের জন্মে বিশ্রবা মুনির ধার্ম্মিক ছেলে হল। তৃতীয় জন্মে কোন পাপ কাজ করল না বলে যক্ষদের রাজা কুবের হয়ে গেল, দেবতাদের ধনভাণ্ডারের অধ্যক্ষ হয়ে মনের আনন্দে কৈলাসে থাকতে লাগল।

জেনে হোক, না জেনে হোক সৎকাজ করলেই মানুষের স্বভাব সাধু হয়, আর সে ভগবানের আশীর্ব্বাদ পায়, পুরাণে এই কথা লেখা আছে।

ঘুমপাড়ানী গান

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়

খোকন সোনা ঘুমিয়ে পড়ো
নাম্‌লো অন্ধকার,
ঘুমপাড়ানী মাসী, পিসী
আস্‌বে না যে আর।
বল্‌বে না আর রূপকথা সব
গাইবে না আর গান,
সর্ব্বনাশা বুল্‌বুলিতে
খাবে না আর ধান।
ছুটিয়ে ঘোড়া, সাত সাগর আর
তের নদীর পারে—
যায় না তো কেউ দানবপুরীর
অট্টালিকার দ্বারে।
রাজকুমারী সেথায় যে আজ
ঘুমেই অচেতন,
সোনার কাঠি হারিয়ে গেছে
অমূল্য সে ধন।
রাজকুমারের মনের কথা
কেইবা বলো বোঝে?
আজও বুঝি ঘুরছে কুমার
সোনার কাঠির খোঁজে
সাত সাগর আর তের নদীর
অতল তলে বুঝি,

হারিয়ে গেছে রূপকথা সব
যা ছিলো হায় পুঁজি।
কালের কালি মুছিয়ে দিলো
রূপকথানীর দেশ,
ঘুমিয়ে পড়ো খোকন সোনা
আমার কথা শেষ।

—

পরিবর্ত্তন

শ্রীঅশোক দাশ

সকলের হিসেব-নিকেষ চুকিয়ে পান্নুর অপেক্ষায় বসে আছে সর্দার। পান্নু সর্দারের নিজে হাতে গড়ে-পিটে তৈরি করা ঝানু লোক। লক্ষ্মীমন্ত চেলা। সর্দারের জমার খাতায় তার অংক থাকে সকলকে ছাপিয়ে।

ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর পেরিয়ে যায়। হিন্দুস্থানি পাহারওলারা পায়ে পট্টি মাথায় টুপি চড়িয়ে, বেল্ট-বাঁধা বিরাট ভুঁড়িখানাকে এগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে পাহারায়। রাস্তার লোক ফিকে হ'তে হ'তে শেষে আর দেখা যায় না। ফুটপাতের ধারে বড় বড় গাছগুলোর ঝুঁটি ধ'রে নেড়ে দিয়ে যায় দম্‌কা হাওয়া। অস্পষ্ট গ্যাসের আলোয় কেঁপে ওঠে—ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ছায়াগুলো। সর্দারের বুক ওঠে শিউরে···পান্নুর কি কোন বিপদ হোল ?

কিন্তু নিজের ওপর সর্দারের বিশ্বাস আছে অগাধ। তা'র দৃঢ় মন জবাব দেয়, "না না সর্দার পান্নু কখনো পুলিশের হাতে যেতে পারে না, তুমি যাকে নিজে হাতে মানুষ করেছ কাজ শিখিয়েছ সে খোদার চোখে ধূলো দিয়ে সাফ্ হ'য়ে যাবে, পুলিশ তো তা'র কাছে কোন ছার !"

কিন্তু খোদার চোখে ধূলো দিতে পারলো না পান্নু। শয়তানের কাছে কাছে ফেরেন ভগবান্, যে খুঁজে নিতে পারে—সেই তস্কর রত্নাকর থেকে উন্নীত হয় সাধু বাল্মীকিতে !

শাণিত শয়তানি বুদ্ধি নিয়ে পথে বেরিয়ে—পান্নুর আজ প্রথম দেখা এক বালকের সংগে। মুমূর্ষু মা-কে বাঁচাবার উপায় খুঁজতে সে আজ মরিয়া হয়ে বেরিয়ে পড়েছে পথে। আট বছরের এতটুকু ছেলে সংসার সম্বন্ধে কিছুই সে জানে না। আগে পাড়ার লোক তার বাবাকে ধার দিত, এখন আর দেয় না। কিন্তু কেন দেয় না, সে তার অতটুকু বুদ্ধি দিয়ে কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারে না। তাই সে পান্নুর কাছে হাত বাড়িয়ে একেবারে বলে বসে, "একটা টাকা দেবে—মায়ের বড্ড অসুখ, ওষুধ কিনব।"

পান্নু মুখ ভেঙচে উত্তর দেয়, "আহা আমার মাতৃ-ভক্তরে, দেখে আর বাঁচিনে, ভিক্ষে করে ওষুধ কিনে মায়ের প্রাণ বাঁচাবে !" ঠাস্ ক'রে তা'র গালে একটা চড় কসিয়ে, চড়া গলায় বলে সে, "ন্যাকামি করবার জায়গা পাসনি ? মায়ের অসুখ, না টাকা নিয়ে বিঁড়ি ফুঁকে জুয়ো খেলে ওড়াবি !"

ছেলেটি এ কথার কোন জবাব দেয় না। দু' চোখ জলে ভাসিয়ে কাঁপা গলায় বলে, "দাওনা তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের ঘরে আজ একটাও পয়সা নেই। বাবার মাইনের টাকা কাল পকেটমারে সব কেটে নিয়েছে।" দু'টো ঢোঁক গিলে ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে সে, "দেবে, দাও না ! না হ'লে মা যে আমার মরে যাবে !"

পান্নু স্বগত বলে ফেলে, "পকেট কেটে নিয়েছে।" তারপর একটু সাম্‌লে নিয়ে বলে, "চল্ তোর মায়ের কেমন অসুখ দেখে আসি !"

পান্নু ছেলেটির বাড়ি এসে পৌছবার আগেই তা'র থেকে টাকা নেবার তাগিদ মিটে গেছে। ছেলেটির বাবা তার মায়ের মাথার কাছে ব'সে আছে। তার দু' চোখ থেকে ঝর ঝর্ ক'রে গড়িয়ে পড়ছে জল। এতবড় আক্ষেপ সে রাখবে কোথায় ! চিকিৎসা অভাবে দুলুর মা-কে সে যমের হাতে তুলে দিলে।

দুলু তা'র মায়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কত কাঁদলে, "মাগো ওঠ, কথা কও, একটি বারের জন্যে "দুলু" বলে ডাকো।"

কিন্তু নির্মম নিয়তির নিষ্ঠুর শাসন, তা'কে একটি বারের জন্যে দুলু বলে ডাকতে দিলে না।

পান্নু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সেই ব্যথাতুর

দুঃখের দিকে। তার শয়তানী চোখ দু'টো আজ প্রথম দু' ফোঁটা জল ঝরালে মানুষের ব্যথায়। সে বার বার ভাবতে লাগল—তবে কি এর জন্যে দায়ী সে! সেই তো কাল আপিসের গেটে একজন কেরাণীবাবুর পকেটে কাঁচি চালিয়ে তার সমস্ত মাসের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের বক্‌শিস্‌টুকু ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ডুলুর বাবা সেই কেরাণীবাবু নয় তো?

ডুলুদের বাড়ি থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ে পানু। পথ চল্‌তে চল্‌তে কত কথাই তা'র মনে পড়ে। সে ভাবে—সারাদিন ভাবে, ক্রমে রাত হয়, তবুও তা'র ভাবনার শেষ নেই। জীবনের দীর্ঘ চল্লিশ বছর সে কত লোকের সর্বনাশ করলে, কত মায়ের ছেলেকে নিলে ছিনিয়ে, কত ছেলের মা'কে পাঠালে যমালয়ে। কিন্তু কার জন্যে সে এত করলে? তা'র সংসার নেই, স্ত্রী নেই, মা নেই, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। আপনার বলতে আছে তা'র শুধু একটা পেট। সেটা ভর্তি করতে তো এত লোকের সর্বনাশ করার কোন দরকার ছিল না। তবে সে কেন করলে? ঐ সর্দারের জন্যে করলে—ঐ সর্দারই যত নষ্টের মূল। অন্ধকারের বুক চিরে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে পানু। সে আজ ঐ মূল উপ্‌ড়ে ফেলে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

সর্দারের কাছে গিয়ে পানু কিন্তু তা' পারলে না। সর্ব্বহারা এতটুকু পানুকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিল সর্দার। তারই যত্নে সে বড় হ'য়ে উঠেছে, সে যত্ন যেমনই হোক্‌ না, সে তা'কে খুন করতে পারবে না। পাপের খাতায় সে আর নাম লেখাবে না।

তাই সর্দারকে গিয়ে সে সরাসরি বলে, "সর্দার, আমাকে এবার ছুটি দাও, আমি কাশী চলে যাবো। জীবনে অনেক পাপ করেছি। বিশ্বনাথের চরণে পড়ে যদি তা'র এক কণারও রেহাই হয়।"

ছোট ছেলের মত ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেলে পানু। সর্দার মূঢ়ের মত স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকে—একটি কথাও বল্‌তে পারে না।

পানু সর্দারকে শেষ সেলাম জানিয়ে যাত্রা করে বিশ্বনাথের চরণে!

চিত্তরঞ্জনে তিনদিন

শ্রীহরিপদ গুহ

অনেকদিন থেকেই মনে মনে চিত্তরঞ্জন দেখবার বাসনা ছিল। এবার হঠাৎ সেই সুযোগ এসে গেল। দিদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম বার্ণপুরে। তাঁর এক ছেলে কাজ করে চিত্তরঞ্জনে।

গত ২৩শে এপ্রিল আসানশোল থেকে ৬-২৪ মিনিটের গাড়ীতে আমরা চিত্তরঞ্জনে রওনা হলুম। সেদিন শনিবার। গাড়ীতে খুব ভীড়। বস্‌বার স্থান নেই কোথাও। তবে ভরসা এই যে, বেশী দূরের পথ নয়। সীতারামপুর ও রূপনারায়ণপুর এই দুটি ষ্টেশন পরেই চিত্তরঞ্জন। পূর্ব্বে ছিল এর নাম—মিহিজাম। চিত্তরঞ্জন পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। লাইনের ওপার পড়েছে বিহারে।

আমরা ৭-২০ মিনিটে এখানে পৌছোলুম। ট্রেণে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু ঘটেনি। বাসে করে আমাদের ২২ নম্বর ষ্ট্রীটে, আমলাদহি যেতে হবে। ভাড়া মাত্র তিন আনা।
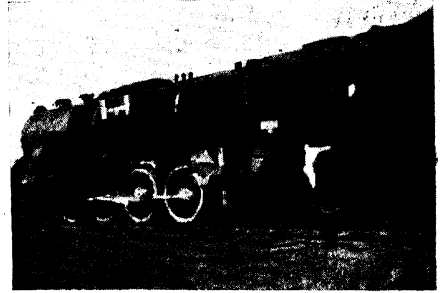
চিত্তরঞ্জন কারখানায় প্রস্তুত ইঞ্জিন

বাসে বস্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই কনডাক্টর টিকিট কেটে নিলে। এমন সময় একজন কনেষ্টবল এসে আমরা কোথায় যাব এবং আমাদের সঙ্গে পারমিট আছে কিনা জান্‌তে চাইলো। এটা যে সুরক্ষিত স্থান (Protected area) আমাদের জানা ছিল না। কাজেই আগে থেকে কোন পারমিট আমরা যোগাড় করিনি। আমাদের আসবার ঠিক ছিল না, হঠাৎই চলে এসেছি। একথা পুলিশকে বল্‌তে, সে বল্‌লে—গেটে অফিসার আছেন তাঁর সঙ্গে কথা বলুন!

ফটকে গিয়ে আমরা অফিসারের সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি বেশ অমায়িক ভদ্রলোক। সব শুনে তিনি বল্‌লেন—পারমিট ছাড়া বাইরের কোন লোককে এখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী এখানে আসছেন বলে কড়াকড়ি একটু বেশী হয়েছে। আপনি আপনার ভাগ্‌নেকে ফোন করে পারমিট আনিয়ে নিন।

আমি বললুম—রাত হয়ে গেছে, এখন তাকে ফোনে পাওয়া সম্ভব হবে কি? তা ছাড়া সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে, অত হাঙ্গামা করতে গেলে অনেক রাত হয়ে যাবে। বড় অসুবিধা হবে তাতে। আপনি দয়া করে কোন ব্যবস্থা করে দিন। মা ছেলের কাছে তাকে দেখতে যাচ্ছে, এতে যে পারমিটের প্রয়োজন হতে পারে, আমি বুঝতে পারিনি। আগে জানা থাকলে, পারমিট্ যোগাড় না করে আসতুম না।

আমার অবস্থা বুঝতে পেরে তিনি সদয় হয়ে আমাকে যাবার অনুমতি

শহরের সাধারণ দৃশ্য

দিলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাসে উঠে বসতেই সঙ্গে সঙ্গে বাস ছেড়ে দিল।

মাঠের উপর দিয়ে পিচ ঢালা ছোট ছোট রাস্তা বেরিয়েছে। পথের দুই দিকে বিজলী বাতি জ্বলছে। সমস্ত পথগুলিই এঁকে বেঁকে নানা দিকে গিয়ে আবার একত্রে মিলিত হয়ে একটা গোলক ধাঁধাঁর সৃষ্টি করেছে। পথ খানিকটা গিয়ে নীচু হয়ে গেছে, আবার ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠেছে। লাইট পোষ্টগুলিরও সেই অবস্থা। দূর থেকে দেখতে
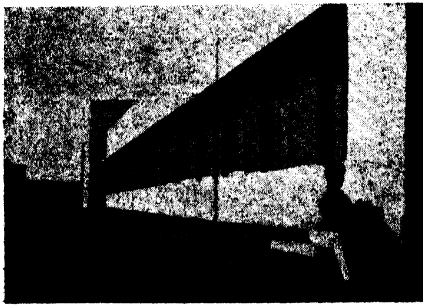
টেকনিক্যাল স্কুল

বেশ লাগে। কনডাক্টর মাঝে মাঝে চার নম্বর ষ্ট্রীট, ছয় নম্বর ষ্ট্রীট বলে চীৎকার করছিল। বাস এঁকে বেঁকে ঘুরতে ঘুরতে অনেক ষ্ট্রীট পার হয়ে শেষে ২২ নম্বর ষ্ট্রীট শেষ ষ্টপেজে এসে থামল। এই স্থানের নাম—আমলাদহি। নিকটেই আমার ভাগনের কোয়ার্টার। দিদি বাসা চিনতেন, কাজেই আমাদের আর কোন অসুবিধা হয়নি।

আমাদের এভাবে হঠাৎ দেখে সকলে একেবারে অবাক্ হয়ে গেল। ভাগনে বললে—খবর দিয়ে এলে কোন অসুবিধাই হতো না। আমি পারমিট নিয়ে গেটে উপস্থিত থাকতে পারতুম।

পরদিন রবিবার। এই দিনটিতেই বাইরের লোকেরা কারখানা দেখতে পারে। বেলা দশটার সময় আমরা কারখানা দেখতে বেরিয়ে পড়লুম।

বিরাট বিরাট সব সেড্। নানা রকম যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত। এক এক স্থানে এক এক রকম কাজ হচ্ছে।

প্রথম যে সেডে গেলুম, সেখানে কাঠের ছাঁচ তৈরী হচ্ছে। এই ছাঁচের উপর লোহার ছাঁচ তৈরী করে, লোহা গালিয়ে তাতে ফেলে ইঞ্জিনের এক একটি অংশ তৈরী হবে।

দ্বিতীয় সেডে দেখলুম—স্ক্রু, নাট ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে। ইলেকট্রিক যন্ত্রের সাহায্যে কত সহজে লোহা কাটা হচ্ছে, কাঠও বোধ হয় এত কাটা যায় না।
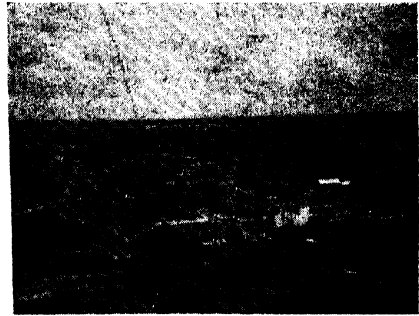
'হিল-কলোনী' এখান হতে জল সরবরাহ করা হয়

বিভিন্ন সেডে ইঞ্জিনের ভিন্ন ভিন্ন অংশ তৈরী হচ্ছে, কোথাও আবার সেগুলি পালিশ ও সাইজ অনুযায়ী কাটা হচ্ছে। বয়লার তৈরী হলে সেগুলো 'ইণ্ডাসট্রিয়াল এক্স রে' দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা হয় যে, কোথাও কোন খুঁত আছে কিনা! তারপর ফিটিং সুরু হয়। লোকোমোটিবের এত বড় কারখানা ভারতের আর কোথাও নেই। প্রত্যেক বিভাগের কাজই এত সুন্দর যে, দেখে বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না।

সমস্ত কারখানার কাজ দেখে বাসায় ফিরতে আমাদের বেলা প্রায় একটা বেজে গেল। এই কাজ দেখে আমরা এত বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলুম যে, ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা আমাদের মনেই ছিল না। শুনলুম—এই কারখানা থেকে এবার মোট দুশোখানি ইঞ্জিন তৈরী হয়েছে। এখন থেকে আরো বেশী প্রোডাক্শন হবে বলে আশা করা যায়।

কারখানা এবং শহরের প্রয়োজনীয় সমস্ত বৈদ্যুতিক শক্তিটাই এখন দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। বিদ্যুৎ-শক্তির স্বাভাবিক সরবরাহ সহসা ব্যাহত হলেও, যাতে কাজকর্ম একেবারে

অচল হয়ে না যায় সেজন্তে চিত্তরঞ্জনের নিজস্ব একটা বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থাও আছে।

মালমসলা ও সাজসরঞ্জামকে একেবারে কারখানা পর্য্যন্ত সরাসরি নিয়ে যাবার জন্য রূপনারায়ণপুর রেল ষ্টেশন থেকে কারখানা পর্য্যন্ত টানা সাড়ে তিন মাইল দীর্ঘ রেলওয়ে সাইডিং লাইন নেওয়া হয়েছে। সমস্ত কারখানাটি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে একদিক দিয়ে

'শ্রীলতা' ইনষ্টিটিউট

কাঁচা মাল আমদানি করে, অপরদিক দিয়ে তৈরী ইঞ্জিন খালাস করে দেওয়া যেতে পারে।

সেদিন বিকালে আমরা 'হিল-কলোনী' দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। শহরের একপ্রান্তে একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর Water works ও Reserve tank. এখান থেকে সমস্ত শহরে জল সরবরাহ করা হয়। এখানকার কাজও আমাদের খুব ভাল লাগ্‌ল। এই পাহাড়ের উপর থেকে সমস্ত শহরের দৃশ্যটি বড় সুন্দর দেখা যায়। দূর থেকে ফ্রেমে বাঁধানো একখানি ছবি বলে মনে হয়। রাজপথ, বৈদ্যুতিক আলো এবং নব-নির্ম্মিত ছোট ছোট বাংলোগুলি কোয়ার্টার। দর্শককে একেবারে মুগ্ধ করে দেয়, চোখ ফেরানো যায় না। মনে হয়—যেন কোন্ এক কল্পলোকে এসে পড়েছি।

এই পাহাড়ের উপর একটি বিশ্রাম ঘর আছে। আমরা অনেকক্ষণ এখানে বসে বিশ্রাম করে নিলুম। এখানে সূর্য্যের উত্তাপ বড় বেশী। অসহ্য গরম, কিন্তু ঘাম হয় না। এই পাহাড়ের শীতল বাতাস আমাদের শ্রান্তি দূর করে মনে একটা প্রফুল্লতা এনে দিল।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় আমরা বাসার দিকে ফিরে চললুম।

পরদিন বেড়াতে বেরিয়ে 'কস্তুরীবাঈ গান্ধী' হাসপাতাল দেখে এলুম। প্রকাণ্ড হাসপাতাল, ইন্‌ডোর ও আউট্‌ডোর বিভাগ আছে। রোগীদের প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়। এই হাসপাতালের এক অংশে T. B. বিভাগ। ব্যবস্থা দেখে আমাদের বেশ ভালই লাগ্‌ল। এখানে দু' তিনটি উচ্চ বিদ্যালয়ও আছে। শ্রমিকদের বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদের জন্য শহরের দুই দিকে দুইটি ইনষ্টিটিউট্ আছে। একটির নাম 'বাসন্তী' ইনষ্টিটিউট্, অপরটির নাম 'শ্রীলতা' ইনষ্টিটিউট্। এই দুইটী ইনষ্টিটিউটের সংলগ্ন দুটি সিনেমাও আছে।

শ্রমিকদের সুখসুবিধার দিকে সরকার যথেষ্ট দৃষ্টি দিয়েছেন। অন্যান্য স্থানের কারখানার শ্রমিকদের তুলনায় এখানকার কর্ম্মীরা বেশ ভালই আছে বলে মনে হল।

২৭শে এপ্রিল সকাল সাতটায় বিদায় নিয়ে বেশ প্রফুল্ল অন্তরেই আমরা বার্ণপুরে ফিরে এলুম।

দীঘি বউ ! তুমি দেখেছ কি কোন মধুর স্বপ্ন নব ?

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কোথা দূরে যেন শোনা যায় কার চাপা ক্রন্দন রোল !
রাখী পূর্ণিমা-তিথি ডোর ছিঁড়ে যায় :
দীঘির দু'ধারে ঝাউ বনে জাগে স্বপনের কল্লোল
ঢেউ লাগে মোর ঘুমভরা আঙিনায়।
আকাশে পাখীরা উড়ে গেছে, আর ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
চুপে চুপে চাঁদ চলে গেছে কাল গুণি
জোনাকীর রঙে ঝিল্‌মিল হোলো আঁধারের উপকূল
জীবনের বাণী নূতন করিয়া শুনি।
তন্দ্রা-বধির প্রহরের মাঝে বাজে কঙ্কন তব
ঝিমানো রাতের জ্যোছনা-বিছানো তটে :
দীঘি বউ ! তুমি দেখেছ কি কোন মধুর স্বপ্ন নব,
হৃদয়-বীণার নীড়টানা ছায়ানটে ?
মেঘলা মলিন আকাশে তোমার কবে বিজলীর রেখা
দেখেছিনু যেন বারি-ঝরা রজনীতে।
সেদিন তোমার নয়নের কোণে ছিল যে অশ্রু লেখা
বিরহ বিধুর বরষার সঙ্গীতে।

পথ-চলাদের কুহেলি-নিবিড় ইতিহাসটুকু নিয়ে
ঘন অরণ্যে গেছে পথ এঁকে-বেঁকে।
তব পথ চাওয়া দিনগুলি গেল স্মরণের বীথি দিয়ে
তৃণতনু ছুঁয়ে হিমঝুরি হাওয়া মেখে।
পুলক-শঙ্কা যৌবন লয়ে শিথিল বয়ানে ঘুমি
ছিলে নিরালায় সুরভিত সমীরণে ;
কামনার নীল পাত্র ভরিয়া আশার মদিরা তুমি
পান করেছ কি কখন হারাণো ক্ষণে ?
উদয় শৈলে হয় তো তোমার আলোকের শতনরী
প্রণামের মত ফুটিয়াছে ভোরবেলা।
দিগন্ত গাঙে দাঁড় টেনে টেনে তোমার মনের তরী
তারাদের সাথে হয় তো করেছে খেলা।
ঘুরে ঘুরে গেছে পথিকের মত কত অতীতের কথা
কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী ঢাকা রাতে,
চৈত্র দিনের কাকলী কূজনে খোঁপায় জড়ায়ে লতা
ফুল তুলে তুমি দিয়েছ কি কারো হাতে ?

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পরের দিনও মস্কোর আকাশ মেঘে মেঘাচ্ছন্ন···সকাল থেকে সন্ধ্যা ঝিরঝির্ করে সারাক্ষণই ঝরছে ওদেশী তুষার-বৃষ্টির ধারা। সহরের পথ-ঘাট জলে-কাদায় প্যাচ্‌প্যাচ্ করছে···লোকজন সব টুপি, ছাতা, বর্ষাতি-কোট, আর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা রবারের 'গ্যলোশ্' বুট জুতো পরে

মেলা শুরু হবার আগে মস্কোর সার্কাসের আসরে খেলোয়াড়দের সমাবেশ

যে যার ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস বইছে এলো-মেলো ঝড়ের বেগে—ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুলেই কাঁপুনী জাগে সারা দেহে!

সেদিন আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা···কেবল মস্কোর বেতার-কেন্দ্রে হাজির হওয়া ছাড়া—আর কোথাও বেরুনোর তাগাদা ছিল না। তাই প্রাতরাশের পালা চুকিয়ে হোটেলের কামরায় বসে কাঁচের জানলার বাইরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে ওদেশের তুষার-বৃষ্টির রূপ দেখছি—এমন সময় ঘরে এসে হাজির হলেন মস্কো-রেডিওর প্রতিনিধি শ্রীমান বোরিশ কারপুশ্‌কিন্। তাঁকে দেখেই মন বিরূপ হয়ে উঠলো—এমন বেয়াড়া জল-কাদায় বাইরে পথে বেরুতে হবে আবার! তবে ওদেশী বন্ধুটি দেখলুম রীতিমত সুবিবেচক··· আজকের এই বেয়াড়া আবহাওয়া দেখে তিনি নিজেই মুলতুবী রেখেছেন আমাদের বেতার-ভাষণদানের পালা! শুধু তাই নয়, এই জল কাদা মাড়িয়ে তিনি নিজে কষ্ট করে এসেছেন আমাদের সে-খবর জানাতে! ধন্যবাদ জানালুম তাঁকে। শ্রীমান বোরিশ কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন···তিনি জানালেন যে পরে, শীগগিরই সুবিধামত এক সময়ে আমাদের সবাইকে টেনে নিয়ে যাবেন তাঁদের বেতার-কেন্দ্রে, ভাষণ-দানের জন্য!

খানিকক্ষণ গল্পগুজবের পর শ্রীমান বোরিশ বিদায় নিলেন। দেশে আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে খানকতক চিঠিপত্র লেখার পর সবে একটু দিবা-নিদ্রা দেবার জোগাড় করছি, এমন সময় দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন সোভিয়েট-সহচরী কুমারী আলেক্‌জান্দ্রোভা। তাঁর মুখে শুনলুম—আজ রাত্রে মস্কোর সুপ্রসিদ্ধ 'সির্ক্-ডোম' (Cirk-dome) বা 'সার্কাস-ভবনে' ওদেশী সার্কাসের খেলা দেখতে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে—আমাদের জন্য! সোভিয়েট-রাজ্য সফরে আসার আগে, কোলকাতায় রুশদেশী সার্কাস-খেলোয়াড়দের বিচিত্র ক্রীড়া-কৌশল দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল কয়েকবার···তাই, মস্কোর 'সির্ক্-ডোমে' যাবার কথা শুনেই মন আগ্রহে অধীর হয়ে উঠলো।

তাড়াতাড়ি সান্ধ্য-ভোজনের পালা শেষ করে রাত আটটা নাগাদ 'স্যাভয় হোটেলের' দরজায় অপেক্ষমান ওদেশের দু'খানি সরকারী মোটর-যানে চড়ে, সোভিয়েট-বন্ধু আনাতোলী আর আলেক্‌জান্দ্রোভার সঙ্গী হয়ে, আমরা ক'জনে দল বেঁধে রওনা হলুম মস্কোর সুবিখ্যাত 'সার্কাস-ভবনের' পানে। বাইরে তখন বৃষ্টির ধারা বন্ধ হয়েছে···পথ-ঘাট সব শুকনো-খটখটে···ঝোড়ো-বাতাসের কনকনানি থাকলেও··· সহরের চারিদিকে জেগেছে আনন্দের হিল্লোল!

হোটেল ছেড়ে খানিকদূর আসবার পর, মস্কোর সুপ্রশস্ত রাজপথের

পাশেই চোখে পড়লো—শিয়রে গম্বুজ-বসানো বিরাট এক সুদৃশ্য-আধুনিক ইমারৎ···সামনে লোকজনের রীতিমত ভীড়—আমাদের গাড়ী এসে থামলো সেই সুবিশাল-ভবনের দরজায়! শুনলুম, এইটিই হলো—মস্কোর 'সার্কাস-ভবন'···সোভিয়েট-রাজ্যের সব চেয়ে সেরা, সব চেয়ে বড়—সার্কাসের খেলা-দেখানোর পাকা আঙ্গিনা। দেখে অবাক হলুম। আমাদের দেশে এতকাল ধরে দেখে আসছি যে, ভ্রাম্যমান দেশী সার্কাসওয়ালার দল রাশি-রাশি তল্পী-তল্পা, লট-বহর—আর নানান্ সব জন্তু-জানোয়ারের রশদ-সরঞ্জাম নিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে, গ্রাম আর সহরের বড়-বড় মাঠে বিরাট তাঁবু খাটিয়ে তারই মধ্যে তাঁদের বিচিত্র

মস্কোর সার্কাসে 'ট্রাপিজের' খেলা

খেলা দেখান—আজ সোভিয়েট দেশে এসে প্রথম দেখলুম, তার ব্যতিক্রম। এদেশে ভ্রাম্যমান সার্কাসওয়ালাদের মধ্যে গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে তাঁবু খাটিয়ে খেলা দেখানোর রেওয়াজ থাকলেও, প্রত্যেকটি বড়-বড় সহর আর বিশিষ্ট জনপদেই মস্কোর এই 'সার্কাস-ভবনের' মতো বহু স্থায়ী-ইমারৎ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজ সোভিয়েট-সরকারের সুব্যবস্থায়! এ-ব্যবস্থার ফলে, ওদেশী বাসিন্দাদের বরাতে, মাত্র দু' এক মাস ছাড়া বছরের বাকী সময়টুকু, নিত্য-নূতন সার্কাসের বহু বিচিত্র ক্রীড়া-কৌশল দেখার সুযোগ মেলে! ওদেশের এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিতে লোক-জনকে শুধু যে সার্কাসের নানা রকম খেলা দেখিয়ে আনন্দ-পরিবেশন করা হয় তাই নয়, ভাঁড় (clown) আর খেলোয়াড়দের বিচিত্র ক্রীড়া-কৌশল' আর রঙ্গ-রসিকতার মধ্যে দিয়ে সুনিপুণভাবে বহু শিক্ষণীয়-বিষয়ের অবতারণা করে লোকশিক্ষার প্রসারতা ঘটানোরও সুবিধা রয়েছে দেখলুম—রীতিমত। তাছাড়া সোভিয়েট দেশের প্রত্যেকটি 'সির্ক্-স্তোমে' সার্কাসের বিচিত্র ক্রীড়া কৌশল শেখানোর উদ্দেশ্যে অভিনব শিক্ষা-কেন্দ্রেরও সুব্যবস্থা আছে। ওদেশের যে সব ক্রীড়ানুরাগী ছেলে-মেয়ে সার্কাসের বিভিন্ন কলা-কৌশল শিখে পেশাদারী খেলোয়াড় হিসাবে জীবিকা-অর্জ্জন করতে চান—তাঁরা আসেন এই সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষালয়ে। সেখানে সুদীর্ঘ তিন বছর

মস্কোর সার্কাসে 'ব্যালান্সিঙের খেলা

ধরে অভিজ্ঞ-কুশলী নানান্ ক্রীড়াবিদ্-শিক্ষকদের শিক্ষাধীনে থেকে সার্কাসের বিভিন্ন বিচিত্র ক্রীড়া-কৌশল শিখে রীতিমত পারদর্শিতা লাভ করে তাঁরা নামেন খেলার আসরে···এঁদের পারিশ্রমিকের হার তখন নির্দ্ধারিত হয় প্রত্যেকের ব্যক্তিগত নিপুণতা অনুসারে। ওদেশের সাধারণ সার্কাস-খেলোয়াড়দের মাসিক বেতনের সর্ব্বনিম্ন হার হলো—পাঁচশো রুব্‌ল···অর্থাৎ আমাদের দেশের মুদ্রামানে প্রায় পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকা! তবে সার্কাসের ভালো আর নামজাদা খেলোয়াড়েরা মাসে তিন-চার, এমন কি, আট-দশ হাজার টাকাও রোজগার করে থাকেন—তাঁদের নিজেদের গুণানুসারে! সাধারণ-আসরে দর্শকদের

সামনে সার্কাসের খেলা দেখানো ছাড়াও, ওদেশের প্রবীণ ও কুশলী খেলোয়াড়ের দল অবসর-সময়ে 'সির্ক্-স্তোমের' তরুণ-কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদেরও শিক্ষাদান করেন—বিচিত্র ক্রীড়া-কৌশলের বিভিন্ন বিষয়ে। এঁদের উন্নত-পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ফলে—সোভিয়েট দেশের সার্কাস-শিল্পীদের ক্রীড়া-নৈপুণ্য আজ রীতিমত উৎকর্ষতা লাভ করেছে। ওদেশী 'সির্ক্-স্তোমে' সার্কাস-খেলোয়াড়দের খেলায় কোন ফাঁকি নজরে পড়ে না কোথাও···সাজ-সরঞ্জাম, বেশভূষা, আলোক-নিয়ন্ত্রণ, ক্রীড়া-কৌশল, রঙ্গ-রসিকতা, সব কিছুতেই তাঁদের নিখুঁত নজর···কি উপায়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করবেন—সেই দিকেই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য! এমনি একনিষ্ঠ সাধনার ফলেই, সার্কাস আজ সোভিয়েট কৃষ্টি-কলার ক্ষেত্রে

মস্কোর সার্কাসে ছুটন্ত ঘোড়ার উপর 'ব্যালান্সিঙের খেলা

একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে···দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে সার্কাসের ক্রীড়া-কৌশল এখন পরম আদরের বস্তু···গৌরবের বিষয়! ওদেশের সার্কাস-শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, সোভিয়েট সরকার তাঁদের ওদেশের সেরা উপাধি-পদক 'Order of Lenin' দানে পুরস্কৃত করেন।

বলা বাহুল্য, সোভিয়েট দেশের এই সব সার্কাস-প্রতিষ্ঠানগুলি কারো ব্যক্তিগত লাভের ব্যবসা নয়···রাষ্ট্রের সম্পত্তি! সারা সোভিয়েট-রাজ্যে যেখানে যত সার্কাস-প্রতিষ্ঠান আছে—সেগুলির কার্য্য-পরিচালনা করা হয়—মস্কোর 'সির্ক্-স্তোম্' কেন্দ্রের নির্দেশানুসারে! খেলার আসর ও শিক্ষায়তন ছাড়াও মস্কোর 'সির্ক স্তোমে' রয়েছে ওদেশের সার্কাসের ইতিহাসের বিচিত্র নিদর্শনে ভরা—বিরাট এক 'মিউজিয়াম'···সেখানে সার্কাস-অনুরাগীদের ভীড় লেগে রয়েছে নিত্য-নিয়ত! মস্কোর 'সির্ক্-স্তোম্‌টি' হলো ওদেশী সার্কাস-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কেন্দ্র···এখানকার কর্ম্মীরা প্রত্যেকেই সোভিয়েট-রাজ্যের সেরা সার্কাসবিদ্! কাজেই ওদেশের সেরা সার্কাসের আসরে, সেরা খেলোয়াড়দের সেরা খেলা দেখতে এসেছি জেনে, মন আগ্রহে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল।

গাড়ী থেকে নেমে একরাশ পাথরের সিঁড়ি মাড়িয়ে এসে আমরা সদলে মস্কোর সুসজ্জিত-আধুনিক স্থাপত্য কলাশ্রীমণ্ডিত 'সির্ক-স্তোমের', Lobby অর্থাৎ বাইরের অঙ্গনে এসে পৌছুতেই দেখি—লোকে লোকারণ্য চারিদিক। টিকিট-ঘরের সামনেই দেখলুম রুশ-ভাষায় লেখা বিচিত্র একটি বিজ্ঞাপন টাঙানো···ওদেশী দোভাষী-সহচর-বন্ধু আনাতোলী অবিলম্বে তর্জ্জমা করে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন তার মর্ম্ম···বিজ্ঞাপনে লেখা রয়েছে—Auditorium Full···অর্থাৎ, আসর ভরপুর—'ন স্থানং তিলধারণং'! আশপাশে লোকজনের বিপুল ভীড় দেখে সুস্পষ্ট আভাস পেলুম যে ওদেশী বাসিন্দাদের সার্কাসের খেলা দেখার ঝোঁক কতখানি প্রবল!

সার্কাস আরম্ভ হতে তখন মাত্র আর মিনিট দশেক বাকী—কাজেই বাইরে অযথা সময় নষ্ট না করে সোভিয়েট-সহচরদের সঙ্গে আমরা সদলে এসে হাজির হলুম—খেলার আসরে! বিচিত্র রঙীন মার্ব্বেল-পাথর আর কংক্রীটের তৈরী বিরাট চক্রাকৃতি আঙ্গিনা···আঙ্গিনার মাঝখানে বালি আর কাঠের গুঁড়ো বিছানো সুপ্রশস্ত আসর—সার্কাসের খেলা দেখানোর জায়গা! চক্রাকৃতি-আসরের চারিধারে লাল ভেলভেট-মোড়া গদীওয়ালা আরামপ্রদ আসনের সারি···প্রায় হাজার দুয়েক লোক বসবার ব্যবস্থা! বক্সের আর গ্যালারীর প্রত্যেকটি আসন একই ধরণের···কম-দামী বা বেশী-দামী আসনের মধ্যে আরামের ব্যবস্থার কোনো পার্থক্য নেই···খেলা-দেখানোর আঙ্গিনার কাছে যে সব আসন, সেগুলির দাম বেশী···আর যেগুলি যত দূরে, তার টিকিটের দামও তত কম। আমাদের আসনগুলি ছিল খেলার আঙ্গিনার কাছে—কাজেই সার্কাস দেখতে অসুবিধা ঘটেনি এতটুকু! চক্রাকৃতি-আঙ্গিনার এক দিকে খেলোয়াড়দের প্রবেশ-পথ—সাধারণতঃ আমাদের দেশের তাঁবু-ঘেরা সার্কাসের আসরে যেমন দেখা যায়—অনেকটা ঠিক তেমনি ধরণের···তবে চেহারায় তার চেয়ে সুন্দর! প্রবেশ-পথের মাথাতেই বিচিত্র নক্সাদার রেলিঙ-ঘেরা বড় বারান্দায় বাদ্যকরদের কোন স্থান···একরাশ বড়-বড় বিজলী-বাতির উজ্জ্বল-আভায় আলো হয়ে আছে সার্কাসের সুপ্রশস্ত আঙ্গিনা!

নির্দ্ধারিত-সময়ে মৃদু-ছন্দে বেজে উঠলো সার্কাসের খেলা সুরু হবার সঙ্কেত-ধ্বনি···ধীরে-ধীরে সরে গেল খেলোয়াড়দের প্রবেশ-পথের যবনিকা···পুরোভাগে সোভিয়েট-রাজ্যের বিরাট একটি জাতীয় পতাকা বহন করে আসরে সারি দিয়ে এসে হাজির হলেন—মস্কোর 'সির্ক-স্তোম্' প্রতিষ্ঠানের ছোট-বড় প্রত্যেকটি সার্কাস-শিল্পী! খেলা-দেখানোর আসরে তাঁদের আবির্ভাব ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ-পথের

উপরের বারান্দা থেকে বাদ্যযন্ত্রীর দল সোভিয়েট জাতীয় সঙ্গীতের সুর বাজাতে সুরু করলেন—সমবেত দর্শকমণ্ডলী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওদেশের জাতীয় পতাকা আর জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অন্তরের মৌন-শ্রদ্ধা জানালেন। জাতীয়-সঙ্গীত শেষ হবার পর সার্কাসের খেলোয়াড়েরা সারি দিয়ে আবার ফিরে গেলেন—প্রবেশ-পথের যবনিকার অন্তরালে! সাগ্রহে লক্ষ্য করলুম যে ওদেশী ক্রীড়াবিদ্ ছাড়াও মস্কোর সার্কাস-খেলোয়াড়দের দলে রয়েছেন কোরিয়া আর চীনদেশের কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ শিল্পী!

তাঁরা আসর ছেড়ে অন্তরালে ফিরে যাবার পর সামান্য একটু বিরতি··· সেই ফাঁকে চোখ বুলিয়ে নিলুম একবার চক্রাকৃতি-আঙ্গিনার চারিপাশে—সমবেত দর্শকমণ্ডলীর উপর। দেখলুম ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে থেকে আরম্ভ করে অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্য্যন্ত সব বয়সেরই লোকজন এসে জড় হয়েছেন এই সার্কাসের আসরে। দর্শকদের ভীড়ের মাঝে প্রায়ই নজরে পড়ে—উর্দ্দি-কোমর-বন্ধ-আঁটা লাল-ফৌজের সেনাপতির পাশে দিব্যি অসঙ্কোচে বসে আছে কয়লা-খাদের কুলী, মস্কোর বাস ড্রাইভার, স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, বাজারের নাপিত, আর নৌবহরের ক্যাপ্টেন···তাঁদের সামনেই ছেলে-মেয়ে নিয়ে সার্কাস দেখতে এসেছেন পাড়াগাঁয়ের চাষা আর চাষী··· তাঁদের পাশের আসনেই রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, হোটেলের পরিচারিকা, জুতোওয়ালা মুচী, চলচ্চিত্রাভিনেত্রী, আর গীর্জ্জার পুরোহিত ···সবাই বসেছে একসঙ্গে মিলে-মিশে—কোনো গোলমাল নেই··· সবাই উৎসুক হয়ে রয়েছে সার্কাসের খেলা দেখার আগ্রহে! অনেকের হাতেই রয়েছে 'অপেরা গ্লাস্' (Opera Glass)···ভালো করে খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-কৌশল দেখবেন বলে তাঁরা 'সির্ক-স্তোমের' ক্লোক্-রুম' (Cloakroom) থেকে নামমাত্র দক্ষিণা দিয়ে ভাড়া করে এনেছেন ছোট-ছোট এই সব দূরবীণ-যন্ত্র! ইউরোপ আর আমেরিকার লোকজনের মত সোভিয়েট দেশবাসীদের মধ্যেও থিয়েটার, নাচ, গান, আর সার্কাসের আসরে 'অপেরা গ্লাস্' ব্যবহারের রীতিমত রেওয়াজ আছে! পাছে খেলা দেখার অসুবিধা ঘটে, এই মনে করে, কুমারী আলেকজান্দ্রোভাও আমাদের জন্য 'অপেরা গ্লাস্' সংগ্রহ করে এনেছিলেন—কাজেই সার্কাস দেখার কোনো অসুবিধা ঘটেনি আমাদের সেদিন।

কিছুক্ষণ পরেই বাদ্যযন্ত্রে ধ্বনিত হলো—সুমধুর সঙ্গীতালাপ···প্রবেশ পথের পর্দ্দা সরিয়ে খেলার আসরে এসে হাজির হলেন—সার্কাসের বিচিত্র পোষাক-পরা ক'জন তরুণ সোভিয়েট খেলোয়াড়। 'সির্ক-স্তোমের' সুপ্রসারিত আঙ্গিনায় সুরু হলো সার্কাসের খেলা!

প্রথমেই দেখলুম—ও দেশের ক'জন তরুণ-খেলোয়াড়ের শারীরিক-কৌশলের বিচিত্র কশরৎ! তারপর ফুটফুটে-সুন্দর একটি কিশোরীকে নিয়ে শূন্যে-লোফালুফি আর 'জিম্‌নাষ্টিকের' বহু অপরূপ খেলা দেখালেন—'সির্ক্-স্তোমের' ক'জন সুদক্ষ সার্কাস-শিল্পী! এঁদের পর তেজী ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসরে এলেন এক রূপসী তরুণী···চক্রাকৃতি-আঙ্গিনার বুকে ছুটন্ত-ঘোড়ার উপর নানান্ বিচিত্র কশরৎ দেখিয়ে তিনি বিদায় নেবার সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাজিকের অভিনব মোহিনী-মায়াচাতুর্য্যে দর্শকদের মন মাতিয়ে তুললেন, মস্কো-প্রবাসী চীন দেশের এক সুদক্ষ-প্রবীণ যাদুকর। চৈনিক-যাদুকলার পর, ক'জন সুনিপুণা রুশ-তরুণী দেখালেন—'ট্রাপিজের' নানা রকম দুরূহ-খেলা! এ-সব খেলার ফাঁকে-ফাঁকে ভুবন-বিখ্যাত রঙ্গাভিনেতা চার্লি চ্যাপ্‌লিনের বিচিত্র রূপসজ্জায় (সাধারণতঃ ঢিলা পাৎলুন, ঝল্‌ঝলে কালো কোট, কালো টুপী, লম্বা জুতো, ছড়ি আর ছোট গোঁফ-আঁটা যে অভিনব রূপসজ্জায় ছায়াচিত্রে দেখা যায়) সেজে সার্কাসের আসরে মাঝে-মাঝে এসে নানান্ 'চুটকী' ক্রীড়া-কৌশল দেখিয়ে যাচ্ছিলেন—ও দেশী এক 'Clown' বা 'ভাঁড়'! ও দেশী সহচর-সঙ্গীদের কাছে শুনলুম—তিনি হচ্ছেন, সোভিয়েট-রাজ্যের সব চেয়ে সেরা, বিশিষ্ট-প্রবীণ সার্কাস-শিল্পী···সারা দেশের ছেলে-বুড়ো সবাই তাঁকে রীতিমত ভালবাসে। তাঁর এই অপরূপ জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে—সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা আর সুনিপুণ ক্রীড়া-কৌশল-চাতুর্য্য··· 'জিম্‌নাষ্টিকের' কশরৎ, 'ট্রাপিজের' খেলা—চলন্ত-ঘোড়ার পিঠে চড়ে বিচিত্র কৌশল-দেখানো···এ-সব ছাড়াও সার্কাসের আরো নানা ধরণের খেলায় এঁর সবিশেষ দক্ষতা আছে···রঙ্গ-রসিকতা করে লোক
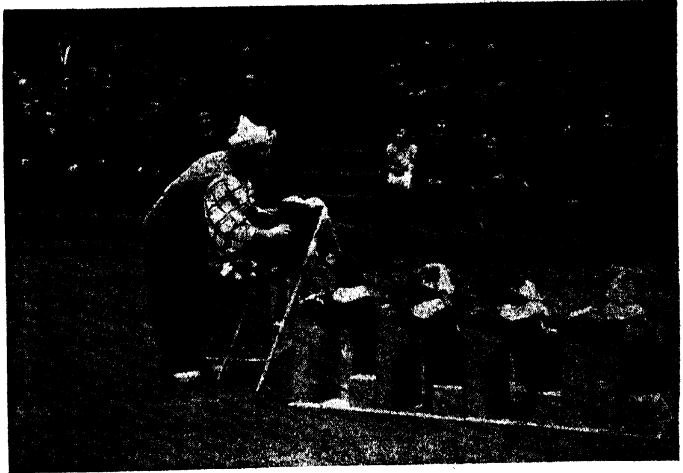
মস্কোর সার্কাসে কুকুরের অঙ্ক-কষার খেলা

হাসানোতেও ইনি অদ্বিতীয়। এই সব নানান্ গুণের জন্যে, শুধু দেশের জন-সাধারণ নয়, সোভিয়েট-সরকারের কাছেও ইনি আজ বিশেষ সমাদর লাভ করেছেন…ও দেশী সার্কাস-শিল্পীদের সেরা-পুরস্কার—'Order of lenin' এবং 'People's Honoured Artist of U. S. S. R' উপাধি-পদক মিলেছে তাঁর বরাতে। শুধু ও দেশের শ্রেষ্ঠ সার্কাস-খেলোয়াড় হিসাবেই নয়, সোভিয়েট 'সির্ক্-ত্তোম্ শিক্ষায়তনের অন্যতম প্রবীণ সুযোগ্য-শিক্ষকরূপে ইনি আজ বিশেষ বরেণ্য…এঁর হাতে-গড়া বহু ছাত্র-ছাত্রী অল্পদিনের মধ্যেই সার্কাসের আসরে রীতিমত পারদর্শিতা দেখিয়ে দেশজোড়া খ্যাতি লাভ করেছেন। নিজস্ব প্রতিভাগুণে, মস্কোর 'সির্ক্-ত্তোম' প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি মাসে ইনি যে মোটা পারিশ্রমিক দেয়। লোক-হাসানোর উদ্দেশ্যে রঙ্গ-রসিকতাচ্ছলে তাঁরা সময়ে-সময়ে এমন সব উৎকট-আদিরসের প্রসঙ্গ-অবতারণা করেন যে দর্শকের আসনে বাপ-মা, ভাই-বোন, ছেলে-বুড়ো তো দূরের কথা—স্বামী-স্ত্রী পর্য্যন্ত পাশাপাশি বসে সে-সব ছ্যাবলামি আর নোংরামি দেখে-শুনে আনন্দ-উপভোগের বদলে রীতিমত অস্বস্তি-বোধ করেন। মস্কোর সার্কাসের আসরে ওদেশের এই সুপ্রসিদ্ধ 'ক্লাউনের' আচরণে বা রঙ্গ-রসিকতার কোথাও কোনো রকম অশ্লীলতা বা অসভ্যতার চিহ্ন চোখে পড়লো না…অথচ, অত বড় বিরাট আসর ওদেশী ছেলে-বুড়ো দর্শকদের স্বতস্ফূর্ত্ত-আনন্দের রোলে ভরপুর…সারা বাড়ী যেন ফেটে পড়ছে হাসির হর্‌রায়! ওদেশী সার্কাসে সঙের রঙ্গাভিনয়ে নেই শস্তা-আদিরসের ছড়াছড়ি…তার বদলে রয়েছে দেখলুম—ঘরোয়া হাস্য-কৌতুকের সরল ঠাট্টা-রসিকতা…দেশ-বিদেশের নানা রকম সামাজিক আর রাজনৈতিক সমস্যার উপরে ব্যঙ্গ-টিপ্পনী, আর অনাবিল আনন্দের হাস্যোদ্দীপক ছেলেমানুষী-পনা—যা ছেলে বুড়ো সবাই মিলে এক সঙ্গে আসরে বসে সমানভাবে উপভোগ করতে পারে। রঙ্গচ্ছলে সোভিয়েট দেশের এই সেরা ক্লাউনটি সেদিন যে সব শক্ত শক্ত বিচিত্র সার্কাসের খেলা দেখালেন, তা রীতিমত অপূর্ব্ব! এমনি ভাবে একের পর এক সার্কাসের আরো অনেক সব কশরতের খেলা দেখলুম আমরা সেদিন মস্কোর 'সির্ক্-ত্তোমে'র আসরে। সে-সব খেলার মধ্যে চীনদেশের একদল খেলোয়াড়দের অপরূপ যাদু-কৌশল আর হাত-সাফাইয়ের খেলার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য! দশ-বারো হাত লম্বা রঙীন কাপড়ের ফালি নিয়ে বিচিত্র পদ্ধতিতে হাত-নাড়ার কায়দায় তাঁরা শূন্যে নানান্ ছাঁদের জ্যামিতিক-চিত্ররচনার যে সব অভিনব কৌশল দেখালেন—সেগুলি রীতিমত আশ্চর্য্য রকমের…আমাদের দেশের বা বিদেশী কোনো সার্কাসের আসরে এ-ধরণের অদ্ভুত খেলা এর আগে আর কখনও দেখেছি বলে, মনে পড়ে না। চীনা-খেলোয়াড়দের পর আসরে নামলেন সোভিয়েট-সার্কাস-জগতের এক নামজাদা ঘোড়-সওয়ার…বিচিত্র কায়দায় ছুটন্ত-ঘোড়ার উপর সাবলীল-ভঙ্গীতে শুয়ে-বসে-দাঁড়িয়ে-ঝুলে-লাফিয়ে জ্বলন্ত আগুনের গোলা আর একরাশ বল লোফালুফি করে নানান্-রকমের দুরূহ ক্রীড়া-কৌশলের কায়দা দেখালেন তিনি! এঁর পর, মস্কো-প্রবাসিনী কোরিয়া-রাজ্যের এক তন্বী গায়িকা তাঁর দেশের

মস্কোর সার্কাসে তারের উপরে ভাল্লুকের খেলা

পান, তার বিরাট অঙ্ক শুনলে আমাদের দেশের লোকের তাক্ লেগে যায়…এমন সৌভাগ্যের কথা ভারতের শ্রেষ্ঠ-প্রবীণ সার্কাস-শিল্পীদের কল্পনাতীত সহচর সোভিয়েট-সঙ্গীদের মুখে এ-সব বিচিত্র পরিচয় পেয়ে আমরা সাগ্রহে ওদেশের এই সেরা সার্কাস-খেলোয়াড়টির প্রত্যেকটি কার্য্যকলাপ বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিলুম। এঁর কার্য্যকলাপে সেদিন যে বৈশিষ্ট্যটি নজরে পড়েছিল—সেটি আমাদের দেশের সার্কাসের আসরে নিতান্তই দুর্লভ! দেশী সার্কাসের আসরে খেলোয়াড়দের যে সব সাজ-সজ্জা দেখা যায়—সেগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জীর্ণ, মলিন, অপরিচ্ছন্ন…এমন কি সুরুচিরও অভাব চোখে পড়ে বিশেষ করে! তাছাড়া খেলা দেখানোর সময় দেশী সার্কাসের আসরে যে সব অদ্ভুত সঙ্-ভাঁড় আর ক্লাউনের ঘন-ঘন আবির্ভাব ঘটে—তাঁদের আচরণও অনেক সময়ে রীতিমত অসভ্য, অশ্লীল এবং জঘন্য নোংরা রুচির পরিচয়

কয়েকটি সুমধুর লোক-গীতি শুনিয়ে সার্কাসের দর্শকদের মোহিত করে তুললেন। এমনিভাবে শুধু মানুষের কশরতই নয়, সার্কাসের পোষ-মানানো জন্তু-জানোয়ারদেরও অনেক রকম খেলা দেখানো হলো সেদিনকার আসরে। এ-সব জন্তু-জানোয়ারদের খেলার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগলো সার্কাসের ক'টি পোষা কুকুরের ইস্কুলের খেলাটি! বিরাট আসরের মাঝে ছোট ডেস্ক, বেঞ্চি, ব্ল্যাক-বোর্ড সাজিয়ে পাঠশালা রচনা করে ওদেশী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মতো পোষাক পরিয়ে সাত-আটটি ছোট-ছোট কুকুর সঙ্গে নিয়ে সঙের সজ্জায় সোভিয়েট-রাজ্যের সুবিখ্যাত এক সার্কাস-খেলোয়াড় এলেন গুরুমশাইয়ের ভূমিকার অভিনয় করতে। জনাকীর্ণ খেলার আসরে এসেই নিতান্ত বাধ্য-পড়ুয়াদের মতো সার্কাসের পোষা কুকুরের দল পরম সুশৃঙ্খলভাবে যে যার নিজের বেঞ্চিতে বসে পড়লো—সামনের উঁচু ডেস্কের উপর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাত-রাখার ভঙ্গীতে সুমুখের দু'খানি চরণ রেখে। সঙ-বেশী গুরুমশাই-খেলোয়াড় বোর্ডে ক'টি যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ অঙ্ক লিখে পড়ুয়া কুকুরদের একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলেন—সে-সবের ফলাফল সম্বন্ধে। অবাক বিস্ময়ে দেখলুম—সার্কাসের পোষা কুকুরের দল সুনিপুণ ভঙ্গীতে টেবিলের উপর থাবার টোকা দিয়ে বা ঘেউ-ঘেউ শব্দ করে অনায়াসেই সে-সব কঠিন অঙ্কের ফলাফল নির্ভুলভাবে জানিয়ে দিলে তাদের গুরুমশাইয়ের কাছে। আঁক-কষা ছাড়াও পোষা কুকুরদের আরো অনেক বিচিত্র খেলা দেখানো হলো। সার্কাসের অনুষ্ঠান-সূচীতে সেদিন সব শেষ বিষয় ছিল—ক'টি রুশ-ভালুকের খেলা। আমাদের দেশে যেমন বাঘ-সিংহের খেলা দেখিয়ে সার্কাসের পালা সাঙ্গ করার প্রথা আছে—সোভিয়েট রাজ্যে তেমনি ওদেশী ভালুকের খেলা দেখিয়ে শেষ করার রেওয়াজ। এ খেলা দেখবার জন্য ওদেশের ছেলে-বুড়ো প্রত্যেকটি দর্শকেরই দারুণ আগ্রহ দেখা যায়—কাজেই আমরাও অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলুম ওদেশী সার্কাসের এই অভিনব খেলাটি দেখবার জন্য। সার্কাসের প্রোগ্রামে ছাপানো সেদিনকার প্রথম পর্যায়ের খেলাগুলি দেখিয়ে, দশ মিনিট Interval বা 'বিরামের' পর দ্বিতীয় পর্যায়ের বাকী কশরৎ শেষ করে সুরু হলো ওদেশী ভালুকের খেলা।

আমাদের দেশে বাঘ-সিংহের খেলা দেখানোর সময় সার্কাসের আসরের চারিপাশে যেমন লোহার গরাদ সাজিয়ে সুদৃঢ় খাঁচা রচনা করে তার মধ্যে খেলা দেখানো হয়, ওদেশে ভালুকের খেলার সময় দেখলুম সে-সবের কোনো আয়োজন থাকে না। মুক্ত-আসরে সমবেত-দর্শকদের সামনে প্রকাণ্ড চারটি ওদেশী ভালুক সঙ্গে নিয়ে খেলা দেখাতে নামলেন সোভিয়েট-রাজ্যের শ্রেষ্ঠ উপাধি-পদকপ্রাপ্ত এক প্রবীণ জন্তু-খেলোয়াড়। বনের বড় বড় হিংস্র ভালুকদের তিনি যে কেমন সুন্দর পোষ মানিয়েছেন—তার পরিচয় পেলুম তাঁর অপরূপ ক্রীড়া-চাতুর্য্য দেখে। ভালুকদের দিয়ে তিনি তারের উপর পায়ে হেঁটে চলা, জিমনাষ্টিকের খেলা, সাইকেল চালানো, ট্রাপিজের কশরৎ—এমনি আরো নানান্ ধরণের চমৎকার সব খেলা দেখালেন। মুগ্ধ দর্শকের দল মুহুর্মুহুঃ করতালি আর হর্ষধ্বনি জানিয়ে তাঁকে আর ভালুকদের জানালেন তাঁদের অন্তরের সানন্দ-অভিনন্দন! তারপর বাদ্যযন্ত্রীর দল আর একবার ওদেশের জাতীয় সঙ্গীতের সুর বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হলো সে-রাত্রের সার্কাসের পালা!

খেলা শেষ হবার পর, মস্কোর 'সিক্-ত্সোমের' প্রধান-কর্ম্ম-কর্ত্তারা আমাদের সাদরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন তাঁদের সাজঘরে—সার্কাসের শিল্পী আর কর্ম্মীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে!

কয়েকটি সুসজ্জিত বড়-বড় ঘর-দালান পার হয়ে মার্ব্বেল-পাথরের তৈরী সুপ্রশস্ত সিঁড়ি বহে এসে হাজির হলুম আমরা মস্কোর 'সিক্-ত্সোমের' বিরাট সাজ-ঘর ভবনে। সাজ-ঘর-ভবনটি দোতলা···সার্কাসের মেয়ে-পুরুষ শিল্পীদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা-আলাদা কুঠুরীর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেকটি সাজঘর রীতিমত সুসজ্জিত, মেঝেতে পুরু কার্পেট বিছানো, শিল্পীদের বিশ্রাম ও সাজ-পোষাকের জন্য আরামপ্রদ আসন ও দামী আসবাব-পত্রের ব্যবস্থা আছে···চারিদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন··· কোথাও কোনো কদর্য্যতার চিহ্ন নেই। আমাদের আগমন-বার্ত্তা পেয়েই সার্কাসের ছোট-বড় শিল্পী আর কর্ম্মীরা সবাই মহা-আগ্রহে ভীড় করে ছুটে এলেন ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে। ভারতবর্ষের সার্কাস-শিল্পীদের বিষয়ে নানান তথ্য জানতে চাইলেন তাঁরা একান্ত আগ্রহে। এ-বিষয়ে আমাদের যতটুকু জানা ছিল—সবই জানালুম তাঁদের। দেখলুম, ভারতবর্ষ ও ভারতের সার্কাস শিল্পীদের সম্বন্ধে তাঁদের রীতিমত শ্রদ্ধা আছে···অনেকেই বার-বার জানালেন যে দেশে ফিরে আমরা যেন ভারতের সার্কাস-শিল্পীদের কাছে পাঠাই তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন! এমনি পারস্পরিক সম্প্রীতি-আলাপের মাঝে আমরা ক'জন তাঁদের সবাইকে ভারতবাসীদের তরফ থেকে সশ্রদ্ধ-অভিবাদন জানিয়ে সে-রাত্রের মতো সোভিয়েট-রাজ্যের সর্ব্ব-প্রধান সার্কাসের আসর—মস্কোর 'সিক্-ত্সোম' প্রতিষ্ঠানের আলাপী বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে—ফিরে এলুম আমাদের হোটেলে। (ক্রমশঃ)

জেনী

(ভিক্টর হিউগো)

সুভাষ সমাজদার

১

রাত্রি নামছে ধীরে ধীরে।

জীর্ণ ঘরখানার কোণে কোণে বিষণ্ণ অন্ধকার ঘন হয়ে জমেছে। ঘরের এককোণে জ্বলন্ত একটা চুল্লীর আলোর ছায়া কাঁপছে দেয়ালে দেয়ালে। ঘরের ভেতরে ইতস্তত ছড়ানো থালাবাটি থেকে চুল্লীর আলো ঠিকরে পড়ছে। একধারে বিরাট আকারের একটা বিছানার ওপরে মশারী খাটানো রয়েছে। সেই মশারীর ভেতরে পাচটি ছোট ছোট শিশু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাখীর ছানার মত অসহায় করুণ বিষাদমাখা সৌন্দর্য্য তাদের মুখে। বিছানার একপাশে এই পাচটি সন্তানের মা, জেনী, হাঁটু গেড়ে নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত বসে আছে। নিদারুণ দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে তার বড় বড় দুটো চোখে। চুল্লীর আগুনে, ছয়টি প্রাণীর নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে উত্তপ্ত এই ঘরের বাইরেই বিশাল বিক্ষুব্ধ ভয়ঙ্কর সমুদ্র। ঝড়ো বাতাসে বাঘের মত গর্জন করছে সমুদ্র। থর থর করে কাঁপছে জানালা দরজাগুলো। হু হু করে আসছে ঠাণ্ডা বাতাস। রাত্রির এই কালিলেপা অন্ধকারে ক্ষ্যাপা সমুদ্রের বুকে দু'হাতে পাহাড় প্রমাণ উঁচু উঁচু ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে তার প্রিয়তম স্বামী এখন মাছ ধরছে।

ক্যালিষ্টোন আজন্ম জেলে। রোজ দুবেলা পাচটি সন্তান এবং স্ত্রীর মুখের ভাত জোগাতে হয় তাকে। মাছ বিক্রীই তার একমাত্র পেশা। তাই দুবেলা, ঝড়-জল সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করাই তার নিয়তি।

২

বিপুলব্যাপ্ত সমুদ্রের বুকের ওপরে পালতোলা ছোট্ট নৌকোটা নিয়ে ক্যালিষ্টোন যখন মাছ ধরে, জেনী তখন ঘরে বসে পুরানো ছেঁড়া জাল মেরামত করে। যে মুহূর্তে তার পাচটি ছেলেমেয়ের চোখ ভেঙ্গে ঘুম নামে অমনি সে হাঁটু গেড়ে বসে তার স্বামীর নিরাপত্তার জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা করে। বাইরের সমুদ্রের বাতাসে, ঢেউয়ের গর্জনে তার অস্ফুট উচ্চারিত বেদনার ভাষা মিলিয়ে যায়।

এই গ্রামের সমুদ্রতীর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে সমুদ্রের ভেতরে একস্থানে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। সে জায়গাটা আর কত বড়ই বা হবে! বড়জোর এই ঘরটার দ্বিগুণ। আর তার চারপাশে সমুদ্রের অন্তহীন বিশাল জলরাশি—জেলেদের কাছে ধূ ধূ মরুভূমির মতই। শত চেষ্টা করলেও সেখানে একটা ছোট্ট মাছও পাওয়া যাবে না। জেনী ভেবে আকুল হয়, এই ঝড়ো নিশিরাত্রে, কালো চামড়ার মত নীরেট থকথকে অন্ধকারে, মাতলা হাতীর ঝাঁকের মত ছুটে আসা বড় বড় ঢেউ কাটিয়ে ক্যালিষ্টোন সেই যায়গাটা খুঁজে পাবে তো? নিরাপদে সেখানে যেতে পারবে তো? ইস্ কী কঠিন, আর কী কষ্টের কাজ বাপু! বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেনী। কল্লোলিত সমুদ্রে এখন বিশাল সরীসৃপের মত বড় বড় ঢেউ হিংস্র লোলুপ উল্লাসে নাচছে। সেই ছোট্ট নৌকোটা নিয়ে তার প্রিয়তম মাছ ধরছে—আর নিশ্চয়ই তার কথা ভাবছে মাঝে মাঝে। বহুদূরে নির্জন এই অন্ধকার ঘরে বসে সেও ভাবছে সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে তার ক্যালিষ্টোনের কথা।

রাত্রি বাড়ছে। বাড়ছে বাতাসের বেগ। আরও গর্জন উতরোল হয়ে উঠছে সমুদ্র। সমুদ্রের অট্টহাসি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে জেনীর চিন্তাসূত্র। হা ভগবান! এই ঝড়ো কালো রাত্রি কী অফুরাণ। ক্যালিষ্টোনের জন্য নিবিড় মমতাভরা নরম অনুভূতি ফোঁটা ফোঁটা জল হয়ে গড়িয়ে পড়ল তার দু'চোখ বেয়ে। তার মত আরও কত হতভাগী মেয়ের স্বামী, একমাত্র ছেলে, ভাই বা প্রেমাস্পদ এখনো রয়েছে সেই ক্ষ্যাপা সমুদ্রের বুকে।

কিন্তু জেনীর দুঃখের সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। তার স্বামীকে সাহায্য করার জন্য কেউ নেই, তার ছেলেরা নেহাৎ শিশু। কবে তারা বড় হবে! সক্ষম জোয়ান হবে। না, না এখনও সেদিন স্বপ্ন, সেদিন আকাশের তারার মতই সুদূরে।

৩

ঘরের এককোনে কালিপড়া লণ্ঠনের নিস্তেজ শিখাটা উস্কে দিল জেনী। তার ছেঁড়া ব্লাউজের ওপরে স্কার্টটা চাপিয়ে দিয়ে লণ্ঠনটা নিয়ে সে বাইরে এল।

শেষ হয়ে আসছে রাত্রি। এই তো ক্যালিষ্টোনের ফিরে আসার সময় হয়ে গেছে। এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক্। কিন্তু এখনও ঝড়ো গর্জন ভেসে আসছে অশান্ত চঞ্চল সমুদ্রের দিক থেকে।

দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে আচ্ছন্ন চারিদিক। তার ওপরে আবার, বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে। শীত-কালের রাত্রিশেষের বৃষ্টি। বন্দুকের এক একটা গুলীর মত বৃষ্টির ফোঁটাগুলো এসে পড়ছে জেনীর গায়ে। তাদের পাড়ার কোন ঘরের জানালায় কোন আলোর রেখা নেই। নেই কোনদিকে কোন জীবনের সাড়া। যেন অসীম, অনন্ত গাঢ় মৃত্যু ছেয়ে ফেলেছে চারিদিক। জেনীর নজরে পড়ল, বিধবা ভারিয়ার হেলে-পড়া পোড়ো বাড়ীটা ঘন অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। হতভাগীর স্বামী মারা গেছে পাঁচ বছর আগে। সে তার ছোট দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে পাড়ার লোকের কাছে ভিক্ষে করে, তাদের খামারের কাজে সাহায্য করে, তাদেরই অনুগ্রহে কোনরকমে দিন কাটায়। দিনের পর দিন অভাবের বোঝা টানতে টানতে ভারিয়ার অমন সুন্দর শরীরটা কুঁকড়ে গেছে। গত কালই ক্যালিষ্টোন তাকে দেখে গেছে, জ্বরে ধুঁকছে ভারিয়া।

জেনীর মনে হল, তার একবার দেখা উচিত, ভারিয়া কেমন আছে। সে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ডাক দিল—ভারিয়া—আছো কেমন? তার গলার স্বর সমুদ্রের সোঁ সোঁ করা বাতাসে মিলিয়ে গেল। দরজার ওপার থেকে কোন সাড়া এল না।

আশ্চর্য! ভারিয়া খুব গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে তো? আরো জোরে একটা ধাক্কা দিতেই শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল। জেনীর হাতের লণ্ঠনের আলোয় জীর্ণ ঘরখানার মলিনতা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঘরের কড়িকাঠ চুঁইয়ে চুঁইয়ে বৃষ্টির জল পড়ছে। মেঝের ওপর দিয়ে সরু রেখায় গড়িয়ে যাচ্ছে জলের ধারা। ছেঁড়া ময়লা একটা বিছানায় শুয়ে আছে ভারিয়া। তার চোখ দুটো খোলা। কিন্তু সে চোখে কোন দৃষ্টি নেই। পা দুটো শক্ত কাঠির মত টান টান হয়ে আছে। শীতের হাওয়ায় তার হাত পা মুখ নীল হয়ে গেছে। মরে গেছে ভারিয়া। তারই পাশে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে ভারিয়ার ফুলের মতো সুন্দর দুটো ছেলেমেয়ে। ওদের ঠোঁটের কোনায় কোনায় হাসির আভা জেগেছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছে না কি ওরা? জেনীর বুক ঠেলে ঠেলে উঠল ছলো ছলো কান্নার ঢেউ। হায় হায় ওরা জানে না, কত বড় ক্ষতি হয়ে গেছে ওদের। জলে ভরে এল জেনীর দুটো চোখ। বাইরের বিক্ষুব্ধ অশান্ত প্রকৃতির কান্নার সঙ্গে তার কান্না একাকার হয়ে গেল। ছাদ থেকে টপ্ করে একফোটা জল গড়িয়ে পড়ল মৃতা ভারিয়ার মুখের ওপরে। তারপর?

তারপর বিদ্যুতগতিতে চঞ্চল পথে জেনী বেরিয়ে এল ভারিয়ার বাড়ী থেকে। ঝড়ের বেগে চলেছে সে। থর থর করে তার পা কাঁপছে। উত্তেজনায় আশঙ্কায় তার বুকের ভেতরে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ। সে কি যেন একটা চুরী করে পালিয়ে যাচ্ছে ভারিয়ার বাড়ী থেকে। না, না, সে পেছন ফিরে তাকাতে পারবে না। সে একেবারেই অসম্ভব! ভোরের আবছা অন্ধকারে চোরের

মত ছুটে পালিয়ে এসে দড়াম করে তার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল জেনী। সে টলতে টলতে একটা চেয়ারে ধপ করে বসল। তার মাথার ভেতরটা ঘুরছে। মুখ থেকে যেন সমস্ত রক্ত সরে গেছে। ক্যালিষ্টোন হয়ত তাকে নিদারুণ ভর্ৎসনা করবে!

কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে বাইরে। তাহলে, সে কী আসছে?

জেনীর বুকের ওপর দিয়ে যেন রেলগাড়ীর চাকা চলে যাচ্ছে গুরু গুরু ধ্বনি তুলে। না, না, খাঁটি ভালবাসায় কোন কথা গোপন থাকতে পারে না। ক্যালিষ্টোনকে সব কথা বলতেই যে হবে! কিন্তু তাকে এই কথা বলতে গেলেই নিশ্চয়ই ও রুখে উঠে মারতে আসবে।

কে যেন দরজায় টোকা মারছে মনে হচ্ছে। ঠক-ঠক্-ঠক্ শব্দ হচ্ছে ক্রমাগত। বিদ্যুৎগতিতে তীরের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল জেনী। তীক্ষ্ণচোখে তাকাল দরজার দিকে।

নাঃ, ও কেউ না। বাতাসে কাঁপছে দরজাটা—উত্তেজনায় আবেগে দুশ্চিন্তায় সব জড়িয়ে সে যেন পাথর হয়ে গেছে। সমুদ্রের সুতীব্র গর্জন, বাতাসের হা হা করা শব্দ, কিছুই তার কানে আসছে না। হঠাৎ যেন একটা দমকা হাওয়াতেই ঘরের দরজাটা খুলে গেল। ভোরের আলোর একটা তির্য্যক রেখা এসে পড়ল মশারীটার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ভেসে উঠল, আনন্দ উচ্ছ্বসিত একটা গলার স্বর—

—পুনর্জন্ম পেয়ে ফিরে এলাম জেনী—

—তুমি? এসেছো? আবেগ বিহ্বল গলায় চীৎকার করে উঠল জেনী। ছুটে এসে একটা ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ল ক্যালিষ্টোনের বুকে। উন্মত্ত আনন্দে কিশোরী প্রেমিকার মত সে তার দরজার কপাটের মত বিশাল চওড়া বুকে মুখ ঘস্তে লাগল। আহা, আহা, জেনী ও কি, ও কি করছো? এই তো আমি এসেছি জেনী—স্নিগ্ধ হাসিভরা মুখে ক্যালিষ্টোন বলল। কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে থেকে আবার সে বলল—জেনী, আজকে আমার কপাল খুবই খারাপ ছিল—

—আবহাওয়া কেমন ছিল?

—উঃ সে ভয়ঙ্কর, সাংঘাতিক!

—মাছ পেয়েছো?

—তেমন কিছু পাইনি। কিন্তু আমার তাতে কোন দুঃখ নেই। তোমাকে আবার আমার বুকের ভেতরে ফিরে পেয়েছি তো। মাছ পেলাম না, মাঝখান থেকে আমার জালটা ছিঁড়ে গেল। উঃ সে কী বাতাস! নৌকো যখন তখন ডুবে যেতে পারে বলে যতটা না চিন্তিত হয়েছিলাম তার চেয়ে কিন্তু অনেক বেশী শঙ্কিত হয়েছিলাম আমাদের এই ভাঙা নড়বড়ে ঘরটার জন্য? ঝড়ে ঘরটা যদি পড়ে যায় তাহলে জেনী ছেলেমেয়ে নিয়ে কী করবে, ভেবেই আকুল হয়েছিলাম। যাক ওসব ছেড়ে দাও—জেনীর কপালে গভীর মমতার সঙ্গে সে একটা দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিল। বলল, ঝড়ের সময়টা তুমি কি করেছিলে জেনী? নিশ্চয়ই আমার জন্যে কেঁদে বুক ভাসিয়েছো?

আবছায়া অন্ধকার ঘরে তার বুকের কাছ ঘেসে দাঁড়িয়ে থাকা জেনী ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল। আশঙ্কা মেসানো গলায় বলল—আমি? না, তেমন কিছু না, এই সেলাই ফোঁড়াই করছিলাম আর সমুদ্রের গর্জন শুনছিলাম।

—হাঁা, শীতকালের ঝড় বড় মারাত্মক—বলল ক্যালিষ্টোন। নিদারুণ একটা যন্ত্রণায় জেনীর মনটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। না, ওর কাছে সে কিছুতেই লুকোতে পারবে না, ওকে বলতেই হবে সব—শোন। শীতল কঠিন পাথরের মত গলায় জেনী বলল—তুমি জানো? কাল রাত্রে ভারিয়া মারা গেছে। তুমি আসার কিছু আগেই আমি তার বাড়ী গিয়েছিলাম। দেখলাম, ভারিয়া মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। না খেতে পেয়েই মরেছে। তার দুটো ছেলেমেয়ে উইলিয়ম আর ম্যাডাসিন, আহা! সে বেচারীদের কে দেখবে বলো তো? ম্লান বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ক্যালিষ্টোন তাকিয়ে রইল ঘরের কড়িকাঠের দিকে। হঠাৎ মাথা থেকে ভেজা টুপীটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বলল—ঠিক আছে, কোন চিন্তা নেই। আধপেটা খেয়ে না খেয়ে থাকার কষ্ট তো আমাদের গা সওয়াই হয়ে গেছে। আমাদের পাঁচটা বাচ্চা আছে, সেখানে না হয় সাতটা হবে! তারপর ঝড়ে দুর্যোগে মাছ না পাওয়া গেলে গুষ্টিশুদ্ধো না খেয়ে থাকবো। আচ্ছা, জেনী ভগবান গরীবদেরই দুঃখ বেশী দেন—না? একটু থেমে মাথাটা প্রবলভাবে দুপাশে ঝাঁকিয়ে আবার সে বলল—

।। না তা হতে পারে না জেনী! আমরা থাকতে বাচ্চা ়টো না খেয়ে মরে যাবে? তা আমি কিছুতেই হতে দবো না। আমি ওদের নিয়ে আসবো। আমাদের ছলেমেয়েরা পাঁচ ভাই বোন, সেথানে ওরা সাত ভাই বান হবে। সুখে দুঃখে ওরা বড় হয়ে উঠবে। আমার নে হয় ভগবান আমাদের এই কাজে খুব খুসী হবেন। তনি প্রচুর মাছ দেবেন। দেখবে, আমরা দুবেলা পটপুরে খেতে পাবো। আনন্দের বন্যা বয়ে যাবে জেনী মামাদের সংসারে। আমি যাই, এখুনি ওদের নিয়ে মাসি। আমরা না দেখলে, পাড়ার আর কেউ তো একটা রুটি দিয়েও বাচ্চা দুটোকে দয়া করবে না! আরে তাই তো? তুমি কিছু বলছো না কেন জেনী? তুমি কি চাও না ওদের নিয়ে আসি?

আনন্দে খুসীতে জেনীর শীর্ণ মুখখানা প্রদীপের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সুখের আমেজে ঝলমল করছে তার বড় বড় দুটো চোখ। সে পরম আবেগে ক্যালি-ষ্টোনের কোমরটা জড়িয়ে ধরল। আরেক হাতে মশারীটা তুলে ধরে বলল—তাকিয়ে দেখ তো, আমাদের ছেলেমেয়ে কয়টি? পাঁচটা না সাতটা?

ক্যালিষ্টোন সবিস্ময়ে দেখল, ছেঁড়া ময়লা বিছানায় সার সার হয়ে ঘুমিয়ে আছে ফুলের পাঁপড়ির মত সাতটি শিশু।

শুনছে কা'রা ?

কুমারী চিত্রলেখা চট্টোপাধ্যায়

চাঁদের আলোয় ভরা নিশুত্ রাতে,
প্রাসাদখানি যখন আলো করা—
ঘোড়াটাকে বেঁধে গাছের সাথে,
পথিক সে এক দ্বারে দিল নাড়া।

বোধহয় ঘোড়ার খাওয়া ছিল বাকী,
সশব্দে সে খাচ্ছে ছিঁড়ে ঘাস;
মাথার উপর ওড়ে কোন্ এক পাখী,
বোধহয় করে প্রাসাদ-চূড়ে বাস।

পথিক আবার দিল দ্বারে নাড়া
জিজ্ঞাসিল্—"কেউ কি আছ ঘরে?"
স্তব্ধ সবই; কেউ দিল না সাড়া
চাঁদের আলো পড়ছে শুধু দ্বারে।

দুর্গপ্রাসাদ জনমানব হীন,
আগের দেওয়া কথা রাখতে এসে
চুপটি করে পথিক ভাবে বসে,
বাসিন্দারা ছায়ায় কি গো লীন?

তার কথা সব শুনতে পাবেই তারা
নাই বা তারা রইলো বাঁধা কায়ায়
এই প্রাসাদে পূর্ব্বে ছিলো যারা
এখন তারা মিলিয়ে গেছে ছায়ায়।

মনে হলো ঝাপসা চাঁদের আলোয়,
ছায়া শরীর ভীড় করে সব এলো;
আলোয় ছোঁয়ায় অসীম-রাতের কালোয়,
তবে ওরা সত্যি শুনতে পেলো?

উত্তর সে পেয়েছে এক মন্তরে;
রাত্রিকালের নীরবতার মাঝে,
ওদের কথা স্তব্ধ হয়ে বাজে;
জাগে নতুন অনুভূতি অন্তরে।

"নাই বা কথা কইলে অশরীরী",
আবার পথিক বললে তাদের ডেকে;
"অন্তরে তো সকলি বুঝতে পারি,
জেনো মনে, কথা গেলাম রেখে।"

উড়িয়ে ধূলো পথিক গেল ফিরে
উৎসুক সব শ্রোতা রইলো পড়ে
নিঃশব্দে বাতাস কাঁপে ধীরে
গাছের পাতা তেমনি ওঠে নড়ে,

মিলিয়ে গেল অশ্বক্ষুর ধ্বনি,
ধূলোর ধোঁয়া আর গেল না দেখা;
বুকে ভরা অশরীরীর বাণী,
দুর্গপ্রাসাদ দাঁড়িয়ে থাকে একা।

কবি Walter De ha Mare এর "The Listeners" কবিতাটি অবলম্বনে।

টিকা-সম্রাট বৈদ্যনাথ ব্রহ্ম

শ্রীসুধীর ব্রহ্ম

বসন্তের মহামারী যখন দেশবাসীকে ভীত-ত্রস্ত করিয়া বাধ্যতামূলক টিকা লওয়াইতে বাধ্য করে, যখন বিংশ শতাব্দীর মাইক-ফিট্-ভ্যানে করিয়া পাড়ায়-বেপাড়ায় শ্রুতিমধুর সঙ্গীত পরিবেশের ছলে টিকা লওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেয়, পথে-ঘাটে, বাজারে যখন টিকাদার টেবিল সাজাইয়া পথচারীকে টিকা লইতে বাধ্য করে, তখন মনে পড়িয়া যায়, আজও ইহার প্রয়োজন যে কতটা চিকিৎসাসম্মত তাহা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই। শাসনবিভাগের প্রচার তহবীলে এই ভীষণ মারাত্মক রোগ হইতে নিজেকে রক্ষার উপায় সাধারণে প্রচার করিতে কত অর্থই না ব্যয় হয়, কিন্তু তথাপিও অজ্ঞতার অন্ধকার এখনও কাটিয়া যায় নাই। সংস্কার মানুষকে এইরূপই অন্ধ করে।

ইংরাজ শাসনের যত কিছুই কলঙ্ক থাক, তাহারা যে আমাদের দেশের কিছু উপকারও করিয়া গিয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের বাংলা দেশে টিকা দেওয়া প্রথম প্রবর্ত্তন হয়, তখন এই বিদেশী চিকিৎসাধারাকে কেহই মানিয়া লন নাই, উপরন্তু ইহা যে ৺শীতলামাতার কোপানলে আহুতি দিবে তাহাই ছিল সে সময়কার দৃঢ় বিশ্বাস—ফলে সৃষ্টি হইয়াছিল একদল হাতুড়ে হাম-বসন্ত চিকিৎসক, যাহাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে কোনও জ্ঞান ছিল না। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে লাল শালুর পুঁটলির মধ্য হইতে বিরাট-নয়না সিন্দুর-নিমজ্জিতা ভীষণ-আকৃতির ৺শীতলা মুখ শান্তিপ্রিয় গৃহস্থের বধূদের মনে যুগপৎ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে ৺মাতাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা চলিত। সেদিন যাঁহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীদের মনে প্রভাব বিস্তার করিয়া টিকা লওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়াছিলেন বৈদ্যনাথ তাঁহাদের কর্ণধার। কতরূপ সামাজিক বাধা, জনমতের শ্লেষ, ধর্ম্মের অভিশাপ মাথায় লইয়া আজ হইতে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে পদব্রজে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যে দ্বারে দ্বারে তাঁহাকে ঘুরিয়া এই প্রচার কাজ করিতে হইয়াছিল, তাহা আজ গল্পের কথা হইলেও সেইদিনের প্রচেষ্টা আজ কত সার্থক হইতে চলিল, তাহা দেখিবার ও কত শত শত নরনারী এই মহামারী হইতে বাঁচিল তাহাও উপলব্ধি করিবার। কাজ না করিয়া আমরা যখন বর্ত্তমান উপাধি ও সম্মানের মোহে অন্ধ তখন ১০০ বৎসর পূর্ব্বে কোন এক অখ্যাত চিকিৎসক একান্ত দেশাত্মবোধে তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত যৌবনের শেষেও সরকারী "রায়-বাহাদুর" উপাধি হেলায় অবজ্ঞা করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া তখনকার দিনের বাঙ্গালীর একটি চরিত্র-চিত্রও পাওয়া যায়।

শ্রীবৈদ্যনাথ ব্রহ্ম M. B. (Gold Medalist) Dy Superintendent of vaccination, Metropolitan circle, Govt. of Bengal জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান ১৯নং পল্লীর অক্রুর দত্ত লেনে। পুরাতন কলিকাতায় এই পল্লীটির একটি বিশেষ স্থান আছে। শহিদ সন্তোষকুমার মিত্রের জন্মস্থান এই অক্রুর দত্ত লেনে। ৺যোগেশ-চন্দ্র দত্ত, গণেশচন্দ্র চন্দ্র, ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়দের কর্ম্মে এই পল্লী মুখরিত। পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের পর 'ক্লাইভ' পুরাতন দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দপুর অঞ্চলের প্রজাগণের অনেক জমি ক্রয় করিয়া লয়েন। সেই জমির উপর বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং এই কাজ শেষ হয় ১৭৭৩ সনে। ব্রহ্মবংশের উত্তরাধিকারীদের নিকট যে উর্দ্দুতে সহি করা পাট্টা নং ৬৬৪ পাওয়া যায় সেটি প্রমাণ করে যে ৺বলরাম ব্রহ্ম ২৪শে ডিসেম্বর ১৭৬৭ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং'র নিকট হইতে একখণ্ড জমি ক্রয় করেন। ৫বি অক্রুর দত্ত লেনের গৃহটির বৃহৎ দালান এবং ছোট ছোট ইঁটের দ্বারা মাটির গাঁথুনির একটি দেওয়াল সযত্নে রক্ষিত আছে পুরাকালের অট্টালিকা নির্ম্মাণ দক্ষতার নিদর্শন হিসাবে। আধুনিক কায়দায় যে সব বাড়ী আজ দেখা যায়, ভূমিকম্পে বা দৈব দুর্বিপাকে সেগুলির ক্ষতি হইলেও, এই মাটির গাঁথুনির দেওয়ালটির একটু ফাটালও আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই।

এই স্যাঁতসেতে জলাভূমির উপরে গৃহ নির্ম্মাণ সূত্রে চতুর্দ্দিক হইতে কোটি কোটি মণ মৃত্তিকা আনীত হয়, কিন্তু এই নগরীতে বাস করিয়া রোগের প্রকোপে প্রথম অগণিত দেশী ও য়ুরোপীয়দের প্রাণ গিয়াছে। অক্রুর দত্ত লেনের প্রকাণ্ড জায়গা লইয়া সেই খোলা ঘরগুলি আজও পুরানো দিনের সাক্ষ্য হিসাবে বর্ত্তমান। কলিকাতার ক্রমশঃ যেরূপ উন্নতি হইতেছে তাহাতে ঐ সকল ঐতিহাসিক মনোহারিতার স্মৃতি লোকের মন হইতে ক্রমেই অপসারিত হইতেছে এবং পুরাতন ভূমির ও স্থানের চিহ্ন সকল পরিবর্ত্তনের স্রোতে যেমন ভাসিয়া যাইতেছে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্মৃতি চিহ্ন বিলুপ্ত হইতেছে। ৺বাবু বলরাম ব্রহ্মের পৌত্র বৈদ্যনাথ ব্রহ্ম ১৮৪৭ সনে মেডিক্যাল কলেজ হইতে সসম্মানে এম-বি পাশ করেন। অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তিনি মেডিক্যাল কলেজ হইতে একটি বৃহদাকার স্বর্ণ পদকে (সার্জ্জারীতে) সম্মানিত হন। পুরানো সার্টিফিকেটটিতে assessor এবং প্রত্যেক বিষয়ের প্রফেসরদের ও সরকারী এক্সামিনারদের সহি করা তকমা ও স্বর্ণ পদকের সহিত এখনকার মেডিক্যাল ডিগরী ও পদকের কতই না প্রভেদ। তিনি পাশ করিয়া চিটাগঞ্জ সরকারী ডিস্পেন্সারির ভারপ্রাপ্ত অফিসার হইয়া W. B. Beatson, officiating Civil Surgeon এর অধীনে ১৮৫৪ সন পর্য্যন্ত কার্য্য করেন [Vide Judicial Memo No. 1536 Dt. 19.7.1847 from the Secretary to the Govt. of

টিকা-সম্রাট বৈদ্যনাথ ব্রহ্ম

শ্রীসুধীর ব্রহ্ম

বসন্তের মহামারী যখন দেশবাসীকে ভীত-ত্রস্ত করিয়া বাধ্যতামূলক টিকা লওয়াইতে বাধ্য করে, যখন বিংশ শতাব্দীর মাইক-ফিট্-ভ্যানে করিয়া পাড়ায়-বেপাড়ায় শ্রুতিমধুর সঙ্গীত পরিবেশের ছলে টিকা লওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেয়, পথে-ঘাটে, বাজারে যখন টিকাদার টেবিল সাজাইয়া পথচারীকে টিকা লইতে বাধ্য করে, তখন মনে পড়িয়া যায়, আজও ইহার প্রয়োজন যে কতটা চিকিৎসাসম্মত তাহা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই। শাসনবিভাগের প্রচার তহবীলে এই ভীষণ মারাত্মক রোগ হইতে নিজেকে রক্ষার উপায় সাধারণে প্রচার করিতে কত অর্থই না ব্যয় হয়, কিন্তু তথাপিও অজ্ঞতার অন্ধকার এখনও কাটিয়া যায় নাই। সংস্কার মানুষকে এইরূপই অন্ধ করে।

ইংরাজ শাসনের যত কিছুই কলঙ্ক থাক, তাহারা যে আমাদের দেশের কিছু উপকারও করিয়া গিয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের বাংলা দেশে টিকা দেওয়া প্রথম প্রবর্ত্তন হয়, তখন এই বিদেশী চিকিৎসাধারাকে কেহই মানিয়া লন নাই, উপরন্তু ইহা যে ৺শীতলামাতার কোপানলে আহুতি দিবে তাহাই ছিল সে সময়কার দৃঢ় বিশ্বাস—ফলে সৃষ্টি হইয়াছিল একদল হাতুড়ে হাম-বসন্ত চিকিৎসক, যাহাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে কোনও জ্ঞান ছিল না। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে লাল শালুর পুঁটলির মধ্য হইতে বিরাট-নয়না সিন্দুর-নিমজ্জিতা ভীষণ-আকৃতির ৺শীতলা মুখ শান্তিপ্রিয় গৃহস্থের বধূদের মনে যুগপৎ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে ৺মাতাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা চলিত। সেদিন যাঁহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীদের মনে প্রভাব বিস্তার করিয়া টিকা লওয়ার প্রয়োজীয়তা বুঝাইয়াছিলেন বৈদ্যনাথ তাঁহাদের কর্ণধার। কতরূপ সামাজিক বাধা, জনমতের শ্লেষ, ধর্ম্মের অভিশাপ মাথায় লইয়া আজ হইতে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে পদব্রজে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যে দ্বারে দ্বারে তাঁহাকে ঘুরিয়া এই প্রচার কাজ করিতে হইয়াছিল, তাহা আজ গল্পের কথা হইলেও সেইদিনের প্রচেষ্টা আজ কত স্বার্থক হইতে চলিল, তাহা দেখিবার ও কত শত শত নরনারী এই মহামারী হইতে বাঁচিল তাহাও উপলব্ধি করিবার। কাজ না করিয়া আমরা যখন বর্ত্তমান উপাধি ও সম্মানের মোহে অন্ধ তখন ১০০ বৎসর পূর্ব্বে কোন এক অখ্যাত চিকিৎসক একান্ত দেশাত্মবোধে তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত যৌবনের শেষেও সরকারী "রায়-বাহাদুর" উপাধি হেলায় অবজ্ঞা করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া তখনকার দিনের বাঙ্গালীর একটি চরিত্র-চিত্রও পাওয়া যায়।

শ্রীবৈদ্যনাথ ব্রহ্ম M. B. (Gold Medalist) Dy Superintendent of vaccination, Metropolitan circle, Govt. of Bengal জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান ১৯নং পল্লীর অক্রুর দত্ত লেনে। পুরাতন কলিকাতায় এই পল্লীটির একটি বিশেষ স্থান আছে। শহিদ সন্তোষকুমার মিত্রের জন্মস্থান এই অক্রুর দত্ত লেনে। ৺যোগেশ-চন্দ্র দত্ত, গণেশচন্দ্র চন্দ্র, ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়দের কর্ম্মে এই পল্লী মুখরিত। পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের পর 'ক্লাইভ' পুরাতন দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দপুর অঞ্চলের প্রজাগণের অনেক জমি ক্রয় করিয়া লয়েন। সেই জমির উপর বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং এই কাজ শেষ হয় ১৭৭৩ সনে। ব্রহ্মবংশের উত্তরাধিকারীদের নিকট যে উর্দ্দুতে সহি করা পাট্টা নং ৬৬৪ পাওয়া যায় সেটি প্রমাণ করে যে ৺বলরাম ব্রহ্ম ২৪শে ডিসেম্বর ১৭৬৭ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর নিকট হইতে একখণ্ড জমি ক্রয় করেন। ৫বি অক্রুর দত্ত লেনের গৃহটির বৃহৎ দালান এবং ছোট ছোট ইঁটের দ্বারা মাটির গাঁথুনির একটি দেওয়াল সযত্নে রক্ষিত আছে পুরাকালের অট্টালিকা নির্ম্মাণ দক্ষতার নিদর্শন হিসাবে। আধুনিক কায়দায় যে সব বাড়ী আজ দেখা যায়, ভূমিকম্পে বা দৈব দুর্ব্বিপাকে সেগুলির ক্ষতি হইলেও, এই মাটির গাঁথুনির দেওয়ালটির একটু ফাটালও আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই।

এই স্যাঁতসেতে জলাভূমির উপরে গৃহ নির্ম্মাণ সূত্রে চতুর্দ্দিক হইতে কোটি কোটি মণ মৃত্তিকা আনীত হয়, কিন্তু এই নগরীতে বাস করিয়া রোগের প্রকোপে প্রথম অগণিত দেশী ও য়ুরোপীয়দের প্রাণ গিয়াছে। অক্রুর দত্ত লেনের প্রকাণ্ড জায়গা লইয়া সেই খোলা ঘরগুলি আজও পুরানো দিনের সাক্ষ্য হিসাবে বর্ত্তমান। কলিকাতার ক্রমশঃ যেরূপ উন্নতি হইতেছে তাহাতে ঐ সকল ঐতিহাসিক মনোহারিতার স্মৃতি লোকের মন হইতে ক্রমেই অপসারিত হইতেছে এবং পুরাতন ভূমির ও স্থানের চিহ্ন সকল পরিবর্ত্তনের স্রোতে যেমন ভাসিয়া যাইতেছে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্মৃতি চিহ্ন বিলুপ্ত হইতেছে। ৺বাবু বলরাম ব্রহ্মের পৌত্র বৈদ্যনাথ ব্রহ্ম ১৮৪৭ সনে মেডিক্যাল কলেজ হইতে সসম্মানে এম-বি পাশ করেন। অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তিনি মেডিক্যাল কলেজ হইতে একটি বৃহদাকার স্বর্ণ পদকে (সার্জ্জারীতে) সম্মানিত হন। পুরানো সার্টিফিকেটটিতে assessor এবং প্রত্যেক বিষয়ের প্রফেসরদের ও সরকারী এক্সামিনারদের সহি করা তকমা ও স্বুবর্ণ পদকের সহিত এখনকার মেডিক্যাল ডিগরী ও পদকের কতই না প্রভেদ। তিনি পাশ করিয়া চিটাগঞ্জ সরকারী ডিস্পেন্সারির ভারপ্রাপ্ত অফিসার হইয়া W. B. Beatson, officiating Civil Surgeonএর অধীনে ১৮৫৪ সন পর্য্যন্ত কার্য্য করেন [Vide Judicial Memo No. 1536 Dt. 19.7.1847 from the Secretary to the Govt. of

Bengal] Deputy Gover[illegible]
Dr. J. Baker Medical charge
of Noakollyর অধীনে কাজ করার নি[illegible]
সনে তাঁহাকে কৃষ্ণনগরের Sub-assist[illegible]
বহাল করেন। তাঁহার ১৬ বৎসর সরকা[illegible]
সারকেল, চিটাগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া এবং [illegible]
স্থানগুলিতে সভ্যতার আলোক যখন প্রবেশ করে[illegible]
পদ্ধতিতে টিকা দেওয়ার প্রচলন করেন। অজ্ঞ প[illegible]
সংক্রামক রোগ হইতে কি ভাবে বাঁচিতে ও জনসাধার[illegible]
তাহাদের অন্ধ বিশ্বাস ও সামাজিক সংস্কার দূর ক[illegible]
অক্লান্ত পরিশ্রম, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন [illegible]
হইতে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

"In spite of the deeprooted prejudic[illegible] ducity of the Natives on the one hand, extreme Jealousy of the bodies (who try t[illegible] most to injure the usefulness of the Instituti[illegible] the other, the dispensary is daily acquiring pop[illegible] rity, not only in the City but all around the cou[illegible] try, as people from the distance of 2 or 3 day. Journey usually come for relief "Report of Babu Buddynath Brahmo Dt. 30. 9. 1848 as per "Half-yearly reports of the Govt. Charitable dispensaries (on Chitagonj) available under 01088 in the National Library, Calcutta.

Calcutta Gazette—17. 1. 1866 and Vaccination Report for the years and proceedings from 1868-69 to 1874 হইতে উদ্ধৃত :—

এমন সব গ্রামে সুপারিনটেনডেন্ট বৈদ্যনাথ ব্রহ্মকে যাইতে হয় যেখানে না আছে গাড়ী, না আছে ঘোড়া। ১০ হইতে ১৫ মাইল পর্য্যন্ত দৈনিক হাঁটিয়াই পরিদর্শন কার্য্য সারিতে হয়। টিকা লওয়াইতে প্ররোচিত করার ব্যাপারে, তাঁহার ক্ষমতা অসীম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আগন্তুক অফিসারকে হঠাৎ দেখিয়া যখন ঘরে ঘরে দরজা যায় বন্ধ হইয়া, জবাব দিবার বা কোনও উপদেশ শুনিবার জন্য একটি ছোট শিশুকে পর্য্যন্ত মাতা যখন সচকিতে সরাইয়া লইতে ব্যস্ত তখন সত্যই সুপারিন্টেনডেন্ট মহাশয়কে কি অসাধ্য সাধন করিতে হয়, কতদূর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তা ও সহ্য জ্ঞান থাকিলে তাহা সম্ভব, একটি ঘটনায় তাহা উল্লেখযোগ্য :—নদীয়া জেলার প্রখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন টিকা লওয়াকে আসুরিক চিকিৎসা বলিয়া মনে করিতেন এবং ইহা যে হিন্দু ধর্ম্মের একান্ত বিরোধী কর্ম্ম ও ইহার প্রচারে ৺ শীতলামাতাকে অপমান ও কলঙ্কের কালিমায় লিপ্ত করা হইতেছে এই মত চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতেছেন তখনই পটভূমিকায়

co.
the I[illegible]
reputat[illegible]

মজার কথ[illegible]
তাঁহার দৃষ্টান্ত নদীয়ার
এবং ক্রমে ক্রমে দেখা [illegible]
করিতেছেন। অনুরূপ ঘটনা [illegible]
পরিবারে।

"This year Deputy Superint[illegible] Nath Brohmo got an educated [illegible] Wooma Churn Mitter of Buxa, n[illegible] others, to use their influence with th[illegible] Baboos and vaccinator Ram Gopal Mitter them with his constant importunities. The quence was that after three months pe[illegible] efforts the vaccinators succeeded in bringing th[illegible] round. When this was known, all the surrounding villages quietly followed their exampl[illegible] and [illegible] ed Vaccination."

তাঁহার কার্য্যের গুণাবলী ও নানা প্রশংসা কলি[illegible] গেজেট এর সাপ্লিমেন্ট ১৭ই জানুয়ারী ১৮৬৬, পৃষ্ঠা ৬, ৩৪,

তাই গেজেটের ৩৪ পৃষ্ঠা হইতে দেখা যায় যে
System' has grown up under
exertions have proved its practi-
uccess attained has been in consi-
due to their individual energies…
ধ্যের জন্য রায়বাহাদুর উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব
চনাথ ব্রহ্ম ইংরেজের এই উপাধি সানন্দে
রতের 'গভর্ণর জেনারেলকে' যেপত্র দিয়াছিলেন

morialist, too, was deemed worthy of
ai—Bahadur) and would have been
th it, had he cared for it…the little,
er offered to your memorialist and by
ied with grateful thanks."

রটোলার যে অনাথভাণ্ডার এখনও বহু অনাথকে আশ্রয় দেয়,
ার এক প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পড়াশুনার দ্বারা অনাথারা
ত মানুষের মত নিজেদের জীবিকা অর্জ্জনে সক্ষম হয়, সেজন্য বস্ত্র
রণ, পুস্তক ও বস্ত্রদান নানা প্রকারে অর্থ সাহায্য করেন।

হি
লেগেছিল
আর সেই ভাল-
—এতদিনে ভালবেসে বেসে
নাহি হোল। বেড়ে গেল
নার পাওয়ার কিনারে এসে।
এই স্তব্ধতার অতলস্ত নিবিড় গভীরে
য়েছিনু বার বার একা। দেখিতেছিলাম শুধু
অতীতের কোন স্পর্শ-মাধুরীর রেখা-আজো
আছে কিনা।
প্রত্যাখ্যাত হই নাই কই!
আজো দেখি তেমনি মনের প্রান্তে অনবগুণ্ঠিতা
মোর আজও বধূবেশে, সলজ্জ নয়নে আজও
দাঁড়াইয়া আছে, চক্ষে তার সেই চাওয়া।
যে চাওয়ায় তুমি আমি আজও আছি কাছে।

অপরিহার্য্য

বিবেককুমার রায়

হাসি কোথায়! কান্না ছড়ায় আকাশ বেয়ে:
মেঘের আঁচল আজ আকাশের দু'চোখ ঢাকে;
যে গিয়েছে উদাস পায়ে, ফুল ছড়ায়ে,
কেশ এলায়ে—আজকে মনে পড়েছে তাকে।
সকাল বেলার কাঁচা সোনার মতন রোদে
এসেছিলো আলোয় ছায়ায় দুই পা ফেলে,
হাওয়ায় দুলছিলো ফল, সবুজ ফসল
স্নিগ্ধ শীতল হওয়ায় ছিলো গন্ধ মেলে।

ব'সেছিলেম দুই পা তুলে, তন্দ্রামাখা;
চাইনি তাকে, দিইনিতো ডাক, তুলিনি মুখ,
শুকনো পাতার মর্ম্মরণে ক্লান্ত বনে
উদাস মনের রিক্ত ব্যথাও আজকে ঝরুক।
ডুবুক এ দিন, মুখ লুকোক এ অন্ধকারে,
ধূসর করুণ রাতের আঁচল দিক না টেনে;
হাসি তো নেই! বইছে বাতাস, ক্লান্ত সুবাস
হৃদয় উদাস ক'রলেও তা' নেবোই মেনে॥

বিশ্বের বিস্ময় রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকরুণানিধান মজুমদার

বহুমুখী প্রতিভার মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন যেন রবীন্দ্রনাথ। পৃথিবীর ইতিহাসখানা চোখের সামনে মেলিয়াছেন একের পর এক পৃষ্ঠা সযতনে উল্টালেও তো কৈ এমন আর একটী দৃষ্টান্তও চোখে পড়ে না। তাই সেই অনন্যসাধারণ প্রতিভার দিকে চোখ খুলিয়া তাকাইতে গেলে শুধু বিস্ময়ই জাগে, আর এই বলিয়া গর্ব অনুভব করিতে হয় যে—হাঁ, আমরা সৌভাগ্যবান এমন একজনের স্বদেশবাসী হইয়া। বিজ্ঞান আমাদিগকে বলে সুদূরবর্তী সূর্য্য হইতে যে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয় তাহারা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর সমান্তরাল—যেন তাহাদের কোনও সংযোগই নাই। সেই সূর্য্যই যখন মানবমূর্তি লইয়া মাটির পৃথিবীতে নামিয়া আসিল তখনও তাহার সে ধর্ম অবিকল ও অপরিবর্তনীয়ই রহিয়া গেল। তাই রবিপ্রতিভা যখন যে দিকে প্রসারিত হইয়াছে সেই দিকই আপন মহিমায় ভরপূর হইয়া উঠিয়াছে। জগতে প্রতিভাধর ব্যক্তিরা আসেন এক-এক বিশেষ বিভাগে কৃতিত্ব দেখাইতে—সর্বকালের সর্ব দেশের ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য বহন করে। তাই আমরা দেখি কেহ শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বা প্রবন্ধকার বা স্বদেশভক্ত ও স্বদেশসেবী বা অনুরূপ কিছু। আমাদের পরিচিত সূর্য্যরশ্মিকে বিশ্লেষণ করিলে সাতটী বিভিন্ন বর্ণের সন্ধান মিলে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যেন আর শেষ নাই—বাংলার গদ্য, পদ্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প, সমালোচনা, সংগীত, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সর্ববিভাগেই রবীন্দ্রনাথের জয়যাত্রা। তাই সমালোচকদের মতে তিনি যে কোন বিশেষ বিভাগেই আপন নামকে অবিস্মরণীয় করিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি যেন পরশমণি।

রবীন্দ্র-প্রতিভা বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ নহে, অনুভূতি সাপেক্ষ। আর আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে তাহা বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা তো ধৃষ্টতা। তদানীন্তন বঙ্গসাহিত্যকে যদি তমসাচ্ছন্ন রাত্রি নাও বলি তো জ্যোৎস্না রাত্রি বলিতে বাধা নাই। কিন্তু তাহা রাত্রিই, প্রকাশ্য দিবালোকের ক্ষমতা সে রাখে না। তাই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সে পটভূমিকায় সূর্য্যোদয়। সূর্য্যোদয়ে শ্যামল বিচিত্র পৃথিবী স্পষ্ট হইয়া উঠিল ; বাংলা সাহিত্য শাশ্বত আসন লাভ করিল বিশ্বের দুয়ারে। বাংলা সাহিত্যকে যদি ভূখণ্ড বলিতে বাধা না থাকে তবে বঙ্কিমচন্দ্রে যে দ্বীপের আভাস মিলিল রবীন্দ্রনাথে তাহা পরিণত হইল মহাদেশে।

আর রবীন্দ্র-প্রতিভার এমনিই ভাস্বর দ্যুতি যে সে প্রভায় অন্য সমস্ত নক্ষত্রই ম্লান হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ সর্বোপরি কবি হিসাবেই শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রধানতঃ প্রকৃতির কবি। প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন 'যেথা যার যত উঠে ধ্বনি আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিচে তখনি'। কিন্তু তিনি অনুভব করেছিলেন যে শুধু প্রকৃতিকে নিয়েই সম্পূর্ণ হয়ে উঠা যায় না ; পূর্ণতার জন্য 'যারা কাজ করে' 'যাদের কাজ মন্দ্রিত করিয়া তোলে জগতের মহামন্ত্র ধ্বনি' তাদের 'জীবনে জীবন যোগ করে' গণ-সাহিত্য রচনারও প্রয়োজন আছে। কেননা 'চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল, তাঁতী বসে তাঁত বনে, জেলে ফেলে জাল, বহুদূর প্রসারিত তাদের বিচিত্র কর্মভার ; তাই গভীর আন্তরিকতার সহিত তিনি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন 'যারে তুমি নিচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে ; পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে টানিছে পশ্চাতে ; তাই 'বিশ্বপ্রকৃতি' ও 'বিশ্বমানব'কে লইয়া তাঁর কাব্যে মধুর ঐক্যতান অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু সর্বোপরি সেই 'অসীম' সেই 'চিরসুন্দরের' সাধনাই রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর। তাই তাঁর কাব্যের আবেদন কতকটা অপৌরুষেয়। কাব্যের সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে তিনি উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, প্রবন্ধ রচনা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতিরও চর্চা করিয়া যান। নিছক গল্প রচনা পরিহার করিয়া কবি উপন্যাসে সমস্যা বিচারে মনোযোগ দিয়াছিলেন এবং সেই থেকেই বাংলা উপন্যাসে আসিল বিশ্লেষণ-সূচিতা। মোট কথা বঙ্কিম প্রবর্তিত ধারার অনুসরণ করিয়া তিনি উপন্যাস রচনায় হাত দিয়াছিলেন এবং তাঁর স্বকীয়, দৃষ্টি, চিন্তা ও মননশীলতার স্বাভাবিক প্রবণতা হইতে তা' ধীরে ধীরে নিজস্ব পরিণতিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের জনক রবীন্দ্রনাথই। তাঁর গল্প প্রধানতঃ কাব্যধর্মী হইলেও 'কাবুলিওয়ালা', 'পোষ্ট মাষ্টার' প্রভৃতিতে বাস্তবতাও প্রকট এবং তা' যথার্থ হৃদয়গ্রাহী।

আমাদের দেশে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে নাটকের সাফল্য পরীক্ষিত না হইলে তা' সাধারণের সমাদর পায় না, এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের সৃজনী-প্রতিভার এক বিরাট অংশ নাট্য-সাহিত্যে রূপ পাইলেও তা' এদেশে তেমন সমাদৃত হয় নাই। প্রবন্ধ রচনায় ও সমালোচনায়ও তিনি কম যান নাই। সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি যে চিন্তাশীলতা ও ব্যঞ্জনার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। কালিদাসের 'শকুন্তলা'র কি অপরূপ ব্যঞ্জনাই না ফুটিয়া উঠে তাঁর সমালোচনায়।

রবীন্দ্র সঙ্গীতে সুরের মর্য্যাদা রহিয়াছে সবার উপরে। তিনি কথাকে কখনও সুরের বাহন বলিয়া মনে করিতেন না। শিল্পীর এমনি কৌশল যে তা গাইলে গান, আর এমনি পড়িলে কবিতা। বাংলার কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি তাঁর দৌলতে আজ সুউচ্চ আসনে সমাসীন। গানের মধ্য দিয়া তাঁর সেই 'চিরসুন্দরে'র সাধনাই চলিয়াছে বেশী।

গানের মতো নৃত্যেরও প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন রবি কবি। সেখানেও তিনি গানেরই মতো প্রাণ-ধর্মের সমর্থক। নৃত্যে দেহভঙ্গীর মধ্য দিয়া মানুষের মনোভাবকে ব্যক্ত করিয়া তোলাই ছিল তাঁর আদর্শ। সেই নৃত্যেরই প্রবর্তন তিনি করেছেন।

চিত্রাঙ্কন করতে তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন নিতান্ত প্রাণেরই আবেগে। তাই সূক্ষ্ম বিচারের খুঁটি-নাটিতে হয়তো তাঁর চিত্রাঙ্কন বিশেষ মর্য্যাদা পায় না। কিন্তু তাতে যে জীবন্ত প্রাণ জেগে রয়েছে তা' বোধ হয় কেউই অস্বীকার করিতে সাহসী হয় না।

আবার অভিনয়েও তিনি নিজের যোগ্যতা দেখাইয়া যাইতে ছাড়েন নাই।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি, তাঁর বিশ্বমৈত্রীর, তাঁর আনন্দবাদ—এক কথায় রবীন্দ্র দর্শন বলিতে যা' কিছু বুঝায় তার সবই আসে প্রধানতঃ উপনিষদ হইতে। তাই তিনি ছিলেন প্রাচ্যের প্রতিভূ।

এই তো গেল আর্টের দিক।

রবীন্দ্রনাথ একজন আদর্শ স্বদেশ-সেবকও ছিলেন। তিনি রাজনীতি লইয়া বড় একটা মাতামাতি করিতে ভাল বাসিতেন না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু দেশের ডাকে তাঁর প্রাণে সাড়া জাগিয়াছিল। ১৮৯৮ সালে রাজদ্রোহ আইনের প্রতিবাদে টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায় কবি 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধে জনগণের ন্যায়-সঙ্গত অধিকারের দাবীতে এক তীব্র নিন্দা করেন। বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধ আন্দোলনেও তাঁকে নামিয়া আসিতে হয়। 'সুরেন্দ্র-নাথ ছিলেন সেই আন্দোলনের প্রাণ, আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর আত্মা। আবার পাঞ্জাবের জালিওয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া কবি গভর্ণমেন্ট-প্রদত্ত নাইট খেতাব অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ত্যাগ করেন এবং বৃটিশ সরকারকে তিরস্কার করিয়া বড়লাটকেও এক পত্র প্রেরণ করেন।

আর আমাদের এই ত্রুটিবহুল জঘন্য সমাজ ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথকে সত্যই ব্যথিত করিয়াছিল। তাই তার বিরুদ্ধেও তাঁর অভিমান আর অভিযান। সমাজে এই উচ্চ-নীচ ভেদ, নারী মর্য্যাদার অস্বীকৃতি তিনি মানেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—তাদেরও তাদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধার অংশ মিটাইয়া দিতে হইবে। অযোগ্য বলিয়া তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনও ভিত্তিই নাই। সুযোগ পাইলে তারাও যে যোগ্যতা দেখাইতে সক্ষম সে বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহই ছিল না। আর সাম্প্রদায়িকতার কোনও গন্ধই তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। ধর্মের দিক দিয়া তিনি মোটেই প্রাচীনপন্থী ছিলেন না।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থারও ঠিক মূলেই তিনি কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তিনি ছিলেন স্বাধীন শিক্ষার পক্ষপাতী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ-মারা শিক্ষা তিনি নিজের জীবনে গ্রহণ করেন নাই এবং তা অত্যন্ত ক্ষতিকর বলেই তাঁর ধারণা ছিল। প্রত্যক্ষের মাঝে যে শিক্ষা সেই শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে বাহিরের জগত ও ভিতরের জগতের মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকা দরকার। আর সে যোগাযোগের প্রধান অবলম্বন হবে আনন্দ। নইলে যে নীরব কঠোর প্রচলিত শিক্ষা—তা জাতীয় জীবনে শুধু নিরর্থকই হয়ে যায় না অধিকন্তু জাতীয় জীবনে Corruption এনে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক কাজের পরাকাষ্ঠা তাঁর সাধের শান্তি-নিকেতন। সেদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জগতের সামনে এক বিস্ময়কর আদর্শ রাখিয়া গেছেন। তিনি তাঁর 'বিশ্বভারতী'তে সহজ স্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। সেখানে সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন যা আমাদের কেতাবী শিক্ষা সম্পূর্ণ ছেঁটে বাদ দিয়েছে তাও যোগ করিলেন। কিন্তু চিন্তাশীল কবি দেখিলেন—ভাব ও অনুভূতির রাজ্যে নির্বাসিত হইয়া, ছাত্ররা বাস্তবতা বিমুখ হইয়া না উঠে;—সেই জন্যেই শান্তিনিকেতনের ভাববিদ্যালয়ের সঙ্গেই তিনি স্থাপন করিলেন শ্রীনিকেতনের শিল্প বিদ্যালয়।

তাঁর এই প্রতিষ্ঠানকে তিনি সামাজিক গণ্ডীর বাইরে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। সেখানে তিনি আদ্বিজ চণ্ডাল সকলেরই একসঙ্গে পান-ভোজনের এবং মেলামেশার ব্যবস্থা করিয়েছেন। আবার এদেশে সমবায়ের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় অবদান উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্র প্রতিভার বিষয়ই এতক্ষণ আলোচনা করা গেল। রবীন্দ্র-জীবনীর পাতা উল্টাইতে আমি বসি নাই তাই এই প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আমি উৎসাহী নই। সে গতানুগতিকতার মধ্যে পদ সঞ্চারণ করিতে আমি নিরস্ত হইয়াছি। বাংলা ১১৬৮, ২৫শে বৈশাখ এমনি একটী দিনে সেই অতিমানব বা মহামানব নামিয়া আসিয়াছিলেন ধূলিসলিল পৃথিবীর বুকে। তাই ধন্য হইয়াছে এই পৃথিবী, সার্থক হইয়াছে মানুষের জন্ম। তারপর একদিন এই ধূলার ধরণীর মায়া তাঁকে কাটাইয়া যাইতে হইল। বাংলা ১৩৪৮এর ২২শে শ্রাবণ তিনি নিলেন চির বিদায়। সুদীর্ঘ এই জীবনকাল চরম সার্থকতার সঙ্গে কাটিয়ে গেলেন। তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর প্রতিভা অক্ষুণ্ণ ছিল। আর গেলেনই বা মানুষ রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের সাধারণের পরিচয় তাঁর ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই। সাহিত্যের আকাশ তাঁর আলোকচ্ছটায় এমনি আলোকিত হয়ে রয়েছে যে তাঁর দৈহিক অনুপস্থিতির কথা আমাদের মনেই হয় না। সেখানে তিনি চির অমর।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোনও বিদেশী সমালোচকের কথায়ই শেষ করি—

There is no stage of human thinking, no aspect of nature that does not manifest in Rabindranath, Sometimes he is a mystic indeed, but often times a sensuous obsuerver, a lover and a critic.

সে রবীন্দ্রনাথ পুরস্কারের বাইরে, নোবেল প্রাইজও তাঁর যোগ্য পুরস্কার নয়; সে রবীন্দ্রনাথ সম্মানের অতীত, অনুষ্ঠান তাঁর তুল্য সম্মান সংগ্রহ করে না। সে রবীন্দ্রনাথ যেন বাক্য ও মনের অতীত। তবুও রবীন্দ্রনাথকে শুধু মানুষের মনের গহন গভীরেই বুঝা যায়, ব্যক্ত করা যায় না।

তাই আর অগ্রসর না হইয়া এইখানেই সমাপ্তির রেখা টানিলাম।

মালগাড়ী ও মেল গাড়ী

দীপ্তীশ সান্যাল

সকালে একটা আপ, আর রাত্রে একটা ডাউন গাড়ী—এই নিয়ে বসন্তপুর ইষ্টিশন্। তার আবার ষ্টেশন মাষ্টার—তার আবার মালবাবু। তবুও যখন রেল কোম্পানীর সাদা কোটটা গায়ে দিয়ে গম্ভীর ভাবে হাত নেড়ে ঘণ্টা বাজাবার আদেশ দিয়ে গার্ড সাহেবের দিকে তাকান ইষ্টিশন মাষ্টার, তখন জানালার খড়খড়ি বেশ খানিকটা ফাঁক করে ইষ্টিশন মাষ্টারের বউ নন্দরাণী আড় চোখে একবার ইষ্টিশনের দিকে—আর একবার মালবাবুর স্ত্রী নিবেদিতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মনে মনে অনেকখানি হেঁসে নেন। রাত্রের গম্ভীরতা ভেদ করে দৈত্যের মত বপু নিয়ে মালগাড়ী এসে বসন্তপুর ইষ্টিশনে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঐক্যতানের ভিতর যখন কিছুকালের জন্য আমন্ত্রণ গ্রহণ করে চলে যাবার পর মালবাবুর সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী নিবেদিতা স্বামীর বুকের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁ-গা, মালবাবু বড়, না ইষ্টিশন মাষ্টার বড় ?

মালবাবুর এই প্রশ্নে অবাক্ হবার কথা নয়, প্রায় রোজই তাঁকে নিবেদিতার এই প্রশ্ন শুনতে হয়। তবুও তিনি যতদূর সম্ভব কানের কাছে মুখটা টেনে এনে চুপি চুপি উত্তর দেন—তিনজন প্যাসেঞ্জার, তার আবার মাষ্টার ! তুমিও যেমন। লাইন যখন পাতা আছে, গাড়ী তখন যাবেই। যদি একটু থামে তাতে গাড়ীরও ক্ষতি নেই, কোম্পানীরও লোকসান হয় না। কিন্তু মালগাড়ী ? মালই যদি পার না হয় তাহলে লাইন পেতে লাভ কি বলতে পার ?

নিবেদিতা ফোঁস করে ওঠে—তবে যে মাষ্টার-গিন্নীর এত দেমাক্, এত অহঙ্কার ? উনি আবার বিনিয়ে বিনিয়ে বলেন, "মাষ্টারবাবু আছেন বলেই মালগাড়ী আছে, আছেন আমাদের মালবাবু।"

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে পাছে মাষ্টারবাবুর কানে কথাটা পৌছায় এই ভয়ে কণ্ঠস্বরের পর্দা আরও নামিয়ে মালবাবু বলেন—আরে, কথার উপর ট্যাক্সো নেই বলেই ত যে যা পারছে তাই বলে যাচ্ছে, তুমিও যেমন !

শূন্য প্রান্তরে কল্প্রকাজল রেখার মত ছোট্ট ইষ্টিশন্ বসন্তপুর। চালের চালানের সময় কিছু লোকের আবির্ভাব হয়, তারপরই সব ঠাণ্ডা। বর্ষা অবসানে ক্লান্ত নদীতটের মত পড়ে থাকে এক বিরাট দীর্ঘনিশ্বাস। এই ইষ্টিশনে পড়ে থাকে দুটো ছোট পরিবার—এক ইষ্টিশন মাষ্টার, আর এক মালবাবু। গাড়ী এসে থামে, কেউ ওঠে কেউ নামে। তারপরই এক বিরাট কালো ধোঁয়া রেখে মিলিয়ে যায় দূরে। পিছনে পড়ে থাকে একটানা মেঠো সুর। তখন আধ খাওয়া বিড়ির টুক্‌রোটা মালবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে কাশ্‌তে কাশ্‌তে বলেন ইষ্টিশন্ মাষ্টার—ধর হে মালবাবু, সুখটানটা দিয়ে নাও।

সুখ ও দুঃখের মধ্য দিয়ে বেশ শান্তভাবেই এগিয়ে চলে তাঁদের জীবনধারা। একজনের অপরজনকে না হলে চলে না। গাড়ী চলে যায় কিন্তু সমালোচনা চলতে থাকে। থামে প্যাসেঞ্জার গাড়ী—মেল গাড়ীর আলোচনা কিন্তু প্রাধান্য পায়। চা আর চিঁড়েভাজা ভাগ করে গিল্‌তে গিল্‌তে দুজনেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন পরস্পরের স্ত্রী-সৌভাগ্যর কথা তুলে। বাড়ী ফিরেই কিন্তু দুজনে স্ব স্ব পদমর্যাদায় স্ফীত হয়ে ওঠেন—তারপরই আরম্ভ হয় পরস্পরের নিন্দাবর্ষণ। পতিবাক্য বেদবাক্য মনে ক'রে নিবেদিতা ফুলে ওঠে, নন্দরাণীও নেচে ওঠেন মনে মনে।

*　　*　　*

সেদিন হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল। বোম্বাই মেল কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে গেল বসন্তপুর ইষ্টিশনে। মাঝ পথে কোথায় নাকি মালগাড়ী উলটিয়েছে—তাই এই দুর্ভোগ। প্যাসেঞ্জার গাড়ীই যেখানে কেউ কেটা সেখানে মেলগাড়ীর আবির্ভাব সত্যই দেখবার মত। ইষ্টিশন মাষ্টারের মুহূর্ত

অবকাশ নেই। মেলগাড়ীর গার্ড সাহেব প্রায় খাঁটি ইংরাজ। তার গায়ের রংএর সাথে কম্পানীর জামা একদম মিশ খেয়ে গিয়েছে। কথায় কথায় "ড্যাম-ননসেন্স" বলে হুঙ্কার ছাড়ছেন, মাঝে মাঝে টেলিফোন তুলে খবর নিচ্ছেন ও দিচ্ছেন। যাত্রীরা অনেকে নেমে এসে ইষ্টিশন মাষ্টারের চেয়ারগুলো দখল করে বসে আছেন কিছু খবর সংগ্রহের আশায়। কিন্তু গার্ড-সাহেবের ব্যস্ততা আর ইষ্টিশন-মাষ্টারের কর্মতৎপরতা দেখে সাহস ক'রে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পাচ্ছেন না।

আজ আর স্থধু খড়খড়ি তুলে নয়, জানলার সবটা খুলে নাক উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন মাষ্টার গৃহিণী নন্দরাণী। আজ আর কোন কাজে তাঁর মন বসছেনা। চোখ দুটি একবার ষ্টেশনের দিকে আর একবার পাশের জানালায় দণ্ডায়মানা মালগিন্নী নিবেদিতার দিকে নিবদ্ধ করে বেশ চেঁচিয়েই মন্তব্য করেন—আজ কি আর ওনার নাইবার-খাবার সময় আছে। মরমে মরে যায় মালগিন্নী। সবাই নাকি বলাবলি করছে এপথে মালগাড়ী চলা বন্ধ হয়ে যাবে। বোম্বাই মেলকে নাকি কারও আটকে দেবার অধিকার নেই। মনে মনে ভাবে সে—মালগাড়ীই যদি না চলে তবে মালবাবুর অস্তিত্ব থাক্‌বে কোথা থেকে?

দুজনের বিভিন্নমুখী চিন্তা বাধা পেল একটি প্রথম শ্রেণীর কামরার কাছে এসে। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী মিস্ গুলঞ্চবালা কল্‌কাতায় আসছিলেন—"চিত্রতারকাদের ক্রিকেট খেলায়" অংশ গ্রহণ করতে। প্লেনে পাবলিসিটি কম হয়—সেই জন্যে ট্রেনে করেই কল্‌কাতায় আসছিলেন তিনি। পথে এই বিপত্তি। সাথে বেঁটে মোটা মদের পিপের মত মিষ্টার ডিব্বাও চলেছেন মিস্ গুলঞ্চর গাইড হয়ে। ছোটখাটো হাত-পা নেড়ে অনর্গল বকে চলেছেন তিনি মিস্ গুলঞ্চর মনোরঞ্জনের জন্যে। মিস্ গুলঞ্চবালা কিন্তু গম্ভীর ভাবে ফটোফ্রেমের মত জানালার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ ক'রে একভাবে শুনে চলেছেন মিষ্টার ডিব্বার কথা। বেশ একদল যাত্রী বোম্বাই সহরেই শুনেছিল মিস্ গুলঞ্চর কল্‌কাতায় যাত্রার খবর। তাই বসন্তপুর ইষ্টিশনে গাড়ীর গতি রুদ্ধ হতেই বিশেষ প্রথম শ্রেণীর কামরাটির কাছে এসে জড় হলেন। মাষ্টারবাবুও হন্তদন্ত হয়ে গার্ড সাহেবের কামরার দিকে যেতে গিয়ে 'ফটোফ্রেমের' কাছে এসে বাধা পেলেন। বিন্তি না? গোকুল সামন্তর মেয়ে বিন্তি? তাকালেন; ভালভাবে তাকিয়ে নিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে ভাববার চেষ্টা করলেন—মেছেদার কথা, গোকুল সামন্তর কথা। গোকুল সামন্ত কোলাঘাট থেকে কল্‌কাতায় ইলিশ মাছ চালান দিয়ে বহু টাকা কামিয়ে জাতে উঠে মাষ্টারবাবুর কাঁধে চাপাতে চেয়েছিলেন তার একমাত্র কন্যা বিন্তিকে। মাষ্টারবাবু তখন সবেমাত্র প্রবেশিকার সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে কল্‌কাতার কলেজে নাম লিখিয়েছেন। কোলাঘাট ব্রিজের তলায় ঘোলা জলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে তেঁতুল খেতে খেতে বিন্তি বলেছিল—তোমাকে না পেলে বিষ খাব, জলে ঝাঁপ্ দেবো সরোজদা। ইষ্টিশন মাষ্টারের বাবা ছিলেন গোঁড়া ইস্কুল মাষ্টার। পুত্রের বাল্য প্রণয়, তাও আবার মাছের কারবারীর মেয়ের সাথে। নির্দয়-ভাবে পিটিয়ে ছেলেকে কল্‌কাতায় পাঠিয়েছিলেন সেদিন।

গুলঞ্চবালাও লক্ষ্য করছিলেন মাষ্টারবাবুকে এবং হঠাৎ মাষ্টারবাবু ভাবনার কিনারায় পৌছাবার আগেই সমবেত দর্শকমণ্ডলীর চাপা গুঞ্জন ভেদ ক'রে দরজা খুলে নেমে এসে হাত টেনে ধরলেন মিস্ গুলঞ্চবালা—কি, চিনতে পারছ সরোজদা?

চেনা, খুব চেনা। অতি পরিচিতা। কেবল মোমের মসৃণতা আর আপেল-লাঞ্ছিত রং-এর বদলে ছিল মেটে রঙের বাহার, ইঁদুরের মত দন্ত-রাশির বদলে ছিল উঁচু উঁচু দাঁত। তবুও চিনতে কষ্ট হবার কথা নয় মাষ্টার বাবুর। মাষ্টারবাবুকে থেমে থাকতে দেখে আরও জোরে হাতটা চেপে ধরে ছেলেমানুষের ম'ত চিৎকার ক'রে ওঠেন মিস্ গুলঞ্চবালা—চিনতে পারছো না আমাকে সরোজদা? তার-পর চতুর্দ্দিকে চেয়ে নীচু গলায় বলেন—মেছেদার গোকুল সামন্তর মেয়ে বিন্তির কথা এর মধ্যেই ভুলে গেলে? শেষের দিকে বর্ষণ মুখর হয়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠস্বর।

বিষম খেতে খেতে মাষ্টারবাবু উত্তর দেন—চিনবোনা কেন। নিশ্চয়ই চিনবো। একি আর ভোলবার কথা বিন্তি।

এর মধ্যে সেই বেঁটে মোটা পিপের মত লোকটিও চোখ গোলাপী করে নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের পাশে। মিস্ গুলঞ্চ মাষ্টারবাবুকে ডেকে এনে আলাপ করিয়ে দিলেন লোকটির সাথে। বললেন—এর নাম মিষ্টার ডিব্বা, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী আর পথের সাথী। আর ইনি—

শোনবার আর দরকার ছিল না। মিষ্টার ডিব্বা নিজেই হাত বাড়িয়ে 'হাডু-ডু-ডু' খেলে নিঃসন্দেহে কামরায় ফিরে গিয়ে নতুন একটা বোতল খুলে বসলেন।

মিষ্টার ডিব্বা বিদায় নিতেই মাষ্টারবাবুকে ভীড়ের বাইরে টেনে নিয়ে অদূরে একটি হাতলশূন্য বেঞ্চিতে বসলেন মিস্ গুলঞ্চ। মন্ত্রবৎ মাষ্টারবাবুও পাশে বসে বললেন—ভগবান তোমাকে অনেক দিয়েছেন বলেই মনে হচ্ছে বিন্তি?

শুধু মনের খিদে মেটাবার খোরাক দেন নি সরোজদা —খিল্ খিল্ করে হেসে মিস্ গুলঞ্চবালা গড়িয়ে পড়লেন মাষ্টারবাবুর গায়ে। তাঁর তৈলবিহীন ফ্যাকাশে কেশরাশি উপছে পড়ল মাষ্টারবাবুর দেহে ও মুখে।

নন্দরাণী কেঁপে ওঠেন এই সব দেখে। স্বেচ্ছাচারে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন তিনি। নিজেকে আর চেপে রাখতে সক্ষম না হয়ে বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। মাষ্টার গৃহিণীর অবস্থা দেখে প্রথমে বিজেতার হাসি হেসে নিল নিবেদিতা। কিন্তু একটু পরেই তার সমস্ত অন্তর আলোড়িত হ'য়ে উঠল নন্দরাণীর ব্যথায়। ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে নন্দরাণীর মাথায় হাত রেখে ভেজা গলায় ডাকল—দিদি।

* * * *

এদিকে চলেছে মাষ্টারবাবু ও গুলঞ্চবালার ফেলে আসা দিনগুলির কথা। ইনি একবার বলেন উনি শোনেন, আবার উনি বলেন ইনি শোনেন। এক একবার দুজনেই এক সঙ্গে বলে উঠেন। এরপর কম্পার্টমেণ্ট থেকে এল প্যাস্ট্রির বাক্স এবং মাষ্টারবাবুর রুম থেকে দু গ্লাস চা। এত-দিনের অদেখায় জমে ওঠা কথাগুলা ইনিয়ে বিনিয়ে বলে চলেছেন বোম্বাই এর বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী। গল্প উঠেছে বেশ জমে। এ হেন সময়ে হঠাৎ মাষ্টারবাবুর চোখ পড়ল প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের উপর। চোখ যেই পড়ল তো একেবারে আটকে গেল। মুখ দিয়েও আর কোনও আওয়াজ বেরোয় না। মাষ্টারবাবুর হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন দেখে গুলঞ্চবালাও অনুসরণ করলেন মাষ্টারবাবুর দৃষ্টি এবং দেখলেন একটি মেদবহুল নারীমূর্ত্তি বোম্বাই মেলের সিনেমাভক্ত যাত্রীদের বিস্মিত-দৃষ্টির সামনে দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বিকৃত মুখে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। তার মুখখানা দেখাচ্চে ভয়ানক রকম সাদা এবং গালে ও ঠোঁটে লাল রঙের ছোপ্। আরও কাছে আসতে দেখা গেল মহিলাটির মুখে খড়ি বা পাউডার গুলে মাখান হয়েছে এবং ঠোঁটে পুরু করে লাগান আল্‌তার রঙ। অনভ্যস্ত পায়ে হাইহিল্ জুতা কোনও রকমে টান্‌তে টান্‌তে কাছে এসে মহিলাটি বিকৃত মুখে হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে কুঁকিয়ে কুঁকিয়ে মাষ্টারবাবুকে বল্‌লেন—প্রিয়তম, ঘরে চল। হতভম্ব মাষ্টারবাবুর চা চল্‌কে পড়ল গায়ে—প্যাস্ট্রীর টুকরোটা আটকে গেল গুলঞ্চবালার গলায়। মাষ্টারবাবুর মুখ দিয়ে শুধু বেরুল—নন্দরাণী তুমি! নন্দরাণী কিন্তু আর দাঁড়াতে পারলেন না। হঠাৎ আর্ত্তনাদ করে বসে পড়লেন মাটিতে। তাঁর একটি পা আর হাইহিলের উচ্চতার উপর স্থির থাকতে না পেরে মোচ্‌কে গেছে। মাষ্টারবাবুকে সচকিত করে এইবার গুলঞ্চবালা বলে উঠ্‌লেন —ইনিই তোমার স্ত্রী? মাষ্টারবাবুর হতভম্বভাব তখন অনেকটা কেটে গেছে। তিনি তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ক্রন্দনরতা নন্দরাণীর কাছে গিয়ে তাঁকে দাঁড় করাতে করাতে বল্‌লেন—হ্যাঁ, তবে ফিল্মএ চান্স না পাওয়ায় মাথাটা ইদানিং খারাপ হয়ে গেছে। তারপর চল্‌তে অশক্তা নন্দরাণীকে তাঁর বাধাদান সত্ত্বেও সিনেমায় দেখা পোজে কোনওরকমে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গুলঞ্চবালা ও প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম ভর্ত্তি লোকের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে বেশ নাটকীয়ভাবেই নিষ্ক্রান্ত হলেন।

যেতে যেতে ফোঁপানর মধ্যে দিয়ে নন্দরাণী বল্‌তে লাগ্‌লেন—আমার কি দোষ? মাল-গিন্নীই তো বললে এরকমভাবে সেজে না গেলে তোমাকে ঐ তারকার না তাড়কার হাত থেকে বাঁচাতে পারব না। সেই তো দিলে তার জুতো আর মাখালে মুখে রঙ। তা নইলে কি ফেরাতে পারতাম তোমাকে আজ।

* * * *

পাকা তিন ঘণ্টা গতিরুদ্ধ বোম্বাই মেল বসন্তপুর ইষ্টিশন ত্যাগ করে চলে গেল—কিন্তু পিছনে রেখে গেল বিরাট দীর্ঘনিঃশ্বাস। অনেক সাধ্য-সাধনার পর মালবাবু ইষ্টিশন-বাবুকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। সারারাত মুখ বেঁকিয়ে শুয়ে থেকে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় চোখ আপনি বুঁজে এল। সকালে যখন চোখের পাতা মেললেন তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। নন্দরাণী আর নিবেদিতা কুয়োর পাড়ে রাতের বাসন নিয়ে জড় হয়েছেন। সকালের আলোর মত তাঁদের মিলিত কণ্ঠস্বর মাষ্টারবাবুর কানে এসে পৌছাল। তিনি শুয়ে শুয়ে শুনলেন নন্দরাণী মালগিন্নীকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছেন—মালগাড়ী মেল গাড়ীর চেয়ে অনেক বড়। তার চেয়েও বড় আমাদের মালবাবু। মালবাবু আছেন, তাই আছে বসন্তপুর ইষ্টিশন।

আন্তরিক বিনয় প্রকাশ করে নিবেদিতা বলে—কি যে বল দিদি। মাষ্টারবাবু আছেন, তাই আছেন মালবাবু। মাষ্টারবাবু হলেন বড়দাদা, আর আমাদের উনি ছোট ভাই।

জয় বিষ্ণু বলে শয্যাত্যাগ করলেন মাষ্টারবাবু।

গাদিয়া-লোহার

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমাদের সব পূর্ব্বপুরুষ
পরাজয় গ্লানি সহিতে নারি,
গেল চারিশত বৎসর আগে
বীর-শিল্পীরা চিতোর ছাড়ি।
মহারাণাজীর ভক্ত প্রবল,
বক্ষে অনল, চক্ষু সজল,
বলিল স্বাধীন চিতোরে ফিরিব
যদি কোনো দিন ফিরিতে পারি।

২

তখনো চিতোর দুর্গ জ্বলিছে
জহর ব্রতের পুণ্যানলে,
তখনো করিছে ঘোর সংগ্রাম
দুর্গ-রক্ষী সৈন্যদলে।
দেখি 'গম্ভীর' সেতু হয়ে পার—
জলভরা চোখে কাতারে কাতার
চলে গেল তাহাদেরি সাথে
স্বাধীন সূর্য্য অস্তাচলে।

৩

তোমরা তাদেরি—বীর যাযাবর
সে করুণ-স্মৃতি আঁচলে বাঁধি,
বক্ষ শোণিতে মুক্তি পিয়াসা—
কত পথে ঘাটে ফিরেছ কাঁদি।
গৌরবময় সে অতীত দিন,
তোমাদের মাঝে হয়ে আছে লীন,
এসো জীবন্ত বিদ্যুৎ ধারা—
তোমাদিকে মোরা আসিতে সাধি।

৪

এলো স্বাধীনতা সে স্বাধীনতার
তোমরা আসিয়া অংশ লভ।
কৃচ্ছ সাধনা, সে কঠিন পণ—
এনেছে সিদ্ধি সুদুর্লভ।
অনুকূল বায়ু বহে-হাসে দিক,
হে অনমনীয় স্বদেশ প্রেমিক
এসো ফিরে এসো তোমাদিকে লয়ে—
আমরা ধনী ও ধন্য হবো।

৫

জননীর দুখে হলে যাযাবর
লোহার হৃদয়, লোহার দেহ,
অভিশাপ শেষে স্বাধীন ভারতে
গৃহী হতে ডাকে মায়ের স্নেহ,
হৃদয় রয়েছে তেমনি যে রাঙা।
রহিয়াছে হের সেই ঘর ভাঙা।
এসো ফিরে এসো পরমাত্মীয়
তোমাদিকে পর ভাবেনা কেহ।

৬

তোমাদিকে ডাকে স্বাধীন ভারত
স্বাধীন চিতোর ডাকিছে কাছে
মহাভারতের প্রধান মন্ত্রী
বরণ করিতে দাঁড়ায়ে আছে।
যে পথে গিয়াছ, ফের সেই পথে,
জয়মালা গলে, এসো জয় রথে,
"জয়তু জয়তু প্রতাপসিংহ"
তব আগমন ভারত যাচে।

(গত ৬ই এপ্রিল চিতোরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ লোহারগণ চারিশত বৎসর ধরিয়া যাযাবরজীবন যাপন করিয়া স্বাধীন চিতোরে ভারতের প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহেরু র অনুরোধে পুনরাগমন করিয়াছেন)

মেয়েদের কথা

মেয়েদের উত্তরাধিকারের পুরাতন কথা

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

সকলেই জানেন যে প্রায় একবছর ধরে কলিকাতায়—আমাদের A. I. W. C. তরফ থেকে জনকয়েক সভ্য হয়ে গেছেন এই উত্তরাধিকারের বিষয় নিয়ে। এবং এই একই কথা নানাভাবে নানাদিক দিয়ে বহু মহিলা আলোচনা করেছেন। আবার আজকে আমাদের এই বিষয়েই আলোচনা করতে হচ্ছে। খুবই পুরানো কথা অথচ বার-বার বলতেই হচ্ছে। কেননা বার বার—না, বল্লে কোনো কাজ হবে বলে মনে হয় না। কথায় বলে, ছেলে না কাঁদলে, না ব্যস্ত করলে মাও দুধ দেয় না—নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকে। আমাদেরও অনেকটা সেই দশা। কোনো অধিকার পেতে গেলে এমনি করে বারবার ঝালাপালা না করলে হয়ত সরকারী কর্তৃপক্ষের অবসরই হবে না—মেয়েদের জন্য বিশেষ করে কিছু ভাববার। (অবশ্য তাঁদের মনোভাবকে মার মনোভাব বলা যায় না, আমাদের মেয়েদের পক্ষে তাঁদের ব্যবহার কৈকেয়ী জননীর মত)।

এখন বলি : এই উত্তরাধিকারের দাবী আজকের নয়, ১৯৩৬ সাল থেকে সভা সমিতি করে—আলোচনা হচ্ছে, দাবী করা হচ্ছে। তারো আগে বহুলেখক ও লেখিকা এ বিষয়ে নানা মাসিকপত্রে আলোচনা করেছেন। বঙ্কিম-চন্দ্র "সাম্য" প্রবন্ধাবলীতে মেয়েদের সম্বন্ধে নানা বিষয়ে লিখেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর—"স্নেহলতা" নামের বইতে—এই বিষয়ের আলোচনা দেখতে পাওয়া যাবে। পরেও বহু লেখক ও লেখিকা সাময়িকপত্রে এই অধিকারের দাবী করেছেন।

কিন্তু এওতো একরকম—স্বাধীনতার দাবী ; তাই স্বাধীনতার মত এও এত সহজে পাবার জিনিষ নয়, দেখা যাচ্ছে। পুরুষ সমাজের সঙ্গে মেয়েদের অতিনিকট, মধুর এবং শ্রদ্ধার সম্পর্ক থাকলেও তাঁরা কোনো বিশেষ সংস্কার বা অধিকারের ক্ষেত্রে একান্তভাবে নিজের জাতি-বৎসল। তাই এ সব বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে ও প্রসঙ্গে আপনারা দেখতে পাবেন দুর্য্যোধনের মত তাঁরা 'সূচাগ্র ভূমিও' দিতে রাজী হন না। তাই আজো প্রায় ২০।২২ বছর ধরে—এই নিয়ে আলোচনা, কমিটী, সিলেক্ট কমিটী, দেশ বিদেশের মতামত গ্রহণের আর শেষ নেই। একে কথায় ঠেলে রেখে কালহরণ করা বলা চলে।

সকলেই জানেন, হিন্দুকোড বিল-এর আগে রাওবিল, তার আগে দেশমুখ বিলে এই বিষয়ে—বহু আলোচনা হয়ে গেছে—শেষ-দুটি-বিল ইংরেজ আমলের রচনা। হিন্দুকোড বিলটি—স্বাধীন হওয়ার পর রচিত হয়েছে। বহু উদারচিত্ত পুরুষ এর সমর্থনও করেছেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর নতুন বিধানতন্ত্রে আমরা নরনারী নির্বিশেষে সমান অধিকার পেলাম সাব্যস্ত হ'ল। ভোট দেবার, ভোট পাবার অধিকারও পেলাম।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু গত নির্ব্বাচনের আগে ঘোষণা করলেন—হিন্দুকোড বিল পাশ হবে এবং মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে, পিতা ও পতির সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাবেন, নির্ব্বাচন হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিল পাশ হয়ে যাবে।

তারপর কি হ'ল সকলেই জানেন।

বিলটীতে তিনটী-বড় অধিকারের কথা বলা হয়েছিল। (১) বিবাহ সম্বন্ধে ;—পুরুষের সর্ব্বত্র এক বিবাহ হবার আইন। (২) বিবাহ বিচ্ছেদ, প্রয়োজন হলে, নরনারী উভয়পক্ষই বিবাহ বিচ্ছেদ করে নিতে পারবেন। (এখন পুরুষ ত্যাগ করতে পারেন আবার বিয়ে করতে পারেন। স্ত্রীকে নিজের সতীত্বের অধিকারে লাঞ্ছনা করতে পারেন ছাড়াছাড়ি না থাকায়) (৩) মেয়েদের বাপের সম্পত্তি

ছেলেদের সঙ্গে খানিকটা অথবা সমান ভাগ পাবার অধিকার।

এখন কিন্তু ওটা আর এক আকারে নেই। সর্ব্বত্র এক বিবাহ প্রচলনের স্থলে একটী ম্যাজিক দেখানো নতুন বিবাহ বিল আনা হয়েছিল। পাশ ও হয়েছে। তার নাম হয়েছে স্পেশ্যাল ম্যারেজ বিল। বলা বাহুল্য এটা সর্ব্ব সাধারণে প্রযোজ্য হবে না। তিন আইনের বিবাহের আইনের মত একটী বিল মাত্র। তাতে লাভ হ'ল কার, বোঝা শক্ত। এবং এটার কোনো দরকার ছিল কিনা তাও সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। কারণ ঐ তিনটী বিষয়ের অহঙ্কার আমরা সাধারণের ক্ষেত্রে চেয়েছিলাম। বিদ্বেষের জন্য চাওয়া হয়নি। তাদের তো আইন পূর্ব্বেই ছিল। এখন একথা থাক্। উত্তরাধিকারের কথাই বলি। এখন কেন্দ্রীয় লোকসভার গত অধিবেশনে এটীকে আনা হয়েছে। ভারতবর্ষে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ দুটী ব্যবস্থা অথবা প্রথা নিয়ে। মনে রাখতে হবে, মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ ব্যবস্থারও বার বার সংস্কার হয়েছে বৃটীশ আমলে এবং একেবারে মনু যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি মেনেই কোনোদিনই সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলেনি। ছোট বড় নানা সংস্কার সমাজে চলেছেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে সব সংস্কারই—পুরুষের নিজের জাতি স্বার্থ বাঁচিয়ে। কোনোখানে মা স্ত্রী কন্যার কথা তাঁরা ভাবেন নি। যা শাস্ত্রে আছে তাও মানেন নি। যা নতুন আসতে পারে তাতেও তাঁরা বাধা দিয়েছেন। যার জন্য এই বিশাল বিপুল মানুষ সমাজের অর্দ্ধেকটা অংশ ক্রীতদাস জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। তবু মিতাক্ষরা ও দায়ভাগের মূল প্রভেদটা দু'কথায় বলি। মিতাক্ষরার প্রথা হ'ল পুত্র সন্তান জন্মের সঙ্গেই পৌত্রিক সম্পত্তির দায়াদ হয়, অধিকার পায়। দায়ভাগে পিতার মৃত্যুর পর পুত্র উত্তরাধিকারী হয়। মিতাক্ষরাতে পিতা পুত্রকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না। একটু আলোচনা কোরে দেখলে সকলেই দেখতে পাবেন কোনো প্রথাই চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু আপাত যথার্থ হানির ভয়ে কূপ মণ্ডুকের মত চোখ বুজে এঁদের একশ্রেণী কেবলি বাধা দেন কোনো মানবিক সংস্কারের কথা উঠলেই। চোখ খুলে নানাদেশ বিদেশ স্বদেশের নানা জাতের কথা ভেবে দেখেন না। দেখলে দেখতে পাবেন আমাদের দেশেই মাতৃতন্ত্র সমাজ আছে। আসামে কোনো কোনো জাতে—যেমন খাসিয়াদের মধ্যে। মাদ্রাজে বহু জায়গায় আছে কিছু জাতের মাঝে। ত্রিবেন্দ্রমরাজ্যে জ্যেষ্ঠাকন্যা রাজ্যাধিকারিণী। পুত্র থাকলেও। মনে রাখতে হবে এই সব জায়গার মেয়েরা সমাজকে উন্নত করেছেন বই অবনত করেন নি। মদ্র-নারীরা শিক্ষায় সমাজ সংস্কারের কাজে অনেকক্ষেত্রে খুবই অগ্রসর। শিক্ষিতা নারী উত্তর ভারতের চেয়ে দক্ষিণ ভারতে বেশী। ত্রিবাঙ্কুর ত্রিবেন্দ্রমের মেয়েরা শিক্ষায় খুব অগ্রসর। আর্থিক অনধিকার তাঁদের অসহায় পঙ্গু করে রাখতে পারে নি বলে তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করেন। কোনো ভারতবাসী মদ্র নারীর কোন বিষয়ে নিন্দা করতে পারবেন না এই অধিকারের অপব্যবহারের বা কিছু অন্য বিষয়ে।

এইসঙ্গে বলা যায় মুসলমান মেয়েরাও অধিকার পান বাপের সম্পত্তিতে, এদেশে খৃষ্টান মেয়েরাও পিতার সম্পত্তি পেয়ে থাকেন ভাইয়ের সঙ্গে সমান। এখানেও সমাজ ভেঙে যায় নি। বরং মেয়েরা অন্নের দায়ে 'দাসী' জীবন-যাপন করে না।

কিন্তু এসব কথা অনেকবারই অনেকে বলেছেন, আমরাও আলোচনা করেছি সুতরাং আর বেশী করে বলা নিষ্প্রয়োজন। এখন শুধু আমরা বলতে চাই কোথায় কি আছে শাস্ত্রে, কোথায় কি আছে লোকাচারে—এ দেখে আর মেনে পুরুষরা কেউই যখন চলছেন না, যুগধর্ম্মে লোকাচার ও সংস্কার চিরকালই বদলেছে। এখনো আরো দ্রুতগতিতে সমাজে পরিবর্ত্তন হয়ে চলেছে। পুরুষ সমাজ নানাবিষয়েই সংস্কার মেনে চলেন না, চলতে পারেন না। শুধু মেয়েদের উত্তরাধিকারের বেলায় শাস্ত্র ও ধর্ম্মের এবং লোকাচারের কঠিন বন্ধন মেয়েদেরও মেনে নেবার যুগ আর নেই। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতা অসংখ্য অশিক্ষিতা নারী-সমাজ কখনো পিতা পতি পুত্রের অভাবে, কখনো তাদেরই উৎপীড়নে, অবজ্ঞায়, স্বেচ্ছাচারে, সমাজে কি দুর্দ্দশাময় জীবন-যাপন করেন সে তো আর কারো দেখতে বাকি নেই। তাদের সেই সব "ম্লান মূক মূঢ় মুখে দিতে হবে ভাষা", তাদের সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপনের জন্য পিতার ঘরে সন্তানের অধিকার চাই।

এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা দরকার—দিল্লীতে ৯ই

এপ্রেলের সর্ব্বভারতীয় হিন্দু-কোড সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ আন্ত-র্জাতিক ও হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ পাল মহাশয় তাঁর ভাষণে বলেছেন…"হিন্দু-কোড বিল উত্থাপিত হওয়ার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে আমার মনে গভীর সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে যে, কর্ত্তারা এই মৌলিক নীতির তাৎপর্য্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছেন কিনা সন্দেহ।"……'কোডে'র বিরোধিতার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "বহু বিচারপতি ও ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল—আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বিলের বিরোধিতা করেছেন। হিন্দু আইন সম্পর্কে এই ব্যাপক বিধান রচনার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছেন…"। উত্তরাধিকার সম্পর্কেও বিরোধিতার কারণ, যে সম্পত্তি আরো বিভক্ত হইয়া যাইবে।…অন্য ব্যক্তিরা (অর্থাৎ জামাতা ও দৌহিত্র?) সম্পত্তির মধ্যে প্রবেশ করুক ইহা তাঁহারা চান না"…।—ইহাতে হিন্দু সমাজের সংস্কৃতিও ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে ইত্যাদি। আন্ত-র্জাতিক সূক্ষ্ম বিচারের খ্যাতিমান আমাদের শ্রদ্ধেয় বিচার-পতি মহাশয়ের কাছে আমরা এই সম্পত্তি বিভাগের গতানুগতিক যুক্তির পুনরুক্তি আশা করি নি এবং হিন্দু-কোডের অন্যান্য বিষয়েও অত্যন্ত সাধারণ মতবাদ শুনব মনে করি নি।

কোনো সমাজের সংস্কৃতি কি কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের নির্য্যাতন ও দাসত্বের উপর দাঁড়িয়ে থাকে? সাধারণতঃ স্ত্রী ছাড়া—সাধারণ লৌকিক ব্যবহার নারী-সম্প্রদায় আত্মীয়-স্বজনের কাছে কি রকম সংস্কৃতিমূলক ভাবে পেয়ে থাকেন এবং স্ত্রীও বহু বিবাহের ক্ষেত্রে চরিত্রহীনতার ক্ষেত্রে কি রকম ব্যবহার পেয়ে থাকেন? এই সংস্কৃতিটা কি রকম বস্তু, যেটি যাবে বলে ভয়? —সেটা কি পুরুষ সন্তানের উত্তরাধিকারের অর্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত? যে-যে সমাজে মেয়েরা সম্পত্তি পেয়ে থাকেন, সন্তানের অধিকার পান, সেই সব সমাজে সংস্কৃতি কেমন সেটা নিশ্চয়ই বিখ্যাত ও বিজ্ঞ বিচারপতি মহাশয়দের ও রাষ্ট্রপতি মহাশয়ের অবিদিত নেই। তাদের সম্পত্তি যদি ভায়ে ভায়ে—ভাই বোনে মিলিয়ে ভোগ করে এবং মেয়েরা ভাগ পাওয়াতে দুর্দ্দিনে এবং সুদিনে পিতৃগৃহে সম্মানিত থাকে, সেটা কি সম্পত্তি ভাগের আতঙ্কের চেয়ে বড় জিনিস নয়? যুক্তি ও মানবিকতার দিক দিয়ে সকল মানুষের সুখ সুবিধার দাবীর অধিকার অনেক বড় বিষয়, সম্পত্তির পুরুষ-ছত্রাধিপতিত্বের চেয়ে। অবশ্য নারী-সমাজকে এখনো মানুষ মনে করা হয় না নতুন সংবিধানের ঘোষণা সত্ত্বেও। তারা এখনো ব্যক্তি-পুরুষের ভোগ্যা এবং সম্পত্তির সামিল হয়েই আছে। তাই এত কথা ওঠে। এবং মানুষকে সম্পত্তি মনে করা যত দিন থাকবে, তারা ক্রীতদাস প্রথার মত এই সব মতবাদ ও আইন মেনে চলতে বাধ্য হবে।

আর সম্পত্তি টুকরা হওয়ার কথাই যদি ওঠে, তাহলে পুরুষেরা সকল ভাইয়ে মিলেই বা বিষয় সম্পত্তির ভাগ নেন কেন? একটী আরো চমৎকার প্রথা আছে—(বিদেশে লর্ডপ্রথা) রাজস্থানে জ্যেষ্ঠাধিকারী প্রথা আছে (ছিল)। বড়ছেলেই সম্পত্তির অধিকারী হ'তেন, ছোটরা 'ছুটভাইয়া' নামে অভিহিত হ'তেন। ভাইয়ের জমীদারীর সামান্য জমীতে লাঙ্গল চালাতেন, ক্ষেত খামার করতেন স্বহস্তে। ধনী বড়ভাইয়ের তামাকও সাজেন তেমন দুর্দ্দিনে। এই প্রথা চলুকনা এদেশেও? কিছু দরিদ্র ভাই ভিখারিণী বোনের পাশে এসে দাঁড়ান না? আমাদের নারী সমাজের দিক থেকে হিন্দু-কোডের আবার সংশোধন বিলে এই প্রস্তাবটী যেন মেয়েরা তোলেন। সেদিন দেখা যাবে এই ভাগাভাগির বিষয়ে পুরুষ সমাজ কত উদার ও সম্পত্তি ভাগের বিরোধিতা করেন কি না!

এই প্রসঙ্গে আরো একটী বিষয় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—সম্পত্তিমূলক স্বার্থের জন্য নানা প্রকার অদল বদল করার ব্যবস্থা। সেটা হচ্ছে, মাদ্রাজে বহুক্ষেত্রে মাতুল ও ভগিনী কন্যায় বিবাহের প্রথা—পাছে মাতৃতন্ত্র সমাজে সম্পত্তি কন্যার দিকে চলে যায়। অথচ এই বিবাহটাকে incest বিবাহ বলা যেতে পারে (নিকট রক্ত সম্বন্ধীয়)।

মুসলমান সমাজেও নিকটাত্মীয়ার কন্যাকে বিবাহ করার প্রথা আছে। সেটার মূলেও হয়ত এই সম্পত্তি হস্তচ্যুতির আতঙ্ক বিরাজ করছে! আরো নানা সমাজে নানাবিধ প্রথা দেখলে বেশ বোঝা যাবে, ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমাজের যত রকম ভাঙাগড়া চলেছে, মানুষকে দাবিয়ে রাখা ও লুব্ধতাই এই সব প্রথার মূলে বাসা বেঁধে আছে। এসব কথা আমার চেয়ে

বিচারপতি মহাশয়রা ও হিন্দু-কোড বিলের বিরোধকারীরা অনেক বেশী জানেন ও বোঝেন, আমাদের তাতে সন্দেহ নেই।

রাণী জয়মতী

শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

কবি বলেছেন—

এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তারে রূপ রস মধু গন্ধ সুনির্ম্মল।

স্বদেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে কত না বিচিত্র কথা, কত না বিচিত্র কাহিনী স্মৃতিবিজড়িত হয়ে রয়েছে। আজ্‌কের দিনে সেই সব কথা, সেই সব কাহিনী তুলে ধর্‌বার দিন এসেছে, আমাদের সমাজ সংসারে যাতে করে আমরা জাগিয়ে তুল্‌তে পারি অনাগত কালের বহু সম্ভাবনাকে আমাদের মধ্যে। যুগে যুগে নারীর আদর্শ ও আত্মদানের কাব্যকাহিনী বিশ্বসংসারে মুখরিত হয়ে আস্‌ছে।

মধ্যযুগের ইতিহাস যদি আমরা পর্য্যালোচনা করি তাহোলে প্রত্যক্ষ হবে আমাদের দেশের সভ্যতার রাজপথের দুই পার্শ্বে বহু মহীয়সী মহিলা তাঁদের প্রাত্যহিক বাস্তব জীবন দিয়ে রচনা করে গেছেন কত না মহৎ আদর্শের চলন্ত মহাকাব্য, কত না জীবন্ত কাহিনী, কত না শৌর্য্যবীর্য্যের রোমাঞ্চকর ঘটনাবহুল ইতিহাস। সেই সব জীবন কাহিনী বা ঘটনা অবলম্বন করে মানুষ প্রেরণা পেতে পারে, সুরু হোতে পারে সংসারের প্রতি দিনের উপন্যাসের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে নতুন পরিচ্ছেদ, নতুন অধ্যায়।

আসামের ইতিহাসে এমন একটি মহীয়সী মহিলার সর্ব্বোন্নত জীবনের আদর্শের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যার সঙ্গে পরিচিত হোলে, নারী-চরিত্রের গৌরব আমাদের সম্মুখে প্রতিভাসিত হোতে পারে। কবি কাল্‌হিল জিব্রান বলেছেন—'বীণা যখন বেজে ওঠে পূর্ণ রাগিণীতে, প্রত্যেকটী তারের ঝঙ্কারের মিলনে গড়ে ওঠে একটি সঙ্গীত, তবু তার মধ্যে স্বতন্ত্র থাকে প্রত্যেকটি আলাদা তার।' আমাদের দেশে একটি সঙ্গীত বেজে উঠেছে আরণ্যক সভ্যতার যুগ থেকে, আজ পর্য্যন্ত সেটি হচ্ছে নারীর অপূর্ব্ব চরিত্র আর সতীত্বের দীপ্তি, তারই এক একটি স্বতন্ত্র তারের ভেতর জড়িয়ে আছে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি সতীর পতি-প্রেমের মাধুর্য্য। আসামের শিবসাগর জেলার প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী জয়মতী সপ্তদশ শতাব্দীতে সহিষ্ণুতা ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন তা জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়।

১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের কথা। রাজা চক্রধ্বজ সিংহ আহোম রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হোলেন। সাত বৎসর ধরে ইনি রাজত্ব করে ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রস্থান করলেন। এই অল্প দিন তাঁর সুন্দর রাজ্যশাসনে প্রজারা তাঁর ওপর খুব প্রীত হয়েছিল ও আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। এঁর তিরোধানের পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত আসাম রাজ্যের ভয়ানক দুর্দ্দিন গেছে। মন্ত্রীগণের প্রাধান্য এরূপ বিস্তৃত হোলো যে তাঁদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে উঠ্‌লো প্রজাবৃন্দ। রাষ্ট্রবিপ্লব দেখা গেল।

রাজা চক্রধ্বজ সিংহের পরে তাঁর ভ্রাতা উদয়াদিত্য ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন! মাত্র দুই বৎসরকাল রাজত্ব করার পর তাঁকে বিষ পান করিয়ে মন্ত্রীরা হত্যা কর্‌লেন। এর পর ১৬৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে পাঁচ জন রাজা সিংহাসনে অধিরূঢ় হোলেন। এই সাত বৎসরের মধ্যে তিন জনকে মন্ত্রীরা হত্যা কর্‌লেন, বাকী দু'জনের ভেতর একজন আত্মঘাতী, অপর একজন রোগগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ কর্‌লেন। এর ফলে রাজার সমস্ত ক্ষমতা মন্ত্রীদের করতলগত হওয়ায় বিশৃঙ্খলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলো, রাজা এদের হাতে খেলার পুতুলের মত হয়ে রইলেন। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে পর্ব্বতীয়া বংশের চুদৈকা রাজা হত হওয়ার পরে, মন্ত্রীরা চামওরীয়া রাজবংশের চুলিকফা নামে রাজাকে আহোম রাজসিংহাসনে বসালেন।

অল্পবয়স্ক ও ক্ষীণকায় চুলিকফাকে 'লরা' রাজা বলা হোতো। আসামী ভাষায় লরা শব্দের অর্থ বালক বা শিশু। রাজা কৈশোরোত্তর না হোলেও বুদ্ধিতে বিচক্ষণ ও জ্ঞানবৃদ্ধ। দেশের তদানীন্তন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা করে বুঝ্‌লেন, যে কোন সময়ে মন্ত্রীদের হাতে

ডাল্‌ডা
আমার পক্ষে
ভালো

তাঁর জীবন বিপন্ন হোতে পারে। তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন অন্য কোন রাজবংশের রাজকুমারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে স্বার্থপ্রণোদিত মন্ত্রীরা তাঁর হত্যার আয়োজন করবে। এজন্যে তিনি রাজা হওয়ার উপযুক্ত যত রাজকুমার ছিল, গুপ্তঘাতকদের দ্বারা সেই সব রাজকুমারদের অঙ্গক্ষত বা তাঁদের বধ করাতে মনস্থ কর্‌লেন, সেই মত নৃশংস কার্য্যও সুরু হোলো।

তুঙ্গখুঙ্গীয়া বংশের গোবর রাজার পুত্র গদাপাণিকে হত্যা করার জন্য 'লরা' রাজা আয়োজন কর্‌লেন। গদাপাণির তেজস্বিতা ও অসম-সাহসিকতা সে সময়ে সর্ব্বজনবিদিত ছিল। তিনি এরূপ বলশালী ছিলেন যে একদা তিনি একটি মত্ত হস্তীকে দাঁতে ধরে আট্‌কে রেখেছিলেন। দু' চারজন গুপ্তঘাতক দিয়ে এরূপ পুরুষ সিংহের অঙ্গক্ষত অসম্ভব, তাই তাঁর হত্যার জন্য লরা রাজাকে বিপুল আয়োজন কর্‌তে হোলো। এ সংবাদ গদাপাণি অবগত হোলেন, কিন্তু কোনক্রমেই বিচলিত হোলেন না।

তাঁরই সহধর্ম্মিণী রাণী জয়মতী। স্বামীর জীবনের আসন্ন বিপন্নতার সম্বন্ধে উপলব্ধি করে তিনি গদাপাণিকে পালিয়ে যাবার জন্যে অনুনয় বিনয় কর্‌লেন, কিন্তু গদাপাণি নির্ভীক কণ্ঠে বল্‌লেন—'তা পারি নে, মৃত্যুকে ভয় করি নে, তোমাকে ও শিশুসন্তান সোনার লাই ও লেচাই দুটিকে ফেলে আমি পালিয়ে যেতে পারব না।' জয়মতী কাতর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—'এ ভাবে থাকা চলে না, তোমাকে এরা হত্যা করলে আমাদের অবস্থা শোচনীয় হবে, তোমার জীবন অমূল্য, একে রক্ষা করা দরকার—অন্য কোথাও পলায়ন করো—'

স্ত্রীর অনুনয় বিনয় উপেক্ষা কর্‌তে না পেরে গদাপাণি ছদ্মবেশে নাগাপর্ব্বতে পালিয়ে গেলেন। এদিকে গদাপাণিকে ধরে আন্‌বার জন্যে লরা রমজা অনেক সৈন্য-সামন্ত প্রেরণ কর্‌লেন। সৈন্যরা ফিরে গিয়ে রাজার কাছে গদাপাণির পলায়নের সংবাদ দিল। লরা রাজার দুর্ব্বল হৃদয় শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌লো। তিনি গদাপাণির সন্ধান জান্‌বার জন্যে ব্যস্ত হোলেন। রাণী জয়মতীর কাছে দূত পাঠিয়ে তিনি গদাপাণির সন্ধান জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, কিন্তু জয়মতী স্বামী সম্বন্ধে কোন খবরই দিলেন না। তিনি দূতকে বলে পাঠালেন যে স্বামীর সন্ধান তাঁর দ্বারা কখনও বাহির হবে না। এই সংবাদে লরা রাজা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে জয়মতীকে বন্দিনী অবস্থায় তাঁর কাছে আন্‌বার জন্যে অনুচরবর্গকে আদেশ দিলেন। জয়মতীকে আনা হোলো, লরা রাজা বল্‌লেন—'তোমার স্বামী কোথায় বলো, না হোলে বেত্‌ মেরে তোমার জীবন শেষ কর্‌বো—' জয়মতী বল্‌লেন—'ও ভয় দেখিও না রাজা, পূর্ব্বেই বলেছি তোমার দূতকে আমার স্বামীর সন্ধান মরে গেলেও দেব না—'

রাজার আদেশ হোলো রাজবাড়ীর সম্মুখে বেঁধে অনবরত জয়মতীকে বেত্রাঘাত কর্‌তে, যতদিন পর্য্যন্ত স্বামীর সন্ধান তিনি না দেন ততদিন এইরূপ শাস্তি ভোগ কর্‌তে হবে তাঁকে।

হোলোও তাই—পৈশাচিক অত্যাচার দেখে সমগ্র দেশের লোক অশ্রুবর্ষণ করতে লাগ্‌লো। রাজার এই অত্যাচার প্রতীকারহীন হয়ে রইলো। দেশে সে সময়ে শক্তিশালী পুরুষের অভাব আর মন্ত্রীরাও আত্মকলহে দুর্ব্বল। নাগা পর্ব্বতে গদাপাণির কাছে এই অত্যাচারের কথা গিয়ে পৌছুলো। গদাপাণি আর স্থির থাকতে না পেরে ছদ্মবেশে এসে উপস্থিত হোলেন। কাতরোক্তি কর্‌লেন স্বামীর সন্ধান বলে দিয়ে মুক্তিলাভ করতে। জয়মতী গদাপাণিকে দেখ্‌লেন, আর চিন্‌তে পেরে শঙ্কান্বিত হোলেন। নিজের মনে বল্‌লেন—'যার জন্যে এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা সহ্য করছি সে যদি এখন নিজেই ধরা দেয় তবে সমস্তই বৃথা—তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌লো। বল্‌লেন—'সতী নারী স্বামীর জন্যে সব সহ্য কর্‌তে পারে, স্বামীর মঙ্গলের জন্যে প্রাণ দানই সতী নারীর কর্ত্তব্য—' এই কথাগুলো বলার সময় অতি কাতর দৃষ্টিতে জয়মতী গদাপাণির দিকে চেয়ে তাঁকে সে স্থান ত্যাগ কর্‌তে বল্‌লেন। গদাপাণি তাঁর সকরুণ অনুরোধ উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লেন না, চলে গেলেন।

গদাপাণি চলে যাওয়ার পরে আরও ১৪।১৫ দিন লরা রাজার পাষণ্ড অনুচরেরা প্রকাশ্যস্থানে জয়মতীকে বেত্রাঘাত করেছিল। সাধ্বী মহিলা রক্তাক্ত দেহ হয়েও যন্ত্রণা ভ্রূক্ষেপ করেন নি—সর্ব্বশুদ্ধ ২১।২২ দিন ধরে অসহনীয় অত্যাচার প্রশান্ত চিত্তে সহ্য করে শেষে তিনি দেহত্যাগ কর্‌লেন।

খুকীর নতুন ফ্রক
ও, মা, এ যে নতুন ফ্রক !
হ্যাঁ, দেখ খুকী যেন খারাপ না হ'য়ে যায়।
স্কুলে যাচ্ছে
স্কুলে
এস আমরা খেলি !
না, আমার নতুন ফ্রক খারাপ হ'য়ে যাবে যে।
তিন মাস পরে
তোমার ফ্রক যে সব ফেঁসে গেছে, খুকী।
আমি ত সাবধান ছিলাম মা !
গ্যারাণ্টি দেওয়া এই ফ্রক দেখুন !
হুঁ...যে কেচেছে এ তারই দোষ !
আমিই কাচি !
মাপ করবেন,...
...কিন্তু এ আছড়ে কাচার জন্যেই হ'য়েছে, তাতে কাপড়ের সুতো ছিঁড়ে যায়, কলার ও আস্তিনের ফেঁসো বেরিয়ে যায়।
সানলাইট সাবানে কাপড় না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে হয়ে যায়।
মাঃ
উনি ঠিকই বলেছেন ! এখন আমি সানলাইট সাবানের প্রচুর ফেনায় কাচি, আমার কাপড় আরও বেশীদিন টেঁকে, তাতে পয়সাও বাঁচে।
SUNLIGHT SOAP
Rs.10,000 Reward!
GUARANTEED
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে
S. 228-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত

(পূর্বানুবৃত্তি)

মুখ ফিরিয়ে ইরা ছুটে বেরুল। স্বর কাঁপছে। আকাশ ঘন কালো মেঘের ভরা সাজিয়ে স্তম্ভিত হয়ে আছে। এক ছুটে সে বাপের কাছে গেল। আকাশের গতিক বুঝে কৃতান্ত আর বেশি বাড়াবাড়ি করছে না। সরে পড়ছে যারা সব এসে জমেছিল।

দীপক বটব্যালও চলে যাচ্ছে। পটলা তার কাঁধে হাত দিয়ে বলে, পালা কি চুকে গেল? শুনেছিলাম যে পরেও আছে—

দীপক খিঁচিয়ে ওঠে, ভেজিটেবল-ঘিয়ের দু-খানা লুচি আর দু-টুকরো আলুর দম মুখে দিয়ে কি এমন চতুর্বর্গ লাভ হবে? চলুন—

পটলা অবাক হয়ে বলে, সে কি মশায়! উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম সর্বদিকে তো চাঁদা তুলে বেড়িয়েছে। খরচের বেলা চাপাচাপি করলে হবে কেন?

দীপক বলে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোক বিপাকে পড়েছেন—ফন্দি-ফিকিরে দু-চার পয়সা তুলে দেওয়া। দুঃস্থ সাহিত্যিকের সাহায্যার্থে সম্বর্ধনার আয়োজন—খোলাখুলি বিজ্ঞাপনটা ছাড়লে ভাল দেখায় না। কিন্তু ব্যাপার আসলে এই।

ইরাকে দেখে থতমত খেয়ে চুপ করল। ছাতের উপর আছে এখনো সর্বসাকুল্যে জনকুড়িক—তা বোধ হয় কুড়িটা মীটিং-ই চলছে একসঙ্গে। বিশ্বেশ্বরও ছাড়বেন না, তাঁর কথা তিনি শুনিয়ে চলেছেন। আজকে বিশেষ পদাধিকার বলে সকলের চেয়ে উঁচুতে গলা তুলবার চেষ্টায় আছেন। পারবেন কেন—একে বুড়োমানুষ, বিপরীতে তায় অতগুলো কণ্ঠ।

ইরা গিয়ে বাপের হাত ধরে টেনে তুলল, চলো বাবা। সভা হয়ে গেছে, এখনো বসে কেন তুমি?

বাধা পেয়ে বিশ্বেশ্বর রেগে ওঠেন, হয়ে গেল কি রে? এই তো এত সব আছেন—

ওঁরা নিজেদের কথা বলছেন। কেউ তোমার কথা শোনে না বাবা। বুঝতে পারো না তুমি, কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই—

টপ-টপ করে ক-ফোঁটা জল পড়ল। মানুষগুলো ঘাড় তুলে আকাশের দিকে তাকায়। জোর বৃষ্টি নামবে, আসর ভাঙতে হল এবার।

কেউ শোনে না? বিশ্বেশ্বরের মুখ বিবর্ণ হল। মৃদু মৃদু তিনি ঘাড় নাড়েন, তাই হবে বোধ হয়। ঠিক বলেছিস ইরা, শুনলে কেন এত গণ্ডগোল হবে?

ইরার মনের মধ্যে হায়-হায়—করে উঠল। নিজে ইনি এক স্বর্গলোক গড়ে রয়েছেন—কেন তার উপর আঘাত হানতে যাওয়া? বিশেষ আজকের এই দিনটায়। বাবার নামে বিস্তর ভাল ভাল কথা বলে গেল—সত্যি কিম্বা অভিনয়, গরজটা কি অত শত খবরে!

কৃতান্তকে পেয়ে বিশ্বেশ্বর তাকেই সালিশ মানলেন, শোন—আমার মেয়ে বলছে, কেউ মোটে শোনে নি নাকি আমার কথা। কথার বাজে খরচ এতক্ষণ ধরে।

কৃতান্ত ভারি ব্যস্ত। আর যাই হোক, খবরের কাগজের লোকগুলোকে তো খাওয়াতেই হবে। নিরম্বু ফিরে গেলে ফলাও রিপোর্ট বেরুবে না তাদের কলমে। তাদেরই বাপু-বাছা ঠাকুর-গোসাই করছিল। তারই মধ্যে ঘাড় না ফিরিয়ে জবাব দিল, কতক্ষণ আর শুনবে মানুষে! উঠলেন বুঝি? তাই যান—বিস্তর বকেছেন, বিশ্রাম করুন গে—

তপোবন-ঘরের মধ্যে ছোট্ট তোষকটুকুর উপর ইরা বাপকে এনে বসাল। সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে পড়লেন তিনি—কত ক্লান্ত হয়েছেন, এতক্ষণে বোঝা গেল। দরজার ওপাশে অন্ধকারে যেন মানুষ—যে হয় হোক গে, উঠে গিয়ে ইরা দুয়ার ভেজিয়ে দিয়ে এলো।

একটুখানি ওঠো বাবা। তাকিয়া সরিয়ে নিচু বালিশ দিয়ে দিই। তোমার ঘাড় ফেটে যাচ্ছে।
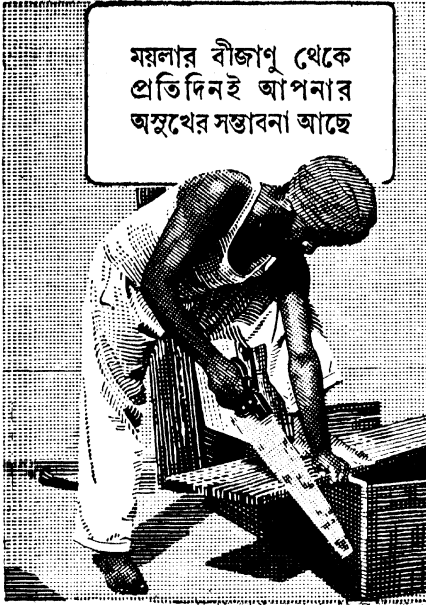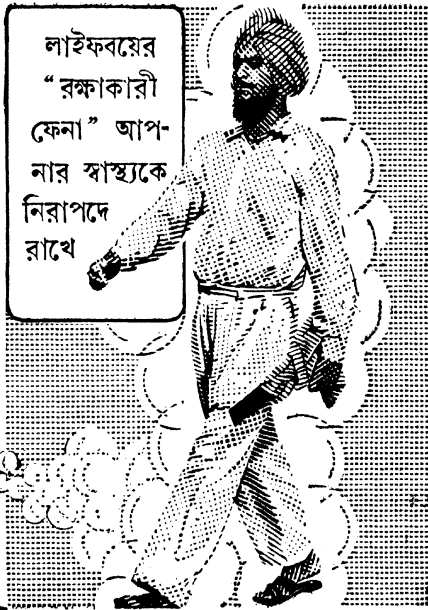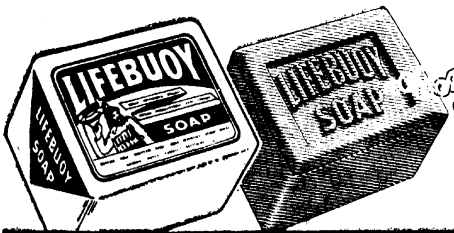
বিশ্বেশ্বরের মেজাজ ভাল নয়। সেইজন্য আরও নেতিয়ে পড়েছেন। এমনি মেজাজেই অবাধ্যপনা করেন তিনি। মেয়ের উপর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, না, কিছু হচ্ছে না আমার। তুই তো সব জানিস, দুনিয়া একেবারে নখদর্পণে নিয়ে বসে আছিস।

ইরাবতীকে হাসতে হয়। কান্নায় চোখ ভরে এলেও হেসে উঠে সামাল দিতে হয় বাপকে। বলে, আমার দুনিয়া হলে তুমি বাবা। সে দুনিয়ার সবটুকু জেনে বসে আছি। তোমার চেয়ে বেশি জানি—অনেক বেশি।

সেই এক দুঃখের আনাগোনা বিশ্বেশ্বরের মনে। অভিমান ভরে তিনি বললেন, কেউ আমার কথা শোনে নি—কিন্তু কৃতান্ত তো অমন কথা বলল না।

ইরাবতী সামলে নিল, তিনি যা বললেন তাই ঠিক বাবা, তিনি একেবারে সামনে ছিলেন। চিলেকোঠায় আমি তো খাবার গোছাচ্ছিলাম, আমি কি দেখেছি কিছু চোখে?

না দেখে বলিস কেন তা হলে?

না বললে কি উঠতে? জানিনে তোমায়? বৃষ্টি এসে যায় ওদিকে—

তাই তো বলি! আঠারোটা সন তারিখের গোলমাল ধরে দিলাম, শুনছে না অমনি বললেই হল! বিশ্বেশ্বর একেবারে জল হয়ে গেলেন। একগাল হেসে বলেন, ভারি বজ্জাত তুই। আমি ভাবলাম, সত্যি সত্যি বুঝি বা—

ইরা তর্ক করে, ভাবো কেমন করে তা-ও তো বুঝিনে? কথা শুনবে না তো এত মানুষ দল বেঁধে এসেছিল কেন?

বিশ্বেশ্বর বলেন, বড্ড অন্যায় করেছিস। তাড়াতাড়ি আসর ভেঙে মনক্ষুণ্ণ করলি এত জনের—

ইরা অমনি ঘাট মেনে নেয়, অত শত ভাবিনি বাবা। তোমায় নিয়ে আসছি—দেখি, মুখ চূণ করে সকলে তাকাতাকি করছে। আমারও কষ্ট হল দেখে—

ভেজানো দরজা একটুখানি নড়ে ওঠে।

কে?

অরুণাক্ষ মৃদুকণ্ঠে বলে, একটুখানি বাইরে আসেন যদি উনি—

না, বাবা শুয়ে পড়েছেন।

ইরাবতী উঠে দরজায় খিল দিয়ে এলো।

বিশ্বেশ্বর ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, খিল আঁটিস কেন? ডাকছে, কি বলে শুনি আমি—

ইরা বলে, কি শুনতে যাবে? মিষ্টি-মিষ্টি কিছু বানিয়ে বলবে—তোমার মতন পারে আর কেউ সত্যি জিনিষ বলতে? তোমার কষ্ট হচ্ছে, ক্লান্ত হয়ে জিরোচ্ছ, তবু ছাড়বে না—তবু জালাতন করছে মুখ্যু মিথ্যেবাদীরা—

বিশ্বেশ্বর তাড়া দিয়ে ওঠেন, ও কি রকম কথা রে! কৃতান্ত বলছিল, অনেক বড়লোক আসবেন—যাঁরা হলেন দেশের মাথা। আমরা গরিব মানুষ—আমি চিনিনে, তুইও চিনিস নে। ডাকছেন হয়তো বা তেমনি একজন কেউ—

ইরাবতী এক কথায় কেটে দেয়, দেশের মাথা আবার কে আছে? মাথা হলে তোমরা, জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি যাঁদের হাতে। সব চেয়ে বড় কুলীন, সকলের বড় ব্রাহ্মণ। আজকে বেদির উপর বসেছিলে বাবা, নিচে সব লোকজন। কত উঁচু আর কত তফাৎ তোমায় দেখাচ্ছিল অন্য দশজন থেকে! বাবা তুমি কত বড়!

এমনি করেই ভাবে ইরা। এদেশে-বিদেশে পাহাড় কেটে বুদ্ধমূর্তি বানিয়েছে—একজন মানুষ যত বড় হতে পারে, তার বিশ-পঞ্চাশ গুণ বড় করেও শিল্পীর তৃপ্তি নেই। তার বাবারও তেমনি এক আকাশ-ছোঁয়া মূর্তি যেন। মনের সমস্ত কল্পনা জুড়ে জুড়েও সে মূর্তির নাগাল মেলে না। বিশ্বেশ্বরের পিতামহ রামনিধি সরকার—ফাঁসি হয়েছিল তাঁর। ফাঁসিতে মরেও রেহাই পান নি—আদালতের কাগজপত্রে তিনি খুনি-ডাকাত। শুধুই মেরে ফেলা নয়, অপবাদের বোঝা চাপিয়ে গোর দিয়ে দিয়েছিল—ঘৃণায় কেউ যাতে সেদিকে নজর না ফেলে। হয়েছিল ও বটে তাই—একশ বছর হয় নি, রামনিধির নামটাও কেউ মুখে আনত না। গোরস্থান খুঁড়ে ফেলে বিচ্ছিন্ন হাড়-পাঁজরা খুঁটে খুঁটে বিশ্বেশ্বরই অবশেষে এক বিশাল-পুরুষ সর্ব চক্ষুর সামনে তুলে ধরেছেন। দেশের মানুষ, একেবারে ভুল জেনে বসে রয়েছ তোমরা। 'ভারতে ইংরাজ'-এর অনেক পৃষ্ঠা জুড়ে রামনিধি। শুধু মাত্র পিতৃপুরুষের ঋণ-শোধ নয়, বাঙালি জাতির কৃতঘ্নতার পাপ-মোচন।

ভাঁটির দেশ ছেড়ে যুবক রামনিধি উত্তর অঞ্চলে এলেন ভাগ্য ফেরাবার আশায়। সঙ্গে অভিন্নহৃদয় বন্ধু কাশীশ্বর

রায়। সংস্কৃত ও ফারসি উভয় ভাষাই উত্তমরূপ জানা—এর উপরে কিছু কিছু ইংরেজি কথাও অচিরে রপ্ত করে নিলেন। এমন মানুষ পড়তে পায় না। সদরে যে ক'টি সাহেব সুবো ছিল এবং মফঃস্বলের নানান কুঠি থেকে হপ্তায় যারা প্লাণ্টার্স ক্লাবে আসত, ভারি দহরম-মহরম সকলের সঙ্গে। কাশীশ্বর তো বছর কতক পরে গ্রামাঞ্চল ছেড়ে ইংরেজের খাস শহর কলকাতায় গিয়ে জমিয়ে বসলেন। গেলেন বটে, কিন্তু যাতায়াতটা বজায় থাকায় কলকাতায় যত পশার-প্রতিপত্তি হোক, গ্রামের বাড়িতে এসে দোল-দুর্গোৎসব করতেন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মানুষজন খাওয়াতেন। উকিল হিসাবে রামনিধিরও খুব নামডাক। কিন্তু সমস্ত পয়মাল শেষ অবধি। ভাঁটির দেশ ছাড়বার সময় তাঁর এক পূর্বপুরুষের হাতে-লেখা ভাগবত পুঁথি এনেছিলেন। নৌকা থেকে নেমেছিলেন সেই পুঁথি মাথায় নিয়ে। আর বুকের মধ্যে এনেছিলেন দুর্জয় সাহস ও ঈশ্বরনিষ্ঠা। তাই কাল হল। এত খাতির নীলকর মহলে, তাদের মামলা-মকর্দমার বেশির ভাগ রামনিধির সেরেস্তায়—কিন্তু তাঁর পুরুত ঠাকুরকে নিয়ে এক ব্যাপারে বিষনজরে পড়ে গেলেন নীলকরদের। ছেলের অন্নপ্রাশনে পুরুত মশায় আর আসেন না—রামনিধি তো রেগে টং। তিন প্রহর বেলায় অপমানে লজ্জায় কাঁপতে কাঁপতে ব্রাহ্মণ এসে হাজির হলেন। কিনা, পথের মধ্যে নৌকো আটকে কুসুমপুর কুঠির টমাস সাহেব তাঁকে এবং অনেককে দিয়ে নীলকুঠির উঠান ঝেঁটিয়ে নিয়েছে।

পরিচয় জানতে পেয়ে টমাস তারপরে দুঃখ প্রকাশ করল। কাশীশ্বর মধ্যস্থ হয়ে বলেন, যাকগে—যাকগে, তোমার পুরুতঠাকুর সেটা জানবে কি করে? মাপ চেয়েছে যখন, মিটে গেল। জবাবে রামনিধি একটি কথা বললেন শুধু—যারা আমার পুরুত নয়?

তা সত্ত্বেও কাশীশ্বরের ধরাধরিতে মিটমাট হয়ে যেত নিশ্চয়। সবাই অন্ততঃ তাই বুঝেছিল। কিন্তু আরও নানা ব্যাপার ঘটল ইতিমধ্যে। ভারতে ইংরাজ-এর দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়টা পড়ুন, বিস্তৃত পরিচয় পেয়ে যাবেন। মাস কয়েক পরে এক তাজ্জব কাণ্ড করে বসলেন রামনিধি। কোন এক ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে টমাস সাহেবকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এনে সকলের সামনে—এবং সেই পুরুত ঠাকুরের সামনে বরকন্দাজে ঘিরে ঝাঁটা তুলে দিলেন তার হাতে। উঠোন সাফ করে দাও সাহেব।

সে আমলের নীলকরের—জানেন তো এর পরের ব্যাপার-গুলো আর বলে দিতে হবে না। চরমে পৌঁছল, একরাত্রে কুসুমপুর-কুঠি দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল যখন। বুড়ো টমাস বেরুতে পারল না, আগুনে পুড়ে মরল। আদালতে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরা বলল—রামনিধির দল কুঠি লুঠ করেছে, বুড়ো টমাসকে রামনিধি নিজে ধাক্কা মেরে ফেলে-ছেন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে।

সেই বংশের বিশ্বেশ্বর। গোড়ায় রামনিধির জন্য পুরাণো কাগজপত্র খোঁজাখুঁজি শুরু—পিতৃপুরুষের নামের কালিমা মোচন করবেন তিনি। নজর ছড়িয়ে তার পরে গোটা ইংরেজ আমলে গিয়ে পড়ল—উঃ, মিথ্যার উপর মিথ্যা সাজিয়ে ইতিহাস বলে চালাচ্ছে—উপন্যাস কোথায় লাগে! দিন-দুপুর হয়ে দাঁড়ায় রাত-দুপুর কলমের মহিমায়। যেমন ঐ রামনিধির বেলা ঘটেছে। এখনো সময় আছে—মালমশলা সব হেলায় এদিক-ওদিক ছড়ানো, খুঁটে খুঁটে তবু অনেক হদিশ পাওয়া যায়। পরে আর হবে না। তাই বিশ্বেশ্বর এত খাটছেন। চাকরি ও সংসার-প্রতিপালন নিয়ে তিনিও যদি মজে থাকেন, ক'টাবছর বাদে পঙ্কোদ্ধারের কোনও উপায় থাকবে না। অতএব সরমা রাগ করলে কি হবে, নিরুপায় তিনি।

ইরা মা'কে বলে, সেই রামনিধিই ফিরে এলেন আমাদের বংশে। অত খাতির-ইজ্জত ওকালতির অমন পশার এক-কথায় ছেড়েছুড়ে গাঁয়ের চাষাভুষোর মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। তেমনি মিছে তোমার কান্নাকাটি আর ঝগড়া-ঝাটি করা বাবার সঙ্গে। সহজ আরাম ওঁদের ভোলাতে পারে না। অনেক দিন ফেরারি থাকবার পর রামনিধি ধরা পড়লেন। ঘরেই নাকি শঙ্করমাছের চাবুক মেরে সর্বদেহ শতছিদ্র করেছিল। তার পরে ফাঁসিতে লটকায়। তা বিশ্বেশ্বরও একই গতিক বটে! ঘরে-বাইরের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অবিরত চাবকাচ্ছে তাঁকে, সরমা পর্যন্ত রেহাই দেন না। নিজেই কেন এতদিন ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়েন নি, সেই তো পরমাশ্চর্য মনে হয়।

•

বিশ্বেশ্বর এক আস্ত পাগল; মেয়েটাও বাপের দোসর।

কিন্তু সরমা তা নন। গরম জল পড়েছে তো ফেলে দিতে হবে নাকি অত লুচি-সন্দেশ ? বেছেগুছে কিছু অন্তত দেওয়া চলবে। তাড়াতাড়ি সেই ভাবে প্লেট গুছোচ্ছেন। কিশোরী-বালাকে নিচে পাঠালেন—আবার চায়ের জল গরম করে আনতে। কৃতান্ত বলেকয়ে মানুষ ক'টিকে আটকে রেখেছে। তা পাঁচ-দশ মিনিট থাকতে অসুবিধা নেই। আকাশ থমথমে হয়ে আছে—এবং বিশ্বেশ্বর ঘরে গিয়ে ওঠায় তাঁর বাক্য শোনবার ভাণ করতে হচ্ছে না—স্পষ্টাস্পষ্টি আড্ডা ও হৈ-হল্লায় কোন প্রকার বাধা নেই এখন। তপোবন-ঘরের ভিতর থেকেই ইরা টের পাচ্ছে, যথোচিত সেবা অন্তে ভক্তমণ্ডলী সিঁড়ি ভেঙে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন। দরজায় ঘা পড়ল এমনি সময়। বিরক্ত হয়ে ইরাবতী সাড়া দেয়, কে ?

পঞ্চানন বলে, শোন একটিবার—

দরজা খুলে ইরাবতী চৌকাঠ ধরে দাঁড়াল। ভিতরে উঁকি দিয়ে পঞ্চানন বলে, শুয়ে পড়েছেন? একটাবার উঠতে হবে যে ওঁকে। বাইরে ডাকছেন।

বিশ্বেশ্বর তড়াক করে উঠে বসলেন। নিশ্চয়, নিশ্চয়। এক্ষুণি যাচ্ছি আমি। গরদের জোড় আবার পরে নিতে হবে—একটু দেরি হবে যে বাবা পঞ্চানন! বেশি নয়, কাপড়খানা জড়িয়ে নিতে যা লাগে। ইরা, কোথায় রাখলি রে কাপড় কুঁচিয়ে ?

ইরা দেখেছে, অদূরে অরুণাক্ষ দাঁড়িয়ে। চৌকাঠের দু-দিকে দু-হাত রেখে বাপকে এক শিশুর মতো আটকে দাঁড়াল। বলে, বাবার শরীর ভাল নয়, আর উনি বেরুতে পারবেন না।

বিশ্বেশ্বর চেঁচিয়ে ওঠেন, পারব রে, খুব পারব। বাড়ির উপর এসে ওঁরা দেখা করতে চাচ্ছেন, কি লাটসাহেব হলাম যে যেতে পারব না !

পিছনে দৃষ্টি ফিরিয়ে বাপের মুখোমুখি চেয়ে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে ইরাবতী বলে, ব্যস্ত হয়ো না, তুমি শুয়ে থাকো বাবা। আমিই জেনে আসছি, কেন ডাকছেন—কি দরকার ওঁদের।

এই কণ্ঠস্বর ভালরকম জানেন বিশ্বেশ্বর। আর তিনি উচ্চবাচ্য করলেন না। ইরা কয়েক পা এগিয়ে অরুণাক্ষের সামনে গিয়ে বলল, কি বলবার আছে, আমায় বলুন—

অরুণাক্ষ জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, যাবার সময় একবার প্রণাম করে যেতাম। আর ধরুন, আমাদের এই আনন্দের দিন—

ভ্রূকুটি করে ইরা বলে, আনন্দের দিন তাতে আর সন্দেহ কি ! তার পর ?

আনন্দের দিনটা উপলক্ষ করে অতি-সামান্য একটা জিনিষ—

সোনালি খাপের দামি এক কলম বের করল পকেট থেকে। ইরাবতী বাঁ-হাতে কপালের অবাধ্য অলকগুচ্ছ তুলে দিয়ে মুখোমুখি তাকাল। অরুণের ধ্বক করে মনে আসে কেশর-ফোলানো এক সিংহী। অথচ হাসছে সে। হাসিমুখে কৌতুকের স্বরে বলে, কলম ? কলম কি হবে, কাঁচি দিলে বরঞ্চ কাজে আসত।

পঞ্চানন বুঝতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে থাকে। ইরা ঘাড় দুলিয়ে বলে, হ্যাঁ—তাই তো বলছিলেন ওঁরা। আমার বাবার কাজ কলমের তো নয়, কাঁচি আর আঠার।

নিজে হাসে, পঞ্চাননও হেসে উঠল হো-হো করে। অরুণাক্ষ এতটুকু হয়ে যায়, না—না করে দু-একবার। কিন্তু দু-জনের হাসির তোড়ে ভেসে চলে যায় তার অস্ফুট আপত্তি। দলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু নিজে কিছু বলে নি—কেমন করে প্রমাণ করবে এই প্রগলভার কাছে !

পঞ্চানন বলে, পুরানো কাগজ-পত্র ঘেঁটে ঘেঁটে উদ্ধার করা—অমুক লোকটা এই বলেছিল, তমুক জায়গায় এই লেখা আছে—সে যে কি কষ্ট, লোকে পড়ে দেখে না, তাই এমনি বলাবলি হয়। পড়লে কদরটা বুঝত।

ইরা অরুণকে দেখিয়ে ভাল মানুষের ভাবে বলে, কিন্তু ইনি ইতিহাসের ছাত্র। ইনি ভয়ানক রকম পড়েছেন—

অরুণ মরীয়া হয়ে বলে, পড়েছি বই কি !

শুধু পড়া ? মুখস্থ বলে যেতে পারেন ইনি গড়গড় করে। অরুণাক্ষের পাংশুমুখের দিকে চেয়ে আবার হেসে ওঠে, ভয় নেই। মুখস্থ আমি ধরতে যাবো না।

কৃতান্ত এসে পড়ে। অরুণাক্ষকে চেনে সে, ইলেকসনের সময়ে অনেকবার তাদের বাড়ি গিয়েছে। বলে, এই যে অরুণবাবু! অনুষ্ঠান মোটের উপর ভালই হল, কি বলেন ?
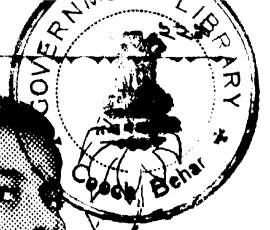
অরুণাক্ষ ঘাড় নেড়ে কি বলল বোঝা গেল না। পঞ্চানন কলমটা হাতে নিয়ে দেখায়, এইটে উপহার নিয়ে এসেছেন দাদার জন্য—

কৃতান্ত তারিপ করে, বাঃ বাঃ! ডেকে দাও দাদাকে। একেবারে তাঁর হাতেই জিনিষটা দিয়ে দিন—

ইরা কঠিন কণ্ঠে বলে উঠল, মাপ করবেন কাকাবাবু। অদৃষ্টে যে দুর্ভোগ ছিল, সে হয়ে গেল। এই সব উপহাসের জিনিষ কক্ষণো আমি বাবাকে ছুঁতে দেবো না।

কৃতান্ত হাঁ-হাঁ করে ওঠে, কী রকম কথার শ্রী! এইসব ছেলেরা এসেছেন। চেনো না এঁদের—হীরে-মাণিকের টুকরো! ভালবেসে শ্রদ্ধা করে দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে, তাই এটা-ওটা হাতে করে এসেছেন—

শ্রদ্ধা আর ভালবাসা! কেটে কেটে ব্যঙ্গের স্বরে ইরাবতী বলে, দেশের লোক মাথায় তুলে নাচাবে! সরল আপন-ভোলা মানুষটিকে নানান কথায় ক্ষেপিয়ে দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব মজা দেখেন! বইটা চোখেও দেখেন নি, অথচ লাইন ধরে ধরে নাকি মুখস্থ!

অরুণাক্ষ প্রতিবাদ করে, চোখে দেখি নি—কে বলে এমন কথা?

ইরা অগ্নিদৃষ্টি হেনে তাকে থামিয়ে দেয়, আমি বলছি। আমি জানি, আমি জানি—

বলতে বলতে এক লহমায় আগুন নিভে গেল জলের প্লাবনে। এত জল ছিল মেয়েটার দু-চোখে!

আমার বাবা—কারো সাতে নেই পাঁচে নেই, পাগলামি করুন যা-ই করুন—নিজের ঘরে কিম্বা লাইব্রেরিতে বসে। কাউকে ডেকে কিছু বলতে যান না। বুড়োমানুষ বলে দয়া নেই—দল বেঁধে বাড়ি বয়ে তাঁকে অপমান করতে আসা—

কৃতান্ত বিরক্ত স্বরে বলে, এঁরা কেউ এমনি-এমনি বাড়ি আসেন নি। আমরাই আদর-আহ্বান করে নিয়ে এসেছি। আমরাই বা কেন বলি—দু-শ' পাঁচ-শ' নয়, 'যুগচক্রের' দুই হতভাগা, আমি আর পঞ্চানন। তা হলে সমস্ত দোষের মূল হয়ে দাঁড়ালাম তো আমি!

কৃতান্তকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ইরাবতী অরুণাক্ষের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, আপনারা শিক্ষিত মানুষ—বাবার জন্মদিনের ব্যাপারে আজকের এই একটা দিন অন্তত রসিকতাগুলো না করলে পারতেন। আরও তো তিন-শ' চৌষট্টি দিন পড়ে রইল। এই বাড়িটা বাদ দিয়ে আরও কত শত বাড়িতে পার্কে-পথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চলতে পারত!

পঞ্চাননের ধৈর্য রইল না। এবারের ইলেকসনে না হয় এদের উল্টা বলেছে, পরেরটায় কি গতিক দাঁড়াবে কে বলতে পারে? মানুষ-জন ডাকাডাকিতে তার খাটনি হয়েছে সকলের বেশি, আবার ইলেকসন বা অন্য কোন ব্যাপার হলে তাকেই এমনি দরজায় দরজায় ঘুরতে হবে। রেখে ঢেকে সেকথা বলতে জানে না, একেবারে বোমার মতো ফেটে পড়ল।

কোন উটকো লোক কি বলেছে, তাই অমনি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে! বই না পড়ে থাকলে ফাঁসে লটকাতে হবে নাকি? বুকে হাত দিয়ে বলুক দেখি, দাদা নিজে ছাড়া আর ক'টা মানুষ পড়েছে! আমাদের যে গায়ের জ্বালা! ফর্মার পাহাড় হয়ে আছে—হৈ-হৈ করলে তবু যদি দু-দশ জনের নজরে পড়ে, দশ-বিশখান বিক্রি হয়ে যায়। চলুন—চলে আসুন মশায়। জন্মদিনের নিকুচি করেছে, ঘাট হয়েছে—এমন জায়গায় মানুষ-জন ডেকে আনা।

হাত ধরে ফেলে অরুণাক্ষর। অরুণ হাত ছাড়িয়ে নিল। ইরাবতী কোন দিকে না তাকিয়ে ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে দড়াম করে দরজা দিল। অরুণাক্ষ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে—সম্বিৎ লোপ পেয়ে গেছে যেন তার। ইরার দুই গাল বেয়ে দরদর ধারে জল পড়ছিল, বিস্রস্ত কেশপাশ। ঘরের খিল এঁটে দিয়েছে, অবমানিতা মেয়ের সেই ছবি তবু সে চোখের উপর দেখতে পাচ্ছে। (ক্রমশঃ)

মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠা—

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে কংগ্রেস-নেতা আনন্দমোহন বসু যে-স্থানে মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, গত ২৪শে এপ্রিল তথায় (কলিকাতা ২৯৪।২।১ আপার সার্কুলার রোডে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মিলন-মন্দির গৃহের উদ্বোধন অনুষ্ঠান করেন। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আনন্দমোহন বসুর স্মৃতি-ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন। মিলন-মন্দির সমিতির সভাপতি ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ভূতপূর্ব মিন্টো অধ্যাপক) চেষ্টায় এই নুতন গৃহ-নির্মাণ সম্ভব হইয়াছে। আপাততঃ রাস্তার ধারে একটি চারিতলা বাড়ী নির্মিত হইয়াছে—সুবৃহৎ ভূখণ্ডের উপর শীঘ্রই বিরাট হল নির্মিত হইবে। মন্দির সমিতির সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সেদিন তাঁহার পিতা সার চারুচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিতে ১৭ শত টাকা দান করিয়াছেন। প্রবীণ অধ্যাপক ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কার্য্য তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। মিলন-মন্দির বাঙ্গালী জাতির যেন প্রকৃত মিলন-কেন্দ্রে পরিণত হয়, আমরা সর্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা করি।

প্রাচ্যবাণী মন্দিরে মেঘদূত উৎসব—

গত ১৮ই জুন সন্ধ্যায় কলিকাতা ৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীটে প্রাচ্যবাণী মন্দিরে বহু পণ্ডিত ও সুধী ব্যক্তির উপস্থিতিতে মেঘদূত উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী দুত-কাব্য—বিশেষ করিয়া মেঘদূত সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন ও সভায় বহু সঙ্গীত ও আবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি জনগণের প্রীতি যে দিন দিন বাড়িতেছে তাহা উৎসবে সুধী সমাগম দেখিয়া বুঝা গিয়াছিল।

নেতাজীর কন্যার শিক্ষা—

সকলেই জানেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পত্নী শ্রীযুক্তা এমিলি সেঙ্কল ও তাঁহার কন্যা শ্রীঅনিতা বসু ভিয়েনায় আছেন। গত ২৭শে জুন প্রাতে শ্রীজহরলাল নেহরু ভিয়েনায় তাঁহাদের সহিত প্রাতরাশ করেন। শ্রীমতী সেঙ্কলের বর্ত্তমান বয়স ৪৫ বৎসর। তিনি টেলিফোনে কাজ করেন। তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহার নিজের জন্য কোন আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন নাই—তিনি আরও ১৫ বৎসর চাকরী করিতে পারিবেন ও পরে সরকারী পেন্সন পাইবেন। তাঁহার বৃদ্ধা রুগ্না মাতাকে তাঁহার দেখিতে হয়, সে জন্য তিনি এখন ভারতে বেড়াইতে আসিতেও পারিবেন না। শ্রীনেহরু তাঁহার কন্যার শিক্ষা ও ভরণপোষণের জন্য আর্থিক সাহায্য দানের প্রস্তাব করায় তিনি তাহা লইতে সম্মত হইয়াছেন। ৪ বৎসর পূর্বে তিনি অর্থ সাহায্য গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। নেতাজীর পত্নী ও কন্যা যাহাতে সত্বর ভারতে আসিয়া বাস করেন, সে জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন হওয়া উচিত। নেতাজীর পত্নী টেলিফোনে কাজ করিয়া উদরান্ন সংগ্রহ করিবেন, তাহা ভারতের পক্ষে সম্মানজনক নহে।

পশ্চিমবঙ্গে নুতন রেলপথ—

পশ্চিমবঙ্গের বারাসত হইতে বসিরহাট হইয়া হাসনাবাদ পর্য্যন্ত ৪০ মাইল দীর্ঘ একটি ব্রডগেজ রেলপথ স্থাপনের জন্য রেল বোর্ড একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। বারাসত বসিরহাট লাইট রেল বন্ধ হইয়াছে—উহা ন্যারোগেজ লাইন ছিল এবং যাত্রী ও মাল চলাচলের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল না। ঐ বিষয়ে শীঘ্রই জরিপ আরম্ভ হইবে—সে জন্য ৮৮ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে আরও বহু রেলপথের প্রয়োজন রহিয়াছে—তমলুক হইয়া নরঘাট, কাঁথি হইয়া দিঘা, কাকদ্বীপ হইয়া নামখানা প্রভৃতি অঞ্চলে রেল লাইন হইলে ঐ সকল স্থান ক্রমে সমৃদ্ধ হইবে ও লোক যাইয়া বাস করিবে। পশ্চিমবঙ্গে নুতন রেল করার জন্য গণ-আন্দোলন হওয়া উচিত।

উদ্বাস্তুদের জন্য ১০ কোটি টাকার গৃহ-নির্মাণ—

গত ২৮শে জুন কলিকাতায় পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের পুনর্বাসন বিভাগের সেক্রেটারীদের সম্মিলনে স্থির হইয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে উদ্বাস্তুদের জন্য ২৫ হাজার গৃহ নির্মাণ করা হইবে। ঐ সকল গৃহ নির্মাণের ব্যয় সহরবাসী উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে প্রদত্ত ঋণ বলিয়া ধরা হইবে। প্রথম বৎসরে ২৫০০, দ্বিতীয় বৎসরে ৬২৫০, তৃতীয় বৎসরে ৮৭৫০ ও শেষ ২ বৎসরে ৭৫০০ করিয়া পরিবারের গৃহ নির্মাণ করা হইবে। সহরাঞ্চলের অন্যান্য পরিবারের প্রত্যেককে ১২৫০০ টাকা করিয়া মোট প্রায় ৯ কোটি টাকা গৃহ নির্মাণ ঋণ দেওয়া হইবে। কলিকাতা ও তাহার পাশে যে সকল জবর দখল কলোনী আছে, সেগুলিকে আইনসঙ্গত করার জন্য মোট ২ কোটি টাকা আপাততঃ ব্যয় করা হইবে। শিল্প ঋণ দেওয়া হইবে ৫ বৎসরে ১৫ কোটি টাকা। ১ লক্ষ উদ্বাস্তুকে শিল্প-শিক্ষা প্রদান করা হইবে সে জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইবে। এই টাকা কি সত্যই দেশবাসীর উপকার করিতে সমর্থ হইবে?

সেনা-নিবাসে মদ্য বর্জন—

গত ১লা জুলাই হইতে ভারতের সকল সেনানিবাসে মদ্য জাতীয় পানীয় দ্রব্য দ্বারা স্বাস্থ্য পান বর্জন করা হইবে। স্থলবাহিনী, নৌ ও বিমানবাহিনীর সেনানায়কমণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ ঐ আদেশ অনুমোদন করিয়াছেন। এখন হইতে শুধু জলপান করিয়া স্বাস্থ্যপান ঘোষণা করিতে হইবে। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ভারতের সৈন্যদের মধ্যে মদ্যপান কমিয়া গিয়াছে। মদ্যপান না করিয়া দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা হওয়া যায় না—পূর্বে যে এইরূপ ধারণা ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে। মদ্যপান দেশে যত কমে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা।

পরলোকে ডাক্তার বামনদাস—

কলিকাতার খ্যাতনামা স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায় গত ১৪ই আষাঢ় বুধবার রাত্রি ৮টায় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার সিমুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৯০৬ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করেন। তিনি মেডিকেল কলেজে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সহপাঠী ছিলেন। তিনি চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনের প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টার, আর-জি কর মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ও পশ্চিমবঙ্গ ষ্টেট মেডিকাল ফ্যাকালটীর সদস্য ছিলেন। তিনি দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। ডাক্তারীর সহিত সমাজ-সেবার কাজ করিয়া তিনি সুনাম অর্জন করেন।

ভারত সরকার ও কম্যুনিষ্ট দল—

গত ২৯শে জুন দিল্লীতে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দলের সেক্রেটারী শ্রীঅজয় ঘোষ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন যে কম্যুনিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটী ঘোষণা করিয়াছেন—ভারত সরকার আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তি রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, কম্যুনিষ্ট দল তাহা সমর্থন করিবেন। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র নীতির ফলে বিদেশে ভারতের মর্য্যাদা যে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভারতের স্বাধীনতা যে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে সে কথা তিনি বলিয়াছেন। ইহা কতকটা ভূতের মুখে রাম নামের মতই শুনাইবে। এই উক্তির পশ্চাতে কম্যুনিষ্ট দলের কি উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা তাঁহারাই জানেন।

ভারত সেবক সমাজ—

শ্রীজহরলাল নেহরু কর্ত্তৃক স্থাপিত ভারত সেবক সমাজের পশ্চিমবঙ্গ শাখা কলিকাতা—১৯, ৪৭ নং সাদার্ণ এভেনিউতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ উহার আহ্বানকারী হইয়াছেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে সভাপতি করিয়া অন্যান্য ১৮ জন সদস্য লইয়া একটি পরামর্শ কমিটীও গঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারত-সেবক সমাজের উদ্যোগে গ্রীষ্মের ছুটীতে পশ্চিমবঙ্গের ৮০টি স্থানে ছাত্র ও যুবকদের লইয়া শিবির খোলা হইয়াছিল এবং তথায় সকলকে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ভারত-সেবক সমাজের কর্মীরা সকল গঠনমূলক কাজে সরকারী পরিকল্পনাগুলিকে সাহায্য করিয়া থাকেন। শ্রীবিধুভূষণ ঘোষের মত একজন কর্মীর উপর এই রাষ্ট্রের কার্য্যভার অর্পিত হওয়ায় সমাজের উদ্দেশ্য সত্বর ও সুন্দরভাবে সিদ্ধিলাভ করিবে বলিয়া সকলে বিশ্বাস করেন।

শিশু স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান—

কলিকাতা সহরে শিশু মৃত্যুর সংখ্যাধিক্যে বিচলিত হইয়া একদল কর্মী একটি শিশুস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। কলিকাতা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী উহার সভাপতি, ডাঃ কে-সি-চৌধুরী সম্পাদক ও বিচারপতি শ্রী জে-পি-মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিরা সদস্য। প্রতিষ্ঠান কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট ৯৫ দিলখুসা ষ্ট্রীটে (পার্ক সার্কাস) এক খণ্ড জমী সংগ্রহ করিয়া গৃহ নির্মাণ করিতেছেন। তথায় প্রত্যহ বাহিরের ৫ শত শিশু-রোগীর চিকিৎসা করা হইবে ও সংলগ্ন হাসপাতালে ১২০টি শিশু রোগী রাখার ব্যবস্থা করা হইবে। কলিকাতায় যাহাতে শিশুমৃত্যুর হার কমে ও শিশুরা পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে, প্রতিষ্ঠান সে জন্য বিরাট পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। কলিকাতা—১৪, ৫৬।২ ঝৌক রোডে প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ডাক্তার কে-সি-চৌধুরী সহিত সংযোগ করিলে এ বিষয়ে সকল বিস্তৃত সংবাদ জানা যাইবে। আমরা এই নূতন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

হিন্দীভাষা সম্বন্ধে কমিশন—

কি ভাবে হিন্দী ভাষার উন্নতি বিধান করা যায় ও উহাকে সত্বর রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করা যায় সে সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য ২১ জন সদস্য লইয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এক কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রী বি-জি-খের ঐ কমিশনের সভাপতি হইয়াছেন। সকল রাষ্ট্র হইতে সদস্য লওয়া হইয়াছে ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান-পরিষদের সভাপতি খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কমিশনের অন্যতম সদস্য হইয়াছেন। আসামের শ্রীবিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া, উড়িষ্যার ডাঃ পি-কে পারিজা, বিহারের ডাঃ অমর নাথ ঝা প্রভৃতিও সদস্য হইয়াছেন। হিন্দীর সহিত অপর সকল রাষ্ট্রের প্রাদেশিক ভাষাগুলিও যাহাতে উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভ করে, আমাদের বিশ্বাস, কমিশন সে বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিবেন।

আসানসোলে নূতন সুতাকল—

পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত ১২ শত উদ্বাস্তুকে কর্মদানের জন্য আসানসোল সূর্য্যনগরে একটি নূতন সুতাকল স্থাপন করা হইবে। সে জন্য ভারত সরকারের পুনর্বাসন বিভাগ স্থানীয় আদর্শ কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলকে ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ ভাবে দেশের সর্বত্র বহু সংখ্যক কল কারখানা স্থাপিত হইলে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হইবে ও দেশের অর্থনীতিক সমস্যার সমাধান হইবে।

দার্জিলিংয়ে জন সমাগম—

এ বৎসর পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১২ই মে দার্জিলিং যাইয়া ১০ই জুন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। ঐ

সময়ের মধ্যে ২ বার দার্জিলিংয়ে মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইয়াছে এবং রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন তথায় যাইয়া কয়দিন থাকার ফলে একমাস কাল দার্জিলিংয়ে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল। দার্জিলিংয়ে বহু লোক গাইলে স্থানীয় অধিবাসীরা নানাভাবে উপকৃত হইয়া থাকে—তাহাদের আর্থিক লাভও কম হয় না।

পশ্চিমবঙ্গে নূতন ব্যবস্থা—

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য দুইটি নূতন বিভাগ খুলিয়া কাজ করিতেছেন—একটি গৃহ-নির্মাণ বিভাগ—মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের উপর সেই বিভাগের কার্য্যভার অর্পণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সমাজ-সেবা বিভাগ—স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাজ্যমন্ত্রী ডাক্তার জীবন রতন ধরের উপর সমাজ সেবা বিভাগের কার্য্য-ভার দেওয়া হইয়াছে। খগেন্দ্রবাবু ও জীবনবাবু উভয়েই খ্যাতনামা দেশ-সেবক—তাঁহাদের দ্বারা ঐ কার্য্য উপযুক্ত ভাবে সম্পাদিত হইবে বলিয়া সকলে আশা করেন।

অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা—

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে বলা হইয়াছিল ১৯৬০ সালের মধ্যে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সকল ভারতীয় বালক বালিকার জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইবে। কিন্তু নানা কারণে ঐ সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা যাইবে না। ১৯৬৬ সাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ আরও ৬ বৎসর পরে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন করা হইবে। শিক্ষা সমস্যাই দেশের প্রথম ও প্রধান সমস্যা। বিলম্বে হউক, তাহা সম্পূর্ণ করিতে সরকার যে সচেষ্ট হইয়াছেন, উহাই আশা ও আনন্দের কথা।

ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক—

গত ১লা জুলাই হইতে ভারতে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার পরিচালনের জন্য ভারত সরকার ভারতের প্রাক্তন অর্থ-মন্ত্রী ডাঃ জন মাথাইকে সভাপতি করিয়া ও ২০ জন সদস্য লইয়া নূতন পরিচালক বোর্ড গঠন করিয়াছেন। বোম্বাই সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীবৈকুণ্ঠ লাল মেহতা সহ-সভাপতি হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ হইতে নিম্নলিখিত ৫ জন সদস্য লওয়া হইয়াছে—(১) অধ্যাপক এ-কে দাশ গুপ্ত (২) শ্রীশচীন্দ্র চৌধুরী (৩) শ্রীবদ্রীদাস গোয়েঙ্কা (৪) শ্রীসত্যপাল বীরমানি ও (৫) শ্রী সি-এম-ম্যাকিনলে। যে ইম্পিরিয়ান ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে পরিণত করা হইল, ২১ জনের মধ্যে অনেকে সে ব্যাঙ্কের পরিচালক ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ স্থানীয় বোর্ডে নিম্নলিখিত ৩ জন সদস্য হইয়াছেন—(১) শ্রীসুরাজ দাস (২) শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মিত্র ও (৩) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন। নূতন ব্যবস্থায় দেশের অর্থ-নীতিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া সরকার বিশ্বাস করেন।

নদীয়া তাহেরপুরের কর্মকেন্দ্র—

নদীয়া জেলার তাহেরপুরে উদ্বাস্তুগণের জীবিকার্জনের সুবিধা দানের জন্য একটি নূতন সূতাকল স্থাপিত হইবে। তাহাতে ২৩৫০০ টাকু থাকিবে এবং ৬ শত লোক কাজ পাইবে। মিল চালু হইলে ১২শত লোকের কর্মের সংস্থান হইবে। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের পরিচালকগণ আগামী ২ বৎসরের মধ্যে ঐ সূতা কল চালু করিবেন সেজন্য সরকার তাঁহাদের ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছেন। পরিকল্পনা কমিশনের নীতি অনুসারে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কার্য্যে এই ভাবে বহু টাকা ব্যয় করা হইবে। কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবে বৃহত্তর শিল্প প্রতিষ্ঠা দ্বারা ও বেকার সমস্যা দূর করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে দেশবাসী জনগণের পক্ষ হইতে ও আগ্রহ প্রকাশ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

বাংলা পরীক্ষায় চীনা ছাত্রীর কৃতিত্ব—

তানওয়েন নাম্নী বীরভূম বিশ্বভারতীর জনৈকা চীনা ছাত্রী এ বৎসর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় বাংলা অনার্স প্রাপ্তগণের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীমতী তান শান্তিনিকেতনের চীনা-ভবনের অধ্যক্ষ তান য়ুনশানের কন্যা। একজন চীনা ছাত্রীর পক্ষে এই কৃতিত্ব অসাধারণ সন্দেহ নাই।

প্রবীণ সাংবাদিকের সম্বর্দ্ধনা—

গত ৫ই জুন ভারতীয় সাংবাদিক সংঘের সদস্যগণ সংঘের প্রাক্তন সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীমৃণালকান্তি বসুকে এক প্রীতি সম্মিলনে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। কলিকাতা কাশীপুর ২৯নং বিটি রোডে শ্রীবিশ্বনাথ রায়ের বাটীতে ঐ অনুষ্ঠান হইয়াছিল। অনুষ্ঠানে সাংবাদিক সংঘের সভাপতি শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায় সভাপতিত্ব করেন ও সংঘের সম্পাদক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু এক মানপত্র প্রদান করেন। মৃণালবাবু সাংবাদিক-গণের উন্নতি বিধানের জন্য আজীবন কাজ করিয়াছেন। পরিণত বয়সে তাঁহার এই স্বীকৃতি লাভ আনন্দের কথা।

ভারতে চিনি উৎপাদন—

১৯৫৫ সালে ভারতে মোট ১৬ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইবে—ইতিপূর্বে আর কখনও ভারতে এই পরিমাণ চিনি হয় নাই। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ৬ লক্ষ টন বেশী চিনি উৎপন্ন হইতেছে। তাহা ছাড়া গভর্ণমেণ্ট ২১টি নূতন চিনি কল স্থাপনের জন্য লাইসেন্স দিয়াছেন। আগামী ২ বৎসরের মধ্যে ভারতে বার্ষিক ২০ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইবে। কিন্তু চিনির মূল্য না কমিলে কেহই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চিনি ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবে না। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে মূল্য হ্রাসের ব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব—

আশা ও আনন্দের কথা—এ বৎসর কলিকাতা সহরে ও পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে বহু অনুষ্ঠান ও উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব-প্রধান—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক ভিটা—২৪ পরগণা জেলার নৈহাটী—কাঁটালপাড়াস্থ ঋষি বঙ্কিম-গ্রন্থাগার ও সংগ্রহ শালার উৎসব। উক্ত সংগ্রহ শালা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন হওয়ার পর হইতেই তাহার নানাবিধ উন্নতি দেখা যাইতেছে। উক্ত মিউজিয়াম এক্ষণে জনপ্রিয় হইয়াছে ও তথায় প্রত্যহ

বহু দর্শনার্থী সমাগম হইয়া থাকে। সংগ্রহশালা পরিচালন সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক নৈহাটীনিবাসী তরুণ সাংবাদিক শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্নের একান্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠাবান শ্রমে সংগ্রহশালা পরিচালনার ব্যবস্থা সুন্দর হইয়াছে। বর্তমানে তথায় একজন গবেষক ও কয়েকজন সহকারী বঙ্কিম-সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্কিম-সহোদর সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র শ্রীযুত শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নিজগৃহে সংগৃহীত বহু দ্রব্য সংগ্রহশালায় দান করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহার নিকট বঙ্কিম-পরিবারের বহু ব্যক্তির চিত্র সংগৃহীত ছিল—ঐ গৃহে রক্ষিত বহু প্রাচীন গ্রন্থ তিনি এতদিন সযত্নে রক্ষা করিতেছিলেন—তিনি সেগুলি ও কয়েকটি আলমারী—সংগ্রহশালায় দান করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তিনি তাঁহার নিজস্ব একটি গৃহ—যাহা কলিকাতায় অবস্থিত ও যাহার মূল্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা—তিনি সংগ্রহশালাকে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন—ঐ গৃহের আয় হইতে বৎসরে বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের নামে দুইটি পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা হইবে। গত ৩রা জুলাই রবিবার সন্ধ্যায় সংগ্রহশালা ভবনের পূর্বাদিকস্থ মাঠে বিরাট চন্দ্রাতপতলে বঙ্কিম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতির এবং কলিকাতার মেয়র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাধ্যক্ষ শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বর্ষিয়সী সাহিত্যিকা খ্যাতনাম্নী শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী সকলের পক্ষ হইতে ঋষি বঙ্কিমের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। সেদিন সভায় প্রায় দুই সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিলেন এবং প্রধান অতিথি সতীশবাবুর অপূর্ব-ভাষণ শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। সতীশবাবু সারাজীবন গণিতের অধ্যাপক ছিলেন—তিনি যখন অনর্গল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার দীর্ঘ দীর্ঘ অংশ বই না দেখিয়া উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার স্মৃতি-শক্তি ও বঙ্কিম-ভক্তি সকলকে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি প্রায় এক ঘণ্টা কাল এইভাবে সমবেত জনতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সভাপতি শৈলকুমারবাবুও তাঁহার লিখিত অভিভাষণে তাঁহার বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যের সম্যক পরিচয় দান করিয়াছিলেন এবং সকলকে অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের মত বঙ্কিমের লেখা মুখস্থ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ৭৫ বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র সেদিনের সমস্যা সমাধানের যে সকল নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, আজও বাঙ্গালীর সমস্যা সেই একইরূপ আছে—বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ করিলে সে সকল সমস্যার সমাধানের উপায় পাওয়া যাইবে—শৈলকুমারবাবু তাঁহার ভাষণে বার বার সে কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এবারের অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল—খ্যাতনামা গায়ক শ্রীপঙ্কজ মল্লিকের গান। তিনি ঋষি বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ ও অন্যান্য কয়েকটি গান—একা ও সদলে গাহিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। উৎসবে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী, শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, শ্রীরাম সহায় বেদান্ততীর্থ, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতিও সময়োচিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বর্ষা সত্ত্বেও কলিকাতা হইতে বহু লোক উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন এবং বারাকপুর মহকুমার প্রায় সকল স্থান হইতেই জন সমাগম হইয়াছিল। বঙ্কিম-গৃহ এখন জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে—কাজেই এই উৎসব জাতীয়-উৎসব। ঋষি বঙ্কিমের গৃহ-বাঙ্গালীর তীর্থক্ষেত্র। আমাদের বিশ্বাস, ক্রমে এই স্থান তীর্থের মত যাত্রী আকর্ষণ করিবে ও দেশবাসী ঋষি বঙ্কিমের সাহিত্য হইতে প্রেরণা সংগ্রহ করিয়া জয় যাত্রার পথে অগ্রসর হইবে।

নিখিল বঙ্গ সাময়িকপত্র সংঘ—

দৈনিক সংবাদ-পত্রগুলির অভ্যুদয়ের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক প্রভৃতি সাময়িকপত্রগুলি গত মহাযুদ্ধের সময় বিপন্ন হইলে কয়েকজন উৎসাহী কর্মীর চেষ্টায় এই সংঘ গঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি আবার কয়েকটি ঘটনার ফলে সাময়িকপত্রগুলির বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে এবং সে জন্য সাময়িকপত্রগুলিকে রক্ষার উপায় নিরূপণের ব্যবস্থার জন্য সাময়িকপত্রসংঘের কর্মীরা গত কয় মাস হইতে তৎপর ও সচেষ্ট হইয়াছেন। সেজন্য গত ২ মাসের মধ্যে রূপমঞ্চ, মাসিক বসুমতী ও সাপ্তাহিক বিশ্ববার্তা কার্যালয়ে সংঘের সদস্যদের তিনটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে ও তাহাতে "ইষ্টার্ণ এণ্ড ইণ্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটীর" সভাপতি শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ, শনিবারের চিঠির সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাস, মাসিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক প্রভৃতি সমস্যাসমূহের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া তাহার প্রতীকারের কথা প্রস্তাব করিয়াছেন। সংঘের বর্তমান সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তিনটি সভাতেই সভাপতিত্ব করেন এবং বর্তমান-সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী একে একে সাময়িক-পত্রের কাগজ-সরবরাহ সমস্যা, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ সমস্যা, সরকারের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করিয়া সরকারী সমর্থন ও সাহায্য লাভ সমস্যার কথা বিভিন্ন সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। সুখের কথা, সকল সাময়িক-পত্রের কর্মীই এই সংঘকে শক্তিমান করিয়া তুলিতে উৎসুক হইয়াছেন এবং সেজন্য একদিনের সভায় ১১ শত টাকা এককালীন দানের স্বীকৃতি ও পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গদর্শন ও তাহার পূর্ববর্তী কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সাময়িক পত্রগুলিই এদেশে সাহিত্য ও কৃষ্টি প্রচারে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছে—যখন দৈনিকসংবাদপত্রের যুগ আসে নাই—তখন ইহারাই সংবাদ সরবরাহের কাজও করিয়াছে। কাজেই আজ সাময়িক পত্রগুলির বিলুপ্তি যাহাতে না ঘটে, সেজন্য চেষ্টা করা দেশ-বাসী মাত্রেরই কর্তব্য। এই সংঘ যাহাতে তাহার কর্তব্য পালনে সমর্থ হয়, সেজন্য সংঘের সদস্যগণের সহিত দেশবাসী পাঠক সাধারণকেও আমরা অবহিত হইতে নিবেদন জানাই।

রবিবাসরের ষড়বিংশ বর্ষ—

রবিবাসর কলিকাতা সহরের সাহিত্য-সেবিগণের একটি প্রসিদ্ধ মিলন-ক্ষেত্র। গত ১৩৬১ সালে ইহার বয়স ২৫ বৎসর হওয়ায় সারা বৎসর ধরিয়া ২৪টি বিশেষ ও সাধারণ অধিবেশনে আড়ম্বরের সহিত ইহার 'রজত জয়ন্তী' বৎসর পালন করা হইয়াছে। প্রতি ১৫ দিনে একটি করিয়া অধিবেশন হয়, কাজেই ছুটী বাদ দিয়া বৎসরে ২৪টি সভা হইয়া থাকে।

সভ্য সংখ্যা ৫০ জনে সীমাবদ্ধ ও প্রত্যেক সভ্যের গৃহেই পালাক্রমে সভা বসে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার অধিনায়ক ছিলেন—তিনি শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণে নিজে ইহার সভা আহ্বান করিয়াছিলেন ও সুযোগ পাইলেই রবিবাসরে উপস্থিত হইতেন। ভারতবর্ষ—সম্পাদক স্বর্গত জলধর সেন মহাশয় ইহার প্রথম সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার পরলোকগমনের পর গত ১৬ বৎসর কাল অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ইহার সর্বাধ্যক্ষ আছেন। ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺প্রফুল্লকুমার সরকার, ৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ৺মৃণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, ৺পঞ্চানন নিয়োগী প্রমুখ বহু সুধী সাহিত্যিক তাঁহাদের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রবিবাসরের সদস্য ছিলেন। খ্যাতনামা লেখক ও সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু গত ২১ বৎসর কাল নিষ্ঠার সহিত রবিবাসরের সম্পাদকের কাজ করিতেছেন। বর্তমান যুগের জীবিত সাহিত্যিকগণ কোন না কোন সময়ে রবিবাসরের সদস্যছিলেন বা উহাতে যোগদান করিয়াছেন। যিনি রবিবাসরে যোগদান করেন, তিনিই উহার সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিরপেক্ষতা দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন। সাহিত্যিকগণের একটি মিলন সভার এত সুদীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন জীবন লাভ করা—ইহার সদস্যগণের পক্ষে ও বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের পক্ষে গৌরবের কথা।

মফঃস্বল সাংবাদিক সম্মিলন—

বর্দ্ধমান জেলা সাংবাদিক সংঘের উদ্যোগে গত ১২ই জুন রবিবার বর্দ্ধমান সহরে বংশগোপাল টাউন হলে পশ্চিমবঙ্গ মফঃস্বল সাংবাদিক সম্মিলন হইয়াছিল। প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সভাপতিত্ব করেন, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ও বর্দ্ধমান জেলা সাংবাদিক সংঘের সভাপতি শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। পশ্চিম বঙ্গের ৮টি জেলা হইতে প্রায় ২০০ জন সাংবাদিক-প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সকাল ৮টা হইতে বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত সভা চলিয়াছিল—উদ্যোক্তাগণ স্থানীয় কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক লইয়া মোট ৪শত লোকের প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মফঃস্বলের সাময়িকপত্রসমূহের কর্মীরা ছাড়াও দৈনিক সংবাদপত্র সমূহের মফস্বল সংবাদদাতারা ও বহু সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণ মুদ্রিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসের বহু উপকরণ সন্নিবিষ্ট ছিল। বর্দ্ধমানবাসী সাংবাদিক শ্রীআবদাস সত্তর, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীদাশরথী তা, শ্রীশ্রীকুমার মিত্র প্রভৃতির যত্নে ও চেষ্টায় সম্মিলন সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল। সম্মিলনে বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা ও সে সকল বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। একটি স্থায়ী মফঃস্বল সাংবাদিক সংঘ গঠনের উদ্দেশ্যে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে সভাপতি ও বর্দ্ধমানের শ্রীশ্রীকুমার মিত্রকে আহ্বানকারী করিয়া এবং উপস্থিত ৮টি জেলার প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে ৮ জন প্রতিনিধি লইয়া একটি অস্থায়ী কমিটী গঠিত হইয়াছে। ঐ কমিটী সংঘের সংবিধানাদি রচনা করিয়া আগামী সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কৃষ্ণনগরের সভায় উপস্থিত করিবেন। সকল শ্রেণীর কর্মীদের সংগঠনের সহিত আজ সাংবাদিকগণের নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করিবার জন্য সংঘগঠনের প্রয়োজন সকলে অনুভব করিতেছেন। শুধু বেতনের পরিমাণ বা হার লইয়া নহে, মফস্বলের সংবাদপত্রগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া তাহাদের দ্বারা প্রকৃত জনসেবার কাজ করাইয়া লওয়া সংঘ গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনহিতকর কার্য্যগুলির প্রচারের দ্বারা দেশের লোকের মনোভাব পরিবর্তনের ভার যেমন মফঃস্বলের সাময়িকপত্রগুলি গ্রহণ করিবেন, তেমনই সরকার পক্ষ হইতে তাহাদের রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও করিতে হইবে। দেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মফস্বলের পত্রগুলির দায়িত্ব ও কর্তব্য বাড়িবে—দৈনিক পত্রগুলির সংবাদদাতাদেরও শিক্ষা ও সতর্কতার প্রয়োজন হইবে।

গীতায় অহিংসা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

সতাই তো দেখা যায় শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার মূল আদেশ যুদ্ধের। অথচ মহা-ভারতের এই শ্রেষ্ঠাংশে অহিংসা, নির্ব্বৈরিতা, শত্রুমিত্রে-সম-দৃষ্টি প্রভৃতি আচরণের আদর্শ অতি স্পষ্ট এবং দৃঢ় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে মানবকে। এ উভয়বিধ শিক্ষা কি পরস্পর-বিরোধী?

কোনো শিক্ষকের নির্দ্দেশ বুঝতে হলে আবশ্যক সম্যক দৃষ্টি। আংশিক জ্ঞান সমৃদ্ধ করেনা বুদ্ধিকে। অহিংসা সম্বন্ধে গীতায় বর্ণিত সকল কথা না বুঝলে সম্যক জ্ঞান অসম্ভব। তাই অহিংসা ও শান্তির স্বপক্ষে যত কথা উক্ত হয়েছে সকলগুলিকে সংশ্লেষণ করলে তবে বোঝা যাবে গীতার অন্য শিক্ষার সাথে অহিংসা নীতির সার্থক সমন্বয় কোথায়। এরূপ পূর্ণ দৃষ্টির ফলে সমন্বয়ের চেষ্টা হবে সরল, সিদ্ধান্ত হবে শুদ্ধ।

যুদ্ধ হিংসা। লোক-ক্ষয় প্রাণ-ক্ষয়, দেহের নাশ। সুতরাং যুদ্ধের মূলে নিহিত হিংসা। ধর্ম্মযুদ্ধের নির্দ্দেশ মাত্র শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় কেন—সর্ব্বশাস্ত্র জুড়ে। ব্রাহ্মণ হতে ক্ষত্রিয়কে আর্য্য সমাজ অবাঞ্ছনীয় স্থান দেয়নি। দুটি পূর্ণ অবতার, শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন ক্ষত্রিয় কুলে এবং শ্রীকৃষ্ণও ছিলেন ক্ষত্রিয়। যুধিষ্ঠির, ভীষ্মদেব প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে নীতি বিবৃত করেছেন, সে নীতিই ভারতের ধর্ম। জাতীয় সংস্কৃতি ধর্ম। জাতীয়তা বা ধর্ম সংরক্ষিত হতে পারে না যুদ্ধ ব্যতিরেকে। মাত্র জীবনরক্ষা মানুষের পক্ষে অসম্ভব—দল না বাঁধলে, সঙ্ঘ না গড়লে। সমাজ গড়া প্রথম প্রয়োজন নরজাতির পৃথিবীতে বাস করবার সংকল্পে। শৃঙ্খলিত সমাজ অসম্ভব—সমাজের লোক নিয়মের অধীন না হলে। পরস্পরের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহারে সঙ্ঘের উন্নতি সম্ভব তার নিয়ম করেছে আদিকাল হতে চিরদিন মানব-গোষ্ঠী। মাত্র জীবনধারণের প্রয়োজন অতিক্রম করে মানুষের জ্ঞান—তাই সুষ্ঠু হতে সুষ্ঠুতর ব্যবহারের বিধান করে রাষ্ট্র। উন্নত-জীবনধারাকে ভারতীয় ভাষায় এককথায় বলা হয় ধর্ম। ক্ষত্রিয়ের আদর্শ ধর্ম—ধর্ম যুদ্ধ। ধর্মের সাধন কৃষ্টি এবং তার অন্তর্নিহিত আদর্শ জাতীয় সংস্কৃতি।

জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন আহার। জাতীয় সংস্কৃতি তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রজাবৃদ্ধি মানুষের আদিম বৃত্তির প্রেরণা। কিন্তু প্রত্যেক সমাজ স্ত্রী-পুরুষের মেলা-মেশা, ব্যবহার ও পরস্পরের প্রতি আচরণের নিয়ম প্রবর্ত্তন করে, সঙ্ঘের কল্যাণে, নিজ নিজ সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান সদাচারের প্রয়োজন অনুসারে। মানুষ পদার্থ সংগ্রহ করে প্রথমে প্রকৃতির ভাণ্ডার হতে। ক্রমশঃ বিনিময় শ্রম-শিল্প এবং বাণিজ্যের দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে প্রকৃতির দান পরিবর্ত্তিতরূপে সমাজে। এ বৈশ্য ধর্মও সমাজের ধর্ম। তাকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজ আদিম বৃত্তির সংযমে।

সকল বিষয়ের ধর্ম বুঝতে গেলে সমাজের প্রধান আদর্শকে বুঝতে হয়। একটি আচরণ নিয়ে সমাজের বিচার—অবিচার। ভারতের মূল নীতি—ধর্মের প্রধান আদর্শ অহিংসা। অথচ সারা বিশ্ব যখন এক আদর্শে জীবনপালন করেনা, তখন মানবের আদিম প্রবৃত্তি হিংসাকে মানতেই হবে। এই দুই স্রোতের সমন্বয় অসম্ভব তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করলে।

সমাজের নিয়ম যে মানে না সে অপরাধী। দণ্ড ব্যতীত অপরাধ লোপ করা অসম্ভব। এমন কোনো সমাজ কল্পনা করা যায় না যেথায় প্রত্যেক লোক হবে ধর্মপ্রাণ। হিংসা ও প্রতিহিংসা নির্মূল করা অসম্ভব মানব সমাজে। পরিবারে স্নেহশীল আত্মীয়স্বজন, জনক জননী, শিশু ও তরুণকে শাস্তি দেয় তাদের প্রতি স্নেহের তাড়নায়। তপস্যায় নিজের দেহ এবং চঞ্চল মনকে কষ্ট দিতে হয় সাংসারিক সাফল্যের আশায়। দেহের কষ্ট অনিবার্য্য ভগবানলাভের পথে। কৃচ্ছ্র-সাধনের তো কথাই নাই।

যাকে হিংসার কার্য্য বলে মনে হয় সহজ দৃষ্টিতে—সূক্ষ্ম বিচারে বহুক্ষেত্রে তাকে মনে হয়না হিংসা। কারণ প্রকৃত হিংসার মূলে থাকে নির্দ্দয়তা। হিংস্রক আনন্দ পায় পরের উৎসাদনে। পরের কষ্টে হিংসার সুখ এবং পরকে ক্লেশ দেওয়াই হিংসার মুখ্য উদ্দেশ্য।

জীবনের সকল কর্মের মতো যুদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যকে বিচার করতে হয় উদ্দেশ্য এবং কর্ম প্রণালীর মাধ্যমে। চিকিৎসক যখন পরের দেহে অস্ত্রোপচার করেন, তিনি বোঝেন যে তাঁর কর্ম কষ্ট দিবে রোগীকে। কিন্তু তাঁর অন্তরে বিদ্যমান শুভ সংকল্প—রোগীর দেহের ক্লেশ অপনোদনের এবং তার নিরাময়তার। রোগীর মঙ্গলের জন্যই সময় বিশেষে তার দেহের কোনো অবয়বের অঙ্গচ্ছেদ করেন চিকিৎসক। তাঁর কর্ম হিংসা-প্রণোদিত নয় একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। চিকিৎসকের কর্ম হিংস্রকের কু-কর্ম হতে পারে যদি তিনি অন্যের প্ররোচনায় কোনো অবৈধ উদ্দেশ্য নিয়ে অস্ত্রচালনা করেন।

এ নীতি সমর-নীতিতেও প্রযুজ্য। গীতার নীতি বিচার করতে গেলে তার সকল শিক্ষার সংশ্লিষ্ট অভিপ্রায় বিবেচনা প্রয়োজন। সংসারের পরিবেশ অদ্যাবধি কোনো জনসমাজে এমন কোনো অবস্থার সৃষ্টি করেনি যার ফলে কোনো দিন মানুষের কোন কর্ম অন্য জীবের দেহের ক্লেশ দিবে না। মানুষের আদর্শের এবং কর্মধারার বাহুল্য চিরদিন বিদ্যমান। তাই একান্ত সাধু প্রকৃতিও আপনাকে রক্ষা করতে পারেনা অন্যের ক্লেশকর কর্ম হতে, নিজের বৈধজীবনধারা হতে। নির্ব্বৈর মনের ভাব। অহিংসাও মানসিক প্রবৃত্তি।

বহুক্ষেত্রে একের নিগ্রহ একান্ত আবশ্যক বহুর কল্যাণে। সেরূপ নিগ্রহ যদি হয় নির্ব্বৈর মনোবৃত্তির প্রেরণায় সে কর্মকে হিংসাত্মক বলা চলে না। এক নৃশংস ব্যক্তি কোনো নিরীহের প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করছে বা

নারী-নিগ্রহে উন্মত্ত—সে কুকর্ম রোধ করা অসম্ভব সে অপরাধী উন্মত্তের দেহে অস্ত্রক্ষেপ। এ ক্ষেত্রে মনকে হিংসার কুপথে না চালিয়ে পরোপকারের সাধু উদ্দেশ্যে আততায়ীকে শাস্তি দিলে সে শাস্তিকে হিংসুকের কার্য্য বলা চলে না। এক দেশের নির্দয় বিধর্মী জনসঙ্ঘ রণধারা বাহি যদি উন্মাদ কলরবে অন্য দেশ জয় করতে আসে, যে অভিযানের ফলে দেশের সকল কৃষ্টি, সঞ্চিত সম্পদ এবং শিল্প-শোভার উচ্ছেদ অনিবার্য্য। সে ক্ষেত্রে ক্ষাত্র-ধর্ম বর্জনে জগতের ক্ষতি। এ অবস্থায় যুদ্ধ অনিবার্য্য এবং অবশ্য কর্ত্তব্য।

সুতরাং যুদ্ধ মাত্রেই পাপ নয়, হিংসা নয়, যদি সে বিগ্রহ হয় ধর্ম যুদ্ধ। পাপের লীলাভূমি চিত্ত। হিংসার কর্ম-ভূমি মন।

কিন্তু মানুষ যে কাজ করে, তার তো শেষ হয় না কাজের শেষে। গান থামে, সুরের রেশ ঘোরে কর্ণকুহরে। চিত্র চক্ষু হতে অপসারিত হ'লেও তার রূপ ভাসে মনের পটে। কলহ থামলে তার সহগত হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, বিজয়ের দাম্ভিক আত্ম-প্রসাদ, পরাজয়ের অবমান এবং প্রতিহিংসার সঙ্কল্প থাকে চিত্ত ঘিরে। মানুষের ভবিষ্যত চিন্তা ও কর্ম ধারা নির্ণয় করে তো তারাই।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা দিলেন যুদ্ধের পূর্বে। চিত্ত-বিজয়ের ধর্মযুদ্ধ সাধারণ হিতের সদুদ্দেশে রণরতি। যার কর্মফলে স্পৃহা নাই, মানাপমান, লাভালাভ, জয়-পরাজয়ের পরিণাম তার চিত্তকে কলুষিত বা উদ্‌ভ্রান্ত করে না। ভক্তি ও জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত করে চিত্ত। ঈশ্বরে একান্ত শরণ ঐ সব পরিণাম হতে মুক্ত করে যোদ্ধাকে। মাত্র কর্ত্তব্যবোধে পরের হিতের সাধু-সংকল্প হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করলে ধর্ম-সমর হয় কর্ত্তব্য মাত্র। অর্জ্জুনের মোহ নষ্ট হয়েছিল সমগ্র গীতা শুনে। বিশ্ব-রূপ দর্শনের সৌভাগ্যে অর্জ্জুন বুঝেছিলেন ভগবানের বিচারে যারা নিহত, নিমিত্ত-মাত্র হয়ে পাণ্ডুপুত্রকে বধ করতে হবে তাদের।

সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত যে যুদ্ধ পাপ হিংসা নয়, যদি শুদ্ধ চেতনার প্রেরণা থাকে চিত্তের পটভূমিতে যুদ্ধের প্রারম্ভে। নিহতের সাথে নিজের যোগসূত্রের সন্ধান পেলে যুদ্ধে পরের প্রাণনাশের হয় দেহের ব্রণে অস্ত্রোপচারের সমতুল কর্ম।

যে আচরণ ব্যক্তি জীবনে সত্য, সঙ্ঘ-জীবনেও তার আদর্শ অনুকরণীয়। শান্তি-কামী রাষ্ট্রনেতার পক্ষে অশান্ত বৈরিতা পাপ! নিজের রাষ্ট্রের ক্ষতি-সাধন, তার অবাঞ্ছনীয়। অন্য রাষ্ট্রের সাথে বৈরিতার অবিসম্বাদী পরিণাম নিজ সমাজের লোকের ক্ষতি—প্রাণ, মন, ধন সকল বিষয়ে। যদি আপামর সাধারণ সদাচারী বা শান্তিকামী হয় অভ্যাস ও সুশিক্ষার ফলে, রাষ্ট্র-পরিচালক জনসাধারণকে শান্তির পথে পরিচালনা করতে পারে সহজে। ইহাই-মনুষ্য ধর্ম, সঙ্ঘ-নীতি। মানুষের চরিত্র গঠিত হয় তার দৈনিক কর্মে এবং চিন্তায়। অভ্যস্থ আদর্শ পরিণামে সাধারণ প্রজাকে উচ্চ-ভূমিতে উন্নয়ন করে।

অর্জ্জুন ছিলেন সেনা-নায়ক। তাঁর আজ্ঞায় সমগ্র পাণ্ডব-বাহিনীর সমর-ধারা হতেছিল নিয়ন্ত্রিত। তিনি নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করলে, ধর্ম-যুদ্ধ হত হিংসা-উন্মত্ত বধ্য-ভূমি। আমরা ইতিহাসে যত নৃশংসতার কাহিনী পাঠ করি, সে সব নিষ্ঠুরতার জন্য দায়ী সাধারণ সৈনিক অপেক্ষা পশু-প্রাণ সেনানায়ক। গীতাই বলেছেন—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন যেমন কর্ম করেন, সাধারণ ব্যক্তিও তেমনি কর্ম করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা প্রমাণ করে, জনসাধারণ তা' অনুবর্ত্তন করে।*

অর্জ্জুনকে যদি আমরা সেনা-নায়কতার প্রতীক বিবেচনা করি, তা হলে বুঝতে বিলম্ব হয় না যে শান্তিকামী সকল রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য, রাষ্ট্র-পরিচালক, সেনা-নায়ক, দলপতি, গোষ্ঠীপতিকে অহিংসা শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষার বিস্তার হলে সুশিক্ষা দেশবাসীর উপরের স্তর ভেদ ক'রে নিম্নস্তরে পৌছতে পারে। কারণ মহাজনের পথে চলে দেশের সাধারণ লোক।

মাত্র দর্শন ও নীতি বিবৃত করে শ্রীকৃষ্ণ অহিংসার উপদেশ সমাপ্ত করেন নি। তিনি চরিত্র গঠনের উপযোগী বিধানের তালিকা দিয়েছেন। আস্তিক্য-বুদ্ধি মেনে নিয়েছেন গীতা। যে ব্যক্তি ঈশ্বর মানে সে ভগবানের প্রিয় হতে চায় নিঃসন্দেহ। তাই আস্তিক্য-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিকে উৎসাহ দেবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সদাচারের তালিকা দিয়াছেন বহুস্থলে। অহিংসার প্রসঙ্গে আমরা তাদের অনেকগুলি হতে জীবনের মূল নির্বৈর পথের নির্দেশ পাই। তেমন বিধি-নির্দিষ্ট সাধনায় জগতের হিত-সাধন অবশ্যম্ভাবী। জগদ্ধিতায় কর্ম শান্তির জনক।

সমগ্র গীতাশাস্ত্রের পূর্ণ আলোচনার ফলে এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করতে হয় যে ক্ষত্রিয়ের প্রাণে যুদ্ধ-প্রেরণার সাথে যে মূল ধর্ম'প্রেরণার আদর্শ বিবৃত করা হয়েছে—তাদের সমন্বয় অহিংসার পোষক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সার শ্লোক মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকলে হিংসা অসম্ভব।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।১১।৫৫

হে পাণ্ডব যে ব্যক্তি আমারি কর্ম করছে এই বুদ্ধিতে কর্ম করে, আমিই পরম গতি এ ভাব পোষণ করে, সর্বপ্রকারে সর্ব্বোৎসাহে আমাকেই ভজনা করে, যে আশক্তিবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে নির্বৈর, সে আমাকে প্রাপ্ত হয়।

* গীতা—২।২১

শুভ কর্মপথে

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সে এক আশ্চর্য ইতিহাস।—
প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে প্রত্যাসন্ন মৃত্যুর আভাস
দিকে দিকে সঞ্চারিত; মুহ্যমান জাতির জীবন
অখণ্ড হৃদয়-পিণ্ডে অস্ত্রাঘাতে জাগিছে কম্পন।
সেথায় বেদনা ছিল পুঞ্জীভূত পর্বত প্রমাণ
রুদ্ধ-অশ্রু সাগর সমান
আত্মার আত্মীয় তরে—
নৈরাশ্যে বৃথায় সেথা গিয়েছিল ঝরে'।

দেখিনু সে বেদনার অভ্রভেদী প্রজ্বলন্ত শিখা,
উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে দেখিলাম লিখা
আসন্ন প্রবল বন্যা আলোড়িত সংক্ষুব্ধ সাগরে,
আরো দেখিলাম লেখা অগ্নির আখরে
আগামী-দিনের আশা ঊর্ধ্বমুখী সহস্র শিখায়
হিতব্রতী সাগ্নিকের আহুতির লুব্ধ প্রতীক্ষায়।

তুমি সেই সাগ্নিক প্রধান,
দাঁড়াইলে অগ্রসরি' যেথায় সহস্র প্রাণ
রুদ্ধশ্বাসে গণিছে প্রহর
আসন্ন ধ্বংসের মুখে অন্তরাত্মা কাঁপে থরথর।
রক্তের প্লাবন শেষে অহিংসার মন্ত্রপূত বাণী—
হে সাগ্নিক, কমণ্ডলু ভরি' দিলে আনি
মহাসত্য মহাজীবনের
মৃত্যুরে অমর করা শুভ সংকল্পের।
তোমার সে গুরু মহারাজে—
অন্তরে রেখেছ তুমি তোমার সকল প্রিয় কাজে।

তাইত অনলে দিলে দ্বেষ হিংসা স্বার্থের আহুতি
হিতব্রতে তাই তুমি নেহারিলে অলৌকিক দ্যুতি;
নদ নদী পথে ও প্রান্তরে
শস্যক্ষেত্রে স্বর্ণশোভা, শ্যামশোভা বনে বনান্তরে
সেই দ্যুতি উদ্ভাসিত। সম্মুখে তোমার
নিত্য খুলিতেছে দেখি কল্যাণের দক্ষিণ দুয়ার।

সহস্র জীবন হ'তে সমিধ সংগ্রহ করি আনি
সহস্রের হিতব্রতে যুড়ি দুই পাণি
তোমার আহুতি দান শুচিশুদ্ধ মনে
আহ্বানিছে জনে জনে
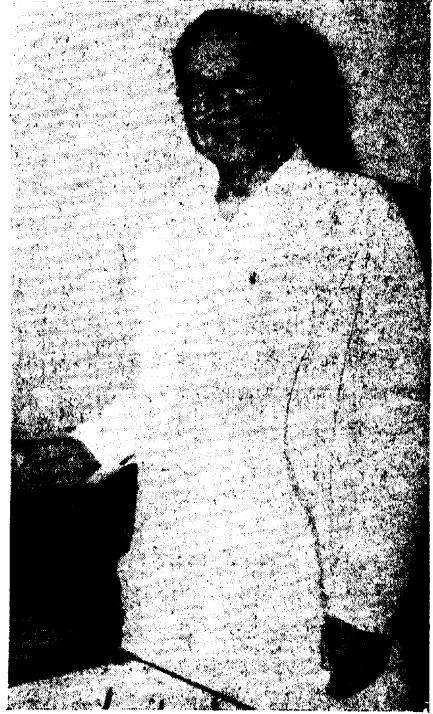
শ্রীবিধানচন্দ্র রায়

শুভ কর্মপথে আর নব ইতিহাস রচনায়;—
যাহা ছিল কল্পনায়
যাহা ছিল আশার মুকুলে
অসম্ভব ভাবি' যাহা গিয়েছিনু ভুলে,

আজি তাহা রূপে রসে বিচিত্র বলিয়া মনে হয়
শুভ কর্মপথে আজ হেরিতেছি নব অভ্যুদয়।

দুর্যোগ কাটিয়া গেছে অন্ধকার অন্তর্হিত প্রায়
আজিকে সহস্র প্রাণ তোমারে জানায়
অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধার প্রণতি।
আজিকে ঝড়ের গতি
সুসংহত তোমার জীবনে,
অন্তহীন তোমার যৌবনে
চন্দ্র শোভা তরঙ্গিত সুন্দরের মহা মহিমায়
আজিকে দেশের কবি সে সুন্দরে প্রণতি জানায়।
প্রণতি জানায় তোমা তোমার এ শুভ জন্মদিনে ;
তোমারে লইব চিনে
প্রতি মুহূর্তের কাজে প্রতি মুহূর্তের জন্মক্ষণে—
নূতন হইয়া তুমি দেখা দিবে—
নব অন্বেষণে।*

* ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চতুঃসপ্ততিতম বৎসর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে—১৯৫৫, ১লা জুলাই লিখিত।

শ্রীচন্দন গুপ্ত
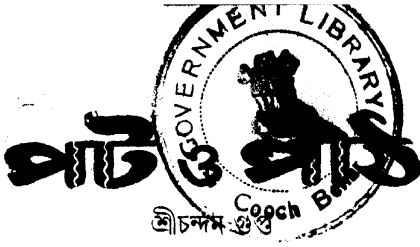
আমেরিকার খ্যাতনামা চিত্রনাট্য-রচয়িতা ও লেখক মিঃ বার্ট হার্ডি এণ্ড্রুজ টোকিও, হংকং, ব্যাঙ্কক্, রেঙ্গুন, কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, কলম্বো, সিঙ্গাপুর এবং ম্যানিলা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি নিউইয়র্ক টাইম্স্-এ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, টোকিও হইতে বোম্বাই এমন কি সমগ্র এশিয়ায় আমেরিকান্ ছবির দর্শক সংখ্যা দিনদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। মিঃ এণ্ড্রুজের পরিভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, গৌতম বুদ্ধের জীবনেতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা। মেট্রো গোল্ডউইন মায়ার্স ছবিখানির প্রযোজনা করিবেন।

* * *

মিঃ টেনিসি উইলিয়াম্স্ লিখিত "Cat on a Hot Tin Roof" নামক নাটকটি নিউ ইয়র্কের নাট্য-সমালোচক মতে ১৯৫৪-৫৫ সালের শ্রেষ্ঠ আমেরিকান নাটক-রূপে বিবেচিত হইয়াছে এবং ১৯৫৫ সালের পুলিট্জার প্রাইজ লাভ করিয়াছে। সঙ্গীত বহুল, নাটক হিসাবে জিন্-কার্লো "The Saint of Blacker Street" এবং আগাথা খ্রীষ্ট্-এর "Witness for the Prosecution" বিদেশীয় নাটকের মধ্যে সমাদর লাভ করিয়াছে।

* * *

গত ৯ই এপ্রিল মেট্রোপলিটন অপেরার ৭০ম অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। এবারে ২৬টী অপেরা দল যোগদান করে। তন্মধ্যে ১৪৭টি অভিনয় হয়। এই অভিনয় আসরে ইতালীয় ভাষায় ১৬টি দল, জার্ম্মান ভাষায় ৫টী দল, ফরাসী ভাষায় ৩টী দল এবং ইংরাজী ভাষায় দুইটি দল যোগদান করে। ওদেশে গীতিবহুল নাটকের সমাদর ও গীতিবহুল নাট্যানুষ্ঠানের

শ্রীমতী দীপ্তি রায়। ষোড়শীর পর এঁকে 'কালিন্দী' কথা-চিত্রে দেখা যাবে

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

উৎসাহ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এক সময়ে আমাদের দেশেও গীতিবহুল :নাটকের বিশেষ সমাদর ছিল কিন্তু

শ্রীমতী শিপ্রা মিত্র। বর্ত্তমানে মঞ্চে 'উল্কা' নাটকে অভিনয় করছেন
ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

বর্ত্তমানে তাহা একরূপ লোপ পাইতে বসিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাত্রায় যে দুই একখানি নাটক পূর্ব্বে অভিনয় হইতে দেখা যাইত তাহাও থিয়েটারের অনুকরণীয় নাটকের প্রভাবে চাপা পড়িয়াছে। অনেকের ধারণা গীতিবহুল নাটকের দর্শকের অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু একথা সত্য নহে। গীতিবহুল নাটক যদি ছায়াছবিতে চলিতে পারে তাহা হইলে নাট-মঞ্চে চলাও সম্ভব। কিন্তু মঞ্চে এই নাটক রূপায়িত করার মধ্যে যে নিষ্ঠা ও সুষ্ঠু পরিচালনার প্রয়োজন বর্ত্তমানে তাহার একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। নাট্যামোদীরা এ বিষয়ে উৎসাহী হইলে একদিকে নাট্যকলা ও অপর দিকে সঙ্গীত সাধনার পথ প্রশস্ত হইতে পারে।

* * * *

হলিউডের বিখ্যাত শিম্পাঞ্জী চিত্রাভিনেতা 'জীপ্পি' তার ট্রেনারের সঙ্গে মাদ্রাজে আসিয়া পৌছিয়াছে। জেমিনীর তিন কোটি টাকার বিরাট ব্যয়বহুল "ইন্‌সানিয়াৎ" নামক ছবিতে অভিনয় করাইবার জন্যই জীপ্পিকে বিমান পথে আনান হইয়াছে। আমেরিকার এই বিখ্যাত শিম্পাঞ্জীটি সম্বন্ধে জানা গিয়াছে যে জীপ্পির মালিক জীপ্পিকে তার দেড় মাস বয়সের সময় ৫০০০ ডলারে কিনিয়াছিলেন এবং জীপ্পিকে ঠিক মনুষ্য শিশুর মতনই মানুষ করেন। জীপ্পির বর্ত্তমান বয়স ছয় বৎসর। তার উচ্চতা ২ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং ওজন ৩৫ পাউণ্ড। জীপ্পি অ-নিরামিষাশী এবং মাঝে মাঝে পান ও ধূমপান করিয়া থাকে। সে বার খানিরও বেশী ছবিতে অভিনয় করিয়াছে এবং প্রায় প্রতিদিনই টেলিভিসন্ প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়া পনের কোটি আমেরিকান শিশুদের আনন্দ দিয়া থাকে। জীপ্পি বেশ পাকা বিমানভ্রমণকারীও। ফিল্ম ও টেলিভিসনে তার
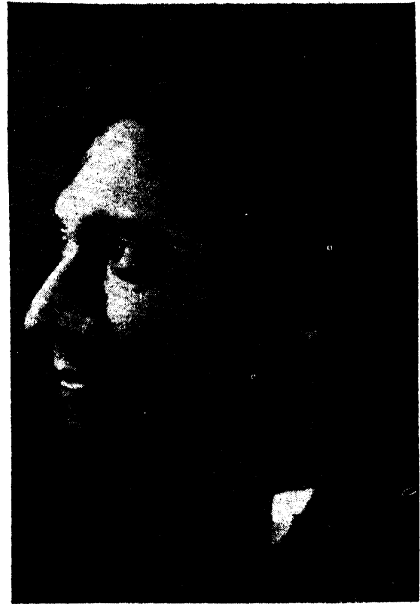
বাংলার শক্তিধর অভিনেতা শ্রীশম্ভু মিত্র। সম্প্রতি ইনি বোম্বাইএর রাজকাপুরের একটি বাংলা বইএর পরিচালন ভার গ্রহণ করেছেন
ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

চাহিদা এত বেশী যে প্রায় প্রতিদিনই তাকে আকাশ পথে আমেরিকা মহাদেশের এধার হইতে ওধারে যাতায়াত করিতে

হয়। জীপ্পির প্রায় দুই মাস মাদ্রাজে থাকিবার কথা আছে। তাকে জেমিনীর একটী বিশেষ শীততাপ নিরোধক অতিথি ভবনে রাখা হইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য। কিন্তু প্রযোজনা ও পরিবেশনার হিড়িক দেখিয়া আশঙ্কা হইতেছে চিত্রশিল্পের অবস্থা 'পুনর্মূষিক ভবঃ' এই প্রবাদ বাক্যের আওতায় না পড়ে।

*　*　*　*　*　*　*　*

সম্প্রতি কলিকাতায় পুনরায় ছবি-মুক্তির যেমন হিড়িক লাগিয়া গিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন ষ্টুডিওতে একসঙ্গে অনেকগুলি নূতন ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ সুরু হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে জুন-জুলাই মাসে সর্ব্বাধিক বাঙ্গালা ছবি মুক্তিলাভ করিয়াছে। একসঙ্গে প্রতি সপ্তাহে দুই তিনখানি করিয়া ছবি মুক্তি পাওয়ায় সাধারণ স্তরের ছবিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যে সকল ছবির বর্ত্তমানে চিত্র-গ্রহণ সুরু হইয়াছে বা চিত্রগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' (পরিচালনা—দেবকীকুমার বসু) এম্-পির 'সবার উপরে' ও সুবোধ ঘোষের 'ত্রিযামা' (পরিচালনা—অগ্রদূত), নারায়ণ পিক্চার্স-এর 'শ্রীশ্রীমা' (পরিচালনা—কালী প্রসাদ ঘোষ), রবিগুপ্ত প্রোডাকসনের কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাদুড়ী-মশাই' (পরিচালনা—প্রফুল্ল রায়), অরোরার প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতক', পরিজাত থিয়েটার্স-এর বিজন ভট্টাচার্য্যের 'দৃষ্টি' (পরিচালনা—চিত্ত বসু) কালিকা ফিল্মস্-এর প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'ব্রতচারিণী', মঞ্জু দে প্রোডাকসনের 'উপহার' (পরিচালনা—তপন সিংহ) প্রভৃতি চিত্রগুলির নাম বিশেষভাবে

সুধাকণ্ঠী শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় তাঁর নেপথ্য সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করেন

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত 'শ্যামলী' নাটকের ৪০০তম অভিনয়ের স্মারক উৎসব গত ৬ই জুলাই অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বাংলা তথা ভারতীয় নাট-মঞ্চের ইতিহাসে 'শ্যামলী'র পূর্ব্বে কোন নাটক এতদীর্ঘ দিন ধরিয়া অভিনীত

হয় নাই। 'শ্যামলী'র ৪০০ তম অভিনয় ভারতীয় নাট-মঞ্চের নূতন রেকর্ড। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চের পক্ষে সত্যই ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার। বর্ত্তমানে 'শ্যামলী' সর্ব্বভারতীয় প্রমোদ-ক্ষেত্রে একটী বিশিষ্ট আসন লাভ করিয়াছে। বহু বিদেশীয় মনীষীগণও ইহার অভিনয় দর্শনে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।
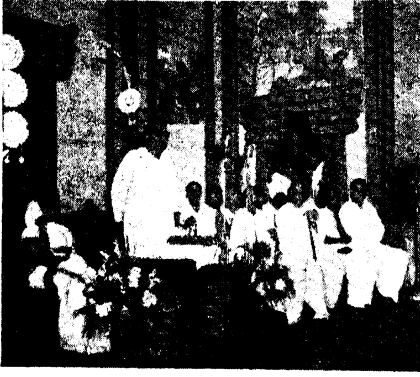
"শ্যামলী" নাটকের ৪০০তম অভিনয়ের স্মারক উৎসবের সভাপতি পশ্চিম-বঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়কে বক্তৃতা করিতে দেখা যাইতেছে

* * * *

সম্প্রতি লণ্ডনে ভারতীয় ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল উপলক্ষে এশিয়ান ফিল্ম সোসাইটী কর্ত্তৃক ছয়টি ভারতীয় চিত্র প্রদর্শিত হয়। 'ঝান্সি-কী-রাণী' উড়ন খাটোলা, মুন্না, শরৎচন্দ্রের পরিণীতা, আঁধিয়া ও অমর ভূপালী এতদুপলক্ষে স্থানলাভ করে। (গত ২১শে জুন হইতে চিত্র প্রদর্শন সুরু হয়। ভারতীয় চিত্রের পৃষ্ঠপোষকরূপে উপস্থিত থাকেন ব্রিটেনের ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও লেডী মাউণ্টবেটেন।

মৃত্যুহীন

সন্তোষকুমার অধিকারী

ক্লান্তি নেই জীবনের, শ্রান্তি নেই একান্ত চলায়,
হতাশার ক্ষোভ নেই, দিগন্তের মৃত্যুর নিঃশ্বাসে।
দৃষ্টির বেদনা নেই সূর্য্যালোক যদি নিভে যায়,
পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার যদি নামে বিশীর্ণ আকাশে।
আমরা জেনেছি মৃত্যু পরিপূর্ণ জীবন সৃষ্টিতে,
জীবন মৃত্যুর বড়; আমরা পেয়েছি পৃথিবীতে
প্রাণের বিচিত্র দীপ্তি; আকাশের নির্লিপ্ত আঁধারে
অগণ্য নক্ষত্র জ্বাল জ্যোতির প্রদীপ্ত আলোভারে।
ক্ষয় নেই আমাদের, আমরা মানিনা পরাজয়;
পাইনি নীড়ের তৃপ্তি মুহূর্ত্তের পরিপূর্ণতায়,
সময় সমুদ্রে ঝড় নামে যদি নামুক: নির্ভয়
আমরা দেখেছি দীপ্ত জীবনের জ্যোতির্ম্ময়তায়।
জীবন মৃত্যুর চেয়ে বড়, প্রাণ অমৃত অভয়,
হৃদয় অনন্ত, দীপ্ত হৃদয়ের মুহূর্ত সময়॥

আসে দিন

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

আরেক দিনের তরে আমাদের সাধনা-সংগ্রাম
মেঘের মিনার ছুঁয়ে নব-সূর্য করি প্রদক্ষিণ,
চেতনার সুখ লয়ে জীবনের অজস্র আরাম,
আমার তোমার তরে জমা করি আলো-ভরা দিন।
বিবর্ণ দিনেরে ঘিরে কল্পনার ব্যর্থ পরিহাস
ধূসর আঁখির-ছায়ে ফিকে রঙ্ আসন্ন মৃত্যুর!
জীর্ণতার রোমন্থনে নাহি দেখি জীবন আশ্বাস
মেঘে মেঘে ভরাক্ষণ, এইদিনে নাহি কোন সুর।
ক্ষয়িষ্ণু দিনেরা থাক! সুরু হোক নতুন সফর;
কাজ নাই বন্ধ আর মিছে কোন রত্ন-সিংহাসনে
ভীড় ঠেলে তুমি এসো, দেখা যায়, প্রত্যক্ষ বন্দর—
আমাদের ঢেউ-তোলা জীবনের প্রেমের ব্যসনে
মেঘলা-রাতের শেষে দেখি এক রৌদ্রময় পথ
ছড়িয়ে হলুদ রোদ আসে দিন, নতুন শপথ॥
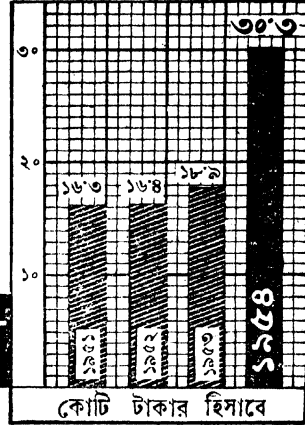
উত্তর কলিকাতা রাজনীতিক সম্মেলন—

গত ৯ই জুলাই শনিবার হইতে তিনদিনব্যাপী উত্তর কলিকাতা জেলা কংগ্রেস রাজনীতিক সম্মেলন ২০নং দমদম রোডে এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শনিবার বিকাল ৫টায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন—তিনি কংগ্রেসকর্মীদিগকে ক্ষুদ্র দলাদলি ও ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভুলিয়া নিরলস কর্মসাধনার দ্বারা দেশের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে আবেদন জানান। তিনি বলেন—"সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তাঁহার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ভাল কাজ করিতে গেলে টাকার অভাব হয় না। প্রয়োজন মানুষের। তিনি মানুষের মত মানুষ পাইয়াছিলেন বলিয়াই বহু প্রতিষ্ঠান অতি ছোট অবস্থা হইতে অনেক বড় হইয়াছে। আজ দেশ গঠনের ডাক আসিয়াছে। দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিয়া তোলার কাজে সেই মানুষেরই প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী।" অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালক শ্রীঅশোককুমার সরকার বলেন—নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা লইয়া নবভারতের গঠন কার্য্যে সকলকে অগ্রসর হইতে হইবে। যে সৌহার্দ্য ও আত্মীয়তা বোধের প্রভাবে উত্তর কলিকাতা কংগ্রেসে বিভিন্ন সমাজের লোক একযোগে ও এক লক্ষ্যে কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নবভারত গঠনে সেই আত্মীয়তা বোধ ও বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত হউক—ইহাই আমি প্রার্থনা করি। ভারতের জনজীবনে ইহা সত্য হইয়া উঠিলে আর কোনো অভাব বা কোন অসম্পূর্ণতা আমাদের অভীষ্টলাভে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি আবাদী কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের সঙ্কল্প ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসকর্মীদিগকে মহান কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান হইবার আহ্বান জানান ও বলেন—পরিবার, সমাজ ও দেশকে সুস্থ সবল করিয়া গড়ার জন্য তাঁহাদের নিষ্ঠার সহিত কাজ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় রেল-মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও কেন্দ্রীয় যোগাযোগ দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীরাজাবাহাদুর সম্মেলনে উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ দিন সকালে কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ তথায় পতাকা উত্তোলন করেন ও সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। সম্মেলনে বহু জনসমাগম হইয়াছিল ও সভাপতিকে পাইকপাড়া রাজবাটী হইতে শোভাযাত্রা ও ব্যাণ্ডবাদ্যসহ সম্মিলন মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কলিকাতায় বহুদিন এ ভাবে সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় নাই।
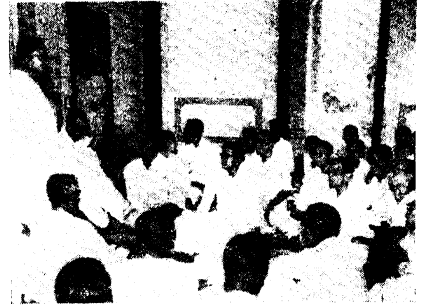
সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বর্ধমানে পশ্চিমবঙ্গ মফঃস্বল সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথি ছিলেন। ছবিতে প্রধান অতিথিকে বক্তৃতা করিতে দেখা যাইতেছে ফটো—শ্রীভোলানাথ দাশ

বৃন্দাবনে বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয়—

আচার্য্য স্বামী বি-এচ-বনের চেষ্টায় ৪ বৎসর পূর্বে বৃন্দাবনে পরমার্থিক বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উহা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নহে—হিন্দু দর্শন ও পরমার্থের গবেষণাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ৮৪ বিঘা জমী লইয়া

উহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে—এখন বিশ্ববিদ্যালয় ভবন ও গবেষণাগার নির্মাণ শেষ হইয়াছে। ছাত্রদের বিনা বেতনে থাকা, খাওয়া ও শিক্ষাদান সম্পর্কে যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করা হয়। এ বৎসর তথায় ডিগ্রি কোর্স শিক্ষাদান আরম্ভ হইয়াছে। ৪ বৎসর শিক্ষার পর আচার্য্য এবং আরও ২ বৎসর শিক্ষার পর ধর্মাচার্য্য উপাধি দেওয়া হইবে। শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্করোত্তর চৈতন্য পর্য্যন্ত ষড়দর্শন সম্পর্কে গবেষণা ও পাঠ ইহার কার্য্য। বর্তমানে শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়াঙ্গার উহার উপাচার্য্য। এই ধরণের ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারক বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে এই প্রথম স্থাপিত হইয়াছে। দেশের জনগণের সমর্থন ও সাহায্য লাভ করিলে ক্রমে উহা উন্নতি লাভ করিবে।
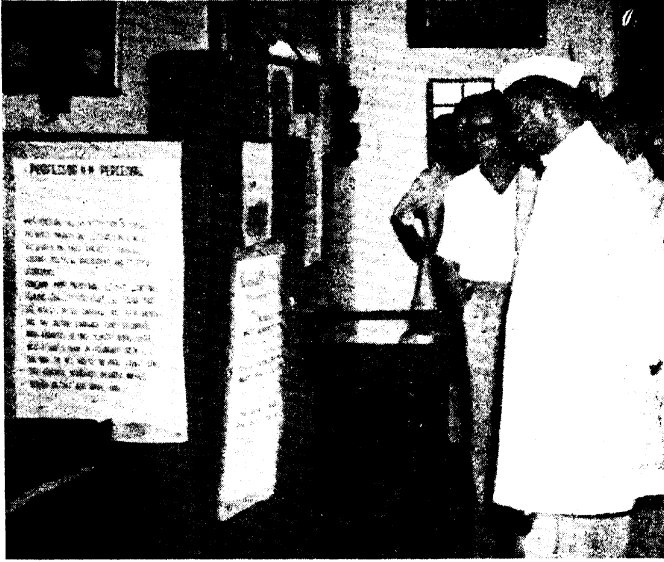
প্রেসিডেন্সী কলেজের শতবার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রদর্শনী দর্শনরত রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

গত ১৬ই জুন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। চিত্রে রাষ্ট্রপতি ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে প্রদর্শনীতে চিত্র দর্শনরত দেখা যাইতেছে

রাষ্ট্রপতির ভাষণ—

গত ১৫ই জুলাই কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবার্ষিক উৎসব আরম্ভ হয়, প্রথম দিনের উৎসবে সভাপতিত্ব করেন—ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তিনি উক্ত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। সেদিন বহু প্রাক্তন ছাত্রের সহিত আচার্য্য যদুনাথ সরকার (বয়স ৮৬ বৎসর), পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এবং কলেজের বর্তমান প্রিন্সিপাল জে-সি-সেনগুপ্ত ও উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন—অন্য সকলে ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা করিলেও ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। তিনি বলেন—"এখানে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি, তার জন্যই আমি দশের সেবায় অল্পস্বল্প কিছু কাজ করতে পেরেছি। আমি তার জন্য এখানকার আচার্য্যদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার সঙ্গী সহপাঠী যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি, তাও কিছু কম নয়। কৃতজ্ঞচিত্তে সেকথা ও আজ স্মরণ করছি।" রাষ্ট্রপতি সভায় ঘোষণা করেন—কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের জন্য তিনহাজার টাকা করিয়া বৃত্তি ও ২টি করিয়া স্বর্ণপদক দান করিবেন।
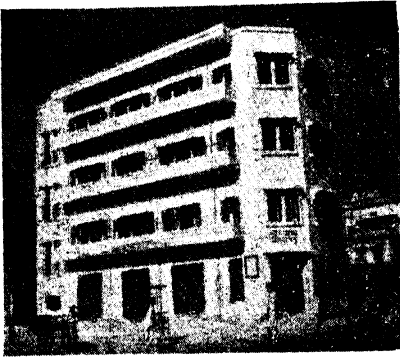
কলিকাতা আপার সার্কুলার রোডে নবনির্মিত ফেডারেশন হল বা মিলন মন্দির

মহামান্য পোপ ও শ্রীনেহরু—

গত ৮ই জুলাই রোমে শ্রীজহরলাল নেহরু মহামান্য পোপের সহিত দেখা করেন ও উভয়ের মধ্যে ২০ মিনিট আলোচনা হয়। তাহার পর শ্রীনেহরু বলিয়াছেন—"পোপ আমার সহিত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে গোয়ার সমস্যা সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিক সমস্যা। গোয়ার সমস্যা ধর্মীয় সমস্যা নহে—মহামান্য পোপ এ বিষয়ে আমার সহিত একমত। ভারতে প্রায় ৭০।৮০ লক্ষ ক্যাথলিক খৃষ্টান বাস করে—গোয়ায় মাত্র ২লক্ষ ক্যাথলিকের বাস। ভারত সকল ধর্মের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করে—কাজেই গোয়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবেই—তাহার পর ক্যাথলিকদের কোন অসুবিধা হইবে না।" গোয়া সমস্যা ও জগতের অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে মহামান্য পোপের সহিত শ্রীনেহরুর আলোচনা হইয়াছে। তিনি ইউরোপ ভ্রমণকালে সকল দলের নেতাদের মতামত জানিয়া লইয়াছেন।

পুরীধামে রথযাত্রা—

ইতিপূর্বে দুই তিন বৎসর একাদিক্রমে পুরীর রথযাত্রায় যে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম দেখা গিয়াছিল এবার তাহাদের

পুরীধামে রথযাত্রার দৃশ্য

পুনরাবৃত্তি না হওয়ায় যাত্রীদের কোন দুর্ভোগ সহিতে হয় নাই। রথযাত্রার দিন যথাসময়ে অনুষ্ঠানাদি আরম্ভ হয় এবং নির্দ্ধারিত সময়ে রথ চলিতে থাকে। রেল কোম্পানী যাতায়াত-ভাড়া সুলভ করায় এবং স্পেশাল ট্রেন দেওয়ায় এবার যাত্রী সমাগম ভালই হইয়াছিল। প্রায় এক লক্ষ লোক সুবিস্তীর্ণ রাজপথের দুই পাশে দাঁড়াইয়া রথযাত্রা প্রত্যক্ষ করেন। অসুখ-বিসুখ—বিশেষ কলেরা-রোগ প্রতিরোধ করিবার জন্য পুরী-পৌরসভা বাধ্যতামূলক কলেরা-টিকার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের উপকার করেন।

লণ্ডনে শ্রীজহরলাল—

শ্রীজহরলাল নেহরু ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করিয়া গত ৮ই জুলাই রাত্রিতে লণ্ডনে গিয়া পৌছিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর অতিথি হইয়া তাঁহার গৃহেই বাস করেন এবং রাত্রিতেই উভয় প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে জেনেভা সম্মেলন ও পশ্চিম এসিয়া পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। ৯ই জুলাই সকালেও উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা চলিয়াছিল। শ্রীনেহরুর সেক্রেটারী শ্রীমেননও ঐ সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ইন্দোচীন পরিস্থিতি ও সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে খণ্ডিত ভিয়েৎনামের পুনর্মিলন সম্পর্কেও উভয় প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে। জেনিভা সম্মেলনের পূর্বে বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ইডেন ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সহিত সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করিয়া স্বদেশযাত্রার পূর্বে শ্রীনেহরুকে বিলাতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলেই উভয়ের সাক্ষাৎ সম্ভব হইয়াছে।

চেকোশ্লোভেকিয়ায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ও তাঁহার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। চিত্রে প্রধান মন্ত্রী নেহরু চেকোশ্লোভকিয়ার প্রেসিডেন্টের সহিত কথপোকথনরত দেখা যায়

সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী বিধান রায়ের সহিত কামারহাটির (২৪পঃ) উইমেনস্ কোঅপারেটিভ ভবন পর্যবেক্ষণ করেন

শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের নূতন গৃহ—

কলিকাতা ল্যান্সডাউন রোডে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন সেবিকা ও কর্মীদের নূতন বিরাট বাসগৃহের উদ্বোধন গত ১৯শে জুন সন্ধ্যায় পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। নূতন গৃহ নির্মাণে মোট ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে—তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দেড় লক্ষ টাকা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০ হাজার টাকা দিয়াছেন—২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দেনা আছে ও বাকী টাকা অন্যভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী দয়ানন্দের চেষ্টায় এই বিরাট কার্য্য সম্ভব হইয়াছে। তথায় এখন ৬০জন ছাত্রীকে সেবিকার কাজ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ কলিকাতার কত গৃহস্থের কল্যাণ করিয়া থাকে, তাহার হিসাব নাই। সন্ন্যাসী কর্মীদের পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান দেশের আদর্শ-স্থানীয়। জন-কল্যাণের কাজে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিবেন, তাঁহাদের এই প্রতিষ্ঠান দেখিয়া তাহার পর কার্য্যারম্ভ করা কর্তব্য।

কালীঘাট কালীমাতার সেবায়েত বংশের অন্যতম সেবায়েত শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ হালদার লক্ষাধিক টাকা মূল্যের তিন খণ্ড ভূসম্পত্তি দেশবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের হস্তে অর্পণ করেন। উক্ত ট্রাষ্ট এই ভূসম্পত্তি অথবা উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ জনগণের চিকিৎসার ও সেবার জন্য ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারিবেন। দেশবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের পক্ষে ডাঃ রায় দাতা শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ হালদারের নিকট দলিল গ্রহণ করেন।

সংবাদপত্রের নূতন ভবন—

কলিকাতা ৬নং সুতারকিন ষ্ট্রীটে আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ পত্রের নূতন ভবনের উদ্বোধন গত ৩রা আষাঢ় শনিবার সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সম্পাদিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় গৃহের উদ্বোধন করেন এবং রাজ্যপাল অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বিশেষ অতিথিরূপে ভাষণ দেন। সে দিন ঐ ভবনে বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক, চিকিৎসক প্রভৃতি সর্বশ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ হালদার দেশবন্ধু স্মৃতি ভাণ্ডারে প্রায় লক্ষটাকার সম্পত্তি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের হস্তে দান করিতেছেন

ফটো—প্রভাত হালদার

সমাজ সেবায় দান—

বিগত ২৬শে জুন ১৯৫৫ রবিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের গৃহে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে

১৯২২ সালের ১৩ই মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়—তদবধি উহা দেশ ও দশের সেবা করিয়া মহান ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়াছে। দেশবাসীর সমর্থন

লাভ করিয়া যে আনন্দবাজার পত্রিকা আজ সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকে পরিণত, তাহার নিজস্ব সুবৃহৎ গৃহের উদ্বোধন দেশবাসী সকলেরই আনন্দের বিষয়। ঐ দিন পুরাতন বন্ধুরা সকলেই আনন্দবাজারের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও প্রফুল্লকুমার সরকারের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়াছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা সংবাদপত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হউক—সকলেই ইহা কামনা করে।

পরলোকে মৃণালিনী সেনগুপ্তা—

গত ২৭শে জুন সোমবার লেডি ব্র্যাবোর্ণ কলেজের অধ্যাপিকা মৃণালিনী সেনগুপ্তা পরলোকগমন করিয়াছেন।

মৃণালিনী সেনগুপ্তা

তিনি স্বর্গত রায় বাহাদুর কমলানাথ দাশগুপ্তের কনিষ্ঠা কন্যা এবং শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের পত্নী ছিলেন। ১৯২২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি বাংলায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পাশ করেন। এম-এ পাশ করার পর তিনি ডক্টর এস-কে-দে, এম-এ, ডি-লিট মহাশয়ের অধীনে গবেষণা করিতে থাকেন। তাঁর গবেষণার বিষয় বস্তু ছিল প্রাচীন 'ভারতীয় ধর্মের আদর্শ ও তাহার পটভূমি'। এ বিষয়ে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের সহিত জড়িত ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে বর্ধমান উইমেনস্ কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী, চারিটি পুত্রকন্যা ও বহু আত্মীয় পরিজনকে রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবার-বর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই ও তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে জ্যোতি বাচস্পতি—

গত ১৬ই আষাঢ় বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও হস্তরেখা-বিশারদ, নাট্যকার, লেখক, সুপণ্ডিত জ্যোতি বাচস্পতি

জ্যোতি বাচস্পতি

সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭১ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি মাসফল, লগ্নফল, রাশিফল, ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র, হাতদেখা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ এবং 'নিবেদিতা'—'সমাজ'—'বিধিলিপি' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। তিনি 'বিধিলিপি' ও 'এ দেশের কথা' মাসিক পত্রিকার বহুদিন সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার

রচনাবলী 'সবুজপত্র', 'ভারতবর্ষ', 'মৌচাক' প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহা ইংল্যাণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। তিনি তন্ত্র, দর্শন, জ্যোতিষ এবং ব্যাকরণ সম্বন্ধে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বহু গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র, এক কন্যা এবং বহু নাতি নাতনী ও আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।
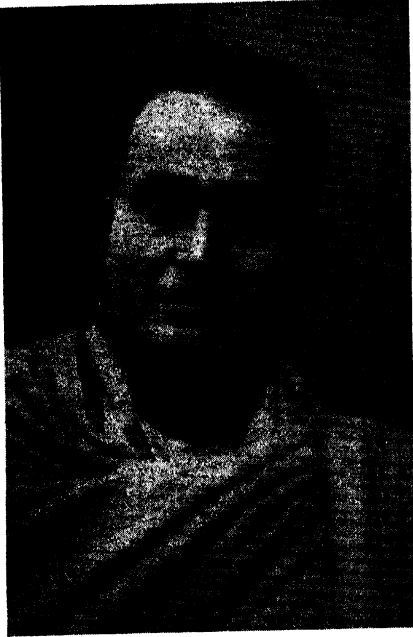
পরলোকে বিজয়রত্ন মজুমদার (গত সংখ্যার সাময়িকীতে ইঁহার সম্বন্ধে লেখা প্রকাশিত হইয়াছে)

রাষ্ট্রপতি ও শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী—

রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্প্রতি ২ দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তিরোধান দিবসে তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী বর্তমানে কালীঘাট নফর কুণ্ডু লেনে নিজবাটীতে বাস করেন। রাজ্যপাল ডাক্তার হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ও রাষ্ট্রপতির সহিত তথায় গমন করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ দ্বারা দেশবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইতেছে।

'ভারতবর্ষের' লেখিকা ও 'মহিলা'-সম্পাদিকা কবি আশা দেবী সম্প্রতি সুইজারল্যাণ্ডের 'লজেনে' বিশ্বমাতৃ-মহাসম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি রূপে যোগদান করিতে গিয়াছেন

কুমারী মঞ্জুলা মজুমদার

ইনি এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বালিকাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কুমারী মঞ্জুলা ভারতবর্ষের লেখক অধ্যাপক শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদারের ভ্রাতুষ্পুত্রী

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
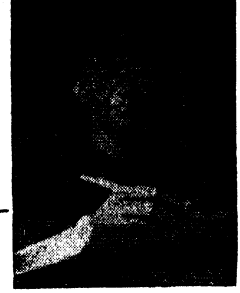
সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

উইম্বলেডন লন্ টেনিস ঃ

১৯৫৫ সালের ৬৯তম উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ৩৫টি দেশের ২৫০জন খেলোয়াড় যোগদান করেন। ভারতবর্ষ থেকে যোগদান করেন ১নং ভারতীয় খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণান, নরেশকুমার (অধিনায়ক) এবং মহিলা খেলোয়াড় রীতা ডাভার। লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ান-সীপের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এই উইম্বলেডন প্রতিযোগিতাকে পরোক্ষভাবে টেনিস খেলায় বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানসীপের সমান চোখে দেখা হয়। যুদ্ধোত্তরকালের আন্তর্জাতিক টেনিস খেলায় আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া এই দুটি দেশ শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করে চলেছে। আলোচ্য বছরের উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় পুনরায় আমেরিকার খেলোয়াড়রা শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে নরেশকুমার পুরুষদের সিঙ্গলসের ৪র্থ রাউণ্ডে এ বছরের সিঙ্গলস বিজয়ী টনি ট্রাবার্টের কাছে ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত হ'ন। কৃষ্ণান পরাজিত হ'ন চিলির প্রতিনিধি এস আয়ালের কাছে ৩য় রাউণ্ডে। মহিলা খেলোয়াড় মিস রীতা ডাভার সিঙ্গলসের ২য় রাউণ্ডে হেরে যান গত তিন বছরের দক্ষিণ আফ্রিকার চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড়ের কাছে। পুরুষদের ডবলসের ৪র্থ রাউণ্ডে কৃষ্ণান এবং নরেশকুমার এ বছরের চ্যাম্পিয়ান অষ্ট্রেলিয়ান জুটি রেক্স হার্টউইগ এবং লুই হোডের কাছে হার স্বীকার করেন। মিক্সড ডবলসের খেলায় কৃষ্ণান এবং মিস ডাভার ৩য় রাউণ্ড পর্য্যন্ত খেলেছিলেন। অন্যদিকে নরেশকুমার বৃটেনের মহিলা খেলোয়াড়ের জুটিতে ২য় রাউণ্ডে উঠে হেরে যান। মোটের ওপর দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় খেলোয়াড়রা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হার স্বীকার করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের পরাজয় অগৌরবের হয়নি।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : টনি ট্রাবার্ট (আমেরিকা) ৬-৩, ৭-৫, ৬-১ গেমে কুর্ট নিয়েলসনকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিস লুই ব্রাউ (আমেরিকা) ৭-৫, ৮-৬ গেমে মিসেস বিভার্লি ফ্লিটজকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস : রেক্স হার্ট উইগ এবং এল হোড (অষ্ট্রেলিয়া) ৭-৫, ৬-৪, ৬-৩ গেমে এন ফ্রেজার এবং কেন্ রোজওয়ালকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলস : মিস এ মর্টিমার এবং মিস জে শিলকক্ (বৃটেন) ৭-৫, ৬-১ গেমে মিস এস ব্লুমার এবং মিস পি ওয়ার্ডকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস : ভিক্ সিক্সাস এবং মিস ডরিস হার্ট (আমেরিকা) ৮-৬, ২-৬, ৬-৩ গেমে ই মোরিয়া (আর্জেন্টিনা) এবং লুই ব্রাউকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৩৫৭ (ওয়ালকট ১৫৫, ওরেল ৬১, উইকস ৫৬ ; মিলার ১০৭ রানে ৬ উইঃ) ও **২৯৩** (ওয়ালকট ১১০) সোবার্স ৬৪)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৭৫৮ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হার্ভে ২০৪, আর্চার ১২৮, ম্যাক্‌ডোনাল্ড ১২৭, বিনড ১২১, মিলার ১০৯)

কিংস্টোনে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৫ম টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস এবং ৮২ রানে জয়ী হয়েছে। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজের পাঁচটি টেষ্ট খেলার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হয় তিনটিতে এবং বাকি দুটি খেলা ড্র যায়। ৫ম টেষ্ট খেলার পূর্ব্বেই অষ্ট্রেলিয়া দুটি খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' খেতাব পেয়ে যায়। ৫ম টেষ্টে ৭৫৮ রান ক'রে অষ্ট্রেলিয়া নিজ দেশের পক্ষে যে কোন দেশের

বিপক্ষে টেষ্ট খেলায় এক ইনিংসে সর্ব্বাধিক রান করার রেকর্ড করেছে। অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্ব রেকর্ড ৭২৯ (৬ উইঃ) ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১৯৩০ সালের লর্ডস মাঠে। এক ইনিংসে সর্ব্বাধিক রান করার বিশ্ব রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে ইংলণ্ডের, ৯০৩ রান (৭ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড), অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ১৯৩৮ সালের ওভাল মাঠে।

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের আলোচ্য ৫ম টেষ্ট খেলায় নিম্নলিখিত রেকর্ডগুলি স্থাপিত হয়েছে।

১। অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসে **৭৫৮** রান (৮ উইকেটে ডিক্লেঃ)—অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে যে কোন দেশের বিপক্ষে টেষ্ট খেলায় এক ইনিংসে সর্ব্বাধিক রান করার অষ্ট্রেলিয়ান রেকর্ড হয়েছে। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ৭২৯ রান (৬ উইঃ) ইংলণ্ডের বিপক্ষে অর্জ্জিত, লর্ডস মাঠে, ১৯৩০ সালে।

২। অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসে ৫টি সেঞ্চুরী—অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংসে সর্ব্বাধিক সেঞ্চুরী করার বিশ্বরেকর্ড করেছে। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ইংলণ্ডের ৪টি, অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নটিংহাম মাঠ, ১৯৩৮।

৩। ক্লাইড ওয়ালকট কর্ত্তৃক উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী। ৫ম টেষ্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী ক'রে ওয়ালকট একই টেষ্ট সিরিজে ২বার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। তাঁর এই বিশ্ব রেকর্ড এইভাবে হয়েছে—১২৬ ও ১১০ রান ২য় টেষ্ট, পোর্ট অফ্ স্পেন এবং ১৫৫ ও ১১০ রান ৫ম টেষ্ট, কিংষ্টোন।

ফুটবল লীগ খেলা ঃ

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের প্রধান আকর্ষণ প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। বর্ত্তমানে লীগ তালিকার ওপরের কয়েকটি দলের মধ্যে পয়েণ্টের ব্যবধান এতই কম যে, শেষ পর্য্যন্ত কোন্ দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হবে তা এখনও সঠিকভাবে বলা যায় না। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের পাল্লায় কি রকম জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে তা দেখাবার জন্যে নীচে দুটি তালিকা দেওয়া হ'ল। প্রথম তালিকাটিতে ফলাফল আছে, লীগের প্রথমার্দ্ধের খেলার পর তালিকার ওপরের দিকে যে পাঁচটি দল স্থান অধিকার করেছিলো; দ্বিতীয়টিতে দেওয়া হয়েছে, উপস্থিত যে পাঁচটি দল তালিকার ওপর দিকে স্থান দখল করে রয়েছে।

প্রথমার্দ্ধের ফলাফল—তারিখ ২২।৬।৫৫

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
রাজস্থান	১২	১০	০	২	২০	৪	২০
মোহনবাগান	১৩	৮	৩	২	২৩	৫	১৯
মহঃ স্পোর্টিং	১৩	৭	৫	১	১৪	৩	১৯
এরিয়ান্স	১৩	৭	৪	২	১১	৬	১৮
ইস্টবেঙ্গল	১৪	৭	২	৫	১৪	৯	১৬

বর্ত্তমান অবস্থা—তারিখ ১২।৭।৫৫

মোহনবাগান	২০	১৩	৪	৩	৩২	৯	৩০
ইস্টবেঙ্গল	২১	১২	৪	৫	২৯	১৩	২৮
মহঃ স্পোর্টিং	২০	১০	৮	২	২২	৮	২৮
এরিয়ান্স	১৮	৯	৬	৩	১৫	৬	২৪
রাজস্থান	১৮	১১	১	৬	২৪	১০	২৩
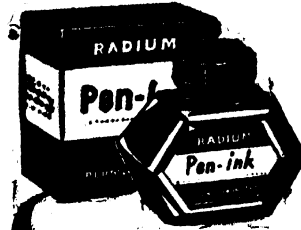
কানু কহে রাই : শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় :

সুসাহিত্যিক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি অধুনা-প্রকাশিত গল্পের সঙ্কলন। অধিকাংশ গল্প আকারে ছোট হইলেও গল্পরস বর্জ্জিত নহে, পরিমিত আধারে যেটুকু রস পরিবেশিত হইয়াছে তাহা বিস্বাদও নহে। নদীর গতিবেগে যে প্রাণশক্তির প্রকাশ, বৃষ্টি বিন্দুর মধ্যেও জীবনের সেই লীলামাধুর্য্য প্রত্যক্ষীভূত। সন্ন্যাস, জোড় বিজোড় প্রভৃতি দু'তিন পাতার গল্পের মধ্যেও যেমন—গ্রন্থি-রহস্য, ভক্তিভাজন, ভূত-ভবিষ্যৎ, অষ্টমে মঙ্গল, কল্পনা প্রভৃতি মাঝারি আকারের গল্পের তেমনি হাল্কা কৌতুক রস অন্তঃশীলা ফল্গুর মত প্রবাহিত। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গল্প 'কানু কহে রাই' কিছুটা রোমান্টিক এবং 'বড় ঘরের কথায়' মনোবিকলের সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত। রসাত্মক বাক্য ও বর্ণন রীতিতে প্রতিটি গল্প পাঠক মনকে রসাবিষ্ট করিয়া তুলে এবং তুচ্ছের মধ্যে বস্তুলাভের আনন্দটিই মুখ্য হইয়া উঠে।

[গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ২॥০ টাকা।]

রামপদ মুখোপাধ্যায়

স্ব-নির্ব্বাচিত গল্প : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় :

স্ব-নির্ব্বাচিত গল্পের সঙ্কলনের এখন একটি যুগ চলেছে বলা চলতে পারে। তবে সব লেখকরাই নন,—কেবল স্বনামধন্য লেখকরাই স্ব-নির্ব্বাচিত গল্পের সঙ্কলন করে থাকেন। স্ব-নির্ব্বাচিত গল্পের সঙ্কলনের সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। নিজের লেখা নিজে বেছে সঙ্কলন করা যেমন সুবিধাজনক তেমনি সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকদের মনস্তুষ্টি করাও তেমনি অসুবিধাজনক, কিন্তু তারাশঙ্করবাবু সে পরীক্ষাতেও বেশ ভালভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর স্ব-নির্ব্বাচিত গল্প সঙ্কলনে তিনি সর্ব্বশ্রেণীর পাঠককেই তুষ্ট করতে পেরেছেন বলেই মনে হয়। সঙ্কলনটিতে সব রকম গল্পই স্থান পেয়েছে। যেমন—'প্রতিমা' গল্পটিতে আছে একটি বধূর সকরুণ কথা ও তার বিষাদময় পরিণতি। 'ইস্কাপণ' গল্পটিও ট্র্যাজিক্। 'তাসের ঘর' এর মধ্যে একটি গ্রাম্য বধূর অপূর্ণ ইচ্ছাকে মিথ্যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার হাস্যকর প্রচেষ্টা হাসির সাথে কান্নাকেও টেনে আনে। 'মাটি'তে জীবন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত একটি মানুষের ফেলে আসা দিনগুলির মর্ম্মস্পর্শী কাহিনীর মধ্যে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়, অবিচারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 'নারী ও নাগিনী'র সাপুড়ে ও সাপের ভাব ভালবাসা ও তার মর্ম্মান্তিক পরিণতির মধ্যে নারী চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 'এক রাত্রি'র মধ্যে দুইটি লোকের হেঁয়ালিপূর্ণ পুরাণ কথার ভেতর দিয়ে তাদের' সম্পর্কের ইঙ্গিত বেশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 'ব্যাঘ্রচর্ম্ম'টি একটি ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত 'মেষ'এর কথা। গল্পের শেষে একটি ভাষণ স্বভাব লোকের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়ে হাসি ও বেদনার উদ্রেক করে। 'যাদুকরী' গল্পের যাদুকরীর চাতুর্য্যপূর্ণ মধ্যস্থতায় স্বামী স্ত্রী ও দুইটি পরিবারের পুনর্মিলনের আনন্দ পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হয়।

তারাশঙ্করবাবু শক্তিমান কথাশিল্পী। তাঁর স্ব-নির্ব্বাচিত এই বিভিন্নরূপ গল্পের সঙ্কলন পাঠে পাঠকমাত্রেই যে খুসী হবেন তাতে সন্দেহ নেই।

[ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোন লিঃ। ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭ মূল্য চার টাকা।]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

পল্লীগীতি ও পূর্ব্ববঙ্গ : শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব :

প্রবহমান যুগ-সভ্যতা ও নাগরিক সভ্যতার অন্তরালে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে গ্রাম্য সংস্কৃতি ও বিবিধ সম্প্রদায়গত উৎসব ও পার্বণাদিকে কেন্দ্র করিয়া যে গীতিকাব্য, বাউল গান, জারি, নটিয়া, নীল প্রভৃতি পল্লীগীতি প্রচলিত ছিল এবং আজও আছে, তাহার ধারাবাহিক কোন ইতিহাস বা ক্রমবিবর্ত্তনের ক্রমিক সংকেত নির্ণয় করা আজ সম্ভব নয়। তবে এই সব পল্লীগীতির ভিতর দিয়া গ্রাম্য গৃহস্থ জীবন ও কৃষক জীবনের পাল-পার্বণাদি ও সংস্কৃতিগত একটী সুস্পষ্ট ধারা পাওয়া যায়। বাঙলার এই সব প্রচলিত ও অধুনালুপ্ত পল্লীগীতির সর্বাধিক প্রচার ও প্রচলন ছিল পূর্ববঙ্গে। যুগ-সভ্যতার প্রবাহে আজ সেই সব পল্লীগীতির প্রচলন সীমাবদ্ধ হইয়া আসিলেও এখনও তাহা লুপ্ত হয় নাই। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রচেষ্টায় 'মৈমনসিংহ গীতিকা' 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' 'ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল ব্যালাডস্' প্রভৃতি আঞ্চলিক পল্লীগীতি ও গীতিকাব্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ও সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দেব মহাশয় ফরিদপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিবিধ পল্লীগীতি সংগ্রহ করিয়া সেগুলির বিশদ বর্ণনা ও ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করিয়া লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির আর একটী মহামূল্য অধ্যায় বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে সংস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার সংগ্রহ এবং সম্পাদনা সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মাটির এই নিজস্ব সভ্যতার রসাস্বাদ শুধু জ্ঞানভাণ্ডারের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ নয়, বর্ত্তমান যুগের পাঠক পাঠিকাদেরও যথেষ্ট আনন্দ দান করিবে। এই শ্রেণীর গ্রন্থের বহুল

প্রচার বিশেষ কাম্য। শ্রদ্ধেয় ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাশঙ্কর সেন মহাশয় গ্রন্থখানির মুখবন্ধ ও ভূমিকা লিখিয়া ইহাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

["কতকথা"। ৬৭।১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য চার টাকা।]

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

রাজ্যের রূপকথা : (প্রথম খণ্ড) শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় :

প্রবীণ কথাশিল্পীর রচনা। এই খণ্ডে আছে বলকান রাজ্যের এগারোটি ; কঙ্গো, কেপ কলোনি আর দক্ষিণ আফ্রিকার এগারোটি—সর্বসমেত বাইশটি রূপকথা। এগুলি ঠিক অনুবাদ নয়—কথাশিল্পীর স্বচ্ছ সহজ ভাষায় রসালো ভঙ্গীতে লেখা। রূপকথাগুলির সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন—এগুলি ও সব দেশে দেড় হাজার দু'হাজার বছর ধরে প্রচলিত আছে এবং এদেশ থেকে ওদেশে, ওদেশ থেকে সেদেশে চলতে চলতে প্রত্যেকটি দেশের স্পর্শে বিচিত্র ভাবে ভঙ্গীতে—জাতি, দেশ রুচি ও সংস্কার ভেদে বহু বিচিত্র রূপে পুষ্টি লাভ করেছে। এসব রূপকথা আলোচনা করলে দেখা যাবে এদের পুষ্টিলাভের সঙ্গে মানব জাতির ইতিহাস বিজড়িত আছে। আদি যুগ থেকে মানুষ বংশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন দেশে গিয়া বসতি স্থাপন করার ফলে অভিন্ন এক জাতির মানুষ নানা জাতিতে পরিণত হয়েছে ; এবং শিক্ষা সভ্যতার প্রকার ভেদে যেমন জাতিতে জাতিতে বিভেদ ঘটেছে, আদিম রূপকথাগুলিও তেমনি প্রত্যেক জাতির রুচি আর রীতি হিসাবে নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে। তা করলেও সকল দেশের রূপকথার themeএ আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়।

গল্পগুলির পাণ্ডুলিপি দেখে ১৯৫৩ সালে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন : "সৌরীনবাবুর প্রণীত গল্পের বিরাট সংগ্রহ নূতন নূতন গল্প শুনিয়ে আমাদের দিন দিন কতদিন ভুলিয়ে রাখবেন।"

গ্রন্থে ছবি আছে অসংখ্য। ছাপা কাগজ বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

[ইণ্ডিয়ান প্রেস্ পাবলিকেশন্ লিঃ, এলাহাবাদ। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য সাত টাকা।]

বহুদর্শী

ভাঙা বন্দর : শ্রীভবেশ দত্ত প্রণীত :

আলোচ্য গ্রন্থ বাস্তবজীবনের কাহিনী মুখর। ভূমিকায় বলা হ'য়েছে উপন্যাস—বড় গল্প বললেই শোভন হয়। ছোট একটি ষ্টেসন পলাশপুর—এরই পল্লীপরিসর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভেতর কাহিনীর পটভূমিকা। পলাশপুরের ষ্টেসন মাষ্টার রবিশঙ্করবাবু আর এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেসন মাষ্টার অবিনাশবাবুর পারিবারিকতা ও মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠার অবতরণিকা নিয়ে সূচনা হয়েছে ভাঙা বন্দর !

অবিনাশবাবুর মেয়ে কুন্তলাই গল্পের নায়িকা। রবিশঙ্করবাবুর ছেলে শোভনলাল কলকাতায় মেসে থাকে। বেকার শোভনলালের চাকুরী হওয়ার ওপরই নির্ভর করছে কুন্তলার বিয়ে। তারপর নেমেছে পলাশপুরে কালোছায়া। লেভেল ক্রসিং পার হ'য়ে একদা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ হোলো লাইনচ্যুত। তদন্ত হওয়ার প্রারম্ভিক অবস্থাতেই ঐ দুটী পরিবারের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল। ষ্টেসন মাষ্টার রবিশঙ্করকে রসুলপুরে বদলী হওয়ার আদেশ এলো। তারপর শোভনও এসেছে আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে—সে দেখ্‌লো কুন্তলাকে বহুদিন পরে বসন্ত রোগে বিগতশ্রী, তবুও সে কুন্তলাকে সারাজীবনের সঙ্গিনী করতে আগ্রহান্বিত কিন্তু ব্যর্থ হল তার আশা আকাঙ্ক্ষা, রবিশঙ্করের নির্মম আদেশ আর নিয়তির নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে। ষ্টেসনটাই শেষ পর্যন্ত গ্রন্থকারের ভাষায় ভাঙা বন্দর—সেই বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে একা কুন্তলা।

গ্রন্থখানি বর্ণনা বাহুল্য বর্জ্জিত ও সংলাপ প্রধান। ভাষা ঝরঝরে, বাচনভঙ্গী ভালো ও রসালো।—ঘাতপ্রতিঘাত তেমন নেই। নবীন গ্রন্থকারের প্রথম প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

[দেব দত্ত এণ্ড কোং। ৪।৬৮, চিত্তরঞ্জন কলোনী। মূল্য দুই টাকা।]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কলকাতার ফুটবল : আর্‌বি রচিত :

ফুটবল বিদেশী খেলা হলেও আমাদের দেশে জাতীয় খেলার পদমর্যাদা লাভ করেছে। আলোচ্য বইখানির মূল বিষয়বস্তু ক'লকাতার ফুটবল খেলার ইতিবৃত্ত এবং প্রসঙ্গক্রমে বাংলা দেশের ফুটবল খেলার দ্বিতীয় ঘাঁটি ঢাকা সহরের অবদান।

সেকালের ধুরন্ধর ফুটবল খেলোয়াড়দের ক্রীড়াচাতুর্য্যের কাহিনী এবং ফুটবল খেলার বিশেষ ঘটনাবলী পরিপূর্ণ এই বইখানি শুধু ফুটবল ক্রীড়া-মহলেই নয়, বাংলা-সাহিত্যের সাধারণ পাঠকমহলেও সমাদর লাভ করবে আশা করি।

লেখকের রচনায় মুন্সিয়ানা আছে। বিস্মৃত যুগের ফুটবল কাহিনী তথ্যবাহুল্যে ভারাক্রান্ত না হয়ে লেখকের রচনাগুণে বইখানি চিত্তাকর্ষক হয়েছে। সেকালের কয়েকজন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়ের আলোক চিত্র এবং কয়েকটি লীগ-শীল্ড বিজয়ী দলের গ্রুপ ছবি বইখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। ছাপা এবং বাঁধাই ভাল।

[ইষ্ট লাইট বুক হাউস, ২০, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা—১ মূল্য ৩৲]

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "আদিম রিপু"—৩৲
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস "বাগ্‌দত্তা" (৪র্থ সং)—৫৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীকান্ত" (২য়—১৫শ সং)—৩৲,
"পল্লী-সমাজ" (২৯শ সং)—২৷৷৹, "চন্দ্রনাথ" (২৭ সং)—১৷৷৹
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "সাজাহান" (৩০শ সং)—২৷৷৹
কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "কথিকা"—২৲, "সপ্তদশী"—৪৲
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন প্রণীত "কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ" (৩য় সং)—৫৲
শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত "সাহিত্যে বাঙ্গালী"—৷৷৵৹
শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "ঝড়ের সংকেত"—৷৷৹, "রত্নমালার কাহিনীর"—৷৷৹
শ্রীঅলককুমার ঘোষ প্রণীত শিশুপাঠ্য "কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী"—৸৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী— শ্রীনিপুণ দত্ত গ্রাম্য বাজার ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভাদ্র—১৩৬২

প্রথম খণ্ড | **ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ** | **তৃতীয় সংখ্যা**

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

আভ্যন্তরীণ প্রমাণ—

মহাভারত একটী মহাগ্রন্থ; এত বড় গ্রন্থ অন্য কোনও প্রাচীন জাতির ছিল না। ইহাকে একটী Whole Literature বলিয়া Winter nitz তাঁহার History of Indian Literature নামক গ্রন্থে আখ্যা দিয়াছেন। এ বিষয়ে মহাভারত বাক্যাবলী আছে।

(ক) উবাচ সমহাতেজা ব্রহ্মাণং পরমোষ্ঠিনং।
কৃতং ময়েদ ভগবন্ কাব্যং পরমপূজিতম্ ॥ ৬১ ॥

* * * * *

ইতিহাস পুরাণানামুন্মেষং নির্ম্মিতং চ যৎ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ ত্রিবিধং কাল সংজ্ঞিতম্ ॥ ৬৩ ॥

আদিপর্ব্ব, অধ্যায় ১।

(খ) ইতিহাসমিমংশ্রুত্বা পুরুষোঽপিসুদারুণঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো রাহুণা চন্দ্রমা যথা ॥
জয়োনামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা ॥ ২০ ॥

আদি, অধ্যায় ৬২।

উদ্ধৃত অংশ দুইটীর ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃতানুবাদ :—

"ভগবন্, আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি, তাহাতে ইতিহাস ও পুরাণের অনুসরণ (উন্মেষ=আরম্ভ) ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছি। * * * * * *

"শ্রোতা অতি নিষ্ঠুর হইলেও এই অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণে রাহু হইতে মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় ভ্রূণ ইত্যাদি মহাপাতক

হইতেও আশু বিমুক্ত হইতে পারে। বিজিগীষু ব্যক্তিদিগের এই জয়াস্থ ইতিহাস শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

এই দুইটী অংশ হইতে জানা যায় যে মহাভারত "জয়াস্থ ইতিহাস" এবং অতুলনীয়। "জয়" শব্দের দ্বারা এখানে পাণ্ডব বিজয় মহাকাব্যই মহাভারতের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা আবার পাইতেছি ভীষ্মপর্ব্বের দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৪৬-৪৭ শ্লোকে—ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন—

অহন্তু কীর্ত্তি মেতেষাং কুরূণাং ভরতর্ষভ।
পাণ্ডবানাং চ সর্ব্বেষাং প্রথয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

"হে ভরত শ্রেষ্ঠ, আমি কুরুদিগের এবং পাণ্ডবদিগের সকলের কীর্ত্তিকলাপ প্রকাশ এবং সর্ব্বদেশে প্রতিষ্ঠিত করিব; তুমি শোক করিও না।"

ইহা ভারত যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বদিনের সন্ধ্যায় ব্যাসোক্তি। যুদ্ধের ফলাফল ব্যাসেরও সেই সময় অজ্ঞাত ও অনিশ্চিত ছিল। আশা করি মহাভারতের মধ্যেই ভারত যুদ্ধের প্রকৃত বিবরণ নিহিত আছে এই সিদ্ধান্ত আসে। তবে মহাভারতে কালক্রমে অনেক অনেক অকেজো এবং অতিরঞ্জিত বিষয়, উৎপাত লক্ষণ যাহা তালমানবিহীন বটে, তাহার পর পরবর্ত্তী লেখকগণের ধারণা ইত্যাদিযোগে এই মহাগ্রন্থে অনেক মল-সঞ্চয় হইয়াছে তাহা বর্জ্জন করা বিধেয়, তাহাও আমি করিয়াছি বলিয়া পরে বিবৃত করিতেছি। এই বিষয়ে আদি ইংরাজী ১৯৩৬ হইতে ১৯৫৪ এই অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী পরিশ্রম করিয়াছি। মহাভারত ভিন্ন অন্যগ্রন্থ পুরাণাদির আমি চর্চ্চা করিয়াছি। জ্যোতিষিককাল গণনায় ব্যবহারোপযোগী ঘটনাবলীর যাহা ভারতযুদ্ধকাল নিরূপণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণাদি তাহা কেবলমাত্র মহাভারত হইতেই পাওয়া যাইতে পারে। অন্য কোন গ্রন্থ হইতে পাওয়া যাইতে পারে না। এক্ষণে পাণ্ডবকালীয় ঘটনাবলী যাহার সময়-নির্দ্ধারণ সম্ভবপর হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এইখানে ইহা বলিতে হইতেছে যে সনির্দ্দিষ্ট ভারতযুদ্ধকাল নির্ভর করিয়াই এই তালিকায় প্রদর্শিত ঘটনাবলীর কালানয়ন সম্ভব হইয়াছে।

(১) যুধিষ্ঠিরের জন্মদিন, এপ্রিল ২০, ২৫০৪ খৃঃ পূঃ অব্দ।

(২) শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন, জুলাই ২১, ২৫০১ খৃঃ পূঃ অব্দ, অর্ধরাত্রে কুরুক্ষেত্রকাল।

(৩) অর্জ্জুনের জন্মদিন, জুলাই ৩০, ২৫০১ খৃঃ পূঃ অব্দ প্রাতঃকাল ৯টা ৪৫ মিনিট কুরুক্ষেত্রকাল।

(৪) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ, মার্চ্চ ১১, ২৪৬২ খৃঃ পূঃ অব্দ, এই বৎসরের আদিতে মঘাপূর্ণিমা আসিয়াছিল জানুয়ারী ৮। নূতন বৎসর গণনা আরম্ভ হইয়াছিল ১০ই জানুয়ারী হইতে।

(৫) যুধিষ্ঠিরের অক্ষদ্যূতে পরাজয় ও পাণ্ডব-বনবাস গমন, আগষ্ট ৪, ২৪৬২ খৃঃ পূঃ অব্দে।

(৬) কলিযুগারম্ভ ২৪৫৪ খৃঃ পূঃ অব্দ, জানুয়ারি ৯ই তারিখ হইতে।

(৭) উত্তর গোগৃহ যুদ্ধ, আগষ্ট ২১, ২৪৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দ।

(৮) ভারতযুদ্ধ, নবেম্বর ৪ হইতে নবেম্বর ২১ পর্য্যন্ত খৃঃ পূঃ অব্দ ২৪৪৯।

(৯) ভীষ্মপ্রয়াণ—জানুয়ারি ১০, ২৪৪৮ খৃঃ পূঃ অব্দ। মাঘ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। মাঘ শুক্লাষ্টমী অসম্ভব।

(১০) যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ দীক্ষা—মার্চ্চ ১১, ২৪৪৬ খৃঃ পূঃ অব্দ।

(১১) শ্রীকৃষ্ণের ও বলদেবের দেহত্যাগ, যাদব অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশীয়দের পরস্পর নিধনের পর; এবং বৎসরের শেষভাগে পাণ্ডব মহাপ্রস্থান ২৪১৩ খৃঃ পূঃ অব্দ।

এই সমস্ত পাণ্ডবকালীয় ঘটনাবলী-কাল-নির্ণয় শুধু মহাভারত হইতেই সম্ভব হইয়াছে, সুতরাং মহাভারত যে প্রকৃতপক্ষেই ইতিহাস সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। তবে অনেক মল-সঞ্চয় হইয়াছে বর্ত্তমান মহাভারতে তাহা বাদ দিতেই হইবে। প্রথম সংস্করণের শ্লোক সংখ্যা ছিল ২৪০০০, উহাতে উপাখ্যান ভাগ মোটেই ছিল না। তারপর উৎপাতলক্ষণ, পরবর্ত্তী লেখকের উপসংহার ইত্যাদি সব বাদ দিলে যাহা এখনও হয় তাহা বিবৃত করিতেছি—

বর্ত্তমান মহাভারতে শ্লোক সংখ্যা = ৯০৯১৯, উপাখ্যান, উৎপাত লক্ষণ এবং অন্যকৃত উপসংহার বা সমাহার শ্লোক সংখ্যা = ৪৪৪৪০, শেষ হইতেছে = ৪৬৪৭৯ শ্লোকসংখ্যা।

অতএব প্রাচীন ২৪০০০ শ্লোকসংখ্যায় আসিতে হইলে, সমস্ত অতিরঞ্জিত উক্তি বাদ দিতে হইবে। গ্রহণীয় অধ্যায়গুলির আকারও অর্দ্ধেকে পরিণত করিতে হইবে।

এক্ষণে আমরা অতি সংক্ষেপে কিরূপে এবং কি বাক্যাবলীর সাহায্যে ভারতযুদ্ধকাল ২৪৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দের ৪ঠা হইতে ২১শে নবেম্বর পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহা বিবৃত করিতেছি।

(১) শ্রীকৃষ্ণ কৌরব সভায় দৌত্য কার্য্যে বিফল হইয়া ফিরিবার দিন প্রাতে কর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন। যখন তাঁহাকে পাণ্ডব পক্ষে আনিতে বিফলকাম হইয়াছিলেন তখন তাহাকে বলিয়াছিলেন আজি হইতে ৭ম দিনে আমাবাস্যা আরম্ভ হইবে এবং জ্যেষ্ঠাদিনে (পরদিনে) শেষ হইবে। সেইদিন যুদ্ধ আরম্ভ কর।

(২) কিন্তু জ্যেষ্ঠাদিনে যুদ্ধারম্ভর প্রতিকূল যুক্তি মহাভারত হইতে প্রাপ্ত বলদেব বাক্য, যে যুদ্ধের শেষদিন—শ্রবণাদিন ছিল। ১৮ দিন যুদ্ধ চলিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রোক্ত জ্যেষ্ঠা দিন হইতে শ্রবণা দিন ৪ দিন বা ৩১ দিন। যুদ্ধ ১৮ দিন হেতু জ্যেষ্ঠা দিন হইতে শ্রবণাদিন ৩১ দিন গ্রহণ করিতে হইবে। এই ৩১ দিনের শেষ ১৮ দিন যুদ্ধকাল হইতেছে। প্রথম ১৩ দিন যুদ্ধ হয় নাই। শুক্ল পক্ষ প্রায় শেষ চতুর্দ্দশ দিনে যুদ্ধারম্ভ।

(৩) পুনরায় কয়েকটী মহাভারত বাক্য হইতে পাওয়া যায় যে চতুর্দ্দশ দিনের সন্ধ্যার পূর্ব্বে জয়দ্রথ বধ হয়। পরবর্ত্তী রাত্রির অর্দ্ধ সময়ে রাক্ষস বীর ঘটোৎকচ বধ হয়। ঐ রাত্রির শেষভাগে বা চতুর্থ প্রহরে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গযুক্ত চন্দ্রের উদয় হইয়াছিল। এই সময়টা কৃষ্ণপক্ষীয় নিশ্চয়ই ছিল। যুদ্ধ শেষ আর ৪ দিন পরে হইয়াছিল।

(৪) যুদ্ধ শেষ হওয়ার ৫০দিন পরে যুধিষ্ঠির প্রাতে হস্তিনাপুর হইতে সূর্য্যের উদয়বিন্দু দেখিয়া এবং দ্রষ্টাদিগের সহিত একমত হইয়া স্থির করিয়াছিলেন যে সূর্য্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়াছে। এই দ্রষ্টাদিগের মধ্যে প্রধান পুরোহিত ধৌম্য অবশ্যই ছিলেন। ইনি যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ কার্য্যের কাল নিরূপক ব্রহ্মা ছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে জ্যেষ্ঠা অমাবস্যা বা অমান্ত দিনের পর মোট অতীত দিন সংখ্যা=৩১+৫০'=৮১দিন, অনেকেই জানেন যে ২৯½ দিনে একচান্দ্র মাস হয়; অতএব এই দিনান্তর=৮১+২৯½=২¾ চান্দ্রমাস হয়।

এখানে দেখা যাইতেছে জ্যেষ্ঠা অমান্তদিন হইতে গণিয়া চান্দ্র অগ্রহায়ণ, পৌষ এবং মাঘের ¾ অংশ অতীত হইয়াছিল। অর্থাৎ মাঘের কৃষ্ণাষ্টমীদিনে ভীষ্মের প্রয়াণ আইসে। ইহার কোনও ব্যতিক্রম হইতেই পারে না।

এস্থলে সূর্য্যের দক্ষিণ অয়ন-বিন্দু প্রাপ্তি দিন জ্যেষ্ঠা অমানন্তদিন হইতে ৮০ দিন পর ঘটিয়াছিল। ইহাই হইল ভারতযুদ্ধ কালায়নের প্রধানতম ভিত্তি বা অবলম্বন।

আমাদের কালীয় পঞ্জিকার আলোচনা দ্বারা পাইতেছি যে ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দের পঞ্জিকা (শুদ্ধপঞ্জিকা বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা) হইতে পাই যে এই বৎসর—

জ্যেষ্ঠা অমাবস্যা (অমান্ত) তারিখ ছিল ১লা ডিসেম্বর, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ এবং ঐ তারিখের ৮০ দিন পরের তারিখ ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ খৃঃ অব্দ।

এই ১৯২৯-৩১ খৃষ্টাব্দ, তিথি, নক্ষত্র অনুসারে ভারতযুদ্ধ বৎসরের সদৃশ। অনেকেই জানেন বা শুনিয়া থাকিবেন যে তিথি নক্ষত্রের পুনরাবর্ত্তন ১৯ বৎসর পর হইয়া থাকে। এই আবৃত্তিযুগের বৃহত্তরমান ১৬০ বৎসর এবং ১৯৩৯ বৎসরও সূক্ষ্মতরভাবে হইয়া থাকে।

এক্ষণে কাল-নির্ণয়ন পদ্ধতি প্রদর্শিত হইতেছে।

এই যে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ খৃঃ অব্দ, ঐ দিনের গ্রীনউইচ্ মধ্যম মধ্যাহ্নকাল বা ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অপরাহ্ণ ৫টা ৩০ মিনিটে মধ্যম সূর্য্যের সায়ন স্থান, New-comb কৃত সূত্র হইতে=৩২৮°৪২' হয়। এই মধ্যম সূর্য্য; ইহাতে ভারত যুদ্ধবর্ষীয়স্থল মন্দফল প্রয়োগ করিলে যে সায়নস্থান আসিবে তাহাই বর্ত্তমান কালের যে সূর্য্যাস্থান হইবে তাহাই ভারতযুদ্ধবর্ষীয় ২৭০° ডিগ্রীর সমান গ্রহণ করিতে হইবে।

আমরা এই মন্দফল ভারতযুদ্ধবর্ষে, +১°৫১' কলা ছিল। ইহা নিরূপণ করিতে সূর্য্যের মন্দনীচ এবং উৎকেন্দ্রত্বের পরিমাণ স্থুলভাবে বিবেচনা পূর্ব্বক করিয়াছি। সুতরাং যাহা ১৯২৯-৩০ খৃঃ অব্দে=(৩২৮°৪২'+১°৫১) ৩৩০°৩৩' ছিল উহাই ভারতযুদ্ধবর্ষে ২৭০এর সমান ছিল। অতএব ৩৩০°৩৩'-২৭০°=৬০°৩০'ই অয়ন চলন। ইহাতে মধ্যম অয়ন চলনমান বার্ষিক ৪৯''৭৭৬০ হয়। এই ৬০°৩০'কে ৪৯''৭৭৬০ দিয়া ভাগ করিলে কালান্তর ৪৩৭৯ বৎসর আইসে। এই কালান্তর ৪৩৭৯ বৎসর হইল; ইহাকে একটী সূক্ষ্ম তিথি নক্ষত্রযুগে পরিণত করিলে ব্যবহারযোগ্য কালান্তর আসিবে। এই ৪৩৭৯ বৎসরকে ১৯৩৯, ১৬০

এবং ১৯ বৎসরের সৌরচান্দ্রিক উপরিকথিত যুগত্রয় দ্বারা খণ্ডত্রয়ে বিভক্ত করিলে—

৪৩৭৯ = ১৯৩৯ × ১৬০ × ১৯ + ২ ।

সুতরাং ৪৩৭৯ কালান্তরকে শেষ বা অতিরিক্ত ২ বৎসর কমাইয়া ৪৩৭৭ বৎসর কালান্তর করিতে হইবে যাহাতে ইহাও একটী সৌরচান্দ্রিক যুগ হয়।

এক্ষণে ১৯২৯ খৃঃ অব্দ হইতে শুদ্ধকালান্তর ৪৩৭৭ বৎসর বাদ দিয়া শেষ ঋণাত্মক,—২৪৪৮ খৃঃ অব্দ ভারতযুদ্ধ কাল হইল। এই বৎসরকে ২৪৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দ বলা হয়। যেহেতু খৃঃ পূঃ অব্দ এবং খৃঃ অব্দ গণনায় ০ শূন্য বৎসর ধরা হয়।

মৎপ্রণীত ভারতযুদ্ধকাল সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রবন্ধে কাল-গণনায় "নক্ষত্র" অর্থে "তারা" মাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। পাণ্ডবকালে "নক্ষত্র" শব্দে যেদিন যে তারা, চন্দ্র অতিক্রম করিত সেই তারার নামে দিনের নাম হইত। যথা মঘাদিন, জ্যেষ্ঠাদিন, শ্রবণাদিন, কার্ত্তিকদিন ইত্যাদি মাসের নাম প্রত্যেক মাসে। ক্রান্তিবৃত্তের সম বা অসম বিভাগ যাহা আমরা সিদ্ধান্তগ্রন্থে পাই তাহার কিছুই সে সময়ে প্রচলিত ছিল না। এইজন্য এইরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক এবং আমি তাহা এই সকল প্রবন্ধে করি নাই।

এক্ষণে মহাভারতোক্ত অর্থাৎ উহা হইতে প্রাপ্ত ভারতযুদ্ধবর্ষে জ্যেষ্ঠা তারা হইতে সূর্য্যের দক্ষিণ অয়নাদিবস প্রাপ্তি বিষয়ে যে ৮০ দিন পাওয়া গিয়াছে এবং যাহা অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া আমি মনে করি, তাহা কতদূর রক্ষা বা ধ্বংস করিয়া ভারতযুদ্ধকে নিম্নদিকে চালন করিতে প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহার দূষণালোচনা করিতেছে।

কালকে ১৪৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দে এবং ৯৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দে নামাইতে ইচ্ছা করেন তাহাদের প্রচেষ্টা মহাভারত বাক্যানুসারে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। অপরপক্ষে মহাভারত বাক্য ভিন্ন "ভারতযুদ্ধ কাল নির্ণয়" বিষয়ে জ্যোতির্গণনাও অসম্ভব। কারণ জ্যোতিষিক ঘটনাবলী যাহা অবলম্বনে ভারতযুদ্ধ কাল-নির্ণয় জ্যোতিঃশাস্ত্র বা জ্যোতিগণিত মতে হইতে পারে তাহা মহাভারত-ব্যতীত অন্য কোনও প্রাচীনগ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না এবং পাওয়াও সম্ভবপর নহে।

আমা কর্ত্তৃক নির্ণীত ভারতযুদ্ধ কাল যাহা আসিয়াছে তাহা ২৪৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দের ৪ঠা হইতে ২১শে নভেম্বর। যুদ্ধারম্ভদিন চন্দ্র নক্ষত্র মৃগশিরা অগ্রহায়ণ (চন্দ্রে), মাসের ভীষ্ম প্রচলনের পূর্ব্ববর্ত্তী দিন ৯ই জানুয়ারী, ২৪৪৮ খৃঃ পূঃ অব্দ। জ্যেষ্ঠাদিন ২১শে অক্টোবর, ২৪৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দ। কাজে কাজেই দিনান্তের এখানেও (১০ + ৬১ + ৩১ + ৯) = ৮০ দিন ঠিক মিলিয়াছে।

সুতরাং ভারতযুদ্ধবর্ষ খৃঃ পূঃ অব্দ ২৪৪৯ = —২৫২৬ শকাব্দ যেহেতু—২৪৪৮ – ২৮ = , – ২৫২৬। এই নিরূপণ বরাহ মিহির কৃত বৃহৎ সংহিতার সপ্তবিচারে লিখিত সূত্র যে শককাল + ২৫২৬ = যুধিষ্ঠিরাব্দের বৎসর সংখ্যা বৃদ্ধগণ মতে। যুধিষ্ঠিরাব্দের শূন্য বৎসরই ভারতযুদ্ধবর্ষ। জ্যোতিষিক যে খৃঃ পূঃ অব্দ ২৪৪৯; উৰ্দ্ধে বা ৩৮১৯ বৎসর এবং নিম্নদিকে ও ৩৮০১৯ বৎসর নাড়াচাড়া করা যাইতে পারে। কিন্তু সার্থক কোনও কিম্বদন্তী পাওয়া যাইবে না। কাজেই একাজ ও অসম্ভব ও অযৌক্তিক।

এক্ষণে যে বৃদ্ধগর্গ সংহিতার হস্তলিখিত প্রতিলিপি পাওয়া যায় তাহাতে পাওয়া যায় যে, "বিনষ্টে শকরাজ্যতু-

কাল	জ্যেষ্ঠাতারার সায়নস্থান	জ্যেষ্ঠাতারা ও দক্ষিণ-অয়ন বিন্দুর দূরত্ব	সূর্য্যগতির কাল
(ক) ২৪৪৯ খৃঃ পূঃ	১৮৮°১৩′	৮২° ডিগ্রির আসন্ন	৮০ দিন
(খ) ১৪৪৯ খৃঃ পূঃ	২০১°৫৬′	৬৮° ,, ,,	৬৬.৩৪ দিন
(গ) ৯৪৯ খৃঃ পূঃ	২০৮° ৪৯′	৬১° ,, ,,	৫৯.৫০ দিন

এস্থলে জ্যেষ্ঠা অমান্তদিনকে প্রথমদিন ধরিয়া দিন সংখ্যা ৬৬.৩৪ দিন কে ৬৮ দিন ধরা যাইতে পারে এবং ৫৯.৫০ দিনকে ঐরূপ ২১ দিন পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে। এস্থানে দেখা যাইতেছে যে, যে লেখক বা অনুসন্ধিৎসু ভারত যুদ্ধ

শূন্যা পৃথ্বীভবিষ্যতি"; আবার লেখক কলিঙ্ক, হরিঙ্ক, ও বাসুদেব এই ৩জনকে "কনিষ্ঠান্তে হতাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ "বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এই রাজগণের পরে জীবিত ছিলেন। ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর

কোনও ব্যক্তির মত আমরা পাইতে পারি না। পুরাণাদি তথাকথিত সব গ্রন্থাবলী অনেক পরের কালেই হইয়াছিল।

যুধিষ্ঠিরকাল Alberuni এর সময়ে পাণ্ডবকাল নামে পরিচিত ছিল। এ বিষয়ে আল্‌বিরুণীর India নামক গ্রন্থের Indian Eras নামক অধ্যায় দ্রষ্টব্য। Alberunis India Sachan's Translation Vol. II.

কল্‌হনও রাজতরঙ্গিনীতে লিখিয়াছেন—

পতেষু ষট্‌সুসার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে
কলের্গতেষু বর্ষেষু হ্যভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥

অর্থাৎ কুরুপাণ্ডবেরা জীবিত ছিলেন কলির ৬৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত। সুতরাং ৩১০২ খৃঃ পূঃ অব্দ হইতে ৬৫৩ বৎসর নীচে নামিয়া আসিলে দেখা যায় ২৪৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত কুরুপাণ্ডবরা জীবিত ছিলেন।

এক্ষণে যাঁহারা ভারতযুদ্ধ কালকে ২৪৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দ হইতে নামাইয়া ১৪৪৯ খৃঃ পূঃ কালে নামাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের গণিত-পদ্ধতির আলোচনা করা যাইতেছে। ইহাদের নাম (১) অধ্যাপক শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং (খ) অধ্যাপক শ্রীযুত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য। ইহারা উভয়েই Science Graduates. উভয়েই পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন।

(ক) অধ্যাপক শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রবন্ধাবলীতে তাঁহার যে মত অভিব্যক্তি করিয়াছেন তাহা এই যে ভারতযুদ্ধবর্ষ ১৪৫৪ খৃঃ পূঃ অব্দ বা ১৪৪১ খৃঃ পূঃ অব্দ।

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্যের মতে ভারতযুদ্ধবর্ষ ১৪৩২ খৃঃ পূঃ অব্দ। এই উভয় অধ্যাপকই মনে করেন যে ভারতযুদ্ধের জ্যেষ্ঠা অমান্তদিনই আরম্ভ হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুত রায় মহাশয়ও বলিয়াছেন যে, জ্যেষ্ঠাঅমান্ত-দিনে যুদ্ধ আরম্ভ উত্তম। এক্ষেত্রে আমরা মনে করিতে পারি যে শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের অভীপ্সীত যুদ্ধবর্ষ প্রকৃত পক্ষে ১৪৫১ খৃঃ পূঃ অব্দ।

শ্রীভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ১৪৩২ খৃঃ পূঃ অব্দের, ১৯ বৎসর পূর্ব্বে ১৪৫১ খৃঃ পূঃ অব্দ বটে। এই উভয় অব্দদ্বয়ই অনেক দোষযুক্ত।

১ মতঃ—এই বৎসরদ্বয়ের মাঘ শুক্লাষ্টমীর দিনই সূর্য্যের দক্ষিণ অয়নবিন্দু প্রাপ্তি ঘটে বর্ত্তমান শুদ্ধ গণিত প্রক্রিয়া দ্বারা। এই দিনকে নূতন বৎসরের প্রথম দিন বলা যায় না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে যখন উত্তর অয়নবিন্দু বিন্দুর নিকট সূর্য্যের উদয় বিন্দু স্থির থাকে চক্রবালের উপর, ২১ দিন। তখন ২১ দিনকে এইরূপে বিভক্ত করা হইত ১০ + ১ + ১০। পূর্ব্বের দশ দিনও পরের দশ দিন এই দুইটী "বিরাজ" আখ্যাযুক্ত কালদ্বয়ের মধ্যের দিনকে একবিংশাহ বলিয়া কথিত হইত। এইরূপে দক্ষিণ অয়ন বিন্দুর নিকটবর্ত্তী ২১ দিনকেও ১০+১+১০ এই দুই বিরাজদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দিনটীকে একবিংশাহ বা প্রকৃত দক্ষিণ অয়নবিন্দু প্রাপ্তিদিন সূর্য্যের পক্ষে বিবেচিত হইত। এই দিনে সূর্য্যের উত্তর দক্ষিণ গতি একেবারে শূন্য বলিয়া বিবেচিত হইত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বাক্য "এযোন্তরে মাঁল্লোকান্ যন্নব্যথতে"। বৈদিক যজ্ঞের পুরোহিত শ্রেষ্ঠ যাহার আখ্যা ছিল "ব্রহ্মা" ইনিই ঠিক্ বলিয়া দিতে পারিতেন পরিদর্শন দ্বারা, কোন দিনটী এক বিংশাহ বা উত্তর অয়ন বা দক্ষিণ অয়নপ্রাপ্তি দিবস। এস্থলে পরদিন প্রাতে উত্তরায়ণের বা দক্ষিনায়ণের প্রথমদিন বলিয়া পরিগণিত হইত। যুধিষ্ঠিরের বৈদিক যজ্ঞের ব্রহ্মা ছিলেন ধৌম্য, তিনিই এই কাজে সম্পূর্ণ সমর্থ ছিলেন। তিনিই যুধিষ্ঠিরকে কোন্ দিন ভারতযুদ্ধের পরবর্ত্তী উত্তর-আয়ণের প্রথম দিবস ছিল, সূর্য্যের উদয় বিন্দু পরিদর্শন দ্বারা নিরূপণ করিয়া তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পরিদর্শন ক্রিয়াতে যুধিষ্ঠির তাঁহার ব্রহ্মা ধৌমের সহকারী-রূপেই ছিলেন।

১। এমত স্থলে যে দিনের অপরাহ্নে সূর্য্যের দক্ষিণ অয়ন বিন্দুর প্রাপ্তি ঘটিতে পারিত সেই দিনকে কখনও উত্তরায়ণের প্রথম দিন বলিয়া ধরা হইত না। পরের দিনকে উত্তরায়ণের প্রথম দিন ধরা হইত। এক্ষেত্রে বা এই কল্পনায় তাহা সম্ভবপর হয় না। এই হইল ভট্টাচার্য্য এবং রায় মহাশয়দ্বয়ের মতবাদের প্রথম দোষ।

২। দ্বিতীয়তঃ যদি ভীষ্মের দেহত্যাগ মাঘ শুক্লাষ্টমী পরে, তবে দুই বৎসর পরে ঠিক সেইদিন বা একবিংশাহে (৮+১১+২)=৩০ তিথি দিন হইবে সে অমাবস্যাটি—এই অনুমান বা মতদ্বয়ের জন্য ধনিষ্ঠা অমাবস্যা আসিবে যাহাতে পৌষ কৃষ্ণ শেষ হইবে। মাঘ ও ফাল্গুন চান্দ্রমাসদ্বয় +২ দিন পরে আসিবে চৈত্রের শুক্লা চতুর্থী। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের

অশ্বমেধযজ্ঞের দীক্ষার দিন কোনও ক্রমেই চৈত্র পৌর্ণমাসী আসিতে পারে না। অপরপক্ষে যদি ভীষ্ম প্রয়াণ দিবস যুদ্ধ বৎসরের মাঘ কৃষ্ণাষ্টমী অর্থাৎ ২৩ তিথি হয়। তাহার ২ বৎসর পরে সেই উত্তারয়ণের প্রথম দিনের তিথি পড়িবে (২৩+২২)=৪৫, উহা মাঘী পূর্ণিমা হইবে। তাহার দুই চান্দ্রমাস পরে চৈত্র পৌর্ণমাসী আসিবে। কিন্তু ভারতযুদ্ধের দুই বৎসর পরে মাঘীপূর্ণিমা আমার গণনায় একবিংশাহের ২ দিন পরে আসিয়াছিল। কাজেই চিত্রাপূর্ণ মাস যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ দীক্ষার প্রকৃতদিন পরে। এখানে হইল রায় ভটাচার্য্য মতবাদের দ্বিতীয় দূষণ।

৩। যেদিনযুদ্ধ শেষ হইয়াছিল সেদিনটী রায় ভট্টাচার্য্য মতবাদে পুষ্যাদিন পরে। সেদিনটা বলদেব বাক্যানুসারে শ্রবণা দিন ছিল। অন্যদিন হইতেই পারে না। এই হইল রায় ভট্টাচার্য্য মতবাদের তৃতীয় দূষণ।

৪। চতুর্দ্দশ দিবসীয় যুদ্ধের পর রাত্রিতে শেষভাগে তীক্ষ্ণশৃঙ্গযুক্ত খণ্ডিত চন্দ্রের উদয় মহাভারতে বর্ণিত আছে। তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সেই রাত্রি কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশী-ত্রয়োদশী দিন ছিল। ইহাই হইল রায় ভট্টাচার্য্য মতবাদের চতুর্থ দূষণ।

আমরা এই চারিটি প্রবলযুক্তি বলেই রায়-ভট্টাচার্য্য মতবাদ যে ১৪৪৯ খৃঃ পূঃ কালের সন্নিহিতই ছিল ভারতযুদ্ধ বর্ষ, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। সুতরাং শ্রীযুত রায় মহাশয়ের এবং শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতবাদজনিত শ্রমকে নিতান্তই অর্থহীন বলিয়া বিবেচনা করি।

তারপর (গ) দফাতে ভারতযুদ্ধ ৯৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দের সান্নিধ্যে; এই মতবাদেরও কোন গণিত সমর্থিত হওয়া অসম্ভব। এই সময়ে জ্যেষ্ঠা অমান্তদিবসের সূর্য্যের জ্যেষ্ঠা তারা হইতে দক্ষিণ অয়নবিন্দুর প্রাপ্তিকাল ৬০ দিন মাত্র হইতে পারে। এই ৬০ দিন মধ্যে মহাভারতস্থ বিশ্বাসযোগ্য অবলম্বনের স্থান হইতে পারে না। এইখানে ভারতযুদ্ধের কাল স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন পার্জিটার তাঁহার "Indian Historical Tradition" নামক বহিতে। তাঁহার প্রথম অনুকারী অধ্যাপক শ্রীযুত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং দ্বিতীয় অনুকারী অধ্যাপক শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ইহা পার্জিটার কর্ত্তৃক এইরূপে সাধিত হইয়াছে।

পরীক্ষিতের জন্ম হইতে মহাপদ্মনন্দ পর্য্যন্ত পুরাণে (২২+৫+১০) ৩৭জন প্রধান প্রধান রাজার নাম আছে। এই ৩৭জনের প্রত্যেককে গড়ে ১৫ বৎসর রাজ্যকাল ধরিলে পরীক্ষিত-নন্দান্তর স্থূলতঃ ৫৫০ বৎসর হয়; তাহার সঙ্গে মহাপদ্মনন্দের রাজ্যাভিষেক খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দে গ্রহণ করিলে মোটে ৯৫০ খৃঃ পূঃ অব্দ ভারতযুদ্ধকাল। এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। রাজনাম-মালা অসম্পূর্ণ, তারপর মগধ হইতে অবন্তীর অভ্যুদয় এবং অবন্তীর পতন হইতে পুনরায় মগধের পুনরভ্যুত্থান এই দুইটীর মধ্যে ভারতে রাজহীন অবস্থা দুইবার হইয়াছিল, তাহার কিছুই বিবেচনা করা হয় নাই। সুতরাং এই মতের সমর্থক কোনও যুক্তিই নাই। বিশেষতঃ পার্জিটার তাঁহার এই মতবাদের স্বপক্ষে কোনও জ্যোতিষিক যুক্তির অবতারণা করেন নাই। এই শেষোক্ত দুইটী মতবাদের শূন্য গর্ভতা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদিত হইল।

অপরপক্ষে আমা কর্ত্তৃক নিরূপিত ভারতযুদ্ধকাল যে ২৩৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দ তাহার সমর্থক আর একটী প্রবল নূতন যুক্তি বিশ্লেষণ করিতেছি। মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্বের ১৭ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক হইতে জানিতেছি যে—

মঘা বিষয়গঃ সোমস্তদ্দিনং পর্য্যপদ্যত।
দীপ্যমানাস্ত সংপেতু র্দিবি (র্দিবঃ) সপ্ত মহাগ্রহাঃ॥

ইহার অনুবাদ এইরূপ হইবে।

"সেইদিন চন্দ্র মঘা বিষয়গ হইয়াছিলেন। সাতটী দীপ্যমান মহাগ্রহ আকাশে (আকাশ হইতে) পতিত হইয়াছিল।

অর্থাৎ ৭টী মহাগ্রহ পর পর অস্ত গিয়াছিল বা পশ্চিম চক্রবালে পতিত হইয়াছিল সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া। এই যে ঘটনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে ইহা ভারতযুদ্ধারম্ভে বা ভারতযুদ্ধ সময় মধ্যেও ঘটে নাই। সাতটী গ্রহ সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। এইরূপ ঘটনা বৎসর মধ্যে একবারই হইতে পারে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা আমার পূর্ব্বে অপর কোনও অনুসন্ধিৎসু কর্ত্তৃক সম্ভবপর হয় নাই।

এই ঘটনা বা দৃশ্য ঘটিয়াছিল ৮ই মার্চ্চ ২৪৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দে এবং ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল এই বৎসরই ৪ঠা হইতে

১৭ই নবেম্বর পর্য্যন্ত। ভারত লেখক দর্শন করিয়াছিলেন কিন্তু পরবর্ত্তীকালের লেখাতে ইহা স্থানভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তারিখ ৮ই মার্চ্চ, ২৪৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দ গ্রান্‌উইচ্‌ মধ্যম মধ্যাহ্ন বা বৈকাল, I. S. T. ৫টা ৩০ মিনিট সময়।

সায়ন স্থান	
সূর্য্য—৩২৮°১৩′	বৃহস্পতি, শনি, বুধ ও মঙ্গল ছিল ৩৪৬°—৩৫৬° পর্য্যন্ত স্থানে, প্রায় ৬ ঘণ্টা পরে চন্দ্র মঘাতারাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই দিনটী মহাভারত মতে "মঘা বিষয়গ" দিন।
চন্দ্র—৮৫°৩৯′	
মঘাতারা—৮৮°৩০	
বুধ—৩৪৭°১২′	
বৃহস্পতি—৩৪৬°৪৫′	
শনি—৩৪৬°১৪′	
মঙ্গল—৩৫৬°১৯′	
শুক্র—১১°৩১′	

অস্ত গমন ক্রম ছিল সূর্য্য, বৃহস্পতি, শনি ও বুধ প্রায় একসঙ্গে, পরে মঙ্গল শুক্র এবং চন্দ্র।

এই গ্রহসংস্থান, ৭দিন পূর্ব্বে ১লা মার্চ্চ তারিখে এইরূপ ছিল। ইহা কৃত্তিকা দিনের দৃশ্য ছিল। বুধ ৩৪২° অংশে, শুক্র, ৩৬৬°২০′, মধ্যে ছিল মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও চন্দ্র কৃত্তিকাযুক্ত।

এই অসাধারণ গ্রহসংস্থান দৃশ্য চীন দেশ হইতেও দেখা গিয়াছিল। Peta Doig প্রণীত "Acoucise History of Astion omy নামক গ্রন্থের দ্বাদশ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। আমি Doigএর নিকট তাঁহার বাক্যের জন্য ঋণী।

পরিশেষে মহাভারত হইতে প্রাপ্ত সময় জ্ঞাপক বাক্য হইতে যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনের জন্মপত্রিকা প্রদর্শিত হইল।

যুধিষ্ঠিরের জন্মপত্রিকা—

(অ) প্রধান অবলম্বন—ভারতযুদ্ধকাল ২৪৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দ দ্বিতীয় অবলম্বন—মহাভারত বাক্য।

ঐন্দ্রেচন্দ্রে সমাযুক্তে মহূর্ত্তেঽভিজিতেঽমে।
দিবা মধ্যগতে সূর্য্যে তিথৌ পূর্ণেঽতিপূজিতে।
সমৃদ্ধ যশসং কুন্তীসুষাব প্রবরংসুতম্ ॥

মহাভারত, আদি, অধ্যায় ১২৩
শ্লোক সংখ্যা ৪৭৬৪-৬৫

কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ।

এপ্রিল ২০,২৫০৪ খৃঃ পূঃ অব্দ, কুরুক্ষেত্রকাল মধ্যম মধ্যাহ্ন; পূর্ণিমা তিথি জ্যেষ্ঠা দিন।

সায়ন স্পষ্ট সূর্য্য = ৭°৫১′৩২″
" " চন্দ্র = ১৮৮°১৬′৫২″
" জ্যেষ্ঠাতারা = ১৮৭°২৭′

পূর্ণিমা প্রায় ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে শেষ হইয়াছিল। দিনটী ঠিকই জ্যেষ্ঠা দিন। দিনের বেলায় "তারা" দর্শন করিয়া নাম পরিবর্ত্তন অসম্ভব ছিল।

চিত্রাপক্ষীয় নিরয়ণস্থানসহ জন্মকুণ্ডলী—

র ১৬°।১৭′
দশম
১৬°।১৭′
ম ১৭°
বু ৮°।২৫′
শ ১৯।১৯
শু ২৮°।১৬
কে ১৫°।১০
রা ১৫°।১০′
লং ১৫°।২১
বৃ ২৮°।১১
চ১৬°।৫২°
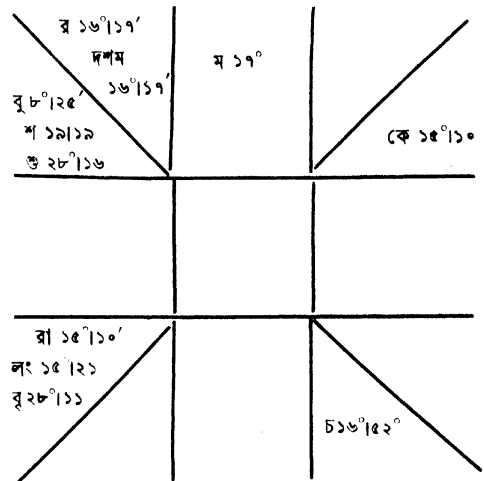
(আ) অর্জ্জুনের জন্মপত্রিকা।

প্রধান অবলম্বন—পূর্ব্ববৎ
দ্বিতীয় অবলম্বন—মহাভারত বাক্য

উত্তরাভ্যাং ফল্‌গুনীভ্যাং নক্ষত্রাভ্যামহং দিবা।
জাতো হিমবতঃ পৃষ্ঠে তেন মাং ফাল্গুনং বিদুঃ ॥

বিরাট, অধ্যায় ৪৪,১৩৮৪. সংস্করণ

কলিকাতা—এসিয়াটিক সোসাইটী কৃত সংস্করণ।

ইহার অনুবাদ এইরূপ; "আমি হিমালয় পর্ব্বতের পৃষ্ঠে চন্দ্র উত্তর ফল্গুনীদ্বয়ের সমাযোগ দিবসে জন্মিয়াছিলাম। এই জন্য আমার ফাল্গুন বলিয়া প্রসিদ্ধি হইয়াছিল।"

এই বাক্য হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে পাণ্ডবকালে "নক্ষত্র" শব্দে শুধু "তারা" বুঝাইত। "ফল্গুনী," "উত্তর," ও "নক্ষত্র" তিনটী বাক্যই দ্বিবচনান্ত।

অর্জ্জুনের জন্মকুণ্ডলী চিত্রাপক্ষীয় নিরয়নস্থান যুক্ত। জন্মদিন জুলাই ৩০,২৫০১ খৃঃ পূঃ অব্দ, কুরুক্ষেত্র কাল প্রাতঃ ৯টা ১৫ মিঃ।
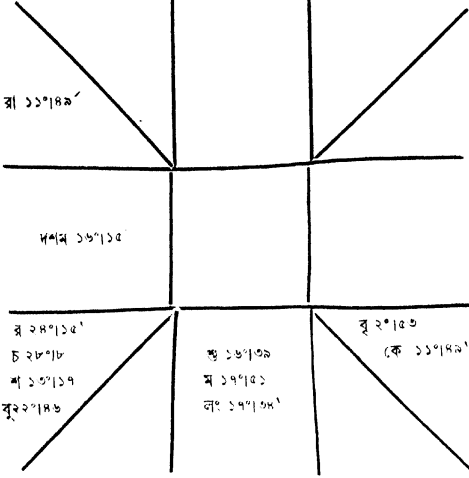
লগ্নের কথা বা জন্ম সময় কিছুই স্পষ্ট করিয়া দেওয়া নাই। কাল আমরা প্রাতঃ ৯টা ১৫ মিনিট গ্রহণ করিলাম। শুক্র, মঙ্গল ও লগ্ন একই তুলা রাশিতে।

অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ সমবয়সী ছিলেন মহাভারত হইতেই পাওয়া যায়। যখন অর্জ্জুন স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীকে লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া জয় করেন, তখন তাঁহার বয়স আনুমানিক ২৫ বৎসরের আসন্ন ছিল। এই ঘটনার পরে যখন পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদের সখ্য সংস্থাপিত হইল, তখন পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল প্রায় ২ বৎসর হইয়াছিল। অর্জ্জুন বনবাস ১২ বৎসর। তার পর রাজসূয়যজ্ঞ তখন অর্জ্জুনের বয়স প্রায় ৩৯ বৎসর। পাণ্ডব বনবাস ১৩ বৎসর। ভারতযুদ্ধ কালে অর্জ্জুনের বয়স ৫২ বৎসর।

(ই) শ্রীকৃষ্ণের জন্মপত্রিকা—

জন্ম সময়, ২৪০১ খৃঃ পূঃ অব্দ, জুলাই ২১এর পরবর্ত্তী মধ্য রাত্রি কুরুক্ষেত্র কাল। অর্জ্জুন হইতে শ্রীকৃষ্ণ ৯ দিনের বড় ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মকুণ্ডলী—২৫০১ খৃঃ পূঃ অব্দ, জুলাই ২১, মধ্যম মধ্য রাত্র কুরুক্ষেত্র কাল।

চিত্রাপক্ষীয় গ্রহস্থান যুক্ত।

চ ১৭°।১৪´
লং ২০°।৩২
রা ১২°।১৯
দশম ১৫°।২
বৃ ২১°।৪৩´
শ ৮।১৭
ব ১৫°।২
মং ২৩°।২৯´
শু ২৬°।৩২
বৃ ২°।৩৮´
কে ১২।১৯
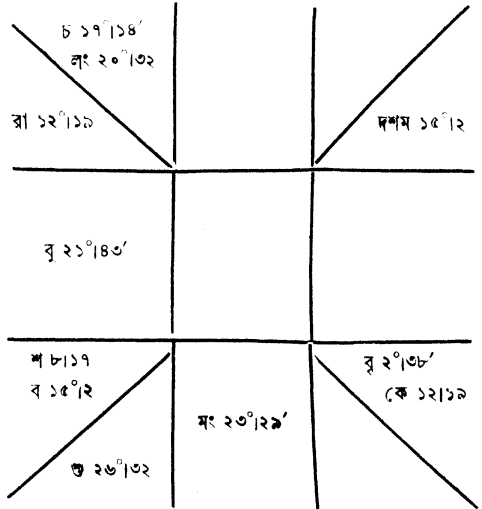
স্মৃতি

শ্রীপুলক আঢ্য

ভুলেছি আজ তারিখ, তিথি, সন্,
এসেছিলে বন্ধু তুমি কবে ?
বাদল ঝরা ভাদর সাঁঝের মেঘের মহোৎসবে
খুসির খেয়ায় ভাসল দু'টি মন।

হঠাৎ দেখি খেয়ায় তুমি নাই
বৈঠা বেয়ে চলছি আমি একা
তখন ফিরে মনের পানে চাই,
দেখি সেথায় নামটি তোমার লেখা।

১৭

পরের শনিবার···মীরা এল ডাকতে, কি রে কমলা যাবি নাকি? আজ খুব ভাল কথাকলি-ডান্স আছে। দু' টাকা করে টিকিট।

না। কমলা বিষণ্ণ মুখে উত্তর দিলে।

কেন—চ না, আমি না হয় তোর টিকিটের দাম দিয়ে দেব। দক্ষিণ ভারতের নামজাদা নাচ—এখানকার ছেলে-মেয়েরা কেমন শিখেছে—দেখবি নে?

তোমরা সীটে বসিয়ে রেখে কোথায় যে যাও!

ওমা—যাব না! কত বন্ধু-বান্ধব আসে—চেনা-শোনা লোক—তাদের সঙ্গে দুটো গল্পগাছা করি। এই দেখ না—গেল শনিবারে তো ফিরলাম রাত তিনটেয়—মাস্টার অবশ্য পৌঁছে দিলেন। একটা সায়েবি হোটেলে ঢুকে তোফা খানা খাওয়া গেল—মোটর চেপে কতদূর বেড়ানো গেল···চ যাবি?

না। তোমরা চলে গেলে পর—একটা ছেলে তোমাদের চেনে বলে যা কাণ্ড করলো।

মীরা হেসে বললে, ও—সেই বুঝি গোলাপ ফুল দিয়েছিল! তা ও-গুলো ভারি হ্যাংলা কিনা—ভাবে নিজেরা খুব চালাক। কোন্ ফাঁকে আমাদের নাম শুনে তোর সঙ্গে ভাব জমাতে গেছে! মীরা উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল। বললে, ওদের দৌড় এই ফুলের তোড়া পর্য্যন্ত—বড় জোর একখানি ট্যাক্সি! না, তাও নয়। ওরা ভাল মোটর কোথায় পাবে—কোন সায়েবি হোটেলে ভাল খানা পাওয়া যায়, জানে না। পড়ে তো ইস্কুল কলেজে—বাবা মায়ের হাততোলায় থাকে—আমাদেরই মত মধ্যবিত্ত ঘর—ওর বেশী আর কোথায় পাবে বল। আহা বেচারী। কথা শেষে মীরা পুনরায় হেসে উঠল।

না মীরাদি—আমি আর যাব না। বাবা ওসব পছন্দ করেন না।

ওঃ—তাই বল! আমি ভাবলাম বুঝি তোরই অনিচ্ছে।

মীরা চলে গেল। সন্ধ্যাবেলায় সাজ-গোজ করে দুই বোনে কমলাদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। বললে, চললাম—তুই তো আর গেলিনে।

আরও দু' একঘরের সামনে একটু দাঁড়িয়ে কাউকে অকারণে কিছু বলে—কাউকে বা রহস্য করে নেমে গেল। সারা বাড়ীটার কুশ্রী দৈন্যের উপর প্রগতি-বিমুখ বাসিন্দাদের উপর কষাঘাত করে গেল যেন। পুষ্পসার সুরভিতে বাড়ীটা খানিকক্ষণ ভরে রইল।

কমলার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই শুধু আকুল হ'ল না, দু'টি চোখে ওদের সাজ-সজ্জার দীপ্তি মায়াবিভ্রম এঁকে দিলে। একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। পাদপ্রদীপের আলো শোভিত রঙ্গমঞ্চ—আর অপরূপ দৃশ্যপট—নৃত্য লাস্যের বিচিত্র-ভঙ্গিমা আর সুরস্রাবী বহু যন্ত্রের অপূর্ব্ব ধ্বনির সঙ্গে নূপুরের নিক্বণ—চঞ্চল কিশোরী চিত্তকে উদ্বেল করে তুলল।

সুরভঙ্গ হল পরের দিন সকালে।···মীরা ইরাদের বন্ধ ঘরে সেনদিদির আক্রোশক্ষুব্ধ চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল; তোরা ভেবেছিস কি? গান শিখতে দিয়েছি বলে কি—সারা রাত বাইরে ঘুরে বেড়াতে বলেছি! ছি—ছি—ছি!

আরও অনেক তর্জ্জন-গর্জ্জন চলল ঘরের মধ্যে। বাইরে তার ভাষা স্পষ্ট হল না। সেনদিদি—সব দুয়োর জানালা এঁটে বন্ধ করে দিয়ে মুখ খুলেছেন। বাড়ীতে পাঁচজনের সঙ্গে বাস করে, আত্ম-সম্মান বাঁচিয়ে—ছেলে মেয়েদের শাসন করাও কি কঠিন!

বৈকালে ভগবতীর কাছে এলেন মনের দুঃখ জানাতে। একজনকেও মনের কথা না জানালে সেনদিদি অসুস্থ হয়ে

পড়েন। ভগবতী পাড়াগাঁয়ের মানুষ—কয়েক মাস হ'ল মাত্র শহরে এসেছেন। সরলা—খানিকটা নির্ব্বোধও বটে। তা ছাড়া আর একটি তাঁর সহগুণ—পরের কথা নিয়ে বিস্তার করা তাঁর অভ্যাস নয়। মান-সম্মান অটুট রেখে—দুঃখ-নিবেদনের এমন উপযুক্ত পাত্রী সেনদিদি আর কোথায়ই বা পাবেন।

বললেন, বেশ করেছিস ভাই—মেয়েটাকে হৈহুল্লোড়ে ছেড়ে দিসনি। গান শেখানোর নাম করে—ওরা অমনিই করে। প্রত্যেক ছুটিতে কোথাও না কোথাও লেগে আছে। এক পাল সোমত্ত ছেলে—আর এক পাল সোমত্ত মেয়ে যদি—অমনি রাত ভোর—নাচ দেখে—হোটেলে খেয়ে—মোটরে চড়ে হৈ হৈ করে বেড়ায়, তুমিই বলত ভাই—ভূমণ্ডলে কে এমন সাধু-সন্ন্যেসি আছে যার মনে—সন্দেহ হবে না। বলেছি বলে—ফোঁস করে উঠল দুই মেয়ে—আমরা সেকেলে—আমাদের মন ছোট। আ মর—তোরা আমার পেটে হয়েছিস—না আমি হয়েছি তোদের পেটে! যখন-তখন মুখের ওপর যে কঁ্যাট-কঁ্যাট করে বলিস—সে বুঝি উঁচু মনের কথা। হলই বা পেটের মেয়ে—যা হক—তা বলব। কর্ত্তা তো রয়েছেন বাড়ীতে—বললাম রাত্তিরে, মেয়েরা তো এখনও বাড়ী এল না—তুমি ওদের বারণ করে দিও—এরপর যেন না যায়। নিজের সোমত্ত বয়েসের কথা ভুলে বসে আছ! বললেন, আমি কি বলব—সব ঘরেই এই। আমাদের অ্যাকাউণ্টেণ্ট-বাবু অফিসারবাবু সকলকারই বাড়ীর মেয়ে ছেলেরা অমনি ক্লাবে যায়—শোয়ে যায়—কলকাতার বাইরে বেড়াতে যায় দল বেঁধে। ওঁরা বলেন, কি করব—কালের ধারা। বললাম, আমরা তো সায়েব মেম হইনি যে তাদের মত চলতে হবে। বললেন, না হলেও ওদের মতেই জগৎ চলছে—যা ভাল তা সবাই নেবে। ভাল! পোড়া কপাল অমন ভালয়। বললাম, তাহলে তুমি বারণ করবে না? বললেন, তুমিই বলো না। শোন কথা। আমি যেন রোজগার করে খাওয়াচ্ছি—তাই আমার কথা শুনবে ওরা। এর আগে তো কত বারণ করেছি—ওরে অত ভাবন করিসনি—যা রয় সয় তাই ভাল। তোদের মত বয়েসে স্নো-ক্রীম কি জানতাম না, মুখে কখনও পাউডার মাখিনি, ঠোঁটের রং—নখের রং—চোখে সুর্মা এসব বাইজীদের দিতে দেখেছি। এত যে সাবান ঘষে ঘষে মরছিস দেহের বর্ণ একটু উজ্জ্বল হলো? গলা ফুলিয়ে ঝগড়া কত! বলে, তোমাদের সেকালে এসব ছিল—তা দেখবে কি। তোমরা কোথায় দুধের সর—ব্যাসন গাছের পাতা এই সব মুখে মেখেছ! বললাম, তাতে তো গায়ের রং তোদের মত জ্বলে-পুড়ে যায়নি। মেম মাগীদের গালে যেমন মেছেতা পড়ে—গালের চামড়া জড়ো হয়ে যায়—যেমন গামছা নিংড়োলে হয়—তেমনি হবে তোদের অবস্থা—দেখিস। তা কে শোনে কার কথা। আরসী চিরুণী আর কোটো বাটা নিয়ে বসল তো এক বেলার ফের। সাজছে তো সাজছেই। এরা যে সংসারের কুটো ভেঙ্গে দু'খানি করবে সে আশা যেন কেউ না করে।

একটু থেমে দম নিয়ে বললেন, কর্ত্তা এলে দিয়েছেন—বলেন, আর ক'টা দিন—বিয়ে হলেই তো আমাদের দায়িত্ব ফুরুলো। বলি, শিক্ষার দায়িত্ব ফুরোয় বুঝি।···একঘরে যার মন বসলো না—আর এক ঘরে তার—মন বসবে। জামাইদের যে হাড়-মাস ভাজা-ভাজা করে তুলবে। কর্ত্তা হেসে বলেন, ভয় পেওনা—জামাইরাও আমাদের মত সেকেলে ছেলে নয়—ওরাও—হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে মানুষ হচ্ছে—নাচন-কোঁদন না হলে ওদেরও শান্তি হবে না। তা মিছে বলেন নি কর্ত্তা—যেমন হাঁড়ী তেমনি সরাই তৈরী করেন ভগবান। কিন্তু যতদিন আমাদের কাছে রয়েছে—আমাদের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলি কেমন করে!—তাই আজ সকালে বকলাম খুব।···দুই মেয়েও—মুখের ওপর চোপা করলে—কর্ত্তার সামনে, তবু—সমীহ করলে না!···এখন যতদিন বিদেয় না হয়—আমি কি করি বলত ভাই—বনে বাস করছি না তো—পাঁচজনের সঙ্গে রয়েছি। পাঁচজনে গাল কাত করে হাস্‌বে—তা সহ্য করব কি করে।

সেনদিদির—চোখে কখনো জল দেখেন নি ভগবতী—কি সান্ত্বনা দেবেন উনি ভেবে পেলেন না।

উঠে যাবার সময় সেনদিদি বললেন, আর একবার বলব—কথা না শোনে—ব্যবস্থা আমিই করব।—এমন ব্যবস্থা করব—যাতে বাছা ধনেরা বুঝতে পারবেন—হাড়ে হাড়ে।···তবে যদি আজন্ম থুবড়ো হয়ে থাকে থাকুক গে—এসব কেলেঙ্কারীর চেয়ে সে হাজার গুণ ভাল।

—তর্জ্জন গর্জ্জনের কিছু ফল অবশ্য পাওয়া গেল। পর পর দুই শনিবার মীরা ইরা কিছু বললে না।

সেনদিদি ভগবতীর কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, রাশ শক্ত করে ধরলে ফল হয় কিনা দেখলে তো ভাই।…উস্ খুস্ করে—এটা ওটা নাড়ে চাড়ে—সাহস করে আমাকে কিছু বলতে পারে না। যেমন পাজী রোগ —তেমনি তেতো ওষুধ দিতে হয়।

অনেকক্ষণ ধরে গল্প করলেন বসে বসে!—আমাদের বাল্যকালেও কি আর ভাব ভালবাসা ছিল না? ছিল। তবে তা এমন সৃষ্টিছাড়া বেয়াড়া রকমের নয়। আমাদের শ্বশুরবাড়ী আর বাপের বাড়ী পাশাপাশি গ্রামে। উনি তখন ইস্কুলে পড়েন—রংটা কালো বটে—কিন্তু ছিপ্ছিপে লম্বা চেহারার ছেলে—এখন ভুঁড়ি থলথলে দেহ দেখে ভাবছ তা কি করে হবে। তাই ছিল ভাই—কথায় বলে না কালোয় সুন্দর—তাই। নাক-চোখ-ভুরু-দাঁত মায় কোঁকড়ানো চুলটি পর্য্যন্ত। আমার মনে হত ব্রজের কিশোর—

ভগবতী রহস্য করেন, তাই বুঝি শ্রীরাধিকার মন মজে গেল।

তা-ভাই মিথ্যে বলব না—। ওঁকে দেখতাম—আর ভাবতাম মনে মনে—এই ছেলেটি যদি বর হয়তো বেশ হয়। ও যখন পাড়ার সামনের মাঠ দিয়ে ইস্কুলে যেত—আমি পেয়ারা তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম।…তারপর কপাল গুণে ওই বাড়ী থেকেই সম্বন্ধ নিয়ে এল রাঙা-ঠানদি। আমার বয়স তখন বার তের। বললে ডেকে, কি লো নাতনী বর পছন্দ হয়? বললে বিশ্বাস করবে না—আমি নাকি ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম, হাঁ। তাই নিয়ে কি ঠাট্টা—কি নাকাল!—তাই বলে কি বেহায়াপনা করেছি কোনদিন? দু'তিন বিয়েন হয়ে গেলেও গুরুজন সামনে থাকলে কখনও এঁর সঙ্গে কথা বলিনি।

বাল্যকালের ভালবাসার স্মৃতিতে কি মধু ছড়ানো আছে; একবার তার আস্বাদ নিলে জগৎ সংসার মুছে যায় চিত্ত থেকে। চির-কালিন্দীর কূলে এসে দাঁড়ালে—চির-কিশোরের প্রাণ-বাঁশীর সুর—চির কিশোরী-চিত্তকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—রূপলোকে—ভাবলোকে। মানুষের মনোলোকে যে বৃন্দাবন—তা বাইরের রূপলোকে অপরূপ নয়। মনেরই সেই রূপলোক—ভাবলোক তাকে সৃষ্টি করে চলেছে—কর্ম্ম-ক্লান্তির ক্ষণমাত্র অবসরের মধ্যেই প্রতিনিয়ত। সেখানকার বাঁশীর সুরে—এ জগতের কর্ম্মব্যস্ত একটি মৃগীও শ্রবণময় হয়ে তন্ময় হয় না—একটি ধেনুও উর্দ্ধপুচ্ছে প্রাণ-বেদী মূলে এসে আত্মনিবেদন করে না—তমাল বেষ্টিত একটি মাধবী লতাতেও ফুল ফোটে না।…যে সুরের জন্য অন্তরে এবং অন্তরের অলক্ষ্য-প্রসারিত তারে তার অনুরণন। কালের ঢেউ ঠেলে —প্রিয় স্মৃতির বিহ্বল কোন বৃত্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে মনে—তখন—সেই মনে জন্ম নেয়—চির-কালের কালিন্দী—প্রেমিক শ্যাম রায়—চিরকালিনী রাধা।

গল্প শেষ হয়ে গেলেও—বহুক্ষণ তন্ময় হয়ে বসে রইলেন সেনদিদি। ভগবতী যেন তার মধ্যে ডুবে আপন মনের গহনে স্মৃতি-মাণিক অন্বেষণ করে ফিরছেন। দু'জনের তন্ময়তা ভেঙ্গে গেল শাঁখের ডাকে—এই বাড়ীর কোন গৃহস্থ বধূ সন্ধ্যা আবাহন করছেন।

ধড়মড় করে উঠে পড়লেন সেনদিদি। ওমা—কখন সন্ধ্যে উতরে গেল কে জানে। যে সব ধিঙ্গি মেয়ে—ওরা কি আর এসব নেম-আচার পালবে। গিয়ে দেখব হয়তো বাকসো কৌটো আরসী চিরুণী নিয়ে ভাবন করছেন।

বটঠাকুর ফেরেন নি?

না ভাই—কোথায় নেমন্তন্ন আছে, ফিরতে রাত হবে! ছুটতে ছুটতে সেনদিদি চলে গেলেন।

তারপর কতক্ষণই বা কেটেছে। দুয়োরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে, ঠাকুরের সামনে প্রদীপ জ্বেলে পিলসুজের উপর বসিয়ে সলতেটা দেশলাই কাঠি দিয়ে সামান্য উসকে দিয়েছেন। তিনবার করেছেন শঙ্খ ধ্বনি—তারপর সেই শাঁখ গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে তাকের ওপর রেখে—একটি ধূপ জ্বালিয়ে রেখেছেন—প্রদীপের তলায় গুঁজে। এসব সেরে গলবস্ত্রে প্রণাম করছেন ভগবতী—এমন সময় বিরাট একটা ভূমিকম্পে ঘরখানি যেন কেঁপে উঠল—ঘর্ ঘর্ ঝন্ ঝন্—দুম দাম করে শব্দও উঠল প্রচণ্ড। কি যেন একটা ভারি জিনিস—কাঠ কিংবা খানিকটা পিতল—দমাস্ করে পড়ল মেঝেয়। মেঝেয় পড়ে সেটা ভেঙ্গে ছত্রখান হয়ে গেল—তার টুকরা অংশগুলি মেঝের সঙ্গে সংঘর্ষে আর্ত্তনাদ তুলল বিচিত্র ধরণের।

কি হল—কি হল? ওপর নীচের সবাই ছুটে এসে

জড়ো হলো সেনদিদির ঘরের সামনে। শব্দটা ওই ঘরের মধ্য থেকে উঠেছে। দুয়ার খোলা—কিন্তু অন্ধকার ঘরের চেহারাটা বাইরে থেকে দেখা গেল না। ঘরে তখনও সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলেনি।

কি গো দিদি—কি হল? কি পড়ল ঘরে? চারিদিক থেকে প্রশ্ন হল।

হলো আমার মাথা আর মুণ্ড। মেয়েরা তো সন্ধ্যে না জেলেই বেরিয়েছে—আমি অন্ধকারে যেমন ঢুকেছি ঘরে—

ওমা—সন্ধ্যে না হতে বেরুবে কেন? এই তোমায় বন্নু—মীরা, ইরা আমাকে বলে গেল, মাকে বলো মামী—আমরা চন্নু এক বন্ধুর বাড়ী—নেমতন্নে। রাত্তিরে যেন খাবার তৈরী না করে। তোমাকে বলে পিছন ফিরেছি—তুমিও ঘরে ঢুকেছ—তারপর এই পেল্লায় কাণ্ড। জ্বালনি গো আলোটা—কি ভাঙ্গল চুরল দেখি।

দাঁড়া উঠি আগে—তারপর আলো জ্বালছি।

রমা নিজের ঘর থেকে হ্যারিকেনটা নিয়ে এল। আলোটা হাতে নিয়ে সৌরভই প্রথমে ঢুকল ঘরের মধ্যে। ঢুকেই চীৎকার, ওমা আমি কোথায় যাব—এ যে একেবারে দক্ষিযগ্যি গো। আহাহা—অমন দামী বাজনাটা ভেঙ্গে শতেক টুকরো হয়ে গেছে! যেন হাতুড়ি দে কে পিটো পিটো ভেঙ্গেছে গো। আহা-হা—মেয়ে দুটো মরবে কেঁদে। তাদের অত সাধের গান-শেখা যন্তর—আহা-হা।

ভগবতী কাছে এসে যেন দিদির হাত ধরে বললেন, ওঠ দিদি, লাগেনি তো।

না। উঠে দাঁড়ালেন সেনদিদি। এই নিদারুণ ক্ষতি দেখে ওঁর মুখে একটিও রেখাপাত হ'ল না। যেন অন্য কারো ঘরের ভাঙ্গা জিনিস দেখছেন অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে। কণ্ঠেও সেই নির্লিপ্ত স্বর, তা আমার কি দোষ! অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়লাম বাজনার ওপর···নিজে যে মরিনি এই আমার ভাগ্যি। অপঘাত মৃত্যুর দায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া মানুষের মতই সেনদিদির মুখের ভাব।

ভগবতী অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হলেন।

১৮

অত বড় একটা বিপর্য্যয়ের জের···রাত্রিতে কর্ত্তা ফিরলে—কিংবা রাত্রি শেষে মেয়েরা ফিরলেও টানলেন না সেনদিদি। সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হ'ল—এবং অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কোন রকমে দিন চলে যাদের—মাসকাবারি বাঁধা মাইনের চাকরে, অথবা ছোট খাটো দোকান-কর্ম্মী—এদের ঘরে তুচ্ছ রকমের ক্ষতিও পৌছয় মর্ম্মান্তিক রূপে। একটি কাঁচের গ্লাস ভাঙ্গা থেকে একটি ক্লিপ হারানো পর্য্যন্ত মনের মাঝে এক একটি কাঁটা ফুটিয়ে অস্থির করে তোলে। তাই নিয়ে কত কলহ মন কষাকষি—অন্ন জল ত্যাগ—অভিমানের পালা যে অভিনীত হয়—তার আর ইয়ত্তা নেই। মেয়েদের শোকপ্রকাশটা যে কোন উপলক্ষে সরব হয়ে ওঠে। কথায় বলে—গরীবের একটি পয়সা বড়লোকের একটি মোহরের তুল্য। অভাবের সংসারে স্বভাবটাই মানুষের এমনি হায় হায় করা—বস্তুমূল্যে সুখদুঃখের স্বরূপ নির্ণয় চেষ্টা। সকলে আশ্চর্য্য না হয়ে পারে কি।

সেনদিদি সকালে উঠে যথারীতি গৃহকর্ম্ম করলেন। ছেলেদের চা জলখাবার খাইয়ে মাস্টারের কাছে পাঠালেন পড়তে। মেয়েদের ডেকে বললেন, চা হয়ে গেছে—মুখহাত ধুয়ে সব খেয়ে নাও। ওঁর আপিসের ভাত আছে তো।

মেয়েরা একে একে উঠল। মুখহাত ধুয়ে চা খেয়ে একটু অবাকই হ'ল।

ইরা মীরাকে বললে, ব্যাপার কি দিদি—মা যে চুপচাপ! কাল না বলে পালিয়েছিলাম—ভাবলাম না জানি আজ অদৃষ্টে কি আছে!

মীরা বললে, চুপ—শুনতে পাবে। এখনও ফাঁড়া কাটেনি। বাবা আপিসে গেলে দেখনা কি হয়।

কর্ত্তা আপিসে গেলেও কিছু ঘটল না। সেনদিদি ডাকলেন, আয় খাবি আয়।

সবাই খেতে বসল একসঙ্গে। কথা হল—দেশের, সেকালের, এর ওর তার। যে কথার সূত্র ধরে বিপর্যয় ঘটবার কথা—সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না মা। মীরা ইরা এবার অস্বস্তি বোধ করল। তবে কি কোন বড় রকমের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন? কে জানে ওঁর মনের কি ভাব।

যাই হোক খাওয়া দাওয়া শেষ হলে টুকি-টাকি দু' একটি কাজ সেরে ওরা শুয়ে পড়ল। রাত জাগার ক্লান্তি আছে তো।

ওদের মনের সংশয় নিরসন হল বেলা তিনটের সময়। মা যেন পাশের ঘরে কার সঙ্গে কথা কইছেন। গানের কথা—হারমোনিয়ামের কথা—এই সব। গলাটা মাস্টার মশাই'এর মত নয় ?

ইরা মীরার গা টিপে বললে, দিদি শুনচিস ! হারমোনিয়াম কাল অক্কা পেয়ে গেছে।

চুপ করে শোন। মীরা ইরার মুখে হাত দিয়ে ইসারা করলে।

যতীন বলছে, তা কাকীমা—ওটা না হয় সারিয়ে নিন।

না থাক—সারাবার মত অবস্থা আর নেই। খালি কাঠ-কাঠরার বোঝা। কালই তো জ্বালিয়ে চা তৈরী করলাম।

যতীন বললে, মীরারা তাহলে আর গান শিখবে না !

সেনদিদি বললেন, কর্ত্তা ছুটি নিচ্ছেন লম্বা। শীগ্‌গীরই আমরা দেশে যাব—না হয় পশ্চিমের কোথাও। হয়তো বাসা তুলে দিয়েই যেতে হবে—তাই ভাবছি আর নতুন কেন এসব হাঙ্গামা।

যতীন খানিক চুপ করে রইল।—তারপর বললে—আচ্ছা—তাহলে আমি উঠলাম। আপনারা যাবার আগে আসব।

এস বাবা—আমার মেয়েদের জন্য কত যে করলে—কিছুই শোধ দিতে পারলাম না !—আর ক্ষ্যামতাই বা কি আমাদের—কথায় বলে, ডোবার জল সমুদ্রে ঢালা !

না কাকীমা—এসব বলবেন না। বলতে বলতে যতীন দুয়ারের কাছে এল। সেখানে এসে গলা নীচু করে বললে··· দিনকতক দেশে গিয়েই থাকুন—সেই আপনাদের পক্ষে ভাল।

সেনদিদি বললেন, কেন বাবা—একথা বললে কেন ?

যতীন একটু হেসে বললে, পরে বুঝবেন। বলে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেই লজ্জা ভীরু মেয়েটি। ও যে হঠাৎ উঠবার মুখে সামনে পড়েছে মনে হল না—যেন প্রতীক্ষাই করছে যতীনের। ওর ভঙ্গীতে আজ আড়ষ্টতা নেই—অত্যন্ত সহজভাবেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি।

আপনি কি কিছু বলবেন আমায় ? যতীন জিজ্ঞাসা করলে।

রমা মাথা নেড়ে বললে, হাঁ।

তারপর নেমে এসে দাঁড়াল—বাড়ী থেকে বেরুবার গলি পথটিতে। বেলা তিনটেয় ত পথ নির্জ্জনই। পুরুষরা যে যার কাজে বেরিয়েছে—মেয়েরা কাজ সেরে নিদ্রা দিচ্ছে। তিনটের পর কলে জল এলে—ওদের ঘুম ভাঙ্গবে—ছেলেমেয়েরা ফিরবে ইস্কুল থেকে—তারপর বড়রা ফিরবেন—কর্ম্মস্থল থেকে—রাত দশটা পর্য্যন্ত গলিটা থাকবে কোলাহল-মুখর।

রমা মৃদু স্বরে বললে, আপনি কি কাল থেকে আর আসবেন না।

না—। জানেনই তো হারমোনিয়ামটা ভেঙ্গে গেছে।

রমা মৃদুস্বরে বললে, কেন হারমোনিয়ামটা ভাঙ্গল ?

যতীন বললে, এ বড় আশ্চর্য্য কথা ! জিনিস কেন ভাঙ্গে ?

রমা বললে, সে কথা আলাদা। কিন্তু সব জিনিসই কি হঠাৎ ভাঙ্গে—?

যতীন ওর প্রশ্নের ধরণে ঈষৎ চমকে উঠল। বললে, আপনি তাহলে জানেন—জিনিসটা কেন ভাঙ্গল ?

জানি।—মৃদুস্বরে রমা বললে।

তবু জিজ্ঞাসা করছেন কেন ভাঙ্গল ?

জিজ্ঞাসা করছি এই জন্য যে আপনিও এর কারণ জানেন বলে।

আমি।

হাঁ, জানেন। গান শেখবার নাম করে আমরা যদি যা-খুসি-তাই করি আমাদের অভিভাবকরা কি ভালবাসেন আমাদের !

যতীন আলোয় এল এতক্ষণে। বললে, ঠিক বলেছেন আপনি। কিন্তু জানেন তো আগাছার গোড়া কেটে দিলেও সে মরে না।

জানি। এই আগাছাও তো হঠাৎ জন্মায় না—সামান্য মাটি তার দরকার হয়। সে মাটি যারা জোগায়—তারাই কি—

যতীন বললে, মানলাম তারা দোষী। তবু বলে রাখি এর জন্য দায়ী আমি নই। সুরের আশ্রয়ের ওপর অসুরের

লোভ চিরকালের, উৎপাত তারা করেই—তার জন্য যারা সুরের উপাসক তাদের দোষ দেবেন কি?

দোষ আমি কাউকে দিইনে—আমরাই দুর্ব্বলা, আমরাই দোষী। রমার স্বরও দুর্ব্বল মনে হল।

না—না—ওকথা বলবেন না। যতীন বিব্রত হয়ে বললে, আমি জানি—আপনার মধ্যে সুরের তৃষ্ণা আছে, আপনি মীরা ইরার মত হালকা নন—

রমা বললে, আমাদের সংসার কত যে ভারি সে আপনি জানেন না—হাল্‌কা হবার সময় কই আমাদের। কিন্তু একটি অনুরোধ করব আপনাকে—রাখবেন কি?

বেশ ত—বলুন।

—এইভাবে গান শেখানো—পারেন তো ছেড়ে দিন। ···দেখলেন তো আমরা কত নির্ব্বোধ। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা।···আমরা ভুলে যাই কোথায় মাটি —আর আকাশ কোনখানে!

আপনি—কিন্তু মাটি আর আকাশের তফাৎ জানেন।

না—না—জানি না। প্রায় আর্ত্তস্বরে রমা বললে।

যতীন চুপ করে রইল। এই মেয়েটি যেন প্রহেলিকা। ···এ কেন চেয়ে থাকে নিত্য সন্ধ্যাকালের—আকাশের দিকে—কেন দুঃখ বেদনা সম্বন্ধে অত সচেতন?···এর কণ্ঠের সুর অপূর্ব্ব—স্বর স্বমর্য্যাদায় স্নিগ্ধ, অশ্রু আভাসে ···মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগায় অসংখ্য। আশ্চর্য্য মেয়ে।

অবশেষে যতীন বললে,···আমি আর একদিন এসে আপনার কথার জবাব দিয়ে যাব।

আবার আসবেন কেন—! এতো আমার সামান্য অনুরোধ—

সামান্য নয়—আমাকে···ভাবতে হবে।—আচ্ছা নমস্কার। যতীন চলে গেল।

রমা···আঁচলে চোখ মুছে—সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগিল।···মনে হল—পা দু'টিতে ওর শক্তি নেই—সিঁড়ির সব ক'টি বাধা বুঝি অতিক্রম করতে পারবে না—সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল রমা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বোবা সিঁড়ি—অজ্ঞান সিঁড়ি—কারও আসা যাওয়ার পদক্ষেপ গণনা করে না—কারও গোপন কথা বা দীর্ঘ নিশ্বাসের অর্থ বোঝে না—কারও জন্য সঞ্চয় করে রাখে না কোন অকথিত বাণী,—সুখ কিংবা বেদনা···

তবু অনেক পায়ের ছাপে অপরূপ একটি পায়ের ছাপ অস্পষ্ট হয় না।—সে ছাপ সিঁড়ির বুকে এবং মানুষের বুকে একই সঙ্গে রেখাপাত করে বলেই—বুকের আশ্রয়ে থাকে—অনপনেয়।—তবু রমার মনে হল—সে ছাপও বুঝি মুছে গেল।—নিষ্ঠুর রাজপুত্র—ভালবাসার মন্ত্র দ্বারা রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গাতে আসে না—আসে ঘুম ভাঙ্গিয়ে বহ্নি-দাহে···জ্বালা বাড়াতে।

···সদর দরজা খোলার শব্দ হ'ল—ছেলেদের বিচিত্র কণ্ঠে বাড়ীর দলিজ পূর্ণ হ'ল। ওরা ইস্কুল থেকে ফিরছে, সিঁড়িটা আর রমার নয়—বহু পদপাতে···বহু মানুষ এর গায়ে···বিচিত্র বৃত্তির স্মৃতি ছড়িয়ে দেবে।

সুরমার ঘরে এসে দেখল—মেঝেতে পাতা বিছানাতে শুয়ে সুরমা একখানি নভেল পড়ছে। তন্ময় চিত্ত। অন্য সময় হ'লে রমা ফিরে যেত,—আজ চিত্ত ভার নিয়ে আর কোথাও যেতে তার ভাল লাগছে না।—ধীরে ধীরে এসে সে বিছানার ধারে বসল। সুরমার তন্ময়তা কাটল। তাড়াতাড়ি বইখানি মুড়ে মাথা তুলল সে। খবর কি? ঝড়-খাওয়া চারা গাছের মত আছড়ে পড়েছ যে?

তোমার সেলাই কলটা খুলবে এখন—একটা নতুন সেলাই শিখবার ইচ্ছে হয়েছে।

তবু ভাল—এতদিনে একটা নতুন কিছু শিখবার ইচ্ছে হল?

বারে তোমার কাছে সায়া, ব্লাউজের কাট, ছেলেদের ফ্রক পেনি ইজের তৈরী এসব শিখিনি। কিন্তু এসব শিখেই বা লাভ কি—সুরমাদি। ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থাকলেই এসব শেখার সার্থকতা।

সুরমা বললে, না রমা—এর মধ্যে অনেক আশা—অনেক কথা শুনতে পাবি।—প্রথম বিয়ে হয়ে, ছিলাম একটি বাড়ীতে—একরকম শ্বশুর বাড়ীই।—আপন শ্বশুর শাশুড়ী তো ছিলেন না। সব দূরের আত্মীয়। দু'দিনে তাঁদের সঙ্গ অসহ্য হয়ে উঠল।—ওঁকে বললাম, একটা কল কিনে দাও—লাইব্রেরির মেম্বার করে দাও আমায়, না হলে দু'দিনেই মারা যাব। বললেন, তাই হবে। তবে ভয় নেই—চিরদিন এখানে রাখব না তোমায়—সুবিধা হ'লেই বাসায় নিয়ে যাব। ঘরে দুয়োর দিয়ে কল নিয়ে পড়লাম। যেথান থেকে কল কেনা হল—সেথান থেকে মাস্টারের ব্যবস্থাও

হল। সারা দুপুর কাটল কল নিয়ে। কল যখন চলে—কি অদ্ভুত শব্দ হয়। শুনেছিস তো—কি মিষ্টি শব্দ।—ও বোনে সুতার জালে মানুষের অঙ্গশ্রীর উপাদান,—আমি বুনি মনের সুতোয়—আমারই সাধ আশার অঙ্গাবরণ। বুনতে বুনতে কতদূরে যে চলে যাই—পৃথিবীর ধুলোর ঝড়—আমায় ছুঁতেই পারে না।

কিন্তু এখন তো দেখলাম—কলে ঢাকনির ওপর কত ধূলোই জমে ছিল।

হাঁ—এখানে এসে অন্য জগৎ পেলাম যে! সুরমা হেসে উঠে বসল। মেয়েরা যতদিন তাদের সত্যিকারের জগতে না পৌছতে পারে—ততদিনই এটা ওটার পরথ করেই। সত্যি মিথ্যে বুঝবি পরে।

আমার সত্যি মিথ্যে বুঝে কাজ নেই। তবে একটি জগৎও যদি একটুখানি জায়গা দেয়—তাই পরম লাভ বলে মানব।

ইস—এত অভিমান কেন?

সবই তো জান সুরমাদি। রমার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল।

সুরমা তাড়াতাড়ি ওর কাছে এসে বলল, কান্না আমি ভালবাসি না রমা—।

রমা বললে, আচ্ছা কাঁদব না—সেলাই শিখিয়ে দাও।

ঘটাঘট—টেন্ টেন্, কলের সুরে মোহ আছে। রমা অল্পক্ষণের মধ্যেই সহজ হয়ে উঠল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলল কল।—তারপর সুরমা বললে, আয় না—ওঠা যাক, ওঁদের আসবার সময় হ'ল। কল বন্ধ করে রমাও উঠে দাঁড়াল।

সুরমা বললে, এইবার বলত—তোর চোখের জলের কথা। এক চোখ জল নিয়ে যে মনের ব্যথা জানায়—সে অনায়াসে মানুষ খুন করতে পারে!

রমা সংক্ষেপে সব বললে।—কথা শেষে মন্তব্য করলে, ওরা আসল রাজপুত নয়—মায়াবী।

সুরমা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, দোষ ওদেরও নয়—আমাদেরও, আমাদের যাঁরা অভিভাবক তাঁদেরও। তাঁরা এমন শিক্ষা দেন যা ওদেশের ওপরের বস্তু—নাচের মধ্যে আর্টের সাধনা—শরীরের স্বাস্থ্য—মনের প্রসার এসব আমরা বুঝি কম। গানের সুরে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর আস্বাদ—আমাদের কল্পনাতেও আসে না—সুন্দর কাকে বলে—সে রুচিও আমাদের সূক্ষ্ম নয়—কাজেই এসবের যে আর একটা দিক আছে—সেইটে নিয়েই মাতামাতি আমাদের।

আমি জানতাম—উনি অন্ততঃ সুরের পূজারী।

দেবতা যে নেমে আসে মর্ত্ত্যে—প্রলোভনের বশীভূত হয়ে। ঋষিদের তপোভঙ্গের গল্প শোননি?

এ তুমি বেশী করে বলছ সুরমাদি।

হতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত কাউকে কমিয়েই বা দিই কোন ভরসায়? অপেক্ষা কর দু'দিন, সত্যি মিথ্যে যাচাই হয়ে যাবে।

হাল্কা পা ফেলে রমা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল নীচের রান্নাঘরে।—উনুনে আগুন দিয়ে—বালতিতে জল ভরে নিতে হবে। তারপর কুটনো কোটা, ময়দা মাখা,··· সংসারে অনেক কাজ।

(ক্রমশঃ)

এলো যবে আহ্বান

শ্রীহরিচন্দন মুখোপাধ্যায় এম-এ

এলো যবে আহ্বান অনাগত পৃথিবীর
যন্ত্রদানব এলো সাথে লয়ে জয়গান,
বজ্রের বুকে বাজে শেষ কথা দধীচির
চারিদিকে হানা দেয় বিজ্ঞান-শয়তান!
প্রগতির ঢেউ এলো নবযুগ বাহিয়া
মানুষের মনে জাগে না-পাওয়ার বেদনা;
রাজনীতি বন্যায় গেল দেশ ছাইয়া
শতাব্দী-বুকে বাজে নব গণ-চেতনা।

নব-কিশলয়ে জাগে নতুনের ধ্বনি যে—
ফাগুনের রঙে ওই ঝঙ্কারে কাকলি;
তার সাথে কারখানা, কলে আর খনিজে
উদ্গারে ধোঁয়া আর হুঙ্কার কেবলই।
তথ্যের ছোঁয়া লাগে পুরাণের তত্ত্বে
বিশ্লেষণের জালে ভাবধারা ক্ষুণ্ণ;
রেশারেশি হোলো সুরু সুন্দরে-সত্যে
উদাস কবির মন—দৃষ্টি যে শূন্য।

সমবায়ে কৃষি ও তাহার বিপণন

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

সকল দেশের মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান পুরুষ তাহাদের অসাধারণ অধ্যবসায়, বুদ্ধি বা ব্যক্তিত্ব দ্বারা তাহাদের স্ব স্ব জীবনে তাহাদের অভীপ্সিত কর্ম্ম-ক্ষেত্রে—অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে, অভূতপূর্ব উন্নতি করিয়াছেন বা এখনও করিতে পারেন ; কিন্তু, অধিকাংশ ব্যক্তি, যাহাদের হৃদয় সতেজ নহে, চিত্তের স্থৈর্য পরিমিত, বুদ্ধির সীমা সংক্ষিপ্ত, অর্থের সীমা সংকীর্ণ তাহাদের স্বাতন্ত্রিক চেষ্টা সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে না বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইহাদের জন্য আবশ্যক—অপরের সক্রিয় সহযোগিতা, সমবেদনা এবং অর্থসাহায্য ; ইহাদের জন্য আবশ্যক—সুষ্ঠু পরিকল্পনা,—এবং সেই লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থায় কর্ম্মের আরম্ভ। সমবায়ের মূলকথা এখানে।

সমবায় অসাধারণ ভাগ্যবান পুরুষ সিংহগণের জন্য নহে—ইহা সাধারণ জনগণের জন্য। ব্যক্তিবিশেষের স্বাতন্ত্রিক চেষ্টা যেখানে ব্যর্থতা আনয়ন করে—কয়েকজনের সমবেত প্রচেষ্টা সেইস্থানে সফলতা আনিতে সক্ষম। কোন এক ব্যবসায়ী যেস্থানে যে বিষয়ে ব্যর্থতার মুখে হতাশা-গ্রস্ত হয়—সমবায়ী সভ্যগণ সে স্থানে সে বিষয়ে ব্যর্থতার স্তম্ভের উপর সফলতার সৌধ নির্ম্মাণ করিতে পারেন। সমবায় প্রথায় কর্ম্মীগণ চিন্তার সুযোগ পান—তাহাদের বুদ্ধিতে বিভিন্ন পরিক্ষেপে পরিমার্জ্জিত করিয়া, কর্ম্মের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারেন। সাধারণ ব্যবসায়ীগণের পক্ষে সমবায় প্রচেষ্টা শুধু সাধারণভাবে হিতকর নহে—তাহাদের প্রত্যেকের পক্ষে বিভিন্ন ভাবে হিতকর। কারণ সমবায়ী সভ্যগণ প্রত্যেকে তাহাদের অন্তর্বর্ত্তী অর্থবান ব্যবসায়ীগণের শোষণ ও পেষণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দ্রব্যাদি স্বল্পব্যয়ে এবং ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করিতে পারেন এবং উপযুক্ত লাভে তাহাদের বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদি বিপণন করিতে পারেন। সমবায়ের সুবিধা এখানে।

আমরা অনেকে যৌথব্যবসায় এবং সমবায়কে এক বলিয়া ভ্রমে পতিত হই। যৌথ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য এবং কার্যপ্রণালী এবং সমবায়ের উদ্দেশ্য এবং কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক। যৌথব্যবসায়ে অংশীদারগণের অর্থের সংযোগ মূল কথা—অংশীদারগণের সংযোগ আনুষঙ্গিক মাত্র। কিন্তু সমবায়ে অংশীদারগণের সংযোগ মূল কথা—তাহাদের অর্থের সংযোগ আনুষঙ্গিক মাত্র। যৌথ ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য—তাহাদের সমষ্টির স্বার্থে সমষ্টিগত লাভ এবং সেই লাভের অংশানুযায়ী বন্টন বিশ্বাস ইহার জীবন—স্পেকুলেশন ইহার কর্ম্ম ; কিন্তু সমবায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা এবং ব্যক্তিগত লাভ—অংশীদারগণের সক্রিয় সহযোগিতা ইহার জীবন—ব্যক্তিগত স্বার্থসংরক্ষণ ইহার কর্ম্ম।

আমাদের দেশে বহু সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু প্রায় সবগুলি একরূপ জীবন্মৃত। অনেক সমিতি যৌথ-ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য বা বুদ্ধি লইয়া কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং এখনও হইতেছেন। কিন্তু যৌথব্যবসায় যে প্রণালীতে চলে—সমবায় সমিতি আইনের অনেক বাধ্যকতায় সে প্রণালীতে কায করিতে পারে না। এজন্য কর্ম্মক্ষেত্রে নানাকারণে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, যাহারা সমবায় প্রথার কাযে লাভবান হইতে পারেন, তাহাদের অধিকাংশ অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন—এজন্য তাহারা সন্দিগ্ধচিত্ত এবং সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে অক্ষম। আর যাহারা শিক্ষিত ও সমবায়ের মূলতত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম—তাহাদের অধিকাংশের ব্যক্তিগত ব্যবসায় নাই—ব্যবসায়ের চেষ্টা নাই—ধৈর্য নাই—উৎসাহ নাই—ব্যবসায়ের বুদ্ধি নাই—চাকরীর জন্য সচেষ্ট—এজন্য সমবেত প্রচেষ্টা নাই—সমবায় সমিতি গঠন করিয়া দুই একজনের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তমনে কালাতিপাত করিতে থাকেন। ইহার ফলে সমিতিগুলি ধ্বংসের মুখে চলিতে থাকে।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয়—বাংলার প্রতি পল্লীগ্রামে সমবায় পদ্ধতিতে কর্ম্মের একমাত্র প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র—কৃষি এবং তাহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট বা তাহার উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন শিল্প ও তাহার বিপণন। বাংলার পল্লীবাসী প্রায় প্রত্যেকের কৃষিযোগ্যভূমি আছে ও তাহার সহিত চাষের স্বার্থ আছে। বিশেষতঃ কৃষিজাত ফসল আমাদের জীবন রক্ষার সহায়ক। এজন্য পল্লীবাসী শিক্ষিত আবালবৃদ্ধ-বণিতা কৃষি বা কৃষিজাত ফসলের সম্বন্ধে সচেতন। এজন্য প্রত্যেক পল্লীতে সমবায় সংস্থায় কৃষিকার্যের প্রকৃত সুযোগ ও সুবিধা আছে। সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য আরম্ভ হইলে পল্লীবাসী সকলেই স্ব স্ব স্বার্থ-সংরক্ষণের চেষ্টায় সক্রিয় সহযোগিতা করিতে বাধ্য হইবেন। সুতরাং সমবায় সংস্থায় কৃষির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হইবে।

পৃথিবীর সকল সভ্যদেশে বর্ত্তমানে কৃষিকার্যের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছে—কিন্তু আমাদের দেশে এখনও সেই মান্ধাতা আমলের প্রথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলবাঁধা জমিতে অস্থিচর্ম্মসার বলদচালিত লাঙ্গলে নামমাত্র কর্ষণে কৃষিকার্য চলিতেছে। আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এটা ঠিক ফুটো কলসীতে জল আনার মতো।—জল আনার পরিশ্রম হয় সম্পূর্ণ—অপব্যয় হয় বেশী, তৃষ্ণা মেটে না।

পৃথিবীর সকল সভ্যদেশে কৃষিজীবীগণ শিক্ষায় দীক্ষায় তৎতৎ দেশের সমাজের পুরোভাগে আসিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষিজীবীগণ দুর্গম পল্লীঅঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয়জলে বঞ্চিত হইয়া অশিক্ষা এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া ম্যালেরিয়া ক্লিষ্ট শরীরে কোনরূপে জীবন ধারণের দুর্বহ কষ্টভোগ করিতেছেন।—তাহাদের না আছে সংস্কৃতি—না

আছে শক্তি—না আছে সংহতি। তাহারা আজিও কূপমণ্ডুক-তুলা, জড়তাগ্রস্ত, অপরের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। তাহারা তাহাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ—তাহাদের বৃহৎ স্বার্থ—জাতির স্বার্থ বুঝিতে অক্ষম।

ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ১৭ জন মাত্র সহরবাসী—বাকী সকলেই পল্লীবাসী। পল্লীবাসী প্রায় সকলেই কৃষির উপর নির্ভরশীল—তাহাদের অধিকাংশের অপর কোন অবলম্বন নাই। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে শিক্ষা কৃষির সহায়ক হইয়াছে—শিল্পমুখী করিতে পারিতেছে কিন্তু আমাদের দেশে আজিও তাহার বিপরীত। পল্লীবাসী নিরক্ষর কৃষক বা শিল্পীর পুত্র সামান্য শিক্ষালাভ করিয়াই চাকরীলাভের আশায় সহর অঞ্চলে ছুটাছুটি করে বা করিতে বাধ্য হয়। তাহার কারণ—সামন্ততান্ত্রিক যুগের শিক্ষাপদ্ধতি এবং মান্ধাতা আমলের কৃষি ও শিল্পের ব্যবস্থা। সুতরাং স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের উপযোগী করিয়া শিক্ষাধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন এবং অধুনাতম প্রথায় কৃষি এবং তাহার সংশ্লিষ্ট শিল্পের পরিচালনা ভিন্ন পল্লী অঞ্চলে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি দুরাশামাত্র। বিশেষতঃ আমাদের এই উপমহাদেশে এবং কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উন্নতি প্রধানতম কাম্য। সুতরাং কৃষির উন্নতি ভিন্ন পল্লীগ্রামের উন্নতি—পল্লীগ্রামের উন্নতি ভিন্ন ভারতের সামগ্রিক উন্নতি এবং বেকার সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা বায়ুস্তরের উপর দুর্গ নির্ম্মাণের মতো কল্পনাবিলাস মাত্র।

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেকার সমস্যার সমাধান হয় নাই—ভারতের সর্ব প্রদেশের মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত জনগণের ক্রয়শক্তি এবং তৎসহ তাহাদের জীবন মানের অবনতি হইয়াছে। এজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেই ক্রটী সংশোধনের চেষ্টা হইতেছে।

বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসরকার সমস্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীগণের উচ্ছেদে কৃষিজীবিগণের এবং তাহাদের কৃষিযোগ্য ভূমিসমূহের নিয়ন্ত্রণের আইনতঃ অধিকারী হইয়াছেন। এক্ষণে আশা করা যায়, নূতন ভূমি-সংস্কার আইনের সুব্যবস্থায় পল্লী অঞ্চলের উন্নতি হইবে। কিন্তু ভূমি-সংস্কার আইনের যে পাণ্ডুলিপি বিধানসভায় পেশ হইয়াছে এবং যাহা বর্ত্তমানে যুগ্মসিলেক্ট কমিটীর বিবেচনাধীন আছে—তাহাতে শিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত পল্লীবাসীগণকে পল্লীমুখী করিয়া কৃষিমনোভাবাপন্ন করিবার কোন সুবিধা বা সুযোগ দেওয়া হয় না, বরং বিপরীত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ঠিক ইস্পাত না দিয়া শুধু লৌহ দ্বারা অস্ত্র নির্ম্মাণের মতো হাস্যকর।

নূতন ভূমিসংস্কার আইনে কৃষির উন্নতির জন্য দুইটী ব্যবস্থা আছে—(১) "জমি একত্রিত করণের ব্যবস্থা (৪০ ধারা) (ক) রাজ্যসরকার স্বয়ং ইচ্ছা করিলে বা (খ) অন্ততঃ দশজন রায়ত নিবেদন করিলে যাহাদের জমিগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে তাহা একত্রীকৃত করিতে পারিবেন।"—কিন্তু সরিকী অংশ বিভাগ এবং হস্তান্তর যখন চলিতে বাধ্য তখন ঐ একত্রীকৃত অবস্থা পুনঃ পুনঃ খণ্ডীকৃত হইতে বাধ্য। সুতরাং কৃষিকার্য পরিচালনার ধারা পরিবর্তন না করিলে, এই ধারা রায়তের প্রকৃত উপকার করিতে সমর্থ হইবে না।

(২) সমবায় প্রথায় কৃষির বিধান (৪৪ ধারা)। এই ধারায় আছে অন্ততঃ ১৫ জন রায়ত যাহাদের (ক) প্রত্যেকের ৫ একরের কম জমি আছে (খ) এবং সংলগ্ন অবস্থায় আছে (গ) মোট জমির পরিমাণ অন্ততঃ ৩৩ একর (ঘ) তাহারা যদি একত্রে আবেদন করেন তাহা হইলে তাহারা সমবায় প্রথায় চাষ করিতে অধিকারী হইতে পারেন। এই ধারায় রাজ্যসরকারের ইচ্ছার কথা সন্নিবিষ্ট নাই। আর যে সকল সংগঠনের সর্ত্ত আছে তাহাও একরূপ অপ্রত্যাশিত এবং বহুক্ষেত্রে অসম্ভব। যাহাদের জমির পরিমাণ ৫ একরের বেশী তাহারা সমবায়প্রথায় কৃষিকার্যে কেন অপাংক্তেয় হইতেছেন বুঝা যায় না।

যাহাদের জমির পরিমাণ ৫ একরের বেশী তাহারা সকলেই তার অধিকাংশ ভূতপূর্ব মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ বা বড় বড় জোতদারগণ। ইহারা সকলেই অল্পাধিক শিক্ষিত। সুতরাং মনে হয় এই ধারায় শিক্ষাকে কৃষির সহিত অহি-নকুল সম্বন্ধ মনে করা হইয়াছে।

যে সকল দেশে কৃষির এত উন্নতি হইয়াছে সেই সকল দেশে বুদ্ধিজীবি-গণকে কৃষকগণের সহিত একযোগে কার্য করিতে হইয়াছে বা হইতেছে। রাজ্যসরকার এই সংযোগের সহায়ক। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষিত কৃষিজীবিগণকে নিরক্ষর কৃষকের সহিত একযোগে কার্যের সুবিধা দেওয়া রাজ্য সরকার মনে হয় ইচ্ছা করেন না। তাহাদের ভাবধারায় মনে হয় একরূপ করিলে শিক্ষিত জনগণ কৃষির সংশ্রব ত্যাগ করিয়া শিল্পমুখী হইতে বাধ্য হইবেন।

অন্য প্রদেশের কথা বলিতে পারি না—বঙ্গদেশের সমস্যা—বাঙ্গালীর সমস্যা—বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারা অন্যান্য প্রদেশ হইতে একটু বিশেষ ধরণের। বাঙ্গালী আজ প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া শিল্পবিমুখ। তাহাদের নিজস্ব বহু শিল্পকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হইয়াছে। বাঙ্গালী তাহার শিক্ষার মত্ততায় এবং সহজলভ্য চাকরীর মোহে দেড়শতাধিক বৎসর ব্যবসায় বাণিজ্যকে অশ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন। আজিও বাঙ্গালী সমাজে চাকরীজীবির যে সম্মান, ব্যবসায়ীর সে সম্মান নাই। কিন্তু বাঙ্গালী কৃষির সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ করেন নাই। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে পল্লীবাসী প্রত্যেক বাঙ্গালীর কৃষির সহিত সংশ্রব আছে। সুতরাং পল্লীবাসী বাঙ্গালীকে হঠাৎ কৃষির সংশ্রব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শিল্পীমনোভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা বাঙ্গালীকে তাহার নিশ্চিত উন্নতির পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অনিশ্চিত পথে চলিতে বাধ্য করা। ইহা সঙ্গত কিনা তাহা বিশেষ চিন্তার বিষয়। বাঙ্গালীকে শিল্পমুখী করিতে হইলে তাহাকে কৃষির মাধ্যমে ধীরে ধীরে করাই সঙ্গত।

কিঞ্চিদধিক সাড়ে বার লক্ষ মধ্যস্বত্বাধিকারী এবং তাহাদের উপর একান্ত নির্ভরশীল তাহাদের আত্মীয় পরিজন প্রায় এককোটী বাঙ্গালী আজ বেকার সমস্যার দ্বারে উপনীত। জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা অনিশ্চিত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে—অধিকাংশ ভাগচাষী ভাগধান্য আদায় দেয় নাই—প্রজা খাজনাদি আদায় দেওয়া বন্ধ করিয়াছে—খাজনাদি আদায় দিবার পক্ষে অন্যায় সর্ত্ত উপস্থিত করিতেছে। মুষ্টিমেয় অর্থবান মধ্যস্বত্বাধিকারী বাদে অধিকাংশ ব্যক্তি আজ কিংকর্ত্তব্য-

বিমূঢ়। ইহা বাদে প্রায় অর্দ্ধকোটী উদ্বাস্তু এবং লক্ষ লক্ষ যুবক বেকার অবস্থায় চারিদিকে হতাশার ঘূর্ণিবায়ু সৃজন করিতেছেন। এই সময় সমবায় প্রথায় কৃষির উন্নতির মাধ্যমে এই সকল সমস্যার যতদূর সম্ভব সমাধানের চেষ্টা একান্ত কর্ত্তব্য।

সমবায় প্রথায় এবং ব্যাপকভাবে উন্নতধরণের কৃষিযন্ত্রের সাহায্যে কৃষির উন্নতি করার বিপক্ষে কয়েকটী আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। তাহা কতদূর বিচারসহ তাহা চিন্তা করা আমাদের কর্ত্তব্য। ইহার বিপক্ষে—

(ক) প্রথম আপত্তি—ব্যাপকভাবে সমবায়প্রথায় এবং যান্ত্রিক কৃষিকার্যে ব্যাপকভাবে জমি সংগ্রহের এবং জমি একত্রীকরণের আবশ্যক হইবে—ইহা প্রজার মনে অসন্তোষ আনিবে। জাতির বৃহৎ স্বার্থে যদি লক্ষ লক্ষ মধ্যস্বত্বাধিকারী উচ্ছেদে যদি অন্যায় না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষকগণের সমস্ত স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জমি সংগ্রহ এবং একত্রীকরণ কেন অন্যায় হইবে বুঝা যায় না। সুতরাং ঐ আপত্তি বিচারসহ নহে।

(খ) দ্বিতীয় আপত্তি—ইহাতে পল্লীগ্রামে কিছু পরিমাণ শ্রমজীবী বেকার হইবে। যান্ত্রিক সংস্থায় কৃষিকার্যে যেরূপ কিছু পরিমাণ শ্রমজীবী বেকার হইবে, তদ্রূপ পল্লীগ্রামের বহু শিক্ষিত অল্পশিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থী যুবকের কর্ম্মের সংস্থান হইবে। শ্রমজীবীগণের শ্রমের উৎকর্ষতা লাভ করিবে। কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট এবং তাহার উপর নির্ভরশীল বহু শিল্পের উদ্ভব হইয়া বহু শ্রমজীবীর কর্ম্ম সংস্থান হইবে। অন্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় প্রকৃত কৃষিমজুরের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে কম। এজন্য যথা সময়ে যথাযথভাবে চাষ হয় না—সেচ হয় না—ফসল সংগ্রহ হয় না। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া হয় যে কিছু সংখ্যক শ্রমজীবী বেকার হইবেই তাহা হইলেও, জাতির বৃহৎ স্বার্থে সমবায় প্রথায় এবং যান্ত্রিক সংস্থায় কৃষিকার্য্য প্রচলনের চেষ্টা আশু কর্ত্তব্য। অন্যথায় শুধু শ্রমজীবিগণের শ্রমচিন্তা চিন্তনীয় হইলে আমাদিগকে এরোপ্লেন, মোটর রেল, ষ্টীমার, কাপড়ের কল, চিনির কল, প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ মধ্যম শিল্প তুলিয়া দিয়া সেই সনাতন পাল্কী-গরুর গাড়ী যুগে ফিরিয়া যাইতে হয়।

সুতরাং পশ্চিমবাংলার সর্বপ্রকার কৃষিজীবীগণের স্বার্থচিন্তা করিয়া পল্লীর কল্যাণ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ভাবে আইন প্রণয়ন সঙ্গত।

(ক) অন্যূন দশজন পল্লীবাসী কৃষিজীবী একত্রে আবেদন করিলে সেই পল্লীগ্রামে অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী হইলে কয়েকটী পল্লীর কৃষিজীবী ঐরূপ একত্রে আবেদন করিলে বা রাজ্যসরকার স্বয়ং ইচ্ছা করিলে সেই সকল পল্লীগ্রামের ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ৫০০ একর পর্য্যন্ত কৃষি যোগ্য সমস্ত জমি (বাস্তু, বাগান, কারখানা এবং মৎস্য চাষের পুকুর বাদে) আইনতঃ ন্যায্য মূল্যে গ্রহণ করিয়া একত্রীকৃত করিতে পারিবেন। ঐ সমস্ত সম্পত্তি স্থানীয় কৃষি সমবায় ও বিপণন সমিতির সম্পত্তি হইবে। ঐ সকল গৃহীত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীগণ তাহাদের স্ব স্ব সম্পত্তির মূল্যের পরিবর্ত্তে ঐ সমিতির সম্ভাব্য অংশের স্বত্বাধিকারী হইবেন। অংশ মূল্য যতই হউক না কেন, প্রত্যেক অংশীদার একটীর বেশী ভোটের অধিকারী হইতে পারিবেন না। স্থানীয় কৃষি এবং বিপণন বিভাগের এবং সমবায় বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারিগণ পদাধিকার বলে ঐ সমিতির সভ্য হইবেন। তাহারা কৃষিসংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিবেন এবং যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

(খ) ঐ সমিতির অংশ ঐ সমিতির সভ্যগণের মধ্যে এবং ঐ গ্রামের অধিবাসীগণের মধ্যে হস্তান্তর যোগ্য থাকিবে। এতদ্ব্যতীত কোন ব্যক্তি ঐ সমিতির অংশ ক্রয় করিতে পারিবেন না এবং অংশ ক্রয়ের একটী নির্দ্দিষ্ট উচ্চসীমা থাকিবে।

(গ) ঐ সমিতির সভ্যগণ উপযুক্ততানুসারে ঐ সমিতির বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইতে পারিবেন। বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন বাহিরের কোন ব্যক্তিকে স্থায়ীভাবে বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিয়োগ করা যাইবে না।

(ঘ) ফসল উৎপাদিত হইলে এক-তৃতীয়াংশ ফসল অংশীদারগণের মধ্যে অংশানুযায়ী বণ্টন করিতে হইবে। বাকী দুই তৃতীয়াংশ ফসল মূল্যে সমিতির সমস্ত ব্যয় নির্বাহযোগ্য থাকিবে। ফসল-মূল্য বেশী হইলে তাহা সমিতির স্থায়ী তহবিলগণ্য হইবে—কম পড়িলে রাজ্যসরকার সাময়িকভাবে সাহায্য করিবেন।

(ঙ) প্রতি থানায় অন্ততঃ একটী ক্রেডিট্ ব্যাঙ্ক, পোষ্টাফিস, কৃষিশিক্ষার উপযোগী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, কৃষি ও শিল্প শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয়, সার বিক্রয় অফিস, ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল, পাঠাগার কৃষি যন্ত্রাদি প্রস্তুত ও মেরামতের কারখানা, গুদাম, ধান্য ছাটাইকল আমোদপ্রমোদ ও স্বাস্থ্যাগার প্রভৃতি থাকিবে। আবশ্যকমতে ইউনিয়োন মধ্যে ইহার শাখা স্থাপন করিতে হইবে।

(চ) এই সকল সমিতির সভ্যগণের কার্যের সুবিধার জন্য প্রতি মহকুমায় এবং জিলার সদরে একটী কৃষি লাইব্রেরী শিক্ষালয় সহ বিশ্রামাগার থাকিবে। এই স্থানে তাহারা বিনাব্যয়ে অন্ততঃ তিন দিনের জন্য বিনাভাড়ায় থাকিতে পারিবেন এবং উপদেশাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন। ইহার জন্য রাজ্যসরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

আমরা আশাকরি উক্ত প্রকার কার্যে কৃষির উন্নতি এবং তৎসঙ্গে পল্লীর উন্নতি হইবে এবং কৃষির অনুপূরক এবং পরিপূরকভাবে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠালাভ করিবে। বেকার সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হইবে এবং ভারত বিশ্বসভার শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হইবেন। ওঁ শুভমস্তু ওঁ।

গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্ল"

শ্রীহরিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী এম-এ, কাব্যতীর্থ

এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ফল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে না এলে আমরা কখনও বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান সমুজ্জ্বল রূপ দেখতে পেতাম না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধুসূদনের হাতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর তুলিকা স্পর্শে সেই সাহিত্য অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথে চরম পরিণতি লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বাংলা দেশে নাটকের উৎপত্তি। দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ প্রতিভাসম্পন্ন লেখকেরা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে নাটক রচনা করেন এবং বাংলা সাহিত্যের শ্রী ও সম্পদ আরও বাড়িয়ে দিয়ে যান। সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে বাংলা সাহিত্যে বোধকরি একখানি নাটকও নেই এবং যদি বা থাকে সে নাটক আধুনিক রুচিসম্পন্ন দর্শকবৃন্দের মনে কোন গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ হবে না। আধুনিক বাঙ্গালী নাট্যকারদের গুরু মহাকবি সেক্সপীয়র। এস্কিলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস, এ্যারিস্টফানিস, সেনেকা প্রভৃতি গ্রীক ও রোমক নাট্যকারগণ আবার ইউরোপের নাট্যসাহিত্যের গুরু এবং মহাকবি সেক্সপীয়রের ওপর এঁদের প্রভাব অসাধারণ। সেই দিক থেকে দেখলে আধুনিক বাংলা নাট্য সাহিত্যও গ্রীক, রোমক ও ইউরোপীয় নাট্যকারদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। অর্থাৎ গ্রীক ও রোমক নাট্যকারদের প্রভাব মহাকবি সেক্সপীয়রের মধ্য দিয়ে বাংলার নাট্যকারদের ওপর এসে পড়েছে। কিন্তু বাংলার নাট্যকারগণ পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলার দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও নিজ দেশের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অন্ধের মত বিদেশীয় নাট্যকারদের অনুকরণ করেন নি। যতটুকু গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন, ততটুকু গ্রহণ করে বাংলা তথা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁরা নাটক রচনা করে গেছেন। সেখানেই তাঁদের প্রতিভার অসাধারণত্ব ফুটে উঠেছে।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনাবলীকে কেন্দ্র ক'রে অসংখ্য নাটক রচিত হ'য়েছে এবং যাঁরা এই সকল নাটকের রচয়িতা এঁদের নাট্যপ্রতিভা যে অসাধারণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, রসরাজ অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ যে উচ্চ শ্রেণীর নাট্যকার এ কথা কে অস্বীকার করবে? এখন কথা হচ্ছে এই যে, বাংলা সাহিত্যে নাটক তো অসংখ্য রচিত হয়েছে কিন্তু যথার্থ রক্ত-মাংসে গড়া নরনারীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মানসিক দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে ক'খানা নাটক রচিত হয়েছে এবং সেই শ্রেণীর ক'খানা নাটকই বা মহাকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা ক'রে স্বীয় গৌরবে আজও বেঁচে আছে এবং বিশ্বের নাট্যসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রেছে?

দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" "সধবার একাদশী" প্রভৃতিতে তৎকালীন বঙ্গ সমাজের চিত্রাবলী বেশ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর সময়ে ঐ নাটকগুলির সমাদরও হয়েছিল খুব এবং বর্ত্তমানেও "সধবার একাদশী" নাটকখানি অভিনীত হয় এবং দর্শকবৃন্দ তা দেখে আনন্দও পেয়ে থাকেন। দীনবন্ধুর ভূয়োদর্শন ছিল। সরকারী কাজে ব্যাপৃত থাকায় তাঁকে বাংলা দেশের বহু স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল এবং তিনি বিভিন্ন চরিত্রের নর-নারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। ফলে নাটক রচনার উপযোগী অভিজ্ঞতাও তিনি অর্জ্জন করেছিলেন প্রচুর। গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুকে বাংলার "রঙ্গালয় স্রষ্টা" বলে অভিনন্দিত করে গেছেন। কিন্তু আজ আমাদের নীলদস্যুদের অত্যাচার কাহিনী শোনবার বিশেষ প্রয়োজন নেই এবং নিমে দত্ত মদ খেয়ে কি ভাবে হাঁটতো বা আর কি কি বাহবার কাজ করত তা জেনেও আমাদের কোন লাভ হবে না।

মধুসূদন যে কয়খানি নাটক রচনা করে গেছেন তার অধিকাংশই পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। কেবলমাত্র "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" আর "একেই কি বলে সভ্যতা" নামে তাঁর দু'খানি সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র আছে। তবে এই প্রহসন দু'খানি উচ্চ শ্রেণীর এবং এদের মধ্যে তৎকালীন বঙ্গসমাজের আংশিক চিত্র বেশ সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। পরবর্ত্তী কালে রসরাজ অমৃতলালের ওপর এই দু'খানি প্রহসনের প্রভাব খুব নিবিড় ভাবে পড়েছিল। রসরাজ নাট্যকার অপেক্ষা প্রহসন-রচয়িতা হিসাবেই বঙ্গসাহিত্যে অধিকতর পরিচিত। দ্বিজেন্দ্রলাল অসাধারণ নাট্যপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং তিনি বহু প্রসিদ্ধ নাটক রচনা করে গেছেন। তবে তাঁর অধিকাংশ নাটক পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। তাঁর "পরপারে" ও "বঙ্গনারী" নামে যে দু'চারখানি সামাজিক নাটক আছে সেগুলি আজ বোধ হয় অচল। ক্ষীরোদ-প্রসাদও উচ্চশ্রেণীর নাট্যকার। তাঁর "আলমগীর," "প্রতাপাদিত্য", "রঘুবীর" প্রভৃতি নাটকগুলি এখনও দর্শকদের কাছে প্রিয়, কিন্তু তাঁর ঐ নাটকগুলিও ঐতিহাসিক। তাঁর সামাজিক উল্লেখযোগ্য নাটক কোথায়?

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র নাটক রচনা না করলেও তাঁর মধ্যে যে প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের গুণাবলী বর্ত্তমান ছিল তা নিঃসন্দেহ। তাঁর গোবিন্দলাল, ভ্রমর, রোহিণী, নগেন্দ্র, সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর নাটকীয় চরিত্র। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের দিক থেকে বিচার করলে এই চরিত্রগুলির তুলনা নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাস নাটকাকারে রূপায়িত ক'রে অভিনীত হয়েছে। কিন্তু সাহিত্য-সম্রাট আমাদের কাছে ঠিক নাট্যকাররূপে পরিচিত নন।

শরৎচন্দ্র নাট্যকার না হলেও তাঁর বহু উপন্যাস নাটকাকারে

পরিবর্ত্তিত ক'রে অভিনীত হয় এবং নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার তাঁর অপূর্ব্ব অভিনয় কৌশলের দ্বারা নাটকগুলিকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায় যে তাঁর নাটকগুলির মধ্যে নাটকীয় গতি অত্যন্ত মন্থর। তাঁর dialogue-ও দুর্ব্বল। অর্থাৎ তাঁর dialogue-এ নাটকীয় গতিকে এগিয়ে নিয়ে যায় না এবং ভাবী নাটকীয় চরম মুহূর্ত্তেরও ইঙ্গিত করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্ট নর-নারীরা তর্কমূলক সংলাপ দ্বারা বাচনিক আবর্ত্ত রচনা করে তারই মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। তাছাড়া তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলিও একেবারে বাঙ্গালীভাবাপন্ন। বিশ্বনাট্যসাহিত্য তো দূরের কথা এমন কি বাংলার বাইরেও তাঁর রমা-রমেশ, সতীশ-সাবিত্রী, ষোড়শী-জীবানন্দ বা নরেন-বিজয়া প্রভৃতিকে লোকে ভাল করে বুঝতে পারবে কিনা সন্দেহ। তাঁর রচিত চরিত্রাবলীর মধ্যে নাটকীয় বৈচিত্র্য নেই। একটী চরিত্রের ছায়া যে অন্য চরিত্রের উপর এসে পড়েছে তা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। নারীকে অস্বাভাবিক প্রাধান্য দেওয়ার ফলে তাঁর পুরুষ চরিত্রগুলি মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছে এবং সেই অনুপাতে তাঁর নারী চরিত্রগুলিও অনেক স্থলে নারীর গুণধর্ম্ম হতে বিচ্যুত হয়ে এক অস্বাভাবিক অনাটকীয় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী প্রতিভা বাংলা ভাষাকে অমরত্ব দান করেছে। সাহিত্যের এমন দিক নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেন নি। তিনি একেধারে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ছোট গল্প-লেখক, পত্র সাহিত্যের স্রষ্টা, চিত্রকর, সুরশিল্পী এবং আরও কত কি তা বলা যায় না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা জগতে বিরল।

সর্ব্বশুক্লা সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ রবীন্দ্রনাথের ওপর যেমন অজস্রভাবে বর্ষিত হয়েছে, এমনটী আর জগতের কোন লেখকের ভাগ্যে ঘটেনি। সবই সত্য। কিন্তু নাট্যকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায় তা একটু আলোচনা করা দরকার। যতদূর মনে হয় নাট্যকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের স্থান খুব উচ্চ নয়। প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার হ'তে হ'লে মানব-চরিত্র সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা, উদার অপক্ষপাত অন্তর্দৃষ্টি থাকা দরকার সেগুলি তাঁর ছিল না। তাঁর আভিজাত্য, তাঁর ধর্ম্মমত এবং তাঁর আজন্ম রূপ-অরূপের দ্বন্দ্ব তাঁকে কোটি কোটি সাধারণ সাকারবাদী নরনারীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। সেইজন্য বেদোপনিষদের ভাবরসধারার ওপর কেন্দ্র ক'রে নৃত্যগীতের আতিশয্যের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অধিকাংশ নাটকীয় চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। ফলে সেই চরিত্রগুলি রক্তমাংসের মানুষ না হয়ে কতকগুলি ভাসা ভাসা অসম্পূর্ণ মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ করে আমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। তাছাড়া তাঁর নাটকগুলির মধ্যে নাটকীয় গতিও খুব মন্থর। তাঁর সৃষ্ট নরনারীরা এমন কি পরিচারক-পরিচারিকারা পর্য্যন্ত কবিতার ভাষায় কথা বলেন। নর-নারীর বাচন-ভঙ্গীর মধ্যে যে একটা বিশিষ্ট স্বাভাবিক পার্থক্য আছে সেটী তাঁর সৃষ্ট নাটকীয় চরিত্রগুলিতে দেখতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য বলতে হয় যে তাঁর "রক্তকরবী" "তপতী" প্রভৃতি কয়েকখানি নাটকের মধ্যে প্রায় সাধারণ নর-নারীর চরিত্র অঙ্কিত হলেও সেগুলির মধ্য দিয়ে কবিগুরু বিশিষ্ট বিশিষ্ট মতবাদকে রূপ দিয়েছেন। "তপতী"র শেষের দিকে উপনিষদ ও বেদ হতে উদ্ধৃতির সঙ্গে নাটকীয় গতি ও বিষয়বস্তুর কি সম্বন্ধ থাকতে পারে?

এখন গিরিশচন্দ্র। তিনি মহাকবি সেক্সপীয়রের মত একাধারে নাট্যকার ও অভিনেতা দুইই ছিলেন। তিনি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং প্রহসন সমেত প্রায় আশীখানি নাটক রচনা করে গেছেন। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু সামাজিক নাটক বলে আমরা তাঁর অন্য দিকের নাটকগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হব না। "প্রফুল্ল," "বলিদান," "শাস্তি কি শান্তি" প্রভৃতি নাটকগুলিই গিরিশচন্দ্রের প্রসিদ্ধ সামাজিক নাটক। তাঁর শেষোক্ত নাটক দু'খানি কিঞ্চিৎ বাঙ্গালীভাবাপন্ন বলে অনেক স্থলে সর্ব্বভারতীয় আবেদন হতেও ভ্রষ্ট হয়েছে। তাঁর একমাত্র "প্রফুল্ল" নাটকখানিই কালজয়ী হয়ে এখনও নিজ গৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। এই নাটকখানিই বিশ্বের নাট্য-সাহিত্যে স্থান পেতে পারে, যদিও এই নাটকখানির ওপর সেক্সপীয়রের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় পড়েছে। তাহলেও গিরিশচন্দ্র তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার বলে আমাদের দেশেও সমাজের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই নাটকখানিকে অমরত্ব দিয়ে গেছেন। ভাব, ভাষা, ঘটনা-বৈচিত্র্য এবং মানব মনের দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বে নাটকখানিকে নিখুঁত বলা চলে। একটী মাত্র মানব প্রবৃত্তির ওপর কেন্দ্র করে গিরিশচন্দ্র তাঁর এই নাটকখানি রচনা করেছেন। সে বৃত্তিটী হচ্ছে মানুষের চিরন্তনী ধনৈষণা এবং রমেশের মধ্যে সেই বৃত্তিটী যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। রমেশের কথাতেই বলি। রমেশ বলছে, "যাতে পরের অপকার, তাতে আপনার উপকার। ভাইয়ের চেয়ে পর কে? প্রথমে মা-বখ্‌রা, তার পরে বাপের বিষয় নিয়ে বখ্‌রা, ভাই-পো হবেন জ্ঞাতি-শত্রু। এই মদে দাদার অপকার, আমার উপকার। এ বিষয়গুলো যে ব্যাপারী-ব্যাটারা বেচে নেবে তাতো প্রাণে সইছে না। দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকান চাই।" (১।৩)

সদানন্দ যোগেশ দুটী ভাই আর মা ছাড়া কিছুই জানেন না। নানা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন এবং সমাজে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ধনী ব্যবসায়ী বলে সুপরিচিত হয়েছেন। তাঁর একান্নবর্ত্তী পরিবার। সংসারে শ্রী যেন অচলা হয়ে বিরাজ করছেন। হঠাৎ বুক-ভাঙ্গা সংবাদ এল যে-ব্যাঙ্কে যোগেশের যথাসর্ব্বস্ব সেই ব্যাঙ্কটী ফেল করেছে। ভাই রমেশের কুচক্রান্তে বেনামিতে বাড়ী রেখে যোগেশ পাওনাদারদের ফাঁকি দিতে বাধ্য হলেন। এতে যোগেশের সুনাম চলে গেল এবং তিনি মদ ধরলেন। এই সময় সুসংবাদ এল যে ব্যাঙ্ক ফেল করে নি। কিন্তু রমেশ সংবাদটী গোপন রেখে যোগেশের কাছ থেকে সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন। যোগেশ পথে বসলেন। তিনি অন্য যোগেশ হলেন। নিজেকে ভুলে থাকবার জন্য তিনি মদের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। মা-স্ত্রী-পুত্র ভাড়াটে বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। বাড়ীভাড়া দিতে না পারায় বাড়ীওয়ালা যোগেশের স্ত্রী-পুত্রকে পথে বার করে দিল। মাতাল হয়ে যোগেশ পথে-পথে ঘুরে বেড়াতে

লাগলেন। যোগেশের স্ত্রী জ্ঞানদার অনাহারে রাস্তায় মৃত্যু হল। নিজেকে নিষ্কণ্টক করবার জন্য রমেশ যোগেশের একমাত্র পুত্র যাদবকে অনাহারে মেরে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সুরেশকে ফন্দি করে জেলে পাঠিয়ে তার বিষয়ের ভাগ রমেশ নিজের নামে লিখে নিতে চেষ্টা করলেন। সুরেশ জেলে গেছে শুনে যোগেশের মা পাগল হয়ে গেলেন। কিছুদিন পরে তাঁরও মৃত্যু হল। রমেশের দুরভিসন্ধিকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করল কাঙ্গালীচরণ আর জগমণি। কিন্তু প্রফুল্ল আর মদন-পাগলার প্রচেষ্টায় যাদব আসন্ন মৃত্যু হতে রক্ষা পেল। রমেশ প্রফুল্লকে গলা টিপে হত্যা করল। এই সময় ছিন্নবাস উন্মাদ যোগেশ এসে তাঁরই বাড়ীতে এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে চলে গেলেন। কি অপূর্ব্ব নাটকীয় ঘটনা-বৈচিত্র্য॥

নাটকখানির মধ্যে অনেকগুলি চরিত্র আছে। তাদের মধ্যে রমেশ আর প্রফুল্ল এই দু'টী চরিত্রই নাট্যকারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যোগেশের চরিত্রের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নেই। রমেশের এক একটা কূট চাল যোগেশকে ভিন্ন ভিন্ন যোগেশে রূপান্তরিত করে দেয় এবং গিরিশচন্দ্র সেই ভাবান্তরগুলি অতি সুন্দর নাটকীয় ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

রমেশের মধ্যে এক বিত্তৈষণা ছাড়া অন্য কোন পাপ প্রবেশ করে নি। যদি অন্য কোন কদাচারের দাস তিনি হতেন, তা হলে তাঁর চরিত্রে কোন নাটকীয় বৈশিষ্ট্য থাকত না। তিনি অপুত্রক। নিজে এটর্নী। প্রফুল্লর মত সরলা সতী সাধ্বী স্ত্রীর স্বামী তিনি। সদাশিব ভাই তাঁর মাথার ওপর। তাঁর অর্থের কোন প্রয়োজন হতে পারে না। কিন্তু তবুও তাঁর অর্থের প্রয়োজন হল এবং সেখানেই নাটকের সৃষ্টি। সমগ্র নাটকটীর মধ্যে অন্যান্য যে সকল চরিত্র আছে সেগুলি যেন রমেশকেই কেন্দ্র করে আমাদের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রফুল্ল গিরিশচন্দ্রের আর এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। লেডি ম্যাকবেথের মত "unsexed" হয়ে ধনদৌলত সংগ্রহ করবার জন্য তিনি স্বামীর সহযোগিনী হন নি। প্রফুল্ল ডেসডিমোনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, বিশেষ করে তাঁর মৃত্যুদৃশ্যটীর সঙ্গে ডেসডিমোনার মৃত্যুদৃশ্যের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। নিরপরাধ দু'জনকেই তাঁদের স্বামীরা গলা টিপে মেরে ফেলেন। ডেসডিমোনা বা লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যু কোন কল্যাণ নিয়ে আসতে পারে নি। তাদের মৃত্যু আরও অনেক মৃত্যুকে টেনে এনেছে। কিন্তু প্রফুল্লর মৃত্যুর মধ্যে আমরা কল্যাণ দেখতে পাই। তাঁর মৃত্যুতে সৃষ্টি হয়েছে। তিনি মরেছেন, কিন্তু যাদব প্রাণ পেয়েছে। রমেশের ভীতি-প্রদর্শন বা কুৎসিত অনুরোধ তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে খর্ব্ব করতে পারে নি। যখন তিনি জানলেন যে তাঁর স্বামী বালক যাদবের প্রাণ নিয়ে খেলা করছেন, তখন অপুত্রক হলেও তাঁর সুপ্ত মাতৃত্ব জেগে উঠেছিল এবং যাদবকে রক্ষা করবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সেই সময়কার মূর্ত্তি অপূর্ব্ব। তিনি তখন নিরক্ষরা সরলা বাঙ্গালী গ্রাম্যবধূ নন। তিনি তখন চিরন্তনী শিবদায়িনী বিশ্বনারীতে পরিণত হয়ে গেছেন এবং মাতৃত্বের অম্লান গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়ে সন্তানকে রক্ষা করবার জন্য দুটী হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। লক্ষ রমেশের সাধ্য নেই তখন সেই মাতৃবক্ষ হতে যাদবকে ছিনিয়ে নেয়। প্রফুল্লর মত চরিত্র বিশ্বের নাট্যসাহিত্যে আছে কি না জানি না।

নাটকের মধ্যে যোগেশ, রমেশ, প্রফুল্ল ছাড়া সুরেশ, উমাসুন্দরী, জ্ঞানদা, মদন পাগলা, জগমণি, পীতাম্বর প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে গিরিশচন্দ্র অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন। নিজ নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। রাণী মুদিনীর গলির দৃশ্য নাট্যকারের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। বিশ্বের নাট্যসাহিত্যে এ দৃশ্যটীর মূল্য আছে। যতদিন আমাদের সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন না হয় অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া এবং ব্যাপারী বা দেনদার-ভীতি আমাদের সমাজ থেকে চলে না যায়, ততদিন নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্ল" অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে বিশ্বসাহিত্যে বেঁচে থাকবে।

স্মরণে

শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈশাখী ঝড়ের ঘায়ে প্রকৃতি-সমুদ্রে-ভাঙা-জীর্ণ নৌকা হ'তে
নামিল আশ্চর্য্য শিল্পী। ভাঙা-গড়া-সময়ের রুক্ষ-হাঁটা-পথে
হাঁটে,—হাতে রঙ, তুলি। আঁকে ছবি দিনে, রাতে,
দুপুরে, বিকেলে,
শিশু-যুবা-নারী-বৃদ্ধ-হৃদয়ের কৌটা হ'তে রঙ ঢেলে ঢেলে।
হাতে নিয়ে মানুষের ব্যাথার-সুরেতে-বাঁধা হৃদয়-সেতার
তোলে জীবনের সুর—আনন্দ-কাকলি-ভরা-বসন্ত-বাহার
তারি যেন ফাঁকে ফাঁকে। সে-সুরে কাঁপন জাগে
ইথার-জোয়ারে;
ভেসে চলে পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিমের শিল্পীদের প্রাণের-দুয়ারে।
নতুন চেতনা জাগে ওপারের জীবনের-আকাশের কোণে
এপারের তৃষিতেরা মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে;
আশা-জাল-বোনে।
কালের বাঁশীর সুরে সে-সুর মিলায় নীল-আকাশের 'পরে;
শ্রাবণের কালো মেঘ জমে ওঠে থাকে থাকে:
অশ্রু হ'য়ে ঝরে।
এ-মরু-পৃথিবী-বুকে এনে দিতে সজলতা নামে ভারে ভারে,
মানবের শুষ্ক প্রাণে আজিও তা ঝরিতেছে ঝর ঝর ধারে।

বাঙ্গালী মোহিতলাল

আজহারউদ্দীন খান্

ক্রান্তদর্শী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কবি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "এখন আর খাঁটি বাঙালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙালী কবি আর জন্মিতে পারে না!" আজকের বাঙলার অবস্থা দেখে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের একথা মোহিতলালের জীবনে সত্য হয়েছে বলে মনে হয়। বাঙলা দেশ যে আবার এক সঙ্কটের সম্মুখীন তা আজ সকলেরই জানা আছে; কেননা আজকের বাঙলায় আমরা প্রত্যেকেই তার ভুক্তভোগী। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বিশেষণে বহুবিঘোষিত সোনার বাঙলা আজ হানাহানি বঞ্চনার অভিশাপে অবনতির চরম বিন্দুতে উপনীত! বাঙালীর জীবন-সমুদ্রের ওপর দিয়ে আজ যে মন্থন চলছে সেই মন্থনের মধ্যে আমাদের জীবন সর্বমহিমাচ্যুত। মধ্যবিত্তসমাজ আজ হৃতসর্বস্ব—অশন ও পুনর্বাসন ভিক্ষায় পথে পথে ভ্রাম্যমান। বঙ্গবিভাগের ফলে ভাঙন শুধু বাঙলা দেশের মাটি ও মানুষকে আঘাত করলো না, আঘাত করলো তার ভাষাকেও। ভাষাকে কেন্দ্র করে ঘরে ও বাইরে যে হীন ষড়যন্ত্র চলছে তাতে মনে হয় বাঙালী জাতির অস্তিত্বই যেন অনেকের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে। ইতিহাসে এই ভাবে ভাষাবিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জাতিবিলুপ্তির একাধিক উদাহরণ পাওয়া যাবে। তাই এ অবস্থায় একজন খাঁটি বাঙালীর আবির্ভাব ঘটবে—ঋষির কথাতো তাই মিথ্যে হতে পারে না। মোহিতলাল বিংশ শতাব্দীর কোলে সেই বঙ্কিম আরাধ্যা বঙ্গ-জননীর যেন বিদায়কালীন প্রীতি উপহার।

মোহিতলালের পক্ষে ঈশ্বর গুপ্তের মতো বাঙলার খাঁটি কবি হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ মোহিতলালের প্রজ্ঞা ও ঋদ্ধি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারা প্লাবিত আর ঈশ্বর গুপ্তের বিদ্যাবুদ্ধি অত্যন্ত সীমিত। কাজেই তাঁর পক্ষে বাঙলার পৌষপার্বণ, তপসে মাছ, আনারস, বাঙালীর সুখদুঃখের গৃহস্থালীর ওপর সাদামাঠা ভাষায় ও হালকাভাব নিয়ে কবিতা লেখা সহজসাধ্য ছিল আর সে-কবিতার পাঠক অল্পশিক্ষিত হলেই চলে যেত। কিন্তু আজ আর তা হবার উপায় নেই—জীবনের রঙ্গমঞ্চের পটপরিবর্তন যেমন হয়েছে তেমনি বাঙালীর মননক্ষেত্রও যে আজ নানা দেশের চিন্তায় সমৃদ্ধ। তাই মোহিতলাল বাঙলার প্রাণধর্মকে কাব্যে উপস্থাপিত করার সময়েই তাঁর নিজেরই অজান্তে তাঁর প্রজ্ঞার চিহ্ন স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। তাই তাঁর কবিতা শিক্ষিত বাঙালীর মনের খোরাক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য আলোচনায় যে মাপকাঠি প্রয়োগ করেছিলেন তার নিরিখে মোহিতলালের কবিতা হয়ত খাঁটি বাঙালী কবিতা নয়; কেননা তাতে বাঙলার নিজস্ব প্রাণধর্মের সম্বন্ধ তেমন বেশী নেই। খাঁটি বাঙালী কবি না হলেও তিনি যে আজকের বাঙলার একজন খাঁটি দরদী বাঙালী একথা অনস্বীকার্য। তিনি বাঙলা দেশকে নিজের জননীর ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন, ইষ্টদেবীর ন্যায় ভক্তি করতেন, প্রণয়িনীর ন্যায় ভালবাসতেন। বাঙলার সাহিত্য সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা সবই ছিল মোহিতলালের অনুধ্যানের বস্তু দিবারাত্রির জপমালা। তাই তিনি বাঙলার ভাব-গঙ্গাকে প্রবন্ধে-নিবন্ধে, সংকলনে—সম্পাদনে সকলের শীর্ষে তুলে ধরেছেন। এই প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্য দিয়েই বাঙালী মোহিতলালের পরিপূর্ণ মুক্তি। তিনি বলেছেন, "আমি যতটুকু বাঙালী, ততটুকুই সাহিত্যিক; আজ সেই বাঙালী জাতটাই আমার চোখের সামনে মরে গেল—বাংলার সাহিত্যে আমার কি কাজ!......নিজের দেশ, জাতির বাসভূমি ও স্বজাতি সমাজের প্রতি যে নিগূঢ় প্রেম ধার্মিক মাত্রেরই থাকে এবং যে প্রেম না থাকলে কেউ সত্যিকারের সাহিত্যরচনা করতে পারে না...। (এপারের কথা: কথা সাহিত্য শ্রাবণ ১৩৫৭) পূর্বে জীবনকে প্রকাশ করবার জন্যে আজকের 'পঙ্ককুণ্ড' থেকে নিজেকে সযত্নে সরিয়ে আত্মতৃপ্তির বিলাসিতার জন্যে কবিতা লিখেছিলেন, বিশুদ্ধ শিল্পের বিশুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু যখন 'বাঙলার নাভিশ্বাস উঠেছে তার সর্বাঙ্গে অরিষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে' তখন তিনি আর স্থির হয়ে থাকতে পারেন নি, তাঁকে নেমে আসতে হল দেশ ও জাতিকে বাঁচাবার জন্যে। তাঁর মত বিশুদ্ধ সাহিত্যিকের পক্ষে জনতার কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মেলানো সম্ভব ছিল না। 'আইভরি ইণ্ডিয়ার' থেকে যে কয়ধাপ তিনি নেমে এসে বাঙালীর সমস্যাকে হৃদয় দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছেন এবং সে-বিশ্লেষণে মতামতের প্রশ্ন অনুক্ত রেখেই বলছি যে তিনি এজন্য আমাদের অভিনন্দনযোগ্য। বাঙলা দেশের দুঃখদুর্দশা তাঁকে এত পীড়িত করে তুলেছিল যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যেও সে-কথা তাঁর মনে উদিত হয়ে তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছে—"আমার ঘরের নীচে মাঠের পর মাঠ কচিধানের পাতায় সবুজ হইয়া উঠিয়াছে—জানালা খুলিলেই, পশ্চিম আকাশপ্রান্তের নীল নারিকেলশ্রেণী পর্যন্ত, সেই ক্রোশব্যাপী হরিৎ-শোভা মুহূর্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কিন্তু সে দৃশ্য দেখিয়া তখনই প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, জানালা বন্ধ করিয়া দিই। ওই হরিতের মধ্যে অন্নপূর্ণার সে সুধাহাস্য আর নাই, ওই সতেজ সরস তৃণরাশির অঙ্গে ধনলুব্ধ পিশাচের লালসা বহ্নি এখন হইতেই জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, উপবাসকাতর বঞ্চিত বুভুক্ষুর দীর্ঘশ্বাস উহাকে আন্দোলিত করিতেছে। তাই ওই শোভা ভয়ঙ্করী।" (শারদীয়া: বাংলা ও বাঙালী) সত্যি সত্যিই কাব্যের জানালা বন্ধ করে দিয়ে বাঙলার শবাসনে বসে বাঙালী ঐতিহ্য বিশ্লেষণের সঙ্গে সাহিত্যের কোষ্ঠী বিচার করতে বসেছেন। তাই বঙ্কিমের খাঁটি বাঙালী কবির বিচার প্রসঙ্গীয় মানদণ্ডে কবি

মোহিতলাল সমালোচক মোহিতলাল যেখানে পৌঁছতে পারেন নি, বাঙালী মোহিতলাল অবাধে সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন।

॥ ২ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন স্বাজাত্যবোধের আদিগুরু—তাঁর সাহিত্যসাধনার মূল-ভাবকেন্দ্রটি জাগ্রত স্বদেশপ্রীতি। দেশ বলতে তিনি বুঝতেন 'সপ্তকোটি কণ্ঠ' বাঙলা দেশকে, ভারতকে নয়—'বন্দেমাতরম' গানটিই তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তাই তিনি ছিলেন একান্তভাবে বঙ্গসন্তান। তাঁর রচনায় ভারতীয় আদর্শ ভারতীয় সাধনার কথা তেমন নেই যত বেশী আছে বাঙলার গৌরব ও গ্লানি, বাঙলার আনন্দ ও বেদনা, বাঙলার আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। মোট কথা বাঙলার দৃষ্টি ছিল তাঁর দৃষ্টি। বাঙলা দেশের প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি ফেরানোই ছিল তাঁর ব্রত। মোহিতলাল ছিলেন এই বঙ্কিমচন্দ্রেরই মানস সন্তান। তাই তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্য দিয়ে প্রতিভায় সমুজ্জ্বল গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন দেশভক্ত এক বিরাট পুরুষ মূর্ত্তির রূপ প্রত্যক্ষ করি। তাঁর দেশপ্রেম সাহিত্যের কেবল অহেতুক উচ্ছ্বাস নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মতই হৃদয়ের অকপট অভিব্যক্তি "জীবনের সঞ্জীবনী অমৃতবল্লরী"। তিনি বলেছেন, "একালে সকল সাহিত্য-চর্চার মূলে থাকিবে জাতির জীবনরক্ষার ভাবনা···মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের আরাধনা।" (জাতির জীবন ও সাহিত্য : বিবিধ কথা) কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সাহিত্যিক-সমাজ আজও এ মন্ত্রে উদ্বোধিত হন নি। তাছাড়া আমাদের দেশের অনেক কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্যিক দেশের পরিস্থিতি থেকে সাতপা পিছিয়ে থাকতে ভালবাসেন। সাহিত্যের সেবা তাঁরা করেন, দেশকে ভালওবাসেন, কিন্তু দেশের উন্নতি ও অবনতির প্রতি উৎসাহী নন। কেমন যেন একটা উদাসীনতার মধ্যে দিয়ে দিন কাটিয়ে চলেন। মোহিতলাল ছিলেন এঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম—তিনি সত্যসুন্দরের পূজারী হয়েও রাজনীতিকে সাহিত্য-সেবার অঙ্গীভূত করে ফেলেছিলেন কেননা বঙ্কিমের মত তিনিও বাংলা-সাহিত্য ও বাঙলা দেশকে একাত্মিকা করেই দেখেছিলেন। তাঁর রাজনীতি একদেশদর্শী হতে পারে কিংবা egoistic viewও প্রচার করতে পারে কিন্তু তাঁর দেশাত্মবোধকে কোনক্রমেই সন্দেহ করা চলে না। বাঙলার নিজস্ব রাজনীতি—যে রাজনীতি ও মনীষার বলে বাঙালী একদিন সমগ্রভারতে নেতৃত্ব করেছিল—সেই নীতির মোহিতলাল ছিলেন একজন মুখ্য প্রবক্তা। যে উনবিংশশতাব্দী বাঙলা দেশের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ সেই যুগের আলোতে মোহিতলাল চোখ মেলেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার চিত্তবিকাশ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর সেই নবজাগরণের মধ্যাহ্ন-দিবালোকে, আমি জন্মিয়াছিলাম বঙ্কিম বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগরের যুগে। তেমন যুগ যে-কোন জাতির ইতিহাসে একটা গৌরবময় যুগ; সে যুগে জ্ঞান কর্ম ও প্রেমের মাধুর্য-সাধনার জন্য বাংলা দেশে যেন দেবকুল অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।" (জাতির জীবন ও সাহিত্য : বিবিধ কথা) উনিশ শতকের এই মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। আজ হাওয়া-বদলের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার সেদিনকার প্রাণধর্মের বহু অদলবদল হয়েছে কিন্তু মোহিতলাল তাঁর মতবাদে এমনই একজন নৈষ্ঠিক সাধক ছিলেন যে যুগের তাগিদে সে পরিবর্তনকে সহজ চিত্তে মেনে নিতে পারেন নি বলেই তাঁর মতবাদের ব্যাখ্যা আজকের যুগ-প্রয়োজনে প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্লেষণ বলে অনেকের কাছে প্রতিপন্ন হয়েছে। তা হোক। মোহিতলালের শিল্পজীবনের কৃতিত্ব তাতে ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাঁর কৃতিত্ব নিহিত রয়েছে ওইখানে—যেখানে তিনি বাঙালীর জীবন-মরণ সমস্যাকে সাহিত্যের ওপরে স্থান দিয়েছেন, দেশের চিন্তা তাঁর মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে, অন্যান্যদের মতো তিনি দেশকে দূর থেকে সেলাম জানান নি, সমস্যার মধ্যে নিজে দাঁড়িয়ে জাতির বেদনা অনুভব করেছেন। তিনি "বাংলা ও বাঙালী" গ্রন্থের 'নিবেদনে' প্রশ্ন তুলেছেন, "সাহিত্যের ভাবরাজ্য ছাড়িয়া আমি যে এতকাল পরে এই বয়সে, ভগ্নদেহে ও অবসন্ন মনে, এই ধরণের পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইয়াছি, তার কারণ, সাহিত্যের দ্বারা জাতি বা সমাজের কোন সেবাই হইতে পারে না—যদি সেই জাতি স্বধর্মভ্রষ্ট হয়, তাহার আত্মজ্ঞান লুপ্ত হয়। একালে বাঙালীর দেহজীবন ও মনোজীবন দুই-ই অতিশয় শক্তিহীন হইয়াছে, তাই সুপথ্য যেমন অরুচিকর, কুপথ্য তেমনি রুচিকর হইয়াছে। ইহার উপর, পরানুচিকীর্ষা এ জাতির একটা রক্তগত ব্যাধি বলিলেও হয়, এক্ষণে ঐ দুর্বলতার কারণে তাহাও বৃদ্ধি পাইয়াছে; আবার রাজনীতি নামক এক সংক্রামক অধর্ম-নীতির মোহে সে যেন আত্মহত্যা করিতেই বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এ অবস্থায় সাহিত্যের উচ্চ চিন্তা আগে, না ঐ মৃত্যু নিবারণের চিন্তা আগে?" তাই তিনি প্রগতিপন্থী শিল্পী কেননা তিনি বাঙলার সমস্যার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যদিও আজকের বাঙলার সঙ্কটাবর্তে দিকভ্রষ্ট হয়ে মনের আসল বন্দর তিনি খুঁজে পান নি, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছেন, প্রলাপ বকেছেন, বর্তমানের বীভৎসতায় জর্জরিত হয়ে নিজের একটা কাল্পনিক জগৎ (উনবিংশ শতকের বাঙলা দেশ) সৃষ্টি করে সেখানে আশ্রয় নিয়ে বর্তমানের প্রতি বক্রোক্তি ও শ্লেষোক্তি করেছেন। কিন্তু যাঁরা আজকের দুরবস্থা নিয়ে মাথা ঘামান না অথচ 'টেবিল-টক' হিসেবে তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-কৌতুক করেন, বাঙালীর সমস্যা সম্পর্কে মোটেই সচেতন নন সেই 'ডুডও খাব টামাকও খাব' গদাধরের দলকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি। আবার যাঁরা আগুনের আঁচ থেকে গা বাঁচিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তাঁকে নানাপ্রকার অশোভন উক্তি করে সমস্যাকে এড়িয়ে গেছেন, কিংবা বাঙালী জাতির প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাঙলা-সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাকে রুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর, ভাষার আভিজাত্যকে ক্ষুণ্ণ করে যাঁরা হিন্দীর ছাঁচে ঢালাই করতে চান তাঁদেরকেই জাতীয় শত্রু মনে করে তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন—

: "বাঙালী যে মরিতে বসিয়াছে বা মরিয়াই গিয়াছে, এমন কথা বলিলে যাহারা অতিশয় উচ্চভাব ধারণ করিয়া আমার অজ্ঞতা, বুদ্ধির কৈবল্য অথবা নষ্ট-স্বভাবের নিন্দা করে—কিংবা উহাকে একটা সৌখীন নৈরাশ্যবাদ বলিয়া ধিক্কার দেয়, তাহাদের কথার জবাব দেওয়া নিষ্ফল বলিয়াই আমি সম্পূর্ণ নীরব থাকি; আমি তাহাদিগকে চিনি—তাহারা

বাঙালী জাতির কেহ নয়, তাহারা মিথ্যাবাদী ও দুরাত্মা। আমি বাধ্য হইয়াই এখানে তাহাদের কিছু পরিচয় দিব। যাহারা সাহিত্যিক তাহারা যে কেমন চিন্তাশীল, কেমন ভাবুক ও প্রতিভাবান এবং কেমন পণ্ডিত তাহা জানি; যদি হয়ও, তাহাতেই বা কি?—তাহারা কেমন জীবন-যাপন করে? তাহারা কেমন স্বাধীন-চেতা, কেমন নির্লোভ, কেমন নীচ সংসর্গত্যাগী? ইঁহারা এতই ক্ষুদ্রচেতা যে লজ্জা বা আত্মধিক্কার তো দূরের কথা, অধিকাংশই তাহাদের সেই ঘৃণ্য অবস্থার গৌরব করিতে না পারিলে একদণ্ড স্বস্তিবোধ করে না; বিশেষতঃ ঐ সভ্যতাভিমানী নাগরিকেরা নিজেদের পঙ্কশয্যাকেই বিলাস-শয্যা করিয়া অতিশয় ধর্মহীন ও সত্যহীন জীবন-যাপন করিয়াও চীৎকার করিবে—'সব ঠিক আছে'!—বাঙালীর—অর্থাৎ তাহাদের ঐ গোষ্ঠীর—গৌরব কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই!·········পশ্চিমা বণিকবাদের রাজ-শ্যালক যাহারা এবং যাহারা ব্যবসায়ের দ্বারা, অর্থাৎ পয়সা লইয়া জনগণের চৈতন্য হরণ করে—তাহারাও স্বাধীন ভারতে বাঙালীর এই চরম দুর্গতির কথা ঘুণাক্ষরে বলিতে দিবে না। এই সুখসমৃদ্ধিশালী নাগরিকেরা মনে করে, তাহারা বাঁচিলেই বাঙালী বাঁচিল; তাহাদের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়িয়াছে, তাহাতেই বাঙালী-জাতি ধন্য হইয়াছে। ইহারা কিছুতেই মৃত্যুর কথা বলিতে দিবে না। এ যেন জাতির মৃত্যু-সংবাদ শুনিলে পাছে অশৌচ পালন করিতে হয় এবং একটা বড় উৎসব ফসকাইয়া যায়, তাই যে সংবাদ যে দিবে তাহার মত শত্রু আর নাই। তাই ঐ মৃত্যুকে অস্বীকার করিতে হইবে,—মানুষ যখন খাবি খাইতেছে তখন বলিতে হইবে, তাহার অঙ্গে পুলক-শিহরণ হইতেছে!—নহিলে স্বাধীনতার টেবিলে বসিয়া চোরাই-খানা খাইতে বড়ই অসুবিধা হয়। অতএব, ইহাদের কথার জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। যাহারা স্বার্থের সম-বন্ধনে একটা বৃহৎ দল গড়িয়া পশ্চিমা বণিকের সহিত চুক্তি করিয়া দেশের যাবতীয় পত্রিকার সাহায্যে মৃতকে জীবিত বলিয়া ঘোষণা করিবেই তাহাদের সেই প্রোপাগাণ্ডা রোধ করা যাইবে না; কিন্তু ঐরূপ প্রচার-শক্তি যাহাদের নাই সেই রুদ্ধ-কণ্ঠ বাঙালী মর্মে মর্মে বুঝিতেছে, কোন্ কথা সত্য।"

"আবার এমনও আছে, যাহারা বাঙালীর ঐ মৃত্যুর কথা স্বীকার করে কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত নয়, বরং তাহাতেই তাহাদের ঐ ভারতের প্রতি ভক্তি আরও বাড়িয়া যায়। একদা ঐ সম্প্রদায়ের এক মহাবীর বাঙালী আমাকে যাহা বলিয়াছিল তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ না থাকিলেও তেমন কথা আমি পূর্বে কাহারও মুখে শুনি নাই। বিস্মিত হইবার কারণ ছিল না এইজন্য যে তিনি নিদারুণ গান্ধীভক্ত—অতএব হিন্দুস্থানীর প্রেমে দেওয়ানা হওয়া তাঁহার কর্তব্য। তার ওপর, তিনি একজন লেখনী-লম্পট সাহিত্যিক, নামে ও বি-নামে সাহিত্যের সবরকম মুখভঙ্গি করিতে ওস্তাদ,—এমন নির্ভীক কর্তাভজাও দুর্লভ। একালে এহেন মহাপুরুষের মুখে কোন কথাই বাধে না, বরং আকার যত ছোট হয়, আওয়াজ ততই বড় হইয়া থাকে। একদিন সেই 'বিশ্বকর্মা' পুরুষটি আমার কথার প্রতিবাদে সহসা সত্যাগ্রহ-দীপ্ত লোচনে আমাকে বলিয়াছিলেন—এ-দেশ ও এ-জাতি এমনই জঘন্য যে, জাতটার তো কথাই নাই এ-দেশের মাটি পর্যন্ত তুলিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে এবং বিহারের মাটি দ্বারা পুনরায় ভরাট করিয়া লইতে পারিলে তবে এদেশ মানুষের বাসযোগ্য হইতে পারিবে। বিহারভুক্ত বাংলায় বাঙালীদের উপরে বিহারীরা যে উৎপীড়ন করিতেছে তাহার সমর্থন করিয়া এই ধর্মপুত্রটি বাঙালীর বিরুদ্ধে বহু কটূক্তি করিয়াছে। যতই অধঃপতিত হৌক, পৃথিবীতে আর কোথাও কোন জাতির মধ্যে এমন স্বজাতি-বিদ্বেষী কুলাঙ্গারের স্থান হয় না; অতএব যে জাতির কুলীন-সমাজে এতবড় পাপাত্মা দম্ভভরে বিচরণ করিতে পারে, সে জাতি কি বাঁচিয়া আছে?" (নিবেদন: বাংলা ও বাঙালী)

উদ্ধৃতিটি একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। দীর্ঘ হয়ে গিয়ে একটা সুবিধেই হল যে স্বজাতি বৎসল ও স্বধর্মপ্রাণ বাঙালী মোহিতলালের পরিচয় পাঠকেরা অনায়াসে বুঝতে পারলেন যা টিকা দিয়ে বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না এবং আরও পরিষ্কার হোল যে নিজস্ব মতবাদ জাহিরে মোহিত-লাল কিরূপ স্পষ্টবাক ছিলেন।

দেশকে এতখানি ভালবাসতে পেরেছিলেন বলেই বাংলার কল্যাণ, বাঙলারধর্ম, বাঙলার বাঁচবার পথ নিদ্ধারণ করার কথা তাঁর হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক ছিল। তাই তিনি বাঙলার ঐতিহ্য উদ্ধারে ব্রতী হয়ে ছিলেন, সমাজ জীবন ও তার ঐতিহ্য সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন। বাঙালী যাতে মানুষ হতে পারে, মানুষ হয়ে আবার বাঙলার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করতে পারে, এই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত ও সাধনার লক্ষ্য। বাঙালীর আত্মবিস্মৃতি ও ব্যর্থ অনুকরণপ্রিয়তা তাঁর হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ শেলের মত বিদ্ধ হ'ত বলেই তিনি ভাষার রূঢ় আঘাতে তাদেরকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন—যদি কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়। বাঙলার বৈশিষ্ট্য বলতে তিনি বুঝতেন বাঙলার অনুশীলিত বুদ্ধির প্রজ্ঞার বৈশিষ্ট্য। "বাংলার নবযুগ" ও "বাংলা ও বাঙালী" গ্রন্থে বাঙালীর অতীত গৌরব অধ্যায়টির সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যটি সকলের সামনে তুলে ধরেছেন এই আশাতে বাঙালী নিজেকে যদি চিনতে পারে। "বাংলার নবযুগ" এর শেষকথাতেও এই কথাই বলেছেন—

: "এই দীর্ঘ ও দুরূহ চিন্তাকার্যে আমার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল—বাঙালীর আত্মপরিচয়সাধন।···এই একাকার অন্ধকারে আমি যদি সেই চেতনা এতটুকুও উদ্রেক করিয়া থাকিতে পারি, তবে আমার এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা সফল হইয়াছে মনে করিব, আমার সাহিত্যিক জীবনও ধন্য হইবে। আজিকার এই অতি-উদার কালচার-বাদ ও বিশ্ব-মানবীয় ভাববিলাসের দিনে, আমি আমার স্বজাতির ভাবনাই বিশেষ করিয়া ভাবিয়াছি, এবং তাহার গৌরব-প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হইয়াছি, সেজন্য আমি কিছুমাত্র লজ্জিত নই;···বাঙালীকেও যদি বাঁচিতে হয় তবে তাহাকে বাঙালী হইয়াই বাঁচিতে হইবে;··· 'অখণ্ড ভারত' নামে মাটির উপরে মানচিত্রে কোন দেশ নাই; ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া পুনঃসৃষ্টি করিবার শক্তি বাঙালীর আছে,···এমন কথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে,

ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাঁচাইবার—সেই অখণ্ড ভারতকে উদ্ধার করিবার প্রতিভাশক্তি বাঙালীরই আছে ; বাঙালী ঘুমাইলে সেই ভারতের সকলেই ঘুমাইবে,…।"

"বাংলা ও বাঙালী" বইতেও উদ্দীপ্ত কণ্ঠে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুরে বলেছেন—

: "আমার উদ্দেশ্য—আজিকার এই মোহান্ধকারে আত্মনিন্দা ও পর-পদাঘাত-সহনপটুতার প্রেতবৎ অবস্থায় সে একবারও তাহার বাঙালীত্বের মর্যাদা স্মরণ করুক ও মনন করুক। যাহা গিয়াছে—যাক, যাহা হইবার তাহা হউক! তবু একবার এই অন্তিমকালে সে যেন তাহার আত্মাকে দেখিতে পায় ; সে কি ছিল, কি হইয়াছে—সেই জ্ঞানের গঙ্গাজল-গণ্ডূষ পান করিয়া সে যেন পাপমুক্ত হয়।" (নিবেদন)

দেশের ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক আর সাহিত্যিক ক্রমবিকাশের আলোচনা এরকমভাবে পূর্বে বাংলাদেশে হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। স্টাইল এবং পদ্ধতিটা অবশ্য বঙ্কিমী, কেননা বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি গুরু বলে স্বীকার করেছেন। তিনি বাংলার দুরবস্থার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বঙ্কিমের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করে বলেছেন, "বঙ্কিমের প্রভাব যে পরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা এই ভীষণ যুগ-সঙ্কটে সকল দিকেই দিকভ্রান্ত হইতেছি।" এর যুক্তির সমর্থনে বলেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র কেবল সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই—সূক্ষ্ম মনোবিলাসের বা কালচারের আয়োজন প্রচুর করিয়া তোলেন নাই ; তিনি এই জাতির বক্ষে বল ও প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন ; ভাবচিন্তার প্রচণ্ড শক্তি-বলে তাহার জীবনের জীর্ণ ভিত্তি সংস্কার করিয়া নূতন সৌধের পত্তন করিয়াছিলেন।" (বঙ্কিম-প্রতিভার পৌরুষ) এযুগে মোহিতলাল আরেকজন মনীষীর ওপর নির্ভর করেছেন তিনি হচ্ছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এঁর কর্মবহুল জীবনের ব্যাখ্যা করেছেন। গান্ধীবাদ ভারতের ঐতিহ্যকে যেমন নির্জীব করে দিয়েছে, সুভাষচন্দ্র সেই ঐতিহ্যের প্রাণচঞ্চল পুরুষ ছিলেন, তাঁর মধ্যেই সকল বৈচিত্র্যের সমন্বয় ঘটেছিল—"জয়তু নেতাজী" বইয়ের মূলকথা হোল এই। মোহিতলাল বলেছেন, "ভারতের ঐতিহ্য ও মানব-ইতিহাসের অন্যতম ধারা—এই দুইয়ের যদি কোথাও সমন্বয় হইয়া থাকে অর্থাৎ ভারতের সেই 'সনাতন' যদি কোথাও যুগোচিত মূর্তি ধারণ করিয়া থাকে তবে তাহা ঐ একটি পুরুষের জীবনে—তাহার জ্ঞানে, তাহার প্রেমে ও তাহার কর্মে। কারণ, সুভাষচন্দ্র শুধুই আজাদ-হিন্দ ফৌজের নেতাজী নহেন—সমগ্র ভারতের প্রাণ-গঙ্গার গঙ্গাধর।" তাই নেতাজীর কর্মময় জীবনকে তিনি মহাকাব্যের উপকরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, "হোমারের 'ইলিয়াড', বাল্মীকির 'রামায়ণ' ও ব্যাসের 'জয়'-মহাকাব্য পাঠ করার পর যদি আর একখানি তেমনই পাঠ্য হইতে পারে তবে তাহা এই নেতাজী-চরিত।…অথচ ইহা কাব্য নহে—ইতিহাস। আমার বিশ্বাস জগৎ-সাহিত্যে এমন মহাকাব্য আর মিলিবে না। ভারত যদি আবার বাঁচিয়া উঠে, তবে রামায়ণ মহাভারতের মতই এই মহাকাহিনী, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া কৃষকের পর্ণকুটীর হইতে ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্র ঘরে ঘরে পঠিত হইবে ; কতগান, কতগাথা, কতকাব্য, কত নাটক এবং কতরকমের শিল্প-কলায় এই অমৃত-নিস্যন্দী রসধারা প্রবাহিত হইতে থাকিবে।"

॥ ৩ ॥

দেশবিভাগের বিষয়ক ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে দুর্দশাটা দাঁড়াল—এই নিয়ে তাঁর মতটা কেমন ছিল এবং বাঙালীর ওপর বিহারীদের অত্যাচার এবং তার ফলে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনে কেন্দ্রীয় সরকারের গড়িমসীভাব তাঁকে কতদূর ব্যথিত করেছে এবার তারই নিদর্শন হিসেবে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থিত করছি—

: ঐ ম্যাপখানির দিকে চাহিয়া দেখ, উহাই স্বাধীন বাংলা—বাঙালীর স্বদেশ। এতদিন যে-ভূমির নাম ছিল বঙ্গদেশ, যে-দেশের সাতকোটিকে লইয়া তোমার গর্বের অবধি ছিল না, যে-দেশের চতুঃসীমা প্রদক্ষিণ করিয়া তোমার চারণ-কবিগণ বর্ণনার ভাষা পাইত না—সেই "বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুকমালা," আরও কত কি! —এখন সেই দেশের ঐ একটি ক্ষুদ্র টুকরার দিকে চাহিয়া তাহাকে চিনিতে পারো?…সহস্র বৎসর বাঙ্গালী যাহাকে আপন বলিয়া জানিত, আজ এতদিন পরে সে ভূমি আর তাহার নহে! বাঙালী-মুসলমানেরও নহে, সেও সেখানে দাসত্ব করিবে—ডবল দাসত্ব।

: ভগবান মানুষকে যে সহজ-বুদ্ধি দিয়াছেন, এবং মৃত্যুসঙ্কটে পড়িলে ইতর জীবেরও যে চৈতন্য সজাগ হইয়া উঠে, আমরা তাহার বেশী দাবী করিতেছি না ; প্রকৃতির নিয়মকে আমরা ভগবানের নিয়ম বলিয়াই মানি, সেই নিয়ম না মানিবার মত স্পর্দ্ধা আমাদের নাই এবং সর্বোপরি আমরা বাঁচিতে চাই, আত্মহত্যাকে একটা বড় নাম দিয়া, পরের সুবিধার জন্য নিজেরা সবংশে নিপাত হইতে চাহি না। যখন সমস্ত ভারতবর্ষের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইতেছি, আর সকলেই যেমন করিয়া হোক শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া যাইবে, মরিবে কেবল বাঙালীই, তখন গোটা ভারতবর্ষের হিতার্থে আমরা এমন করিয়া মরিতে প্রস্তুত নহি। স্তোকবাক্য ক্রমেই বাড়িতেছে—কেন তাহা জানি। বাঙালীর কানে একটা কথাই বারবার ধ্বনিত করা হইতেছে যে, এমন আত্মত্যাগ বাঙালীই করিতে পারে, বাঙালী আবার সারা ভারতের গুরু হইবে। ত্যাগের দৃষ্টান্ত সে-ই দেখাইবে বটে, কিন্তু অপরাপর ভারতবাসী তাহার অনুসরণ করিবে কেন? তাহাদের ত প্রয়োজন নাই। তাহাদিগকে ত' এমন বাউণ্ডারীর শমনজারী সহিতে হয় নাই। তাহারা কি দুঃখে বাঙালীর মত নিজের চিতা নিজে সাজাইবে?

: ভূমির ভাগ ত' চোখে দেখিতে পাইতেছি ; কিন্তু উহার অন্তরালে যে আর একটি ভাগ রহিয়াছে তাহা যেমন গূঢ়, তেমনি আরও ভীতিজনক। ঐ যে সীমানা-নির্দেশ উহার অন্য অভিপ্রায় আছে, বোধ হয় সেই অভিপ্রায়টাই গুরুতর। পূর্বভাগের ঐ বিপুল বিস্তারের দ্বারা বাঙালী হিন্দু-সমাজের একটা বৃহৎ অংশকে বেড়াজালে বেষ্টন করিয়া লওয়া হইয়াছে ;…ঐ যে বাংলা-ভাগ—উহাতে হিন্দু সমাজের হস্তপদ উদর ও

বক্ষ কাটিয়া লইয়া কেবল মুণ্ডটি ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে—যে মুণ্ডের মস্তিষ্কে এ যুগে বাঙালীর পাপবুদ্ধি পর্যীভূত হইয়া আছে।

ঃ ভারতরাষ্ট্রের হিতার্থে বাঙালীকে বাংলার দুই তৃতীয়াংশ বাঘের মুখে ছাড়িয়া দিতে হইল—গেল, বাঙালীরাই গেল! তবু বাঙালী ভারত-রাষ্ট্রের জয়ধ্বনি করিল। আসাম, উড়িষ্যা, বিহার ভারতরাষ্ট্রের কোলে বসিয়া বাঙালীকে যৎপরোনাস্তি পদাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত করিল; অপর প্রদেশগুলীর সন্নিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের ছিটাফোঁটাও বাংলার সহিত যুক্ত হইতে দেওয়া হইল না—তাহা দেখিয়াও বাঙালী ভারতরাষ্ট্রের জয়ধ্বনি করিল। 'পূর্বাচল' নাম দিয়া বাঙালী একটা প্রদেশ গড়িয়া লইবার অতিশয় ন্যায্য দাবী করিল, ভারতরাষ্ট্র কেবল প্রভুত্বের অধিকারে সকল যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া সেই দাবী না-মঞ্জুর করিল—তবু বাঙালী ভারতরাষ্ট্রের জয়ধ্বনি করিল। 'বন্দেমাতরম্' ও বাংলা ভাষা—বাঙালীর এই দুইটি অমূল্য দান ভারতরাষ্ট্র দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করিল—এত বড় অবিচার ও অপমান সহ্য করিয়াও বাঙালী ভারতরাষ্ট্রের জয়ধ্বনি করিল। …কলিকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে, ব্যবসা-বাণিজ্যে হিন্দুস্থানীর একচেটিয়া অধিকার দৃঢ়তর করিবার ও তাহাদিগকে সর্ববিধ সুযোগদানের পক্ষপাতী দেখিয়াও বাঙালী ঐ ভারতরাষ্ট্রেরই জয়ধ্বনি করিল। ওগো দয়াময়গণ! এত করিয়াও কি বাঙালী একটু দয়া পাইবে না। জানি, ব্রিটিশ-মিত্রের বিরুদ্ধে বাঙালীই সর্বপ্রথম জাতীয়তা মন্ত্রের বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল—বাঙালীর স্বভাব সহিংস সংগ্রাম করিয়া সব মজাইতে বসিয়াছিল; কিন্তু সে পাপের শাস্তি কি কিছুতেই পূর্ণ হইবার নয়? তাই বাঙালীকে শেষে ভারত হইতে নির্বাসিত হইয়া আন্দামানে বাস করিতে হইবে?

ঃ বাংলার পূর্বভাগে বাঙালী-জাতির একটা বড় অংশ শীঘ্রই 'পাক' হইয়া যাইবে; বিহার খানিকটা হজম করিবে; আসামও কিছু-কিছুর সদ্গতি করিবে। খোদ পশ্চিম ভাগটাতে যত অনাবাদী পতিত জমি আছে, সেগুলি পরে হিন্দুস্থানী-ধনিকদের কবলে যাইবে, কত রকমের কারখানা স্থাপিত হইবে। তাই বাস্তহারা বাঙালীকে সেখানে বসতি করিতে না দিয়া (অজুহাতের অভাব নাই) আন্দামানে চালান করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহার পরেও যে বাঙালীগুলো অবশিষ্ট থাকিবে তাহারা হয় বলদের ল্যাজ মলিবে, নয় কারখানার কুলি হইবে। হিন্দুস্থানী বণিকের উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া, অথবা হিন্দুস্থানী রাজপুরুষদের সেবা করিয়া, যে কয়জন ভুঁড়িতে হাত বুলাইবে, তাহাদিগকে বাঙালী বলিয়া চিনিতেই পারা যাইবে না। ইহাই হইল বাঙ্গালী-সমস্যার সমাধান।

ঃ হিন্দী হইবে ভারতের রাষ্ট্রভাষা, অর্থাৎ রাজভাষা, অর্থাৎ পিতৃভাষা। বাংলা ভাষার মারফতে কোন দেবকর্ম, অর্থাৎ পিতৃকর্ম, অর্থাৎ প্রভুকর্ম করা আর চলিবে না—ঐ ভাষা রাষ্ট্র-সভায় বা রাষ্ট্রিক শাসন-বিভাগের উচ্চপদ অধিকারে কোন কাজে লাগিবে না। না লাগুক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যটাকে যদি নাগরী লিপিতে ছাপানো হয় তবে ভারতের সকল জাতিই উহার রূপে মুগ্ধ হইয়া যাইবে, ভৃত্যেরও একটু খাতির মিলিবে।……বাঙালীর দাস-মনোভাব যে কিরূপ পাকা হইয়া উঠিবে, তাহা মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

ঃ স্বাধীনতা ভালো, এক-রাষ্ট্রও ভালো; কিন্তু একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ য়ুরোপের মতই একটা মহাদেশ, ইহাতে বহু জাতি বাস করে, তাহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি আছে; ভারতবর্ষ এক রাষ্ট্র হইলেও কখনও একজাতি-রাষ্ট্র নহে। বাঙালীকেও জার্মাণ, ফরাসী, ইতালীয় জাতির মত তাহার জাতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে। কংগ্রেস এখন আচরণে যে মূর্তিই ধারণ করুক—এই জাতি-স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ধর্ম শপথ করিয়াই সে সারা ভারতের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিল। আজ যদি সে সর্বপ্রকারে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যনাশ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে, তবে বাঙালীকে তাহার স্বাতন্ত্র্য নিজেই রক্ষা করিতে হইবে। স্বাধীনতা ও একরাষ্ট্রের কোন মূল্যই তাহার পক্ষে আর নাই, সে ক্রমেই একটা দাস জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ঐ দাসত্ব বা পরাধীনতা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়—'ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা'।……এ সঙ্কট যদি আমরা এখনই ঠেকাইতে না পারি, তবে বাঙালীর আর কিছুই থাকিবে না। ইহার মত বিপদ আর কি হইতে পারে? যে বাঙালী—তিনি যতবড় পণ্ডিত, বা যতবড় নেতাই হউন—এই কার্যে সহায়তা করিবেন তাঁহাকে বাংলা ও বাঙালীর মহাশত্রু বলিয়াই গণ্য করা উচিত। (বাঙালীর বর্তমানঃ বাংলা ও বাঙালী)

—উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। ইতিমধ্যে আশা করি একথা স্পষ্ট হয়েছে যে মোহিতলালের এসব মতামত নিছকই ফেলনা নয়, আজকের বাঙলায় আমরা তা হাড়ে হাড়ে বুঝছি। বিশেষ করে সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূমের ওপর বাঙালীর দাবীকে দাবিয়ে রেখে বিহারের অকথ্য অত্যাচার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নীরবতা আমাদের বিস্মিত করেছে। অন্ধ্র প্রদেশ গঠনে গণ-আন্দোলনের জয় হয়েছে—আমাদের নিজেদের কর্মদোষে বাঙালীর আন্দোলন এখনও সংহত হয়ে ওঠেনি, তবু বাঙালী-প্রধানরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত প্রদেশ-গঠন কমিশনের কাছ থেকে সুবিচারের আশা রাখেন। 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' দুর্যোধনের সেদিনের আস্ফালন বিহারীরা বাঙলার বিরুদ্ধে আজ প্রয়োগ করছে। বাঙলা-সংস্কৃতির ওপর তাদের সদম্ভ পদাঘাত ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন প্রতিদিনকার খবরের কাগজে আমরা পড়ছি। বাঙালীর এই দুর্দিনে যিনি বাঙলার জন্যে ভেবেছিলেন সেই মোহিতলালের রচনাবলীর বিচার এই আলোকে আরেকবার আমাদের দেখে নিতে হবে। সাহিত্য ও স্বজাতি নিয়ে যথার্থ 'শহীদ' যদি কেউ থাকেন সে তিনি। তিনি বঙ্গদর্শন, 'বঙ্গভারতী'র সম্পাদনায় ও প্রবন্ধাদির সাহায্যে জাতির দৈন্যের কথা, অভাবের কথা, জাতির ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ-সূচনা সম্বলিত বিবিধ প্রবন্ধ লিখে মরণোন্মুখ জাতির সম্মুখে যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন সেদিন তাকে আমরা আমলই দিইনি। কিন্তু আজ প্রলয়পয়োধির জল বাড়তে বাড়তে আমাদের নাকের ডগায় এসে ঠেকেছে। প্রলয়ের বন্যা যখন পিছনে তাড়া দিয়ে আসছে

করে নাইবা এগিয়ে গেলাম—অন্ততঃ পরিত্রাণ লাভের উপায় নির্দ্ধারণে তাঁর রচনাবলী পাঠ করতে দোষ কি?

আজকের অন্ধকার ভেদ করে দেশকে দেখেছিলেন বলেই বাঙলার এ অবস্থায় তাঁর মনে পড়েছে অতীত গৌরবের সুখ-স্মৃতি; কেননা তাঁর জন্ম হয়েছিল মহাজাগরণের সেই সোনার বাঙলায়। সে-সুখের স্মৃতি আছে যার নিদর্শন বর্তমানে নেই—তাই তিনি আজকের শ্মশানভূমির প্রতি চেয়ে যে বিলাপোক্তি করেছেন তা তাঁর মত বাঙালীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। ছন্নছাড়া বাঙালীর শোচনীয় অবস্থা তাঁর মনে নৈরাশ্যের উদ্রেক করলেও পরাজিতের মনোভাব তাঁর চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় নি। র'লার জাঁক্রিস্তফের মতো তাঁর মনোভাবও হলো যেন "I am beaten; I will fight again." তাই বাঙালী চরিত্রের প্রতি গভীর ভাবে আস্থাবান না হলে নদীয়া জেলার সাহিত্য সম্মেলনে (৮ই বৈশাখ ১৩৫৮ : ২২শে এপ্রিল ১৯৫১) তিনি কিছুতেই একথা বলতে পারতেন না—

: "...যদি বাঙালী আর বাঙালী হইয়াই বাঁচিয়া না থাকে তবে ভারতও মরিবে—অন্তত ভারতের আত্মা যে নির্বাণপ্রাপ্ত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। অতএব আমি যে বাঙালীর জন্যই কাঁদি তাহাতে ভারতের অকল্যাণ হয় না...বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের জাতি কি এমন করিয়া মরিতে পারে?...এ জাতি বিশেষ করিয়া প্রাণধর্মী, ইহার এক আশ্চর্য প্রাণবত্তা আছে।...আর কিছুতেই এ জাতি জাগিবে না, একমাত্র—কোন মহাপ্রাণ পুরুষের সাক্ষাৎ সংশ্রয় ব্যতিরেকে। যদি এখনও তেমন পুরুষের আবির্ভাব হয়—তবে সেই একজনের আহ্বানে এই শ্মশান ভূমিতেও শবদেহ উঠিয়া বসিবে, ইহার মৃত্তিকাতল হইতেও অস্থি-কঙ্কাল বাহির হইয়া কলেবর-শোভিত হইবে। এ জাতির প্রাণমাহাত্ম্য এমনই!"...(সভাপতির অভিভাষণ)

॥ ৪ ॥

মোহিতলালের বাঙালী-সত্তা নিয়ে এতক্ষণ আলোচনার পর একটি সিদ্ধান্ত অনায়াসে টানতে পারি। সেটি হোল—বঙ্কিমচন্দ্রের মত তিনিও আগে বাঙালী পরে ভারতীয়, আগে হিন্দু পরে অন্য কিছু, আগে দেশ ও জাতি পরে সাহিত্য। এইখানেই মোহিতলালকে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে কেননা স্বাদেশিকতার থেকে জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা। মোহিতলালের মধ্যে এই অন্ধ-প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা ছিল না।

ভারতের স্বাধীনতার জন্যে কেউ যদি সবচেয়ে বেশী রক্তমূল্য দিয়ে থাকে তবে সে বাঙলা দেশ। কিন্তু বিনিময়ে সে পেল কি? পেল দ্বিখণ্ডিত হৃৎপিণ্ড মাত্র। সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক দিয়ে বাঙালীর অবস্থা যেমন শোচনীয় তেমনি পূর্ব-বাঙলায় বাঙালী হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ফলে ভারতে তাদের পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকারের শৈথিল্য বাঙালী হিন্দুকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিয়েছে। এমতাবস্থায় বাঙলা-দেশের ঐতিহ্য ও বাঙালী হিন্দুকে বাঁচাবার জন্যে যদি মোহিতলাল ব্যাকুল হয়ে পড়েন তাকি প্রাদেশিকতা কিংবা সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট হবে? বাঙালীত্বের প্রতি অনুরাগকে প্রাদেশিকতা ও বাঙালী হিন্দুকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধারের কথা চিন্তা করাকে যদি সাম্প্রদায়িকতা বলতেই হয় তাহলে বলতে হবে যে মোহিতলালের বাঙালীয়ানা বিহারী-উড়িয়া-অসমীয়াদের মত বাঙালী-খেদার রূপান্তর নয়, তাঁর জাতির প্রতি ভালবাসা হিন্দু-মুসলমানের প্রতি দাঙ্গা বাঁধানো নয়। তিনি শুধু বলতে চেয়েছেন, যে বাঙালী নিজের মেধা ও মনন নিয়ে একদিন সমগ্র ভারতের সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করেছে—সে জাতকে যেমন করে হোক বাঁচতে হবে সমগ্র ভারতের খাতিরে—এবং এর ফলে একালের ভারতীয় সংস্কৃতির নবতররূপ যে একান্তভাবে বাঙালী সংস্কৃতিরই রকমফের মাত্র এবং ভারতের সেই জাগরণের মধ্যে বাঙলার বিশেষ বাঙালী হিন্দুর যে কৃতিত্ব রয়েছে সেই হিন্দুকেও বাঁচতে হবে। এ ঐতিহাসিক সত্য নিয়ে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় "জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য" গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, আর মার্কসবাদী সমালোচক গোপাল হালদার "সংস্কৃতির রূপান্তর", "বাঙালী সংস্কৃতির রূপ" বইতেও স্বীকার করেছেন—তবে এঁরা বাঙালীত্বের প্রতি অন্ধ অনুরাগের বশবর্তী না হয়ে ভারত-পথের পথিক হয়েছেন। কিন্তু মোহিতলাল ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই যাঁরা ভারত-পথের পথিক ছিলেন তাঁদের তিনি দেখতে পারেন নি। এজন্যে রবীন্দ্রনাথের ওপরও তিনি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন—কেননা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারত-ভাগ্য-বিধাতার উপাসক—বাঙলার সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে কখনও স্বতন্ত্র মর্যাদা দেন নি, বরং বাঙলা দেশকেই ভারত পথের পথিক হবার প্রবর্তনা দিয়ে গেছেন! "বাঙালীর অদৃষ্ট" প্রবন্ধে মোহিতলাল তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "যে জাতির মেরুদণ্ড বক্র ও শীর্ণ হইয়া উঠিতেছে, যাহার উদরে অন্ন নাই, চক্ষে দীপ্তি নাই—যে জাতিহারা, বাস্তহারা হইতে বসিয়াছে—সে এখন কবির মুখে বিশ্বভারতী ও বিশ্বমৈত্রীর বাণী শুনিয়া কেমন করিয়া সঞ্জীবিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কবি তাহাকে বঙ্গভারতীর পরিবর্তে বিশ্বভারতীর আদর্শে দীক্ষিত করিতেছেন; দেশ ও জাতি ভুলাইয়া মহামানবের বন্দনা-গান শুনাইতেছেন; তাহার রসবোধ উন্নত ও মার্জিত করিবার জন্য সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রকলার নব নব ধারায় বেগসঞ্চারে সাহায্য করিতেছেন; সত্যকার রক্ত-মাংসের চেতনা স্তিমিত করিয়া, অরূপ-রূপকের মিষ্টিক-রসে তাহার মরণাহত প্রাণে সান্ত্বনা সিঞ্চন করিতেছেন। তাই মনে হয়, বাঙালীকে লইয়া বিধাতার কি পরিহাস! এতবড় প্রতিভাও জাতির পক্ষে নিষ্ফল হইল! রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর Renaissance-এর শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক না হইয়া তাহার মৃত্যুযজ্ঞের অন্যতম পুরোহিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন।" (বিবিধ কথা।)

আজকের দিনে স্বতন্ত্রভাবে একটা দেশ বা জাতি বেঁচে থাকতে পারে না, প্রত্যেকের উন্নতি অবনতি পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একটা খণ্ড সত্যের মহত্ত্ব একটা অখণ্ড সত্যের ঘাড়ে কোন প্রকারেই চাপানো যায় না তাতে যতগুণই থাক। সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে দেখতে হবে

নিজের মধ্যে সর্বভূতের আত্মাকে উপলব্ধি করতে হবে। তাই একের কথার আগে বহুর কথাকে ভাবতে হবে—এযুগের এটিই হোল বেঁচে থাকার একমাত্র পন্থা। বাঙালীকে উদ্ধারের পথ বাতলিয়ে দেবার পূর্বে সে-পথ আজকের জাগতিক ও ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় কতটা কার্যকরী হবে এবং সেজন্যে নিজের মতের কতখানি যোগ-বিয়োগ করতে হবে—দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে সেই দৃষ্টির সমগ্রতা মোহিতলালের ছিল না। জগতের সহিত দূরের কথা সমগ্র ভারতের সহিতই তাঁর অন্তরের আত্মীয়তা নেই। নিরতিশয় স্বল্পপরিসর গণ্ডীর মধ্যে নিজের বাঙালীত্ব নিয়ে মেতেছিলেন। তিনি শুধু বাঙালীর দুর্দশায় কাতর হয়ে এমন উত্তেজিত হয়েছেন যে বাঙলার গৌরবময় অতীতকে স্মরণ করে এবং বাঙালীর প্রতি বাকী ভারতের ঔদাসীন্যকে সর্বদা মানসপটে জাগ্রত রেখে বাঙালীর বাঁচার পথ চিন্তা করেছেন। কাজেই শেষের দিকে তাঁর এই মনোভাব বাঙালী জাতির রক্ত-নির্দ্ধারণ তত্ত্বে গিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে। বিদ্যাবত্তা এবং মনীষার সমন্বয়ে তাঁর রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ সন্দেহ নেই, বিদগ্ধ চিত্তকে পরিতৃপ্ত করে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পরিমিত বদ্ধ-গণ্ডীর মধ্যে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে। তবু, এত ত্রুটি বলার পরও আবার বলছি বাঙালীত্বের প্রতি মোহিতলালের মমত্ববোধকে কিছুতেই সন্দেহ করা চলে না—বাঙালীর সঙ্গে তাঁর সত্যিকারের নাড়ীর টান ছিল। আর এই অকৃত্রিম মমত্বের জন্য বাঙালী মোহিতলালের চরিত্রকে অনুধাবন করে আজকের দুর্বিপাকের মরীচিকা থেকে বাঙালীকে সত্যিকারের মরূদ্যানে ফিরে যাওয়ার পথ সকলকে নির্দ্ধারণ করতে আহ্বান জানাই—যাতে ভারতীয় আত্মার রূপ পরিপূর্ণতা লাভ করবে, যাতে বিরোধ থাকবে না—বন্ধুত্বের মিলন-সেতু গড়ে উঠবে, একের জন্যে অপরে প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকবে।

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

দ্বয়োঃ সবীজং, অন্যত্র তদ্ধতিঃ। সাং সূ—৫।১১৭

সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থার যেমন অস্তিত্ব আছে, তেমনি মোক্ষও আছে। দ্বয়োরিব ত্রয়স্যাপি দৃষ্টত্বাং ন তু দ্বৌ।

সাং সূ—৫।১১৮

সুষুপ্তি ও সমাধি উভয়েরই "দোষযোগ" আছে—কেননা উভয় অবস্থাতেই আত্মার গুণসঙ্গ থাকে এবং সুষুপ্তি ও সমাধি উভয় অবস্থার কোনটাই প্রধানের বাধা জন্মাইতে পারে না, কেননা উভয়ই প্রধানের অন্তর্গত। কিন্তু উক্ত অবস্থাদ্বয়ে কোনও বাসনার উদ্রেক হইয়া কোনও বিষয়ের জ্ঞান হয়না।

বাসনয়া ন স্বার্থখ্যাপনং দোষযোগেঽপি
ন নিমিত্তস্য প্রধানবাধকত্বম্। সাং সূ ৫।১১৯

মোক্ষ অর্থাৎ বন্ধন হইতে মুক্তি "অস্তিত্বের পাশ" হইতে মুক্তি নহে।

"ন সর্বোচ্ছিত্তিঃ অপুরুষার্থত্বাদিদোষাৎ।"

সাং সূ ৫।৭৮

আত্মা যখন অবিনাশী, তখন মোক্ষে তাহার নাশ হইবে কেন? মোক্ষ হইলে নাশ হয় জীবের। আত্মনাশ কেহই চাহে না, সুতরাং পুরুষও তাহা চাহেনা। কিন্তু "দুঃখত্রয়াভিঘাতে" আসন্ন জীবে তাহা চাহে কি? জীব মোক্ষে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। এই ধ্বংস জীবের কাম্য কি?

পুরুষ নির্গুণ। সুতরাং "ন আনন্দাভিব্যক্তিঃ মুক্তিঃ।" সাং সূ ৫।৭৪। মুক্তিতে আনন্দের অভিব্যক্তি হয় না। আবার পুরুষ নিষ্ক্রিয় তাহার গতি নাই। সুতরাং ন বিশেষগতিঃ নিষ্ক্রিয়স্য। সাং সূ ৫।৭৬। ব্রহ্মলোক অথবা অন্য কোনও লোকে গমন মোক্ষ নহে।

নাকারোপরাগোচ্ছিত্তিঃ, ক্ষণিকত্বাদিদোষাৎ।

সাং সূ ৫।৭৭

ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীদিগের মত এই যে আত্মা ক্ষণিক জ্ঞানমাত্র বিষয়কর্তৃক তাহার উপরাগের উচ্ছেদও মোক্ষ নহে। কেননা আত্মা ক্ষণিক জ্ঞানমাত্র নহে। "ন ভাগিযোগো ভাগস্য"। সাং সূ ৫।৮১। ঈশ্বরের অংশরূপ জীবের ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়াও মোক্ষ নহে। কেননা সংযোগ বিয়োগান্ত; ঈশ্বরের সহিত যোগ হইলে তাহার বিয়োগও হয়।

"ন অণিমাদিযোগোঽপি অবশ্যংভাবিত্বাৎ
তদুচ্ছিত্তেরিতর যোগবৎ।" সাং সূ ৫।৮২

ধনজন যৌবন প্রভৃতি ইতর ঐশ্বর্য্যের ন্যায় অনিমাদি যোগজ ঐশ্বর্য্যের বিনাশও অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তাহাও মোক্ষ নহে।

নেন্দ্রাদি পদযোগোঽপি তদ্বৎ। সাং সূ ৫।৮৩

ইন্দ্রত্বাদি পদও নশ্বর, সুতরাং তাহার প্রাপ্তিও মোক্ষ নহে। মোক্ষ অর্থে সেই দুঃখাতীত অবস্থা, যাহার বিনাশ নাই।

এ সকলই মোক্ষের নেতিবাচক বর্ণনা। ইহার ভাববাচক বর্ণনা একটু পাওয়া সাংখ্যকারিকার ৬৪ সূত্রে।

এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্মি, নমে নাহম্ ইত্যপরিশেষম্
অবিপর্য্যয়াৎ বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্।

এইরূপ তত্ত্বাভ্যাসের ফলে বুদ্ধির বিপর্যায় দূর হয় এবং আমি দেহাদি নহি, আমার কেহ নাই এবং কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া আমি কেহ নাই, এই প্রকার বিশুদ্ধ নির্ম্মল আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান কাহার? পুরুষের যদি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বে তাহাতে এই জ্ঞান ছিল না বলিতে হয় অর্থাৎ পুরুষের বন্ধ হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিতে হয়। অহংকারমুক্ত জীবের এই জ্ঞান হয়, ইহা বলা অর্থহীন, কেননা প্রথমতঃ অহংকারের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে জীবেরও বিনাশ হয়। দ্বিতীয়তঃ আমি দেহ নহি, আমার কিছু নাই—এ সকল কথা পুরুষের পক্ষে সত্য। জীবের পক্ষে নহে। অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব যখন অবিদ্যা হইতে মুক্ত হয় তখনই তাহার বিশুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু তখন তো তাহার অস্তিত্বই নাই। গীতায় যোগের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে চিত্তের নিরোধ হয়, আত্মা আপনাকে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক সুখ লাভ হয়, আত্মা স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় না; অন্য কোনও লাভকেই লাভ বলিয়া মনে হয়না, মহৎ দুঃখেও আত্মা বিচলিত হয় না; ইহাই দুঃখ-সংযোগ হইতে বিযুক্ত অবস্থা, ইহাই সমাধি। এই অবস্থা পরম আনন্দের অবস্থা। ইহাই ব্রহ্মরূপতা, কিন্তু ইহা সাংখ্যের মোক্ষ নহে। সাংখ্যের মোক্ষ আনন্দের অবস্থা নহে।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।"

(তৈত্তিরীয় উপ) ব্রহ্ম সুখস্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মরূপতা আনন্দপূর্ণ অবস্থা। সাংখ্যের পুরুষ ব্রহ্ম নহে, কেন না ব্রহ্ম এক, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। কিন্তু পুরুষ বহু, পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতি তাহার পার্শ্বে অবস্থিত। সাংখ্যের ৫।১১৫ সূত্রে "ব্রহ্মরূপতা" শব্দের ব্যবহার হইতে মনে হয়, এই সূত্র প্রাচীন কপিল সূত্রাবলীর অন্তর্গত ছিল, এবং কপিল প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মবাদীই ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে সাংখ্যদর্শন হইতে ব্রহ্মবর্জিত হইয়াছেন। চরক সংহিতার প্রথমেই যে দর্শন বিবৃত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন সাংখ্যদর্শন। তাহাতে অব্যক্ত প্রকৃতিকে পুরুষ বলা হইয়াছে। এই অব্যক্ত পুরুষই ব্রহ্ম। তাহা হইতেই জগৎ উদ্ভূত হয়। তিনি "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং, একো বহূনাং বিদধাতি কামান্, তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং, জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।" (শ্বেতাশ্বতর উপ, ৬।১৩) এই সাংখ্যযোগাধিগম্য দেব পরবর্ত্তী সাংখ্যদর্শন হইতে বর্জ্জিত হইয়াছেন। খুব সম্ভবতঃ বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবে।

চিতিশক্তি অপরিণামী এই যুক্তিতে সাংখ্যের ভাষ্যকারগণ পুরুষের সহিত প্রকৃতির প্রকৃত যোগ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। বন্ধ যে পুরুষের হয়, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। বন্ধ ও মোক্ষকে বাঙ্‌মাত্রং বলিয়াছেন। কিন্তু চিত্তস্থিত দুঃখকে পুরুষ নিজের দুঃখরূপে অনুভব করে, অহংকার-সমন্বিত হইয়া লিঙ্গশরীরের জরা-মরণ-সংসৃতির দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া ভোগ করে, ইহা স্বীকার করিলে বন্ধ ও মোক্ষকে বাঙ্‌মাত্র বলিবার কারণ থাকে না। ইহা স্বীকার না করিলে "জীব" পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বস্তু—চৈতন্যের আভাসপ্রাপ্ত লিঙ্গদেহ—এবং মোক্ষ অর্থে তাহার ঐকান্তিক বিনাশ। ঈদৃশ মোক্ষ কাহারও কাম্য হইতে পারে না।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেন "প্রকৃতির খেলা যখন শেষ হয় তখন তাহার অভিব্যক্ত অবস্থা অনভিব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যায়। তখন পুরুষ হয় দ্রষ্টা, কিন্তু দর্শন করিবার কিছুই থাকে না; পুরুষ দর্পণে পরিণত হয়, কিন্তু তাহাতে প্রতিফলিত হইবার কিছুই থাকে না। প্রকৃতির বন্ধন হইতে পুরুষ চিরকালের জন্য মুক্ত হয়, প্রকৃতির সংস্পর্শে আর কলুষিত হয় না। কালাতীত শূন্যের মধ্যে শুদ্ধ চিদ্রূপে অবস্থান করে।" (Ind. Philosophy vol II, P. 313)। মুক্ত পুরুষের দৃশ্য যদি কিছুই না থাকে তাহা হইলে ৬৪ কারিকায় যে অপরিশেষ বিশুদ্ধ কেবল জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, সে জ্ঞান কিসের? প্রকৃতপক্ষে মোক্ষে পুরুষ কি বাস্তব চৈতন্য হইতে চৈতন্যের শকাতায় পরিণত হয়? প্রকৃতির স্পর্শে তাহার যে জ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার ও তাহার সংস্কারের বিলোপের ফলে সেকি জ্ঞানহীন অবস্থায় পরিণত হয়?

সাংখ্যের ভাষ্যমতে এই মীমাংসা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে বটে। কিন্তু পুরুষ অনাদিকাল হইতে প্রকৃতির পাশে বদ্ধ; বুদ্ধিদ্বারা তাহার জ্ঞানশক্তি সংরুদ্ধ। বুদ্ধির বাধা বিদূরিত হইলে পুরুষ অতিমানসিক (Supra-mental) জ্ঞান লাভ করে। সেই অতিমানসিক জ্ঞানই অপরিশেষ বিশুদ্ধ ও কেবল জ্ঞান। সে জ্ঞান বৌদ্ধজ্ঞান অপেক্ষা উন্নততর। ইহা স্বীকার করিলে সাংখ্যের অসংগতি বহু পরিমাণে বিদূরিত হয়।

সমাপ্ত

কাণ্ডারী

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

(নাট্যচিত্র)

কোনো পল্লীঅঞ্চলের হাইস্কুলবাড়ীসংলগ্ন এক ক্ষুদ্র কক্ষে একটা ছোট তক্তপোষে বসে সন্ধ্যার পর প্রধানশিক্ষক জীবনবাবু নিবিষ্ট মনে হ্যারিকেনের আলোতে খবরের কাগজ পড়ছেন। এমন সময় দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল ইস্কুলের সম্মুখস্থ রুমি নদীর ঘাটের খেয়া-নৌকার মাঝি চন্দ্র দোলুই। বয়স প্রায় ষাট হলেও অত্যন্ত শক্ত ও দৃঢ় স্বাস্থ্য, গলাও সেই পরিমাণ বাজখাঁই। মাথার ধপধপে সাদা চুলগুলি গায়ের মিশকালো রংএর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে। অন্ধকারে আচমকা দেখলে ভয় পাবার কথা—এমন চেহারা। চন্দ্রর কাঁধে একখানা লাল টকটকে গামছা, পরণের ধুতি হাঁটুর উপর। জীবনবাবুর বয়স পঁয়তাল্লিশ, মাথার চুল এখনও কাঁচা, গোঁফদাড়ি কামান। গায়ে একটা গেঞ্জি।

জীবন। (মুখ তুলে) কে?

চন্দ্র। (ঘাড় হেঁট করে নমস্কার করে) আমি এলম এজ্ঞে।

জীবন। (ভাল করে দেখে) ও—অ, চন্দ্র?

চন্দ্র। এজ্ঞে।

জীবন। কি দরকার চন্দ্র? ভেতরে এস।

জীবনবাবু তক্তপোষের উপর থেকে হ্যারিকেনটি পাশের একটা টিনের চেয়ারের উপর রাখলেন। চন্দ্র ঘরে ঢুকে তক্তপোষের পাশে মেজেতে বসে পড়ল।

চন্দ্র। সব্বনাশ হয়েছে আমার মাস্টরমশয়।

জীবন। (সবিস্ময়ে) সে কি! কি হল?

চন্দ্র। লদীতে লৌকো লামিয়ে একি সব্বনাশ হল আমার। ডোঙ্গা আমার ভাল ছিল এজ্ঞে। এখন আমি কি করি!

জীবন! ছেলেটেলে কি ডুবে গেল নাকি? ডাক লোকজন তাহলে।

চন্দ্র। এজ্ঞে, কাল সকালে ডাকব।

জীবন। কাল সকালে ডাকব,মানে? ভরা নদী—এখনই হয়তো ভাসিয়ে নিয়ে গেল কতদূর,—কাল ডাকব মানে? যাও, যাও, এখনি ডাক।

চন্দ্র। ছেলেটেলে লয় এজ্ঞে।

জীবন। তবে?

চন্দ্র। সেই কথাই তো বলছি মাস্টরমশয়।

জীবন। ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে বাবা। কি তবে ডুবল তাহলে?

চন্দ্র। আজ যদি আমার একটা ব্যাটা থাকত, তা'লে কি হত, মাস্টরমশয়?

জীবন। তোমার তো ছেলেও নেই, স্ত্রীও নেই শুনেছি।

চন্দ্র। এজ্ঞে বলুন না, সেই ব্যাটা যদি ডিঙ্গি থেকে পড়ে গিয়ে জলডুবি হত, তা'লে কি হত?

জীবন। তাহলে তো সর্বনাশ হত।

চন্দ্র। তবেই বলুন এজ্ঞে, ঠিক বলেছি কিনা। মুখ্যু লোক, লিখাপড়া শিখিনি, তবে ইস্কুলের গায়ে থাকি, ইস্কুলের ছেলাদের মাস্টরদের খেয়াপার করি, পাঁচটা ভাল কথা শুনি—তাই বলছিলম, ডোঙ্গা আমার ভাল ছিল। আপনি বললেন, চন্দর, তুমি একটা ডিঙ্গি কর, বস্থাকালে ডোঙ্গায় করে লদী পার হতে ছেলাদের বড় কষ্ট, একে কম লোক ধরে, তায় আবার টলমল করে। তাছাড়া শ্যামসুখার লোকেরাও বলল, চন্দর, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠিকেছে তোর, মা গঙ্গার ছিচরণে একটা ভাল কাজ কর তুই, একটা লৌকো দে ঘাট পার হবার লেগে। তাই ভাবলম, কথাটা মিছে লয়। আমি কে, লগি লিয়ে দাঁড়ালেও আমি কেউ লই, আসল কাণ্ডারী সেই ভগমান!

বলে দুহাত জোড় করে মাথায় ঠেকালে

জীবন। পারাপারের জন্যে ডিঙ্গি দিয়ে তো ভাল কাজই করেছ তুমি চন্দ্র।

চন্দ্র। ভাল কাজ লয় এজ্ঞে। কে ভাল কাজ করবে, আসলে মালিক যদি না করায়। তাছাড়া ঐ বড়গাঁর ছেলারা এজ্ঞে বড় জ্বালাতন করে আমায়। রোজ ইস্কুল

এসবার সময় যেবার সময় লৌকো লাচাবে, ভাসিয়ে দেবে, লগি ভেঙ্গে দেবে, কত কি! আমি বলি, হাঁ গা, তোমরা যে ইস্কুলে পড়, বড় ছেলা সব, এ কি রীত তোমাদের! ডিঙ্গি ডুবলে যে কচি ছেলাগুলো ডুববে, তাতে ভুরুক্ষেপ নেই।

জীবন। আচ্ছা, ইস্কুল বসলে একবার এস, যারা ডিঙ্গি নাচায়, তাদের দেখিয়ে দিও আমায়।

চন্দ্র। এমন তেঁদোড় ছেলে যে কারুর কথা কানে তুলবেনি। পণ্ডিতমশয়, ভোলানাথবাবু যখন পেরোন, তখনও কি ভয়ডর আছে, লাচছে তো লাচছেই। এখন এই ঠাকরুণচক থেকে খেলে ফিরছিল এক দঙ্গল ছেলে।

জীবন। নৌকোটা কি ভাসিয়ে দিয়ে গেল নাকি।

চন্দ্র। রেতের বেলা আমি ভাল করে ঘুমুতে পারিনি এজ্ঞে। মাঝে মাঝে চমকে জেগে উঠি; মনে হয়, ঐ যেন কে ডাকছে, চন্দর! চন্দর! লৌকোটা একবার দাও। কান পেতে শুনি, কুনোদিন হয়তো সত্যি, আবার কুনো-দিন হয়তো লয়। ঘাট পর্য্যন্ত যেয়ে ফিরে এসি। রাত বারোটা, দুটো, তিনটে—কিছুই ঠিক নেই। ভগমানকে বলি, হে হরি, কি কঠিন কাজের ভার দিয়েছ তুমি। মরবার দিন পর্য্যন্ত যেন এই কাজ করে যেতে পারি। আর সেইদিন, ভবপারের কাণ্ডারী তুমি, চন্দকে লৌকোটা দিও। তাই বলি মাস্টরমশয়, এ আমার লৌকো লয়, এ আমার জুয়ান ব্যাটা, আমার বুড়ো বয়েসে আমায় উপায় করে খাওয়াচ্ছে। আমার এমন লৌকোর সব্বনাশটা করে দিয়ে গেলে তোমরা।

বলে গামছা দিয়ে চোখ মুছলে

জীবন। (চোখে জল দেখে একটু চঞ্চল হয়ে) চন্দ্র, কাল একবার এস তুমি, খুব শাসন করে দেব আমি তাদের।

চন্দ্র। মাস্টরমশয়, আজ চন্দ বুড়ো হয়েছে, না'লে লোকে বলে এখনো, পরাণে দোলুইএর ব্যাটা চন্দর দোলুইএর রাগ মানষের রাগ লয়, ভইষের রাগ, গাছ পাথর মানবেনি। বলব কি মাস্টরমশয়, সেই আকালের বছর, একে পেটের জ্বালা, তায় নিত্যি পারাণির পয়সা লিয়ে লোকের সঙ্গে তক্ক,—বলব কি এজ্ঞে, ডোঙ্গা চালাতে চালাতে একদিন একটা জুয়ান মদ্দকে মারলম গালে এক থাপ্পড়, উলটে পড়বি তো পড় একেবারে লদীর জলে। হাত ধরে টেনে তুললম, বললম, চন্দরকে আর কুনোদিন ঘেঁটিয়োনি। আর আজ এই বুড়ো বয়েসে ছেলাদের কাছে আমার এই হেনস্থা।

জীবন। ছেলেরা তো তোমাকে ভালওবাসে চন্দ্র।

চন্দ্র। তা বাসে এজ্ঞে। সে কথা একশবার বলব। দেশের লোকের পারাপারের জন্যে তো ঘর ঘর বছরে দুবার চালটা পয়সাটা পাই, তা গেলেই মা জেঠিকে ছেলারা বলবে, চন্দ এসেছে, আগে ওকে দাও। আবার আমাকে বলে কিনা, কালো মাণিক।

জীবন। (হাসি মুখে) কালো মাণিক বলে তোমাকে?

চন্দ্র। এজ্ঞে। আমি তো ফরসা লয়, তাই বলে আরকি। তা বলুক, ক্ষেতি নেই, কিন্তু এমন সব্বনাশটা করতে হয়।

জীবন। তোমার সব্বনাশটা কি, তা তো শোনা হলনা এখনো। ব্যাপারটা কি খুলে বল।

চন্দ্র। এই একটু আগে ঠাকরুণচক থিকে বল খেলে ফিরছিল ছেলারা। লৌকোটা উপারে লিয়ে গিয়ে ডুবাই দিয়েছে।

জীবন। ডুবিয়ে দিয়ে গেল কেন?

চন্দ্র। সে কথা আর কে বলে এজ্ঞে! মজা পেয়েছে, ডুবাই দিয়ে গেল। এখন আমি লোককে পারাপার করি কি করে!

জীবন। নৌকোটা কি তুলতে পারা যাবে না?

চন্দ্র। ও কি দু-একজনের কম্ম এজ্ঞে! পাঁচ সাতজন লাগবে। তা ছাড়া এই ঠাণ্ডা রেতে জলে ডুবতে তো কেউ চাইবেনি।

জীবন। তাই তো! আমাদের ইস্কুলের কজন ছেলে ছিল?

চন্দ্র। এজ্ঞে, তারাই তো বেশী, না'লে এত বুকের পাটা আর কার।

জীবন। আচ্ছা বেশ, তুমি কাল ইস্কুল বসবার সময় এস, দেখিয়ে দিও ছেলে কটাকে।

জীবনবাবু উঠে দাঁড়ালেন

(কিছুটা আত্মগত) যত ধমক-ধামক দিই, কিছুতে তো

শুনছে না। কাল দু-চারখানা ছড়ি পিঠে না ভাঙ্গলে চলবে না দেখছি, ছেলেগুলো বড্ড জ্বালাতন করেছে।

চন্দ্র। (জীবনবাবুর রাগ দেখে সঙ্কুচিত হয়ে নরম স্বরে) ঘাট থেকে ডোঙ্গাটা তুলে আজকের রাতটার মত চালাই এজ্ঞে।

জীবন। ডোঙ্গাটা কি এখনও রেখেছ নাকি?

চন্দ্র। এজ্ঞে, এই সব বিপদ-আপদের জন্যে রাখতে হয়, কখন কি দরকার পড়ে।

জীবন। ভাল করেছ।

চন্দ্র। (উঠে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে কচলাতে) মাস্টরমশয়, একটা কথা বলব?

জীবন! আবার কি কথা? ওই তো বললুম, কাল এস, ভয়ানক শাস্তি দেব তাদের।

চন্দ্র। তাই বলছিলিম, ছেলামানুষ—একটু ডানপিটিপনা করে—তাই বলছিলিম কি—

জীবন। কি বলছিলে?

চন্দ্র। (মাথা চুলকোতে চুলকোতে) ছেলামানুষ—করে ফেলেছে, কিছু বুঝেনি—তাই বলছিলিম, ওদিগে আর মারবেননি।

জীবন। তবে বলতে এলে কেন ছুটে?

চন্দ্র। মনটায় বড্ড বেজেছিল এজ্ঞে, তাই ছুটে এসেছিলিম। একটু বকে দেবেন, তা'লেই হবে। দুষ্টুই হয় ছেলারা,—কি আর করব!

জীবন। বেশ লোক তুমি! এই জন্যেই ছেলেরা তোমাকে জ্বালাতন করে। জানে, চন্দ্র মুখে যতই বলুক, তাদের মাস্টারমশায়ের কাছে মার খাওয়াবে না।

চন্দ্র। (হে হে করে খানিকটা হেসে) তা যা বলেছেন। তবে কিনা ছেলেরা সময় সময় এমন করে যে—ভাবি, হাঁ, ভাবি কি জানেন মাস্টরমশয়, আর কেন, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—এবার হে হরি ভগমান, আমাকে তুমি ছুটী দাও।

বলে জীবনবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে

এখন এসি মাস্টারমশয়। ডোঙ্গাটা আবার তুলতে হবে।

জীবন। (হাসিমুখে) এস।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রসায়নের অবদান

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস এম, এস-সি

ভারতীয় শিল্পসমূহের জন্য রসায়নের প্রয়োজন খুব বেশী। সালফিউরিক এসিড, সোডাএশ, কষ্টিক সোডা প্রভৃতি শিল্প, প্লাস্টিক, কৃত্রিম রেশম এবং ভেষজদ্রব্যসমূহ রসায়নের সাহায্যেই প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। এলুমিনিয়াম, সিমেণ্ট, কাগজ, চিনি, সাবান, বনস্পতি, রং ও বার্ণিশ প্রভৃতি শিল্প ফলিত রসায়নেরই অবদান বলা যেতে পারে। কৃষিশিল্পের অগ্রগতির জন্য সার প্রস্তুতের দরকার। ভারতবর্ষের মাটিতে প্রচুর পরিমাণ জৈবসার দরকার হলেও নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশ ঘটিত অজৈব সারও যথেষ্ট পরিমাণ আবশ্যক। রসায়নের সাহায্যে এমোনিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম সুপারফসফেট প্রভৃতি কৃত্রিম সার প্রস্তুত হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতীয় কাঁচামাল থেকেই বিবিধ রাসায়নিক প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে এবং প্রয়োজনমত বিদেশ হতে রাসায়নিক আমদানী করে শিল্পে ব্যবহার করা হয়েছে। বিবিধ রাসায়নিক প্রস্তুতের জন্য যেমন শিল্পসমূহ গড়ে উঠেছে সেরূপ আবার বিবিধ রাসায়নিকের উপর নির্ভর করেও বহু শিল্প সৃষ্ট হয়েছে। তাই আজ ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতির জন্য লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পের পরেই রসায়ন শিল্পের স্থান দেওয়া যেতে পারে।

ভারত সরকারের ১৯৫১-৫২ হইতে ১৯৫৫-৫৬ পর্য্যন্ত যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তাহাতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসম্বন্ধীয় পরিকল্পনা কার্য্যকরী করবার ব্যবস্থা হয়েছে। ইহা মোটামুটি দুই অংশে ভাগকরা হয়েছে। প্রথম অংশ কার্য্যকরী করতে হলে ১৪৯৩ কোটি টাকা লাগবে এবং দেশীয় কাঁচামাল ও সরঞ্জামাদি হতেই এই কাজ করা সম্ভব হবে। ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্য্যন্ত দেশের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি তৈরী করে জনসাধারণের চাহিদা মেটান সম্ভব হবে। পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশের জন্য ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। প্রথম অংশের জন্য যে শিল্পসরঞ্জাম সমূহ চালু করা হবে তাদের দ্বারা কার্য্যকরী ভাবে শিল্পদ্রব্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব হবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নতিসাধন। জনসাধারণের কৃষিকার্য, যানবাহন, বহু কুটীরশিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ ও কয়েকক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পসমূহে অর্থবিনিয়োগ করাই এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশের বেসরকারী শিল্পসমূহের উন্নতিসাধন একান্ত প্রয়োজনীয় বলেই জাতীয় সরকার মনে করেন।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য কৃষিশিল্পের উন্নতিসাধন।

কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধিই দেশের সর্বপ্রধান সমস্যা এবং বিদেশ হতে খাদ্যশস্য আমদানী বন্ধ করতে হলে এই ফসল উৎপাদনের উপরই নির্ভর করতে হবে। দেশবিভাগ হবার পর এই সমস্যা বহুলাংশে বেড়ে গেছে এবং কয়েক স্থানে খাদ্যসমস্যা নূতন করে দেখা দিয়েছে। জমির উর্বরতা বাড়াতে হলে জলসেচন প্রণালীর উন্নতিসাধন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন এবং রসায়নের সাহায্যে কৃত্রিম সার প্রস্তুতের মাত্রা বহুলাংশে বাড়ান দরকার হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উপরোক্ত দুটি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন এবং গ্রাম্য উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যে ১৯২ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে তার মধ্যে ১৩৭ কোটি টাকা কেবল কৃষিবাবদই খরচ হবে। এই বিপুল অর্থ ব্যয় হতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উপর কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বুঝা যাবে। বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রচুর শিল্পোন্নয়ন হয়েছে। কাপড়, চিনি, লবণ, সাবান, চামড়া এবং কাগজ প্রভৃতি পণ্য উৎপাদন শিল্পে ভারতবর্ষ প্রচুর অগ্রসর হয়েছে এবং প্রায় সম্পূর্ণভাবে দেশের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হয়েছে। ইহা ছাড়া ইস্পাত, সিমেন্ট, পাওয়ার এলকোহল, খনিজ ধাতু এবং বিবিধ রাসায়নিক শিল্পেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। শিল্পোন্নয়ন কার্য্যে ভারতীয় খনিসমূহ হতে উদ্ভূত খনিজ পদার্থসমূহের বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায়। ভারতবর্ষের খনিসমূহ হতে প্রচুর পরিমাণ কয়লা এবং লৌহ পাওয়া যায়। এই মূল্যবান খনিজ পদার্থ দুটির প্রাচুর্য্য থাকায় বহু শিল্পের সুবিধা হয়েছে। কাঁচা কয়লা হতে জ্বালানি কয়লা (কোক) এবং উৎপন্ন গ্যাস হতে নানারূপ মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী হয়েছে। ভারতবর্ষের লৌহ সম্পদের জন্যই টাটার বিরাট লৌহ এবং ইস্পাত কারখানা সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় খনিসমূহে তামা, টিন, সীসা, দস্তা, নিকেল এবং কোবাল্ট প্রভৃতি কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় খনিজ-সমূহের ঘাটতি দেখা যায়। ভারতীয় খনিসমূহে এলুমিনিয়াম, টাইটানিয়াম এবং থোরিয়ামএর খনিজসমূহের প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে রসায়নশিল্পের প্রভূত উন্নতি দেখা গিয়াছে। কৃষিকার্য্যের জন্য কৃত্রিম সার প্রস্তুতের কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অজৈব সারের মধ্যে এমোনিয়াম সালফেট সর্বোৎকৃষ্ট এবং পৃথিবীব্যাপী এই সারের প্রয়োগ দেখা যায়। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে কাঁচা কয়লা থেকে কোক কয়লা তৈরীর চুল্লীসমূহ হতে বৎসরে প্রায় ২৬০০০ টন এমোনিয়াম সালফেট উপজাত হয়। মহীশূরস্থ বেলাগোলায় বার্ষিক ৬,৬০০ টন এমোনিয়াম সালফেট প্রথম উৎপন্ন হয়। ১৯৪৭ সালে ট্রাভাঙ্কোরে ৪৬,০০০ টন উৎপাদনের উপযোগী কারখানা স্থাপিত হয়।

বিহারের অন্তর্গত সিন্ধ্রীতে জিপ্সাম (ক্যালসিয়াম সালফেট খনিজ) থেকে এমোনিয়াম সালফেট প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়েছে। ১৯৪৫ সালে পাঞ্জাবের অন্তর্গত খেওড়ায় (পাকিস্থান) যে সমস্ত জিপ্সাম খনিজ পাওয়া যেত তা দিয়েই কারখানা চালু হয়েছিল। কিন্তু দেশবিভাগের পর উক্ত সরবরাহ অনিশ্চিত হওয়ায় অন্যান্য স্থানে জিপ্সামের সন্ধান লওয়া গেল। বিকানীর এবং যোধপুরে কিয়দংশ খনিজের সন্ধান পাওয়া গেল। ১৯৫১ সালে সিন্ধ্রী কারখানা প্রায় ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হল। উক্ত কারখানার জন্য প্রত্যহ ৮০০ টন কয়লা, ৬০০ টন কোক, ১৮০০ টন জিপ্সাম এবং ১০০,০০০০০ গ্যালন জল খরচ হয়। উক্ত কারখানায় দৈনিক প্রায় ১০০০ টন এমোনিয়াম সালফেট এবং ৯০০ টন ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত পদার্থ হতে সিমেণ্ট প্রস্তুত করা যেতে পারে। সিন্ধ্রীতে এমোনিয়াম সালফেট এবং আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র রসায়ন শিল্প সুন্দর ভাবে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ বর্তমানে বার্ষিক ৩০০,০০০ হইতে ৪০০,০০০ টন এমোনিয়াম সালফেট অজৈব সার হিসাবে ব্যবহার করে থাকে এবং কৃষিকার্য্যের ক্রমোন্নতির সঙ্গে এমোনিয়াম সালফেটের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা দরকার হবে। তখন সিন্ধ্রীর মত আরও সারের কারখানা গড়ে উঠবে সন্দেহ নাই।

এমোনিয়াম সালফেট ছাড়া, এমোনিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম সাইয়ানামাইড, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট এবং ইউরিয়া সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর একশ্রেণীর উৎকৃষ্ট সার আছে তাকে সুপারফসফেট বলে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সার তৈরীর পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১৯৪৮ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ২১,৩৫৮ টন। ইহা ক্রমশঃ বাড়িয়া ১৯৫১ সালে ৬১,০১৮ টনে দাঁড়ায়; ফসফেটযুক্ত প্রস্তর এবং সালফিউরিক এসিড সহযোগে সুপারফসফেট প্রস্তুত হয়। বহুপূর্বে হাড় থেকে সুপারফসফেট তৈরী হত, পরে ইহা বিশেষ লাভজনক না হওয়ায় ফসফেটযুক্ত প্রস্তর ব্যবহৃত হতে লাগল। কৃষিগবেষণাগারে পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতবর্ষের মাটিতে অজৈব নাইট্রোজেনযুক্ত সার প্রয়োগে ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণ এমোনিয়াম সালফেট ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে উক্ত নাইট্রোজেনযুক্ত সারের সহিত ফসফেটযুক্ত সার মিশালে উৎপাদনের মাত্রা শতকরা কুড়ি থেকে পঞ্চাশ হতে চল্লিশ থেকে সত্তর পর্য্যন্ত বাড়তে পারে।

রসায়ন শিল্পের একটি প্রধান উপাদান সালফিউরিক এসিড। মোট কথা যে দেশে যত সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন হয় সে দেশ তত শিল্পোন্নত বলা যেতে পারে। এ কারণ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ইহা একটি মূল অঙ্গ হিসাবে ধরা হয়েছে। সালফিউরিক এসিড ছাড়াও হাইড্রোক্লোরিক ও নাইট্রিক এসিডেরও চাহিদা যথেষ্ট এবং এদেশে অনেকটা তৈরী হচ্ছে। বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত থেকে সাল-ফিউরিক এসিড নিষ্কৃতি পেয়েছে কেবল তার ক্ষয়কারী শক্তির জন্য—বিদেশ থেকে আধারে ভরে আনা বেশ কঠিন বলে। যুদ্ধের সময় সালফিউরিক এসিডের উৎপাদন ক্ষমতা অনেকগুণ বেড়েছিল এবং এই এসিডের চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে সালফিউরিক এসিডের চাহিদা হবে ২০০,০০০ টন, তার মধ্যে ১১৬,০০০ টন সার তৈরীর জন্য লাগবে। কৃত্রিম সারশিল্প ছাড়া অন্যান্য রাসায়নিক শিল্পেও প্রায় বার্ষিক ১০৬,৯৩৫ টন সালফিউরিক এসিডের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী গন্ধকের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় সালফিউরিক

এসিড তৈরীর জন্য জিপ্সাম এবং গন্ধক-খনিজসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারতবর্ষেও উক্ত খনিজসমূহ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে এবং রাসায়নিক ও শিল্পপতিগণ তাহার সদ্ব্যবহার করিলে উক্ত এসিডের উৎপাদন অনেকাংশে বেড়ে যাবে।

ভারতবর্ষে কষ্টিকসোডা এবং সোডাএশ তৈরীর অনেক অসুবিধা থাকায় এই দুইটি শিল্পের তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। এছাড়া সালফিউরিক এসিড ক্ষয়কারী তরলপদার্থ হওয়ায় যেমন বিদেশ হতে আমদানী করা অসুবিধাজনক, তেমনি কষ্টিকসোডা ও সোডাএশ কঠিন পদার্থ হওয়ায় আমদানী করা সহজসাধ্য। সম্প্রতি ভারতবর্ষে কষ্টিকসোডা এবং সোডাএশ শিল্পের প্রসার দেখা দিয়েছে। ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত বার্ষিক ৫৪০০০ টনের অধিক সোডাএশ এবং ২২,৫৭৬ টন কষ্টিকসোডা তৈরী হত। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই শিল্পগুলির উপর প্রচুর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় যুদ্ধের পর অনেকগুলি রাসায়নিক তৈরী করা সম্ভব হয়েছে এবং নিম্নোক্ত তালিকায় ঐ সব রাসায়নিকের নাম, বার্ষিক উৎপাদন-ক্ষমতা এবং ১৯৫১ সালের উৎপাদনের মাত্রা উল্লিখিত হয়েছে।

রাসায়নিক	বার্ষিক উৎপাদনের হার	১৯৫১ সালের উৎপাদনের মাত্রা
এলাম (ফটকিরি)	৯,৯৯০ টন	২,৪৬০ টন
এলুমিনিয়াম সালফেট	৩৯,০০০ „	১৯,৩৫০ „
ফেরাস সালফেট	২২৩৮ „	৬১২ „
কপার সালফেট	১৭২০ „	৫০৫ „
সোডিয়াম থায়োসালফেট	১৭২৫ „	৪৭৯ „ (১৯৫০)
সোডিয়াম সালফাইট	৪২০ „	২০৪ „
সোডিয়াম বাইসালফাইট	৭৩৫ „	২৭১ „
সোডিয়াম সালফাইড	৭৯৩৬ „	১,৯৩৫ „
বাইক্রোমেটস	৫৯১৬ „	৩২১৭১ „
সোডিয়াম বাইকার্বনেট	৩৪৪০ „	১,৬৩০ „
পটাসিয়াম ক্লোরেট	২,২০০ „	১,৫৯৩ „
জিঙ্ক ক্লোরাইড	৬৯০ „	৫৩২ „
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড	২,৪৪০ „	৯৬০ „
ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড	১৮,২০০ „	৩,৬৩৯ „

রাসায়নশিল্পের সঙ্গে ভেষজশিল্পেরও ক্রমোন্নতি দেখা যায়। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই ভেষজশিল্পের উন্নতি দেখা যায়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টায় বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ দেশের অন্যান্য স্থানেও ভেষজ-শিল্পের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এ পর্য্যন্ত আমদানী ঔষধের বদলে দেশীয় ঔষধসমূহ তৈরী করাই প্রধান প্রচেষ্টা হয়ে আসছে। এই সমস্ত ঔষধের উপাদানগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিদেশ হতে আমদানী করা হয়েছে। দেশীয় গাছগাছড়া থেকেও অনেক ঔষধ তৈরী হয়েছে। বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহ কয়েকক্ষেত্রে দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত যৌথভাবে এদেশে কারখানা স্থাপন করে অনেক ঔষধ তৈরী আরম্ভ করেছে। সম্প্রতি সালফাড্রাগস, এন্টিবায়োটিকস প্রভৃতির বহুল প্রচলন হওয়ায় ঐ সব ঔষধের আমদানী বেড়ে চলেছে! শেষোক্ত ঔষধসমূহও এখানে কিয়দংশ তৈরী হতে আরম্ভ হয়েছে এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে এই সব তৈরী ঔষধ কিনে এনে এদেশে ছোট-ছোট আধারে ভর্ত্তি করে কিংবা ট্যাবলেট তৈরী করে জনসাধারণের কাছে সরবরাহ করছে। এদেশে এখনও বহু ঔষধের কারখানা দরকার এবং সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেন্টেরও আমদানী নীতির পরিবর্তন করা এবং দেশীয় শিল্পগুলির উন্নতির ব্যবস্থা করে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। ভেষজ নিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না তবে প্রতিযোগিতার বাজারে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে দাঁড়াতে পারে তজ্জন্য গভর্ণমেন্টের দেখা দরকার।

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন রসায়নশিল্পের উন্নতির জন্য গভর্ণমেন্টকে তাহার আমদানী নীতির পরিবর্তন করে দেশীয় শিল্পপতিগণকে সস্তায় কাঁচামাল ও বিদ্যুত প্রভৃতি শক্তি সরবরাহ করবার জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি সাধারণভাবে বিদেশী অপেক্ষা দেশীয় রাসায়নিক-সমূহ ব্যবহার করবার নীতি সমর্থন করেন এবং দেশীয় শিল্পসমূহকে অনুরূপভাবে নিজ নিজ উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ রচনা করবার জন্য অনুরোধ করেন। সম্প্রতি রাসায়নিকশিল্পে এবং ভেষজশিল্পে উন্নতিবিধানের জন্য গভর্ণমেন্ট সচেষ্ট হয়েছেন এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনাসমূহ রচিত হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে অনেকগুলি কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যাতে সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হয় তার জন্য রাসায়নিক, ভেষজবিদ্গণের এবং গভর্ণমেন্টের সমবেত প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন।

প্রতিভা-পরিচিতি

কবি ও নাট্যকার বোয়র্নসন

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
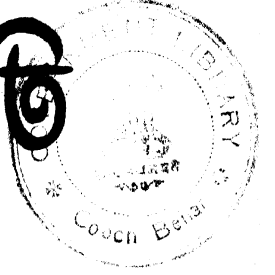
নরওয়ের প্রতিভাশালী মানবদরদী কবি ও নাট্যকার বোয়ন ষ্টার্ন বোয়র্নসনের জীবন যে-ভাবে ও যে-পরিবেশে আরম্ভ হয়েছিল তার দ্বারা কল্পনা করা যায়নি যে, উত্তরকালে তিনি তাঁর দেশের মাটি আর অরণ্যানী, দেশের চাষী আর নিরক্ষর মানুষকে নিয়ে যে কবিতা আর নাটক রচনা করবেন তা একদা জগতের কাছে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্ত্তি বলে স্বীকৃত হবে।

একশো বছর আগেকার নরওয়ের এক গ্রাম। সেখানকার জীবনযাত্রা পদ্ধতি এবং মানুষের প্রতি মানুষের আচরণ তখনো সভ্যযুগের আলোক প্রাপ্ত হয়নি। বোয়র্নসনের বাবা ছিলেন সেই গ্রামের ধর্ম্ম-যাজক। চাষা-প্রধান গাঁ, মধ্যযুগীয় তমসায় আবৃত। সেখানে ধর্ম্মযাজকের অবস্থিত

কবির তরুণ বয়সের প্রতিকৃতি

খুব নিরাপদ ছিল না। বোয়র্নসনের বাবা পিডর বোয়নসনের আগে যিনি সেখানে ধর্ম্মযাজক ছিলেন তিনি তো ধর্ম্মকথা বোঝাতে গিয়ে চাষীদের কাছে লাঞ্ছিত হোয়ে অবশেষে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। অনেকদিন পর্যন্ত সেই কুখ্যাত ভিখ্নি গ্রামে কোন যাজক ছিল না। অবশেষে এলেন পিডর বোয়নসন। প্রকাণ্ড চেহারা, দেহে অমিত শক্তি, এবং প্রয়োজন হলেই সেই শক্তি প্রয়োগ করতেও কার্পণ্য নেই,—গ্রামের লোক বুঝলে, এবার বড় শক্ত পাল্লা! পিডর বোয়নসন টিকে গেলেন।

একদিনের একটা ঘটনা থেকেই পিডরের দাপট বোঝা যাবে। কিশোর বোয়নসন তাঁদের বাড়ীর সামনে বরফ-ঢাকা রাস্তার উপর খেলা করছেন আর মাঝে মাঝে কান পেতে শুনছেন, বাড়ির মধ্যে তাঁর বাবা থেকে থেকে হুঙ্কার ছাড়ছেন। কাঠের বাড়ি। দোতলা। দোতলার সিঁড়ি নীচে থেকে উপরে উঠে গেছে। হঠাৎ বোয়র্নসন শুনলেন, কাঠের সিঁড়িতে ধপাধপ শব্দ, তার পরেই দেখলেন, একটা লোক গড়াতে গড়াতে সেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে পড়ল এবং উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে গলির বাঁকে অদৃশ্য হল।

নানাধরণের বই পড়ায় বোয়র্নসনের বহু সময় যাপিত হত। তাঁর প্রকাণ্ড গ্রন্থাগারের একাংশে পাঠ-নিরত অবস্থায় তাকে দেখা যাচ্ছে

এই ঘটনায় কিশোর বোয়র্নসন কিন্তু এতটুকুও বিচলিত হলেন না। এরকমধারা ব্যাপার তাঁদের বাড়িতে আর পাড়ায় প্রায় নিত্যই ঘটে থাকে। রেভারেণ্ড পিডর বোয়র্নসন ঘুসি চালাতে জানতেন এবং তা চালাতেনও প্রচুর। একজন উদ্ধত গ্রামবাসী ধর্ম্ম সম্বন্ধে যা-তা কথা বলে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে এসেছিল, তার ফলে বাঁ চোখটা তার

ফুলে উঠ্‌ল এবং সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে তাকে নীচে নামতে হল ! নরওয়ের ভিখ্‌নি গ্রামের যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল !

গ্রামবাসীরা যেমন নিরক্ষর তেমনি সভ্যতা-বর্জ্জিত। এই আবেষ্টনের মাঝখানে কিশোর-কবি বোয়র্নসনের অন্তরাত্মা গুমরে উঠতো থেকে থেকে। তাঁর মনের আকাশে নিত্য যেন নূতন নূতন রঙের খেলা চলেছে তা কি পৃথিবীর বুকে প্রতিফলিত হবে কোনদিন ?

বোয়নসনের বাসভবন

অপরাহ্ণ বেলায় মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতেন বোয়র্নসন। বৃদ্ধ চাষী দিনের কাজ শেষ করে তার কুটীরের দরজায় বসে আছে। বসতেন গিয়ে তার পাশে, বলতেন, দাদু, গল্প বল। বৃদ্ধ চাষী সুকুমার বালকের মুখের পানে চেয়ে ক্ষণেক কি ভাবতো, তারপর সত্যিই গল্প বলত। এই দেশে ছিল কত বীর, কত যোদ্ধা, কত শিল্পী, কত কবি ! আজ তারা কোথায় ? দেশের সেই সব প্রাচীন কীর্ত্তিমান মানুষের কাহিনী বলত বৃদ্ধ কৃষক, আর তন্ময় হয়ে শুনতেন বোয়র্নসন। প্রত্যেকটি কথা তাঁর মনে গাঁথা হোয়ে যেতো।
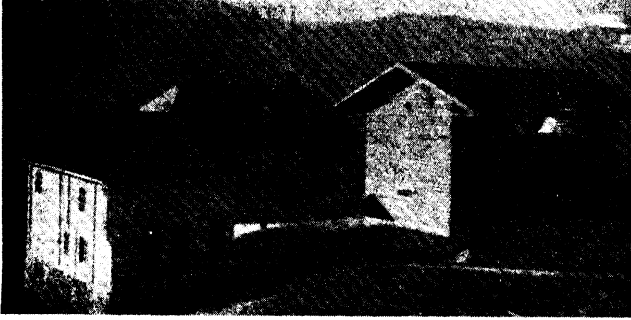
পিডর বোয়র্নসনের চাষ-বাসের কাজ ছিল। অল্পবয়সেই ছেলেকে বললেন, লাঙল ধর। ছেলের লক্ষ্য তখন অন্য আকাশে ! "এই সব মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা।" কিন্তু তা কি সম্ভব হবে কোনদিন ?

সুসজ্জিত বৈঠকখানা

দেশের এই গাঢ় অন্ধকার ঘুচে সূর্য্য কি উঠ্‌বে কোন দিন কোন নূতন প্রভাতে ?

এমনি পরিবেশে ১৮৩২ সালের ৮ই ডিসেম্বর বোয়র্ন্‌ষ্টার্ন্‌ বোয়র্নসনের জন্ম হয়।

* * *

চারিদিকে আবছা কুয়াসা, সূর্য্যের আলো স্তিমিত, তুষারাবৃত পথঘাট, ধূ ধূ করছে মাঠ, জলা, আর জঙ্গল। পিছনে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা। তাদেরই মাঝখানে ছিল বোয়র্নসনদের মাঠকোঠা। আশে পাশের

সমসাময়িক জীবনের গ্রাম্যচিত্র, কিংবদন্তী আর প্রাচীন উপাখ্যান উত্তরকালে কবি ও নাট্যকার বোয়র্নসনের লেখনীমুখে অপরূপ বর্ণাঢ্য ভাষা আর কল্পনার মোহময় বিস্তৃতি নিয়ে ধরা দিয়েছে। এগারো বছর বয়সে তাঁর লেখা কবিতা তাদের ইস্কুলের পত্রিকায় ছাপা হয়। সেই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তিনি। প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত লেখাই ছিল তাঁর রচনা, স্ব নামে অন্য নামে, ছদ্ম নামে।

পিতা দেখলেন, এ ছেলের হাতে লাঙল মানাবে না ; সতেরো বছর বয়সে বোয়র্নসন ক্রিশ্চিয়ানিয়ায় গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার আগে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে যে-ক্লাসে গিয়ে তিনি বসলেন, সেখানে নানা বয়সের ও নানা অবস্থার বিভিন্ন জায়গার ছাত্রদের বিচিত্র সমাবেশ। ত্রিশ বছরের চাপ-দাড়িওয়ালা যুবকের পাশে বসেছে ষোল বছরের কিশোর। ধনী ও বিলাসী বাবু-ছাত্রের পাশে বসেছে ছিন্নবাস গরীব চাষীর ছেলে।

এই বিদ্যায়তনে বোয়র্নসনের সঙ্গে ইবসেনের আলাপ এবং বন্ধুত্ব হয়। এক ওষুধের দোকানে শিশি বোতল ধোয়ার কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়ে ইবসেন লেখাপড়া শেখবার উচ্চাশায় সেখানে গিয়ে ভর্ত্তি হয়েছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে নাট্যকার হিসাবে ইবসেনের সঙ্গে বোয়র্নসনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়, কিন্তু সে কারণে দু'জনের বন্ধুত্ব কোনদিন ক্ষুণ্ণ হয় নি। বরাবর তাঁরা উভয়ে ভাবের আদানপ্রদান করেছেন, জীবনের দর্শন এবং রহস্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বোয়র্নসনের জীবনবাদের সঙ্গে ইবসেনের আদর্শের মিল ছিল না। বোয়র্নসন ছিলেন আশাবাদী, নূতন সূর্য্যোদয় প্রত্যাশা করতেন তাঁর প্রতি রচনায়, আর ইবসেন ছিলেন

ঘোরতর অদৃষ্টবাদী, জীবনের অন্ধকার দিকের ম্লান শোকার্ত্ত ছবি শ্লেষাত্মক রেখায় রচনার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতেন তিনি।

একটি বিষয়ে দু'জনের পরিপূর্ণ মিল ছিল। উভয়েই চেয়েছিলেন, দেশের এই স্থূল গন্ধময় কুরুচিপূর্ণ আবহাওয়াকে দূর করতে হবে, দেশের যুবকদের কাছে নূতন আদর্শবাদের বাণী বহন করে আনতে হবে, ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নূতনতর সাহিত্য রচনা করতে হবে। মনে প্রাণে বোয়র্নসন ছিলেন বিপ্লবী, তাই ছাত্রদের মধ্যে যে সব আলোচনা-বৈঠক বসত তাতে তিনি ফরাসী বিপ্লবের পক্ষ নিয়ে জোরালো ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। বাগ্মিতায় বোয়র্নসনের তুলনা ছিল না।

* * *

ক্রিশ্চিয়ানিয়ায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর সহসা তিনি এক অসমসাহসিক কাজ করলেন, পা বাড়ালেন দুর্গম পথে. সাংবাদিক বৃত্তি অবলম্বন করলেন। সেই সঙ্গে থিয়েটারে ঢুকে নাটক লেখবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হলেন।

নাট্যসমালোচক রূপে যা উপার্জ্জন করতে লাগলেন, দু'বেলা ভাল খাবার জোগাড় করবার পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত নয়। ছোট মেটে বাড়িতে বাস, অতি সামান্য ধরণের আহার, কিন্তু মাথার মধ্যে উজ্জ্বল চিন্তার আনাগোনা, জাতির ও দেশের ঘটনাবহুল ইতিহাস তাকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে, দেশের মাটির রং ধরেছে তাঁর মনের আকাশে, স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমির কীর্ত্তি কাহিনী আর বিরাটত্ব তাঁর লেখনীমুখে প্রকাশের ভাষা খুঁজছে। বোয়র্নসন ছিলেন, জাত-কবি, জাত-সাহিত্যিক এবং জাত-দেশপ্রেমিক।

কিছুদিন পরে ক্রিশ্চিয়ানিয়ার এক সংবাদপত্রের বিশেষ প্রতিনিধি রূপে তিনি সুইডেনে গেলেন। সেখানে প্রকৃতির শোভা তাঁকে মুগ্ধ আচ্ছন্ন করল। লিখলেন—"এখানে চারিদিকে সৌন্দর্য্য, সুখ আর বিরাটত্ব। কোলের কাছে গোছা গোছা ফুল পড়ে আছে, চোখের সামনে দিগন্তবিস্তীর্ণ রূপের আভাস, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, হে ঈশ্বর, আমার কবিত্বশক্তিকে তুমি উদ্বোধিত কর।"

লিখতে লাগলেন অবিরাম। ছোট ছোট পৌরাণিক উপাখ্যান, লোক-গাথা, পল্লীচিত্র। পুরাণো ইতিবৃত্তের মধ্যে সঞ্চারিত করলেন নূতন প্রাণশক্তি, জাতির লুপ্ত ইতিহাসকে নূতন রসে সঞ্জীবিত করলেন। স্বতস্ফূর্ত্ত সরল ভাষায় লেখা তাঁর কাহিনীগুলি আপামর সাধারণ নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলের কাছে সমাদর লাভ করল। দরিদ্রতম চাষী সন্ধ্যার পর মৃদু আলোর নীচে ব'সে দেশের পুরাতন গল্পকথাগুলি নূতন ভাবে নূতনতর ভঙ্গীতে যেন আবার নূতন করে শুনলো তাঁর বই পড়ে, বিত্তশালী ও বিদ্বজ্জনসমাজ সাহিত্যে এক নূতন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব দেখে পুলকিত বিস্ময়ে চঞ্চল হল। তাঁর রচনায় বাল্যকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার রং মিশে এক অপার্থিব আনন্দলোকের সৃষ্টি হয়েছে যেন, দেশের মাটি, দেশের চাষী আর দেশের আকাশ যেন ধরা দিয়েছে—তাঁর রচনায় সোঁদা গন্ধ, তাজা প্রাণের পরিচয় আর অনির্ব্বচনীয় বর্ণসমারোহ নিয়ে, তাঁর রচনায় যেন অপার আনন্দ আর অফুরন্ত আশার আস্বাদ পাওয়া যাচ্ছে,—এমন একজন লেখক যে সহজেই দেশের চিত্তজয় করবেন তাতে আর সন্দেহ কি?

সুউচ্চ শিলাস্তূপের উপর খোদিত বোয়র্নসনের বিরাট ও বিচিত্র মর্ম্মরমূর্ত্তি

* * * *

১৮৫৭ সালে বেরুলো তাঁর প্রথম বড় গল্প, 'সিনোভ সোলবাকেন'। এক দুর্দ্দম-প্রকৃতি কৃষক কেমন করে একটি সরলা গ্রাম্য-তরুণীর প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে অধর্ম্ম থেকে ধর্ম্মের পথে ফিরে এলো, 'সিনোভ সোলবাকেন' সেই ফিরে-আসার কাহিনী। তারপর তাঁর আর তিনখানি বই প্রকাশিত হল, 'আর্নে', 'সুখী বালক' ও 'ধীবর-কন্যা'।

ইতিমধ্যে বোয়র্নসন বার্গেন শহরের একটি ছোট থিয়েটারের কর্ম্মকর্ত্তারূপে তাঁর বহুদিনের সাধ রঙ্গালয়-পরিচালনাকে বাস্তবে পরিণত করেছেন। ১৮৫৮ সালে এই থিয়েটারেই ক্যারোলাইন রীমার্স নামে একটি সুন্দরী অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় এবং সেই বছরই উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

ছিল স্নেহ, ছিল বিশ্বাস, ছিল শ্রদ্ধা। উভয়ের দাম্পত্যজীবন তাই

বোয়র্নসন দম্পতি। পঞ্চাশোর্দ্ধেও উভয়ের প্রাণে নবীনতা ও তারুণ্য বিদ্যমান ছিল

লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসতো, মনের মধ্যে অকারণে তিক্ততার সৃষ্টি হত, তখন মুহূর্ত্তে ক্যারোলাইন স্বামীর মনের অবস্থাটি বুঝে নিতে পারতেন। হাসি-গল্প আর লাস্যলীলায় তাঁকে নিত্য নূতন আনন্দ পরিবেশন ক'রে আবার তাঁকে লেখার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতেন।

কিছুকাল পরে ক্রিশ্চিয়ানিয়ার একটি রঙ্গালয়ের কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হয়ে বোয়র্নসন পুনরায় ইবসেনের সান্নিধ্যে এলেন। ইবসেনও তখন অন্য এক রঙ্গালয়ের মঞ্চাধ্যক্ষ। উভয়ে দিনের পর দিন নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। বোয়র্নসন বললেন, অল্পশিক্ষিত চাষা আর গৃহস্থদের একসঙ্গে আনন্দ আর শিক্ষা দেবার জন্যে পল্লীর কিংবদন্তী আর কল্পকথাগুলিকে যদি নাটকে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে হয়ত নূতনতর নাট্য-সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে। ইবসেন ছিলেন, বাস্তববাদী, বোয়র্নসনের কল্পনাবিলাস তাঁর মনঃপূত হল না। dুই বন্ধুর মধ্যে মতবিরোধ ঘটল।

পর পর অনেকগুলি নাটক রচনা করলেন বোয়র্নসন। কিন্তু দু'খানি ভিন্ন কোন নাটকই তেমন জমল না। হতাশ হয়ে তিনি দেশ-ভ্রমণে বেরুলেন। নাটক ছেড়ে লিখলেন কবিতা আর গ্রামজীবনের গল্প। দেশবিদেশের পত্রিকায় সেগুলি প্রশংসিত হল।

ফিরে এলেন রাজধানীতে। আবার নাটক লেখবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু আবার এলো ব্যর্থতা। ভেঙে পড়লেন তিনি। অসুস্থ হলেন। দশ বছর তাঁর কলম রইল স্তব্ধ। একদা যাঁর লেখায় জীবনের উচ্ছলতা আর আশাবাদের রঙীন বর্ণচ্ছটা ফুটে উঠ্‌তো, তাঁর লেখায় দেখা দিল তিক্ততা আর শ্লেষ, দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ ক'রে জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রিত করছিলেন তাঁদের প্রতি বর্ষণ করলেন তীব্র কটূক্তি, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি।

কিন্তু তার ফল ভাল হল না। তাঁর বিরুদ্ধে দেশের প্রতিপত্তিশালী নাগরিকদের তীব্র আন্দোলন ক্রমে প্রবল আকার ধারণ করল। বাধ্য হোয়ে তিনি দেশ ছেড়ে জার্ম্মানী চলে গেলেন। সেখানে শান্ত মনে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আবার লিখতে লাগলেন তিনি। যে-প্রতিভার স্ফূরণ দেখা গিয়েছিল প্রথম জীবনে তার পূর্ণতর বিকাশ ঘটতে লাগল। জার্ম্মানীতে ব'সে তিনি লিখলেন তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

ছিল এক অবিচ্ছিন্ন সুখের কাহিনী। স্বামীকে আনন্দ দেবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ছিলেন তাঁর কর্ম্মের সহায়, লেখার নকল করা, প্রকাশিত লেখাগুলির ফাইল সংগ্রহ ক'রে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা এবং চিঠিপত্র
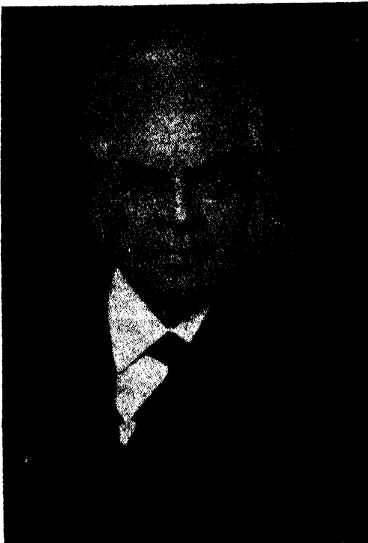
কবির পরিণত বয়সের প্রতিকৃতি

লেখা—এই সমস্ত কাজের ভার ও দায়িত্ব নিয়েছিলেন ক্যারোলাইন। বোয়র্নসন প্রকাশ্যেই স্বীকার করতেন, ক্যারোলাইন ভিন্ন তিনি অচল।

জীবন-বেদমূলক নাটক 'সিগার্ড শ্লেম্বি'। সেই সঙ্গে বহু গল্প ও কবিতা।

দেশে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর নাম সবার মুখে। তার গল্প এবং গাথা পড়েনি এমন লোক ছিল বিরল। দেশবাসীর চিত্তে তিনি যে কতখানি শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন ইতিমধ্যে, সে-খবর তিনি নিজেও জানতেন না। একদিন এক পরম বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটল। নিজের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন একদিন সকালে, সামনে রাস্তা দিয়ে কুচকাওয়াজ ক'রে চলেছে এক বিশাল সৈন্য শ্রেণী। তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় সৈন্যাধ্যক্ষ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন তাঁকে। চিনতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে টুপী উঠিয়ে অভিবাদন জানালেন দেশের কবি ও নাট্যকারকে। তার পর সে-এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। দেশের রাজাকে যেমন ক'রে 'গার্ড অফ অনার' দেওয়া হয় তেমনি ক'রে প্রাণের স্বতস্ফূর্ত্ত আবেগে সেই প্রকাণ্ড সৈন্যবাহিনী তাঁকে স্যাল্যুট করতে করতে চলে গেল। তারা যে সবাই পড়েছে তাঁর গল্প, তারা যে সবাই ভাল বাসে, শ্রদ্ধা করে তাঁকে।

স্তব্ধ অভিভূত বোয়র্ন সন মাথা হেলিয়ে প্রত্যভিবাদন জানাতে লাগলেন! জীবনের সেই দিনটিকে সবচেয়ে পুণ্যদিন বলে গণ্য করেছিলেন তিনি।

তারপর জাতির এক শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে বহু অভিনন্দন তিনি লাভ করলেন। ক্রিশ্চিয়ানিয়ায় যে জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হল সেখানে প্রথম অভিনীত হল তাঁরই নাটক। প্রথম রাত্রির অভিনয়ের পূর্ব্বে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁকে দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরূপে সম্মানিত করা হল। হাজার কণ্ঠে শোনা গেল তাঁর জয়ধ্বনি।

অতঃপর নোবেল কমিটির সভ্যরূপে মনোনীত হলেন এবং ১৯০৩ সালে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন।

বহু কবিতা ও বহু নাটক লিখেছেন তিনি। যদিও নাট্যকার হিসাবে ইবসেন জগতের কাছে তাঁর চেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি পেয়েছেন তাহলেও দেশের কাছে বোয়র্ন'সন ছিলেন অধিকতর প্রিয়। একজন সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে লিখলেন—"বোয়র্ন'সনের নাম উচ্চারণের দ্বারা আমরা যেন দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি।"

শেষ জীবনে পরিপূর্ণ শান্তিময় পরিবেশে স্ত্রীপুত্রদের পাশে নিয়ে আটাত্তর বছর বয়সে ১৯১০ সালের ২৬শে এপ্রিল বোয়র্ন'সন পরলোকগমন করেন।

ভারতীয় ধর্মে সমাজতন্ত্রবাদ

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

অধুনা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রসার লাভ করিতেছে। রাশিয়া চীন প্রভৃতি শক্তিশালী রাষ্ট্র এই মতবাদকে পূর্ণাংশে রূপায়িত করার চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসকগোষ্ঠী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই যে তাহাদের লক্ষ্য ইহা বার বার প্রচার করিতেছে।

সমাজতান্ত্রিকগণের মতে মানুষের সর্ববিধ দুঃখের একমাত্র কারণ ধন সঞ্চয় ও তজ্জাত সামাজিক বৈষম্য। এক একজন লোক অন্যান্য লোককে শোষণ করিয়া ধন সঞ্চয় করে! এই ধনবান ব্যক্তিরা দরিদ্র জনসাধারণের উপর নানাভাবে অত্যাচার করিয়া, তাহাদিগকে নানাভাবে নিপীড়ন করিয়া, তাহাদিগের শ্রমজাত ধন কাড়িয়া লয় এবং বিনা পরিশ্রমে "পরের ধনে পোদ্দারি" করে। তাহারা আরামে, সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে বিলাসীর জীবন যাপন করে অথচ যাহাদের ধন লইয়া তাহাদের এত বিলাস সেই শ্রমিকরা থাকে নিত্য দারিদ্র্যের দুঃখময় জীবনের মধ্যে। তাহারা সারাজীবন পরিশ্রম করিয়াও ক্ষুধার অন্ন, পরিধানের বস্ত্র বা বাসের গৃহ জুটাইতে না পারিয়া দুঃখে, কষ্টে এবং অভাবে জর্জরিত হইয়া আমরণ চোখের জল ফেলে। এই অন্যায় ব্যক্তিগত ধন সঞ্চয়ের ফলে মানবসমাজ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এক অংশ হইল পুঁজিবাদী, আর এক অংশ শ্রমিকগণ। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। যতদিন না এই পার্থক্যের অবসান হইবে, ততদিন মানুষের দুঃখ ঘুচিবে না।

সুতরাং মানুষের দুঃখ দূর করিতে হইলে শ্রেণীতে শ্রেণীতে এই ভেদ অপসারিত করিতে হইবে, শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যেদিন সকলে সমানভাবে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এবং জীবন-ধারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু সকল লাভ করিবে, সমান সামাজিক অধিকার লাভ করিবে, সেই দিন মানুষের আর কোনও প্রকারের অভাব ও দারিদ্র্য থাকিবে না, মানুষ সুখী হইতে পারিবে। যে হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, দ্বন্দ্ব ও বিবাদে মানবসমাজ সতত বিক্ষুব্ধ হইতেছে সে-সকলের পরিবর্ত্তে সুখ, শান্তি ও প্রীতি আসিবে।

সমাজতান্ত্রিকগণ মানবসমাজের যে আদর্শ পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার মূলনীতি হইল Give according to your capacity and take according to your necessity তোমার সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিয়া ধনোৎপাদন করিয়া তাহা সমাজকে দান কর এবং তোমার অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের জন্য সমাজের নিকট ধন গ্রহণ কর। তোমার পরিশ্রমের দ্বারা উৎপন্ন ধনে তোমার অধিকার নাই, অধিকার সমগ্র সমাজের। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য এই ধন সমভাবে বণ্টিত হইবে।

আজ ধনসম্পত্তি ব্যক্তিগত বলিয়াই একজন আর একজনকে নানাভাবে বঞ্চিত করিয়া ধনার্জনের ও সম্পত্তি সংগ্রহের চেষ্টা করে, একজন আর একজনকে বঞ্চিত করার অভিপ্রায়ে নানা অসদুপায় অবলম্বন করিয়া ধন আহরণ ও ভোগ করে। যেদিন সে জানিবে অর্জিত ধনসম্পত্তি তাহার নহে, উহা সমগ্র সমাজের, সেদিন সে আর অন্যায়ের দ্বারা ধন উপার্জন করিবে না। সেদিন সে জানিবে অন্নবস্ত্র ও আরামে সকলের সমান অধিকার, সেদিন শঠতা, প্রবঞ্চনা ও লোভ আপনা হইতেই লোপ পাইবে। সুতরাং ব্যক্তিগত ধন সঞ্চয় মাত্রই পাপ এবং পুঁজিবাদীমাত্রই অন্যায়কারী। সুতরাং এই ধন সঞ্চয় করিতে না দেওয়া এবং ধনীমাত্রেরই বিরুদ্ধে সতত সংগ্রাম সমাজকল্যাণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কথাগুলি আপাতমনোহর ও চিত্তাকর্ষী এবং সেইজন্যই দরিদ্র জনসাধারণকে দলে ভিড়াইবার পক্ষে বিশেষ শক্তিশালী।

ধনি-নির্ধনের এই ভেদের কথা যে সমাজতান্ত্রিকগণই বলিতেছেন তাহা নহে। এই প্রভেদ লক্ষ্য করিয়াই যুগে যুগে ধর্মগুরুগণ—ইহার অপসারণের উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রিয়সখা উদ্ধবকে সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন-—

যাবদ্‌ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যো ভিমন্যেত সস্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥

জীবন ধারণের নিমিত্ত মাত্র যেটুকু প্রয়োজনীয় কেবল তাহাতেই দেহধারিগণের অধিকার। তাহার অতিরিক্ত যদি কেহ আকাঙ্ক্ষা করে, তবে সে চোর, তাহার দণ্ড হওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির মধ্যে বর্তমান যুগের সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কসের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের মতই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন তোমার যেটুকু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তাহাতেই তোমার অধিকার। অবশিষ্ট অংশ তোমার নহে, সমাজের।

সমাজতান্ত্রিকগণ বলেন, তাহাদের মত—কোনও বিশেষ দেশ, রাষ্ট্র বা ধর্মমতের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, তাহা সর্বজনীন এবং উদার। কারণ তাঁহারা সমগ্র মানব-সমাজের দুঃখের কারণ উদ্ভাবন ও তাহার নিরাকরণের উপায় নির্দেশ করেন। তাঁহারা জানেন না ভারতীয় ধর্ম এই মতের অপেক্ষা অনেক বেশী উদার, কারণ সেই উদার সাম্যদৃষ্টি কেবলমাত্র মানব সমাজ নহে সমস্ত প্রাণীর উপর পতিত হইয়াছে। তাঁহাদের সাম্যবাদ শুধু মানুষের নিমিত্ত নহে—সর্বভূতহিতায়।

পাশ্চাত্ত্যদেশ হইতে আমদানি করা সমাজতন্ত্রবাদ যে মানুষের দুঃখ ঘুচাইতে পারিবে না তাহার কথাই এখন বলিব। এই সমাজতন্ত্রবাদের ও ভারতীয় ধর্মের লক্ষ্য যে এক তাহা আমরা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হইতেই বুঝিতে পারি; কিন্তু লক্ষ্য এক হইলেও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক, একেবারে বিপরীত বলিলেও চলে।

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ একেবারে ভোগসর্বস্ব জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে—কেন আমি এইমত গ্রহণ করিব? তখন উত্তর আসিবে 'আমি যে ভাল খাইতে চাই, পরিতে চাই, আরাম চাই, অনায়াসে ইন্দ্রিয় তর্পণ চাই। সে পথে বাধা পুঁজিবাদীরা, সুতরাং তাহাদের ধ্বংস সাধন চাই।' যেন দেহের ক্ষুধা মিটানই মানুষের একমাত্র বাঞ্ছিতব্য। দেহাতিরিক্ত আর কিছু ত এইমত স্বীকারই করে না। ফলে নীতি বা ধর্মের বালাই এখানে একেবারেই নাই। মানুষের ভোগের পথে বাধা সামাজিক অসাম্য—। এই সামাজিক অসাম্য দূর করাই ইহার একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে সত্য বা মিথ্যা ন্যায়ানুগত বা অন্যায় যে কোনও উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ এই মতে চলিতে পারে। উপরন্তু ধনবানের প্রতি নিত্য-বিদ্বেষ এবং শ্রেণী-সংগ্রাম লক্ষ্যে পৌঁছিবার পক্ষে অপরিহার্য।

পরন্তু ভারতীয় ধর্মে যে সাম্যবাদের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মূলভিত্তি আত্মোপলব্ধি, সর্বভূতে আত্মোপম্যদৃষ্টি, ত্যাগ, সত্য এবং অহিংসা। সত্য এবং অহিংসাকে আশ্রয় করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। তিনিও তাই বার বার সত্য ও অহিংসার কথা উচ্চারণ করিয়াছেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে জীবনদর্শনের কথা বলিয়াছেন তাহার আদর্শও সমদৃষ্টি ও কর্মফলত্যাগ। গীতা সকল উপনিষদের সার-সংগ্রহ। এই উপনিষদেরই উক্তি—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্।

সমস্ত জীব ও জড়জগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত দেখিবে। ত্যাগের দ্বারা বিষয় ভোগ করিবে। অন্যের ধনে লোভ করিবে না। (ঈশোপনিষৎ) নরের মধ্যে নারায়ণকে দর্শন করিলে, জীবে জীবে শিবের অবস্থান অনুভব করিলে অথবা জীবমাত্রকেই প্রিয়তম কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া উপলব্ধি করিলে আপনা হইতে সর্বভূতে (শুধু প্রত্যেক মানুষে নয়) প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হইবে। তবেই ত তুমি সমগ্র জীবসত্তার হিত সাধনে প্রেরণা লাভ করিবে। ধনবানের প্রতি সতত হিংসাভাব পোষণে, তাহার বিনাশ সাধনে বা গায়ের জোরে ধন-সাম্যের প্রতিষ্ঠায় মানব সমাজে কোনও দিন শান্তি বা সুখ আসিবে না। পক্ষান্তরে কমলার কৃপাপাত্রেরও হৃদয়ে যদি ভগবানের প্রতি ভালবাসার সঞ্চার হয়, তখন সেই ভগবানের নিত্যদাস জীবের প্রতি ও তাহার প্রীতির সঞ্চার হইবে। তখন সে আপনা হইতে নিজের ধন পরকে বিলাইয়া দিতে অগ্রসর হইবে। তখন সে নরে নরে অবস্থিত নারায়ণের সেবায়, জীবে জীবে বিরাজমান শিবের উপাসনায় উদ্বুদ্ধ হইবে। আচার্য বিনোবাভাবে যে ভূদানযজ্ঞের আয়োজনে নিজকে নিয়োজিত করিয়াছেন তিনিও এই কথাই বলিতেছেন। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ ধনহীনকে ধনবানের প্রতি বিদ্বিষ্ট ও হিংসাত্মক মনোভাব পোষণে প্ররোচিত করে। ভারতীয় ধর্মের সমাজতন্ত্রবাদ ধনি-নির্ধন-নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের চিত্তে প্রেম, দয়া, শান্তি ও আনন্দের সঞ্চার করিয়া তাহাকে সামাজিক সাম্য স্থাপনে

প্রণোদিত করে। স্থায়ী সামাজিক সাম্য আনিতে হইলে প্রেমধর্মের আশ্রয় লইতেই হইবে, অন্যথা দ্বন্দ্ব, বিবাদ, ক্ষমতালোলুপতা এবং রক্তপাতের কখনও অবসান হইবে না। বর্ত্তমান রাশিয়া এবং সাম্প্রতিক প্রশংসিত মহাচীনই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেখানে ধন-সাম্য সাধন হয় ত কিছু হইয়াছে, মানুষের ভোগের পথ প্রশস্ত হইয়াছে, কিন্তু দিনের পর দিন রাষ্ট্রবিরোধিতার অজুহাতে বিচারের প্রহসন করিয়া মানুষকে (এমন কি সেখানকার সেরা মানুষকেও) বধ করা ত বাড়িয়াই চলিতেছে। ধনের দ্বন্দ্ব জোর করিয়া তাড়াইতে গিয়া ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্ন হয় ত. জুটিতেছে কিন্তু মানুষকে প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত করা হইতেছে। মানুষের প্রাণের যেন কোন মূল্য নাই, স্বাধীন চিন্তার কোনও অবসর নাই। ধনসাম্যের বিজয়রথ অপ্রতিহত গতিতে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই রথচক্রের তলায় মানুষের স্বাভাবিক বিকাশ পিষ্ট হইয়া যাইতেছে। মানুষের মনের অনন্ত বৈচিত্র্যকে বধ করিয়া, তাহাকে একটি নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে ঢালাই করা হইতেছে।

ভারতীয় ধর্মের সাম্যবাদ ইহার ঠিক বিপরীত পথে চলার উপদেশ দেয়। সেখানে 'সবার উপরে মানুষ সত্য'। এই সত্য দেখার ক্ষমতা যে কেবলমাত্র প্রেমের দ্বারাই সম্ভব তাহা পাঁচশত বৎসর পূর্বে এই বাংলা দেশেই একটি মানুষ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন—জীবকে কৃষ্ণের অধিষ্ঠানভূমি মনে করিতে ও তাহাকে তদনুরূপ সম্মান দিতে। তিনি কেবলমাত্র সাম্যের শ্লোগান আওড়াইতেন না, যাহা বলিতেন আচরণেও তাহাই করিতেন। তাই ত তাঁহার "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" তাই ত তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শত শত বৎসরের সঞ্চিত বৈষম্য নিমেষমাত্রে বিলুপ্ত হইয়াছিল। রাজনৈতিক পরাধীনতা সত্ত্বেও সমগ্র বঙ্গদেশ তৃপ্তিতে, শান্তিতে এবং আনন্দে কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। সাম্যের অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠা সমাজের মধ্যে আপনা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যদি কেবলমাত্র নদী-নিয়ন্ত্রণে, বড় বড় কল-কারখানার প্রতিষ্ঠায়, ধনোৎপাদন বৃদ্ধিতে অথবা সাধারণ মানুষের অন্ন-বস্ত্রের অভাব মোচনেই পর্যবসিত হয়, তবে তাহার দ্বারা সমাজ-তন্ত্রবাদ সম্মত সমাজের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা কোনও দিনই হইবে না। ইহার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হইবে সেই দিন যেদিন জনগণের মনে ভাগবত জীবন-যাপনের জন্য উদগ্র পিপাসা জন্মিবে যেদিন মানুষ মানুষকে প্রেমের চোখে দেখিতে শিখিবে। যেদিন সমাজে এই মহতী স্পৃহার উদয় হইবে, ভোগসর্বস্ব জীবনের দিক হইতে ত্যাগের দিকে দৃষ্টি ফিরিবে, সেদিন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রচার বিভাগের প্রয়োজন হইবে না। তখন মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে কোনও জনহিতকর পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিতে অগ্রসর হইবে। শুধু যন্ত্রচালিতের মত প্রাণহীন প্রচেষ্টা লইয়া অগ্রসর হইবে না, অগ্রসর হইবে মনে অফুরন্ত আনন্দ ও স্পন্দন অনুভব করিয়া। যন্ত্র যতই বিরাট ও ক্রিয়াশীল হউক না কেন, তাহার দ্বারা সত্যকার কল্যাণ সাধন সম্ভবপর হয় না, যতক্ষণ না তাহার পশ্চাতে প্রাণবন্ত পরিচালকের আবির্ভাব হয়। এই প্রাণের সৃষ্টি করে কেবলমাত্র প্রেম।

বস্তুতঃ মানুষকে বুঝিতে হইবে যে, সে স্বরূপতঃ নিত্যকৃষ্ণদাস, অথবা বুঝিতে হইবে একই কৃষ্ণ প্রতি জীবে বর্ত্তমান। যখন সে জীবনের মধ্যে ইহা উপলব্ধি করিবে তখন সে দেখিতে পাইবে নিখিল জীবজগৎ "সূত্রে মণিগণা ইব" প্রিয়তম কৃষ্ণের দ্বারাই বিধৃত। তখন সে কৃষ্ণ-প্রীতিকাম হইয়া জীবনের প্রত্যেকটি কার্য্য করিবে। প্রীতির ধর্মই হইল এই যে, যে যাহাকে ভালবাসে প্রিয়তম সম্পর্কিত প্রতিটি ব্যক্তিতে ও বস্তুতে তাহার প্রীতি আসিবে। তাই কৃষ্ণের জীবের কল্যাণ সাধনের জন্য তাহার মনে স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাকুলতার সঞ্চার হইবে। সমাজে যেদিন এই কল্যাণ-সাধন-স্পৃহা জাগিবে সেইদিনই যথার্থ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। শুধু ধন-সাম্য নয়, সকল প্রকারের সাম্যই আপনা হইতে আসিবে। ঈশ্বরপ্রীতি না থাকিলে বা ত্যাগ ও কল্যাণ-স্পৃহার দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হইলে সমাজতন্ত্রসম্মত সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় আদর্শ-সমাজ প্রতিষ্ঠা বিড়ম্বনামাত্র। যাহা কিছু করিতে হইবে তাহা "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়।"

এইরূপ সমাজ প্রতিষ্ঠা ভারতীয় লোক-শিক্ষকগণের কেবলমাত্র আদর্শ বা স্বপ্ন-বিলাসমাত্র নয়। যিশুখ্রীষ্টও যে Kingdom of Heaven on earth ধরণীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথা বলিতেন তাহা বাস্তব সত্য। ভারতীয় ঋষিগণের মতে সমাজের এই বাঞ্ছনীয় অবস্থা দুর্লভ হইলেও কাল্পনিক নয়, কালচক্রে বার বার সত্যযুগের আবির্ভাব হয়।

যদ্যেকাস্তিভিরাকীর্ণং জগৎ স্যাৎ কুরুনন্দন
অহিংসকৈরাত্মবিদ্ভিঃ সর্বভূতহিতে রতৈঃ
ভবেৎ কৃতযুগপ্রাপ্তিঃ আশীঃ কর্ম বিবর্জিতা।

(মহাভারত, শান্তিপর্ব)

অহিংসক আত্মবিৎ সর্বভূতহিতেরত ভাগবত-ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা যদি জগৎ পূর্ণ হয়, তবে স্বার্থবুদ্ধিবশে কৃত কর্ম লোপ পায় এবং পুনরায় সত্যযুগের আবির্ভাব হয়।

প্রেমের দ্বারা জীবনকে অনুরঞ্জিত করিলে হিংসা দূরীভূত হইবে, আত্মোপলব্ধি আসিবে, সর্বজীবের কল্যাণ-সাধনে চেষ্টা আসিবে—এই দুঃখময় পৃথিবীতে নিত্যানন্দময় বৃন্দাবনের প্রতিষ্ঠা হইবে।

অবলোকন

মানবেন্দ্র পাল

সেদিন দেখেছিলাম প্রথম, তারপর দেখছি আজ।

সেদিন যখন দেখেছিলাম তখন ছিলেন আর এক মানুষ। আমি দেখে প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবতে পারিনি বাঘনাপাড়ার এই জঙ্গলাকীর্ণ অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে এই রকম এক প্রাচীন ভাঙ্গা দেওয়াল-ঘেরা অন্তঃপুরের মাঝে এমনি একজনকে দেখতে পাব। ভাবতে পারিনি সত্যিই, এই ভদ্র পরিচয়ের যোগ্যতাহীন কুৎসিত প্রফুল্লটার কপালে এমনি এক নিষ্কলংক বধূ বিধাতার নিদারুণ পরিহাসপ্রিয়তা প্রমাণের জন্যে অবস্থান করেছিল।

মনে মনে একটু ঈর্ষা হল।

কিন্তু সে ঈর্ষা নিয়ে ভাববার অবসর ছিলনা। প্রফুল্ল তখন মাটির ওপর বসে খালি গায়ে কোমরে গামছা জড়িয়ে বীরবিক্রমে একটা মস্ত বড়ো কাঁঠাল ভাঙছিল। আমায় দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আরে বসন্ত যে!

পরক্ষণেই গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে বলে উঠল—মা, দেখে যাও কে এসেছে!

পাশেই আলজ্জিত বধূ দাঁড়িয়েছিলেন। প্রফুল্ল হেসে বললে—অপর্ণা, বসন্তকে বসতে দাও। আরে লজ্জা কি, এ যে আমাদের বসন্ত! তোমার সঙ্গে তো মিষ্টি সম্বন্ধ!

প্রফুল্লর এই উচ্ছ্বাসে বিব্রত হয়ে পড়ছিলাম। ভদ্র-মহিলা প্রফুল্লর কথায় আরও বেশি কুণ্ঠিত হয়ে মাথার কাপড় কপাল পর্যন্ত নামিয়ে তাড়াতাড়ি একটা আসন পেতে দিলেন।

বসতে যাব, এমনি সময় ব্যস্ত হয়ে মা বেরিয়ে এলেন। তাড়াতাড়ি উঠে প্রণাম করলাম।

নিচু গলায় মা তিরস্কারের সুরে বললেন—এতদিনে মনে পড়ল বাবা? প্রফুল্লর বিয়েতে কি আসা উচিত ছিল না? ওকি তোমার কেউ নয়?

লজ্জিত হয়ে বললাম—সুবর্ণকে তো পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

তেমনি ভাবেই মা বললেন—সুবর্ণ যদি নাও আসত তাহলে দুঃখ আমার যত না হত তার চেয়ে দুঃখ হত তার। দাদার বিয়ে। কিন্তু তুমি এলে না—এ আফসোস যে দুঃখের চেয়েও লজ্জা দেয় বেশি!

এই বলে মা একটু থামলেন। তারপর বললেন—সত্যি বলছি, আমি বড়ো দুঃখু পেয়েছি বাবা। তুমি কি আপিস থেকে দুটো দিন ছুটিও নিতে পারতে না?

তাড়াতাড়ি বললাম—না না তা নয়। ছুটি তো আমার যথেষ্ট পাওনা রয়েছে; কিন্তু কী করি, আরও পাঁচটা কাজ —বুঝতেই তো পারছেন, কলকাতায় থাকলে—

মা এবার অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন—সুবু ভালো আছে? বললাম—হ্যাঁ।

—আলো বাতি?

বললাম—সবাই ভালো।

একটু থেমে বললাম—আজও আসা হচ্ছিল না; লাইফ ইন্‌সিওরের দুটো কেস করবার ছিল। কিন্তু কী করি; দেখলাম বিয়েতে যাওয়া হয়নি, সে একটা ত্রুটি হয়ে আছে। তারপর যত দেরি হচ্ছে তত যেন নিজের কাছে অপরাধী হয়ে পড়ছি। তা ছাড়া কোনো রবিবারই আমার কাছে বিশ্রামের দিন নয়, এ তো জানেন। একটা না একটা কাজ লেগেই আছে। অফিসটা যেতে হয়না এই যা। কাজেই ভাবলাম, আর দেরি না করে এই রবিবারেই চলে যাই।

মা খুশি হয়ে বললেন—বেশ করেছ বাবা। তা আলো

আর বাপিকে নিয়ে এলে না কেন? আম খেয়ে যেতে পারত।

কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি প্রফুল্ল এক মুঠো কাঁঠালের কোয়া নিয়ে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে—চট্ করে হাঁ করো দিকিনি।

মা মৃদু ধমকে উঠলেন—ওকী! ওভাবে কেউ দেয়?

তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কখন এক সময়ে দেখি ভদ্রমহিলা লজ্জিত কুণ্ঠিতভাবে একটি রেকাব নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন।

আমি বললাম—এখন থাক্।

ভদ্রমহিলা তখনই চলে গেলেন এবং একটু পরেই একটি ধোপ-ভাঙা তোয়ালে আর ভালো একটা সাবান নিয়ে কুয়োতলায় রেখে এলেন।

মা বললেন—পরে গল্প করব। এখন যাও, হাত-মুখ ধুয়ে নাও।

আমার জীবনে বিয়েটা হচ্ছে একটা দুর্ঘটনা। এ কথা আজ উচ্চস্বরে প্রচার করে লাভ নেই—বিশেষ সুবর্ণ যখন এখনো বর্তমান এবং আমার পুত্র ও কন্যার মুখ চেয়ে যখন তার দীর্ঘ শান্তিপূর্ণ জীবন কামনা করতেই হবে।

এ দুর্ঘটনা ঘটল কেন এবং এর জন্যে কে দায়ী—বিবাহিত জীবনের এই সুদীর্ঘ আট বচ্ছর পর আজ সে তত্ত্ব অনুসন্ধান করেই বা কী হবে?

অশিক্ষিতা গ্রাম্যস্বভাবা সুবর্ণকে তবু কোনো রকমে গ'ড়েপিটে কিছুটা নিজের মতো করে নিতে পেরেছি;—ওর সরলতার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ওকে ক্ষমা না করে পারিনি; কিন্তু কিছুতেই ক্ষমা করতে পারি না তার জন্মভূমির কালচারকে। সেখানকার অশিক্ষা, কুসংস্কার, অপরিচ্ছন্নতা, মনের সংকীর্ণতা আমাকে পদে পদে তীক্ষ্ণভাবে বিঁধেছে। ওদের কথায়-বার্তায় ঠাট্টায় বিদ্রূপে যে শালীনতার অভাব, তা আমাকে বারে বারে লজ্জা দিয়েছে।

এই কারণেই কোনোদিন প্রফুল্লকে সহ্য করতে পারিনি। আমি কখনো চাইনি ওকে নিজের পরমাত্মীয় বলে বন্ধুসমাজে পরিচয় করিয়ে দিতে। সে যোগ্যতা ওর ছিল না। এমন কি আমি পছন্দ করতাম না; ও আমার বাড়ি আসে। বাঘনাপাড়ার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই—এই কঠিন সত্যটা আমি অনেকবার অনেকভাবে সুবর্ণকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। সুবর্ণ কাঁদত চুপি চুপি। সে কান্নাটুকুও ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে। মায়ের কাছ থেকে ডাকের বিরাম ছিল না, তবু সে কোনোদিন বলে নি 'মায়ের কাছে যাব'। হয়তো ও আমাকে ভালোভাবে চিনত বলেই সেকথা বলতে সাহস পেতনা—অথবা ইচ্ছে করত না।

কিন্তু এত কড়াক্কড়ির মাঝেও কেমন করে যে ওই প্রফুল্লটা এসে হাজির হত তা ভাবতে পারতাম না।

ঘরে ঢুকেই তারস্বরে চীৎকার করে উঠত—সুবি কেমন আছিস রে?

অমনি, যদিও সুবর্ণ তখনি বেরিয়ে আসত, কিন্তু তার মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যেত। দাদাকে একটা প্রণাম করে বলত—বাড়ির খবর সব ভালো তো?

প্রফুল্লর কিন্তু সংকোচবোধ ছিল না। তেমনিভাবেই গলার স্বর তুলে বলত—এবার আর 'না' বললে শুনব না, বাড়ি যেতেই হবে। মা বলে দিয়েছে।

এই বলে উত্তরের প্রত্যাশায় আমার মুখের পানে তাকাতো। আমি তখনই খুবই ব্যস্ততার ভাণ করে উত্তর না দিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকতাম।

সুবর্ণ বোধ করি সবই বুঝতে পারত এবং বিকেলে অফিস থেকে ফিরে দেখতাম, শ্রীমান নেই। যেমন একা এসেছিল, তেমনি একাই ফিরে গিয়েছে।

নিষ্ঠুর কৌতুকে একবার সুবর্ণর মুখের দিকে তাকাতাম, কিন্তু তার মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা যেত না।

প্রফুল্লর যে কবে কখন আর্বিভাব হবে—তা বোঝা যেত না। কোনো কারণ নেই—কোনো আমন্ত্রণ অনুরোধ নেই, হঠাৎই সে বাঘনাপাড়া থেকে কলকাতায় এসে হাজির।

—কইরে সুবি?

এই বলে কখনো এক ঝুড়ি আম কিম্বা বড়ো একটা কাঁঠাল এগিয়ে দিত, কখনো দিত পটোল, কখনো দুটো কুমড়ো—কখনো কখনো আনত মাছ।

সুবর্ণ এতে খুব উচ্ছ্বসিত হত না। কারণ, আমার কাছে এই সব যৌতুকের জন্য কোনোদিনই বিশেষ উৎসাহ পায় নি। প্রথম প্রথম বলেছে—মা পাঠিয়েছে।

কিন্তু আমি কোনো 'হ্যাঁ' বা 'না' করিনি। চুপচাপ দেখে গিয়েছি।

—তোর শরীর খারাপ নাকি? যখনই আসি তখনই দেখি মন-মরা? ব্যাপারটা কি? খুব খাটতে হয় বুঝি? কেন বসন্ত একটা লোক রাখতে পারে না?

সুবর্ণ হয়তো শিউরে উঠে দাদাকে নিরস্ত করে। কিন্তু প্রফুল্লর মন্তব্য আমার কান এড়ায় না। গম্ভীর হয়ে থাকি। ইচ্ছে করেই প্রফুল্লর সামনে বেরোই না। বেরোলেও প্রফুল্ল বলে যে একজন কেউ আমার বাড়িতে এসেছে, সে দিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র করি না।

প্রফুল্ল কথা বলতে আসে, কিন্তু বিশেষ সাড়া পায় না। ও কী বোঝে তা জানি না, তবে আমায় আর বেশি ঘাঁটায় না।

কিন্তু তবু ও আসে। ওর আসার বিরাম নেই। 'সুবি' ছাড়া যেন জগতে ওর আর কেউ নেই। গ্রীষ্মকালে কখনো আসে নীল ডুরে ডুরে ছিটের হাফসার্ট গায়ে দিয়ে, কখনো আসে ছাপমারা নতুন কাপড়ের পাঞ্জাবী গায়ে চড়িয়ে—ধুতি কখনো মালকোঁচামারা হাঁটু পর্যন্ত ওঠা, কখনো কোঁচা পকেটে গোঁজা।

শীতকালে ছিটের সার্টের ওপর উলের সোয়েটার। তার ওপর গাঢ় সবুজ রঙের দশ বছর আগের পুরনো এক-খানি গায়ের কাপড়। পায়ে কখনো রবারের জুতো, কখনো বুট, কখনো নিউকাট। আসবার আগে প্রত্যেক-বারেই ভালো করে চুল কেটে আসা চাই।

বাঘনাপাড়ার এই কুটুম্বপরিবারটির ওপর আমার বরাবর এমনি একটি অসহিষ্ণু মনোভাব ছিল বলেই যেদিন হঠাৎ প্রফুল্লর বিয়ের খবর এল, সেদিন মনে মনে না হেসে পারিনি।

ম্যাট্রিক পর্যন্ত বিদ্যে নিয়ে প্রফুল্ল মাস্টারি করে ওখান-কারই কোন্ এক স্কুলে। কিছু জমি-জমা আছে, বাড়িটাও নিজের। আজ এতগুলি পরিচয়পঞ্জীর ওপর নির্ভর করে না জানি কালনা থেকে কোন্ ভাগ্যবতী কন্যা আসছে বধূবেশে আমাদের প্রফুল্লর জীবনসঙ্গিনী হয়ে!

এ বিয়েতে আমাকে বা সুবর্ণকে যেতে হবে, যাওয়া উচিত—এ অদ্ভুত কল্পনা আমার মাথায় কখনো আসেনি। তাই বেশ চুপচাপ ছিলাম। কিন্তু বিয়ের কদিন আগে হঠাৎ সুবর্ণ আমার কাছে এসে সহজভাবে বললে—দাদার বিয়েতে যাব।

সুবর্ণ এত সহজে কথাটা বললে যে আমি সত্যিই খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ নিরুত্তর থাকতে পারলাম না। সুবর্ণ তখনো আমার মুখের পানে উত্তরের প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে তাকিয়ে রয়েছে।

আমি বললাম—বেশ, যেতে চাও যাবে।

সুবর্ণ নিরুচ্ছ্বাসে ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেল। তারপর যথাসময়ে প্রফুল্লকেই আসতে হল। সুবর্ণর মুখে তেমন কোনো খুশির আভাস দেখা গেল না। এ যেন সে কর্তব্যর খাতিরে নিয়মরক্ষা করতে যাচ্ছে।

যাবার সময় একবার শুধু আমার পানে তাকিয়ে বল্‌ল, —তুমি কি একদিনের জন্যেও যেতে পারবে না? অন্ততঃ বিয়ের দিনটায়?

প্রথমে রাগ হয়েছিল ওর স্পর্ধা দেখে। কিন্তু সামলে নিয়ে বললাম—চেষ্টা করব।

সুবর্ণ চলে গেল।

অবশ্যই আমি চেষ্টা করি নি। চেষ্টা করলে একদিন কেন, কদিনের ছুটি নিয়েই যেতে পারতাম।

বিয়ের দিন কেটে গেল। তার পর আরও দু'দিন কাটল। সুবর্ণ ফিরে এল।

প্রফুল্লর বিয়ের ব্যাপারে আমার তেমন কৌতূহল ছিল না। ওর বউ হবে ওরই মতো—এতে আর সন্দেহ কি? কালনা মহকুমা যতই আধুনিকাদের দেশ হয়ে উঠুক না কেন, সেখানে কি বর্ণপরিচয়-পাস ঝুম্‌কো-কাঁটা-ধারিণী কৃষ্ণাঙ্গী চতুর্দশী ভীরু লজ্জাশীলা বালিকার অভাব আছে?

তবু ইচ্ছে হল সুবর্ণকে একবার জিগেস করি। ইচ্ছে হল জেনে নিই, আমার অভাবটা ওখানকার আত্মীয়বর্গ কে কিভাবে নিল।

কিন্তু সুবর্ণর কাছে যেতেই ও হঠাৎ ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলল।

আমি আশ্চর্য হয়ে অনেকবার জিগেস করলাম—কী ব্যাপার? কিন্তু সুবর্ণ উত্তর দিল না। পাথরের মতো কঠিন হয়ে রইল।

উত্তর পেলাম রাত্তিরে। আবার খানিক কেঁদে কেটে বললে—তুমি গেলে না একদিনও, আমি অপ্রস্তুতে

পড়লাম। মা জিগেস করলে বড়ো-মুখ করে বলেছিলাম, বিয়ের দিন আসবেই। কিন্তু যখন এলে না মায়ের তখন কী অভিমান! বললে কি জান? বললে—ওরে সুবি, জানি, জানি, সব জানি। বসন্ত আমাদের কী চোখে দেখে সে কী জানিনা? তোকে বিয়ে করে ও যে কত দয়া করেছে সে কী বুঝি না?

এই বলে মায়ের সমস্ত দুঃখ উজাড় ক'রে সে রাত্রে সুবর্ণ নিজেই কেঁদে সারা হল।

আমি অপ্রস্তুতে পড়লাম। মনে হল, আজ যেন আমার মস্ত বড়ো হার হল।

সুবর্ণকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—বিশেষ কাজ ছিল বলেই যেতে পারি নি। ঠিক আছে সামনের রবিবারে যাবই।

তখন বেলা পড়ে এসেছে। আম-কাঁঠালের শাখা-পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য-ডোবার রাঙা আলো লুকোচুরি খেলছে। বাঘনাপাড়ার আকাশ জুড়ে ঘরমুখো পাখির ঝাঁক। এই সময়টা বিকেলের দিকে থেকে থেকে নারকল গাছগুলোর পাতা যেন বাতাসে মেতে ওঠে। মনে হয় যেন ঝড় উঠল। কিন্তু ঝড় নয়। শন্ শন্ করে হাওয়া ছোটে—দেবদারুর শাখায় শাখায় কাঁপন লাগে—পূবের আকাশ ধূসর হয়ে ওঠে।

আমার সামনে জলখাবারের ডিস সাজিয়ে দিয়ে অপর্ণা চলে যাচ্ছিল—মা বললেন, বৌমা, যাচ্ছ কোথায়? বোসো।

খুব নিচু গলায় খুব ছোট্ট করে বধূ উত্তর দিলে—আসছি।

একটু পরে সত্যিই ফিরে এল। হাতে একটা লাল ঝালর দেওয়া পাখা। অল্প দূরত্ব বজায় রেখে বাতাস করতে লাগল।

ঠিক এমন পরিবেশের সঙ্গে মোটেই পরিচিত নই। এক অদ্ভুত সংকোচের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছিলাম। বুঝেছিলাম, ঘরে এখন আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। মা রান্নাঘরে ঢুকেছেন, প্রফুল্ল বোধ হয় গেছে বাড়ি বাড়ি গাছের কাঁঠাল বিলোতে।

অপর্ণা কপাল পর্যন্ত অবগুণ্ঠন টেনে বাতাস করেই চলেছে। কোনো কথা নেই। শুধু ওর হাতের দু'গাছা সরু চুড়ি মাঝে মাঝে বাজছে ঠুন্ ঠুন্।

হঠাৎ এক সময়ে অপর্ণা কথা বললে—আপনি বুঝি আমাদের পছন্দ করেন না?

চমকে উঠে তাকালাম। দেখি, কখন সেই অবগুণ্ঠন সরে গিয়েছে। একখানি ঢলঢলে মুখ। তারই ওপরে ভাসা-ভাসা দুই কাজলটানা চোখ মৃদু তিরস্কারে মৃদু কৌতুকে যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

লজ্জিত স্বরে বললাম—এ কথা কে বললে?

অপর্ণা নিঃসংকোচে বললে—সে কথা পরে। আগে বলুন, আমি যা বলেছি ঠিক কিনা।

অকপটে সেদিন মিথ্যে বলতে হল। প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বললাম—কখ্খনো না। আপনি ভুল শুনেছেন।

ভদ্রমহিলা কী বলতে যাচ্ছিলেন এমনি সময়ে প্রজাপতির মতো চঞ্চল আনন্দে একটি মেয়ে এল।

—বৌদি!

মেয়েটি ছুটতে ছুটতে আসছিল। মুখটা রাঙিয়ে উঠেছে। হঠাৎ আমায় দেখে কেমন যেন লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেল।

অপর্ণা মৃদু হেসে বললে—কী রে বকুল?

কিন্তু ত্রয়োদশী বালিকার মুখে তখন আর কথা সরল না। আমার দিকে একবার কৌতূহলভরা চোখে তাকিয়েই অপর্ণার পিছনে গিয়ে আত্মগোপন করল।

তার পর নিচু গলায় বললে—শুনে যাও একটা কথা।

অপর্ণা হেসে বললে—এখানেই বল্ না।

বালিকা মাথা নাড়ল। বললে—না, বাইরে চলো। একবারটি।

এ ঘটনা হল তিন বছর আগের।

তিন বচ্ছর পরে আবার একদিন আসতে হল। এই সময়টুকুর মধ্যে ঘটেছে নিদারুণ পরিবর্তন। প্রায় বছরখানেক হল প্রফুল্ল মারা গেছে। সেই প্রফুল্ল!

বাংলা দেশের চির অভিশপ্ত গ্রাম। সেখানে সংক্রামক ব্যাধির যেমন নেই প্রতিকারের ব্যবস্থা, তেমনি নেই চিকিৎসার উপায়। মৃত্যু সেখানে কোল পেতে বসেছে। প্রফুল্ল সেই মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিল।

প্রফুল্লর মৃত্যু-খবর যথানিয়মে যথাসময়ে এল সুবর্ণর কাছে। সুবর্ণ তার স্বাভাবিক শোকোচ্ছ্বাস সামলে

রাখতে পারে নি। কিন্তু বড়ো কথা তা নয়। বড়ো কথা, প্রফুল্ল মরে বড়ো গভীরভাবে আমার আপন হয়ে উঠল। আমি কোনোদিন ওকে এতভাবে ভাবিনি—ভাববার অবকাশ পাইনি। চলতে ফিরতে অফিসে কাজ করতে সব সময়েই প্রফুল্লর কথা মনে পড়তে লাগল। বিশেষ করে যখন বাড়ি ফিরি তখন যেন আমার এই ভাড়াটে বাড়ির প্রতি ইঁট কাঠের গায়ে আমি ওর উপস্থিতি টের পাই। মনে হয়, এই তো এইখানে সে সেদিন বসল, এইখানে দাঁড়িয়ে হাসছিল, এইখানে—এই দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে ভাই-বোনে ঝগড়া করছিল।

আশ্চর্য! আমি কোনোদিনও ভাবিনি প্রফুল্লর জন্যে আমার মনের ভেতর এতটা ফাঁক ছিল। প্রফুল্লও তা টের পেল না।

সুবর্ণ মায়ের কাছে গেল। এবারও আমার যাওয়া হল না। সুবর্ণ জলভরা দু চোখ মেলে তাকালো। সে চোখের ভাষা এই—এবার কে এসে নিয়ে যাবে?

কিন্তু তবু ওর যাওয়া আটকালো না। বাঘনাপাড়া থেকে ওর মা-ই লোক পাঠালেন। আমায় যেতে হল না।

কিন্তু এই না-যাওয়ার মূলে এবার কিন্তু কারণ ছিল অন্য। প্রফুল্লর মৃত্যুর খবরের সঙ্গে সঙ্গে আমার কেবলই মনে পড়ছিল আর একজনকে—সেই তরুণী বধূটি, যৌবনের প্রথম উদ্‌ভাসের সূচনা থেকেই ভাগ্য যাকে নিষ্ঠুর বঞ্চনা করে যাচ্ছে।

ভাবলাম, একবার অপরাধী হয়ে আছি। আজ এত কাল পর আবার কোন্ মুখে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াব? সেদিন তার মধুর স্মৃতিটুকু বুকে করে লুকিয়ে এনেছিলাম, আজ চোখের জলে সে স্মৃতিটুকু ধুয়ে ফেলতে মন সরে না যে!

কিন্তু তবু যেতে হল।

আবার সেই বাঘনাপাড়ার ধুলোওড়ানো বাতাস—সেই ছায়াঘন পথ। আবার সেই নিঃশব্দ বনভূমি—সেই চিরবিচ্ছেদের হাহাকার-ভরা শূন্যতা!

ধীরে ধীরে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। আজ মা উঠে আসতে পারলেন না। তিনি শয্যা নিয়েছেন। যিনি এগিয়ে আসতে গিয়েও আসতে পারলেন না, তিনি অপর্ণা।

অকস্মাৎ আমায় দেখে যেন কি রকম হয়ে গেলেন। নিশ্চল পাষাণের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। মাথার অবগুণ্ঠন খসে পড়ল, বুকের নিশ্বাস দ্রুততর হল।

কিন্তু সেদিকে যেন তাঁর হুঁস নেই।

তিনি নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। দূর থেকে চোখের ওপর চোখ রেখে এমন অসংকোচে কাউকে কাঁদতে দেখিনি।

অবাক হয়ে তাই আজ ভাবছিলাম, সেদিনের সেই মানুষটির সঙ্গে আজ কত তফাত!

একটি শ্বেতপদ্মের মতো তাঁর সমস্ত সত্তাটি একটা অপূর্ব বেদনায় শ্রীময়ী হয়ে উঠেছে। সেদিনের সে হাস্যোচ্ছ্বাস আজ নেই—কাজলটানা চোখের সে চঞ্চল কৌতুক কাজলরেখার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে।

আশ্চর্য তাঁকে সান্ত্বনা দেবার মতো ভাষা আমার কণ্ঠে যোগাল না।

আজ সন্ধের পরই শেষ ট্রেনে আমায় ফিরতে হবে।

কতক্ষণ মায়ের মাথার কাছে বসে রইলাম। ওঁর শীর্ণ হাত দুটি আমার হাতের মুঠোয় কাঁপছে থর্ থর্ করে। চোখের জলে গাল ভাসছে। সেই অবস্থাতেই বিদায় নিতে হল।

উনি বললেন—এসো বাবা, তুমি ছাড়া আজ আর আমার কেউ নেই।

বললাম—আসব।

তখন ক্লান্তস্বরে উনি একবার ডাকলেন—বউমা।

কিন্তু অপর্ণার সাড়া পাওয়া গেল না।

—ও মেয়েটার মুখের পানে আমি তাকাতে পারি না।

বলতে বলতে মা ফুঁপিয়ে উঠলেন। তার পর একটু সামলে নিয়ে বললেন—তুমি একবার ওর সঙ্গে দেখা করে যেও।

বললাম—আচ্ছা।

বাইরে বেরিয়ে এলাম। অপর্ণা কোথায় জানি না। ভাবছিলাম, দেখা করে যাব কিনা। এমনি সময়ে বিকেলের স্বল্প আলোর মাঝে ওপাশের বারান্দার এক কোণে অপর্ণার শুভ্র মূর্তি ভেসে উঠল।

অপর্ণা যেন ইঙ্গিতে ডাকল। আমি কাছে গেলাম।

—একটু ভেতরে আসুন। দরকার আছে।

এই বলে অপর্ণা বারান্দার কোলের ছোট্ট ঘরটিতে ঢুকল।

বারান্দার এদিকের অংশটা একেবারে নির্জন। ঘরের ভেতর আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার এরই মধ্যে জমাট বেঁধে উঠেছে। পশ্চিমের জানলাটা খোলা। সেখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরে রেললাইনের বুকে অস্পষ্ট ধোঁয়া। হয়তো কোনো মালগাড়ি গেল।

অপর্ণাকে এই মুহূর্তে বড়ো অপরূপ লাগল। নিশীথের অন্ধকারের বুকে ও যেন নিশিগন্ধার আলো। পূর্ণ প্রস্ফুটিত কুসুমস্তবকের ভারে লতা যেন নুয়ে পড়েছে।

অপর্ণা ভিজে গলায় বললে—আমার একটা উপকার করুন। আপনি আমাদের বড়ো দুঃসময়ে এসে পড়েছেন।

এই বলে হঠাৎ ড্রয়ার থেকে একটা আঙটি বের করে আমার হাতে গুঁজে দিলে।

আমি চমকে উঠলাম—এ কী!

অপর্ণা বললে—আমাদেরই পাশের বাড়ির মেয়ে বকুল। বড়ো গরিবের মেয়ে। সামনের সপ্তাহে তার বিয়ে। সে আমাদেরই একজন। এই আঙটিটা রেখে খুব তাড়াতাড়ি কিছু টাকা পাঠিয়ে দেবেন।

আমি ব্যস্ত হয়ে বলতে যাচ্ছিলাম—

কিন্তু অপর্ণা বাধা দিয়ে বললে—আমি জানি আপনি কী বলবেন। কিন্তু এ আঙটি আপনাকে রাখতেই হবে। ও আঙটি আমার। বুঝছেন তো, ওই আঙটির জন্যেই আমার টাকা শোধ দেবার তাগিদ থাকবে। নইলে—

অপর্ণার কথা শেষ হল না। তখন ও হাতের আঙটি আমার হাতের মুঠোয় সবেমাত্র সমর্পণ করেছে। হঠাৎ সেই জনশূন্য বারান্দায় খোলা জানলার আড়ালে কাদের চাপা হাসি শোনা গেল।

অপর্ণা চমকে উঠে তাকালো। কাউকে দেখা গেল না। শুধু নির্জন বারান্দার বুকে দুতিনটে হাল্কা পায়ের শব্দ দ্রুত মিলিয়ে গেল।

অপর্ণা সেই মুহূর্তে তিরস্কারের সুরে ডাকল—বকুল! কিন্তু বকুল তখন আর সেখানে নেই।

কটা মুহূর্ত কেটে গেল। অপর্ণার কণ্ঠে আর স্বর বেরোল না। দুচোখ সহসা কেমন হয়ে উঠল। মুখ আরক্ত হল। হাত পা সর্বাঙ্গ যেন কেঁপে উঠল একবার। কী এক দুর্নিবার আবেগে সেই মুহূর্তে ঝড়ের মতো বেগে ঘর থেকে চলে গেল।

অন্ধকার তখন সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছে ঘরখানাকে। দেওয়ালের গায়ে টিক্‌টিকি ডাকছে টিক্ টিক্। দেওয়াল-ঘড়িটায় একঘেয়ে শব্দ হচ্ছে টক্ টক্।

পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলাম। সেকালের পুরনো —এই মুহূর্তে অন্ধকারের গর্ভে যেন কী এক অকল্যাণ আশঙ্কায় আত্মগোপন করেছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আশা—হয় তো এখুনি অপর্ণা বেরিয়ে আসবে। এখনো যে বিদায়ের পালা সাঙ্গ হয়নি।

কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল তবু কেউ বেরিয়ে এল না। অত বড় বাড়িটায় আলোও জলল না এখনো।

একবার ভাবলাম, ডাক দিই। যাবার আগে শেষবার তার কাছে বিদায় নিয়ে যাই। ও যদি বিদায় না দেয়, তাহলে এ আসা যে ব্যর্থ!

কিন্তু অকস্মাৎ মনে হল—অপর্ণা যেন আর কোনোদিন আমার সামনে এসে দাঁড়াবে না। আমিই যেন অপরাধী। আমারই জন্যে বধূ অপর্ণা কোনো এক [illegible] বালিকার চোখে বুঝি অকারণে [illegible] চিরদিনের জন্যে এক নিদারুণ পরিহাসের পাত্রী হয়ে রইল।

কলকাতায় গিয়েই আমি [illegible]শটা টাকা মণিঅর্ডার করে পাঠালাম। যথাসময়ে রসিদ এল। অপর্ণা সই করে নি। সই করেছেন অপর্ণার [illegible] তাঁর বিধবা শাশুড়ি।

পরের দিনই [illegible]লাদা একখানা চিঠি এল। লিখেছেন—তোমা[illegible]রিত টাকা পেলাম। বড়ো উপকার হল। খুব [illegible] পেছনের বাগানটা বিক্রি হবে। সেই সময় [illegible] করছি সমস্ত টাকাটাই একসঙ্গে পাঠা[illegible]

চিঠি [illegible] সংক্ষিপ্ত। আঙটির ইঙ্গিত কোথাও নেই। হয় তো [illegible]ক ভদ্রতা; কিম্বা—

কিম্বা [illegible] তো আঙটির কথা অপর্ণা গোপন করেই গেছে।

যাই হোক না সবই ওঁরা একদিন শোধ করে দেবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ; কিন্তু—

কিন্তু এ আঙটিয়ে আমি বোধ হয় কোনোদিন আর অপর্ণার সামনে গিয়ে[illegible]তে পারব না।

—বঙ্কিম তর্পণ—

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

আমি কোনদিন সাহিত্যিক পদবাচ্য নই। সাহিত্যিক বলিতে যে ভাবসমষ্টির চিত্র মানসপটে উত্থিত হয় আমার মধ্যে তাহার প্রকাশ কোনদিন হয় নি। সাহিত্য সমালোচকরূপে তাহার কোন দান বা খ্যাতি নাই। সাহিত্য সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোন দিন কোন লেখনী ধরি নাই। যখন আমায় এই সভায়* সভাপতিত্ব করবার অনুরোধ করা হয় তখন আমি এই প্রশ্ন করেছিলাম যে এই সভায় সভাপতিত্ব করবার আমার কোন অধিকার বা যোগ্যতা আছে কি না? নিজের সাহিত্যিক দৈন্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েই এই প্রশ্ন করেছিলুম। এই প্রসঙ্গে—অর্থাৎ আমার সাহিত্যচর্চা এবং সাধনার অভাব সম্বন্ধে—শ্রদ্ধেয় ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্তের লিখিত বঙ্কিমবাবুর সহিত তাঁহার একটী কথোপকথন উদ্ধৃত করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বঙ্কিমবাবু আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—দেখুন 'সাহিত্য' মাসিক পত্রিকায় আপনার যে কালিদাস ও সেক্সপীয়র শীর্ষক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমি যত্ন করিয়া পড়িয়াছি। হীরেনবাবু বলিলেন—'মাসিকে প্রকাশিত যা প্রবন্ধ বাহির হয় সব আপনি পড়েন নাকি?' বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে—'হাঁ, অনেকই দেখিতে হয় বই কি। কোথায় কোন্ নূতন লেখকের উদয় হইতেছে [illegible] করি। প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমবাবু শুনিলেন তাহার সংবাদ রাখিতে ইচ্ছা [illegible] তিনি যে হীরেনবাবু শীঘ্রই আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ করবেন। [illegible] কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—তাহা হইলে আপনাকে সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে হারাইব। হীরেনবাবু এতে জোর করিয়া বলিলেন যে—কেন, আমি সাহিত্য চর্চা কিছুতেই ছাড়িব না। বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে—আপনি বোধ হয় এখনও জানেন না যে 'ল' কি রকম exacting mistress! বিশেষতঃ যে উকিলের সাহিত্যচর্চারূপ দুর্নাম রটে, মক্কেল তাহাকে দূর হইতে পরিহার করে।

আমার জীবনে সাহিত্যচর্চা ও সাধনার অভাব বোধ হয় বঙ্কিমবাবুর এই যুক্তিই প্রযোজ্য। আজ সেই আইন ব্যবসায়ের কবলমুক্ত হয়ে বোধ হয় এই সভায় সভাপতিত্ব করবার অধিকার অর্জন করেছি।

যাই হোক আরও এক কারণে স্বীকৃত হয়েছিলাম—যে জীবনের প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে প্রথম সুযোগ লাভ করব বাঙ্গালী জাতির এই পবিত্র তীর্থস্থান দর্শন করবার এবং এর কর্ণধারগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার। আজ প্রথমেই তাই আমি উদ্যোক্তাগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই পুণ্যস্থানের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমায় দিয়েছেন বলে, যে সৌভাগ্য নিশ্চয়ই আমার ভবিষ্যত কর্মপথে কিছু পাথেয় যোগাবে।

আমি ভাবছিলুম যে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর ৬১ বৎসর পরেও এবং তাঁর জন্মের এই ১১৭ বৎসর পরে বার্ষিক উৎসব পালন করার আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? কি আদর্শ বা প্রেরণা বা ইচ্ছা আমাদের অনুপ্রাণিত করে? এবং জগতের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিয়মের অনিবার্য্য ফলস্বরূপ আমরা এইরূপ উৎসব পালন থেকে কতটা কল্যাণ ব্যক্তিগত-ভাবে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হই। সেই দিক থেকে বিচার করলে আমরা কি এই সভায় এমন নূতন কথা বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বলতে পারব—যা এই ৬১ বৎসরেও তাঁর সম্বন্ধে পূর্বে বলা হয় নি। সুতরাং পুনরাবৃত্তি আমাদের হবেই। কিন্তু পুনরাবৃত্তিও সব সময় দোষ নয়। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমষ্টিগত জীবনেও তাই অনেক জিনিষের পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। মানুষ প্রতিদিন একই মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতার আরাধনা করে—বা আত্মিক চিন্তায় নিমগ্ন হয়। যুগ যুগান্তর ধরে রামায়ণ মহাভারত গীতা প্রভৃতি অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ—কোটী কোটী ভারতবাসীকে শুধু আনন্দ পরিবেশন করে নি, তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে এবং ভারতবর্ষের ঋষিবাক্য-সমূহ কালের স্রোতকে অগ্রাহ্য করে যুগযুগান্তর ধরে তাদের চিরন্তন সত্য ও সৌন্দর্যে মানবের কল্যাণদায়িনী শক্তিরূপে কার্য্য করে এসেছে। ঋষির আবির্ভাব ভারতের পুণ্যভূমিতে নূতন নয়! এখানে আবির্ভূত হয়েছেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন স্রষ্টা দ্রষ্টা যাঁদের মুখ ও লেখনী নিঃসৃত জীবন-বাণী কালের সীমারেখা অতিক্রম করে জাতির জীবনকে পুষ্ট করেছে, সমৃদ্ধি-শালী করেছে। আজ আমরা শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি উনবিংশ শতাব্দীর সেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে। এই অনুষ্ঠানে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করতে চাই তাঁর উত্তরসাধক দেশবাসীগণকে—যাতে তাঁরা তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও চিরন্তন সত্য ও তথ্যপূর্ণ বাণীগুলিকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে বর্ত্তমানে আরও হৃদয়ঙ্গম করে সমাজের ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারেন।

আমি আজ তাই এই সভায় তাঁর সাহিত্য প্রতিভার, সাহিত্যরস-সৃষ্টির ও বাঙ্গালাসাহিত্যে যুগবিপ্লবসাধনকারী গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকরার প্রসঙ্গ আলোচনা করব না। আমি পূর্বেই বলেছি যে সাহিত্যের রসবিচারে সেরূপ নিদর্শন করবার শক্তি ও সামর্থ্য আমার নেই। সাহিত্যিক না হয়েও আমি বিশ্বাস করি না যে বাংলা দেশে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিক্ষিত নামধারী এমন কোন বাঙ্গালী আছেন—যাঁর জীবনে, কি সমাজ সেবায়, কি দেশ-প্রেমিকতায়, কি রাষ্ট্র-পরিচালনায়, কি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বঙ্কিম সাহিত্যের বহুমুখী প্রতিভা প্রত্যক্ষ বা অলক্ষ্যে প্রতিভাত হয় নি। আমি আজ এই সামান্য অবসরে তাই নিবেদন করব—তাঁর সাহিত্যের মধ্যে থেকে কতকগুলি সমাজগঠন ও রাষ্ট্রগঠনে জাতির কল্যাণমূলক ইঙ্গিতের কথা—যার দূরদর্শিতা

---

* নৈহাটী কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-স্মৃতিসভায় অভিভাষণ।

—সে যুগে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে যেমন সত্য ছিল—আজও এই বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগে সেইরূপ সত্য স্মরণীয় ও পালনীয়।

সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করবার পূর্বে আমি আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে চাই বঙ্কিম সাহিত্য ও প্রতিভা সম্বন্ধে বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন মনীষীগণের প্রশস্তি। সেই সব উক্তি স্মরণেও আমরা নিজেদেরই উন্নত করবো এবং বঙ্কিম স্মৃতি বার্ষিকীর সার্থকতা প্রতিপন্ন করব।

৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বললেন :—

"কাব্যের চেয়ে ইতিহাসেই তাঁর বেশী সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। R'enaissance' ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গালায় যাহাতে আবার নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল তিনি বাংলার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান। সেই উদ্দেশ্যে তিনি 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' বলিয়া বঙ্গদর্শনে সাতটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশে আর্য ও অনার্য-গণের বাস সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তার চেয়ে এখনও কেহ বেশী কিছু লিখিতে পারেন নাই।"

৺পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় লিখিলেন :—

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম লিখিয়া বাঙ্গালীর কলঙ্কাপনোদনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই তিনখানি উপন্যাসে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ করা হইয়াছে। বন্দেমাতরম্ গানই বাঙ্গালীকে বঙ্গভূমিকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখাইয়াছে। মালমসলা বঙ্কিমচন্দ্র তৈয়ারী করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, কেবল সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। বঙ্গ ভঙ্গে সে সময় ও সুযোগ দেখা দিল। এই তিনখানি উপন্যাস বাঙ্গালার দেশাত্মবোধের ত্রিপদবেদী।

৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাহিত্য বিষয়ে একটি কথোপকথনের উল্লেখ করিয়া বলিলেন :—

"আমি বঙ্কিমবাবুর সম্মুখে বসিয়া যে নূতন বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলাম, তাহাকে ত আগে দেখি নাই, চিনিতে পারি নাই। আমার মানসপটে তাঁহার অন্য মূর্ত্তি উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। কল্পনা নয়নে সেই বঙ্কিম-চন্দ্রের ছবি দেখিয়া মনে হইল—'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ'।"

৺বিপিনচন্দ্র পাল বলিলেন :—

"বসুন্ধরা যেমন ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনি ফুটিয়া উঠিয়া প্রত্যেক ঋতুর বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করিয়া, তাহাকে নিজের বিকাশ ও সার্থকতা সাধনে নিয়োগ করে, প্রত্যেক নূতন অবস্থার মধ্যে যাহা গ্রহণীয় তাহাকে গ্রহণ করে, যাহা বর্জনীয় তাহাকে বর্জন করিয়া অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় শক্তিকেই আপনার বিকাশের উপযোগী করিয়া তুলে, শক্তিশালী পুরুষেরাও নিজ নিজ অধিকারে তাহা করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্রোতে ভাসিয়া বেড়ান না, অথবা ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া স্রোতের শক্তি ও সত্যতাকে অলীক বলিয়া উড়াইয়াও দেন না। স্রোতের মাঝখানে যাইয়া, আপনার শক্তি ও নিপুণতার দ্বারা তাহারই বেগে তাহাকে নিজের সার্থকতাসাধন ও জনসমাজের ইষ্টপথে পরিচালিত করেন। বাংলা দেশের আধুনিক চিন্তার বিকাশে কয়েক-বৎসর কাল, বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্বদাই এই স্রোতের মাঝখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। এই জন্যই আধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যে ও ভাবরাজ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের এমন অনন্যপ্রতিযোগী ও সর্বতোমুখী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পরিচালিত বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ প্রকাশে—এক বিজ্ঞপ্তিতে লিখেছিলেন—

"বাংলা সাহিত্য পঞ্জিতে ১৩ই আষাঢ় ১২৪৫ একটী স্মরণীয় দিন। ঐ দিন আকাশে কিন্নর গন্ধর্ব্বেরা নিশ্চয়ই দুন্দুভিধ্বনি করেছিল…দেব-বালারা অলক্ষ্যে পুষ্পবৃষ্টি করেছিল—স্বর্গে মহোৎসব সম্পন্ন হয়েছিল।"

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক ৺মোহিতলাল মজুমদারও বঙ্কিমপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য নামীয় একটী প্রবন্ধে লিখলেন :—

"উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে যে যুগান্তর অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল সে যুগান্তরের প্রাণান্ত বিক্ষোভকে নবজীবন ধারায় নূতন সৃষ্টি পথে প্রবাহিত করিবার জন্য, যে প্রতিভার ও মনীষার স্মরণ আমরা এই যুগে নানাভাবে হইতে দেখিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্রে তাহাই সার্থক হইয়াছিল। আজ বাঙ্গালী সে যুগের সেই বিক্ষোভ প্রত্যক্ষ করিতেছে না বটে কিন্তু তাহার আধুনিক মনোজীবনের অন্তঃস্থলে সেদিনের সেই বন্যা হইতে যে পলিমৃত্তিকার স্তর সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা বঙ্কিমচন্দ্রেরই অসাধ্য-সাধনের কারণ। এখনও বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে আমরা যে কয়টি প্রধান ভাবচিন্তা লইয়া আন্দোলন আলোচনা করিয়া থাকি তাহার সঙ্গে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র।"

৺শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিলেন :—"যে সাহিত্য মানুষ গড়ে, সেই সাহিত্যই বঙ্কিমচন্দ্র গড়িয়া গিয়াছেন। স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত…ইহাই ছিল তাঁহার মর্ম্মোক্তি। গঙ্গা হিন্দুমাত্রেরই নিকট পরমপূজ্য দেবতা বিশেষ। তাঁহার কাছে গঙ্গা যথার্থ পুণ্যময়ী। কিন্তু দেশের জন্য দুঃখ করিতে গিয়া তিনি সেই গঙ্গার উদ্দেশে নিঃসঙ্কোচেই বলিয়াছেন—'তুমি যাহার পা ধোয়াইতে সেই মাতা কোথায়?' সত্য সত্যই দেশমাতাকে তিনি সকল দেবতার উপরে আসন দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা যে আদর্শ ভাষা, অমূল্য ভাব ও অপূর্ব্ব সাহিত্য লাভ করিয়াছি, তাহা তাঁহার অনন্য-সাধারণ প্রতিভা-প্রসূত হইলেও, মনে রাখিতে হইবে, সেই প্রতিভা তাঁহার প্রগাঢ় দেশপ্রীতির প্রভাবেই পরিচালিত হইয়াছিল।

৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিলেন :—"বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য, কি বিজ্ঞান কি ইতিহাস কি ধর্ম্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁকে আবশ্যক হইত তখ তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গ সাহিত্যের সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেখা

প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।…যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্ব্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন, তিনিই আমাদের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ, দারিদ্র্যের শৃঙ্খলতার মধ্যে চিরসৌন্দর্য্যের অক্ষয় আকর উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যাহা কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা কিছু অমর করিবে সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার পোষণ করিবার, প্রকাশ করিবার এবং সর্ব্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন। তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্য স্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা কেবল সাময়িক সত্য নহে, এ কথা কোন বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।"

আমি এখানে আপনাদের কাছে মোহিতবাবুরই ভাষায় সেই বর্ত্তমান ভাব চিন্তাগুলির কয়েকটীর মূল সূত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের সঙ্গে কি ভাবে জড়িত তাহাই নিবেদন করার চেষ্টা করিব।

স্বাধীন ভারতের প্রথম সংবিধানের নীতিনির্দ্দেশক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রনায়কগণ যে বর্ণহীন শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের পরিকল্পনা করিতেছেন তাহার পরিচয় বঙ্কিমের আদর্শে পাই "আনন্দমঠে"। সন্তানগণের দীক্ষাগ্রহণে সত্যানন্দ শিষ্যদিগকে প্রশ্ন করছেন—

"তোমরা জাতিত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান একজাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কি বল?"

শিষ্যগণ—"আমরা সে বিচার করিব না—আমরা এক মায়ের সন্তান।"

সত্য—তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারি স্বয়ং ইহার সাক্ষী।"

আজ শ্রেণী-সংঘর্ষ ঘুচাইয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও দেশ গঠনের কথা রাষ্ট্রনায়কগণ চিন্তা করছেন তাঁদের বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্য প্রবন্ধ পাঠ কর্ত্তে অনুরোধ করি! সাম্য প্রবন্ধগুলিতে অপূর্ব্ব ভাষায় ধনী-দরিদ্র সমস্যা, পুঁজিবাদ-সাম্যবাদ সমস্যা, জমিদার কৃষক সমস্যার আলোচনা করিয়া সেই যুগেও তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন স্বাধীন চিন্তাধারার যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা চিন্তাশীল বাঙ্গালী সমাজ-সমস্যার সমাধানের উপকরণ যোগাইবে। তার চিরন্তন সত্যগুলি চিরদিন অনস্বীকার্য্য হইয়া থাকিবে। সামাজিক প্রবন্ধের মধ্যে লোকরহস্যই বঙ্কিমচন্দ্রের অমরকীর্ত্তি। প্রথম ব্যঙ্গ কৌতুকপূর্ণ রচনা পুস্তক বাহির করে—বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে যে শুধু কৌতুক ও রহস্য পরিবেশন করিলেন তা নয়—অনুসন্ধিৎসু চক্ষুর দৃষ্টিতে সমাজচিত্রের কুৎসিত ও কদর্য্যরূপকে হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে তীব্র কশাঘাত করে সমাজের রূপ উদ্ঘাটিত করলেন। 'দাম্পত্য দণ্ডবিধি আইন' "বাবু" প্রবন্ধগুলির সমাজ চিত্র আজও বর্ত্তমান। সেদিন যে ভারতের জাতীয় মহাসভার সভাপতি মিঃ ডেবার—এক সভায় কলিকাতায় 'বাবু' সভ্যতার উল্লেখ করেছিলেন আজও বঙ্কিমচন্দ্রের বাবু গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায় এ কলঙ্ক বাঙ্গালী চরিত্রে এখনও যায় নি এবং এক শ্রেণীর তথাকথিত সভ্যসমাজের চিত্র ফুটিয়া উঠে যাহা স্বাধীন জাতির কলঙ্কস্বরূপ। কমলাকান্তে বঙ্কিমচন্দ্র যে মৌলিকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা কোন কালে বা যুগে নিবদ্ধ নয়। কমলাকান্তেই বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে কবি, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ ও স্বদেশপ্রেমিক। বিজ্ঞানরহস্যে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে বহির্বিজ্ঞান অর্থাৎ পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের সেবা বা সাধনা যে অতি প্রয়োজনীয় তাহা জাতির সম্মুখে তাহার আন্তরিক বিশ্বাসের মাধ্যমে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছিলেন।—তাঁর শেষ জীবনের ধর্ম্মমূলক সমালোচনার গ্রন্থে কৃষ্ণচরিত্র ধর্ম্মতত্ত্ব ও গীতা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি চিরদিনই তাদের অনবদ্য সৌন্দর্য্য বিকীরণ করবে এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদার মনোভাবের পরিচয় দিবে।

পরিশেষে আমি ভারতের আর একজন তত্ত্বদর্শী ঋষির কথা না উল্লেখ করে পারছি না। শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশ্লেষণ করে তাঁর যে তিনটি অবদানের কথা বলেছেন, আমি সেইটি উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শেষ করব—

"আমরা ইহা উপলব্ধি করিয়াছি যে বর্তমানযুগের ঋষিরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম অবশ্যই গণ্য হইবে কারণ তিনিই আমাদের নব ভারত নির্মাণের অমোঘ মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' দান করিয়াছেন।—

—কবি, সাহিত্যিক বা ঔপন্যাসিক রূপে বঙ্গদেশ আজ তাঁর সমাদর করিতেছে না। প্রথম বয়সের বঙ্কিম ছিলেন কবি ও ঔপন্যাসিক। শেষ বয়সের বঙ্কিম দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। দেবী চৌধুরাণী ও আনন্দমঠের চরিত্র গুলিতে তিনি নির্ভীক চরিত্র শক্তির প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্মী ও মাতৃভূমির যোদ্ধারা রাজনৈতিক বৈরাগী, তাহাদের দেশের সেবা ও দেশের প্রতি কর্তব্য ছাড়া আর অন্য কোন বস্তু অধিকতর প্রিয় ছিল না। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে নৈতিক শক্তির দ্বিতীয় উপকরণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংগঠন এবং তৃতীয় উপকরণ ছিল দেশ প্রেমের মধ্যে ধর্মভাব জাগরিত করা। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট আদর্শ সৃষ্টির মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ দান—দেশপ্রেম ধর্ম। এই নব ধর্মের তিনি প্রবর্তক ও রাজনৈতিক গুরু। এই ধর্মই জাতির নবজাগরণের ও স্বাধীনতা লাভের পথ প্রস্তুত করিবে।"

আমার সর্বশেষ নিবেদন যে বঙ্কিম সাহিত্যানুরাগী গোষ্ঠীগণ এখনও দেশে বঙ্কিম সাহিত্যের বহুল প্রচার করুন। পাঠাগার ও পাঠচক্রের মাধ্যমে, আলোচনার মাধ্যমে তরুণ সমাজ আনন্দ পাবে, শক্তি পাবে, সাহস পাবে, সত্য-পথের সন্ধান পাবে। জাতীয়তায় অনুপ্রাণিত হয়ে এখনও উঠবে এবং নবভারত গঠনে আত্মশক্তি নিয়োগ করতে পারবে।

'বন্দেমাতরম্'

জয় শ্রীঅরবিন্দ

চির-সুন্দর শ্রীঅরবিন্দ জয়,
শিব শান্ত সুনির্ম্মল সত্যময়।
অবিরাম ঝরে করুণা নয়নে,
ভব-তাপ হরে চরণে শরণে,
যুগ-সঙ্কট নাশ তরে উদয়
জয় শ্রীঅরবিন্দ অনন্ত জয়।

জয় নিত্য নিরঞ্জন দিব্য গতি,
রসরাজ সমাহিত আত্মরতি,
রিপু-লাঞ্ছন দুর্জ্জয় শক্তিধর,
শরণাগত বৎসল বিঘ্নহর,
মন-সংশয়-খণ্ডন দীপ্তময়,
জয় শ্রীঅরবিন্দ অচিন্ত্য জয়।

ছিল চাহি জগজ্জন উর্দ্ধমুখে,
নব আশয় জাগিল শূন্য বুকে,
সুর-বাঞ্ছিত মানব মূর্ত্তি ধরি
পুরুষোত্তম সম্ভব মর্ত্ত্য 'পরি।
জয় বিশ্বপিতা প্রভু প্রেমময়,
জয় শ্রীঅরবিন্দ অনিন্দ্য জয়।
জয় হে জয় হে জয় হে জয় হে।

কথা—অনিলবরণ রায় ঃ সুর ও স্বরলিপি—তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

ধা ণা II র্সা -া র্সা র্সা | র্সা -া র্সা র্সা I র্সা -া ধা ণা | র্সা -া মা গা I
চি র স্‌ নু দ র - শ্রী ০ অ র - বি ন্‌ দ জ - য় ০ শি ব
নি ০ ত্য নি - র ০ ঞ্জ ন - দি ০ ব্য গ - তি ০ র স
চা ০ হি জ - গ ০ জ্জ ন - উ র্‌ দ্ধ মু - খে ০ ন ব

I মা -পা পা পা | পা -ধপা মা গা I মা -া ধা পা | ধা -া মা গা I
শা ন্‌ ত সু - নি ০র্‌ ম ল - স ০ ত্য ম - য় ০ শি ব
রা ০ জ স - মা ০০ হি ত - আ ০ ত্ম র - তি ০ র স
আ ০ শ য় - জা ০০ গি ল - শূ ০ ন্য বু - কে ০ ন ব

I মা -পা পা পা | ধা -পা র্সা ণা I ধা -া মা গা | মা -া ধা ণা I
শা ন্ ত সু - নি র্ ম ল - স ০ ত্য ম - য় ০ অ বি
রা ০ জ স - মা ০ হি ত - আ ০ ত্ম র - তি ০ রি পু
আ ০ শ য় - জা ০ গি ল - শূ ০ ন্য বু - কে ০ সু র

I র্রা -া র্রা -র্জ্ঞা | র্সা -া র্সা র্সা I র্সা -র্রর্সা ণধা পধা | ণা -া ণা ধা I
রা ০ ম ঝ - রে ০ ক রু - ণা ০০ ন০ য় - নে ০ ভ ব
লা ০ ঞ্ছ ন - দু র্ জ য় - শ ০ক্ তি০ ধ - র ০ শ র
বা ০ ঞ্ছি ত - মা ০ ন ব - মূ ০র্ তি০ ধ - রি ০ পু রু

I ণা -র্রা র্সা র্সা | ধা -র্সা ণা ধা I পধা -পা ধর্সা র্সণা | ধা -া মা গা I
তা ০ প হ - রে ০ চ র - ণে ০ শ০ র - ণে ০ যু গ
ণা ০ গ ত - ব ৎ স ল - বি ঘ ন০ হ - র ০ ঘ ন
যো ০ ত্ত ম - স ম্ ভ ব - ম র্ ত০ প - রি ০ জ য়

I মা -পা পা পা | পা -া মা গা I মা -া ধা পা | ধা -া সা সা I
স ঙ্ ক ট - না ০ শ ত - রে ০ উ দ - য় ০ জ য়
সং ০ শ য় - খ ণ্ ড ন - দী প্ তি ম - য় ০ জ য়
বি ০ শ্ব পি - তা ০ প্র ভু - প্রে ০ ম ম - য় ০ জ য়

I গা -া মা মা | পা -া র্সা ণা I ধা -া মা গা | মা -া ধা ণা II
শ্রী ০ অ র - বি ন্ দ অ - ন ন্ ত জ - য় ০ "জ য়"
শ্রী ০ অ র - বি ন্ দ অ - চি ন্ ত জ - য় ০ "ছি ল"
শ্রী ০ অ র - বি ন্ দ অ - নি ন্ দ্য জ - য় ০ ০ ০

ধা ণা II র্রা -া -া -া | -া -া র্সা না I
জ য় হে ০ ০ ০ ০ ০ জ য়

I সা -া -া -া | -া -া মা ণা I ধা -া -া -া | -া -া -া -া I
হে ০ ০ ০ ০ ০ জ য় হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা সা গা গা | মা মা ধপা ধা I মা -া -া -া | -া -া -া -া IIII
জ য় জ য় জ য় জ০ য় হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ভারত ও ব্রহ্মে টিটোর বাণী

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বহুকালের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে' স্বাধীন ভারত তার শক্তির সন্ধান পেয়ে দৃঢ়ভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে, তাই আজ সারা পৃথিবীর সজাগ দৃষ্টি এই ভারতের দিকে। ভারতের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কার্য্যকলাপ পৃথিবীর সমস্ত মানুষই লক্ষ্য করছে।—

"যে সাহসিকতার সঙ্গে এখানকার মানুষ নূতন ভারত গড়ার জন্যে এগিয়ে চলেছেন তা দেখে বিস্মিত হয়েছি।"

এই অকপট স্বীকারোক্তি যাঁর মুখ থেকে এসেছে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়কগণের অন্যতম, যুগশ্লাভ ফেডারল পিপ্‌ল্‌স্ রিপাবলিকের সভাপতি মার্শাল টিটো।

ভারতবর্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের আশায় তিনি গত ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৪ সালে ভারতে উপস্থিত হন এবং ৩রা জানুয়ারী ১৯৫৫ সাল অবধি ভারতের মাটিতে বাস করে' ১১ দিনের জন্যে ব্রহ্মদেশে যান; ৬ই জানুয়ারী থেকে ১৭ই অবধি অবস্থান করে' দেশে ফেরার পথে আবার ২১শে জানুয়ারী ভারতে উপস্থিত হন। তাঁর এই ভারত ও ব্রহ্ম সফর নানা দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি এখানে সাধারণ পর্য্যটকের মত আসেন নি, একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়ে ভারত ও ব্রহ্মের রাষ্ট্রনায়কগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের দেশের সঙ্গে ভারত ও ব্রহ্মের মৈত্রী-সম্পর্ক দৃঢ় করার বাসনা ও বর্ত্তমান পৃথিবীর জটীল রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের আশা নিয়েই এসেছিলেন। বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনায় অনেক সুফল ফলে। আন্তর্জাতিক নানা সমস্যা, বিশেষ করে' বিশ্ব-শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর এই সফর যে সুফল প্রদান করবে সে বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হয়েই তিনি এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

বন্ধুভাবে ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়ে তিনি সব কিছু ভালভাবেই লক্ষ্য করেছেন। ভারতের প্রতি তাঁর ও তাঁর দেশবাসীর গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থার কথা অতি সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করেছেন।—

"সারা পৃথিবী ভারতবাসীদের শান্তিপ্রিয় ও মহৎ নৈতিকগুণের অধিকারী জাতি বলেই জানে। ভারতবাসী সত্যই গর্ব্ব অনুভব করতে পারে এই জন্যে যে—নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির আশায় তারা কখন অন্য জাতির রক্ত ও চোখের জল বহায় নি; এ জিনিসের নিদর্শন ভারতের ইতিহাসে নেই।"...

ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ও তার সাফল্যের কথা উল্লেখ করে' বলেছেন,—

"আমার দেশবাসীরা সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার সঙ্গে ভারতের জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম লক্ষ্য করে এসেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সফল পরিণতির জন্য ধন্যবাদ। অতীতের বাধা বিঘ্ন আজ দূর হয়েছে। ভারত ও যুগশ্লাভিয়ার জনগণ শান্তি রক্ষা ও সর্ব্বক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের অভ্যন্তরীণ উন্নতির একই আদর্শে আবদ্ধ হয়েছে, আর এই একই কারণে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও উন্নত ও দৃঢ় করতে পেরেছে।"

নানা গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে ভারতের যে অগ্রগতি সুরু হয়েছে তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি; ভারতের উন্নতিকল্পে যে সব পরিকল্পনা ভারতসরকার গ্রহণ করেছেন সেগুলি যে তাঁর ভাল লেগেছে এবং সেগুলি যে ভারতের পক্ষে সময়োচিত হয়েছে তা অকপটচিত্তে নানা প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছেন,—

"আমি বিশ্বাস করি যে তাঁরা (ভারত সরকার) এই বিরাট বিরাট পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করে' ঠিক পথেই পা দিয়েছেন,—সেচ এবং জল-বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার কথাই বিশেষ করে বলছি। আমার মনে হয়, ভারতের ভবিষ্যত দুটি জিনিসের ওপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করছে,—একটি হ'চ্ছে ইলেকট্রিক, আর অন্যটি যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। শুধু জনসাধারণের কায়িক শ্রম, গতানুগতিক পন্থা, আর মান্ধাতা আমলের যন্ত্র দিয়ে দেশের পশ্চাৎপদতা দূর হ'তে পারে না।"...

"ভারতের গঠনমূলক পরিকল্পনা, শিল্পোন্নয়ন, বিশেষ করে বৈদ্যুতিক পরিকল্পনা আমাদের মুগ্ধ করেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই শিল্পায়নের ভিত্তিভূমিতে পৌঁচেছে এবং তার থেকে আরও সাফল্যলাভ করবে। যন্ত্র শিল্পের প্রতিষ্ঠা ছাড়া সত্যিকারের জীবন ধারণের মানোন্নয়ন যে সম্ভব নয়, তা শ্রীনেহেরুর নেতৃত্বে ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ভাল ভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন।"

"এখানকার মানুষ যাঁরা এই সব গড়ে তুলছেন তাঁদের প্রতি আমার আকর্ষণ বা ঔৎসুক্য ছিল প্রবল। আমি তাঁদের লক্ষ্য করেছি, দেখেছি তাঁদের চোখে ফুটে আছে তাঁরা কি করছেন সে বিষয়ে সচেতনতা, আর তাঁদের কাজের গর্ব্ব, সত্যই তাঁরা তাঁদের কাজে গর্ব্ব অনুভব করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও তার পরে আমার দেশে যুবকসম্প্রদায় যা অনুভব করতো, যে গান গাইতো এখানেও তাই দেখেছি: তারা গাইতো,—'আমরা রেলপথ তৈরি করছি, আর রেলপথ তৈরি করছে আমাদের।' অর্থাৎ এইসব গড়ে তুলে মানুষ তাঁদের নিজেদেরই অবস্থার উন্নতি করছেন।"

"সংক্ষেপে বলতে পারি যে এই বহুকোটি মানুষ অতীতের পশ্চাৎ-পদতাকে দূর করার বিরাট চেষ্টায় একতাবদ্ধ হয়েছেন, এ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, আর এখানে অর্থ-নৈতিক উন্নতি যে অবশ্যম্ভ তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি।"

"ভারতে কৃষির উন্নতি ও খাদ্য সরবরাহ বিষয়ে আত্মনির্ভরতা দেখে আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি না।"

ভারতের অগ্রগতির পথে আজও নানা বাধা বিঘ্ন রয়েছে একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। মার্শাল টিটোও তাই বলেছেন,—

"যত দিন না ভারতের যন্ত্রশিল্প উন্নত হ'বে এবং যতদিন না উৎপাদন বৃদ্ধি হ'চ্ছে ততদিন নানা বাধা বিঘ্ন থাকবেই।"

তিনি নিজে একজন সমাজতন্ত্রবাদী। প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় শ্রমিক-সম্প্রদায়কে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় তা শুধু কেতাবী শিক্ষা থেকেই নয়; নিজের দেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই তা উপলব্ধি করেছেন। বিশেষ করে তিনি নিজেও পূর্ব্ব জীবনে ছিলেন একজন শ্রমিক, কাজেই বাঙ্গালোরে হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্ট ফ্যাক্টরিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রমিকদের সামনে গভীর আবেগপূর্ণ ভাষায় বলেন,—

"ভারতের উন্নতির ক্ষেত্রে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কায়েম করতে ভারতের শ্রমিকসম্প্রদায়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমি এই প্রতিষ্ঠানের এবং সারা ভারতের সমস্ত শ্রমিক যারা নিজেদের এবং ভারতের সমস্ত জনগণের সুখপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছেন, তাঁদের সেই কাজে সাফল্য কামনা করি।"

দিল্লীর পুনর্ব্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন ক'রতে গিয়ে সেখানকার অনাথ বালকবালিকাদের দেখে তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। তাঁর মনের মধ্যে ভেসে ওঠে নিজের দেশের সহস্র সহস্র অনাথ বালক-বালিকাদের মুখগুলি—যারা যুদ্ধের ফলে পিতামাতাকে চিরকালের জন্যে হারিয়েছে। এই পুনর্ব্বাসন কেন্দ্রের শিশুদের সম্বোধন করে বলেন,—

"প্রিয় শিশুগণ, আমি আমার দেশের শিশু ও যুবকগণের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমরা তোমাদের কর্ম্মে ও শিক্ষায় সাফল্য লাভ কর, এমন ভাবে নিজেদের দেশের উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তোলো—যাতে তোমাদের ভবিষ্যৎ আরও সুন্দর আরও সুখী করে তুলতে পারো।"

তাঁর বক্তৃতাবলীর মধ্যে এইটাই বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় যে শুধু রাজনীতি, অর্থনীতির কথা নিয়েই তিনি ব্যস্ত ছিলেন না। অতীত ভারতের সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্থাপত্যশিল্প সব কিছুই তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছে।—

"প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ও স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি যা বহুকাল আগেই ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে এক উন্নত স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল সেগুলিকে আমাদের দেখতেই হ'বে। এ কথা স্বীকার করতেই হ'বে যে ভারতবাসী তাঁদের অতীতের জন্যে গর্ব্ব অনুভব করতে পারেন।"

ভারতের প্রাণ-কেন্দ্র দিল্লীনগরীর তিনি যে উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশস্তি করেছেন তার তুলনা নেই;—

"আপনাদের এই নগরী সারা ভারতের জনগণের জীবনীশক্তি, সৃজন-শক্তি, আর মুক্তি স্পৃহার প্রতীক। কাল, বৈদেশিক আক্রমণ এবং যুগের পর যুগ ধরে অত্যাচার উৎপীড়ন ও এটিকে বা এখানকার জনসাধারণকে ধ্বংস করতে পারে নি।...এই নগরীর ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে এই নগরীটি এখানকার মুক্তিপ্রিয় জনগণের মুক্তি-স্পৃহার কেন্দ্রস্থল, অতীতের উন্নতির কেন্দ্রস্থল এবং অবশেষে এই যে স্বাধীনতা আপনারা অর্জ্জন করেছেন সেই স্বাধীনতা আন্দোলনেরও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।......"

মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ও জনগণ বহু নিপীড়ন অত্যাচার সহ্য করে' বছরের পর বছর সংগ্রাম করে' ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাঁর এই শ্রদ্ধা, আস্থা ও বন্ধুত্ব দিয়ে তিনি যে ভারতবাসীর অন্তর জয় করে নিয়েছেন, যুগশ্লাভিয়ার সঙ্গে ভারতবাসীর একটি অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরেছেন তাতে আর সন্দেহ নেই।

আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে মার্শাল টিটো একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ। সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী এই মানুষটি নিজের দেশে এক অভিনব পন্থায় সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা করে জগৎকে বিস্মিত করে দিয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন,—

"আমরা যুগশ্লাভিয়াতে এক নূতন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছি—সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ১৯৪৮ সাল থেকে এই ব্যবস্থা গড়ে উঠছে, সোভিয়েট ব্যবস্থার ধরণে নয়,—এর নিজস্ব ধরণে—আমাদের দেশের মাটির সঙ্গে খাপ খাইয়ে।...প্রত্যেক দেশেরই বিশেষ কতকগুলি অবস্থা থাকে সেগুলির জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পথে সমাজতন্ত্রের স্ফুরণ হ'তে বাধ্য। লক্ষ্য সেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমাজতন্ত্রবাদ,—উন্নততর জীবন। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানের পথ বিভিন্ন হতেই পারে।"

যুগশ্লাভিয়ার অগ্রগতির কারণ বর্ণনা করে তাঁর নিজস্ব রাজনীতির আর একটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন,—

"বাইরে থেকে মাঝে মাঝে কথা ওঠে যে আমাদের দেশে একদলীয় নীতি চালু আছে, আমাদের দেশে পশ্চিমা ধরণের গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই, ইত্যাদি। যদি কেউ সত্যই খোলা মনে বোঝার চেষ্টা নিয়ে আমাদের সামাজিক উন্নতি লক্ষ্য করেন তাহ'লে যে সব কারণে আমাদের অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে সেগুলি তাঁর দৃষ্টি এড়াবে না। সব কথাই আমি আগে বলেছি, ঐ সব কারণেই নূতন ধরণের গণতন্ত্রের ভিত্তি গড়ে উঠছে, চালু যে গণতন্ত্র তা থেকে ভিন্ন ধরণের, অর্থাৎ পশ্চিমা গণতন্ত্রের থেকে ভিন্ন।'

২১শে ডিসেম্বর ১৮৫৪, ভারতীয় পার্লামেন্টে ও ১৭ই জানুয়ারী ১৯৫৫, মান্দ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি যে ভাষণ দেন তা ভারতবাসীর স্মৃতিপটে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে ফুটে থাকবে। এই ভাষণের মধ্যে একদিকে যুগশ্লাভিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা, তার রাজনীতি, অর্থনীতি সব কিছুর পরিপূর্ণ চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন, আর অন্যদিকে তুলে ধরেছেন বিশ্বশান্তির জন্যে, জাতিতে জাতিতে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর আকুল আগ্রহ। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

"বর্ত্তমানে মনুষ্যজাতির এই যে ভীষণ ভয়, আশঙ্কা, এই সব কিছু দুর্দ্দশার মূলে প্রধান কারণ—প্রথম—রাষ্ট্র ও জাতিগুলির পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে সাম্যভাবের অভাব। দ্বিতীয়—এক দেশের

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্য জাতির হস্তক্ষেপ ;—এই সব হস্তক্ষেপ আসে সেই সব জাতিরই পক্ষ থেকে যারা বড় আর উন্নত। তৃতীয়—পৃথিবীকে এক একটি প্রভাবে প্রাভাবান্বিত করে বিভিন্ন চক্রে বিভক্ত করা। চতুর্থ—উপনিবেশ রাখার প্রথা। বিশ্বের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্র থেকে যতদিন না এই কারণগুলি দূর হচ্ছে ততদিন মনুষ্যজাতি তার ভাগ্যে এই শঙ্কিত অবস্থার হাত থেকে অব্যাহতি পাবে না।"

অনেকে অভিযোগ করেছেন, প্রশ্ন করেছেন যে তাঁরা নাকি আর একটি চক্র অর্থাৎ পৃথিবীর রাজনীতি-ক্ষেত্রে তৃতীয় চক্র সৃষ্টি করছেন। সেই সব অভিযোগও প্রশ্নের জবাবে টিটো স্পষ্টই বলেছেন—

"আমরা যারা এই পৃথিবীর বিভিন্ন চক্র—যেগুলি পৃথিবীকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে রেখেছে সেগুলিকে ভাঙ্গার জন্যে নিরলস সংগ্রাম করে চলেছি, সেই আমরাই আবার একটি তৃতীয় চক্র সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি? হ্যাঁ, আমরা চাই সেই সব রাষ্ট্র ও জাতির সংখ্যা বাড়াতে যাঁরা সব কিছুর উর্দ্ধে শান্তিকে রক্ষা করতে চান, যাঁরা চান সাম্য, জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা ও বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহ-অবস্থান। এইগুলির ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলার যাঁরা চেষ্টা করছেন আমরা চাই তাঁদের সংখ্যা বাড়াতে,—আরও একটি তৃতীয় চক্র সৃষ্টি করতে যাচ্ছি না আমরা।"

ভারত ও ব্রহ্মে তিনি যেখানেই কোন কথা বলেছেন, আলাপ আলোচনা করেছেন সেখানেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা ও বিশ্ব-শান্তির জন্যে আকুল আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বিনা দ্বিধায়। বর্তমানের এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে, বিশেষ করে এ্যাটম্ ও হাইড্রোজেন বোমার যুগে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে বিশ্বের পক্ষে কতখানি অকল্যাণকর তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। যুদ্ধ যাতে না বাধে তার জন্যে আকুল আগ্রহ মার্শাল টিটোর প্রতিটি বক্তৃতার ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।—

"প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি বেশ ভালভাবেই জানেন যে আর একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থ কি। এ শুধু রাষ্ট্র বিশেষকেই ধ্বংস করবে না, সমস্ত মনুষ্য জাতিকেই এক অভাবনীয় ধ্বংসের অতলতলে তলিয়ে দেবে,—দু'দশ বছরের জন্যে নয়, যুগ-যুগ ধরে চলবে সেই অবস্থা।"

ভারত ও ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রীগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর যে যুক্ত বিবৃতি তাঁরা দিয়েছেন সেইগুলির মধ্যে এই তিনটি রাষ্ট্রের আদর্শ ও মতামত বেশ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। ভারত-যুগশ্লাভ এবং ব্রহ্ম-যুগশ্লাভ সম্পর্কের মৈত্রী বন্ধন নিঃসন্দেহে আরও দৃঢ় হয়েছে। এই তিন রাষ্ট্র-নায়কের যুক্ত বিবৃতিগুলি শান্তির মূল্যবান দলিলরূপে বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্য্যকরী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২৫শে জানুয়ারী মার্শাল সফর শেষ করে দলবলসহ ভারতবর্ষ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর এই সফর নানা কারণে ভারত ও ব্রহ্মবাসীদের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা যুগশ্লাভিয়ার অদ্বিতীয় নেতা, রাজনীতিজ্ঞ, শান্তিপ্রিয় মার্শাল টিটোকে ও তাঁর সঙ্গীদলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।—

মার্শাল টিটো ও যুগশ্লাভিয়ার জনগণ দীর্ঘজীবী হোক। *

মার্শাল টিটোর ভারত ও ব্রহ্ম সফরকালের বক্তৃতাবলী, যুগশ্লাভ ও ভারতের জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা বাণী এবং ভারত ও ব্রহ্মের নেতৃবর্গকে প্রদত্ত তাঁর পত্রাবলী এই পুস্তকখানিতে প্রকাশিত হয়েছে।

ভারত ও ব্রহ্মের সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর এবং এশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের সম্পাদকমণ্ডলীর প্রশ্নের উত্তরগুলিও এই পুস্তকে যুক্ত করা হয়েছে।

ভারত-যুগশ্লাভ ও ব্রহ্ম-যুগশ্লাভ সম্পর্কের পূর্ণপরিচয় দানের জন্য ভারত ও ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রীগণের সঙ্গে আলোচনার পর যে যুক্ত বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং State Secretary for foreign affairs Mr. Koca Popovic-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কলিকাতা ও রেঙ্গুনে প্রেসকনফারেন্সের বিবরণও এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে।

আশা করি পুস্তকখানি ভারত ও ব্রহ্মবাসীগণের কাছে সমাদৃত হবে এবং বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক হবে।

---

* 'Teto speaks in India and Burma.'—Printed at Ananda Press, published by Jugoslav Embassy, 13, Sundar Nagar, New Delhi.

এ পৃথিবী

শ্রীউমাপদ নাথ

এ পৃথিবী সুরেলা সকাল।
দুপুরের দাবতাপ মানুষের বনে জলমান।
নিজের সেতারে রচি নিরলে যে গান
সে গানের দাহ নাই, সেটি এক সুরের সকাল।
ঝিলমিলে মাথাভাঙা চিকচিকে বালুপথ দিয়ে
বয়ে যায়, তার সাথে গান ধরে আদিবাসী মন।
তুলসীর কাঁচা বেদী নিকোয় যে বিরহিনী জন
সকালের নহবত তার কংকণ-রব নিয়ে।
হাওয়ায় যে বাণী ভাসে সে-বাণী কি শুনিয়াছে কান?
পাতাদের চোখ দিয়ে দেখিয়াছি আকাশের নীল?
পাঁচিলের খাঁচা দিয়ে বাঁধিয়াছি সনাতন চিল:
নিজেদের কাতরানি ভাবিয়াছি পৃথিবীর দান।
পৃথিবীর বিষ নাই, পৃথিবী তো স্বপনের প্রিয়া।
তার চোখে চোখ রেখে ভ'রে ওঠে ক্ষুধাতুর হিয়া
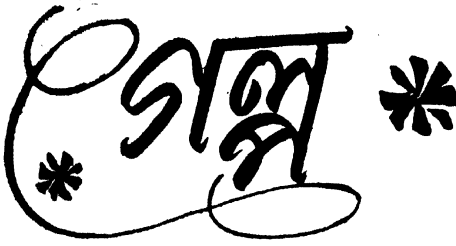
হৃতি ও প্রাপ্তি

সাধনা দেবী

সরকারদের বাড়ির রকে হেলান দিয়া লোকটি বসিয়াছিল। বেপাড়ার বাসিন্দা নিঃসন্দেহে।

অন্ততঃ আজ প্রভাতের পূর্ব্বে কস্মিনকালেও উহাকে এ পাড়ার কেহ কোথাও দেখে নাই। পরণে জীর্ণ দিশী ধুতি। ধুতির প্রশস্ত জলচুড়ি ও মিহি জমি কিন্তু এককালীন অভিজাত উৎসের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। দেহে স্যাণ্ডো গেঞ্জির উপরে একটি মূল্যবান অথচ ছিন্ন মলিন মুগাশিল্কের কোট যেমন তেমন করিয়া চাপানো। পায়ের সাণ্ডেল জোড়াটির অবস্থা আর কহতব্য নয়।

লোকটির বয়স হয়তো পঁচিশের নীচে। বহু দিনের অমনোযোগ ও অবহেলার স্তরান্তরাল হইতে সমস্ত অবয়ব ব্যাপিয়া একটা লুপ্তশ্রী উঁকি মারিতেছে—তাহাকে কোনোমতে অস্বীকার করা চলে না। উদাস উন্মনস্ক চাহনী আকাশের কোনো এক দুর্নিরীক্ষ্য কোণে প্রেরণ করিয়া যুবকটি নিস্তেজভাবে বসিয়াছিল। যেন পৃথিবীর সকল দারিদ্র্য, মালিন্যকে অবজ্ঞা করিবার মন্ত্র ধ্যান করিতেছে ঊর্দ্ধলোকে।

শশীকান্তবাবু এমন সময়ে বাজার করিয়া ফিরিতেছিলেন। পাড়ার বিখ্যাত পয়সাদার কৃপণ। গৃহিণীকৃত সুদীর্ঘ ফর্দ্দখানিকে আয়তনে এক পঞ্চমাংশ করিয়া ফেলিবার সুবিপুল আত্মপ্রসাদে তখন তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ। রকাসীন লোকটির প্রতি নজর পড়িতে ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। নিশ্চয়ই বেকার। জোয়ান লোক রিক্সা চালাইয়া কিংবা মুটেগিরি করিয়া খেগে যা—তা নয়তো ঠিক দেখ ভিক্ষা চাহিবার মতলবে আছে।

কিন্তু ভৎর্সনা করিবার মানসেই হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক লোকটির দিকে দ্বিতীয়বার তাকাইবামাত্র তাঁহার মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইল। অর্দ্ধস্ফীত বাজারের থলিটিকে সামলাইতে সামালাইতে পিছন ফিরিয়া ঝোলা কামিজের পকেট হইতে কি যেন একটা বাহির করিয়া দেখিলেন পুনরায় তির্য্যক দৃষ্টি হানিয়া যেন কি একটা মিলাইবার উদ্দেশ্যেই উপবিষ্ট লোকটিকে ভালো করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখে এক বিচিত্র ভাবের উন্মেষ হইল। শশীকান্ত কই মাছের মতো কোণাচে ভাবে অগ্রসর হইয়া সহসা যুবকটির নিকটবর্ত্তী হইলেন।

ঃ শুনছো ভাই ?

ঃ অ্যাঁ ? যুবকটি যেন স্বপ্নঘোর হইতে জাগ্রত হইল।

ঃ আমায় কি বলছেন ?

ঃ হ্যাঁ ভাই। বলছিলাম ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে কেন এমনভাবে পড়ে রয়েছ ?

ঃ আমি ভদ্রলোকের ছেলে আপনাকে কে বললে ? গায়ে লেখা আছে নাকি ?

যুবকটির কণ্ঠস্বর আকস্মিকভাবে উষ্ণ হইয়া উঠিল। শশীকান্ত কিন্তু রুষ্ট হইলেন না। যেন প্রস্তুতই ছিলেন এই উষ্ণতার জন্য।

ঃ কে আবার বলবে ভাই ? গায়ে সত্যি সত্যি অক্ষরে লেখা না থাকলেও ছাপ-মারা থাকে তা কি জানো না ? আচ্ছা বেশ ভদ্রলোকের ছেলে না হও মানুষের ছেলে তো বটেই ? মানুষ মানুষের ছেলেকে না দেখবে তো কে দেখবে ? ভগবানের সৃষ্টিই নাহলে ব্যর্থ। ইস্ কি অবস্থাই করেছ। কতদিন গায়ে জল পড়েনি পেটে ভাত পড়েনি কে জানে। নাও নাও চলো দিকি আমার সঙ্গে চান করে পরিষ্কার হয়ে দুটি ভাত খাবে।

ঃ না না আমি কোথাও যাবো না। যেতে চাই না। যুবকটি প্রবলবেগে মস্তক অন্দোলিত করিল।

ঃ ছি ভাই অবুঝ হোয়ো না।। শশীকান্ত আরো নিকটে সরিয়া আসিলেন যেন এইমাত্র পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইতে আরম্ভ

করিবেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে মধু ক্ষরিতেছে চক্ষু হইতে স্নিগ্ধ বাৎসল্য রস বৃষ্টি হইতেছে। কে বলিবে এই সেই শশীকান্তবাবু, শশীকান্ত শাহু।

অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া সুধা ঝরাইয়া তবে শশীকান্ত যুবকটিকে স্বীয় গৃহে লইয়া আসিতে সমর্থ হইলেন। বাহিরের ঘরে না বসাইয়া তাহার হাত ধরিয়া অতি পরিচিতের ন্যায় শশীকান্ত একেবারে অন্দরমহলে আনিয়া হাজির করিলেন। অতিথির আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া শ্রীমতী শশীকান্তের নাসা তীব্রবেগে সিঁটকাইয়া উঠিবার আগে হস্ত সঙ্কেতে গৃহিণীকে রান্নাঘরে লইয়া গিয়া আড়ালে ফিস্ ফিস্ করিয়া শশীকান্ত এমন কিছু গোপনীয় কথা বলিলেন যাহা শুনিয়া গৃহিণীর চক্ষু দুইটি চক্রাকৃতি হইয়া গেল। বাহিরে আসিয়া ব্যাকুল ভাবে আগন্তককে প্রশ্ন করিলেন: তোমার নাম কি বাবা?

: আমার নাম? আমার না—ম···যুবকটি যেন শব্দ হাতড়াইয়া বাহির করিল।

: আমার নাম জীবন।

: ওরে জীবন এসেছে, জীবন এসেছে রে—বলিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এমন হাঁকডাক সুরু করিয়া দিলেন যেন মনে হইল নূতন জামাতা সদ্য শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিয়াছে। যথোচিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য তদুপযুক্ত বিপুল সমারোহ পড়িয়া গেল। রন্ধনমানসে বাজারের থলিটি খুলিয়াই গৃহিণী লম্ফঝম্ফ সুরু করিয়া দিলেন। ফর্দ্দ ছোটো করিয়া দিবার চিরকালের জমা অভিযোগ একত্র করিয়া মনের সুখে স্বামীকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে শশীকান্ত নীরবে সব হজম করিয়া গেলেন এবং পরমাশ্চর্য্যের বিষয় যে শশীকান্ত সাহু জীবনে প্রথমবার পুনরায় বাজারের থলিটি হাতে করিয়া ট্যাকে একখানি দশ টাকার নোট গুঁজিয়া গুট্ গুট্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বাড়িতে যেন আজ উৎসবের লগ্ন। বহুবিধ সুখাদ্যের গন্ধে বাতাস ভরপুর। ইহারই এক ফাঁকে শশীকান্ত গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন: শোনো আমি তাহলে এখনি বেরিয়ে যাই।

: সে কি? ভাত তৈরী—না খেয়ে বেরিয়ে যাই।

: না, না দেরী হলে যাবে। এই তো সময়, অনেকক্ষণ ধরে ওকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াও। পাঁচরকম রান্না করতে বললাম তো সেজন্যেই। আমি এদিকে চট্ করে খবরটা দিয়ে আসি—কতক্ষণ আর আগলাবো?

: এত তাড়াহুড়ো করবার কি দরকার? দু'তিনদিন যাক না, একটু পোষ মানুক—

: আহা-হা কি কথাই বললে! উপোষী ছারপোকা হয়ে আছে না খেয়ে খেয়ে, ঐ মোষের খোরাক জোগাতে গিয়ে শেষকালে ফেল মারবো? ছ্যা—আমারি পয়সায় ও যণ্ডা হবে তাহলে আর লাভটা কি হোলো?

: তা বটে। গৃহিণী আর আপত্তি করিলেন না।

সাড়ে বারোটায় শশীকান্ত বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু ফিরিতে তাঁহার বিকাল চারিটা বাজিয়া গেল। গৃহস্থালীর পাট চুকিয়া গিয়াছে। কর্ত্তার ঘর্ম্মপ্লাবিত দেহ, স্ফীতারক্ত চক্ষু ও হাপরের মতো হাঁপানী দেখিয়া গৃহিণী হাঁ হইয়া গেলেন।

: হোলো কি গো?

: হবে আবার কি! কাগজের অফিস থেকে যে ঠিকানাটা উদ্ধার করলুম সেটা কোলকাতার ঠিকানাই নয়। মফঃস্বলের। কি কাণ্ড করে যে গেলুম শেয়ালদা থেকে—উঃ মরে গেছি একেবারে। তা ছাই কোলকাতার ~~মানুষ~~ আমরা গ্রামে গিয়ে দিশে পাই না—কোথায় মাঠ ঘাট বনজঙ্গল ভেঙে ঠিকানা খোঁজা—ঠিক করতে পারলুম না কিছু—সকাল থেকে একটি দানা পেটে পড়েনি। ট্রেন ভাড়া এ-ও-তা একরাশ খরচের শ্রাদ্ধ কেবল, উপায় কি। কাল আবার ভোর থেকে লাগতে হবে কোমর বেঁধে। ছোঁড়াটা কোথায়?

: খাইয়ে দাইয়ে ঘুমোতে পাঠিয়েছি।

: চলো একবার দেখে আসি।

কিন্তু দেখিতে গিয়া জীবনকে দেখিতে পাইলেন না। শুধু যে জীবন নাই তাহা নহে, বন্ধকী সিন্দুক হইতে বহু মূল্যবান হীরক কণ্ঠাভরণটিও নাই। মাত্র গতকল্যই দালাল যেটি রাখিয়া পাঁচশত টাকা লইয়া গিয়াছে।

অভুক্ত স্বামীস্ত্রী পাশাপাশি বসিয়া পড়িয়া কেবল কিছুক্ষণ অন্তর নিজেদের গালে মুখে চড়াইতে লাগিলেন। এত বৃহৎ ঘুঘু শশীকান্তকে যথেষ্ট বকুনী দিবার উৎসাহও আর গৃহিণীর তহবিলে অবশিষ্ট ছিলো না।

জীবন তখন শশীকান্তের গৃহ হইতে মাইলখানেক দূরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র ভগ্ন গৃহের একতলার অন্ধকার ঘরে বসিয়া সহকারী মধুর সহিত হিসাবনিকাশ করিতেছে।

সমান সমান ভাগ হইয়াছে, কিন্তু মধু তথাপি খুঁত খুঁত করিতেছিল।

সামনে একখানি খবরের কাগজ মেলা—তাহার হারানো, প্রাপ্তি, নিরুদ্দেশ স্তম্ভে জীবনের একখানি বেশ বড়ো সুস্পষ্ট ছবি ছাপা। তাহার নীচে লেখা রহিয়াছে "নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান কেহ দিতে পারিলে দুহাজার টাকা পুরস্কার দিব।" ছবিটিতে আঙুল দেখাইয়া জীবন কহিল: বিজ্ঞাপনের খরচা, ছবি তোলাবার খরচা, ব্লক-চার্জ্জ সবই তো আমি দিলাম রে!

: কিন্তু বুদ্ধিটা কার মাথায় এলো সেটা বলো!

: তা বটে, কিন্তু আসল কাজটা হাসিল করলে কে শুনি?

: আর আমি যে বুড়োকে কাগজ গছালাম কি কায়দা করে? যে বুড়ো—কদিন থেকেই তো খোঁজ খবর নিচ্ছি, বাজে খরচ সিকি পয়সা করে না—কত কাণ্ড করে যে কত কাঠখড় পুড়িয়ে বিজ্ঞাপন আর ছবিটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয়েছে সে আমিই জানি বাবা—কাগজটার তো দামই দিলে না ছাই, দু দুআনা পয়সাই গচ্চা—

উভয়ে একযোগে হাসিয়া উঠিল।

ত্রয়ী

শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তী

মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে বাঙ্‌লা কাব্য-সাহিত্যের তিনজন প্রখ্যাত-নামা কবির মহাপ্রয়াণ ঘটলো। বাঙ্‌লা কাব্য-সাহিত্যের সংগে যাদের পরিচয় স্বল্প—তারাও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন তিনজন কবির আকস্মিক মৃত্যুতে। মৃত্যুর ভয়াল হাতছানি কেবলমাত্র দু'জনের বেলায়—জীবনানন্দ দাশের ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের। কিন্তু খ্যাতিমান কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকে প্রয়াণ করলেন পরিণত বয়সে। আধুনিকতার দিক থেকে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ বাঙ্‌লা সাহিত্যে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। তিরিশ শতকের মনোভংগীর সংগে আশ্চর্য রকম মিল পাওয়া গিয়েছিল যতীন্দ্রনাথের কবিতায়। দুঃখের মধ্যে কাব্যের যে কলা-বিলাস আছে সেই বিলাসে তিরিশ শতকের পাঠক-গোষ্ঠী মশগুল ছিল। তাই নৈরাশ্য ও হতাশার দিনে পাঠকগোষ্ঠী আবৃত্তি করত—"মরীচিকা" ও "মরুমায়া"। কৃষ্ণনগর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে চাকুরী করিবার সময় তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "মরীচিকা" প্রকাশিত হয়। একখানা ছোট কবিতার বইয়ের মাধ্যমেই যতীন্দ্রনাথ বিদগ্ধ জন মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিলেন। "মরীচিকা"র রচনা-কাল ১৩৩০ সাল। বাঙ্‌লার কাব্যক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন যূথভ্রষ্ট। তাঁহার স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ, অপূর্ব সুন্দর কাব্য-সৃষ্টি বাঙ্‌লা সাহিত্যকে সুন্দরতর ও সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিয়াছে এ সত্যটি আজ সর্বজনসমর্থিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পরিমণ্ডলে বসবাস করিয়াও তিনি কখনও পরানুকরণের অন্ধ মোহে মোহাবিষ্ট হন নি। ভাবধর্মী কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথের রচনা প্রজ্বলন্ত প্রতিবাদ। তাই তিনি তীব্র অভিযোগ আনিয়া ছিলেন প্রচলিত কাব্যরীতির বাঙ্ময় রূপায়নের বিরুদ্ধে। যতীন্দ্রনাথের পেসি-মিসিজ্‌ম্ দুঃখের নব-ভাগবদ্গীতা। বিশ্বস্রষ্টার জগৎ বিধানের মধ্যে তিনি দেখিয়াছিলেন একটা অসম্পূর্ণতা, ব্যর্থতা, নশ্বরতা ও নিষ্ঠুরতা; ভগবানের বিরুদ্ধে তাঁহার যে অভিযোগ তাহা "আর কিছু নয়,—যে পিপাসা দিয়াছে সে পানীয় দেয় নাই—বুকের ভিতর বসিয়া আছে, অথচ ধরা দিবে না! তাহারই দুঃখ মানুষকে অধীর করিয়া তোলে।" সুখের পিপাসা, পৃথিবীর প্রতি মানবীয় আসক্তি তাঁহার অধিক ছিল বলিয়াই তাঁহার দুঃখবোধের বেদনাও ছিল নিরসীম। "মরীচিকা", "মরু শিখা" ও "মরু মায়া"—যতীন্দ্রনাথের রচিত এই তিনটি কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই যতীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টির স্বরূপ লক্ষণটি অনেকটা আভাসিত হইয়া উঠে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটা নতুন দৃষ্টিভংগী যতীন্দ্রনাথের কবিতায় এক উচ্চ কবি-কল্পনায় মণ্ডিত হইয়া বাঙ্‌লা কাব্যের বৈচিত্র্য সাধনে সমর্থ হইয়াছে। তিরিশ শতকের কাব্যিক ভাবধারা একদিকে যেমন মোহিতলাল মজুমদারের ভাবঘন বলিষ্ঠতায় বিমোহিত, অন্যদিকে তেমনি যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের আত্যন্তিক দুর্গতিতে মর্মাহত। মোহিতলাল রচনা করিয়াছিলেন—

> "চাহিনা আনার যেন অভিমানে ক্রুর
> আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজ সুন্দরীর,
> চাহিনাক "কেউ" যেথা বিরহ বিধুর

জানকীর চির পাণ্ডু বদন রুচির।
একটুকু রসে ভরা চাহিনা আঙুর
সলজ্জ চুম্বন যেন নব-বধূটির,
চাহিনা "গন্না"র স্বাদ, কঠিনে মধুর
প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ় দম্পতির।"

আর যতীন্দ্রনাথ রচনা করিলেন—

"নিদ্রিতা জননী বক্ষে সুপ্তোত্থিত শিশু
খেলা করে ল'য়ে কণ্ঠহার
কোন মহাশিশু ক্রীড়াসুখে
তব বুকে
ঘুরাইছে জ্যোতির্মালা বিশ্ব শৃংখলার ?
অন্ধকার, মহা অন্ধকার !"

বিদ্যালয়ে ইংরাজী কাব্যের পাঠ নিতে গিয়ে যখন শোনা যায় যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স্ প্রকৃতির কবি, তখন সহজ বুদ্ধিতে সংশয়ের স্পর্শ লাগে। প্রকৃতির কবি কোন্ কবি নন্? অনেক কবির পক্ষে প্রকৃতি মানব জীবনের বহু অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপট ; অনেকের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিলাস, অনেকের পক্ষে প্রেমের উদ্দীপনা। জীবনানন্দ দাশ এক বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি। জীবনানন্দর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "ঝরা পালক" ১৩৩৪ সালে আত্মপ্রকাশ করেছিলো, জীবনানন্দর পরিচয় দিতে গিয়ে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত লিখছেন—"একজন যায়, আরেকজন আসে। যে যায় সেও নিশ্চয় কোথাও গিয়ে উপস্থিত হয়। আর যে আসে, সেও হয়তো কত অজানিত দেশ ঘুরে কত অপরিচয়ের আকাশ অতিক্রম করে একেবারে হৃদয়ের কাছটিতে এসে দাঁড়ায় ঃ

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধুসর জগতে।
সেথানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন—"

হঠাৎ "কল্লোলে" একটা কবিতা এসে পড়ল—'নীলিমা'। ঠিক এক টুকরো নীল আকাশের সারল্যের মত। মন অপরিমিত খুশি হয়ে উঠল। লেখক অচেনা, কিন্তু ঠিকানাটা কাছেই, বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট। বলা-কওয়া নেই, সটান একদিন গিয়ে দরজায় হানা দিলাম।

"এই জীবনানন্দ দাশগুপ্ত !"

বাঙ্‌লা কাব্য-সাহিত্যে জীবনানন্দ নতুন স্বাদ নিয়ে এসেছিলেন—এনেছিলেন নতুন সুর, নতুন মোহ, নতুন আবেগ, নতুন ব্যঞ্জনা, নতুন দ্যোতনা, নতুন মনন, নতুন চৈতন্য। সংগ্রাম-সংকুল সংসারের পরিবেষ্টনে জীবনানন্দ নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন নি। একটা অন্তরতম নীরবতা জীবনানন্দের কাব্যের মূল সুর। আর এই নীরব নির্জন পরিবেশই জীবনানন্দের কাব্যলোকের প্রকৃত প্রাকৃতিক আবেষ্টন। যেথানে অনাহত ধ্বনি ও অলিখিত রঙ্, জীবনানন্দের পথ-পরিক্রমা সেইখানে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব জীবনানন্দের রচনায় বিস্ময়কররূপে অনুপস্থিত। উনিশ শতকের ইংরিজি কাব্যস্রোতে অবগাহন করেছেন জীবনানন্দ। শেলী, কীট্‌স্, সুইনবর্ণ ও ডাব্লিউ-বি-ইয়েট্‌সের প্রভাব জীবনানন্দের কবিতায় প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। কিন্তু সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব অতিক্রম করে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি ও সৃষ্টি শক্তি প্রখর হয়ে উঠেছিল। ছন্দের তির্যক গতিতে, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় ও বিরতিতে জীবনানন্দের কাব্য প্রোজ্জ্বল। জীবন ভংগুর ও পরিবর্তমান, মৃত্যুতে সব জিনিসেরই পরিসমাপ্তি, এই ব্যথাহত বেদনা জীবনানন্দের কাব্যের মূল ভিত্তি।

"পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে ;—স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই !......
পৃথিবীর দিন আর রাতের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর,......
থাকিত না হৃদয়ের জরা......
সবাই স্বপ্নের হাতে দিত যদি ধরা !"......

ডাব্লিউ, বি, ইয়েট্‌স্‌ও রচনা করিয়াছিলেন—

"All would be well
Could we but give us wholly to the dreams
And get into their world that to the sense
In shadow, and not linger wretchedly
Among substantial things ; for it is dreams
That lift us to the following, changing world
That the heart long for."

জীবনানন্দ যে সত্যিই প্রকৃতির কবি, তা' তাঁর নিজস্ব লেখা চিঠি থেকেই উপলব্ধি করা যায়—

"আষাঢ় এসে ফিরে যাচ্ছে, কিন্তু বর্ষণের কোনো লক্ষণই দেখছিনে। মাঝে নিতান্ত "নীলোৎপলপত্র কান্তিভিঃ কচিৎ প্রভিন্নাঞ্জনরাশি মন্নিভৈঃ" মেঘ মালা দূর দিগন্ত ভরে ফেলে চোখের চাতককে দুর্দণ্ডের তৃপ্তি দিয়ে যাচ্ছে। তার পরই আবার আকাশের cerulean vacancy, ডাক-পাখীর চীৎকার, গাঙ-চিল-শালিকের পাখার ঝটপট. মৌমাছির গুঞ্জরণ—উদাস অলস নিরালা দুপুরটাকে আরও নিবিড়ভাবে জমিয়ে তুলছে।

চারিদিকে সবুজ বনশ্রী. মাথার উপরে শফেদা মেঘের সারি, বাজপাখীর চক্কর আর কান্না। মনে হচ্ছে যেন মরুভূমির সবজী-বাগের ভেতর বসে আছি, দূরে-দূরে তাতার দস্যুর হুল্লোড় ! আমার তুরাণী প্রিয়াকে কখন যে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি !......

জীবনানন্দের প্রথম বই "ঝরা পালক" থেকে সুরু করে "ধূসর পাণ্ডুলিপি", "মহা পৃথিবী", "সাতটি তারার তিমির" ও "বনলতা সেন" পর্যন্ত, জীবনানন্দের সবগুলি কবিতার বই পরের পর উল্টে গেলে, তাঁর কবি-চেতনার কৈশোর, যৌবন ও পূর্ণপরিণতি লক্ষ্য করা যায়। কবি জীবনানন্দ নিজেই স্বীকার করে গেছেন—"বেদান্তের দেশে জন্মেও কায়াকে ছায়া বলা তো দূরের কথা, ছায়ার ভেতরই আমি কায়াকে ফুটিয়ে তুলতে চাই।" কবি মৃত্যুর স্বরূপ নিজেই উপলব্ধি করে গেছেন—"স্পষ্ট হদিস পাচ্ছি আমার এই টিমটিমে কবি-জীবনটি দপ করেই নিভে যাবে; যাক্‌গে—আফশোস কিসের? আপনাদের নব-নব-সৃষ্টির রোশনায়ের ভেতর আলো খুঁজে পাবো তো—আপনাদের সংগে-সংগে চলবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হব না তো। সেই তো সমস্ত। আমার হাতে বাঁশী ভেঙে যাচ্ছে—গেছে, বন্ধুর মুখে তা অনাহত বেজে চলেছে—আমার মেহেরাবে বাতি নিবে গেল, বন্ধুর অনির্ব্বাণ প্রদীপে পথ বেয়ে চলুম—এর চেয়ে তৃপ্তির জিনিস আর কি থাকতে পারে।"

রবি-চক্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধানতম ছিলেন কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিপুরের কাব্য মন্ত্রে ইনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈরাগ্য-পিপাসী, ভক্তি বিহ্বল, মুক্তি-পাগল করুণানিধান নদীয়া জেলার শান্তিপুর শহরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কবি করুণানিধান যে শুধু রবীন্দ্রনাথের ভাব-সাধনায় পুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা নয়, বাংলা দেশের তদানীন্তন দুইজন বিশিষ্ট শক্তিমান কবির প্রভাব তাঁহার কাব্যে পরিলক্ষিত হয়—বিহারীলাল চক্রবর্তী ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভাবের রূপ-সাধনা কবির বাণী-বিলাসকে কম প্রভাবিত করে নাই। করুণানিধানের সমগ্র রচনায় একটি উৎকণ্ঠার সুর, আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও একটি বিষণ্ণ গাম্ভীর্য পরিব্যাপ্ত। মানুষের জীবনে নব-যৌবন স্বভাবতই বিদ্রোহের ঋতু। কিন্তু বিদ্রোহের সেই পরমক্ষণটিতে করুণানিধান শান্ত সমাহিত। গভীর উপলব্ধি ও নিঃশেষে আত্মনিবেদনের মধ্যেও যে বিদ্রোহ থাকতে পারে—তারই শান্ত স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় করুণানিধানের সমগ্র রচনায়। পরব্রহ্মের নিবিড় উপলব্ধির নিঃসীম আনন্দই ছিল তাঁহার প্রাণের আকুতি। চির নির্মল চির সুন্দর ভগবানের নিকট করুণানিধান বার বার প্রার্থনা করিয়াছিলেন—পরামুক্তির শাশ্বত আনন্দ। খ্যাতি-জ্যেষ্ঠ কবির কাব্যের মূল সুর হচ্ছে—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" কবি বার বার মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন—জাগতিক মায়া মোহের অন্ধ-কারাগারের অনর্গলিত দ্বার। সংস্কারের সংকীর্ণ সীমার বন্ধন ঘুচাইয়া কবি চাহিয়াছিলেন প্রিয় দেবতার পরম করুণাধারা। কবির কল্পিত "কল্পলতা" অমৃত নিস্যন্দী ও শাশ্বত কালের মৃত্যুঞ্জয়তা। "যেনাহংনামৃতা স্যাম তেনাহং কিং কুর্য্যাম্?" এই বাণীটির সহিত কবির "কল্পলতা"র বেশ মিল আছে। মানুষের মধ্যে দেবতাকে, ক্ষুদ্রের মধ্যে বিরাটকে করুণানিধান ভক্তি অর্ঘ্য দিয়াছেন, অন্তরের প্রেম নিবেদন করিয়াছেন। "Dark night of the soul" এই কথাই করুণানিধানের প্রাণের প্রকৃত পরিচয়। কবি রচনা করিয়াছিলেন—

"জনম-মরণ-বাসনার তীরে উতরিব নির্দ্বন্দ্ব
নিরঞ্জনের চরণে যাচিব মুক্তির চিরানন্দ।"

....

....

"এসগো পরম ভাগ্যবন্ত
ভক্তির রথে এস তুরন্ত
এস হেথা এই তীর্থ-রেণুতে মিশে যাও নিস্পন্দ।"

করুণানিধানের ভক্ত শিষ্য কবি-সমালোচক মোহিতলাল মন্তব্য করিয়াছিলেন—"করুণানিধানের মত সৌন্দর্য বিভোর, রূপরস পিপাসুর কাব্য-বীণায় একটা তার বড় বেসুরা বাজিয়াছে—একটা কাতর ভীতিবিহ্বল বৈরাগ্যের সুর অত্যন্ত অপ্রাসংগিক ভাবে কতকগুলি কবিতায় বার বার দেখা দিয়াছে।"

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাস ও করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথিবী থেকে চলে গেলেন। কালের গতিতে আরো কত বছর চলে যাবে, কিন্তু আর "ন ভুতো ন ভাবী"। দৃশ্য বা বিষয়ের পরিবর্তন হবে দিনে দিনে, কিন্তু যে যৌবন-দীপ্তিতে বাঙলা কাব্য-সাহিত্য একদিন আলোকিত হয়েছিল তার লয়-ক্ষয়-ব্যয় সেই—সত্যের মত তা সর্বাবস্থায়ই সত্য থাকবে। "একো দেবঃ সর্বভুতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।"

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

দুর্গম গিরি

ফটো :— দেবেন ব্রহ্ম

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

নদী ও নৌকা

ফটো :—অনিল বসু
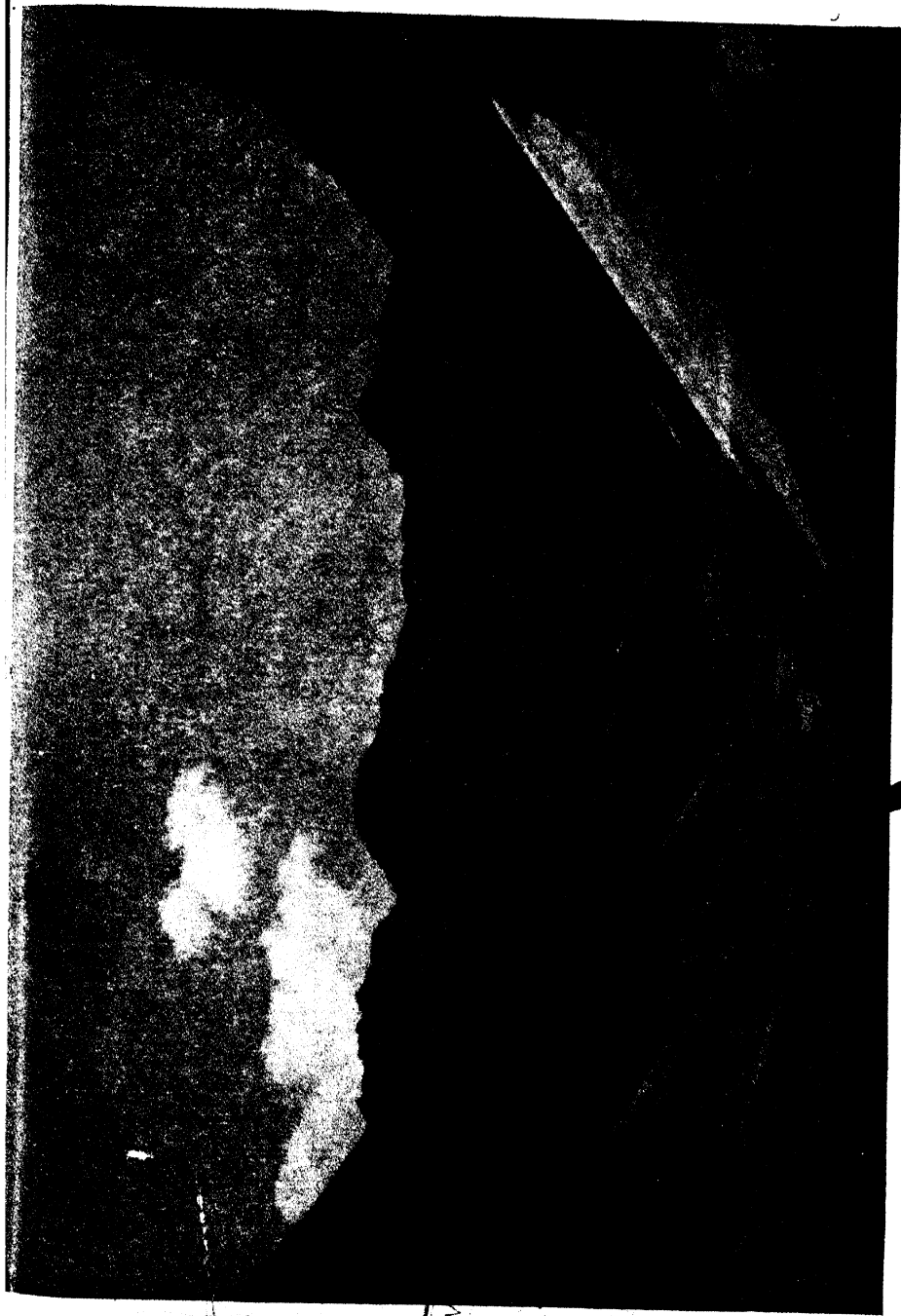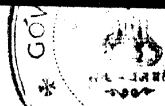
বাঘের লুকোচুরি

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলারাজ)

চাঁদা জেলায় মহার্লি স্থটিং ব্লক—মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণপ্রান্তে। গ্রীষ্মের দিনে, এ স্থানটি সব চাইতে বেশী গরম। এই সময় রুক্ষ, শুষ্ক জঙ্গলের তলদেশ সব ফাঁকা হয়ে ওঠে। কোনও কোনও স্থান নীরস তৃণগুল্মে সমাচ্ছন্ন। জানোয়ার গুলোও হয়ত বনান্তরে বা শৈলাবাসে চলে যায়। জঙ্গল তখন নিঝুম—জনমানবসমাগমহীন—যে ক'টি পশু অবশিষ্ট থাকে, তারা মনের সুখেই হোক্ বা দুঃখেই হোক, যদৃচ্ছা বিচরণ করে। এমন কি, ডাকবাংলোর বারান্দায় তারা বেশ আরাম করে শুয়ে থাকে—মানুষের না হয়ে তখন সেটা পশুরই বিশ্রামাগার হয়ে ওঠে। লোক জনের বালাই নেই—বাধা দেবে কে? সে সময় জঙ্গলরক্ষী বা বাংলোর বেয়ারাও নিজেদের ছুটী নিজেরাই মঞ্জুর করে আপন আপন বাড়ী চলে যায়। বর্ষায় জঙ্গল যেমন দুরধিগম্য হয়ে পড়ে তেমনি আবার পোকা মাকড়, মশার অত্যাচারও দারুণ বেড়ে ওঠে। বর্ষান্তে জঙ্গল বেশ ঘন সবুজ, সতেজ হ'লেই সেই গৃহত্যাগী জানোয়ারগুলো ফিরে এসে আবার নূতন করে আসর জমায়।

আশ্বিন মাস—পুজোর ছুটিতে লোকের আনাগোনা সুরু হয়। বর্ষায় যে সব রাস্তা ধুয়ে যায়, মাটী ফেলে সেগুলো আবার নূতন করে তৈরী করে। শীতের আগেই জঙ্গলের কাঠ ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যাদির সংগ্রহ কার্য্য চল্‌তে থাকে। বড়দিনে সাহেব সুবোরাও শিকারে আসে।

আমি যে সময়ের কথা বলছি—সেটা পূজোর ছুটি। তখনও রাস্তাঘাটগুলো তেমন মেরামত হয়নি। আমারই এক পরিচিত বন্ধুর পত্র নিয়ে Divisional Forest Officer এর সঙ্গে দেখা করলাম। North Chandaয় শিকারের অনুমতিপত্র পাওয়া গেল। তবে একথাও বন বিভাগের রাজকর্ম্মচারী গোঁফে চাড়া দিয়ে বক্রদৃষ্টিতে বল্লেন—

—এটা তো শিকারের সময় নয়—এবার যে flowering of the bamboo হয়েছে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর দিকে চাইতেই তিনি আর একবার Cosmetic দেওয়া চু চ্‌লো মোচের ডগাটি পাকিয়ে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন—

—ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাঁশের ফুল হয়ে বীজ হয়—আর সব পুরণো ঝাড় মরে যায়। নতুন বাঁশ গাছের কঞ্চিগুলো এমন ঘন যে আপনার দু'হাত দূরে কোন জানোয়ার থাকলেও কিছু দেখতে পাবেন না—আর ঢোকাও অসম্ভব। পাশ দিলাম বটে—দেখুন চেষ্টা করে, কী হয়!

যা হোক আমরা ডাক বাংলোয় গিয়ে উঠ্‌লাম—সঙ্গে কিছুদিনের খাদ্য সরঞ্জাম চাকর বামুন, জঙ্গলের পথ-প্রদর্শক ঝানু গোণ্ড—তার দল বল নিয়ে, সংখ্যায় ছ'সাতজন এরা বায়েগা জাতির ভায়রা ভাই। অন্য শিকার কাহিনীতে ওদের কথা বলেছি।

আর আছে আমার এক বন্ধু "টকি"—। এরা দুই ভাই—ডাক নাম "হকি" আর "টকি"। পিতৃদত্ত নামের গুণ আছে। জ্যেষ্ঠ—'হকি'—সব খেলাতেই ওস্তাদ, বিশেষ করে হকিতে, আর কনিষ্ঠ "টকি" খুব কথা বলেন, আর বহুবিধ ছন্দে হাস্য পরিহাস করে থাকেন—হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ, হু, হুর বিকট শব্দে সামনের মানুষ আঁৎকে ওঠে। ইনি আবার সিনেমায় ঢোকবার চেষ্টাতেও আছেন। লম্বা, ছিপ্ ছিপে গড়ন—বেশ ফুট্ ফুটে চেহারা!

মহার্লি থেকে তারোবা—একটি মাত্র রাস্তা—অন্য কোনও পথ নেই। আর সবই ঘন জঙ্গল। তারোবায় একটি হ্রদ আছে—মনোরম দৃশ্য—যেন কোন নাম না জানা কবির স্বপ্ন। আর আছে তেলিনালা, প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও ঐ একটিমাত্র স্থানেই জল থাকে। বাংলো থেকে সওয়া মাইল দূরে। এই স্থানেরই ঘটনা।

ঝানু দূরের গ্রাম থেকে বহুকষ্টে তিনটে মহিষের বাচ্চা সংগ্রহ করে এনেছিল—ইচ্ছেমত সেখানে বেট পাওয়া যায় না। বাঘকে টোপ দেখানোর জন্যে এখানে সেখানে জায়গামত সেই বেটগুলো বেঁধে রেখে দেয়। পাঁচ ছ'দিন ধরে আমরা কেবল ঘোরাঘুরি করি, আর অতি প্রত্যূষেই বেট "Kill" হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে বেরিয়ে পড়ি। রোজ সন্ধ্যায় বেট বাঁধা, আর ভোরে সেগুলো ডাকবাংলোয় ফিরিয়ে আনা এই চল্‌তে থাকে—কারো মোলাকাৎ নেই। ভাবলাম পরমশাক্ত ব্যাঘ্র মহোদয়গণ বোষ্টম হয়ে পড়ল না কি?—না আমাদের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন সুরু করে দিলে। আরও কয়েক দিন কেটে গেল—একদিন দেখলাম একটা বেট Kill হয়েছে, আর দুটো অক্ষত। তাদের ডাকবাংলোয় ফিরিয়ে আনা হোল। ঝানুকে মারির কাছাকাছি মাচান বাঁধবার নির্দ্দেশ দিলাম।

সন্ধ্যায় মঞ্চারোহণের পূর্ব্বেই হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। মাচানে উঠে বেশ শক্ত হয়ে বস্‌লাম। গাছের ডালপালা বেয়ে তখনও জল গড়িয়ে পড়ার বিরাম নেই—পাতার ওপরেও সেই একটানা শব্দ টপ্ টপ্ টপ্। মৃদু বাতাসের কম্পনে শাখাপ্রশাখা এক একবার এক একটু নড়ে ওঠে—জলের একঘেয়ে শব্দ যেন ভেঙ্গে যায়। দু একটি করে গাছের পাতা ঝরে পড়ে। সেই আদিহীন, অন্তহীন, বৈচিত্র্যহীন টপ্ টপ্ শব্দটাই কান পেতে শুনছিলাম।

অনতিবিলম্বে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম, ঈশান, নৈঋত, অগ্নিবায়ু, উর্দ্ধ, অধঃ—দশদিক দিয়ে মশক কুলের মিলিত সাঁড়াশী আক্রমণ। অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌লাম—কী বিপদেই পড়া গেল। একে তো শিকার পাওয়া যাচ্ছে না—উপরন্তু এনোফেলিসের গুষ্টি যদি হয়, লভ্যাংশের কোঠায় অধিকন্তু আবার ম্যালেরিয়ার বীজাণু বহন করে বাড়ী ফিরতে

হবে। তবুও অহিংসা পরমোধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চলেছি। এ যেন সেই নিরীহ গরীব মানুষকে পয়সার বিনিময়ে দড়ির খাটিয়ায় শুইয়ে রেখে ছারপোকা দিয়ে রক্ত খাওয়ানোর মত পুণ্য সঞ্চয় করা। ওদিকে ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীবের ওপর যে হিংসা করা হয় সেটা কারো খেয়াল নেই।

আমিও এক হিসেবে পুণ্যকামী। মশক কুলের ধারাবাহিক দংশনে সহ্যের সীমা অতিক্রম কল্লেও নির্বিকার—দিব্যিরক্ত খাইয়ে চলেছি—তবে কিনা আর একটি সবল হিংসার নির্ব্বাণকল্পে উপায়ান্তর নেই বলেই আমার এই অতি সহনশীল পুরুষ হয়ে বসে থাকা। হাতপা নাড়া চাড়ার যো নেই—কী জানি যদি বাঘ টের পেয়ে যায়—মশক নিধনেরও উপায় নেই—কী জানি যদি শব্দ হয়। আমি ভাল করেই জানি, বাঘ যখন একবার Kill ক'রে তাজারক্ত খেয়ে চলে যান—তখন সন্ধ্যার পর তিনি যখনই হোক না কেন ডিনার খেতে ফিরে আসেন। শুভাগমনের আশা-পথ চেয়ে বসে আছি; নিঝুম নিশুতি রাত—সমস্ত পৃথিবী নিবিড় তন্দ্রাচ্ছন্ন—শুধু জেগে আছে উর্দ্ধে ঐ আকাশের তারা আর নিম্নে এই অরণ্যের স্বপ্নছাওয়া রহস্যের মায়াপুরীতে ক্লান্ত, অবসন্ন, এক দুর্জ্জয় শিকারী।

রাত ভোর হয়ে গেল, তবুও মহারাজের টিকি দেখতে পাওয়া গেল না তো!

বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে, সকালে মাচান থেকে নেমে, ডাকবাংলোয় ফিরে আসার পথে চিন্তা করি—বাঘ Kill করা সত্ত্বেও সেখানে ফিরে এলো না—এটাও ত' এক অভিনব অভিজ্ঞতা! কি জানি যদি আবার লাঞ্চ খেতে আসেন, তাই বেলা একটায় গিয়ে দেখি তিনি তৎপূর্ব্বেই আহারাদি সমাধা করে চলে গিয়েছেন। এ জঙ্গলের বাঘ বেশ চালাক চতুর দেখছি—ধরা ছোঁয়া দেয় না। নিশ্চিন্ত হয়ে ডাকবাংলোয় ফিরে এলাম—রাত্রি জাগরণ-ক্লিষ্ট চোখ দুটি ঘুমে জড়িয়ে এল।

দিন তিনেক পরে—দুটো বেটের মধ্যে একটা Kill হয়েছে দেখে এলাম। হারাধনের দশটি ছেলের মত আমারও তিনটি বেটের মধ্যে দু'টি গেল—রইল বাকী এক। তাই কৃপণের ধনের মত সেটিকে ডাকবাংলোয় গচ্ছিত রেখে দু নম্বর মাচানের অনুরূপ ব্যবস্থা করা গেল। সন্ধ্যার সময় গিয়ে দেখি মারিটাকে শকুনি গৃধিনী এমন ভাবে খেয়েছে যে আর চেনাই যায় না—শুধু হাড় গোড় পড়ে আছে। গৃধ্র যতই উর্দ্ধে উঠুক না কেন—তার নজর কিন্তু ঐ ভাগাড়ে—তাই কোনো বাঘ জীব জানোয়ারকে মেরে জঙ্গলের মধ্যে খুব সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখলেও তাদের শ্যেন্ দৃষ্টিকে এড়ানো কঠিন।

একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ঐ জঙ্গলে জমা রেখে স্বস্থানে ফিরে এলাম। আজ সুনিদ্রার ব্যাঘাত হবে না জেনেও নিশ্চিন্ত হইনি। দারুণ অস্বস্তি—এত চেষ্টা করেও শিকার না পাওয়ার একটা জমাট ব্যথা যেন বুকে চেপে আছে। "টকি" এটা সেটার গল্প জুড়ে তার চিরন্তন হাসির তুফানে আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চায়—কিন্তু সান্ত্বনার ঘুষে মন মানবে কেন?

পরদিন বৈকালে তেলিনালায় একটা মাফিক-সই জায়গা খুঁজে নিয়ে আমাদের ঝানু মাচান তৈরী করে রাখলে। অদূরেই সবে ধন নীলমণি সেই ছোট্ট মোষের বাচ্চাটি বাঁধা গেল।

পরের দিন আমি, ঝানু ঐ বেটের কাছে এসে দেখি তিনি অক্ষত অবস্থায় বিরাজ করছেন। কিন্তু তার চোখে যে কী একটা ভীতি-বিহ্বলতা—থেকে থেকে সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে—একটা অস্বাভাবিক ভাব—চারিদিকে ছটফট্ করে ঘুরে ফিরে কী যেন দেখতে চায়! এ রকমটি দেখা যায় না—ওরা খুব নিরীহ জাত—চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে—কোনও সাড়াশব্দ দেয় না। কাছে গিয়ে দেখি—দশ বারো হাত দূরে সদ্য-চলে-যাওয়া চিতে বাঘের পাঞ্জা! বেটের এতো কাছে পায়ের ছাপ—অথচ Kill করেনি এটাই বা কী রকম কথা—মহা দুর্ভাবনায় পড়ে গেলাম। কাঁচা রাস্তার দু ধারেই দুর্ভেদ্য জঙ্গল—আশে পাশে কিছুই দেখার উপায় নেই। পাশের তৃণগুল্মের দিকে নজর পড়তেই বুঝলাম, এই মাত্র সেটা যে এখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে তাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই—কারণ ঘাসগুলো টাট্‌কা পায়ের চাপে শুয়ে গিয়েছিল—এখন সবে মাথা তুলে ধীরে ধীরে উঠ্‌বার চেষ্টায় আছে। আমাদের সাড়া পেয়েই বাঘ এক্ষুণি কাছে ভিতে কোথাও সরে গেলো। তার পরেও হনুমানের খক্ খক্ শব্দে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হ'ল। জোরে কথা বল্‌তে বল্‌তে আমি আর ঝানু দুজনে এগিয়ে গেলাম। সামনে তেলিনালার প্রায় একশ ফুট ঢালু পথ—দেখ্‌লাম আমাদের "টকি" ধব্‌ধবে পাঞ্জাবী গায়ে ফুল-কাটা কোঁচা দুলিয়ে ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে ঐদিক থেকেই আসছেন—পায়ে টিকি উল্‌টানো নাগরাই জুতো—যেন ঝক্‌ঝকে নব কার্ত্তিক আর কি—এই মাত্র ময়ূরটি কোন্ মধুবনে ছেড়ে দিয়ে এলেন। তিনি কখনো শিকার করেন নি বটে, কিন্তু অসীম সাহসী—তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি চীৎকার করে বল্‌লাম—ওহে, খুব কাছেই কোথাও বাঘ আছে—হুঁসিয়ার!

মানুষের সাড়া পেলে বাঘ সেদিকে বড় আস্‌তে চায় না, তাই আমাদের কথোপকথন সচীৎকারেই চল্‌তে থাকে।

সেও দূর থেকে চেঁচিয়ে বলে—

—ছড়ি নিয়ে আর হুঁসিয়ার হব কী ছাই? আসবার পথে আমিও একটা কিছুর চলে যাওয়ার শব্দ পেয়েছি।

—শীগ্‌গীর আমার কাছে চলে এসো।

"টকি" আপন মনেই আবোল-তাবোল অসম্বন্ধ কতকগুলি কথা বানিয়ে বলতে বলতে আমার কাছে এগিয়ে আসে। বলাই বাহুল্য ফাঁকে ফাঁকে স্বভাবসিদ্ধ দমকা হাসির এটম্ বম্ব।

আমরা তিন জনে ফিরে আসবার পথে বেটের কাছে দাঁড়িয়ে দেখি—এগিয়ে যাবার সময় কাঁচা রাস্তায় আমাদের যে জুতোর দাগ পড়েছিল—তার ওপরেই চিতে বাঘের পদ-নখ চিহ্ন। উত্তেজিত হলে বা শিকার ধরবার সময় স্বভাবতঃই তাদের নখ বেরিয়ে পড়ে যেমন সচরাচর বিড়ালদের দেখা যায়। আশ্চর্য্য এই বাঘের অশরীরী লীলা-খেলা—

বেটের আশে পাশেই আছে অথচ দেখা যায় না। কী রকম বেয়াড়া বাঘ রে বাবা! এরাও কী সহরের ছোঁয়া লেগে ধর্ম্মবটী হয়ে পড়েছে? ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার পর আর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে কিছুটা বিরক্ত হয়েই আমরা বেট খুলে নিয়ে বাংলোয় ফিরে গেলাম। হঠাৎ ঝামু চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—

—দেখুন, দেখুন, মোষের গলায় রক্তের দাগ!

ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা যখন খুব ভোরে বেট দেখতে আসি, ঠিক সেই সময় বাঘ ঝাঁপিয়ে তার গলায় আঁচড় বসিয়েছে, ঘাড় মটকাতে পারে নি—এদিকে আমরা বাঘকে দেখতে পাই নি—অথচ সে আমাদের আসাটা টের পেয়েই সটকান দিয়েছে।

কী জানি কেন একটা ধারণা হ'ল—আজ এ বাঘ শিকার হবেই। শেষ সম্বল এই বেটেরও যা অবস্থা—দু এক দিনের বেশী আর টিক্‌বে না। খাওয়া দাওয়া শেষ করেই বেলা দুটোয় আমরা বেট নিয়ে মাচানের কাছে যাই। সাধারণতঃ Kill হবার পরেই শিকারী মাচানে বসে। দু' দুবার ঠকে, এবার উল্টো পথ নিলাম। বেচারী আহত মোষটাকে বেঁধে আমি আর ঝামু দুজনেই মাচানে উঠে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে বস্‌লাম।

আমাদের ঝামু জঙ্গলের পাকা ঝামু—কথায় কাজে চাল-চলনে কম যায় না। এবার তার দলবল নিয়ে বারো ফুট উঁচু সেই মাচানকে ডালপালা দিয়ে এমন ঘিরে ফেলেছে, বাইরে থেকে চেনাই যায় না। যেন একটা বড় ঝোপের সামিল।

বেলা তিনটে, চারটে, পাঁচটা বেজে গেল—সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তবুও প্রভুর দেখা নেই। মাচানে বসেই গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে নিলাম। উপনয়নের পর থেকে আমার ত্রিসন্ধ্যা কোনও দিন বাদ পড়ে নি—অবশ্য অসুখ-বিসুখ ছাড়া। শিকারে এলেও দৈনন্দিন পুজো মনে মনেই সেরে নিয়েছি।

মণিবন্ধের রেডিয়াম ঘড়িতে দেখলাম—ন'টাও বেজে গেল। "আর কত কাল রইব বসে?" এ রকম আগ্রহ নিয়ে ডাকলে ভগবানও বুঝি সাক্ষাৎ সশরীরে দেখা দিতেন। কিন্তু কৈ ব্যাঘ্র-দেবতার তো কৃপা হয় না।

মনের চাঞ্চল্য ক্রমেই বেড়ে যায়। আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব-কাতর আমি বিরক্তিকর মুহূর্ত্তগুলি কাটিয়ে চলেছি। হঠাৎ দেখলাম বেটটা ধপ্ করে বসে পড়্‌ল। বুঝলাম আর আশা নেই—নিশ্চিন্ত না হলে কোনো জানোয়ার এভাবে বসে পড়ে না। এবার সত্যি হতাশ হয়ে পড়লাম।

যাঁহা মুস্কিল তাঁহা আসান।

আরো কিছুটা পরে লতাপাতার উপরে বালি ছড়িয়ে দিলে যেমন সর্ সর্ শব্দ হয় ঠিক তেমনি একটা আওয়াজ কানে এল। তখুনি বুঝলাম কোন জানোয়ার ছুটে আসছে বলেই ধূলো মাটি সব আশে-পাশের লতা পাতায় পড়ে ঐ রকমের শব্দটা হচ্ছে, তার পরেই বেটের কাছে কী একটা চোরের মত এসেই চুপ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি আমার রাইফেলে ফিট্ করা টর্চ্চ জ্বেলেই দেখি কোথাও কিচ্ছু নেই—বেট মরে পড়ে আছে। প্রমাদ গণলাম। ভৌতিক কাণ্ড না কি—বাঘ গেল কোথায়?

চারদিকের ঘেরাও অন্ধকার ভেদ করে আমারও টর্চ্চের আলো এধার ওধার মুহুর্মুহুঃ ছল্‌কে পড়ে। প্রায় দশ বারো হাত দূরে ফোকাস্ করতেই দেখি—একটা মস্ত বড় Royal Tiger. সেই শক্তির অবতার, চোখ দু'টিতে আগুন নিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। যেন স্থির বিদ্যুৎ। কী দৃপ্ত সেই গ্রীবা ভঙ্গিমা—সামনে ও পেছনের থাবা যথা-সম্ভব প্রসারিত। এক একটি শক্ত পা যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠিন স্তম্ভ। সমস্ত অঙ্গ ঘিরে মৃত্যুর আহ্বান।

একটা এস্‌পার ওস্‌পার হ'য়ে যাক্!

ট্রিগার টিপ্‌লাম। বাঘ অদৃশ্য।

বন্দুকের ধাক্কায় টর্চ্চটাও তখুনি নিভে গেল—আবার জ্বালিয়ে কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না। ঝামুর হাতেও একটা টর্চ্চ ছিল। সেও চারদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নেয়। হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠ্‌ল—

—শের খতম্।

কোন কিছুই হাঁকডাক নেই—বাঘটা পড়্‌ল আর মর্‌ল—এ কী ব্যাপার! সুনিশ্চিত হবার জন্যে নিয়মানুযায়ী আর এক রাউণ্ড চালিয়ে দেখি—বাঘের দেহে সেই বিদ্যুৎ তরঙ্গ আর নেই—গুলীর আঘাতে একবার নড়ে উঠেই থেমে গেল।

ওয়া গুরুজীকী ফতে। নিশ্চিন্ত হয়ে মাচান থেকে নেমে দেখলাম—যতগুলো বাঘ মেরেছি—সব চাইতে এইটি বড়। পদাঙ্ক দেখে আশা ছিল ফোঁটাকাটা চিতা বাঘের—তার বদলে পেলাম কী না একটা ডোরাকাটা জাঁদরেল শেলো বাঘ! তবে কী বড় ভাই এসে পড়ায়, বেটের ওপর দাবী দাওয়া ছেড়ে দিয়ে ছোট ভাই চম্পট দিলে। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—তার পরেও ইনি কিনা বৈমাত্রেয়। আবার Right of Primogeniture মেনেও চলা চাই। তাই বুঝি সচরাচর একই বনে চিতে বাঘ ও রয়েল টাইগার এক সঙ্গে বড় দেখা যায় না।

ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দ্দার টকিবাবু, আমাদের অজ্ঞাতসারে কখন যে অদূরে একটি বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট ছিলেন, জানতে পারিনি—হঠাৎ পিঠে হাত পড়তেই চমকে উঠি। তাঁর বিচিত্র রঙ বেরঙের হাসির তোড়ে তখন আমিও ডুবে গেলাম। তিনি পকেট থেকে ফিতে বের করেই বল্‌লেন—

—দেখ, আজ যে বনের এই দুষমনটা মারা পড়্‌বে, আগেই জানতাম, তাই এটা সঙ্গে এনেছি!

—তুমি কী না জান্‌তে—? এখন মেপেই দেখনা—ক' ফুট!

বন্দুকটা বগলে চেপে দুহাতে দুটো টর্চ্চ জ্বালিয়ে ধরে রাখি—ওরা দুজনে ঝুঁকে পড়ে অনন্ত শয্যায় শায়িত সেই মহাবীরকে তিন তিনবার মেপে দেখলে—দশফুট পৌনে ছ' ইঞ্চি—বুঝলাম অনেক শিকারীর হাত এড়িয়ে ইনি এতটা বড় হয়েছেন। ওদিকে টকিবাবুর টক্‌টকে কথা যেন আর থামতে চায় না—সাধুভাষায় বলে যান—

—এই শার্দ্দূল শিকারে মশক দংশনের অত্যাচার সহ্য করেও বহু রকমের সংযম দেখিয়েছো—উপবাস করেছো—চার প্রহর রাত্রি জাগরণও হয়েছে—আজ পারণও হয়ে গেল—এতেও যদি চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ না হয়—তবে আর কিসে হবে? তোমায় আজ খেতাব দিলাম—Giant killer—এখন থেকে ঐ নামেই ডাক্‌ব।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ হলে কার না আনন্দ হয়—বিশেষতঃ বহু প্রতীক্ষার পর আজকের মত এত বড় একটা শিকার! ঝামুকে জাপটে ধরে তার দুর্গন্ধপূর্ণ খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখে চুমু দিলাম। টকির গালের কাছে মুখ আনতেই সে দশহাত পিছিয়ে করযোড়ে হুমকী দেখায়—

—ভাল হবে না বল্‌ছি—ওই উচ্ছিষ্ট মুখে আর আমায় চুমু খেয়ে কাজ নেই। তার পরেই টকির চিরাভ্যস্ত পিলে চমকানো হাসিতে নির্জ্জন বনভূমি কম্পমান।

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৫)
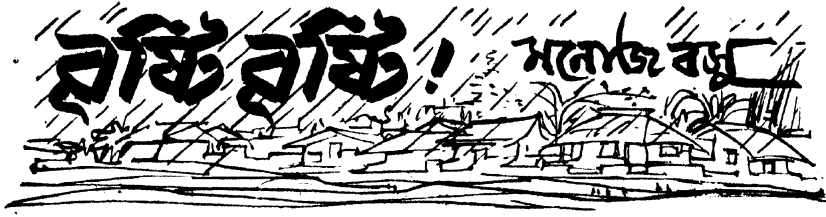
বৃষ্টি, বৃষ্টি—কী বৃষ্টিটা হল তার পরে ! শ্যামবাজার এই অবস্থায় কি করে যাওয়া যায় ! মোটর আছে, কিন্তু কালীতলায় এত জল বেধেছে যে মোটরে হবে না, নৌকোর দরকার। বাইরে থাক সুনন্দা, শহর কলকাতার গতিক তো জানো না ! ঐ জল মরতে এখন রাত দুপুর। টেবিল সাজিয়ে থাকো বসে ততক্ষণ। গিয়ে কি বলবে ? অন্যত্র এক নিমন্ত্রণ ছিল—সেই যে মেয়েটাকে দেখেছিলে সেদিন আমাদের বাড়ি। তাই দেরি হয়ে গেল। বলে ফেলে বেধে যাক আবার এক দফা কুরুক্ষেত্র সেখানে। মেয়ে মাত্রেই বিষম ঝগড়াটে, পুরুষের মতন ভালমানুষ নয়। তার চেয়ে এক ফোন করে দাও, উঃ সুনন্দা, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, নাড়িতে জ্বর দেখা দিয়েছে, যেতে না পেরে কী যে হচ্ছে মনের মধ্যে !

যাওয়াই যখন হচ্ছে না, মোটর ঘুরিয়ে এই পাড়াটা চক্কোর দিয়ে যাওয়া যাক। ফোন করে দেবে কোন এক দোকান থেকে, আর 'ভারতে ইংরাজ' একটা কিনে নেবে। রাত্রিবেলা বইটা পড়ে নিয়ে, কাল সকালেই বিশ্বেশ্বরের বাড়ি হুঙ্কার দিয়ে পড়বে—খুব যে বলা হচ্ছিল, বই মোটে চোখেই দেখি নি—চোখের জল ফেলা হয়েছিল। একজামিন করা হোক এবারে। জিতে গেলে যে-মুখে গালমন্দ হয়েছিল সেই মুখ টিপে টিপে হাসতে হবে কিন্তু। আমার নুন-চা খাওয়ার পরে যেমন ধারা হয়েছিল।

ও হরি, বইয়ের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। পাল্লা দিয়ে সবাই শত্রুতা করছে। লাট সাহেবের নাতিপুতিরা কি না—আটটা বাজতে না বাজতে দোকানে তালা এঁটে বইওয়ালারা সরে পড়ে ! ব্যবসার গতিক কারো কাছে অজানা নেই। সারাদিন কাউন্টারে বসে অপলক চোখে পথচারীদের দিকে তাকিয়ে থাকা—নিতান্ত বোকাশোকা ও বাতিকগ্রস্ত ভিন্ন ফুটপাথ ছেড়ে কেউ ঘরে ঢোকে না। ভিড় জমে বটে দোকানের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে তার পরে। ছুঁচো, ইঁদুর ও আরশুলার মহামহোৎসব। ওরা আছে, বই তাই তো কিছু কাটে। শুধু খদ্দেরের ভরসায় থাকলে এক এডিসন কাবার হতে জন্মজন্মান্তর লেগে যেতো।

যাকগে; যাকগে। একটা দিনে কি আর হবে ! আজ হল, কাল। বাবুরা বুঝি আবার দশটার আগে দোকান খোলেন না। তাই হবে, আসা যাবে ঠিক দশটায়। আজকের পুরো একটা রাত্রি না-হক গেল।

পরের দিনও ঘুরে ঘুরে হয়রান। 'ভারতে ইংরাজ' শুনে দোকানদাররা হাঁ করে তাকায়। অকূল সমুদ্রে ভাসমান—এমনি গোছের মুখভাব।

কি মশায়, বইটা চোখেও বোধ হয় দেখেন নি ? ইরার ভর্ৎসনাটা অন্যকে ছুঁড়ে মেরে বেশ খানিকটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। দেখ তবে, আমি একজন শুধু নই—ঢের ঢের আছি আমরা এক দলে।

বলে, বই না দেখুন, সকালের খবরের কাগজটাও কি দেখেন নি ? লেখক মশায়ের যে বিরাট সম্বর্ধনা হয়ে গেল !

দোকানদার নিরুৎসুক কণ্ঠে বলে, ও তো হচ্ছেই মশায় আজকাল। লেখক মাত্রেই তালেবর; আর যে বই বেরোচ্ছে, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর তিনকালের মধ্যে নাকি অমনটি আর হয় নি। তা খদ্দেরও আবার তেমনি ঘড়েল হয়েছে। সহজে নড়াচড়া করে না। বলে বিজ্ঞাপনের ডামাডোল থামুক তো আগে, চতুর্দিক থিতিয়ে আসুক—তারপরে দেখা যাবে।

দশ-বারোটা দোকান ঘোরবার পর একজনের কাছে হদিস পাওয়া গেল।

বাজার ঢুঁড়েও পাবেন না, কেউ রাখে না ও-জিনিস। 'যুগচক্র' ছেপেছে, গলার কাঁটা নামাবার জন্য আঁকুপাকু

করছে এখন। সেখানে চলে যান—একখানা চাইলে তিনখানা চাপাবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু 'যুগচক্রে' যাওয়া যায় কেমন করে—ইলেকসনের মরশুমে যেখানে একদিন দলবল সহ গিয়ে কৃতান্তকে যাচ্ছে-তাই করে বলে এসেছিল। 'ভারতে ইংরাজ'এর খাতিরেও যাওয়া চলে না সেখানে।

আপনারা এক কপি দয়া করে আনিয়ে দিন। বিকেলে আসব।

বেশ, দেবো তাই। বিকেল-টিকেল নয়—'যুগচক্র' কি এখানে? কাল সন্ধ্যেবেলা।

আরো দুটো দিন বরবাদ। দুই আর একে তিন—তিন-তিনটে দিন মেয়েটার কাছে দোষী হয়ে রইল। কিন্তু তড়িঘড়ি তার আগে দিচ্ছে এনে কে? ঘাড় নেড়ে অতএব সায় দিতে হয়।

দোকানদার আগের কথার জের ধরে বলে, ব্যবসা করতে বসেছি। খদ্দেরে চাইলে—'যুগচক্র' কোন ছার, সুন্দরবনে গিয়ে বাঘের দুধ দুয়ে ঘটিতে করে এনে দেব। কিন্তু পুরো দামটা অগ্রিম চুকিয়ে দিতে হবে মশাই। কিছু মনে করবেন না—বিতিকিচ্ছি বই বলেই। কালকেতু-রোমাঞ্চ হলে কি আর চাইতে যেতাম? অর্ডার দিয়ে তারপরে ধরুন আপনি আসতে ভুলে গেলেন। তখন তো ঠোঙাওয়ালা ছাড়া বই কাটাবার অন্য গতিক নেই।

অরুণাক্ষ বলে, আমি কিছু মনে করছি নে। দয়া করে আনিয়ে দিচ্ছেন—দাম কত বলে দিন, পুরো টাকাই জমা দিচ্ছি।

দোকানদার মুখ চাওয়াচায়ি করে। নিজে দাম জানে না, কর্মচারীরাও নয়। দুনিয়ায় কত রকম খেয়ালের মানুষ আছে—বই লেখায় যখন ট্যাক্সো নেই, লিখে গেলেই হল। সব মালের দাম মুখস্থ রাখতে গেলে তো জীবন থাকে না। আপনি জানেন না? কি রকম মোটা হবে বইটা—ওজন কত, দেড় পোয়া—আধসের? নেড়ে চেড়ে দেখেন নি?

আন্দাজ মতো দশটা টাকা জমা দিয়ে রশিদ নিয়ে অরুণ বাড়ি চলে গেল। তারপরেও কি কম নাজেহাল! আজকে মশায় ভুল হয়ে গেছে। 'যুগচক্র' কি এখানে? একখানা বইয়ের জন্য কে যায় অদ্দর ট্রাম ভাড়া করে? কতই আর কমিশন পাবো—পড়তায় পোষাবে না। আরও দু-চারখানার অর্ডার জমুক না!

অরুণাক্ষ বলে, গাড়িভাড়াও ধরে নেবেন বইয়ের দামের উপর।

জিভ কেটে দোকানদার বলে, সে কি চলে মশায়? ফার্মের বদনাম হয়ে যাবে। এত জরুরি তা বুঝতে পারিনি। যাক গে, যাক গে। এদ্দিন তো ঘুরলেন—কাল, নির্ঘাৎ কাল পেয়ে যাবেন। সন্ধ্যের দিকে আসবেন, কাল আর ফিরতে হবে না।

তবু ফিরতে হল। এবং শুধু সেদিন বলে নয়, আরও অনেক সন্ধ্যায়। বিস্তর ঘোরাফেরার পর বইটা হাতে এলো।

হাতে এলো অবশেষে, কিন্তু এগুনো যায় কই? বিশ্বেশ্বর মুখে মুখে তো মন্দ বলেন না, কলম ধরলেই কি যত পাণ্ডিত্যে পেয়ে বসে! যত লেখা, তার ডবল ফুটনোট। যেন কাঁটা-ছড়ানো পথের উপরে চলা। আধ পাতা পড়েই মাথা ঝিমঝিম করে, হাত-পা মেলে টান-টান হয়ে শুয়ে জিরিয়ে নিতে হয়। আর ভেবেছিল কিনা, একরাত্রে বই শেষ করে পরের দিন ইরার কাছে হুমকি দিয়ে পড়বে। কি লেখাই লিখেছেন ভদ্রলোক! শাঁস হয় তো কিছু আছে, কিন্তু খোলা ভেঙে কার সাধ্য আস্বাদন নেবে! বই-সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধারে একটা মাস তো কাবার হতে চলল, এখনো কোন রকম ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না।

এর মধ্যে একদিন সুনন্দা ও তার মা সাবিত্রী দেবী এসে পড়লেন।

সুনন্দা বলে, এমন অসুখ যে আমাদের নিমন্ত্রণে যেতে পারলেন না। অথচ পরের দিন আর পাত্তা পাওয়া যায় না।

সাবিত্রী বলেন, তোমার মেসোমশায়ের তো উঠবার জো নেই। তিনি বললেন, আহা একলা অসুখে পড়ে রয়েছে—দেখে এসো তোমরা বাছাকে। তা তিন তিন দিন এসে গেছি। কিছু বলেনি তোমার চাকর?

হুঁ—বলে তাড়াতাড়ি অরুণ অন্য কথা পাড়ে। কেমন আছেন মেসোমশায়?

সাবিত্রী বলেন, যেমন দেখে এসেছিলে তেমনই। বাইরে বাইরে থাকি, কলকাতায় আমাদের তো জানা-শুনো নেই। নন্দার পিশেমশাই আছেন ভবানীপুরে।

তিনি এক ডাক্তার পাঠিয়েছেন, তাঁর অষুধ চলছে। কোন উপশম নেই। তাই বড় ভাবনা হচ্ছে বাবা—

সুনন্দা বলে ওঠে, সেই প্রথম দিন গিয়েছিলেন—তারপর আপনিও তো একবার খোঁজ নিলেন না, আছি কি মরেছি আমরা।

শেষ দিকটায় গলার স্বর যেন ভারী। অরুণাক্ষ বেকুব হয়ে বলে, ইয়ে—মানে, একজামিন কিনা, সময় করতে পারিনে—

এখন এগজামিন কিসের?

সেকালে মেয়েরা মুখ্যুসুখ্যু ছিল। দিব্যি ছিল—কথায় কথায় উকিলের জেরায় পড়তে হত না এমন। বলে, এখন মানে কি আজকেই? কলেজটা খুলে গেলেই—

কৈফিয়ৎটা তেমন লাগসই না হওয়ায় আরও জুড়ে দেয়, ভারি কড়া একজামিন। ফেল হলে সর্বনাশ। বই মোটে পাওয়া যায় না—তা পেয়ে গেছি অনেক কষ্টে। জীবনপণ করে লেগেছি।

সাবিত্রী ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন, কানপুর থেকে এই অবস্থায় নিয়ে চলে এলাম তোমার বাবা রয়েছেন বলে। উনিও তাই বললেন, তার কাছে নিয়ে যাও—তোমাদের কারো কিচ্ছু করতে হবে না। তা এমনি অদৃষ্ট তাঁকে এক নজর দেখানোই গেল না। বাসায় এইভাবে চলবে, না হাসপাতালে ব্যবস্থা করতে হবে, কোন কিছু ঠিক করা যাচ্ছে না।

বাতে পঙ্গু হয়ে আছেন সুনন্দার বাবা—সে ব্যাধি দু-চার দিনে সারবার নয়। তা নিয়ে এত বেশি দুশ্চিন্তারও হেতু নেই। যে কেউ লক্ষণ দেখে রোগ বুঝতে পারে। কেবল সাবিত্রী বুঝবেন না, তাঁকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা বৃথা। অরুণাক্ষ বলে, এসে যাবেন বাবা খুব শিগগির—

সে তো কতদিন থেকে শুনছি!

না, আসবেনই। না এসে উপায় নেই। চরম অবস্থা। নইলে রোগিরাই দল বেঁধে সেই পাড়াগাঁয়ের বাড়ি অবধি হামলা দিয়ে পড়বে।

হেসে একথা-সেকথা শুরু করে, সাবিত্রীর একঘেয়ে কাঁদুনি কাঁহাতক আর ভাল লাগে? বলে, যা জীবন ডাক্তারের! শীত নেই বর্ষা নেই, দুপুর নেই রাতদুপুর নেই, সংসার নেই বিশ্রাম নেই—সর্বক্ষণ রোগের পিছু পিছু ছুটে বেড়ানো। আমারও ডাক্তার হবার কথা মাসিমা। বাবা তাই চাচ্ছিলেন। বাঁধা পশার—এমন কি এ. রায় ছাপা নামের প্যাডটাও বদলাতে হত না। কিন্তু মা একেবারে আড় হয়ে পড়লেন। ডাক্তার কিছুতেই হতে দেবেন না। আই. এস-সি-র পরে তাই আর্টসে চলে গেলাম।

গল্পগুজবে চলল খানিকক্ষণ। সাবিত্রী ছাড়েন না, ওরই মধ্যে স্বামীর রোগের লক্ষণ সবিস্তারে শুরু করেন এক একবার। অরুণ বিব্রত হয়ে পড়ছে। রোগীরা বাবার কাছেও অমনি এসে বলতে থাকে। বাবা নেই, সে জায়গায় তাকেই ডাক্তারির ধকল নিতে হবে নাকি! মাঝে মাঝে আজে-বাজে রোগীও এমনি তার ঘরে ঢুকে পড়ে। জোর তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখতে হবে—চলে এসো শিগগির। বাবাকে নয় অবশ্য—বাবার উপর কথা বলবে মা ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি দুনিয়ার উপরে নেই। লিখবে মাকে। চলে এসো মা। পড়ার ঠেলায় হিমসিম হচ্ছি, তার উপরে নানান রকম উপদ্রব। মাথা খারাপ না হয়ে যায়।

গতিক তাই বটে! দৈত্যাকার এই 'ভারতে ইংরাজ'—ক' মাস কিম্বা ক' বছর লাগবে যে শেষ হতে, আদপেই শেষ হবে কিনা, কিছু বলা যাচ্ছে না। অরুণাক্ষের বদলে তেনজিং নোরকে হলেও পারতেন না বলতে; এভারেস্ট চূড়ার চেয়ে এ কিছু কম শক্ত নয়। তার উপরে, এই দেখুন, সাবিত্রী দেবী সুখ-দুঃখ ভাবনা-উদ্বেগের বস্তা খুলে বসে গেলেন।

শেষটা ধরে বসলেন, ভবানীপুরে আমার ননদের বাড়ি যাই চলো। নন্দাই এবারে আফিস থেকে ফিরবেন। রোগের গতিক বোঝা যাচ্ছে না—কদ্দিন চুপচাপ থাকা যায় এভাবে? চলো, যুক্তিপরামর্শ করে দেখা যাক—

অরুণ বলে, আমি গিয়ে কি করব মাসিমা, রোগপীড়ের কিচ্ছু আমি বুঝিনে।

সুনন্দা ফোড়ন কাটে, বাড়িতে এত রোগী আসে—শুনে শুনেই তো কত শেখা হয়ে যায়!

অরুণ হেসে উঠে বলে, বাবার ঘরে যাবো রোগের লক্ষণ শুনতে—কি বলছেন, ঘাড়ের উপর একটা বই দুটো মাথা নেই তো আমার!

কিছুতে রেহাই হয় না। নিয়েই যাবে। সুনন্দা বলে,

এই অবেলায় বই মুখে দিয়ে কতটুকু পড়া হবে বলুন দিকি? বেড়িয়ে-চেড়িয়ে এলে আবার মন বসবে।

সাবিত্রী বলেন, চলো বাবা। একটু-যদি ক্ষতিই হয় কি আর করবে? এখানে কাউকে তো চিনিনে তুমি আর ভবানীপুরের ওরা ছাড়া। দুটো মুখের কথা বলে ভরসা দেবারও মানুষ নেই।

কি আর বলা যায় এর উপরে! কিন্তু ভবানীপুরের কর্তাটি এসে পৌঁছেন নি এখনো। অফিস থেকে ফিরতে রাত হয়ে যায় ইদানীং। কখন ফিরবেন, ঠিক নেই। কোন এক ডিপার্টমেন্টের মাথা হয়ে যাবার পর থেকে বাড়িঘরদোর ভুলে গেছেন। কি মুশকিল, চলে যাই তা হলে আমি! আপনারা কথাবার্তা বলে পরে যাবেন। আমার একজামিনের পড়া।

বড় মেয়ে শোভা এসে বলে, এসেই চলে যাবেন, তাই কখনো হয়! বাবার আসা পর্যন্ত না পারেন, থাকুন আর কিছুক্ষণ। আলাপ-পরিচয় হোক, গল্প-সল্প করি।

অর্থাৎ জলটল না খাইয়ে ছেড়ে দেবে না। আর সুরটা কেমন সন্দেহজনক। শোভা আবার বলল, পুরুষমানুষ কেউ নেই—বৈঠকখানায় কি, উপরে চলে আসুন। মা বলছেন।

পিছু পিছু তখন উপরে উঠতে হয়। বাড়িতে বিস্তর মেয়ে, উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে এদিকে ওদিকে। চাপা কথাবার্তা, হাসি-হাসি মুখ। অবস্থা মালুম হয়েছে এতক্ষণে। ছি-ছি, এমন ভাবে এদের সঙ্গে আসা কক্ষণো উচিত হয়নি। ধরে নিয়েছে এরা, সুনন্দার ভাবী স্বামী—সাবিত্রী বোনের বাড়ি জামাই দেখাতে এসেছেন। কী লজ্জা, কী লজ্জা!

আর, কি কাণ্ড উপরে উঠতে উঠতে ইরাবতীর সঙ্গে দেখা। সে নামছে। অরুণাক্ষ আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

আপনি এখানে?

এই বাড়িতে পড়াই আমি। শোভা-দি'র বোনকে। আমি মাস্টারনি!

তারপর খানিকটা গায়ে-পড়া ভাবে বলল, সকাল সকাল চলে যাচ্ছি। এত সকালে ছাড় পাবার কথা নয়। কিন্তু ছাত্রী পড়ল না, তার কোন জামাইবাবু এসেছেন—

ছাত্রী সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। ইরাকে একটু ঠেলে দিয়ে চাপা গলায় বলে, আঃ ইরাদি, আপনি যেন কি! এই তো সেই—

ধুপধাপ করে অনেকখানি নেমে গিয়েছে তারা। সেখান থেকে জিজ্ঞাসা করছে, বর কি রকম দেখলেন, বলুন ইরা-দি?

ইরার উচ্ছ্বাস অরুণাক্ষের কানে গেল, খাসা বর—চমৎকার বর!

[ক্রমশ]

সনেট

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

আজি মায়াময় এই স্তব্ধ ত্রিযামায়
হৃদয়ের বিনিময় তোমায় আমায়,—
একি শুধু ক্ষণিকের ক্ষীণ খদ্যোতিকা?
এ নর্ম্মলীলার স্মৃতি রহিবে না লিখা
জীবনের অভ্রপটে—যেন শশিকলা
স্থির অচপল? অয়ি আবেশ-বিহ্বলা,

সত্য করি' কহ মোরে—আজিকার কথা
যাবে কিগো ভুলে তুমি—দুঃস্বপন যথা
প্রত্যূষে সুপ্তির শেষে ভুলে যায় লোকে?
এ মায়া-কাজল তব রহিবে কি চোখে?
রহিবে কি মুগ্ধ গৃহকপোতীর মত
দুরু দুরু ক্ষুদ্র বুকে জাগি' অবিরত

বেপথুপুলকস্পন্দ? হায় সুলোচনা,
এ কি স্বপ্ন? এ কি সত্য?—এ কি প্রবঞ্চনা?

নরেন্দ্র দেব

(প্রাচীন চীন)

এইবার 'জোড়া আয়না' গল্পটির কথা বলি। "পতি পত্নী অদল-বদল" অনেকটা আগের গল্পের মতই ব'লে সে আখ্যানটি আর লিখতে চাইনা।

ছিয়েন ইয়েন যুগের শাসন কালের চতুর্থ বৎসর চলেছে তখন। সেই সময় চীনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একজন রাজ-কর্মচারী ফুচাওয়ের রাজস্ব সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর নাম ফেঙ্ চুঙ্-আই।

'ফুচাও' দক্ষিণপূর্ব চীনের একটি সু-সমৃদ্ধ অঞ্চল। ফেঙ্ মনে মনে স্থির করলেন যে তিনি সপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে যাবেন তাঁর এই নূতন কর্মস্থলে। কারণ, তিনি জানতেন যে ফুচাও শুধু ধন-সম্পদেই সমৃদ্ধ নয়, অরণ্য পর্বত ও সমুদ্রপরিবেষ্টিত সেই স্থানটি প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যেও পরম রমণীয়। সুতরাং স্থায়ী বসবাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, উত্তরাঞ্চলে গোলোযোগ প্রায় লেগেই আছে। নিষ্ঠুর তাতারদের ঘন ঘন অত্যাচারে জনসাধারণ সেখানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সুতরাং দক্ষিণ পূর্ব চীনে আশ্রয় নেওয়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। এইসব বিবেচনা করে ফেঙ্ বেশ খুশী মনে ফুচাও অভিমুখে রওনা হল। সে-সময় এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে যেতে হলে যানবাহনের বিশেষ কোনও সুবিধা পাওয়া যেত না। পাল্কি ঘোড়া বা পায়ে হেঁটেই সকলকে যেতে হত।

ফেঙ্ যখন সপরিবারে চিয়েনচাও প্রদেশে এসে পৌছালো তখন সেখানে শীতান্তে বসন্তের সমাগম হয়েছে। কিন্তু, যুদ্ধ বিগ্রহের পর যেমন সর্বত্র দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় পূর্ব চীনও তা থেকে অব্যাহতি পায়নি। কারণ, ন্যু-চেন তাতাররা ইতিমধ্যে পীতনদী উত্তীর্ণ হয়ে পূর্বাঞ্চলে হানা দেওয়ায় সে দিকটা একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। দক্ষিণ পূর্ব চীনে যদিও যুদ্ধবিগ্রহ কিছু হয়নি, কিন্তু দুর্ভিক্ষের আক্রমণ থেকে সেও রেহাই পায়নি। অনাবৃষ্টির ফলে সে দিকে শস্য না-হওয়ায় চিয়েনচাও অঞ্চলে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। এক মুঠো চালের দাম সেখানে তখন হাজার টাকা! কাজেই চিয়েনচাওয়ের অধিবাসীদের অনাহারে দিন কাটছিল।

সৈন্যবাহিনীদের জন্য সে-সময় সীমান্তে রসদ যোগাতে হচ্ছে। কাজেই, রাজ-কর্মচারীরা খাজনা আদায়ের জন্য উৎপীড়ন শুরু করেছিল। জনসাধারণের খাজনা দেবার মতো অবস্থা নয় এটা তারা কিছুতেই বুঝতে চায় না। ভাত না থাকলে যে আমানি জোটেনা, এ সত্য তারা বিস্মৃত হয়ে রাজকর আদায়ের জন্য সকলের উপর অত্যাচার ও মারধোর শুরু করেছিল। কারো ঘরে তখন অর্থ তো দূরের কথা, অন্ন বস্ত্রও ছিল না। রাজপুরুষদের উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তারা একে একে ঘরবাড়ী ছেড়ে পাহাড়ে জংগলে পালাতে শুরু করলে। তাদের মধ্যে একটা বিদ্রোহ ভাব জেগে উঠলো। অন্যায় অবিচার অত্যাচারের প্রতিকার করবার জন্য তারা মরিয়া হয়ে দাঁড়ালো। এই গণ-বিদ্রোহের নেতৃত্বপদ নিলেন ফ্যান জ্যু-ওয়াই। ফ্যান চায় সুবিচার! ফ্যান চায় এই নিপীড়িত সর্বহারা জনগণের দুঃখ নিবারণ করতে। সে চায় রাজ-কর্মচারীদের অন্যায় অত্যাচার থেকে নিরুপায় দুর্বল দেশ-বাসীদের বাঁচাতে।

কাজেই দলে দলে সমস্ত লোক বিপ্লবী ফ্যানের পতাকাতলে এসে সমবেত হ'ল। দেখতে দেখতে তাদের সংখ্যা একলক্ষ অতিক্রম করে গেল। তারা তখন অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। লেখক তাদের কুকর্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন—

"ঘর-বাড়ী ক্ষেতে জ্বালায় আগুন,
ধনী যত রাতে করে আসে খুন!

আবার কখনো সহানুভূতিসূচক কণ্ঠে তাদের গুণগানও করেছেন :—

কতদিন হায় অনাহারে যায়,
কখনো যা-পায় ভাগ করে খায়!"

বিদ্রোহ দমনে সরকারী সেনাবাহিনী বারংবার পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে। ফ্যান তখন সদলবলে এসে চিয়েনচাও অধিকার করে বসলো। বিদ্রোহীরা ফ্যানকে সংবর্ধনা জানিয়ে তার নামকরণ করলে 'জননায়ক ফ্যান'? অতঃপর ফ্যান তাদের দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে লুঠপাট করে আনতে আদেশ দিলেন। অবশ্য, দরিদ্র দেশবাসীর উপর উৎপীড়ন সম্পর্কে তিনি কঠিন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। বীর যুবক যারা প্রাণ তুচ্ছ করে সরকারী সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করতে অগ্রসর হয়েছিল ফ্যান তাদের সকলকে যথাযোগ্য মর্যাদানুযায়ী উপাধি দিয়ে সামরিক উচ্চকর্মচারীরূপে নিয়োগ করলেন।

ফ্যানের দলে তার দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয় ছিল। তার নাম ফ্যান ছি-চাও। বয়স মাত্র তেইশ। কিন্তু, তার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সে অসাধারণ সন্তরণপটু। জলের মধ্যে ডুবে সে একাদিক্রমে তিন চার দিন আত্মগোপন করে থাকতে পারতো। এইজন্যে সবাই তার নাম দিয়েছিল 'পাঁকাল মাছ!'

তরুণ-ফ্যান ছিল বেশ মেধাবী ছাত্র। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাকে জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিপ্লবী

সৈন্যদলভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল। জননায়ক ফ্যানের কঠোর আদেশ ছিল যে, বিদ্রোহী দলে যোগ দিতে সে অস্বীকার করবে তাকে দেশের শত্রু বিবেচনায় নির্মম ভাবে হত্যা করবে। যাতে সেই দৃষ্টান্ত দেখে কেউ না আর সরকারের পক্ষে যোগ দিতে সাহস করে।

কিন্তু, তরুণ ফ্যানের হৃদয় ছিল স্বভাবতই কোমল। সে কিছুতেই কারুর উপর অকারণে অত্যাচার করতে পারতোনা। প্রাণের দায়ে বিদ্রোহী দলে যোগ দিতে সে বাধ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু দুর্ভাগাদের সর্বপ্রকারে সে সাহায্য করতো। কখনো লুঠপাট বা হত্যা কাযে লিপ্ত হত না। সবাই তাকে ভীরু কাপুরুষ বলে উপহাস করতো। একেবারে নেহাৎ অপদার্থ বলেই ভাবতো।

রাজস্ব আদায়ের কাযভার নিয়ে ফুচাও যাত্রী রাজ-কর্মচারী ফেঙ্ যখন সপরিবারে চিয়েনচাও অঞ্চলে এসে পৌছালো, দুর্ভাগ্যক্রমে চিয়েনচাও তখন বিদ্রোহীদের অধিকারে। অবিলম্বে তারা সেই নিষ্ঠুর বিদ্রোহীদের কবলে পড়ে গেল। ফেঙের একটি পরমাসুন্দরী ষোড়শী কন্যা ছিল তার সঙ্গে। বিদ্রোহীরা তাদের আক্রমণ ক'রে যথাসর্বস্ব কেড়ে নিলে। প্রাণভয়ে তারা সকলে কে৲ কোথায় যে ছিটকে পড়ে ছুটে পালালো কেউ জানেনা।

বিদ্রোহীরা লুঠপাট করেছিল বটে—কিন্তু কাউকে হত্যা করেনি। ফেঙ্ তার পত্নী পুত্র ও কন্যাকে কোথাও খুঁজে পেলে না। অত্যন্ত বিষণ্ণ ও ভগ্নচিত্তে সে একাই ফুচাও অভিমুখে রওনা হল। কর্তব্যনিষ্ঠ রাজ-কর্মচারী সে। দুর্ভাগ্য তাকে নিরস্ত করতে পারেনি।

ফেঙের ষোড়শী কন্যা সুন্দরী য়ু মাই ছুটে পালানো দূরে থাক, তার পা দু'খানি খুবই ছোট বলে সে বেশি জোরে চলতেই পারে না। বিদ্রোহীরা অবিলম্বে তাকে বন্দী করে শহরে টেনে নিয়ে এল। য়ু-মাই নিরুপায়ের মতো কাতর কণ্ঠে কেবলই কাঁদছিল। তরুণ ফেনের মনে মেয়েটির অবস্থা দেখে কেমন যেন মায়া হল। সে তার কাছে এগিয়ে এসে বিনীত ভাবে পরিচয় জানতে চাইলে। য়ু-মাই তার সত্য পরিচয়ই দিলে। তরুণ ফেন তখন তার সহকর্মীদের অনুরোধ করলে—মেয়েটিকে তোমরা ছেড়ে দাও। নিজে সে এগিয়ে এসে তার বন্ধন মোচন করে দিলে। তার পর, সুমিষ্ট ভাষণে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলবার জন্য নিজের বাড়ীতে নিয়ে এল।

মেয়েটি তখনও কাঁদছিল। তরুণ ফেন বিব্রত হয়ে তাকে বললে, বিশ্বাস করো তুমি—আমি এই বিপ্লবীদের মধ্যে থাকলেও আমি বিদ্রোহী নই। আমার আত্মীয় গোষ্ঠী জোর জবরদস্ত করে আমাকে তাদের মধ্যে রেখেছে। ভবিষ্যতে যদি কোনও দিন এই বিদ্রোহী দল রাজশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে, সেদিন আমাকে সে লজ্জা বহন করতে হবে না জেনো। কেন না, আমি চিরদিন রাজভক্ত প্রজা। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করবার জন্য আমি প্রস্তাব করছি, যদি তোমার অসম্মতি না থাকে তবে তোমাকে আমি বিবাহ করে আমার ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করতে পারি। এ ব্যাপারে তোমার সম্মতি হবে আমার পরম সৌভাগ্য ও সম্মানের বিষয়।

য়ু-মাই বিবাহের জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিশেষ করে শত্রুপক্ষের একজনকে বিবাহ করা সে অনুচিত বলেই মনে করে। কিন্তু, উপায় কি? সে যখন তাদের হাতে পড়েছে, তখন এ প্রস্তাবে সম্মত না-হওয়া মানে অপমান ও লাঞ্ছনা বরণ করা। য়ু-মাই বুদ্ধিমতী, সে আপত্তি জানালে না।

পরের দিন তরুণ ফেন জননায়ক ফ্যানের কাছে গিয়ে অকপটে সব কথা নিবেদন করলে। জননায়ক সমস্ত ব্যাপার শুনে খুশী হয়ে তাকে বিবাহ করবার অনুমতি দিলেন। তরুণ ফেন মহানন্দে ঘরে ফিরে এল য়ু মাইয়ের জন্য বিবাহের নানা উপহার নিয়ে। তার পর এক শুভ দিনে তাদের বিবাহ কায সুসম্পন্ন হল। তরুণ ফেনের গৃহে বংশপরম্পরায় পাওয়া এক বিচিত্র জোড়া-আয়না ছিল। আয়না-জোড়াকে ইচ্ছামতো দু' ভাগ করা যেত! উজ্জ্বল ও নির্মল এই মুকুর যুগলে দুটি কথা উৎকীর্ণ করা ছিল 'হংস মিথুন' আর "মরাল দম্পতি"। তরুণ ফেন তার নববধূকে সেই যুগল-দর্পণ উপহার দিলে। বিবাহ উপলক্ষে সকল বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ করে এনে সে মহা ভোজের ব্যবস্থা করলে।

লেখক এই নবদম্পতী সম্বন্ধে এখানে বলেছেন—

"এতদিনে হল ফেন মানুষের মতো,
সরলা বালিকা গেল ভুলে তার ক্ষত।
সুপুরুষ ফেন যার মন বড় ভালো,
ষোড়শী য়ু-মাই করে ঘর তার আলো!
বিদ্রোহী দলে থেকে বিপ্লবী নয় স্বামী,
উদার হৃদয় সে যে সকলের শুভকামী!
যদিও য়ু-মাই এক সুন্দরী বন্দিনী,
তবু সে হয়েছে সুখী, পতি-প্রেমে নন্দিনী।

বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই তারা ঘর সংসার করছিল। কিন্তু বিধাতার বোধ করি সে অভিপ্রায় ছিল না।

কথায় বলে—মাটির কলসী একদিন কুয়োতলায় ভাঙবেই! বিদ্রোহী দলের নেতা জননায়ক ফ্যান রাজ্যের প্রধান শত্রু ও ঘোরতর অপরাধী বলে একদা বিঘোষিত হলেন। যতদিন সরকার তার সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে বহিশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যাপৃত ছিল, ফেন ছিল ততদিন বেশ নিশ্চিন্ত নিরাপদে। তারপর চাকা ঘুরে গেল। রাজ্যের বীর সেনাপতিরা মহা বিক্রমে তাতারদের যুদ্ধের পর যুদ্ধে পরাস্ত ও বিপযস্ত করতে লাগলো! ক্রমে সাম্রাজ্য শত্রুশূন্য ও রাষ্ট্র স্বাভাবিক অবস্থায় এসে পৌছালো। সম্রাট কাঙ্ চুং তাঁর রাজধানী হ্যাঙ্ চাওয়ে স্থানান্তরিত করলেন। যুবরাজ হান শী চুংকে তিনি এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহ দমনে পাঠালেন। জননায়ক ফ্যান এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বাধা দেওয়া অসম্ভব বুঝে তিনি পশ্চাদপসরণ করলেন এবং চিয়েনচাও নগরে প্রবেশ করে আত্মরক্ষার আয়োজন শুরু করলেন। যুবরাজ হান তখন চিয়েনচাও নগর পরিবেষ্টন করে জননায়ক ফ্যানকে অবরোধের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলেন।

যুবরাজ হানের সঙ্গে রাজস্ব সংগ্রহকারী ফেঙের বহুদিনের বন্ধুত্ব ছিল। ফুচাও নগরে ফেঙকে কর আদায়ের কাজে পাঠানো হয়েছে এ কথা তিনি জানতেন। এখানকার স্থানীয় সংবাদ জানতে হলে ফেঙের সাহায্য অত্যাবশ্যক। অতএব তিনি ফেঙকে ডেকে পাঠালেন। তাকে আপন দপ্তরের প্রধান কর্মচারীর পদে নিয়োগ করে উভয়ে মিলে চিয়েনচাও নগরের বহির্দ্বারে উপস্থিত হলেন জননায়ক বিদ্রোহী ফ্যানকে কি ভাবে আক্রমণ করলে শীঘ্র এবং সহজে কার্যোদ্ধার হতে পারে সে বিষয়ে সম্যক আলোচনার জন্য।

ওদিকে দীর্ঘ অবরোধের ফলে চিয়েনচাও নগরে হাহাকার উঠেছে। জননায়ক ফ্যান অবরোধ ভেদে বেরিয়ে আসবার একাধিক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারলেন না। সমগ্র নগরে একটা সর্বগ্রাসী ধ্বংসের বিভীষিকা দেখা দিল। উদ্ধারের কোনো আশা নেই বুঝে য়ু-মাই একদিন স্বামীকে ডেকে বললে—তোমার মুখে শুনেছি রাজভক্ত প্রজা কখনো নূতন প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করে না, তেমনি যে নারী তার পতির একান্ত অনুরাগিণী সে কখনো দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে না। রাজসৈন্য এসে আমাদের অবরোধ করেছে। বিদ্রোহী না হয়েও আমরা বিপ্লবী দলভুক্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং এই অবরুদ্ধ নগরীর পতন হলে রাজ সৈন্য এ শহরের একটি প্রাণীকেও জীবিত রাখবে না। তুমি যে একজন রাজভক্ত প্রজা একথা প্রমাণ করবার কোনও সুযোগই পাবেনা হয়ত। তোমার শোচনীয় মৃত্যু দেখবার আগে আমি মরতে চাই। আমার চোখের সামনে রাজ সৈন্যরা এসে তোমাকে হত্যা করবে এ আমি দেখতে পারবোনা। তারপর—তারপর আমার কি লাঞ্ছনা হবে তাদের হাতে সে কথা ভাবতেও শিউরে উঠি! উঃ! না না, আমি বাঁচতে চাইনা—"

বলতে বলতে য়ু-মাই স্বামীর শিয়রস্থ তরবারি কোষমুক্ত করে নিয়ে নিজের কণ্ঠে আঘাত করতে উদ্যত হ'ল। তরুণ ফ্যান বিদ্যুৎ বেগে লাফিয়ে উঠে তার হাত থেকে তরবারিখানি কেড়ে নিয়ে বললে— (ক্রমশঃ)

ঈর্ষা

শ্রীকালিদাস রায়

সবার সাথে গল্পে বাজে কথায় কাজে হেসে খেলে
বেশত তোমার দিন কেটে যায় ভাই,
থম্‌কে কভু দাঁড়াও নাক, এগিয়ে চলো ভিড়টি ঠেলে।
ভাবার তোমার এমন কিছুই নাই।

ভালো ক'রে আঁচড়ানো চুল, দাড়ি কামাও প্রতিদিনই
জুতা তোমার সর্বদা চক্‌চকে।
দর্জি এবং ধোবা ছাড়া কারো কাছে নওক ঋণী
বেশ রয়েছ শৌখিনতার শখে।

আফিস হতে ফেরার পথে খেলা দেখ গড়ের মাঠে
সন্ধ্যা কালটা কাটাও সিনেমাতে,
খবর কাগজ নিয়ে তোমার সকালবেলা দিব্যি কাটে,
চুরুট তোমার সদাই থাকে হাতে।

তোমায় আমি ঈর্ষা করি, বর্ত্তমানের প্রতিটি পল
কাজে লাগাও কিংবা করো ভোগ,
অতীত আমায় পিছে টানে হরে সে হাত পায়ের বল
জাগায় স্মৃতি লাগায় গোলযোগ।

অনাগতের শঙ্কা মোরে আকুল করে, দেয় না আশা,
রহস্যময় হয় যে বর্ত্তমান।
মনে কেবল প্রশ্ন জাগে পীড়ন করে জ্ঞানপিপাসা
ভাবায় মোরে রাতের ঝিঁঝিঁ তান।

নেই অতীত অনাগত বর্ত্তমানই তোমার পুঁজি
জীবন পথে হাল্কা তোমার ভার।
ফুলের ভাষার অর্থ তোমায় দেখতে কভু হয় না খুঁজি
উদাস তোমায় করে না বীণকার।

কাঁদায় মোরে আকাশে মেঘ অবাক করে প্রজাপতি,
করে উদয় অস্ত অনিমেষ,
ঈর্ষা করি তোমারে ভাই সরল পথে তোমার গতি
এই দুনিয়ায় তুমিই আছ বেশ।

পরিচালক—উপানন্দ

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্ববাদীসম্মত। এ সম্বন্ধে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত বহু মনীষী ও মহাপুরুষ বলেছেন এর সার্থকতা উপলব্ধি করে। যা চাওয়া যায়, তাই প্রার্থনা—ধন, মান, বিদ্যা, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, চাকুরি পাওয়া প্রভৃতি লাভের জন্যে প্রার্থনার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি আছে। কিন্তু সকল প্রার্থনার মূলে নিজের আন্তরিক ইচ্ছার প্রয়োগ আবশ্যক, তা না হোলে সব ব্যর্থ হয়ে যায়। পর্ব্বতকে লঙ্ঘন করতে হোলে ঠিক পথে শক্তি চালনা চাই-ই। পশুর জ্ঞান সহজ বোধের সীমার বাইরে যায় না, তাই সাধনা সম্বন্ধে তার কোন বোধ নেই, কোন ধারণাও নেই। প্রার্থনার অসীম শক্তি মানুষ উপলব্ধি করেছে।

নিত্য প্রার্থনা দ্বারা সাধনার পথ উন্মুক্ত হয়, প্রশস্ত হয়, আর জ্ঞানের উন্নতি সাধন হওয়ার পক্ষে কোন বাধা ঘটে না। জ্ঞানের উন্নতি না হোলে আত্মারও উৎকর্ষ লাভ হয় না। তোমরা বোধহয় জানো, জগতে যত প্রকার উন্নতি আজ পর্য্যন্ত হয়েছে, জ্ঞানের উন্নতিই তার মধ্যে প্রধান। জ্ঞান অর্জ্জন করতে হোলে আশ্রয় বা অবলম্বন আবশ্যক, যাতে করে সম্যকভাবে বোধোদয় হয়। যীশুখৃষ্ট বললেন—'দ্বারে আঘাত করো, দ্বার মুক্ত হবে—' ঠিক ভাবে আঘাত না করলে তো দ্বার মুক্ত হবে না, এর জন্যে শক্তির প্রয়োজন, অপর পক্ষে যিনি দ্বার বন্ধ করে আছেন তাঁর সাড়া জাগাতে হোলে যেরূপ পন্থা অনুসরণ করা দরকার, সেরূপটী গ্রহণ করা আবশ্যক। এই পথের সন্ধান সম্ভব হয় একমাত্র প্রার্থনায়।

রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপলব্ধি করে বলেছেন, যে মানুষ না চায় তাকে কেউ কিছু দিতে পারে পারে না, দিলে দান বিফল হয়। তাঁর মতে চাওয়া এবং দেওয়া একটা চক্র, পরস্পরের যোগে পরস্পর পরিপূর্ণ। তিনি বলেছেন, "……তুমি তোমার ছাত্রের কল্যাণার্থী—একান্ত মনেই চাও যে তার শিক্ষা সার্থক হয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছার পথ বন্ধ, সে যদি না চায়। আমাদের দেশে গুরুভক্তির অর্থই তাই। গুরুর নিজের জন্যে ভক্তির প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাঁর দান-ক্রিয়ার জন্যে তার প্রয়োজন আছে— ভক্তির দ্বারা গুরুর কাছে ছাত্র আপন দাবীকে সত্য করে—তখন গুরুর কল্যাণে ইচ্ছার বাধা দূর হয়। পাওয়ার জন্যেই পাওয়ার বাধার মূল্য আছে। বাধা দূর করতে গিয়ে পাওয়ার শক্তি সচেষ্ট হয়ে ওঠে। তীর্থে পৌছোনোর সার্থকতা তীর্থ-যাত্রার কৃচ্ছ্র তার দ্বারাই পরিপূর্ণ। দেবতাকে না পাওয়াটাই দেবতাকে পাওয়ার ভূমিকা, মাঝে থাকে প্রার্থনা। যেটাকে পেয়েই আছি, সেটাকে আমরা সব চেয়ে কম পাই। এইজন্যে ভগবান যদিচ নিজেকে দিয়েই রেখেচেন—তবু চেয়ে পাওয়ার দুঃখের ভিতর দিয়ে পাওয়ার আনন্দকে প্রগাঢ় করতে হবে। বস্তুত তাঁকে না পাওয়াটা মায়া, ঐটে লীলা—যিনি আছেন তিনি নেই হয়ে খেলা করেন, যিনি দিয়েছেন তিনি দেননি বলে ফাঁকি দেন—"

মানুষ মাত্রেরই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনার আশু প্রয়োজন। তোমরা ঈশ্বরের কাছে নিত্য প্রার্থনা করবে। বৈদিক যুগ থেকে সুরু করে পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত আমাদের যত কিছু মন্ত্র রচনা হয়েছে, সবগুলি প্রায় প্রার্থনাময় হয়ে আছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বুঝেছিলেন, ভগবানকে পাওয়ার সাধনার দ্বারাই পাওয়ার যোগ্যতা গৌরবে—মানুষ বড় হয়ে উঠেছে, যা পশু বা ইতর শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বড়ো না হয়ে উঠলে বড়কে পাওয়া যায় না। এক গণ্ডূষ জলের ভেতর সমগ্র পুষ্করিণীর জল তুলে নেওয়া যায় না। আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি হোতে থাকে তখন তাকে ধরে রাখবার জন্যে জলাশয় বা কূপ তৈরী করে নিতে হয়। নিজের বিশেষ চেষ্টার দ্বারা নিজের প্রয়োজনে আকাশের জল না ধরে রাখলে জলের অভাব কোনদিন মোচন হয় না—প্রার্থনার দ্বারাই অন্তরের মধ্যে সেই জলাশয়কে বড়ো করে, গভীর করে রাখার প্রয়োজন—এই সত্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ বুঝেছিলেন। একমাত্র প্রার্থনা দ্বারাই অনুভূতির ভেতর দিয়ে তাঁরা জ্ঞানলাভ করেছিলেন, তাঁদের দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছিল। জ্ঞান প্রধানতঃ দুই ভাগে

বিভক্ত—(১) জড়বিষয়ক জ্ঞান (২) অধ্যাত্মজ্ঞান। প্রথমটীকে বিজ্ঞান, আর দ্বিতীয়টীকে জ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়েছে। যে জ্ঞান দ্বারা জড় জগতের কার্য্য কারণগুলি সুস্পষ্টরূপে জানতে পারা যায়, তাকেই বলে জড়ীয় জ্ঞান বা বিজ্ঞান, আর যার দ্বারা জড়ের অতীত আত্মবিষয়ক জ্ঞান লাভ করা যায় তাই অধ্যাত্মজ্ঞান। জ্ঞানের দ্বারা মানুষ সংসারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতিবিধান করতে পারে, আর মৃত্যুর পরে অমৃতের আস্বাদন লাভ সম্ভব হয়। সব জ্ঞান অর্জ্জনই সাধনা ও ঈশ্বরের করুণা সাপেক্ষ। মানুষ তার সভ্যতাকে পেয়েছে অগ্নির দয়ায়, অগ্নি আবিষ্কার না হোলে পৃথিবীর কনিষ্ঠ সন্তান এই মানুষ হিংস্র প্রাণীদের কবলে পড়ে চিরলুপ্ত হয়ে যেতো। অগ্নিকে নিয়েই আমাদের প্রথম উপাসনা সুরু হয়। অগ্নি উপাসনার ভেতর দিয়েই মানুষ তার যা কিছু পাওয়ার বস্তু সবই পেয়েছে।

ভগবানের প্রত্যক্ষ বিভূতি দু'টী—অগ্নি ও সূর্য্য। এঁদের কাছে মানুষ যুগে যুগে প্রার্থনা করে এসেছে, অর্ঘ্য দিয়েছে আর অর্চ্চনা করেছে, ফলে সে পেয়েছে অসাধারণ শক্তি। চাষ করে মানুষ অন্ন পেয়েছে বলে তার সেই পাওয়া পশুর পাওয়ার চেয়েও বড়ো, কবি গুরু এই কথাই বলেছেন।

বহুদিন আগের কথা, আরব সাগরের উপকূলে জনৈক মহিলা তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্র নিয়ে সায়াহ্নে বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে তাঁর ছেলেকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। মহিলাটী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী, যীশু প্রার্থনার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন,—মহিলাটী অসহায় অবস্থায় ক্রন্দন করতে লাগলেন, ওঁর মনে পড়ে গেল প্রার্থনা সম্বন্ধে যীশু যা বলেছিলেন। ফলে উনি প্রার্থনা সুরু করলেন. চব্বিশ ঘণ্টা ধরে উনি পুত্রকে ফিরে পাবার জন্যে তন্ময় হয়ে প্রার্থনা করতে করতে শেষে পুত্রকে ফিরে পেলেন বটে সমুদ্রের তরঙ্গে—কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় নয়। এরকম সত্য ঘটনা বহু গ্রন্থ ও সংবাদপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে। তোমরা যারা ইতিহাসের ছাত্র নিশ্চয়ই জানো হুমায়ুনের আরোগ্যের জন্যে বাবর প্রার্থনা করতে করতে শেষে তাকে আরোগ্য করলেন, কিন্তু তার বিনিময়ে তাঁকে তাঁর নিজের জীবন হারাতে হোলো। তরুলতাও প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা করে, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্রের সাহায্যে দেখিয়ে গেছেন।

সর্ব্বধর্ম্মে সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বকালে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। তোমরা প্রত্যহ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে যাতে তোমরা মানুষের মত মানুষ হয়ে সমাজ সংসারে নিজেদের সুদীর্ঘ জীবন, সমৃদ্ধি ও গৌরব প্রতিষ্ঠা করতে পারো। আশা করি ঈশ্বর আরাধনা ও প্রার্থনা তোমার দৈনন্দিন কর্ম্মের ভেতর একটি বিশিষ্ট কর্ম্মরূপে পরিগণিত হবে।

জন্মাষ্টমী

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

কাজল-মেঘেতে ঢেকেছে আকাশ ঝরিছে বাদল-ধারা,
সহসা কাহার মধুর হাসিতে উজল হইল কারা।
কু-স্বপন দেখে মথুরা নৃপতি রহিয়া ঘুমের ঘোরে,
একটি নোতুন শিশু হেসে ওঠে বন্দিনী মাতা-ক্রোড়ে।

পিতা-মাতা তা'র ক্ষণিক চাহিল বিস্ময়ে শিশুপানে,
বিপদেরি মাঝে পুলকের সুর বাজিল তাঁদের প্রাণে।
বিনা অপরাধে সাতটি ছেলেরে দিয়াছে রাজার হাতে,
চূর্ণ করিতে নবনীর দেহ নিঠুর ক্রূরাঘাতে।

মনে মনে ভাবি' এ শিশুর কিগো তেমন মরণ হবে ?
কে তবে তাঁদের এ অপমানের প্রতিশোধ পরে ল'বে।
স্নেহ-করুণায় তুলিয়া শিশুরে বসুদেব নিজ ক্রোড়ে,
কহিল—"বাছনি নিয়ে যাই চল বহুদূরে আজ তোরে।

বাদলের ধারা সবেগে ঝরিছে ক্ষণে ক্ষণে ডাকে দে'য়া,
চল যাই মোরা এ ঘোর আঁধারে বাহিয়া দুখের খেয়া।"
দুর্য্যোগে তোর জনম হোয়েছে দুঃখেরে কেন ভয় ?
প্রতিশোধ তোর নিতে হবে ওরে শত্রুরে করি' জয়।

তোর জননীর চোখে ধারা বয় রাজকীয় কারাগারে,
বীর হোয়ে তোকে বাঁচিতে হইবে মুক্ত করিতে তা'রে।
মুক্তি-বীরেরা জনম লভেছে বন্দিনী মাতা ক্রোড়ে,
এ আশার বাণী হোক্‌রে ঘোষিত নিখিল বিশ্ব-জুড়ে।

সব ঝুট্‌ হ্যায়

নরেন চক্রবর্ত্তী

সেদিন যোগ কি অম্‌নি একটা কিছু পর্ব্ব উপলক্ষে কালীঘাট এবং গঙ্গার ঘাটগুলোতে যাত্রীর এক অসম্ভব রকম জনতা হয়েছিল। ভোর হতেই কাতারে কাতারে নরনারী গঙ্গাস্নান ও কালীদর্শনের জন্য এই পথে যাতায়াত সুরু করে দিল, বেলা যতো বাড়তে লাগলো ভীড়ও তার সঙ্গে পাল্লা

দিয়ে বেড়ে চল্‌লো, শেষে বিকেলের দিকে ভীড়টা এত দূর বেড়ে গেল যে বল্‌বার নয়—ভলেণ্টিয়ার আর পাহারা-ওয়ালাদের ছুটোছুটি পুরোদমে আরম্ভ হ'লো, আর আরম্ভ হ'লো অসংখ্য কণ্ঠের প্রাণ-বার-করা চিৎকার। ঠিক এই সময়—জীবনমরণের এই সন্ধিক্ষণে—একটি মেয়ে তার মায়ের আঁচল থেকে ছিট্‌কে হাত কুড়ি দূরে গিয়ে পড়লো, আর তার মাও আরো কুড়ি হাত দূরে গিয়ে টের পেল যে মেয়ে তার কাছে নেই। মায়ের চিৎকারে আর তার আত্মীয় সঙ্গীদের অনুরোধে স্বেচ্ছাসেবকেরা ও পুলিশের লোকেরা অনেক অনুসন্ধান করলো, কিন্তু মেয়েটির আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তখন কন্যার মাতা কালীদর্শন মাথায় রেখে কালীমাতা, যোগ ও ভীড়ের জন্য গালি ও কন্যার জন্য কান্না আর ভাবনা নিয়ে দেশে ফিরে গেল।

ছ'বছরের পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ভীড়ের ধাক্কা সামলে যখন বুঝতে পারলো যে মা তার কাছে নেই তখন সে প্রথমে ভাবাচাকা খেয়ে গেল—তারপর ফোঁপাতে লাগ্‌লো, তার পরও যখন সে দেখ্‌লো মা তার কাছে এল না তখন কান্না আর ফোঁপানর মধ্যে চাপা রইলো না, বুক ঠেলে বের হ'য়ে পড়লো।

যাত্রীগণ পুণ্যসঞ্চয়ে আর ভলন্টিয়ারগণ পূর্ণ-উৎসাহে হৈ চৈ করতে ব্যস্ত, সুতরাং কোন দলের কেউ-ই মেয়েটির দিকে নজর দেবার অবসর পেল না, কান্নাও তার সমান আবেগে চলতে লাগলো। খানিক পরে তার কান্নার শব্দ এক জনের কানে পৌঁছল এবং সে তার রুক্ষ চুল আর শুষ্ক দেহকে সজাগ করে মেয়েটির দিকে ছুটে এল এবং মেয়েটিকে যত্নে কাঁধে তুলে নিয়ে ভীড় থেকে বেরিয়ে গেল। ভীড় থেকে বেরোবার সময় তার কানে এল কে যেন বল্‌লে—আরে বুড়ো সর্দ্দার আজ মস্ত দাঁও মারলে রে।

লোকটি ফিরে দেখলে একটা লোক তার দিকে চেয়ে হেসেই ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল। তাকে সে চিন্‌তে পারলে।

* * *

এই ঘটনার পর আরো ছ'সাত বছর কেটে গেছে। সকাল থেকে টিপ্‌টিপুনি বৃষ্টির পর একটু রোদ দেখা দিয়েছে, হারাণী তার ভিজে চুলের গোছা শুকোতে বস্‌লো। তাকে তখন সেই মেঘলা দিনের পাত্‌লা রোদের মতোই সুন্দর দেখাচ্ছিল। এমন সময় ভীখু ছুটে এসে বল্‌লে—হারাণী, আমার লাঠিটা দেতো মা। একটু বাজারে বেরোই, অসুখে পঙ্গু বলে বসে থাক্‌লে তো চল্‌বে না বেটি।

হারাণী একবার কঠিন দৃষ্টিতে ভীখুর দিকে চাইলে—জবাব দিলে—"না—আমি কিছুতেই দেব না। আমি না তোমায় কতবার বলেছি বাবা, তুমি এসব কাজ করতে পাবে না। তুমি কিছুতেই আমার কথা শুনবে না? তুমি আমায় কিচ্ছু ভালবাস না। তা না হ'লে এই বয়সে অসুখ অবস্থায় এই সব জঘন্য কাজ করতে যেতে চাও।"

ভীখু হারাণীর মাথাটা কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে সেখানে বসে ভাব্‌তে লাগলো তার জীবনের পুরাণ ইতিহাস।···সামান্য ঘরে তার জন্ম হয়েছিল বিহারের একটা অতি ছোট গ্রামে। স্ত্রী দুখিয়াকে নিয়ে সে কলকাতায় এসেছিল, রুটি রোজগারের জন্য—তারপর সে মিশে গেল এক গুণ্ডার দলে—হয়ে উঠলো গুণ্ডা, চোর, পকেটমার।··· সংসার হয়তো চল্‌তো ভালই, কিন্তু সে কি আনন্দ দিতে পেরেছিল দুখিয়ার মনে? তারপর যখন তাদের ঘরে চাঁদের একটা টুক্‌রো এল লছমি—তখন দুখিয়ার কি অনুরোধ তাকে এই জঘন্য ব্যবসা ছেড়ে দেবার জন্য—হায়, তখন যদি ভীখু শুন্‌তো তার কথা তবে ছ'মাসের মধ্যেই হারাতে হ'তো না তাদের টুক্‌টুকে মেয়ে লছমিকে। লছমি চলে গেল, তার একবছরের মধ্যেই চলে গেল দুখিয়া। তখন সে মেতে গেল আরো পুরোদমে তার এই ব্যবসায়ে, হয়ে উঠলো দলের সর্দ্দার—ভীখু সর্দ্দার। কিন্তু আজ··· তখন সে শোনে নি দুখিয়ার কথা—চেয়ে দেখে নি ভাল করে লছমির মুখের দিকে, তার ফল তো সে পুরো মাত্রায় পেয়েছে···এখন যদি সে হারাণীর কথাও উপেক্ষা করে! হারাণী যে তাকে কিছুতেই দেবে না এই ভাবে রোজগার করতে। ভীখু হারাণীর মাথায় হাত বুলোতে লাগলো—তার চোখ তখন জলে ভেসে উঠেছে। এমন সময় বাইরে কে ডেকে উঠ্‌লো—ভীখু সর্দ্দার, শীগ্‌গির বেরিয়ে এস, জবর খবর আছে।

হারাণী চেঁচিয়ে বল্‌লে—মধুকাকা, বাবা তো যেতে পারবে না, তার যে আবার জ্বর হয়েছে।

ভীখু তাড়াতাড়ি কাপড়ের খানিকটা গায়ে জড়িয়ে দাওয়াতেই শুয়ে পড়লো। কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লে—

সীতারাম—সীতারাম, কে মধু ভাই! বহুত জ্বর ভাই—বহুত জ্বর। মধু চলে গেল। ভীখু তাড়াতাড়ি উঠে বল্‌লে—চলে গেছে রে?

হারাণী হেসে ফেল্‌লে। বললে—হ্যাঁ চলে গেছে। কিন্তু ওর ভয়ে শুয়ে পড়লে?

ভীখু হেসে বল্‌লে—ওর ভয়ে নয় রে বেটি, তোর ভয়ে। শুয়ে না পড়লে টেনে নিয়ে যেতো, তখন তুই কি করতিস্?

* * *

বেশ বেলা হয়েছে। ভীখু ঘরের দাওয়ায় চুপ করে বসে ভাবছে কি করে দুটো পেটের জন্য অন্নের সংস্থান করবে। জীবনে সে তো আর কোন কাজ শেখে নি, পকেটমারের ব্যবসাই সে শিখেছে এবং তাতেই সে সংসার ভালভাবেই চালিয়ে এসেছে, গড়িয়ে দিতে পেরেছে হারাণীর গলায় অমন সুন্দর ওই হারছড়াটি। কিন্তু এখন···

কোথা থেকে হারাণী এসে তার পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সমস্ত চিন্তাকে তলিয়ে দিলে। আদরে ভীখুর গলা জড়িয়ে ধরে তার পিঠের ওপর মুখ রেখে জিজ্ঞাসা করলো—কি ভাবছিলে বাবা? ভীখু বল্‌লে—ভাবছি বেটি, কাল খাব কি?

হারাণী তার গলা থেকে হারগাছটি খুলে ভীখুর হাতে দিয়ে বল্‌লে—কেন বাবা, এই হারছড়া নাও না। এইটে বিক্রী করলে আমাদের অনেকদিন চলে যাবে, তার মধ্যে একটা কিছু কাজ নিশ্চয় জোগাড় হয়ে যাবে।

ভীখু তাড়াতাড়ি হারটা হারাণীর গলায় পরিয়ে দিয়ে বল্‌লে—খবরদার। ও হার কখনো আমার হাতে দিবি নে। ওই হার বেচে আমি রুটীর জোগাড় করবো! তুই বল্‌লি কি করে বেটি?

হারাণী বল্‌লে—বেশ, হার আমি তোমায় দেব না। কিন্তু তুমি ভেবো না বাবা, উপোষ করে আমাদের মরতে হবে না। আমিও তো ছোট নেই এখন—দেখ না, জিনিষ ফিরি করে আমি কত রোজগার করি।

ভীখু হেসে বল্‌লে—কি ফিরি করবি?

হারাণী বল্‌লে—তুমি আমায় গোটা দশেক টাকা ধার করে এনে দাও। হারটা তো বেচবে না। দেখবে আমি দশটাকা থেকে কত টাকা করে আনি।

ভীখু একটু ভেবে বললে—তাই হবে; বাপ বেটিতে খেটে খাব—পাপের পয়সা আর কিছুতেই ছোঁব না মা।

হারাণী ভীখুর পাকা চুলের মধ্যে তার হাত ঘস্‌তে লাগ্‌লো।

* * *

দুপুরের আগে হারাণী নানা জায়গা ঘুরে বাড়ী ফিরে এল। ছোট একটা বাক্স নামিয়ে রেখে মেঝেয় শুয়ে পড়লো। বড়ই ক্লান্ত সে। আজ তার জিনিষ তেমন বিক্রী হয় নি। কিছুদিন অবশ্য ভালই চলেছিল। সে নিয়ে বেরুতো ছেলেদের নানা রকম বাহারি প্লাষ্টিকের খেল্‌না, মেয়েদের মাথার ফিতে প্রভৃতি। যেখানেই সে যেতো মেয়েরা আদরে তার জিনিষ নিত, বসিয়ে গল্প করতো, আর জিনিষের দামও দিত অনেক সময় একটু বেশিই। দিন চলছিল মন্দ নয়—কিন্তু আজ ছোট একটি ব্যাগ মাত্র দু আনায় বিক্রী হয়েছে, আর কিছু না। আজই আবার ঘরে মোটে চাল নেই। চাল কিন্‌তে হবে. তবে রেঁধে বাবাকে খাওয়াবে, নিজে খাবে।

ভীখুও ভুগে ভুগে ইদানীং একটু খিট্‌খিটে হয়েছে। যদি সে এখুনি এসে হাজির হয়—যদি হঠাৎ খেতে চায় তবেই মুস্কিল। হারাণী ভাব্‌ছে—কি করে আজকের বেলাটা চালিয়ে নেবে।

ঠিক সেই সময়েই ভীখু বাড়ীতে ঢুক্‌লো এবং হারাণীকে শুয়ে থাক্‌তে দেখে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—আরে শুয়ে আছিস্ কেন রে তুই? ভাত হয়ে গেছে? দে, আমায় খেতে দে, আজ বড্ড ভুখ্ লেগেছে রে।

কি উত্তর দেবে হারাণী! তার চোখ ফেটে তখন জল বেরুচ্ছে।

ভীখুর যেন তর সইছে না। বল্‌লে—কিরে—ওঠ্—তবু শুয়ে রইলি।

হারাণী ধীরে জবাব দিলে—আজ চাল নেই—একটা জিনিষও বিক্রী হয়নি। এই দু' আনা পয়সা আছে, তুমি মুড়ি কিনে খাওগে। আমার বড্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে বাবা, কিছু খাবো না।

ভীখুর মেজাজ একেবারে বিগড়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—দু' আনার মুড়িতে আমার কি হবে রে? আমি আজ দই ভাত খাবো।

কি জানি কেন হারাণী যেন আর সহ্য করতে পারলে

না। তাড়াতাড়ি উঠে গলা থেকে হারটা খুলে ভীখুর হাতে দিয়ে বল্‌লে—তবে এই হারটাই বেচ গে। যা পাবে তাতে তুমি অনেকদিন দুই ভাত খেতে পারবে। আমার শরীর আর বইছে না।

ভীখুরও যেন কি হ'ল। হারছড়াটা নিয়ে সে বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল এবং হাজির হলো একেবারে হরি পোদ্দারের দোকানে। তখন পোদ্দার দোকান বন্ধ করে বাড়ীর ভেতর গেছে, ভীখুর ডাকাডাকিতে হরি পোদ্দারের ছোট ছেলে ঘুনসে এসে বল্‌লে—'তুমি একটু দাঁড়াও গো, বাবা এখনি খেয়ে আস্‌ছে।'

হরি পোদ্দারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ভীখু ভাব্‌তে লাগ্‌ল কত টাকায় সে হারছড়াটা বাঁধা দিতে পারে! টাকার কথা মনে হতেই তার মনটা কিসের পাকে ঘুরে গেল, মনে হলো সামান্য কটা টাকার জন্যে এই হার বাঁধা দেবে—হারাণীর গলা থেকে ছিনিয়ে আনা এই হার। তার বুক যেন ফেটে যেতে লাগ্‌লো, সে আর দাঁড়াতে পারলো না, হরি পোদ্দারের দোকানে যেমন ছুটে এসে ঢুকেছিল, তেমনি ছুটেই বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

* * * *

বেলা পড়ে এসেছে। হারাণী ঠিক সেই ভাবেই শুয়ে আছে, চোখের জল শুকিয়ে তার দু-গালে দাগ রেখে গেছে, সে কেবলি ভেবেছে যে—সে না জানি কি অপরাধই করেছে যার জন্যে বুড়ো বাপকে ক্ষুধার জ্বালায় তার স্নেহের কন্যার হার খুলে নিয়ে যেতে হয়েছে—দোষ তো তারই।

এমন সময় ভীখু তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে হারাণীকে জড়িয়ে ধরলো অনেকদিনের ফিরে পাওয়া হারানিধির মত, গলায় পরিয়ে দিল সেই হার। তারপর আট আনা পয়সা হারাণীর হাতে দিয়ে বল্‌লে—কি কি আন্‌বো বলতো মা—এখনি কিনে এনে দিচ্ছি। রান্না চড়িয়ে দে—বাপ বেটিতে দুটো মুখে দি।

হারাণী নির্ব্বাক। ভীখু তখনো বলে চলেছে—পারি কিরে বেটি, তোর গলার হার বেচে পেটের চানা জোগাড় করতে! তাইতো হারটা ফিরিয়ে আন্‌লুম। কালীমায়ীর কি দয়া দেখ মা—পথে একটা দোকানী তার মাল ঠেলাগাড়িতে তুলে মুটে খুঁজছে ঠেলবার জন্যে। লেগে গেলুম ঠেলাগাড়িটা নিয়ে। মুর্গিহাটায় পৌঁছে দিয়ে এই আট আনা মজুরি নিয়ে এলুম। তুই যা মা, উনুনে আঁচটা দে—আমি এক্ষুণি চাল আলু কিনে আন্‌ছি - সারাদিন যে কিছু খাস্ নি মা।

হারাণী তখনি উঠে পড়লো। সত্যিই তো তার বাবা তো সারাদিন কিছু খাই নি।

* * * *

পরের দিন একটু বেলা হতেই হারাণী বেরিয়ে গেছে তার মনোহারী জিনিষের বাক্সটি হাতে নিয়ে। ভীখু যেতে দিতে চায় নি তার শরীর সুস্থ নয় বলে—কিন্তু শোনে কি হারাণী ভীখুর সে কথা।

ক্রমে একটু বেলা বাড়তে ভীখু ধীরে ধীরে গেল উনুনটায় আঁচ দিতে। ভাব্‌লে চাল তো ঘরে রয়েইছে—ভাতটা চড়িয়ে দি, বেটি এলে তাড়াতাড়ি একটা তরকারি রেঁধে নিয়ে দুজনে খেয়ে নেবে। আহা, মেয়েটার শরীর বড্ড দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে।...ভাত হয়ে গেল, তবু হারাণী ফিরলো না। ভীখু একটা তরকারিও রেঁধে ফেলে দাওয়ায় বসে ভাব্‌তে লাগ্‌ল তাই তো বেটির এত দেরি হচ্ছে কেন? আসুক ফিরে—আজ তাকে খুব বকুনি দেবে।

দুপুর গড়িয়ে গেল। ভীখু কাঁধে গামছাটা ফেলে ঘর থেকে বেরুবে মেয়ের খোঁজে—এমন সময় জনকয়েক ভদ্র-লোক হারাণীকে নিয়ে তার ঘরের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। ভয়ে ভাবনায় ভীখুর হাত-পা কাঠ হয়ে গেল—একি ব্যাপার! এত লোক মিলে হারাণীকে বয়ে নিয়ে আস্‌ছে কেন? ভীখু তাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো।

একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—ভীখু তোমার নাম?

আজ্ঞে আমারই—ও আমার বেটি—হারাণী বাবুজি।

ভদ্রলোকটি ধমকে বল্‌লেন—কি আক্কেল বল তো তোমার হে? এই দুর্ব্বল মেয়েকে পাঠিয়েছ তোমার জিনিষ ফিরি করতে। চালাকি তো খুব শিখেছ—নিজে না গিয়ে মেয়েকে দিয়ে লোকের বাড়ী বাড়ী খেল্‌না বেচতে পাঠাও, যাতে বেশি খদ্দের হয়। কিন্তু মেয়েটা যে মরতে বসেছিল।

ভীখু কেঁদে ফেল্‌লে। বল্‌লে—কি হয়েছিল বাবুজি বেটির আমার?

ভদ্রলোক বল্‌লেন—মাথা ঘুরে পড়ে গেছলো, আর কি হবে।

কথাগুলো বন্দুকের গুলির মতো ছুটে ভীখুর বুকে এসে বিঁধলো। একটি বালক আরো একটু এগিয়ে এসে ভীখুকে বল্‌লে—যে বাড়ীর রোয়াকে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সেই বাড়ীর গিন্নিমা এই দুটো টাকা দিয়েছেন—বলেছেন ভাল হয়ে উঠলে একদিন যেন সেই বাড়ীতে গিয়ে দু-টাকার খেল্‌না দিয়ে আসে। টাকাটা আগাম দিয়েছেন। বলে টাকা দুটো ভীখুর হাতে দিল।

ভীখু টাকা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বল্‌লে—বাবুরা আপনারা একটু দেখুন মেয়েটাকে, আমি চট্ করে একটু দুধ কিনে আনি।

* * * *

বৃদ্ধা তার নাত্‌নিকে জিজ্ঞাসা করলেন—গৌরী, কাল সারারাত তুই কি চোখের পাতা বুজুস্ নি দিদি?

গৌরী বল্‌লে—দিদিমা আমার মন বল্‌ছে সে ফিরে আস্‌বে—তাকে যেন আবার পাবো। নইলে আমাদেরই রোয়াকে ও মাথা ঘুরে পড়বে কেন, আর আমিই বা এতদিন পরে কাল আবার তোমার এখানে আস্‌বো কেন?

বৃদ্ধার বুক থেকে একটা চাপা শ্বাস বেরুল—আহা, এই হলো মায়ের মন। কতদিন আগে মেয়েটাকে মা গঙ্গাই বোধহয় নিয়ে গেছেন, আজও নাত্‌নি তার শোক ভুল্‌তে পারি নি।

গৌরী বল্‌লে—দিদিমা, তোমার মনে আছে টুলুর যখন তিন বছর বয়েস তখন ওর কাঁধে একটা ফোড়া হয়, তারপর সেই ফোড়া চেরাই হ'লে কত বড় একটা দাগ থেকে গেছলো!

দিদিমা বল্‌লেন—আমি তো দিদি লোক দিয়ে টাকা পাঠিয়েছি, শুনেছি এ পাড়া দিয়ে সে নিত্য যায়। সে নিশ্চয় আস্‌বে জিনিষ দিতে। তখন তুই তোর মনের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নিস্।

সেই সময় একটা স্বর কানে যেতেই গৌরী ঘর থেকে ছুটে বাইরে গেল। হারাণী তাকে জিজ্ঞাসা করলো—আপনারা কি দু টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন খেল্‌না নেবেন বলে?

গৌরীর কানে হারাণীর একটা কথাও পৌছল না। সে শুধু চেয়েছিল হারাণীর দিকে একদৃষ্টে—অন্তরে নানা সন্দেহ, নানা নিশ্চয়তা নিয়ে। তার বুকের মধ্যে তখন হাতুড়ির ঘা পড়ছিল—এ যেন ঠিক সেই মুখ—সেই নাক—সেই চোখ? সবই সে, শুধু বয়সের জন্যে যা কিছু তফাৎ। গৌরী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লে—তোমার নাম কি মা?

হারাণী।

হারাণী? এ রকম নাম কেন? কথাটা বলে গৌরী হারাণীর দিকে বিহ্বল চোখে চেয়ে রইলো।

ছেলেবেলায় হারিয়ে গেছলুম—বাবা কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছেন, নাম রেখেছেন হারাণী।

বাড়ীর সকলেই তখন সেখানে হাজির হয়েছে। দিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন—কালীঘাটে যোগের সময় হারিয়ে গেছলে কি মা?

হ্যাঁ—কিন্তু আপনারা কি করে জান্‌লেন?

গৌরী তাকে প্রাণপণ শক্তিতে বুকে জড়িয়ে ধরলো। বল্‌লে—ওরে মা জান্‌বে না তার মেয়ে-হারানর ঘটনা। আমি যে তোর মা।···এই দেখ দিদিমা, কাঁধের সেই কাটা দাগের চিহ্ন এখনও রয়েছে।

তারপরের ঘটনা যা হয় তাই।

হৈ-চৈ পড়ে গেল বাড়ীতে, মা কালীর পূজো সবাই মন্দিরে গিয়ে দিয়ে এলেন। বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হ'লো। গৌরী ব্যস্ত হয়ে উঠলো মেয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে, স্বামীকে আগে খবর না দিয়ে কন্যা নিয়ে হাজির হবেন সাম্‌নে। এই সব হৈ-চৈএর মধ্যে হারাণী যেন গুলিয়ে গেল, নির্ব্বাক বিস্ময়ে সে অভিভূত।

গৌরীর মামা সুরেশবাবু এসে বল্‌লেন—ভীখু সর্দ্দারের কাছে সব খোঁজ নিয়ে এলুম। সে সবই স্বীকার করেছে, লোকটা খুব ভাল। দুশো টাকা দিতে চাইলুম, কিছুতেই নেবে না, শেষে তার সাম্‌নে ফেলে দিলুম। আহা, ওর ও-টাকা পাওয়া উচিত। লোকটা না নিয়ে গেলে টুলুর বরাতে কি হতো কে জানে।······নাও নাও, দেরি কোরো না, ট্যাক্সিতে মিটার উঠছে, গৌরী গাড়ীতে উঠে পড়—ট্রেণের আর সময় বেশি নেই।

এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে সুরেশবাবু হাঁপাতে লাগ্‌লেন। হারাণীকে নিয়ে গৌরী ও সুরেশবাবু ট্যাক্সিতে উঠলেন। ট্যাক্সিটা গলি পার হয়ে বড় রাস্তায়

আস্‌তেই হারাণী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—এই ট্যাক্সি, বাঁয়ে নয়—ডাইনে যাও।

*　　*　　*　　*

হারাণীর আসার অপেক্ষায় ক্লান্ত ভীখু কেবল ঘর-বার করছিল, তখন সহসা সুরেশবাবুর আবির্ভাবে সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। আবার ভদ্রলোক আসে কেন ঘরে—আবার কোন বিপদ হলো না কি বেটির। নাঃ আর তাকে বাড়ী থেকে বেরোতে দেবে না। নিজেই যেমন করে হ'ক দু'জনের খোরাকির মত রোজগার করে আনবে, তারপর সুরেশবাবুর কাছে যখন শুনলে যে হারাণী তাদেরই হারাণো মেয়ে, এতদিন পরে তারা তাকে খুঁজে পেয়েছে তখন যেন সে পাষাণ হয়ে গেছে। তারপর কি কথাবার্ত্তা হয়েছে কিছুই তার মনে নেই। সহসা তার সম্বিৎ যেন ফিরে এল, সে ছুটে রাস্তায় এসে চেঁচাতে লাগ্‌লো—বাবু—বাবু—শুনুন—শুনুন—আমি আপনাদের কোন কথা বিশ্বাস করি না—সব ঝুট্‌, সব ঝুট্‌ হ্যায়। আমার বেটিকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছো।

তারপর নীরবে পথের দিকে খানিক চেয়ে থেকে ফিরে এলো আবার ঘরে। দেখলে চৌকাঠের ধারে কতকগুলো নোট পড়ে আছে। নোটগুলো সে দু'হাতে ধরে কুঁচোতে আরম্ভ করলে, তারপর সেগুলো রাস্তায় ছড়িতে দিতে লাগ্‌লো, আর বিড় বিড় করে বক্‌তে আরম্ভ করলে—সব ঝুট্‌ হ্যায়—সব ঝুট্‌ হ্যায়।

*　　*　　*　　*

ট্যাক্সিটা ঘচ করে সরু গলিটার সাম্‌নে এসে দাড়াল। সুরেশবাবু বল্‌লেন—তোমরা বোসো, আমি ওকে ডেকে আনছি, একবার টুনুকে দেখে যাক্‌। যাহ'ক মানুষ করেছে তো এতদিন, মায়া পড়তেই পারে।

হারাণী সে কথায় কান না দিয়ে ট্যাক্সি থেকে লাফিয়ে পড়লো এবং 'বাবা বাবা' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ভীখুর সামনে হাজির হলো।

ভীখু ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রয়েছে হারাণীর পানে, মুখে কোন কথা নেই।

সুরেশবাবু, গৌরী তখন ঘরের মধ্যে এসে গেছে।

হারাণী আবার ডাক্‌লে—বাবা।

ভীখু একবার হারাণীর দিকে চাইলে—ফিরে চাইলে সুরেশবাবু আর গৌরীর দিকে, তারপর বিকট ভাবে চেঁচিয়ে উঠলো—'নেহি নেহি, সব ঝুট্‌ হ্যায়।'

হারাণী ভীখুর এ অবস্থা দেখে কেঁদে উঠলো, আবার জোরে ডাক্‌লে—বাবা, আমি এসেছি, আমি আর কোথাও যাবো না বাবা, তোমার কাছে সব সময় থাক্‌বো।

তারপর গৌরীর দিকে ফিরে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে—আমি বাবাকে ছেড়ে কোথাও যাব না—তাহলে বাবা বাঁচবে না। তোমরা চলে যাও—তোমরা চলে যাও।

গৌরী বল্‌লে—দাদা, তুমি লোকটিকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে বাড়ী ফিরে চল, ডাক্তার দেখাতে হবে। আর দেশে একটা টেলিগ্রাম করে দাও—টুনু ফিরে এসেছে সবাই যেন কলকাতায় চলে আসে।

ভীখু চেঁচাতে থাকে—নিকাল যাও হিঁয়াসে—নিকাল যাও। সব ঝুট্‌ হ্যায়—সব ঝুট্‌ হ্যায়।

বর্ষায়

ভূদেব চট্টোপাধ্যায়

ঝর ঝর জল পড়ে ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ শব্দ
কালো মেঘে আলো ঢাকা রবি তাই জব্দ,
চারিদিকে খালি শুনি ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ শব্দ।
　জলে ভিজে কোলা ব্যাং,
　ডাকে খালি গ্যাং গ্যাং
কটোর কটোর কট্‌ সে কি গলা ফোলানি,
পুবালী বাতাসে মনে লাগে বুঝি দোলানি।
সন্ধ্যার সাথে সাথে ঝিঁঝিঁ পোকা ধরে তান,
গংগা ফড়িং নাচে বরষার গেয়ে গান।
　উৎসব প্রাঙ্গণে শ্রোতা সব স্তব্ধ,
　চারিদিকে খালি জাগে ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ শব্দ॥

ঝরে বর্ষা

বিভূতি ভট্টাচার্য্য

টুপ্‌টাপ্‌, টুপ্‌টাপ্‌ ঝরে বর্ষা,
দেয় আজ বুকে যেন কত ভরসা।

টুপ্ টাপ্ টুপ্ টাপ্ দেখি সহসা,
পৃথিবী নীরস হোলো কত সরসা।
কিশলয়ে মাথা তোলে তৃণ দোলে আজ,
দেখ সবে ফুলে ভরা বনানীর সাজ।
ঘন মেঘ নীলাকাশে
দলে দলে কত ভাসে,
দিন হলো তবু দিক্ হলো নাকো ফর্সা,
টুপ্ টাপ্, টুপ্ টাপ্ ঝরে খালি বর্ষা।

খবর নেওয়া-দেওয়া

সন্ধানী

আত্মীয়-বন্ধু আছেন দূরে, তাঁরা কেমন আছেন, জানবার জন্য মন আকুল থাকে—এ আকুলতা ঘুচোবার জন্য আমরা এ যুগে চিঠি-পত্র লিখি, প্রয়োজনে টেলিগ্রাম করি—এমনি ভাবে খবর নেওয়া-দেওয়া চলে সাধারণতঃ।

কিন্তু এ ভাবে খবর নেওয়া-দেওয়ার সুবিধা মেটবার আগেও খবরা-খবর নেওয়া-দেওয়ার রীতি কি রকম ছিল সে কথা বেশ মজার।

পুরাণ ইতিহাসে আমরা পড়ি—দূতের মারফৎ বড় বড় ঘরোয়ানাদের খবর দেওয়া-নেওয়া চলতো—ঘোড়ায় চড়ে লোক যেতো, নৌকায় চড়ে যেতো—হেঁটে যেতো এখান থেকে সেখানে খবর নেওয়া-দেওয়ার কাজে। আমাদের দেশে ছেলে-মেয়ের বিয়ের পরে তত্ত্ব-তাবাস পাঠানোর রেওয়াজ ছিল। তত্ত্ব-তাবাসের অর্থ এ যুগে দাঁড়িয়েছিল—মেয়ে-জামাই কুটুমকে খাবার-দাবার আর নানা জিনিষ পাঠানো—কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল মেয়ে-জামাইয়ের তত্ত্ব বা খবর নেওয়া! শুধু হাতে লোক যাবে খবর নিতে ভালো দেখায় না—তাই জিনিষ-পত্র পাঠানো হতো। ইদানীং অবশ্য খবর নেওয়াটা আর তত্ত্ব-তাবাসের আসল উদ্দেশ্য ছিল না—জিনিধ পাঠানোই হয়ে উঠেছে পরম লক্ষ্য।

এখন রেডিয়োর কল্যাণে সারা পৃথিবীর সব খবর আমরা সকল দেশে বসে চকিতেই পাচ্ছি—কিন্তু এ ব্যবস্থার চলন কদিনই বা হয়েছে!

সেকালে ভারতবর্ষে উত্তর-আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ঢাক-ঢোল পিটে জরুরি-খবর জানানো হতো—ঢাকের বোলে থাকতো বৈচিত্র্য, আর সেই বিচিত্র রোল থেকে সঙ্কেতে অর্থ বোঝা হতো। সন্ধ্যার পর প্রচণ্ড আগুন জেলে সেই আগুনের শিখার সাহায্যে খবর দেওয়া-নেওয়া চলতো। শেখানো পায়রা থাকতো অজস্র—চিঠি লিখে পায়রার পায়ে সে চিঠি আঁটায় বেঁধে তাদের উড়িয়ে দেওয়া হতো—শেখার গুণে এ সব পায়রা ঠিক গিয়ে পৌঁছতো…চিঠির ডাক্ নিয়ে। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় য়ুরোপে আমেরিকায় এই ভাবেই খবর দেওয়া-নেওয়া চলতো—এ ছাড়া আলোর রশ্মি আকাশে ফেলে খবরা-খবর নেওয়ার প্রথা ছিল।

খৃষ্ট জন্মের প্রায় তিনশো বছর আগে—সোলার বড় বড় আধার তৈরী করে জলে সে গুলো ছেড়ে দেওয়া হতো—আধারের মধ্যে থাকতো সাঙ্কেতিক পরিভাষা, শত্রুপক্ষ পড়ে অর্থ বুঝতো না—স্বপক্ষ অর্থ বুঝতো। তবে এভাবে খবর পৌঁছনো সম্বন্ধে নিশ্চয়তা থাকতো না। তবু কাজ যে একেবারে হতো, না তা নয়।

রোমানরা তৈরী করেছে সঙ্কেত টাওয়ার—পথে খানিক খানিক দূরান্তরালে উঁচু টাওয়ার তৈরী থাকতো—দিনে সেই টাওয়ারের মাথায় আগুন জ্বেলে ধোঁয়া সৃষ্টি করে খবর পাঠানো হতো, আর রাত্রে ধোঁয়ার বদলে জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় খবর যেতো।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা প্রথা সৃষ্টি করে—বাতাসে শব্দ যোজনা করে খবর পাঠানো, গ্রাফ পদ্ধতিতে এ শব্দ যোজনা করা হতো—এর ফল ছিল সেমাফোন টেলিগ্রাফ। খুব উঁচু একটা টাওয়ারের উপর ঘড়ির মতো বড় একটি যন্ত্র লাগানো থাকতো—আর সেই যন্ত্রে ঘড়ির মতো কাঁটা থাকতো—কাঁটা ঘুরিয়ে ঘড়ি বাজালে ঘড়ির শব্দ ন-দশ মাইল দূর পর্য্যন্ত শোনা যেতো। এই পদ্ধতির উন্নতি করে প্রুশিয়া-ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ বাতির সৃষ্টি হয়।

এর পর ১৮৭৬ সালে টেলিফোনের সৃষ্টি—তখন দু-মাইল দূরে পর্য্যন্ত খবর দেওয়া চলতো—টেলিফোনের এমন উন্নতি হয়েছে ১৯২২ সালে—তার ফলে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়েও টেলিফোনে খবরাখবর নেওয়া-দেওয়ার চলন হলো। তবে বেশ চড়া গলায় কথা না

বললে—তখন কথা শোনা যেতো না। ১৯২৪ সালে এ ত্রুটি সেরে টেলিফোনের চরম উৎকর্ষ সংসাধিত হয়েছে। ১৯২৪ সালেই আমেরিকার হোয়াইট-হাউসে বসে প্রেসিডেণ্ট ক্লিজ সারা মার্কিণ রাজ্যে তাঁর বাণী শুনিয়েছিলেন—কানাডায় এবং য়ুরোপেও বাণী পাঠিয়েছিলেন।

রেডিয়োর সাধনা কতকটা সফল হয় ১৯১১ সালে—তখন এ যন্ত্রের আকার ছিল অদ্ভুত—এবং ব্যবহারের প্রণালী ছিল রীতিমত জটিল।

আজ রেডিয়োর দৌলতে আমরা বুঝতে পেরেছি সারা পৃথিবী জুড়ে শব্দ-তরঙ্গ বয়ে চলেছে—কোটী কোটী বাণী বুকে বয়ে বাতাস সংবাদ বহন করে চলেছে—তার ভিতর থেকে যার যে বাণী প্রয়োজন—কি করে সে তা গ্রহণ করছে—সে কাহিনী আর একদিন বলবো ইচ্ছা রইলো।

—

পুণ্যতীর্থ সারনাথ

শ্রীবিমানচাঁদ মল্লিক

সারনাথ বৌদ্ধদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানগুলির একটি। কাশীর সাড়ে পাঁচ মাইল উত্তরে এই সারনাথ তীর্থ। সারনাথেই গৌতম বুদ্ধ প্রথম তাঁর অহিংসার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তাই আজো সারনাথ বৌদ্ধধর্ম্মের পীঠস্থান হয়ে আছে।

বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী যুগে এখানে গড়ে উঠেছিল বিশাল এক বৌদ্ধ বিহার—বৌদ্ধ ধর্ম্ম শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল। চীন, জাপান, যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ থেকে ধর্ম্মার্থীরা এসে এখানে ধর্ম্ম শিক্ষা করতেন। সম্রাট অশোকও সারনাথে এসে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। আজও এখানে ভগ্ন অশোকস্তম্ভে সে যুগের অশোক লিপি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সম্রাট কনিষ্ক, সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন, পাল রাজগণ যুগে যুগে সারনাথের ঐতিহ্য বজায় রেখে এসেছেন। সুদীর্ঘ সতেরশো বছর ধরে যে সারনাথ ছিল বৌদ্ধ ধর্ম্ম শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল, আজ তা শুধু জীর্ণ ভগ্ন স্তূপের সমষ্টি-রূপে দর্শন ও গবেষণার বস্তু হয়ে রয়েছে।

সারনাথের আগেকার নাম ছিল মৃগদাব। "মৃগদাব" মানে হল মৃগ অর্থাৎ হরিণদের দান করা জায়গা। কি ভাবে হরিণদের এ জায়গাটি দান করা হয়েছিল এখন সেই কথা বলি।

অনেকদিন আগে এখানে এক বিরাট বন ছিল, আর সেই বনে বাস করত এক হাজার হরিণ। এই হরিণদের এক রাজা ছিল—নাম তাঁর রোহক। রোহকের দুই ছেলে…ন্যায়গ্রোধ আর বিশাখা। রোহক তাঁর হরিণ প্রজাদের সমান দু ভাগ করে তাঁর দু ছেলেকে দু দলের রাজা করে দিলেন।

এদিকে কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্ত প্রায়ই এই হরিণদের বনে এসে প্রচুর হরিণ শিকার করতেন, আর তার চেয়ে বেশি হরিণ আহত হয়ে ঝোপে ঝাড়ে পড়ে পরে মারা যেত। ফলে হরিণদের মধ্যে ভয়ঙ্কর ত্রাসের সঞ্চার হল, আর তাদের সংখ্যাও ভীষণ ভাবে কমতে সুরু করল।

এই দেখে একদিন ন্যায়গ্রোধ তার ভাই বিশাখাকে ডেকে বলল, ভাই, এসো, আমরা কাশীর রাজাকে বলি যে তিনি কি ভীষণ ভাবে আমাদের ক্ষতি করছেন। আর তিনি যদি রাজী থাকেন তো আমরা প্রতিদিন তাঁর আহারের জন্যে তাঁর রন্ধন শালায় একটি করে হরিণ পাঠাতে প্রস্তুত। এই প্রস্তাবে বিশাখাও রাজী হল।

এমন সময় কাশীরাজ দল বল নিয়ে মৃগয়া করতে এসে হাজির। তাকে দেখে দুই হরিণ-রাজা নির্ভয়ে কাশীরাজার দিকে এগিয়ে গেল। দুটি সামান্য হরিণের এমন দুঃসাহস দেখে রাজা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, আর সকলকে জানিয়ে দিলেন নিশ্চয়ই কোন অভিপ্রায়ে তারা আসছে, সুতরাং কেউ যেন তাদের বাধা না দেয়।

তারা গিয়ে রাজাকে অভিবাদন করে মানুষের গলায় বলল, "মহারাজ, এই অরণ্য আপনার। আমরা নিরীহ হরিণের দল এখানে বাস করি। যেমন নগরের নাগরিকরা আপনার প্রজা, আমরাও তেমনি আপনার প্রজা। তাদের রক্ষা করা যেমন আপনার কর্ত্তব্য, তেমনি আমাদের রক্ষা করাও আপনার কর্ত্তব্য। কিন্তু রক্ষার বদলে আপনি নিয়মিত আমাদের ধ্বংস করে পাপ সঞ্চয় করছেন। তবে আপনি যদি রাজী থাকেন তাহলে আপনার আহারের জন্যে আমরা প্রতিদিন আপনার রন্ধনশালায় একটি করে হরিণ পাঠাতে পারি।"

কাশীরাজ তাদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে ঘোষণা করলেন—কেউ যেন কোন হরিণকে আর না হত্যা করে। তারপর রাজা সদলবলে কাশী ফিরে গেলেন।

তখন আবার হরিণদের নতুন ভাবে গণনা করে দু ভাগ করা হল। স্থির হল একদিন অন্তর এক এক দল হতে একটি করে হরিণ পাঠান হবে। যাতে ঠিক মত এই কাজ হয় তাই দুই রাজা নিজের নিজের দলে এক একজন দলপতি নিযুক্ত করলেন।

ঠিকভাবে প্রতিদিন একটি করে হরিণ রাজার রন্ধন শালায় পাঠান হয়। কোন অসুবিধে নেই।

হঠাৎ একদিন বিশাখার দলের একটি হরিণীর যাবার পালা পড়ল, তার পেটে তখন দুটি বাচ্চা। সে তার দলপতিকে গিয়ে জানাল যে এখন সে যদি যায় তাহলে তার মৃত্যুর সংগে তার বাচ্চাদুটিরও মৃত্যু হবে। তার বাচ্চা হয়ে যাবার পর সে স্বচ্ছন্দে যেতে রাজী আছে। এখন যদি তার বদলে অন্য কেউ যায় তো বড় ভাল হয়। দলপতি গিয়ে সমস্ত ব্যাপার সেই দলের রাজা বিশাখাকে জানাল। সব শুনে বিশাখা বলল, কেউ তার হয়ে যাক। কিন্তু কেউই যেতে রাজী হল না—বলল, "আমাদের তো এখন পালা নয়, যাব কেন?"

বেচারা হরিণী কি করে—ন্যায়গ্রোধের কাছে গেল। কিন্তু ন্যায়গ্রোধের দলেরও কেউ যেতে রাজী হল না। কি উপায়! ন্যায়গ্রোধ নিজেই চলল কাশী-রাজের রন্ধন-শালার দিকে।

পথে যত লোক তাকে দেখে সবাই বিস্ময়ে বলে, "এমন সুন্দর হরিণটি কেন চলেছে? এ যে হরিণদের রাজা! নিশ্চয়ই সব হরিণ শেষ হয়ে গেছে তাই আজ এ চলেছে। একে কিছুতেই হত্যা করতে দেওয়া হবে না—এ রাজ্যের অলঙ্কার স্বরূপ।"

রাজ্যের সব লোক হাজির হল কাশীরাজের কাছে; ন্যায়গ্রোধের প্রাণ ভিক্ষা চাইল। কাশীরাজ ন্যায়গ্রোধকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—হঠাৎ আজ সে নিজে কেন এসেছে। ন্যায়গ্রোধ সকল কাহিনী বর্ণনা করল।

রাজা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন; বললেন, "যে অপরের জীবন রক্ষার জন্যে নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সে পশু নয়। আর আমরাই প্রকৃত পশু। কারণ আমরা ন্যায়পরায়ণ নই। আজ থেকে রাজ্যে পশুবধ নিষিদ্ধ।"

রাজার আদেশ চারদিকে ঢাঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল।

এ ঘটনা স্বর্গে দেবতাদের কানেও পৌঁছাল। তখন দেবরাজ কাশীরাজের ন্যায়পরায়ণতা পরীক্ষা করবার জন্যে হাজার হাজার হরিণ সৃষ্টি করলেন। ফলে রাজ্যের মানুষ প্রজারা আর থাকবার জায়গা পায় না। তাই তারা রাজার কাছে নালিশ করে বললে, "প্রভু, হরিণদের জন্যে সমস্ত রাজ্য ধ্বংস হতে চলেছে। হরিণেরা আমাদের সকল শস্য খেয়ে ফেলছে। এদের প্রতিরোধ করবার উপায় করুন।"

রাজা বললেন, "যাক, রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাক। হরিণদের রক্ষা করব বলে মৃগরাজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি সুতরাং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারব না।"

এমনি ভাবে হরিণদের জন্যে নিজেদের সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন করে কাশীরাজ রক্ষদত্ত এই জায়গাটি হরিণদের দান করেছিলেন—তাই এর নাম হল—মৃগদাব।

সারনাথের ইতিহাসের সংগে এমনি কত কাহিনী জড়িয়ে আছে। আর এর স্তূপ বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লুকিয়ে আছে ইতিহাসের কত অনাবিষ্কৃত তথ্য। যুগ যুগ ধরে প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারনাথ—পুণ্যতীর্থ সারনাথ।

রাশিয়ায় শ্রীনেহরু

শ্রীসুবোধ রায়

বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি করে ভারতবর্ষ তার নিজস্ব রাজনীতি, শান্তি-নীতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। দুশো বছর পরাধীনতার পর স্বাধীনতা অর্জন করে নূতন উদ্যমে দেশকে নূতন ভাবে গড়ে তোলার জন্যে বদ্ধপরিকর ভারত সরকার গঠনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে সক্রিয়ভাবে প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তিতে এক অভিনব পন্থায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্রগঠনের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। আর সাথে সাথে নিজস্ব পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে বিশ্বের দরবারে ভারতের আসনকে অতি উচ্চে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করছেন। ভারত সরকারের পররাষ্ট্রনীতি যে ভারত তথা এশিয়ার পক্ষে সময়োপযোগী ও মঙ্গলকর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীনেহেরুর পররাষ্ট্রনীতি আজ সারা বিশ্বের প্রগতিশীল জনগণ দ্বারা অভিনন্দিত।

শ্রীনেহেরুর পররাষ্ট্র নীতির মূল কথা 'শান্তি'! ভারত, এশিয়া তথা সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান ভূমিকা ভারত সরকার অতি নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তাই যেদিন জন-গণতান্ত্রিক চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন্-লাই-এর সঙ্গে শ্রীনেহরু পঞ্চশীল চুক্তি সম্পন্ন করে জন-গণতান্ত্রিক চীনের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করলেন সেদিন সারা দুনিয়া বিস্মিত না হয়ে পারে নি। যুদ্ধবাদী জাতিগুলি ঠিক যে সময় এশিয়ার বুকে সমরানল জ্বালাবার জন্যে বদ্ধপরিকর হ'য়ে জোট বাঁধছেন, 'সিয়াটো' সৃষ্টি করছেন, ঠিক সেই সময়ে চৌ-নেহেরুর এই চুক্তি তাদের সেই যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিরোধ হিসাবেই মাথা তুলে দাঁড়ালো। তার পর বান্দুং সম্মেলনে সেই প্রতিরোধ আরও দৃঢ় হয়ে উঠলো, চৌ-নেহেরুর পঞ্চশীল দশশীলরূপে আত্মপ্রকাশ করল। এশিয়ার বুকে যুদ্ধ বাধানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। বান্দুং সম্মেলনের সেই দশ দফা চুক্তিও সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল জনগণ দ্বারা অভিনন্দিত হোলো। তার পর শ্রীনেহেরুর আমন্ত্রণ এলো সমাজতন্ত্রবাদের পিতৃভূমি সোভিয়েৎ ইউনিয়ন থেকে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শান্তির দূত শ্রীনেহেরু ৭ই জুন ১৯৫৫ সদলবলে সোভিয়েৎ সরকারের আমন্ত্রিত অতিথিরূপে উপস্থিত হলেন রাশিয়ার প্রাণকেন্দ্র মস্কো সহরে।

"শ্রীজওহরলাল নেহেরুর রৌদ্রস্নাত বিমানখানি অপরাহ্ন ছয় ঘটিকার সময় দিগ্বলয় পার হইয়া সাবলীল গতিতে মস্কোর কেন্দ্রীয় বিমানবন্দরে আসিয়া ভূমিস্পর্শ করিল। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী পাটাতন ধরিয়া নামিয়া আসিতেই সোভিয়েৎ সরকারের ও কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ, কূটনৈতিকমণ্ডলীর সদস্যগণ এবং মস্কোর জননেতৃবর্গের মধ্যে যাঁহারা বন্ধু-ভাবাপন্ন দেশ ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বোচ্চ নেতাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মস্কোর কিশোর দল নেহেরুকে পুষ্পগুচ্ছ উপহার

আরও মসৃণ, কমনীয় ত্বক্
দিনে দিনে...
ক্যাডিল্*যুক্ত রেক্সোনা'কে
আপনার অবগুণ্ঠিত রূপকে
উন্মোচন করতে দিন
রেক্সোনা'র ক্যাডিল্-সমৃদ্ধ ফেনা আপনার ত্বকে
মোলায়েমভাবে রগড়ে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন,
আপনার ত্বক্ দিনে দিনে মসৃণতর আর কোমল হয়ে'-
এক নতুন উজ্জ্বলতর কমনীয়তায় ভরে তুলেছে।
বড় সাইজেও
পাওয়া যায়
Rexona
রেক্সোনা
ক্যাডিল্‌যুক্ত একমাত্র সাবান
* ত্বক্ পোষক ও কোমলতাপ্রসূ তৈল সমূহের এক
বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।

দিল। ভারতের পদ্মের মতই রুশিয়ার লিলাক পুষ্প যৌবন ও শান্তির প্রতীক।"

"কিশোরগণ রুশভাষায় ভারতের 'বন্দে মাতরম্' গানটি গাহিয়া ওঠে।"

"সোবিয়েৎ সরকারের সর্বোচ্চ নেতা এন, এ, বুলগানিন নেহেরুজীকে অভিনন্দন জানাইলেন। মস্কো গ্যারিসনের গার্ড অফ অনারের পাশ দিয়া নেহেরু হাঁটিয়া যাইবার সময় ব্যাণ্ড বাজে ভারত ও সোবিয়েতের জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। নিস্তব্ধ জনতার সম্মুখে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু হিন্দীভাষায় বক্তৃতা দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা রুশভাষায় তর্জমা করা হইল।"

"জওহরলাল ও বুলগানিন প্রথম মোটর গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। বিমানবন্দর হইতে আরম্ভ করিয়া নেহেরুজীর যাত্রা-পথের দুইধারে হাজার হাজার লোক সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নেহেরুজী, সোবিয়েৎ সরকার ও পার্টির নেতৃবৃন্দ ও ভারত-সোবিয়েৎ মৈত্রীর উদ্দেশে ঘন ঘন জয়ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। অতিথিবৎসল মস্কো উৎসাহপূর্ণ সম্বর্দ্ধনা জানাইল ভারতীয় মহাজাতির প্রতিনিধিকে।"*

মস্কোর রাজপথে সারিবদ্ধ বিরাট জনতা শ্রীনেহেরুকে যে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিল তার তুলনা নেই। একখানি খোলা গাড়ীতে ক'রে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন আর হাজার হাজার হর্ষমুখর জনতা তাঁর গাড়ী লক্ষ্য করে পুষ্পবৃষ্টি করছে। মস্কোর জনতা এমনভাবে আর কখন কোন অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছে কিনা জানি না।

কবি রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় উপস্থিত হয়ে লিখেছিলেন "রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অসমাপ্ত থাকতো।" শ্রীনেহেরুও বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করে' উচ্চারণ করলেন—"তিনি একজন তীর্থযাত্রী—এখানে এসেছেন শান্তির সন্ধানে, নিজের দেশের জন্য ঐশ্বর্যের সন্ধানে।" বিমান ঘাঁটিতে তাঁর সেই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় তিনি পরিষ্কারভাবে তাঁর রাশিয়া ভ্রমণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন, "আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত বাসনা পূর্ণ হয়েছে—আশা করি আমার এই সফর—ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর করবে।"

পরদিন তিনি সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন ও পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মঃ মলটভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করেন; এসব আলোচনায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কে, পি, এস, মেনন উপস্থিত ছিলেন।

মার্শাল বুলগানিন ও মঃ মলটভের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর শ্রীনেহেরু ও তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী রেড স্কোয়ারের লেনিন ও ষ্ট্যালিনের সমাধি পরিদর্শন করেন। সেই দুই পরলোকগত মহান নেতার রক্ষিত মৃতদেহ দুটির পাশে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধান্তঃকরণে তিনি সমাধিক্ষেত্রে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন। লেনিন ও ষ্ট্যালিনের সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের পর ক্রেমলিনে আরও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সমাধিও পরিদর্শন করেন।

যে গৃহে ষ্ট্যালিন বাস করতেন শ্রীনেহেরু সেই গৃহটিও পরিদর্শন করেন এবং পরে মস্কোর ষ্ট্যালিন মোটর-কারখানা পরিদর্শনে যান ও সেখানে জনতা কর্তৃক বিপুলভাবে অভিনন্দিত হন। কারখানার সংস্কৃতি ভবনে উপস্থিত হ'লে সেখানকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পুষ্পস্তবক ও তরুণ অগ্রগামী দলের প্রতীক উপহার দেন। শ্রীনেহেরু সেই শিশুদের উপহার সানন্দে গ্রহণ করে' বলেন—"আমি তোমাদের এই শ্রদ্ধার দান ভারতের শিশুদের হাতে তুলে দেবো।"

ঐদিনই মঃ মলোটভ শ্রীনেহেরুর সম্মানার্থ এক ভোজসভার আয়োজন করেন, বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেই তা অনুষ্ঠিত হয়।

রাত্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কৃষ্ণ মেনন একটি ভোজসভার আয়োজন করেন, ঐ ভোজসভাটিও বিশেষ সৌহার্দ্যপূর্ণ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই ভোজসভায় সুপ্রীম সোভিয়েটের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যগণ ও পদস্থ সকল সোভিয়েট নেতাই উপস্থিত ছিলেন।

৯ই জুন প্রাতে শ্রীনেহেরু মার্শাল ভরোশিলভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' একটি বিমান কারখানা পরিদর্শনে যান। রাশিয়ার শিল্পগত অগ্রগতি দেখে তিনি বিশেষভাবে মুগ্ধ হন এবং এ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। ষ্ট্যালিন অটোমবাইল প্ল্যাণ্টে যেমন ম্যানেজারের সঙ্গে তিনি নানারূপ আলাপ আলোচনা করেন, এখানেও তেমনি বিমান কারখানার ম্যানেজারের সঙ্গে বহু বিষয়ে আলোচনা করেন। পরে দুটি বিমান থেকে বোমা বর্ষণের মহড়া দেখানো হয়।

অপরাহ্নে মস্কোর কৃষি-প্রদর্শনীতে উপস্থিত হন এবং ব্রিটিশ দূতাবাসে রাণী এলিজাবেথের জন্মদিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সন্ধ্যার সময় ক্রেমলিনে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেণ্টজর্জ হলে মার্শাল বুলগানিন কর্তৃক অনুষ্ঠিত সম্বর্দ্ধনা সভায় উপস্থিত হন। এই সভায় শ্রীনেহেরু বলেন—শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে সোভিয়েট সরকারের নিষ্ঠা ও অকপট ইচ্ছা সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। তিনি আরও বলেন যে বিশ্বের শান্তিবাদী প্রত্যেকটি ব্যক্তিকেই যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্যে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে—যা অশুভ তা কখনই কল্যাণপ্রদ হয় না, হিংসার দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

এই সম্বর্দ্ধনা সভায় শ্রীনেহেরু আন্তরিক ও অকপট ভাবে তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করে উপস্থিত সকলেরই অন্তর জয় করে নেন—তিনি বলেন যে আপনারা আমাকে যে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন তাতে আমার স্বদেশ ও স্বদেশের জনগণকেই সমধিক সম্মানিত করা হয়েছে।

আপনাদের সরকার ও জনগণের শান্তির জন্যে আকুল-আগ্রহ আমি লক্ষ্য করেছি, আমার স্বদেশবাসীদেরও এই একই আগ্রহ, একই আকাঙ্ক্ষা। সোভিয়েতের শান্তি-সংগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন বহুদিন ধরে সারা পৃথিবী শান্তির জন্যে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের মত আপনাদের সঙ্গেও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দান করছে।

* সোবিয়েৎ দেশ—২৫শে জুন, ১৯৫৫

পৃথিবীতে ভারতের কোন শত্রু নেই। আমরা সকলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে চাই, এমন কি যারা এক সময় আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট খারাপ ব্যবহার করেছে তাদের সাথেও। তিনি আরও বলেন —আপনাদের দেশ শান্তি-সংগ্রামে ও যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে বিরাট কৃতিত্ব অর্জন করেছে। বৃহৎ শক্তির দায়িত্বও বিরাট, কাজেই—আপনাদের কাঁধে আজ বিরাট দায়িত্ব। বহুদেশ এই দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে আপনাদের এই দায়িত্ব কল্যাণ ও শান্তি প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হবে।···যাদু মন্ত্রের দ্বারা হঠাৎ কোন সমস্যার সমাধান হ'তে পারে না ; ক্রমান্বয়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পৃথিবী থেকে যুদ্ধের উত্তেজনা প্রশমনের জন্যে, মানুষের মন থেকে শঙ্কা ও সন্দেহ দূর করার জন্যে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রতে হবে। শান্তির জন্যে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তাতে যুদ্ধের উত্তেজনা যে বহুলাংশে প্রশমিত হয়েছে একথা ধ্রুবসত্য।

পি, টি, আই এর একটি সংবাদ থেকে জানা যায়—১০ই জুন রাশিয়ার রাজধানীর ভূগর্ভস্থ রেলপথে শ্রীনেহরু প্রমোদ ভ্রমণে বেরুলে মস্কোর জনসাধারণ ভিড় করে তাঁকে ঘিরে ধরে। মেট্রো ষ্টেশনে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় রুশযাত্রীরা তাঁকে চিনে ফেলে ও দেখার জন্যে তার কামরার দিকে এগিয়ে আসে। তিনি ভ্রমণের সময় যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন, তার পর চতুর্থ ষ্টেশনে নেমে মোটরে করে যান মস্কোর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

রাশিয়ার এই বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করে। এই বাড়ীখানি ৩০ তলা উচ্চ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন বলেন, এখানে আবাসিক ছাত্র হিসাবে পড়াশুনা করে প্রায় ৬ হাজার ছাত্র, বাকি ছাত্ররা আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে।

শ্রীনেহরুর দর্শন লাভের আশায়—অধিকাংশ ছাত্রই লেকচার হল ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে, তখন তাঁর পক্ষে যাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করে দর্শকের খাতায় মন্তব্য প্রকাশ করেন—এই বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়টি এমন প্রকাণ্ড ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে সামান্য সময়ের মধ্যে সবকিছু ঠিক ভাবে জেনে ওঠা সম্ভব নয়। এর পরিকল্পনা ও রূপায়নের আয়োজন দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারি না। কামনা করি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদারচেতা ও মহৎপ্রাণ মানুষ গড়ে উঠুক।"

এইদিনই শ্রীনেহরু ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মস্কোর বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাবেন বলে মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হয়।

তিনি সদলবলে ভারতীয় প্রদর্শনী দেখতে যান। মঃ গেবাসিলভ সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার একটি ব্রোঞ্জ পদক ও ভারতীয় গ্রন্থকার ডাঃ এম, এস, কৃষ্ণ রচিত ভূতত্ব সম্পর্কে একখানি পুস্তকের রুশ ভাষায় অনুদিত সংস্করণ তাঁকে উপহার দেওয়া হয়।

শ্রীনেহরু ইণ্ডিয়ান আর্টগ্যালারীতে উপস্থিত হয়ে ভারতীয় চিত্র, রুশশিল্পীদের আঁকা ভারতচিত্র, প্রাচীন সূচীশিল্প, তালপাতার পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি দেখেন।

এর আগে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় তিনি পরিদর্শন করেন। এই বিদ্যালয়ের শিশুরা তাঁকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানায়। একটি বালিকা তাঁকে ফুলের তোড়া উপহার দেয় ও গলায় স্কার্ফ জড়িয়ে দেয়। বালিকাটির উৎফুল্ল ব্যবহারে মুগ্ধ শ্রীনেহরু তাকে চন্দন কাঠের ক্ষুদ্র দণ্ডটি উপহার দেন।

মস্কো থেকে ১১ই জুন উপস্থিত হন ষ্ট্যালিনগ্রাডে। এখানেও বিপুলভাবে তাকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। গত বিশ্বযুদ্ধে ষ্ট্যালিনগ্রাড যে শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিয়েছিল শ্রীনেহরু সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতা দেন।

তিনি ষ্ট্যালিনগ্রাডে সহর রক্ষায় নিহত রুশ সৈন্যদের কবরে ভারতের জাতীয় পতাকার মত রংএর ফিতাসহ একটি ফুলের মালা অর্পণ করেন। সহরের প্রতিরক্ষা সংগ্রহশালাও তিনি পরিদর্শন করেন। ষ্ট্যালিনগ্রাড ট্রাক্টর কারখানার কর্মিগণ তাকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর তিনি সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বলশয় থিয়েটারে 'সোয়াল লেক' ব্যালে নৃত্য দর্শন করে বিশেষ প্রীত হন। নৃত্যানুষ্ঠানের পর শ্রীনেহরু মার্শাল বুলগানিন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও ভরশিলভ মঞ্চের ওপর গিয়ে দাঁড়ান। উপস্থিত দর্শকগণ আনন্দে হর্ষধ্বনি করে ওঠে।

লেনিনগ্রাড পরিদর্শনের অপেক্ষাও উল্লেখযোগ্য ঘটনা রাশিয়ার আণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শন।—যে আনবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র দর্শনের সুযোগ পৃথিবীর কোন অ-কমিউনিষ্ট নেতার ঘটেনি, শ্রীনেহরুর কাছে সেই কেন্দ্রের দ্বারও উন্মুক্ত করে দিলেন সোভিয়েট সরকার।

১৩ই জুন উপনীত হলেন জর্জিয়ান রিপাবলিকের রাজধানী তিবলিসে। সেখানকার দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি পরিদর্শন করে ১৪ই জুন দলবল সহ শ্রীনেহরু উজবেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী তাশখেণ্ডে বিমান-পথে যাত্রা করেন। তাশখেণ্ড যাওয়ার পথে সকাল বেলা তিনি তুর্কমেন প্রজাতন্ত্রের রাজধানী আশখাবাদ পরিদর্শন করেন। সেখান থেকে যান তাশখেণ্ড। ১৫ই সেখান থেকে বিমানে করে যান সমরখন্দ এবং সমরখন্দ পরিদর্শন করে বিকালে আবার তাশখেণ্ডে ফিরে আসেন।

তিনি ইয়ঙ্গি উল জেলার (yangi yul) ষ্ট্যালিন যৌথ খামার পরিদর্শন করে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।

পরদিন উজবেক পরিচালিকের বিজ্ঞান একাডেমিতে যান। সেখানে তিনি বলেন "উজবেক স্থানের বিজ্ঞানের উন্নতি দেখে আমি পরম প্রীতি-লাভ করেছি, উজবেক জনসাধারণের এই বিরাট কৃতকার্য্যতায় আমি সত্যই আনন্দিত।···আমাদের দুই দেশে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানে উভয়েরই সুবিধা হবে।"···

তাসখন্দ বিমান ঘাঁটিতে একখানি মানপত্রের জবাবে শ্রীনেহরু বলেন "ভারত ও উজবেক পরস্পরের প্রতিবেশী। এই দুই দেশের মধ্যে বহু সাংস্কৃতিক বন্ধন রয়েছে। ভারত ও উজবেক উভয়েই শান্তিকামী, শান্তি ছাড়া কারো পক্ষেই উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।"

১৬ই জুন তিনি আলমাআটাতে রুবটসোভস্কে উপনীত হন। সেখান থেকে যাত্রা করেন উরাল অঞ্চল পরিভ্রমণে। উরালের যে

যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানাটিতে ভারতের জন্যে ইস্পাত কারখানার যন্ত্রপাতি নির্ম্মিত হবে শ্রীনেহেরু সেই কারখানাটি পরিদর্শন করেন।

এইভাবে অল্প সময়ের জন্য হ'লেও তিনি রাশিয়ার প্রায় সব কিছুই দেখে, দূরদূরান্তে সফর সাঙ্গ করে ২১শে জুন আবার মস্কোতে পৌঁছে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হন। এই সম্মেলনে বহু বিদেশী সাংবাদিকও সোভিয়েট সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নাবলীর জবাবে শ্রীনেহেরু তাঁর সফরের অভিজ্ঞতা, ভারত ও রাশিয়ার মৈত্রী, ভারতবর্ষের শিল্পায়নে সোভিয়েটের সাহায্য-দান সম্বন্ধে ও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাসে ভারত ও রাশিয়ার মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই সম্মেলনে শ্রীনেহেরু আশা প্রকাশ করেন যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা অবশ্যই ক্রমশঃ হ্রাস পাবে।

ঐ দিনই (২১শে জুন) মস্কো দিনামো ষ্টেডিয়ামে সোভিয়েৎ-ভারত মৈত্রী সভায় শ্রীনেহেরু এক দীর্ঘ ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে তিনি বলেন—"দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আমরা এই দেশে আসি এবং শীঘ্রই এ দেশ ত্যাগ করে যাচ্ছি। এই সময়ের মধ্যে আমরা প্রায় ১৩ হাজার কিলোমিটার পরিভ্রমণ করেছি, বহু বিখ্যাত নগরী ও বিস্ময়কর জিনিস অবলোকন করেছি। কিন্তু রাশিয়ার যেখানেই গেছি,—সেখানেই জনগণের সম্বর্দ্ধনা, তাদের অকুণ্ঠ প্রীতিমুগ্ধ ব্যবহার আমাদের সর্ব্বাধিক তৃপ্তি করেছে। এই প্রীতিও সম্বর্দ্ধনার জন্যে আমরা অপরিসীম কৃতজ্ঞ থাকবো, সোবিয়েৎ জনগণের প্রতি আমাদের সে কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই (দীর্ঘায়িত তুমুল হর্ষধ্বনি)।"...

"অপরিচিতের মত আমরা এদেশে আসিনি। কেননা এদেশে যে বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটেছে আমাদের মধ্যে অনেকেই তা সাগ্রহে লক্ষ্য করেছেন। সুমহান জননায়ক লেনিনের নেতৃত্বে আপনাদের দেশে যখন অক্টোবর-বিপ্লব আরম্ভ হয়, প্রায় সেই সময়েই ভারতে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামেরও এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। দীর্ঘকালব্যাপী এই স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জনগণ অপরিসীম সাহস ও সহিষ্ণুতা সহকারে নির্ম্মম অত্যাচারের মুখে নির্ভীক ভাবে দাঁড়িয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা ভিন্ন পথ গ্রহণ করলেও লেনিনকে আমরা শ্রদ্ধা করেছি এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছি। (দীর্ঘায়িত হর্ষধ্বনি)।"...

"বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-সৃষ্ট যন্ত্রবিদ্যা এ পৃথিবীর রূপ বদলে দিয়েছে, বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উন্নতি মানবজাতি ও জগৎ সম্পর্কে মানুষের চিন্তা ধারায় পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে। এমন কি স্থান ও কাল সম্পর্কেও ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটেছে।—প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের, মানুষের জ্ঞানকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করার এক বিরাট সুযোগ আজ এসেছে।"...

"পৃথিবীকে যদি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে হয়, অথবা, আমি একথাও বলতে পারি যে, পৃথিবীকে যদি নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কা থেকে বেঁচে থাকতে হয়, তবে সবচেয়ে আগে চিন্তা করতে হবে শান্তির কথা।"...

"সোবিয়েৎ ইউনিয়নের যেখানেই আমি গেছি, সেখানেই শান্তির জন্য অদম্য তৃষ্ণা লক্ষ্য করেছি।"...

"সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরাট সাফল্য আমাকে বিশেষভাবেই মুগ্ধ করেছে। জনসাধারণের শ্রমের দ্বারা এই বিরাট দেশের যে রূপান্তর ঘটেছে, যে বিরাট প্রাণশক্তি তাদের উন্নতির পথে পরিচালিত করছে তা আমি লক্ষ্য করেছি।"...

"আমাদের এই দুই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে মানুষ জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে মৈত্রী ও সহযোগিতা দীর্ঘস্থায়ী হোক।" বলে শ্রীনেহেরু তাঁর ভাষণ শেষ করেন।

সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার চেয়ারম্যান এন, এ, বুলগানিনও একটি দীর্ঘ ভাষণ দেন। সেই ভাষণে শান্তির আদর্শে ভারতের অবদান ও ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ও নির্ভীক শান্তি সংগ্রামী শ্রীজওহরলাল নেহেরুর ভূমিকার ওপর বিশেষ ভাবে জোর দেন। বুলগানিন বলেন "সোবিয়েৎ নরনারী ভারতের মহান জনগণের প্রতিনিধি ও দূত রূপে শ্রীনেহেরুকে বিশেষ দরদ, আনন্দ ও আন্তরিক বন্ধুত্বের সঙ্গে নিজের দেশে বরণ করে নিয়েছে।" ভারতের জনগণের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার দীর্ঘায়ু এবং ভারতের ক্রমোন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের প্রয়াসে ভারতীয় জনগণের সাফল্য কামনা করে তাঁর ভাষণ শেষ করেন।

প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ও চেয়ারম্যান বুলগানিন পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হয়ে করমর্দ্দন করতে গেলে গ্যালারীর সমস্ত লোক উঠে দাঁড়িয়ে তুমুল জয়ধ্বনি দিতে থাকে। সেই সভায় ভারত ও সোবিয়েৎ জনগণের ভালবাসা ও বন্ধুত্বের যে চিত্র ফুটে ওঠে—তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সোভিয়েৎ-ভারত-মৈত্রীর এই সভায় যোগদান করেছিলেন ৮০ হাজার লোক।

কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়ে শ্রীনেহেরু রাশিয়ায় যান নি, তাঁর রাশিয়া ভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল ভারত-সোভিয়েৎ-মৈত্রী ও বিশ্ব-শান্তিকে দৃঢ়তর করা। তাই তিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই বয়ে নিয়ে গেছেন মৈত্রী ও শান্তির বাণী। রুশ প্রধানমন্ত্রী—বুলগানিন ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সাথে আলাপ আলোচনার পর দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু ও বুলগানিন নিয়োক্ত যুক্তঘোষণা প্রকাশ করেন—

(ক) পরস্পরের রাষ্ট্রিক অখণ্ডতা ও সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা, (খ) অনাক্রমণ. (গ) যে কোন বৈষয়িক, রাজনৈতিক ও আদর্শগত কারণে পরস্পরের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, (ঘ) সমতা ও পারস্পরিক সুবিধা দান এবং (ঙ) নিরুপদ্রব সহাবস্থান। এই পঞ্চশীলের ভিত্তিতে যুক্ত ঘোষণা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সাহায্য করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

"প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মতে পরমাণবিক ও তাপ-পরমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন, ব্যবহার এবং সেগুলি সম্পর্কে পরীক্ষা কার্য্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার পথে কোন অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক থাকতে দেওয়া যেতে পারে না। প্রধানমন্ত্রীদ্বয় এ অভিমতও ব্যক্ত করছেন যে যুগপৎ প্রচলিত অস্ত্রের

প্রবেশমূল্য লাগবে না!
১০,০০১ টাকা
জিতুন!
প্রথম পুরস্কার...
২০,০০১ টাকা*
দ্বিতীয় পুরস্কার...
৫,০০১ টাকা
* প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা বিজেতাগন যৌথভাবে কোনও একটি শিশু হাঁসপাতাল বা ওয়ার্ডে আরও ২০,০০১ টাকা দান করবার সুযোগ লাভ করবেন।
আরও ২০,০০১ টাকা
দান করা হবে
ডালডা কুইজ্
প্রতিযোগিতায়
শেষ তারিখঃ
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি
প্রত্যেক সমাধানের সঙ্গে ডালডা টিনের অভগ্ন সীল সমেত উপরের একটি সম্পূর্ণ ঢাকনা পাঠাতে ভুলবেন না।
আপনাকে কি করতে হবে
যে দোকানদারের কাছে আপনি ডাল্ডা কেনেন তার কাছ থেকে একখানি প্রবেশপত্র চেয়ে নিন্ এবং তাতে যে ১৮টি সহজ বাক্য দেওয়া আছে সেগুলি পূরণ করুন। যদি আপনার উত্তরগুলি, বিশিষ্ট বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে মেলে তবে আপনি একটি পুরস্কার পাবেন। এতে কোনও প্রবেশমূল্য নেই— কেবল প্রত্যেক প্রবেশপত্রের সঙ্গে ডাল্ডা মার্কা বনস্পতির ৫ পাউণ্ড টিনের উপরের ঢাকনাখানি পাঠালেই হবে। একটি ১০ পাঃ টিনের উপরের ঢাকনার সঙ্গে আপনি দুটি সমাধান পাঠাতে পারবেন।
DALDA
ডালডা
সকলেই যোগদান ক'রতে পারবেন (বোম্বাই, সৌরাষ্ট্র, হায়দ্রাবাদ এবং মহিশূর রাজ্যের অধিবাসীগণ ছাড়া)।
ডাল্ডা বিক্রেতার কাছ থেকে আজই প্রবেশপত্র চেয়ে নিন

পরিমাণও যথেষ্ট হ্রাস করা প্রয়োজন। নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে সোবিয়েতের সাম্প্রতিক প্রস্তাব শান্তির বিশেষ সহায়ক বলেই স্বীকৃত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীদ্বয় একথা বিশ্বাস করেন যে, পঞ্চশীলের আওতার মধ্যে থেকেই তাঁদের দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও কারিগরী সহযোগিতা স্থাপনের প্রভূত সুযোগ রয়েছে। প্রত্যেক দেশ স্বীয় প্রতিভা, ঐতিহ্য ও পরিবেশ অনুযায়ী স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে এ ধরণের সহযোগিতার পথে কোন অন্তরায় দেখা দিতে পারে না। বাস্তবিক, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মূল কথা হ'চ্ছে—বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থাবিশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ শান্তিপূর্ণভাবে পরস্পরের পাশাপাশি মিলে-মিশে বাস করবে এবং পারস্পরিক কল্যাণের জন্যে কাজ করবে।

শ্রীনেহেরুর রাশিয়া যাত্রার প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি বাণী পাঠান—"আশা করি আপনার সদিচ্ছা মিশন সাফল্যমণ্ডিত হবে। অবস্থা যে অনুকূল হয়ে আসছে তার নিদর্শন সুস্পষ্ট। আপনার এই মহান প্রয়াসে অবস্থার আরও উন্নতি হবে। আপনার পশ্চাতে সমগ্র দেশের সমর্থন রয়েছে। শান্তি প্রচেষ্টায় বিজয় গৌরব অর্জন করে আপনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করুন এই আমাদের প্রার্থনা।"

রাষ্ট্রপতির এই আন্তরিক প্রার্থনা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করে শ্রীনেহেরু ২৩শে তারিখে রাশিয়ার মাটি থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্ক অতি নিবিড়। শ্রীনেহেরু সেই মৈত্রী ও সৌহার্দ্দপূর্ণ সম্পর্ককে বিশ্ব-শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে, এই দুই দেশের তথা বিশ্ব-মানবের কল্যাণে আরও নিবিড় ও দৃঢ়তর করলেন। শান্তির দূত শ্রীনেহেরুর সোভিয়েট ভ্রমণের এই অমর কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আর্থিক খবরাখবর

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পরিকল্পনা-প্রসঙ্গ

কলিকাতার সব আসরেই আজকাল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা চলিতেছে। দুই দলে প্রবল মতভেদ দেখা দিয়াছে। কে জিতিবে, কে হারিবে, তাহার নিষ্পত্তি কবে হইবে ঠিক নাই—কিন্তু জনসাধারণ মজা দেখিতেছেন। পরীক্ষামূলক কাঠামোর যে খসড়া রচিত হইয়াছে, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনীতি বিভাগ, অর্থ-দপ্তরের অর্থনীতি বিভাগ, ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ-গোষ্ঠী ও জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের মতামত ও সুপারিশ অবলম্বন করিয়া অধ্যাপক মহলানবীশ এই পরীক্ষামূলক খসড়া পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। মুখ্যতঃ তিনি পরিকল্পনা রচনা করিলেও পরিকল্পনার যাহা কিছু ভাল ও যাহা কিছু মন্দ, সব কিছুর জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু রাজ্য ও কেন্দ্রে যে যুদ্ধ সুরু হইয়াছে তাহাতে অধ্যাপক মহলানবীশকেই উলুখড়ের ন্যায় আক্রমণ করা হইতেছে। কোন কোন মহলের অভিমত এমনই সঙ্কীর্ণ যে কোন অর্থনীতিবিদ এই পরিকল্পনা রচনা না করিয়া গণিতশাস্ত্রের লোককে রচনা করিতে দেওয়ায় পরিকল্পনা-অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাহা মানহানির সমান হইয়াছে। কিন্তু সে দোষ তো কেন্দ্রীয় সরকারের। গণিতের অধ্যাপকের নহে।

যাহা হউক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও বক্তব্য হইল—

(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা

(২) মূল শিল্পসহ সকল শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা

(৩) পূর্ণ কর্মসংস্থান করা এবং

(৪) সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করা।

বলা বাহুল্য উদ্দেশ্যগুলি একে অপরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, দ্রুত শিল্প উন্নয়ন ও মূলধনের জন্য প্রয়োজন মূল শিল্পসমূহের পত্তন, যাহার আদর্শ হইল নিত্যব্যবহার্য বা ভোগ-শিল্পের (Consumer goods industries) সঙ্কোচ সাধন করা। সুতরাং উভয় প্রকার শিল্পের উৎপাদনের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল, মোট জাতীয় আয় ২২ বৎসরে দ্বিগুণ, মাথা পিছু জাতীয় আয় ২৭ বৎসরে দ্বিগুণ হইবে এবং ১৯৭৭ সালে মাথা পিছু ভোগের পরিমাণ শতকরা ৭৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে শতকরা ৫ ভাগ। উন্নত দেশগুলির জাতীয় আয় কোনরূপ পরিকল্পনা ব্যতিরেকেই শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পশ্চিম ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জাতীয় পরিকল্পনার আওতায় ১২% হইতে ১৩% পর্যন্ত বাড়িয়াছে। এই দৃষ্টান্তে আমাদের লক্ষ্য সর্বনিম্ন; উপযুক্ত যত্ন ও অধ্যবসায়ে ইহা বাড়িতে পারে।

উপরের কথা কয়টিই পরিকল্পনার সার কথা। পরিকল্পনা ambitious হইয়াছে। পরিকল্পনা গ্রহণে হয়তো কিছু দুঃসাহসের পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু পরিকল্পিত উন্নয়ন সূচী যদি গতানুগতিক উন্নয়নের ব্যতিক্রম না হয়, তবে তাহাকে পরিকল্পনা বলিবার প্রয়োজন কী? দরিদ্র, অবনত বা অর্দ্ধ অবনত দেশের আর্থিক

অনটন, অস্বাচ্ছল্য ও অভাবের পটভূমিকায় দেশবাসীর নিষ্ঠা, শ্রম, অধ্যবসায় এমন কি কৃচ্ছ্রসাধন যদি নিতান্তই সর্বাঙ্গীণ ও সামগ্রিক কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রযুক্ত হয়, তবে তাহাতে বিরোধিতার কি থাকিতে পারে?

রেল বিভাগের দুর্নীতি

রেলবিভাগের দুর্নীতি আছে কিনা, তাহাই তদন্ত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দুর্নীতি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কমিটির রিপোর্ট গত ১১ই জুলাই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর ভারতীয় রেলের ছোট বড় কর্মচারীগণ কিভাবে বিশেষ নীতির বশবর্তী হইয়া কত টাকা পকেটস্থ করেন, তাহার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব নয়। তবে ওয়াকিবহালের মত এই যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে পরিমাণ ঘাটতি হইবে, তাহা স্বচ্ছন্দেই রেলকর্মচারীগণ দিতে পারেন।

দুর্নীতি সম্পর্কে তদনন্তকাণ 'বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া'র নামান্তর মাত্র। দেশবাসী আজ তদন্ত চায় না। তাহারা দোষীর শাস্তি চায়। সেই শাস্তির ব্যবস্থা হইবে কিনা তাহাতেও তাহাদের সন্দেহ আছে। দেশবাসীকে সরকারের প্রতি আস্থাবান করা সরকারের কর্তব্য।

অল্প আয়বিশিষ্ট লোকদের জন্য গৃহনির্মাণের ঋণ

ভারত সরকার রাজ্য সরকার মারফৎ অল্প-আয় লোকেদের গৃহ নির্মাণ কল্পে ঋণ দান পরিকল্পনায় কিছু টাকা দান করিয়াছেন। এই ঋণের প্রাপ্তি, সুদ, কিস্তি প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সঠিক বিবরণ এখনও অনেকের অজ্ঞাত। কেহ বলেন ৮০০০ হাজার টাকা ঋণের সুদ ৩৫০০ টাকার মত পড়িবে। কেহ চান ১৬ বৎসরের কিস্তিতে কিস্তির হার বেশী হইবে, অতএব ২৫ বৎসর হইলে ভাল হয়; কিন্তু তখন হয়তো সুদের পরিমাণ আরও বাড়িবে—৪০০০ হাজারের মত হইতে পারে। যদি আট হাজার টাকার ঋণের দ্বারা নির্মিত বাড়ীর মূল্য ১২০০০ হাজার টাকা দাঁড়ায়, তবে জনকল্যাণ প্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত নহে বলিয়া দেশবাসী সন্দেহ করিবে। তবে যদি কেহ আট হাজার টাকা ঋণ লইয়া পাঁচ হাজার টাকার গৃহ নির্মাণ করেন ও ৩ হাজার টাকার কণ্ট্রাকটরী করেন, তাহার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। মনে হয় সুদের হার চলতি ব্যাঙ্কের সেভিংস একাউণ্ট সুদের হার অপেক্ষা বেশী নহে। তবেই 'মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম' নীতি সার্থক হইবে।

ভারতের ঘি শিল্প

কিছুদিন যাবৎ গুণ্টুরের ঘি-এর বাজার বন্ধ হইয়াছে। ভারত-সরকার সর্বভারতের জন্য একটি ঘি-এর মান নির্ধারণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। ইহাতে ঘি ব্যবসায়ী ও উৎপাদক মহলে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। তাহারই প্রতিবাদে ভারতের অন্যতম প্রধান ঘি-উৎপাদক কেন্দ্র—অন্ধ্র রাজ্যের গুণ্টুরের ঘিএর বাজার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘি ব্যবসায়ীরা ও ঘি-বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত এই যে জলবায়ু, মৃত্তিকা, গরুর খাদ্য, গরুর গঠন, শোণা ইত্যাদি বিবিধ বিষয় বিভিন্ন অঞ্চলে ঘি এর গুণগত পার্থক্যের কারণ। সুতরাং ভারত সরকার যদি জোর করিয়া সর্বভারতের জন্য একটি মাত্র মান (Specification) স্থির করেন, তবে তাহাতে খাঁটি ঘি প্রস্তুতের পরিবর্তে ভেজাল মিশ্রিত ঘি প্রস্তুতের সম্ভাবনা দেখা দিবে।

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা

প্রস্তাবিত মোট ব্যয়ের পরিমাণ—	২৬৫ কোটি টাকা
প্রত্যাশিত মোট আর্থিক সঙ্গতির পরিমাণ—	২০৫ ,, ,,
ব্যয়ের তুলনায় সঙ্গতিতে ঘাটতি—	৬০ ,, ,,
প্রথম পাঁচসালার পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত সংশোধিত ব্যয়—	৭৭ ,, ,,

দ্বিতীয় পাঁচসালার প্রস্তাবিত মোট ব্যয়ের মধ্যে এইগুলি ধরা হয় নাই। গঙ্গাবাঁধ, দুর্গাপুর, লবণ হ্রদ উন্নয়ন প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ পরিকল্পনা বাবদ মোট ৬২ কোটি টাকা এবং উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্বাসন বাবদ—১১৩ কোটি টাকা।

প্রত্যাশিত মোট আর্থিক সঙ্গতির পরিমাণ এই হিসাবে ধরা হইয়াছে:—রাজ্যের জনসাধারণের নিকট হইতে প্রদত্ত শ্রম ও অর্থ বাবদ মোট ৩৬ কোটি টাকা। রাজ্যের অভ্যন্তর হইতে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত অনুমিত আয় বাবদ মোট ১১২ কোটি টাকা এবং ভারতগভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনুমিত সাহায্য বাবদ ১১৫ কোটি টাকা। সর্ব সমেত ২৬৩ কোটি টাকা। কিন্তু দ্বিতীয় পাঁচসালার অনুমিত রাজস্ব ঘাটতি মোট ৫৮ কোটি টাকা ইহা হইতে বাদ দিয়া অনুমিত আর্থিক সঙ্গতির পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ২০৫ কোটি টাকা।

বাটা সু কোম্পানীর নূতন দোকান

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের নিকটে বাটা সু কোম্পানীর নব নির্মিত গৃহে একটি নূতন দোকানের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্প্রতি সম্পন্ন হইয়াছে।

দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে রাজ্যপাল ডাঃ মুখোপাধ্যায় যে ক্ষুদ্র ভাষণ দেন, তাহাতে তিনি বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতির উপর জোর দেন। বৃহৎ জুতাশিল্পগুলির ছোট উৎপাদকদের সহিত একযোগে কাজ করা উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন।

কারখানা শিল্প, বৃহৎ শিল্প আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পগুলির অকাল মৃত্যুর জন্যই মুখ্যতঃ দায়ী। দেশের শত সহস্র চর্মকার যে অন্নের সংস্থান তাহাদের গৃহে বসিয়া করিতে পারিত এই বৃহৎ শিল্পগুলি তাহাদের কর্মহীন করিয়াছে, গ্রাসাচ্ছাদনে অক্ষম করিয়াছে, ইহাই রাজ্যপালের ভাষণে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দেশবাসী ইহা হৃদয়ঙ্গম করিলে আজও বহু ক্ষুদ্র শিল্পীর ও কুটীর শিল্পের সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

ভূদান ভাণ্ডার

ভারতে প্রাক্তন মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ চেষ্টার বোলস আচার্য্য ভাবের ভূদান যজ্ঞের সাহায্যকল্পে একটি অর্থ ভাণ্ডার গঠনে উদ্যোগী হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ভাণ্ডারের নাম দেওয়া হইয়াছে ভূদান-ভাণ্ডার।

মিসেস বোলস বর্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নানাস্থানে ভারত সম্পর্কে কয়েকটি বক্তৃতা দিতেছেন। ইহার পারিশ্রমিক বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ এই ভূদান ভাণ্ডারে তিনি দান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য নীতি

সম্প্রতি করাচীতে যে ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহাতে কয়েকটি সামান্য দ্রব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু ঐ দ্রব্যগুলি সামান্য হইলেও, ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য ক্ষেত্রে উহাদের বিশিষ্ট স্থান আছে। সিনেমা ফিল্ম, ভারত ও পাকিস্থানের ভাষায় লিখিত পুস্তক ও সাময়িক পত্র এই সব জিনিষের অন্তর্গত।

পূর্ববঙ্গ সীমান্তের উভয় পার্শ্বেই যে সব লোকজন বসবাস করে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে কতকগুলি বিশেষ সমস্যা রহিয়াছে। সীমান্তপারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যাবতীয় নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হয়। ফলে লোকে বড় অসুবিধা ভোগ করিতেছে। চুক্তিতে এই সকল লোককে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

পাট তুলা ও সূতী বস্ত্র সম্পর্কে উভয় দেশের বাণিজ্য আন্তর্জাতিক চাহিদা, সরবরাহ ও মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। তাহা হইলেও এইসব পণ্যের বাণিজ্যে চুক্তিটি ভালই হইয়াছে। উভয় সরকার চুক্তিটি সমর্থন করিলে, উহা ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৫৫) হইতে এক বৎসরের জন্য চালু থাকিবে। কয়লা ও পাট সম্পর্কে দুই দেশের মধ্যে বর্তমানে যে চুক্তি আছে তাহাও ঐ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

শিল্প শ্রমিকদিগের গৃহ নির্মাণ

শ্রমিকদিগকে গৃহ নির্মাণ কার্যে সরকারী সাহায্যদান পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত সরকার গত জুন মাসে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও বেসরকারী সংস্থাকে ১,৬৪৯টি বাড়ী তৈয়ার করিবার জন্য মোট ৫৩,২৫,২১০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

দমদম মতিঝিলে ২৮৮টি এক কোঠাওয়ালা বাড়ী তৈয়ার করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬,৪৮,০০০ টাকা সাহায্য এবং সম পরিমাণ টাকা ঋণ বাবদ পাইয়াছেন।

জাতীয় সড়ক নির্মাণ

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে জাতীয় সড়কসমূহ নির্মাণের জন্য মোট ৫৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হইবে বলিয়া ঠিক আছে। ইহার মধ্যে ২৭ কোটি টাকা ভারত সরকার ইতোমধ্যেই বরাদ্দ করিয়াছেন বলিয়া একজন সরকারী মুখপাত্রের কথা হইতে জানা গেল। ব্যয়ের পরিমাণের দ্বিগুণ মোট লক্ষ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। কারণ তাহা হইলে বরাদ্দকৃত টাকা খরচ হইয়া গেলেও বর্তমান পরিকল্পনাকাল শেষ হইলে কাজের ব্যাঘাত হইবে না বা কাজ থামিয়া থাকিবে না। কাজেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকাল সুরু হইলে বাকী ২৭ কোটি টাকার বরাদ্দ অনুযায়ী কাজ চলিতে থাকিবে।

প্রথম পরিকল্পনায় প্রথম চারি বৎসরে জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ সন্তোষজনকভাবে চলিয়াছে। কারণ এই সময়ের মধ্যে ১৮ কোটি টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। পরিকল্পনার শেষ বৎসরে প্রায় ৯ কোটি টাকার মত ব্যয় হইবে। এই পর্যন্ত যে সকল কাজের পরিকল্পনা মঞ্জুর হইয়াছে তাহাও সন্তোষজনক। এই পর্যন্ত ৪৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার কাজ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

স্বাগতঃ নেহেরু

পণ্ডিত নেহেরু সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, কিছুদিন আগে তিনি চীন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভারত এখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় অর্থ নৈতিক উন্নয়ন স্চী উন্নয়ন করিতেছে এবং শীঘ্রই দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী প্রণয়ন চূড়ান্তরূপ লইবে। শ্রীনেহেরুর দেখা উপরোক্ত দেশগুলির আর্থিক অবস্থা, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা নিশ্চয়ই ভারতের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইবে।

শ্রীনেহেরু সোভিয়েট রাশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশ-গুলিতে যে ভাবে সম্বর্ধিত হইয়াছেন, তাহা ভারতের পক্ষে অসীম গৌরবের বিষয়। তাঁহাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাগরিক এবং একমাত্র শান্তির দূত বলিয়া সকলেই সম্বর্ধনা জানাইয়াছেন। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পৃথিবীতে আজ সকলেই শান্তি-প্রত্যাশী এবং শ্রীনেহেরুই ইহার দ্যোতক। ইহাই ভারতের শাশ্বত সত্যের বাণী। জেনেভা সম্মেলনে ইহাই স্বীকৃত হইতে চলিয়াছে।

৫ই শ্রাবণ, ১৩৬২

এদের প্রথম কলহ...
এরা নব-বিবাহিত, কিন্তু...
দেখো মা, এই ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে আমায় ঘুরতে হয়, আর...
আমি ওঁর জন্যে যথাসাধ্য করি, তবুও...
ঝগড়া কোরো না। আমি বুঝেছি গলদ কোথায়।
লক্ষ্মী, তোমার কাপড় কাচার ধরণেই রয়েছে গলদ
কিন্তু, কাপড় কাচতে খাটুনি তো আমি কম করি না!
কিন্তু কাপড় তুমি আছড়ে কাচো যে!
এ ছাড়া পরিষ্কার করে কাচার উপায়ই বা কী?
সানলাইট সাবান ব্যবহার কর—যা আমি বরাবর করেছি। সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনায় কাচলে কখনই তোমাকে কাপড় আছড়াতে হবেনা।
আছড়ালে -কাপড়ের সুতো ফেঁসে যায়: সেইজন্যে অতো তাড়াতাড়ি কাপড় ছেঁড়ে।
(ছেঁড়া সুতো বড় করে' দেখানো হয়েছে)
আজই আমি সানলাইট সাবান কিনবো!
আরে: সানলাইট, সত্যিই, বিনা আছাড়ে সাদা আর ঝকঝকে করে কাচে। এখন—আমাদের কাপড় আরও বেশীদিন টেঁকে। তাই সানলাইট আমাদের পয়সা বাঁচিয়েছে।
SUNLIGHT SOAP
Rs.10,000 Reward!
GUARANTEED
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।
235-X52 BG

বিশ্ব-নারী-প্রগতি ও সমাজ

শ্রীআশাবরী দেবী বি-এ

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা।
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি'
ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি'
দৈবাগত দিনে।
শুধু শূন্যে চেয়ে র'ব।
কেন নিজে নাহি ল'ব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্দ্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি' দৃঢ় বল্গা পাশে।
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হ'তে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি পণ।'

নিখিল নারী-মানসে এই বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে। নারী-প্রকৃতির তুষার গলে নদী প্রবহমানা। এই স্রোতের বেগে কতো প্রাচীন কীর্তি-সৌধ যাবে অতলে তলিয়ে আবার হয়তো সেই ধ্বংসের মধ্য হতেই গড়ে উঠবে নতুন কতো সম্পদ—বন্যার ব'য়ে-আনা পলিমাটিতে উপ্‌চে-পড়া নবীন হরিত শস্য সম্ভারের মতো।

বিচিত্রা নারী। বিশ্ব-সংসারের অন্দর-মহলে কি বহু বিচিত্রই না তার রূপ। জীবন ও জীবিকার সংগ্রাম-ক্লান্ত জগৎ তার অবসর-ক্ষণে কতো অপূর্ব ছন্দ ও রঙের বিন্যাসেই না ধন্য করেছে নারীকে।—'অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা!' প্রিয়া, জায়া, গৃহিণী ও মাতার কতো অপরূপ ছবিই না নিত্য-নবীন রূপে সমাজ ও সংসারকে উপহার দিচ্ছেন 'শতেক যুগের' কবি ও শিল্পী। সত্যই যেন জীবনের অন্তর-সিংহাসনে নারীকে স্থাপন করে দেবীর মতো পূজা করেছে জগৎ—নানা রূপে নারীর জয়গান গেয়েছে ভক্তের মতো!

জীবন ও জগতের দুই দিক স্বীকার করতেই হবে। মানব-জীবনের সকল আশা-আকাঙ্খাই অন্তর ও বাহির দুই মিলিয়ে। আজকের এই নিখিল-নারীপ্রগতিতে শংকিত হবার কিছুই নেই—যদি তার গতির দুই দিক ঠিক থাকে—যেমন দ্রুতগামী মেল-ট্রেনের সামনে ও পেছনে দুই দিকের লাইনই থাকা চাই অবাধ আবর্জনা-হীন। জীবন-শিল্পী সৃষ্টির লীলাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতেই গড়েছেন প্রাণের দুই রূপ—নারী ও পুরুষ। এই দুই রূপেরই যথাযোগ্য সমন্বয় চাই জীবনকে সুন্দর করতে হলে। ছবিতে যেমন দরকার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ—দুইয়েরই ঐক্য সাধন। Aristophanes মানব-প্রকৃতি বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছেন যে প্রথম সৃষ্টিতে মানব-মানবী ছিলো একই অঙ্গীভূত! Zeusএর নির্দেশে এক অঙ্গ হলো বিভক্ত। এই বিভেদই মানব-হৃদয়ের সকল চাওয়া ও পাওয়ার উৎস—কেন না ভিন্ন না হলে তো এক হওয়া যায় না। উপনিষদেও আছে, একের বহু হবার ইচ্ছা সৃষ্টির মূলে!

এ তো গেলো জীবন-কাব্যের দর্শন। অন্তর ও বাহির এক হলেই হলো নীড়ের রচনা। অন্তর ও বাহিরের মাঝখানে আছে এক জীবন ও জীবিকার সমস্যা-সঙ্কুল দুস্তর সাগর। এই দুইয়ের সেতুবন্ধন প্রেমে—আর কিছুতেই নয়।

দুইটি ভয়ংকর মহাযুদ্ধের করাল ছায়া চলে গেছে বিশ্ববাসীর ওপর দিয়ে। তার নিদারুণ রক্তধারা ক্ষত এখনও শুকায় নি। কতো বিকৃতি ও অনাচার বিশ্ব-সমাজ-জীবনে অনিবার্য ভাবে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে মঙ্গল ও অগ্রগতির পথে। বিশ্ব-নারী-প্রগতির জয়যাত্রার পথেও তেমনি ছায়া ফেলে দাঁড়িয়েছে এক সমাজ-সংকটের কালো মূর্তি। সংসারের ভিতর-মহলের জায়া, গৃহিণী ও মায়ের

সিংহাসনগুলি শূন্য করে পাশ্চাত্য নারী আজ এসে দাঁড়াচ্ছেন বহির্জগতের পথে। পুরুষের কর্মক্ষেত্র শত অশান্তি, ভয়, ভাবনা-ভরা, অজানা অচেনা বহির্জগৎ চিরদিনই অন্দরমহলের নারী-মনকে কৌতূহলে আকৃষ্ট করেছে, বহির্বিশ্বে আছে পদে পদে অজানিত বিভীষিকা—তবু চিরদিনের কৌতূহলী নারীপ্রকৃতি তারই অভিমুখে চোখ মেলেছে। কেবলমাত্র ঘরণী, জায়া, মাতা হয়েই সে আর তৃপ্ত নয়—তাই বহির্বিশ্বের ক্ষুরধার পথে আজ বাজছে নারীর পদধ্বনি। পাশ্চাত্য দেশগুলি এই প্রগতির বেগে টলমল করছে ও তারই ঢেউয়ের আঘাত চীনে, জাপানে, তুরস্কে, মিশরে ও আরও কতো দেশে ঘটালো নারীসত্তার জাগরণ।

শিক্ষা ও কর্মের নানা ক্ষেত্রে নারীর সহযোগিতা পুরুষকে এনে দেবে গভীর প্রেরণা। এর প্রয়োজন ছিলো। তাই নারীর আর এক রূপ আজ পুরুষের পরম আকর্ষণীয়—সে রূপ সঙ্গিনীর! এই সঙ্গিনী সংসার, স্বার্থ ও প্রত্যাহের সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী নয়। এ সঙ্গিনী সারাদিন ধরে সংসার সাজিয়ে রেখে, আপনাকেও সাজিয়ে তার ক্ষণ-অবকাশের পাত্রটি মাধুর্যে ভরে দেবার জন্য ব্যগ্র প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকে না দুরু দুরু বুকে। এ সঙ্গিনী একাকিনী—সাহসিকা স্বাবলম্বিনী! য়ুরোপে, আমেরিকায়, রাশিয়ায় নারী এসে দাঁড়িয়েছে কর্মজগতের মাঝখানে পুরুষের পাশাপাশি। কিন্তু মানবপ্রকৃতির প্রীতির ধর্ম তাতে ব্যাহত হয় নি। ঘর-গৃহস্থালীর শত বন্ধন ছিঁড়েও সে আবার সাড়া দিয়েছে সহযোগিতার আহ্বানে। বিশ্ব-কর্ম-যজ্ঞশালায় নারীর যোগ দেবার যে-স্বপ্ন গ্রীক দার্শনিক Socrates একদিন দেখেছিলেন তা রূপ-পরিগ্রহ করতে চলেছে আজ।

এই সহযোগিনী নারীর শিক্ষার আদর্শ-নির্ণয় করাই আজকের বিশ্ব-নারী-প্রগতির অঙ্গাঙ্গী সমস্যা। বিধাতার অভিপ্রায় নারী ও পুরুষ ভিন্ন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের দেহ ও মনের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রেও পুরুষ ও নারীর শিক্ষায় খানিকটা স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতে হয়। স্বতন্ত্র সত্তা সত্ত্বেও কর্মজগতে এক হওয়া অসম্ভব নয়। চিত্রকলার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের মতোই জীবন ও জগতের দুই দিক মেলাতে হবে—তবেই নারীপ্রগতির অগ্রগতি হবে সত্য ও সার্থক। বিশ্বকবি সুন্দর ও মঙ্গলকে একই রূপে দেখেছেন। সৌন্দর্য ও মঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নারী রূপেই কল্পিতা সর্বদেশে। এই সৌন্দর্য ও মঙ্গলের আদর্শই নিতে হবে নারীকে—কি অন্দরমহলে কি বহির্বিশ্বে। নারী চায় না পুরুষে রূপান্তরিত হতে। চিত্রাঙ্গদা ও প্রমীলা বহির্বিশ্বের কর্মক্ষেত্রে ছিলেন অজেয়া—তবু তাঁদের মধ্যেকার নারী অস্বীকার করে নি সমাজ ও সংসারকে।

নিখিল নারী-প্রগতি আজ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ললিতকলা ও দুরূহ জীবন-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে নিয়ে আসুক দীপশিখার মতো প্রাণবতী সহযোগিনী—কর্মভারাক্রান্ত শ্রান্ত পুরুষের পাশে। আসুক সহস্র ম্যাডাম কুরী, জোয়ান অফ আর্ক, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, গাগী, মৈত্রেয়ী, খনা আবার নবরূপে আজকের এই নানা সমস্যা-ক্লিষ্ট জগৎ ও জীবন নব প্রেরণা নিয়ে। সমাজ ও সংসার নারীকে চায় সৌন্দর্য, মঙ্গল ও পবিত্রতার প্রতীক রূপে পেতে। সেই কল্যাণী নারীই সকল অগ্রগতির প্রেরণা।

—'প্রভাত আসে তোমার দ্বারে, পূজার সাজি ভরি',
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির বরণডালা ধরি'।
সদা তোমার ঘরের মাঝে নীরব একটি শঙ্খ বাজে,
কাঁকন দুটির মঙ্গল গীত উঠে মধুর স্বরে॥
রূপসীরা তোমার পায়ে রাখে পূজার থালা,
বিদুষীরা তোমার গলায় পরায় বরমালা।
ভালে তোমার আছে লেখা পুণ্যধামের রশ্মিরেখা,
সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়খানি হাসে চোখের পরে॥'

—

মা হবেন যাঁরা

সাধনা ভট্টাচার্য্য

বিবাহের সুসঙ্গত পরিণতি হ'ল মাতৃত্ব। নারীর জীবনে তাঁর প্রথম সন্তান লাভের মুহূর্তটি হল অবিস্মরণীয়। সুস্থমনা নারীদের কাছে পরবর্তী সন্তানদের জন্মেও পুলকের অবধি নেই। বেশীর ভাগ মেয়েদেরই বিয়ের আগে মাতৃত্ব সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা থাকে না। সে শিক্ষার ব্যবস্থাও নেই। তাই আপনাদের যারা এবার প্রথম মা হ'তে যাচ্ছেন তাঁদের বুকটা একটু কাঁপবে তো বটেই—কি রকম প্রসব

বেদনা, সহ্য করতে পারবেন কিনা? আরও কত কিছু। তার সঙ্গে নিশ্চয়ই জড়িয়ে আছে অজানা-অচেনা মানুষের স্বপ্ন—যার সঙ্গে আপনার হবে সুনিবিড় সম্পর্ক, অথচ আজ আপনার সঙ্গে তার কোন পরিচয় নেই।

পরিচয় নেই এ কথাই বা কি করে বলব বলুন? যে আপনার দেহে-মনে এমন একটা আলোড়ন এনে দিয়েছে—দিয়েছে একটা অজানা আশংকাকে বুকের মধ্যে জাগিয়ে। ভয়-আশার দোলায় দুলিয়ে দিয়েছে সে আপনার মনটাকে এমনি ভাবে—তাকে উপলব্ধি করতে পারছেন প্রতি মুহূর্ত্তেই। তার উপর আপনার খুব রাগ ধরেছে? ধরতে পারে, বিয়ের এক বছর যেতে না যেতেই দুষ্টু খোকা কিংবা খুকী এসে পড়ছে। কিন্তু সত্যি বলছি আপনার রাগ করা ঠিক হয়নি। সুস্থ নব-দম্পতির পক্ষে এক বৎসরের মধ্যেই সন্তানের সাড়া পাওয়া স্বাভাবিক। লজ্জা করছে? তা একটু না হয় করল।

কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই খুকীর নাম করাতে খুব রেগে গিয়েছেন? ভাবছেন খুব বড় একটা অলক্ষুণে কথা বললুম। কেন খুকীরা কি দোষ করল বলুন? আপনি নিজেও ত একদিন খুকী হয়েই এসেছিলেন? আর আপনারা যদি খুকী নাই চান, তবে সরোজিনী, তরু কিংবা বিজয়লক্ষ্মীর মত মেয়ে জন্মাবে কি করে? আপনার হাসি পাচ্ছে? ভাবছেন আপনার মেয়ে কি তেমন হবে? তার চেয়ে বরং ছেলে—হ্যাঁ, ছেলে হোক সেও আমি আপনার জন্যে প্রার্থনা করছি, আপনার যখন ছেলের জন্যে এত টান! কিন্তু সে ছেলেও সাধারণ হবে কেন? কেন সে বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের মত হবে না? বলবেন, এত বড় চাইনে। আমি বলছি আপনার চাই। শুনেছি কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন, গর্ভাবস্থায় মায়ের চিন্তা যত উঁচু হবে, সন্তানও তেমনি বড় হবে। কথাটা ঠিক কিনা একবার পরীক্ষা করেই দেখলে ক্ষতি কি?

ওসব কথা হয়ত আপনার ভাল লাগছে না। নিয়মিত স্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে আপনার শরীর কেমন করছে। প্রাতর্বমন আরম্ভ হয়েছে। সে কি কষ্ট! কারো কারো হয়ত বিকাল বেলায় বমি হতে পারে। যা হোক সে দিনে একবারের বেশী হয় না সাধারণতঃ। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ মাসেও এ বমির ভাব থাকবে। কিন্তু যদি পঞ্চম মাসেও এ উপসর্গ চলতে থাকে কিংবা দিনে একবারের বেশী বমি হয়, তবে ডাক্তার দেখানোই ভাল।

তারপর আপনাকে সন্তানের নড়াচড়ায় একটু বিচলিত করতে পারে। তৃতীয় মাসে কিংবা যদি দেরী হয় তবে পঞ্চম মাসে অন্ততপক্ষে। সন্তান যত বড় হবে নাড়াচাড়া তত বেশী অনুভূত হবে। তা আপনার ভালও লাগতে পারে, আবার খারাপ লাগাও অসম্ভব নয়। এমনকি এতে কোন কোন মেয়ের হিষ্টিরিয়ার লক্ষণও প্রকাশ পেতে পারে। যদি তাই পায় তবে ডাক্তার ডাকতে দেরী করবেন না মোটেই। ঐ সময়ে মনটাকে পবিত্র রাখতে চেষ্টা করবেন। ভাল ভাল বই পড়বেন। সাবধান—বাজে বই পড়বেন না কখনও, মন খারাপ হবে তাতে।

আর বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন পায়খানা যেন পরিষ্কার হয়, প্রস্রাব বেশী হয়। প্রস্রাব কম হলে ডাক্তারকে দেখান উচিত। প্রস্রাবটা একমাস অন্তর অন্তর (অন্ততঃ পাঁচ মাসের পর থেকে) পরীক্ষা করে নেওয়াই ভাল। দেখা দরকার তাতে এলবুমেনের (Albumen) ভাগ আছে কিনা। না থাকলে খুব ভাল। লক্ষ্য রাখবেন হাত পায়ের দিকে, ফুলেছে কিনা। ফুললে চিকিৎসার ব্যবস্থা সত্বর করবেন। পুনর্নবার শাক খেতে পারেন, তাতে প্রস্রাব বেড়ে যাবে ও গা-ফোলাটা কমে যাবে, আশা করা যায়। কিছুদিন অন্তর ডাক্তারকে দিয়ে রক্তের চাপ (blood pressure) বাড়ছে কিনা পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। এ সময়ে রক্তের চাপ একটু বাড়ে, তবে বেশী বাড়লে তার চিকিৎসা করান বিশেষ দরকার।

আপনি একটু অলস হয়ে যাচ্ছেন, না? ভাল কথা নয় কিন্তু। একটু কাজটাজ করবেন। কিন্তু তবে বেশী ভারী জিনিষ হাতে করে তুলবেন না বা সিঁড়ি দিয়ে বেশী ওঠা নামা করবেন না। প্রত্যহ (ভুল যেন না হয়) বিকালে কিংবা সকালে বেড়াবেন। কারণ তাতে পেটের মাংসপেশীগুলি সুস্থ থাকবে। এতে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সময়ে কষ্টকম হবে।

আপনারা ইচ্ছামত পুত্র কন্যা লাভ করুন, আপনাদের পিতৃকুল-মাতৃকুলে তাদের জন্মে আনন্দের ঢেউ খেলে

যাক। উজ্জ্বল হোক উভয় কূলের মুখ তাদের গৌরবে, আপনাদের সংসার সুখের হোক, জয় হোক ভারতবর্ষের, ধন্য হোক আপনাদের মাতৃত্ব—এই তো আমাদের একমাত্র কামনা।

নূতন রান্না

অঞ্জনা ও ভারতী

(মাংস-ভাতে)

সাধারণতঃ মাংস রান্নায় নানা প্রকারের মসলার ব্যবহার আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। চিবানোর কষ্টটার যাতে ক্ষতিপূরণ হয়, তার জন্যে মাংসটাকে সুস্বাদু করবার উদ্দেশ্যে কত প্রকারের মসলা নানা সমাজের লোকেরা নানা ভাবে প্রয়োগ করে থাকেন। তাতে হয়ত খেতে ভাল লাগে, কিন্তু পেট তা' অনেক সময়ে সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহ করে বসে। আর সে বিদ্রোহ দমন করতে ডাক্তারের সাহায্য নিতে হয়। তাই শুনেছি পাশ্চাত্যের মাংসাশীরা নাকি মাংস সেদ্ধ খেয়ে থাকে।

তা একদম সেদ্ধ না করে এভাবে একদিন রান্না করে দেখুন না, কচি দেখে মাংস নিন। তাকে ভালভাবে বিশুদ্ধ জলে ধুয়ে নিন, রক্তটা খুব ধুয়ে ফেলে দেবেন না। তারপর ভাল মাখন একটু মাখিয়ে নিন তাতে। আন্দাজ করে নুন দিন। তাতে কাঁচা কিংবা পাকা টম্যাটো (যদি পাওয়া যায়) মিশিয়ে নিন। এবার একটা বাটীতে করে বসিয়ে দিন ভাতের হাড়ীর উপর। বাটিটা ঢেকে দিন একটা কিছু পাত্র দিয়ে ভালভাবে যাতে বাটি থেকে বাষ্প না উড়ে যেতে পারে। কাঠের চুল্লীতেই রান্নাটা খুব ভাল হবে। ভাত রান্না হতে হতে মাংসও আশা করি সেদ্ধ হয়ে যাবে। তবে মাংসটা যদি পাকা হয় তবে কিছু পেঁপের টুকরো এর সঙ্গে কুচি-কুচি করে মিশিয়ে দিন। কিন্তু তবু শক্ত থেকে যেতে পারে।

যা হোক পরীক্ষা করে দেখুন, এবার সেদ্ধ হয়েছে কিনা? হলে নামিয়ে ফেলুন। কিছু কালো মরিচের গুড়ো মিশিয়ে নিন, যেমন আপনার মুখে সহ্য হবে। তার-পর আর কি করতে হবে নিশ্চয়ই বলতে হবে না।

এ যে খাবারটা হলো, তা বুঝতেই পারছেন নিশ্চয়ই খুব পুষ্টিকর। এতে আছে এ-ভিটামিন, সি-ভিটামিন, আর প্রোটিন। তা যাই হোক, যদি মাখন বেশী দিয়ে থাকেন পেট রোগা লোকেদের কখখনো খেতে দেবেন না, সাবধান করে দিচ্ছি।

সূঁচের গোলাপ ফুল

মঞ্জুলা কর

এই গোলাপ ফুল ক্রচেট সূতা দিয়ে করিলে খুব ভাল দেখায়। লাল সূতা এক ফের করিয়াই সূঁচে পরাইতে হইবে। পরে যাহাতে ফুলটি করিবেন এবং যে জায়গায় করিবেন সেই জায়গায় সূঁচটি তুলুন। এইবার যে সূতাটি সূঁচে পরাণ আছে সেই সূতাটি সূঁচে ১২বার জড়াইতে থাকুন, বেশ আঁট করিয়া জড়াইবেন যেন খুলিয়া না যায়। আধখানা পর্য্যন্ত জড়ান হইয়া যাইলে লম্বা ভাবে সূঁচটি কাপড়ের নীচে নামাইয়া নিন। সূতা জড়ানটি যেন খুলিয়া বা আলগা হইয়া না যায়, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। বাঁ হাত দিয়া সূতো জড়ান জায়গাটা ধরিয়া তারপর আস্তে আস্তে সূঁচটি নীচের দিকে নামাইবেন; তাহা হইলে সূতা খুলিয়া যাইবার বা আলগা হইয়া যাইবার ভয় থাকিবে না। এইবার যেখানে লম্বা পাকানো সূতাটি দিয়াছেন তাহার পাশটিতে আবার সূঁচটি তুলুন এবং ঐ ভাবে সূতা প্যাঁচাতে থাকুন। আধখানা হইলে একটু গোল ভাবে লইয়া সূঁচটি নামাইয়া নিন্।

এইভাবে সূতা জড়াইয়া পাশাপাশি গোল গোল করিয়া গেলে সুন্দর একটি গোলাপ ফুল হইবে। এইভাবে সূতা জড়াইয়া লম্বা করিয়া দুইবার দিলে বেশ পাতার মত দেখায়।

এই ফুল রুমালে বা ব্লাউজের হাতায় করিলে বেশ ভালই দেখায়।

হঠাৎ মৃত্যু

ডাঃ জে-এন-মৈত্র

বর্তমানে "মৈত্র-ব্যাধি"তে যে "হঠাৎ মৃত্যু" সংঘটিত হইতেছে তাহার কারণ "করোনারী ধমনীর সংকোচন" বা "করোনারী অক্কলুসন" ইহা ছাড়া অন্য কোনও কারণ নাই বা হইতে পারে না। অবশ্য মোটর চাপা, গৃহ-দাহ হইতে বা উচ্চ বৃক্ষ হইতে বা গিরি আরোহণ প্রভৃতি আকস্মিক দুর্ঘটনার কারণ ছাড়া।

বাংলা তথা কলিকাতার চিকিৎসক মণ্ডলী ৺স্যর নীলরতন সরকার, মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ রায় বা সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-পরায়ণ বৈজ্ঞানিক ও প্রবীণ ডাক্তার শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ের কথা সর্ব্বাগ্রগণ্য ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাহাদের উৎসাহ আমার এই দুরূহ আবিষ্কারের গোড়ায় পাথেয় হইয়াছিল।

তারপর লেঃ কঃ জে, সি, দে, ডাঃ দবিরুদ্দিন আহম্মদ, ডাঃ কবীর হোসেন, ডাঃ উকিল ও বর্তমান পুলিশ সার্জন ডাঃ সরকারের অনন্যসাধারণ অনুসন্ধিৎসা এবং সর্ব্বশেষ বিচারক করোনার হাকিম কলিকাতার সকল মৃত্যু তদন্তের উপরিস্থিত মহামান্য শ্রীযুক্ত এন্‌, এন্‌, রুদ্র মহাশয়ের মৃত্যুর কারণ ঘোষণা আমাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কারকের আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে।

আমার শিক্ষকবৃন্দ ডাঃ অখিলরঞ্জন মজুমদার, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত ও ডাঃ রজতচন্দ্র সেন মহাশয়ের অকুণ্ঠ উৎসাহ, সর্ব্বশেষ বন্ধু যিনি ডাক্তারও নহেন বা বৈজ্ঞানিকও নহেন তিনি হইতেছেন সাংবাদিক পণ্ডিতপ্রবর চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক। তিনি জ্ঞানী ও সংস্কৃত ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, একাধিক বার (কত বার স্মরণে আসে না) আমার ফটো, উভয় হস্তের ফটো এবং হস্তরেখা ও নক্ষত্র পরীক্ষা করিয়া, "এগিয়ে চলুন," "ভয় নাই" প্রভৃতি অভয় দিয়া পরম বন্ধু শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এল-এ "ভারতবর্ষের" সম্পাদকের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন।

আমি নির্ভীক ভাষায় বলিতেছি "হঠাৎ মৃত্যু" হঠাৎ হয় না। দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর বা বছরের পর বছর সময় নেয় এ ব্যাধি। ইহাতে মৃত্যু হইতে পারে না। এ ব্যাধি পূর্ব্বাহ্নে নিরূপিত হইতে পারে (Daignosed) এবং এ মৃত্যুর তারিখ পিছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে (Preventible)।

যুক্তরাষ্ট্র এমেরিকায় ডাঃ মাষ্টার ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা পাঁচ শত রোগীকে ভাগে ভাগে দেখাইয়াছেন যে কেবলমাত্র শতকরা ২০ জন মরিতে পারে। পূর্ব্বাহ্নে অক্‌কুলুসন বা সংকোচন সন্দেহ করিলেই চিকিৎসা করা যায় ও শতায়ু করা শুধু আশীর্ব্বাদের হাল্‌কা কথা নয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদর্শ স্থাপনও বটে। মানুষ মরিবেই, স্বভাবের ধর্ম্মই বিনাশ। তাই দেবাদিদেব মহাদেবের হাতে স্বর্গরাজ্যের মন্ত্রীত্বে যমরাজা, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতিকে ফেলিয়াই port-folio তৈয়ার করার রেওয়াজই হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব। মৃত্যুর কারণ, "আধি, ব্যাধি, শস্ত্র, পতনং গিরাৎ," জলপ্লাবন, সর্পাঘাত ইত্যাদি ও হিংস্র পশু কর্ত্তৃক আক্রমণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি মার্কিণ-বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন যে যক্ষ্মা ও কর্কট (থাইসিস ও ক্যানসার) উভয় ব্যাধির মৃত্যুর সংখ্যার দ্বিগুণ মৃত্যু এই করোনারী অককুলুসনে হইতেছে।

বাংলায় ও ভারতে আজ যদি চিকিৎসককুল ব্যবসায়কে বজায় রাখিয়াও মানুষ বাঁচাবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, অনুগ্রহ করিয়া পুলিশ কমিশনারের ও করোনার মহোদয়ের নিকট পরিচয় পত্র লইয়া ময়না তদন্ত ঘরে যাইয়া দেখুন। "কী বিভৎস মৃত্যু?"

নধরকান্তি যুবক I. C. I. অফিসের ছুটির পর ক্ষুধিত হইয়া রেস্তোরার চায়ের টেবিলে আকস্মিক ভাবে মরিলেন। ময়না তদন্তে কোন কিছু আছে কিনা বিচারক বলিবেন। কিন্তু আমি ডাঃ সরকারের মারফত কতবার জানিয়াছি।

(১) হৃদ্‌পিণ্ড বড়

(২) করোনারী ধমনী বন্ধ।

থ্রম্বসিস হয় নাই। করোনারী থ্রম্বসিস মৃত্যুর কারণ নহে।—করোনারী অক্‌কুলুসন বা "মৈত্র-ব্যাধি"তে মৃত্যু।

জন্মাষ্টমী

ডাঃ শ্রীইন্দুভূষণ রায়

অষ্টমী ফিরিয়া গেল—ফিরে গেল কৃষ্ণাতিথি,
ভাদ্রমাস কত কত বার,—
পাষাণ প্রাচীরে রুদ্ধ কত শত বসুদেব—
দেবকীর উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস—

মিলাল পাষাণ কক্ষে! প্রাসাদ শিখরে বসি
কত কংস হাসে অট্টহাস!
এলে না ত বাসুদেব! বল দেব, কতদিনে
হবে শেষ তব প্রতীক্ষার?

লা ই ফ ব য় সা বা ন

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু
থেকে আপনাকে রক্ষা করে

ভারতে প্রস্তুত　　L. 254-X52 BG
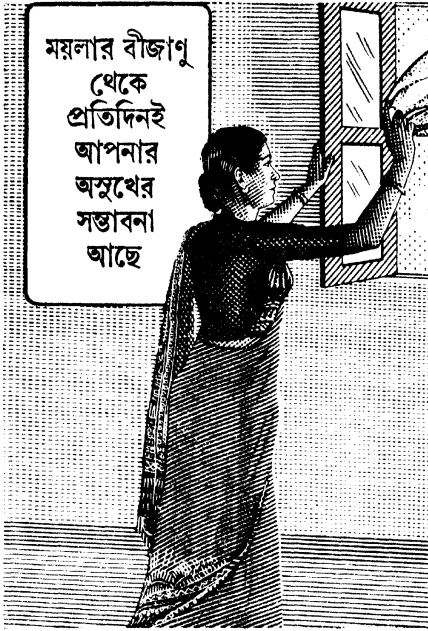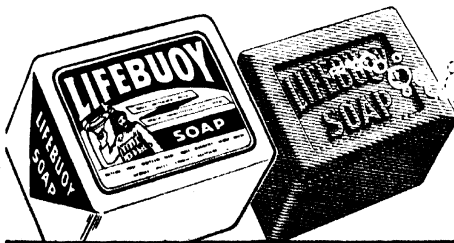
বাংলাভাষায় সরকারী কাজকর্ম—

গত ১০শে জুলাই বোম্বায়ে যাইয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এক সভায় বলিয়াছেন—বাংলা দেশে সমস্ত প্রকার কাজকর্ম বাংলা ভাষায় হইবে ও বাহিরে চিঠিপত্র লেখা হইবে হিন্দীতে। মুখ্যমন্ত্রীর এই উক্তি সর্বসাধারণের মধ্যে বহুলভাবে প্রচার করা প্রয়োজন। দাসমনোভাব এখনও আমাদের মধ্য হইতে যায় নাই—স্বাধীনতা লাভের পর ৮ বৎসর হইয়া গেলেও আমরা সরকারী দপ্তরে চিঠিপত্র লেখার সময় ইংরাজিতেই লিখিয়া থাকি। অনেক সময় ভুল ইংরাজিতে এমনভাবে আবেদন লেখা হয়, যে তাহার অর্থ বুঝা কঠিন হয়। তথাপি আমরা বাংলা ভাষা ব্যবহার করি না। বাংলা ভাষায় সকল কাজ করা হইলে ইংরাজি-না-জানা লোকজনও সহজেই তাঁহাদের কথা জানাইতে পারিবেন। আমরা এ বিষয়ে দেশের সর্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করি। সকলে চেষ্টা করিলে সহজেই সরকারী দপ্তরখানায় বাংলা ভাষা চালু হইবে। বিধান সভা ও বিধান পরিষদেও ইংরাজি বক্তৃতা বন্ধ করিয়া শুধু বাংলাতেই যাহাতে সকল কাজ সম্পাদন করা হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার—

অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত গত ১লা আগষ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলারের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ডক্টর শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইয়া চলিয়া যাওয়ার পর অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ নিজ ট্রেজারারের কার্য্য ছাড়াও ভাইস-চ্যান্সেলারের কার্য্য করিতেছিলেন। ডক্টর ঘোষ ভাইস-চ্যান্সেলার হইয়া বহু নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তাহা ক্রমে কার্য্যে পরিণত করিতেছিলেন। অধ্যাপক সিদ্ধান্ত ও প্রবীণ শিক্ষাব্রতী, তিনিও উৎসাহের সহিত কার্য্যারম্ভ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিক রূপদানে যত্নবান হউন, আমরা সর্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়—

কলিকাতার সন্নিকটস্থ যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজটিকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার যে পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ গত ২৯শে জুলাই এক সভায় তাহাদের ৯২ বিঘা জমী যাদবপুর কলেজের পরিচালক জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদকে ইজারা দিয়াছেন। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশে জাতীয় শিক্ষা প্রচারের জন্য জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ গঠিত হইয়াছিল—৫০ বৎসর পরে সেই পরিষদের অধীনে যে একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, তাহা দেশবাসীর পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা। তবে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় যেন শুধু কারিগরী শিক্ষাদানের মধ্যেই নিজেদের কাজ আবদ্ধ রাখেন। আজ দেশে শিক্ষা-প্রচার অপেক্ষা কর্ম-সংস্থান ব্যবস্থা করা অধিক প্রয়োজন। যাদবপুরে এমন সব বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হউক, যে শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষিতগণ সঙ্গে সঙ্গেই দেশের পণ্যবৃদ্ধি দ্বারা কর্মসংস্থান করিতে পারে ও তাহার ফলে দেশের বেকার সমস্যা কমিয়া যায়। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য দেখিবার জন্য দেশবাসী সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিবে।

আচার্য্য রায়ের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা—

গত ২রা আগষ্ট কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে ভারতের ঋষিপ্রতিম আধুনিক বিজ্ঞানী ও বাংলার নবজাগৃতির অন্যতম শিক্ষাগুরু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের এক পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন উৎসব হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উৎসবে আচার্য্য রায়ের বিবিধ গুণ বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন। একমাত্র শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বাংলায় ভাষণ দেন এবং ভাব, ভক্তি ও শব্দ যোজনায় তাহা শ্রুতিমধুর হইয়াছিল। খুলনা জেলা স্মৃতি সমিতির অর্থসাহায্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টায় এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে—কলিকাতা কর্পোরেশন এজন্য এক খণ্ড জমী দান করিয়াছেন। আচার্য্য রায় শিক্ষার সহিত ও ছাত্র সমাজের সহিত কি সম্পর্ক রাখিতেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার মর্মর মূর্তি কলেজ স্কোয়ারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় লোক সর্বদা তাঁহার কথা স্মরণ করিবে ও তদ্দ্বারা দেশবাসী উপকৃত হইবে।

১৯৫৫ সালের ঈশানবৃত্তি—

সেন্ট জেভিয়ার্স (কলিকাতা) কলেজের শ্রীনীলাদ্রি মজুমদার ১৯৫৫ সালে বি-এ ও বি-এস্‌সি গণিত অনার্সে সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়া ঈশানবৃত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি চিত্তরঞ্জন রেল কারখানার প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার শ্রীএন-এন-মজুমদারের পুত্র। আমরা শ্রীমানের জীবনে সাফল্য কামনা করি।

সুদান সরকারে শিক্ষক নিযুক্ত—

নবদ্বীপ (নদীয়া) বিদ্যাসাগর কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল শ্রীসত্য-নারায়ণ দাশ সুদান সরকারের খারতুম বিদ্যালয়ে তিন বৎসরের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন—ভারত হইতে সুদান সরকার ৬ জন শিক্ষক গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীদাশই একমাত্র বাঙ্গালী। তিনি নদীয়া

জেলা ও নবদ্বীপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত নানাভাবে জড়িত ছিলেন। ৮ই আগষ্ট যাত্রা করিয়া ১৫ই তিনি খারতুমে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। আমরা তাঁহার সাফল্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করি এবং আশা করি, তাঁহার দ্বারা বিদেশে বাঙ্গালীর সম্মান বর্দ্ধিত হইবে।

কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষা—

গত বুধবার (৩রা আগষ্ট) কলিকাতায় এক সভায় কলিকাতার ডেপুটী মেয়র ডাক্তার অমরনাথ মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন—দেশবন্ধু মেয়র হইয়াই কলিকাতায় ১৯টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তথায় ১৬৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ৬ হাজার বালক-বালিকাকে শিক্ষাদান করিতেন—তাহাতে ব্যয় হইত ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। বর্তমানে কলিকাতা কর্পোরেশন ২৫০টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালাইতেছে—তাহাদের শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা ১৫০০, ছাত্র সংখ্যা ৫১ হাজার এবং পাঠাগারের ব্যয়সহ বৎসরে কর্পোরেশনের শিক্ষাব্যয় ২৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এখন বহু ছাত্রছাত্রীকে বেতন দিয়া কলিকাতা সহরে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। কলিকাতার মত সহরেও যদি প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক করার ব্যবস্থা না হয়, তবে অন্যত্র কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে। আমরা এ বিষয়ে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

সেবাধর্ম ভারতের আদর্শ—

৩১শে জুলাই পাটনায় বিহার সমাজ সেবা সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে যাইয়া বিহারের রাজ্যপাল শ্রীআর-আর-দিবাকর বলেন—ভাগ্যবলে বা আকস্মিকভাবে আমি আজ রাজ্যপাল হইয়াছি—কিন্তু আমার জীবনের আসল ব্রত—সমাজ সেবা। আমি সারা জীবন সমাজ-সেবক থাকিতে চাই। শ্রীদিবাকর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলেন—দরিদ্র, পতিত ও অসহায় মানবের সেবার দ্বারাই শ্রীভগবানের পূজা করা হয়। গান্ধীজী তাঁহার জীবনে সমাজ সেবাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দান করিয়াছিলেন—তাহারই তিনি নাম দিয়াছিলেন—গঠনকার্য্য। অতি দুঃখের কথা এই যে, ভারতের সনাতন ধর্ম এই সেবার মনোভাব আজ দেশে বিরল হইয়াছে। দেশ সেবায় আত্মদান করিয়াই দেশবাসী আজ তাহার রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। জন সেবায় সকলে মিলিয়া আত্মদান না করিলে আজ দেশের আর্থনীতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হইবে না। সেজন্য আজ সর্বত্র এই সেবাধর্মের কথা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। রাজ্যপালগণ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলে সত্বর আমরা আমাদের অভীষ্ট লাভ করিব।

পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু সমাগম—

গত ৩১শে জুলাই বেলঘরিয়ায় রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার সপ্তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসবে যাইয়া কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না বলিয়াছেন—১৯৫৪ সালের ১২ মাসে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ উদ্বাস্তু আসিয়াছে, তদপেক্ষা বেশীসংখ্যক উদ্বাস্তু আসিয়াছে ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত ৬ মাসে। তিনি পশ্চিম-বঙ্গের শিল্পপতিদের নিকট আবেদন জানান—যেন উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কাজ দিয়া তাহাদের সাহায্য করা হয়। শ্রীখান্না মন্ত্রী হইলেও নিজে একজন উদ্বাস্তু; কাজেই তিনি দুর্গত উদ্বাস্তুদের কথা সর্বদা স্মরণ করেন। পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের পক্ষে থাকা আর সম্ভব হইতেছে না—অথচ পূর্ববঙ্গ সরকারকে প্রশ্ন করা হইলে জানা যায়, সেখানে হিন্দুদের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করা হয় না। এ কথা সত্য হইলে অবশ্যই হিন্দুরা সেখানকার পিতৃপুরুষের ঘর-বাড়ী ত্যাগ করিয়া নানা কষ্টের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আসিত না। ভারত সরকার যেমন ভারতে মুসলমানদিগকে সুখে বাস করিতে দিতেছেন, পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের পক্ষে কি তাহা করা সম্ভব নহে? পূর্ববঙ্গের সকল হিন্দু চলিয়া আসিলে পাকিস্তান সরকারও যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, সে কথা কি তাহারা চিন্তা করিয়া দেখিবেন না?

গার্হস্থ্য ও সমাজ বিজ্ঞান কলেজ—

নারী সমাজের উন্নতিকল্পে স্বর্গত বিহারীলাল মিত্র যে অর্থদান করিয়াছিলেন, তাহার বর্তমান মূল্য ১০ লক্ষ টাকা ও তাহা হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক ৪৮ হাজার টাকা পাইয়া থাকেন। ঐ অর্থ ভাণ্ডার হইতে কলিকাতা আলিপুর হেষ্টিংস হাউসে গত ১লা আগষ্ট বিহারীলাল গার্হস্থ্য ও সমাজ বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হইল। ঐ দিন সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কলেজ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত ও প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এখন ১ বৎসরে ঐ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়—নূতন কলেজে ঐ বিষয়ে ৪ বৎসরে শিক্ষাদানের জন্য ডিগ্রী কোর্স খোলা হইবে। ১০ বৎসর পূর্বে স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গার্হস্থ্য ও সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষাদান ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়াছিলেন—এতদিনে তাহা পূর্ণতা লাভ করিল। ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ইহা দেশের নারী সমাজের কল্যাণ সাধন করুক, ইহাই আমরা কামনা করি।

আবদুল গফুর খানের ঘোষণা—

সীমান্ত-গান্ধী খান আবদুল গফুর খান গত ২৬শে জুলাই মর্দান সহরে এক জনসভায় বলিয়াছেন—"যাঁহারা বৃটীশকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন, তাঁহাদিগকে এখন সব লোক 'বিশ্বাসঘাতক' বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, আর যাঁহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া ইংরাজের গোলামী করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা আজ দেশসেবক। ইহাকে অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?" তিনি আরও বলেন—"আমি অহিংসায় বিশ্বাসী, বরাবরই মানুষকে ভালবাসিয়াছি ও আজও ভালবাসি। অতীতে আমি কখনও মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব প্রচার করি নাই—আজও করি না।" খান সাহেব গান্ধীজীর আন্দোলনে পূর্ণভাবে যোগদান করিয়াছিলেন—তিনি পাকিস্থান বিশ্বাস করেন না, সেজন্য দীর্ঘকাল

তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। এরূপ একজন আদর্শ মানুষকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে না দিলে তাহার ফলে পাকিস্থানে নানা প্রকার অশান্তি আসিতে পারে--পাকিস্থান সরকারের সে কথা চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য।

বিদ্যাসাগর প্রদর্শনী—

৬৪ বৎসর পূর্বে স্বর্গত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু বার্ষিক উপলক্ষে এ বৎসর গত ৩০শে জুলাই হইতে ৭ই আগষ্ট ৯ দিন কলিকাতা মিউনিসিপাল মিউজিয়ামে তাঁহার ব্যবহৃত কতকগুলি জিনিষের একটি প্রদর্শনী করিয়া তাঁহার আদর্শ জীবনের কথা স্মরণ করা হইয়াছে। তাঁহার ব্যবহৃত দোয়াতদানী, মুড়ি খাইবার বাটী, কাঁসার গ্লাস, পানের সঙ্গে খাইবার চুণের পাত্র, হুঁকোর রূপার মুখ, লাঠি প্রভৃতি প্রদর্শনীতে দেখানো হইয়াছে। ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতৃশ্রাদ্ধে তিনি যে রূপার গ্লাস দান পাইয়াছিলেন, তাহাও প্রদর্শনীতে ছিল। ইংরাজি ভিজিটিং কার্ড, কাগজ-কাটা, কাগজ-চাপা, শীল মোহর, কৃত্রিম দাঁত প্রভৃতিও তথায় ছিল। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ সমূহ, তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থ প্রভৃতিও প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্য ছিল। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা আজ ভাল করিয়া স্মরণ করা প্রয়োজন—কারণ আজ সেই অনাড়ম্বর, তেজস্বী জীবনের ধারা অনুকরণের দিন আসিয়াছে। প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা দেশের সত্যই উপকার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

দশমিক পদ্ধতিতে মুদ্রামান—

গত ২৮শে জুলাই দিল্লীর লোকসভায় ভারতে দশমিক পদ্ধতিতে মুদ্রামান প্রতিষ্ঠার বিল আলোচিত হয়। বর্তমান মুদ্রামান পদ্ধতি দশমিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হইলে ভারত মুদ্রামান পদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্বের অন্যান্য প্রগতিশীল দেশসমূহের সহিত সম-পর্য্যায়ভুক্ত হইবে। ঐ বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা আহ্বান করেন। তিনি বলেন—কেবল মুদ্রামান পদ্ধতি সম্পর্কেই এই পরিবর্তন অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে নাই, পরন্তু ওজন পদ্ধতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়েও এই পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা [illegible]। সরকার ক্রমে অন্যান্য পরিবর্তন সাধন করিবেন। স্বাধীন ভারত যখন সকল বিষয়ে নূতন পদ্ধতি অবলম্বনে অগ্রসর, তখন মুদ্রামান বা ওজন পদ্ধতি—সকল বিষয়ে দশমিক পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি হইতে পারে না। প্রথম কয়েকদিন লোককে একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হইলেও নূতন ব্যবস্থা দেশের স্থায়ী উপকার সাধন করিবে।

ধান কলের পরিবর্তে ঢেঁকী প্রচলন—

ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত এক কমিটী নির্দেশ দিয়াছেন—৫ বৎসরের মধ্যে সমবায় পদ্ধতিতে ঢেঁকী ও উদুখল প্রচলন করিয়া চাউল প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ধান কলগুলি তাহার ফলে ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া যাইবে। এই ব্যবস্থার ফলে পল্লীবাসীদের কাজের একটা নূতন উপায় হইবে, কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে যে সাময়িক বেকার-সমস্যা দেখা দেয়, তাহা দূরীভূত হইবে এবং যাহারা চাউল খায়, তাহারা উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর চাউল পাইবে। আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে, এইরূপ কঠোর কিছু না করিলে দেশের বেকার-সমস্যা দূর হইবে না। গ্রামে লোক কাজ পায় না বলিয়া সহরে চলিয়া আসে। তাহারা যদি ঢেঁকীতে চাউল প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, তবে আর তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিবে না। ঢেঁকী ও কাপড় বোনার জন্য তাঁত-শিল্প পুনরায় চালু হইলে দেশের বেকার-সমস্যা অনেকটা কমিয়া যাইবে। আমরা আশা করি, সকলেই বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখিবেন ও এ বিষয়ে প্রচার কার্য্য করিয়া অপর সকলকে এ বিষয়ে অবহিত করিবেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাবর্তন—

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ৫ সপ্তাহ ধরিয়া সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে ভ্রমণ করিয়া গত ১৩ই জুলাই বুধবার দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার এই ভ্রমণের ফলে—তিনি যে দেশেই গিয়াছেন, সেখানে ভারতের সম্মান বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং সকল দেশের রাষ্ট্র-নেতারা শ্রীনেহরুর শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রস্তাবে তাঁহার সহিত একমত হইয়াছেন। তাঁহার এই ভ্রমণের চলচ্চিত্র সর্বত্র দেখানো হইতেছে—তাহা দেখিলে বিদেশে শান্তিদূতরূপে তিনি কিরূপ সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায়।

জেনেভায় চতুঃশক্তি সম্মিলন—

১৮ই জুলাই জেনেভায় বিশ্বের ৪টি সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রের প্রধানগণ মিলিত হইয়া পৃথিবীর সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকার রাষ্ট্র প্রধানগণ মিলিত হইয়াছিলেন। উদ্বোধন ভাষণে আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান আইসেনহাওয়ার বলেন—রাষ্ট্র চতুষ্টয়ের মধ্যে আদর্শগত বৈষম্য থাকিলেও সাধারণ ক্ষেত্রে তাঁহারা যে ঐক্যমত পোষণ করিবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৪ জন কয়েকদিন সভায় মিলিত হইয়া এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার ফলে পৃথিবীর অশান্তি অবশ্যই দূরীভূত হইবে।

দশ লক্ষ হরিজন খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত—

হায়দ্রাবাদ রাজ্যের তপশীলী জাতি ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীজে-এন-কৃষ্ণমূর্তি গত ২৪শে জুলাই জানাইয়াছেন—সম্প্রতি হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ১০ লক্ষ হরিজনকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে। ফলে রাজ্যে হরিজনের সংখ্যা কমিয়া ৪০ লক্ষ হইয়াছে। আর্য্য সমাজ খৃষ্টান মিশনগুলির কার্য্যে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াও সফল হইতেছে না—কারণ মিশনগুলির হাতে প্রচুর অর্থ আছে। প্রত্যেক বড় গ্রামে মিশন হইতে গির্জা, স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। স্বাধীন ভারতে এইভাবে খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরগ্রহণ কার্য্য করিতে দেওয়া হইতেছে, ইহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের অধিকাংশ

লোক খৃষ্টান, তাহারা বহু শত বৎসর পূর্বে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এখন আবার যদি হায়দ্রাবাদের দারিদ্র্য ও শিক্ষাভাবের সুযোগ লইয়া মিশনারীদের কাজ করিতে দেওয়া হয়, তবে সারা ভারত একদিন খৃষ্টধর্মাবলম্বী হইয়া যাইবে। আমাদের বিশ্বাস, কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যথাযথ কর্তব্য সম্পাদনে বিলম্ব করিবেন না।

কল্যাণীতে সরকারী অফিস—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন—শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৭টি বিভাগের অফিস নবনির্মিত কল্যাণীতে স্থানান্তরিত করিবেন। ঐ ১৭টি অফিস বর্তমানে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে আছে। ঐ অফিসগুলির গৃহ এবং ঐ সকল অফিসের কর্মীদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ তথায় প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। ঐ ভাবে কলিকাতা হইতে বহু অফিস কল্যাণীতে লইয়া যাওয়া উচিত। কলিকাতায় দিন দিন যে ভিড় বাড়িতেছে, তাহা কমাইবার ব্যবস্থা না করিলে লোক কলিকাতায় সুখে বাস করিতে পারিবে না। নূতন ১৩ তলা সরকারী দপ্তরখানা গৃহটি সহরের মধ্যে নির্মাণ না করিয়া কল্যাণীতে করা হইলে বহু লোক বাহিরে বাস করিবার সুযোগ লাভ করিত। ট্রেণ, বাস, ট্রাম প্রভৃতির ভিড় কমাইবার জন্য এবং বাসগৃহ সমস্যার সমাধানের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আমাদের বিশ্বাস, ক্রমে এইভাবে সহরের ভিড় কমাইবার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণতা দান সম্ভব হইবে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ—

গত ৬ই আগষ্ট রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিবসে সর্বত্র শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা স্মরণ করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আমরা দেশবাসী সকলকে জানাইতে চাই—যে স্থানে (বারাকপুর গঙ্গাতীরে, তাঁহার বাসগৃহসংলগ্ন মাঠে) সুরেন্দ্রনাথের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হইয়াছিল, তথায় কোনরূপ স্মৃতিস্তম্ভ রচিত হয় নাই—সম্প্রতি তথায় যে বেদী নির্মিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে দেশবাসীকে লজ্জাই অনুভব করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় দার্জিলিংস্থ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শেষ নিশ্বাস-ত্যাগের গৃহটি গৃহীত ও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বাস গৃহ ও তৎসংলগ্ন বিরাট ভূমিখণ্ড হয় ত শীঘ্রই হস্তান্তরিত হইয়া যাইবে—আমরা যদি সত্বর তাহা ক্রয় করিয়া জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত না করি—তবে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের নিকট আমাদের দায়ী হইতে হইবে। আমরা এ বিষয়ে পূজনীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের, ভারত সভা, মিলনমন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালকদের ও দেশবাসী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আশা করি, সকলের সমবেত চেষ্টায় শীঘ্রই এই কার্য্য সুসম্পাদিত হইয়া জাতির সম্মান রক্ষা করিবে।

স্বদেশী আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী

গত ৭ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গে বহু স্থানে স্বদেশী আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হইয়াছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাঙ্গালী ৭ই আগষ্ট স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। সে সময় হইতে বৃটীশ পণ্য বয়কটের ব্যবস্থা হয় ও দেশে দেশীয় পণ্য উৎপাদনের কারখানা প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। তাহার পর ৫০ বৎসর গত হইলেও এবং স্বাধীনতা লাভের পর ৮ বৎসর অতীত হইলে ও আমরা আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সম্পর্কে স্বদেশী হইতে পারি নাই। আজও বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্য আমাদের পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে সে কথাই সকলকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। ভারতবাসী—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী শিল্প বিমুখ—সেজন্য এদেশে কোন স্বদেশী শিল্প ভাল করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে না—এ আমাদের পক্ষে কম লজ্জার কথা নহে। দেশে যাহাতে কৃষি ও শিল্পের অধিক প্রসার হয়, সে জন্য শুধু সরকার চেষ্টা করিলেই হইবে না, দেশবাসী সকলকে চাকরীর মোহ ত্যাগ করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইতে হইবে। আজ সেই কথাই আমাদের সকলের যেন চিন্তার বিষয় হয়।

আসাম রাষ্ট্রে ভয়াবহ বন্যা—

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের পর্বতসমূহে আকস্মিক প্রবল বারিপাতের ফলে আসামের সমভূমি অঞ্চলের ৬টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ও প্রায় ৫ লক্ষ অধিবাসী দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ডিব্রুগড় ও জোরহাটের মধ্যবর্তী ব্রহ্মপুত্রের তীর বরাবর প্রায় দুই শত বর্গমাইল এলাকা এবং তেজপুর ও ধুবড়ীর মধ্যবর্তী প্রায় আট শত বর্গমাইল এলাকা ৪৮ আগষ্ট পর্য্যন্ত ও জলমগ্ন ছিল। বন্যায় যোগাযোগ ব্যবস্থা এত ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যে, ভারতের অন্যান্য অংশের সহিত আসামের রেলওয়ে যোগাযোগ পুনস্থাপনে বেশ কয়েক সপ্তাহ লাগিবে। ভারতের উত্তর পূর্ব প্রান্তের রাজ্যের সহিত টেলিগ্রাফ যোগাযোগ স্থাপনে আর ও এক সপ্তাহ লাগিবে। সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা বিমান হইতে প্লাবিত অঞ্চল দেখিয়া বলিয়াছেন, প্রায় ১ হাজার একর এলাকা জলমগ্ন হইয়াছে। শস্য, গবাদি পশু ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট হওয়ায় প্রায় ২ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের অধিবাসীদের এই দুর্দশায় সমবেদনা প্রকাশ করি।

পাকিস্তানে নূতন ব্যবস্থা—

পাকিস্তানের নির্বাচনের পর সব রদবদল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলি পদত্যাগ করিয়াছেন। অর্থসচিব চৌধুরী মহম্মদ আলি মুসলীম লীগদলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি পরবর্তী প্রধান মন্ত্রী হইলেন। গণপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ৮০ জন, তন্মধ্যে লীগ দলের ৩৫ জন ও আওয়ামী লীগের ১২ জন মিলিত হইয়া ৪৭ জনে সম্মিলিত দল গঠন করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো—

উড়িষ্যার জনপ্রিয় নেতা শ্রীযুত নিত্যানন্দ কানুনগো এতদিন ভারত রাষ্ট্রের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উপমন্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার উপর শিল্প বিভাগের ভার অর্পণ করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ৫ই আগষ্ট তাঁহার নিয়োগ সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, শ্রীযুত কানুনগোর পরিচালনায় ভারতের শিল্পোন্নতির অগ্রগতি লক্ষিত হইবে।

আর্দ্দালী

ছবি দেবী

সমাধি স্থান অফিসারে ভরে গেছে। মনে হচ্ছে ফুলে ঢাকা একটা মাঠ যেন। 'কেপী' (মিলিটারী অফিসারদের টুপী) ট্রাউজার, স্ট্রাইপ, সোনার বোতাম আর উচ্চপদস্থ অফিসারদের পদনির্দ্দেশক কাঁধের উপরকার থোপনা, এবং 'শাস্‌য়াব' 'হুজারদের' বিস্তনীকরা পোশাক সমাধিগুলোর পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে। সমাধিগাত্রে ক্রুশগুলো সাদা নয়ত' কাল, তারা তাদের হতাশাপূর্ণ লোহা, শ্বেতপাথরের, কিংবা কাঠের হাতগুলো মৃতের অদৃশ্য জাতির উপরে উঁচু করে রেখেছে।

এইমাত্র কর্ণেল লাইমুসিনের স্ত্রীর সমাধি হ'ল। দু'দিন পুর্ব্বে সে যখন স্নান করতে গিয়েছিল, সেই সময় জলে ডুবে মারা যায়। সমাধির কাজ শেষ হয়ে গেছে। পুরোহিত চলে গেছে, কিন্তু সহযোগী ছুটি অফিসারের গায়ে ভর দিয়ে তখন পর্য্যন্ত কর্ণেল দাঁড়িয়ে ছিলেন, গর্ত্তটার একেবারে সম্মুখে, যার নিচেতে এখনও তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, তাঁর তরুণী স্ত্রীর দেহটা ইতিমধ্যে যার ভিতরে নষ্ট হয়ে গেছে সেই ওক কাঠের কফিনটাকে।

কর্ণেলটি বয়সে প্রায় বৃদ্ধ, দেখতে রোগা লম্বা এবং একজোড়া সাদা গোঁফ আছে। তিন বছর আগে তাঁর সহকর্ম্মী কর্ণেল সর্টইস্ যখন তাঁর কন্যাটিকে অসহায় অবস্থায় রেখে মারা গেলেন, তখন কর্ণেল লাইমুসিন সেই কন্যাটিকে বিয়ে করেন!

যাদের উপর তাদের শাসনক্ষম অফিসারটি ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেই ক্যাপটেন্ এবং লেফ্‌টেন্যাণ্টরা, কর্ণেলকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তাদের তিনি বাধা দিলেন। চোখ ছুটো তাঁর জলে ভরে গেছে, তবু বীরের মতই কান্নাটাকে কর্ণেল দমন করে রেখেছেন। আর বিড়বিড় করে বলছেন "না, না—আর একটুক্ষণ!" ঐখানেই থাকার জন্য তিনি যখন জোর করতে লাগলেন এবং সে গর্ত্তটাকে তাঁর মনে হচ্ছে অন্তহীন, যার গহ্বরের মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা তাঁর প্রিয় সেই অন্তর-আত্মাটি রয়েছে, সেই গর্ত্তটার কাছে হাঁটু মুড়ে প্রায় তিনি বসে পড়ছিলেন এমন সময় হঠাৎ সেখানে এলেন জেনারেল অর্মণ্ট। কর্ণেলকে জড়িয়ে ধরে তিনি জোর করে ঐখান থেকে কিছুটা যেন টানতে টানতেই নিয়ে গেলেন এবং বললেন "আমার পুরাণ সহকর্ম্মী! এখানে তোমার থাকা উচিত নয় চলে এসো, চলে এসো।"

সুতরাং কর্ণেল তাঁর জেনারেলের আজ্ঞা তখনই পালন করলেন এবং তাঁর কোয়ার্টাসে তিনি ফিরে এলেন।

তিনি যখন তাঁর পড়ার ঘরের দরজা খুললেন, তখন টেবিলের উপর একটা চিঠি তিনি দেখলেন। কিন্তু, চিঠিখানা যখন তিনি হাতে তুলে নিলেন, তখন মনের উত্তেজনায় আর বিস্ময়ে বলতে গেলে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন তিনি। কেননা, কর্ণেল দেখলেন যে এটা তাঁর স্ত্রীর হাতের লেখা!! আর চিঠিখানায় ডাকঘরের যে ছাপ ও তারিখ দেওয়া আছে, সেটা হ'ল সেই একই দিনের তারিখ। অতঃপর খামখানা ছিঁড়ে কর্ণেল তখন চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করলেন।

"প্রিয়

যখন এই চিঠি তুমি পাবে তখন, আমি মাটির নীচে থাকব মৃত হয়ে। সুতরাং আমাকে তুমি সম্ভবতঃ ক্ষমা করতে পারবে। অবশ্য, তোমার স্নেহকে আমি জাগিয়ে

তুলতে চাইছি না। কিংবা নিজের পাপকেও হ্রাস করতে চাইছি না। আমি শুধু, যে নারী ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আত্মহত্যা করতে চলেছে তার সম্পূর্ণ অকপটতা দিয়ে, পুরাপুরি সব সত্য কথা তোমার কাছে বলতে চাই।

আমাকে তুমি যখন দয়া করে বিয়ে করলে, সেই সময় তোমাকে আমি আমার সম্পূর্ণ বালিকাসুলভ হৃদয় দিয়েই ভাল বেসেছিলাম এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিজেকে তোমার কাছে সঁপে দিয়েছিলাম। তোমাকে আমি ভালবেসেছিলাম।

আমরা সহরে এলাম। কিন্তু—ক্ষমা কর আমাকে—আমি ভালবাসলাম! হায় দীর্ঘকাল—প্রায় দু' বছর আমি নিজের মনোভাব দমন করেছিলাম, কিন্তু তারপর সেই ভালবাসাকে আমি স্বীকার না করে পারিনি। আমি অধর্ম্ম করলাম এবং পতিতা হ'লাম।

কে, সে? তুমি কখনই ধরতে পারবে না যে, সেই লোকটি কে। এই বিষয়ে আমি একেবারেই নিশ্চিন্ত! কেননা, বারটি অফিসার সর্ব্বদা আমাকে ঘিরে রাখত এবং সেই জন্য তুমি তাদের আমার বারটি নক্ষত্রপুঞ্জ বলে সম্বোধন করতে।

প্রিয়, সে যে কে, এই কথাটা জানতে তুমি চেষ্টা কর'না এবং তাকে ঘৃণা কর'না। তার স্থানে, অন্য কোন লোক—সে যে কোন লোকই হোক—সে যা করত' সেও শুধু তাই করেছিল। তবে, আমি নিশ্চিন্ত জানি যে, সে আমাকে খুবই ভালবাসে এবং সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই ভালবাসে।

কিন্তু, এখন তুমি মন দিয়ে শোন!! একদিন "বিকাসিস্" দ্বীপে, আটাকলের কাছে ছোট্ট যে দ্বীপটা তুমি জান, সেইখানে আমাদের দু'জনের দেখা করার কথা ছিল। অর্থাৎ সেই দ্বীপে আমি যাব সাঁতরে এবং সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে ঝোপের মধ্যে। আর, পাছে চলে যেতে কেউ দেখে, এই জন্য সেখানে সন্ধ্যা অবধি আমরা থাকব ঠিক হ'ল।

এখন হ'ল কি যে-মুহূর্ত্তে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটল, ঠিক সেই সময় ঝোপ-ঝাড়গুলো সরে গেল, আর আমরা তোমার আর্দ্দালী ফিলিপকে দেখতে পেলাম। ফিলিপ আমাদের হতবুদ্ধি করে দিলে! তখন আমাদের সাম্নে যে ঘোর বিপদ এটা আমি বুঝলাম এবং জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

যে আমার প্রণয়ী তখন আমাকে সে বললে—"এখানে এই লোকটার কাছে আমাকে রেখে, প্রিয়া আমার, শান্তভাবে সাঁতরে তুমি ফিরে যাও।"

আমি সেখান থেকে এত উত্তেজিত মনে ফিরে এলাম যে, জলে প্রায় ডুবেই যাচ্ছিলাম!! আর এর পর, কিছু যে একটা ভয়াবহ ব্যাপার ঘটবে এটা আশা করেই তোমার কাছে আমি ফিরে এলাম।

একঘণ্টা পরে, ড্রইংরুমের বাইরের বারান্দায়, ফিলিপের সঙ্গে আমার যেখানে সাক্ষাৎ ঘটল, সেখানে সে আমাকে নিচু গলায় বললে, "মহাশয়ার আমি আজ্ঞাবহ। তাঁর যদি কোন চিঠি থাকে ত' আমাকে দিন্।"

অতঃপর আমি বুঝলাম যে, নিজেকে সে বিক্রয় করেছে এবং তাকে আমার প্রণয়ী ক্রয় করেছে। আমি তখন তাকে খান কয়েক চিঠি দিলাম এবং বস্তুতঃ সব চিঠিগুলোই সে নিয়ে চলে গেল। তারপর, উত্তরগুলোও সে আমাকে এনে দিলে।

এই ব্যাপার প্রায় দু'মাস চলেছে। ঐ লোকটার উপর তোমার নিজের যেমন বিশ্বাস ছিল, তেম্নি বিশ্বাস আমাদেরও ছিল। কিন্তু এবারে বলি কি ঘটল! সেই দ্বীপে যেখানে আমি সাঁতরে পৌছুতাম, সেই দ্বীপে একদিন এম্নি একাই আমি গেলাম এবং তোমার আর্দ্দালীকে সেখানে দেখতে পেলাম। ঐ লোকটা আমার জন্যই অপেক্ষা করেছিল। সে আমাকে তখন জানালে যে, আমি যদি তার ইচ্ছাপুরণ না করি তবে, আমাদের বিষয় এক্ষুণি সে তোমার কাছে প্রকাশ করে দেবে। আর, যে চিঠিগুলো সে চুরী করে রেখেছে তোমার কাছে সেগুলো দেখাবে সে।

ভীষণ ভয়ে আমি ভীত হলাম। ভীরুর ভয়, দোষীর ভয়!! যে আমার সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার করেছে আমি তাকে প্রতারণা করছি ব'লে তোমার বিষয়েই আমার বেশী ভয়। অবশ্য, তার বিষয়েও আমার খুবই ভয়, পাছে তুমি তাকে হত্যা কর। বলতে পারি না সম্ভবতঃ আমার জন্যও আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, সুতরাং ঠিক করলাম আমি, এই ইতরটাকে আর একবার আমি ক্রয়

করব। এই লোকটাও আমাকে ভালবাসে!! কি লজ্জা!!!

মেয়েরা—আমরা এত দুর্ব্বল যে, বিপদে যতটা না তোমরা বুদ্ধি হারাও, আমরা তার চেয়ে বেশী হারাই বুদ্ধি এবং মেয়েরা যখন নষ্ট হয়, সর্ব্বদাই সে তখন নিচু থেকে নিচুতে নামতে থাকে। অতএব আমি যে কি করছি সেটা কি তখন আমি বুঝেছি? আমি এই শুধু বুঝেছিলাম যে, তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজনের এবং আমার, মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।

অবশ্য, এটা তুমি বুঝে দেখ যে আমি আমার নিজের দোষ স্খালনের চেষ্টা করছি না। অতএব, পূর্ব্বেই আমার যেটা বোঝা উচিত ছিল, তাই ঘটল। সে বার বার যখনই তার খুশী, ভয় দেখিয়ে আমার সুযোগ গ্রহণ করতে লাগল। সুতরাং, দু'জনের মন রেখে আমায় চলতে হ'ল। আচ্ছা, এটা কি ঘৃণ্য নয়? আর, কত বড় শাস্তি!!

অতঃপর, সব শেষ হয়ে গেল আমার! মরতে আমাকে হবেই! তোমার কাছে আমার এই অপরাধের কথা কখনই আমি, আমার জীবিতাবস্থায় স্বীকার করতে পারতাম না। কিন্তু মৃত্যু সে আমায় সব কিছুতেই সাহসী করেছে। এই পাপ থেকে নিজেকে ধুয়ে ফেলতে মৃত্যু ছাড়া আমার পথ নেই। আমি খুবই অপবিত্রা, এরপর আর ভালবাসতে, কিংবা ভালবাসা পেতে আমি পারিনা। এমন কি, কাউকে স্পর্শ করলেও আমার মনে হত বুঝি তাকে আমি কলঙ্কিত করে দিচ্ছি।

এখন, আমি যাচ্ছি স্নান করতে। কিন্তু, আমি আর ফিরে আসব না। তোমায় লেখা এই চিঠিখানা আমার প্রণয়ীর কাছে যাবে এবং এ বিষয়ে কেউ কিছু জানার আগে যখন আমি মরে যাব, তখন চিঠিটা তার কাছে পৌছুবে। তারপর আমার শেষ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে, চিঠিখানা সে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবে এবং এই চিঠিখানা তুমি, আমার সমাধি স্থান থেকে ফিরে এসে পড়বে। বিদায় প্রিয়, আর কিছু বলার আমার নেই। তোমার ইচ্ছা যা, তাই তুমি কর। আর, ক্ষমা কর আমাকে।

ঘামে ভরে ওঠা কপালটা কর্ণেল মুছে ফেললেন। তাঁর ধৈর্য্য, অতীতের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যখন দাঁড়াতেন সেই ধৈর্য্যই যেন তাঁর মধ্যে আবার ফিরে এল। ঘণ্টা বাজালেন তিনি এবং একটি ভৃত্য তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল।

কর্ণেল বললেন—"আমার কাছে ফিলিপকে পাঠিয়ে দাও।" অতঃপর তিনি তাঁর টেবিলের ড্রয়ার খুললেন।

লোকটি ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ঘরে ঢুকল। দীর্ঘকায় এক সৈনিক—একজোড়া লাল গোঁফ, ধূর্ত্ত চোখ, আর আতঙ্কজনক চেহারা!! কর্ণেল তার মুখের দিকে সোজা বরাবর চেয়ে রইলেন।

আমার স্ত্রীর প্রণয়ীর নাম তোমাকে বলতে হবে।

"কিন্তু—কর্ণেল—হুজুর—"

অফিসারটি তখন তাঁর আধখোলা ড্রয়ার থেকে সহসা রিভলভারটা তুলে নিলেন।

তুমি জান, আমি ঠাট্টা করি না। নাও—বল শীগ্‌গীর!

"আজ্ঞে কর্ণেল হুজুর, সে হচ্ছে ক্যাপ্টেন সেণ্ট আলবার্ট।" ফিলিপের মুখ থেকে ক্যাপ্টেন সেণ্ট আলবার্টের নামটা উচ্চরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, হঠাৎ যেন একটা অগ্নিশিখা ঝলসে উঠল ফিলিপের দু'চোখের মাঝ-খানে এবং কপালগুলি বিদ্ধ হয়ে তক্ষণি সে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

গীদ্য মোপাসাঁর "দি অর্ডারলি" হইতে
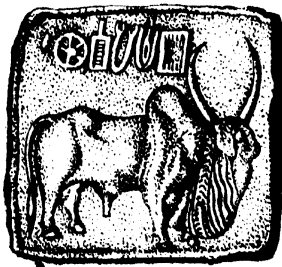
প্যাট ও পীঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

দক্ষিণ ভারতীয় ফিল্ম আর্টিষ্ট.সজ্ঘের সভ্যরা মাদ্রাজে সম্প্রতি এক সভায় স্থির করিয়াছেন, রাত্রি ১০টার পর কোন অভিনেত্রী সুটিং করিবেন না। তাঁহাদের এই দাবী প্রযোজকদের নিকট বিশেষভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি কোন কারণে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কার্য্য চালাইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে স্ত্রী-চরিত্রের কাজগুলি নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করিয়া পুরুষ চরিত্রগুলির কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। স্বাস্থ্যের দিক হইতে এরূপ দাবী খুবই সমীচীন। কিন্তু এরূপ নিয়ম অভিনেতা ও অভিনেত্রী উভয় পক্ষেই হওয়া উচিত।

প্রশ্ন কথাচিত্রের নায়িকা শ্রীমতী অরুন্ধতি মুখোপাধ্যায়

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

*　　*　　*

আমেরিকার ইউনিভারসাল্ ইণ্টারন্যাশন্যাল ফিল্মের প্রযোজিত "বেঙ্গল ব্রীজ", "ডন এ্যাট্ গুকুরো" ও "প্লেগার্ল" নামক তিনখানি ছবি ভারতে প্রদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত ছবি তিনখানি ভারতীয় সেন্সরের ছাড়পত্র লাভে অসমর্থ হইয়াছে। জনকল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সরকার এবম্বিধ ছবির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করিয়া জনগণের প্রশংসাভাজন হইলেন সন্দেহ নাই। ছবির মাধ্যমে দুর্নীতি ও দুষ্কার্য্য, যত প্রদর্শিত না হয় ততই মঙ্গল।

*　　*　　*

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত শিশু-দিগের উপযোগী চলচ্চিত্র প্রস্তুতের ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর সভাপতিত্বে সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে শিশু চলচ্চিত্র সংস্থার কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় আগামী বৎসরে আন্তর্জ্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং একটি শিশু চলচ্চিত্র লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হইবে স্থির করা হইয়াছে। শিশু চলচ্চিত্র সংস্থা কার্য্য সুপরিচালনার জন্য তিনটি অনুসমিতি গঠন করিয়াছেন। প্রথম অনুসমিতি প্রযোজনার ব্যাপার, দ্বিতীয়টি গল্প নির্ব্বাচন এবং তৃতীয়টি সংস্থার পরিচালনা কার্য্যের তদারক করিবেন।

প্রথম অনুসমিতিতে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত ডি, শান্তারাম, শ্রীযুক্ত কে, সুব্রাহ্মণম্ এবং শ্রীযুক্ত এম্, ডি,

ভাট্ সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহাদের প্রধান কাজ হইবে, প্রযোজক মনোনয়ন ও তাহার তালিকা প্রস্তুতকরণ। যাঁহারা শিশু-চিত্র প্রযোজনায় বিশেষ উৎসাহশীল কেবলমাত্র তাঁহাদেরই মনোনীত করা হইবে।

দ্বিতীয় অনুসমিতিতে শ্রীযুক্ত বি, জে, থের, শ্রীযুক্ত অমর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা কমলা ভুট্টা, শ্রীযুক্তা টি, এন্, রামমূর্ত্তি এবং শ্রীযুক্ত এম্, ডি, ভাট্ সভ্য ও সভ্যা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহাদের কাজ হইবে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা লেখকদের নিকট গল্প আহ্বানকরা এবং সেই সকল গল্প হইতে শিশুদের উপযোগী গল্প নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া। গল্পের জন্য কোনরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করা হইবে না। লেখকেরা তাঁহাদের ইচ্ছামতন গল্প লিখিতে পারিবেন। প্রতি গল্পের জন্য লেখককে ২,৫০০৲ টাকা দেওয়া হইবে।

তৃতীয় অনুসমিতিতে শ্রীযুক্ত পি, এম্, লাড্, শ্রীযুক্ত কে, শঙ্কর পিল্লাই এবং সংস্থার সভাপতি পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জুরু ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সংস্থার যাবতীয় পরিচালনার কার্য্য চালাইয়া যাইবেন।

সংস্থার সভাপতি ও সম্পাদক অপর দুইটী অনু-সমিতিরও সদস্য থাকিবেন। কালচারাল্ ফিল্ম সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ শিশু চলচ্চিত্র সংস্থার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সংস্থা আলোচ্য বর্ষে দুইটি শিশুচিত্র প্রযোজনা ও তাহার আর্থিক সাহায্যের জন্য ভারত সরকারের নিকট অনুমোদন করিয়া পাঠাইয়াছেন।

শিশু চলচ্চিত্র সংস্থার এই সাধু প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক্—এই কামনা করি।

* * *

এখন হইতে সোভিয়েট রাশিয়ায় ভারতীয় ফিল্ম প্রদর্শিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ওদেশের লোকের ভাল লাগিতে পারে এইরূপ ১৫খানি ভারতীয় চিত্রের মধ্যে ১১ খানি চিত্র এবৎসর সোভিয়েট রাশিয়ায় পাঠান হইতেছে। এই ১১টি চিত্রের মধ্যে ২টি বাংলা ১টী তামিল ও বাকীগুলি হিন্দী চিত্র পাঠান স্থির হইয়াছে। নির্ব্বাচিত চিত্রগুলির মধ্যে 'ফেরী' "মিঃ এণ্ড মিসেস্ ৫৫" "ময়ূর পঙ্খ" "মুন্না" "নকরী" "মির্জ্জা গালিব" "বিরাজ-বৌ" "ঢুলী" (বাংলা) যদু ভট্ট (বাংলা) এবং 'অভিয়ার' (তামিল) চিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

জয় মা কালী বোর্ডিংএর নায়িকা শ্রীমতী তপতা ঘোষ

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

* * * *

ভারতের প্রধান প্রধান সহরে আগামী ডিসেম্বর মাসে রাশিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল্ অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া জানা

সুপরিচিতা সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীমতী উৎপলা সেন ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়
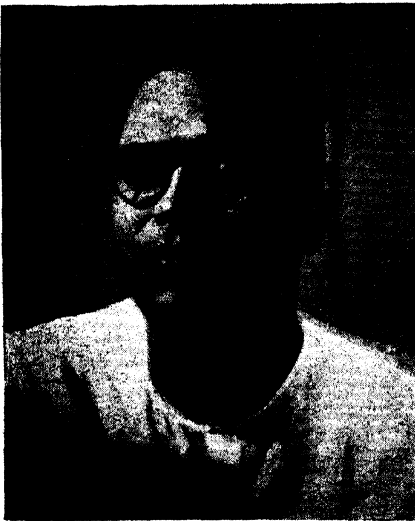
গিয়াছে। এতদুপলক্ষে কয়েকজন খ্যাতনামা রাশিয়ানফিল্ম ডিরেক্টর, টেক্‌নিশিয়ান এবং চিত্র-তারকা উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে রাশিয়ান ফিল্মের এরূপ বৃহৎ প্রদর্শনী ভারতে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

* * *

দিল্লীর এক সংখ্যানুপাত সংবাদে প্রকাশ যে, দিল্লীর সিনেমা গৃহগুলিতে প্রতিমাসে অন্ততঃ ৮ লক্ষ দর্শকের সমাবেশ হইয়া থাকে। দিল্লীর প্রতি পরিবারের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন করিয়া লোক প্রতিমাসে সিনেমা দেখিয়া থাকেন। বিভিন্ন চিত্রগৃহগুলিতে প্রতিদিন অন্ততঃ ২৭ হাজার দর্শকের সমাবেশ হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে দিল্লীর বিভিন্ন সিনেমা গৃহে এক কোটী টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে দিল্লীর প্রতিটি লোক বছরে গড়-পড়তা ৫৷৶০ আনা ছবি দেখার জন্য খরচ করিয়া থাকেন। দিল্লীতে সর্ব্বসমেত মোট ১৮টী চিত্রগৃহ ১০ মাইল এলাকার মধ্যে আছে। ইহা ব্যতীত অস্থায়ী লাইসেন্স প্রাপ্ত ৬টি সিনেমা কোম্পানী আছে। এই সকল কোম্পানীর অধিকাংশই নূতন কলোনীগুলির নিকট অবস্থিত। কাজেই নূতন কলোনীগুলির অধিবাসীদের সহরে সিনেমা দেখার জন্য ছুটীতে হয় না।

* * * *

ভারতীয় কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ড ১৯৫৪ সালে ২৭৯ খানি ভারতীয় চিত্র এবং ২৩৫ খানি বিদেশীয় চিত্রকে সেন্সর সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে কোন ভারতীয় চিত্রকে ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করা হয় নাই। ৩৮ খানি বিদেশীয় চিত্রকে এ বৎসর ছাড়পত্র প্রদান করা হয় নাই। গত ১৯৫১ সালে ৫টী, ১৯৫২ সালে ১৮টী এবং ১৯৫৩ সালে ২১টী বিদেশীয় ছবিকে ছাড়পত্র দেওয়া হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে উহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৫১ সালে ছাড়পত্রপ্রাপ্ত বিদেশী ছবির সংখ্যা ছিল—৩১৫, ১৯৫২ সালে ৩১৬ এবং ১৯৫৩ সালে ২৪৭। আলোচ্য বর্ষে যে ৩৮ খানি ছবি মনোনয়ন লাভ

সুধাকণ্ঠ সংগীত-শিল্পী শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

করে নাই তন্মধ্যে ৩১টী ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌-এর, ২টী ইউনাইটেড কিংডমের, ২টী সোভিয়েট ইউ-নিয়নের, ২টী চীনের এবং ১টী ফ্রান্স-এর। ২৭৯ খানি ভারতীয় চিত্রের মধ্যে ১২০ খানি হিন্দী, ৪৮ খানি বাংলা, ৪০ খানি তামিল, ২৭ খানি তেলেগু, ১৮ খানি মারাঠি, ১০ খানি কনোজী, ৮ খানি অলিয়ম্‌, ৩ খানি ইংরাজী, ৩ খানি পাঞ্জাবী, ১ খানি অসমীয় এবং ১ খানি উড়িয়া ভাষায় তোলা ছবি সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কাট্‌ছাট না করিয়াই ৯৬ খানি "U" অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের জন্য এই সার্টিফিকেট পাইয়াছে। কিঞ্চিৎ কাট্‌ছাটের পর "U" সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে ১৭৫ খানি ছবি। ৮ খানি ছবি কেবলমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য এই সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে।

শ্রীমতী শোভা সেন—বিচিত্র চরিত্রাভিনেত্রী　　ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

*　　*　　*

করাচীর চীফ্‌ কমিশনারের আদেশে করাচী পুলিশ নিসাদ সিনেমা সম্প্রতি শীল করিয়া দেয়। "Here come the Girls." নামক একটি ইংরাজী ছবি এখানে সেন্সর বোর্ডের আদেশ অমান্য করিয়া প্রদর্শিত হইতে থাকে। ফিল্ম সেন্সর বোর্ড উক্ত ফিল্মের কিয়দংশ বাদ দিয়াছিলেন কিন্তু প্রদর্শনকালে সিনেমা গৃহের কর্ত্তৃপক্ষ উহা বাদ না দিয়াই প্রদর্শন করেন।

নদী

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

নদীর এ-পারে ছেলে ও-পারেতে মেয়ে,
এ-পারে কুমীর থাকে ও-পারেতে নেয়ে,
এ-পার ভাঙ্গিয়া যায়, ও-পারেতে চর,
এ-পারে শ্মশান তার ও-পারেতে ঘর।
ও-পারে ধানের ক্ষেত এ-পারেতে বালি,
ছেলে-মেয়ে ভাবে, হায় মা কত খেয়ালী!

সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনীর পর অফিস্ থেকে ফিরে যদি এক ঘণ্টা ধরে এক কাপ চায়ের জন্যে বারান্দায় হা-পিত্যেস করে বসে থাক্‌তে হয় তবে অনেকেরই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা থাকে।

জগদ্দল জোয়ারদারও শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্‌লেন। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে পাগলের মতো হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন, বলি, কানের মাথা কি সবাই খেয়েছে? এক কাপ চায়ের জন্যে গলা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল!

হঠাৎ তাকিয়ে দেখেন, তাঁর গৃহিণীর এতক্ষণে বুঝি চেতনা ফিরে এসেছে। রোজকার বরাদ্দ একবাটি তৈল-মুড়ি আর এক পেয়ালা চা নিয়ে তিনি একেবারে নব বধূটির মতোই তাঁর দিকে এগিয়ে আস্‌ছেন।

কিন্তু এ কী! হঠাৎ বিষম খেলেন নাকি জগদ্দল জোয়ারদার? তাঁর চিরকেলে পুরোনো গৃহিণীর মুখে সযত্নপুষ্ট একটি গোঁফ্?

সকালবেলাও যখন ওই শ্রীহস্ত থেকে তাম্বুল নিয়ে তিনি অফিস যাত্রা করেছিলেন, তখনও কৈ গোঁফের রেখাটি পর্য্যন্ত ছিল না।

জগদ্দল জোয়ারদার দুটি কাঁধ ঝাকিয়ে যেন এই অভাবনীয় কাণ্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখ্‌তে চান!

এই জন্যেই কি গৃহিণীর এত দেরী হচ্ছিল চা নিয়ে আস্‌তে?

জোয়ারদার মশায়ের মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে যেন একটা টাইফুন বিপুল তাণ্ডবে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে চলে গেল।

প্রথমটা তিনি গৃহিণীকে কোনো কথাই জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলেন না।

আজকাল কত কী যে কাণ্ড ঘটছে!

সংবাদপত্রের পাতা ওল্টালেই যত আজগুবী খবরের সন্ধান মেলে!

কোথায় কোন্ নি-খাকী-মা সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছে, কে কোন গ্রামে বসে একটি মাত্র গাছের পাতা দিয়ে বিশ্বের ব্যাধি দূর করার ব্রত গ্রহণ করেছে! কোথায় কোন গোকুলে বাড়ছে নেকড়ে পালিত শ্রীরাম্! সাগর পারের কোন্ ধনকুবের বৃদ্ধ বয়েসে নারী হবার জন্যে নখ আর ঠোঁট রঙীন করে অস্ত্রোপচারের জন্যে আকাশে উড্ডীন হচ্ছেন···!

এসব রঙ্-বেরঙের গাঁজাখুরি সন্দেশ খবরের কাগজের পাতাতে পড়াই ভালো। কিন্তু তাই বলে এই জাতীয় উদ্ভট কাণ্ড নিজের অন্দর-মহলে?

কপালের গেরো আর কাকে বলে?

সারা দিনের পর একটু চায়ে যে আমেজ করে চুমুক দেবেন—সে উৎসাহও আর জোয়ারদার মশায়ের থাক্‌লো না!

গৃহিণীকে আগের মতো কাছে ডেকে যে গুম্ফ-উন্মেষ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করবেন—সে সাহসও নিজের মধ্যে খুঁজে পেলেন না তিনি!

তাহলে সমস্যার সমাধান কি করে হয়!

বহুকাল থেকে তিনি নিজেই যখন ব্লেডের দৌলতে গুম্ফহীন, তখন এতকাল পরে চির পুরাতন গৃহিণীর মুখে যদি পুরুষ্টু গোঁফ দেখা যায়—মনুর শাস্ত্রে কি বিধান আছে তা তিনি জানেন না। বিষয়টি এমন জটিল যে,—এ নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করা চলে না। "আমাদের দাবী মান্‌তে হবে" বলে—ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে প্রতিবাদ সভা ডাকাও মুস্কিল! কিন্তু কী যে সত্যি করা উচিত, জগদ্দল জোয়ারদারের মস্তিষ্কে তা আস্‌ছে না।

মনের মধ্যে নানারকম ভাবনা যখন জট পাকাতে

শুরু করেছে সেই সময় সিঁড়ির কাছে একটা দুপ্ দাপ্ শব্দ শোনা গেল।

তাকিয়ে তিনি যা দেখলেন—তাতে অন্তরাত্মা একেবারে খাঁচা ছাড়া হবার দাখিল।

গৃহিণী মালকোঁচা দিয়ে দুটো বাল্তি জলে ভর্ত্তি করে বাগানের দিকে চলেছেন। হাত দুখানার পেশীও লক্ষ্য করবার মতো!

চা দেবার সময় যাও বা সামান্য একটু চক্ষুলজ্জা ছিল—এখন তা একেবারে উপে গেছে! অবশ্য গৃহিণীকেও এ ব্যাপারে দোষ দেয়া চলে না। লজ্জা নারীর ভূষণ! যতদিন তিনি গৃহিণী ছিলেন—এই লজ্জা বস্তুটিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ছিলেন বলেই মনে হয়। আজ যখন তিনি পৌরুষ ভরে গোঁফে ছাড়া দিয়ে, মাস্‌ল্ ফুলিয়ে বাগানে জল দিতে চলেছেন তখন শকুন্তলার মতো লজ্জা মেশানো ভাবটি ফুটিয়ে তোলা কোনো ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।

কেউ যদি আজ ওঁকে বলে—

"আপনার মান রাখিতে জননী—
আপনি কৃপাণ ধরো"

তাহলে নিশ্চয়ই মানহানির দায়ে পড়তে হবে। কেননা তাতে ব্যাকরণ ভুল হবার সম্ভাবনা রয়েছে বিলক্ষণ!

গুঁফো গিন্নী

জননী যখন কাউকে কোনো রকম নোটিশ না দিয়ে জনক হয়ে ওঠেন—তখন বিপদ সব চাইতে বেশী হয় তাঁর পতি দেবতার!

আইনের মার-প্যাঁচে কোনো দাবীই তখন আর তাঁর থাকে না!

এক 'কমরেড' বলে ডাকা হয়ত চলে, কিন্তু ছেলে-পিলেরা বিপদে পড়ে যায়—কাকে বাবা আর কাকে মা বল্‌বে এই সমস্যা নিয়ে!

গোঁফের জোরে গৃহিণী যদি বেলাবেলি 'বাবা' বনে যান তবে জগদ্দল জোয়ারদার মশাই দাঁড়ান কোথায়? এই নতুন বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কই বা কি হয়?

অফিসের 'লেজার' মেলানোর কাজে জোয়ারদার মশায়ের খ্যাতি আছে। কিন্তু রাতারাতি যে সাংসারিক সমস্যা গজিয়ে উঠল—কোন্ আদালতে তার রায় মিলবে?

গৃহিণী কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে বাগানে জল দিয়ে চলেছেন। কিন্তু জগদ্দল মশাই বারান্দায় বসে বসেই একেবারে গলদঘর্ম্ম হয়ে উঠলেন।

হঠাৎ গায়ের ওপর আচম্‌কা একটা আরশুলা এসে বস্‌লে যেমন সারাটা দেহ রি-রি করে ওঠে তেমনি অস্বোয়াস্তি বোধ করতে লাগলেন জোয়ারদার মশাই।

মানুষ বিপদে পড়ে, কিন্তু সে বিপদে দশজনের সাহায্যও পায়। শক্ত ব্যায়রামে পড়লে ডাক্তার ডাকা চলে; মামলা-মোকদ্দমা বাধলে উকিল-মোক্তারের শরণ নেয়া যায়; গ্রহ কুপিত হলে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করে লোকে; বাঘে তাড়া করলে ছুটে গিয়ে গাছে ওঠা যায়,

ভূতের ভয় হলে রাম নামে কেটে যায় ' সব কিছু আপদ-বিপদ। কিন্তু এই বিদ্ঘুটে বিপদে স্বস্তি কোথায় মিল্‌বে? মুস্কিলে পড়লে মুস্কিল-আসান আছে। কিন্তু গিন্নির গোঁফ্ গজালে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে—কোনো কেতাবেই সে সম্পর্কে কোনো উপদেশ দেয়া নেই।

একটি মাত্র ছেলে জোয়ারদার মশায়ের। সে ইস্কুলের পরে একেবারে খেলাধূলার পাট চুকিয়ে তবে বাড়ীতে ঢুক্‌বে। কিন্তু তারও ত' বেশী বিলম্ব নেই।

সে যখন বাড়ী ফিরে এই অঘটন অবলোকন করবে তখন ত' জগদ্দলবাবু লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবেন না।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল বন্ধু বিপদবারণের কথা।

বিপদবারণ জগদ্দলবাবুর সঙ্গে কলেজে পড়তেন। অনেক বিষয়-আশয় রেখে বাপ অকালে দেহ রক্ষা করেছেন, কাজেই বিপদবারণ হয়েছেন সখের বৈজ্ঞানিক। নিজের বাড়ীতেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ল্যাবরেটরী স্থাপন করেছেন। বহু বিচিত্র পরিকল্পনা বাসা বেঁধে আছে তাঁর মাথায়। এককালে বিপদবারণকে তাঁর উদ্ভট মতবাদের জন্যে বন্ধু-বান্ধব ও সতীর্থরা আধ পাগলা বলে সন্দেহ প্রকাশ করতেন। কিন্তু যে বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে বিপদবারণ কথা কইতেন এবং কথায় কথায় হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখাতে চাইতেন তাতে বন্ধুর দল বিপদবারণের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা দেখে একেবারে হক্‌চকিয়ে যেতেন।

জগদ্দলবাবুর হঠাৎ মনে হল—এই বিপদবারণই তাঁকে আকস্মিক বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে।

যদিও অনেককাল পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ হয়না, কিন্তু এ সময়ে চক্ষু লজ্জায় চুপ করে বসে থাক্‌লে সমূহ বিপদ।

মাঝে মাঝে জোয়ারদার মশাই বিপদবারণের কাছ থেকে খবরা-খবর পেয়েছেন। আহ্বানও এসেছে তার ল্যাবরেটরী গিয়ে দেখ্‌তে। কিন্তু মিছিমিছি পাগলের কথায় কান দেয় কে?

একবার খবর এলো—গোবর থেকে নাকি অভিনব ও পুষ্টিকর কেক তৈরী করছেন বিপদবারণ। সেই পরীক্ষা দেখতে বিপদবারণ তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এই খবরে লোকে না হেসে থাক্‌তে পারে? কাজেই জগদ্দলও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে প্রচুর হেসেছিলেন এই কথাটা নিয়ে।

তারপর বহুকাল আর বিপদবারণের কাছ থেকে কোনো আহ্বান আসে নি!

তা না আসুক।

আজ যেন হঠাৎ জোয়ারদারের মনে হল, বিপদবারণ হয়ত সত্যি আধ পাগলা নয়! ও যা বলে, তার ভেতর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা লুকিয়ে আছে! একদিন হয়ত অদ্ভুত কিছু অবিষ্কার করে ওই মানুষটি সারা জগতে বিখ্যাত হয়ে উঠবে।

নাঃ অভাগা বাঙলা দেশ! কটা লোকই বা সত্যিকারের গুণীর আদর করতে পারে—বা জানে!

এতদিন যে বিপদবারণের দিকে সম্যক দৃষ্টি দেয়া হয়নি, তাঁর প্রতিভা নিয়ে কাগজে কাগজে প্রবন্ধ রচিত হয়নি, তাঁর গবেষণাগারের ফটো কোথায়ও ছাপা হয়নি—সে জন্য জগদ্দলবাবুর সত্যি আফশোষ হতে লাগলো!

আজ কেন যেন মনে হল—পাঠ্যাবস্থা থেকে বিপদ-বারণকে আরো বেশী খাতির করা উচিত ছিল। তা হলে এই বিপদে তিনি এমন দিশেহারা হয়ে পড়তেন না!

যাই হোক বেশী অপেক্ষা করার সময় নেই! দুর্দ্দান্ত ছেলেটা কখন আবার বাসায় ফিরে গৃহিণীর গোঁফ দেখে ওঁকে মা বলে ডাক্‌তে সুরু করে তার ঠিক কী!

তাড়াতাড়ি গায়ে একটা জামা চড়িয়ে আর স্যাণ্ডেলে পা গলিয়ে দিয়ে কোনো মতে চোখ-কান বুঁজে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। পাছে গৃহিণীর সঙ্গে আবার চোখোচোখি হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি অন্দর মহলের দিকেই আর গেলেন না!

বিপদবারণ তাঁকে দেখে বেশ সোল্লাসেই গ্রহণ করলেন। বল্লেন, নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছ। কেননা, পুরোনো বন্ধুরা বিপদে না পড়লে ত' কেউ আমার ল্যাবোরেটরীতে ঢোকে না!

জগদ্দল ওর দু'হাত জড়িয়ে ধরে উত্তর দিলেন, ঠিক ধরেছ ভাই! যাকে বলে—একেবারে অকূল সমুদ্রে! এই বিপদে তুমি যদি—

মুখের কথা লুফে নিয়ে বিপদবারণ বল্লেন, ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে। এখন বিপদটা কোন দিক থেকে এসেছে তাই আগে বাৎলাও—

জোয়ারদার হক্‌চকিয়ে উত্তর দিলেন, আরে না ভাই,

কোনো দিক থেকেই নয়। বিপদ যে এমন ভাবে অন্দর মহলে ওৎ পেতে ছিল তা কি করে জান্‌বো বলো?

অ্যাঁ! অন্দর মহলের বিপদ? দাম্পত্য কলহ?

—কি পেয়েছ ভাই?

—সন্ধান।

—কিসের সন্ধান?

বিপদবারণ ও জগদ্দল

মানভঞ্জনের পালা? তা ভয় নেই! তার জন্যেও আমি WXYZ. ভিটামিন ট্যাবলেট আবিষ্কার করেছি—

—আরে—না—না! দাম্পত্য কলহ মোটেই নয়। জোয়ারদার মশাই কপাল কুঁচকে উত্তর দিলেন।

—তবে?

প্রশ্ন করেন অত্যুৎসাহী বৈজ্ঞানিক।

জগদ্দল মুখ ব্যাদান করে সশব্দে উচ্চারণ করলেন—গোঁফ!

—কার?

—স্বয়ং গৃহিণীর! ইয়া বড়া—ঝাঁটার মতো। আর বলব কি ভাই, একেবারে বেলাবেলি গজিয়েছে!

এইবার ভ্রূ কুঁচকে উঠল বৈজ্ঞানিকের।

বিপদবারণ কপালে পেন্সিল ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে পাইচারী করতে লাগলেন।

বৈজ্ঞানিক যত ঘোরেন—জগদ্দলমশাই তত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কারো মুখে কোনো কথা নেই!

শুধু এদিক আর ওদিক! আপ এণ্ড ডাউন।

হঠাৎ আস্ফালন করে উঠলেন বৈজ্ঞানিক, ইউরেকা পেয়েছি!

—গোঁফের!

এইবার জগদ্দল মশাই কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠেছেন। বল্লেন, আর আমায় নাচাস্ নি ভাই, সত্যি করে বল, আমি কি সুইসাইড করবো?

—মোটেই না।

—তবে?

—তোকে মেয়েছেলে হতে হবে।

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ!

জগদ্দল আবার মরিয়া হয়ে ওঠেন। ব্যাপারটা কি, খুলেই বল না ভাই!

এইবার বৈজ্ঞানিক দিব্যি আমেজ করে একটিপ নস্যি নিয়ে উত্তর দিলেন, তেজস্ক্রিয় ভস্ম!

জগদ্দল হাঁ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর মুখ ব্যাদান করে বল্লেন, বুঝতে পারলাম না ত ভাই!

বিপদবারণ উত্তর দিলেন, তা হলে বলি শোনো, আণবিক বোমার নাম শুনেছ ত?

—হ্যাঁ!

—সম্প্রতি তার পরীক্ষা চল্‌ছে—

—হ্যাঁ!

—তারই তেজস্ক্রিয় ভস্ম কোনো রকমে বায়ুতাড়িত হয়ে তোমার বাসায় এসে পড়েছিল।

—অ্যাঁ?

—হ্যাঁ। আর সেই তেজস্ক্রিয় ভস্মের জন্যে তোমার গৃহিণীর গোঁফ গজিয়েছে!

জগদ্দল শুকনো মুখে উত্তর দিলেন, তা হলে আমাকে কি করতে হবে?

বৈজ্ঞানিক বল্লেন, বিষে বিষক্ষয় জানো ত? "যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে" ওই তেজস্ক্রিয় ভস্মের সাহায্যেই তোমাকে আমি নারীতে রূপান্তরিত করবো। আজ থেকে আমার ল্যাবোরেটরীতে তোমায় আবদ্ধ থাকতে হবে! কবে আবার তেজস্ক্রিয় ভস্ম কল্‌কাতায় উড়ে আসবে কেউ জানে না! ইতিমধ্যে আমি এক্‌সপেরিমেণ্ট চালিয়ে যাবো!

—তবে আর আমি বাড়ী ফিরে যাবো না?

—না।

—কিন্তু আমার গৃহিণী?

—তোমার গৃহিণী আর গৃহিণী নেই, এখন একেবারে জলজ্যান্ত পুরুষ মানুষ! যতদিন তোমায় না মেয়েছেলে করতে পারছি তুমি এই ল্যাবোরেটরীতেই থাক্‌বে।

জগদ্দল বল্লেন, তথাস্তু!

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি যে, জগদ্দল জোয়ারদার মশাই বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরীতে বসে আঙুলে রঙ মাখাচ্ছেন, ঠোঁটে লিপষ্টিক্ ঘষছেন, বড় বড় চুল রেখেছেন এবং তেজস্ক্রিয় ভস্মের আশায় চাতক পাখীর মতো দিন-রাত আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক বড্ড হুঁসিয়ার। তাঁর সতর্ক দৃষ্টিতে কেউ জগদ্দলের সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। কোনো সংবাদপত্রের নিজস্ব রিপোর্টার সংবাদ অবগত নন; নইলে জোয়ারদারের রকমারী ছবিতে দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজের পৃষ্ঠা ভর্ত্তি হয়ে যেত এতদিনে!

সাধক

আশা গংগোপাধ্যায়

গান যদি হতে তুমি আমি মুগ্ধগুণী
কণ্ঠে ধরি রাখিতাম হায়।
আজন্ম সাধনা করি মনোমত সুর
ছন্দ, লয়, দিতাম তোমায়।
ভোরের ভৈরবী সুরে নিশীথ-বেহাগে
শুনাতাম বিশ্ব-নিখিলেরে,
কাজরী বরষাকাশে কৃষ্ণঘন মেঘে
গুঞ্জরিত বিজলীর তারে।
শারদ-সুষমা-প্রাতে শেফালি পল্লবে
সোনালী রোদের দীপশিখা,
আগমনী তব গীতে প্রকৃতির অন্তরেতে
পাঠাতাম সুরের লিপিকা।
সংগীতের মধুমন্দ্রে নবতালে নবছন্দে
ওষ্ঠপ্রান্তে শয়ন বিছাতে,
মেঘ-মল্লারে ভাসি খেয়ালে উলসি আসি
কণ্ঠ রংগপটে ধরা দিতে।
নিজহাতে বাঁধি তার দেহবীণে জড়াতাম
অতন্দ্র এ আমি সুরকার,
নিবিড়ে ঘিরিয়া চিত্ত ঝংকারিতে মধুস্বনে
ভয় নাহি ছিল হারাবার।
সীমাতে অসীমা তুমি ধরাতে অধরা
শুধুই মানবী হায়, নহ তবু গান,
একান্তে তোমারে কভু পেতে নাহি পারি
নিঃশেষেও ঢালি দিলে তনুমন প্রাণ।
তবু জানি বৃথা নাহি হবে এ সাধনা
বিরহের মাঝে আছে মিলন মধুর।
লভিব পরমাসিদ্ধি উত্তর-সাধক
প্রশান্তির ছায়াঘন মরণ সুদূর॥

জন্মাষ্টমী উৎসব—

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের পুত্র, পশ্চিমবঙ্গের উপমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ শুধু রাজনীতির আলোচনা করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন না। তিনি তাঁহার পিতামহ মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের মত দেশে ধর্ম প্রচারে বিশেষভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে বৈষ্ণব উৎসবে নগর সংকীর্তন হয়, তরুণকান্তি সাগ্রহে তাহাতে যোগদান করেন ও উদ্যোক্তাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। গত দোলপূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে তিনি উত্তর কলিকাতায় যে বিরাট নগর সংকীর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং শ্যাম পার্কে ঐ দিন যে বিরাট বৈষ্ণব সভা হইয়াছিল, তাহা দর্শক মাত্রকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। বর্তমান যুগে ঐরূপ ভক্ত সমাবেশ ও কীর্তনে জনগণের যোগদান সত্যই বিস্ময়ের জিনিষ হইয়াছিল। গত রথযাত্রার দিনও শ্রীমান তরুণকান্তি শ্রীরামপুর মাহেশে রথের পুরোভাগে বিরাট সংকীর্তন দল পরিচালনা করিয়াছিলেন। ঐ ভাবে প্রায়ই তাঁহাকে গ্রামে গ্রামে নগর সংকীর্তনে যোগদান করিতে দেখা যায়। গত জন্মাষ্টমীর দিন দক্ষিণ কলিকাতায় যে বিরাট উৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা পূর্বের সকল উৎসবকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ঐ দিন বেলা সাড়ে ৩টা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্য্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের নেতৃত্বে বহু সহস্র লোকের নগর সংকীর্তন দল দক্ষিণ কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। পথে যাঁহারা সে শোভাযাত্রা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছেন। ইহকাল সর্বস্ব, জড়বাদ জর্জরিত যুগে মানুষের মধ্যে এই ধর্মভাবের প্রকাশ দেখিয়া সত্যই মনে হইয়াছে যে দেশে সত্যযুগের শুভসূচনা দেখা দিয়াছে। পথে পথে কয়েক লক্ষ লোককে ঐ সংকীর্তনে যোগদান করিতে দেখা গিয়াছিল। তাহার পর সাড়ে ৬টায় যখন সংকীর্তন দলগুলি দেশপ্রিয় পার্কে যাইয়া সমবেত হইল, তখন তথায় তিলধারণের স্থান ছিল না। লক্ষাধিক লোক পূর্ব হইতেই তথায় সমবেত হইয়াছিল। সভায় ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ দিবার কথা পূর্বেই ঘোষিত হইয়াছিল। ইহা রাজনীতিক সভা নহে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ধর্ম সভা—এই অধর্ম ও ধর্মহীনতার যুগে ধর্মকথা শুনিবার জন্য মানুষের মধ্যে যে আগ্রহ দেখা গিয়াছিল, তাহা অসাধারণ মনে না করিয়া উপায় নাই। এত অধিক লোক সমাগম তথায় আর কখনও দেখা যায় নাই। সকলেই মনে করিতেছিল, এ সভা গড়ের মাঠে প্যারেড গ্রাউণ্ডে হইলে সমবেত জনগণের পক্ষে সুবিধা হইত। যাহা হউক, প্রথমটা সভার কার্য্য গোলমালের জন্য কিছুক্ষণ ব্যাহত হইলেও পরে ভিড় অপেক্ষাকৃত কমিয়া গেলে সভার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন ও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন। কলিকাতার প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত লোক ঐ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। সংকীর্তন দল দুই মাইল দীর্ঘ ছিল এবং প্রায় ৪ মাইল পথ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য প্রত্যেক দর্শককে ভক্তিরসে সিঞ্চিত করিয়াছিল। যিনি যে ভাবে পারিয়াছেন, সেদিন সমবেত ভক্তগণের সেবা দ্বারা নিজেকে ধন্য করিয়াছেন। সহরে বহুদিন একত্র এত অধিক লোক সমাগম দেখা যায় নাই।

পাকিস্তানে নূতন মন্ত্রিসভা—

গত ১১ই আগষ্ট করাচীতে পাকিস্তানের নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। মুসলিম লীগ দলের ৬ জন সদস্য ও যুক্তফ্রণ্টের ৫ জন সদস্য তাহাতে স্থান পাইয়াছেন। আওয়ামী লীগ দল যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনে সম্মত হয় নাই। চৌধুরী মহম্মদ আলি নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া প্রধান মন্ত্রী

হইয়াছেন—তাহা ছাড়া মুসলিম লীগ দলের (২) ডাক্তার খান সাহেব (৩) হাবিব ইব্রাহিম রহিমতুল্লা (৪) সৈয়দ আবিদ হোসেন (৫) পীর আমীর মহম্মদ রাসদি ও (৬) সর্দার আমীর আজম খাঁ আছেন। যুক্তফ্রণ্ট দলের মহম্মদ আলি নূতন মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন নাই। ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা বর্তমানে পাকিস্তানের অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেলের কাজ করিতেছেন। ১৯৫০ সালে মন্ত্রী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগের পর

ময়ূরাক্ষী বাঁধের একটি দৃশ্য

প্রাচ্যবাণী মন্দিরের বার্ষিক অধিবেশনে ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী বঙ্গদেশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের যৌক্তিকতা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। পার্শ্বে ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়, শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু এবং প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সভাপতি ডক্টর শ্রীনলিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত মহাশয়কে দেখা যাইতেছে

(১) এ-কে-ফজলুল হক (২) কামিনীকুমার দত্ত (৩) লুৎফর রহমন খাঁ (৪) আবদুল লতিফ বিশ্বাস (৫) মহম্মদ নুরুল হক চৌধুরী আছেন। ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী এই প্রথম একজন হিন্দুকে পাকিস্তানে মন্ত্রী করা হইল। শ্রীকামিনীকুমার দত্তকে তাঁহার নিয়োগে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

বিধান সভার দল—

গত ১১ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে দেখা যায় নিম্নলিখিত ১৩জন বিরোধী দলের সদস্য কংগ্রেস দলে যোগদান করিয়াছেন—(১) ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ফরোয়ার্ড ব্লক (২) শ্রীভূষণচন্দ্র দাস—পি-এস-পি (৩) কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ—স্বতন্ত্র (৪) শ্রীবিজয়গোপাল গোস্বামী—জাঃ গণ (৫) শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ কুমার—জাঃ গণ (৬) শ্রীপঞ্চানন লেট—ফঃ ব্লক (৭) শ্রীপশুপতিনাথ মালিয়া—জাঃ গণ (৮) শ্রীদীনতারণ মণি—স্বতন্ত্র (৯) ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল—ফঃ ব্লক (১০) শ্রীবসন্তকুমার পানিগ্রহী—জাঃ গণ (১১) শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক—পি-এস-পি (১২) শ্রীনেপালচন্দ্র রায়—ফঃ ব্লক (১৩) শ্রীকৃপাসিন্ধু সাহা—ফঃ ব্লক। ফলে বিভিন্ন দলের সদস্য সংখ্যা হইয়াছে—কংগ্রেস ১৭২, কম্যুনিষ্ট—৩১, পি-এস-পি ১৩, জাতীয় গণতন্ত্র—১১, ফরোয়ার্ড ব্লক—৮ ও স্বতন্ত্র—৭। নূতন ১৩জন সদস্যের যোগদানে কংগ্রেস দলের নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের শক্তি বর্দ্ধিত হইল।

কুমারী মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি এ বৎসর বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন

আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার—

৭২টি দেশের পরমাণু শক্তি বিশেষজ্ঞগণ সংখ্যায় ১২শত—৮ই আগষ্ট জেনেভায় রাষ্ট্রসংঘের ইউরোপীয় হেড কোয়ার্টার্সে জেনারেল এসেম্বলী হলে সমবেত হইয়া আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডাঃ এইচ-জে-ভাবা সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন—রাষ্ট্র সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ডাগ হ্যামার সয়েল্ড উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। ডাঃ ভাবা তাঁহার অভিভাষণে বলেন—আগামী ২০ বৎসরের মধ্যেই হাইড্রোজেন বোমার অমিত শক্তি মানুষের বৈদ্যুতিক শক্তি ও তেজের অভাবজনিত সকল সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত হইবে। বিশ্বে ব্যাপকভাবে আণবিক শক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সমিতি গঠিত হইবে এবং শান্তিরক্ষার জন্য বৃহৎ দেশগুলি উহাতে একমত হইয়াছে।—এইভাবে দেশের বৈজ্ঞানিকগণ জনকল্যাণের কথা চিন্তা করিলে দেশবাসী স্বস্তি অনুভব করিবে।

আমেরিকার সিনেমাইড্ কোম্পানি. কলিকাতার দে মেডিকেল স্টোরস্ লিঃ-এর মালিক শ্রীধীরেন্দ্র দে মহাশয়ের মারফত ১০০০ গ্রাম ডি-হাইড্রো-স্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট-এর একটি বাক্স দার্জ্জিলিং টি. বি. হাসপাতালের রোগীদের বিতরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে দান করেন। চিত্রে দে মহাশয়ের হস্ত হইতে ডাঃ মুখোপাধ্যায় ঔষধগুলি পরীক্ষা করিতেছেন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঋণ—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহের অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে ও জমিদারী দখলের ব্যয় নির্বাহের জন্য শতকরা ৪ টাকা সুদের ৫ কোটি টাকার এক ঋণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৬৭ সালে ঐ ঋণ শোধ

করা হইবে। ঋণের ৫ কোটি টাকার মধ্যে ২ কোটি টাকা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পথ উন্নয়ন, সড়ক পরিবহন ও কল্যাণী প্রভৃতিতে গৃহ নির্মাণ কার্য্যে ব্যয় করা হইবে। জমীদারীর ক্ষতিপূরণ দানে ২ কোটি টাকা ও ১ কোটি টাকা দুর্গাপুরে কোকচুল্লী স্থাপনে ব্যয়িত হইবে। ২৫শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও হায়দ্রাবাদেও এইরূপ ঋণ ঘোষণা করা হইয়াছে। মোট ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ সংগ্রহ করিয়া দেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর করা হইবে। অন্ধ্র ২॥০ কোটি, হায়দ্রাবাদ ২ কোটি, বোম্বাই ৬ কোটি, মাদ্রাজ ৭ কোটি, উত্তর প্রদেশ ৬ কোটি টাকা ঋণ লইবে। আশা করা যায়, সত্বর দেশবাসী এই ঋণ দান করিয়া সরকারকে সাহায্য করিবেন।

শস্যোৎপাদনে আণবিক শক্তি—

ইতালীয় বিজ্ঞানীরা আণবিক শক্তির সাহায্যে ২ মাসের মধ্যে গমের ফসল ঘরে তুলিয়াছেন। সাধারণত উহাতে ৭ মাস সময় লাগিত। বিজ্ঞানীরা গম বীজের উপর নিউট্রন ও গামা রশ্মি প্রয়োগ করিয়া অসময়ে সেগুলি বপন করেন। ৬৪ দিনের মধ্যে ফসল পাকিয়া উঠিয়াছে। এইরূপ পরীক্ষা দেশের সর্বত্র প্রসারিত হইলে দেশের খাদ্য সমস্যার আশু সমাধান হইবে।

পদ্মার ভাঙ্গনে মুর্শিদাবাদ—

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন দয়ারামপুর ইউনিয়নের নিকট পদ্মা ভীষণ রূপ ধারণ করিয়াছে—ফলে মিস্ত্রীচক, নতুনচক, মনসুর খাঁ চক, সোনারপাড়া, ঘনশ্যাম-পুর, শিবপুর, রঞ্জিতপুর, আহম্মদপুর, নওদাটুলী প্রভৃতি গ্রাম পদ্মার ভাঙ্গনে প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। গৃহহীন পরিবারবর্গ অন্যত্র কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছে—ঐ এলাকায় প্রায় ২ হাজার বিঘা ফসলের জমী জলমগ্ন হওয়ায় শস্য নষ্ট হইয়া যাইবে। বেলডাঙ্গা থানার মাণিকনগর মৌজার দুধমাটি দাঁড়া দিয়া জল প্রবেশ করিয়া বন্যার স্রোতে ১০।১২ হাজার বিঘা জমীর ফসল নষ্ট করিয়াছে। ঐ স্থানে একটি স্লুইস গেটের ব্যবস্থা হইলে এই বন্যা বন্ধ করা যাইত। কান্দি মহকুমার কান্দি থানার কুমারসন্ধ্যা ইউনিয়ন এবং খরগ্রাম থানার খরগ্রাম, সদন, বালিয়া, খরগ্রাম, ইন্দ্রাণী ও কীর্তিপুর ইউনিয়নের প্রায় ৯০ হাজার বিঘা জমী ময়ূরাক্ষীর জলে ডুবিয়া গিয়াছে। দামোদর ও ময়ূরাক্ষীর নিয়ন্ত্রণের পর বন্যার প্রকোপ বন্ধ হইবে লোক আশা করিয়াছিল। সেজন্য সর্বত্র নিরাশা দেখা যাইতেছে।

নূতন অস্ত্র নির্মাণ কারখানা—

মধ্যপ্রদেশে নাগপুর হইতে ৪০ মাইল দূরে ভাণ্ডারার নিকট ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারত সরকার এক বিরাট অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপন করিবেন। উহা নাগপুর—জব্বলপুর পথের মধ্যে অবস্থিত। নাগপুর হইতে এখন জব্বলপুরের রেল অনেক ঘুরিয়া গিয়াছে। নূতন সোজা রেলপথ নির্মিত হইলে ভাণ্ডারার নিকট দিয়া যাইবে। এই বিরাট কারখানায় ভারতের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করা হইবে। ভারতে এখনও অস্ত্র নির্মাণ ব্যবহার বিস্তৃতির প্রয়োজন রহিয়াছে।

আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন—

গত ২৩শে জুলাই দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় স্থির হইয়াছে—পূর্ব পাঞ্জাবের অমৃতসরে আগামী ১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারী কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইবে। ১১ই ও ১২ই জানুয়ারী তথায় ওয়ার্কিং কমিটীর সভা এবং ১৩ই ও ১৪ই জানুয়ারী বিষয় নির্বাচনী সভা হইবে। দেশের অগ্রগতির পথে এখনও কংগ্রেসের বহু সাহায্যের প্রয়োজন রহিয়াছে। এখনও কংগ্রেসের মধ্যে বহু স্বার্থত্যাগী কর্মী আছেন। নূতন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীডেবরের নেতৃত্বে তাহাদের কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত হইলে, স্বাধীন ভারতের অগ্রগতিও সুনিশ্চিত হইবে।

দুর্গাপুর বাঁধের উদ্বোধন—

গত ৯ই আগষ্ট মঙ্গলবার বিকালে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিয়া দুর্গাপুর বাঁধের উদ্বোধন করেন। দুর্গাপুরে দামোদর নদে ২২০০ ফিট বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। এ বাঁধ নির্মাণের কাজে মূলতঃ যে সময় ও অর্থ বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা কম সময় ও কম অর্থে এই বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। এই বাঁধ নির্মাণের জন্য ৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা

হইয়াছিল। বাঁধের জল দ্বারা শেষ পর্যান্ত ১৩ লক্ষ একর জমীতে সেচের ব্যবস্থা হইবে। বর্তমানে বাঁধের জলে ১লক্ষ একর জমীতে জল সেচ করা যাইবে। ফলে অতিরিক্ত চাউল উৎপন্ন হইবে ৫৬ লক্ষ ৫ হাজার ১ শত মণ ও রবিশস্য হইবে ৩৬ লক্ষ মণ। দামোদরের উভয় পাড়ে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া জেলায় মোট ১৫৫০ মাইল খাল ও শাখা খালের দ্বারা জল সেচ করা হইবে। বাঁধের পূর্ব প্রান্ত হইতে ৮৫ মাইল দীর্ঘ নৌচলাচলের খাল আরম্ভ হইয়াছে ও উহা মগরার নিকট হুগলী নদীতে পড়িবে। সেদিন ডক্টর রাধাকৃষ্ণন বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিবামাত্র দামোদরের অবরুদ্ধ জলরাশি বিপুল বেগে স্লুইস গেট দিয়া পার্শ্ববর্তী খালে প্রবেশ করিতে থাকে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া ডক্টর রাধাকৃষ্ণন দামোদর উপত্যকার এই বাঁধ ভারতের জনগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন এবং আশা ব্যক্ত করেন যে, এককালে যে দামোদর নদের নাম ধ্বংস ও দুর্গতের অশ্রুর সহিত জড়িত ছিল, তাহা অদূর ভবিষ্যতে আশা ও সমৃদ্ধির বার্তাবহ হইয়া উঠিবে। তিনি আরও বলেন—কেবলমাত্র পরিবেশ ও বস্তুতান্ত্রিক উন্নয়ন সাধন করাই কল্যাণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নহে—মানুষের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতিসাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করাই উহার উদ্দেশ্য।

দুর্গাপুর বাঁধ বর্দ্ধমান বিভাগের জেলাসমূহকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলুক—সকলেই এই প্রার্থনা করে।

কলিকাতা টাউন হল -

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে বর্তমান টাউন হলটি নির্মিত হইয়াছিল। পূর্বে তথায় জনসভা অনুষ্ঠিত হইত। নূতন বিধান সভা গৃহ নির্মিত হইবার পূর্বে তথায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইত। উহা কলিকাতা কর্পোরেশনের সম্পত্তি। ১৯৪৩ সাল হইতে ঐ গৃহে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য বিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল। সম্প্রতি উহা খালি পড়িয়া আছে। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় স্থির হইয়াছে যে ঐ গৃহ-সংস্কার করিয়া তথায় সাধারণের জন্য চিত্র-গৃহ করা হইবে। কলিকাতা সহরের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের চিত্র তথায় রক্ষিত হইবে। কর্পোরেশনের সকল চিত্র ঐ ভাবে একত্র রক্ষিত হইলে জনগণের পক্ষে সেগুলি দেখার সুবিধা হইবে।

শরৎচন্দ্র অধ্যাপক—

কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ১০৫৪ সালের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক" নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হইবে। ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালের যথাক্রমে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ও শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'শরৎচন্দ্র অধ্যাপক' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্যামাপদবাবুর মত প্রবীণ অধ্যাপকের নিয়োগে উপযুক্ত পাত্রেই সম্মান দেওয়া হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র—

যে সকল প্রবীণ ছাত্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের শত বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ৪জনের নাম উল্লেখযোগ্য—(১) ৯২ বৎসর বয়স্ক শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ রায় বিদ্যার্ণব—ইনি কলেজ পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন। (২) শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র ১৮৯৬ সালে (৩) শ্রীসতীনাথ রায় ১৮৯৮ সালে ও (৪) শ্রীহেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ ১৮৯৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়াছিলেন—তাঁহারা পতাকা উত্তোলনের সময় শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন সিংহ রায় মহাশয় ১৮৮৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়াছিলেন। সকলেই খ্যাতনামা ব্যক্তি।

বিরলা পরিবারের বিরাট দান—

কলিকাতার বিরলা পরিবার দেশের শ্রমশিল্প বিষয়ক অগ্রগতির জন্য কলিকাতার বিরলা পার্ক নামক তাহাদের বিরাট বসতবাটীটি দখল করিয়াছেন। পার্কটি ১৯ বিঘা জমীর উপর অবস্থিত—তাহার মধ্যে ৫ বিঘার উপর সুবৃহৎ তেতালা বাড়ী। ঐ গৃহে বর্তমানে ৪০টি বড় ঘর ও ৭টি বড় হল আছে। ভারত সরকারের উদ্যোগে তথায় একটি শ্রমশিল্প মিউজিয়ম স্থাপিত হইবে। বিরলাদের অর্থেই উহা সংস্কার করা হইয়াছে। ঐ পার্কের জমীতে একটি গ্রহকক্ষ (গ্রহ নক্ষত্রের গতি সম্বন্ধীয় গবেষণার স্থান) একটি কলেজ ও একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইবে। এরূপ বিরাট দানেই অর্থের সার্থকতা বর্তমান।

পাকিস্তানের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী—

গত ৭ই মে পাকিস্তানী সীমান্ত সৈন্য ভারতীয় এলাকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুলীবর্ষণ করায় নেকোয়ানে ১২জন ভারতীয় নিহত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৬জন ভারতীয় সৈনিক ও ৬জন বেসামরিক কর্মী ছিল। রাষ্ট্রসংঘের পর্য্যবেক্ষককে ঐ ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করিতে বলা হয়—তিনি জানাইয়াছেন—পাকাস্তানী সীমান্ত রক্ষীরা ইচ্ছা করিয়া বিনা উত্তেজনায় ঐ কার্য্য করিয়াছে। সেজন্য ভারত সরকার পাকিস্তানী সরকারের নিকট ১২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়াছে। এই ক্ষতিপূরণ যদি সত্বর প্রদত্ত না হয়, তবে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ইহার পূর্বে বহুবার লোকের বহু ক্ষতি করিয়াছে—কিন্তু এবারের মত পূর্বে এমন হাতে-নাতে ধরা পড়ে নাই। আমাদের বিশ্বাস পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করিবেন।

উত্তর পূর্ব ভারতে নদী ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ -

ভারত সরকার হিমালয়ের উত্তর পূর্ব এলাকায় তথা উত্তর পূর্ব ভারতে নদী-নিয়ন্ত্রণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পর্য্যবেক্ষণ প্রাথমিক কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রজাতন্ত্রী চীন, ভূটান, সিকিম, পাকিস্তান, নেপাল এবং ভারত রাষ্ট্রের বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সরকার এ বিষয়ে সহযোগিতা করিতেছেন সম্প্রতি এ বিষয়ে ভূটানের সহিত ভারতের এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। তিব্বত হইতে যে সকল নদী ভারতে আসিয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধে প্রজাতন্ত্রী চীনও ভারতের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। সিকিম ও পাকিস্তানের সহিতও পত্র লেখালেখি চলিতেছে। ইহার ফলে উত্তর পূর্ব ভারতের নদী ও বন্যা নিয়ন্ত্রিত হইলে পার্বত্য অঞ্চলগুলির উন্নতির ব্যবস্থা করা সহজ হইবে। দেশবাসী এই সকল গঠনমূলক কার্য্যের জন্য সর্বত্র শান্তি রক্ষার কামনা করিয়া থাকে।

বৈচিত্র্য

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী

পালালো—ধরো—মারো---

সহসা উচ্চনাদে চীৎকার উঠল—লোক জড়ো হ'ল অনেক রাস্তার দুদিকে। সকলের মুখেই এক রব—কি? কি?—ব্যাপার কি মশাই? ঘটনাটা এই, একটি ভদ্র-মহিলা একটি শিশুপুত্রের হাত ধরে চৌরঙ্গীর রাস্তা পার হচ্ছিলেন হঠাৎ একখানি ট্যাক্সি তাদের চাপা দিয়ে পালাচ্ছিল, রাস্তার পথচারীরা সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে চীৎকার করে উঠলো। অতঃপর পথচারীদের উৎসাহে শিখ ড্রাইভার ধরা পড়ল এবং তার পিঠে পড়ল কীল, গুঁতা, ঘুষী, লাথী, ছাতি ও লাঠী। তামাসা দেখতে ভীড় জমে উঠল ক্রমশ। এমন সময় জনতা ভেদ করে ঢুকলেন একজন ভদ্রলোক—তখনও চলছিল নির্যাতন সমভাবে—চালকের উপর। তিনি জনতাকে র্ভৎসনা করে বললেন—আপনারা এখানে ভীড় করে একে মারধর করছেন আর ওই অদূরে একজন মহিলা ও শিশু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছেন---সাহায্য প্রার্থনা করছেন। কয়েকজন ভদ্রলোক লজ্জিতভাবে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। ভদ্রলোকও অনুসরণ করলেন। ইতিমধ্যে একজন পুলিশ সার্জেণ্ট এসে হটিয়ে দিল জনতা। আহতা মহিলাকে তোলা হল সেই ট্যাক্সিতে। ছেলেটি ছিল অক্ষত কিন্তু ভয়ানক 'শক' পেয়ে কাঁদছিল অসহায়ভাবে! ভদ্রলোক তুলে নিলেন ছেলেটিকে তাঁর গাড়ীতে। দুইখানি গাড়ী চলল শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল অভিমুখে। রাস্তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল---কে বলবে দু'মিনিট পূর্বে ঘটেছে কোন দুর্ঘটনা। অপর ফুটপাথে তখনও বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়িয়ে ছিল এক ব্যক্তি—মলিন বেশ, রুক্ষ কেশ। উন্মাদ নয় তো!

মটর গাড়ীর ভদ্রলোককে দেখে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলেন গাড়ীর কাছে। লোক ডেকে তাড়াতাড়ি ষ্ট্রেচার আনিয়ে স্ত্রীলোকটীকে নামাবার ব্যবস্থা করা হ'ল কিন্তু নামাতে গিয়ে দেখা গেল স্ত্রীলোকটি মারা গেছেন পথিমধ্যেই। সার্জেণ্ট ও হাসপাতাল এবার তাদের কর্তব্য কার্য্য সুরু করল। সার্জেণ্ট ড্রাইভারের নাম-ধাম ও লাইসেন্স নম্বর নিল। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ তাদের রেজেষ্টারী বইতে মৃতার নাম লিখতে গিয়ে বিপদে পড়লেন। বালকটিকে তার মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করলে সে তো কেঁদেই আকুল---অনেক করে বোঝাতে সে বলল তার মায়ের নাম "মা"—মহা মুস্কিল! মুস্কিল আসান করল সার্জেণ্ট—সে জিজ্ঞাসা করল তার বাবার নাম। অনেক সাধ্যসাধনা করে উত্তর পাওয়া গেল—যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কিন্তু ঠিকানা সে বলতে পারল না। অসহায়ভাবে বালক কাঁদতে লাগল। ভদ্রলোকের অনুরোধে মৃতার ও বালকের ফটো নেয়া হল।

এখন প্রশ্ন উঠল এই বালকটীকে নিয়ে, হাসপাতালের কর্মসচীব ভদ্রলোককে সম্বোধন করে বললেন: এক কাজ করুন ডাঃ মুখার্জি, ছেলেটীকে আপনি নিয়ে যান, নিজের ছেলেমেয়ে নেই, এটিকে নিয়ে মানুষ করুন। পদবী মুখার্জি ব্রাহ্মণ, মিলবে ভাল। উপস্থিত সকলে অনুমোদন করল এই প্রস্তাব। ডাঃ মুখার্জি গম্ভীর হয়ে কি ভাবলেন, তারপর তিনি ছেলেটীকে গাড়ীতে তুলে প্রস্থান করলেন। ডাঃ রবীন্দ্র মুখার্জি কলিকাতার একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। অগাধ সম্পত্তির মালিক কিন্তু নিঃসন্তান।

পাচ বছর পর। বালীগঞ্জ অঞ্চলে ডাঃ মুখার্জির বিরাট আধুনিক বাড়ী। বাড়ীর পিছনে প্রকাণ্ড 'লন'---সামনে ফুলের বাগান। ফটকের সামনে প্রহরী---তবে কাহারো প্রবেশের বাদ-বিচার নাই। ডাক্তারের বসবার ঘরের দুদিকে রোগী ও ডাক্তারদের বসবার ঘর। একে একে ডাক আসছে আর রোগী যাচ্ছে---গৃহ-ডাক্তার সংগে

থাকলে তিনিও রোগীর সংগে যাচ্ছেন। ডাঃ মুখার্জি এগারোটার সময় বেরুন 'কলে'। তিনি 'বেয়ারা'কে সেদিন জিজ্ঞাসা করলেন, রোগীর বসবার ঘরে আর কেহ আছে কিনা। বেয়ারা দেখে এসে জানাল রোগী নাই তবে একজন লোক তাঁর দর্শনপ্রার্থী। ডাক্তার মুখার্জি বিরক্তভাবে তাকে ডাকতে বললেন। বেয়ারার সংগে ঘরে ঢুকল একজন লোক—পরণে ছিন্ন বস্ত্র, সেলাই করা সার্ট গায়ে—খালি পা—চুলগুলো তৈলাভাবে রুক্ষ কটা। ডাঃ মুখার্জি অপ্রসন্ন মুখে আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বিরক্তভরা কণ্ঠে বললেন, কি চাই? আগন্তুক বিনীত কণ্ঠে বলল: আমার একটি ভিক্ষা—

ডাঃ মুখার্জি বিরক্তব্যঞ্জক মুখে একটি টাকা পকেট থেকে বের করে তাকে দিতে গেলেন। সে প্রত্যাখ্যান করল। ডাঃ মুখার্জি অসহিষ্ণু ভাষায় বললেন—তবে চলে যাও, এখন অসময়ে বিরক্ত করো না। আগন্তুক ধীরকণ্ঠে বলল: আমি কোন অর্থ ভিক্ষা চাই না, ডাঃ মুখার্জি,—আমি আমার পুত্র ভিক্ষা চাইছি আপনার কাছে।

ডাক্তার বললেন—তার মানে?

আগন্তুক উত্তর করল :—আমার পুত্র রমেন্দ্রকে ফিরিয়ে দিন।

ডাক্তার বসে পড়লেন বজ্রাহতের ন্যায়। কিছুক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করে ডাক্তার প্রশ্ন করলেন—আপনার পুত্র তার কোন প্রমাণ আছে? আগন্তুক যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট থেকে বের করে দেখাল একখানি ফটো। ডাক্তার মুখার্জি দেখলেন ফটোতে বসে আছে তিন ব্যক্তি, যোগেন্দ্র, রমেন্দ্র ও তার মা। ডাক্তার মুখার্জির মুখমণ্ডলে দেখা দিল বিষাদের ছায়া। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, পরে যোগেন্দ্রকে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন—ভাই, তোমাকে দেখছি পরিশ্রান্ত, ভিতরে চলো স্নানাহার কর, পরে আমাদের কথাবার্তা হবে।

যোগেন্দ্র আপত্তি করল না এই প্রস্তাবে।

ডাঃ মুখার্জির স্ত্রী শৈলবালা সাশ্রুনয়নে বললেন: ঠাকুরপো, রমু তোমার ছেলে—তোমার ছেলে তুমি নিয়ে যাবে তাতে আমাদের বাধা দেবার কোন অধিকার নাই। তবে ওকে আমার কোল থেকে নিয়ে যাওয়া মানে আমার বুক থেকে হৃৎপিণ্ড ছিড়ে নেওয়া হবে। ডাঃ মুখার্জি একটি 'রিভলভার' এনে টেবিলের পরে রেখে ছল ছল চোখে বললেন, ভাই, রমুকে আমাদের কাছ থেকে নেবার পূর্বে ঐ গুলিভরা আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা আমাদের বধ কর—তিলে তিলে মরার চেয়ে তোমার হাতে মৃত্যু অনেক সুখকর হবে। আমার অনুরোধ তুমি ছোট ভাইয়ের স্নেহে থাক আমার কাছে। এই বিষয় আশয় ভোগ করবে তোমারই রমু আমাদের অবর্তমানে। অথবা তুমি যেখানে খুসী থাক আমি আজীবন তোমাকে ১০০৲ টাকা মাসে মাসে পাঠাব। রমু বড্ড ভাল ছেলে—লেখাপড়ায় খুব আগ্রহ—ক্লাশের 'ফার্স্ট বয়'। দেখবে কালে রমু আমার বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হবে।

যোগেন্দ্র এই মুখার্জি দম্পতির আলাপ ব্যবহার ও সদাশয়তায় হল মুগ্ধ। তারপর রমুর প্রতি তাদের স্নেহ মমতা উপলব্ধি করে যোগেন্দ্র বলল: আমার রমুকে আপনাদের দিলাম। আজ থেকে আমি মুক্ত—রিক্ত। ভগবান আমাকে সকল রকমে করেছেন কাঙাল। আমি বাস্তহারা—পত্নীহারা, আজ থেকে হলাম পুত্রহারা। কি ছিলাম, কি হয়েছি আবার কি হবো ভগবান জানেন।

যোগেন্দ্র তড়াক করে উঠে পড়ল। ডাক্তার দম্পতী সমস্বরে বলে উঠলেন—সে কি হে? এক্ষুণই তুমি কোথায় চলছ? যোগেন্দ্র নির্লিপ্তভাবে বলল: যেখানে দু' চোখ যায়। শৈলবালা বললেন: রমু স্কুল থেকে এখনই আসবে—একবার তাকে দেখে যাও।

যোগেন্দ্র জোরে জোরে পা বাড়িয়ে বলল: সর্বনাশ! সে এলে কি আমায় ছাড়বে? অনর্থ বাধাবে—আপনাদের সকল উদ্দেশ্য হবে ব্যর্থ।

প্রকাণ্ড হলঘরের সামনে এসে যোগেন্দ্র থমকে দাড়াল—তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল প্রকাণ্ড একখানি অয়েল পেন্টিং ছবির দিকে। ডাঃ মুখার্জিকে জিজ্ঞাসা করল ঐ ছবিখানি কার? ডাক্তার জানালেন ঐ হচ্ছেন তাঁর কাকাবাবু তারক মুখার্জি আর ডানদিকে তার পিতা অনাদিনাথ মুখার্জি। যোগেন্দ্র ক্ষণিক হতভম্বের ন্যায় দাড়াল—দুইখানি ছবির উদ্দেশ্যে যুক্তকরে প্রণাম করল। দু' হাত তুলে একবার ডাঃ মুখার্জির দিকে এগিয়ে—আবার গেল পিছিয়ে। দু' চোখ তার বাষ্পাকুল। সাশ্রুনয়নে মুখার্জিদম্পতির পায়ে প্রণাম করে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল: আজ আমি নিশ্চিন্ত! বিদায়।

প্রস্থানোদ্যত যোগেন্দ্রকে জড়িয়ে ধরে ডাঃ মুখার্জি সাগ্রহে বললেন ঃ ভাই, ঐ দুই ব্যক্তিকে তুমি কি করে জানলে বল ?

যোগেন্দ্র নিরুত্তর—নির্বাক। একবার শুধু তাকাল ডাঃ মুখার্জির দিকে—সেই দৃষ্টিতে প্রকটিত হল বহুদিনের হারাণ স্মৃতি—নিরুদ্দিষ্ট আপনজনের সন্ধান !!

হতবাক্ মুখার্জিদম্পতী অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যোগেন্দ্রের গন্তব্য পথের দিকে। হৃদয়ে অনুভব করলেন এক অতি আত্মীয়ের বিরহব্যথা। তাঁদের ভাবাবিষ্ট ভাব কাটল রমুর "মা" সম্বোধনে। রমু জিজ্ঞাসা করল কি দেখছেন তাঁরা রাস্তায় একাগ্রচিত্তে। ডাঃ মুখার্জির ইংগিতে ডাক্তার-গিন্নী যোগেন্দ্রের আগমন ও প্রত্যাগমন কাহিনী চেপে গেলেন। তিনি রমুকে বুকে জড়িয়ে ধরে জানালেন তারা প্রতীক্ষা করছিলেন তারই আগমনের। রমুকে কাছে বসিয়ে ডাঃ মুখার্জি রমুকে সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন ঃ আচ্ছা রমু, তোমার বাবার বাবা—পিতামহের নাম জান ?

তোমাদের গাঁয়ের নাম বলতে পার ?

রমু বিস্মিত নেত্রে একবার ডাঃ মুখার্জির গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ আমার পিতামহর নাম তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রামের নাম জঙ্গলবাধন—জেলা যশহর। ডাক্তার মুখার্জি তড়িৎপৃষ্ঠের ন্যায় আসন ছেড়ে উঠলেন—রমুকে স্নেহভরে বুকে চেপে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন ঃ তোমার এই পরিচয় এতদিন বলনি কেন, বাবা ? কিশোর রমেন্দ্র বিস্মিত স্বরে উত্তর করল ঃ বা, রে ! আপনি কি আমাকে কখন জিজ্ঞাসা করেছেন আমার বংশ পরিচয় ? রমুকে হলঘরের দু'খানি অয়েল পেন্টিং ছবি দেখিয়ে ডাঃ মুখার্জি জানতে চাইল ওদের সে চিনে কিনা, রমু জানালে অমনি ছবি ছিল তাদের বৈঠকখানা-হলঘরে—একজন পিতামহ, অপরজন তাঁর দাদা। তার বাবা বলেছেন তাঁদের পরিচয় কিন্তু সে চোখে দেখি নি তাঁদের। সংশয়মুক্ত ডাঃ মুখার্জি উল্লাসে আত্মহারা হয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন ঃ শৈল, কি আনন্দ ! আমারই বংশের দুলালকে পেয়েছি আমাদের নয়নের মণিরূপে। তুমি তো জান আমার বিয়ের সময় যোগেন এসেছিল ও বরযাত্র গিয়েছিল তোমাদের বাড়ী। তোমার ছোট ভাই অলোক বিদ্রূপ করে তাকে বলেছিল "বাংগাল"—তাতে ভায়া আমার ক্রোধে-অভিমানে অভুক্ত অবস্থায় ফিরে গেল সোজা দেশে। সেই অভিমানে সে আর আসে নি আমাদের গৃহে। সে যে ভয়ানক জেদী ও আত্মমর্য্যাদাভিমানী। আজ আমার হৃদয়ে উদিত হচ্ছে ছায়াচিত্রের ন্যায় অতীতের কাহিনী ! এই আত্মমর্য্যাদাভিমানে সে খোঁজ করে আসেনি আমাদের আশ্রয়ে। স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল রাজপথে। আহা ! কি অদৃষ্টের পরিহাস ! জমীদার যোগেন মুখোযোর স্ত্রী মরল রাজপথে—দাহ করল ডোম-মুদ্দিফরাসে। জানো শৈল, আমি যোগেনের হাতে পুরে দিয়েছিলাম একশত টাকার পাঁচখানি নোট কিন্তু সে আমায় হেসে বলল কি জানো ? আমার একটা পেট, তাতে বেটাছেলে, খুব চলে যাবে। রমুকে মানুষ করুন—আপনার বংশ মর্য্যাদা রাখুন উজ্জ্বল। আমি জানি, আর আসবে না আমার অভিমানী ভাই।

ডাঃ মুখার্জির দু'চোখে ছুটল অশ্রুধারা।

পনর বছর পর। ডাঃ রবীন্দ্র মুখার্জি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন—অধিকাংশ সময় কাটান ধর্মচর্চায়। রমু প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে, আই, এ, এস পাশ করেছে। তার কার্যে প্রীত হয়ে ভারত সরকার নিয়োগ করেছেন তাকে এক উচ্চ পদে। প্রত্যেক মন্ত্রী স্নেহ করেন রমেন মুখার্জিকে।

ডাঃ মুখার্জি ও রমেন বহু চেষ্টা করেছে যোগেনকে খুঁজে বের করতে কিন্তু তাদের চেষ্টা বিফল হয়েছে।

ডাঃ মুখার্জি সস্ত্রীক তীর্থ ভ্রমণে বেরুলেন উত্তর ভারতে। প্রকৃতির রম্যক্ষেত্র ও তপঃক্ষেত্র লছমনঝোলা, হৃষিকেশ, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র, শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরা, রাধারাণীর লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন পরিক্রম করে ডাঃ মুখার্জি গেলেন যদুপতির রাজধানী দ্বারকায়। সুদীর্ঘ তীর্থ ভ্রমণে ডাঃ হলেন অসুস্থ—স্ত্রী শৈল দেবী প্রমাদ গণলেন। এই দূর দেশে বন্ধুবান্ধবহীন অ-বাঙ্গালী দেশে শৈলবালা দেবীর অসহায় অবস্থার সংবাদ পেয়ে এসে উপস্থিত হলো এক জটাজুটধারী গৈরিকবসন পরিহিত সাধু। তিনি অভয় দিলেন শৈলদেবীকে। পাণ্ডা আশ্বাস দিয়ে জানালো সাধু বাবা বহুদিন আছেন এখানে—তিনি জয় করেছেন দ্বারকাবাসীর অন্তর তাঁর সেবা কার্যে। সেখানকার লোকেরা তাঁর নাম রেখেছেন সেবানন্দ স্বামী। তিনি

কোন দেশের লোক জানে না কেহ, কিন্তু বাংগালী তীর্থ-যাত্রীদের প্রতি আছে তার অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা।

সেবানন্দ দিবারাত্রি বসে আছেন রোগীর শিয়রে। শৈল দেবী স্বামিজীর অদ্ভুত সেবাযত্ন ও পরিচর্যা দেখে হয়েছেন বিস্মিত। কিন্তু স্বামীর অজ্ঞান অবস্থা ও প্রলাপ বাক্যে শঙ্কিত হলেন। অজ্ঞান অবস্থায় ডাঃ ডাকেন "রামু" ও "যোগেন" বলে। স্বামীজি অভয় বাক্যে শান্ত করে শৈল দেবীকে উপদেশ দেয় প্রার্থনা করতে স্বামীর রোগ মুক্তির জন্য ভগবৎ চরণে। বলেন, তিনিই মংগলদাতা—ভয়ত্রাতা।

পরদিন। ডাঃ মুখার্জির জ্ঞান ফিরে এল গোধূলি সময়ে। তখন পশ্চিম আকাশে রক্ত আভা নিয়ে সূর্যদেব একটু একটু করে আত্মগোপন করছিলেন নীলাম্বু সমুদ্র ক্রোড়ে। স্বামীজি বিহ্বলভাবে দেখছিলেন সেই অপূর্ব দৃশ্য—আর মুখে উচ্চারণ করছিলেন একটি ভগবৎ স্তোত্র সুললিত কণ্ঠে। সেই অপূর্ব স্তোত্রের মূর্চ্ছনা বিহ্বল করল শৈল দেবীর পার্থিব চিন্তাধারা—ডাঃ মুখার্জির লুপ্ত স্মৃতিতে সঞ্জীবিত করল এক অপূর্ব প্রেরণা—স্বামীজির সেই কণ্ঠস্বর মনে হল যেন কত চেনা। তিনি দুই চক্ষু মুদ্রিত করলেন কিছুক্ষণ, স্মরণে আনতে চেষ্টা করলেন সেই চেনা লোককে। হঠাৎ আনন্দে উজ্জল হলো তার দুই চোখ—তিনি যেন পেয়েছেন সন্ধান। তার দুই গণ্ডে গড়িয়ে পড়ল আনন্দাশ্রু। আনন্দের আতিশয্যে উঠে বসলেন ডাঃ মুখার্জি, তারপর একবার স্বামীজির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে ডাকলেন—ভাই যোগীন—

সেই স্নেহসম্ভাষণে কাটল স্বামীজির বিহ্বল ভাব—শৈল দেবীর বিস্মৃতি। স্বামীজি আর্দ্রকণ্ঠে ডাকল—দাদা—দাদা! শৈল দেবী আশ্চর্য দৃষ্টিতে উপভোগ করছিল দুই ভ্রাতার মিলন দৃশ্য।

সেইক্ষণে দ্বারে দেখা দিল রমেন্দ্র, হাতে একটি ছোট 'এটাচি'। শৈল দেবী আনন্দে আত্মহারা হয়ে এগিয়ে গিয়ে সস্নেহে বুকে ধরলেন রমেন্দ্রকে। তিনি প্রসন্ন চিত্তে জানালেন এই স্বামীজির অক্লান্ত সেবা ও যত্নে তার স্বামী ফিরেছেন মৃত্যুদ্বার হতে, আর দ্বারকাপতির কৃপায় সন্ধান মিলেছে তার পিতার। রমেন্দ্র ব্যগ্র কণ্ঠে বলল—মা, মা, বল কোথায় আমার বাবা—আ! আজ কি শুভ দিন! জ্যেঠামণি হয়েছেন রোগমুক্ত, সন্ধান মিলেছে আমার নিরুদ্দিষ্ট পিতার!

শৈল দেবী স্বামিজীর নিকট রমেন্দ্রকে নিয়ে বললেন: ইনিই তোমার জনক।

রমেন্দ্র ছুটে গিয়ে অশ্রুসিক্ত করল পিতার চরণযুগল।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
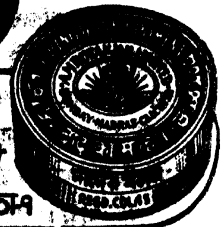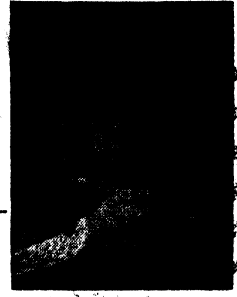
ফুটবল লীগ ঃ

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের প্রথম বিভাগে গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব এ বছরও (১৯৫৫ সাল) লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। এ নিয়ে মোহনবাগান ৬ বার লীগ বিজয়ী হ'ল। ইতিপূর্ব্বে তারা লীগ পেয়েছে ১৯৩৯, ১৯৪৩-৪৪, ১৯৫১ এবং ১৯৫৪ সালে। এ বছর ফুটবল লীগ ছাড়াও মোহনবাগান ক্লাব ক্রিকেট খেলায় মেহেরা কাপ (ক্রিকেট এসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল পরিচালিত) এবং প্রথম বিভাগে হকি লীগ বিজয়ী হয়েছে। এ বছর মোহনবাগান উপর্য্পরি তিন বছর মেহেরা কাপ পাওয়ার রেকর্ড করেছে। একই বছরে তিনটি জনপ্রিয় খেলা—ক্রিকেট, হকি এবং ফুটবলে এ রকম গুরুত্বপূর্ণ খেতাব লাভ করা মোহনবাগান ক্লাব ভিন্ন অন্য কোন স্থানীয় দলের পক্ষে এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয়নি। এদিক থেকে নিঃসন্দেহে মোহনবাগানকে চৌকস দল বলা যায়।

আলোচ্য ফুটবল লীগের খেলায় মোহনবাগানকে দুর্দ্ধর্ষ দল বলা চলে না। অপ্রত্যাশিতভাবে তারা যেমন কয়েকটি খেলায় পয়েণ্ট নষ্ট করেছে তেমনি তাদের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলিও অনুরূপভাবে পয়েণ্ট হারিয়েছে; যার ফলে মোহনবাগান ক্লাব তার অগ্রগতি বহাল রেখে শেষ পর্য্যন্ত লীগ বিজয়ী হয়েছে।

প্রথম বিভাগে নবাগত অরোরা দল সর্ব্বনিম্ন স্থান পেয়ে দ্বিতীয় বিভাগে নেমেছে এবং তাদের শূন্য স্থানে খেলবার অধিকার পেয়েছে এ বছরের দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হাওড়া জেলার বালী প্রতিভা দল। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগে বালী প্রতিভা দলই সর্ব্বপ্রথম মফঃস্বল দল। এ বছর প্রথম বিভাগের খেলায় ব্যক্তিগত-ভাবে যাঁরা বেশী গোল করেছেন তাঁদের নাম এবং গোল সংখ্যা—আবিদ (মহমেডান স্পোর্টিং) ১২টি; এস রায় (ইস্টবেঙ্গল) এবং কে সিংহ (পুলিশ) ১১টি; এস দত্ত (মোহনবাগান) এবং কানাইয়ান (রাজস্থান) ১০টি। হ্যাট-ট্রিক করেছেন চারজন—এস ঘোষ (ওয়াড়ী), ভারালু (বি-এন-আর), আবিদ (মহমেডান স্পোর্টিং) এবং আর দাস (এরিয়ান্স)।

লীগ তালিকায় উপরের পাঁচটি দল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	২৬	১৫	৮	৩	৩৯	১২	৩৮
এরিয়ান্স	২৬	১৩	৯	৪	২৮	১১	৩৫
ইস্টবেঙ্গল	২৬	১৫	৫	৬	২৮	১৬	৩৫
রাজস্থান	২৬	১৪	৬	৬	৩৬	১৪	৩৪
মহঃ স্পোর্টিং	২৬	১২	১০	৪	৩০	১২	৩৪

ইংলণ্ড-দঃ আফ্রিকা টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

দঃ আফ্রিকা ঃ ১৭১ (ম্যাক্‌লীন ৪১, এনডিন ৪১। লোডার ৫২ রানে ৪ এবং ষ্টেথাম ৩৫ রানে ৩ উইঃ) ও ৫০০ (এনডিন নট আউট ১১৬, ম্যাক্‌গ্লু ১১৩, গডার্ড ৭৪, কিথ ৭৩। ওয়ার্ডলে ১০০ রানে ৪ এবং বেলী ৯৭ রানে ৩ উইঃ)

ইংলণ্ড ঃ ১৯১ (মে ৪৭, কম্পটন ৬১। টেফিল্ড ৭০ রানে ৪ উইঃ) (হেইনী ৭০ রানে ৪ উইঃ) ও **২৫৬** (মে ৯৭, ইনসোল ৪৭। টেফিল্ড ৯৪ রানে ২ এবং গডার্ড ৬৯ রানে ৫ উইঃ)

লিডসে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকাদলের ৪র্থ টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা ২২৪ রানে ইংলণ্ডকে পরাজিত ক'রে বর্ত্তমান টেষ্ট পর্য্যায়ের খেলা সমান সমান (২-২) করেছে। ইংলণ্ড দল যথাক্রমে ১ম ও ২য় টেষ্ট খেলায় জয়ী হয়। দঃ আফ্রিকা জয়লাভ করে ৩য় ও ৪র্থ খেলা। ওভালের ৫ম বা শেষ টেষ্ট খেলার ফলাফলের ওপরই বর্ত্তমান টেষ্ট পর্য্যায়ের 'রাবার' খেতাব পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা দল অভাবনীয়ভাবে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ১ম ইনিংসের খেলায় দঃ আফ্রিকার ৫টা উইকেট পড়ে মাত্র ৩৮ রানে এবং ইনিংস শেষ হয় ১৭১ রানে। কিন্তু ২য় ইনিংসে দঃ আফ্রিকা ইংলণ্ডের বোলারদের আক্রমণ ভোঁতা ক'রে ৫০০ রান তুলে দেয়। আবার খেলার শেষ দিনে ইংলণ্ডের ২য় ইনিংসে মারাত্মক বল দিয়ে খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই ইংলণ্ডের ২য় ইনিংসের খেলা ২৫৬ রানে শেষ ক'রে দেয়—যার ফলে দঃ আফ্রিকা জয়ী হয়। গত অষ্ট্রেলিয়া সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা টেষ্ট পর্য্যায়ে অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সমান সংখ্যক টেষ্ট খেলায় জয়ী হয়ে টেষ্ট সিরিজ অমীমাংসিত রাখে। ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে দক্ষিণ আফ্রিকা শক্তিশালী ক্রিকেট দল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

নিউজিল্যাণ্ডে দিল্লী হকিদল ঃ

নিউজিল্যাণ্ড সফররত দিল্লী ওয়াণ্ডারার্স হকিদল তিনটি বে-সরকারী টেষ্ট খেলার মধ্যে ইতিমধ্যে দুটি ম্যাচ খেলেছে। ১ম টেষ্টে দিল্লী দল ৩-২ খেলায় জয়ী হয় এবং ২য় টেষ্টে নিউজিল্যাণ্ড দল ৪-২ খেলায় দিল্লী দলকে পরাজিত করে। নিউজিল্যাণ্ড সফরে দিল্লী দলের এই প্রথম পরাজয়। অবিশ্যি সফর তালিকায় ৩য় টেষ্ট সমেত কয়েকটি খেলা এখনও বাকি আছে। দিল্লী ওয়াণ্ডারার্স দলের শক্তিবৃদ্ধি করেছেন বিশ্ব-অলিম্পিক জয়ী ভারতীয় হকিদলের এই পাঁচজন খেলোয়াড়—কে ডি সিং (১৯৫২ সালের অধিনায়ক), জেণ্টল, ক্লডিয়াস বলবীর সিং এবং রঘুবীরলাল।

ডেভিস কাপ ঃ

ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনাল খেলায় নর্থ আমেরিকান জোনের ফাইনাল বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়া ইষ্টার্ণ জোনের ফাইনাল বিজয়ী জাপানকে পরাজিত করেছে। এখন ইণ্টার-জোনফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ার খেলা পড়েছে ইউরোপীয় জোনের ফাইনালে বিজয়ী ইটালীর সঙ্গে। এ খেলায় যে দেশ জয়ী হবে তারা চ্যালেঞ্জ-রাউণ্ডে গত বছরের ডেভিস কাপ জয়ী আমেরিকার সঙ্গে খেলবে।

রাশিয়া সফরে ভারতীয় ফুটবল দল ঃ

রাশিয়া সফরের উদ্দেশ্যে ভারতীয় ফুটবল দলে ২২জন খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হয়েছেন। বাংলা থেকে ভারতীয় দলে স্থান পেয়েছেন এই ৯জন খেলোয়াড়—শৈলেন মান্না এবং রতন সেন (মোহনবাগান); সুধীর রায় এবং আমেদ খান (ইস্টবেঙ্গল); সনৎ শেঠ (এরিয়ান্স); চন্দন সিং, সালাম এবং কানাইয়ান (রাজস্থান) এবং সুশান্ত ঘোষ (উয়াড়ী)।

দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হয়েছেন শৈলেন মান্না এবং সহ-অধিনায়ক পদ লাভ করেছেন আমেদ খান। ২২ জন খেলোয়াড় ছাড়া দলে ৭জন কর্ম্মকর্ত্তা যাবেন। এই ২৯ জন বাদে দলে একজন মহিলাও যাবেন যিনি, সংবাদে প্রকাশ, বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত। পরের খরচায় বিদেশ ভ্রমণ ছাড়া ২২ জন খেলোয়াড়পুষ্ট একটি দলের সঙ্গে এতগুলি কর্ম্মকর্ত্তা যাওয়ার কোন সার্থকতা নেই। খেলা-ধূলার সফরের ইতিহাসে ইহা বোধকরি বিশ্ব-রেকর্ড।

দলে এতগুলি কর্ম্মকর্ত্তার স্থান হ'ল অথচ বাংলার তথা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সেণ্টার-হাফ সুভাষ সর্ব্বাধিকারীর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও স্থান হ'ল না। গত কলম্বো কাপ প্রতিযোগিতায় এবং ১৯৫৫ সালের লীগের খেলায় তিনি যে ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা ভারতীয় দলে তাঁর স্থান লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয় কি ?

ভাবছি, একটি ফুটবল দল পাঠানোর নিমন্ত্রণেই যেখানে বিদেশে যাওয়ার লোভে এতগুলি কর্ম্মকর্ত্তা পা বাড়িয়েছেন তখন কর্ম্মকর্ত্তাদের নিমন্ত্রণ এলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে !

আমাদের দেশে তো একটা বহুকালের প্রথাই আছে, একজন নিমন্ত্রিত হয়ে সপরিবারে ভোজ-বাড়িতে খেয়ে আসা।

ভারতীয় ফুটবল নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কর্ম্মকর্ত্তাদের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। রাশিয়ার ফুটবল খেলার মান ভারতীয় ফুটবল খেলার থেকে বহুগুণ উন্নত—

আকাশ পাতাল ফারাক। আন্তর্জাতিক মহলে রাশিয়ান ফুটবল খেলার অভিনব নয়নাভিরাম পদ্ধতি এবং প্রাধান্য বিপুলভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অতি অল্পকালের মধ্যে কঠোর সাধনায় রাশিয়া যে এই বিরাট সাফল্য লাভ করেছে তার মূলে রয়েছে রাশিয়ার ফুটবল নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কর্ম্ম-কর্ত্তাদের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী এবং একনিষ্ঠা। রাশিয়া ফুটবল খেলায় নিজেকে প্রস্তুত ক'রে তবেই ভিন্ন দেশের সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় অথবা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বন্ধনের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় ফুটবল খেলার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ অবস্থা।

যে কোন খেলাধূলায় উৎকর্ষ লাভের পক্ষে এই দু'টি ব্যবস্থা খেলাধূলায় কীর্ত্তিমান দেশগুলি একান্ত প্রয়োজন মনে করে—(১) বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অনুশীলন দ্বারা প্রস্তুতি এবং (২) বিভিন্ন দেশের সঙ্গে খেলাধূলায় অবতীর্ণ হয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। আমাদের দেশে প্রথমটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। ২য়টির উপর আগ্রহ বেশী এই কারণে যে, আমাদের দেশের ক্রীড়া-নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কর্ম্মকর্ত্তারা মাতব্বরী এবং বিলাস-ভ্রমণের সুযোগ পান। এই দুটির সম্পর্ক এত অঙ্গাঙ্গি যে, যে কোন একটিকে বাদ দিয়ে অভীষ্ট লাভ করা যায় না। আমাদের দেশে যে ভাবে খেলাধূলার উন্নতির চেষ্টা হয়, তা প্রায়ই ঘোড়ার সামনে গাড়ি জুড়ে দূরন্ত পথ অতিক্রমের চেষ্টার সমান।

আমাদের দেশের ক্রীড়া-নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তাদের মধ্যে এতটুকু যদি আত্মমর্য্যাদা এবং জাতীয়তাবোধ থাকতো তাহলে জাতির ভবিষ্যত বংশধরদের কথা চিন্তা ক'রে কখনই ভারতীয় ফুটবল দলের আসন্ন রাশিয়া সফরে এতগুলি কর্মকর্ত্তা দলভুক্ত করতেন না। বেশী সংখ্যক খেলোয়াড় এবং তরুণ ফুটবল ক্রীড়া-শিক্ষক পাঠিয়ে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন।

ভারত সফরে নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেট দল ঃ

আগামী শীতকালে নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসবে। এই নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় নির্ব্বাচন পর্ব্ব শেষ হয়েছে। দলের অধিনায়ক হয়ে আসবেন এইচ বি কেভ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্রিকেট খেলোয়াড় বার্ট সাটক্লিফ এবং জন রিড দলভুক্ত হয়েছেন।

পরলোকে এস জি সিন্ধে ঃ

ভারতীয় টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় এস জি সিন্ধে (লেগ্ ব্রেক এবং গুগলী বোলার) বোম্বাইয়ে পরলোকগমন করেছেন।

হেনলী রেগেটা ঃ

ইংলণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত হেনলী রেগেটা প্রতিযোগিতার সাতটি অনুষ্ঠানের মধ্যে বৈদেশিক দাঁড়িরা ছ'টি অনুষ্ঠানে জয়ী হয়েছে। এই তিনটি অনুষ্ঠানে—ষ্টিওয়ার্ডকাপ, ডবল স্কাল্স এবং সিলভার গোবলেটস, রাশিয়া প্রথম স্থান পেয়ে গতবারের মত এবারও অধিকসংখ্যক খেতাব অর্জ্জনের গৌরব লাভ করেছে। মোট ৭টি অনুষ্ঠানের মধ্যে রাশিয়ার জয় ৩টি, আমেরিকার ২টি, ইংলণ্ড ১টি এবং পোলাণ্ড ১টি।

মুষ্টি যুদ্ধে বিশ্ব খেতাব ঃ

ওয়েল্টার ওয়েট বিভাগে কারমেন বাসিলিও (আমেরিকা) বার রাউণ্ড টেক্‌নিকাল নক্ আউটে চ্যাম্পিয়ান টনি ডেমাকোকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

ডেভিস কাপে ভারতবর্ষ ঃ

ডেভিস কাপের ইউরোপীয় জোনের কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতবর্ষ ২-৩ খেলায় বৃটেনের কাছে পরাজিত হয়েছে। প্রথমদিনের খেলায় রামনাথন কৃষ্ণাণ ষ্ট্রেট সেটে বৃটেনের ১নং খেলোয়াড় টনি মোট্রামকে পরাজিত করেন; কিন্তু রোগার বেকারের কাছে নরেশকুমার পরাজিত হওয়ায় প্রথমদিন খেলার ফলাফল ১-১ দাঁড়ায়। দ্বিতীয় দিনের ডবলস খেলায় নরেশকুমার এবং কৃষ্ণাণ জয়ী হলে ২-১ খেলায় ভারতবর্ষ অগ্রগামী হয়। ৩য় দিন রোগার বেকার ষ্ট্রেট সেটে কৃষ্ণাণকে হারিয়ে খেলাটা ড্র (২-২) করেন। অপর দিকে নরেশকুমার বনাম টনি মোট্রামের সিঙ্গলস খেলায় নরেশকুমার ৬-২, ৭-৯, ৬-৪, গেমে অগ্রগামী থাকেন। বৃষ্টির দরুণ ঐ দিন খেলাটি বন্ধ থাকে। কিন্তু পরে নরেশকুমার ৬-২, ৭-৯, ৬-৪ ৫-৭, ৩-৬ গেমে পরাজিত হ'লে বৃটেন ৩-২ খেলায় জয়ী হয়।

টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ইংলণ্ড ঃ ৩৩৪ (কেনিয়ন ৮৭, মে ৮৩)

আফ্রিকা ঃ ১৮১ (ম্যাকগ্ল ৬৮ ; ওয়ার্ডলে ২৪ রানে ৪ উইঃ) ও **১৪৮** (ম্যাকগ্ল ৫১ : টাইসন ২৮ রানে ৬ উইঃ)

নটিংহামে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বণাম দঃ আফ্রিকার ১ম টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ১ ইনিংস এবং ৫ রানে জয়ী হয়।

ইংলণ্ড ঃ ১৩৩ (হিয়ানী ৬০ রানে ৫ এবং গডার্ড ৫৯ রানে ৪ উইঃ) ও **৩৫৩** (মে ৬০, কম্পটন ১১২, ব্যারিংটন ৬৯। টেফিল্ড ৮০ রানে ৫ উইঃ)

দঃ আফ্রিকা ঃ ৩০৪ (ম্যাকলীন ১৪২, কিথ ৫৭ ; ওয়ার্ডলে ৬৫ রানে ৪ উইঃ) ও **১১১** (ষ্টেথাম ৩৯ রানে ৭ উইঃ)

লর্ডসের ২য় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ৭১ রানে জয়ী হয়।

ইংলণ্ডের ফাস্ট বোলার ষ্টেথামের মারাত্মক বোলিংয়ের জন্যেই দঃ আফ্রিকা জয়লাভের সহজ সুযোগ হারিয়ে পরাজয় বরণ করে।

খেলার ২য় দিনে ইংলণ্ড ১৭১ রানে দঃ আফ্রিকার থেকে পেছনে থেকে ২য় ইনিংস আরম্ভ করে এবং ১ উইকেট হারিয়ে ১০৮ রান করে। ৩য় দিনে দঃ আফ্রিকা জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৮৩ রান তুলতে ২য় ইনিংসের খেলা সুরু করে। ঐদিন তাদের ২টো উইকেট পড়ে ১৭ রান দাঁড়ায় অর্থাৎ জয়লাভের জন্যে তখন তাদের ১৬৬ রান দরকার—হাতে ৮টা উইকেট এবং সময়ও যথেষ্ট।

কিন্তু খেলার ৪র্থ দিনে দঃ আফ্রিকার বাকি ৮টা উইকেটে রান ওঠে ১০৪ রান ; ফলে ইংলণ্ড ৭১ রানে জয়ী হয়।

ইংলণ্ড ঃ ২৮৪ (কম্পটন ১৫৮) ও **৩৮১** (মে ১১৭, কম্পটন ৭১, কাউড্রে ৫০। হিয়েনী ৮৬ রানে ৫)

দঃ আফ্রিকা ঃ ৫২১ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ম্যাকগ্ল ১০৪, ওয়েট ১১৩, উন্সলো ১০৮, গডার্ড ৬২) ও **১৪৫** (৭ উইকেটে। ম্যাকলীন ৫০।)

ম্যাঞ্চেষ্টারে অনুষ্ঠিত ৩য় টেষ্ট খেলায় দঃ আফ্রিকা ৩ উইকেটে ইংলণ্ডকে নাটকীয়ভাবে পরাজিত করে।

খেলার ৫ম দিনের অর্থাৎ শেষ দিনের চা পানের সময় ৩৮১ রানে ইংলণ্ডের ২য় ইনিংস শেষ হয়। ২ ঘণ্টার কিছু বেশী সময় হাতে নিয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৪৫ রান তুলতে দঃ আফ্রিকা ২য় ইনিংসের খেলা সুরু করে। এই সময়ের মধ্যে এত রান করা আসুরিক কাজ। কিন্তু ৭ উইকেটের বিনিময়ে দঃ আফ্রিকা সে কাজ সুসম্পন্ন করে।

—

বাগদত্তা (চতুর্থ সংস্করণ)—অনুরূপা দেবী :

'বাগদত্তা' লেখিকার অন্যান্য সুখ্যাত ও সুবৃহৎ সামাজিক উপন্যাসের অন্যতম। এতে একদিকে যেমন সমস্যাবহুল ঘটনার সমাবেশ আছে অন্যদিকে তেমনি আছে বহু বিচিত্র চরিত্রের নরনারীর ভিড়। যদিও এ কাহিনীর যুগ থেকে আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি তবু লেখার গুণে পড়তে ভালো লাগে। উপন্যাসের প্রধান নায়িকা কমলা। কমলার জীবনে আবির্ভূত হয় দুটি নায়ক। প্রথম শচীকান্ত ও পরে মণীশ। মণীশ এবং শচীকান্ত বাল্যবন্ধু। একই গ্রামে উভয়ের বাড়ি। শচীকান্তের পিতা উমাকান্ত সার্বভৌম একজন বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতব্যক্তি। শচীকান্ত কিন্তু বড় ভাই ভক্তিনাথের মতো পিতৃশিক্ষার অনুগামী হয়নি, সে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। আশ্চর্য সুন্দরী কমলাকে দেখে সে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল এবং তাকে পাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত বিবেকের শাসন অমান্য করেও ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সমাজ পরিবার স্বজন বন্ধু সমস্ত কিছুই সে উপেক্ষা ও পরিত্যাগ করেছিল কমলার জন্যে।

মণীশ কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। যদিও সে-ও শচীকান্তের মতো আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত, সমাজ সেবী, উদার চরিত্র, ভগবৎ বিশ্বাসী। সে উমাকান্তের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতো ইংরাজী শিক্ষার শেষে। একদা উমাকান্ত ভট্টাচার্য কাশীবাস করতে যান, সঙ্গে মণীশও সপরিবারে যায়। সেইখানেই এই উভয় পরিবারের সঙ্গে কমলার সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটে। তখন সাংসারিক বিপর্যয়ে কমলাকে নিয়ে কমলার পিতামহী অতি দীন-ভাবে কাশীতে বাস করছিলেন। তারপর ঘটনাবর্তে পরিচয় দৃঢ়তর হল এবং কমলার পিতামহী মৃত্যুকালে কমলাকে মণীশের হাতে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মণীশও কমলাকে গ্রহণ করার বাক্যদান করলে। কিন্তু শেষ রক্ষা হ'ল না।

এই ঘটনার অনেক পূর্বেই কমলার দাদা শচীকান্তকে কমলার পাত্র স্থির করেছিলেন। কিন্তু কমলার দাদার আকস্মিক মৃত্যুতে সে ব্যাপার চাপা পড়ে যায়। অবশ্য শচীকান্তর অন্তরে তা চাপা পড়েনি। শচীকান্ত তাই শেষ পর্যন্ত বন্ধুর 'বাগদত্তা' বধূকে ছলনার সহায়তায় বিবাহ করে পাপ সঞ্চয় করলে এবং সর্বশেষে কমলার জন্যই আত্মবিসর্জন দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল।

লেখিকা দক্ষ শিল্পী। কাহিনী বিন্যাসে তাঁর শক্তি অসামান্য; আলোচ্য গ্রন্থখানিতে যে চরিত্রগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সমস্তগুলিই প্রাণবন্ত এবং নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এর 'সত্য' এবং 'গৌরীর' প্রেম-ভালবাসা মনে দাগ রেখে যায়! কমলার মামা করালীচরণের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমনি মনে রাখবার মতো একটি স্বার্থপর খল চরিত্র। গৌরীর মাসীমা শান্ত-স্বভাব বিন্ধ্যবাসিনীর স্নেহ মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার করে। গিরিজাসুন্দরীকেও আমাদের ভালো লেগেছে।

গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই ভালো। বিশেষ করে পরিচ্ছন্ন সুন্দর প্রচ্ছদ-সজ্জা উল্লেখযোগ্য।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—৫৲ টাকা]

বি. না. চ.

দেশে দেশে চলি উড়ে—শ্রীদিলীপকুমার রায় :

বাংলার বরপুত্র দিলীপকুমার। কবিত্বে-গানে, সুর-সৃজনে, বক্তৃতায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি ভ্রমণ করেছেন সারাটা পৃথিবী, অনুভব করেছেন ভোগাঙ্ক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহন উত্তাপ, কিন্তু চিত্ত তাঁর বিকল কিংবা বিচলিত হয় নি কিছুতেই। এ একরকমের কঠিন সাধনা। এ বৈরাগ্য সংসর্গের দোষে নষ্ট হয় না। ভারতের সংগীত সাধনার উৎকর্ষ পৃথিবীময় বিশেষ করে অ্যামেরিকায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন সন্ন্যাসী কবি দিলীপকুমার। সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্যা শ্রীমতী ইন্দিরা। নৃত্যে মুগ্ধ করেছিলেন তিনি ঐ দূর দেশের মানুষগুলিকে। তাঁদের দুজনের ভ্রমণ কাহিনী তথা নৃত্য-গীত আর আনন্দ আস্বাদনের হিসাব নিয়ে রচিত হয়েছে 'দেশে দেশে চলি উড়ে'। লেখকের ভাষার উচ্ছলতা, গতিবেগ, বর্ণনার চমৎকারিত্ব প্রত্যেক পাঠককে মুগ্ধ করবে, পাগল করে তুলবে তাঁদের দেশে দেশে উড়ে চলবার জন্যে। এইখানেই লেখকের বাহাদুরি।

কিন্তু কয়টি কথা যা বিরূপ সমালোচকদের মুখে শোনা যাচ্ছে তার উল্লেখ না করে পারা গেল না। গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁদের প্রশ্ন হ'ল—

(১) ইন্দিরা দেবীকে মীরার আত্মা ভর করে একথা প্রতিপন্ন করার অর্থ কি? লেখক কি মনে করেন, এসবে এখনো আমাদের দেশের লোক বিশ্বাস করেন?

(২) এত আধ্যাত্মিক ভাব প্রকট করার পক্ষে জাপানী গাইশা গার্ল, অ্যামেরিকান একট্রেসদের সঙ্গে এত মেলামেশা ক্ষতিকর হয় নি কি?

(৩) ক্ষতিকর যে হয়েছে তার প্রমাণ অ্যামেরিকায় মাঝে মাঝে যে ধরণের আমন্ত্রণ পেয়েছেন ইন্দিরা দেবী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোক্ত কথোপকথন উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

দর্শনার্থী—অবাক ! গুরু চান না টেলিভিশান—আমরাও চাই না তাকে। আমাদের লেন-দেন শুধু আপনার সঙ্গে। আপনি আসুন আমাদের ষ্টুডিয়োতে, শাড়ী পরে দাঁড়ান, ছুটো যা পারেন বলুন—

ইন্দিরা—কী বলব ? টেলিভিশানে বলবার আমার কিছুই নেই।

দর্শনার্থী—তাহলে শুধু ঝলমলে শাড়ী পরে এসে দাঁড়ান—হেলে দুলে চলে যান—হাজার হাজার লোক দেখবে আপনার সুন্দর বেশভূষা—ইত্যাদি (২০৯ পৃঃ)।

(৪) লেখক তাঁর ধর্মমত অ্যামেরিকার লোকেদের বোঝাতে পেরেছেন কি ? সেখানকার প্রেস রিপোর্টারদের নিয়োদ্ধৃত রিপোর্টের ধরণ থেকে মনে হয় তাঁর সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নি।

"Roy has been transforming himself at the Ashram for twenty four years, Miss Indira for three." (৯১ পৃঃ)

"নাখি লোকে অনিন্দিতাঃ" (ধর্ম্মপদম্)। অতএব ওসব বাজে কথায় কান দিয়ে লাভ নেই। গুরুশিষ্যা উভয়ে মিলে দেশে দেশে উড়ে পেয়েছেন অনেক কিছু, দিয়েছেনও অনেক। যাঁরা 'দেশে দেশে চলি উড়ে' পড়বেন তাঁরাও পাবেন অনেক কিছু, কিন্তু দিতে হবে না তাদের কিছুই। এই তো পাঠকের পরম লাভ।

[প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ। ৯৩, হ্যারিসন রোড্, কলিকাতা। মূল্য—৬৲ টাকা।

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

যাত্রা হ'ল শুরু—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় :

"যাত্রা হ'ল শুরু" একটি উপন্যাস। স্বাভাবিক স্বতস্ফূর্ত চিন্তাধারা এই গ্রন্থের মুখর চরিত্রগুলিকে এক উজ্জ্বল পটভূমিতে উপস্থিত ক'রে তাদের সজীবতা ও লাবণ্য দিয়েছে। ভালো লাগল এই গ্রন্থের নায়ক সুপ্রিয়কে,—তার চরিত্রের মার্জিত ভাব-বৃত্তকে। নায়িকা প্রমীলা গ্রন্থারম্ভে কিছু প্রগলভা রূপে দেখা দিলেও—ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে সে সপ্রমাণ করেছে তার সুগভীর প্রেম ও ব্যক্তিত্বকে : তার পরিচ্ছন্ন রূপ মায়ারী মৃত্তিকার মতই স্নিগ্ধ, তার অপরূপ চরিত্রের শুভ্রতা মোমের আলোর মত নরম অথচ উজ্জ্বল।

এর পর লক্ষণীয় ভাষাবিন্যাসের সারল্য, যদিও তা সর্বত্রই এক রূপালি পালিশে ঝিকিমিকি খেলেচে। চলচ্চিত্রের রঙে ছোঁয়া দৃশ্যের মত ঘটনাগুলি একের পর এক চোখের সামনে প্রতিভাত হয়। এ বই-এ আছে কান্নাহাসির বিরহমধুর আলোছায়া ;—আছে হিংসা প্রতিশোধের দ্বন্দ্ব ;—আছে অতলস্পর্শী বন্ধুত্বের নির্মলতা ! এতগুলি মানব মনোবৃত্তিকে মিলিয়ে সরু মোটা সুরের এক মিশ্ররাগ বানিয়ে লেখক বইটিকে নিটোল সার্থকতায় পৌঁছে দিয়েছেন। ঘটনাপ্রধান এই উপন্যাস যন্ত্রক্লান্ত মনকে ধৈর্যস্খলনের প্রশ্রয় দেবে না, পাঠকচিত্তকে এর স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতায় খুশি ক'রবে।

[প্রাচী পাবলিশার্স ৮ ডি, দমদম রোড কলকাতা-৩০ থেকে শ্রীরবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম—২॥০ আনা]

সুনীল বসু

গল্পলতা—সুবোধ বসু :

লেখকের মতে এই গল্প সংগ্রহটী তাঁর সতেরটী শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন। কোন মানদণ্ডে শ্রেষ্ঠ গল্পের বিচার করা হয় তা আমার সঠিক জানা নেই, তবে ভালো সুখপাঠ্য সহজবোধ্য ও স্বচ্ছতা গুণসম্পন্ন গল্প যদি রসোত্তীর্ণ বলে ধরা যায় তবে এই গল্পসংগ্রহটী সত্যই সার্থক একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গল্পগুলির পটভূমিকা শুধু বাংলা দেশেই আবদ্ধ নয়। বম্বে, দিল্লী, হাজারীবাগের কয়লার খনি, দামোদরের বাঁধ এবং সেখানকার পাত্রপাত্রীরা গল্পের বিষয়বস্তু এবং শুধু মানুষ নয়, মানুষের আশ্রিত জীবজন্তুরাও গল্পের পাত্রপাত্রীর স্থান অধিকার করেছে। গল্পগুলির ভিতর শুধু বৈচিত্র্য নয় একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক ও শ্লেষের যে আভাস আছে তা সত্যই উপভোগ্য। আরও প্রশংসার কথা—যে শ্লেষ ও ব্যঙ্গের মধ্যে অনেক সময় থাকে জ্বালা কিন্তু এ গল্পগুলির মধ্যে শ্লেষ ও ব্যঙ্গের সঙ্গে মিশ্রিত আছে লেখকের অনাবিল সহানুভূতি এবং এইখানেই সুবোধ বসুর লেখার বিশেষত্ব। লেখকের পরিচয় পাবার পক্ষে গল্পলতার গল্প একান্ত সহায়ক।

[প্রকাশক : গ্রন্থাগার : পি ৫৮ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা-২৯, মূল্য ৪৲ টাকা]

শ্রীভূপতিনাথ চৌধুরী

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "হরিলক্ষ্মী" (৮ম সং)—১॥০

শ্রীঅলককুমার ঘোষ প্রণীত শিশুপাঠ্য "গল্পে উপদেশ"—৸০

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "সাংঘাতিক ইঙ্গিত"—২॥০

সুগুপ্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "উল্কার আলো"—১॥০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীবীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী | পঞ্চবটী বনে রাম-সীতা | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

আশ্বিন—১৩৬২

প্রথম খণ্ড | ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

বেদে পরলোকতত্ত্ব

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যুর পরে জীবের কিরূপ গতি হয় এ বিষয়ে বেদ বলিয়াছেন, যে যাঁহারা ঈশ্বর লাভের জন্য যথেষ্ট সাধনা করেন তাঁহারা ঈশ্বর লাভ করেন, আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ; যাঁহারা ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করেন নাই কিন্তু যজ্ঞ-দান প্রভৃতি পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা মৃত্যুর পরে স্বর্গলাভ করেন, অল্প বা দীর্ঘকাল স্বর্গ ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে মনুষ্য বা পশুপক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করেন ; যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনাও করেন নাই, পুণ্য কর্মও করেন নাই তাহারা কীট পতঙ্গ হইয়া বারম্বার জন্মগ্রহণ করেন ; যাঁহারা বেশী পাপ কর্ম করেন তাঁহারা নরকে গমন করেন, নরক-বাসের পর পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন ।

স্বর্গ ও নরকের কথা খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মেও আছে । কিন্তু তাঁহাদের মতে স্বর্গ ও নরক অনন্ত, যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে সে স্বর্গে যায়, চিরকাল স্বর্গে থাকে, যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে সে নরকে যায় এবং চিরকাল নরকে থাকে । কিন্তু তাঁহাদের এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না । স্বর্গ ও নরক যখন কর্মের ফল, কর্ম যখন অনন্ত নহে (এক ব্যক্তি এক জন্মে যে কর্ম করে তাহার সমষ্টি কখনও অসীম হইতে পারে না) তখন কর্মফলও অনন্ত হইতে পারে না । এজন্য সনাতন ধর্মে যে স্বর্গ ও নরক বাস সীমাযুক্ত বলা হইয়াছে ইহাই যুক্তিযুক্ত । মোক্ষ কর্মের ফল নহে । অজ্ঞান অপসৃত হইলে আত্মার স্বাভাবিক অবিনশ্বরতা উপলব্ধ হয় । ইহাই মোক্ষ । ইহা যখন কর্মফল নহে, তখন ইহাকে অনন্ত বলিতে কোনও আপত্তি হইতে পারে না ।

অতএব বৈদিক পরলোকতত্ত্বের এই গুলি বৈশিষ্ট্য, এই মতে স্বর্গ ও নরক উভয়ই সান্ত ; মোক্ষ স্বর্গ ও নরক হইতে ভিন্ন ; মোক্ষ অনন্ত ; পাপ বা পুণ্যফলে নরক বা স্বর্গ প্রাপ্তি হইলে, পরে পুনর্জন্ম হয়।

বৈদিক পরলোকতত্ত্বের এই সকল বৈশিষ্ট্যই আমরা ঋগ্বেদ সংহিতার একটি শ্লোকে দেখিতে পাই। তাহার অনুবাদ এইরূপ :—

(মৃত ব্যক্তির আত্মাকে বলা হইতেছে) "তোমার চক্ষু সূর্য্যকে প্রাপ্ত হউক, তোমার প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হউক ; তোমার কর্ম অনুসারে তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীতে গমন কর ; তোমার কর্মফল যদি জলের মধ্যে অবস্থিত থাকে তাহা হইলে তুমি সেইখানে গমন কর ; (অথবা) উদ্ভিদের মধ্যে তোমার (সূক্ষ্ম) দেহের অসার গুলি লইয়া অবস্থান কর। (১)

যে ব্যক্তি সাধন ফলে ঈশ্বর লাভ করে এবং সেজন্য পুনর্জন্ম হয় না, তাহার চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চবায়ু বায়ু-দেবতার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, এইরূপ মুক্ত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, "তোমার চক্ষু সূর্য্যকে প্রাপ্ত হউক, তোমার প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হউক।" যে ব্যক্তি ঈশ্বর লাভের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে নাই কিন্তু পুণ্য কর্ম করিয়াছে সে ব্যক্তি মৃত্যুর পরে স্বর্গলাভ করে, স্বর্গভোগের পরে পুনরায়-পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। তাহাকে বলা হইতেছে "তোমার কর্ম অনুসারে তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীতে গমন কর।" যে ব্যক্তি ঈশ্বরের উপাসনা করে নাই, পুণ্যকর্মও করে নাই, সে পৃথিবীতে বা জলের মধ্যে কীট পতঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, অথবা উদ্ভিদ জন্মলাভ করে।

ঋগ্বেদ সংহিতার অন্য শ্লোকেও পুনর্জন্মের উল্লেখ দেখা যায়। নিম্নে একটির অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে।—

(ঋষি বামদেবের গর্ভে অবস্থানকালে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছিল) তিনি বলিয়াছিলেন আমি গর্ভে থাকিতেই এই সকল দেবতাদের জন্ম জানিয়াছিলাম। (দেবতারা পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ইহা জনিয়াছিলাম) শত-লৌহময় পুরী (অর্থাৎ স্থূলদেহ) আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল (বিশুদ্ধ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে দেয় নাই)। এক্ষণে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বেগে দেহ হইতে নির্গত হইলাম (দেহাত্মবোধ ত্যাগ করিলাম)। (২)

মোক্ষলাভের কথা বেদের নিম্নলিখিত শ্লোকে পাওয়া যায়। যথা—তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়। মোক্ষলাভের অন্য উপায় নাই। (৩)

ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিলে মোক্ষলাভ করা যায়। ঈশ্বরের কথা বেদে বহু স্থানে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইল।

"যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্"
(ঋগ্বেদ সংহিতা—১০।১২৯।৭)

এই পৃথিবীর কর্ত্তা পরমেশ্বর যিনি পরম ব্যোমে অবস্থান করেন।

"উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ"
(ঋগ্বেদ সংহিতা—১০।১২১।২)

দেবতাগণ যাঁহার আদেশ পালন করেন।

"মহিত্বা একইদ্ রাজা জগতো বভুব"
(ঋগ্বেদ সংহিতা—১০।১২১।৩)

যিনি তাঁহার মহিমার জন্য জগতের একমাত্র রাজা হইলেন।

"যো দেবেষু অধিদেব এক আসীৎ"
(ঋগ্বেদ সংহিতা—১০।১২১।৮)

যিনি সকল দেবগণের মধ্যে একদেবতা (ঈশ্বর) ছিলেন।

---

(১) সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মনা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তেহিতম্ ওষধীষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ॥
ঋগ্বেদ সংহিতা—১০।১৬।৩

(২) গর্ভে নু সন্ অন্বু এষাম্ অবেদম্ অহং দেবানাং জনিমানিন বিশ্বা
শতং মাপুর আয়সীঃ অরক্ষরণং অধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্
ঋগ্বেদ সংহিতা—৪।২৭।১

(৩) তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।
শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা ৩১।১৮ (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩।১৮তেও এই মন্ত্র আছে)।

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং।"
(ঋগ্বেদ সংহিতা—১০।৯০।১)

সেই পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পাদ (অর্থাৎ সকল মস্তক ঈশ্বরেরই মস্তক, সকল প্রাণীর চক্ষু ঈশ্বরেরই চক্ষু, সকল প্রাণীর পাদ ঈশ্বরেরই পাদ—সায়ণ ভাষ্য) তিনি সমগ্র বিশ্ব আবৃত করিয়া থাকেন, আবার বিশ্বের বাহিরেও অবস্থান করেন।

"পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যং।"
(ঋগ্বেদ সংহিতা—১০।৯০।২)

এই সকল বস্তু সেই ঈশ্বরের অংশ, যাহা কিছু ছিল, যাহা কিছু থাকিবে, সকলই তাঁহার অংশ।

"পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।
(ঋগ্বেদ সংহিতা—১০।৯০।৩)

বিশ্বের সমস্ত প্রাণী তাঁহার একচতুর্থভাগ, অবশিষ্ট তিনভাগ স্বর্গে অমৃতরূপে অবস্থান করে।

"যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা।"
(ঋগ্বেদ সংহিতা—১০।৮২।৩)

যিনি আমাদের পিতা, জনক এবং বিধাতা।

পূর্বোদ্ধৃত বেদবাক্য হইতে বোঝা যাইবে যে—বেদের মন্ত্র বা সংহিতাভাগে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা অনেক স্থানে আছে। মন্ত্রভাগের ঋষিগণ ঈশ্বরের ধারণা করিতে পারেন নাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই মত ভ্রান্ত। বলা বাহুল্য বেদের মন্ত্রভাগে এইরূপ ঈশ্বর-প্রতিপাদক বাক্য আরও অনেক আছে। উপনিষদে যে ব্রহ্মের কথা, ঈশ্বরের কথা বহুস্থলে আছে ইহা সুবিদিত বলিয়া উদ্ধৃত করা হইল না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে উপনিষদ বেদেরই অংশ।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে পরলোকে বিভিন্ন গতি সম্বন্ধে বাক্য বেদের প্রাচীনতর অংশেও (মন্ত্র বা সংহিতাভাগে) পাওয়া যায়। উহা যে পরবর্তী যুগের কল্পনা তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

আত্মা মৃত্যুর পরে যে পথে গমন করিয়া মুক্তিলাভ করে তাহা দেবযান পথ নামে পরিচিত। যে পথে স্বর্গ পর্য্যন্ত গিয়া আবার পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে তাহা পিতৃযান পথ নামে পরিচিত। উপনিষদে পিতৃযান পথের এইরূপ বর্ণনা আছে: যাহারা যজ্ঞ করে, দান করে মৃত্যুর পর তাহাদের আত্মাকে ধূমদেবতা লইয়া যান, ধূম-দেবতার পর রাত্রিদেবতা, তাহার পর কৃষ্ণপক্ষের দেবতা, তাহার পর দক্ষিণায়নের দেবতা (যে ছয় মাস সূর্য্য দক্ষিণাভিমুখে গমন করেন তাহাকে দক্ষিণায়ন বলা হয়) তাহার পর সংবৎসরের দেবতা, এই সকল দেবতা তাঁহাদের নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে তাঁহাদিগকে লইয়া যান। সেখান হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রলোক গমন করেন। ইহাই স্বর্গলোক। সেখানে পুণ্যের পরিমাণ অনুসারে অল্প বা দীর্ঘকাল বাস করেন। পুণ্য শেষ হইলে চন্দ্রলোক হইতে মেঘে নামিয়া আসেন, তাহার পর বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে আসেন, তাহার পর শস্য বা তরুলতার মধ্যে প্রবেশ করেন। যে পুরুষ উহা ভক্ষণ করেন তাহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহার শুক্রের সহিত রমণীর যোনিতে প্রবেশ করেন, তাহার পর জন্মগ্রহণ করেন (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫।১০ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬।২)। এই পরলোকগামী আত্মার সহিত মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ প্রভৃতি দ্বারা গঠিত সূক্ষ্মদেহও থাকে। এজন্য পরলোকে আত্মার সুখদুঃখ ভোগ হয়, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি করিতে পারে। স্থূলদেহ থাকে না বলিয়া চন্দ্রলোক প্রভৃতি অতিশয় শীতল বা অত্যুষ্ণ স্থানে থাকিতে পারে। স্বর্গভোগের পর যে অভুক্ত কর্ম থাকে সেই কর্ম অনুসারে পরবর্তী জন্মে পবিত্র বা অপবিত্র মনুষ্যদেহ অথবা পশুদেহ প্রাপ্ত হয়। (ছাঃ উঃ ৫।১০।৭)। মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যে এই আত্মাকে দীর্ঘকাল থাকিতে হয় না। শস্যের মধ্যে দীর্ঘকাল দেরী হইতে পারে।

দেবযান পথ—যে পথে গিয়া মোক্ষলাভ হয়—তাহার বর্ণনা এইরূপ। প্রথমে অগ্নি, তাহার পর দিবস, তাহার পর শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, বৎসর, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বরুণ, ইন্দ্র, প্রজাপতিও ব্রহ্ম। যেখানে দেবতার উল্লেখ নাই, (যেমন দিবস, শুক্লপক্ষ) সেখানে বুঝিতে হইবে দিবসাভিমানী দেবতা বা শুক্লপক্ষ অভিমানী দেবতা। যেমন মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে

অন্য লোক ধরিয়া লইয়া যায় সেইরূপ মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহযুক্ত আত্মাকে এই সকল দেবতা বহন করিয়া লইয়া যান। চন্দ্র-লোক হইতে বিদ্যুৎ এই আত্মাকে লইয়া যান। এই বিদ্যুৎকে "অমানব পুরুষ" বলা হইয়াছে। বোধহয় তাহার উদ্দেশ্য এই যে অর্চ্চি হইতে চন্দ্রলোক পর্যন্ত যে সকল দেবতা বহন করিয়া লইয়া যান তাঁহারা পূর্বে মানব ছিলেন উৎকৃষ্ট কর্ম করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই বিদ্যুৎ—দেবতা সৃষ্টির প্রথম হইতেই দেবতা ছিলেন—পূর্বকল্পে মানব থাকিতে পারেন। বিদ্যুৎ দেবতা বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক দিয়া সেই আত্মাকে ব্রহ্মের নিকট উপস্থিত করেন। দেবযান পথে এই যে ব্রহ্মের নিকট লইয়া যাইবার কথা আছে ইনি পরব্রহ্ম নহেন, পরব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট চতুর্মুখ পরব্রহ্মা। ইঁহার এক এক দিবসের পরিমাণ ৪৩২ কোটি বৎসর। ইঁহার পরমায়ু ১০০ বৎসর। ইঁহার পরমায়ু শেষ হইলে মহাপ্রলয় হয়। তখন মুক্ত আত্মা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। আচার্য্য শঙ্করের মতে যাঁহারা সগুণব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহাদের এই গতি, কারণ নির্গুণব্রহ্মের উপাসক মৃত্যু হইলেই ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যান। রামানুজ নির্গুণব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে যাহারা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম উপাসনা করিয়া মোক্ষলাভ করেন সকলেই এই পথে যান।

যাঁহারা পাপ করেন তাঁহারা মৃত্যুর পর নরকে যান। অল্প বা বেশী পাপ অনুসারে নরকে অল্প বা দীর্ঘকাল বাস করিতে হয়। এইভাবে পাপ ক্ষয় হইলে পুনর্জন্ম হয়। কঠোপনিষদে আছে "যাহারা মনে করে ইহলোকই সত্য, পরলোক নাই তাহারা বার বার যমের বশীভূত হয়" (কঠ ১।২।৬) এখানে নরকের কথাই বলা হইয়াছে (ব্রহ্ম-সূত্র ৩।১।১৩)। বেদের সংহিতা ভাগে নরকের কথা বেশী পাওয়া যায় না। পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে রৌরব প্রভৃতি সাতটি নরকের উল্লেখ আছে। ইহা বেদেরই অভি-প্রায়। বেদে যেস্থলে এই সকল নরকের উল্লেখ ছিল এক্ষণে সে সকল অংশ পাওয়া যায় না। ঋষিরা সেই সকল বেদ-বাক্য স্মরণ করিয়াই পুরাণে এই সব বর্ণনা দিয়াছেন।

এরূপ হইতে পারে যে কোনও ব্যক্তি কিছু পুণ্য করিয়াছেন এবং কিছু পাপ করিয়াছেন—তিনি মৃত্যুর পর কিছুকাল স্বর্গে ও কিছুকাল নরকে বাস করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন।

যাহারা পাপ পুণ্য কিছু করে নাই, কেবল স্বার্থপর জীবন যাপন করিয়াছেন তাহারা কীট পতঙ্গ হইয়া বার বার জন্মগ্রহণ করে।

জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইতি তৃতীয়ং স্থানং (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬।২।১৬ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫।১০।৮)

"জন্মগ্রহণ কর, মৃত্যুমুখে পতিত হও (বার বার) ইহাই তৃতীয় পথ।" প্রথম পথ দেবযান, দ্বিতীয় পথ পিতৃযান, ইহাই তৃতীয় পথ।

গীতাতেও দেবযান, পিতৃযান পথের উল্লেখ আছে, (গীতা ৮।২৪, ২৫)। সেখানে এই দুইটি পথকে শুক্ল ও কৃষ্ণ গতি বলা হইয়াছে। উপনিষদের ন্যায় গীতাও বলিয়া-ছেন যে ঈশ্বরকে লাভ করিলে পুনর্জন্ম নিবারণ করা যায়, পুনর্জন্ম নিবারণের অন্য উপায় নাই।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥
(গীতা ৮।১৫)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমাকে প্রাপ্ত হইলে দুঃখের আলয় অনিত্য সংসারে আর পুনর্জন্ম হয় না।"

জলের লিখন

শক্তিপদ রাজগুরু

আড্ডা এবং বৃষ্টি দুটোই যদি এক সঙ্গে সুরু হয় তাহলে অনেক সময়ই অনেক কাহিনীই প্রকাশ হয়ে পড়ে—যা কোনদিনই বাইরের আলো দেখতো না। এমনি এক দুর্ঘটনা ঘটেছিল সুবীরের জীবনেও। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে মনের দুর্বলতম কোণটাকে বন্ধু-বান্ধবের কাছে প্রকাশ করতেও অনেকেই চায় না।

সন্ধ্যার পর থেকেই সুরু হয়েছে শাওনের বর্ষণধারা, আকাশটার বুকে মহানগরীর আলোকচ্ছটা কেমন একটা পিঙ্গল ছোপ ধরিয়ে দিয়েছে, দীর্ঘশ্বাসের মত ঝরে পড়ছে বৃষ্টিবিধৌত গাছগুলোর বুক থেকে জলধারা। কয়েক কাপ চায়ের সামনে বসে কয়েকজন আড্ডার সভ্য—সুবীর সেন আধুনিককালের একজন সাহিত্যিক সেও চোখ বুজে কি যেন ভাবছে—ওপাশে শিল্পী রণেন বলে চলেছে—ছেলেদের মধ্যে বন্ধুত্ব জিনিষটা ঠিক তারার আলোর মত, যতই অন্ধকার নামুক, তার জ্যোতি তেমনিই থাকে, আর মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় যেন চাঁদের আলো, কলায় কলায় বেড়ে চলে—পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদের আলোয় আকাশ ভরে যায়, মনে হয় সে ছাড়া জগৎ বৃথাই হয়ে যাবে। কিন্তু আবার কলায় কলায় ক্ষয় হয়ে কোনদিকে মিলিয়ে যায়। মেয়েদের পুরুষের ভালোবাসা আর মেয়েদের নিজের মধ্যে বন্ধুত্বও তেমনি, ওতো চোরাবালির উপর বাসা বাঁধা—এক ঢেউয়ে ব্যস।

নীতিন দমবার পাত্র নয়, সেও শাণিত যুক্তি খাড়া করে—ওটা পুরুষদের স্বার্থের কথা।

তর্ক পুরোদমে চলেছে—এক কোণে বসে সুবীর জানলার বাইরে বৃষ্টির ধারাপাতের দিকে চেয়েছিল, মাধবীলতা এনেছে সাদা ফুলের স্তবক···ভিজে বাতাস তারই গন্ধে মাতাল হয়ে উঠেছে। তার মনে অতীতের কি যেন এক স্বপ্নজাল বোনা চলেছে। তার কথায় সকলেই ফিরে চাইলো—মেয়েদের নিজের মধ্যে বন্ধুত্বের দাম তারা কতখানি দেয়।

তা পরখ করবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল, কিন্তু সে এক বেদনাদায়ক স্মৃতি—

কেমন যেন মাঝপথেই থেমে গেল সুবীর। রণেন বলে ওঠে—এ যে আদি-রসাশ্রিত কাহিনী বন্ধু···বলে ফেলো—

কি যেন ভাবছে সুবীর। বন্ধুরা তর্ক ফেলে ইতিমধ্যেই গোল হয়ে বসে ওর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। বাইরে বৃষ্টির অঝোর বর্ষণ তখনও থামেনি···

এক বৃন্তে যেন দুটি ফুল, দুই সখী। পাশাপাশি বাড়ী—রাস্তার এপার আর ওপারে একখানা বাড়ীর পরই হলদে রংএর একতলা বাড়ীটা। সকাল থেকে এ আসে ওর বাড়ী, না হয় মাধবী যায় শেফালির বাড়ী, সুরু হয় গল্প। এ যেন গল্পের গুদোম—এ গল্পের শেষ নাই।

হাসির ধমকে এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ছে, শাড়ীর আচল গেছে গা থেকে খসে—এ ওকে অকারণে জড়িয়ে ধরে। পিসীমা হাঁক পাড়েন—ওরে শেফু ও মাধু তোদের হাসির দাপটে ছেলেগুলোর পড়াশোনা কি বন্ধ হবে—আর বলি তোদেরও কি পড়াশোনা নাই-লা?

ঘর থেকে—বারান্দায়, বারান্দা থেকে দরজায়, দরজা থেকে রাস্তায়, রাস্তা থেকে দুজনে আসে মাধুদের বাড়ীতে। সেখানে আবার এক পক্কোড় আড্ডা, হুল্লোড়।

যাবার আসবার পথে দৃশ্যটা প্রায়ই চোখে পড়ে। কানে আসে সুবীরের কথাগুলো।

—নতুন এসেছে এ পাড়ায় নারে, গল্প কবিতা-টবিতা লেখে—কাগজেও ছাপা হয়—

মাধবীর কথায় শেফালি হেসে ওঠে—মরণ. কবি মানুষের ছিরি দেখনা। কেমন কাঠখোট্টা মার্কা চেহারা,

 শ্রী ৭৮৩ পরিচয় দিতে ..

তেড়ঙ্গা বেড়েঙ্গা চলন, হাতে আবার একটা ছাতা। মুখ-খানা ঠিক ফজলি আমের মত।

হাসিতে ফেটে পড়ে। মাধবীই সাবধান করে দেয়—ওই রে—বোধহয় শুনতে পেয়েছে, কেমন করে চাইছে দেখ না।

শেফালির রূপের গুমোর আছে। রংটা বেশই ফর্সা, টিকলো নাক; একরাশ কোঁকড়ানো চুল···চোখ দুটোও বেশ শান্ত, মাধবীর রংটা তার তুলনায় অনেক চাপা—তবে পোষাক-আশাক চাল-চলনে সেও স্মার্ট কম নয়, শেফালিই বলে ওঠে মরণ, হাঁ করে হ্যাংলার মত চেয়ে রয়েছে দেখোনা, কি মনে করে জানিস দুটো বই লিখেছে কিনা, তাই পাড়ার মেয়েরা দুমদাম করে ওর প্রেমে পড়বে। অমন লেখক আঁস্তাকুড়ে গড়াগড়ি যায় বুঝলি।

মাধবী চাপা সুরে ধমক দেয়—"আঃ কি যা তা বলছিস।"

—"ইস্—খুবই যে দরদ মেয়ের। ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস নাকি রে?"

সেদিন পাড়ার হাউসেই নতুন ছবি রিলিজ করেছে। কাহিনীকার সুবীরই, রক্ষা যা পাড়াটা নতুন—এখনও স্থানীয় অতি-উৎসাহী ছেলের দল তাকে চেনেনি, সুতরাং প্রথম শোতেই নিরুপদ্রবে চলেছে ছবি দেখতে, সহরতলীর ছায়া ঢাকা রাস্তাটা—হঠাৎ শেলি সচকিত হয়ে ওঠে—পিছু নিয়েছে দেখনা কেমন হ্যাংলার মত।"

মাধবী অবাক হয়ে যায়—"কে রে?"

—"সেই" কবেট—সুবীর না কে? পিছু ফিরে চাসনা, আস্কারা পেয়ে যাবে। বা কাত করে চোখ ফিরিয়ে চা, যেন দূরে কাউকে দেখছিস—ওকে পাত্তাই দিস না। আহা পরেছেন আবার খদ্দরের পাঞ্জাবি গেরুয়া রংএর, কি বাহারই না খুলেছে।

সুবীর একমনে চলেছে সিনেমার দিকে।

প্রথম শো—হাউসটাকে সাজান-গোজান হয়েছে ফুল-পাতা দিয়ে। সানাইও বসিয়েছে, কেমন যেন বুকটা আনন্দে ভরে ওঠে। অপরিচিতের মতই ভিড়ে মিশে গিয়ে লবিতে একটু ফাঁকা জায়গা দেখে দাঁড়ালো। নিজের নামটার দিকে অজ্ঞাতেই বারে বারে চোখ যায়।

'হাউস ফুল', একটি টিকিটও আর নাই। দুই সখীতে হতাশ হয়ে কাউণ্টার থেকে সরে এসে বিরস বদনে ছবি-গুলো দেখতে থাকে। মাধবী কাহিনীকারের জায়গায় সুবীরের নামটা দেখে একটু বিস্মিতই হয়ে যায়।

হঠাৎ স্বয়ং তাকেই এগিয়ে আসতে দেখে শেফালিই কঠিন চাহনি মেলে তার দিকে চাইলো।

—"টিকিট তো পাননি। আমার দেখা ছবি, চারখানা কমপ্লিমেনটারি পাশ রয়েছে—আপনারা দুজনেই যান।"

মাধবী ভীরু কৃতজ্ঞ চাহনিতে চেয়ে থাকে তার দিকে। নবীনকুমার, বিচিত্রা সেন অভিনয় করছে ছবিতে—তার সবচেয়ে প্রিয় নায়ক নায়িকা, না দেখে ফিরে যেতে হতো—তার চেয়ে মন্দ কি। তাছাড়া উনি তো সঙ্গে যাচ্ছেন না।

ফোঁস করে ওঠে শেফালি—"বেশ তো লোক আপনি, কথাটা বলতে মুখে বাধলো না? আমরা ও ক্লাসের নই, যান্—এখান থেকে। হ্যাংলামির সীমা ছাড়িয়ে গেছেন দেখছি।"

সুবীরের মুখে এক পোচ কালি কে যেন বুলিয়ে দেয়।

—"মাপ করবেন আমায়, ওভাবে অপমান করতে চাইনি আপনাদিকে।"

কোন কথা না বলে সুবীর একাই উঠে গেল উপরে। দু'একজন মুখ চাওয়াচায়ি করে। ওরা পরের 'শোর' টিকিট কেটে বার হয়ে এলো।

মাধবী আগাগোড়াই নীরব দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করেছিল, বাইরে এসে তার কণ্ঠস্বরের উচ্চতা প্রকাশ পায়—"ভদ্রলোককে খামোকা অপমান করলি তুই।"

—"বেশ করেছি, জুতো খুলে মারিনি এই ঢের। সিনেমায় যাবেন—কি ভেবেছে ও।"

—"এত গুমোর করিস না, উনিও যে সে লোক নন, ওর লেখা উপন্যাসেরই এই ছবি হয়েছে। দেখলি না কাহিনীকারের নামটা, ভদ্রভাবে কথাটা বলেছিলেন বই তো নয়?"

শেফালি যেন কি খুঁজছে মাধবীর চোখে। তাকে বিশ্বাসও করতে পারে না।

"—ছি ছি ছি—কি ভাববেন উনি বল দিকি?"

এর পরও পথে দেখা হয়েছে যুগল মূর্তির সঙ্গে—সুবীর মাথা নীচু করে চলে যায়। শেফালিই ফোড়ন কাটে—

—"ওরে বাব্বাঃ! একটু নাম ডাক হয়েছে কিনা, গুমোরে আর দিশেবিশে নাই। আগে কেমন চুলবুল করতো এই দিকে চাইবার জন্য।"

মাধবী কেমন যেন নিজেকে অপ্রস্তুত বোধ করে বন্ধুর এই মন্তব্যে। হাজার হোক ওর যোগ্যতা না থাকে নেই। সাধারণ পথচলতি লোকের মধ্যে ও একটা প্রতিভাবান গুণী লোক—তাকে লক্ষ্য করে শেফালির এই হীন মন্তব্য যেন তার কাছে অসহ্যই মনে হয়।

মাধবীর আর একটা পরিচয় আছে—সেটা যেদিন সুবীরের কাছে ধরা পড়লো, সেদিন সে ওই স্বল্পবাক মেয়েটিকে একটু শ্রদ্ধা না করে পারে না। একটা স্থানীয় সাহিত্যসভায় তাকে ধরে নিয়ে গেছে প্রধান আতিথ্য করতে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও হয়েছে। সুবীর হঠাৎ মাধবীর গান শুনে একটু বিস্মিত হয়ে যায়—রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে সে এবং বেশ দরদী কণ্ঠে নিখুঁত প্রাণময় করে তুলে। নীচে আর একটি সঙ্গীও রয়েছে তার—সেই মুখরা শ্বেত সরষের মত ঝাঁঝালো শেফালিও। সে অবশ্য এসবের মধ্যে নাই—পলাশ ফুলের মত রংবাহার সার করেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই সেজেগুজে কাজলপরা চোখ মেলে বসে রয়েছে। লক্ষ্য করে সুবীর—মাধবীর অনুরোধেই সে বসে রইল—সুবীরের বক্তৃতা পর্যান্ত।

ফিরবার সময় ওদের দুজনের সঙ্গে দেখা—চাঁদের আলো বিজলীবাতির আভাকেও যেন ম্লান করে তুলেছে, রাস্তার পাশে পুকুরের জলে পড়েছে একটা নারকেল গাছের প্রকম্প ছায়া—বাতাসে কি যেন ফুলের উগ্র সৌরভ …ওদের দুজনের খোঁপায় রজনীগন্ধা ফুলের স্তবক, হঠাৎ সুবীরকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। সুর্মাটানা ফর্সা চোখের গভীর শান্ত চাহনি, পুকুরের জলে রাতের হিমের মতই কি যেন অপরূপ স্নিগ্ধতা ঝরে পড়ে তা থেকে।

—"বেশ চমৎকার গাইতে পারেন তো, খুব ভালো লাগলো আপনার গান।"

কথা কয়না মাধবী, কি যেন অজানা আবেশে তার চোখের দীঘলপাতা নেমে এলো, সুবীর এগিয়ে চলে বাড়ীর দিকে।

শেফালি বন্ধুর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল, লক্ষ্য করেছিল কেমন ইচ্ছে করেই সুবীর তাকে এড়িয়ে গেলো—আমলই দিল না। বারেকের জন্যও তার: চন্দনের টিপ-পরা ললাট, সুর্মাপরা চোখের দিকে ভুলেও চাইলো না—সে যে একটা মানুষ ছিল সঙ্গে সে খেয়ালই করলো না। মাধবীকে চুপ করে থাকতে দেখে টিপ্পনি কাটে শেফালি—"কিরে ঢলে পড়লি নাকি? যেচে এসে প্রশংসা করে গেল—এতবড় একটা লোক।"

কথাটায় বেশ তীব্র একটা শ্লেষ ফুটে উঠেছিল তা মাধবীর নজর এড়ালো না।

—"তুইও যেমন! যাঃ।"

শেফালি বেশ গিন্নীপনার ভাব নিয়েই বলে—"ওসব কিন্তু আমার ভালো লাগে না। ও বেজায় বেহায়া—"

মাধবী শেফালিকে অভ্যাসমত জড়িয়ে ধরে ওদের বাড়ী ঢুকলো, পিসীমা দাঁড়িয়েছিলেন। বলে ওঠেন—"পথে ঘাটেও কি অমনি ঢলানির মত চলিস নাকি লো তোরা।"

মাধবী একটি মুহূর্তকে যেন কিছুতেই ভুলতে পারে না, তার শিল্পসত্তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে আর একজন শিল্পী—এই অযাচিত স্বীকৃতিটুকু তার সমস্ত মনকে যেন ভরিয়ে রেখেছে কি এক মধুর স্বপ্নাবেশে। শেফালি নেহাৎ ডালভাতের দলে—তার জীবনের সুপ্ত শিল্পীমন আজ যেন কোন সাধনার অনুপ্রেরণা পায়।

কয়েক দিন পর হঠাৎ সুবীরবাবুর ছোট বোনের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়—তাদের কলেজেই পড়ে। বেশ হাসি খুশী মেয়েটি।

সেদিন প্রণতির সঙ্গে তাদের বাড়ীতে এসে একটু অবাক হয়ে যায় মাধবী। বেলা তখন প্রায় বারোটা-একটা হবে। বারান্দায় যাবার সময় প্রণতি একটু ইসারা করে ওকে চুপ করতে বলে, জানলা থেকে দেখা যায় টেবিলে মাথা নীচু করে কি লিখছে সুবীর একমনে—এখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি। একপাশে পড়ে রয়েছে কতকগুলো সদ্য লেখা ফুলস্কেপ কাগজ।

—"নোতুন কি একটা উপন্যাস লিখছে দাদা, খুব খাটতে হয় এখন। রাত প্রায় একটা অবধি জেগে কি যেন ভাবে বসে বসে—না হয় লিখেই চলে।"

মাধবী নিজেকে কেমন যেন ছোট ভাবে। সেও শিল্পী বলে পরিচয় দিতে চায় কিন্তু গানের পিছনে কতটুকু

তার সাধনা রয়েছে। সেকি এমনি নিঃশব্দে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পেরেছে তার সাধনায়।

—"তোমার বৌদি ?"

হাসে প্রণতি—"বৌদি নাই বলি কি করে ? হয় তো আছে—তবে তার এখনো দাদার সঙ্গে দেখাই হয় নি।"

প্রণতির গলা শুনে সুবীর বলে ওঠে ভিতর থেকে "এককাপ চা খাওয়াবি রে ?"

—"বেলা কত হয়েছে খেয়ালই নাই,একটা বেজে গেছে—খেতে হবে না। ওঠো—মা ডাকাডাকি করছে নীচে।"

সুবীর চুপ হয়ে গেছে।

কয়েকখানা মাসিকপত্র বই নিয়ে বার হয়ে এলো মাধবী, বাড়ীতে পা দিয়েই দেখে শেফালি এসে বসে আছে, স্নান খাওয়া সেরে লালঠোঁট পানের রসে টুকটুকে করে—পায়ে গিন্নীবান্নির মত আলতা পরে—ভিজে চুল এলো করে গিঁঠ বেঁধে এসে পুরোনো সিনেমার গল্প ফেঁদেছে। মাধবীকে ঢুকতে দেখে বিস্মিত হয়ে ওঠে, হাতে সুবীরের সদ্য প্রকাশিত নতুন বইখানা—যেটা সেদিন ছবি দেখে এসেছে তারা—শেফালির পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে যায়—গোপনেগোপনে মাধবীর এতদূর অধঃপতনটা সে সহ্য করতে পারে না।

—"বুঝেছি"—অভ্যাসমত রক্তিম ঠোঁটটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে শেফালী গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—"কি বুঝেছিস ?" মাধবী বন্ধুকে জড়িয়ে ধরতে যায়। উদ্যত হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শেফালী গম্ভীর-ভাবে বলে ওঠে—"থাক থাক, আদরে দরকার নাই। যার আদরের জন্য লালাচ্ছ সেইখানেই যাও। তবে সাবধান করে দিচ্ছি মাধু—কবি-সাহিত্যিক ওরা কমবেশী সব্বাই মেয়ে হ্যাংলা।"

মাধবী প্রতিবাদ করে ওঠে—কি বলছিস যা-তা।

"—একথা কি এখন ভালো লাগবে! যাই—কাজ আছে। একটা সোয়েটার আধখানা করে ফেলে রেখেছি—শেষ করাই হচ্ছে না।"

চলেই যেতে চায় শেফালি, কিন্তু নতুন বাক্সতে ঝক্‌ঝকে একগাদা বই—মাসিকপত্র দেখে মনে মনে লোভও সামলাতে পারে না। মাধবীই এগিয়ে দেয় তার হাতে দুখানা বই—"পড়ে দেখ—লোকটা কেমন তাও বোঝা যাবে হয়তো।"

শেফালী ব্যগ্রতা চেপে হাত বাড়িয়ে বইগুলো নেয়। পাতা উলটে দেখে নিজের নামসইও করে দিয়েছে তাতে সুবীর।

রাতের বাতাস জানালায় উঁকি মেরে যায়, বর্ষণ তখনও থামেনি। গাছের মাথায় মাথায় বাতাস তখনও মাতামাতি করে চলেছে। আকাশের বুকে নিরন্ধ্র অন্ধকার। সুবীর চুপ করে কি যেন ভাবছে। অতীতের স্মৃতিমুখর জীবন থেকে উড়ে আসে সুরভিময় একটি ছিন্ন পত্র—আজ হয়তো এর দাম কিছু নাই, কিন্তু একদিন তার শিল্পী মনে এনেছিল প্রবল আলোড়ন।

নারীমন এমনিই বিচিত্র রহস্যময়, শেফালীর এই বিরাগটা কমার দিকে না গিয়ে বেড়েই চললো, হয়ত গোপন মনের হিংসা—প্রত্যাখ্যানের বেদনাই তাকে সচেতন করে তুলেছিল। তার সামনে মাধবী কেমন করে তিলে তিলে একটি মনের পরতে তার শ্যামলিকা বিস্তার করলো, কি করে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো ওই শিল্পীর সঙ্গে তার শিল্পী সত্ত্বা—তাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে—এইটাই ছিল তার হিংসার কারণ। মাধবীর মনে শেফালীই ছিল সব, কিন্তু তার ঠাঁই যেন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে তলে তলে, মাধবীর সুর গানের ছন্দ অধিকার করে নিল অন্য একজন, এটা শেফালীর কাছে অসহ্য ঠেকে। এ তার নিদারুণ পরাজয়।

মাধবী এখন উঠে পড়ে গান নিয়ে লেগেছে, পড়া আর গানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে, কি যেন একটা অনুপ্রেরণা তাকে সর্বংসহা করে তুলেছে। শেফালী আর তাকে সব সময় পায় না—সেই গলাগলি ভাব কথায় যেন মিলিয়ে গেছে। মনের দুঃখে শেফালীই আসেনি ক'দিন। সন্ধ্যার দিকে সেদিন থাকতে না পেরে সেদিন মাধবীদের বাড়ীতে এলো।

বাইরের ঘরে পা দিয়েই চমকে ওঠে, এই কদিনের মধ্যে নাটক যে এতদূর এগোবে তা কল্পনাও করতে পারেনি। মাধবী গান গাইছে আর ওপাশে একটা চেয়ারে চোখ বুজে ধূমায়িত পেয়ালার সামনে সিগারেট হাতে বসে আছে স্বয়ং সুবীর। দুজনেই তন্ময় হয়ে গেছে, নীরবে

দাঁড়িয়ে থেকে বার হয়ে গেল শেফালী। রাগে অপমানে তার সারা দেহমনে যেন আগুন জলছে। এমনি করে মাধবী যে তিলে তিলে অধঃপাতে নেমে যাবে কল্পনাই করতে পারে না।

এত বড় কাণ্ডটা ঘটে গেল দুজনের কেউই তা টের পেল না।

রাত্রি নেমে আসে, তারার চুমকীবসানো আকাশ যেন স্বপ্ন দেখছে! সুবীরকে এগিয়ে দিতে আসে মাধবী।

—নতুন কি লিখছেন ?

—"বিরাট এক উপন্যাস, প্রায় শেষ করে এনেছি। ভালো একটা মাসিকে বেরুচ্ছে।"

নীরবে ওর দিকে চেয়ে থাকে মাধবী, ওই তার কাছে অনুপ্রেরণা। নিঃশেষে সাধনার মধ্যে নিজেকে সঁপে দেবার ব্রত দীক্ষা নিয়েছে ওর কাছ থেকেই ওরই অজ্ঞাতে।

বাড়ী ফিরছে মাধবী হঠাৎ জানলার ধারে শেফালীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে যায়—হালকা আনন্দবিহ্বল সুরে ডাক দেয় "শেফি—এ্যাই।"

ঘরের আলোতে দেখতে পায় মাধবী শেফালীর চোখে কি এক নিদারুণ ঘৃণা, তার মুখের উপরই সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে দেয়।

কয়েকদিন পর সুবীর চিঠিগুলো ডাকে পেয়ে খুলছে। মেয়েলিহাতের ঠিকানা লেখা দেখে একটু কৌতূহলের সঙ্গেই খুললো খামখানা। কয়েক ছত্র পড়েই স্তম্ভিত হয়ে যায়—ব্যাপারটা ঠিক ঠাহর করতে পারে না। চিঠিখানায় লেখিকারও নাম নাই, অথচ প্রতিটি ছত্রে লেখিকা আর একজনের সম্বন্ধে যে গরল উদ্গীরণ করেছে তা সহ্য করা নীলকণ্ঠ ছাড়া আর কারুরই সম্ভব নয়! চিঠিখানা খানিকটা পড়েই বন্ধ করে রেখে দিল সুবীর। অহেতুক বেনামী চিঠিতে একজন ভদ্রমহিলা আর একজন মেয়ের সম্বন্ধে যে এই সব কথা লিখতে পারে—তা জানা ছিল না। হাসিও আসে—দুঃখবোধও হয়।

মাধবীকে আসতে দেখে নেহাৎ কৌতুকবশেই সুবীর বলে ওঠে—তোমার সম্বন্ধে চিঠিখানা কে লিখেছে—তোমারই কোন আপনজন, তার পরিচয়টা জানা তোমারও দরকার।

মাধবী ব্যস্তসমস্ত হয়ে চিঠিখানা খুলল, সুবীর চেয়ে থাকে ওর দিকে, চাপা আক্রোশে যেন কাঁপছে মাধবী। সারা মুখ চোখ থমথম করছে কি একটা তীব্র উত্তেজনায়।

—আপনি বিশ্বাস করেন এই সব নোংরা কথা ?

—ঘাড় নাড়ে সুব্রত—"আমাকে ভুল বুঝোনা মাধু; বিশ্বাস করলে তোমাকে এটা দেখাতাম না, এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলার প্রয়োজনও বোধ করতাম না।"

চিঠিখানা হাতে করে মাধবী ক্ষিপ্রবেগে নেমে গেল নীচে।

শেফালী রোজকার মত ঘর গুছিয়ে স্নান সেরে প্রসাধনে ব্যস্ত। চোখের কোণে সুর্মার প্রলেপ টানতে যাবে—মাধবীকে প্রবেশ করতে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল।

—"এ চিঠি তুই লিখতে পারলি? এত নীচ তুই শেফি—"

শেফালী কোন কথা কয়না, মুখ তুলে চাইলমাত্র। চোখে কি যেন একটা নিদারুণ তৃপ্তির আভা। পাউডার পাফ্‌টা নিয়ে পাশের ঘরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে চলে গেল।

দলিতাফণিনীর মত বার হয়ে এলো মাধবী—চিঠি-খানাকে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ছিটিয়ে দিলে ওর ঘরের মেজেতে।

তারপর বন্ধুত্ব নামক পদার্থটি তাদের মধ্যে থেকে কর্প্‌রের মত উবে গিয়েছিল।

চুপ করল সুবীর, বাইরে বৃষ্টির ধারা কমে এসেছে, ঘরের মধ্যে একটা স্তব্ধতা বিরাজমান। কে যেন প্রশ্ন করে—তারপর মাধবী কোথায় গেলো ?

—"যাবে আর কোথায় আজকাল বাংলাদেশের সে একজন বিখ্যাত গাইয়ে, অনেক গানই তার শুনেছো—শুনছো তোমরা। আর শেফালী? সে কোন বেচারার ঘরে গিয়ে ঘাড়ে চেপে হাতাবেড়ি ঠেলছে, আর স্বামী বেচারার উপর আড়ি পাতছে—ফস্ করে কোন মেয়ের পাল্লায় পড়লো নাকি তাই খবরদারি করতে।"

—কিন্তু মাধবী বলে তো কোন নামকরা গাইয়ে নাই—হাসে সুবীর—আসল নামটা চেপেই গেলাম। ওটা নাই বা শুনলে।

বৃষ্টি কমে এসেছে। বাতাসে তখনও একটা স্নিগ্ধ মাধবী ফুলের সুবাস। সুব্রত অতল অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে কি যেন ভাবছে।

ভারতীয় চিত্রে যুগপ্রভাব

শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুশারী

"নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হলাদৈকময়ীমনন্য পরতন্ত্রাং।
নবরসরুচিরাং নিৰ্ম্মিতিমাদধীতি ভারতী কবের্জয়তি॥"

নিয়মের মধ্যে ধরা আনন্দের ভিতর দিয়ে মানব চলতে থাকে অজানার সন্ধানে। যা খুঁজে পায় তা প্রকাশের ভিতর থাকে তার নির্মিতি। পরিমিতির বাইরে খুঁজে পায় রসেভরা অপরিমিতি। পুষ্পের বাইরের রূপটা দেখে সে খুশি থাকতে পারে না, তার সৌরভ চাই, পাতা গাছ মালা, তার গুণ সব কিছু চাই। এতো পেয়েও মানব মন তৃপ্ত হয় না, পুষ্পের রূপ-যৌবনটা কি করে চিরস্থায়ী করা যায় সে চেষ্টাও তাকে করতে হয়। পরিমিতিকে অপরিমিত রূপ রস দিয়ে, বর্ণে ছন্দে ভাবে সাদৃশ্যে, ক'নে বৌটির মত সাজিয়ে অনুপম করে তোলাই হলো শিল্পী বা কবির কাজ।

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ বললেন, "দেশ কাল পাত্র এ সমস্তই গতি দিচ্ছে শিল্পীর মনোবৃত্তি সমস্তকে, এই হল স্বভাবের নিয়ম; যেখানে এর অভাব সেখানেই শিল্পের ধারা হয় একই অবস্থায় জড়বৎ...।"

ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় শিল্পধারা যুগপ্রভাবকে এড়িয়ে চলতে পারে নি। শিল্পের গতি সম্বন্ধে শিল্পী ও শিল্প-সমালোচকগণ এ পর্যন্ত যে সকল আলোচনা করেছেন তাতে ভারতীয় চিত্রের ধারা অবনীন্দ্রনাথের যুগ পর্যন্ত জানা যায়; কিন্তু বর্তমান যুগের ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বিচিত্র ভাবধারা অবলম্বন করে চলেছে। কাজেই শিল্পের অতীত যুগের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করে দেখা যাক এ যুগের শিল্পীগোষ্ঠীর সম্ভাব্য পরিণতি কি। পুনরোক্তি হলেও ভারতীয় শিল্পের ধারা সম্বন্ধে এ স্থলে সংক্ষেপে একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন।

বৈদিক যুগ থেকেই আর্যশিল্পের ক্রম ধরা হয়। ধর্মকে ভিত্তি করে, উষাকে কুমারী মূর্তিতে, অগ্নিকে দূত রূপে ধ্যান মূর্তির রূপ তখন দেওয়া হতো।

"দেবশিল্পানাম্ অনুকৃতিঃ"

দেবতার কার্যে সহায় হলো শিল্পীগণ এরূপ বিবৃতি বৈদিক যুগে পাওয়া যায়। আর্য ও অনার্য উভয়ের ভিতরেই শিল্পী ছিল। রাক্ষস বলতে আমরা অনার্য জাতিই মনে করি। রামায়ণে স্বর্ণসীতা ও লঙ্কায় মায়া-সীতার কথা জানা যায়। অতএব প্রথম প্রতিমা গড়া যে আর্যজাতির সেই রামায়ণের যুগ থেকেই আরম্ভ হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মহাভারতের যুগে দেখা যায় যুধিষ্ঠিরের সভা প্রস্তুত করতে এলো শিল্পকার ময়দানব, কিরাতের ঘর থেকে এলো অর্জুনের গাণ্ডীব। তাদের অনেকে আবার কারিগর না বলে যাদুকর আখ্যাও দিতেন।

তারপর এক সময়ে ইন্দ্রের পূজা বন্ধ হয়ে আরম্ভ হলো শ্রীকৃষ্ণের পূজা—এলো গোপজাতি—রামের পাশে সীতা, কৃষ্ণের পাশে রাধা। এভাবেই আর্য ও অনার্য সভ্যতা ক্রমবিবর্তনের ধারা মেনে চলতে থাকে এবং শিল্পও সে ধারা অনুসরণ করে চলে। কিন্তু মূর্তি পূজার বিশিষ্ট ধারাটি প্রবর্তিত হয় বৌদ্ধযুগ থেকে, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৫৬৩ শতাব্দের পর। এরই সমসাময়িক কালে দেখা যায় তিব্বত ও নেপালের ভিতর দিয়ে এলো চীনা শিল্প, বাদশাহী দরবার দিয়ে এলো মোগল ও রাজপুত শিল্প, দ্রাবিড়ী ও উড়িয়াদের হাত দিয়ে এলো দক্ষিণী শিল্প (ভাস্কর্য)। প্রাচ্যকলা বলতে রাজপুত, মোগল, দক্ষিণী, বৌদ্ধ সকল স্কুলকেই বোঝায় কিন্তু লক্ষ্য করা হয় অজন্তা স্কুলকে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা অজন্তার শিল্পসম্পদ খৃষ্টপূর্ব ৪৮৩ শতকের পর রচিত। অজন্তাগুহা আবিষ্কৃত হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে।

৮০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চিত্রশিল্পের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নি। এই মধ্যযুগীয় শিল্পে ভাস্কর শিল্পীদের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সময়ে জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বর ও কোনারকের সূর্য মন্দির, মধ্যভারতের খাজরাহোর, দাক্ষিণাত্যের বিশ্ব-বিখ্যাত দেবমন্দিরসমূহ প্রস্তুত হয়। রাজপুত ও মোগল চিত্রের যুগ হলো ১৬০০ খৃঃ অব্দ থেকে ১৯০০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত।

বুদ্ধগয়ার মন্দির, বরহাট স্তূপ খৃষ্টপূর্ব ২০০-২৫০এ নির্মিত। তার পর প্রথম অব্দে সাঞ্চি স্তূপ, তার ৫০০ বৎসর মধ্যে গান্ধার, এবং ৪০০-৫০০ খৃঃ অব্দে অমরাবতী স্তূপ নির্মিত হয়। ৩০০-৪০০ খৃঃ অব্দে দিল্লীতে ফিরোজ সাহেবের কবর সম্মুখে ধাতুনির্মিত ২৩ ফুট উচু স্তম্ভ প্রস্তুত হয়।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে 'পাহাড়ী প্রণালী' নামে আর এক প্রকার চিত্র দেখা যায়। এ সকল চিত্রে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত। তৎকালীন শিল্পীগণ বীরগণের প্রতিকৃতি, পুরুষ ও নারী রূপে বিভিন্ন রাগরাগিনীর চিত্র অঙ্কন করে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

'পাহাড়ী' প্রণালীর আর একটি শাখা 'কাংরা প্রণালী' নামে পরিচিত। ১৯০০ শতাব্দীতে সমসের বন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় উহা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। কিন্তু মোগল শাসনের অবসান ও বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত থেকে ভারতীয় সর্বপ্রকার ললিত কলার অবাঞ্ছিত অবনতি ঘটতে থাকে। তখনকার শিল্পীসমাজ বিলেতী আমদানী শিল্পের অক্ষম অনুকরণে নিজেদের শিল্প ঐতিহ্যের সমাধি রচনা করেন। ভারতীয় শিল্পে এ স্বৈরাচার বাধাপ্রাপ্ত হয় ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী মিঃ হ্যাভেলের দ্বারা। শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ মিঃ হ্যাভেলের সাহায্যে ভারতীয় শিল্প মর্যাদা পুনপ্রতিষ্ঠায় তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন। পাশ্চাত্য শিল্প থেকে আরম্ভ করে প্রাচ্য শিল্পের প্রতিটি অধ্যায় এমন কি চীনা শিল্প প্রণালীও তিনি আয়ত্ত করেন। প্রতিভাবান শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে

এ সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে অধিক দিন লাগেনি। যার যেটুকু ভাল তা গ্রহণ করে নিজের সৃষ্টিকে রসোদয়ে পরিণত করতে এবং ভারতীয় ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখতে তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস সফল হয়েছিল। স্বামীজী বলেছেন, "এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার তাহা শিক্ষা কর।" অবনীন্দ্রনাথ এ আদর্শই গ্রহণ করেছিলেন।

ভারতীয় আদর্শ চিত্র বলতে অজন্তা স্কুলকেই বোঝায়। অজন্তার চিত্রাবলী মুখ্যত ধর্ম-বিষয়ক হলেও অতীন্দ্রিয়কে ধরতে গিয়ে বাস্তবকে উপেক্ষা করেনি। প্রাচীন শিল্পীগণ শুধুই দেবদেবীর চিত্র বা মূর্তি প্রস্তুত করতেন এরূপ ভ্রান্ত ধারণা অনেকে পোষণ করেন। অবশ্য যে যুগের যে ভাবধারা সে যুগের সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে তা ব্যক্ত হবেই। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে তখনকার সাহিত্য ও শিল্পে ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক। বর্তমান এই যান্ত্রিক যুগে শিল্প ধারার যে অনন্তলীলা চলছে তার ইতিহাসও আমাদের সৃষ্টির ভিতরে অমর হয়েই থাকবে।

বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে' বর্ণিত ভারতীয় চিত্র ষড়ঙ্গ রচিত আনুমানিক খৃঃ পূর্ব ৬৭: শতকে। অজন্তা শিল্প সৃষ্টির বহু পূর্বে। কামসূত্র রচনার উপসংহারে বাৎস্যায়ন লিখেছেন,—

"পূর্বশাস্ত্রাণি সংহৃত্য প্রয়োগানুপমৃত্য চ।
কামসূত্রমিদং যত্নাৎ সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্॥"

যশোধর পণ্ডিতের টীকায় যে কামসূত্র আমরা দেখতে পাই, তাও ১১শত থেকে ১২শত খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। কাজেই নিম্নোক্ত চিত্রষড়ঙ্গের রচনাকাল যে বহু প্রাচীন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

"রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥"

রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ এ ছয়টি অঙ্গ নিয়ে হয় চিত্র। দেবদেবীর চিত্র, জীবজন্তু বা নৈসর্গিক যে কোন চিত্রই হোকনা কেন শিল্পীকে এ ছয়টি দিক ধরে রসোদয়ের চেষ্টা করতে হবে, এটাই হলো ভারতীয় চিত্রের আদর্শ এবং এ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখেই অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিকে মহামূল্য সম্পদ রূপে রেখে গেছেন।

বিভিন্ন দেশের শিল্পধারাকে নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়,—

প্রাচীন ভারত	সাত্বিক ভাবাপন্ন
প্রাচ্য	ঐ
" ইজিপ্ত	তামসী ভাবাপন্ন
" গ্রীক	রাজসিক "
পাশ্চাত্য	ঐ

রাজপুত ও মোগল চিত্র সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক কুমারস্বামী বলেন, মোগল চিত্র নাটকীয় ভাবাপন্ন, পাণ্ডিত্য প্রকাশক, বস্তুতান্ত্রিক আর রাজপুত চিত্র চিত্তাকর্ষক সম্ভ্রান্ত সমাজের লোকশিল্প, রক্ষণশীল ও সঙ্গীত ধর্মী। রাজপুত চিত্র যে অজন্তার অনুরূপ তার আভাসও তিনি দিয়েছেন। অজন্তার শিল্প ভারত শিল্প ষড়ঙ্গ অনুসরণে সৃষ্ট বলেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ববাসী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ভারত শিল্প ষড়ঙ্গ বহু প্রাচীন। আমাদের ধারণা হওয়া অসঙ্গত নয় যে এসিয়াবাসী, মিসর, জাপান প্রভৃতি এ ষড়ঙ্গেরই অনুসরণ করেছিল। এসিয়ার ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি, গ্রাক আর্টে টিনিয়ার এপলো মূর্তি, মিশরীয় আর্টে সম্রাট খেফ্রেনের মূর্তি, চীনের কুও-যু (Kuo-Tzu-I) মূর্তি, পারসিক শিল্পে সাপুরের মূর্তি প্রভৃতি স্বায়া প্রামাণ্য মূর্তি এবং এসকল সৃষ্টির ভিতর দিয়ে যুগের ভাবধারা প্রকাশ পেয়েছে। ষড়ঙ্গের বিষয়গুলো আলোচনা করলে এ সত্য আবিষ্কার করা যায় যে উপরোক্ত শিল্প সৃষ্টিতে প্রাণছন্দ (রূপভেদ), প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য ও সাদৃশ্য পূর্ণভাবে বিদ্যমান। সাধকশিল্পী এ পঞ্চমুণ্ডী আসনে সমাসীন থেকে তাদের সৃষ্টিকে জাতীয় মহামূল্য সম্পদে অমর করে রেখে গেছেন। তাঁদের এ সাধনার প্রথম অবস্থায় ছিল দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব, দ্বিতীয় অবস্থায় ছিল রূপলোক অর্থাৎ আদর্শ মূর্তির অবস্থা এবং তৃতীয় পর্য্যায়ে ছিল অমূর্ত্ত জগৎ অর্থাৎ মূর্ত্তিকে অতিক্রম করে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে অনন্ত যাত্রার ইঙ্গিত।

শিল্পীরও কবিদের ব্যক্তিগত জীবন আলোচনা করলে দেখা যায় অধ্যাত্মবিদ্যার তত্ত্বগত গভীর রহস্য উদ্ঘাটনই যাঁদের একমাত্র সাধনা তাঁরাই প্রসিদ্ধ শিল্পী বা কবি নামে খ্যাত হয়েছেন। A. E. অধ্যাত্মবিদ কবি, মিতরলিঙ্ক, য়িটস্ মিষ্টিক ও ছিলেন অধ্যাত্মপন্থী; রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথও অধ্যাত্মপন্থী ছিলেন।

অয়কেন প্রশ্ন করেছিলেন, "Is human life a mere addition to nature or is it the beginning of a new world?"

উত্তরে হাফডিঙ্ বলেছিলেন, "He looks on the attempt of empirical Science to demonstrate continuity in the world of Phenomena as hopeless but explains the interuption of empirical continuity as particular results of a great transcendental continuity of a Kingdom of possibilities of end and values which reveals itself in the world of finitude only in flashes."

এখানেও সেই অধ্যাত্মতত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জড় জগতের ঘটনা প্রবাহকে বস্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমস্ত সম্পর্ককে রাসায়নিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা দেখতে পারি না—পিতামাতা, বন্ধু প্রভৃতিকে জৈবিক (biological) বা রাসায়নিক সংযোগের ফল বলে কখনো মনে হয় না। কেননা মানবশাস্ত্র গণ্ডশাস্ত্র নয়। বিজ্ঞানের ক্রিয়া চলে যন্ত্রজগৎ (dead matter) নিয়ে—তাতে থাকে নীতিগত বাধ্যবাধকতা—তাকে সীমাবদ্ধ করে মানবের প্রয়োজন মেটানো হয়।

বার্গসো বলছেন, "From the beginning of the humanity there have been men whose peculiar office has been to see and to make other men see that which without and would never have been discovered. They are artists."

টুকরো টুকরো করে জগৎটাকে দেখা যায়, কিন্তু সে টুকরো গুলোকে জগৎ আখ্যা দেওয়া যায় না—টুকরোগুলোকে অখণ্ড রূপে দেখতে পেলেই সেটা হলো জগৎ। এ কারণেই এমন লোক প্রয়োজন যে দেখতে জানে—দেখাতেও পারে। ওকাকুরা তাই বলেছেন, "Adjustment is art." বাইরের জিনিষকে সরল, সহজ, শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে না পারলে তার ভিতর ঘোরাফেরার পথ করা যায় না।

"The mind or the eye brought face to face with a number of disconnected and apparently different facts, ideas, shapes, sounds or objects is bothered and uneasy; the moment that some central conception is offered or discovered by which they all fall into order, So that their due relation to one another can be percieved and the whole graped, there is a sense of relief and pleasure which is very intense,"

—"Felix Clay. The origin of the Sense of beauty" P. 95

বর্ত্তমান যুগে বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে শিল্পধারা কি ভাবে ভারত শিল্পকে কর্ণধারবিহীন তরণীর মত একান্ত অসহায় করে তুলেছে রাস্কিনের কথায় তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"Men who have no imagination, but have learned merely to produce a spurious resemblance of its results by the reciepes of composition, are apt to value themselves mightily or their concoctive Science; but the man whose mind a thousand living imaginations haunt, every hour, is apt to care too little for them; and so long for the perfect truth which he binds is not to become so easily."

কল্পনা শক্তি যাদের অল্প তার কতকগুলি প্রচলিত নিয়মের প্রক্রিয়া অবলম্বন করে পদার্থের একটা মেকি প্রস্তুতের শিক্ষা করে মাত্র এবং, তাদের ঐ সৃষ্টিকে ও প্রস্তুত প্রকরণ প্রণালীকে মূল্যবান মনে করে গর্ব অনুভব করে। কিন্তু যাদের মন কল্পনাপ্রবণ, প্রকরণ প্রণালী তাদের কাছে থাকে গৌণ হয়ে—অমূর্ত সত্যের দিকে তাদের চিত্ত ধাবিত হয়। তারা জানে প্রকরণ প্রণালীর সহজ উপায়ে কঠিনকে ধরবার উপায় নেই। এ যুগ তর্কের যুগ, প্রকরণ প্রণালীর সহজ পথ অবলম্বনের যুগ—স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলাই এ যুগের লক্ষ্য, কাজেই আর্ট ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যখনই মানুষের কল্পনা শক্তির অভাব দেখা দেয় তখনই সে অনুকরণে প্রবৃত্ত হয় এবং এ অনুকরণ চলে নির্বিচারে।

শিল্পী এমন সব চিত্র আঁকেন যা ধনী ব্যক্তিদের গৃহের রূপসজ্জা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নগ্ন স্ত্রীমূর্তি, লোকে বুঝতে পারে না এমন সাঙ্কেতিক চিত্র এবং কামোদ্দীপক চিত্রগুলি সবই নিকৃষ্ট আর্ট। এতে ভাবের গভীরতা নেই—মানব অন্তর পবিত্র করে না—লালসাকে উন্মত্ত করে তোলে। এ বিষয়ে টলস্টয়ের কথা প্রণিধান যোগ্য।

"The art of our time and our circle has become a prostitute and this comparison holds good even in minute detail. Like her it is not limited to certain times, like her it is always adorned, like her it is always saleable and like her it is enticing and ruinous.

বিষয় বস্তুর শুচিতা ও মহত্ত্ব শিল্পীর উচ্চতম বৃত্তি থেকে উদ্ভূত। ভাব যখন মূর্তি পরিগ্রহ করে তখনই সে হয় মূর্তি। এ মূর্তিকে কলাকৌশলের ভিতর দিয়ে গড়ে তোলাই হলো শিল্প রচনা। শিল্পী রোঁদা বলেছেন,

"It is false idea that drawing in itself can be beautiful, It is oniy beautiful through the truths and feeling that it translates.... There does not exist a single work of art which owes into charm only to balance of line and tone and which makes appeal to the eye alone.';—Rodin

আমাদের শাস্ত্রকার লিখলেন,—

"শরীরেন্দ্রিয় বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়কা ভাবাঃ
বিভাবজনিতাশ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতাঃ।"

যেকোন মূর্তির আংশিক কৌশলে থাকে form, expression, execution, প্রভৃতি এবং ভাববস্তু হয় conception, matter, content নিয়ে। আর্টএর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মতভেদ নেই। মিশর শিল্পীগণ অক্ষমতার জন্য রূপান্তরিত করে রাজা খেফ্রেণকে রচনা করেনি। চৈনিক শিল্পীগণ অক্ষমতার জন্য কুও-জু-ইর মূর্তি বিকৃত করে আঁকেনি, জাপানী শিল্পী অক্ষমতার জন্য বিরূঢ়ক মূর্তি বিকৃত করেনি অথবা গ্রীকশিল্পী টিনিয়ার এপোলো মূর্তি প্রস্তুতে ব্যর্থতার পরিচয় দেননি। ভারতের বুদ্ধমূর্ত্তি প্রভৃতিও ভাবব্যঞ্জনার দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রস্তুত করা হয়েছে—অক্ষমতার জন্য আংশিকের বিকৃতি করা হয়নি।

ভারতবর্ষে দেবদেবীর মূর্তি আঁকার দিকেই অধিক ঝোঁক ছিল, এখনো আছে। এর কারণ দিব্যত্বে অনুরক্তি ভারতবাসীর স্বভাবসুলভ ধর্ম। ভারতের ঐতিহ্য ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাই চিত্রে ও ভাস্কর্যে তার প্রমাণ সুস্পষ্ট।

"পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াভির্হি কলাভেদস্তু জায়তে" অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন :—

"চিত্র হয় তখন, যখন চিত্রকরের অন্তর্নিহিত উদয়-বাসনা বা প্রকাশ-বেদনা ছন্দের নিয়মে আপনাকে বাঁধিয়া অন্তর্বাহ্য দুইরূপে নিজেকে সংগত করিয়া রসোদয়ে পরিণত হয়। শব্দচিত্র, সংগীত, বাচ্যচিত্র, কবিতা, দৃশ্যচিত্র, পট ও মূর্তি ইত্যাদি কেহই সৃষ্টির, এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অনুসরণ না করিয়া প্রকাশ পাইতেই পারে না। যদি কিছু এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে অতিক্রম করিয়া উদয় হয় তাহাকে বলিব না সংগীত, কবিতা কিম্বা চিত্র। তাহাকে পাগলের খেয়াল, মাতালের প্রলাপ বলিতে পারি।

ঐ স্থলে তিনি বাহ্যকে উপেক্ষা করে অন্তরের উদয়-বাসনাকে

রূপায়িত করবার উপদেশ দেননি। সীমা হতে অসীমে যাওয়ার পথ রূপকলা। অসীম মানে অবাস্তব কল্পনা নয়। বর্তমানের একটা সীমা আছে, অবর্তমান বা অজ্ঞাত রূপেও তেমনি একটা সীমা আছে। তাই অবনীন্দ্রনাথ আবার বললেন,—"মানুষ যখন দেখলে অগোচরের অবাস্তবের অসম্ভবের অজানার, সেই দেখার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি বদল করে নিলে সৃষ্টির বাইরে এবং সৃষ্টির অন্তরে যে তার সঙ্গে অদ্বিতীয় শিল্পীর অপরাজিত প্রতিনিধি মানুষ মনোজগতের অধিকারী বহির্জগতের প্রভু।"

ভাবাশ্রিত রূপকে অবলম্বন করলে চিত্র-ষড়ঙ্গকে উপেক্ষা করা হয়। ভাবব্যঞ্জনা ষড়ঙ্গের একটি অঙ্গ বিশেষ। ষড়ঙ্গের প্রতিটি অঙ্গের সঙ্গে আত্মীয়তা না ঘটলে, সুন্দরের প্রকৃত সন্ধান না পেলে, অন্তরকে বাইরে ও বাইরেকে অন্তরে নেওয়া আশা করতে না পারলে, অবিদ্যমানকে সন্ধান করবার ধৈর্য না থাকলে অঙ্কনের সাফল্য নির্ভর করবে অপরের অনুকরণের মধ্যে। মানবের জ্ঞান যখন চরম অবস্থায় উপনীত হয় তখন তাঁর পুষ্পাঞ্জলি মায়ের চরণে না গিয়ে যায় নিজেরই শিরে। বাইরের পূজা তখন চলতে থাকে অন্তরে কালীর কালো বর্ণ জ্যোতিতে পরিণতি লাভ করে।—এ অবস্থা শিল্পীর এলে ভাবের রূপাশ্রিত মূর্তি ভাবেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে—কলাকৌশলে তা ধরা পড়বে না। ধ্যানের মূর্তি কলা কৌশলে ধরা পড়বে তখনই, যখন বাস্তবের পরিপূর্ণ রূপ শিল্পীর আত্মায় প্রতিবিম্বিত হবে।

যামিনীকান্ত সেন একটি অতি মূল্যবান কথা বলেছেন,—

"অন্তর্গৃহীত সৌন্দর্যাকে রূপগ্রাহী করা সমস্ত উচ্চ আর্টের একটা পরম লক্ষ্য। এই সমগ্রকে গভীরভাবে বিচার করা, নির্মুক্ত করা মনের একটা বিরাট কাজ......। বিশ্বের প্রতি বস্তুই নানা পরিবর্তন ও আন্দোলনে কম্পিত ও শিহরিত হচ্ছে—প্রতিমুহূর্তেই সংসারের সম্পদ নূতন রূপ পরিগ্রহ করছে, ভাবের দিক থেকে ইন্দ্রিয়ের দিক থেকেও। ...বস্তু মাত্রেরই সহস্রমুখী স্বরূপ আঁকা সম্ভব নয় এবং সব সময় প্রয়োজনও হয় না। কয়েকটা নিপুণ ও অপরিহার্য লক্ষণে সমগ্রকে উদ্দীপ্ত করতে হয়। যে হিসাবে ভাষা ইঙ্গিত, শব্দ ইঙ্গিত, তেমনি কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতিতে যে সমস্ত প্রণালী বা উপকরণ ব্যবহৃত হয় তা সবই সংকেত।"

"Art and not philosophical knowledge is the highest human function"—Sheling

আর্টের ভিতর দিয়ে যে সত্য পাওয়া যায় তার সাধনা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে অথবা অনুকরণ দ্বারা সম্ভব নয়। যুগ-প্রভাবকে উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু যুগপ্রভাব যে সতত পরিবর্তনশীল একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। 'রূপের সঙ্গে রূপাতীত এক হয়ে গাঁথা।' বর্তমান যেমন সত্য অবর্তমানও তেমনি মিথ্যে নয়। যা আছে তার সঙ্গে একটা স্বার্থের সম্পর্ক আছে বলে তা তত সুন্দর নয়, যত সুন্দর অবগুণ্ঠনের অন্তরালে অর্থাৎ অবিদ্যমানের ভিতর। বিদ্যমান অবিদ্যমানে যাবার পথ মাত্র। শুধু পথে চলার আনন্দ নিয়ে মানুষ পথ চলে না, গন্তব্যস্থলে যাবার আনন্দেই পথিক পথ চলে।

অলঙ্কার শাস্ত্রে আছে, —"নিয়তিকৃতানিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্য-পরতন্ত্রাং। নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়তি॥"

বর্তমান ভারতের শিল্পধারা পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুকরণ করতে গিয়ে নিয়েছে Cubist, Futurist, Realist, Impressionist, Mystic প্রভৃতি। শুধু তাই নয় ভারতের বাইরে আর্টে যখন যে নূতনত্ব দেখা দেয় আমাদের দেশের শিল্পীগণ তা অনুকরণে প্রবৃত্ত হন।

Corot এ বিপর্যয় রোধ করবার জন্য সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, "Do not imitate; do not follow others—you will be always behind them."

Kandinskyর কথায়ও এর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়,—"Effort to revive the art principle of the past will at best produce an art that is still-born. It is impossible for us to live and feel, as did the ancient Greeks. In the same way there who strike to follow the Greek method in sculpture achieve only a similarity of form, the work remaining soulless for all the time, such imitation is mere oping."

অনেক শিল্পী অজন্তার চিত্র আদর্শে দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও অনেক প্রকারের সমাজ-জীবনের চিত্র আঁকেন। এরূপ অন্ধ অনুকরণ শিক্ষার্থীদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। অনুকরণ পুনরুক্তি মাত্র, উহাকে আর্ট বলা চলে না। বর্তমানে পাশ্চাত্যের অনুকরণে যে বস্তুতান্ত্রিক শিল্প-প্রগতি চলছে তার পরিণাম অতিশয় ভয়াবহ অন্তত ভারতবাসীর পক্ষে, তা চিন্তাশীল মাত্রেই বুঝতে পারবেন।

পূর্বেই বলেছি অনুকরণে যাদের আসক্তি প্রবল, স্বাধীন চিন্তা ও সৃষ্টি ক্ষমতা তাদের গতপ্রায়। বর্তমানের শুধু হাতে কলমে শিক্ষা শিল্পীদের চিন্তাশীল হবার পক্ষে কিছুমাত্র সাহায্য করে না বলেই তাদের সৃষ্টি ক্রমশ বাস্তবমুখী হয়ে পড়ছে। বাস্তবের অনুকরণ করতে গিয়ে শিল্পীগণ তাদের চোখের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, অন্তরের কোন সন্ধানই রাখেন না। তার ফলে জড় বাস্তবের পুনরুক্তি করতে গিয়ে বর্ণ ও আলো-ছায়ার চমকপ্রদ বিন্যাস দ্বারা শিশুসুলভ খেয়ালী মনস্তত্ত্বের প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছেন—ষড়ঙ্গমালা বুঝবার কোন চেষ্টা নেই। হাতে কলমে শিক্ষা দ্বারা শুধু হাত ও দৃষ্টি শক্তিরই অনুশীলন হয়, বুদ্ধিবৃত্তি বা সত্যকে —সুন্দরতমকে আবিষ্কার করবার শক্তি লাভ হয় না।

শিল্পসাধকের মূলমন্ত্র হলো,—

"সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং"

সাহিত্য ও ভাবসত্য

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

সত্যকে বাদ দিয়া কখনও জীবন চলে না, কারণ সত্যকে পিছনে রাখিয়া যে-জীবন, সে-জীবন মূল্যহীন। সাহিত্য জীবনেরই প্রতিচ্ছবি, তাই সাহিত্যের মধ্যেও সত্যকে থাকিতে হইবে। কেন না, চিরন্তন সত্যের স্বাক্ষরটি যদি সাহিত্য তাহার বুকে আঁকিয়া না রাখে, তবে সেই সাহিত্যও কালের ধোপে নিশ্চিন্ত হইয়া সকলের অগোচরেই মুছিয়া যায়। না থাকে তাহার কোনো সজাগ ঠিকানা, না থাকে জন্মলগ্নের কোনো সার্থক ইতিহাস। তাই সত্যকে স্থায়িত্বের ইতিহাসের সমস্ত মালমশলা জোগান দিয়া যায়।

চিরন্তনত্বের রাজটীকা ললাটে আঁকিয়া লইয়া যাহা কিছুই এই পৃথিবীতে টিকিয়া থাকে, তাহাই হইতেছে সত্য; আর অন্তর-ভাবনায় যে-নিগূঢ়তম সত্য ধরা পড়ে তাহাই হইতেছে ভাবসত্য। যে-ফুলটি ফুটিয়া উঠিয়া আমাদের দৃষ্টির সীমানায় মেলিয়া ধরিয়াছে তাহার রূপের অঞ্জলি—ক্ষণিকের দেখা সেই বিশেষ ফুলটির রূপ বহুদিন আমাদের স্মৃতির জগতে তাহার পুষ্পসত্তাকে জমা রাখিয়া দিতে পারে—এই জমা রাখাটা একদিক দিয়া সত্য; আর তাহার অন্তরলোকে সে-সুরভির ঐশ্বর্য, যাহা আমার মনের দুয়ারে আসিয়া একটি ভাবাকুলতার স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া গেল, একটি মদির লগ্নের অন্তরঙ্গতা দিয়া আমার কাছে চিরদিনের জন্য আবেদন জানাইয়া গেল যে,—ইহাই হইতেছে সব চেয়ে বড় জিনিস যাহার ক্ষয় নাই, রূপান্তর নাই, স্মৃতি-বিস্মৃতির আলো-ছায়া হইতেও তাহার শাশ্বতত্বকে প্রকাশ করিতে কোন কুণ্ঠা নাই—সেই গোপনে থাকা সুরভি-সত্তার সে প্রাণময়তা তাহাই হইতেছে ভাবসত্য। সত্য যদি হয় ফুলের পাপড়ি—ভাবসত্য হইতেছে ফুলের বুকের রসমধু। সত্য যদি হয় নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের নীল বারিধারা, ভাবসত্য হইতেছে সেই সমুদ্রের বুকের রসে-ভেজা মণি-মুক্তা। সত্য প্রাণলোকের, ভাবসত্য অন্তর-জগতের। অনুভূতিময় মানস-চেতনায় রস-আনন্দের সে-লীলা মাধুরী, তাই তো ভাব।

অনুভূতির মধ্যে তাই ভাবসত্য এবং ভাবসত্য সাহিত্য লোকের মর্মধ্বনি। এই ধ্বনি ও ছন্দের সঙ্গে কবি-হৃদয়ের ধ্যান-মন্থিত আদর্শ লইয়াই গড়িয়া ওঠে কবির একটি ভাবলোক। এখানে আছে অরূপের ধ্যান এবং মানস-আস্বাদনের একটি রস-মধুর পটভূমিকা। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার স্বপ্ন-কামনা লইয়া সে জীবনসত্য আমাদের মর্মলোকে বাসা বাঁধে, এই ভাবলোকই সেই জীবন-বোধের সত্যকারের প্রতিষ্ঠাভূমি। সত্যের চিরঞ্জীব আলোকে এখানেই হয় সুন্দরের অভিষেক উৎসব। বৃহত্তর জীবন-সত্য নিজেকে প্রকাশ করে রস-সাধনার মাধ্যমে। ভাবলোকের ধ্যানশ্রীর মধ্যেই আছে বিশ্বজনীন সত্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনার সংকেত-রেখা। নক্ষত্র বিশ্ব-হৃদয়ের সঙ্গে অনুভবের মানস-মগ্নতার দ্বারা নিজের মধ্যে বিশ্বমানবীয় সত্তাকে যেমন উপলব্ধি করা যায়, তেমনি গভীরতর সত্যের সঙ্গে উচ্চারণ করাও চলে—

> বিশাল বিশ্বে চারিদিক হ'তে
>
> প্রতিকণা মোরে টানিছে,
>
> আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
>
> শত কোটি কর হানিছে। (রবীন্দ্রনাথ)

অন্তর-মিলনের ভাব-সাধনায় কবির ছন্দ-সংগীতে এই সত্যই জাগিয়া উঠে।

পৃথিবীর সমস্ত সত্যই আত্মপ্রকাশ করে অনুভূতির মাধ্যমে; কবি-সাহিত্যিক একটু বিশেষ ধরণের অনুভূতিশীল এবং প্রকাশক্ষম বলিয়াই সেই সত্যকে সকলের সামনে তুলিয়া ধরিতে পারেন। বৈদিক ঋষি-কবি তাই বলিয়াছেন—'কবির্মনীষী পরিভূঃস্বয়ম্ভূঃ।'

ভাবসত্যের সঙ্গে আর একটি যে সত্যের কথা মনে পড়ে, তাহা হইতেছে রূপসত্য। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পথে ইন্দ্রিয়ের দ্বারে আসিয়া বস্তুজগতের যে-রূপ তাহার অভিনন্দনটি পাঠাইয়া দেয়, তাহাকেও তো প্রত্যক্ষ না করিয়া উপায় নাই। আমাদের প্রাণের তীর্থভূমিতে এই যে রূপের সঙ্গে জীবনের নিত্য দর্শন, ইহাকেও স্বীকৃতি না দিয়া পারা যায় না। বিভোর তন্ময়তার এক মাধবী

মন্ত্র এই রূপের মধ্যেও ছড়ানো আছে—কিন্তু কবি-মনে যখন একটি গভীরতম পিপাসার আকুলতা রূপলোককে ছাড়াইয়া কোন এক অনির্দেশ্য ঠিকানায় পাড়ি দিতে চায়, তখন আর কবি-মন সেই রূপময় আবেষ্টনীতে থাকিয়া কিছুতেই শান্তি পায় না। কবি যেন তখন তাঁহার রূপ-কামনার বর্ণলেপনে নিজের অন্তরকে রাঙাইয়া জীবনাতীতের সন্ধান পাইতেছেন না—অথচ তাহা তাঁহাকে পাইতেই হইবে। তাঁহাকেই তো আমাদের এই মৃত্যুময় পরিবেশের উপর বিতরণ করিতে হইবে অমৃতলোকের নিত্যপ্রসাদ! একদিকে রূপলোক তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতেছে একটি সীমাবন্ধনে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে চিরন্তন সত্যবোধের প্রাণসঞ্চয় হইতে;—অন্যদিকে অনায়ত্ত লাবণ্যের উদার বিস্তৃতি একটি স্বপ্ন জাগাইয়া দিয়াছে তাঁহার চোখে, কি যেন এক অজানা সত্য-সমুদ্রের জোয়ার-বার্তা সংকেতিক হইয়া উঠিয়াছে চেতনার দিগন্তে। কবি তাই রূপলোকে অপূর্ণতার যে-দীনতা, তাহাকে সরাইয়া রাখিয়া পরিপূর্ণতার অমৃত আহরণ করিবার জন্য আকুল হইয়া ওঠেন এবং তাঁহার মানস-জগতে গ্রহণ করেন ভাব-সাধনার ধ্যানশ্রীকে। কবির মানসিকতার বাসন্তী রঙে রাঙিয়া ওঠে নূতন আনন্দে-গড়া ভাবলোকটি। এই ভাবলোকেই তিনি তাঁহার বাস্তব-জীবনের মানস-অভিজ্ঞতা ও ভাবসাধনার ধ্যানময়তা দিয়া জীবন ও জগতের সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান। অনুভূতির গাঢ়তায় যেমন নূতন করিয়া পরিচয় ঘটে তাঁহার নিজের সত্তার সঙ্গে, তেমনি নিবিড়তম সত্যোপলব্ধির মুখোমুখী দাঁড়াইয়া শেষ করিয়া দিতে চান অন্তরের সমস্ত প্রগল্ভ চাঞ্চল্যকে। তাই ভাবসত্যের যে জগৎ, সে-জগৎ স্থির গম্ভীর এক প্রশান্তির জগৎ।

জীবনের একটি ব্যবহারিক দিকও আছে—সে-দিক বহু সমস্যা-জড়িত, বহু বিক্ষোভের তাড়নায় উত্তাল। বহির্ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অন্তরের গভীরে বহু ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং সেখান হইতে অন্তশ্চারী ফল্গুর মতো বহু রক্তই ঝরিয়া পড়ে। ম্যাকবেথ যখন ব্যবহারিক জীবনের উন্নতির জন্য বিশেষ তৎপর হইয়া ওঠে এবং বলে—

> Our fears in Banquo
> Stick deep; and in this royalty of nature
> Reigns that which would be feared.…

তখন দেখি বস্তুজগতের নিত্য নৈমিত্তিক তাগিদে তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে হিংসাদ্বেষের বা কুটিলতার মানবিকতা; এবং পার্থিব সম্পদের জন্য এক অত্যুগ্র আকাঙ্খা। এই দিকটাকেও উপেক্ষা করিবার উপায় নাই, ইহা ব্যবহারিক জীবনের সত্য। কিন্তু সেই ম্যাকবেথকেই জীবনের বহু রক্তাক্ত অধ্যায় রচনা ও ভাগ্য-বিপর্যয়ের দুঃখবেদনা সহ্য করিবার পর যখন বলিতে শুনি—

> Out, out, brief candle!
> Life's but a walking shadow, a poor
> Player that struts and frets his hour upon
> the stage
> And then is heard no more.

তখনই বুঝিতে পারি, জীবনের দুঃখবেদনার অতল হইতে এক বিরাট অভিজ্ঞতার সত্যকে সে সঞ্চয় করিয়া লইয়াছে। বেদনাময় মুহূর্তটিতে চক্ষে তাহার অশ্রু নাই, কিন্তু কণ্ঠের আর্ত চীৎকারের সঙ্গে অন্তর-অনুভূতির গভীরতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই করিয়াই ব্যবহারিক জীবনের রূঢ় সত্যের ধাপ ছাপাইয়া ভাব-জীবনের সত্য আসিয়া দেখা দেয়। সাহিত্য সেই ভাব-মুহূর্তের সত্যটিকেই পরম সম্পদরূপে তাহার প্রাণ-ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া রাখে; আর সেই সত্যের পথ-প্রদীপেই দীপ্তোজ্জ্বল করিয়া তোলে রসসন্ধানীর দিনগুলিকে।

ভাব অনির্বচনীয়, এই জন্যই তাহার মধ্যে একটি অসীমের আকুতি আছে। বন্ধনরেখার সীমায়িত পরিবেশকে ছাড়াইয়া কোন্ অসীমের রহস্যকে কবি ধরিতে চান। বাইরের রূপ-জগতের সমস্ত খণ্ডকে, বিচ্ছিন্নতাকে এড়াইয়া একটি অখণ্ড জ্যোতির্ময় ব্যাপ্তিকে কবি তাঁহার ভাবের ডোরে বাঁধিতে চান। বিশ্বজগতের চেতনাবৃন্তে বাসনা-কামনার যে-পুষ্পস্তবকটি ফুটিয়া রহিয়াছে,—ফুটিয়া উঠিতেছে প্রাণধারার যুগযুগান্তরের পথরেখা ধরিয়া—সেই বাসনা-কামনার পুষ্প-সুরভির যে বিপুল বিস্তার, তাহার মধ্যেও কবি অসীমতার ভাবকেই প্রত্যক্ষ করেন। সে-প্রেমাস্পদকে ঘিরিয়া অন্তরের শত আকাঙ্ক্ষা রাত্রিদিন গুঞ্জন করিয়া ফিরে, তাহাকে সারাজন্ম দেখিয়াও যেন দেখার শেষ হয় না! তাহাকে পাইয়াও যেন শেষ

পাওয়ার সন্ধান মিলে না! তখন শুধু এই ভাব—'জনম অবধি হম রূপ নিহারল, নয়ন ন তিরপিত ভেল।'

আনন্দ-গভীর কোন বিশেষ লগ্নে প্রিয়জনটির সমস্ত পরিচয় লাভ করিয়াও অপরিচয়ের ছায়াপথে তাহাকে রাখিয়া দিয়া মন তাহার প্রেম-যাত্রায় তাহাকেই শুধু প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। আবার তাহারই বিরহে প্রেম দেহের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ভাবের অসীমতায় পড়ে ছড়াইয়া। তখন শুধু—'পন্থ নেহারিতে নয়ন আন্ধাওল দিবস লখিতে নখ গেল।' আর—'অনুখন মাধব মাধব মুখরইত সুন্দরী ভেল মধাই।' কিন্তু এই বিরহের মধ্যেই বিরহিণী তাহার প্রিয়তমকে লাভ করিলেন অন্তরের ভাবলোকে। যে ছিল পূর্বে তাহার আলো-আঁধারের সংশয়-দোলায়, সে আসিয়া ধরা দিল অনুভূতির সত্যবন্ধনে, সেখান হইতে কখনো আর তাহাকে হারাইতে হইবে না। মুগ্ধ-আলিঙ্গনের ভাব-সৌন্দর্যে ভরপূর হইয়া উঠিয়াছে তাহার মন। শ্যামল ঘন রসরূপের ধ্যান-গভীরতায় এই যে মিলন-ভাবের সত্য, এই সত্যের মধ্য দিয়াই ঘটে প্রেমিক প্রেমিকার ভাব-সম্মেলন। প্রেম-সমস্যার উৎসব-অঙ্গনে প্রাণ-প্রদীপটি ওঠে জ্বলিয়া এবং অন্তরের ভাববৃন্তে পুষ্পস্তবকের মত প্রিয়তমকে ফুটাইয়া লইয়া রাত্রিদিন তাহারই আরতি চলে;—আর কণ্ঠে বাজিয়া ওঠে স্বতস্ফূর্ত ছন্দ-ঝংকার—

মরদক চান্দ মরিস তোর মুখ রে।
ছাড়ল বিরহ আঁধারক দুখ রে। (বিদ্যাপতি)

এবং

বঁধু হে, আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ-বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেখানে তোমাকে থোব॥ (জ্ঞানদাস)

চাওয়া-পাওয়ার একান্ত সাধনায় এমনি করিয়াই ভাবসত্য আনিয়া ধরা দেয়। বিরহ-বেদনার আঁধার লগ্নটিতে চির আকাঙ্ক্ষিত কাছে নাই, তাঁহাকে পাওয়ার চেতনায় বাঁধিয়া রাখার যে-ভাব, ইহার মধ্যেও লুকাইয়া আছে অজস্র সান্ত্বনার নিবিড়তা। তাই বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে এই সত্যটি এমনি করিয়াই ধরা পড়িয়াছে—সমুদ্র-পিয়াসী তরঙ্গ-দেহে যেমন করিয়া ধরা পড়ে সুদূর মিলনের আবেশ-মাখানো শিহরণ!

ভাব-সত্যকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের চোখের সামনে দেখা দেয় একটি সুঠাম সুন্দর আনন্দ-ঘন ভাব-মূর্তি। যাহাকে আমরা চোখে দেখি নাই অথচ যাহাকে ভাবিতে ভালো লাগে, তাহার একটি স্নিগ্ধ-সুন্দর মূর্তি আমাদের মনে স্বতঃই ভাসিয়া ওঠে। কবি-কল্পনার আনন্দলোকে যাহার আসনই হইয়াছে প্রতিষ্ঠিত, আমাদের চেতন-সত্তায় দোলা দিয়া যায় যাহার জীবন-সাধনার মর্মবাণী, তাহার ভাবরূপটিকে লইয়াই আমাদের মনের রাসলীলা চলিতে থাকে। হৃদয়-জগতে এ-টুকু না করিয়া লইলে আমরা যেন শান্তি পাই না। অন্তর-ভাবনায় যে জীবন-সাধকের সত্য আসিয়া ধরা দেয়, সেই সত্যকে লইয়াই আমাদের মনের চিরদিনকার কারবার। কেননা, ভাব মানুষের অন্তরের এবং অন্তরের বলিয়াই চিরদিনই ধাবিত হয় সত্যের দিকে। সেই সত্যবোধই তাহার একটি বিশেষ রূপকে আমাদের মনের পটে আঁকিয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়লগ্না শ্রীরাধিকাকে বিভিন্ন বৈষ্ণব কবি নিজস্ব ভাবদৃষ্টি দিয়া আঁকিয়া তুলিয়াছেন। যিনি যেমন হৃদয়গত ভাবাদর্শের ভিতর দিয়া ভাবিয়াছেন, তেমনি ভাবের তুলিকায় বর্ণসঞ্চার হইয়াছে শ্রীরাধিকার ভাবমূর্তিতে। বিদ্যাপতি পূর্বরাগিণী শ্রীরাধাকে যে-দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহা হইতেছে—

আচর ধরইতে কার লউলি লাজভার
নমইত মুঁহক উপাম।
ন জানাঞা কমল জাঞা কমল নাল মাঞা
কমল মমোলল কাম॥

আর পূর্বরাগের সুগভীর ব্যাকুলতা বুকে বহন করিয়া চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা—

আউলাইয়া বেণী ফুলায় গাঁথনি,
দেখয়ে খসায়া চুলি।
হসিত বদনে, চাহে মেঘ পানে,
কি কহে দু'হাত তুলি।

এ-রাধা যেন নিরভিমান অনুরাগের স্বপ্নবিহ্বল সুরভির মত চির-আরাধ্যের রূপের সঙ্গে সকলের অলক্ষ্যে মিশিয়া যাইতে চাহিতেছেন। একজনের শ্রীরাধায় ভোগরাগের অরুণিমা, আর একজনের শ্রীরাধায় সর্বত্যাগের ভিতর দিয়া ধ্যানমুগ্ধতা। বৈষ্ণব কবি-মানসের ভাবারাধনার ভিতর

দিয়া শ্রীরাধার ভাবমূর্তি এমনি করিয়াই রসের অভিষেক লাভ করিয়াছে।

শ্রীরাধার প্রেম-ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গের ঢল ঢল ভাবমূর্তিও বৈষ্ণব কবির ভাবলোকে সত্য-চেতনার বৃন্তটিতে ফুলের মতই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের প্রেম-সাধনার ইতিহাসে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবমূর্তি যেন চির-সত্যের জয় ও সাফল্যের স্বাক্ষর। হৃদয়োৎসবের হর্ষমুখর আঙিনায় যে-অপূর্ব শান্ত-শুচি তপস্যার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহারই আরতি-গান জাগিয়াছে ধ্যানের আবেগ-ভরা ছন্দ-মাধুর্যে—

ভাবে ভরল হেন তনু অনুপাম রে
অহনিশি নিজ রসে ভোর।
সঘন যুগলে প্রেম, জলে ঝর ঝর রে,
ভুজ তুলি হরি হরি বোল॥
নাচত গোঁর কিশোর মোর পহুঁ রে
অভিনব নবদ্বীপ চাঁদ॥ (গোবিন্দদাস)

যে-রূপকে কবি অন্তরের ধ্যানের জগতে বরণ করিয়া লইয়াছেন আবেগময় ব্যাকুলতার সঙ্গে, মর্মলোকের ভাব-সাধনায় যে-রূপসজ্জার প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন রাত্রিদিন, সেই সাধনার সত্যরূপটি এমনি সুললিত হইয়াই ধরা দিয়াছে কবির ছন্দপথে। যে-রূপের জন্য ছিল ভাবনার প্রেরণা, তাহাই আনন্দময়তার শিহরণের মধ্যে পথ করিয়া লইয়া শুধু ভাবময় হইয়াই রহিল না, চির-সত্যের আভাটুকু গ্রহণ করিয়া সকলের চোখের সামনে এক শাশ্বত মূর্তি ধারণ করিল। ইহা যেন ভাবের খাতে বহিয়া যাওয়া রূপ-কল্লোলের চিরদিনকার ধারা-প্রবাহ। নিত্য প্রশান্তির অপরিহৃত দীপ্তিময়তা।

এই ভাবলোকের সত্যের পথ ধরিয়াই বিশ্বকবির কাব্য-জগতে জাগিয়া উঠিয়াছে 'মানস-সুন্দরী' ও 'উর্বশী' মূর্তি। নিখিল ধরণীর রূপ-রস-গন্ধের তরঙ্গ-দোলায় কবি-প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছে যে-বিচিত্র অনুভূতি, তারই প্রকাশময় রূপ এই মানস-সুন্দরী। জন্ম-জন্মান্তরের বহু বেদনা-বাসনাময় যে-ভাবসাধনা তাহাই নারীপ্রতিমা হইয়া আসিয়া উঠিয়াছে কবির কাব্যালোকে। ভাব-জগতের সহজ সৌন্দর্যবোধের স্বচ্ছতায় সে-রূপের যেমন অপরূপ উদ্ভাসন, তেমনি বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মীর সঙ্গে মিশিয়া যাইয়া কাব্যলক্ষ্মীরূপে কবির আত্মার জগতে সে সত্যরূপিণী। অনুভাবের সত্যের ডোরে বাঁধা পড়িয়াছে আনন্দ-চেতনার রূপমাধুরী। প্রেমবোধ ও সত্যবোধের যেন এক অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে এই রূপ-মাধুর্যের আবেশ-নিবিড়তায়। তাই তাহার—

মৃণাল পরশে,
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি ওঠে মর্মান্ত হরষে।

সেই বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্যের পরশ প্রকাশের যে-সত্য, সে-সত্যকে অনুভূতির রাজ্যে গ্রহণ করিয়া কবি দীর্ঘদিন সংগোপনে লালন করিয়াছেন, 'উর্বশী' তারই বিকশিত মাধুর্যময়ী রূপ। বিশ্বসৌন্দর্যের সর্ববন্ধনমুক্ত রূপ-ভাবনাকে কবি মুক্তি দিয়াছেন 'উর্বশীর' রূপ-কল্পনায়। 'মানস-সুন্দরী' কবির অন্তর-জগতের ভাব-সাধনার ধ্যানময়তায় মধুময়ী, 'উর্বশী' অখণ্ড সৌন্দর্যের মোহনীয়তায় অপরূপা। কবির উপলব্ধিগত ভাবসত্যের বৃন্তবন্ধনে যেন দুইটি পদ্মকলিকা। যখনই কবির ভাবের আনন্দ-সত্তায় 'উর্বশী' ধরা দিয়াছে,—তখনই কবিকে বলিতে শুনি—

মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।

সৌন্দর্যের পাদপদ্মে কবি-হৃদয়ের সত্য-অনুভূতির অঞ্জলি এমনি করিয়াই ঝরিয়া পড়িয়াছে যুগে যুগে।

এই সৌন্দর্যধ্যানের সত্যের পথটি ধরিয়াই কবি দেখিতে পান নারীসত্তার কল্যাণীরূপকে, দেখিতে পান বিশ্ব সংসারের নির্মল শুচিতা ও সহনশীলতার অপূর্ব এক প্রতিমাকে। সেই কল্যাণী শরীর শুভ্রতাকে কবি একেবারে মনের অন্তরঙ্গ করিয়া নেন ভাব সত্যের আলোকে,—আর বলেন—

সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে। (রবীন্দ্রনাথ)

ভাব-সত্যের মাধ্যমেই কবি-হৃদয়ের আত্মোপলব্ধিও ঘটে। যা' আছে কবির একান্ত অগোচরে, আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নে, তাই একদিন একখানি উজ্জ্বল সুন্দর আভাসের রূপ ধরিয়া আকস্মিক সত্যোপলব্ধিতে ধরা দিয়া কবিকে যেন একেবারে

আকুল করিয়া তোলে। যিনি অখিলরসামৃত মূর্তি, চির জীবনের বাঞ্ছিত ধন, তিনি কখনো সাংসারিকতার, অজ্ঞানতার সীমাবন্ধনে মানবকে চিরদিনের জন্য বাঁধিয়া রাখিতে পারেন না। তিনি উপস্থিত হন তাঁহার অসীম লোক হইতে মানব-হৃদয়ের দ্বারদেশে এক উদগ্র মিলন-পিপাসা লইয়া। পার্থিব ধনকে বড় করিয়া লইয়া কবি যাহাকে চিরদিন অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন, তিনিই একদিন এক মহারাজার দীপ্তোজ্জ্বল বেশে কবির কাছে আসিয়া 'আমায় কিছু দাও গো' বলিয়া হাত বাড়াইয়া দেন। ঝুলি হইতে একটি মাত্র ছোট কণা সেই মহারাজার হাতে তুলিয়া দিয়া কবি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সেই দিনের ভিক্ষার মাঝে একটি সোনার কণা রহিয়াছে। দুর্লভ সৌভাগ্যের একটি স্পষ্ট ইংগিত লইয়া সোনার কণা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে অবহেলার সঙ্গে তুলিয়া দেওয়া সেই তুচ্ছ পদার্থটি। কবির আত্মার জগতে জাগিয়া উঠিল যেমন এক সন্ধানের আবেগ, তেমনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া এই উপলব্ধিই দেখা দিল যে, নিজের জন্য কিছুই রাখিলে চলিবে না, সকলই বিলাইয়া দিতে হইবে সেই পরম প্রার্থিতকে। নিজের ভাবনার মধ্যে যখন এই সত্য আসিয়া দেখা দেয়—তখনই কবি দুইটি চোখে অজস্র জল ভরিয়া লইয়া বলিয়া উঠেন—'তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে।' এই আকুলতা-ভরা কথাগুলিতে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে আত্মোপলব্ধির এক অনায়াস অভিব্যক্তি। ভাব-সত্যের পথ ধরিয়াই কবির জীবনে দেখা দিয়াছে এই উপলব্ধির অরূপসত্তা।

সাহিত্যে তাই ভাবসত্যের মাধ্যমে এমনি করিয়া ধরা দেয় বিশ্বসত্যের রূপ-মাধুরী। রস-সাধনার ভাবময়তায় আনন্দরূপের চিরন্তন বিকাশলীলা এমনি করিয়াই ঘটে।

অতীন্দ্রিয়

শ্রীআদিত্যনাথ মিশ্র

হৃদয় যমুনা তটে আজো শুনি মুরলীর সুর
কোন যুগ-যুগান্তের পরিচিত প্রেমের আহ্বান,
অতীন্দ্রিয় জগতের প্রেমানন্দে মন ভরপুর
ধূলার ধরণী সেই সংগীতে কি দিবে না সম্মান ?
জীবনের আঙিনায় নেমে আসে গোধূলির ছায়া
জীবিকার কাছে তুচ্ছ জীবনের অমূল্য-সম্পদ,
প্রাত্যহিক দুঃখ-দৈন্যে বেড়ে চলে ঐহিকের মায়া
স্বার্থের রঙীন নেশা ঢেকে রাখে মনের গলদ।
কৌমুদী বিধৌত নিশি ; স্বপ্নে শুনি বাজে ব্রজ-বেণু
অকস্মাৎ মনে জাগে বিরহিনী প্রিয়ার আকুতি ;
সৃষ্টির মৌলিক তত্ত্বে প্রতিভাত যে রূপের রেণু
হৃদয় মুকুরে দেখি সে রূপের তীব্র অনুভূতি।
বাজুক মুরলী তবে থেমে যাক ব্যথার ক্রন্দন
মূর্তিমতী কবিতায় দেখা দিক বিরহিণী-প্রিয়া,
ধরণীর প্রতি অঙ্গে ওঠে যদি প্রেমের স্পন্দন
সংগীতে মুখর হবে যুগান্তের পিপাসার্ত হিয়া।

সন্ধ্যার গঙ্গা

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

সন্ধ্যার গঙ্গার তীরে একবার এলে
যে শান্তি—আশ্বাস-তৃপ্তি অনায়াসে মেলে,
মনে হয়—তাকে ফেলে রূঢ় সহরের
ঘরে গিয়ে জীবিকা ও প্রাণ ধারণের
প্রাণান্ত প্রয়াসে ব্যস্ত হব নাকো আর ;
এখানে প্রাণের ঘর রয়েছে আমার।

হাওড়ার ব্রিজের 'পরে লক্ষ দীপ্ত তারা
শান্ত-তৃপ্ত জীবনের আনে যে ইশারা
পাই না তা সহরের কংক্রিটে-পাষাণে ;
মুক্ত বায়ু-স্পর্শে, স্নিগ্ধ তরঙ্গের গানে
যে প্রেম, যে শান্তি ঝরে, তাকে কোন দিন
পাবে কি এ দ্বন্দ্ব-ভরা সহর রঙিন ?

ভাবি,—কবে রক্ত-ক্ষরা সহর জীবন
হবে স্নিগ্ধ প্রেমে এই গঙ্গার মতন।

প্রতিভা-পরিচিতি

কবি-বন্ধু গ্যেটে ও শিলার

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জোহান ফন গ্যেটে যে-জার্ম্মানীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-জার্ম্মানী আজকের জার্ম্মানী ছিল না। তখন সে দেশে না ছিল রাজনৈতিক চেতনা, না কোন দলগত ঐক্য, না বা কোন স্বদেশ-প্রেমের প্রকাশ! প্রজারা ছিল যেমন মেরুদণ্ডহীন তেমনি ভীরু। চরিত্রবলের কোন বালাই ছিল না দেশের মধ্যে। পরবর্ত্তীকালের বিখ্যাত লেখক লেসিং সেই সময়কার দেশের কথা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লিখেছিলেন—"জার্ম্মান জাতির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে তাদের কোন চরিত্র নেই।"

দেশের মধ্যে কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠান নেই। সাহিত্য শিল্প বা ঐতিহ্য, এসব বড় বড় কথা জার্ম্মানরা চিন্তা করে না। তারা খায় দায় ঘুমোয় আর বংশ বৃদ্ধি করে। জার্ম্মানীর এই তমসাচ্ছন্ন যুগে ১৭৪৯ সালের

ইতালীর যাদুঘর-সংলগ্ন উদ্যানে চিন্তামগ্ন গ্যেটে

২৮শে আগষ্ট গ্যেটে তদানিন্তন রাজধানী ফ্রাংকফোর্টের এক সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাপ-মায়ের একমাত্র পুত্র ছিলেন তিনি। কাজেই আকাশের-চাঁদ-চাওয়া গোছের আবদারের প্রশ্রয় পেতেন খুবই। ফলে, বাল্যে লেখাপড়ায়—যাকে বলে অষ্টরম্ভা। কিন্তু যেমন ছিলেন ডেঁপো বা এঁচোড়ে-পাকা, তেমনি ছিলেন বুদ্ধিমান। অঙ্ক, গান, চিত্রাঙ্কন, লাতিন ও হিব্রু, বেশ কিছু কিছু শিখে নিয়েছিলেন অল্পবয়সেই। রীতিমতোভাবে স্কুল কলেজের ধরাবাঁধা লেখাপড়ার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হলে, কৃতী ছাত্ররূপে তিনি যে বিশেষ সাফল্য ও সম্মান লাভ করতেন তাতে সন্দেহ নেই।

ফ্রাংকফোর্টে যতপ্রকার সমাজ ছিল তার সকলগুলির মধ্যেই তাঁর অবাধ মেলামেশা, মধ্যযুগীয় আড়ম্বরপূর্ণ ধনী ইহুদি, টাকার কুমীর মহাজন, ভ্রাম্যমান অভিনেতার দল, ধর্ম্মযাজক এবং দোকানদার, সকলের কাছেই তিনি ছিলেন সমান প্রিয়। গ্যেটের এই লোকপ্রিয়তা তাঁর সমগ্র জীবনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গ্যেটে তাঁর একমাত্র পুত্রকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন

একদল ফরাসী অভিনেতা সে-সময় ফ্রাংকফোর্টের প্রধান রঙ্গালয়ে তাদের অভিনয়ের আসর বসিয়েছিল। তাদের সঙ্গে মিশে গেলেন বালক গ্যেটে। পঞ্চদশ লুইর প্রবল প্রতিপত্তি তখন সারা ইউরোপে পরিব্যাপ্ত, ফরাসী আর্ট, কৃষ্টি এবং আদবকায়দা তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ফরাসী সভ্যতার ছোঁয়াচ লাগল গ্যেটের মনে। থিয়েটারের বাতিক

ঢুকলো মাথায়। বারো বছর মাত্র বয়স, কিন্তু ওই বয়সেই তিনি রংচঙা জামা গায়ে দিয়ে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে বড় বড় অভিনেতাদের পার্টগুলি হুবহু নকল ক'রে আবৃত্তি করতেন।

বাপ দেখলেন, ছেলে তো গোল্লায় যেতে বসেছে। গ্যেটের যখন ষোল বছর বয়স তখন তাঁকে এক রকম জোর করেই লাইপ্‌জিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল। পিতার ইচ্ছা ছিল, পুত্র আইন পাশ করে শহরের রাজনীতিক্ষেত্রে একজন গণমান্য নাগরিকরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। পুত্রের বুদ্ধি এবং জ্ঞানলিপ্সার প্রতি প্রগাঢ় আস্থা ছিল তাঁর।

কিন্তু লাইপ্‌জিগে গিয়ে গ্যেটে তাঁর অধ্যাপকদের স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন, কূটকচালে আইনের কচকচি তাঁর ধাতে সইবে না, তিনি পড়বেন সাহিত্য, শিল্প এবং কাব্য।

এইখানে তরুণ বয়সেই গ্যেটে প্রথম প্রেমে পড়েন। মেয়েটির নাম ছিল কিটি শোওন্‌কফ্‌।

গ্যেটের এক জীবনীকার বলেছেন, গ্যেটে বহুবার প্রেমে পড়েছেন,

ফ্রেডারিক ফন শিলার

এক নারী থেকে অন্য নারীতে তাঁর হৃদয়ের অর্ঘ নিবেদন করেছেন, তাঁর মনের এই ভাবপ্রবণ ও রোমাণ্টিক প্রবৃত্তি তাঁর জীবনের একটি বিশেষ বৈচিত্র্য। গ্যেটে বহু নারীর মধ্যে খুঁজেছিলেন এমন একজনকে যে শুধু তাঁর কল্পনায় বিরাজিত ছিল। তাঁর ভালবাসার পাত্রীদের উপর তিনি তাঁর মনের রং আরোপ ক'রে তাদের এক স্বর্গীয় জ্যোতির্ময় লোকে স্থাপনা করে তাদের পূজা করতেন। তাই তাঁর ভালবাসা ছিল নিষ্কলুষ এবং অতীন্দ্রিয়।

* * *

লাইপজীগে শরীর টিক্‌লো না। বাড়ী ফিরে এলেন। দু'বছর পরে ১৭৭০ সালে গ্যেটে ষ্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের পড়া শেষ করতে গেলেন। ষোলো মাস তিনি ষ্ট্রাসবুর্গে ছিলেন। সেই ষোলো মাস তাঁর জীবনের সন্ধিক্ষণ বলা যেতে পারে, সেই সময় তিনি প্রথম শেকস্‌পীয়রের রচনার সঙ্গে পরিচিত হলেন। ষ্ট্রাসবুর্গে আর একজন চিন্তাশীল মনীষী তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করলেন। তাঁর নাম হার্ডার। তিনি গ্যেটের চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। হার্ডারের কাছে গ্যেটে নূতন জীবনবেদের সন্ধান পেলেন, শুনলেন, স্থূল জীবনের ঊর্দ্ধে উঠ্‌তে হলে চাই কৃষ্টির সাধনা। হার্ডারের এই নূতন তত্ত্ব গ্যেটের জীবনে যেন এক নব আলোকের দ্যুতি সঞ্চারিত করল। তিনি আত্মকৃষ্টির সাধনায় মগ্ন হলেন। এই সাধনাই তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবিত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হোতে সহায়তা করেছে। এই সাধনাই তাঁর জীবনের নিগূঢ় পরিচয়।

অনেকদিন ধরেই এলোমেলোভাবে লিখছিলেন তিনি। ষ্ট্রাসবুর্গে ব'সে একখানি মধ্যযুগীয় রোমান্‌স্‌ লিখলেন, নাম, 'গট্‌জ্‌ ফন বার্লিচিংগেন।' ১৭৭৩ সালে সেই বই প্রকাশিত হল।

সাহিত্যিক খ্যাতি বা জনপ্রিয়তার প্রতি তিনি কোনদিনই লোলুপ ছিলেন না। সে-কারণে যা লিখেছেন তা-ই ছাপাবার জন্যেও তাঁর ব্যগ্রতা ছিল না। সেই সময়েই তাঁর মনে জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ "ফষ্ট"-এর পরিকল্পনা দানা বেঁধেছিল। কিন্তু সেই বই ১৮৩১ সালের আগে (প্রায় ষাট বছর) প্রকাশিত হয় নি।

আইনের উপাধি নিয়ে গ্যেটে ষ্ট্রাসবুর্গ থেকে ওয়েজলার নামক স্থানে আইন ব্যবসায়ের জন্য গেলেন। সেইখানে ছিল সদর আদালত। হাজার হাজার মামলা সেই আদালতে জমা হয়েছিল। মামলা আর মামলা! হৈ হৈ কাণ্ড। সারাদিন দম ফেলবার ফুরসৎ নেই। অসহ্য লাগল গ্যেটের! এই কি তাঁর জীবনের সাধনার পরিণতি? দিনের পর দিন এই মিথ্যার জাল বোনা, দিনকে রাত আর রাতকে দিন করা? মামলা ফেলে চলে গেলেন নদীর ধারে। চাই নির্জ্জনতা, চাই নূতন প্রেরণা।

আলাপ হল এক তন্বী সুষমামণ্ডিতা যুবতীর সঙ্গে, তাঁর নাম, লটি বাফ। হানোভার রাজদপ্তরের এক বড় কর্ম্মচারী কেস্‌ট্‌নারের সঙ্গে লটি বাগদত্তা হয়েছিলেন। কিন্তু তাহলেও বন্ধুত্ব নিবিড় হ'তে বাধা ঘটল না। উভয়ে উভয়ের মধ্যে অনেক মিল অনেক ঐক্য লক্ষ্য ক'রে পুলকিত হলেন, এমন কি দু'জনের জন্মতারিখটি পর্য্যন্ত ছিল এক—২৮শে আগষ্ট।

* * *

কাটলো কিছুকাল।

ইয়োরোপের মনোরাজ্যের উপর দিয়ে তখন প্রবল ভাবপ্রবণতার ঝড় ব'য়ে চলেছে। গ্যেটের মনের উপরেও তার ধাক্কা এসে লাগল। "ওবার্দার" নামে যে উপন্যাসখানি তিনি সে-সময় লিখেছিলেন তার ছত্রে ছত্রে সেই ভাবপ্রবণতা ফুটে উঠেছিল। বর্ত্তমান যুগে সেই কাহিনীর মর্ম্মবেদনা আর হতাশা হয়ত মনে তেমন সাড়া জাগাবে না। কিন্তু সে-সময় সেই বই তাঁর দেশের মধ্যে প্রশংসা এবং দীর্ঘশ্বাসের তুফান তুলেছিল বললেই হয়। ইংলণ্ড তখন রিচার্ডসনের "পামেলা" প'ড়ে কাঁদছে, "নুভেল হেলোয়েস" লিখে রুসো ফ্রান্সকে অভিভূত করেছেন, জার্মানীও "ওয়ার্দার" প'ড়ে দুঃখের বিলাসে অবগাহন করল।

পর পর বই লিখছেন। কাটতিও হচ্ছে প্রচুর। কিন্তু কোন্‌টি তাঁর সত্যিকার পেশা? সাহিত্য না আইন? আত্মকৃষ্টির সাধনায় ছেদ পড়ে নি। কিন্তু কিসের উদ্দেশ্যে সেই সাধনা? গোটে যেন দিশেহারা বোধ করতে লাগলেন। ফিরে গেলেন ফ্রাংকফোর্টে। অস্থির মন, অনিশ্চয়তা এবং দ্বিধায় ভারগ্রস্ত।

মনে মনে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারছিলেন না, ঘটনাচক্র তাঁকে সেই সিদ্ধান্তের পথে ঠেলে নিয়ে গেল।

একদিন সন্ধ্যা বেলা এক অপরিচিত আগন্তুক তাঁদের বাড়ির দরজায় এসে টোকা দিলে।

—কাকে চাই?

—যোহান গোটে থাকেন এই বাড়ীতে?

—থাকেন। এখন বাড়ি নেই।

—দয়া ক'রে তাঁকে বলবেন যে উইমারের ডিউক তাঁর সাক্ষাৎ-প্রার্থী। কাল সকালে যদি তিনি ডিউকের সঙ্গে দেখা করেন তো ডিউক বিশেষ সুখী হবেন।

বলে গেল বার্তাবহ। বাড়ী ফিরে গোটে সংবাদটি শুনলেন। উইমারের ডিউক কার্লঅগাষ্ট, আঠারো বছর তাঁর বয়স, প্রকাণ্ড এক খণ্ড-রাজ্যের মালিক, তিনি সফরে বেরিয়ে এই তল্লাটে এসে গোটের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছেন। অদম্য কৌতূহল নিয়ে গোটে পরদিন যথাসময়ে ডিউকের কাছে উপস্থিত হলেন। প্রথম কথাই হল—"আপনিই 'ওয়ার্দারের' লেখক? আপনাকে অভিনন্দন জানাই। বহুবার বইখানা পড়েছি। তবুও যেন তৃপ্তি পাইনি।"

ডিউকের কথা শুনে কৃতার্থ বোধ করলেন গোটে। ধন্যবাদ জানালেন। বহুক্ষণ ধরে বহু আলাপ হল। তারপর নিমন্ত্রণ। তাঁর সঙ্গে উইমারে গিয়ে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্যে ডিউক গোটেকে আমন্ত্রণ ও অনুরোধ জানালেন।

১৭৭৫ সালের নভেম্বর মাসে গোটে ডিউকের সঙ্গে উইমারে গেলেন। এক নাগাড়ে সেখানে র'য়ে গেলেন দশ বছর!

রাজসভায় গোটের জনপ্রিয়তার অবধি রইল না। সুন্দর চেহারা, সুরসিক, কবি এবং অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র ও কৃষ্টিসম্পন্ন যে-ব্যক্তি, তাঁকে পছন্দ না করবে কে? প্রথম রাজ্যপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হলেন সর্ব্বসম্মতিক্রমে। তারপর নিযুক্ত হলেন যুদ্ধমন্ত্রীর পদে। ১৭৮২ সালে ডিউক তাঁকে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ খেতাব দিয়ে সম্মানিত করলেন।

ছ'বছর মহা আনন্দে কাটলো। ডিউক সম্মান করেন গোটেকে। গোটে ভালবাসেন তাঁর তরুণ মনিবকে। ছোট একটি খণ্ডরাজ্য, কোন গোলমাল নেই, সুতরাং সে-রাজ্য শাসন করাতেও নেই কোন হাঙ্গামা! রাজকার্যের পর বিস্তীর্ণ অবসর কাটতে লাগল নাচ গান এবং অভিনয়-ব্যবস্থার আয়োজনে। দু'জনের মধ্যেই ছিল থিয়েটারের প্রবল শখ্। প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চ তৈরী হল। গোটে নাটক লিখতে লাগলেন এবং ডিউক সেই সব নাটকের প্রযোজনা ক'রে আনন্দ লাভ করতে লাগলেন। চোখের পলকে যেন ছ'বছর কেটে গেল।

বালক শিলার তাঁর সাথীদের পুতুল-নাচ দেখাচ্ছেন

তারপর গোটে হঠাৎ একদিন অনুভব করলেন, অনেক সময় যেন বৃথা নষ্ট হয়েছে, তাঁর সাধনা থেকে তিনি বিচ্যুত হয়েছেন, যে সাহিত্যকে তিনি জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করেছিলেন তাকে তিনি বেবাক বিস্মৃত হয়েছেন, চুটকি নাটক আর রংদার প্রহসন লিখে তিনি তাঁর সাহিত্য-দেবতাকে অপমান করেছেন।

সুরম্য বাগানবাড়ীর বন্ধনদশা অসহনীয় বোধ হল তাঁর। মুক্তি চাই। হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোনখানে। গোটের মনের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে মানসমুক্তির সেই চিরন্তন সুর—আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।

১৭৮৬ সালে ডিউকের কাছে ছুটি নিয়ে বিচিত্র এক ছদ্মবেশ ধারণ করে গোটে ইতালির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

ইতালীতে গিয়ে গোটে যেন পৃথিবীকে নূতন করে চিনলেন। ইতালীর প্রাকৃতিক শোভা, শিল্প আর ভাস্কর্য্য তাঁকে অভিভূত করল। সারা জীবনের সাধ তাঁর পূর্ণ হল। নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলেন তিনি। কবিত্বের যে প্রতিভা তাঁর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল তার পূর্ণ বিকাশ ঘটল।

কিছুদিন পরে উইমারে ফিরলেন। কিন্তু পূর্ব্বের মতো আর রাজসভায় আসন গ্রহণ করলেন না। রাজকার্য্যের কোন দায়িত্ব আর তাঁর

কাম্যও নয়। তিনি চান নির্জ্জন গৃহকোণ, যেখানে বসে তিনি ষোড়শোপচারে কাব্যলক্ষ্মীর বন্দনা করতে পারবেন। ডিউক তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। গোটের জন্যে নির্দ্দিষ্ট করে দিলেন একটি নিরালা প্রাসাদ। অরূপরতনের কামনায় গোটে রূপসাগরে ডুব দিলেন।

একদিন সকালে সেই প্রাসাদে এলো একটি মেয়ে। তার ভাই একটি চাকরির জন্যে এক আবেদনপত্র লিখেছে। সেই আবেদন-পত্রে গোটের একটি সই প্রার্থনা করল সেই মেয়েটি। সে কাছেই থাকে। শুনেছে গোটের খ্যাতি। তাই সে তাঁর কাছে এসেছে। মেয়েটি বললে, বড় আশা করে সে আবেদনপত্রটি এনেছে, তার আশা আছে, গোটের স্বাক্ষর পেয়ে আবেদনপত্রটি ধন্য হবে।

মেয়েটির পানে ভাল ক'রে তাকালেন গোটে। মাথাভরা সোনালী রঙের কোঁকড়াচুল, জ্বলজ্বলে দুটি চোখ, কমনীয় মুখে প্রসন্ন ঊষার দ্যুতি,

শিলার গোটেকে তাঁর লেখা প'ড়ে শোনাচ্ছেন

ঠোঁটের কোনে প্রাণচঞ্চল হাসির রেখা। মুগ্ধ হলেন গোটে। আলাপ হল। কাছেই থাকে মেয়েটি আর তার দাদা। মেয়েটির নাম ক্রিশ্চিয়েন ভাল্‌পিয়াস। আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করে দিয়ে গোটে বললেন—আবার এসো। আবার এলো মেয়েটি। পরিচয় ক্রমে নিবিড় হল। ১৮০৬ সালে গোটে ক্রিশ্চিয়েনকে বিবাহ করলেন। একটি পুত্রসন্তান নিয়ে তাঁদের দাম্পত্য জীবন চিরদিন অনাবিল সুখশান্তির মধ্যে কেটেছে।

*　　*　　*

গোটের সঙ্গে শিলারের প্রথম আলাপ হয় ১৭৯৪ সালে। দুই প্রতিভাধর কবি ও সাহিত্যিক যেদিন মুখোমুখি দাঁড়ালেন সেদিন দু'জনেই কাব্যসৃষ্টির প্রেরণায় উদ্দীপিত, চঞ্চল। গোটে দেখলেন, অপার্থিব জ্যোতি শিলারের তীক্ষ্ণ দু' চোখে, চোখের দৃষ্টি যেন অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত পৌঁছোয়, বিরাট এক জিজ্ঞাসা যেন তার সামনে মূর্ত্তি ধরে দাঁড়িয়েছে।

শিলার দেখলেন, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের মত এক বিশাল ব্যক্তিত্ব তাঁকে যেন আচ্ছাদিত করতে চাইছে। সেই পর্ব্বতের গাত্র থেকে প্রতিভার যে কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, মনকে অভিভূত করে।

হাতে হাত মেলালেন দু'জনে। কী আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা? প্রশ্ন করলেন দু'জনে দু'জনকে। একই প্রশ্ন এবং একই তার উত্তর।

তোমারও যে কামনা আমারও তাই। জার্ম্মান সাহিত্যে দুই অপ্রতিরোধ্য শক্তির মিলন ঘটল সেদিন। নানা বিষয়ে মতের অমিল সত্ত্বেও দুই বন্ধুর প্রাণের প্রীতি চিরদিন অটুট ছিল।

শিলার ছিলেন কাজের মানুষ, গোটে ছিলেন ভাবের। কিন্তু এক বিষয়ে দু'জনে ছিলেন এক মত, দুজনেরই ছিল এক লক্ষ্য, শিল্প যে একটি বিপুল শক্তি, জীবনের অলংকার নয়, শিল্প জীবনের বেদ, ধর্ম্মের মতোই তা সাধনা-সাপেক্ষ, এই সত্য উভয়েই মেনে নিয়েছিলেন।

১৭৫৯ সালে ওয়ার্ত্তেমবার্গ নগরে শিলারের জন্ম। তার বাবা ছিলেন সেনা-বিভাগের ডাক্তার। ছেলেবেলা থেকেই ধর্ম্মের প্রতি শিলারের প্রবল আকর্ষণ ছিল। কিশোর বয়সেই ধর্ম্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে আনন্দ পেতেন তিনি। কিন্তু পিতা চেয়েছিলেন, পুত্র তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করুক। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিলার প্রথমে আইন তারপর ডাক্তারি-শিক্ষায় শিক্ষালাভ ক'রে একুশ বছর বয়সে সেনাবিভাগের শল্যচিকিৎসকরূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করলেন।

কিন্তু শান্তি পেলেন না মনে। ছুরির ফলার চেয়ে কলমের ডাক তাঁর মনের মধ্যে দিন দিন প্রবলতর হ'য়ে বাজতে লাগল। সেনানিবাস থেকে একদিন পালিয়ে গেলেন তিনি। তারপর সাত বছর ধ'রে নানা রঙ্গালয়ের জন্যে নানা ধরণের নাটক লিখে কিছু কিছু রোজগার ক'রে জীবিকানির্ব্বাহ করতে লাগলেন। অবশেষে উইমারের ডিউক তাঁকে আশ্রয় দিলেন এবং ১৭৮৯ সালে তাঁরই চেষ্টায় শিলার জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন।

গোটের সঙ্গে শিলারের যখন মিতালি ঘটল তখন গোটের বয়স পঁয়তাল্লিশ। শিলার তাঁর চেয়ে দশ বছরের ছোট। বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধুর তাগাদায় গোটে অস্থির হলেন। আজ কি লেখা হল শুনি? না, না, না-লিখলে চলবে না। প্রত্যহ লেখা শুনতে হবে, শোনাতে হবে।

১৭৯৬ সালে দুই বন্ধু মিলে একটি বই লিখলেন—জেনিয়েন। সেই গ্রন্থের মধ্যে জার্মানীর পণ্ডিতমূর্খদের প্রতি, বিদ্যাব্যবসায়ীদের প্রতি, এবং সমাজ-ভণ্ডদের প্রতি যেসব শ্লেষ এবং বিদ্রূপ ছিল তা দেশের লোক সহসা সইতে পারল না। চারিদিকে সমালোচনার ঝড় উঠল। কিন্তু সে-ঝড়ে প্রকাণ্ড দুই বনস্পতি একটুও হেলে পড়ল না। ধুলো উড়িয়ে ঝড় গেল চলে। তারপর সে-ঝড়ের সূচনা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের নামে জয়ধ্বনি শোনা গেল দিকে দিকে।

অতঃপর সাহিত্যরসিক ও গুণীর সমজদার উইমারের কার্ল অগাষ্টের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় দুইবন্ধু পাঁচ বছর নিবিড়তম যোগাযোগের মধ্যে তাঁদের সাহিত্যসাধনায় ব্যাপৃত রইলেন।

গোটে সমাপ্ত করলেন 'ফষ্ট'। শিলার লিখলেন 'ওয়ালেনষ্টেন,' 'উইলহেলমটেল' এবং আরও অনেক বই।

*   *   *

১৮০৫ সালের একদিন।

সকাল থেকে গোটেকে বড় বিমর্ষ এবং চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে। শিলার এসে পাশে বসলেন। ব্যাপার কি? কথা নেই কেন গোটের মুখে? ক্ষণেক পরে মুখ তুলে তাকালেন তিনি। দুই চোখে বিহ্বলতা। বললেন, ক'দিন থেকে তিনি অনবরত দুঃস্বপ্ন দেখছেন, ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার ছায়া দেখছেন তিনি, তাঁর মনে হচ্ছে, শরৎকালের আগেই তিনি বা শিলার দু'জনের একজন মারা যাবেন!

হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন শিলার। বললেন—আজ আর সাহিত্যচর্চ্চা নয়, আজ তোমার সঙ্গে রসচর্চ্চা করব। চিন্তার ভারে তোমার মাথার গোলমাল হয়েছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই কিন্তু গোটের কথা ফলে গেল। দু'জনেই গুরুতর অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। দিনকয়েক পরে শিলার একটু সুস্থ হ'য়ে রুগ্ন বন্ধুকে দেখতে এলেন। শিলারকে দেখে গোটের পাণ্ডুর মুখে পরম সুখের দীপ্তি ফুটে উঠল। কম্পিত দুহাত তুলে তাঁকে আলিঙ্গন জানালেন ইঙ্গিতে। সেই তাঁদের শেষ সাক্ষাৎ। দু'চারদিন পরে শিলার আবার শয্যা নিলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিরনিদ্রায় অভিভূত হলেন।

সেরে উঠলেন গোটে। কিন্তু আরোগ্যলাভ ক'রে এ কোন্ নূতন জগতে তিনি এসে দাঁড়ালেন? ধু ধু মরুভূমি চারিদিকে। দিগন্ত-বিস্তীর্ণ নিঃসঙ্গতা! শিলার নেই। একথা যে ভাবা যায় না! বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল আনন্দ, চলে গেল লেখার প্রেরণা, চলে গেল জীবনের সমস্ত সোনালী রং।

কাটলো কয়েক বছর। ১৮০৮ সালে গোটের সঙ্গে নেপোলিয়নের পরিচয় হল। তারপর মা গেলেন মারা। স্ত্রীও চলে গেলেন একান্ত অকস্মাৎ। শেষ বন্ধু এবং সান্ত্বনার স্থল ছিলেন কার্ল আগষ্ট, উইমারের ডিউক! তিনিও যেদিন হৃদরোগে আক্রান্ত হ'য়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, সেদিন একেবারেই ভেঙে পড়লেন গোটে। আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালেন বারেক। দিন ফুরিয়ে গিয়েছে। রাত্রি নামল। যে-রাত্রির শেষ নেই। যে-রাত্রিতে জীবনের কোন কাজ নেই, নেই কোন স্পন্দন। সেই রাত্রির পারে অপেক্ষা করছে শিলার, অপেক্ষা করছে ক্রিশ্চিয়েন।

১৮৩২ সালের ২২শে মার্চ্চ বিরাশি বছর বয়সে সজ্ঞানে শান্তচিত্তে আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বসে ধীরে ধীরে গোটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

অনুতাপ

শ্রীঅঞ্জলি দেবী

তোমার পূজার ছলে করেছি যে অবহেলা
বুঝেছি সে কথা আজ; জীবনের সায়াহ্ন বেলা
হৃদয় কাঁদিয়া মরে—মরণ শিয়রে করি।
অনুতাপ আর পাপে নিয়েছে যে ভরি
জীবনের শূণ্য ভাণ্ড! তাই ওগো প্রিয়তম
এবারের মত মোরে ক্ষম, তুমি ক্ষম!
কেড়ে নাও আজ তুমি সম্মানের সিংহাসন
রাজার প্রাসাদ আর অতুল ঐশ্বর্য্য ধন।

দাও মোর হাতে তুলে ভিখারীর ভিক্ষা ঝুলি
আর যেন কভু আমি তোমারে নাহি ভুলি।
এবারের ভুল লয়ে চলিয়াছি পর পারে—
তবু আশা জাগে মনে সরমেতে বারে বারে
মৃত্যুর আঁধার ছাড়ি যবে হেরিব আলোক
নয়নে বহিবে অশ্রু আর হৃদয়ে পুলক,
তুমি আছ সেথা নাথ, স্মিতহাস্যে দাঁড়ায়ে
মোর লাগি, কোমল তব চরণ দুটি বাড়ায়ে।

১৯

তখনও ভোরের আলো ভালো করে ফোটেনি—সৌরভী এসে ভগবতীর দুয়োর ঠেলে ডাকছে, বউদি—বউদি গো, দোর খোল না গো—

—হঠাৎ এত ভোরে দোর ঠ্যাঙ্গাঠেঙ্গি কেন ঠাকুরঝি? কাল যে ভীম একাদশী গেছে—জান না?

—আহা এ বার্ত্তা যেন কারও জানতে না হয়!

মুখে কাল জলবিন্দুটি দিইনি—দাঁতে খড়কুটোও কাটিনি—একেবারে তোমাদের ঘরের মত নিরম্বু গো। তা অব্যেস তো নেই—ক্ষিদেয় নাড়ী যেন পাক দিচ্ছে! দাদাকে বলে রাখ—শীগ্‌গির করে সন্ধ্যে-আহ্নিক সেরে রাখুন—এখুনি ওঁকে জল খাইয়ে—তবে মুখে জল দেব।

তা উনি ছাড়া এ বাড়ীতে আরও অনেক বামুন তো আছে। কেষ্টর বাবাকে না হয়—

সৌরভী মুখ বিকৃত করে বললে, মুখে আগুন অমন বামুনের। এড়া কাপড় ছাড়ে না, দাঁত মাজে না, সন্ধ্যে-আহ্নিকের পাট নেই—পরণের কাপড়খানায় চিমটি কাটলে ময়লা বেরয়—ওরাও আবার বামুন। পেতলও তালে সোনা! তুমি আর জ্বালিও নি বউদি—দাদাকে বলে রাখ—আমি কাপড় কেচে জলখাবার নে আসচি এখুনি।... পেছন ফিরেই ঘুরে দাঁড়াল সৌরভী। ভগবতীর আরও কাছে ঘেঁষে—চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করে বললে, সেনদিদিরা যে চল্ল—চাটিবাটি তুলে দে। বলে হাওয়া খেতে যাচ্ছি। মেয়ে দুটোকেও বলে হাওয়া বদলাতে নে যাচ্ছি। তা বদলান হাওয়া, হাওয়া বদলে সুস্থ হলে শরীলও বাঁচে—মানও বাঁচে।

তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি নে।

কেন—কথাটা কি এমন শক্ত যে বুঝতে পারছ নি! তুমি তো আজুলি নও গো কেন বুঝবে না! ও যতই ঢাক ঢাক গুড় গুড় হোক ঢাকে ঢোলে কাঠি পড়লে উলু দিতে বাকী থাকে নি গো। দুই সোমত্ত মেয়ে—গানের মাষ্টার—রাত্তিরে বাড়ী ফেরে না—বন্ধুরা খাওয়ায়...তারপর নাতির মুখ দেখলে বুঝি সেনদিদি আমাদের সন্দেশ খাওয়াবে?

থাক—থাক—সকাল বেলায় ওসব কথা থাক।

বলি ক'টা মুখে হাত চাপা দেবে! যা রটে—তা বটে। এ বয়সে কতই দেখনু কতই শুননু। চোক-খাগীরা দোষ দেখে আমাদের। বলে মাছ খায় সব পাখী—ধরা পড়ে মাছরাঙা।

তুই তাড়াতাড়ি নেয়ে নিগে—না হলে লোক উঠলে কল খালি পাবিনে।

না—তা পাব কেন—রাত বারোটায় কলের মুখে ঘড়া বস্যে দে এসেছি না!

সৌরভী চলে গেল—ভগবতী ভাবতে লাগলেন, কেন... মানুষ...এমন?...সবাই জানা চেনা মানুষ—তবু একজনের সুখ্যাতিতে আর একজনের মুখ কালো হয়ে যায়, একজনের নিন্দায় অন্যজন আনন্দ পায়। যে কলঙ্ক মেয়েদের চরম দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি করে—সেই কলঙ্কের কালি একজন মেয়ের গায়ে মাখিয়ে আর একজন মেয়ে পরম আনন্দ লাভ করে! —কেন এই হিংসা—এই আনন্দ!

একটু পরেই নীচে থেকে সৌরভীর গলা শোনা গেল, ওমা ইকি কাণ্ড!...এই ভোর রাত্তিরে—এখনও কাক কোকিল ডাকে নি—সদর দরজা খুলে বেইরে গেল কে গো? না রাত্তিরে কেউ এসেছিল বুঝি—দোর দেয় নি!—

মঙ্গলার গলা শোনা গেল, সে কি গো মেয়ে—আমি বলে রাত বারোটায় দোর দিয়ে শুয়েছি—কেউ তো বাইরে

ছিল নি! কড়া নাড়ার শব্দও শুনিনি। তবে শীতকালের রাত—নেপকাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েছি, ঘুম না মরণ!

খোলা দুয়োর নিয়ে এমন অভিযোগ মাঝে মাঝে শোনা যায়—এ নিয়ে কেউ কৌতূহল প্রকাশ করে না। একটু পরে বাড়ীর সবাই উঠলে—কর্ম্মকোলাহলে এই তুচ্ছ অভিযোগ কোথায় মিশিয়ে যাবে।

নেয়ে ধুয়ে—কাটা ফলের থালা হাতে নিয়ে সৌরভী এল। ডাকলে, বউদি গো—ইদিকে এস।

ভগবতী বাইরে এসে বললেন, তোমার দাদার তো এখনও সারা হয় নি ভাই—

তা'লে বসি একটু। ফলের থালা হাতে নিয়ে সৌরভী উবু হয়ে বসল দোর গোড়ায়।

আহা—ওখানে বসলে কেন ঠাকুরঝি? তোমার দাদার পূজো পাঠ সারা হতে যার নাম একটি ঘণ্টা। তার চেয়ে এক কাজ কর—ফলটল ওঁয়ার হাতে দিয়ে যাও—উনি নারায়ণকে উচ্ছুগ্য করে প্রসাদ খাবেন।

—আহা—সেই ভাল—সেই ভাল। একসঙ্গে দেবতা বামুনের সেবা হবে—এ যে আমার পরমভাগ্যি! তা'লে ওঁয়াকে ডেকে দাও—

অমরনাথ দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেন। সৌরভী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ হাত দিয়ে ঘোমটা টেনে দিলে। তারপর দু'হাতে ফলের থালা এগিয়ে দিলে অমরনাথের দিকে। এই অবসরে অভ্যাসবশতঃ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ওঁর মুখের দিকে। মুহূর্ত্তমাত্র। অমনি মাঘের শীতের রাশীকৃত হিমকণা উত্তর বাতাসের কাঁধে চেপে—হু হু করে ঢুকে পড়ল এই সরু বারান্দাটিতে। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল সৌরভীর। এমন কঠিন নির্লিপ্ত মুখ কোন পাষাণ বিগ্রহে প্রত্যক্ষ করে নি ও। এমন মর্ম্ম-সন্ধানী দৃষ্টি—! তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম সেরে চলে গেল। পায়ের পানে খানিক চেয়ে থাকার বাসনাও আজ রইল না। তাড়াতাড়ি ছাদে এসে রোদ পোয়াতে বসল। ভুলে গেল কাল নিরম্বু উপবাসে কেটেছে—শরীরের স্নায়ু শিরায় ঈষৎ দুর্ব্বলতার বেগ—ক্ষুধাতৃষ্ণা তাদের স্বনিয়মে সৌরভকে পীড়ন করছে। কি গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি—নির্লিপ্ত অথচ সংহত, মৌন, গম্ভীর উজ্জল পাবক শিখার মত সর্ব্ব মার্জ্জনা দগ্ধকারী। পুরুষ এমন! কে জানে এতকাল দেবতার যে রূপ ছিল বাইরে—তা কি সৌরভীরই মনের প্রতিচ্ছায়া?···মদনমোহনের ত্রিভঙ্গে শ্রীরাধিকা—অভয়দায়িনী দুর্গার সঙ্গে কৈলাসেশ্বর শম্ভু, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের পদসংবাহনরত কমলা, ভয়ঙ্করী কালীর পদতলে যোগীশ্বর মহাদেব—এঁরা কেউ সুন্দর—কেউ ভয়ঙ্কর—কেউ পালক—কেউ রক্ষক। এঁদের মুখের পানে চেয়ে চেয়ে মনে হয়েছে—এঁরা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন—মঙ্গল করবেন—সঞ্চিত পাপও হয়তো ধ্বংস করবেন। একবার নয় বারবার ধ্বংস করবেন পাপ—তাই পাপের ভয়ঙ্করত্ব অন্যায়ের ভীষণত্ব মনকে বেশীক্ষণ মুহ্যমান করে রাখে নি।···আর আজ অটল গাম্ভীর্য্যের মহিমায় দৃপ্ত দৃষ্টি সৌরভীর সর্ব্বাঙ্গ লেহন করে···একে পৃথিবীর ক্লেদ মালিন্যের উর্দ্ধে তুলে দিলে—সে উর্দ্ধলোক থেকে নেমে আসা আর বুঝি সম্ভব নয়। ওই দৃষ্টির প্রহরায়···দিনরাত্রি যাপন করতে হবে—এমনি শুচিস্মিতভাবে—নিরম্বু উপবাসে···দেবমহিমার ধ্যান-ধারণা স্তব-পূজায়।

দু'হাত জোড় করে সৌরভী সূর্য্যকে প্রণাম করলে। হে দেবতা, মনের অন্ধকার দূর কর—অন্ধকার দূর কর।

কি গো সৌরভী রোদ পোয়াচ্ছ বুঝি? তা আজকাল অত মাগ্যি হলে কেন—বলত?

সৌরভী চমকে উঠল ওর স্বরে।···পাশের ছাদ থেকে ডাকছে···সান্তু মিত্তির—হাড়কেপ্পণ হরি মিত্তিরের একমাত্র ছেলে। এরা কলকাতার আদি-বাসিন্দা। নাকি সুতানুটি গোবিন্দপুরের জঙ্গল কাটিয়ে ওদের অতি বৃদ্ধ ঠাকুরদারা বসতবাড়ী করিয়েছিলেন।···কলকাতার অর্দ্ধেকখানি ছিল ওঁদের। ক্রমে বংশও বাড়তে থাকল—নানা রকমের উৎপাত আরম্ভ হল। একবার বর্গীর উৎপাতে ওঁরা ক'ঘর—এই মাঝখানের কলকাতায় সরে এলেন—। বড় বড় গাছ কেটে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিলেন—আর এক সময়ে—যখন নবাব সিরাজদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন। এমনি অনেক গল্প আছে মিত্তির বাড়ীর। হাতীর দাঁতের খেলনা থেকে গণ্ডারের চামড়ার ঢাল ও কাশ্মীরি শাল—কোনটার পিছনে নেই···মনরোচক গল্প? W-দেওয়া টাকা আছে পেতলের ঘড়ায়—চোর কুঠুরিতে আর বৈঠকখানার দেয়ালে গাঁথা আছে কত জীবন্ত মানুষ—হুকুম তামিল না করার অপরাধে। এ বংশের রক্তে মিশে

আছে—বাসনা পূরণের জিদ। যদি মনে সাধ জাগল—যেমন করে হোক তা পূরণ করবেই এরা।…এই সাম্বু মিত্তির…সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল সৌরভীর। তাড়াতাড়ি গায়ে মাথায় কাপড়টা টেনে দিয়ে নিজেকে সম্বৃত করে নিলে।

কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠল সাম্বু মিত্তির। ইস—যেন কুলের বউ হয়ে বসলি যে? তুড়ি দিয়ে গান ধরলে, 'কাদের কুলের বউ গো তুমি—কাদের কুলের বউ?'

সৌরভী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, বেহায়াগিরি করতে লজ্জা করে না!

লজ্জা-ঘেন্না-ভয়—তিন থাকতে নয়। এ বাবা যার তার বাক্য নয়। সব সাধুর সেরা সাধু রামকেষ্ট বলে গেছে। পরমহংস গো। পরমহংস মানে বুঝিস—আয় এখানে, মাইরি বলছি—ওঁর কথামৃত থেকে পড়ে তোকে বুঝিয়ে দেব।

তোমরা কেন যে এসব বই পড়!

ওসব বই তো আমরাই পড়ব রে। জানিস ভগবানের এক নাম পতিতপাবন। কিনা—যে পতিত তাকে কৃপা করাই হল ওঁর ধর্ম্ম। তেলা মাথায় তেল সবাই দেয়—রুক্ষ মাথায় যে তেল জোগায় সেই তো মানুষ। একথা ভগবান কেষ্ট অর্জ্জুনকে একবার বলেছিলেন। যীশু—সায়েবদের যে ঈশ্বর—সে পতিতাকে উদ্ধার করেনি? মেরি ম্যাগডালিনকে? বুদ্ধদেব সুজাতার পায়স খান নি? সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ব্যসবদত্তাকে সেবা করে নি?

সৌরভী উঠে বললে, তা বেশ করেছে। বলি অনেক কাল তো কত অকীর্ত্তি কুকীর্ত্তি করলে—আর কেন? বিষয় সম্পত্তি যা আছে—

—ইস্—ঠিক কুলবধূর মত লেকচার। পয়লা নম্বরের পতিব্রতা। তা যাক মাইরি—বিষয় কখনও থাকে এক জায়গায়? ও যে মা লক্ষ্মীর বাসা—এই এখানে—এই সেখানে। ঠাকুরদা উড়িয়েছে—বাবা উড়িয়েছে—আমি ওড়াচ্ছি—এর চূড়ান্ত করে যাব—বুঝেছিস? এ বিষ আর ছেলেদের জন্যে রেখে যাব না—এক পাই না।

ছেলেরা কি দোষ করলে? ওরা তোমার মত—

বল—বল—আমার মত লম্পট—মাতাল—দুশ্চরিত্র নয়? ওরে লম্পট মাতাল দুশ্চরিত্র মানুষ মায়ের পেট থেকে পড়ে হয় না। রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে বিষ—বংশের ধারা। তারপর আচার ব্যবহার—সঙ্গী সাথী—বনেদিয়ানা। আমিও লেখাপড়া শিখেছিলাম—গান বাজনা শিখেছিলাম—

তাই এমন হস্তিমূর্খ হয়েছ! লোকজন কেউ নেই—কার সঙ্গে মরছ বকর বকর করে?

ভারী মেয়ে কণ্ঠের স্বরে সৌরভী ছুটে পালাল ছাদ থেকে। সাম্বু মিত্তিরের বউ হরিলক্ষ্মী। যেমন মোটা শরীর তেমনি ভারি গলা—এ গলির ছাদে দাঁড়িয়ে ডাকলে—বড় রাস্তার মোড়ের মাথায় পৌঁছয়। চাঁচা ছোলা স্বর—কোথাও ভেজাল নাই। শোনা যায়—ঠিকুজি কোষ্ঠী মিলিয়ে হরি মিত্তির বউ এনেছিলেন—বংশের লক্ষ্মীশ্রী উথলে পড়বে বলে। কিন্তু ভাঙ্গা কার্নিসের অশ্বত্থ গাছটা এখন ভিতের মধ্যে জটাজুট নামিয়ে আকাশে সহস্র শাখা বিস্তার করেছে—হরি এবং লক্ষ্মী দ্বৈতশক্তি নিয়েও তা উৎপাটন করতে পারলেন না। বাড়ীর দুয়োর জানালা খসে খসে পড়তে লাগল—দেয়ালের পলস্তরা ঘুচিয়ে আদ্যিকালের গোবিন্দপুর তার প্রত্নতাত্ত্বীয় ইঁট বার করে হাসতে লাগল। পেয়াদা পুলিশ কাবুলিরা সদর দরজার কড়া নেড়ে নেড়ে ভিতের ইঁট আলগা করে দিলে, হরিলক্ষ্মীর গায়ের সোনা স্যাকরার সিন্দুকে উঠল—রূপো পেতল তামা কাঁসার বাসনগুলো ভেল্কী দেখিয়ে সিন্দুক ছেড়ে উধাও হল—তার বদলে আলমারি আর ছাদের কোণে জমতে লাগল—হরেক রঙের হরেক আকারের বোতল। লক্ষ্মী বউ কত আর সইবে! প্রথমে মৃদুস্বরে অনুনয় ক্রন্দন—পরিশেষে কলহ অভিশাপ। পরে নিষ্কাষিত সোনার মত পরিষ্কার হল হরিলক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর। লক্ষ্মীর আসনে বসাবার নাম করে যারা ওকে একদিন মিথ্যা আড়ম্বরে ভুলিয়েছিল—তাদের ভুলে থাকতে পারে নি হরিলক্ষ্মী। ওর সাধা কণ্ঠে নিত্য চলে অভিশাপ বর্ষণ—বনেদিয়ানার ইঁট ক'খানা গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে সুরকির মত ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে—গলির চারধারে—গলি ছাড়িয়ে বড় রাস্তার মোড়ে—সেখান থেকেও বুঝি বা আদি-কালীন সুতানুটি গোবিন্দপুরের কিম্বদন্তীর গায়ে।

এরা এমনি করে রসাতলে গেছে—তবু মান-মর্যাদার সহস্র ছিদ্র চাদরখানি খুলে ফেলতে পারে নি দেহ থেকে।

অন্ধ হরিমিত্তির আজ অবশ্য বেঁচে নেই। তাঁর শ্রাদ্ধের দায়েই বাড়ীখানা শেষবার মর্টগেজ হয়ে গেছে।

বাড়ীর ইতিহাস আর সান্থ মিত্তিরের বসন্ত-দাগ-ধরা মুখখানা যেন সৌরভীর পিছনে তাড়া করে এল।

নীচেয় এসে তবে বুকের কাঁপুনি থামে। এখানে যে দেবতার অভয়-পানি সমস্ত গ্লানিকে মুছে নেবার জন্য উগ্যত রয়েছে। দেবতার প্রশান্ত দৃষ্টি সমস্ত অশুচিকে নষ্ট করে দেবার জন্য দিনরাত্রির অতন্দ্র প্রহরী। দেবতা দূরে ঠেলছেন কাছে টানবার জন্যই। সমুদ্রের ঢেউ যেমন একই কালে দূরে ঠেলেও কাছে টানে।

দুয়োর গোড়ায় এসে ডাকল মৃদু স্বরে। বউদি, ঠাকুরের পেসাদ নিতে এলাম।

ওমা—এখনও জল মুখে দাওনি—ঠাকুরঝি? এস বস।

দুহাতে প্রসাদ নিয়ে মাথায় ঠেকালে সৌরভী। একটি ফলের টুকরো মুখে দিয়ে বাকিটা আঁচলে বাঁধল। বললে, দাঁড়াও বউদিদি—তোমাকে একটা পেরণাম করি।

২০

কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নামছে কেষ্ট—সিঁড়ির মাঝ পথে রমার সঙ্গে দেখা।

ওকে দেখে রমা বললে, একটু দাঁড়াবি ভাই কেষ্ট, একটা বরাত ছিল।

কেষ্ট ব্যস্তবাগীশের মত বললে, সন্ধ্যের পরে হলে হবে না?

না ভাই। দাঁড়া না—আমি আসছি। হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে এল রমা, এই নে দু'টো টাকা—ভাল ছিট কিনে আনিস তো দু গজ।

কেষ্ট টাকা দু'টি হাতে নিয়ে বললে, এক কাজ করলে হয় না রমাদি? টাকা দু'টো দিয়ে আজ চানাচুর কিনে আনি—তুমি প্যাকেটে ভরে দিতে পারবে না? না পার আমিই ভরে নেব'খন। কাল ওই চানাচুর বেচে তোমায় তিন টাকা এনে দেব—ফিফ্‌টি পারসেণ্ট লাভ। কেমন রাজী?

আমি যে সেলাই আরম্ভ করতে পারব না।

—আচ্ছা—তাহলে একগজ কাপড় আনি—আর এক টাকার চানাচুর। লাভ না দেখলে কেউই যখন বিশেস করে না—তুমিইবা করবে কেন!

—হাঁরে—তুই রোজ চানাচুর বিক্রী করিস?

কেন করব না। আমায় কি কেউ একটা পয়সা হাতে তুলে দিয়ে বলে—কেষ্ট জল খাস।

পড়াশোনা করিস কখন?

—পড়াশোনা! জান রমাদি, আমাদের মটো—লেখা-পড়া করে যেই—গাড়ী চাপা পড়ে সেই। কোন্ গাড়ী চান্! গোরুর গাড়ী। হাত দিয়ে গরুর গাড়ীর চাকা দেখিয়ে কেষ্ট হাসল।

কত চানাচুর রোজ বিক্রী করিস? রমাও হেসে বললে।

ওসব ট্রেড সিক্রেট—বলব না বোন—বল চট্‌পট—কি করব! এমন মেঘলা দিন—হু—হু করে কাটবে চানাচুর।

যা তোর ভাল মনে হয় করিস।

থ্যাঙ্ক ইউ রমাদি। এক লাফে কেষ্ট বাড়ীর বার হ'য়ে গেল।

রমা ভাবলে—মন্দ কি। কেষ্টর বাবা আছে—মা আছে; ওরা কেউ এক পয়সা দেন না বলে মাথা খাটিয়ে ও পয়সা রোজগারের ফন্দী বার করেছে। আমারও তো কেউ নেই। আশ্রয় যে পাবনা কোথাও ঠিক, তবে দু' এক পয়সার জন্য পরের মুখের পানে কেন চেয়ে থাকি। চানাচুর না হোক—তৈরী জামা সেমিজ বিক্রী করলেও তো টাকা আসে। দেখি কেষ্টকে বলে।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় কেষ্ট রমাকে ডেকে ওর হাতে দু'টো টাকা দিয়ে বললে। এই নাও—একশোয় একশো লাভ। আজ আর আমার কমিশন নিলাম না।

বেশ তো কমিশন নাও।

না—প্রথম দিন নেব না। বিশ্বাস না হলে তো পার্টনার নেওয়া যায় না। কিন্তু একটা কথা—তুমি যদি ঠোঙাগুলো সব ভরে দাও—দু'জনে মিলে অনেক লাভ করতে পারি রমাদি। দেবে?

দেব। এ দুটো টাকাও আজ নিয়ে যা।

আর আমার থেকেও নেব দুই। চার টাকার অনেক মাল হবে—অনেক লাভ দাঁড়াবে। আর দুদিনে যদি লাল হয়ে না যাই! কেষ্ট ছাদের ওপর এক পাক ঘুরে নেচে নিলে।

···রমাদির ও কেমন নেশা লেগে গেল। একটি সহজ পথ ওর সামনে কে বুঝি মেলে ধরলে। আত্মনির্ভরতার পথ। গভীর রাত পর্য্যন্ত জেগে ও ঠোঙা ভরে-ভরে তোলে। জামা সেলাইএর স্বপ্ন দেখে। রাশি রাশি জামা। যার লাভের কড়িতে কালো চকচকে একটি সেলাই কল কিনতে পারা যাবে অনায়াসে। তারপর···এর বেশী ভাবতে পারে না রমা। ওর বেশী আপাততঃ ভেবেও লাভ নাই। সংসারের আরও বহু কাজ আছে—এর বেশী ভাববার সময়ই বা কই।

সপ্তাহ শেষে হিসাব হ'ল—রমার ভাগে লাভ হয়েছে এগারো টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা। কাগজের দাম—আঠার দাম, কাঁচির দাম সব বাদ দিয়ে।

কেষ্ট বললে একটা রবার ষ্টাম্প কিনে আনব রমাদি—কাগজে ছাপা হবে—রমা জলপান।

দূর বোকা—মেয়েছেলের নামে বুঝি জলপান—

মেয়েছেলের নামেই তো বিক্রী বেশী হয়। লক্ষ্মী চানাচুরের কাটতি যদি দেখ—চক্ষু তোমার ছানাবড়া হয়ে যাবে। আর শ্রীপতির ধোঁকা। কি রকম হাঁকে জান—

ছোলার ডালের ধোঁকা,
খাবে এস খোকা,
যে না খায় সে বোকা।

কে আর বোকা হয়ে থাকতে চায় বল ?···

রমা বললে, চানাচুর বেচায় পরিশ্রম আছে—সবদিন সমান বিক্রী হয় না—জিনিস নষ্ট হয়েও যায়। তার চেয়ে আর একটা জিনিস বেচে দিতে পারবি ? তাতে পরিশ্রম কম—জিনিস নষ্ট হবার ভয় নেই।

কি—কি ?

আমি তো জামা-সেমিজ আণ্ডার-অয়্যার এই সব তৈরী করতে শিখেছি—যদি এগুলো বেচে দেবার ভার নিস—

চমৎকার আইডিয়া রমাদি—থ্যাঙ্ক ইউ। আমি নিশ্চয় পারব। আজই দাও—যদি কিছু তৈরী থাকে। গোলদীঘির রেলিঙে টাঙিয়ে রাখব—পুলিশ এলে সব না ঝোলায় পুরে দে সটকান। ফার্ষ্ট ক্লাস।

পুলিশে যদি কেড়ে নেয় ?

ইস—সে মন্তর আমি জানি! ওরা তো দেবতার জাত, পূজো পেলেই ঠাণ্ডা হয়। তা ছাড়া দোকান থেকেও অর্ডার নিয়ে আসব। সস্তা মজুরিতে পেলে কেন নেবে না ? আলবৎ নেবে।

প্রথম দিন বিক্রী হ'ল দুটো—দ্বিতীয় দিনে তিনটে ইজের দুটো ফ্রক। তৃতীয় দিনে একটিও নয়। সেদিন আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল। মাঘের শেষে বৃষ্টি। ধন্য রাজার পুণ্য দেশেই সম্ভব। ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহ চলছে; সরস্বতী পূজো আর দু'টো দিন পরে। সবাই বললে, দেবতাও ধন্য, জল নামাবার আর সময় পেলে না! খালি কষ্ট দেওয়া বইত নয় মানুষকে।

সেই বৃষ্টিতেই সেনদিদিরা পোঁটলা পুঁটুলি বাঁধছেন—কালই ওঁরা চলে যাবেন। লম্বা ছুটি, কতদিন কাটবে দেশে কে জানে! আমার এখানে আসবেন তো ? ঘর খালি থাকলে আসা সম্ভব। নতুবা না হক মাস মাস এককাঁড়ি টাকা ভাড়া গোণার কি বা মানে!

পুরুত গিন্নী বললেন, সবাইকে দেখছি—ইরাকে যেন কদিন দেখছি না ? অসুখ টসুক করল না কি!

না মা—ও মামার বাড়ী গেছে। আজ দু'হপ্তা হল।

তাই বল! যেদিন তোমাদের বাজনা ভাঙ্গল—তার পরের দিন থেকেই দেখিনি কিনা। তা মামাকে তো দেখলুম না আসতে। কত্তা বুঝি রেখে এলেন ?

হ্যাঁ। সেনদিদি একটা ঢোক গিলে অন্যদিকে চাইলেন।

···মামার বাড়ী—কাছে-পিঠে বুঝি কোথাও ? কারণ কত্তা তো দু'ঘণ্টা পরেই ফিরে এলেন দেখলাম।

হ্যাঁ—মানে উনিও যাচ্ছেন—ইষ্টিশানে দেখা মামার সঙ্গে। ব্যস—ট্রেনে আর চাপতে হল না।

আহা—একেই বলে ভাগ্যি! ভাগ্যিমানের বোঝা ভগমানে বয়। মুখ ফিরিয়ে হাসলেন পুরুত গিন্নী।

সেনদিদি উঠে গেলেন সেখান থেকে। বারান্দার এক কোণে ভগবতীকে পেয়ে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন বুকের মধ্যে। জড়িয়ে ধরেই—হু হু করে কান্না।

তুই আমার সত্যিকারের বোন—তোর কাছেই বলতে পারি সব কথা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সেনদিদি বললেন, সাজান সংসার নিজের হাতে ভেঙ্গে দিয়ে চলেছি ভাই—লোকের কাছে হাজারটা কথা বলছি বানিয়ে বানিয়ে—আমাকে কে যেন টুকরো টুকরো করে কাটছে বোন। এত বড় শাস্তি আমার কপালে লেখা ছিল—এ যে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি কোন দিন। পেটের ছেলের চেয়ে আপন কেউ নেই—শত্রুও কেউ নেই। ওরা বাঁচায়—মারে। না হলে যে হারমোনিয়াম সাধ করে কিনে দিলাম—তাই ইচ্ছে করে নিজের হাতে চুরমার করে ফেললাম। হারমোনিয়াম নয় ভাই—আমার সংসারও ওই সঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে! বহুক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে—বুকটা তাঁর হাল্কা হল। ভগবতীর চিবুক ধরে একটি চুমো খেয়ে বললেন, রেতের প্রাতঃবাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি—জন্ম এয়োস্ত্রী হও—। ছেলেমেয়েরা যেন কথার বাধ্য হয়—যেন ভগবান এদের সুমতি দেন। এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।

(ক্রমশ:)

ডাকের সাজ

নির্মল দত্ত

প্রতিমা সাজাতে ডাকের সাজ বাংলা দেশের কুটির-শিল্পের মধ্যে অন্যতম। ডাকের সাজ-এর নামের মাঝে যেমন একটা ডাক আছে, তেমনি আছে তার আভিজাত্যও। ডাকের সাজ দিয়ে প্রতিমা সাজালে প্রতিমার জাঁকজমক অনেক বেড়ে যায়, দেখতেও লাগে সুন্দর। তাই হয়ত এই সাজের নামকরণ করা হয়েছিল ডাকের সাজ।

ডাকের সাজের প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল নদীয়া জেলা থেকেই। নদীয়া জেলার উলার (বর্তমান বীরনগর) কাছে পালিতপাড়া নামক স্থানে কানাইলাল আচার্য ও নীলমণি আচার্য নামে দুই ভাই বাস করতেন। তাঁরাই প্রথম এই সাজের সৃষ্টি করেন। সেও প্রায় দু'শো বছর আগের কথা। দেবীমূর্তিকে নয়নমুগ্ধকর মূর্তিরূপে গড়তে হ'লে তার সাজেরও দরকার ঠিক সেইরকম। নদীয়ার মহারাজা ছিলেন সুন্দরের পূজারী। তাই তিনি প্রতিমার সাজকে জাঁকজমক পূর্ণ ক'রে তুলতে চাইলেন। মালাকররা পেল' তাঁর কাছ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা। সৃষ্টি হ'ল ডাকের সাজ। তারপর ধীরে ধীরে ডাকের সাজের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল নদীয়া জেলা ছাড়িয়ে বাংলা তথা বাংলার বাইরে অনেকদূর পর্যন্ত। প্রতিমা সাজের জন্যে ডাকের সাজের হাঁকডাক বেড়ে গেল—বেড়ে গেল এর চাহিদা। বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে বহু লোক আসতে লাগল এই কুটীর-শিল্পটির শিক্ষার জন্যে।

ডাকের সাজের প্রথম সৃষ্টি উলাতে হলেও কৃষ্ণনগরেই তার প্রধান কেন্দ্র হ'য়ে উঠল। কৃষ্ণচন্দ্র থাকতেন কৃষ্ণনগরে। তাই কৃষ্ণনগরই পেল' তাঁর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা। এই শিল্প থেকে বহু লোকের জীবিকা-নির্বাহ হ'তে লাগল। এমন কি, মেয়েরাও এই শিল্পটি থেকে বেশ উপার্জন করার সুযোগ পেল'। বাইরে না বেরিয়েও অসহায় মেয়েরা ঘরে ব'সে ডাকের সাজের বিভিন্ন জিনিস বিশেষ ক'রে জরির সুতো তৈরী ক'রে বেশ কিছু রোজগার ক'রে নিজেরাই নিজেদের জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারত। 'জরির সুতো' তৈরী করার কাজটা মেয়েদেরই একচেটিয়া ছিল, আজও কিছু কিছু আছে। তা ছাড়া গ্রামের চাষীরা পাতলা সোলার পাত তৈরী ক'রে আনত—মালাকররা অবশ্য নিজেরাও তা করত, কিন্তু চাহিদা বেশী হওয়ায় তারা অনেক কাজ অন্যান্যদের দিয়ে করিয়ে নিত। মেয়েরা বিভিন্ন সাজের ওপর মোম, বিরজার আঠা মাখিয়ে জরির সুতো, চুমকি প্রভৃতি লাগিয়ে দিত। কাজেই মালাকররা ছাড়াও আরও বহু ব্যক্তি এই শিল্পটি থেকে উপকৃত হ'ত।

ডাকের সাজের যে প্রধান প্রয়োজনীয় জিনিষ তা হচ্ছে জরির সুতো। এই জরির সুতো বিভিন্ন সাজের তারের কাঠামোর সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে কাজ করা হয়। জানা যায়, এই জরির সুতো আবার কৃষ্ণনগর ছাড়া আর কোথাও তৈরী হ'ত না। তখনকার দিনে প্রায় পাঁচ ছ'শ স্ত্রীলোক চরকায় এই সুতো কাটত এবং এই কাজ ক'রে তারা এক একজন এক টাকা থেকে দেড় টাকা পর্যন্ত রোজগার করত। জরির সুতো দু'তিনটি একসাথে পাকিয়ে ও কুচকিইয়ে নিয়ে জরি প্রস্তুত হ'য়ে থাকে।

প্রধানতঃ তিন রকমের সাজের দ্বারাই প্রতিমা সাজানো হ'য়ে থাকে—মাটির সাজ, শোলার সাজ ও ডাকের সাজ। এদের মধ্যে ডাকের সাজই সবচেয়ে বেশী জাঁকজমকপূর্ণ। প্রাচীনকালে ফুল দিয়েই প্রতিমা সাজানো হতো। তারপর আসে মাটির সাজ, ও তারপর শোলা ও ডাকের সাজ। ডাকের সাজ দিয়ে যে শুধু প্রতিমাই সাজানো হ'য়ে থাকে তাই নয়, যাত্রা থিয়েটারের সাজপোষাকেও ডাকের সাজ ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

ডাকের সাজ তৈরী করতে প্রথমে শোলার পাতের প্রয়োজন হ'য়ে থাকে। প্রথমে শোলা কাগজের মত পাতলা ক'রে প্রয়োজনানুযায়ী

ডাকের সাজের তৈরি মুকুট। তারের ফ্রেমের ওপর জরির সুতো প্রভৃতি জড়িয়ে এর সূক্ষ্ম কাজ করা হয়

কেটে নিয়ে তার ওপর বিরজার আঠা মাখিয়ে জরি, চুমকি, জামির প্রভৃতি বসানো হ'য়ে থাকে। এই কাজ করতে ধৈর্য ও মননশীলতার একান্ত প্রয়োজন হয়। এইভাবে বড় কল্কা, ছোট কল্কা, হীরাপিট, বলিষ্ট, ক্রাউন, ঝিনকোষ, শাড়ী, আঁচলা, সিঁথি, হাত, পা, কানের প্রভৃতি গহনা তৈরী হ'য়ে থাকে। এর মধ্যে আঁচলা ও মুকুটই সব চাইতে দেখতে সুন্দর। মুকুট তৈরী করতে প্রথমে তারের ফ্রেম তৈরী ক'রে নিতে হয়। এই ফ্রেমের ওপর জরির কাজ ও চুমকি প্রভৃতির কাজ করা হয়ে থাকে। ওপরের প্রতিমার অলঙ্কারগুলো সবই দেখতে বিশেষ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। 'রাং' ও 'তাবক' একসঙ্গে মিশিয়ে আওটি তৈরী হয়।

আগে ডাকের সাজ তৈরীর সরঞ্জামাদি সবই বিদেশ থেকে আমদানী

করা হ'ত। বর্তমানে সব এদেশেই তৈরী হ'য়ে থাকে। কিন্তু দাম তুলনামূলক হিসাবে যুদ্ধের সময়ের দামের চেয়ে অনেক কম হ'লেও পূর্বের চেয়ে অনেক বেশীই আছে।

ডাকের সাজ প্রধানতঃ ধনীর গৃহে প্রতিমা সাজাতেই ব্যবহৃত হ'ত। তাও সে চাহিদা কম ছিল না। কিন্তু বর্তমানে সে চাহিদা একেবারেই ক'মে গিয়েছে। তখন অনেক বাড়ীতে প্রতিমার সাজে মুকুট, আঁচলা ও

ডাকের সাজের একটি আঁচলা ও একটি ভিন্ন প্রকারের ছোট মুকুট

কানের গহনার সাথে সোনার গহনার মত পাথর সেট করাও হ'ত। কিন্তু বর্তমানে পাথর সেট তো দূরের কথা, ডাকের সাজ দিয়ে প্রতিমা সাজানোর ক্ষমতা কটা লোকের আর আছে? ডাকের সাজের মূল্য বেশী ব'লে মাটির বা শোলার সাজ দিয়েই আমাদের প্রতিমা অলঙ্করণের কাজ সেরে নেওয়া হচ্ছে। তাও ডাকের সাজের মূল্য এখন কমই হ'য়ে গিয়েছে এবং দাম কমে যাওয়ার সঙ্গে তার শিল্পদক্ষতার মানও অনেক নিম্নাভিমুখী হ'য়ে গিয়েছে।

পঞ্চাশ বছর আগেও কৃষ্ণনগরে কয়েক শ' ডাকের সাজ গড়া মালাকরের কারবার ও কারখানা ছিল এবং দুর্গাপূজার আগে সেই সব মালাকরের এক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৪০০।৫০০ ক'রে সাজ তৈরী হ'ত। কিন্তু বর্তমানে কৃষ্ণনগরে ডাকের সাজ-গড়া মালাকর ৩।৪ ঘর মাত্র আছে এবং তাও তাদের সকল সময় কাজ থাকে না। পূজোর সময় ছাড়া বছরের অন্য সময়টা কাজ অল্প থাকে বললেই চলে। কাজেই ডাকের সাজের শিল্পীদের উপার্জনও যৎসামান্য। বহুল সংখ্যক ডাকের সাজ আগে পূর্ববাংলাতেও রপ্তানী হ'ত। কিন্তু সে পথটাও বন্ধ। অন্যদিকে মানুষের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও তার সাথে রুচি পরিবর্তন ডাকের সাজের চাহিদা একেবারেই কমিয়ে এনেছে। অথচ একদিন বড় বড় গৃহস্থ বাড়ীতে ডাকের সাজের প্রতিমা গড়া না হলে যেন গৃহের মর্যাদাই রক্ষা হ'ত না। কিন্তু বারোয়ারী পূজার আধিপত্যের দিনে কুটীর-শিল্পের এই মর্যাদা আর কতটুকু? তার চেয়ে বিদ্যুতের আলোর জৌলুশ-এর মূল্য যেন আরও বেশী। হয়ত মাটির সাজের ওপর দু'চারটি চুমকি, আওটি প্রভৃতি লাগিয়ে তার ঔজ্জ্বল্যকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আসল ডাকের সাজ খুব কম ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। অথচ এই শিল্পটির বাজার থাকলে বহু পরিবারের তার থেকে জীবিকানির্বাহ হ'তে পারে। শুধু তাই নয়, এক একটি কারিগর দিনে ৬৲ টাকা থেকে ১০৲ টাকা পর্যন্ত উপার্জনও করতে পারেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারি শিল্পের সাথে সাথে কুটীর-শিল্পের উন্নয়নের চেষ্টাও চলছে। অন্যক্ষেত্রে ভারি-শিল্পের সাথে কুটীর শিল্প ঠিক পাশাপাশি চলতে পারবে কিনা এ নিয়ে মতান্তর থাকলেও ডাকের সাজের ক্ষেত্রে সে বিষয়ে কোন ক্ষতির কারণ হবে না। কারণ এ একটি এমন শিল্প যা হাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা ছাড়া কোন যন্ত্রে তা ক'রে নেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই শিল্পটির পেছনে যদি সরকারী অর্থের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা থাকে এবং বাজারের প্রসারলাভ ঘটে তা হ'লে শিল্পটিরই শুধু উন্নতি হবে না, বহু ব্যক্তি এই শিল্প-কার্যে নিয়োজিত হ'তে পারে। এর জন্যে জনসাধারণেরও সহানুভূতির প্রয়োজন।

রবীন্দ্র-প্রতিভার দিগ্‌দর্শন

শ্রীবিজলী দত্ত

বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা-প্রদীপ্তি, মনীষা, সকল দেশের, সকল কালের মানুষের এক পরম বিস্ময়। কোন দেশে, কোন কালে এতাদৃশ মণীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ—মনে হয় নাই। ক্ষণজন্মা মনীষীরা পৃথিবীতে এক বিশিষ্ট প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া কোনো মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা আমার জানা নাই।

রবীন্দ্রনাথ কি নন? তিনি কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, নাট্যকার, দার্শনিক—নৃত্যশিল্পী, সুরকার, চিত্রশিল্পী—বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, কর্ম্মী, ঋষি, সর্ব্বোপরি মানুষ রবীন্দ্রনাথ। শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম্ম, রাজনীতি—কিছুই তাঁহার বিপুল ব্যাপ্ত প্রতিভার পরিধি হইতে বাদ পড়ে নাই। বহুমুখী শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি প্রথম ও প্রধান, একক ও অপ্রতিদ্বন্দী।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ কবি—পৃথিবীর কবি, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি, অপরাজেয় গীতি-কবি। অদ্বিতীয় স্বপ্নবিলাসী, ভাবপ্রবণ, অন্তর্মুখী কবি রবীন্দ্রনাথ—যাঁর তুলনা একা তিনিই। রোমান্টিক কবির দৃষ্টিতে প্রকৃতি চিরসুন্দর। পৃথিবীর তরু-লতা, পাহাড় পর্ব্বত, মরু-কান্তার, বন-উপবন, গিরি-গহন, নদ-নদী, আকাশ-আলো সবই সুন্দর প্রাণময়। রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই পৃথিবী সুন্দর, মানুষ ও প্রকৃতি একাত্ম। তিনি লিখিয়াছেন—"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।" রোমান্টিসিজম্ বুঝিতে এক রবীন্দ্রনাথ পড়িলেই চলে, বিশ্বের আর কোন কবিকে পড়ার দরকার নাই। রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বযুগের সকল দেশের, সকল কালের, সকল কবির মিলিতরূপ।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নব স্রষ্টিকর্ত্তা রবীন্দ্রনাথ—আধুনিক বাংলাভাষা ও সাহিত্য বলিতে বুঝি রবীন্দ্রনাথকে, রবীন্দ্রনাথ বলিতে বুঝি আধুনিক বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে।

গীতিধর্ম্মী রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাই গানের রাজা—শুধু গানের রাজা নন, তিনি আনন্দের রাজা, সৌন্দর্য্যের রাজা, স্বপ্নের রাজা। তাঁর উপন্যাস ও গল্প সঙ্গীত-ধর্ম্মী। গানের সুরের রেশের মত কানে বাজিতে থাকে, মনে ভাসিয়া বেড়ায়।

বাংলা-সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রবর্ত্তক রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার হাতেই ইহা সম্পূর্ণতা লাভ করে। তাঁহার 'পোষ্টমাষ্টার', 'কাবুলিওয়ালা' 'ছুটি', 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা' মানুষের মনের চিরকালের খোরাক। গোরা, নৌকাডুবি, চোখের বালি, ঘরে বাইরে—বিশ্ব সাহিত্যের চির সম্পদ—নূতন আদর্শ, নূতন ভঙ্গি, নূতন দৃষ্টি। শেষের কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যে—ভাষায়, ব্যঞ্জনায়, বৈচিত্র্যে, সংলাপে, বর্ণনায়, মনস্তত্ত্বে—সম্পূর্ণ একক—'দেখি নাই, কভু দেখি নাই' পর্য্যায়ের। শেষের কবিতা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য—যাকে বলে Symbolic drama—বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন—তিনিই ইহার প্রবর্ত্তক। ডাকঘর, রক্ত-করবী, ফাল্গুনী—অপূর্ব্ব অদ্ভুত। Action অপেক্ষা Idea এই সকল নাটকের প্রাণবস্তু। হৃদয়ের রহস্যময় অনুভূতিরই প্রতিরূপ। রবীন্দ্রনাটকগুলি রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনের বাণী। তাঁর জীবন দর্শনের মূল কথা 'সীমার মধ্যে অসীমকে, রূপের মধ্যে অরূপকে উপলব্ধি করা'।

উপনিষদ-লালিত রবীন্দ্রনাথ। তিনি অসীমকে বুঝিয়াছিলেন, অসীমকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই তিনি অসীমের কবি। এই অসীমের আবির্ভাব, ভারতীয় দার্শনিকতার ছাপ, সেই 'একমেবাদ্বিতীয়মের'—চরণচিহ্ন তাঁর সাহিত্যে। তাই তাঁহার রচনাবলী সীমার মাঝে থাকিয়াও সীমাতীত, রূপের মাঝে থাকিয়াও রূপাতীত, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির মাঝে থাকিয়াও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি-সম্পন্ন। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার রূপরসময় পরিপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভগবানের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়াছেন, অণুপরমাণুতে তিনি তাহার জীবন দেবতার অনুভূতি পাইয়াছেন। উপনিষদের সেই "অশরীরং শরীরে স্বনবস্তেস্ববস্থিতং।" উপনিষদের জটিল দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বকে সহজ, সরল ভাষায় রূপ দিয়াছেন তিনি—"তত্ত্বের নিথরে যেথা বিথারিল রসের পাথার।"

রবীন্দ্রনাথ ললিতকলার একাধারে ধারক ও পোষক। কাব্যের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নৃত্য, সঙ্গীত ও চিত্রায়ন—রবীন্দ্র-প্রতিভার আর এক প্রকাশ। রবীন্দ্র-সংগীত ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। সঙ্গীতাকাশে রবীন্দ্র-সংগীত বর্ণাঢ্য রামধনুর ন্যায়ই অপূর্ব্ব।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রগুলিও প্রাণবন্ত। গীতি-কবিতার ব্যঞ্জনা ইহাদের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্র-প্রতিভা সমাজ-সেবায়ও সীমিত। সমাজের অনাদৃত, অবহেলিত নরনারীর দুঃখে তিনি দুঃখিত, ব্যথিত, মর্ম্মাহত। তিনি লিখিয়াছেন—

> হে মোর দুর্ভাগা দেশ যা'দের করেছ অপমান
> অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান
> মানুষের অধিকারে
> বঞ্চিত করেছ যারে
> সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
> অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন কর্ম্মী রবীন্দ্রনাথের পরিচয়।

"বাংলাদেশকে, বাঙালীর জীবনকে তিনি নূতনভাবে গড়িয়াছেন, নূতন মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সম্যকরূপে হৃদয়ংগম করিতে পারিলেই বাঙালী তাহার আত্মসাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবে—তাহার আপন সত্তাটির পূর্ণ পরিচয় পাইবে।"
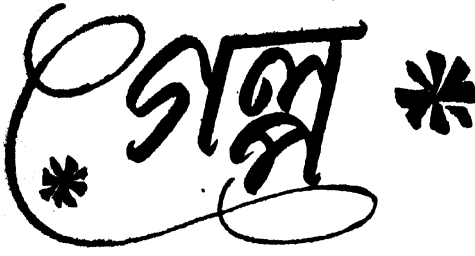
ঠাঁই নেই

শ্রীহরিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

কারখানার ষ্টীম ক্রেণটা, তার সারস পাখীর মত বিরাট বহির্মুখ দণ্ডটার মাথায় বাঁধা সিলিংরোপ দিয়ে সারাটা দিন জয়েষ্ট, চ্যানেল, প্লেট্‌ ইত্যাদি বোঝাই করা আর খালাস করার কাজ করে চলে। সিফ্‌ট ডিউটিতে মানুষগুলোই কেবল বদল হ'য়ে যায়; যন্ত্রটা কিন্তু বিশ্রাম পায় না। বিরাম আছে শুধু কেবল ব্রেক-ডাউনে। দূরে চিমনির মাথায় কয়লার কাল ধোঁয়া উড়ে যায়; ঠিক যেন, অজানা যুবতী, তার বৈশাখীর ঘন কাল মেঘের মত চুল এলিয়ে দিয়েছে। কামারশালের মাথায় ষ্টীমের সাদা ধোঁয়া—ঠিক যেন বৃদ্ধার পক্ক কেশ! 'পাওয়ার হাউসের' কাছে মেসিনের একটানা চাপা গুঞ্জন ভেসে আসে। এহেন কারখানার, এহেন ষ্টীম ক্রেণের মাথায় চক্রাকারে ঘোরা সুরু করল একটি চিল। বোমা ফেলবার আগে উড়ো জাহাজ যেমন লক্ষ্য বস্তুর মাথায় ঘুরে বেড়ায়। অনেকটা তেমনি ভাবে। কি তার উদ্দেশ্য? কেন সে ঘোরে? কেউ তার খবর রাখে না।

একদিন দু'দিন বৃথা ঘোরার পর; সঙ্গী এল। মনের মিল হল। এইবার নীড় চাই। কিন্তু এই কারখানায় ঠাঁই কোথায়? তারা দু'জনাতে বাসা খুঁজে চলে। কিন্তু ঠাঁই যে পাওয়া ভার! সগর রাজার ষাট্‌ হাজার ছেলে খোঁজার কাজ, ভগীরথের কাছে এর চেয়েও বুঝি সোজা ছিল!

রাতে কোথায় তারা থাকবে? কত জীব তো এখানে-সেখানে ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে থাকে, কজন তার খবর রাখে? স্ত্রী-চিলের মনের শান্তি চলে গেছে। নীড়-বাঁধার স্বপ্ন তার চোখে; সুখের আশা তার বুকে। মন তার আকুলি-বিকুলি করে। গাছ? সেখানেও স্থান নেই। তবে কি স্থান হবে না? নীড় তাকে পেতেই হবে। যারা আসছে তাদের রাখবে কোথায়? দুরাত্মাদের হাত থেকে বাঁচাবে কি করে? যদি ঐ jibটার ফোকরে বাসা বাঁধতে পারে—হোক্‌ না ক্রেণের jib তবুও তা হবে স্বপ্নরাজ্য! ওর মাঝে স্বামী আর ছেলেদের নিয়ে গড়বে সংসার। আর কি চাই?

কিন্তু ঐ বিরামহীন যন্ত্রযানে নীড় বাঁধবে কি করে? সুযোগ তো মেলে না। হঠাৎ সেদিন স্ত্রী-চিলটি মরিয়া হয়ে ঢুকে পড়ল jibএর ফোকরে। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল ক্রেণের কাজ। সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোণের কোপে পড়া জাহাজের অসহায় যাত্রীদের মত অবস্থা! কিন্তু এ দুঃখ সে সহ্য করতে রাজী। সে মা হতে চায়। সুখের সংসার চায়। কোন এক সময় বেরিয়ে পড়ে স্ত্রী-চিলটি। মনে তার উল্লাস! ঘর সে পেয়েছে। চলল স্বামী আর স্ত্রীর মুখে মুখে খড় বয়ে আনা। আর সময় নেই। দিন আসন্ন। স্ত্রী-চিলটি বেশ বুঝতে পারে। সুখ-কল্পনা পেয়ে বসে! পেয়ে বসে মা হওয়ার আনন্দ।

ডিমে তা দিতে দিতে স্ত্রী চিলটি কর্মরত দরিদ্র মানুষের হীনাবস্থা লক্ষ্য করে। ওরা কত গরীব। ওরা কত অসহায়। ঐ ক্লাবরুম থেকে আকণ্ঠ ভোজন সেরে অফিসাররা সিঁড়ি দিয়ে নামছে। এখন তার প্রচুর অবসর। সব জিনিষ খুঁটিয়ে দেখে। স্বামী তাকে আজকাল বেশ তোয়াজে রেখেছে। ছোট ছেলের হাত থেকে ছোঁ-মারা এটা-ওটা-সেটা খাইয়ে দিয়ে যায়। মা হয়ে তাকেও নিজের বাছাদের এমনি করে খাওয়াতে হবে। দেখতে দেখতে নবাগতদের আসবার দিন ঘনিয়ে এল। চোখ মেলে তারা বনানীর সবুজ শোভা দেখ্‌বে না। শান্ত-প্রকৃতির সু-শীতল ছায়া পাবে না। জন্ম হল যে কারখানাপুরীতে।

তারা এল। মার মনে আবার ভয় দেখা দিল। যদি বাচ্চারা পড়ে যায়! গরম ষ্টীম যদি গায়ে লাগে! তবে কি ওরা বাঁচতে আসেনি। দুরু দুরু কাঁপে মায় বুক। ভীরু পারাবত যেন! মা হওয়া কি সুখের কথা! স্ত্রী-চিলটি চুপ করে ভাবে।

দিনে দিনে দুরন্ত হয়ে পড়ে ওরা। ঘরে তারা থাকবে না। ওদের অজানার আকর্ষণ পেয়ে বসেছে। পাখীদের যদি ঈশ্বর থাকে; তাঁর কাছে স্ত্রী-চিলটি বুঝি মানত করে। 'বাঁচাও ঠাকুর···যদি ওদের দিলে, তবে কেন কেড়ে নেবে ওদের······"

বাচ্চা দুটোকে ঝিমুতে দেখে মা বেরিয়ে পড়ল। খাবারের খোঁজে। ফিরে এল বুকভরা আনন্দের দোলা নিয়ে। অনেক খাবার পেয়েছে। কিন্তু ফিরে না এলেই হত বুঝি ভাল। হাহাকার করে ওঠে বুকের ভেতরটা। যা' ভেবেছিল তাই। পড়ে গেছে বাসা থেকে কতদিন। মজুররা তুলে দিয়ে গেছে। কিন্তু আজ একটা ছুটির দিন। কারখানা বন্ধ। শুধু ক্রেণ ড্রাইভার আর দু'জন মজুর 'ওভার-টাইম' করে চলে গেছে। ছোট বাচ্চাটা পড়ে গেছে। কাকে ঠুক্‌রে মেরে ফেলেছে। চোখে তার রক্ত। তাজা রক্ত। আর বাচ্চা মেয়েটা ঝিমুচ্ছে। জানতেও পারে নি, একজন সঙ্গী পৃথিবী থেকে চিরদিনের মত গেছে চলে অন্য জগতে। ফিরে এল বাচ্চাদের আর একজন স্নেহাকাঙ্ক্ষী—পিতা। সন্তানের পিতা। তার মুখের খাবার। এটা-ওটা-সেটা। ছেলেদের বুক ভরে খাওয়াবে, বাঁচাবে এই আছে আশা। কিন্তু শেষ! চলে গেছে বুকের ধন।

পাখীরাও কাঁদে। পুত্রশোকে তারা কাঁদল। অনেক দিন আগে ছেলেকে হারিয়ে অন্ধ পিতা-মাতা যেমন কেঁদেছিল।

মেয়ে বাঁচল। ওর মার মত অনন্ত নীলাকাশের মাঝে সাঁতার দিয়ে তাকেও বেড়াতে হবে। সঙ্গী জুটবে, হয়ত জুটবে না। ঘর মিলবে, হয়ত মিলবে না।

মানুষ এখানে বাসা পায় না তো কাকপক্ষী!

অনগ্রসর অঞ্চল ও আন্তর্জাতিক দাদনী তহবিলের প্রস্তাব

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম-এ

ইকাফির কার্য্যাবলীর সাথে আমাদের অনেকেরই হয়ত পরিচয় আছে। ইকাফির অর্থ হচ্ছে এশিয়া এবং সুদূরপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক সংস্থা। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই সংস্থাটি গঠন করেছেন। এশিয়া এবং সুদূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের প্রয়োজন সম্পর্কে ইকাফি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সংগৃহীত তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, চীন এবং জাপান ছাড়া এশিয়া এবং সুদূরপ্রাচ্যের অবশিষ্ট দেশগুলোতে যদি দু' শতাংশ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে বছরে পাঁচশত কোটি ডলার হিসাবে লগ্নী করা দরকার। এশিয়া এবং সুদূরপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় জাপান ও চীন অধিকতর শিল্পোন্নত। কাজেই জাপান এবং চীনের প্রয়োজনকে একটু পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে পাঁচশত কোটি ডলার সংগ্রহ করা সম্ভবপর সেটাই হল আসল আলোচ্য বিষয়। ইকাফি কর্ত্তৃক সংগৃহীত তথ্যগুলো থেকে মনে হচ্ছে, যদি বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয় তাহলে আভ্যন্তরীণ সঞ্চতি দ্বারা বছরে দু' শত কোটি ডলার জোগাড় করা হয়ত সম্ভবপর হবে। এছাড়া বাইরে থেকে বছরে একশত কোটি ডলারের বেশী পাওয়া যাবে বলে মনে হয়না। বাকী রইল দু' শত কোটি ডলার। এই দু' শত কোটি ডলার যদি আগামী অল্প কয়েক বছরের মধ্যে পাওয়া না যায় তাহলে এশিয়া এবং সুদূরপ্রাচ্যের দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর হবে না। অবশ্য এই সব দেশের মধ্যে চীন ও জাপানকে ধরা হয়নি, কারণ আমরা আগেই বলেছি, এই দুটো দেশের প্রয়োজন একটু ভিন্ন ধরণের।

আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় যে সব অনগ্রসর দেশ আছে সে সব দেশেও বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। যদি খুব তাড়াতাড়ি এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন সংগ্রহ করা না হয় তাহলে এই সব দেশে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাবে না। অবশ্য একথা ঠিক যে, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক অনগ্রসর রাষ্ট্রগুলোকে ঋণ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেননি। তবে যে সব সর্তে ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে প্রস্তুত, সে সব সর্তে ঋণ নেওয়া এঁদের অনেকের পক্ষে কষ্টকর। তাছাড়া প্রত্যেকটি দেশের পক্ষে ঋণলাভ করবার আগে তাঁর সরকারকে জামিন রাখা বাধ্যতামূলক। যে দেশের সরকার জামিন দাঁড়াবেন না সে দেশ ব্যাঙ্ক থেকে দাদন পাবেন না।

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীর সাথে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা হয়ত ব্যাঙ্কের কর্ম্মপদ্ধতির একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। ব্যাঙ্কের কাছে যে পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য ঋণের আবেদন করা হয় সে পরিকল্পনা যদি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে কিম্বা সে পরিকল্পনার স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা সম্পর্কে ব্যাঙ্কের মনে যদি কোনপ্রকার সন্দেহের উদ্রেক হয় তাহলে ব্যাঙ্ক ঋণ মঞ্জুর করতে দ্বিধাবোধ করেন কিম্বা ঋণের আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য করে থাকেন। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক সে সব ক্ষেত্রেই ঋণ কিম্বা দাদন দিতে রাজী যে সব ক্ষেত্রে সুদ সমেত আসল নিশ্চিতভাবে পরিশোধ করা হবে। যেহেতু অনগ্রসর এলাকায় দাদন সরবরাহের ব্যাপারে ব্যাঙ্ককে অধিকতর সতর্কতার সাথে কাজ করতে দেখা যায় সেহেতু মনে হচ্ছে, অনগ্রসর দেশগুলোর পক্ষে সমস্ত সর্ত পুরণ করে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পাওয়া ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে পড়বে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারত এখনও পর্য্যন্ত অনগ্রসর। কাজেই অনগ্রসর রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে ভারতকে অনায়াসে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং অনগ্রসর রাষ্ট্র সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক যে নীতি অনুসরণ কচ্ছেন সে নীতি ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী থেকে মনে হয়, ব্যাঙ্ক অনগ্রসর দেশগুলোর অর্থনৈতিক সামর্থ্যকে উদার মনোভাব নিয়ে বিচার করে দেখেন নি। আমাদের

দেশেরই প্রয়োজন সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক যে নীতি অবলম্বন করেছেন সেটাকে কিছুতেই উদার বলা চলে না। দামোদর পরিকল্পনা সম্বন্ধীয় কাজের জন্য ব্যাঙ্কের কাছে যখন দাদন চাওয়া হয়েছিল, তখন ব্যাঙ্ক ভারতের প্রয়োজন ভালভাবে উপলব্ধি করতে চাননি। অবশ্য বোকারোতে যে কয়লা-বিদ্যুৎ কারখানা আছে সে কারখানায় ব্যবহৃত বৈদেশিক যন্ত্রপাতির দামটুকু ব্যাঙ্ক দাদনের সাহায্যে মিটিয়ে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। এছাড়া সেচের পরিকল্পনায়ও ব্যাঙ্ক কিছু টাকা দাদন দিয়েছেন। কিন্তু গোটা দামোদর পরিকল্পনার জন্য যে দাদন চাওয়া হয়েছিল সেটার তুলনায় ব্যাঙ্ক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত দাদনের পরিমাণ খুবই সামান্য। তাছাড়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেসন, চিত্তরঞ্জনে রেলইঞ্জিন কারখানা, এবং রাউরকেল্লায় ষ্টীল ফ্যাক্টরীর জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের কাছে যে দাদনের জন্য আবেদন করা হয়েছিল সে আবেদন মঞ্জুর করতে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক রাজী হননি। এখন প্রশ্ন হল, এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে দাদন দিতে ব্যাঙ্ক কেন অসম্মত হয়েছিলেন। ভারত সরকার আশা করেছিলেন, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক অন্ততঃ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেসনকে দাদন দিতে রাজী হবেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক এই কর্পোরেসনকে পর্যাপ্ত দাদন দিতে রাজী হননি। কি কারণে দাদন মঞ্জুর করা হয়নি সেটা বাইরে থেকে বলা সম্ভবপর নয়। ভারত সরকারও এ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। চিত্তরঞ্জনে রেলইঞ্জিন কারখানাকে দাদন দেওয়া সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের পরিচালকদের মনোভাব হচ্ছে, এই কারখানাকে দাদন দেবার কোন সার্থকতা নেই, কারণ একটা ভ্রান্ত উদ্দেশ্য নিয়ে কারখানাটি স্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ এঁরা বলতে চাইছেন, ভারতের উচিত ছিল ইঞ্জিন মেরামত করার জন্য কারখানা স্থাপন করা। ইঞ্জিন তৈরী করবার জন্য কারখানা খুলে ভারত ভুল করেছেন, কারণ ইঞ্জিন তৈরীর কাজে ভারতের তেমন যোগ্যতা নেই। কাজেই এক্ষেত্রে দাদন মঞ্জুর করার কোন অর্থ হয়না। এটাই হল ব্যাঙ্কের পরিচালকদের আসল অভিমত।

রাউরকেল্লায় ষ্টীল ফ্যাক্টরীকে দাদন দেবার ব্যাপারে ব্যাঙ্ক কিন্তু একটু অন্যধরণের মনোভাব অবলম্বন করেছেন। অবশ্য এক্ষেত্রেও দাদনের আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়েছে। তবে অগ্রাহ্য করার কারণটি একটু ভিন্ন ধরণের। ব্যাঙ্ক পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, সরকার কর্তৃক পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার ইচ্ছা ব্যাঙ্কের নেই। মোট কথা হল এই যে, যেভাবে বর্তমানে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের নীতি নির্দ্ধারিত হচ্ছে তা'তে অনগ্রসর দেশগুলোর পক্ষে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আ'থক সাহায্য লাভ করা কষ্টকর। তাছাড়া খুব উচ্চ হারে ব্যাঙ্ক সুদ দাবী কচ্ছেন। এই হারে সুদ দিয়ে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে অনগ্রসর দেশগুলো ইতস্ততঃ করে থাকেন। অনগ্রসর দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর করে তোলাই যদি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে ব্যাঙ্কের তরফ থেকে অতটা চড়া সুদ দাবী করা কিছুতেই সমর্থন করা চলেনা। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীর অনুন্নত এলাকাগুলোকে শিল্পোন্নত করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা ততদিন পর্য্যন্ত সম্ভবপর হবেনা যতদিন পর্য্যন্ত বাইরে থেকে মূলধন কিম্বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাওয়া যাবে না। শুধু তাই নয়। একদিকে মূলধন যেরকম পর্য্যাপ্ত হওয়া দরকার সেরকম অন্যদিকে এটা যা'তে তাড়াতাড়ি সরবরাহ করা যেতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। বিদেশ থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাওয়া না গেলে অনগ্রসর অঞ্চলগুলোর পক্ষে শিল্পোন্নত হওয়া অসম্ভব।

সম্প্রতি একটা আন্তর্জাতিক দাদনী তহবিল গঠন করবার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কে যখন দাদন দেবার ব্যবস্থা আছে তখন কেন আর একটা নূতন আন্তর্জাতিক দাদনী তহবিল গঠন করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি মনে করি, নূতন দাদনী তহবিলটি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক থেকে একেবারে পৃথক, তাহলে ভুল হবে। যেক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশগুলোর পক্ষে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় মূলধন বা দাদন পাওয়া কষ্টকর কিম্বা অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াবে, সেক্ষেত্রে নূতন দাদনী তহবিলের কাছ থেকে এঁরা প্রয়োজনীয় সাহায্য লাভ করতে পারবেন এই আশা নিয়ে নূতন তহবিলের পরিকল্পনা করা হয়েছে। যদি নূতন তহবিলটি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের পরিপূরক হিসাবে কাজ করতে পারে তাহলে অনগ্রসর রাষ্ট্রগুলোর আশা সফল হবে। এক সংবাদে প্রকাশ ভারত সরকার এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, আন্তর্জাতিক দাদনী তহবিলকে এড়িয়ে চলা বাঞ্ছনীয় হবে না। তাই ভারত এই তহবিলে যোগদান করবেন বলে স্থির করেছেন। স্মরণ থাকতে পারে, আন্তর্জাতিক দাদনী তহবিল সম্পর্কীয় মূল প্রস্তাবটি তৈরী করতে ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এ কথা বল্লে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না, তহবিলটির গোটা পরিকল্পনার পিছনে এঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনাটি ভারতীয় বিশেষজ্ঞদেরই সৃষ্টি।

আন্তর্জাতিক দাদনী তহবিল সম্পর্কীয় মূল প্রস্তাবে বলা হয়েছে, পাঁচশত কোটি ডলার মূলধন নিয়ে একটা তহবিল গঠন করা দরকার। বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে রাজী হননি। এঁদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, পাঁচশত কোটি ডলার মূলধন নিয়ে যে বিরাট তহবিল গঠন করবার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে সে তহবিলে মোটা রকমের দাদন করা অসুবিধাজনক। এখানে মনে রাখা দরকার, প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়েছে অনগ্রসর দেশগুলোর পক্ষ থেকে এবং যে সব রাষ্ট্র প্রস্তাবটির বিরোধিতা কচ্ছিলেন সে সব রাষ্ট্র সমস্ত বিশ্বের কাছে শিল্পোন্নত বলে পরিচিত। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, এখন কি করে তহবিল খোলা সম্ভবপর হল। আরো লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, মার্কিণ সরকারের পক্ষ থেকেই তহবিল খোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। কি কারণে মার্কিণ সরকারের মনোভাব পরিবর্তিত হল সেটা ঠিক ভাবে জানা যাচ্ছে না। মার্কিণ সরকার বলছেন, আপাততঃ দশ কোটি ডলার মূলধন নিয়ে তহবিল খোলা যেতে পারে। আরো বলা হয়েছে, গোটা মূলধনকে এক হাজার শেয়ারে ভাগ করে ফেলতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য হবে এক লক্ষ ডলার। যাঁরা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের অংশীদার নন তহবিলের শেয়ার ক্রয় করবার কোন অধিকার তাঁদের নেই। মার্কিণ সরকার নিজেই সাড়ে তিন কোটি ডলারের শেয়ার ক্রয় করবার সিদ্ধান্ত করেছেন। অনগ্রসর দেশগুলোর প্রয়োজনের দিক থেকে বিবেচনা করলে মনে হবে, দশ কোটি ডলার মূলধন মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়। কাজেই সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে, নবগঠিত আন্তর্জাতিক দাদনী তহবিল এঁদের চাহিদা পূরণ করতে পারবে না। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তহবিল হয়ত শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিবে।

নরেন্দ্র দেব

(প্রাচীন চীন—পূর্বানুবৃত্তি)

ফ্যান তার পত্নীকে আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত ক'রে বললে—আমি কোনোদিনই এই বিদ্রোহী বিপ্লবী সৈন্যদলে যোগ দিই নি এটা অতি সত্য! কিন্তু, সেটা প্রমাণ করা যে খুবই শক্ত, একথাও ঠিক। নুড়ি পাথর আর হীরে জহরৎ যে একসঙ্গে একই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এতেও কোনও সন্দেহ নেই। আমি তাই আমার অদৃষ্টকে ভাগ্যদেবীর হাতেই ছেড়ে দিয়েছি। তবে, তোমার কথা আলাদা। তোমার বাবা হ'লেন একজন উচ্চ রাজকর্মচারী। তোমার অবস্থা হল সেই উচ্চ রাজকর্মচারীর একমাত্র কন্যা আজ শত্রু শিবিরে বন্দী। তোমাকে উদ্ধার করবার জন্য সবাই অগ্রসর হয়ে আসবে। তোমার কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করবে না; কারণ যুবরাজ হান্স্ এবং তাঁর সেনাপতি ও সৈন্যদল সবাই উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী, তোমারই দেশের লোক! তোমার ভাষাও তাদেরই ভাষা। তারা যখন বুঝতে পারবে যে—তুমি তাদেরই একজন, তোমার গায়ে তারা হাত দেবে না। তোমার প্রতি হয়ত সদয় ব্যবহারই করবে। সৈন্যদলের মধ্যে তোমাদের কোনও আত্মীয় বন্ধু থাকাও অসম্ভব নয়। তারা হয়ত তোমায় চিনতে পেরে তোমার বাবাকে খবর দেবেন। তুমি তখন আবার তোমার পরিবারের সকলের সঙ্গে মেলবার সুযোগ পাবে। কদিনইবা তুমি পৃথিবীতে এসেছো! যৌবনের প্রথম অরুণোদয়ে তোমার সর্বাঙ্গ আজ সমুজ্জ্বল। তোমার জীবন এখন খুবই মূল্যবান। ভবিষ্যৎ জাতির জননী হবে তুমি। তোমার এ প্রয়োজনীয় প্রাণটা এমন তুচ্ছ ভেবে নষ্ট কোরনা। লক্ষ্মী সোনা আমার। কথা শোনো।

য়ু-মাই ব্যথিত কণ্ঠে বললে—তোমাকে ছেড়ে আমার বেঁচে থেকে লাভ কি? আমায় যদি ওরা প্রাণে নাও মারে, আমার প্রাণাধিককে তো মারবে। তুমি কি মনে করো আমি তারপর ও আবার একজনকে পতি বলে স্বীকার করে নিয়ে আমার সতীত্ব বিসর্জন দেব? সে আমি কিছুতেই পারবো না। আমি আজীবন বৈধব্য পালন করবো। তা ছাড়া—তুমি এটা বুঝচো না কেন যে—দুর্দান্ত সৈন্যদল জয়োল্লাসে যখন নগরে প্রবেশ করবে, নারী বা ধনসম্পত্তি কি কারুর রক্ষা পাবে? জয়োন্মত্ত সৈনিকদের দ্বারা পশুর মতো ধর্ষিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যু বরণ করা কি শ্রেয়ঃ নয়?

তরুণ ফ্যান পত্নীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে—আর আমার মরণে কোনও খেদ নেই। আমি খুশী মনে প্রাণ দিতে পারবো। তবে, হ্যাঁ, একটা কথা বলে রাখি। যদি দৈবক্রমে কোনও উপায়ে পালিয়ে গিয়ে ক্ষ্যাপা সেপাইদের হাত এড়াতে পারি, আমি তোমার স্মৃতি বুকে করেই জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেব। আর কোনও নারীকে অঙ্কশায়িনী করতে পারবো না। তোমার প্রতিশ্রুতি আমিও গ্রহণ করলুম প্রিয়তমে। কিন্তু, মরতে আমি তোমায় কিছুতেই দিতে পারব না।

য়ু-মাই বললে, তবে এক কাজ করি এসো। তুমি যে একজোড়া 'হংস মিথুন ও মরাল দম্পতি' আঁকা দর্পণ আমাকে বিবাহের রাত্রে উপহার দিয়েছিলে, এসো আমরা সেই মুকুর দু'খানি দুভাগ করে নিয়ে দুজনের কাছে রাখি, আমাদের অভিজ্ঞান স্বরূপ। যদি কখনো এই আয়না দুখানা আবার জোড়া লাগে—সেদিন আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনর্মিলন ঘটবে।

দু'জনেই দু'জনের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আনন্দ ও বেদনায় অশ্রুজলে উভয়কে উভয়ে সিক্ত করতে লাগলো। তাদের আবেগ কম্পিত অধরোষ্ঠ একত্র মিলিত হয়ে সকল কথার কণ্ঠরোধ করে দিলে।

তারপর বহু ঘটনা ঘটে গেছে। যুবরাজ হান্সের সমরবাহিনীর ঝটিকা প্রবাহে ছিয়েনচাও নগরের পতন হয়েছে। বিদ্রোহী নায়ক সেনাপতি ফ্যান পালাতে না-পেরে নিজের বাড়ীতে নিজেই আগুন লাগিয়ে দিয়ে সেই অগ্নিশিখায় আত্মাহুতি দিলে! তবু, শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করলে না। যুবরাজ হান্স ছিয়েনচাওয়ের দুর্গ শিখরে চীন-সম্রাটের পীত পতাকা উড়িয়ে দিয়ে অবশিষ্ট বিপ্লবীদের অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করবার জন্য ঘোষণা করে দিলেন।

ফ্যানের গোষ্ঠী রাজরোষ থেকে রক্ষা পেয়েছিল। কারণ, তাঁরা এ খবর জানতেন যে বিপ্লবীদের অধীনে থাকতে বাধ্য হ'লেও ওরা বিপ্লবী নয়। নগরবাসীদের মধ্যে অর্ধেকের উপর এই আক্রমণে নিহত হয়েছিল। অবশিষ্ট লোকেরা বন্দীর সংখ্যাই বৃদ্ধি করলে। তাদের রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে তারা রাজার বিচার ও দণ্ডের জন্য বন্দীশালায় অপেক্ষা করবে।

তরুণ ফ্যানকে তারা ধ'রে নিয়ে গেল। ফ্যান কোনো বাধা দিলে না। য়ু-মাই ভাবলে তার স্বামী তবে আর রক্ষা পাবে না। সে তখন ছুটে পালিয়ে গিয়ে নিকটস্থ একটা খালি বাড়ীতে ঢুকে নিজের গায়ের ওড়না খুলে গলায় ফাঁস লাগিয়ে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়লো। কবি বলেছেন—

"শোনো শোনো বলি রূপসী যুবতি,
মৃত্যুও ভালো—যদি মরো সতী!
সুখ নেই জেনো অসতীর প্রাণে;
সে যে বেঁচে থাকা শুধু অপমানে!"

কিন্তু য়ু-মাইয়ের আয়ু তখনও শেষ হয় নি। উদ্বন্ধনে তার মৃত্যু হল না। কেন না—ঠিক সেই মুহূর্তেই সে বাড়ীতে কে কে আছে দেখবার জন্য প্রধান রাজকর্মচারী ফেঙ সসৈন্যে এসে প্রবেশ করলেন। একটি তরুণী মেয়েকে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করতে উদ্যত দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসে মেয়েটির গলার ফাঁস কেটে সন্তর্পণে তাকে নামিয়ে নিলেন। য়ু-মাই তখন অচেতন। কিন্তু, নিজের একমাত্র প্রাণপ্রিয় দীর্ঘ নিরুদ্দিষ্ট কন্যাকে চিনতে ফেঙের বিলম্ব হ'ল না।

য়ু-মাইয়ের জ্ঞান ফিরে আসতে সে চোখ মেলে চেয়ে দেখলে—সামনে যেন তার স্নেহময় জনক দাঁড়িয়ে রয়েছেন! সে বিস্ময়ে বহুক্ষণ রুদ্ধবাক হয়ে রইল। তার কেবলই মনে হ'তে লাগলো—বোধ করি সে স্বপ্ন দেখছে! অথবা, মৃত্যুর পর হয়তো পরলোকে এসে তার বাবার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তবে তো তার স্বামীর সঙ্গেও দেখা হতে পারে!—এই ভেবে সে আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠলো!

এ ভাব কেটে যেতে বেশিক্ষণ লাগে নি। য়ু-মাই ক্রমে প্রকৃতিস্থ হয়ে সমস্ত অবস্থা বাবার কাছে শুনলে এবং নিজেও তার সেই হারিয়ে-যাওয়ার দিন থেকে সমস্ত ইতিহাস বাপের কাছে বললে। কন্যার মুখে তরুণ ফ্যানের মহত্ত্ব ও বীরত্বের কাহিনী শুনে ফেঙ্ বুঝলেন যে মেয়ে তাঁর অপাত্রের কণ্ঠে মাল্যদান করে নি।

ক্রমে ক্রমে ছিয়েনচাও প্রদেশ শান্ত হল। জনসাধারণ আবার নির্ভয়ে যে যার ঘরে ফিরে এসে শান্ত ও সহজ জীবন যাপন করতে শুরু করলে। যুবরাজ হাঙ্ রাজধানীতে ফিরে গেলেন সম্রাটকে ছিয়েনচাও বিজয়ের সমাচার দিতে। সঙ্গে নিয়ে গেলেন প্রধান রাজকর্মচারী ফেঙকেও। সম্রাট এই বিজয়ের জন্য খুশী হয়ে ফেঙকে প্রচুর পুরস্কার দিলেন।

দিন যায়। ফেঙ্ একদিন কথায় কথায় স্ত্রীকে বললেন—মেয়েটা কি এই বয়সে এমনি উদাসিনী যোগিনী হয়েই থাকবে? অনেক সুপাত্র ওকে বিবাহ করতে চায়। একটু বুঝিয়ে বলে দেখ না!

য়ু-মাইয়ের মা কিন্তু মেয়েকে কিছুতেই বুঝিয়ে পারলেন না। মেয়ে একেবারে অটল-অনড়! মাকে সে মিনতি করে বুঝিয়ে বললে, স্বামীর কাছে কি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

শেষে ফেঙ্ নিজেই একদিন কন্যাকে ডেকে বললেন—এক বিদ্রোহী যুবা তোমার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিল। সেটাকে বিবাহই বলা চলে না। ছোঁড়াটা যে যুদ্ধে মরেছে এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। ভালই হয়েছে। সে তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে—একটা লজ্জাকর বন্ধন থেকে। তুমি এখন অনায়াসে তোমার বংশমর্যাদার উপযুক্ত ও তোমার মনোমতো একটি ছেলেকে বিবাহ করে সুখী হতে পারো। আমাদের ইচ্ছে—তোমার জীবন ব্যর্থ না হ'য়ে সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠুক। তুমি এতে আর অমত কোর না।

অশ্রুসিক্ত চোখে য়ু-মাই বললে—"আমায় ক্ষমা করুন বাবা। সে আমি কিছুতেই পারব না। আমি যে তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

য়ু-মাই একে একে সমস্ত কথাই পিতার কাছে অকপটে প্রকাশ করলে এবং সেই 'হংসমিথুন' মুকুরের অর্ধাংশ দেখিয়ে বললে—আমি আজীবন প্রতীক্ষা করে থাকবো এর অপরার্ধ 'মরাল-দম্পতির' সন্ধান পাবার জন্যে।

এই ঘটনার পর ফেঙ্ আর কন্যাকে পুনর্বিবাহের জন্য পীড়া-পীড়ি করেন নি।

দিন যায়। মাস যায়। দেখতে দেখতে বছরও কেটে গেল। ফেঙের দিন দিন উন্নতি হচ্ছিল। তিনি এখন সহকারী প্রধান সেনাপতির পদ পেয়েছেন। একদিন কাওয়াংচাওের প্রধান সেনাধ্যক্ষ বিশেষ এক জরুরী খবর দিয়ে তাঁর কাছে পাঠালেন একজন সহকারী সেনাধ্যক্ষকে। এই সহকারী সেনাধ্যক্ষটি এসে দীর্ঘকাল ধরে ফেঙের সঙ্গে কি আলোচনা করছিলেন। পিতার খাবার সময় হয়েছে বলে তাঁকে ডাকতে গিয়ে য়ু-মাই চমকে উঠে বাড়ীর ভিতর পালিয়ে এল। আগন্তুক চলে যাবার পর বাপকে নিভৃতে পেয়ে য়ু-মাই জানতে চাইলে লোকটি কে? কোথা থেকে এসেছিল? ওর নাম কি? ইত্যাদি। ফেঙ্ কন্যার ঔৎসুক্য দেখে সমস্তই বললেন। লোকটি একজন সহকারী সেনাধ্যক্ষ। নাম—হো চেঙ ছিন্!

য়ু-মাই শুনে বললে—কী আশ্চর্য বাবা! অবিকল লোকটি তোমার জামাইয়ের মতো দেখতে। সেই চেহারা, সেই কণ্ঠস্বর, সেই চলা বলার একটা বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী! দুজন মানুষ কি এত একরকম হয়?

ফেঙ হেসে উঠে বললেন—পৃথিবীতে আশ্চর্য বলে কিছু নেই মা! হয় তো ও তোমার স্বামীর কোনও জ্ঞাতি বা যমজ ভাই হ'তে পারে। অনেক সময় এক বংশের ছেলেদের চাল চলন একরকমই হয়!'

তাই হয়ত হবে। এই ভেবে য়ু-মাই এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা তোলেনি।

তার পর ছ' মাস কেটে গেছে। একদিন আবার সেই সহকারী সেনাধ্যক্ষ হো-চেঙ্ ছিন্ সামরিক প্রয়োজনে ফেঙের কাছে এক সংবাদ নিয়ে এল।

য়ু-মাই এবারও তাকে দেখে চমকে উঠলো! ওদের কথার মাঝখানেই বাবাকে সে ডেকে পাঠালে বাড়ীর ভিতর। বললে, তুমি যাই বলো—আমার বিশ্বাস উনিই আমার স্বামী। তুমি কথায় কথায় ওঁকে জিজ্ঞাসা করো যে 'মরাল-দম্পতী' আঁকা দর্পণাংশ ওঁর কাছে আছে কিনা?

ফেঙ ফিরে গিয়ে এবার সোজা প্রশ্ন করলে—তোমার নাম কি তরুণ ফ্যান? তুমি কি 'ছিয়েন-চাও' নগরে কখনো ছিলে?

এবার সেই সহকারী সেনাধ্যক্ষটি চমকে উঠলো!

ফেঙ্ সেটা লক্ষ্য করে বললেন,—ভয় নেই, তুমি অকপটে সব কথা সত্য বলো—তাতে তোমার মঙ্গলই হবে।

তখন তরুণ ফ্যান সমস্ত কথাই ফেঙ্‌কে বললে। বললে, আমি রাজ সৈন্যদের সাহায্য করায় আমাকে ওরা হত্যা করেনি। আমার নাম বদলে দিয়ে সেনাপতি উয়েকাই নাম দিয়েছেন হো-চেঙ্ ছিন্। আমাকে সহকারী সেনাপতি পদে নিয়োগ করার কারণ—এক বিদ্রোহী দল একটি জলাশয়ের ওপার থেকে রাজসৈন্যকে আক্রমণ করছিল, কিন্তু রাজসৈন্যগণ উত্তরাঞ্চলের মানুষ, জলে সাঁতা অভ্যাস নেই।

কিন্তু, আমি দক্ষিণের লোক। ছিলুম জলের পোকা। তিন চারদিন জলের ভিতর ডুবে থাকতে পারতুম। আমার একার চেষ্টাতেই আমি সেবার সেই বিদ্রোহী দলকে পরাস্ত করি।

ফেঙ্ এবার জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কোথায় বিবাহ করেছো? তোমার সন্তানাদি কি, তোমার স্ত্রীর নাম কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?

তরুণ ফ্যান বললে—সে এক করুণ কাহিনী একটি মেয়েকে আমি বিদ্রোহীদের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে রক্ষা করবার জন্যই বিবাহ ক'রে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হই। কিন্তু সে মেয়েটি ছিল একটি অমূল্য রত্ন। তাকে ভাল না-বেসে পারা যায় না। আমি তাকে পেয়ে অত্যন্ত সুখী হয়েছিলুম। কিন্তু, ভাগ্য বিরূপ। দুর্যোগ এল জীবনে। আমরা পরস্পরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লুম—

বাধা দিয়ে ফেঙ্ জিজ্ঞাসা করলেন—মেয়েটির নাম কি?

লোকটি বললে 'য়ু-মাই'

'য়ু-মাই?' ফেঙ্ চিৎকার করে উঠলেন। সে যে আমার মেয়ে! যুবক! তোমার কাছে কি তবে সেই 'হংস-মিথুন ও মরাল-দম্পতি' দর্পণ যুগলের অপরার্ধ আছে?

ফ্যান বললে—নিশ্চয়! আমি যে অহরহ সে মুকুর বুকে করে আমার দীর্ঘ বিরহ-ব্যাথাতুর জীবন বহন করছি! এই সে দর্পণ!

হঠাৎ দরজার পাল্লা দুটো ধাক্কা মেরে খুলে—ঝড়ের বেগে য়ু-মাই সে ঘরে প্রবেশ করে ফ্যানের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে সাশ্রুনেত্রে বললে—ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন! আমি যে রোজ তাঁকে ডেকে বলতুম—ভগবান! আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও! ওগো! এতদিনে কি তোমার য়ু-মাইকে মনে পড়লো?

তার পর?……

সমাপ্ত

আর্থিক খবরাখবর

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পরিকল্পনা প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৬৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ সাপেক্ষ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া রচনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার অন্তর্গত ফরাকার গঙ্গাবাঁধ (৩৩ কোটি টাকা), উত্তর ও দক্ষিণে লবণ হ্রদ পুনরুদ্ধার (১৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা), কলিকাতার আবর্জনা হইতে গ্যাস উৎপাদন (২ কোটি টাকা), এবং দুর্গাপুর কোক চুল্লী (১৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা), মোট ৬২ কোটি টাকার পরিকল্পনার বহির্ভূত খরচ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী অধিকরণ হইতে পরিচালনা করিবেন না। দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের মত অনুরূপ আধা-সরকারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইবে। ইহা ছাড়াও উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ১১৩ কোটি টাকা পরিকল্পনার বাহিরে খরচ হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। পরিকল্পনার অন্তর্গত ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে কৃষি, শিল্প, জলসেচ ও বিদ্যুৎ, পথঘাট, বাড়ী ও উপসহর, সমাজ উন্নয়ন, সমবায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ সেবা প্রভৃতির জন্য সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যাপক উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ২৬৫ কোটি টাকার মধ্যে ৬৩ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু এই ঘাটতি পুরণের জন্য কোন নূতন ট্যাক্স ধার্যের প্রস্তাব করা হয় নাই।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনে করেন, এই রাজ্যে তাঁহাদের আয়যোগ্য যে সম্পত্তি আছে তাহা ১৪৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তলার দিক হইতে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ; এই রাজ্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরে সরাসরি ভাবে চার লক্ষ লোকের কর্ম সংস্থান হইবে। পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনায় জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা এবং জনগণের উৎসাহ, উদ্দীপনা, এই পরিকল্পনাকে সাফল্যের দিকে আগাইয়া দিবে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার আশা প্রকাশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের কুটীর শিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যের কুটীর শিল্পের উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে ৮ কোটি টাকার একটি খসড়া তৈয়ারী করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের হস্তচালিত তাঁত শিল্প, চর্মশিল্প, কাঁসার বাসন শিল্প এই তিনটি প্রধান শিল্পকে যান্ত্রিত প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খাদি, তালের গুড়, মাদুর, বেতের ঝুড়ি, ইত্যাদি তৈয়ারীর ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনায় আছে। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন দ্বারা গ্রাম-বাঙ্গালার সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি সাধন ও গ্রামবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এই লক্ষ্য মোটামুটি সম্মুখে রাখিয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা রূপায়নের চেষ্টা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গের জন্য দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সেচ ব্যবস্থার

উন্নয়নকল্পে ফরাক্কা বাঁধ সহ ৮৫ কোটি টাকার এক খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বাঁকুড়া মেদিনীপুর অঞ্চলের উষর ভূমিতে জলসেচের নিমিত্ত বহু প্রতীক্ষিত কংসবতী (কাঁসাই) নদী পরিকল্পনা উহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ঐ দুইটি জেলার ৮ লক্ষ একর জমি সেচ ব্যবস্থার আওতায় আসিবে. এই জন্য ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

আসামের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা

আসাম সরকার আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য ১০৮ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়সাপেক্ষ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য আসাম সরকার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আগামী দশ বৎসরের মধ্যে আসাম হইতে দারিদ্র্য, অনশন, ব্যাধি, নিরক্ষরতা এবং বেকার সমস্যা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হইবে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইবে।

বিহার সরকারের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা

বিহার সরকারের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সম্ভবতঃ ৬ শত কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহার মধ্যে সেচ খাতে ৯১ কোটি টাকা ও শিক্ষা খাতে ৬২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। অন্যান্য বিষয়ের উপরও সম্যক্ গুরুত্ব এই পরিকল্পনায় দেওয়া হইয়াছে।

উড়িষ্যার দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনায় ১২০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। শিল্প প্রসার ও কর্মসংস্থানের জন্য ১১ কোটি টাকা ব্যয় উল্লেখযোগ্য।

মহলানবীশ প্লান ও পরিকল্পনার তর্ক বিতর্ক

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঠামো ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেই সম্পর্কে কিছুদিন যাবৎ প্রায় সকল মহলে আলাপ আলোচনা, তর্ক বিতর্ক, এমন কি আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আতঙ্কের সম্ভাবনা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চারিটি।

(ক) জীবন যাত্রার মান উন্নত করা এবং তাহার জন্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি।

(খ) দ্রুত শিল্প উন্নয়ন। বিশেষ করিয়া মূল শিল্পগুলির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

(গ) পূর্ণ কর্ম সংস্থান।

(ঘ) সামাজিক ন্যায় বিচার।

পরিকল্পনার প্রথমেই বলা হইয়াছে যে পরিকল্পনাকে কোন নির্দিষ্ট বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে রাখা হইবে না। অর্থাৎ ইহা হইবে "ফ্লেক্সিবল্" কর্মসূচীর গতি প্রকৃতি অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে ইহার পরিবর্তন সম্প্রসারণ, সঙ্কোচন করা হইবে। 'ক্ষেত্রেকর্মবিধিয়তে' চিরাচরিত পন্থাই পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইবে। এই পরিকল্পনার সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। দরিদ্রের মুখের অন্ন যাহাতে জুটে, তাহার জন্যই কুটীর ও গার্হস্থ্য শিল্পের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। তবে মূল শিল্পগুলিকেও সম্যক প্রাধান্যই দেওয়া হইয়াছে। পরিকল্পনা অবশ্য ব্যাপক ও উচ্চাশাব্যঞ্জক হইয়াছে। তাহা নিশ্চয়ই কার্যকরী করিতে হইবে। পরিকল্পনার উন্নয়ন সূচী যদি গতানুগতিক কচ্ছপের ন্যায় মন্থরগতিতে অগ্রসর হয়, তবে তো পরিকল্পনারই প্রয়োজন হয় না। বিধাতার অনুকম্পাই যথেষ্ট!

অধ্যাপক মহলানবীশের পরিকল্পনার শেষে যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাই বোধহয় যে কোন পরিকল্পনা সম্পর্কে শেষ কথা। বর্তমানে সরকারী শাসনযন্ত্র যে পদ্ধতিতে চলে, তাহাই সবচেয়ে বড় বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এই অসুবিধা দূর করিতে হইবে। সমস্যাটি অত্যন্ত জরুরী এবং অবিলম্বে উহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

আমাদের মনে হয় এইটাই সব কথা ও শেষ কথা। 'গোড়ায় গলদ' থাকিলে শেষ পৌঁছানো অবশ্য শক্ত। যাহারা পরিকল্পনার ত্রুটি ধরিতে ব্যস্ত, তাঁহারা রচয়িতার ত্রুটি আবিষ্কার না করিয়া পরিকল্পনা কার্যকরী ও সফল করিবার পথের অন্তরায়গুলি দূর করিবার চেষ্টা করিলে অধিকতর কল্যাণের সূচনা হইবে।

স্বাধীনতার অষ্টম বার্ষিকী দিবস

ভারত আটটি বছর স্বাধীন হইয়াছে। ইতিমধ্যে নানা পরিবর্তন আমরা অনুভব করিয়াছি, লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু স্বাধীনতার প্রকৃত লক্ষ্যে আমরা পৌঁছিতে পারি নাই; স্বাধীনতার প্রকৃত উদ্দেশ্য জনগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের মূর্ত বিকাশ ও পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা—এই লক্ষ্যে ৩৬ কোটি ভারতবাসী যতদিন পৌঁছিতে না পারিবে, যতদিন তাহাদের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ বৃহত্তর সমাজের নিকট স্বর্থ্যপ্রদ হইয়া থাকিবে। আমরা আশা করি ভারতের নূতন পরিকল্পনার সর্বাঙ্গীণ সাফল্যে ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা সার্থক হইবে।

গোয়া ও ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্ক

গোয়া ও ভারতীয় ভূখণ্ড রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটনাচক্রে পৃথক হইলেও গোয়া ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য ভৌগলিক অংশ। গোয়া ভৌগোলিক ভারতের অন্যতম খনিজসমৃদ্ধ অঞ্চল। গোয়া লোহা ও ম্যাঙ্গানীজের সম্পদে সমৃদ্ধ। একমাত্র মার্গাগারের আশেপাশেই ২০০টি ম্যাংগানীজ ধাতুর খনি আছে। উপরন্তু গোয়া মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার গমনাগমনের সমুদ্রপথে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মার্গাগান, মার্গোয়া ও ধাম্বোলিস ভারতের উপকূল ও বহির্বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিবে। গোয়া মুক্ত না হইলে ভারতের বর্হিবাণিজ্যে, সামরিক গুরুত্বে আর্থিক সম্পদে পর্তুগাল বিঘ্ন ও বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ৫০ বৎসর

১৯৫৫ সাল ১৯০৫ সাল হইতে পঞ্চাশ বৎসর। ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি বৎসর। ঐ বৎসর বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই'এর শ্লোগান ভারতের অধিবাসীকে বিশেষতঃ বাঙ্গালীকে আত্মাভিমুখী ও শিল্পোচেতনাসম্পন্ন করিয়াছিল। তাহার পর দীর্ঘদিন

অতীত হইয়া গিয়াছে। বঙ্গ ভঙ্গ তাহার বহু পরে সম্পন্ন হইয়াছে। বাঙালী তথা ভারতবাসী শিল্পের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে—হয়তো শিল্পোন্নয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য বাঙ্গালীর ষোল আনা না হইলেও ভারতবাসীর আঠার আনা সফল হইয়াছে ও হইতে চলিয়াছে। আমরা বাঙ্গালী, বাঙালীর কথাই বলিব। সেই প্রেরণা সেই যুগে বাঙালীকে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পরিতে উৎসাহিত করিয়া বাংলায় বহু কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সূচিত করিয়াছিল ঐ সকল কলের সমৃদ্ধির ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছিল,—শুধু ঐ সকল কলের কেন তাহার পর বহু শিল্পের পত্তন, গঠন, প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে। আজ অকৃতজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাঁহারা বাঙালীকে স্বদেশী দ্রব্য না ক্রয় করার অভিযোগ দিতেছেন, কিন্তু নিজেদের কর্তব্যপ্রীতির, দেশসেবার, শিল্পসাধনার আদর্শ সম্পর্কে আত্মজিজ্ঞাসার দ্বারা জানিতে পারিবেন, যে এতদিন তাহারা দেশবাসীর আনুগত্যের পরিবর্তে তাহাদিগকে যতখানি প্রবঞ্চিত করিয়াছেন, অন্য কোন দেশে ইহার তুলনা মিলিবে না! আজ যদি নূতন পরিকল্পনার পটভূমিকায় প্রাইভেট সেকটার গভর্ণমেন্টের কুক্ষিগত হয়, তবে সে দোষ গভর্ণমেন্টের নয়, শিল্পপতিদের। কালের কষ্টিপাথরে দেশবাসীকে প্রবঞ্চনার ইহাই পরিণাম! এখনও আত্মস্বীকৃতি ও শুদ্ধির সময় আছে বলিয়া মনে করি।

ম্যানেজিং এজেন্সী

ম্যানেজিং এজেন্সীপ্রথার নিয়ন্ত্রণ ও বিলোপ সম্পর্কে ভাবা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কোম্পানী আইনের সংশোধনের জন্য একটি বিল ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছে। ম্যানেজিং এজেন্সীপ্রথার কুফল সম্পর্কে ভারতবাসী মাত্রই সচেতন। কিন্তু এই প্রথার অবসান এখনই প্রয়োজন কিনা, কিম্বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রয়োজন কিনা তাহাও বিবেচ্য। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি পার্লামেণ্টারী দলের সভায় গত ১১ই আগষ্ট যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে ভারত সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে ও তাহার পরেও যখন প্রাইভেট সেকটারের অবসানের প্রসঙ্গ চিন্তা করেন নাই, তখন ম্যানেজিং এজেন্সী—যাহা প্রাইভেট সেকটারের প্রধানতম অঙ্গ—তুলিয়া দিবার জন্য সময় নির্দিষ্ট করার পক্ষপাতী নন। সুতরাং রাষ্ট্রীয়করণের প্রয়োজনবোধে সময় ও সুযোগ বুঝিয়া ইহার অবসান করার তিনি পক্ষপাতী। তবে নিয়ন্ত্রণ অবশ্য প্রয়োজনীয়।

রেল পুনর্বিন্যাস

আবার রেল পুনর্বিন্যাস হইল। প্রথমে ৬টি অঞ্চল হইয়াছিল। পরে আটটি করা হইল। এই আক্রমণ অন্য কোন রেল অঞ্চলের উপর নয়—পূর্ব রেলপথের উপর! পূর্ব রেলপথের ৫৬৬৭ মাইলের মধ্যে ২২৯০ মাইল এখনও পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত থাকিবে এবং অবশিষ্ট অংশ লইয়া 'দক্ষিণ' পূর্ব রেলপথ অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয়বার পুনর্বিন্যাসের কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে পূর্ব রেলপথের উপর চাপ অত্যন্ত বেশী পড়ায় তাহা হ্রাসের প্রয়োজনে উহা করা হইয়াছে। কিন্তু রেলপথ পুনর্বিন্যাসের যদি কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিচার করিতে হয় এবং সেই সঙ্গে অঞ্চলবিশেষের বাণিজ্যিক সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় তবে পূর্ব রেলপথের অধীনে পূর্বতন আসাম রেলপথের ১৭৮৫ মাইল জুড়িয়া দিলে একদিকে শাসনপরিচালনার সুবিধার জন্য অন্ততঃ ৪ হাজার মাইলের মত একটি অঞ্চলের রেলপথ থাকিবে, আর যে সকল উত্তর-পূর্ব রেলপথের কর্মী কলিকাতায় কাজ করিত, তাহাদিগকে স্থানান্তরের ঝামেলা হইতে রেহাই দেওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া আসাম ও উত্তর বঙ্গের একমাত্র বন্দর কলিকাতা, তাহার সহিত যোগাযোগ সুষ্ঠু হইবে। এই অঞ্চলের ক্লেমস্ ইত্যাদির ফয়সালায় গোরক্ষপুর হইতে কলিকাতাতে সুবিধার সহিত নির্বাহ করা যাইবে। শাসনযন্ত্রের মালিকের খেয়ালমাফিক নিত্য নবীন বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাসের মধ্যে যদি কর্মীকুলকে আজীবন শাঁখের করাতের মত আক্রমণে নিত্যই আশঙ্কিত থাকিতে হয়, তাহার চেয়ে স্বাধীন দেশে আর কিছুই পরিতাপের বিষয় থাকিতে পারে না। কর্তৃপক্ষের শুভবুদ্ধি কর্মচারীগণ আশা করিবেন এটা স্বাভাবিক।

সমৃদ্ধির বাঁধ—দুর্গাপুর

দুঃখের দামোদর, রুদ্র দামোদর আজ বিজ্ঞানের শক্তির নিকট, মানুষের উপস্থিত প্রচেষ্টার নিকট ধরা দিয়াছে। দুর্গাপুর বাঁধের সমাপ্তিতে ইহার সূচনা হইল। দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ আজ মানুষের অক্লান্ত শ্রম ও সাধনায় সম্ভব হইল। গত ৯ই আগষ্ট দুর্গাপুর বাঁধের উদ্বোধন কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। দামোদরের খালগুলি শুধু ১০,২৬,০০০ একর জমিতে জলসেচই করিবে না, জলনিকাশের কাজেও লাগিবে। খালগুলির অনেকগুলির মধ্য দিয়াই নৌকা চলাচল করিতে পারিবে। ফলে উন্নত নৌ-পরিবহনের দ্বারা এই অঞ্চলে উৎপন্ন কয়লা, লোহা প্রভৃতি দ্রব্য চালানোর সুবিধা হইবে, রেল পরিবহনের উপর চাপও ইহাতে অনেকটা কমিবে। নিম্নের পরিসংখ্যানগুলি এই পরিকল্পনার প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভে সাহায্য করিবে।

পরিকল্পনার মোট ব্যয়—প্রায় ২৩ কোটি টাকা।
খালগুলির মোট দৈর্ঘ্য—১৪০০ মাইল।
নাব্য খালগুলির দৈর্ঘ্য—৮৫ মাইল।
সেচের অঞ্চল :—
খারিফ···১০,২৬,০০০ একর।
রবি···৩,০০,০০০ একর।
অতিরিক্ত চাউল উৎপাদনের পরিমাণ—৫৬,০৫,১০০ মণ
" খড় " " —১,৭৮,৭৪,৬০০ মণ
" রবিশস্য " " —৩৬,০০,০০ মণ।
নাব্য খালগুলিতে মোট মাল চালানের বার্ষিক
আনুমানিক পরিমাণ—২০,০০,০০০ টন।

পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্য হ্রাস

পাকিস্তানী মুদ্রা মূল্যের হ্রাস হইয়াছে। ইহার ফলে ইহার মূল্য ভারতীয় মুদ্রার সমান হইয়াছে। পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন যে তাঁহারা কোন চাপে পড়িয়া এই কাজ করেন নাই। সম্পূর্ণভাবে কৃষি অর্থনৈতিক অবস্থা হইতে আধা শিল্প পর্যায়ে আসিবার জন্যই এই পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে! আমরা বলি চাপে না পড়িলেও কাতে পড়িয়া এই কাজ করিতে হইয়াছে। বঙ্গ বিভাগের পর ভারতকে পাটের ব্যাপারে যেরকম অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল, পাকিস্তান মুদ্রামূল্য হ্রাস না করিয়া মার্কিনী আনুগত্য ও ব্রিটিশী মেহেরবানের আশ্রয়ে ভারতকে নাজেহাল করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। বাণিজ্যচুক্তি করিবার পরও চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে টাল-বাহানাও কম করে নাই। ইংল্যাণ্ড হইতে কয়লা আনাইয়া ট্রেন চালাইয়াছিল, তবু পাট দিয়া ভারতের কয়লা লইতে না করে নাই। এখন ভারত পাটে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। কয়লা বাহিরে প্রচুর রপ্তানি করিবার সুযোগ আসিয়াছে। তুলার ব্যাপারেও অবস্থা আয়ত্তে আসিয়াছে। ভারত পাকিস্তানের তোয়াক্কা না রাখিয়াও নিজের আর্থিক অবস্থা তথা অর্থনৈতিক কাঠামো ক্রমশঃ সুদৃঢ় করিতেছে। কাজেই যাহার জন্য তাহা, তাহা যখন মিটিয়াই গিয়াছে, তখন আর ঝামেলা করিয়া লাভ কী? তাহার উপর ঘর সামলাইতেই 'জান' যায়! আমরা বলি শুভবুদ্ধি বিলম্বে উদয় হইলেও ভাল।

আগমনী

নারীশ্বরী শারদা,
মানবী ভবতারা !
বহিয়া তব বারতা
জীবন ঘুমহারা।

পথিক প্রাণ গাহে গান :
"আঁধারনিশা অবসান
নব আলোর অভিযান
নাশিল তমোকারা"।

কালের কালোছায়াতে
অরুণ-বরণী,
মরণময় কায়াতে
মরণ-হরণী।

তোমার অবতরণে
ধরণী তব চরণে
লভিল চির শরণে
স্বরগ-সুধাধারা ॥

কথা—নিশিকান্ত (পণ্ডিচেরী) :: সুর ও স্বরলিপি—তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

II ধা ধণর্সা -র্সণা | ধা পা | ধা -মা | পা পা I মা ণা ণা | ধা পা | মপধা -ধপা | মা -জ্ঞা I
না রী০০ ০ শ্ব রী শা ০ র দা মা ন বী ভ ব তা০০ ০ রা ০

I জ্ঞা মা মা | রা সা | রা -া | সা সা I রা মা মা | পা মা | পা র্সনা | র্সা -া II
ব হি য়া ত ব বা ০ র তা জী ব ন ঘু ম হা ০০ রা ০

II মা পা পা | ণপা -না | না র্সা | র্সা -া I না র্সা র্রজ্ঞা | র্রা র্সা | না র্সর্র র্সা | র্সা -ণা I
প থি ক প্রা০ ণ্ গা হে গা ন্ আঁ ধা র০ নি শা অ ব০০ সা ন্

I ধা ণা ণা | ধা পা | পধা মা | পা -া I মা ণা ণা | ধা পা | পা -সরা | জ্ঞা -া I
ন ব আ লো র অ০ ভি যা ন্ না শি ল ত মো কা ০০ রা ০
“বহিয়া…………………………………………ঘুমহারা” II

II সা জ্ঞা জ্ঞা | রা জ্ঞা | রমা মজ্ঞা | রা সা I রা ণা ধপা | ধা মা | পা -া | -া -া I
কা লে র কা লো ছা০ ০ য়া তে অ রু ণ০ ব র ণী ০ ০ ০

I পা ধা ণা | র্সা র্রা | র্সনা -র্সা | ণধা পমা I পা র্সা র্সা | ণপা মজ্ঞা | রা -া | -া -া I
ম র ণ ম য় কা০ ০ য়া০ তে০ ম র ণ হ০ র০ ণী ০ ০ ০

I মা পা পা | ণপা না | না -র্সা | র্সা র্সা I না র্সা র্রজ্ঞা | র্রা র্সা | নর্সর্রা -র্সা | র্সা -ণা I
তো মা র অ০ ব ত ০ র ণে ধ র ণী০ ত ব চ০০ ০ র ণে

I ধা ণা ণা | ধা পা | পধা -মা | পা পা I মা ণা ণা | ধা পা | পা -সরা | জ্ঞা -া I
ল ভি ল চি র শ০ ০ র ণে স্ব র গ সু ধা ধা ০০ রা ০
“বহিয়া…………………………………………ঘুমহারা” II II

চির-অভিসারিকা

কবিশেখর শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

শারদ আকাশে চেয়ে আছি পথ
তোমারি তরে,
কবে এসে তুমি তুলে নেবে বুকে
আদর করে'
মেঘ বলাকায় হাসি কান্নায়
বর্ষা যেথায় শরতে মিলায়,
সেই মোহনায় শুভ লগনের
মিলন ক্ষণে,
আমারে কি প্রিয় হারা সাথী বলে
পড়িবে মনে।

পড়িবে কি মনে শেফালী ঝরাণ
আঙিনা তলে,
বাদল শেষের বরিষণ যেথা
চোখের জলে।
এই মুখভার—এই অভিমান,—
হাসি-কান্নার বেদনার গান,
মেঘ-গুণ্ঠন ফুল মুখ তুলি
চাহনি লাজে,
আসিবে কি চির অভিসারিকার
বিরহী সাজে!

ভারতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা অবসানের প্রয়াস

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য নাই বলিলেই চলে। এইজন্যই রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবার জন্য ভারতের শাসনকর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হইয়াছেন। যুদ্ধ ও দেশবিভাগ-জনিত বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াও তাঁহারা বিপুল পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়ের দায়িত্ব লইয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা ও কার্য্যকরী করিয়াছেন। সুখের কথা, নানা দিক হইতে এই পরিকল্পনার লক্ষণীয় সাফল্য দেখা যাইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়াও বর্ত্তমানে রচিত ও আলোচিত হইতেছে। এইরূপ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আধুনিক জগতের উপযোগী স্বয়ংসম্পূর্ণ নূতন ভারত গড়িয়া তুলিবার বলিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। জনস্বার্থের প্রতিকূল দীর্ঘপ্রচলিত জমিদারী-প্রথা বাতিলের ব্যবস্থাও এই আকাঙ্ক্ষাজাত।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রধানতঃ কৃষিকেন্দ্রিক করিয়া রচিত হয়। কৃষির উল্লেখযোগ্য উন্নতির পর, যতদূর জানা গিয়াছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে শিল্পপ্রসারের উপর জোর দেওয়া হইবে। এই ব্যাপক শিল্পসংস্কারের মুখে ভারতসরকার শিল্প-পরিচালনা-ক্ষেত্র যথাসম্ভব ত্রুটিশূন্য করিতে আগ্রহশীল হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক। ভারতীয় কোম্পানী আইন (Indian Companies Act) অনুসারে ভারতের শিল্পজগৎ মোটামুটি নিয়ন্ত্রিত হয়। শিল্পক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এইজন্য কর্ত্তৃপক্ষ নূতন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় কোম্পানী আইন তথা ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার সংশোধন করিতে চান। পার্লামেন্টে বর্ত্তমানে ভারতীয় কোম্পানী আইন সংশোধনের একটি বিল উপস্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের এই বিলের খসড়াটি পার্লামেন্টে পেশ হইলে বিবেচনার জন্য তাহা এক সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। গত ১৯শে আগষ্ট সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ সহ বিলটির আলোচনার প্রস্তাব পার্লামেন্টের লোকসভায় গৃহীত হয় এবং বর্ত্তমানে পার্লামেন্টে বিলটি ধারাবাহিকভাবে বিবেচিত হইতেছে। এই বিলে ভারতীয় শিল্পের উপর হইতে ম্যানেজিং এজেন্সির সর্ব্বাত্মক প্রভাব বাতিল বা অন্ততঃ লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস করিবার কথা আছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের অর্থসচিব শ্রীচিন্তামন দেশমুখ সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ-গুলিকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন।

সিলেক্ট কমিটির বিবেচনাসহ বিলটিতে ম্যানেজিং এজেন্সি সম্পর্কে যেসব বিধান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল নীতি হিসাবে ভারতের বেসরকারী শিল্পক্ষেত্র হইতে (১) ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার প্রভাব প্রতিপত্তি বিলোপের ব্যবস্থা। এই বিল অনুসারে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের পর সাধারণভাবে ভারতীয় শিল্পে ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগ চলিবে না এবং সে সময় যে সব ম্যানেজিং এজেন্ট চুক্তি অনুযায়ী কার্য্যকাল উত্তীর্ণ না হইবার জন্য অথবা বিশেষ প্রয়োজনে বা জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে কাজ চালাইবার সরকারী অনুমতি লাভ করিবে, সরকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন ক্ষেত্রেই তিন বৎসরের নোটীশ দিয়া তাহাদের বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত, যেক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সি থাকিবে, সেখানে ম্যানেজিং এজেন্টদের ক্ষমতা বা অধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কোম্পানীর সহিত ম্যানেজিং এজেন্টের চুক্তিপত্র সরকারের অনুমোদন বা সংশোধনসাপেক্ষভাবে তাঁহাদের নিকট রেজেষ্ট্রিতো করিতেই হইবে, তাছাড়া কোন ম্যানেজিং এজেন্ট তাঁহার বা তাঁহাদের মাসিক পারিশ্রমিক ও বার্ষিক লভ্যাংশ হিসাবে কোম্পানীর নিট মুনাফার শতকরা ১১ ভাগ অথবা ৫০ হাজার টাকা, ইহার মধ্যে যেটি বেশি, তাহাই মাত্র লইতে পারিবেন। কোন একটি ম্যানেজিং এজেন্টের একসঙ্গে দশটির বেশি কোম্পানী পরিচালনা এই বিলে নিষিদ্ধ করিতে চাওয়া হইয়াছে এবং এই বিধান অমান্য করিলে কোম্পানী পিছু প্রচণ্ড জরিমানা ধার্য্য করিবার কথা বলা হইয়াছে। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীতে ম্যানেজিং এজেন্টদের মনোনীত ডিরেক্টরের সংখ্যা কমাইবারও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শিল্পক্ষেত্রে বর্ত্তমান দুর্নীতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিলে এইরূপ নির্দ্দেশও দেওয়া হইয়াছে—ম্যানেজিং এজেন্টদের স্বার্থসম্পর্কিত ব্যক্তিরা কোম্পানীর ক্রয় বিক্রয় এজেন্ট নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। সিলেক্ট কমিটি আশা করিয়াছেন যে, বিলটি ইহার নিজস্ব গুরুত্বের জন্যই আইনে পরিণত হইতে বাধা পাইবে না এবং সেজন্য তাঁহারা সরকারের আইন পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত দপ্তরের অধীনে এই বিশেষ উদ্দেশ্যসংশ্লিষ্ট একটি বিধিবদ্ধ কমিটি গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন।

সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ সহ উপরোক্ত বিলটি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, কর্তৃপক্ষ ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্টদের স্থান বা দান সম্পর্কে অবহিত নহেন এমন নয়, (২) কিন্তু মধ্যসত্বভোগী জমিদারদের

(১) সরকারী শিল্পক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগ চলিবে না, বিলে একথা স্পষ্ট বলা হইয়াছে।

(২) ভারতে যে সব শিল্পসংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সংগঠনে ম্যানেজিং এজেন্টদের অবদান অনস্বীকার্য্য। এ অবদান পরিচালনা-যোগ্যতা এবং অর্থসংস্থান উভয় হিসাবে লক্ষ্য করা যায়। সরকারী হিসাবেই প্রকাশ, ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে রেজেষ্ট্রিকৃত কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১৩,৬৮৯টি এবং কার্য্যকরী মূলধন ছিল ৩৫৪ কোটি টাকা।

মত অংশীদারদের বঞ্চিত করিয়া ম্যানেজিং এজেন্টরা শিল্প-মুনাফার মোটা অংশ নিজেদের পকেটে ভরিতে থাকায় ও শিল্পের সম্পর্কে অন্যান্য নানা প্রভাববিস্তার করায় এবং বাস্তবক্ষেত্রে বর্ত্তমানে প্রতিভাশালী কর্ম্মচারীদের বা কারিগরদের সহযোগিতায় ম্যানেজিং এজেন্ট ছাড়াই বহু শিল্পের স্বাবলম্বী হইবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় তাঁহারা ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা বাতিল করিতে এবং শিল্পোৎপাদনের প্রয়োজনে যে ক্ষেত্রে বাতিল করা চলিবে না, সে ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থে ও যতটা সম্ভব জনস্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর সকল দিক হইতে জাতীয় পুনর্গঠনের প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করিবেন। সে হিসাবে এদেশের অস্বাভাবিক ও অন্যায্য ধনবণ্টন-অসাম্য বিদূরণের যে কোন প্রচেষ্টাই মূল্যবান। ম্যানেজিং এজেন্টদের শিল্পক্ষেত্র হইতে বিতাড়ন সম্ভব হইলে ধনবণ্টন ব্যবস্থায় অবশ্য কিছুটা সমতা আসিবে। কিন্তু সেই সূত্রে ভারত সরকারের দায়িত্বের কঠিন বাস্তব দিকটাও অবশ্য মনে রাখিতে হইবে। ভারত কৃষি-কেন্দ্রিক দেশ, শিল্পের হিসাবে পশ্চাৎপদ। এদেশে শিল্পসমৃদ্ধি না ঘটিলে জনগণের আর্থিক ভবিষ্যৎ কিছুতেই নিশ্চিত হইবে না। এদেশে প্রভূত পণ্যাভাব বিদ্যমান, সে হিসাবেও শিল্পজাত বহুবিধ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি আশু আবশ্যক। কর্ম্মসংস্থান সমস্যার সমাধানেও শিল্পপ্রসার অনুপূরক। কাজেই শিল্পের ক্ষেত্র হইতে ম্যানেজিং এজেন্টদের একেবারে সরাইবার প্রস্তাবের হৃদয়ানুভূতি বা সেন্টিমেন্টজনিত মূল্য যথেষ্ট হইলেও বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধ হইতে অভিজ্ঞ কুশলী ম্যানেজিং এজেন্টদের একেবারে সরাইতে সরকার বোধহয় সাহস পাইতেছেন না। এইরূপ বিপ্লবাত্মক শিল্পব্যবস্থা অবিলম্বে চালু হইলে পরিচালনার যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইতে না পারার জন্য উপস্থিত দেশবাসী মূলধন বিনিয়োগে সঙ্কোচবোধ করিতে পারে এবং প্রারম্ভিক মূলধনের অভাবে শিল্পসংগঠন দুরূহ হইতে পারে। অবশ্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের পর এই মূলধন যোগান 'ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার' অন্যতম কর্ত্তব্য। তবু শিল্পপতিরা নিজ দায়িত্বে যেরূপ নূতন শিল্পক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারেন, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ককে তদপেক্ষা অনেক সাবধানতার সহিত অর্থবিনিয়োগে পদক্ষেপ করিতে হইবে। হৃদয়াবেগের হিসাবে ভারতে বৃহৎ শিল্পের সামগ্রিক জাতীয়করণ অবিলম্বে হইলে সকলেই খুসী হইতেন, কিন্তু একই কারণে এই জাতীয়করণ পিছাইয়া যাইতেছে। ভারত সরকারের ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ঘোষিত শিল্পনীতি হিসাবে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই জাতীয়-করণের আশা একরূপ সুদূরপরাহত। ভারত সরকার বর্ত্তমানে বাধ্য হইয়াই পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতেছেন, কাজেই শিল্পপণ্য উৎপাদনের জন্য নৈতিক সমর্থন থাকিলেও সম্পূর্ণ জাতীয়করণ বা ম্যানেজিং এজেন্সি সম্পূর্ণ বাতিল করিবার প্রশ্ন বিলম্বিত হইতেছে। (৩) শুধু বামপন্থীগণ নন, কংগ্রেসীদের অনেকেও এখন ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা চালু থাকার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবেই মতপ্রকাশ করিতেছেন। শ্রী এন ভি গ্যাডগিলের মত প্রবীণ কংগ্রেস নেতা লোকসভায় কোম্পানী বিল সম্পর্কে সাধারণ বিতর্কে অংশ গ্রহণকালে বলেন যে, 'অতীতে ম্যানেজিং এজেন্টদের কার্য্যকলাপ হইতে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহা আর ম্যানেজিং এজেন্সি চালু রাখিবার পক্ষে অনুকূল নয়। তিনি দৃঢ়তার সহিত এমন কথাও বলিয়াছেন যে, অতঃপর ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা চালু থাকিলে স্বাধীন ভারতের শাসন-তন্ত্রের অমর্য্যাদা হইবে।'

ভারতে শিল্পের এখন যে অবস্থা ও যেরূপ সম্ভাবনা, তাহাতে অবিলম্বে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা সম্পূর্ণ বাতিল করা সঙ্গত নয় বলিয়া আমরাও মনে করি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পের জন্য যেটুকু ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার মধ্যে বেসরকারী অবদানই বেশি (সরকারী খাতে ১৭৩৭ কোটি ও বেসরকারী খাতে ৫৩৩ কোটি টাকা)। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় মূল শিল্পের উপর জোর দেওয়া হইবে বলিয়া সরকারী খাতে অধিকতর অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা থাকিলে বেসরকারী দায়িত্বে শিল্পপ্রসারের উপর পরিকল্পনাকারগণের কম আশা থাকিবে না। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যখন পার্লামেন্টে অর্থনৈতিক আলোচনা চলিতেছিল, তখনও পার্লামেন্ট জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে বেসরকারী শিল্পের সবিশেষ গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। বেসরকারীভাবে ভারতে শিল্পোন্নয়নের উপর যদি কর্তৃপক্ষের আস্থা থাকে, তাহা হইলে এযাবৎ যে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা বেসরকারী শিল্পোন্নতিতে বিরাট দায়িত্ব বহন করিয়া আসিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া দিতে হইলে পূর্ব্বাহ্নে শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার প্রশ্ন অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে। অবশ্য যদি দেশের অভ্যন্তরভাগ হইতে মূলধন ও পরিচালনা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সম্পদ আহৃত হইবার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়, অথবা বিদেশী সম্পদ লাভজনকভাবে এদেশের বেসরকারী

১৯৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে ৯৮৩ কোটি টাকা মূলধন লইয়া ২৯,৭৭৯টি রেজেষ্ট্রিকৃত কোম্পানী ভারতে কাজ করিয়াছে। ম্যানেজিং এজেন্টরা এইসব শিল্পের প্রারম্ভিক মূলধনের শতকরা অন্ততঃ ১৫ ভাগ এবং ঋণ ও অগ্রিমের শতকরা অন্ততঃ ২৫ ভাগ জোগাইয়াছে। (সরকার সম্প্রতি ১৩৪০টি ম্যানেজিং এজেন্সি পরিচালিত ১৭২০টি যৌথ প্রতিষ্ঠানের হিসাব লইয়া দেখিয়াছেন যে, ইহাদের মোট ২৫১ কোটি টাকা আদায়া মূলধনের মধ্যে ম্যানেজিং এজেন্টগণ যোগাইয়াছেন ২৯ 'কোটি টাকা বা শতকরা ১৩·৬ ভাগ।) এছাড়া বাজার হইতে অংশীদারী-মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে ম্যানেজিং এজেন্টদের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং ব্যবসায়িক সুনাম-সম্ভ্রমের মূল্য কম নয়।

(৩) এ সম্পর্কে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয়-শিল্প-পরামর্শদান সমিতির (Central Advisory Council of Industries) প্রথম অধিবেশনে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু যে কথাটি বলেন, তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :—"The Government's resources were meant to increase production and not just apply them to transfer of ownership."

শিল্পপ্রসারে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা বাতিল করিতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না। নীতিগতভাবে সরকারী কর্তৃপক্ষের এই প্রথা অবসানের যৌক্তিকতা স্বীকৃতির কথা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করিতে হইলে সম্ভাব্য আভ্যন্তরীণ সুযোগ সুবিধা লইয়া জুয়াখেলা ঠিক নয়, ইহাই বিশেষজ্ঞগণের মত। বেসরকারী শিল্পে প্রয়োজনীয় বিপুল নগদ টাকার প্রশ্ন তুলিয়া এইজন্যই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারের উদার ও ব্যাপক ঋণ সংগ্রহনীতি সম্পর্কে অনেকে কটাক্ষ করিয়াছিলেন। জাতীয়করণের সংকল্পও এই জন্যই স্থগিত হইতে চলিয়াছে। ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা অবসানের প্রশ্নেও ইহাই বাস্তব অসুবিধা। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু আপন দায়িত্ব স্মরণ রাখিয়া সাবধানতার সহিত মধ্যপথ অবলম্বনের পক্ষপাতী। এইজন্যই সম্প্রতি লোকসভায় মাদ্রাজের কংগ্রেসী সদস্য শ্রীএন এস লিঙ্গম্ যখন ম্যানেজিং এজেন্সি অবসানের একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখ স্থির করিয়া দেওয়া উচিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন, প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, এখনই এইভাবে দিন স্থির করা উচিত হইবে না। আমাদেরও মনে হয় এখন নীতি স্থির করিয়া বাস্তব-অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে পরে দিন স্থির করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। দেশের শিল্প-সম্ভাবনার পূর্ণ রূপায়ণই উপস্থিত সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং সে সমস্যাকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হইবে। অন্ততঃপক্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে এ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। সম্ভবতঃ এইজন্যই সিলেক্ট কমিটি কোম্পানী আইন সংশোধন বিলে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা বিলোপ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপ গ্রহণের আগে বা ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সুরু করিতে চাহেন নাই।

তবে বলাই বাহুল্য, ম্যানেজিং এজেন্সি প্রয়োজনের হিসাবে বা দেশের শিল্পস্বার্থে টিকিয়া থাকিলেও এই প্রথার বিপুল পরিমাণ গলদ দূর করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা অবিলম্বেই দরকার। সম্প্রতি কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সদস্যদের নিকট প্রেরিত এক সার্কুলারেও উপরোক্ত কোম্পানী আইন সংশোধন বিলের ম্যানেজিং এজেন্সি সম্পর্কিত ধারাগুলিকে কঠোর করিবার পক্ষেই সুপারিশ করা হইয়াছে। ম্যানেজিং এজেন্টরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে শোষণ চালান, তাহা অবিলম্বে বন্ধ করিয়া ন্যায্য পারিশ্রমিক গ্রহণে তাঁহাদের বাধ্য করাই এই সুপারিশের উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির সুপারিশসহ বিলের মূল ধারাগুলির উল্লেখ ইতিপূর্ব্বেই করা হইয়াছে। এছাড়া কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির উপরোক্ত সার্কুলারে সদস্যবৃন্দকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা যেন কোম্পানী আইন সংশোধনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কর্ত্তৃক ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত স্পেশাল অফিসার শ্রীএস, সি, সেনের সুপারিশগুলি পুনরালোচনা করেন। ম্যানেজিং এজেন্সি পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল সংরক্ষণ নীতি সম্পর্কে শ্রীসেন এই সুপারিশে তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিলেন এবং সরকারী ঋণপত্রের মত নিরাপদ জামিনে ইহাদের লগ্নী করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন।

গান্ধীজী ভারতে শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জীবন দিয়াছেন। তিনি ব্রিটিশ শোষণ হইতেই শুধু ভারতের মুক্তি চাহেন নাই, দেশীয় শোষণ হইতেও মুক্তি চাহিয়াছিলেন। (৪) কাজেই ধনী ম্যানেজিং এজেণ্টদের বংশানুক্রমিক কবল হইতে দেশের অর্থনীতির মুক্তিপ্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই এবং সে হিসাবে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার যতশীঘ্র অবসান ঘটে ততই ভাল। ইতিপূর্ব্বেও ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার দোষগুলি সম্পর্কে ভারত সরকার যে সচেতন ছিলেন, তাহার প্রমাণ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানী আইনের সংশোধন। এই সংশোধনে ম্যানেজিং এজেণ্টদের সর্ব্বোচ্চ কার্য্যকাল এবং তাঁহাদের উপভোগ্য কোম্পানীর মুনাফার অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সংশোধনে আরও স্থির হয় যে, কোম্পানীর সম্পত্তি কেনাবেচা করিতে হইলে ডিরেক্টরদের সভা আহ্বান করিয়া সভায় উপস্থিত ও ভোটদানের অধিকারী ডিরেক্টরদের ¾ অংশের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে। এবারকার সংশোধন প্রস্তাবে এই ক্ষমতা-সংকোচন আরও প্রত্যক্ষ ও কঠোর করিবারই ব্যবস্থা হইয়াছে। (৫)

ভারতে পণ্যউৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা তীব্র সন্দেহ নাই এবং সেজন্য ম্যানেজিং এজেণ্টদের এখনই ছাড়িয়া দেওয়ায় অসুবিধা আছে। কিন্তু আবাদী কংগ্রেসে গৃহীত সংকল্প অনুযায়ী ভারতের সমাজতান্ত্রিক রূপ দিতে হইবে এবং সে হিসাবে শ্রেণীগত শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার সঙ্কোচ সাধন এই শোষণ হ্রাসের অনুপূরক বলিয়া মহাত্মা গান্ধীর দেশে এই ব্যবস্থা কল্যাণকর।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বা তাহারও পরে যদি ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা প্রচলিত থাকেই, ম্যানেজিং এজেণ্টদের ক্ষমতা সঙ্কোচন অবিলম্বে হওয়া দরকার। এই ক্ষমতা হ্রাস শুধু ম্যানেজিং এজেণ্টদের ধন-তান্ত্রিক অন্যান্য সুবিধালাভের সঙ্কোচনের উদ্দেশ্যেই নয়, পরোক্ষভাবে দেশের সমগ্র অর্থনীতির উপর ইহার অনুকূল প্রভাব পড়িবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া আলোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, ভারতের কয়লা

---

(৪) "Swaraj for me means freedom for the meanest of our countrymen. I am not interested in freeing India merely from the British Yoke, I am bent upon freeing India from any Yoke whatsoever. I have no desire to exchange 'King Log for King Stork.''

(৫) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি এক বিবরণীতে জানাইয়াছেন যে ১৯৫১, ১৯৫২ ও ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ—এই তিন বৎসরে ম্যানেজিং এজেণ্টরা গড়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের মোট মুনাফার শতকরা ২৭.৭ ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই আলোচ্য সংশোধনের পর পারিশ্রমিকের হার শতকরা ১১ ভাগে নামিয়া আসিলে ম্যানেজিং এজেণ্টদের শোষণ লক্ষ্যণীয়-ভাবে হ্রাস পাইবে।

খনিগুলিতে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দ্বারা উৎপাদন শতকরা ১২½ হইতে ১৫ ভাগ বাড়িয়াছে, অথচ এই বৃদ্ধির অনুপাতে মোটেই নূতন শ্রমিকের কর্ম্মসংস্থান হয় নাই। বলা নিষ্প্রয়োজন, এ ব্যবস্থা মারাত্মক। নিজেদের মুনাফা বাড়াইবার ঝোঁকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ম্যানেজিং এজেণ্টগণ যদি শিল্পক্ষেত্রে র‍্যাশানালাইজেশনের ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োগ চালাইতে থাকেন, দেশ পণ্যের দিক হইতে কিছু লাভবান হইলেও বেকার সমস্যার প্রবল চাপে তাহাতে লাভের চেয়ে বিপদ হইবে অনেক বেশি। গান্ধীজীর অর্থনীতির সহিত পরিচিত সকলেই জানেন যে, গান্ধীজী ভারতের মত বেকার-সমস্যা-ক্লিষ্ট দেশে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির উপর অধিক জোর দিয়াছেন এবং কুটিরশিল্পের সম্প্রসারণে তাঁহার আগ্রহের ইহাই কারণ। কাজেই শিল্প যদি সরকারের হাতে বা সরকারের অধিকতর নিয়ন্ত্রণে আসে, তাহা হইলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ও বেকার সমস্যার বিবেচনায় তাঁহারা নূতন দৃষ্টিকোন হইতে ভারতের শিল্প পরিচালনা-নীতি নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেণ্টদের মুনাফাভোগের প্রশ্ন না থাকিলে অংশীদারদের সন্তুষ্ট রাখাও কঠিন হইবে না।

কাজে কাজেই ম্যানেজিং এজেন্সি সম্পর্কে দেশবাসীর বিপুল বিরূপ সমালোচনা লক্ষ্য করিয়া মধ্যসত্বভোগী ম্যানেজিং এজেণ্টদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণ-অন্তে যথাসত্বর শিল্পক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দেওয়াই ভাল। সাহস করিয়া ও দায়িত্ব লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে না পারিলে কঠিন কার্য্যোদ্ধার হয় না, ভারতে শিল্পক্ষেত্র হইতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার অবসান ঘটাইতে হইলে কর্তৃপক্ষকে এইরূপ সাহস করিয়াই দায়িত্বগ্রহণ করিতে হইবে।

গুণাশ্রয়ে গুণময়ে

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্য বা দুর্গাসপ্তশতীর একাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, দেবতাদের পরমশত্রু অসুরেন্দ্র শুম্ভ দেবীর হস্তে নিহত হ'লে হর্ষোৎফুল্ল দেবগণ বিভিন্ন গুণব্যাখ্যানমুখে দেবীর প্রসন্নতা আকাঙ্ক্ষা করে কৃতজ্ঞতা নিবেদন কচ্ছেন। তা' নারায়ণী-স্তুতি বলে আখ্যাত। তা'তে দশম শ্লোকে দেবতারা বলছেন—"সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি। গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥" সহজভাবে এ'র মর্ম্মার্থ হচ্ছে "সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণরূপা, নিত্যা, গুণত্রয়ের আশ্রয় এবং ত্রিগুণময়ী তুমি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম।" শ্লোকটির ব্যাখ্যা এ ভাবে মিলিয়ে দিলেও শব্দশক্তির মূলানুসন্ধান পরীক্ষায় এবং তাৎপর্য্য বিশ্লেষণের নিকষ-যন্ত্রে উপর্য্যুক্ত শ্লোক মন্থন করে এই মাত্রই কি এর মর্ম্মার্থ অনুভূত হয় অথবা এতদপেক্ষাও কোন গভীর রহস্য বা পরম তাৎপর্য্য এই শ্লোকে অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে,—যার সঙ্গে আমরা সহজ দৃষ্টিতে পরিচয় করে উঠ্‌তে পারি না—তাই আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা কোরবার চেষ্টা কোরবো।

আপাতদৃষ্টিতে শ্লোকের যে অর্থ আমরা বুঝি, তা'তে কতকগুলি অসামঞ্জস্য ও সন্দেহের বিষয় প্রতীতিগোচর হয়, যেমন—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণরূপা যিনি, তিনি সাংখ্য সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বের প্রকৃতিরূপা হ'তে পারেন, কিন্তু 'নারায়ণী' অর্থাৎ নারায়ণের পত্নী 'লক্ষ্মী' —এরূপ পৌরাণিক ব্যাখ্যা সাংখ্যসম্মত হওয়া সহজভাবে দুরূহ। আর যদি ব্রহ্মই নারায়ণপদবাচ্য হন, তাঁর শক্তি অর্থে নারায়ণী বলা হ'য়ে থাকে,...তা'তে সেই শক্তিরূপিণী মায়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ হ'তে পারেন বটে, কিন্তু এক ব্রহ্ম ভিন্ন 'নিত্য' ত কেহ নয়, সুতরাং তিনি নিত্যা এ কথার সাহজিক অর্থ সঙ্গত হয় না। তারপর 'গুণাশ্রয়ে গুণময়ে'—যিনি গুণাশ্রয়—তাঁরই বিকারার্থক 'ময়ট্' প্রত্যয়ান্ত গুণময় হওয়া—অর্থাৎ গুণের বিকৃতিস্বরূপ, এ-কথাও সঙ্গত হয় না—আশ্রয় আর আশ্রিত কখনো একই বস্তু হ'তে পারে না। প্রাচুর্য্যার্থ ব্যাখ্যা হ'লে অবশ্য একটা সঙ্গতি দেখান যেতে পারে—প্রচুর গুণ যা'তে রয়েছে, তৎস্বরূপা। যেমন 'জলময়' প্রচুর জল। কিন্তু তা'তে দোষ হ'ল যে গুণের প্রাচুর্য সম্ভাবিত হ'লেও অপ্রাচুর্যটি কিসের? একটি বিশেষ সম্পদের প্রাচুর্য হ'লে অন্য সম্পদেরও কিঞ্চিৎ সত্তা প্রতীত হয়, সুতরাং এতেও সামঞ্জস্য কোথায়? অধিকন্তু ময়ট্ প্রত্যয়স্থি পদে স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ্' বিহিত, সুতরাং "গুণময়া" পদটি ব্যাকরণসম্মতও হয় না, তৎস্থলে গুণময়ী পদই সাধু, তা'তে 'হে গুণময়ি' এরূপ হওয়াই সঙ্গত। তদ্ভিন্ন বিশেষ অসঙ্গতি হ'ল মূলগত, অর্থাৎ যদিই বা এ সব ব্যাখ্যার সাহায্যে সাংখ্যের প্রকৃতি বা বেদান্তের ব্রহ্মশক্তি মায়া রূপে বর্ণনা করে একটা সামঞ্জস্য আনাও যায়, তা'তে শব্দার্থের সমন্বয় একটা দেখান যায় বটে, কিন্তু দেবীমাহাত্ম্যের প্রকৃত গৌরব বা যথার্থ মহিমাটি আর অবগুণ্ঠনমুক্ত হয়ে উঠে না। অর্থাৎ পুরুষাপেক্ষিণী প্রকৃতির পরিচয়ে বা ব্রহ্মাশ্রিতা মায়ার বৈভবে মহামায়া-তত্ত্বের ব্যাখ্যা দ্বারা মহামায়াকে ত ক্ষুণ্ণ করেই দেওয়া হ'ল, অন্য নিরপেক্ষ পূর্ণতার প্রকাশ হল কৈ?

এই সমুদায় সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন টীকাকারদের বিশ্লেষণ কি তথ্য উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে, তা' এবার অনুধাবন করা যাক্। টীকাকারদের অভিপ্রায় বুঝবার পূর্ব্বে এ তত্ত্বটি আমাদের স্মরণ করা উচিত যে, ব্রহ্মবাদীদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে এটাই নিগূঢ় তথ্য

যে, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম কূটস্থ অবস্থা থেকে অবতরণ না করে কখনো কাময়িতৃত্বাদি ধর্ম্মাক্রান্ত হ'তে পারেন না, আর তা' সম্ভব না হ'লে সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়াও আরব্ধ হয় না। এজন্য সৃষ্ট্যাদির জন্য তাঁর যে সৃষ্ট্যাদি-শক্তিরূপে প্রকাশ সে রূপান্তরিত অবস্থাগুলিকে লক্ষ্য করে তার সংজ্ঞা হ'ল ব্রহ্মা, হরি, হর। এই 'ব্রহ্মা হরি হর' আর মহামায়া যদি অভিন্ন রূপে ব্যাখ্যাত হয়ে থাকেন তবে একথা সহজেই বোধগম্য হয় যে, মূলতঃ মহামায়াতত্ত্ব আর পরমাত্মতত্ত্ব ভিন্নতত্ত্বরূপে টীকাকারদের অভিপ্রেত নয়। এ সম্বন্ধে চতুর্ধরীটীকা বলেন—"সৃষ্ট্যাদীনাং শক্তয়ো ব্রহ্মহরিহরাত্মকাঃ, তদ্ভূতে তৎস্বরূপে, সনাতনি নিত্যে গুণাশ্রয়ে গুণভাবনে, স হি প্রধানোপহিতঃ সত্ত্বাদ্যধিকরণং ভবতি গুণময়প্রকৃতিভাবেন। সা হি সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা।"

এখানে একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—টীকাকার 'গুণাশ্রয়ে' পদের মর্ম্মব্যাখ্যা করেছেন 'গুণভাবনে'। এই গুণভাবন কার?—তা'র উত্তরেই নিজে বলছেন "স হি প্রধানোপহিতঃ সত্ত্বাদ্যধিকরণং ভবতি" অর্থাৎ সাংখ্যসিদ্ধান্ত অনুসারে অসঙ্গ পুরুষ অথবা বৈদান্তিক সম্মত পরব্রহ্ম যিনিই হোন্ তিনি স্বভাবতঃ নির্গুণ হওয়াতে তা'তে গুণবত্তার (শ্রুতিসিদ্ধ কাময়িতৃত্বাদির) সমাবেশ যথার্থতঃ হ'তে পারে না, সুতরাং যা' হয়েছে তা' তুমি ঘটিয়েছ, তোমার অবলম্বনেই— (স হি প্রধানোপহিতঃ) সেই পরমাত্মা "সত্ত্বাদ্যধিকরণং",—অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি শক্তিমান্ রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। সত্ত্বগুণ প্রকাশগুণ—অর্থাৎ সৃষ্ট হ'লে তবে ত প্রকাশ, সুতরাং সৃষ্টিশক্তি ব্রহ্মা, রজোগুণ ধারণশক্তি, বাঁচিয়ে রাখার সামর্থ্য সুতরাং পালনীশক্তি বিষ্ণু, আর তমোগুণ স্বরূপনাশিকা শক্তি সুতরাং সংহারে মহেশ্বর। এইরূপে গুণবিভাবন কে ঘটায়?—তুমি মহামায়া। তাই টীকাকারের উক্তি—গুণাশ্রয়ে গুণভাবনে। আবার তুমি নিজে গুণাধিকার না রাখলে তোমার সংস্পর্শে নির্গুণে গুণাধিকার আসতে পারে না—সুতরাং তুমি গুণময়। "সা হি সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা"। এরূপ ব্যাখ্যা বিন্যাস করেও আবার জগদ্রূপেও মহামায়াকে বিশ্লেষণ করে টীকাকার মহামায়ার সর্ব্বাত্মকতা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। "যদ্বা গুণাশ্রয়া ব্যোমাদিভাবেন গুণময়া শব্দাদিভাবেন," অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূতরূপে তুমি গুণাশ্রয়, [আকাশাদি দ্রব্য পদার্থ, সুতরাং গুণবত্তা তর্কশাস্ত্রসিদ্ধ, 'শব্দগুণকমাকাশম্'] আর শব্দাদি গুণরূপে তুমি গুণময়া। অর্থাৎ তুমিই শব্দের আশ্রয় আকাশ—তুমিই আকাশাশ্রিত শব্দ। সুতরাং এই ভেদ মূলত একতত্ত্বের। অভিন্ন তুমিই উভয়রূপা।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়, এই স্বরূপার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় নিষ্পন্ন 'গুণময়' পদের স্ত্রীলিঙ্গে 'গুণময়া' পদটি সর্ব্বমতসিদ্ধ নয়, 'ময়ট্' প্রত্যয়ান্ত পদের স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ্' বিধানই শাস্ত্রসম্মত, এজন্য এখানে টীকাকার একটা ভিন্নপন্থা উদ্ভাবন করেছেন। তিনি এখানে বলেছেন—"তদ্ধিতা নানাবিধা প্রত্যয়াঃ স্যুঃ" মহাভাষ্যে এরূপ একটি কথা পাওয়া যায়—এইটি অবলম্বন করে আপ্ প্রত্যয় করা যেতে পারে। "শান্তনবীটীকাকার এই 'গুণময়া' পদটি সন্দেহমুক্ত রাখবার জন্যে বহুবিধ কৌশল অবলম্বন করেছেন, আমরা যথাস্থানে তার আলোচনা কোরবো।

শ্লোকের আদ্যাংশের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ টীকাকারই প্রায় তুল্যরূপ বিশ্লেষণরীতিই প্রয়োগ করেছেন। শান্তনবীটীকাকার এখানে অন্যান্য টীকাকারদের সঙ্গে ঐকমত্য রক্ষা করেও অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য দেখিয়ে বলিষ্ঠ বচোভঙ্গীর সন্ধান দিয়েছেন। তিনি প্রথমতঃই মহামায়াকে সৃষ্ট্যাদি শক্তিরূপে আবির্ভূতা বলেছেন অর্থাৎ অন্য কোন তত্ত্ব যেন শক্তিরূপে প্রকাশিতা হ'য়েছেন, আবার তাঁকেই শক্তিস্বরূপাও বলেছেন। আবার সেই শক্তিত্রয়ের উদ্ভবস্থান মূলাধার পরমাত্মার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে সংবদ্ধ ব'লে গুণগুণীর অভেদের ন্যায় তন্তুপটের দৃষ্টান্তে উভয়ের ওতপ্রোতভাবটির ব্যাখ্যায় যথার্থতঃ অভেদ ও ব্যবহারতঃ ভেদাভেদ তত্ত্বটিরই ইঙ্গিত দিয়েছেন, আবার একেবারে পরব্রহ্মের শক্ত্যবতার-রূপেও বিশ্লেষণ ক'রে 'শক্তিভূতা'—'শক্তিভূতি' এই দ্বিবিধ পদেরই সম্ভাবনা দেখিয়ে বিচার-নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। অধিকন্তু শক্তি-সমূহের ভূমি বা প্রকাশস্থান যে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর—এই ত্রিতত্ত্বের বিতনন বা বিস্তার সংঘটনা ব্যাখ্যার ইঙ্গিতে লূতাতন্তুর (মাকড়সা ও তার জাল বিস্তার) দৃষ্টান্ত স্মরণ করে যে উপাদান উপাদেয়ের অভেদ তত্ত্বটি এ' থেকে সুকৌশলে আবিষ্কার করে 'শক্তিভূতি' পদের বিশ্লেষণপটুত্ব দেখিয়েছেন—তা' টীকাকারের পাণ্ডিত্যপ্রতিভার অখণ্ডনীয় প্রকাশ। তত্ত্বব্যাখ্যার এরূপ নিগূঢ় বিশ্লেষণের ফলে নিত্যার্থক 'সনাতনী' পদটির ও যথার্থ সার্থকতা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

টীকাকার প্রথমাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন—"জগতাং সৃষ্টেঃ সর্গস্য স্থিতের্বর্ত্তমানস্য বিনাশস্য প্রলয়স্য হে শক্তিভূতে শক্তিরিত্যেবং-ভূতা জাতা। হে শক্তিরূপে। জগতঃ সর্গস্থিতিসংহারকরণবিষয়ে যা শক্তিঃ শক্ততা সামর্থ্যরূপা তদ্ভূতা দেবী, তৎসম্বুদ্ধৌ হে শক্তিভূতে। যদ্বা ব্রাহ্মী শক্তিঃ সৃষ্টৌ, বৈষ্ণবী শক্তিঃ স্থিতৌ, মাহেশ্বরী শক্তির্বিনাশে তদ্ভূতা ত্রিশক্তিভূতা যা শক্তিঃ সা সামান্যেন শক্তিভূতা হে শক্তিভূতে। যদ্বা শক্তীনাং ভূঃ কারণভূতিঃ পরমাত্মা তেন উতা গুম্ফিতা তন্তুনেব প্রোতা। উঙ্ তন্তুসন্তানে বৃঃ! যদ্বা শক্তীনাং ভূতিরবতাররূপা শক্তি-ভূতিঃ হে শক্তিভূতে। যদ্বা শক্তীনাং ভুবঃ ভূময়ঃ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। তেষাং উতিঃ সংঘটনা তন্তুনেব গুম্ফনং সন্তননং শক্তিভূতিঃ। বেঞঃ স্ত্রিয়াং ক্তিন্। হে শক্তিভূতে! হে সনাতনি!...হে শাশ্বতি!"

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে অগ্রসর হ'লে শ্লোকের অপরার্দ্ধের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য সহজ হ'য়ে উঠবে। অপরার্দ্ধের "গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে" অংশটির অন্তর্গত গুণাশ্রয় পদের ব্যাখ্যাতেও টীকাকার নানাভাবে মূলতত্ত্বটি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—গুণসকলই হ'চ্ছে আশ্রয় অর্থাৎ স্বরূপপ্রকাশের অবলম্বন যাঁর তিনি গুণাশ্রয়া। অর্থাৎ গুণেতেই—সত্ত্বরজ আদিরূপে বিভাবিত বস্তুতেই স্থিতা। যা' কিছু বস্তু জগতে জ্ঞানগোচর হ'চ্ছে, তা'তে তাঁরই প্রকাশ, তিনি তা'তে রয়েছেন তাই বস্তুজগৎ জ্ঞানগোচর হ'য়ে থাকে। অথবা যাঁ'কে আশ্রয় করে গুণাদি প্রকাশিত হ'তে পারে। অথবা সত্ত্বাদি গুণযুক্ত যে 'গুণ' অর্থাৎ প্রকাশ সূত্র ব্রহ্মাদিরূপবিভাব, এ'রাই হ'চ্ছেন আশ্রয় অর্থাৎ অবলম্বন বা প্রকাশের যন্ত্র যাঁর ;—অর্থাৎ ব্রহ্মাদিশক্তিতে মহাসরস্বতী,

মহালক্ষ্মী ও মহাকালীরূপে ভগবতী, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী মূর্ত্তিতে আবির্ভূ'তা হয়ে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সংঘটন করেন—সুতরাং ঐ শক্তিগুলিই তাঁর প্রকাশস্থলী। টীকাকার বলেছেন—

"হে গুণাশ্রয়ে, গুণাঃ আশ্রয়ো যস্যাঃ সা গুণাশ্রয়া। গুণাঃ সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি ত্রয়ঃ। গুণেষু বর্ত্তমানেত্যর্থঃ। যদ্বা গুণানামাশ্রয়ো যত্র সা গুণাশ্রয়া, হে গুণাশ্রয়ে। যদ্বা সত্ত্বাদি গুণযুক্তা গুণাঃ যথাযোগং ব্রহ্মাদয়স্তে আশ্রয়ো যস্যাঃ সা গুণাশ্রয়া, হে গুণাশ্রয়ে!"

এভাবে তত্ত্ব বিশ্লেষণের কৌশলে প্রকৃত মর্ম্মার্থ প্রকাশ করে টীকাকারগণ নৈপুণ্য প্রদর্শন ক'রলেও 'গুণময়ে' পদটি নিয়ে তাঁরা যে নিজেদের বেশ বিব্রত বোধ করেছেন, তা' সহজেই ধরা যায়। চতুর্ধরী টীকাকার—এখানে সহজতঃ ময়ট্ প্রত্যয়ান্ত পদ বলে মেনে নিয়ে 'ঈপ্' বিধানস্থলে মহাভাষ্যের একটি টুক্‌রো কথার দোহাই দিয়ে 'আপ্' প্রত্যয়ের সাধুতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। শান্তনবী-টীকাকার এ যুক্তিটি স্বীকার ক'রতে চাননি। এজন্য তিনি এখানে পদের তাৎপর্য্য বা মর্ম্মার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে পদটির সাধুতা বজায় রাখবার চেষ্টায় প্রাণপাত করেছেন বলা যায়। তিনি বলেছেন—গত্যর্থক একটি 'ময়' ধাতু রয়েছে, যার রূপ 'ময়তে'। সুতরাং ময়তে অর্থাৎ গচ্ছতি। কোথায়? বলেছেন—'লোকান্'—অর্থাৎ 'লোকান্ ময়তে গচ্ছতি যা সা ময়া'। 'ময়' ধাতু অচ্+আ। মর্ম্মার্থ হ'ল এই যে, লোকরূপে যার গমন অর্থাৎ প্রাপ্তি বা প্রকাশ। কি উপায়ে? তা'তে হ'ল "গুণৈঃ"—অর্থাৎ গুণের দ্বারা। গুণের সহায়ে গতিমতী বা প্রকাশমানা, অর্থাৎ জগদ্রূপে তিনি পরিব্যক্তা, অথবা তিনি নিষ্ক্রিয়া হ'য়েও গুণসহযোগে সক্রিয়া। টীকাকারের স্বকীয় উক্তি—"ময় গতৌ। ময়তে গচ্ছতি লোকান্ ময়া। পচাদ্যচি স্ত্রিয়াং টাপ্। গুণৈর্ময়া, গুণৈর্গতিমতীত্যর্থঃ।"

এখানে টীকাকার একটি অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করেছেন, যা' প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে কদাচ দৃষ্টিগোচর হয়। বিশেষতঃ 'গুণময় পদটি এতই প্রসিদ্ধি নিয়ে বিপুল ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, কোন ব্যাখ্যান্তর এখানে যোগ্যতর বলে সঙ্গতি সাধনের সহায় হ'তে পারে তা' সহজে চিন্তার বিষয়ীভূত হয় না। টীকাকার দেখিয়েছেন—'গুণাশ্রয়ে গুণময়ে' এখানে "গুণাশ্রয়েঽগুণময়ে" এরূপ পাঠও হ'তে পারে! এই 'অগুণময়া' শব্দের তাৎপর্য্যও এখানে মহামায়ার তত্ত্বপ্রকাশে নিখুঁ'ত হয়ে উঠেছে। অগুণ অর্থাৎ নিগু'ণ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম সহায়ে তুমি 'ময়া'—অর্থাৎ গমনপরা জ্ঞায়মানা। গমন অর্থাৎ গতি-অবগতি জানা। ব্রহ্মতত্ত্ব দিয়ে তোমাকে জানা যায়। ব্রহ্মতত্ত্ব যার অজ্ঞাত তুমিও তার অজ্ঞাত। সুতরাং তোমার তত্ত্ব, তত্ত্বজ্ঞান বৰ্জ্জিত আমাদের অবিজ্ঞাত তত্ত্ব। টীকাকার বলছেন—"যদ্বা হে অগুণময়ে, অগুণং ব্রহ্ম ময়তে ময়া অগুণেন ময়া গমনপরা অগুণময়া, হে অগুণময়ে! ব্রহ্মতত্ত্বেন ময়মানা ইত্যর্থঃ।"

শান্তনবীটীকাকার যে এখানে 'ময়ট্' প্রত্যয়টি এড়িয়ে চলেছেন তাঁর বিশ্লেষণের কৌশল অনুধাবন করে সহজেই তা' বলা যায়। সুতরাং টীকাকারের মতে ময়ট্ প্রত্যয় এখানে অভিমত হ'লে গুণময়ী পদই সঙ্গত, গুণময়া পদ মেনে নেওয়া চলে না, কারণ তা' ব্যাকরণ শাস্ত্রসম্মত না হওয়াতে নিঃসন্দিগ্ধ সাধুপদ বলে গ্রাহ্য হবে না। এ অভিপ্রায়টিও—টীকাকার কৌশলে প্রকাশ করেছেন, যথা—"গুণাশ্রয়ে গুণময়ি' ইতি পাঠে তু গুণানাং বিকারঃ—গুণময়ী, হে গুণময়ি। 'ময়ট্ বৈতয়োর্ভাষায়াম্' ইত্যাদিনা ময়ট্। স্ত্রিয়াং টিদন্তত্বান্ ঙীপ্। যদ্বা গুণেভ্যো হেতুভ্য আগতা গুণময়ী। হে গুণময়ি।" ইত্যাদি। বিকারার্থক ময়ট্ প্রত্যয় দেখিয়ে প্রাচুর্য্যাদি অর্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের সম্ভাব্যতা দেখাতে টীকাকার ত্রুটি রাখেন নি, তা'তে বলেছেন "যদ্বা গুণাপ্রকৃতা উচ্যন্তে অস্যাং গুণময়ী দেবী, হে গুণময়ি। তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্।"—অর্থাৎ 'প্রকৃত গুণবত্তা বলতে এখানেই' গুণপ্রাচুর্য্য থাকলেই এরূপ ব্যবহার সম্ভাবিত হয়ে থাকে। সেই অর্থে "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" এটি প্রাচুর্য্যার্থের সূত্র। এক্ষেত্রেও শান্তনবীটীকাকার 'অগুণ' শব্দ রক্ষা করে 'অগুণময়ি' পদের সম্ভাবনা দেখিয়েছেন,—"যদ্বা অগুণময়ি নারায়ণি"—ইত্যাদি।"

'নারায়ণী' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাধারণতঃ পৌরাণিক সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা অবলম্বনে 'নারায়ণস্য স্ত্রী নারায়ণী' এই অর্থে নারায়ণ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গবিহিত 'ঈপ্' প্রত্যয় করে—তুমি লক্ষ্মীস্বরূপা এই সহজবোধ ব্যাখ্যাটি দেখিয়েই শান্তনবীটীকাকার পদটির বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেছেন। তা'তে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য দেখিয়েছেন, যা'তে দেবী-মাহাত্ম্যের মূল প্রতিপাদ্য বস্তুটির সঙ্গে চমৎকার সঙ্গতি সাধিত হয়েছে। তিনি বলেছেন—'অয়', ধাতুর অর্থ গমন অর্থাৎ প্রাপণ—এই প্রাপণ চরম প্রাপণ বা প্রাপ্তি, যার তুল্য পাওয়া আর কিছু হ'তে পারে না—'এই তাৎপর্যে—' 'অয়না' পদ নিষ্পন্ন হ'লে মুক্তিরূপ মর্ম্মার্থ লাভ করা যায়। প্ল শব্দ হ'ল অদিতি বাচক। সুতরাং প্ল থেকে জাত অপত্য এই অর্থে অণ্ করে "আর" অর্থাৎ অদিতিসন্তান দেবগণ। 'ন' শব্দটি যদিও 'নঞ্' অর্থে নিষেধাদিবাচক হ'তে পারে এবং তা'তে দেবতা ভিন্ন বোধকও হ'তে পারে—কিন্তু তা'তে অয়না পদের সঙ্গে অর্থসঙ্গতি থাকে না বলে তৎ-তাৎপর্য্যক বলা যেতে পারে না। এজন্য এখানে পদের তাৎপর্য্য রক্ষার অনুরোধে 'ন' শব্দটি নঞ সমানার্থক তৎসম্বন্ধাদির অভাববোধক বুঝে নিতে হ'বে। সুতরাং "ন সন্তি আরাঃ" এরূপ অর্থ কল্পনা করে নিতে হয়। অর্থাৎ আজো পর্য্যন্ত দেবতাগণ সাধকরূপে যেখানে সমর্থ নয় তিনি 'নারা'—দেবতাদেরও দুষ্প্রাপ্যা। আবার তিনিই 'অয়নী' সুতরাং নারায়ণী অর্থাৎ সাক্ষাৎ মুক্তিস্বরূপা। 'হে নারায়ণি তোমাকে প্রণাম। এই বিশ্লেষণ চাতুর্য্যে টীকাকার স্বয়ংসম্পূর্ণ করে মহামায়ার স্বরূপটি প্রকাশ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। 'নারায়ণের স্ত্রী নারায়ণী' এই ব্যাখ্যায় অগৌরবের কিছু মনে না হ'লেও লক্ষ্মী নারায়ণাপেক্ষিণী তদনুগতা এ বুদ্ধিটি এ'তে সংলগ্নই থেকে যায়। তা'তে অভিন্নরূপে পরব্রহ্মস্বরূপিণী—একথার মর্ম্ম উদ্ধারে বিরুদ্ধতা আসে। মনে হয় এই অভিপ্রায়টি টীকাকারের অন্তরে জাগ্রত ছিল, তার ফলেই এই অপূর্ব্ব প্রয়াস। শান্তনবীটীকাকার লিখেছেন—"নারায়ণস্য স্ত্রী নারায়ণী লক্ষ্মী, হে লক্ষ্মি, নমস্তেঽস্তু। যদ্বা অয্যতে ঈর্যতে গম্যতে প্রাপ্যতে অয়না মুক্তিঃ। প্ল-শব্দঃ অদিতিবাচী। অরোঽপত্যানি পুমাংসঃ আরাঃ দেবাঃ। ন-শব্দো নঞসমানার্থোঽননুবন্ধকঃ। ন

সত্ত্বাপি দেবাঃ সাধকশ্চেন যত্র সা নারা। নারা চাসৌ অয়নী চেতি নারায়ণী মুক্তিঃ। দেবৈরপ্যাপি দুষ্প্রাপ্যেত্যর্থঃ। তৎসম্বুদ্ধৌ—হে নারায়ণি, হে মুক্তে, নমোঽস্তু তে।"

নাগোজীভট্টটীকাকার পূর্ব্বোক্ত টীকাকারদের প্রতিপাদনীয় মর্ম্মার্থের সার সংক্ষেপ বলেই ছেড়ে দিয়েছেন। তবে তার একটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়, তিনি 'গুণাশ্রয়ে গুণময়ে' কথায় অগুণময়ে পাঠই ধরেছেন। 'গুণময়ে' পদোল্লেখ করে কোন ব্যাখ্যাই দেখাতে যান নি। "অগুণময়ে অবিদ্যমানগুণকৃতবিকারে" এই বলেই ব্যাখ্যা সমাপ্ত করেছেন। তা'তে দেখা যায় কোন ব্যাখ্যান্তর টীকাকারের অভিপ্রেত নয়, সুতরাং বলা যেতে পারে ইনি 'অগুণময়ে' পাঠই সমীচীন বলে বিশ্বাস করেছেন।

'দংশোদ্ধার টীকাকার অবশ্য প্রথমতঃ অন্যান্য টীকাকারদের অনুরূপ পন্থাতেই প্রথমার্ধের বিশ্লেষণ করেছেন। তিনিও বলেছেন—"সৃষ্ট্যাদীনাং শক্তয়ো বিধিহরিহররূপাঃ, তন্তু্তে, তদ্রূপে অর্থাৎ তুমি সৃষ্ট্যাদির যে শক্তিসমূহ সামর্থ্যরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি তাদৃশ ত্রয়াত্মিকা। সনাতনী নিত্যা। গুণময়া, পদে ময়ট্ প্রত্যয়ের অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করে ও টীকাকার কথা বলেছেন। প্রথমতঃ টাপ্প্রত্যয় নিবন্ধন স্ত্রীলিঙ্গে 'বিহিত ঈপ্ বিধান ব্যাকরণশাস্ত্র সম্মত বলে টীকাকার এখানে 'ছান্দসত্বাৎ' বলে 'আপ্' প্রত্যয়ের সাধুতা রক্ষায় যত্ন করেছেন। কিন্তু 'ছান্দস' অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগ ত নয় যে তার দোহাই চলতে পারে। তাই দেখা যায় সেটি আবার পরিবর্জ্জন করে একটি নূতন পন্থা দেখিয়েছেন। ইনি বলেছেন—এখানে 'ডুমীঞ্ প্রক্ষেপে" এই মী' ধাতু 'অচ্' করে ময় পদ নিষ্পন্ন। সুতরাং "গুণানাং ময়ঃ প্রক্ষেপঃ অস্ত্যস্যাং'' অর্থাৎ গুণসমূহের নিবেশ আছে এ'তে তাই তিনি গুণময়া। ইনিও অগুণময়ে পদ স্বীকার করে ব্যাখ্যান্তর সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। "অগুণময়ে নির্গুণে ইতি বা ছেদঃ।" সুতরাং দেখা যায় এক্ষেত্রে বহুটীকাকারই 'অগুণময়ে' পাঠের স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তদনুরূপ ব্যাখ্যারীতি ও প্রকাশ করেছেন। অথচ পরিতাপের বিষয় এই "অগুণময়ে' পাঠটি অধুনা প্রখ্যাত শিষ্টসমাজে মোটেই পরিজ্ঞাত বা আদরণীয় নয়। অন্ততঃ বহুক্ষেত্রে আলোচনা করে আমরা তার স্বীকৃতি উদ্ধারে সফল হ'তে পারিনি। যা হোক্ উল্লিখিত পদ বিশ্লেষণে দংশোদ্ধারটীকাকার অন্যান্য টীকাকারদের সঙ্গে একটা সহজ সামঞ্জস্য রক্ষা করেই এসেছেন। কিন্তু 'গুণাশ্রয়ে গুণময়ে' পদের বিশ্লেষণে একটু ব্যাখ্যান্তর দেখাবার প্রয়াস করেছেন। চতুর্ধরীটীকাকার সাংখ্য সিদ্ধান্ত অনুসারে পুরুষের গুণবত্তা সহজতঃ না থাকাতে এক্ষেত্রে গুণাশ্রয়পদে 'গুণভাবনে' এই অর্থ উদ্ধার করে গুণপরিভাবনে পুরুষের গুণবত্তার ব্যাখ্যাটি কৌশলে সুবিন্যস্ত করে দিয়ে স্থূলটি পরিচ্ছন্ন ভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেছেন। দংশোদ্ধার টীকাকার এখানে সহজতঃই বলে দিয়েছেন—"গুণাশ্রয়ে পুরুষরূপে" "গুণময়ে সত্ত্বাদ্যাত্মকপ্রকৃতিরূপে"। অর্থাৎ পুরুষরূপাও তুমি প্রকৃতিরূপাও তুমি। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্ব নিয়ে অর্থসঙ্গতি দেখাবার চেষ্টা থাকলেও সাংখ্য সম্মত প্রকৃতিপুরুষ তত্ত্বই যদি মহামায়ার তত্ত্ব বলে অভিপ্রেত হ'য়ে থাকে, তা'হলে তা'কে উভয়রূপা বলা কঠিন। কারণ তাদের সিদ্ধান্তে একের উভয়রূপ নয়—উভয়ই স্বতন্ত্র তত্ত্ব। সাংখ্যশাস্ত্রের তত্ত্ব বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্ব্বদা পরিণম্যমানা নিত্যা প্রকৃতি পুরুষ সান্নিধ্যমাত্র সহায় করে মহদাদি ক্রমে স্বয়ং জগদ্রূপে পরিণতিলাভ করেন। এই ক্রমপরিণাম সম্ভব হয় তিনি নিজে গুণময়ী বলে। কারণ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হ'ল প্রকৃতির স্বরূপাবস্থা। কিন্তু স্বভাবতঃ এদের পরস্পর অভিভাব্য অভিভাবক ধর্ম্ম থাকাতে একে অন্যকে পরাভূত কোরবার স্বাভাবিক চেষ্টায় যখন পরস্পরের মধ্যে গুণের তারতম্য ঘটে তখনই হয় সৃষ্টির সম্ভাবনা বা প্রকৃতির পরিণাম। এই পরিণম্যমানা প্রকৃতির সঙ্গপ্রাপ্তি নিবন্ধন অথবা প্রকৃতিতে ছায়াসম্পাতবশতঃ প্রকৃতি-পুরুষের একটা অতাত্ত্বিক মিলন ঘটে বলে পুরুষের হয় ভোগ। তা'তেই হয় পুরুষে গুণাশ্রয়তা, অর্থাৎ সম্প্রতি জগতে যে অবস্থা, প্রকৃতিও স্বস্থানে নেই, পুরুষও স্বরূপে নেই। প্রকৃতি জড়া বলে তার ভোগ নেই। পুরুষের জন্যই যত তার জ্বালা। সুতরাং দেখা গেল উভয়েরই রয়েছে আবশ্যকতা, সেজন্য উভয়ই স্বতন্ত্র তত্ত্ব।

কিন্তু এখানে যে পন্থা অবলম্বন করে মর্ম্মার্থ বিশ্লেষণ করা হ'ল অর্থাৎ উভয়ই তুমি, পুরুষতত্ত্ব আর প্রকৃতিতত্ত্ব, তা'তে সাংখ্য সিদ্ধান্তের উভয়ের পৃথক্ তত্ত্ব নীতি ব্যাহত হ'য়ে পড়েছে। সুতরাং এই রীতিটি অবলম্বিত হ'লেও প্রকৃতপক্ষে এখানে সাংখ্যপদ্ধতি দেখান টীকাকারের মূল উদ্দেশ্য নয়। মনে হয় অভিন্ন কোন কারণতত্ত্বই উভয়রূপে এমন কি জগদ্রূপে পরিত্যাক্ত হ'য়ে যে স্বকীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রকাশ দেখিয়েছেন সেই পরম তত্ত্বটিই মহামায়া তত্ত্বরূপে টীকাকারের লক্ষ্যস্থল।

এই সমুদায় টীকাগ্রন্থ মন্থন করে আমরা যে সার সম্পদ আহরণ করতে পারি,তা'তে দেখা যায় মহামায়া—তত্ত্ব বস্তুতঃ—সাংখ্যের প্রকৃতিও নয় বা বেদান্তের মায়াংশও নয়। অথচ তা যদি সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত না হয়, তবে তৃতীয় অর্থাৎ ভগবদতিরিক্ত আর কোন তত্ত্ব অবশিষ্ট থাকতে পারে, যা'কে মহামায়া বলে অনুধাবন করবো। আর ভগবত্তত্ত্বসত্ত্বে অন্য কোন তত্ত্বস্বীকারের আবশ্যকতাই বা কি রয়েছে? সুতরাং এতেও প্রশ্নের মীমাংসা সহজ হয়ে উঠ্‌লো না। কারণ, এই সপ্তশতীর যে সমুদায় টীকা সমধিক প্রসিদ্ধ এবং প্রমাণ গ্রন্থরূপে শিষ্ট-পরিগৃহীত সে সমুদায় গ্রন্থে অর্থাৎ চতুর্ধরী, শান্তনবী, নাগোজীভট্টী, দংশোদ্ধার প্রভৃতি টীকাগ্রন্থে ঐ শ্লোকবিশ্লেষণের মর্ম্মার্থরূপে দেবীকে কোথাও প্রকৃতি, কোথায়ও প্রকৃতিপুরুষ উভয়, কোথাও সৃষ্ট্যাদি শক্তিত্রয়ের সামান্যরূপ, কোথায়ও পরিব্যক্ত জগদ্রূপে, কোথাও পরমাত্মৈকরসরূপে ব্যাখ্যা করেই দেবীর স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াস স্বীকার করা হয়েছে। এ'তে নির্দ্দিষ্ট কোন তত্ত্ব তৎস্বরূপসম্ভাবগাহী না হওয়াতে তাঁর সম্বন্ধে সেই দুরবগাহ অস্পষ্টতা অবগুণ্ঠনমুক্ত হয়ে উঠেনি বলেই আশঙ্কা প্রবল হ'য়ে উঠে। অথচ তাঁরা দেবীর স্বরূপ নির্ণয়ার্থে প্রবৃত্ত হয়ে কেন এই বিভিন্ন ব্যাখ্যারীতি বা বিশ্লেষণচাতুর্য্য অবলম্বন করে এত কথা বললেন—এসবের বা কি প্রকৃত তাৎপর্য্য, এবার এসম্বন্ধে আমরা আলোচনার চেষ্টা করবো।

পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ বিভাবে উভয়াত্মক। শ্রুতি যেমন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' বলে অদ্বিতীয় একাকারতা কীর্ত্তন করেছেন তেমনি "...মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ" ইত্যাদি দ্বারা তাঁর সগুণাবস্থাও প্রকাশ করেছেন, পরমাত্মা তাঁর অমোঘ সঙ্কল্প বশে যে

জগৎ সৃষ্টি করেছেন—['স ঐচ্ছৎ, সোহকাময়ত'] সেই সৃষ্ট জগৎটির প্রতি তিনি যেমন কর্ত্তা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ তেমনি উপাদান কারণও বটে, কারণ তিনি ভিন্ন বস্তুতঃ আর কিছু ত নেই যা'কে উপাদান বলা যেতে পারে! [সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম] তাই তিনি ভেবেছিলেন—"একোহহং বহু স্যাং প্রজায়েয়"। তিনিই সৃষ্টিতে বহুরূপে প্রকাশিত হয়ে উঠেছেন। সুতরাং সৃষ্টি আর স্রষ্টাকে পৃথক্ তত্ত্ব বলে কি করে ধরা যায়! শাণ্ডিল্য বিদ্যা প্রারম্ভে শ্রূয়মাণ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" এই ছান্দোগ্য শ্রুতির এবং তন্মূলক "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি ব্যাসসূত্রেরও এই হ'ল তাৎপর্য্য।

সৃষ্টবস্তু দেখেই আমরা প্রমাণ পাই যে সৃষ্টিটি হচ্ছে গুণের কার্য্য। অর্থাৎ পরব্রহ্ম যে বহুরূপে প্রকটিত হ'লেন তা' ঐ গুণের সাহায্য অবলম্বন করেই, অন্যথা অখণ্ডৈকরসকূটস্থ ব্রহ্মতে কখনো যথার্থতঃ কাময়িতৃত্বাদি বিভিন্নরসবত্তা বা বৈচিত্র্য সম্ভব হ'তে পারে না। একরসতা অবস্থায় বিভিন্নরূপে তাদের প্রকাশ নেই বলেই, সে অবস্থাকে লক্ষ্য করে বলা যায় নির্গুণ বা গুণাতীত। যখন প্রকাশ তখনই সগুণতা। যেমন ধরা যাক্ 'রস' বস্তুটি—রস বলে অখণ্ডরূপে আমরা কখনো কিছু গ্রহণ বা অনুভব করতে পারি কি? এই রসবস্তুটি যখন অম্লমধুরাদিভেদে বিভিন্নতাময় হ'য়ে উঠে তখনই বলে দেওয়া যায় এ'তে রস আছে—অর্থাৎ ভেদবৎ কোন রসের সাহায্যে। একরসতা অবস্থা এ জন্যই একান্ত দুর্জ্ঞেয়। সুতরাং বলা যেতে পারে পরমপুরুষ স্বভাবতঃ অখণ্ডৈকরস হ'য়ে ও গুণাদি পরিস্ফুরণের দ্বারা বহুরূপে বিভাবিত হ'য়েছেন, গুণস্ফূর্ত্তির অনন্তর বলা যেতে পারে তিনি গুণময়, কিন্তু তার পূর্ব্বাবস্থাতে গুণাতীত ভিন্ন কি সংজ্ঞা তাঁর পক্ষে সম্ভব?

সেই গুণাতীতের গুণপরিভাবনের দ্বারা বহুধাভিব্যক্তিটি তাঁর একটি লীলা বা ক্রীড়ামাত্র। "তত্ত্ব লীলাকৈবল্যম্"। এই লীলাভিনয়ের দক্ষতা বা সামর্থ্যটিরই নাম শক্তি, অচিন্ত্যশক্তি বা মায়াশক্তি, যিনি গুণবিভাবনে পরব্রহ্মকে সগুণে রূপায়িত করে থাকেন। এ শক্তিটি যে কি, কি তার স্বরূপ, তা' বলা অত্যন্ত দুরূহ। কারণ কোন প্রমাণ প্রয়োগে তা'কে অন্যান্য পদার্থের ন্যায় প্রমাণিত করা যাচ্ছে না যে, সেও একটি পদার্থ বা ভাববস্তু, আবার তা' বলে একেবারে নেই বলে উড়িয়েও দেওয়া যাচ্ছে না তাকে, কেননা প্রতিপদক্ষেপে তার কার্য্য, তার অনুভব সর্ব্বত্র জ্ঞানগোচর হ'য়ে থাকে। এই প্রণালীর বিচাররীতির প্রয়োগে তা'কে ধরিয়ে দেওয়া যায় না বলেই বলা হয় বৈদান্তিক দৃষ্টিতে যে অতি দুর্জ্ঞেয় ভাবাভাববিলক্ষণ এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব এ'টি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এ কথাই প্রকাশ করে শ্রীভগবান্ বলেছেন—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"

এই অচিন্ত্যতত্ত্বটির কার্য্যকারিতার ফলে যে গুণময় বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হ'য়েছে, তা'তে দেখা যায়, দু'টি বড় সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হ'য়েছে। একটি হ'ল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর উপাদান হয়ে সর্ব্বত্র অনুস্যূত থেকেও তাঁর স্বরূপসত্তাটি বহির্ভাগ থেকে লুকিয়ে ফেলেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর অভিন্নসত্তা বা সমগোত্র চেতনপুরুষ যে জীব সে তার স্বরূপসত্তা অখণ্ডৈকরস আনন্দ তত্ত্বটি হারিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ তিনিই যেহেতু—"বহু স্যাং প্রজায়েয়" বলে বহুরূপে অভিব্যক্ত হ'য়েছেন তখন গুণপরিভাবনে জীবরূপে অভিব্যক্ত হ'য়ে তাঁরই সৃষ্ট প্রতীকে নিমজ্জিত হ'য়ে তিনি তদ্রসাক্ত হ'য়ে উঠেছেন, তাই এখানে তাঁর সংজ্ঞা হ'ল জীব। যদিও তিনিই জীবরূপে রূপায়িত হ'য়েছেন তথাপি সে শক্তি তাঁর স্বরূপকে বিনষ্ট করে দিতে পারেনি, কারণ তাঁর স্বরূপ হ'ল শাশ্বত, অখণ্ডনীয়, অবিকারী; কিন্তু গুণবিভাবনে উদ্ভূত পদার্থটির সঙ্গে মিলনের ফলে ঘটেছে যা' বিভ্রান্তি, তার ফলে বস্তুটির দোষগুণধর্ম্ম-মিশ্রণপারতন্ত্র্যে তাঁকেও তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত মনে করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বরূপাবস্থা তা'তে কলঙ্কিত হ'বে কেন? যেমন আপন গৃহে ধূলি ময়লা দেখে গৃহস্থ শূন্যময়স্থান অর্থাৎ আকাশকে ধূলিমলিন অনুভব করে "গৃহাকাশ ময়লাসমাচ্ছন্ন" প্রয়োগ করলেও এই আকাশভিন্ন মহাকাশকে ত আর ময়লা বলা চলে না! এখানে এই উদাহরণটি তার অনুরূপ। সুতরাং জীবভাবে স্বরূপের রূপান্তর সাধিত না হয়েও বিস্মৃতি এসেছে। এই বিস্মৃত, অপহৃত বা বঞ্চিত রত্নটির উদ্ধার করতে গেলে তার নিদান ধরে আকর্ষণ করতে হবে। সে নিদান ত ঐ মায়াশক্তি।

তাই এ রত্ন উদ্ধারের একমাত্র উপায় হ'ল তাঁর উপাসনা। 'সগুণ-নির্গুণ' উভয়ভাবের উপাসনারীতি উপদিষ্ট হ'লেও দ্বিতীয় রীতিটি উচ্চাধিকারী ব্যতীত অন্যের পক্ষে কল্যাণকারিণী নয়। তাই এই উপাসনা কৌশলের সৌকর্য্যের জন্যই পরমপুরুষের সগুণভাবে অবতার-লীলা। অবতারলীলায় ভগবানের বহুবিধ ক্রিয়া। তা'তে স্ত্রীমূর্ত্তি, পুরুষমূর্ত্তি, কখনো অদ্ভুত নরসিংহমূর্ত্তি ভেদে নানারূপ অবলম্বনে ভগবান্ তাঁর অভাবনীয় লীলাবৈচিত্র্য সম্পাদন করেন। দেবীমাহাত্ম্যের মহামায়াও শ্রীভগবানের স্ত্রী-অবতার বা শক্ত্যবতার। এই স্ত্রী-অবতারে তাঁর লীলাব্যাখ্যানই শ্রীশ্রীদুর্গাসপ্তশতীর বিষয়বস্তু। সুতরাং শ্রীশ্রীচণ্ডীর মহামায়াতত্ত্ব আর পরব্রহ্মতত্ত্ব মূলতঃ অভিন্ন বলা যেতে পারে। তদনুসারে বিশ্লেষণের অভিপ্রায় মহামায়াকেও সগুণ-নির্গুণ ভেদে উভয়রূপা বলে ইঙ্গিত করা হ'য়েছে। "বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে। তথাসংহৃতিরূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে॥" ইত্যাদি শ্লোকে গুণবিভাগই নিবদ্ধ করা হ'য়েছে। আবার দেবী স্বয়ং যা বলেছেন—"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা"—এতে ও সেই পরম অদ্বিতীয় তত্ত্বের ধ্বনিই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

দেবীমাহাত্ম্যের অন্যতম টীকাকার রাজাধিরাজ শ্রীমত্তোমরবংশ্য শ্রীমদ্ উদ্ধরণের আত্মজ মনীষী শ্রীমৎ শান্তনু চক্রবর্ত্তী তাঁহার শান্তনবী টীকাংশে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের "শক্তিভূতে" পদ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্পষ্টতঃই শক্ত্যবতাররূপে পদের মর্ম্মার্থ বিশ্লেষণ করেছেন—"যদ্বা শক্তীনাং ভূতি-রবতাররূপা শক্তিভূতিঃ—হে শক্তিভূতে।" দেব্যুপনিষদেও আমরা দেখ্‌তে পাই এ'র মূল তত্ত্বটি অতি অপরিচ্ছন্নরূপে ব্যক্ত রয়েছে। শক্তির সর্ব্বাত্মকতা বিবৃত করে দেব্যুপনিষদ্ বলেছেন—"সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ, কাহসি ত্বং মহাদেবি। ১। সাহব্রবীদহং ব্রহ্মস্বরূপিণী, মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগচ্ছূন্যং চাশূন্যঞ্চ। অহমানন্দানানন্দাঃ। বিজ্ঞানাহ-বিজ্ঞানেহহম্। ব্রহ্মাব্রহ্মণী বেদিতব্যে ইত্যাহাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ।" ২।

"অহং পঞ্চভূতান্যপঞ্চভূতানি। অহমখিলং জগৎ। বেদোহহ মবেদোহহম্। বিদ্যাহহমবিদ্যাহহম্। অজাহহমনজাহহম্। অধশ্চোর্দ্ধ্বং চ তির্য্যক্ চাহম্॥ ৩॥ ইত্যাদি।

আর এই শক্তিরূপার সর্ব্বধারকত্বটি দেবীসূক্তে যে অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—তা' "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ" ইত্যাদি মর্ম্মার্থবিদ্ বিজ্ঞজন মাত্রেই অবগত আছেন। তদ্ব্যতীত গৌতমীয়কল্পেও আমরা অভেদ তাৎপর্য্যমূলক দেবীস্বরূপের বর্ণনা পাই—"যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। অনযোরন্তরাদর্শী সংসারান্নো বিমুচ্যতে॥" ইত্যাদি। তদুপরি নিরুক্তিও হ'ল—"কৃচ্ছ্রেণ দুরারাধনাদিবহুপ্রয়াসেন গম্যতে লভ্যতে ইতি দুর্গা।"

সুতরাং এই সমুদায় তত্ত্বমূলক সংবাদ থেকে শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তিরূপেই মহামায়ার পরিচয় আমরা অনুভব করতে পারি। এবার যথার্থতঃই টীকাকারদের বিশ্লেষণ—বৈচিত্র্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করে বলা যেতে পারে তাঁদের এই অদ্ভুত ব্যাখ্যানৈপুণ্য কেবলই তাঁদের প্রতিভাস্ফুরিত অসার কল্পনামাত্র নয়, পরন্তু এর মূলে রয়েছে এক অমোঘ শাশ্বত সত্য, যা' তাঁদের সেই প্রতিভাপ্রভাকে শক্তিসঞ্চারের প্রাণপ্রবাহে অনুক্ষণ সঞ্জীবিত রেখেছে। এবং তাতেই দেখা যায় এই একটি শ্লোকের ধ্বনিবিশ্লেষণ-মাধুর্য্যেই মহামায়ার সামগ্রিক স্বরূপখানি অপূর্ব্ববৈচিত্র্য-সম্ভারের সমৃদ্ধি নিয়ে অপরূপ সুসমায় সমুদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে।

পথিক শাস্ত্রী

শ্রীগিরিবালা দেবী

পূজা এসেছে। চারদিকে আগমনীর সাড়া পড়ে গেছে। পূজার প্রারম্ভে কি জানি কেন যেন ভবানীর হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে। বিক্ষিপ্ত মন পাখীর মতন পাখা মেলে উড়ে যেতে চায় সুদূর থেকে সুদূরে।

পাখা মেলে ওড়ার বয়েস ভবানী অতিক্রম করেছে। তবু সময় সময় তার উচ্ছলতা তন্দ্রা থেকে সহসা জাগ্রত হয়ে তাঁকে উন্মনা করে তোলে। প্রথম জীবনে ভবানী একখানা মলাট ছেঁড়া খাতায় আঁকা বাঁকা অক্ষরে—ছড়া লিখেছিল অনেক। সেই ছড়ার ঘোরে এখনও সে আচ্ছন্ন অভিভূত। সামান্য কিছু হলেই বিচলিত, ব্যথিত—এ দোষ তার ইচ্ছাকৃত নয়, ভাগ্য বিধাতার—হৃদয় গড়বার ভুল।

সহরতলীতে ভবানীদের—আবাস গৃহ। কিন্তু একে নগর না বল্লেও ছায়াঘন গ্রাম বলা চলে না। পল্লীর স্নিগ্ধ কোমলতার স্বপ্ন এখানে চোখে ভাসে বটে, কিন্তু সেই চির-পরিচিত চির-মধুর রূপ রস গন্ধ স্পর্শের আভাস মেলে না।

মিলুক বা না মিলুক তবু শরৎকাল এলেই ভবানী উন্মুখ হয়ে সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে পথের ওপরে ঝোলানো বারান্দায় গিয়ে উপস্থিত হয়। একবার তাকায় শরতের নীলোজ্জ্বল আকাশের দিকে, আবার অনিমেষে চেয়ে থাকে দূরের ঘন রাজির পানে।

এখানকার বনরেখা প্রকৃতির মোহন তুলিকায় থরে থরে বিকশিত হয়ে ওঠে নি, স্থানের শোভা ও পথের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করছে, মানুষের সযত্নে রচনা এবং পরিকল্পনা। পরিকল্পনা যাই হোক্ শরৎকালের—দূরে নিকটে আকাশে বাতাসের সংস্পর্শে ভবানী বিহ্বলা হয়ে পড়ে।

ভবানীর স্বামী অটলবিহারী স্বনামধন্য পুরুষ, ধনে মানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এখনো তাঁর কর্ম্মশক্তি অদম্য। ছেলেও কৃতী। ঘরে বধূ এসেছে। সে প্রৌঢ় শ্বশুর-শাশুড়ীকে উপহার দিয়েছে খসে-পড়া চাঁদের মতন এক নয়নানন্দ নন্দন। ভবানী নাতির নাম রেখেছে কুন্তল।

ছেলেদের দিক দিয়ে ভবানীর ক্ষোভ দুঃখ নেই। কিন্তু মস্ত এক সমস্যা হয়েছে মেয়ে অমিয়াকে নিয়ে।

যথা সময়ে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু অমিয়া কোন-রূপেই শ্বশুরঘর করতে রাজী নয়। তারা আদর আপ্যায়ন করে নিয়ে যাবার দু'চার দিন পরেই মেয়ে কেঁদে কেটে ঝগড়া কোন্দল করে ফিরে আসে এখানে।

ঐশ্বর্য্যশালী পিতার কন্যা, সুতরাং অমিয়ার আদরের সীমা নাই। অটলবিহারী বলেন "আহা, ছেলেমানুষ, এখন এখানেই থাকুক, বড় হলে বুদ্ধি হলে আপনিই যেতে চাইবে সেখানে। জামাই শ্যামল বরং আরো ঘন ঘন আসা যাওয়া করুক, তাহলেই ওর মন বসবে সেখানে।"

পিতার যুক্তিতে মাতা সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। কুড়ি বছর বয়েস, লেখাপড়া শিখেছে, জ্ঞান বুদ্ধি টনটনে, তবুও নাকি সে ছেলে মানুষ। বড় হবে কি বুড়ি হলে? যে সময়ের যা, সেটার ব্যতিক্রমে নানা লোকে নানা কথা বলে। হোলই বা স্বচ্ছল সংসার, তবু শ্যামলের এটা যে শ্বশুরবাড়ী। নিত্যি নিত্যি জামাই এসে শ্বশুরের অন্নই বা ধ্বংস করবে কেন?

মায়ের এমনি ধরণের মন্তব্যের জন্যে মেয়ে দু'চোখে মাকে দেখতে পারে না। মার ওপরে তার নিদারুণ হাড়ের রাগ ছল ছুতোয় ব্যক্ত হয়ে পড়ে।

নামে অমিয়া হলেও তার বাক্যে অমিয় বর্ষণ করে না। যেমন কথার বাঁধুনী, তেমনি বিষের ছুরি বচন। যাকে আঘাত করে সেই জানে তার তীক্ষ্ণতা।

যাক্ অমিয়া'র প্রসঙ্গ, এমন কথা হচ্ছে আমাদের ভবানীকে নিয়ে। শরৎ সমাগমে ভবানী পাখা মেলে উড়ে যেতে চায়, দূরে কোন সুদূরে? দূরের চির পরিচিত চির-

বাঞ্ছিত পথ তাদের বন্ধ হয়ে গেছে পাকিস্থান হয়ে। পৈত্রিক ভিটে আজো মুখর করে রয়েছে তার ছোটদেবর সপরিবারে। এখনো সেখানে ঢাক ঢোল কাঁসী বাজে। দশ হাতে দশ প্রহরণ নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপ আলো করতে আসেন মা দশভূজা। ক'বছর পূর্ব্বে যেমন আনন্দ উল্লাসের মধ্যে—মহামায়ার আগমন সূচিত হোত, এখনো তেমনি হয় কিনা ভবানী সেটা জানেনা। তার সে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। পাশপোর্ট ভিসা ইত্যাকারের মধ্যে কাউকে পাঠাতে অটলবিহারী প্রস্তুত নন। শুধু কি পাশপোর্ট ভিসা? সে লোকের সত্য-মিথ্যা কত শত অমানুষিক কাহিনী এ লোকে বায়ু স্তরে ভেসে এসে সকলের প্রাণে আতঙ্কের ঝড় বইয়ে দেয়। তাই ভবানীর পূজার সময় গত দিনের মতন আর দেশে যাওয়া হয় না। মাঝখানে পদ্মা-যমুনা দুই বিশাল নদী—তরঙ্গ তুলে অহরহ ডাকে 'আয়-আয়' করে। সে ডাকে সাড়া দেবার শক্তি নেই।

দুর্গা পূজা ভবানীর রক্তে মাংসে মজ্জায় মিশে গেছে। কোন অতীত যুগে আগমনীর ললিত রাগিণীর মধ্যে সে প্রথম আঁখি মেলেছিল। পিত্রালয়ের পূজার উৎসবের কল-কোলাহলে শৈশব কাটিয়ে বালিকা বধূ গিয়েছিল শ্বশুর ঘরে পূজার আয়োজন করতে। এ সেই পূজা, সেই শরৎ-কাল। তাই ভগ্ন প্রাণের বীণা আবার বেজে ওঠে রিনি-ঝিনি করে। ভুলে যাওয়া সুর জাগে হৃদয়ের তারে তারে। খেয়ে দেয়ে স্বামী পুত্র তাদের কর্ম্মক্ষেত্রে রওনা হয়ে গেলে সেই ক্ষণিক বিরতির সময়টী ভবানী ব্যর্থ হতে দেয়না, ছুটে আসে তাদের গাড়ীবারান্দায়—সেথান থেকে দেখা যায় শরৎকালের অযাচিত উন্মুক্ত আকাশ, অস্পষ্ট বনশ্রী, সুদূর-প্রসারী বঙ্কিম পথ-রেখা।

আজও ভবানী এসে দাঁড়িয়েছিল তার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে। এমন সময় পেছন থেকে অমিয়া ডাক দিলে। আজ কি তোমার নাওয়া খাওয়া নেই? নিজে যেন মনের আনন্দে বায়ু ভক্ষণ করচো, ওদিকে যে ঝি চাকর—রাঁধুনীরা বসে রয়েছে তোমারি জন্যে। বৌদি বলছিল, তোমার নাকি পূজোর বাজার এখনো শেষ হয়নি? শেষ করে—সকলকে পূজোয় কাপড় দেবে কবে? আজ না পঞ্চমী?

ভবানী সচকিতে ঘাড় ফিরিয়ে বল্লে—"না, বাজার আমার বাকী নেই, সিঁদুর আলতা আগে আনা হয়েছিল না, তা কালকেই এনে তোমার পিসিমা কাকীমাদের কাপড় জামা পাঠিয়ে দিয়েছি। যাকে যা দেবার দেওয়া হয়েছে। বরাবর ষষ্ঠীর সকালে বাড়ীর লোকজনদের কাপড় দেওয়া হয় তাই কাল দেব?

"কাল না ষষ্ঠীর ঘট বসাতে তুমি যাবে ভাইদের ওখানে? নিজের বাড়ীর পূজোর ঘট কে বসাচ্ছে তার ঠিক নেই, উনি যান পরের বাড়ীতে। ষষ্ঠীর দিন ঘরের গিন্নীবান্নী অন্য কোথাও যায় নাকি?

"যাওয়া মানে ক ঘণ্টার জন্যে। সেখানে তো থাকি না। বাবা মা নেই, ছেলেমানুষ ভাইরা বৌ-ঝি, তাই একবার গিয়ে ঘুরে আসা। ঘট পুরোহিত বসাবে, ঘটের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? ষষ্ঠীতে যাওয়া আপত্তি হ'লে আমি আজকেই একবার বরং ঘুরে আসি। ষষ্ঠী বাদ দিয়ে একেবারে সপ্তমীর ভোরে যাব।

সবাই বেরিয়ে গেল এখন তুমি সে তেপান্তরে যাবে কিসে? হ্যাঁ মনে পড়েছে দাদা নাকি টিফিনের সময় এ পাড়ায় কি একটা কাজে আসবে, সেই সময় তুমি গিয়ে সন্ধ্যাবেলা অফিস ফেরতদের সঙ্গে ফিরে এস।

ভবানী মেয়ের ব্যবস্থায় আপত্তি করল না। কতকাল হ'ল নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে সে ভুলে গেছে। ভুলে না গেলে সংসারের অশান্তি আরো বেড়ে যেতো চতুর্গুণ হয়ে। ভবানী নবোঢ়া হ'লে বলা যেতো "ফুলের মালা গাছি চরণে বিকায়েছি।" কিন্তু এ বুড়ো বয়সে কোমল শব্দগুলো আর প্রয়োগ করা চলে না।

বেলা গোটা আড়াইয়ের সময় ভবানী পৌছিল ভ্রাতৃ-আলয়ে। আলয় বলতে সহরের ঘন বসতির মধ্যে ভাঙ্গা-চোরা একখানা ছোট বাড়ী। দ্বিতল একতলা দিয়ে গোটা চারেক ঘর। একফালি ঘুরানো বারান্দা। সেই সঙ্কীর্ণ পরিসরের ভেতরে বছরে বছরে মা দুর্গার আবির্ভাব হয়। এদেরো পাকিস্থানে যথাসর্ব্বস্ব বিনাশ হয়েছে। ভবানীর ভাইরা কায়-ক্লেশে পৈত্রিক পূজাটি এখনো বজায় রেখেছে। প্রতিমা এসে গেছে, পথের পাশের একতলা ঘরে আলপনায় চিত্রিত চৌকীতে সমাসীন হ'য়ে মৃণ্ময়ী প্রতিমা প্রশান্ত হাসি-মুখে অপেক্ষা করছেন, ফুল ফল ভোগ রাগ নৈবেদ্যের।

স্বল্প-পরিসর স্থানটুকুতে পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সমবেত হয়ে কলরব তুলেছে। বৌয়েরা কাঁড়ি-

খানেক নারিকেল ভেঙ্গে নিয়ে কুরতে বসে গেছে। শিলে নারকেল মিহি করে বাটছে ভবানীর ছোট বোন শিবানী।

শিবানীদেরো আসতে হয়েছে স্রোতের ফুলের মতো পাকিস্থান থেকে ভাসতে ভাসতে নগরের জনসমুদ্রে। তাদেরো ফেলে আসতে হয়েছে জীবনের যা কিছু সঞ্চয় ও সম্বল। শিবানীরা থাকে ভাইদের কাছাকাছি ভিন্ন বাড়ীতে। এ বাড়ীর যা কিছু হোক্ না কেন, সর্ব্বাগ্রে ডাক পড়ে তার। সে ভারী কাজের মেয়ে।

ছুই বোনের দেখাশুনা হয় কালে ভদ্রে। দূরত্বের জন্যে উভয়ের মনের কথা—মনেই প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

ভবানীকে দেখে সহসা বাড়ীতে আনন্দের উচ্ছ্বাস বয়ে গেল। ভাইপো ভাইঝিরাই উল্লাসে কল কল খল খল করে উঠল। শিবানী আনন্দে দিদিকে স্বাগত সম্ভাষণ করল "দিদি এসেছ? বসো এই পিঁড়িতে। আমরা এতক্ষণ রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়ে তোমাকেই আশা করছিলাম। দাদা বলছিল—দিদি না এলে আমাদের পূজো বাড়ী বলে মনে হয়না।"

ভবানীর সারা মুখে হাসির ছটা খেলে গেল। মুহূর্ত্তে মনে পড়লো বয়সের ছদ্ম গাম্ভীর্য্য—গৃহিণীর গুরুভার পদমর্য্যাদা।

ভবানী সকৌতুকে বল্লে "হাঁ, তা ওরা বলতে পারে বৈকি, দিদির বিপুল দেহের পত্তনে অনেকটা জায়গা জোড়া না হলে 'পূজো বাড়ী' মনে হবে কি করে? দে তো শিবি আমাকে একখানা কুরুণী আর কলা পাতা এগিয়ে। আমিও তোদের ছুটো নারকোল কুরে পূজোর কাজের পুণ্য সঞ্চয় করি। 'হাতে করি কাম—মুখে বলি রাম'।"

এক বধূ কুরুণী এগিয়ে দিয়ে—নারকেলের তক্তি নাড়ু—সন্দেশের জন্যে বাঁটা নারকেল বারকোসে ভাগ করতে লাগল।

ছুই ভগিনী পাশাপাশি হয়ে একজনা কুর কুর করে নারকেল কোরে, আর একজন খস খস করে বাঁটে। তারই ভেতর চলে কত আলোপ আলোচনা। পিতা মাতার স্মৃতি কথা, নিজেদের জীবনযাত্রার খুঁটি-নাটি কত কি?

ভবানী জিজ্ঞাসা করে—জামাই মেয়ে, নাতি নাতনিদের পূজোর জামা কাপড় কি পাঠিয়ে দিয়েছিস দিদি? তারা অনেক দূরে থাকে, আগে না পাঠালে ঠিক সময় কিন্তু পাবে না! তোর কেনা-কাটা শেষ হয়েছে? নিজের জন্য কি কাপড় হ'ল তোর? এবার পথে ঘাটে পথিক শাড়ীর ছড়াছড়ি? আমি ননদদের, জায়েদের, দেওরঝি, ভাসুরঝি সকলের জন্যই একধার থেকে পথিক শাড়ী কিনে দিয়েছি। নতুন উঠেছে, সবাই পরতে পারবে।"

শিবানী উত্তর দিল "না দিদি আমি পথিক কিনিনি, ছেলেদের ধুতি পাঞ্জাবী কিনেছি, মেয়ে জামাইদের জামা কাপড় পাঠানো হয়েছে সিল্কের সব। কুটুম বাড়ীতে পাঠানো, খেলো জিনিষ দিলে মেয়ের মুখ ছোট হয়ে যায়। এবার ওদের দিতেই খরচ পড়ে গেছে ঢের বেশী। সেই জন্য তোমার ভগিনীপতির আর আমার কাপড় বাদ দিয়েছি। বুড়োবুড়ির আবার পূজোর নতুন কাপড় কিসের?"

ভবানী ব্যথিত হ'ল। আহা একটিমাত্র ছোট বোন অভাবী মানুষ, পূজায় নূতন কাপড় পরতে পারবে না? অথচ সে নিজের হাতে কম ক'রে হাজার টাকার ধুতি শাড়ী জামা কিনে শ্বশুর বংশের সকলকে দিকে দিকে বিতরণ করে দিয়েছে। এদিকে সে দিতে চায় না, ইচ্ছাও হয় না। যার যেমন অবস্থা সে তেমনি থাকুক। ধনীর ধন গর্ব্বের দানে কাউকে ছোট করতে তার প্রবৃত্তি হয় না। সংসার হ'ল দান প্রতিদানের ক্ষেত্র। যার আছে সে পাঁচশো দিচ্ছে যার নেই তাকেও পাঁচ দিতে হয়। কিছু না দিলে কিছু যে নিতে পারা যায় না।

পূজার বাজার করতে ভবানীকে মাসাধিক কাল অবিরত দোকানে দোকানে ঘুরতে হয়েছিল। খরচের হিসাবপত্র ক্যাশ-মেমো গৃহকর্ত্তার কাছে দাখিল করেও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনো ছু'একটা রসিদ পড়ে রয়েছে ভবানীর শান্তিনিকেতনী ব্যাগের ভেতরে। তার সঙ্গে রয়েছে খুচরো টাকা পয়সা কিছু। ভবানীর একটা নেশা আছে পান জরদার। বাইরে পা বাড়াতে গেলেই ব্যাগের ভেতরে আগে তার পান জরদার কৌটো ওঠে।

কাগজপত্র টাকাকড়ি নামিয়ে রেখে আজ আর পানের কৌটো চুণের শিশি তুলবার সময় হয়নি।

নারকেল কোরা শেষ হলে ভবানী হাত ধুয়ে ব্যাগ

খুলে আঁতি-পাতি খুঁজতে লাগল, সেখানে রয়েছে দশটা টাকা, আর কয়েক আনা পয়সা।

শিবানীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ভবানী তার হাতে টাকা দশটা গুঁজে দিয়ে সস্নেহে বল্লে "দেখ শিবি, তুই এইটে দিয়ে একখানা পথিক শাড়ী কিনে পরবি। আমি থাকি সহরের বাইরে, সেখানে দোকানপসার কম, আর কাল ষষ্ঠী আমি বেরোতে পারব না বলে নিজে কিনে দিতে পারলাম না। তোদের হাটে বাস, বাড়ী ফেরার পথেই কিনে নিয়ে যাস্। দশ টাকায় তো ভাল কিছু হবে না, এই আটপৌরে একখানা।"

শিবানী ক্ষুণ্ণ হ'ল "এ কেন দিদি, তোমাকে বলাই আমার অন্যায় হয়েছে। আমরা গরীব হ'লেও কাপড় কেনবার টাকা যে ঘরে নেই তা নয়। তবে একটা সংকল্প করেছিলাম সেইজন্যে কিনতে চাইনি। পোষাকী শাড়ী আমাদের মতন অবস্থার লোকের কোনই কাজে লাগে না। জামাইবাবু তোমার পছন্দে কতবার কত ভাল কাপড় আমাকে দিয়েছিলেন, তাই পড়ে রয়েছে বাক্সের তলায়। কোথায়ো যাওয়া হয় না, যাদের রান্না ভাঁড়ারে আস্তানা, তাদের আবার পোষাকী শাড়ী? তোমাদের চারদিকে কত টানতে হয়, সে দলে আমাদের টান কেন? তুমি হাতে করে দিলে দিদি, আমি মাথায় তুলে নিলাম।" বলতে বলতে শিবানী নত হয়ে ভবানীকে প্রণাম করল।

ভবানী ছোট বোনের মস্তকে স্নেহ হস্ত বুলিয়ে উত্তর দিলে "ভারী তো দশ টাকা, তাতে তোর জামাইবাবুর ভাঙ্গা ঘর রাজঅট্টালিকা হয়ে যাবে নাকি? ভয় নেই গো ছোট গিন্নী—আমি তাঁর টাকা তোমায় দিলাম না। এ টাকা আমার নিজস্ব মেহনতের মাশুল।"

'মেহনত' ও বুঝেছি, আজকাল তুমি বোধহয় ঝি চাকরদের কাজ করে দিয়ে জামাইবাবুর কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিচ্ছ দিদি? বুড়ো বয়সে বিদ্যা যে কম বাড়েনি! ভবানী তার স্বভাবের বহির্ভূত খিল খিল করে হেসে উঠল "তা নয় তো কি? আমার যেন কোন ক্ষমতা নেই? জানিসনে, সেবার আমাদের পাড়ায় যে 'একজিবিসন' হয়েছিল, তাতে আমার সেলাই করা সেই ফুলপাতা-কাটা কাঁথাখানা দিয়েছিলাম। এক ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা হয়ে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে সেইটে কিনে নিয়ে গিয়েছিল। সেই টাকা কটা পড়ে রয়েছে সেই থেকে, তা দিয়ে কিছু করিনি, কাউকে দেইনি, তার থেকেই তোকে দিলাম।"

"তবু তো দিদি তুমি রোজগার করেছিলে। এক হাতা বেড়ি ঠ্যালা ভিন্ন হাত পেতে চেয়ে নেওয়া ছাড়া আমার বাপু কোন গুণ নেই। সারাদিন 'দাও দাও' কি মানুষ করতে পারে—তাতেও যে লজ্জা হয়। হাঁ দিদি তুমি কি এখন আর পদ্য লেখনা? সেই পুরানো পদ্যগুলো দাওনা কেন মাসিকে? আজকাল শুনছি যারা মাসিক পত্রে লেখে তারা নাকি টাকা পায়? তুমি তোমার সেই পুরানো লেখাগুলো দাওনা কেন মাসিকে পাঠিয়ে, তাহলে তুমিও কত টাকা পাবে!"

ভবানীর ঠোঁটের ওপরে ব্যর্থতার করুণ হাসি খেলে গেল, "কি বলছিস শিবি, আমার সেই কোন কালের সাত-পুরানো পচা হিজিবিজি লেখার—একালে কি মূল্য আছে রে? রাম রাম সে আবার লেখা, তার আবার ব্যাখ্যানা। তার আবার টাকা, তার আবার মাসিক পত্র। কবে ছেলেবুদ্ধিতে কি জ্বরের প্রলাপ বকেছিলাম, তুই আবার তাই মনে করে রেখেছিস্?"

"না দিদি—সে পদ্যগুলো আমার বড্ড ভাল লেগেছিল, এখনও কতক কতক মনে আছে—

আমার কবিতাখানি নিশির শিশির প্রায়,
প্রখর রবির তাপে সরসে শুকায়ে যায়
আমার কবিতা—"

ভবানী সহসা লজ্জায় আরক্ত হয়ে শিবানীর মুখে হাত চাপা দিয়ে বল্লে—"তুই থাম শিবি, আর জ্বালাসনে, চারদিকে ছেলেপেলেরা ঘুর ঘুর করছে কেউ শুনে ফেলবে। কি লজ্জা, কি ঘেন্না।"

সপ্তমীর প্রভাতে স্নানান্তে শুচি হয়ে ভবানী উপনীত হল পূজা বাড়ীতে। অটলবিহারী উদ্যোগী হয়ে এই একটি দিন স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন এদের কাছে। অতদূর থেকে পূজার বাকী কদিন আর তেমন আসা হয় না। দেশের বাড়ীতে দুর্গোৎসব, তার আচার অনুষ্ঠান পালন করতে হয় ওদের। গৃহের গৃহিণী, ছেলেমেয়ের মাকে পূজার দিনে অনুপস্থিত থাকলে চলে না। বছরে একটি দিন

প্রভাত হ'তে সন্ধ্যা। একি পূজার উৎসব? না ভবানীর স্মৃতির রাজ্যে বিচরণ।

শিবানী পাড়ায় থাকে, ভোর হ'তে না হ'তে এসে যোগ দিয়েছে পূজার কাজে। পরিধানে দিদির টাকায় কেনা নূতন লাল পাড় পথিক শাড়ী। ব্রাহ্মণের বাড়ীর দুর্গোৎসবের প্রধান হল ভোগের আড়ম্বর। এই উপলক্ষে—আত্মীয়স্বজন একত্রিত হয়ে প্রসাদ পাবে। এ অন্ন ভোগের ভার বাড়ীর মেয়েদের ওপরে। পাচকের স্পর্শের বাইরে।

ভবানী শিবানীর সঙ্গে মিলিত হ'ল ভোগ-শালায়, গোটা চার পাঁচ উনুনের সামনে। এখন রান্নার পাঠ তার উঠে গেছে। রান্নাঘরে বিরাজ করছে পাচকপ্রবর। কিন্তু একদিন ভবানীর রান্নায় খ্যাতি ছিল। কত রোগীর অরুচি সেরে গেছে তার হাতের ঝোল ঝাল শুক্তো খেয়ে।

আজকের রাশ-ভারী কর্ত্তা সুদূর অতীতে তরুণী বধূর রান্না খেয়ে একদা কানে কানে বলেছিল "আমরা পাঁচ ভাই নই, চারজনা, পাঁচ ভাই হ'লে তোমাকে দ্রৌপদী আখ্যা দিতে পারতাম।"

সে কালও নেই, সে তরুণতরুণীও নেই, তবু ভবানী রাঁধে ভাল।

দিদি এসে স্বয়ং রান্নার ভার নিয়েছে, এতে ভাইরা পুলকিত, বৌরা নিশ্চিন্ত। শিবানী পাশে থেকে ভবানীকে সাহায্য করছে—কড়ায় কোটা তরকারী ছেড়ে দিয়ে ঘটিতে গঙ্গাজল নিয়ে ঢেলে দেয়। আজ ভবানীর মুখে কথা-বার্ত্তা তেমন নেই। মনযে তার চলে গেছে দূরে সুদূরে পাখীর মত পাখা মেলে।

সেই শান্ত স্নিগ্ধ—জননী জন্মভূমি, তারপর শ্বশুর গৃহ। কত সমারোহের আড়ম্বরপূর্ণ দুর্গাপূজা। বালিকা-বধূকে বিরাট ভোগশালায় হাতে খড়ি দিতে স্নেহময়ী শ্বশ্রূমাতার কত ব্যগ্রতা। মহামায়ার ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত রন্ধন-কারিণীরা জল খেতে পারেনা। গঙ্গাজল পানে দোষ নেই, কিন্তু সেখানে গঙ্গা কোথায়? দুর্ল্লভ রত্নের মত অতিকষ্টে [illegible] করা যায়, সেটা থাকে পূজা মণ্ডপে সযত্নে রক্ষিত।

[illegible] শ্বশ্রূমাতা গুরুদেবের নির্দ্দেশে কূপের শীতল জলের [illegible] তুলসী পাতা দিয়ে ভোগ-শালায় বধূদের মেয়েদের [illegible] পরিবেশন করতেন। দশ-বারোটা উনুনে পাঁচ-ছয়শো লোকের রান্না, সে কি বিপুল আয়োজন? তিনি চারজনার কমে সে অন্ন-যজ্ঞের সমাধা হ'তে পারতোনা। মা করে-ছিলেন ভোগের ঘরে তুলসী জলের প্রচলন। এর অনেক পরে তিনি প্রচুর দুধ মিশিয়ে চায়ের চলন করেছিলেন ভোগ রাঁধুনীদের জন্যে।

আজ কোথায় গেছে সেদিন, কোথায় গেছে তাঁরা সব। চারদিকে শূন্য, চারদিকে ফাঁকা। বাবা যেন ক্ষীণ দুর্ব্বলস্বরে উপরের বারান্দা থেকে নাম ধরে ডাকছেন।

মা এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন গঙ্গাজলের গেলাস নিয়ে। হাতে হাতে খুন্তি হাতা জুগিয়ে দিচ্ছে মেজবোন শৈলি, যে ঝরে গেছে অকালে কীটদুষ্ট ফুলের মত, শুষ্ক পাতার মতন।

"দিদি বাল্যভোগ হয়ে গেল, এবার তুমি একটুখানি বাতাসে যাও। তোমাকে গঙ্গাজল দেব? না চা খাবে একটু? এত ভাবছ কি দিদি?"

শিবানীর কণ্ঠস্বরে ভবানীর স্মৃতির স্বপ্ন খনখনে হয়ে ভেঙ্গে গেল। সে শিবানীর দিকে চোখ তুলে মৃদু হাসল—"ভাবা-চিন্তের আমার কিছু নেই শিবি, পূজোর দিন এলেই আমার মনে পড়ে যাদের হারিয়ে ফেলেছি। চা-টা আমার কিছু লাগবে না রে। এখন একবার পান খাব।'

মুহূর্ত্তে শিবানীর হাসিমুখ ম্লান হ'ল, চোখ ছল ছল করতে লাগল। শিবানী সায় দিলে "সত্যি দিদি, আমারো প্রাণ যেন কেমন করে? চোখের সামনে ভাসে বাবা যেন মণ্ডপের কোণে আসনে বসে রয়েছেন, হাতে চণ্ডীর পুঁথি, কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে মাকেও দেখতে পাই। মেজ-দিদি যেন এদিকে সেদিকে উঁকি-ঝুঁকি দেয়।"

এর পরে দুই বোনেই নির্ব্বাক হয়ে রান্না-বাড়ায় মনো-নিবেশ করল। কারোর মুখে কথা নেই। পঞ্চমীর সন্ধ্যার যে ভগ্ন বীণা হঠাৎ বেজে উঠেছিল, সপ্তমীর মধ্যাহ্নে ফের তার তার কেটে গেল।

ভোগের পূর্ব্বেই ওবাড়ী থেকে ভবানীর ছেলে-মেয়ে বৌ নাতিরা এলো প্রসাদ পেতে। দেশের পৈত্রিক পূজায় যোগ দিতে না পেরে অটলবিহারী কোন পূজা বাড়ীতে যান না। সকলকে একদিন পাঠিয়ে দেন এখানে। ভোগের পরে যখন পাতা পড়ল খাবারের, তখন অমিয়া জানাল "মাকে নিয়ে আমাদের সন্ধ্যার আগেই যেতে হবে। এদিকের

ভীড়ে রাস্তাঘাট বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে, বাবা বেলাবেলি যেতে বলে দিয়েছেন।

"কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" মেনে নিয়ে ওদের সঙ্গে ভবানীকেও খেয়ে নিতে হ'ল। যেতে হবে যে অনেক দূরে সহরতলীতে।

রাস্তা অবধি ভবানীকে এগিয়ে দিয়ে সকলে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল—"দিদি, কাল মহাষ্টমী, তুমি এসে বেশীক্ষণ যদি না থাকতে পার, তবু এস একবার, অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ পেয়ে যেয়ো।"

এরা জানে—আসা না আসা দিদির ইচ্ছার ওপর যেন নির্ভর করছে।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়—ভবানীদের বাড়ীর পাশের পড়ো জমিতে বারোয়ারী পূজা হচ্ছিল। এ অঞ্চলে পূজা কম, তাই আশে-পাশের যত লোক ভেঙ্গে পড়েছে পূজা মণ্ডপে। থেকে থেকে ঢাক ঢোল সানাই বাজছে। পাড়ার ছেলেরা মিলে আরতির আয়োজন করছে।

সারাটা দিন প্রায় ভবানীর কেটে গেছে অগ্নির উত্তাপে। গা দিয়ে ঘাম ঝরছিল, সে ওপরে না গিয়ে নীচের স্নানের ঘরে ঢুকে আগে স্নান সেরে নিলে।

স্নানান্তে স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন হয়ে দ্বিতলে শয়ন গৃহে এসে তার চক্ষুস্থির। তার ঘরের সামনে গাড়ী-বারান্দা বেতের চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজানো। সেখানে পিতা-পুত্রীর তুমুল আলোচনা চলছে।

অমিয়া বলছে—আমি ছোট মাসীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার পথিক-শাড়ীর পাড়টি ভারী সুন্দর। কত দিয়ে কিনেছেন? তিনি উত্তর দিলেন—"দিদি আমাকে পথিক শাড়ী কিনতে দশটা টাকা দিয়েছিলেন, তাই দিয়ে কিনেছি।" এখন আপনি বুঝে দেখুন ওঁর কাণ্ড কারখানা। আমাদের কাউকে না বলে বোনকে চুপে চুপে টাকা দেওয়া হয়েছে। এমন যে কত দেওয়া হয় তার কি সীমা সংখ্যা আছে? অটলবিহারী যজ্ঞের আগুনের মত দপ্‌ করে জলে উঠ্‌লেন "তাই তো বলি এত টাকা যায় কোথায়? সেবার আমার লোহার সিন্দুক থেকে তিনশো টাকা উধাও হয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি কোথায় সেগুলো পাচার হয়েছিল? আমার ঘর থেকে টাকা দেওয়া হবে, অথচ আমি জানতে পারবনা, এ অপমান অসহ্য।"

ভবানী ধনী-গৃহিণী, মারবেল-খচিত প্রশস্ত গৃহে সুদৃশ্য খাটে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা তার বিশ্রামের জন্য প্রসারিত হয়ে রয়েছে। মাথার ওপরে বিজলি পাখা ঘুরছে ঘুর ঘুর করে। যে পথিক-শাড়ী অদ্যকার বিপত্তির মূল, তার নূতন একখানা স্নানাগারে ছেড়ে রেখে আর একখানা সে পরে এসেছে। ভবানীর কাপড়ের আল্‌নায় ঝুলছে আরো ক'খানা নূতন কোরা-নীল, হলুদ, খয়েরি পাড়ের পথিক শাড়ী।

ভবানী কদিন থেকে টের পাচ্ছে, মেয়ের ছল-ছুতো খোঁজা। মায়ের প্রতি তার যে রাগ আছে, সে রাগ বর্ত্তমানে ছড়িয়ে গেছে সারা বিশ্বে। কারণ শ্যামল তাদের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম স্ত্রীর শত অনুরোধ সত্ত্বেও পূজায় স্ত্রীর কাছে না এসে বেড়াতে গেছে দার্জ্জিলিং। অমিয়ার স্বামীর নিকটে এই প্রথম পরাজয়।

ভবানীর শরীরটা আজ ক্লান্ত ছিল। সে একবার ভাবল কোন কথার উত্তর না দিয়ে শয্যা নেওয়াই বুদ্ধির কাজ। কিন্তু চোর অপবাদ নীরবে সহ্য করতে তার প্রবৃত্তি হ'ল না। স্বামী তার সিংহনাদই করুন, আর মেঘ গর্জ্জনই করুন, হৃদয়-হীন নিষ্ঠুর প্রকৃতির নন। তাঁর দয়া দাক্ষিণ্য দান সর্ব্বজন-বিদিত। যে দশ টাকার জন্য আজ শান্তির গৃহে অশান্তির ঝটিকার উদ্ভব হয়েছে, এমন কত দশ বিশ টাকা কত গরীব দুঃখীদের তিনি অবহেলা ভরে বিলিয়ে দিয়ে থাকেন। কিন্তু লোকটির একটি প্রধান দোষ কান-পাতলা। সামান্য কারণে যেমন জলে ওঠেন, তেমনি নিবে যেতেও বেশী সময় লাগে না। অমিয়া পিতার জলে ওঠাই পছন্দ করে বেশী। ভবানীর বিছানায় শোয়া হ'ল না। বারান্দায় এগিয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠ্‌ল "হ্যাঁ আমি টাকা দিয়েছি, আমার কটা টাকা ছিল, তার থেকে দিয়েছি ব'লে কারোকে বলা দরকার বোধ করিনি। সংসার খরচের প্রত্যেকটা টাকা খাতায় লিখে রাখি, মিলিয়ে দেখলেই হয়, চুরি হয় কিনা?"

খড়ের আগুন জলেই ছিল, বাতাস লেগে দাউ দাউ করে উঠ্‌ল "কি, নিজের টাকা ও আবার একটা টাকা নাকি? আমার এখানে থাকতে হ'লে কুটোটাও দিতে গেলে বলতে হবে। না বল্লে চুরি ছাড়া অন্য কথা বলব না।" বাক্যের মধু বর্ষণের মধ্যে মেয়ে রসিয়ে ফোড়ন দিলে, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, একখানা কেন—তুমি হাজারখানা

নাও, আমার বাবার সে টাকা দেবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু না বলে দেবে কেন?"

যুগ্ম শক্তির প্রবল প্রতাপে ভীত ভবানী আর একটি কথাও বল্লে না। সে জানে দন্তস্ফুট করলে এক্ষুণি প্রতিবেশিনীদের বন্ধ বাতায়ন খুলে যাবে। ঢাকের শব্দ ছাপিয়ে গলার শব্দে রণিত হবে চারদিকে। বয়েস হলে কি হবে, ভবানীর প্রকৃতি ভিন্ন ধরণের। চেঁচামেচি গোলমাল তার ভাল লাগে না। আজও তার মন পাখীর মতো পাখা মেলে উড়ে যেতে চায়।

ভবানী দুঃখে ক্ষোভে সরে এসে বিছানায় আশ্রয় নিল। তার হৃদয়ে অকস্মাৎ দুঃখের সমুদ্র উদ্বেলিত হ'ল। মনে হ'ল জগতে কোথাও যেন তার কেউ নাই। জীবনের শান্তি নেই, এই যে ছোট সংসারটিকে সে সারা জীবনব্যাপী তিল তিল করে গড়ে আজ বৃহতে পরিণত করেছে—অভাব অভিযোগ দৈন্য নিঃশেষে মুছে ফেলে দিয়েছে। একি কেবল অর্থসমাগমেই—সমৃদ্ধ হয়েছে? এর মধ্যে কি একজনের যত্ন চেষ্টা সাধনা আত্মত্যাগ নিহিত হয়ে রয়নি? কিন্তু সেই ত্যাগের আজ এই মূল্য।

ভবানীর হাতের নূতন ঝকঝকে চুড়ির দিকে চোখ পড়তে মনে হ'ল—এ তার আভরণ নয়, সোনার শৃঙ্খল। একটানে এই শিকল খুলে ফেলে দিয়ে তার বিক্ষিপ্ত হৃদয় ছুটে বেরিয়ে যেতে ব্যগ্র হয়ে উঠল। গলার পাটি হারকে কণ্ঠভূষা বলে বোধ হ'ল না, এ যেন বন্ধন রজ্জু—এ বন্ধন অপেক্ষা দীঘির শীতল জল অনেক ভাল। যার বুকে নীল আকাশের ছায়া কাঁপছে, চন্দ্রতারাখচিত দীঘির তল অনেক সুন্দর। সুন্দরের উদ্দেশ্যে ভবানীর অভিযানের পূর্ব্বে সন্ধ্যারতির ঢাক-ঢোল বেজে উঠল তুমুল বেগে।

বধূ বিছানার পাশে উপনীত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—"মা পাড়ার মেয়েরা আরতি দেখতে আমাদের ডাকতে এসেছে। ঠাকুরঝি যাবে না বল্লে, আপনি এখন যাবেন কি?" ভবানী শুয়ে থেকেই উত্তর দিল। "না মা—আমি যাব না, ভারী ক্লান্তি লাগছে, তুমি কুন্তলকে নিয়ে ঘুরে এসগে। নতুন টিস্যুর শাড়ীটা পরে যেয়ো। আর ঝি চাকরদের কারোকে সঙ্গে নিয়ো।"

বধূ বেরিয়ে গেলে এত দুঃখের মধ্যেও ভবানীর অধরে ক্ষোভের হাসি চকিতে দেখা দিয়ে চকিতে মিলিয়ে গেল। এই প্রাধান্যের গৃহিণীত্বের মোহ কি? এর উপরে—কতনা সৌন্দর্য্য, কিন্তু মধ্যে দীঘির জল তলের মতন পাঁকে পরিপূর্ণ।

তখনো বাইরে ভবানীর কানের কাছে পিতা-পুত্রীর সমালোচনার বিরতি হয় নাই। তবে তার বেগ ঈষৎ মন্দীভূত হয়ে এসেছে। প্রতিপক্ষ না হলে কলহ চলে না। যুদ্ধ চলে না। নাই মেঘের ঘনঘটা প্রবল পক্ষের—অন্তরাকাশে তেমন জমে উঠতে পারল না। ওদের আক্রোশের অগ্নির প্রখর তেজ না থাকলেও ধিকিধিকি জ্বলছে। যেটুকু জ্বলছে তারই উত্তাপে ভবানী দুগ্ধফেননিভ বিছানায় শুয়েও ঝলসিত হচ্ছিল। যে একদা খাতার পাতা ভরেছে ছড়া লিখে লিখে, তার ভেতরে আর কিছু না থাক, ভাবপ্রবণতার অভাব নেই।

সেই ভাবের আতিশয্যে ভবানী সঙ্কল্প করল—সে আর এখানে থাকবে না, দীঘির—অতল জল না হোক্ অদূরের বুড়ী-গঙ্গার খালটিই বা মন্দ কিসের? ডোবার মত তাতে জলের অভাব হবে না। এদের দেওয়া নূতন চুড়ি, পাটিহার—পথিক শাড়ী পড়ে থাকুক এখানে। সে আজ মায়ামুক্ত হ'য়ে পাখা মেলে উড়ে যাবে।

"দিদা-দিদা, আমি এসেচি আমাকে কোলে নাও একটুখানি।" ভবানী-সচমকে বিছানায় উঠে বসে দুই বাহু প্রসারিত করল "একি কুন্তল, তুই আরতি না দেখে যে ফিরে এলি?"

"আসবই তো, তোমার চোখে জল কেন? তুমি শুয়ে রয়েছে কেন? ওরা তোমাকে বকে, আমি ওদের লাঠি দিয়ে মারব, যাব না—আরতি দেখতে—।" বলতে বলতে চার-বছরের অবোধ শিশু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

অটলবিহারী আদরের নাতির কান্না শুনে অস্থির হয়ে ছুটে এলেন। তাঁর পেছনে অমিয়া।

কুন্তল অঝরে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—"তুমি দিদাকে বকবে কেন? আমি তোমার সাথে কথা কইবো না, কোলে চড়বো না। দিদাকে নিয়ে চলে যাব বুড়িগঙ্গায়। তুমি বেরিয়ে যাও, আমাদের ঘর থেকে, কখনো ঢুকো না।"

শিশুকর্ত্তার আদেশে বাড়ীর কর্ত্তা ম্লান হয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। অমিয়া হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

ভবানী মুহূর্ত্তে ভুলে গেল দীঘির শীতল জল, বুড়িগঙ্গার খাল—পাখা মেলে ওড়ার সংকল্প। সে সাদরে সস্নেহে রোরুদ্যমান শিশুকে বুকে তুলে নিলে।

তখনো আরতি শেষ হয়নি, পাড়া কাঁপিয়ে ঢাক ঢোল বাজছে তালে তালে। পুষ্প চন্দনে আচ্ছাদিত ধূপের ধূমে ধূমাচ্ছন্ন মায়ের মন্দির-তোরণে একজন উপনীত হ'ল না বলেই বুঝি মহামায়া দয়া করে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর আরক্ত কর্ণের একটি কুন্তলকে। যার পরশে ভবানীর সকল জ্বালা জুড়িয়ে গেল। শীতল হ'ল।
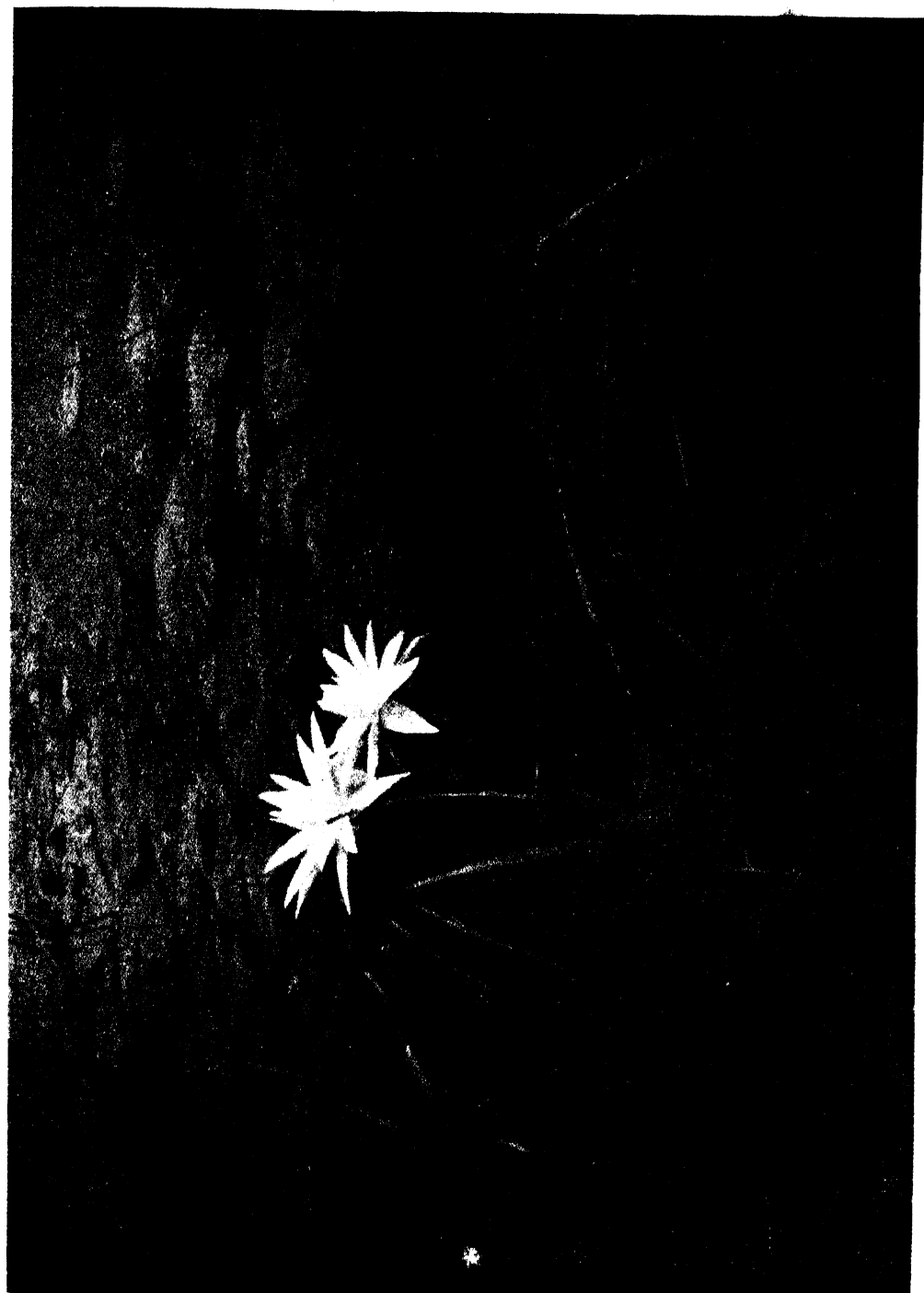
ভাষাভিত্তিক বাংলা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বহুকাল আন্দোলন আলোড়নের পর প্রধানতঃ ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশন নিয়োজিত হোলো এটা অবশ্যই সুখের বিষয়। সকলে আশা করে যে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বহুকালের দাবিগুলি যাতে মেটানো যায় কমিশন আন্তরিকভাবে তার চেষ্টা করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গের দাবিগুলির মূল কথা হ'চ্ছে—যে সব অঞ্চল যে যে প্রদেশের অংশ ছিল সেগুলিকে সেই সেই প্রদেশের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত করে দেওয়া হোক। সমস্ত দিক থেকে বিচার বিবেচনায় যে সব এলাকা ন্যায়ত যে প্রদেশের সেই প্রদেশকে ঐ সব অঞ্চলগুলি থেকে নৈতিক, রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক কোন ওজর দেখিয়েই আর বঞ্চিত রাখা চলবে না।

পশ্চিম বাংলার সঙ্গে যুক্ত করার জন্যে যে অঞ্চলগুলি দাবি করা হয়েছে সেগুলি পাঠান ও মোগল রাজত্বের সময় চিরকাল পশ্চিমবঙ্গভুক্ত ছিল; ইংরাজ শাসনের সময়েও ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিল বাংলা দেশেরই অংশ।

বিহার থেকে মানভূম, সিংভূমের ধলভূম পরগণা, পূর্ব্বতন দেশীয়রাজ্য সেরাইকেল্লার উত্তর-পূর্ব্ব অংশ, সাঁওতাল পরগণার বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল এবং পূর্ণিয়া জেলার মহানন্দ নদীর পূর্বপারের ফালি জায়গাটুকু।

আসাম থেকে গোয়ালপাড়া (গারো, খাসি, জয়ন্তিয়া পাহাড় ও কাছাড়সহ) এবং ত্রিপুরা (যা বর্ত্তমানে কোন প্রদেশের সঙ্গেই যুক্ত নয়) এই অঞ্চলগুলিকে পশ্চিমবাংলার সঙ্গে যুক্ত করবার জন্যে দাবি করা হয়েছে।

লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনা দেশের মধ্যে এক বিরাট আন্দোলন ও প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করে, প্রায় সাত বছর ধরে সেই আন্দোলনের ঝড় বইতে থাকে। সেই আন্দোলনের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করার জন্যে ভারত সরকার ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ২৫ই আগষ্ট ভারত-সচিবের কাছে বঙ্গ-বিভাগ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের একটি পরিকল্পনা পেশ করেন, তাহার শেষ অংশটুকু উদ্ধৃত করছি।—

"আশা করি গভর্ণর ও সরকার উপরোক্ত পরিকল্পনাটি অনুমোদন করবেন। আমাদের প্রস্তাব এই যে ভারত-সম্রাট কলিকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার কথা ঘোষণা করুন এবং সাথে সাথে এই স্থানান্তরের আনুসঙ্গিক হিসাবেই যতশীঘ্র সম্ভব বাংলা প্রদেশের জন্যে গভর্ণরের পদ এবং বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার জন্যে—একটি লেফ্‌টেনেন্ট গভর্ণরের পদ সৃষ্টি করুন, এই ভাবে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন ও সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণ করে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে গৃহীত বঙ্গ-বিভাগ পরিকল্পনার জন্যে উদ্ভূত যে সব সমস্যা নিয়ে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে—সেগুলি যথাযথ ভাবে সমাধান করুন। দরবার অনুষ্ঠানের পর স্থানীয় ও অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে উদার ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো—যাতে বঙ্গ-বিভাগ পরিকল্পনা রদবদল করার শ্রেষ্ঠ পন্থা বেরিয়ে আসে এবং সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি চূড়ান্ত ও সন্তোষজনক মীমাংসায় আশা যায়।"

মহামান্য ভারত-সম্রাট ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর দরবারের অভিভাষণে সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেন। তখন হাতে সময় অল্প থাকায় অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে তখনকার মত শাসন-তান্ত্রিক ভাবে গঠিত প্রাদেশিক ভিত্তিতে তাড়াহুড়ো করে রাজ্যগুলির জায়গা পুনর্বণ্টনের কাজ সমাধা করা হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে বাংলা ও বিহার প্রদেশের যথাযথ সীমানা নির্দ্ধারণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনা রদবদল করার ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বিহারের বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করার জন্যে সরকারের কাছে দাবি করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব করেন ডাঃ (পরে স্যর উপাধিতে ভূষিত) তেজবাহাদুর সাপ্রু এবং এই প্রস্তাব সমর্থন করেন বিহারের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ স্যর পরমেশ্বরলাল।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে বিহারের বিশিষ্ট নেতৃবর্গের নিম্নলিখিত বিবৃতিটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।—

"আমরা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করছি যে কংগ্রেসের গত অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলা-ভাষাভাষী সমস্ত অঞ্চলগুলিকে বঙ্গ সরকারের শাসনাধীনে এবং সমস্ত হিন্দিভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে বিহারের লেফ্‌টেনেন্ট গভর্ণরের শাসনাধীনে প্রযুক্ত করাই কর্ত্তব্য! এই ব্যবস্থানুযায়ী পূর্ণিয়া ও মালদহের(১) মহানন্দ নদীর পূর্ব্বকূলস্থ অঞ্চলগুলি জাতিগত ও ভাষাগত ভাবে বাংলা ও বিহারের সীমানা, কাজেই সেই এলাকাগুলি বাংলার সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত এবং ঐ দু'টি জেলার পশ্চিম অংশ বিহারের সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত। ঠিক এই রকম সাঁওতাল পরগণার ও এই ধরণের অঞ্চলগুলিতে যেথানে বাংলা ভাষা প্রচলিত সেগুলি বাংলার সঙ্গে এবং হিন্দি-ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি বিহারের মধ্যে থাকা উচিত। ছোটনাগপুরের সারা মানভূম জেলা ও সিংভূম জেলার ধলভূম পরগণা বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল, কাজেই সেগুলি

---

(১) মালদহ কথন বিহারের অংশ নয়, এটি সম্পূর্ণ বাংলা-ভাষাভাষী—কাজেই বিহারের নেতৃবর্গ তাদের বিবৃতিতে মালদহকে যুক্ত করে সম্পূর্ণ ভুল করেছেন।

বাংলার সঙ্গে এবং এই বিভাগের বাকি হিন্দি-ভাষাভাষী অংশ বিহারের মধ্যে থাকা উচিত।"

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন দীপনারায়ণ সিং, এম-ফাকরুদ্দিন, সচ্চিদানন্দ সিংহ, নন্দকিশোর লাল এবং পরমেশ্বর লাল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে ২৫শে আগষ্ট তারিখে যে সরকারী ডেস্‌প্যাচে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি নিয়ে বাংলা প্রদেশ ও হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে একটি আলাদা বিহার প্রদেশ গড়ার নীতি ব্যক্ত করা হয়েছে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের তদানীন্তন সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সরকারের কাছে দাবি পেশ করেন যে (ক) শিলেট ও গোয়ালপাড়া জেলা, (খ) মানভূম জেলা, (গ) সাঁওতালপরগণা, (ঘ) সিংভূম জেলার ধলভূমপরগণা, (ঙ) পূর্ণিয়া জেলার মহানন্দ নদীর পূর্ব্বপারের অংশ বাংলা প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হোক।

এই দাবির উত্তরে বঙ্গ সরকার জানান যে বঙ্গ-বিভাগ পরিকল্পনা রদবদলের সিদ্ধান্তের ফলে সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণের বিষয়টি 'সরকারের বিবেচনাধীন।'

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ৭ই এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়!—

"ভারত সরকার কর্তৃক ঘোষিত সমস্ত বাংলা-ভাষাভাষী জনগণকে একই প্রাদেশিক সরকারের শাসনাধীন করার নীতি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ২৫শে আগষ্ট তারিখের ডেস্‌প্যাচে প্রকাশিত হয়েছে, তাই এই সম্মেলন দাবি করে যে শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়া জেলা, সাঁওতালপরগণা, মানভূম, সিংভূম জেলার ধলভূমপরগণা, পূর্ণিয়া জেলার মহানন্দ নদীর পূর্ব্বপারের এলাকাকে নবগঠিত বাংলা প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করতেই হবে।"

বছরের পর বছর ধরে বারে বারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন থেকে এই একই দাবি উঠেছে!

তদানীন্তন রাষ্ট্রসচিব মিঃ মণ্টেগু ও গভর্ণর জেনারল্ লর্ড চেম্‌সফোর্ডের কাছে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর বর্ণনা করে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে একখানি স্মারকলিপি পেশ করেন। সেই স্মারকলিপিতে এ্যাসোসিয়েসন ঐ দুই ব্যক্তিকে সরকারের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং সেই প্রতিশ্রুতিগুলি তখনও পর্য্যন্ত পালিত না হওয়ায় নিম্নলিখিত দাবি পেশ করেন।—

"সরকার বাহাদুরের কাছে আমাদের দাবি এই—যে সব প্রদেশের জনসাধারণ একই ভাষায় কথা বলে, পুরুষানুক্রমে যারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমজাতীয়; এই রকম অকৃতিগতভাবে একই ধরণের প্রদেশগুলিতে শাসনকার্য্যের সুবিধা হ'বে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ঠিক সেই ধরণেরই একটি প্রদেশ। কিন্তু বাঙ্গালা প্রদেশের সঙ্গে সংলগ্ন অথচ বাইরে কতকগুলি জায়গা রয়ে গেছে—যার অধিবাসীরা কথা বলে বাংলায়, যারা জাতিগত ও পুরুষানুক্রমিকভাবে বাঙ্গালী, বর্ত্তমানে সেই সব এলাকা বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। আমাদের নিবেদন এই যে প্রদেশগুলির সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণ করা হোক এবং সেই অঞ্চলগুলিকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করা হোক।"

সর্ব্বদলীয় কমিটী (নেহেরু-কমিটী) ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেই বছরেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন ঐ একই নীতি অনুসারে সারা বাংলার যে দাবি সেই বিহারের বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করার দাবি তোলেন।

সাইমন কমিশন অভিমত দেন এই বলে যে—"সমভাষা ব্যবহারই হ'চ্ছে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের দৃঢ় এবং স্বাভাবিক ভিত্তি" এবং প্রস্তাব করেন যে "বিশেষ জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'চ্ছে—ভারত সরকারের উচিৎ কোন একজন নিরপেক্ষ সভাপতি নিয়ে একটি সীমানা নির্দ্ধারণ কমিশন গঠন করা, যাঁরা প্রদেশগুলি পুনর্গঠনের বিশেষ বিশেষ কারণ বা তথ্যের তদন্ত করবেন।"

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তার নির্ব্বাচনী ঘোষণাপত্রে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করেন।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে নিউ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কতকগুলি নূতন প্রদেশ গঠন এবং ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে বর্ত্তমান প্রদেশগুলির সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণের দাবি করে' প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া থেকে কতকগুলি এলাকাকে শাসন-তান্ত্রিক সুবিধার জন্যে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে মানভূম জেলা, সাঁওতাল পরগণা ও ধলভূম মহকুমা নূতন করে তৈরি করা হয়। মানভূম চিরকালই বাংলাদেশের অংশ ছিল। এই অঞ্চল প্রথমে মেদিনীপুর থেকে শাসিত হোতো, তার পর বীরভূম থেকে। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে জঙ্গল মহল নামে একটি জেলা গঠন করা হয়—তার সঙ্গে যুক্ত করা হয় বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ার কিছু অংশ এবং মানভূম জেলার অন্তর্গত স্থানগুলি। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আবার জঙ্গল মহল জেলা ভেঙ্গে দিয়ে মানভূম নামে একটি জেলা তৈরী করা হয়—আর তার সঙ্গে যুক্ত করা হয় ধলভূমকে। খুন-খারাপী প্রভৃতি অপরাধমূলক কার্য্যকলাপের মাত্রা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ধলভূমকে সিংভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ডাঃ গ্রিয়ারসন তাঁর বিখ্যাত 'The Linguistic Survey of India' পুস্তকে লিখেছেন,—"সাঁওতাল পরগণার হাজারিবাগের সন্নিহিত অঞ্চলগুলি এবং সমগ্র মানভূম জেলার ভাষা বাংলা।" তিনি পুনরায় লিখেছেন—"মানভূম বাংলাভাষাভাষী জেলা, এবং সিংভূমের ধলভূম অঞ্চলেও ঐ একই ভাষা ব্যবহার হয়।"

মানভূমের জেলা-গেজেটের তথ্যানুযায়ী দেখা যায় যে সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭২ জন বাংলায় কথা বলে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও হিন্দি ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল শতকরা মাত্র ১২½ জন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে মানভূমের শতকরা ৮১ জন বাংলায় কথা বলে। সেই রিপোর্টেই দেখানো আছে যে বিহার এবং উড়িষ্যায় ১৯৩৭৫৮৭ জনেরও বেশী লোকের মাতৃভাষা

বাংলা, আর তাদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ লোকই আছে মানভূম জেলায় এবং সিংভূমের ধলভূম মহকুমায়।

ডাঃ গ্রিয়ারসনের—'Linguistic Survey of India' পুস্তকে যতখানি এলাকাকে বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল বলে বর্ণিত আছে তার চেয়ে অনেক কম এলাকাকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করার জন্যে এই স্মারকলিপিতে দাবী করা হয়েছে। কাজেই এই দাবী খুবই সঙ্গত, বিশেষ করে আজ ৪৫ বছর ধরে ভাষাগত মিলের জন্যে যে সংস্কারের চেষ্টা চলছে এতে সেই দাবিই ওঠানো হয়েছে।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে পুরুলিয়া ও ধানবাদে সমগ্র অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১৮১০৮৯০, তার মধ্যে যাদের মাতৃভাষা বাংলা তাদের সংখ্যা—১২২২৬৮৯, হিন্দুস্থানী ভাষীর সংখ্যা—৩২১৬৯০ এবং সাঁওতালী ভাষীর সংখ্যা—২৪২০৯১ (২)। তাহ'লে সমগ্র অঞ্চলে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা হোলো শতকরা ৬৭ ভাগ। ঐ জেলার সাঁওতালরাও বাংলাকে সহকারী চলিত ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। পুরুলিয়ার আদালত গ্রাহ্য ভাষা চিরকালই বাংলা। সদর মহকুমায় দলিলাদি সমস্তই লেখা হয় বাংলা অথবা ইংরাজীতে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ধানবাদে বাংলা ভাষা থাকা সত্ত্বেও হিন্দিকেও আদালতগ্রাহ্য ভাষারূপে ধার্য্য করা হয়, কিন্তু দলিলাদি, আবেদন পত্র বা লিখিত বিবরণাদি এতাবৎ খুব কমই হিন্দিভাষায় লেখা হয়েছে। ধানবাদে সম্প্রতিকাল পর্য্যন্ত যত দলিলাদি রেজেষ্ট্রি হয়েছে তা সমস্তই বাংলা অথবা ইংরাজীতে লেখা, হিন্দিতে নয়। এই থেকেই চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হয় যে ধানবাদ বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল। ভাষার মত সংস্কৃতিগত ভাবেও ধানবাদ বাংলারই অংশ, ছোটনাগপুরের নয়। যে সব লোক বাইরে থেকে ধানবাদে নিত্য যাওয়া আসা করে—এর মধ্যে তাদের গণ্য করা উচিৎ নয়।

মানভূম জেলার পতিত ও অন্যান্য তালুকের মত ধলভূম ও সুবা-বাংলার সরকার মন্দরনএর অংশ ছিল (আইন-ই-আকবরি ২য় খণ্ড, ২য় ভাগ)। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে যখন বাংলার নবাব ইংরাজদের হাতে জমিদারী অর্পণ করলেন তখন ধলভূম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ অবধি মেদিনীপুর জেলার অংশ হিসেবেই শাসিত হয়ে এসেছে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এই জায়গাটিকে মানভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার পর আবার ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এটিকে সিংভূমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ধলভূমের অধিবাসীরা কোন দিনই সিংভূমকে তাদের নিজেদের দেশ বলে না। সংস্কৃতি ও ভাষাগতভাবে ধলভূম এখনও পর্য্যন্ত বাংলারই অংশ, বিহার বা ছোটনাগপুরের সঙ্গে যোগাযোগ খুবই অল্প। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির হিসাব অনুযায়ী ঐ মহকুমার সমগ্র অধিবাসী ৩৯৪৫৯৫ জনের মধ্যে ১৩৪১০৫ জনের মাতৃভাষা বাংলা। এর প্রায় সমসংখ্যক লোক কথা বলে আদিবাসীদের ভাষায়; কিন্তু আদিবাসীরাও চলতি সহকারী ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাই ব্যবহার করে। কাজেই অধিবাসীদের বিরাট অংশ বাংলা-ভাষাভাষী। উড়িয়া ও হিন্দি ভাষা ব্যবহার করে অতি অল্প লোক, তার সংখ্যা যথাক্রমে ৪৪৬৪০ (শতকরা ১১ জন), এবং ৪৯৬২৪ (শতকরা ১২ জন)। ধলভূমের অধিবাসীদের সমজাতীয় লোক আছে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও মানভূমে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই মহকুমার আদালতগ্রাহ্য ভাষা ছিল শুধু বাংলা, ঐ খৃষ্টাব্দে হিন্দিভাষাকে আরও একটি আদালতগ্রাহ্য ভাষারূপে ধার্য্য করা হোলো। সেটেলমেণ্ট সম্পত্তির বিবরণাদি, দলিলপত্র প্রভৃতি বাংলা ভাষাতেই লেখা হয়েছে। মিঃ লেসি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁর আদমসুমারির রিপোর্টে মন্তব্য করেন যে "জামসেদপুরের বাইরে বাংলাভাষাই ধলভূমের প্রধান ভাষা, উড়িয়াভাষা দ্বিতীয় স্থানে এবং হিন্দুস্থানী শোচনীয়ভাবে তৃতীয় স্থানে আছে।" যে সব লোক বাইরে থেকে নিত্য জামসেদপুরে যাতায়াত করে এর মধ্যে তারা গণ্য নয়।

উত্তরপূর্ব্ব সেরাইকেল্লা স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিমবঙ্গের অংশ, কারণ এর অধিবাসী প্রধানতঃ বাঙ্গালী, সাঁওতাল এবং ভুমিজারাও সহকারী চলিত ভাষা হিসেবে বাংলাভাষার মাধ্যমেই অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তেজবাহাদুর সাপরু সেরাইকেল্লাকে বাংলাদেশের অংশ বলে দাবি করেন নি—তার কারণ তখন এটি ছিল স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন দেশীয় রাজ্য। বর্ত্তমানে সেরাইকেল্লা ভারতডোমিনিয়নের অন্তর্গত হয়েছে, এটিকে পশ্চিমবঙ্গভুক্ত না করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

ইংরাজ শাসনের গোড়ার দিকে বর্দ্ধমান, বীরভূম ও ভাগলপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এই এলাকাকে বীরভূম ও ভাগলপুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে চারটি মহকুমা গঠন করা হোলো—দুমকা, দেওঘর (জামতাড়াসহ), গড্ডা এবং রাজমহল (পাকুড় সহ), এইগুলি নিয়েই হোলো সাঁওতাল পরগণা। পরে আবার দুটি মহকুমা গঠিত হোলো জামতাড়া ও পাকুড়।

বর্ত্তমানে রাজমহল, পাকুড়, জামতাড়া ও দুমকা মহকুমার যে এলাকা সেই এলাকা বহুকাল যাবৎ বাংলাদেশেরই অংশ ছিল। কিছু কালের জন্যে রাজমহল ছিল বাংলার রাজধানী। বহু পূর্ব্বকাল থেকেই সাঁওতাল পরগণার বেশীরভাগ অঞ্চলেই প্রধান ভাষা বাংলা। কিন্তু ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই জেলাটিকে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত করার পর থেকে হিন্দি ভাষা বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের স্থান করে নিতে লাগলো। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আদমসুমারির রিপোর্ট-লেখক লিখেছেন, "সাঁওতালপরগণা, সিংভূম এবং দেশীয় করদ রাজ্যগুলিতে ইহা (বাংলা ভাষা) পিছু হঠতে সুরু করেছে। জামতাড়া ও দুমকা মহকুমায় বাংলা ভাষার প্রভাব বিশেষভাবে জোরদার।" গড্ডা ছাড়া সাঁওতাল পরগণার অন্য সমস্ত মহকুমার নাগরি (বা কায়তি) ভাষার সঙ্গে বাংলাও আদালতগ্রাহ্য ভাষা। এই সব অবস্থা বর্ত্তমান থাকার দরুণ সমগ্র পাকুড় ও জামতাড়া

---

(২) ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারির সংখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে—তার কারণ ঐগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের সংখ্যা সাধারণভাবে বিশ্বাসের অযোগ্য বলেই মনে হয়, কেন না ঐগুলি উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই তৈরি হয়েছিল।

মহকুমা এবং দুমকা ও রাজমহল মহকুমার প্রত্যেকটি থেকে আধাআধি অংশ পশ্চিম বাংলার সঙ্গে যুক্ত করাই সঙ্গত।

পুর্ণিয়া জেলার মহানন্দা নদীর পূর্ব্বপারে যে এলাকা রয়েছে তা বাংলা দেশের দিনাজপুর ও মালদহ জেলার সঙ্গে সংলগ্ন, এই জায়গা চিরকালই এই প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ভাষাগত ঐক্যের দিক থেকে বিচার করলেও এই এলাকা পশ্চিমবঙ্গেরই মধ্যে পড়ে। পুর্ণিয়ার কিষাণগঞ্জ মহকুমায় বাংলা ভাষাতেই কথা বলা হয় বলে গ্রীয়ারসন্ বর্ণনা করেছেন, আবার ১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদম শুমারির তত্ত্বাবধায়ক এখানকার কথিত ভাষাকে মৈথেলি বাংলা ভাষা বলে বর্ণনা করেছেন। এই ভাষা হিন্দি ভাষা থেকে অনেক তফাৎ। এই এলাকাকে পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত করার আরও একটি কারণ এই যে র‍্যাডক্লিফ্ এ্যাওয়ার্ড জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর জেলা দুটিকে মূল পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, পুর্ণিয়ার ঐ এলাকা সেই জেলা দুটির সঙ্গে মূল পশ্চিমবঙ্গকে সংযুক্ত করতে পারবে, এই ভাবে সংযুক্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। শাসনকার্য্য পরিচালনার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের কথা বিচার করে এই এলাকাকে পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত করায় কমিশনের কোন রকম দ্বিধা করা উচিত নয়।

গোয়ালপাড়া এবং গারোপাহাড় চিরকালই বাংলাদেশের মধ্যে ছিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে যে ব্রহ্মযুদ্ধ হয়েছিল তারও পরে, আসল আসাম বৃটিশের শাসনাধীনে আসার ৬১ বছর আগে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানী প্রাপ্ত হয়ে এই অঞ্চলগুলি বৃটিশের অধীনে আসে। গোয়ালপাড়াসহ সারা আসাম ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ অবধি বাংলার সঙ্গে যুক্ত ভাবেই কমিশনার দ্বারা শাসিত হয়ে এসেছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দেই চীফ্ কমিশনারের পদ সৃষ্টি হয়। গোয়ালপাড়া প্রধানতঃ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল।

কাছাড় অধিকার হয়েছিল দু'ভাগে, একভাগ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে, অন্য ভাগ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে চীফ্ কমিশনারের পদ সৃষ্টির পরও বাংলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কাজেই আসামীদের এই কাছাড়কে তাদের প্রদেশের অংশ বলে দাবি করার কোন যুক্তি নেই। এই এলাকার অধিকাংশই বাংলা ভাষাভাষী, মাত্র ৩৪৬২ জন লোক মাতৃভাষা হিসেবে আসামী ভাষা ব্যবহার করে।

গোয়ালপাড়া ও কাছাড়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার জন্যে গারো, খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের সামান্য অংশ পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত করতে হ'বে। এটা শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্যে বিশেষ প্রয়োজন, কাজেই এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই থাকতে পারে না, তাছাড়া গারো পাহাড়ে আসামী অপেক্ষা বাঙ্গালীর সংখ্যা অনেক বেশী, আর খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়েও আসামী এবং বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান।

ত্রিপুরা প্রায় সম্পূর্ণ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল, এটিকে পশ্চিমবাংলার সঙ্গে যুক্ত না করে' আলাদা একক ভাবে রাখা খুব সুবিবেচনার কাজতো নয়ই, আর সেটা বিশেষ নিরাপদও নয়।

উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে এখন বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গেছে যে পশ্চিম বাংলায় সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণের দাবি ন্যায়সঙ্গত, দৃঢ় এবং অকাট্য। নিঃসন্দেহে বাংলার এই বহু আকাঙ্ক্ষিত দাবি সত্যের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর এটি যথেষ্ট তিক্ততারও উৎস বটে। এখন এই বিষয়টিকে কংগ্রেস সরকারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করা উচিত। এর ন্যায্য ও চূড়ান্ত মীমাংসা হলে নিশ্চয়ই এই পাশাপাশি প্রদেশগুলির অধিবাসীদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও আন্তরিকতা ফিরে আসবে। এখানে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য যে বিহার এবং আসামের ঐসব অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত করার পরও ঐ দুটি প্রদেশ যথেষ্ট বড় থাকবে এবং তাদের প্রাকৃতিক সম্পদও থাকবে অপর্য্যাপ্ত। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণের পরেও ভারতের বৃহৎ প্রদেশগুলির মধ্যে বিহার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে থাকবে এবং তার কয়লা ও লৌহসম্পদ তাকে ভারতের অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে রাখবে। আমাদের বন-সম্পদ, খনিজ তৈল ও জল-বিদ্যুৎকে যদি যথাযথভাবে কাজে লাগানো যায় তাহ'লে তাকে প্রচুর বল ও জীবনীশক্তি যোগাবে এইসব প্রাকৃতিক সম্পদ।

আরও একটি নূতন সমস্যা ইতিমধ্যে এসে পড়ায় বিষয়টির গুরুত্ব ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস থেকে আরম্ভ করে পূর্ব্ববঙ্গ থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুর সংখ্যা বিরাটভাবে বেড়ে চলেছে। এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের হঠাৎ আগমনে পশ্চিম বাংলার জমী ও অর্থ-নৈতিক জীবনের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়েছে। যদি এই অবস্থা আরও কিছু কাল চলতে থাকে, তা হ'লে জমীর অভাবে উদ্বাস্তুদের বসবাসের স্থান সঙ্কুলান হওয়াই অসম্ভব হয়ে উঠবে। অবস্থা খুব দ্রুত শোচনীয় হয়ে উঠছে, বিশেষ করে' আরও একটা ব্যাপার হ'চ্ছে এই যে কুখ্যাত র‍্যাড্ক্লিফ্ এ্যাওয়ার্ডে পশ্চিম বাংলার ভাগে যেটুকু জমী বরাদ্দ করা হয়েছে তা সারা বাংলা দেশের মাত্র ⅓ অংশ। অধিবাসী-সংখ্যারও যে প্রচণ্ড চাপ (বাংলা—৭৯৯, বিহার—৫৭২, আসাম—১০৬) সে'দিকে একবার নজর দিলেই বেশ পরিষ্কার দেখা যায় যে এর ওপর আবার জনসংখ্যার বোঝা চাপলে তা বহন করা অসম্ভব। দেশ বিভাগের পর থেকেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চিম বাংলার অবস্থা বিশেষভাবে তলায় নেমে এসেছে। এই সময়ে বিহার ও আসামের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হ'লে এই অবস্থাকে ফেরানোর অনেকখানি সাহায্য হ'বে।

বাংলা দেশের মানুষই সারা ভারতের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করেছিল, ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যে অবিরাম সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হয়েছিল এই বাংলা দেশেরই মানুষ। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই বৃটিশ সরকার এবং ভারতের শাসক সম্প্রদায়ও সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন বাংলার শক্তি ও প্রভাবকে খর্ব্ব করার জন্যে। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার মূলেও ছিল সেই একই উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন দেখলেন সেই সর্ব্বজন-ধিক্কৃত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে দুর্দ্দমনীয় প্রতিরোধ শক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—তাকে কোন সোজা পন্থায় দমন করা যাবে না, তখন তাঁরা কুটিল পথ ধরলেন তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশায়। ঠিক যে ভাবে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ

পরিকল্পনার রদবদল করা হোলো. তার আসল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার জনসাধারণকে দুর্ব্বল করে দেওয়া। সেই কারণেই বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনা রদবদলের প্রস্তাবের সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বৃটিশ শাসক-সম্প্রদায় তারপর আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। এখন ভারতবাসীর হাতেই শাসন ক্ষমতা এসেছে—তাই আমরা আশা করি আমাদের জাতীয় সরকার ন্যায়সঙ্গত, অকপট এবং সম্মানজনক উপায়ে বিষয়টির মীমাংসা করে দেবেন। বহুকাল আগে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস যে শপথ গ্রহণ করেছিল তা পালন করা এখন তাঁদের পবিত্র কর্ত্তব্য। বাংলার সেই সংগ্রাম-নির্য্যাতনের ফল বিহার বেশ পরিপূর্ণভাবেই ভোগ করছে, অবশ্য নূতন স্বায়ত্বশাসনসম্পন্ন বিহারের বর্ত্তমান অবস্থাকে বাংলা কোন রকম ঈর্ষাতো করেই না, বরং তার এই সৌভাগ্যের জন্যে সত্যই আনন্দিত। আশা করবো বিহারও এই মনোভাব গ্রহণ করে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে উদার ব্যবহার করবে। আসামের এলাকা বিরাট অথচ জনসংখ্যা অল্প. শুধু তাই নয় ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সব দিক থেকেই পশ্চিম বাংলার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠ, তাই তার কাছেও আশা করবো যে কোন রকম অযৌক্তিক ও অসঙ্গত দাবির কথা উপেক্ষা করে পরিপূর্ণ সক্রিয় সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসবে, এতে যে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ উভয়েই ইষ্ট ও উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গ কোন অনুগ্রহের প্রত্যাশী নয়, কোন রকম অযথা সুবিধা সে চায় না, সে চায় ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা, নিরপেক্ষ বিচার। (৩)

(৩) কলিকাতা ২৯।৮।২।১ আপার সার্কুলার রোডের মিলন মন্দির সমিতির (ফেডারেশন হল সোসাইটী) পক্ষ থেকে সভাপতি অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব মিণ্টো অধ্যাপক) যে নিবেদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বনে উপরের প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে।

আণবিক শক্তির শান্তি-কালীন প্রয়োগ

শ্রীমুকুল বিশ্বাস বি-এসসি

বিজ্ঞান মানুষকে অনেক কিছুই দিয়াছে। কিন্তু আণবিক যুগের অভ্যুদয়কে তাহার দান শ্রেষ্ঠ-দান বলা চলে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুর অন্তরের চাবিকাটি আজ বিজ্ঞানীর হাতে। সে আজ পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে লাগাইয়াছে, ইহা আনন্দের বিষয়। কিন্তু আণবিক-বোমা বা তদপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমার বিশ্ববিধ্বংসী ক্ষমতা যে পৃথিবীতে মরণযজ্ঞের সূচনা করিতে পারে, সে সম্বন্ধে বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের সতর্কবাণী আমরা শুনিয়াছি। বিশেষজ্ঞগণের মতে এবিষয়ে দ্বিমত নাই যে হাইড্রোজেন বোমার যুদ্ধে সমগ্র মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধটির স্বপক্ষে যুক্তি অবতারণার পূর্ব্বে আণবিক বোমার অন্তর্নিহিত রহস্যের একটু পরিচয় দেওয়া বাহুল্য হইবে না। ফার্মী, হ্যান্, কুরী, ও ষ্ট্রাসম্যান্ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দেখাইয়াছেন যে একটি ইউরেণিয়াম্ নিউক্লিয়াসকে নিউট্রন দ্বারা বিধ্বস্ত করিলে তাহা অস্থায়ী হইয়া পড়ে এবং সমান 'ভর' বিশিষ্ট দুইটি নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই প্রক্রিয়াকে নিউক্লিয়ার ফিশন বলা হয়, এবং ইহা দ্রুত ও অল্পগতি সম্পন্ন দুই প্রকারের নিউট্রন দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে। এই ফিশন্কালে প্রভূত শক্তি উৎপন্ন হয়, যাহার পরিমাণ ২০০×১০^৬ ইলেকট্রন ভোল্ট প্রতি ইউরেণিয়াম পরমাণুর জন্য। এই বিধ্বস্ত হওয়ার কালে তিনচারিটি দ্রুত নিউট্রনের উৎপত্তি হয় এবং ইহারা আরো ইউরেণিয়াম্ নিউক্লিয়াসের বিধ্বস্তকরণ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।

ফিশনের ফলে প্রাপ্ত পদার্থগুলির মধ্যে ইউরেণিয়ামের একটি আইসোটোপ পাওয়া যায়; তাহার আণবিক ওজন ৯২ ও ভর ২৩৯। ইহা 'বিটা রশ্মি' বিকীর্ণ করিয়া নেপচুনিয়ামে রূপান্তরিত হয় এবং ইহাও বিটারশ্মি বিকীর্ণ করিয়া প্লুটোনিয়ামে রূপান্তরিত হয়। এই প্লুটোনিয়ামকে নিউট্রন দ্বারা বিধ্বস্ত করিলে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয় এবং কয়েকটি নিউট্রন পাওয়া যায়। আণবিক বোমায় প্লুটোনিয়াম বিধ্বস্ত-কালের প্রচণ্ড শক্তিকেই কাজে লাগান হয়। এইজন্য প্লুটোনিয়ামকে 'অ্যাটমিক পাইলে' তৈয়ারী করা হয়। এই পাইলে, উদ্গত নিউট্রনের গতি স্থির করার জন্য গ্রাফাইট বা ভারী জলকে মডারেটর হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

শুধু মারণাস্ত্র হিসাবে আণবিক বোমার আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট হন নাই ইহা সুখের বিষয়। তাঁহারা আণবিক শক্তির শান্তিকালীন ব্যবহারকেও আয়ত্ত করিয়াছেন। উপযুক্তভাবে পরিচালিত হইলে আণবিক শক্তি যে মানুষের পরম বন্ধু হইতে পারে তাহাই বৈজ্ঞানিকগণ, বিশেষ করিয়া আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিতেছেন। ইউরোপের আণবিকশক্তি কমিশন্ পৃথিবীর ৩৯টি দেশের সহিত আণবিক শক্তির শান্তিকালীন ব্যবহারের জন্য হাত মিলাইয়াছে। যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রধান আণবিক শক্তি কেন্দ্র 'ওক্‌রিজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরী' ১৯৪৮ সাল হইতেই এক হাজার আণবিক বিজ্ঞানীকে, এতদ্ উদ্দেশ্যে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছে। 'ইণ্টার ন্যাশনাল নিউক্লিয়ার এনার্জি সোসাইটি' নামে আর একটি আন্তর্জাতিক গবেষণাকেন্দ্রও গঠনের পথে।

আণবিক শক্তি যে যে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত

চারিটি বিষয়ই প্রধান : (১) চিকিৎসাশাস্ত্রে (২) কৃষিবিষয় (৩) শিল্প-বিষয় এবং (৪) বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে।

সৃষ্টির আদি হইতেই মানুষ রোগের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করিয়াছে। প্রায় প্রত্যহই নিত্য নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে। কিন্তু আজকের আণবিক যুগে মানুষ পরমাণুকে কাজে লাগাইয়াছে। এই দিক দিয়া আণবিক যুগের সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার 'রেডিও-আইসোটোপ'। এই রেডিও-আইসোটোপগুলি ধাতুর পরমাণু। অ্যাটমিক্ পাইল বা সাইক্লোট্রন নামক যন্ত্রের দ্বারা ধাতুর পরমাণু-গুলিকে ব্যবহার করিলে তাহারা নানা প্রকার রশ্মি বিকীরণ করিতে পারে। এইরূপ রশ্মি-বিকীরণে সুপটু পরমাণুকেই রেডিও-আইসোটোপ বলা হয়। রোগ-নিবারণের জন্য যখন এই রেডিও আইসোটোপদের ব্যবহার করা হয়, তখন সেই রশ্মিগুলিই শরীরের আক্রান্ত অংশে প্রবেশ করে ও রোগকে আক্রমণ করে।

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ এই রেডিও আইসোটোপ্ দিয়া প্রধানত ক্যান্সার রোগ নিবারণ করিতেছেন। এই সূত্রে তেজস্ক্রিয় কোবল্ট বা রেডিও-অ্যাকটিভ্ কোবল্টের নাম উল্লেখযোগ্য। ক্যানসারের জন্য যে বিশেষ ধরণের এক্স-রে চিকিৎসার ব্যবহার আছে, তাহাতে বহু লক্ষ ইলেকট্রিক চার্জ দেওয়া হয়, যাহাতে আক্রান্ত স্থানটি শক্তিহীন হইয়া পড়ে। রেডিও-অ্যাকটিভ্ কোবল্ট ব্যবহার করিলে উৎপন্ন রশ্মিগুলিও লক্ষ ইলেকট্রিক ভোল্টের মতো শরীরের আক্রান্ত স্থানে প্রবেশ করে ও রুগ্ন-টিসুগুলিকে আঘাত করে। এই প্রক্রিয়াকে 'কোবল্ট থেরাপি' আখ্যা দেওয়া যায়। এই কোবল্ট্ থেরাপির আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা আভ্যন্তরিক ক্যান্সারকেও আঘাত করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে উপরের চামড়ার কোন ক্ষতি হয় না।

ক্যান্সার রোগের ঔষধ হিসাবে আর একটি আবিষ্কার রেডিও-সিজিয়াম। যুক্তরাষ্ট্রের 'ওক্ রিজ ন্যাশানাল ল্যাবরেটরী'তে ইহা তৈয়ারী হইতেছে।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার রেডিও অ্যাকটিভ্ আয়োডিন্। থাইরয়েড্ ক্যান্সারের পক্ষে ইহার উপযোগীতা প্রচুর। রোগীকে সাধারণত ইহা খাইতে দেওয়া হয়। তাহার পর রশ্মিগুলি ক্যান্সার আক্রান্ত টিসুকে গিয়া আঘাত করে এবং আয়োডিনটুকুও ঐ আক্রান্ত টিসুতে গিয়া কার্যকরী হয়। উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পারিপার্শ্বিক রোগ-বিস্তার বন্ধ হইয়া যায়।

চক্ষু ক্যান্সার চিকিৎসায়ও আণবিক্ শক্তির ব্যবহার করা হয়। ইহার প্রধান সুবিধা এই যে ইহা চক্ষুর রেটিনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়না।

চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্ষেত্রে আবিষ্কারের বৈচিত্র্যে মার্কিণ বৈজ্ঞানিক-গণ সকলকেই হার মানাইয়াছেন। রোগের উপর আণবিক রশ্মির প্রভাব লক্ষ্য করিবার জন্য তাঁহারা ডিমকে বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত করিতেছেন। ব্রুকহাভেনের চিকিৎসাবিদ্‌গণ জীবনের পক্ষে খনিজের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করার জন্য নানা আশ্চর্য্যজনক গবেষণা করিতেছেন। মধুর মধ্যে রেডিও-অ্যাক্টিভ্ বেরিয়াম্ দিয়া তাহা ভীমরুলকে খাওয়ান হয়। ধাতুটি পতঙ্গটির শরীরের মধ্যে গেলে তাহাকে পরীক্ষা করার ব্যবস্থাও আছে।

কৃষি-বিষয়েও আণবিক্ শক্তির ব্যবহার দেখা যায়। খাদ্য সমস্যাই পৃথিবীর জটিলতম সমস্যা। অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিতে হইলে বিজ্ঞানীদের আণবিক্ শক্তির ব্যবহার করা উচিত। প্রথমত কৃষি-বিজ্ঞানীরা উন্নততর উপায় শস্যোৎপাদনের দিকে মন্ দিবেন। দ্বিতীয়ত, কৃষকগণকে পতঙ্গ ও বিভিন্ন প্রকার শস্যরোগের হাত হইতে শস্যরক্ষা করার জন্য উন্নততর প্রথা শিখাইতে হইবে।

এই ক্ষেত্রেও রেডিও আইসোটোপের প্রচলন হইয়াছে। ঠিক কতখানি সার শস্যের পক্ষে যথেষ্ট ইহা যদি কৃষকগণ বুঝিতে পারে তবে ঠিক তত পরিমাণ দিতে পারে ও বাকীটা সঞ্চয় করিতে পারে। শস্য-ক্ষেত্রে রেডিও-ফস্‌ফরাস ব্যবহার করিয়া তাহা বোঝা যায়। জানা গিয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থক্যারোলিনার কৃষকেরা এই উপায়ে বৎসরে ৪০০০ টন সার বাঁচাইতে পারিয়াছে।

উদ্ভিদজগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চয্য বস্তু হইতেছে অঙ্গার-আত্মকরণ বা Photo-Synthesis—যাহার দ্বারা উদ্ভিদেরা জল, বাতাস ও রৌদ্র-কিরণের সংমিশ্রণ ঘটাইয়া নিজেদের গঠনকার্য্য সমাধান করে। এই রহস্যকেও রাসায়নিকগণ রেডিও-আইসোটোপের ব্যবহার করিয়া জানিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই ক্ষেত্রে রেডিও-কোবাল্টের নাম করা যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে যে, রেডিও-কোবাল্টের রশ্মিগুলি উদ্ভিদের গঠনের পক্ষে উপকারী।

রোগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বা অধিকতর খাদ্যশস্য জন্মাইয়াই কোন দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন হইতে পারে না। এই জন্য প্রয়োজন দেশের শিল্পের উন্নতি। আণবিক শক্তির অবদান শিল্পের ক্ষেত্রে অধিকতর হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। রেডিও-অ্যাকটিভ জিনিষের ব্যবহার করিয়া আজকে উন্নততর 'মোটর-অয়েল' বা উন্নতধরণের 'অটোমোবাইল টায়ার' ও অন্যান্য নানা আবিষ্কার পৃথিবীর কাছে পরিচিত হইয়াছে। ছাঁচ (Castings) তৈয়ারীতে কোন গলদ থাকিলে বা শিল্পদ্রব্যে কোন খুঁৎ থাকিলে তাহা রেডিও-আইসোটোপের সাহায্যে ধরা পড়ে। খাদ্যদ্রব্যের জীবাণু দূরীকরণেও (Sterilisation) রেডিও-আইসো-টোপের চলন হইয়াছে। রবার, কাগজ বা ধাতুর গভীরতা মাপাতেও রেডিও-আইসোটোপের ব্যবহার হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে রেডিও-আইসোটোপটিকে ঐগুলির নিম্নে রাখিতে হয় এবং তাহার উপরে একটি উদ্‌ঘাটক (Detector) রাখিতে হয়। দ্রব্যটির গভীরতা ভেদ করিয়া যে পরিমাণ রশ্মি উপরে যায়, তাহাকেই উদ্‌ঘাটকের সাহায্যে মাপিতে হয়। এইভাবে ঘনত্বটুকু বোঝা যায়।

বিদ্যুৎশক্তির প্রসার আজিকার দিনের অন্যতম প্রধান সমস্যা। ইতোমধ্যেই পৃথিবীর বহুস্থলে জ্বালানীর অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। ইটালী, জাপান এবং দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ায় জ্বালানীর অভাব ঘটিয়াছে। বেলজিয়াম কয়লা-খনির কাজ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৫৬

সালে ব্রিটেনেও জ্বালানীর অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রেও বহুস্থলে ঐরূপ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এই ব্যাপক সমস্যার সমাধান করিতে পারে আণবিক শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার। জানা গিয়াছে যে, পৃথিবীর সমস্ত ইউরেনিয়াম সম্পদ হইতে যতখানি 'আণবিক-জ্বালানী' বা 'অ্যাটমিক ফুয়েল' করা যাইতে পারে, তাহার পরিমাণ পৃথিবীর সমস্ত কয়লা ও তৈল হইতে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। ইহা ভিন্ন, আণবিক জ্বালানী ব্যবহারের নিম্নোদ্ধৃত দুইটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

(১) ঘনীভূত অবস্থায়, শক্তি উৎপাদনের জন্য অনেক কম আণবিক জ্বালানী লাগে।

(২) কোন কোন আণবিক শক্তির প্রতিষ্ঠান হইতে অতিরিক্ত জ্বালানী উৎপন্ন হইতে পারে।

আণবিকশক্তি হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন 'অ্যাটমিক্ রিএ্যাক্টরের'। ইহাতে ইউরেনিয়াম্ প্রভৃতিকে বিধ্বস্ত করা যায়। এই ফিশন কালে ইহাতে প্রভূত তাপ উৎপন্ন হয় এবং এই তাপ হইতেই বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত বলিয়া রাখা দরকার যে মার্কিণ বিজ্ঞানীরা ইহাতেই সন্তুষ্ট নহেন। আণবিকশক্তির আরো প্রচার কার্য্য তাঁহারা চান। এই উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানী ও শক্তি উৎপাদনের মন্ত্রী একটি দশ বৎসর ব্যাপী পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য আণবিকশক্তি হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন। ১৯৫৭ সাল হইতে চারিটি 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার ষ্টেশন স্থাপিত হইবে ও ১৯৬৩ সালের মধ্যে উহাদের স্থাপনা সমাপ্ত হইবে এইরূপ আশা করা যায়। উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ হইবে ৪০০,০০০-৮০০,০০০ কিলোওয়াট। ১৯৬৫ সালের মধ্যে আরো ১২টি নিউক্লিয়ার পাওয়ার ষ্টেশন স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে। সম্মিলিত বিদ্যুৎ-শক্তির মোট পরিমাণ ১,৫০০,০০০ হইতে ২,০০০,০০০ কিলোওয়াট হইবে। উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তির ঐ পরিমাণ আবার ৫,০০০,০০০-৬,০০০০,০০০ টন কয়লা হইতে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণের সহিত সমান হইবে। ১০,০০০ টন কয়লা হইতে যতখানি তাপ পাওয়া যায় ১ টন্ আণবিক জ্বালানী হইতেও ততখানি তাপ পাওয়া যাইবে। আবার নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর যেমন ইউরেণিয়ামকে বিধ্বস্ত করিয়া শক্তি উৎপন্ন করিবে তেমনি আবার—তাহা হইতে অ্যাটম বোমার জন্য প্লুটোনিয়ামও তৈয়ারী করিবে।

ভারতবর্ষে আণবিকশক্তির অবদান কতখানি হইতে পারে, এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৯৫৪ সালের নভেম্বরের শেষে দিল্লীতে যে অ্যাটমিক্ এনার্জি কনফারেন্স হইয়াছিল তাহাতে ভারতবর্ষে আণবিকশক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে সুযোগ ও সুবিধার নানা কথা আলোচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইউরেণিয়াম সম্পদ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। পিচ্‌ব্লেণ্ড্ প্রভৃতির মতো অধিক ইউরেণিয়াম সম্পন্ন খনিজ ভারতে নাই। ইউরেণিয়ামের একমাত্র উৎস মোনাজাইট্ স্যাণ্ড্ পাওয়া যায় ত্রিবাঙ্কুর উপকূলে এবং তাহার ইউরেণিয়াম পরিমাণ শতকরা ০·২-০·৩ ভাগ।

ভারতবর্ষে অ্যাটমিক রিঅ্যাক্টর স্থাপনের প্রধান সমস্যা হইল ইউরেণিয়ামের স্বল্পতা। দ্বিতীয়ত নিউট্রনের গতি স্থির করার জন্য যে গ্রাফাইট্ বা ভারী জলের মডারেটর প্রয়োজন, তাহা প্রভূত পরিমাণে পাওয়া। সৌভাগ্যবশত ভাকরা-নাঙ্গাল হইতে ভারী জল পাইবার ব্যবস্থা হইবে—এইরূপ আশা করা হইতেছে। তৃতীয়তঃ, মোনোজাইট হইতে ইউরেণিয়ামকে বাছিয়া লওয়ার জন্য উন্নততর প্রথার প্রয়োজন। চতুর্থত, ইউরেণিয়াম নিষ্কর্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি যেমন ইথার, হাইড্রোজেন ফ্লুয়োরাইড্, হাইড্রোজেন পারক্সাইড্, ক্যালসিয়ম্, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু ইত্যাদির উৎপন্নের পরিমাণ অনেকাংশে বর্দ্ধিত করা। উপরোক্ত সমস্যাগুলির জন্য ভারতবর্ষ পঁচিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বে শক্তি উৎপাদনের জন্য অ্যাটমিক পাইল তৈয়ারী করিতে সক্ষম হইবে না।

হিমালয়ে সূর্য্যাস্ত

আলো নাগ

দিগন্ত হারায়ে গেছে নীল নগরাজ পদতলে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে দলেদলে—
যোগমগ্ন ঋষি সম বনস্পতি অভ্রংলিহ শির ;
তাদেরি পায়ের নীচে লুকোচুরি খেলা তটিনীর
উপলমুখর কূলে। কাশবনে ঢাকা বালুচর,
ঝিল্লী কলস্বর মাখা জলের মর্মর ;
বাজে পূরবীর সুর। আকাশ ললাটে
রক্তচন্দনের রেখা, সূর্য্য চলে পাটে।
গোধূলিধূসরা
পিঙ্গলবসনামূর্ত্তি ধৃতবেণী তপস্বিনী ধরা
বরি নিল' দিনান্তের নম্র নমস্কারে
রাত্রির আঁধারে— ॥

প্রতিভার জন্মভূমি—স্কট্‌ল্যাণ্ড

শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ বি-এ, এল-এল-বি, ব্যারিষ্টার এট-ল

সাধারণত আমরা যখন দেশভ্রমণের কথা লিখি তাহাতে দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বর্ণনাই বেশী থাকে, দেশের কৃতী সন্তানদের খবর অল্পই থাকে। বস্তুবাদি আমরা ব্যক্তির অপেক্ষা বস্তুকেই বড় করে দেখে তার গুণগান করি। সম্প্রতি আবার স্কটল্যাণ্ড বেড়াতে গিছলাম। ছাত্রাবস্থায় ২৫ বছর আগে যাহা দেখেছিলাম সেটা নিছক দেশ দেখাই হয়েছিল ; এবার আমি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেশটা দেখলাম। একদিন সকালে আমি ও আমার স্ত্রী মটরকোচে লণ্ডন থেকে এডিনবরা যাত্রা করলাম। পথে ইয়র্কসায়ার ও স্কটল্যাণ্ডের রমণীয় পার্ব্বত্য ও লেক-অঞ্চল বেড়ানর সময় কবি Wordsworth ও উপন্যাসিক স্কটের বাড়ীও দেখলাম, সেগুলি এরা খুব যত্নে রক্ষা করছে। কোন দেশকে বড় করে তার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি, তার কলকারখানা ও সৌধরাজি, না তার বিখ্যাত ও কৃতী সন্তানেরা, এই প্রশ্নই আমার মনে বার বার দেখা দিয়েছিল। উত্তর সহজেই পেলাম আমাদের কবির কথায়—সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। আমার কাছে দেশটা গৌণ বোধ হল, আর মুখ্য হল দেশের কৃতী সন্তানেরা—যাদের প্রতিভা ও অধ্যবসায় দ্বারা দেশ গড়ে উঠেছে এবং দেশের নাম বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে বিদেশীরা ছুটে আসে ঐ দেশ দেখার জন্য। এইরূপ দেশ স্কটল্যাণ্ড, তার কৃতী সন্তানেরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে কিন্তু তারা দেশকে ভুলে যায় নাই।

কয়েকদিন ধরে স্কটল্যাণ্ডের বিভিন্ন সহর ও পার্ব্বত্য অঞ্চল বেড়িয়ে দেখলাম, এরা একদিকে যেমন দ্রষ্টব্য স্থানগুলি জনসাধারণের দৃষ্টির সামনে সাজিয়ে রেখেছেন, তেমনই যত্ন করে তুলে ধরেছেন স্বদেশী বিদেশী সকলের নিকট তাদের দেশের প্রতিভাবান লোকের কীর্ত্তিকলাপ, তাঁদের জন্মস্থান, কর্ম্মস্থান প্রভৃতি। সুতরাং একদিকে যেমন স্কটল্যাণ্ডের প্রাসাদ-দুর্গ বাগান ইত্যাদি দেখলাম—তেমনই সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম তার প্রতিভার বরপুত্রদের স্মরণার্থে মিউজিয়ম, মনুমেণ্ট প্রভৃতি। তাঁদের জন্মস্থান, বাসস্থান ও কর্ম্মস্থানগুলি জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে রক্ষার প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। এ বিষয়ে আমাদের দেশ এখনও অনেক পিছনে পড়ে আছে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে আমি স্কটল্যাণ্ডের রাজারাণীদের কথা বা তাদের প্রাসাদ প্রভৃতির কথা বলব না—Mcbeth or Mary Queen of Scots or James VI যিনি পরে James I রূপে প্রথম ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের রাজা হয়েছিলেন—এঁদের কথা ত সকলেই জানেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সাহিত্যিক, কবি ও উপন্যাসিকদের কথাই বিশেষ করে বলব। দেশ বেড়াতে বেড়াতে যে সকল প্রতিভাবান লোকের স্মৃতিচিহ্ন দেখেছি বা তাঁদের কথা শুনেছি তাঁদের সম্বন্ধেই দু'চারটি কথা বলে তাঁদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য প্রদান করাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। এদের মধ্যে অনেকেই আবার Edinburgh সহরের সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছেন এবং Edinburgh সহর নানাভাবে এঁদের স্মৃতি বহন করছে। অর্থাৎ এডিনবরা সহরই সমস্ত স্কটল্যাণ্ডকে প্রতিফলিত করছে। কয়েক দিন ধরে স্কটল্যাণ্ড বেড়িয়ে এই কথাই মনে হচ্ছিল যে যদি কেবলমাত্র সাম্প্রতিক সময়ের ইতিহাস বিবেচনা করা হয়, তাহা হলে নিঃসন্দেহ দেখা যাবে যে স্কটল্যাণ্ড তার আয়তন ও জনসংখ্যা অনুপাতে পৃথিবীর যে কোন দেশ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক আন্তর্জাতীয় খ্যাতিসম্পন্ন লোকের জন্মস্থান। স্কটল্যাণ্ড একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যদেশ, আকারে পশ্চিম বাংলা অপেক্ষা ছোট, অথচ এত প্রতিভাবান লোকের জন্মভূমি এই দেশ একথা ভেবে আশ্চর্য্য না হয়ে থাকা যায় না। এঁদের অনেকেরই কর্ম্ম ও জীবনী আমাদের নিকট পরিচিত, কারণ প্রত্যক্ষভাবে তাহার দ্বারা সকল দেশই উপকৃত। স্কটল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক যুগের এইরূপ কতকগুলি লোকের কথা এবার বলব। গ্লাসগোর জেমস্ ওয়াট ষ্টীম এঞ্জিন আবিষ্কার করেন যার ফল সর্ব্বজনবিদিত। বিখ্যাত Cunard জাহাজগুলি যাহা অতি দ্রুতগতিতে আতলান্তিক মহাসাগর অতিক্রম করে আমেরিকাকে ইউরোপের নিকট এনেছে (তখনও অবশ্য আকাশযানের যুগ আসে নাই) তার প্রথম নির্ম্মাতা হিসাবে Robert Nipierএর নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। Paul Jones যিনি U. S. Navyর সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিও স্কটল্যাণ্ডের লোক। James B. Neilson যাঁর hot blast fornace তৈরীর ফলে লৌহশিল্পে যুগান্তর সৃষ্টি হয়েছে, John L. Baird টেলিভিসন পাইওনিয়র, Maemillan যিনি দ্বিচক্রযানের (বাইসাইক্ল) বিষয় চিন্তা করে কার্য্যে পরিণত করেছিলেন, Dunlop যিনি নিউম্যাটিক টায়ার উদ্ভাবন করে মটর চলাচলের সুবিধা করে দিয়েছেন, Sir J. H. A. Macdonald যাঁর মাথা থেকে Post Card জিনিসটা এসেছিল—আর আজ পোষ্টকার্ড না হলে কাহারও চলে না, এমন কি কথাটি বাংলা ভাষাতেও প্রচলিত হয়েছে—এঁরা সকলেই স্কটল্যাণ্ডের কৃতী সন্তান। ডানডি সহরের James Chalmers পিছনে আটা দেওয়া ডাক টিকিটের (adhesive postage stamp) চালু করেন। বিখ্যাত পর্য্যটক David Livingstoneর নাম কে না জানেন? তিনি Zambesi অঞ্চল বাহির করেন। Selkirkএর Mungo Park Niger নদীর গতিবিধির সঙ্গে আমাদের পরিচিত করে গেছেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Lord Kelvin আতলান্তিক মহাসাগরে প্রথম Cable বসান এবং নূতন ও পুরাতন পৃথিবীর মধ্যে প্রথম যে বার্ত্তা চলাচল করে তাহা তিনিই শুনেছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত জাতীয় কবি Robert Burns তাঁর Auld Long Syne

গানটি Dum friyshinএ বসে লিখেছিলেন। এঁরই সেই চিরনবীন ও চিরপ্রিয় কবিতা স্মরণ করুন—

To see her is to love her ;
And love but her for ever,
For Nature made her what she is
And n'ever made another ! Bohmic Lesly.

ছাত্রাবস্থায় পাঠকালে ইহা আমাদের অন্তর পুলকিত করেছিল এবং এখনও যে করে না তাহা নিশ্চয় করে বলা যায় না। কবি Burns মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন কিন্তু তাঁর রচনাবলীর ভিতর দিয়ে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। এডিনবরার ১০নং St. James square বাটী—যেখানে কবি Burns তাঁর বিখ্যাত clarindau letters লিখেছিলেন এবং Baxter's closeএ যে বাটীতে তিনি বাস করতেন সেগুলি সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে। সর্ব্বজনপ্রিয় খৃষ্টধর্ম্ম সঙ্গীত—'Abide with me'র রচয়িতা Henry F. Lyteও স্কটল্যাণ্ডে জন্মেছিলেন? এডিনবরা castleর তলার দিকে কবি Allan Ramsay ও তাঁর প্রথিতযশা চিত্রকর পুত্র Allan Ramsayর বাটী। আন্তঃজাতি-খ্যাতিসম্পন্ন লেখক ও দার্শনিক David Humeর বাটী ৮ নং St. David Streetএ। তাঁর Riddles Courtএ একটি ফ্ল্যাটও ছিল। এখানেই তিনি তাঁর History of England লিখেছিলেন। James Courtএ James Boswell থাকতেন এবং সেখানেই ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে Boswellএর অতিথিরূপে Dr. Johnsonএর আগমনের কথা লেখা আছে। Dr. Johnsonএর জীবনী রচনা করে Boswell বিখ্যাত হন। স্কটল্যাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক Sir Walter Scott এডিনবরার ৩৯ নং Casle Street বাটীতে ২৮ বছর বাস করেন এবং একটির পর একটি Waverly Novels এখানেই লেখেন। শৈশবে স্কট তাঁর পিতামাতার সঙ্গে নিকটস্থ George Squareএ বাস করতেন। George Streetএ এসে মনে হল যেন Scottর দেশে এলাম। যে পথ দিয়ে তিনি বাল্যে ও যৌবনে ঘোরা ফেরা করতেন, যে বাগানে তিনি বেড়াতেন সে সকল স্থানে তাঁর কত স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে। Princes Streetএ বিখ্যাত Scott মনুমেণ্ট আছে, বহুদূর থেকে ইহা দেখা যায়। এই বিশাল মনুমেণ্ট এক বিরাট কীর্ত্তিমান পুরুষের স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে Stratford on Avon নগরীতে Shakespeareএর Statue আছে এবং তাঁর নামে Shakespeare Memorial Statue হয়েছে। কিন্তু Scottর যে মনুমেণ্ট দেখলাম এতবড় মনুমেণ্ট আর কোন দেশে কোন লেখকের জন্য আছে বলে জানি না। Scotlandএ যদি আর কোন বিখ্যাত লোক না জন্মগ্রহণ করতেন, একমাত্র স্কটের জন্মস্থানরূপে এই দেশ সভ্য জগতে অতি উচ্চস্থান গ্রহণ করত। মনে পড়ে বাল্যকালে ইংরাজি অনুবাদের পুস্তকে পড়তাম Bankim was the Scott of Bengal, কিছু না বুঝলেও সেই Scottর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিও Scottর Waverly Novels পড়ার সুযোগ হল। স্কটের প্রতিভা ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার সঙ্গে আমার অপেক্ষা পাঠক-পাঠিকাগণের অনেকেরই বেশী পরিচয় আছে, তথাপি এইটুকু বলতে পারি যে অল্প বয়স থেকেই এঁদের দুজনের লেখা পড়ে যেমন আনন্দ পেয়েছি তেমন আর পেলাম না। Sir Walter Scott ও R. L. Stevenson উভয়েই আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। এডিনবরা Parliament Hall—যেখানে এখন কোর্ট বসে সেখানকার সঙ্গে তাঁদের কত স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে। Robert Louis Stevenson যাঁর ভ্রমণ কাহিনী ও রম্য-রচনা সকল দেশের পাঠকদের প্রিয়, তিনি ১৮৫১ থেকে ১৮৭৮ পর্য্যন্ত ১৭নং হেরিয়ট Rowতে বাস করতেন। যাঁরা তাঁর Dr. Jekyll ও Mr. Hyde পড়েছেন তাঁরা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে তিনি তাঁর ঐ অদ্ভুত চরিত্র কল্পনা করেছিলেন Deacon Brodie নামক একজন লোক দেখে। যিনি নাকি একজন কাউন্সিলর ছিলেন এবং দিনের বেলা দয়ালু ও সম্ভ্রান্ত নাগরিক বলে পরিচিত ছিলেন এবং রাত্রের অন্ধকারে ডাকাতি করতেন। Stevensonর স্মৃতি বহন করছে ৮নং হাউয়ার্ড প্লেস R. L. S. Memorial House। বিখ্যাত

স্যার ওয়ালটার স্কট মনুমেণ্ট, এডিনবরা

সাহিত্যিক Thomas Carlyle বাস করতেন ২১ নং কামলি ব্যাঙ্কে। সে বাটী এখনও আছে, আর George Square এ তিনি Jane Welsh কে প্রেম নিবেদন করতেন। ৬০ নং জর্জ্জ ষ্ট্রীটে কবি শেলী হ্যারিয়েট ওয়েষ্টব্রুকের সঙ্গে তাঁর run away মধুযামিনী যাপন করেন। Adam Smith যাঁহাকে শৈশবে জিপসিরা চুরি করে নিয়ে যায় এবং যিনি পরে The wealth of the Nations লিখে ভুবন বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর বাটী আছে Panmure close এ Conongate এ। James Birdie তাঁর The Anatomist নাটকে Surgeon Square এর Dr. Kuox এর গুণ চরিত্র চিরস্মরণীয় করে গেছেন। কথিত আছে Dr. Kuox নাকি Burke ও Hare নামক ২জন গোরস্থান খননকারীদের সঙ্গে মৃতদেহ নিয়ে ব্যবসা করতেন। Lord Brougham যিনি ব্রুহামগাড়ীর নির্ম্মাতা হিসাবে সর্ব্বজন পরিচিত এবং যে ব্রুহামগাড়ী আমাদের দেশেও কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত দেখা যেত, তিনি বাস করতেন এডিনবরার St. Andrews Square। চিকিৎসা শাস্ত্রে যুগান্তর এনেছে chloroform. ইহার আবিষ্কারক Sir James young Simpson বাস করতেন Queen Street এ। Kenneth Grahame যিনি The Wind in the Willows লিখে খ্যাতি অর্জ্জন করেন তিনি বাস করতেন ৩০ নং Castle Street এবং ইহার বিপরীত দিকের বাটীতে ৩৯ নম্বরে Scott বাস করতেন। এডিনবরা সহরের Charlotte Square এর স্থতিকার হিসাবে Robert Adam জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন। প্রথম পৃথিবী যুদ্ধের অন্যতম নেতা Earl Haig জন্মেছিলেন Charlotte Square এ, এখানে তাঁর বৃহৎ ষ্ট্যাচু আছে। South Charlotte Square এ টেলিফোনের আবিষ্কারক Alexander Graham Bell এর বাটী আছে। বিখ্যাত স্কটিস চিত্রকর Sir Henry Raeburn এর বাটী ছিল York Place এ। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যিনি প্রথম ডিটেকটিভ্ উপন্যাস রচনা করেন সেই Sherlock Holmes এর স্রষ্টা—Sir Arthur Conan Doyle জন্মগ্রহণ করেছিলেন Picardy Place এ। অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত প্রফেসর John Playfair এর স্মৃতিচিহ্ন আছে Calton Hill এ। অতি প্রথম যুগের ফটোগ্রাফার D. O. Hill বাস করতেন Rock House এ। বর্ত্তমানে জীবিত আছেন—স্কটল্যাণ্ডের এমন কৃতী সন্তানও আছেন, কিন্তু তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। স্কটল্যাণ্ডের প্রতিভার বরপুত্রগণের উদ্দেশ্যে লিখিত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি শেষে অন্ততঃ আর একজনের নাম উল্লেখ না করা হয়। তিনি হচ্ছেন চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের প্রচারক Dr. Alexander Duff. যাঁর প্রচেষ্টায় কলিকাতায় Duff College এর সূত্রপাত হয় এবং পরবর্ত্তীকালে স্কটিশ চার্চ কলেজে পরিণত হয়। শিক্ষার প্রসার ক্ষেত্রে স্কটিশ মিশনারীদের দান খুব বেশী এবং বিশেষ বাংলা দেশে, প্রচারক ও শিক্ষাব্রতী হিসাবে ডাঃ ডাফ্ স্কটল্যাণ্ডের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। এডিনবরার সাহিত্য খ্যাতি ও সম্পর্ক এত বিরাট যে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা শেষ করা যায় না। ছোটবড় অনেক সাহিত্যিকের স্মৃতি এডিনবরা সহর বহন করছে। রোমাঞ্চকর এই তালিকা হইতে কেবলমাত্র বার্ণস্, বসওয়েল, কারলাইল, ডিকো, ডি কুইন্সি, গোল্ডস্মিথ, স্কট, ষ্টিভেনসন, র‍্যামসে, হগ্ প্রভৃতি উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। সাহিত্যিক ও সাহিত্যসেবিগণের তীর্থস্থান এডিনবরা নগরী।

শরণাগতা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কান্ত গোপাল, নন্দ-দুলাল, কৃষ্ণ, মনোমোহন।
দাও অনাথায় দয়াল, কৃপায় চরণে চিরশরণ।
লোক-লাজ ভয়, নয় নয় নয়, রাজ-কাজ—বন্দন
প্রিয়-পরিজন নয় তো আপন, তুমিই পরমধন।

জগতের মধু প্রেম প্রীতি বঁধু, সঁপি আজ রাঙা পায়।
চাই অভিসার, জানি না যে তার কেমন রীতি ধরায়।

কারে বলে ধ্যান কারে বলে জ্ঞান—জানি না কিছুই স্বামী!
শুনি' তব নাম চাই গুণধাম হ'তে দাসী শ্যাম আমি।

দোষ অগণন ক্ষমিয়া শরণ দিও পায়ে হৃদিরাজ!
এসেছি শ্যামল, "ভকতবছল" নাম শুনি' তব আজ।
ত্রুটির যাহার নাই সীমা, তার তুমি বিনা কে বা আছে?
অমূল্য শুধু এক গুণ বঁধু তার—সে তোমারে যাচে।

(ইন্দিরা দেবীর সমাধিশ্রুত মীরা ভজনের অনুবাদ)

পরিচালক—উপানন্দ

সত্যনিষ্ঠা ও জীবন

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র 'সত্যাশ্রয়ী' প্রসঙ্গে বলেছেন—"…ভুল জানা, ভ্রান্ত ধারণা, বরঞ্চ সেও ভালো কিন্তু ভিতরের জানা ও বাইরের আচরণে যদি সামঞ্জস্য না থাকে,—অর্থাৎ যদি জানি এক রকম, বলি আর এক রকম—তবে জীবনের এত বড় ব্যর্থতা, এত বড় ভীরুতা আর নেই… বুঝি, ছোঁয়াছুয়ি আচার বিচারের অর্থ নেই, তবু মেনে চলি; বুঝি জাতিভেদ মহা অকল্যাণকর, তবু নিজের আচরণে তাকে প্রকাশ করি নে, বুঝি ও বলি বিধবা বিবাহ উচিত, তবু নিজের জীবনে তাকে প্রত্যাখ্যান করি, জানি খদ্দর পরা উচিত, তবু বিলাতি কাপড় পরি, একেই বলি আমি অসত্যাচরণ। দেশের দুর্দ্দশা ও দুর্গতির মূলে এই মহাপাপ যে আমাদের কতখানি নীচে টেনে এনেছে, এ হয়তো আমরা কল্পনাও করি নে। এমনি ধারা সকল দিকে। দৃষ্টান্ত দিয়ে সময় অতিবাহিত করবার প্রয়োজন নেই,—প্রার্থনা করি, দীনতা ও কাপুরুষতার এই গভীর পঙ্ক থেকে দেশের যৌবন যেন মুক্তিলাভ করতে পারে। ভুল বুঝে ভুল কাজ করায় অজ্ঞতার অপরাধ হয়, সেও ঢের ভালো, কিন্তু ঠিক বুঝে বেঠিক কাজ করায় শুধু সত্য-ভ্রষ্টতার নয়, অসত্যনিষ্ঠার প্রত্যবায় হয়। তার প্রায়শ্চিত্তের যখন দিন আসে, তখন সমস্ত দেশের শক্তিতে কুলোয় না। একথা মনে রাখতে হবে সত্যনিষ্ঠাই শক্তি, সত্যনিষ্ঠাই সমস্ত মঙ্গলের আধার এবং ইংরাজীতে যাকে বলে Tenacity of purpose, সেও এই সত্যনিষ্ঠারই বিকাশ। তাই বারম্বার স্বদেশের যৌবনের কাছে এই আবেদনই করি, সত্যনিষ্ঠাই যেন তাঁদের ব্রত হয়। কেন না, নিশ্চয় জানি, এই ব্রত ধারণই তাঁদের সম্মুখের সমস্ত বাধা অপসরণ করে যথার্থ কল্যাণের পথ উদ্‌ঘাটিত করে দেবে। প্রোগ্রাম ও পথের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

সত্যনিষ্ঠায় চরিত্র গঠিত হয়। রাজা হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রবল অতুলনীয়। তিনি নিজের রাজ্য, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি সমস্ত দান করে সর্ব্বস্বান্ত হোলেন, এমন কি চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করে শ্মশানে বিচরণ করেছিলেন তথাপি তিনি চরিত্রবল হারিয়ে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হন নি। চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষ বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও যেদিন প্রলোভনে পড়ে সত্যভ্রষ্ট হয়েছিলেন সেইদিনই তাঁর অধোগতি দেখা গেল।

সত্যকে জানা—আর তা পালন করার জন্যে ছেলেবেলা থেকেই সচেষ্ট হওয়া দরকার। সত্যকে জেনেই রত্নাকর দস্যুর চৈতন্যোদয় হয়েছিল, আর সেই সত্য পালনের জন্যে তিনি দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যা ত্যাগ করে সত্যাশ্রয়ী হোলেন—অবশেষে জগন্মান্য মহাকবি বাল্মীকিরূপে অমর হয়ে রইলেন। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার পথে সত্যনিষ্ঠার আশু প্রয়োজনীয়তা আছে। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি কখনও মিথ্যাচরণ করে অপরকে প্রলুব্ধ বা প্রতারিত করে না। মহাভারতে দেখা যায় যুধিষ্ঠির সত্যব্রত ছিলেন, সত্যরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁকে বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। রামায়ণে আমরা দেখতে পাই শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্যে রাজ-সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করে বনচারী হয়েছিলেন। কোন প্রলোভন, কোন অনুনয় বিনয়, কোন অশ্রুপাতই তাঁকে সত্যভ্রষ্ট করতে সক্ষম হয় নি।

দৈনন্দিন অভ্যাসের দ্বারা সত্যব্রত পূর্ণভাবে পালন করবার শক্তি অর্জ্জন করা যায়। মহাত্মা গান্ধী সত্যকে অবলম্বন করেই দৈবকে করতলগত করেছিলেন, আর সেই দৈব বলে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এনে দিতে পেরেছিলেন। আজ দেশের সহস্র দুর্দ্দশার কারণ এই যে, অধিকাংশ লোকই মুখে যা বলে কাজে তা করে না, বক্তৃতায় যা দেশকে শোনায়, কাজে তা ঘটায় অন্যরকম। ফলে দেশের কোন উন্নতি সাধিত হয় না। বাল্যজীবনে তোমাদের মানসক্ষেত্রে যদি এই সত্যনিষ্ঠার বীজ রোপিত হয়, তা হোলে তোমাদের যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় তা অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়ে প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হবে আর সমগ্র হৃদয়ভূমি অধিকার করে তা দেশের গৌরব বৃদ্ধি করবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছেন—'ভগবান আমাদের অর্থের সম্পদ দেন নাই বটে কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের সম্পদ দিয়েছেন। অর্থের জন্য লালায়িত হয়ে যদি প্রাণের সম্পদ হারাতে হয় তবে অর্থের আমাদের প্রয়োজন নেই। বাঙ্গালীকে এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষে কেন—পৃথিবীর

অনেক স্থান আছে—এবং সেই স্থানেরই উপযোগী কর্ত্তব্যও তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে।···স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভারত গড়ে তুলতে হবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্পকলা, শৌর্য্যবীর্য্য, ক্রীড়া-নৈপুণ্য, দয়া-দাক্ষিণ্য—এই সবের ভেতর দিয়ে বাঙ্গালীকে নূতন ভারত সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করবার শক্তি এবং জাতীয় শিক্ষা সমন্বয় করবার প্রবৃত্তি একমাত্র বাঙ্গালীরই আছে।' আজ তোমরা স্বাধীন। নেতাজীর সাধনাপ্রসূত এই মন্ত্রবাণী তোমাদের জন্যে তিনি রেখে গেছেন, তোমরা সে বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে আশা নিয়েই তাঁর অন্তর্ধান ঘটেছে। আজ যদি তোমরা ফাঁকি দিয়ে মহৎ কাজ করতে অগ্রসর হও, পরে তোমাদের অনুতাপ করতে হবে, পিছু হটে আসতে হবে জীবনের সমরক্ষেত্র থেকে। কখনও কাউকে ফাঁকি দেবে না—ঘরেও নয়, বাহিরে নয়, তা হোলে সত্যভ্রষ্ট হয়ে জীবনে বড় কষ্ট পাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে জাতির চলার পাথেয় ফুরোলো, চলার সাধনায় যার জড়ত্ব এলো, সে জাতি তার গতির শেষে দুর্গতিতে এসে ঠেকল। ভয়ে ভয়ে যে জাতি তার সঞ্চয়ের খোঁটায় নিজেকে বাঁধলো—সেই বন্ধনেই তার বিনাশ।

যে জাতি সত্যভ্রষ্ট তার পদে পদে বাধা আর সঙ্কোচন আসে, ফলে সে এগোতে পারে না, বুঝতেও পারে না যে চলাই মানুষের নিয়ত মুক্তি। ফলে পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে পশুর মত অবস্থায় পরিণত হয়। জীবনকে কখন ক্ষুদ্রতা এবং অসম্পূর্ণতার মাঝে ফেলে রাখা উচিত নয়। বিপুল শক্তির বিশাল ক্ষেত্রে তোমাদের এসে দাঁড়াতে হবে, আর সজোরে আহ্বান করতে হবে তাদের যাদের জীবন সম্বন্ধে কোন বোধই নেই। সত্য পালনের নামে অপকৌশল প্রয়োগ করে আর মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে মানুষ স্বার্থসিদ্ধির ক্রমাগত চেষ্টা করার ফলে সমগ্র জগতে বারে বারে যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, দুঃখদুর্দ্দশা, অন্যায় ও অমঙ্গলের উদ্ভব হচ্ছে। রোগ, দুঃখ, শোক পাপেরই পরিণতি। আজকের দিনে নিজস্ব স্বার্থটিকেই জীবনের চরম আদর্শ করে নিলে অপরের ওপর অবিচার করা হয়, বর্ত্তমান জীবনে কোনো গণ্ডীবদ্ধ সমাজের আদর্শ স্থায়ী হোতে পারে না। পূর্ব্ব যুগের মানুষ সমগ্র জগতের বাস্তব দুঃখের স্বরূপটাকে উপলব্ধি করতে পারতো না, বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান বিজ্ঞান তা সম্ভব করে তুলেছে। ফলে আজকের দিনে জীবন বলতে যা বুঝায় তার সঙ্গে পূর্ব্বেকার যুগের জীবনের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান জগতে নৈতিক সমস্যা জটিল হয়ে উঠছে, এজন্যে মানুষের চিত্তে ও এসেছে দারুণ বিদ্রোহ ও ক্ষিপ্ততা। দশটা কাজের প্রণালী নিয়ে দ্বন্দ্ব কলহ না করে যদি একটা মানুষকেও অধঃপতনের মুখ থেকে রক্ষা করে তাকে সত্যাশ্রয়ী করা যায় তা হোলেই হবে শ্রেষ্ঠ কাজ। দুর্ব্বলতার প্রতি সহানুভূতি আর সুখ সম্ভোগের প্রতি করুণা দৃষ্টি দিয়ে তোমরা জীবনের পথে চলতে শেখো। প্যাঁচোয়া মন নিয়ে মানুষকে কষ্ট দিও না। তোমরা চরিত্রবান হও, তোমরা সত্যব্রত হও, আর দশজনকে তোমাদের উন্নত চরিত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত করো তাহোলেই আমাদের স্বাধীনতা লাভ সার্থক হবে, নেতাজীর স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবে, মহাত্মাজীর বিশাল মহামঙ্গলের স্বপ্ন নিত্যকাল বিশ্বজগৎকে উর্দ্ধ হোতে উর্দ্ধে নিয়ে চলবে, আর ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।
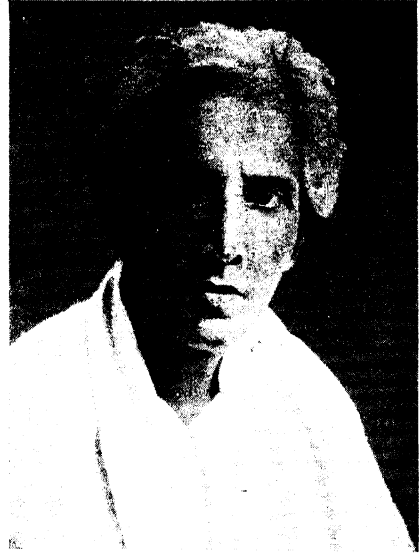
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম—৩১শে ভাদ্র—১২৮৩ মৃত্যু—২রা মাঘ—১৩৪৪

অমর লেখক

(কিশোর রচনা)

শ্রীমান মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

বাংলা দেশের অচেনা গাঁয়েতে
জনম নিলে গো তুমি,
তোমায় লেখক, বক্ষে ধরিয়া—
ধন্য বঙ্গভূমি।
বাঙ্গালীরে তুমি নিপুণ তুলিতে—
আঁকিলে নতুন করি,
দিলে নবরূপ পতিতেরে তুমি
গ্রন্থ পৃষ্ঠা ভরি।
দরদী লেখক, দরদ তোমার—
সকল লোকের তরে,
নাই ভেদাভেদ মানুষে মানুষে
একথা বুঝালে নরে।
লেখক শরৎ তুমি যে অমর
আজিকে বাণীর বরে,
জানাই প্রণাম জনম দিনেতে—
তোমার চরণ পরে।

বেহালা

শ্রীহরিপদ গুহ

সেদিন রবিবার।

বড়রা সব সিনেমায় গেছে। ছোট ছেলে-মেয়েরা সব হৈ-হৈ আরম্ভ করে দিয়েছে। আজ তাদের ছুটির দিন, মাষ্টার মশাই পড়াতে আস্‌বেন না। কাজেই তারা মনের আনন্দে ছুটোছুটি আর চেঁচামেচি কর্‌ছে।

এমন সময় নতুন বৌদি তাদের ডেকে বল্‌লেন—তোমরা সব স্থির হয়ে বসো, তোমাদের গল্প শোনাব।

তারা সব বারান্দায় চুপ করে বসে পড়্‌ল। নতুন বৌদি তাদের মাঝখানে বসে গল্প বল্‌তে আরম্ভ করলেন

অনেক দিনের কথা।

এক কৃষকের একটি বিশ্বস্ত ও পরিশ্রমী ভৃত্য ছিল তার নাম হারু। সে এখানে তিন বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করে কাজ করছে। এই তিন বছর সে মনীবের কাছ থেকে কোন বেতন পায়নি। হঠাৎ তার মনে হলো—এ ভাবে মাইনে না নিয়ে এখানে আর কাজ করা চলে না। সুতরাং প্রভুর কাছে গিয়ে সে বল্‌লে—অনেক দিন থেকে আপনার কাছে কোন মাইনে না নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে আস্‌ছি। আমি আশা করি, আপনি আমার পরিশ্রমের উপযুক্ত যা প্রাপ্য তা আমাকে দেবেন।

এই কৃষক ছিল অতি কৃপণ। সে মনে মনে জান্‌ত যে, লোকটি অতি সরল। তাই সে ভেবে-চিন্তে প্রতি বছরের জন্য হারুকে এক আনা করে, তিন বছরের মাইনে তিন আনা তাকে অতি কষ্টে বের করে দিলে।

বেচারা এই তিন আনা পেয়েই মনে মনে ভারি খুসী! ভাব্‌লে ঢের পেয়েছি। আর এখানে পড়ে থাকি কেন? এই অর্থ নিয়ে এখন বিশাল জগতে বেরিয়ে পড়ি। একটী সুন্দরী বউ বিয়ে করে সংসারী হই! পয়সাগুলো পকেটে রেখে, কৃষকের কাছে বিদায় নিয়ে সে তখনই বেরিয়ে পড়্‌ল। কত পাহাড়, উপত্যকা ও নদী পার হয়ে সে চল্‌তে লাগল। তার মনে ভারি আনন্দ! সে নাচতে-নাচতে গাইতে গাইতে চলেছে।

পথে হঠাৎ একজন বামনের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। সে হারুকে জিজ্ঞেস করলে—তুমি এত খুসী হলে কিসে ভাই?

হারু জবাব দিলে—কেন খুসী হবো না? আমার এমন স্বাস্থ্য! পকেটভরা অর্থ। আমি কারো তোয়াক্কা রাখি না। আমার তিন বছরের মাইনে সঞ্চয় করে নিয়ে চলেছি।

বামন মৃদু হেসে জিজ্ঞেস কর্‌লে—কত অর্থ হবে?

হারু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে—সে অনেক—তিন আনা!

বামন বল্‌লে—দেখো, আমি বড় গরীব, ঐগুলো আমাকে দিয়ে দাও! আমার অনেক উপকার হবে!

বামনের কথায় হারুর খুব দয়া হলো, সে আনি তিনটি তাকে দিয়ে দিলে।

বামন খুব খুসী হয়ে বল্‌লে—তোমার তিন আনার বিনিময়ে আমি তোমার তিনটী ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌ব। তোমার যা ইচ্ছে আমার কাছে প্রার্থনা কর।

মনে মনে তার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়ে খুসী হয়ে হারু বল্‌লে—টাকার চেয়ে আমি অনেক জিনিষ ভালবাসি। প্রথম—আমি এমন একটি ধনুক চাই, যা দিয়ে আমি যাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়্‌ব—সে ধরা পড়বে কিন্তু মরবে না। দ্বিতীয় আমি এমন একটি বেহালা চাই, যা বাজালে, যে সেই বাজনা শুনবে, অমনি নাচতে আরম্ভ করে দেবে। তৃতীয়—আমি যার কাছে যা চাইব, সে আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌বে।

বামন সহাস্যে বল্‌লে—বেশ, তোমার তিনটী প্রার্থনাই পূর্ণ হবে। তারপর সে তার হাতে একটী তীর ধনুক ও বেহালা দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল।

হারুও আগের চেয়ে অনেক বেশী খুসী মনে পথ চল্‌তে লাগল। কিছুদূর যাবার পর এক বৃদ্ধ সাহাজীর সঙ্গে তার দেখা হল।

নিকটেই একটা গাছের উঁচু ডালে বসে একটা সুন্দর পাখী মনের আনন্দে চমৎকার গান করছিল।

সাহাজী বলে উঠল—কি সুন্দর পাখী! এর মাংস ভারী উপাদেয় হবে। এর বিনিময়ে আমি প্রচুর অর্থ দিতে পারি।

'তাই যদি হয়, আমি এখনি তোমায় ঐ পাখী ধরে

দিতে পারি।' বলে হারু তার ধনুকে তীর লাগিয়ে পাখীটাকে লক্ষ্য করে বাণ ছুড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পাখীটা তীরবিদ্ধ হয়ে একটা ঝোপের ধারে মাটিতে পড়ে গেল। বৃদ্ধ সাহাজী তাড়াতাড়ি ঝোপের ভিতর ঢুকে পাখীটা আন্‌তে গেল। হারু বুড়োর কাছে অর্থ চাইতে সে বললে —পাখী তো এমনি পড়ে গেল, তোমায় অর্থ দেব কেন? হারু তার মনোভাব বুঝতে পেরে, তার বেহালাখানি তুলে বাজাতে আরম্ভ করে দিলে। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সেই বুড়ো ঝোপের ভেতর নাচতে আরম্ভ করে দিলে। বাজনা যত জোরে বাজে, সেও তত দ্রুত নাচে। কাঁটায় তার পোষাক ছিঁড়ে যেতে লাগল; তার শরীর দিয়ে দরদর ধারায় রক্ত পড়তে লাগল। সে চীৎকার করে বল্‌তে লাগল ভাই শিগ্‌গীর তোমার বাজনা থামাও! প্রাণ গেল, আর পারি না। কি অপরাধ করেছি যে, আমায় এমন শাস্তি দিচ্ছ?

হারু হেসে বল্‌লে তুমি অনেক গরীবের সর্ব্বনাশ করেছ, আমাকেও ঠকাবার মতলব করেছ। তোমায় আমি সহজে ছাড়ছি না!

সাহাজী জোড় হাত করে বল্‌লে—দোহাই দাদা, রক্ষে কর। আবার বাজালে আমি মরে যাব।

হারু তার কথায় কান না দিয়ে আবার এক নতুন সুর বাজাতে লাগল; সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো নাচতে আরম্ভ করে দিলে। সে চীৎকার করে বল্‌লে—আমি তোমায় পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি, বাজনা বন্ধ করো। সে তার কথায় কান দিলে না, দ্রুত বাজাতে লাগল। বুড়ো তখন বল্‌লে— বেশ, আশি টাকাই দেব, এবার থামাও। হারুর ভ্রূক্ষেপ নেই। সমানে বাজিয়ে চলেছে।

সাহাজী এবার কেঁদে ফেলে বল্‌লে—দোহাই দাদা, থামাও, আর পারি না। তোমায় পুরো একশো টাকাই দিচ্ছি। আমার থলিতে এর বেশী নেই।

এবার তার বাজনা বন্ধ হলো। একজন গরীবকে ঠকিয়ে সে এই টাকা এনেছিল। থলিটি সে হারুর হাতে তুলে দিয়ে একটা বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

টাকার থলিটি নিয়ে প্রফুল্ল মনে হারু আবার পথ চল্‌তে লাগল। তার মনে আনন্দ আর ধরে না! বুড়ো 'সাইলকটাকে' জব্দ করে সে মনে মনে বেশ খুসীই হয়েছে।

বেচারা সাহাজী ক্ষুণ্ণ মনে পথ চল্‌তে চল্‌তে ভাবতে লাগল—কি করে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়! একে জব্দ করা যায়! মনে মনে সে একটা বুদ্ধি ঠিক্ করে ফেললে।

বিচারকের কাছে গিয়ে সে নালিশ করল—একটা বদমাস তাকে মেরে, তার একশো টাকার থলি কেড়ে নিয়েছে। তার চেহারার বর্ণনা দিয়ে সে বল্‌লে—তার সঙ্গে তীর-ধনুক ও একটি বেহালা আছে।

বিচারক তখনই তাঁর পেয়াদা পাঠালেন সেই আসামীকে ধরে আনবার জন্য।

একটু পরেই তার দেখা পেয়ে কর্ম্মচারীরা তাকে ধরে বিচারালয়ে এনে হাজির কর্‌লে।

সাহাজী তাকে সনাক্ত করে বল্‌লে—হাঁ, এই সে লোক। আমার সমস্ত টাকা কেড়ে নিয়েছে।

হারু করজোড়ে বল্‌লে—না হুজুর, আমার বাজনা শুনে, ঐ টাকা আমায় পুরস্কার দিয়েছে।

বিচারক গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লেন—তোমার কথা বিশ্বাস-যোগ্য নয়। বাজনা শুনে এত টাকা কেউ দেয় না। তুমি মিথ্যাবাদী, জোর করে এই বুড়োর টাকা তুমি কেড়ে নিয়েছ। মৃত্যুই তোমার উপযুক্ত শাস্তি!

হারু বিনীত কণ্ঠে বল্‌লে—ধর্ম্মাবতার, আমার একটি শেষ অনুরোধ আছে, রাখবেন কি?

বিচারক গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন - প্রাণদান ছাড়া তুমি যা কিছু প্রার্থনা কর্‌তে পার!

হারু বল্‌লে—না প্রভু, আমি প্রাণ ভিক্ষা চাই না। শেষ বারের মত একবার আমার এই প্রিয় বেহালাটি বাজাতে চাই মাত্র!

সাহাজী চীৎকার করে বলে উঠল—ওর কথা শুনবেন না হুজুর, ওর কথা শুনবেন না।

বিচারক বল্‌লেন—না, তার শেষ বাসনা পূর্ণ কর্‌তে দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

বামনের তৃতীয় দানের জন্যই তিনি হারুর প্রার্থনা অপূর্ণ রাখতে পারলেন না।

সাহাজী চীৎকার করে বল্‌লে—দয়া করে আমাকে তবে ভাল করে বেঁধে রাখতে বলুন, দোহাই আপনার!

হারু তখন বেহালায় সুন্দর একটি মিষ্টি সুর তুলেছে।

সাহাজীর কথায় কেউ কান দিলে না। সকলে একেবারে তন্ময় হয়ে গেছে।

তার সুরের তালে তালে বিচারক, কেরাণী, উকিল, মোক্তার, পেয়াদা সকলেই নৃত্যের তালে দুলে উঠল। সাহাজীও বাদ গেল না!

বাজনা তখন জলদ চলেছে।

বিচারক হতে আরম্ভ করে সমস্ত কোর্টশুদ্ধ লোক তালে তালে নাচতে সুরু করেছে। প্রথম দিকটায় সকলেই বেশ একটু কৌতুক অনুভব কর্‌ছিল, কিন্তু বাজনা যত দ্রুত চলতে লাগল, তাদের নাচের গতিও তত বাড়তে লাগল।

নাচতে নাচতে সকলে হাঁপিয়ে উঠেছে! ঘামে সমস্ত দেহ ভিজে গেছে, পায়ে খিল ধরছে। আর পারে না। সকলে চীৎকার করে বল্‌তে আরম্ভ করেছে—শিগ্‌গির তোমার বাজনা থামাও, প্রাণ যায়।

কারো কথায় হারু কান দিলে না। বাজনার গতি-বেগ আরো বাড়িয়ে দিলে। অবশেষে বিচারক তাকে প্রাণদান করে বল্‌লেন—আমি সব বুঝতে পেরেছি। তোমার টাকাও তুমি ফেরৎ পাবে। এবার থামো!

হারু তখন সাহাজীর দিকে ফিরে বল্‌লেন—এখনো তুমি সত্য কথা বলো, নইলে আমি সহজে ছাড়বো না।

সাহাজীর অবস্থা তখন খুবই কাহিল। সে বিচারকের কাছে সত্য কথা স্বীকার কর্‌লে।

হারু বাজনা বন্ধ করে টাকার থলি হাতে নিয়ে মনের আনন্দে চল্‌তে লাগল।

আর বিচারকের ন্যায় বিচারে সাহাজীর প্রতি প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হলো।

আমার কথাটি ফুরুলো।

সবার জ্বালা

অধ্যক্ষ শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-টি

পিট্‌-পিটে চোখ, কি করেছিস্ বল্!
সত্যি করে বল্! নৈলে তোকে—
এমন কঠিন সাজা দেবো যাতে
থাকবে মনে, জল ঝরবে চোখে।
অমন ক'রে চাটলে থাবা শুধু,
জিভ দিয়ে খুব মুছলে গোঁফের দাগ,
ভাবছিস তোর মুছবে চুরির কথা?
ভাবছিস্ তুই ঘুচবে আমার রাগ?
কি করেছিস? এখনও তা বল্!
নৈলে দাঁড়া দুটি পায়ের ভরে!
আসুক কেন চক্ষেতে তোর জল,
ভাবিস না মোর মনটি কেমন করে!
তোর জ্বালাতে ঘরে থাকাই দায়,
দিন রাত্তির কেবল শুনি খোঁটা।
সইব কত? চামড়া কি নেই গায়ে?
ঠাক্‌মা ছোঁড়েন বাক্যি গোটা গোটা॥
ঠাক্‌মা শুধু? বাবাও যান্ না কম!
তোর জ্বালাতে জ্বলে ম'লাম আমি!
কেন আমায় ভুলে আছে যম,
চুকে গেলেই আপদ যেতো নামি!
মাছের মুড়ো, ক্ষীরের বাটীর লোভ
এ বাড়ীতে কার যে আছে খাটো,
জানিনে তা, তবু সবার ক্ষোভ,
লুকিয়ে খেয়ে শেষকালে গোঁফ চাটো!
আজি তোকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাড়া
দিয়ে আসবো মামাবাড়ীর ধার
দেখতে আমায় পাবি নেকো মোটে
ভাবছিস মোর মুখটি হবে ভার?
দুঃখেতে তোর, মুখখানা তোর ভেবে,
চোখে আমার আসবে নাকি জল?
কখখনো না; ভাববো না তোর কথা;
ভাল হবি? সত্যি আমায় বল্!
বাঁচবে সবাই পাড়ার কাঁটা গেলে,
আমিও আর দেখব না ও মুখ।
ভুলুর আদর করবো তোকে ফেলে,
দুষ্টু যেমন তেমনি পাবি দুখ্।
কোলে বসে গরর্ গরর্ শুধু,
লেজটী নেড়ে আদর খাওয়ার পালা,
আজ বাদে কাল সাঙ্গ করে দেবো।
সাঙ্গ হবে পাড়ার ঝালাপালা॥

চিরিমিরি

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী বি-এ

চিরিমিরি নামটি শুনলেই মনে হবে স্থানটী হারিকিরির দেশ জাপানে বুঝি। কিন্তু তা নয়; চিরিমিরি বিন্ধ্যপর্বতমালার ক্রোড়াশ্রিত একটী সুন্দর দেশ। বিখ্যাত রোমনগরী যেমন সাতটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত, চিরিমিরি সহর ও সেই রকম সাতটী পাহাড়ের উপর নির্মিত। চিরিমিরির প্রকৃত নাম ছেড়মেঢ়ী। ছেড় মানে ছয়, আর মেঢ় মানে মন্দির। অর্থাৎ ছয় মন্দির। একদা এখানে যে বহু মন্দিরাদি ছিল তার প্রমাণ এখনও বহু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সেইজন্যই বোধকরি এই স্থানের নাম চিরিমিরি হয়েছে। আধুনিক চিরিমিরি সহরের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য শ্রীবিভূতিভূষণ লাহিড়ী মহাশয় আমাদের বললেন এই কথা। তিনি যখন সর্বপ্রথম এখানে আসেন, সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা। তখন এখানে একটী ৯×১১ কষ্টি-পাথরের সুদৃশ্য প্রস্তর লেখা পাওয়া যায়। বহু শ্রমে ও বহু অর্থব্যয়ে তিনি সেখানি উদ্ধার করে রায়পুরের প্রসিদ্ধ সংগ্রহশালায় প্রেরণ করেন। সেই শিলালিপিটীর পাঠোদ্ধারে জানা যায় যে, "গোবিন্দচূড় দেব নামে চেদীবংশীয় একজন রাজার রাজধানী ছিল এখানে। এবং তিনি ১৪০৭ সংবৎ (১২৭২ শক) মাঘমাসে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার এখানে এক মন্দির নির্মাণ করেন।" ওই মন্দিরের বহু ভাস্কর্য খোদিত অনবদ্য কারুকার্য-বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড লাহিড়ী মশাইর বিত্তাভবনে সযত্নে সুরক্ষিত আছে। চিরিমিরিতে ব্রহ্মার মন্দির আছে জেনে আমার বেশ ভালো লাগল। কেননা ভারতবর্ষে একমাত্র পুষ্কর তীর্থ ভিন্ন অন্য কোথাও সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মন্দির আছে বলে শোনা যায় নি।

চিরিমিরির পথ

আমরা যখন চিরিমিরি স্টেশনে এসে পৌছোলুম, তখন যেদিকে দৃষ্টিপাত করি শুধু মহামৌন পর্বতশ্রেণী, গভীর অরণ্যরাজি, আর "পারদ শিশির স্বচ্ছ তিমিরে তারা অগণ্য জ্বলে।" সেইজন্য অজানা মুলুকে এরাই নিঃশব্দে আমাদের প্রথম অভ্যর্থনা করল। তার মধ্যে দূরে দূরে লোকালয়ের চিহ্নস্বরূপ, বৈদ্যুতিক বাতিগুলি দেখে মনে আশার সঞ্চার হোল। যা এখানে জনমানবের বসতি আছে। ছন্দা পাপড়ীও ভয়ে অস্থির "এ কোথায় আমরা এসেছি, ওই দেখ বনের মধ্যে বাঘের চোখ জ্বলছে," ইত্যাদি অভিযোগের আর শেষ নেই ওদের। এমন সময় লাহিড়ী মশাইর প্রেরিত চাপরাশী এসে পড়ায় নিশ্চিন্ত হলুম। লাহিড়ী মশাইর বাংলোটা স্টেশান থেকে অনেকটা উঁচুতে। চিরিমিরি সহর সমতল ভূমি থেকে প্রায় দুইহাজার ফুট উঁচু। এখানে পাহাড়ের গায়ে বেশ থাকে থাকে সিঁড়ি কাটা আছে। কাজেই পথশ্রমে ক্লান্তি অনুভূত হলেও, নয়নে আতঙ্কের সঞ্চার হয় না। মনে মনে আমাদের তখন অমরকণ্টক পর্বতের দুর্গম গিরিবর্ত্ম হাতছানি দিয়ে ডাকছে, সেই দুর্গমকে জয় করে আমরা দেখবো নর্মদা ও শোননদীর উৎপত্তি স্থলকে; সেই উদ্দেশ্যেই চিরিমিরিতে আসা হয়েছে। তাই আজকে পর্বতারোহণের কোনও শ্রমকেই কষ্টসাধ্য বলে মনে হচ্ছিল না কারো। চমৎকার, যেদিকে দৃষ্টিপাত করো শুধু ধূসর শৈলশৃঙ্গ আর শ্যামল অরণ্যানী। মধ্যে মধ্যে মানুষের পায়ে চলা পথগুলিতে সুদূরের হাতছানি, ঠিক যেন একখানি আচার্য নন্দলালের আঁকা চিত্র। খনিজ ঐশ্বর্যের বিপুল ভাণ্ডার এই পার্বত্য দেশটী। তার মধ্যে কয়লার খনি অন্যতম। এখানকার কয়লার খনি Unique ধরণের। ২৩ ফুট এখানকার কয়লার স্তর। একপ্রকার Horizantally সর্বত্র অবস্থিত। কয়লা কেটে বাহির করা ও খনির অভ্যন্তর হতে জল নিষ্কাশনের কাজ এর জন্য অত্যন্ত সোজা। এইরূপ খনি ভারতের অন্য কোথাও নেই। শুধু U. S. A র West virginiaতে এইপ্রকার খনি আছে। পাহাড়ের গায়ে বৃক্ষরাজির মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কোলিয়ারীর চিমনিগুলি। তার মুখদিয়ে ধ্বক ধ্বক করে নির্গত হচ্ছে রাশি রাশি ধূম। মনে হয় ঠিক যেন আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার তাণ্ডবে ব্যথিতা ধরিত্রীর বুকের দীর্ঘশ্বাস মাটী থেকে উত্থিত হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

শুনেছিলুম চিরিমিরি সহর নির্ঝরিণী পরিশোভিতা। পরের দিন অপরাহ্ন বেলায় আমরা সেই ঝরণার সন্ধানে পথে বেরিয়ে পড়লুম। পথে লাহিড়ী মশাইর ছোট্ট নাতনী শম্পা আমাদের সাথী হোল। সন্ধ্যা

শহর পাহাড়ী বস্তী ছাড়িয়ে ক্রমে আমরা এসে পড়লুম বনের মধ্যে। চতুর্দিকে অগাধ বন তারমধ্যে সরু পায়ে চলা পথ। আমরা এগিয়ে

ধুপপানি ঝরণা

চলেছি, কানে ভেসে আসছে, ঝরণার কলোচ্ছ্বাস ; এদিকে সন্ধ্যার তিমির গুণ্ঠনে দিগন্ত আবৃত হয়ে আসছে, কিন্তু ঝরণা কই ? আরও কতদূরে ? এমন সময় সম্মুখস্থ ঢালু পথটীর দিকে চেয়ে ভাদুড়ী বললেন—"এইবারে আমরা খুঁজে পেয়েছি ঝরণাকে"—সত্যই সেই ঢালুপথটী গিয়ে শেষ হয়েছে একটী পার্বত্য ঝরণার সঙ্গমে।

এই ঝরণা থেকে সমস্ত শহরে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। এই ঝরণাটার নাম টমসন স্প্রীং। এক সময়ে বনের মধ্যে টুংটাং ঘণ্টার শব্দ শোনা যেতে আমরা চকিত হয়ে উঠলুম। নিকটে কোথাও মন্দির আছে নাকি ? মন্দিরের দেশ চিরিমিরি, হয়ত থাকতেও পারে ? কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে সেই শব্দ শুনে ভাদুড়ী বললেন—"না, এ গরুর গলার ঘণ্টার শব্দ ; সন্ধ্যা হয়েছে তারা ঘরে ফিরছে।"

শম্পা শিকারীবংশের মেয়ে। লাহিড়ী পরিবারের সকলেই শীকারে সিদ্ধহস্ত। "বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি"—এই কথাটী এঁদের জীবনে সত্যে রূপায়িত হয়েছে। কাজেই শিশু শম্পা বনের রহস্যের কথা কিছু কিছু জানে। ভাদুড়ীর কথায় উৎসাহিত হয়ে সে বললে, "এখানে অনেক বাঘ আছে। ওরাই গরু ধরে নিয়ে যায়। গরুর গলার ঘণ্টার শব্দে ওরা ভয়ে আসতে পারে না। না হলে একটু অন্ধকার হলেই ওরা গরু ধরে নিয়ে যায়।"

একথায় আমাদেরও উঠতে হোল। তখন পাহাড়ে শালগাছের মাথায় চাঁদ উঠেছে। দেবীপক্ষের জ্যোৎস্না। এই সময় হরিণরা দল বেঁধে পাহাড় থেকে নেমে আসে ঝরণায় জল খেতে। আর বনের মধ্যে শীকারী চিতা-বাঘের চোখ অন্ধকারে জ্বলে ওঠে ঠিক বৈদুর্য মণির মত। নাঃ এখানে থাকা আর উচিত নয়।

বনের পথ সবই একরকম। ফেরার সময় আমরা পথভ্রমে একটী সমাধি ক্ষেত্রের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলুম। বনের ছায়ায় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে কতকগুলি কবর। বৃক্ষের ঘন পত্রজালের জন্য এখানে শারদজ্যোৎস্না সুন্দর আলপনা এঁকে রেখেছে। নিতান্ত অনাড়ম্বর কবরগুলি, প্রকৃতির মধুর দাক্ষিণ্যে প্রাণময় হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে করছিল একটী সমাধির পাশে একটু বসি। কিন্তু তা হবার নয়। সঙ্গে ছেলে-মেয়ে রয়েছে। ওরা ভয় পাবে। ছন্দা পাপড়ী তখনও বুঝতে পারেনি, তারা কবরস্থানের মধ্যে পথ হারিয়েছে। তাই তারা বাঘ তাড়াবার জন্য উচ্চকণ্ঠে প্রাণ খুলে গান গাইছিল। আর ভাদুড়ী পথানুসন্ধানে ভীষণ ব্যস্ত।

দুর্গম অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্য প্রকৃতির পটভূমিকায়, আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতায় সমুজ্জ্বল এই চিরিমিরি সহরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই

শ্রীবিভূতিভূষণ লাহিড়ী

মনে স্মরণ হয় শ্রদ্ধেয় লাহিড়ী মশাইর কথা। তিনি বিগত ১৯১৪ সালে জনহীন শ্বাপদসঙ্কুল এই স্থানে আসেন খনিজের সন্ধানে। তখন অনুপপুরের পর থেকে চিরমিরি আসার কোনও সুসভ্য পথ ছিল না। বিগত ১৯২৫ সালে লাহিড়ী মশাই প্রথম এই পথে রেললাইন প্রতিষ্ঠা করেন। —এসে যাত্রীদের যে কত সুবিধে হয়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। চিরিমিরির বহু দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে তিনি জনপদের ও যান চলাচলের পথ নির্মাণ করেছেন এবং এখনও দেখলুম তিনি একটী নতুন পথ নির্মাণের কাজে বিশেষ ভাবে ব্যস্ত রয়েছেন। এসব কাজে তিনি

সব সময় রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে না থাকলেও রাজ্য হতে তিনি নিয়মিত সাহায্য ও উৎসাহ পেয়ে থাকেন। এইসব পথগুলির

লাহিড়ী কলিজিয়েট্ স্কুল

বৈশিষ্ট্য হোল এই যে, যেখানে পর পর দুটী পাহাড়, কিংবা দুটী পাহাড়ের মধ্যস্থলে একটী পার্বতী নদী পথের দুস্তর বাধা হয়ে রয়েছে এবং তার জন্য পথচারী মানুষও যন্ত্রযানকে বহু পথ ঘুরে বহু শ্রম করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে হয় সেই সমস্ত দুরধিগম্য স্থানকে সহজ পথে পরিণত করা। কিন্তু সেই পাণ্ডববর্জিত দেশে লাহিড়ী মশাইর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হোল তাঁর শিক্ষাভবন; লাহিড়ী কলিজিয়েট স্কুল। যখন স্থানীয় লোকেদের মধ্যে অক্ষর পরিচয় ছিল না, তখন এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে

লাহিড়ী স্কুলের ছাত্রাবাস

তিনি জনসাধারণের মধ্যে পাঠস্পৃহা জাগরিত করেন। এখন এখানকার জনসাধারণ অন্যান্য শিল্পপ্রধান কেন্দ্র হতে বহু পরিমাণে শিক্ষিত।

সম্প্রতি যদিও এখানে আরও দুটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে তথাপি দেশ-বিদেশের লোকের কাছে লাহিড়ী স্কুল একটী তীর্থ বিশেষ। ১৯৪৮ সালের আগে এই চিরিমিরি কোরিয়া নামে এক দেশীয় করদ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তখন রাজ দরবারে লাহিড়ী মশাইর স্থান ছিল সর্বাগ্রে। হিন্দীতে যাকে বলে—"তাজিমীসর্দার।" এই রাজ্যের উন্নতির মূলেও ছিলেন তিনি।

চিরিমিরির বনশোভা হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমরাও বেরিয়ে পড়লুম অরণ্য পরিভ্রমণে।—লোকালয় ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে আমরা অরণ্যে প্রবেশ করলুম; এই রকম গভীর অরণ্য আমি দূর থেকে দেখেছি, কিন্তু তার অভ্যন্তরে কখনও যাইনি। মধ্যপ্রদেশের বিশাল গভীর দণ্ডকারণ্য, হিমালয়ের অরণ্যালোক, দেরাদুনের বনবিভাগে যার পরিসমাপ্তি। হরিদ্বারে নীলধারার তীরস্থিত গহীন বনে গিয়েছি; কিন্তু চিরিমিরির অরণ্যকে তাদের তুলনায় অসামান্য বলে উল্লেখ করা চলে। চোখের সামনে হঠাৎ দুলে ওঠে, গাছের ডালে ডালে স্তবকে স্তবকে বন্য ফুল আর ফল। তাদের মউ-ঝরানো কটু গন্ধে মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে ওঠে। কোথাও বা চারিদিকে শুধু আমলকীর গাছ, যার কণ্ঠ বেষ্টন করে ফলে আছে থরে থরে আমলকী ফল। মুক্তার মত সাদায় সবুজে মেশানো ফলগুলির গায়ে গোলাপী আভা। মনে পড়িয়ে দেয় কচি ডালিমের কথা। এই ভয়ঙ্কর বনের মধ্যে সুন্দর আমলকী ফলগুলি ঠিক বনদেবতার আশীর্বাদের মত—ক্লান্ত পথিকের মনে সান্ত্বনা হয়ে ঝুলতে থাকে। কোথাও কোনও শব্দ শোনা যায় না; শুকনো পাতা একটী ঝরে পড়লে মন উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। এমন সময় আমরা দেখতে পেলুম একটী চমৎকার একটী নীলকণ্ঠ পাখী। এ বনে আরও পাখী দেখেছি, শাখান্তরাল হতে মধুর কল-কাকলি শুনেছি, তবুও মনে হোল, উত্তর ভারতের চেয়ে এ দিকের বনে পাখী খুব কম। এর পর আমরা একটী বিরাট ক্লেটের পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়ালুম। বন এখানে একটু পাতলা হয়ে একটী পার্বত্য নদীর ঢালু পথে নেমে গেছে। সেই নদীর ওপারে পাহাড়। তার

গায়ে থাকে থাকে সজ্জিত রয়েছে উজ্জল শ্যামাভাযুক্ত, কালো স্লেট পাথর। এই স্লেট পাথর; আমাদের বিদ্যার প্রথম হাতেখড়ি হয়েছে এই স্লেটে। মহাসরস্বতী এখানে জ্ঞানের সমস্ত ভাণ্ডার খুলে বিরাজিতা। আমরা বিস্মিত হয়ে দাঁড়ালুম সেই মুক্ত মন্দিরের পাদপীঠে।

সকালবেলাতেই সকলের মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। খবর এসেছে, এ যাত্রায় আমাদের "অমর কণ্টক" দর্শন হবে না। বর্ষার জন্য পাহাড়ে ধ্বস নেমে সে পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। সে পথ সুসংস্কৃত না হলে, মানুষের সেখানে যাত্রা নিষিদ্ধ। খবর এল পেণ্ড্রারোডের ভাদুড়ীর এক বন্ধুর কাছ থেকে। কি আর করা যাবে, এবার দুর্গাপূজা আমাদের চিরিমিরিতেই করতে হবে। এখানকার দুর্গোৎসবে বাংলার ঠিক নিজস্ব রূপটা প্রত্যক্ষ করে মন আনন্দে ভরে উঠল। লাহিড়ী মশাইর অকুণ্ঠ অর্থব্যয় ও অক্লান্ত উদ্যমে এটা সম্ভব হয়েছে। তবু তাঁর দুঃখ এসব দিকে ঢুলীর অভাবে পূজাবাড়ীতে ঢাক বাজানো উঠে যাচ্ছে বলে। তিনি বহু চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশ থেকে কিছু ঢুলীসম্প্রদায়কে এদিকে এনে জমি দিয়ে পত্তন করানোর জন্য। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি, কেননা বাংলাদেশেই যে ঢুলীবংশ ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। তাঁর পুত্রবধূ কন্যা নাতি নাতনীদের সঙ্গে পূজার দিনকটা আমাদের বেশ আনন্দে কেটে গেল।

চিরিমিরির একটি জলাশয়

মহানবমীর দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে আমরা লাহিড়ী মশাইর সঙ্গে রওয়ানা হলুম তাঁর কন্যার বাড়ী ঝাকড়াখণ্ডে। এই স্থানটীও কয়লাখনির জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর জামাতা ঝাকড়াখণ্ডে কালিয়ারীর Resident Engineer। আমার কাছে এই ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ মনে হোল, চিরিমিরি থেকে ঝাকড়াখণ্ডের সুদীর্ঘ ২৭ মাইল পথের অপরূপ পার্বত্য শোভা। এই পথে যাত্রাকালে তিনি আমাদের দেখালেন বহু দুর্গম পর্বত-কন্দরে জনপদ-নির্মাণে তাঁর সার্থক কলাকুশলতা, বাস্তবিক এই সব বন্ধুর পার্বত্যপথে, যন্ত্রযান চলাচলের কথা ভাবতেও শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের চেষ্টার কাছে আর বিজ্ঞান সভ্যতার কাছে আজ আর কিছুই দুঃসাধ্য নয়। তার প্রমাণ এভারেষ্ট বিজয়! এই পথ হয়েছিল বলেই আমরা বনলক্ষ্মীর এই স্বর্গীয় সুষমা দেখতে পেলুম। নচেৎ এ সৌন্দর্য সভ্য মানুষের দৃষ্টাতীত থেকে যেতো। বনমধ্যে এক একস্থান এমন সঙ্কীর্ণ যে, সে পথে আরোহীসমেত জীপগাড়ী চলতে নারাজ। কাজেই আমরা পদব্রজেই সে স্থান অতিক্রম করলুম।

বন্ধুর পার্বত্যপথে আমাদের জীপ ছুটে চলেছে। এক জায়গায় স্বচ্ছজলপূর্ণ হ্রদের তীরে পাহাড় দেখিয়ে লাহিড়ী মশাই বললেন, এর নাম শ্রীকৈলাস পর্বত ও মানস সরোবর। এই পর্বতশৃঙ্গটী অবিকল কৈলাস পর্বতের মত গোলাকৃতি। আর তার পদপ্রান্তে ঠিক মানস সরোবরের মত সুন্দর বারিপূর্ণ হ্রদ টলটল করছে। তার চতুষ্পার্শে অরণ্যের স্নিগ্ধ প্রশান্তি। বড় ভালো লাগল। এ স্থানের নামকরণ ঠিকই হয়েছে। কেননা এমন স্থানে পার্বতীসহ কৈলাসপতির অবস্থান অতি সত্য। সে সত্য দৃষ্টি দিয়ে বিচার করা যায় না। হৃদয়ানুভূতিতে তার প্রকাশ। বহু পথ পরিভ্রমণান্তে দেবী দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করে অবশেষে মধ্যাহ্নকালে আমরা গন্তব্যস্থলে এসে পৌছলুম। লাহিড়ী মশাইর কন্যা ও জামাতা বহু সমাদরে অতিথি আপ্যায়ন করলেন। তাদের মধুর ব্যবহারে আমাদের পথশ্রম মুহূর্তের মধ্যে বিদূরিত হোল। সমস্ত দিন-রাত্রি পূজা, থিয়েটার দেখে ও বেড়িয়ে বেশ আনন্দে কেটে গেল। এই দিনই রাত্রি শেষে আমাদের আবার যাত্রা হলো সুরু চিরিমিরির পথে।

—
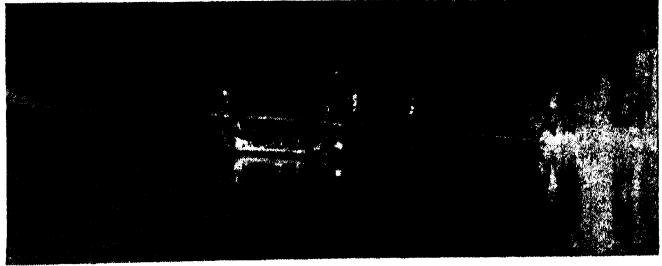
গ্রেস ডার্লিং

পরেশ রায়চৌধুরী

আমার ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা বোধহয় সবাই গল্প শুনতে খুব ভালবাস, না? বিশেষ করে যে গল্পের নায়ক-নায়িকা হয় তোমাদেরই মত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, তাহলে ত' আর কথাই নেই, কেমন? আমি আজ তোমাদের সেই রকম একটি ছোট্ট মেয়ের বীরত্বের কাহিনী শোনাব। শুনতে নিশ্চয়ই তোমাদের খুব ভাল লাগবে। এখন বলি, শোন তাহলে।

মেয়েটির নাম হচ্ছে গ্রেস ডার্লিং। জাতিতে ইংরেজ। তার বাবা ছিলেন বাতিঘর-রক্ষক।

বাতিঘর জিনিষটা যে কি তা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?

হাঁ, রাত্রিবেলায় যেখান থেকে আলো ফেলে জাহাজের

গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাকে বাতিঘর বলে। গ্রেস ডার্লিংএর বাবা এই রকম একটা বাতিঘরে চাকরী করতেন।

গ্রেস ডার্লিংএর অনেকগুলি ভাই বোন ছিল। তারা সবাই তার চেয়ে বড় ছিল, বিদেশে চাকরী করত। গ্রেস ডার্লিং ছোট ছিল বলে সে তার বাবা মার কাছে থাকত।

তোমরা জিজ্ঞেস করতে পার, বাড়ীতে থেকে গ্রেস ডার্লিং করত কি? বলছি, বাড়ীতে থেকে গ্রেস ডার্লিং তার বাবার কাছে লেখাপড়া শিখত, ছোট ছোট হাত দিয়ে সংসারের কাজে মাকে সাহায্য করত। আর যখন তার কিছুই করবার থাকত না তখন সে তার ছোট্ট নৌকাখানি বেয়ে তীরে উঠে মনের আনন্দে একলা বেড়াত। এই ছিল তার দৈনন্দিন কাজ। প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে নৌকা বেয়ে যাওয়া আসার ফলে সেই বয়সেই গ্রেস ডার্লিং খুব ভাল নৌকা চালাতে শিখেছিল। সাহসও তার খুব বেড়ে গিয়েছিল। সমুদ্রকে সে মোটেই ভয় করত না।

যেদিনটার কথা বলছি—সেটা এক দুর্য্যোগের রাত। সমুদ্রে টাইফুন সুরু হয়েছে। সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। সে যে কী ভীষণ ঝড়বৃষ্টি তা তোমরা মোটেই কল্পনা করতে পারবে না। সমুদ্রের কালো জল কুটিল আর অশান্ত হয়ে উঠেছে। বিরাট বিরাট ঢেউ সিংহের মত গর্জ্জন করে প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়ছে। সমুদ্র আর প্রকৃতি এরা দু'য়ে মিলে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে চায়। এমনি দুর্য্যোগ!

এই দুর্য্যোগের রাতে, গ্রেস ডার্লিং তার বাপমার সঙ্গে বাতিঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে ভীতি-বিহ্বল চোখে সমুদ্রের এই ভয়ংকর লীলা দেখছিল। হঠাৎ এক সময় একটা দমকা বাতাসের সঙ্গে তাদের কানে এসে ঢুকল—একদল বিপন্ন মানুষের বুকফাটা আর্ত্ত চীৎকার। এই চীৎকারের শব্দে গ্রেস ডার্লিংএর মা বাবা চমকে উঠলেন। গ্রেস ডার্লিংএর বাবা বাতিঘরের আলো ফেলতেই দেখলেন; ঝড়ের দাপটে বাতিঘরের কিছু দূরেই একখানা জাহাজ ভেঙে পড়ে রয়েছে, আর সেই ভাঙা জাহাজখানা আঁকড়ে ধরে আটজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। স্ত্রীলোকটির কোলে আবার একটি শিশু।

দৃশ্যটা মর্ম্মান্তিক সন্দেহ নেই। সেই দৃশ্য দেখে তাঁরা সবাই মর্ম্মাহত হলেন, বাতিঘর রক্ষকের কাজ বিপন্ন মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা, কিন্তু গ্রেস ডার্লিংএর বাবা এই দুর্য্যোগ দেখে কেমন ভয় পেয়ে গেলেন। তার মাও স্বামীকে এই বিপদের মধ্যে যেতে দিতে রাজী নন। কিন্তু ছোট্ট মেয়ে গ্রেস ডার্লিং কোনমতেই চুপ করে থাকতে পারল না। তার মনটি ছিল করুণায় ভরা। সে বিপন্নদের উদ্ধার করে আনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

প্রথমে গ্রেস ডার্লিং তার বাবাকে বিপন্নদের উদ্ধার করে আনবার জন্য অনুরোধ করল। পরে সে জিদ ধরল, শেষকালে কিছু করতে না পেরে কাঁদতে লাগ্‌লো। গ্রেস ডার্লিংএর বাবা তাঁর কোলের মেয়েটিকে খুব ভালবাসতেন। তার চোখের জল তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। গ্রেস ডার্লিংকে খুসী করবার জন্যই যেন শেষকালে তিনি এই বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিলেন। গ্রেস ডার্লিংকে সঙ্গে নিয়ে তার ছোট নৌকা করে বেরিয়ে পড়লেন।

গ্রেস ডার্লিংএর ছোট নৌকাখানা অশান্ত সমুদ্রের বুকে পড়ে ঠিক যেন মোচার খোলার মত পাক খেতে খেতে ভেসে চলল। একবার এমন অবস্থা হল যে, তাঁরা বুঝি সবশুদ্ধ তলিয়ে যান। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তাঁরা রক্ষা পেলেন। বিপন্ন মানুষগুলিকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। গ্রেস ডার্লিংএর মার আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় শীতে জমে যাওয়া অর্দ্ধমৃত মানুষগুলি আবার তাদের প্রাণ ফিরে পেল।

যে মানুষগুলিকে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছিল তারা কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয়। তাদের মুখ থেকে এই মহৎ উদ্ধারের কাহিনী শীঘ্রই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই খবর পেয়ে সমগ্র বৃটিশ জাতি ছোট্ট মেয়ে গ্রেস ডার্লিংকে শ্রদ্ধা জানাতে এগিয়ে এল। তাকে অনেক অর্থ পুরস্কার দিল। চারিদিক থেকে উপহার আসতে লাগল। প্রশংসা আর আশীর্ব্বাদ বৃষ্টির বিন্দুর মত গ্রেস ডার্লিংএর উদ্দেশ্যে বর্ষিত হতে লাগল। এমন কি স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়াও গ্রেস ডার্লিংকে সম্মান জানালেন।

তোমরা বোধহয় ভাবছ, সবার কাছ থেকে সম্মান আর প্রশংসা পেয়ে ছোট্ট মেয়ে গ্রেস ডার্লিং বুঝি খুব গর্বিত হয়ে উঠেছিল? মোটেই না। গ্রেস ডার্লিংএর মধ্যে এতটুকু গর্ব্ব জাগে নি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, গ্রেস ডার্লিং বেশী দিন বাঁচে নি, মাত্র সাতাশ বছর বয়সে দুরারোগ্য যক্ষ্মা ব্যাধিতে সে মারা গেল।

গ্রেস ডার্লিংএর ছোট নৌকাখানা আজও লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। ইংরাজরা এটা তাদের জাতীয় সম্পদ বলে মনে করে।

অশরীরী চালাক

ভি. পি. জেলিভস্কী

অনুবাদক—শ্রীবিভূতিভূষণ রায়

[প্রখ্যাত 'থিয়োসোফিস্ট' পত্রিকায় জনৈক রাশিয়ান লেখক কর্তৃক নিম্নোক্ত কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে এবং পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে যে আমাদের বিশিষ্ট পরিচিত ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত এই কাহিনীটি উক্ত অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসী এবং পুলিশকে ভীত চকিত করে তুলেছে। লেখক মন্তব্য করেছেন, প্রেতাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ব্যক্তিগণ এই ঘটনায় কিছুটা বিশ্বাস করবেন, কারণ লেখক উক্ত ঘটনার একজন সাক্ষী এবং সমস্ত ঘটনাটাই এখনও পুলিশের কাগজ পত্রে রেকর্ড করা আছে। উহাতে নিম্নোক্ত ভাবে মন্তব্য করা আছে—বহু লোকজন-এর সম্মুখে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে নিহত ব্যক্তির অশরীরী আত্মার আবির্ভাবই অপরাধীকে আবিষ্কার করে]

রাশিয়ান ককেসাসএর টাইফ্লিস নামে একটি শহরের প্রান্তে বাস করে এক বিধবা, আর তার আঠারো বৎসরের যুবক ছেলে আলেকজাণ্ডার শাস্কা। পিতার মৃত্যুর পর ছেলেটি ধীরে ধীরে হয়ে উঠে উচ্ছৃঙ্খল এবং বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে অতিরিক্ত মদ্যপ হয়ে পড়লো। তার মা নিরাশ হয়ে পড়লো। তার অনুনয় বিনয়, ভয় দেখানো, সব কিছু ব্যর্থ হল এবং অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকেই চল্‌ল।

একদিন সূর্য্যাস্তের পূর্বেই শাস্কা মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মায়ের বারণ সে শুনলে না। মা জানতো ছেলে ফিরে আসবে মাতাল হয়ে। বহু বলাবলির পর শাস্কা কথা দিলে যে সে আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে। মা ছেলের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল এবং মধ্যরাত এসে গেল। চারিদিক সম্পূর্ণ স্তব্ধ, কেবল মাত্র ঘড়ীটি টিক টিক করছিল। এম্নি করে মায়ের আরও কত রাত কেটেছে কিন্তু আজকের মত এতটা উতলা সে কোনদিন হয়নি, ছেলে ফিরে পাবার এতটা আকাঙ্ক্ষা তার মনে আর কোনোদিন হয়নি। কতবার সে বাইরে গেল—কিন্তু কৈ ? আকাশে নভেম্বরের পূর্ণচাঁদ শুধুই আলো দিচ্ছিল বুঝি ! রাত দু'টা—এর পর বাজলো তিনটা—মর্মাহতা মা আবার বাইরে এলো—কিন্তু কেউ নেই। নিরাশ হয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভালো করে গেট আটকে দিয়ে ঘরে এলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে গেটের খিল খোলার এবং আঙ্গিনায় ছেলের পরিচিত পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে শুনতে পেল এবং শুনলো সে পদশব্দ হলের সামনে এসে থেমে গেল। ভুলে হয়ত মা হলের দরজার হুক আটকে ফেলেছে মনে করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল কিন্তু কৈ—হল ঘরের বারান্দায় বা বাইরে নেই কেউ। প্রহরারত যে কুকুরটি এতক্ষণ গোঙাচ্ছিল সেটা শুধু যেন করুণ আর্তনাদ করে উঠলো। আর দেখলে যে গেট সে ভাল করে আটকে রেখে ছিল—তা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে আছে।···ভয়ে মায়ের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। তাড়াতাড়ি সে আবার রাস্তায় এসে ডাইনে বাঁয়ে তাকালে, কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। মনে মনে অমঙ্গলের আশংকা করে সে ফিরে এসে কাজ করতে আরম্ভ করলে, কারণ তার আর ঘুম আসবে না। বসে বসে হঠাৎ তার দু' বছর পূর্বের স্মৃতি মনে পড়লো। স্বামীর মৃত্যুর আগে এম্নি করে গেট খুলে যেত। যে ভাবেই ঐটা আটকানো হোক না কেন ঐটা বন্ধ থাকতো না। যেন কোন অদৃশ্য হাত এসে গেট খুলে দিত এবং স্বামীর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এম্নি চলেছিল এবং স্বামীর দেহ কবরস্থ করার পর আর ঐরূপ ঘটেনি।···

অতীতের দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে টেবিলের উপরই তার তন্দ্রা এল। কিন্তু তা সামান্যক্ষণ মাত্র, হঠাৎ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তার তন্দ্রা ছুটে গেল। সে স্বপ্নে দেখল তার ছেলে

করুণ ভাবে তার সান্নিধ্য কামনা করছে। মায়ের কেন যেন বার বার মনে হচ্ছিল ছেলে বুঝি তার আর ফিরে আসবে না। বহু কষ্টে সে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করলে, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল ছেলেকে খুঁজতে। আশে-পাশের পানশালাগুলো দেখা হল, কিন্তু আলেকজাণ্ডার কাজমিনকে কেউ দেখেছে বল্লে না। বৃদ্ধা বহু পানশালা খুঁজলে কিন্তু গভীর নিরাশা নিয়ে ক্লান্তিভরে মধ্যাহ্নে নিজ-গৃহে ফিরে এল। ব্যর্থ অনুসন্ধান-এর হতাশা তার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিল। কেউ তার সন্তানের সন্ধান দিতে পারছিল না। রাস্তায় বেরিয়ে শোকার্তা মা শুধু লোকের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘুরতো, এর মধ্যে যদি ছেলের মুখটি চোখে পড়ে যায়! পুত্রের ছবি ভেসে ওঠে! কিন্তু হায়—নৈরাশ্যের দুঃখ তাকে আরও কাতর করে তোলে। এম্নি করে ঘুরে ঘুরে একদিন সে একটি রাস্তার বাঁক ঘুরতেই একটি মানুষের পেছন দিকটা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, হ্যাঁ ঐ তো আলেকজাণ্ডার! আনন্দে বৃদ্ধা চীৎকার করে দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে গেল। লোকটি তার চীৎকারে ফিরে তাকালে, হাঁ সেই তো! কিন্তু কী বিবর্ণ চেহারা! মৃতের মত রক্তহীন মুখাবয়ব, অস্বচ্ছ দৃষ্টি! বৃদ্ধার সারা দেহ কেঁপে উঠলো। শাস্কা! শাস্কা! চেঁচিয়ে ডাকলে বৃদ্ধা, এগিয়ে গেল ছেলেকে যেখানে দেখেছে সেদিকে। কিন্তু সে তো নাই! ছেলে যেদিকে গেল মাও দ্রুত ছুটলো সেদিকে। বিষাদ ভরে ছেলে যেন মাকে অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করছে। এবার ছেলেকে দেখা গেল অনেক দূরে—মাথায় কোন টুপি নেই, প্রখর রৌদ্রে রুক্ষ চুলগুলো চক চক করছে। একবার মনে হল সে থেমেছে, হাত তুলে মাকে ইসারা করছে অনুসরণ করতে, তারপর তাদেরই বাড়ির দিকের আরেকটি রাস্তা ধরে চলতে লাগল। ভয়ে মায়ের পা কাঁপছিল তবুও তরুণীর মত শক্তি সঞ্চয় করে বৃদ্ধা হাঁটতে শুরু করলে। কিন্তু রাস্তার মোড় ঘুরে আর কাউকে দেখতে পেল না। আশ্চর্য, এখনও পর্যন্ত বৃদ্ধা বুঝতে পারল না যে সে যা দেখছে তা তার ছেলের রক্তমাংসের শরীর নয়। রাত্রির স্বপ্ন, দিনের ক্লান্তি আর অবসাদে তার কোন কিছুতেই খেয়াল ছিল না। এখন হঠাৎ তার মনে একটা সংস্কার-জনিত প্রবল ভয় এল। মৃতের মত পাণ্ডুর মুখ, ঘোলাটে চোখ, তাকে অনুসরণ করার নিঃশব্দ ইঙ্গিত, হঠাৎ আবির্ভাব ও তিরোধান এবং এখন এই পরিষ্কার মূর্তি হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া, মায়ের মনে এই ধারণাই আনলে যে এই চালক তার ছেলের অশরীরী মূর্তি ছাড়া কিছু নয়।

মুহূর্তের জন্য বৃদ্ধার মনে এতো ভয় এলো যে এখনি বুঝিবা সে পড়ে যাবে—কিন্তু কোথা থেকে শক্তি ফিরে পেয়ে যেন সে আবার চলতে লাগল।···এম্নি করে নিজের ছেলের আর আবির্ভাব না দেখে মা ভাবছিল—এখন আর কী করা যায়?

মনে যখন দারুণ সংশয়, তখন যেন অন্তর থেকে কে বল্লে তারই বাড়ির কাছের একটি সরাইখানা খুঁজে দেখতে। সেটা ঠিক পানশালা নয়, আহার্যের সঙ্গে অল্প দামের মদ পাওয়া যেত এতে এবং বৃদ্ধার ছেলে এখানে আসত কমই।

সেদিন ছিল রবিবার, সরাইখানা ভর্তি লোক, মায়ের অনুসন্ধানে কেউ বলতে পারলে না তার ছেলের কথা। মিসেস কাজমিন দরজা খুলে বেরিয়ে আসার সময় উপরের দিকে ঘাসে ভরা একটি সিঁড়ির ঘরের দিকে নজর পড়ল। সেদিকে একটু চেয়ে সে বাইরে উঠানে এসে দাঁড়াল। ছেলের মৃত্যু সম্বন্ধে তার আর সন্দেহ ছিল না। আবার উপরের দিকে নজর পড়তেই ঘাসের বোঝার কাছে বৃদ্ধা যেন হঠাৎ দেখতে পেল তার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। এবার আর প্রেতাত্মা নয়, জলজ্যান্ত মানুষটি। প্রবল আনন্দে চিৎকার করে ডাকলে মা—"শাস্কা! তুমি? তুমি ওখানে কী করছ? আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে প্রাণপাত করছি, আর তুমি ওখানে! চলে এস শীগ্‌গির। আমাকে আবার আসতে ইসারা করছ কেন?"

কিন্তু—বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে কাঁপতে লাগল। পূর্বস্মৃতি মনে পড়ল তার। এই প্রকাশ্য দিবালোকে তার ছেলে পূর্বের ছায়ামূর্তির ন্যায় তাকে নীরব আহ্বান জানাচ্ছে, ছেলের মুখ যেন আবার মৃতের মত বিবর্ণ দেখাচ্ছে। বৃদ্ধা ভয়ে প্রবল ভাবে কাঁপতে লাগলো।

পুলিস কোর্টে এ সময়ের কথা বৃদ্ধা যে ভাবে বলেছিল তা হচ্ছে এই যে—কোনো এক শক্তি যেন বৃদ্ধাকে ছেলের দিকে যাবার জন্য আকর্ষণ করছিল। নিজের ক্লান্তির কথা ভুলে সে ছেলেকে অপেক্ষা করতে বলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে

উঠছিল। পরে কোর্টে এবং করোণারের কাছে সাক্ষীগণ বৃদ্ধার শূন্যে কথা বলা এবং অদ্ভুত চালচলনের কথা উল্লেখ করেছিল এবং বলেছিল যে এ সময়ে বৃদ্ধাকে অত্যন্ত অপ্রকৃতিস্থ মনে হয়েছিল। বৃদ্ধাও বলেছিল যে যদিও তার ছেলের মূর্তি অন্তর্ধান করেছিল, তথাপি একটি রহস্যময় শক্তি তাকে উপরে উঠার জন্য টানছিল। সেখানে উঠে ঘাসের মাচার কাছে গিয়ে সে ছেলেকে আবার ডেকেছিল কিন্তু কোন সাড়া মিলেনি।

সে আরও বলেছিল যে তার পক্ষে বর্ণনা করা অসম্ভব —কোন্ শক্তি তার উপর ভ'র করেছিল। ছেলের তিরোভাবে তখন তার মনে আর কোনো বিস্ময় জাগেনি, তবে শুধু তার মনে হয়েছিল ছেলেকে আর না দেখলেও সে যেন সেখানেই আছে—তার কাছেই। সেখানে অনেক ঘাসের বোঝা ছিল। মায়ের অন্তরে কে যেন বার বার বলছিল—এখানে খুঁজে দেখ।

বৃদ্ধা বল্লে—"তখন আমি তাই করলাম। কয়েকটি আঁটি সরিয়ে জুতোসহ আমি একজোড়া পা দেখলাম এবং তা আমার ছেলের বলে চিনতে ভুল হল না। ঘুমন্ত ব্যক্তিকে যেমন করে ডাকে আমি ঠিক তেম্নি ভাবে পায়ে নাড়া দিয়ে ছেলেকে জোরে ডেকেছি বেরিয়ে আসার জন্য। কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে তার শরীর আর মুখের উপর থেকে ঘাসের বোঝা সরিয়ে দিয়ে বুঝলাম তার শরীর শীতল, সে মৃত। তাতেও তখন আমি বিস্মিত হইনি। আমি চিৎকার না করে ধৈর্য ধরে লোকজন ডাকলাম,—'দেখাবার জন্য যে আমি কী আবিষ্কার করেছি।" বিস্মিত লোকজন বৃদ্ধাকে অনুসরণ করে অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখলে। কেহ কেহ তাড়াতাড়ি গৃহকর্তাকে খবর দিল।

দৃশ্য দেখে গৃহকর্তার মুখেও আর কথা এল না ভয়ে বিস্ময়ে। সে আর পুলিশকেও খবর দিল না, কিন্তু হঠাৎ হাঁটু গেড়ে সবার কাছে স্বীকার করলে যে যুবক কাজমীনকে হত্যা করা হয়েছে।

পরে অনুসন্ধানে প্রকাশ পেল কোনো পরিকল্পনা করে যুবককে হত্যা করা হয় নি। একটা খেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। কৌতুক করার উদ্দেশ্যে ছেলেটিকে প্রচুর মদ খাওয়ানো হয়েছিল এবং চেতনাহীন করা হয়েছিল। তার চীৎকার রোধ করার জন্যে তাকে টেনে এনে তার উপর ঘাসের বোঝা চাপানো হয়েছিল, কিন্তু তাদের কারিকুরিতে ভুল হয়ে গেল এবং দেখা গেল যে মদের অতিরিক্ত নেশায় ছেলেটি মারা গেছে। সঙ্গীরা মনে করলে এটাই বুঝি ভগবানের ইচ্ছে ছিল। এর পর ছেলেটির সমস্ত শরীর ঘাসে ঢেকে রাত্রির জন্য প্রতীক্ষা করা হচ্ছিল এবং ঠিক করা হয়েছিল যে মৃতদেহটি পরে কোনো খানায় ফেলে রাখা হবে। সঙ্গীরা এটা নিশ্চিত ভেবেছিল যে, সবাই মনে করবে পরিচিত মাতাল ছেলেটির অতিরিক্ত মদ্যপানেই মৃত্যু হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে তাকে কবরস্থ করা হবে। হত্যাকারীরা ঐরূপই ভেবেছিল—কিন্তু মৃতের প্রেতাত্মাই নিজ দেহকে খুঁজে বার করলো শেষ পর্যন্ত।...

উৎসাহ

(Encouragement to a Lover—Sir J. Snekling)

অনুবাদক—সুশান্ত পাঠক

রক্ত-বিহীন বিবর্ণ মুখ, কেন গো প্রেমিকার,
মিনতি—বল না মলিনতা কেন মুখে ?
হেরিয়া ফুল্ল-আনন ; ভুলেনি প্রেমিকার অন্তর
তাই বুঝি মুখ বিবর্ণ মনো-দুখে ?
মিনতি—বল না মলিনতা কেন মুখে ?
বেশ নির্বাক প্রাণহীন হ'য়ে, র'য়েছ তরুণ পাপী
মিনতি—বল না, নাই কেন মুখে কথা ?
পারনি তাহারে জয় করিবারে কেবল কথায় ছাপি'
তাই চুপ ক'রে মিটাও চঞ্চলতা ?
মিনতি—বল না মুখে কেন নাই কথা ?
ছাড়ো পথ তব, লজ্জা করে না ! গলিবে না তার প্রাণ
পারিবে না তারে করিতে কখনও জয় !
আপনি যে কভু নাহি দেয় প্রেম, করে না
হৃদয় দান,—
কিছুতেই সে যে আপন হবার নয়,
অকারণ তব প্রেমের এ পরিচয়।

কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান

শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার

সুখের বিষয় ইউসিসের উদ্যোগে আমেরিকার প্রখ্যাত কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের রচনাবলীর প্রদর্শনী হয়েছে। প্রদর্শনীতে কবির প্রথম গ্রন্থ Leanes of Grass এর প্রথম সংস্করণটি (১৮৫৬) দেখানো হয়েছে। তাছাড়া কবির নানা লেখার পাণ্ডুলিপি, জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোককে লেখা চিঠিপত্রাদি দেখানো হয়েছে। এই উপলক্ষে হুইটম্যানের দেশেরই কবি শাপিরো ইউসিসে বিশিষ্ট বাঙালী সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে হুইটম্যান সম্বন্ধে এক ভাষণ দিয়ে গেলেন। এই প্রদর্শনীতে আর কিছু নয়—কেবল সেই উদার মানবতাবাদের চারণ কবির ('Bard of Democracy') ব্যক্তিত্বের কিছুটা সৌরভ পেয়ে উৎফুল্ল হয়েছে।

আজকে ওয়াল্ট হুইটম্যানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক'রে আমেরিকা-বাসীরা তাঁর রচনাবলী প্রচারের ব্যবস্থা করেছে, তার কারণ প্রধানত এই যে হুইটম্যানই জগতে প্রথম গণতান্ত্রিক যুগের উদ্বোধক। কিছুদিন আগে আমেরিকান রিপোর্টারে পড়েছিলাম যে আমেরিকাতে হুইটম্যানের রচনাবলীর এক প্রদর্শনী হয়েছে। ইউসিসকে ধন্যবাদ যে তাঁরা ঐ রচনাবলী দূর দেশ থেকে এনে আমাদের সঙ্গে গণতন্ত্রের সেই প্রথম চারণ কবির পরিচয় ঘনিষ্ঠ করে তুললেন।

আমেরিকান কাব্যজগতে হুইটম্যানের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বেশ একটা বৈদগ্ধ্যের আবহাওয়া চলছিল। আমেরিকার অধিকাংশ কবিই তখন যতটা প্রত্যক্ষ জীবনের প্রেমিক ছিলেন, মনন ও চিন্তনের অনুশীলনে তার চেয়ে অনেকগুণে উৎসাহিত ছিলেন। হুইটিয়ার লাওয়েল ইত্যাদির কাব্যে ছিলনা খাঁটি জীবনাবেগের ফলশ্রুতি—ছিলনা উদার আমন্ত্রণ-আলিঙ্গনের ব্যাকুলতা। এমার্সন ও থোরো প্রকৃতিকেই জীবনের মূল বলে জেনেছিলেন বটে, কিন্তু ঐ বিশ্বাস একটি পাণ্ডিত্য সুলভ নির্দিষ্ট দর্শনে পরিণত হয়েছিল। এডগার এলান পো, ব্রায়াণ্ট হুইটিয়ার হল্মস্ লাওয়েল, লংফেলো, কারো কাব্যে প্রকৃতির আসল আদিম প্রাণশক্তিটি (elemental vigour) চোখে পড়েনি। হুইটম্যানের মধ্যেই আমরা প্রথম সেই আদিম প্রাণশক্তিকে অনুভব করলাম। একজন সমালোচক চমৎকার একটি মন্তব্য করেছেন হুইটম্যান সম্বন্ধে। তিনি বলেছেন যে হুইটম্যান আসলে লোফার। নগরের জনাকীর্ণ রাজপথে আর গ্রামাঞ্চলের জনবিরল পথহীন পথে সর্বত্রই তিনি লোফারের মতো বেড়িয়ে ফিরেছেন। আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক—উভয় দিক বিবেচনায় তিনি লোফার। তাঁর লোফিং এর প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচনায়। কেবল গ্রাম্য বিজনতার কবি তিনি নন, কেবল নাগরিক জনাকীর্ণতারও কবি তিনি নন—গ্রাম ও নগর উভয়েরই কবি তিনি—পুরুষ স্ত্রী নির্বিশেষে সকলের কবি তিনি। সভ্যতার কলরোল আর মাঠ-ঝরণার গান—দুইই মিলেছে তাঁর কাব্যে। আসলে কবি সকল সময়েই জীবনের মূলে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। জীবনের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলি তিনি সকলের সামনে উপভোগের জন্য তুলে ধরেছেন।

সভ্যতার উপর কবি বিষদৃষ্টি ফেলেন নি। নগরের দুরন্ত কল্লোল ও গ্রামের শান্ত নৈঃশব্দ্য—উভয় রাজ্যেই কবি সানন্দে সঞ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন—

I tramp a perpetual journey
My sings are a rainproof Coat, good shoes
And a staff cut from the woods
I have no chair, no church, no philosophy.

তিনি কেবল 'Staff' cut from the woods-এর কবি নন, তিনি rainproof coat good shoes এরও কবি। সভ্যতাকে কবি অস্বীকার করেন নি।

আমেরিকান গান শুনেছেন কেবল চাষী আর আরণ্যকের মুখে নয়—গ্রাম ও নগর জীবনের সমগ্র রূপের সমস্ত স্তরের জীবনের গান, এক বিচিত্র হার্মানি সৃষ্টি ক'রে কবিকে বিস্মিত করেছে।

জীবনের এই সামগ্রিক রূপদর্শন হুইটম্যানের যে ঘটেছিল তার কারণ আছে, কবির জীবনীতে পাই কবি কেবল নিজের জন্মস্থানের মানুষের সঙ্গেই অন্তরঙ্গ হৃদ্যতায় মেশেন নি—আমেরিকার নানাস্থানে ভ্রমণ করে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন—আমেরিকার গৃহযুদ্ধে আহত মানুষের সেবা করেছেন প্রাণ দিয়ে। সেইজন্যই তিনি মানুষের কৃত্রিম সামাজিক সম্পর্ককে অস্বীকার ক'রে নির্যাতিত-নিপীড়িতের সঙ্গে আত্মার সংস্পর্শে এসে Democratic Individual এর কল্পনায় মেতেছিলেন। সেই গ্রাম-নগর, ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, সাধু-অসাধু সকলেরই জয় গান করছেন—

I am not the poet of goodness only,
I am the poet of badness also.

সাধারণ মানুষ তার দোষ গুণ নিয়েই এগিয়ে যাবে—বাধাবিপত্তি আঘাত বিরতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে। সাধারণ মানুষের ঐশ্বরিক শক্তিতে হুইটম্যান বিশ্বাসী ছিলেন। সেইজন্য তিনি সাধারণ মানুষকে 'divine average' বলে সম্বোধন করেছেন। হুইটম্যানের কাব্যে ব্যাপক জীবনবোধ আবিষ্কারের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন—His secret as a democrate bard lies in his unselfish love of men, body and soul, fred by a

generous, unenvious commerce with his kindred. গৃহযুদ্ধে মানুষের পাশবিকতা দেখেও মানুষের প্রতি অসীম বিশ্বাসে তাঁর একটুও ঘা লাগে নি, কারণ উক্ত সমালোচকের কথায় বলতে গেলে—'He was born with a robust confidence and with imperturbable optimism.' হুইটম্যানের এই মানবপ্রেমকে 'Cosmic enthusiasm' বলে অভিহিত করা হয়েছে। গণতন্ত্রের উদ্বোধনে কবি গেয়েছেন—

I speak the password of primeval,
I give the sign of Democracy,
By God! I will accept nothing
Which all cannot have their
Counterpart of on the same ferms.

নরনারীনির্বিশেষে জীবনের ভালোমন্দের উপর চিরন্তন সমান অধিকারই কবির মতে গণতন্ত্রের মূল কথা। আরও বলেছেন—

Whoever you are! how superb and how divine is your body, or any part of it.

Wherever the human heart beats
With terrible throes out of its ribs.

কবি এখানে যে whoever, wherever ইত্যাদি শব্দের উপর জোর দিয়েছেন তা লক্ষণীয়। কোন বিশেষ দেহী, কোন বিশেষ হৃদয় নয়—এখানে-ওখানে-সেখানে যত মানুষ আছে কবি বুদ্ধিদীপ্ত অথচ মুগ্ধ অন্বেষী দৃষ্টি নিয়ে তাদের মধ্যেকার জীবনাবেগকে, মহত্বকে ও নাটকীয়তাকে লক্ষ্য করেছেন—আর মানুষের জন্মদাত্রী এই ধরণীর আলোছায়ার আল্পনায় তৃণ-শষ্পের কম্পনে, সর্বোপরি জীবের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এক অদ্ভুত অস্তিত্ববোধে শিহরিত হয়েছেন—

To me every hour of the light and dark
is a miracle,
Every inch of space is a miracle,
Every square of yard of the surface of the
earth is spread with the same,
Every cubic foot of the interior swarms
with the same,
Every spear of grass—the frames, limbs,
Organs of men and women,
And all that concern them,
All these to me are unspeakable miracles.

কবির বিজ্ঞান মার্জিত বুদ্ধি তাঁর গণতান্ত্রিক অভিনব আদর্শ কল্পনার সঙ্গে একাত্ম হয়েছে।

জীবন ও জগতের প্রতি এমন অন্তহীন মমত্ববোধের জন্যই হুইটম্যান আমেরিকার সাহিত্য জগতে পৃথক মর্যাদার অধিকারী। আমেরিকার কাল্চার-ভারাক্রান্ত সাহিত্যিক-ঐতিহ্যকে অস্বীকার ক'রে কবি প্রাণের জোয়ার নিয়ে এলেন। তাই হয়তো তাঁর কাব্যে পাওয়া যাবে না শিল্পগত নিপুণতা, চিন্তার তীক্ষ্ণতা ও প্রকাশের পরিমিতিবোধ, কিন্তু পাওয়া যাবে একটা উৎসাহিত হৃদয়ের উৎসার, উপলব্ধ সত্যের নির্ভীক প্রকাশের ব্যাকুলতা। হুইটম্যানের কাব্য বাগানের ফুল নয়—বনের ফুল—যেন অনন্তের স্পর্শ লাগা—সদ্য ফোটা। এ এক নতুন সাহিত্যিক আর্ট—যার ভিত্তি হৃদয়ে দৃঢ়বিলগ্ন। এ আর্টে ভাবের নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে এক একটি নিটোল তারা চমৎকৃতি আনে। প্রকাশের অসংখ্য অনিয়মই এর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তার মধ্যেই এক একটি নিটোল মুক্তা শৈল্পিক পরিপূর্ণতা নিয়ে পাঠকমনকে প্রলুব্ধ করে।

ইংরাজি সাহিত্যে ইবেজেনার ইলিয়ট, টমাস হুড, মিসেস ব্রাউনিং এবং ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও শেলী—সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গণ-তন্ত্রের উপাসক ছিলেন। কিন্তু আমেরিকাই স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তাকে খুঁজে পেল। হুইটম্যান আমেরিকাবাসীদের গণ-তান্ত্রিক নব-জাগরণের প্রাথমিক আলো-আঁধারি পর্বে এমন একটি পথ দেখালেন যে পথ স্বর্গীয় হ্যুতিময় ঝলমল। শুধু যে আমেরিকা সে পথে গেল তা নয়—সমস্ত জগৎ আজ ঐ পথের পথিক হতে উন্মুখ। মানুষ এমন একটি অন্তর্ভেদী দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন কবিকেই চেয়েছিল—আর তাই হুইটম্যানের আবির্ভাব সময়োচিত আবির্ভাব। তিনিই জন-জীবনের প্রকৃত কবি—'He is the Demos articulate', জীবন-জলধি-জলের গভীরে ডুব দিয়েছিলেন তিনি প্রথম। তাই তিনিই প্রথম সার্থক স্নাতক।

মুক্তি সংগ্রামে গোয়া

শ্রীমীনাক্ষী রায় এম্‌-এ

পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিক তখন। সেই সময় ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের ধনরত্ন ও শিল্প-সম্ভারের লোভে বাণিজ্য উদ্দেশ্যে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা একদিন ভারতের উপকূল কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হ'ল। কারণ, ভাস্কো-ডা-গামার আবিষ্কৃত এই পথ ধরে শুধু পর্তুগীজ বণিকই নয়, দিনেমার, স্পেন, ফরাসী ও ইংরাজ বণিকরাও ভারতবর্ষে আসতে সুরু করল।

এই সব ইউরোপীয় বণিকরা প্রথমে এ দেশে স্থানে স্থানে কুঠি নির্মাণ করে ব্যবসা করত। পরে এরা দেশ জয়ও সুরু করে। পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরাজ—এরা সকলেই ভারতের কিছু কিছু স্থান জয় করল। ক্রমে এই সব ইউরোপীয় বণিকদের নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিলে চতুর ইংরাজই সকলের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভূভাগই করায়ত্ত করে।

পরে ভারতবাসীদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ-বোধ দেখা দিলে দীর্ঘ সংগ্রামের পর তারা ইংরাজকে এদেশ থেকে তাড়াতে সক্ষম হয়। ফরাসীরাও চলে গেল। গেল না কেবল পর্তুগীজ। ভারতবর্ষের বুকে পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়া, দমন ও দিউ এই তিনটি মাত্র খণ্ড অংশ কলঙ্কের কালো দাগের মত আজও টিকে রয়েছে। তাই পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ভারতের জনগণও এদেশ থেকে পর্তুগীজ শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য আজ বদ্ধপরিকর হয়েছে।

পর্তুগীজ-অধিকৃত গোয়া, দমন ও দিউ এই তিনটি খণ্ড-রাজ্যের আয়তন যথাক্রমে ১৩০৯, ২১৯ ও ১৪ বর্গমাইল এবং তিনটি রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ৬,৩৭,৫৯১ (১৯৫০ সালের সেন্সাস্ অনুযায়ী)। এই জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ জন বাস করে গোয়াতে। তাই ভারতে পর্তুগীজ-অধিকৃত স্থান বলতে প্রধানতঃ গোয়াকেই বোঝায়।

পর্তুগীজ শাসন কোনদিনই গোয়াবাসীদের মন জয় করতে পারেনি। এরা শাসনের নামে শোষণ ও অত্যাচারই বরাবর চালিয়ে এসেছে। দেশ জয়ের সুরু থেকে এরা কিভাবে অত্যাচার চালিয়েছে, এখানে তারই একটু আভাস দেওয়া গেল—

১৫ই আগষ্ট (১৯৫৫) ভারতীয় সত্যাগ্রহীরা গোয়ায় প্রবেশ করছেন

১৫১০ খৃষ্টাব্দে ২৫শে নভেম্বর তারিখে পর্তুগীজ আলবুকার্ক বিজাপুরের মুসলমান শাসক আদিল খাঁর নিকট থেকে গোয়া অধিকার করে। গোয়া জয় করার পরদিন পর্তুগীজরা সেখানকার ১১ হাজার মুসলমানকে হত্যা ক'রে তাদের স্ত্রীদের ধরে বিলিয়ে দেয় পর্তুগীজ সৈন্যদের মধ্যে। হিন্দু মন্দির সব ভেঙ্গে ফেলল। তার জায়গায় তৈরী হ'ল গির্জা। মন্দিরের ধনরত্ন হ'ল লুণ্ঠিত। বহু লোককে জোর করে খৃষ্টান করে পর্তুগীজ নাম নিতে বাধ্য করা হ'ল। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ গোয়া জয়ের ৩০ বছরের মধ্যে গোয়াতে আর একটিও হিন্দু মন্দির অবশিষ্ট রইল না। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ১৩,০৯২ জন হিন্দুকে জোর করে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করানো হ'ল। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে আবার এক লক্ষ হিন্দুকে খৃষ্টান করা হ'ল। ১৭৩৬ সালের ১৪ই এপ্রিল সরকার থেকে ঘোষণা করা হ'ল যে গোয়ার কোন খৃষ্টান হিন্দু নাম বা পদবী ব্যবহার করতে পারবে না, পুরুষেরা ধুতি পরতে পাবে না, মেয়েরা সাড়ী পরতে পারবে না।

পর্তুগীজ অত্যাচার কেবল গোয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অর্থ-লোলুপের দল গোয়ার বাইরেও কয়েকটি দেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। ১৫৫৫ সালে গোয়ার গভর্ণর ফ্রান্সিস্কো ব্যারেটো সিন্ধুর তট্টাসহর আক্রমণ করে প্রায় ৯০০০ মুসলমানকে হত্যা করে।

ভারতে পর্তুগীজ শাসনের ইতিহাসই প্রমাণ করে যে, পর্তুগীজ সরকারের অসততা, বিদ্বেষ ও দুর্নীতিপরায়ণতা, অর্থলোলুপতা ও শোষণের জন্যই পর্তুগীজ সরকার প্রায় সাড়ে চার শ বছর গোয়া শাসন করার পরও গোয়াবাসীর মন কোনদিন জয় করতে পারে নি। গোয়াবাসীরা শুধু দিনের পর দিন নীরবে অত্যাচার সহ্য করে এসেছে, আর স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ্য-আন্দোলনের রূপ দেবার জন্য অপেক্ষা করে এসেছে। প্রথম পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটলো ১৯৪৫ এর ১৫ই আগষ্ট। এই কয়েক বছরে পর্তুগীজ সরকার তাদের যথেচ্ছ অত্যাচারের মাত্রা দিয়েছে বাড়িয়ে। শত শত সংগ্রামী নেতাকে করেছে কারারুদ্ধ। এই আন্দোলনের আগুন ধিক্ ধিক্ করে জ্বলতে লাগলো—অবশেষে গোয়ার সর্বদলীয় নেতারা একত্রিত হলেন। এই সর্বদলের মিলন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে গোয়ার মুক্তির জন্য আর এ-রকম একত্র প্রচেষ্টা বিশেষ দেখা যায় নি। এবার ভারতের স্বাধীনতা দিবসে (১৯৫৫—১৫ই আগষ্ট) ভারতীয় সত্যাগ্রহীরা দলে দলে প্রবেশ করলো গোয়াতে সংগ্রামী মুক্তি-কামী গোয়াবাসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে, আর পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীদের জানিয়ে দিতে যে "গোয়া ভারতের।"

এই অনভিপ্রেত ঘটনায় পর্তুগীজ সরকারের ধৈর্যচ্যুতি হ'ল। নিরস্ত্র শান্ত সত্যাগ্রহীদের উপর তাদের অকথ্য লাঞ্ছনা এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে আর এক কলঙ্কময় অধ্যায়ের সূত্রপাত করল। শত শত সত্যাগ্রহীকে কারারুদ্ধ করা, মেসিনগান ও বুলেট ব্যবহার করে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হত্যা, পুলিশের নির্মম লাঠির আঘাতে নিদারুণভাবে আহত করা পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রায় দৈনন্দিন কর্তব্যে দাঁড়িয়েছে। তাদের এই মানবতা-বিরোধী, দস্যুমনোবৃত্তিতে যে আজ শুধু সমগ্র ভারতের জনচিত্তে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তা নয়—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রত্যেক অধিবাসীই স্তম্ভিত ও লজ্জিত।

গোয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকে সর্বতোভাবে দমন করার জন্যই যে পর্তুগীজ সরকার চেষ্টা করছে, তা নয়—সদম্ভে আজ এ ঘোষণাও করেছে যে, ভারতে পর্তুগীজ অধিকৃত স্থান উপনিবেশ নয়, উহা স্বয়ং পর্তুগাল। আরও বলেছে যে, পর্তুগীজ অধিকৃত স্থান পর্তুগালের সাগর পারের প্রদেশ। অতএব গোয়ার যে সব লোক ভারতের অন্তর্ভুক্তি চায়, তাদের পর্তুগীজ সরকার বিদ্রোহী বলে গণ্য করবে এবং ভারত যদি গোয়া সমস্যায় হস্তক্ষেপ করে তবে ভারতবর্ষকে 'আক্রমণকারী' বলা হবে।

কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, সাগর পারের দেশ থেকে এসে ভারতের কয়েকটি ক্ষুদ্রতম অংশ জোর করে অধিকার করে রাখার মত দম্ভের উৎস পর্তুগীজ সরকারের কোথায়?

পশ্চিম-এশিয়া ও দক্ষিণপূর্ব-এশিয়ার মধ্যে গোয়ার অবস্থান সামরিক ঘাঁটি হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া এখানে ভাল লোহার এবং ম্যাঙ্গানিজের খনি আছে। একমাত্র মারমাগোয়ার কাছেই ২০০টি ম্যাঙ্গানিজ খনি আছে। তার ফলে আমেরিকা গোয়ার দিকে নজর দিয়েছে এবং পর্তুগালকে হাতে রাখার জন্য আমেরিকা তাকে উত্তর-আটলন্টিক জোটে ঢুকিয়েছে। ছোটখাটো বন্দর মারমাগোয়া এখন একটা নৌঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে—তার চার পাশে তৈরী হয়েছে বিমান ঘাঁটি। জাহাজ বোঝাই অস্ত্রের আমদানী হচ্ছে আমেরিকা থেকে গোয়াতে। সবচেয়ে আশ্চর্য কথা এই যে, ১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত গোয়াতে কোন পর্তুগীজ সৈন্যদল ছিল না। বৃটিশ সৈন্য, বৃটিশ রণতরী গোয়াতে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে আসছিল। কিন্তু যখন বৃটিশ ভারত ত্যাগ করল, তখন সুবিধা বুঝে পর্তুগালও আমেরিকার সঙ্গে এক সামরিক চুক্তি করল। সেই চুক্তি অনুসারে ভারতে পর্তুগীজ শাসন অব্যাহত রাখার পাকা বন্দোবস্ত হ'ল আমেরিকার সহায়তায়।

ভারতীয় সত্যাগ্রহীরা নৌকাযোগেও গোয়ায় যাচ্ছেন

তাই কোন কোন আমেরিকান সংবাদপত্র ঘোষণা করেছে যে, ভারতে পর্তুগীজ অধিকৃত স্থানগুলি পর্তুগালের কলোনী মাত্র নয়—উহা পর্তুগালের অবিচ্ছেদ্য অংশ—কারণ গোয়ার সব লোকই পর্তুগীজ। কিন্তু এই কথা অত্যন্ত মিথ্যা। কারণ গোয়াতে আছে ১১টি জেলা—

তার সাতটিতে ভারতীয়রা সংখ্যাগুরু—বাকী চারটিতে যে লোক আছে তাদের অনেকের নামের পিছনে পর্তুগীজ উপাধি আছে সত্য, কিন্তু এদের শতকরা ৫ জনও একবর্ণও পর্তুগীজ বুঝে না। সুতরাং গোয়ার খৃষ্টানদের সঙ্গে ভারতীয় খৃষ্টানদের কোন প্রভেদ নেই।

ভারতীয় সত্যাগ্রহীরা গোয়ায় প্রবেশ করলে গোয়ার অধিবাসীবৃন্দ তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন

১৫ই আগষ্ট ভারতীয় সত্যাগ্রহীরা গোয়ায় প্রবেশ করলে পর্তুগীজ সৈন্য তাঁদের উপর গুলিবর্ষণ করে। চিত্রে একজন ভারতীয় নারী সত্যাগ্রহীকে ভারত সীমান্তে ব'য়ে আনতে দেখা যাচ্ছে

গোয়া যেমন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, আচার ব্যবহার প্রভৃতির দিক দিয়ে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতীয়মান হয়, তেমনি অর্থনৈতিক দিক দিয়েও গোয়া সম্পূর্ণ ভারতেরই উপর নির্ভরশীল। ভারত থেকে টাকা পেলে তবে গোয়ানিজদের খাওয়া পরা চলে। গোয়ার আর্থিক জীবনের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন চোরাকারবার ও চোরাই চালান। সরকারী সাহায্য ও আশ্রয়পুষ্ট একটা আন্তর্জাতিক চোরাকারবারী দল আছে। এরা নির্দিষ্ট-পথে প্রকাশ্যে তাদের কারবার চালায়। মদ, সোনা, রেশম-বস্ত্র প্রভৃতি চোরাকারবারের প্রধান মাল। পর্তুগীজ সরকার সক্রিয় সাহায্যের বিনিময়ে এই চোরাকারবারীদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা পায়। পর্তুগীজ সরকার আমদানী করে ৯ কোটি টাকার মত মাল, কিন্তু রপ্তানী করে মাত্র আড়াই কোটি টাকা। চোরাই ব্যবসায়ের টাকা থেকেই এই বিরাট ঘাটতি মিটিয়েও পর্তুগীজ সরকার পর্তুগালে এক কোটির উপর টাকা পাঠায়। ভারতবর্ষ থেকে সরকারীভাবে ব্যবসা করে এরা প্রায় সাত কোটি টাকা পায় এবং ভারতবর্ষে পাঠায় প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার উপর। চোরাই কারবারের অর্থের সাহায্যেই পর্তুগীজ সরকার তাদের শাসনের ভিত্তিকে রক্ষা করছে। এই অর্থ দিয়ে সরকার হাজার হাজার আফ্রিকান ও ইউরোপীয়ান সৈন্য ও সার্জেণ্ট দল পোষণ করছে। এই অর্থ দিয়েই আধুনিক সমরোপকরণ কেনার সুবিধা হয়েছে। এই টাকার সাহায্যেই ভারত থেকে হাজার হাজার গবাদি পশু আমদানী করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গোয়াকে স্বাধীন করার প্রধান অস্ত্র গোয়া সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বিভিন্ন বিদেশী সংবাদপত্রের বিবৃতিতেও প্রকাশ যে, অধিকাংশ গোয়াবাসীই ভারত-ভুক্তি চায়—পর্তুগীজ অত্যাচার তাদের দমিয়ে রাখতে পারবে না।

কিন্তু ভারত-ভুক্তি কি ভাবে সম্ভব? ভারত গভর্ণমেন্ট যুদ্ধ ঘোষণা

করলে হয়তো একদিনে গোয়া দখল করে নিতে পারেন। কিন্তু তার নীতিগত বহু বাধা আছে। এই মিলিটারী অপারেশনের ফলে বর্তমান আন্তর্জাতিক জগতে জটিলতা ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। ভারত পররাষ্ট্রনীতিতে 'সহ-অবস্থানে' বিশ্বাসী। এখন সামরিক অভিযান চালালে এই নীতির সম্পূর্ণ ব্যভিচার ঘটবে। শুধু তাই না, যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ-ক্ষিপ্ত মনোভাব এখন শান্ত আছে, তা হয়তো আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান, আর গোয়ার বিরুদ্ধে ঐ একই ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কারণ বৃটিশ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে হায়দ্রাবাদের আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিলনা। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের বিচারে গোয়া এখনও একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। তার বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযানের পরিষ্কার অর্থই হচ্ছে—গোয়ার পর্তুগীজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। আর এর ফলে সারা পৃথিবীতে নতুন করে যুদ্ধের আগুন জ্বালানোর পুরা দায়িত্ব আসবে ভারতের ঘাড়ে।

পণ্ডিত নেহেরুর এই সহ-অবস্থান নীতির অন্য আর একটা দিকের ব্যাখ্যাও অনেকে করেছেন। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বনিয়াদ হচ্ছে জাতীয় রাষ্ট্র (National State)। পর্তুগালের সঙ্গে ভারতের সহ-অবস্থান নীতি প্রযোজ্য—কিন্তু পর্তুগীজ-অধিকৃত যে সব জায়গা পর্তুগাল নয়, তার সঙ্গে সহ-অবস্থান চলতে পারেনা। যেমন বৃটেনের সঙ্গে সহ-অবস্থান চলতে পারে, কিন্তু বৃটেনের অধিকৃত কেনিয়ার পক্ষে এ নীতি অবাস্তব।

তবে পর্তুগীজ সরকারের বিরুদ্ধে একটি মাত্র বাস্তব অথচ প্রত্যক্ষ কার্যকরী উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে—সেটি হচ্ছে অর্থনৈতিক অবরোধ। পূর্বের আলোচনাতেই দেখা গেছে যে, গোয়ার পর্তুগীজ-সরকারের অর্থনৈতিক কাঠামো কত দুর্বল ও পরনির্ভরশীল। প্রত্যক্ষ আঘাত একমাত্র এই দিক দিয়ে করা যেতে পারে। তা ছাড়া গোয়ায় আভ্যন্তরীণ আন্দোলন যত বেশী প্রবল হবে, ততই ভারতীয় সত্যাগ্রহীদেরও শক্তি বৃদ্ধি হবে। সমগ্র বিশ্বের আত্ম-নিয়ন্ত্রণবোধে সচেতন সমস্ত দেশই পর্তুগীজ সরকারের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত। ভারতের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, এই সুযোগে পর্তুগীজের অত্যাচার ও সাম্রাজ্য-লোলুপতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টি করা। তা হলে গোয়ার স্বাধীনতা লাভের পথ অনেক সহজ ও সরল হয়ে পড়বে।

এ ছাড়া গোয়া সমস্ত ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্নের সঙ্গেও জড়িত। আমেরিকার হস্তক্ষেপের ফলে গোয়া দিনের পর দিন শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হচ্ছে এবং এই ঘাঁটি শুধু ভারত নয়, সমগ্র এশিয়ার দিক দিয়েও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু তাই বার বার দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, গোয়ার প্রশ্ন ভারতের জাতীয় প্রশ্ন। তিনি আরও বলেছেন—ভৌগোলিক দিক থেকে, এবং ভাষা, জাতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে গোয়া ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই ভারতের সঙ্গে এই উপনিবেশ মিলিত হবেই।

আজ আমাদেরও আন্তরিক প্রার্থনা এই যে, গোয়ার মুক্তি সংগ্রাম সফল হোক—ভারতের গোয়া আবার ভারতেরই হোক।

৯. ৯. ৫৫

স্বপ্ন ও সাধনা

শ্রীনীতিন মণ্ডল

প্রত্যেকেই কোন না কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই পৃথিবীর প্রথম আলো দেখে। তারপর সে দিনে দিনে শশীকলার মত যুবকে পরিণত হয় শিশু থেকে। বালক, বালক থেকে কিশোর, যুবক এবং বৃদ্ধে পরিণত হয়। যৌবনে মানুষ অনেক স্বপ্ন রচনা করে। জীবনে সুদেহ ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সাধনায় লিপ্ত হয়। কিন্তু এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে চাই উপযুক্ত পরিশ্রম। আর পরিশ্রমের প্রধান উৎস হচ্ছে স্বাস্থ্য। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করা সম্ভব নয়। তাই জীবনে কৃতকার্য্য হতে হলে—সুখী হতে হলে—অপরকে সুখী করতে হলে স্বাস্থ্যের একান্ত প্রয়োজন।

শাস্ত্রে আছে—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" অর্থাৎ শারীরিক উন্নতিই হচ্ছে সকল সাধনার মূল। শরীর যদি সুস্থ ও সবল থাকে তাহলে মনও প্রফুল্ল থাকে। কারণ শরীর মন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বস্তুতঃ মন ও শরীর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। অতএব আমরা রাজ-নীতি, ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য এবং অন্য যা কিছু গঠনমূলক কাজ করতে যাই না কেন, সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীর না থাকলে কোন কিছুই সম্ভব নয়। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আমাদের শরীর ঠিক একটা ইঞ্জিনের মতো। ইঞ্জিনের যন্ত্রসমূহকে চালু অবস্থায় রাখতে হলে তার প্রয়োজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, তারপর জল ও কয়লা সরবরাহ করা। তার সামান্যতম কোন একটি জিনিষের অভাব ঘটলে সে বিকল হয়ে বসে থাকে। ঠিক তেমনি আমাদের শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলে প্রয়োজন নিয়মিত স্বাস্থ্যচর্চ্চা করা।

কিন্তু এই স্বাস্থ্যচর্চ্চা নিয়ে আমাদের দেশের অনেকের মধ্যে মতভেদ আছে। তাঁরা মনে করেন যে ব্যায়াম ব্যয়সাপেক্ষ। তাদের মতে ডিম, মাংস, ঘি, দুধ ইত্যাদি ঐ জাতীয় দুর্মূল্য খাদ্য ছাড়া বলিষ্ঠ দেহ লাভ করা যায় না। কিন্তু এ ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন। ব্যায়াম

যারা করবেন তাদের খাদ্যাদি যথাসম্ভব টাট্‌কা হওয়াই দরকার। শাকসব্জী, ফলমূল যথাসম্ভব খাবেন। তবে দুধ একটু পেলে কথাই থাকে না। আমরা সাধারণতঃ দৈনিক যে সমস্ত খাদ্য খাই, তাই খেয়ে আমরা শরীর তৈরী করতে পারি। খাদ্য অখাদ্য না হলেই হলো। সাধারণ ঘরে যা পাওয়া যায়, সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট বলেই মনে হয়।

ব্যায়ামের পূর্ব্বে কিছু খেয়ে নেবেন। রুটী, তরকারী, ভেজিটেবল সুপ ইত্যাদি, পরে চিনি বা মিছরির সরবৎ বা শুধু ২।১টী পাতি নেবুর রসে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে চিনি দিয়ে পান করবেন। ব্যায়ামের জন্য বেশী সময় লাগে না। ৩০ মিনিট সময় হলেই যথেষ্ট। ব্যায়ামের ১৫।২০ মিনিট পরে হাত মুখ বা প্রয়োজন হলে গা ধুয়ে নিতে পারেন।

অবশ্য যে ব্যায়ামের বা খাবারের কথা বলা হলো তা সাধারণ ব্যায়ামের উপযোগী। এর ভেদাভেদ আছে—সেটা যে কোন উপযুক্ত ব্যায়ামবীরের নিকট নিজের শরীরের দোষ ত্রুটি জানিয়ে নির্দ্দেশ নেওয়াই ভাল। প্রতিটি রবিবার বা সপ্তাহে আপনার সুবিধামত একদিন ব্যায়াম থেকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেবেন।

সুস্থ-দেহী নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে দশের মধ্যে। জীবন সংগ্রামে সে হয় জয়ী। মন থাকে সদা প্রফুল্ল। কর্ম্মে আসে নব-প্রেরণা। নিজে আনন্দিত থাকে, আর অপরকে আনন্দ দান করতে পারে। অপর দিকে ভগ্নদেহী পারে না জীবনে কোন কিছুই করতে। জীবন তার কাছে বিড়ম্বনা মাত্র। তার জীবনে সমস্ত কিছুই বৃথা। জীবনে থাকে না আশা—সেখানে থাকে শুধু ব্যর্থতা।

স্বাস্থ্যই সম্পদ। এই সম্পদের অধিকারী যে নয়, অন্য সব কিছুই তার আয়ত্তের বাহিরে। জীবন হয়ে উঠে তার বীভৎস। তাই উপযুক্ত শিক্ষকের নির্দ্দেশমত ব্যায়াম ও খাদ্যতালিকা নিয়ে চলতে যদি পারা যায়, তবে জীবনে সুস্থদেহে প্রতিষ্ঠা লাভ করার মত স্বপ্ন কখনও ব্যর্থ হবে না।

দ্বিজেন্দ্র-স্মরণে

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

কোথা বাংলার চারণ কবি, নব ভারতের দীক্ষাগুরু,
সৃষ্টিকুশলী সুরকার কোথা, যাত্রাপথের নূতন সুরু,
প্রাণগঙ্গার নবভগীরথ, ভাবের প্লাবনে মুক্ত ধারা
নব ভাবরাজি স্নিগ্ধ শান্ত, উদার আকাশে আপন হারা!

বিশ্ববলীন প্রতিভা আজিও আকাশ ভুবন দীপ্তিময়,
মনীষা অপার জ্ঞানগরিমায় সাগরের বুকে হয়েছে লয়,
সৃষ্টি-রচনা সঙ্গীত যার, কৃষ্টি-সাধনা অন্তহীন,
মহামানবের তীর্থ-সলিলে পুণ্যজ্যোতিঃ সে রাত্রিদিন!

সপ্তসুরের দিব্য আলোকে হেরিল নবীন প্রভাত সূর্য্য,
কণ্ঠে তোমার বিপুল মন্দ্রে গরজি উঠিল কালের তূর্য্য,
চোখের সুমুখে ধরিয়া তুলিলে প্রাচীন জাতির গরব কথা,
অজ্ঞানতার তামসী নিশীথে আজি সে অসীম চঞ্চলতা!

ম্লান, মূঢ়, মূক, নির্য্যাতিতের জাগালে হিয়ায় গভীর আশা,
শ্রান্ত, ক্লান্ত, শুষ্ক বক্ষে দিয়েছ অমোঘ অতুল ভাষা,
নাট্য প্রতিভা হিমাচল সম, হাসির গানের দরদী কবি,
বক্ষে আঁকা সে কৌস্তভমণি—বাংলা মায়ের সোনার ছবি!

উদ্‌গাতা তুমি আর্য্যঋষির মহিমা, গরিমা, লুপ্ত স্মৃতি,
সঙ্গীতে যার স্বদেশের বাণী মূর্ত হইয়া জাগিছে নিতি,
জন্মভূমির এত যে মাধুরী স্বপনে, গোপনে দিয়েছে ধরা,
হরিতে হিরণে শ্যামলে নিখিলে চিরবিমোহন দুঃখহরা;

কোথা চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত, কোথা সম্রাট সাহজাহান,
ছন্দে গাথায় মেবারের স্মৃতি ঝঙ্কৃত সদা বীণার তান,
কোথা সে চিতোর গিরিকন্দর, রাণা প্রতাপের উদয়গিরি,
জহর ব্রতের অগ্নিআহবে রক্তঝলকে বক্ষ চিরি!

কোথা সে ভাবুক, উদার-প্রেমিক, কোথা সুরসিক, মহৎপ্রাণ,
কোথা 'সুরধাম',—কোন পরপারে আজি জীবনের চির অভিযান!

অলক্ষ্যে আসি দাঁড়ায়েছে কবি পরাধীনতার ছিন্নপাশে,
গেয়েছিল গান স্বদেশের তরে জন্মভূমি সে ভালো যে বাসে।

সন্ধ্যা আরতি জাগিছে ভুবনে মিলাল আঁধার বিশ্বভরি',
গুণমুগ্ধ ভক্ত আমরা স্মৃতির বাসরে প্রণাম করি।

চরম চরিতার্থতা
শরতের নির্মল আকাশে
বৈরাগী মেঘ; বাতাসে
শেফালির স্নিগ্ধ নিমন্ত্রণ।
সোনায় পান্নায় বিজড়িত
দিগন্তে শরতের প্রসন্ন
মহিমা। রঙে রসে
মধুর এই যে উৎসব-
মুহূর্ত, হৃদয়ের আনন্দ-
গানেই এর চরম
চরিতার্থতা। তেমনি
রম্য রুচির চিরন্তন
বিলাস, রূপসাধনার
চরম চরিতার্থতা—
"লক্ষ্মীবিলাসে"।
লক্ষ্মীবিলাস তৈল
এম • এল • বসু য়্যাণ্ড কোং লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস : কলিকাতা-৯

মেয়েদের কথা

আমরা কোন পথে ?

আরতি দেব

প্রগতির ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে অতি ক্ষীণ এক কণ্ঠ শোনা যায়। "হে ভারত—ভুলিও না সীতাসাবিত্রী তোমার আদর্শ···ক্ষীণ কণ্ঠ ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যায়, স্বাধীন ভারতের নারীদের কাণে কথা কয়েকটি প্রবেশ করলেও মর্ম্মে আঘাত করেনা। নারী-প্রগতি-স্বাধীনতার প্রকৃতরূপ অর্থ অল্প কয়েক জনেই জানে, বাকি সকলে কাহারও অধীন না হয়ে ইচ্ছা অনুসারে খেয়াল খুসি মত কাজ করাকেই নারী-স্বাধীনতা বলে মনে করে।

সেকালে মেয়েদের স্বল্প পরিসর গণ্ডী ছিল, মোটামুটি ভাত কাপড়—ঠাকুর দেবতা, পাঁচজনকে দিয়ে নিজে অল্পে সন্তুষ্ট হয়ে জীবন কাটিয়ে দেওয়াকেই ধন্য মনে করতো। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সীমা বৃদ্ধি হয়েছে। বিলাসের নানা রকম উপকরণ ধনী নির্ধন সকলের মন বিভ্রান্ত করে তোলে। অনেকের এই সব ভোগ করবার সুযোগ সুবিধা ও অবস্থা থাকে না। ফলে মেয়েরা বিরক্ত হতে থাকে, গৃহ-জীবনের শান্তি হারিয়ে যায়, এ রকম মেয়েদের বলতে শুনেছি "একটু যদি লেখাপড়া জানতো, তবে সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে চাকরি করে জীবন কাটাতো।"

সাধারণ মেয়েদের আদর্শ—সিনেমা-শিল্পী, শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি। কয়েক শ্রেণীর মেয়েদের ধারণা—সিনেমা শিল্পীরা ছবিতে দেখা গল্পের মত জীবন যাপন করে, কাজেই বাস্তব জীবনে এইরূপ সুলভ স্বপ্নময় জীবন ছেড়ে কোন বোকা অন্য পথে পা দেবে ?

একজন গৃহিণীকে আক্ষেপ করতে শুনেছিলুম "তাঁর এ জন্মটা বৃথা গেছে। চিরকাল সকলের মন রেখে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে ভয়ে আধমরা হয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে। এখনকার মেয়েরা স্বাধীন হয়ে কেমন যাহা ইচ্ছা তাই করছে।"

পুরানো নূতন কোন কিছু একেবারে ভালো কিংবা মন্দ হয়না। বর্ত্তমানে একদল পুরানো সংস্কারবাদী পুরানো সব কিছু প্রাণপণে ধরে রাখতে চায় এবং নূতন সব কিছুকে অনিষ্টকর বলে নিন্দা করে থাকে। আর নূতন প্রগতিসম্পন্না আধুনিক-শ্রেণীরা পুরানো সব কিছুকে ক্ষতিকারক কুসংস্কার বলে প্রতিপন্ন করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

যুগে যুগে দেশের অবস্থা অনুসারে নূতন নিয়মকানুন আচার আচরণ ও ব্যবস্থা প্রচলন হয় এবং উঠে যায়, যেমন মেয়েদের অবরোধ-প্রথা—পৌরাণিক যুগে বৈদিক যুগে এদেশে কঠোর অবরোধ প্রথা ছিল না। তারপর যুগের প্রয়োজন অনুসারে দেশে অবরোধ প্রথা প্রচলন হয়। অনেকে একে স্বাধীনতার রূপ বলে মনে করেন, কিন্তু কতকগুলি নিয়ম প্রথা ব্যবস্থা উঠে যাওয়া এবং প্রচলন হওয়াকে কি স্বাধীনতা বলে ?

লজ্জা, ক্ষমা, ধৃতি দয়া ধৈর্য্য অতিথিসেবা প্রভৃতি নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। বর্ত্তমানে এসব কুসংস্কার সেন্টিমেণ্ট্ নাম দিয়ে সগৌরবে পরিহার করা হয়েছে, অতিথি সেবা—প্রাচীন ভারতের বৈশিষ্ট্য ছিল, এর কত গল্প কত রূপকথা না আছে। নারায়ণ জ্ঞানে অতিথিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েরা হাসি মুখে নিজেদের অন্ন দিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করতো। এতে পরলোকে কোন দুর্লভ লোক লাভ করতো কি না জানা যায় না, কিন্তু ইহলোকে যে আনন্দ যে ত্যাগের শান্তি লাভ করতো—এখনকার সহস্র বিলাস ব্যসনের মধ্যে তার কণা লাভ হয় না। বর্ত্তমানে কর্ম্মময় যান্ত্রিক যুগে কতকগুলো অকর্ম্মণ্য অক্ষম লোককে সেবা করাকে কুড়েমির প্রশ্রয় দেওয়া এবং লজ্জাকর বলে মনে করা হয়। পূর্ব্বে অতিথি সেবা ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকলেই কর্ত্তব্য বলে মনে করতো, এই কাজটিতে নারীর

মমতাময়ী হৃদয়ের একরূপের প্রকাশ হত। বর্ত্তমানে অনেক মেয়ের ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও অপরের অনিচ্ছায় এই ছোট ছোট কাজগুলি করতে পারে না, দেখা যায়। কাজেই এক্ষেত্রে সামান্য কাজে যদি আমাদের স্বাধীনতা না থাকে, তবে স্বাধীনতা কি? ভালো ভালো কাপড় জামা পরে' ইচ্ছা মত ঘুরে বেড়ানোকে কি স্বাধীনতা বলে? সেকালে দরিদ্র বন্দিনী দাসী-শ্রেণীর ঠাকুমা-দিদিমারা ভালো কাপড় জামা পরে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে না পারলেও এরকম কাজে তাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল।

একজন রক্ষণশীল আত্মীয় জিজ্ঞাসা করিলেন, নারীর প্রগতি স্বাধীনতা মানে কি জানো?

—না, ঠিক···(উত্তরটা অসম্পূর্ণ ছিল, কারণ তখন সঠিক রূপ জানা ছিল না) শ্রীকান্ত বইতে শ্রীকান্ত বর্ম্মায় নেমে একটা গাড়োয়ানকে অনেকগুলি মেয়ে আখ (ইক্ষুদণ্ড) দিয়ে পিটিয়েছিল মনে আছে? তার নাম মেয়েদের স্বাধীনতা। আমাদের দেশের মেয়েরা মুখে বলে আমরা স্বাধীন হয়েছি—কাজের বেলায় দেখ সেই সেকালের মত নাকে কাঁদছে। সেকালের তুলনায় মেয়েদের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে সে সকলে স্বীকার করেন! কিন্তু সেই উন্নতির সঙ্গে কতক অন্যায় ক্ষতিকর এমন সব আচার নিয়ম প্রবেশ করেছে যে তাহা বুঝেও কোন প্রতিকার করতে পারা যায় না। কিন্তু এখন হতে যদি ঠিক পথে সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে ভবিষ্যতে প্রগতির বন্যার প্রচণ্ড ভাঙ্গনকে কি দিয়ে প্রতিরোধ করা যাবে। ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের সুস্থ সরল সুন্দর আদর্শ দেশনায়কেরা সকলেই কামনা করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সকলেই যুগ বিপ্লবের ভাঙাগড়ার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে নাই। তারপর পরিবর্ত্তনের বন্যা এখন থামছে না। দেশ স্বাধীন হবার পর অল্প সময়ের মধ্যে সব দেশ অল্প উন্নতি করেছে। কিন্তু আমাদের দেবভূমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।

—

সমাজের অস্বাস্থ্যে নারীর ইন্ধন

রেখা মুখোপাধ্যায়

সাংসারিক কাজকর্ম্মের অবসরে বাড়ীর মেয়েছেলেরা যখন সংবাদপত্রের উপর চোখ বুলান তখন সমাজের নানাক্ষেত্রে দুর্নীতির ভয়াবহ পরিণতি দেখে তাঁদের স্বভাব-কোমল মন স্বভাবতঃই দুঃখ পায়। দুঃখের বিষয় এই সব ক্ষেত্রে তাঁরাও সে পুরুষের পাশে একটা বড় ভূমিকা নিয়ে ব'সে আছেন, এ চিন্তা তখন বোধহয় তাঁদের মাথায় আসে না। ঝাঁ ঝাঁ করছে রৌদ্দুর। পুরুষেরা যে যার কর্ম্ম স্থলে বেরিয়ে গেছেন। ছেলে-মেয়েরাও স্কুলে কলেজে চ'লে গেছে। গলির মোড়ে লোভনীয় ডাক শোনা গেল—"শিশি বোতল কাগজ বিক্রী।" বেরিয়ে এলেন উকীল গিন্নী। হর্লিকস্‌এর শিশি, পনড্‌স্‌এর কৌটো, কড্‌লিভারের খালি বোতল—জিনিসগুলো শিশিবোতলওলার ঝোলায় গেল। গিন্নী ঝনাৎ করে আঁচলটা পিঠে ফেললেন। খুদ বিক্রী আছে গো? এক মুখ হেসে মাথায় কতকগুলো চুপড়ী নিয়ে এসে দাঁড়ালো লক্ষ্মীকান্তপুরের মেয়েটি চৌধুরীদের টিনের বাড়ীটার দরজায়। কালি ঝুল মাখা রান্নাঘরটার আরও চার পাঁচটা বিবর্ণ ঝুড়ি চুপড়ীগুলোর পাশে শোভা পেতে লাগলো ঈষৎ সবুজ ছোপ লাগা নতুন চুপড়ী দুটো। শুধু ক্ষুদের টিনটার পেটটা খালি হ'য়ে গেল। চৌধুরীবাবুর বিধবা মা বোধহয় সেই সৌন্দর্য্য দেখেই মুগ্ধ হচ্ছিলেন—চমক ভাঙ্গলো ছেলের বিরক্ত স্বরে—"আবার ওসব জঞ্জাল জুটালে কেন, একেই তো এখানে খেতে বসলে দম আটকে আসে যেন, তার ওপরে দেওয়ালে গুচ্ছের ধামা কুলো চুপড়ীর ডাঁই। বিরক্ত মুখে ভাত খেতে লাগলেন আবার তিনি।

বাসন নেবে গো? বাসনউলী হাঁকলো অমলাদের দোর গোড়ায়। দোতালা ফ্ল্যাটের ভাড়াটে ওরা। বাড়ীতে আরও পাঁচটা ভাড়াটে আছে। সবাই ভাড় ক'রলো বাসন-উলীর আশে পাশে। অমলার মা তো খোপদুরস্ত একটা গোটা ছেঁড়া মশারীই বদলে ব'সলো একটা ফুলকাটা বাটির জায়গায়। সে আর অল্পবিস্তর লোভের চাহিদা মিটিয়ে বরদা প্রসন্ন লেনের অনেক গৃহিনীই খুশী হ'লেন মনে মনে, কিন্তু এর পর দেখা গেল চৌধুরীদের ছেলেটা জাল হর্লিক্স খেয়ে আরও বিপদ বাড়িয়ে ব'সলো টাইফয়েডের শেষে। গড়িয়াহাটের মোড়ে সস্তায় মশারী বিক্রী হ'তে দেখে পাপিয়ার দাদামশায় লেক ফেরৎ বেড়িয়ে ফিরবার সময় মাত্র সাত টাকায় বেশ বড় সড় একখানা মশারী কিনে বাড়ী ফিরলেন। অত ক্যাটকেটে নীল রং সহ্য না হওয়াতে বালতীর জলে চুবিয়ে কেচে তুললো তাকে পাপিয়ার মামী। দড়িতে মেলে দেওয়ার পর তাতে ছেঁদার বহর দেখে সকলের চক্ষু স্থির। এমন কি পাশের বাড়ীতে বাস ক'রে অমলার মাও তাঁর ভোল বদলান মশারীটাকে চিনতে পারলো না। নিজেরই খুদ আবার চালের সঙ্গে ফেরৎ পেয়ে চৌধুরী-বাবুর মা সেটা সযতনে আবার খালি টিনটায় পুরলেন। নারীর কল্যাণ হস্ত অজানতেই এক হাত কালি মেখে কলুষিত হ'য়ে উঠলো। আরও দু একটি পরোক্ষ অপরাধ নিবেদন ক'রে এ অপ্রিয় প্রসঙ্গের ইতি করবো। বইটা হাতে করে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন মিসেস্ সেন। ইচ্ছা এবার দরজাটা বন্ধ ক'রে দিবানিদ্রার যোগাড় দেখবেন। সামনের বাড়ীর জানালা থেকে ডাকলেন প্রিয়সখী মিত্রজায়া!

"ভুলের ফসল হচ্ছে, আলেয়ায় যাবি নাকি? একখানা টিকিট বেশী আছে আমার। আজকেই শেষ দিন। ভারী ভালো বই নাকি।" আমতা আমতা করেন সেন। এগজামিন দিচ্ছে ছেলেটা ইস্কুলে।

কলেজ থেকে ফিরতে মেয়েটারও দেরী হবে। তবু দেখা গেল খোকন ইস্কুল থেকে ফিরে মায়ের দেখা পেল না। রামের মা গুছিয়ে দিল তার জলখাবার। খোকনের মুখের হাসি নিভ্‌লো না তাতে। মা সিনেমা গেলে তারও একটা সিনেমা দেখা পাওনা হয়। একটু দেরীতেই ফিরলো খোকনের দিদি খুকী। প্রাইভেট বাস স্ট্রাইকের দরুণ ভিড় ট্রামে বাসে। আজ বাধ্য হ'য়ে আসতে হ'লো রামেশ্বর প্রসাদের গাড়ীতে। অবাঙ্গালী হ'লেও কেমন চমৎকার বাংলা বলে রামেশ্বর। অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে সামনের আয়নাটার দিকে চেয়ে থাকে খুকি। আয়নাতে ফর্সা মুখটা সত্যিই ভালো দেখাচ্ছে। পর পর তিনটে বিয়ের সম্বন্ধ নানা কারণে ভেঙ্গে গেছে তার।

কিন্তু তার কি সত্যিই রূপ গুণের অভাব আছে? আরও কি ভাবে তার স্থির দৃষ্টি দেখে বোঝার জো নেই কিছু। তবু অন্যমনস্ক চোখ ছুটোতে একদিন হয়তো ঐ সরলা খুকিরই প্রতারিত জীবনের কথা পড়তে হয়—আমাকে' আপনাকে সংবাদ পত্রের পাতায়। সিনেমার নেশায় পোক্ত হ'য়ে খোকা একদিন বাবার মাস মাইনে আত্মসাৎ ক'রে বোম্বে পাড়ি দেয়। তাই বলছিলাম যে সমাজের গলিত ক্ষতে আপনার আমার বিয়ের প্রলেপ কম ক্ষতিকর নয়।

নূতন রান্না

মিনতি বসু

মাংসের দোশা

উপকরণ:—মাংস এক সের, ময়দা এক সের, ঘি তিন পোয়া, গরম মশলা পরিমাণ মত, আদা ছু'তোলা, ধনে চার তোলা, ছোলার ডাল এক পোয়া;—প্রথমে ময়দায় পরিমাণ মত ময়ান দিয়ে ভালভাবে মাখতে হবে, তারপর ছোলার ডালগুলি ঘিয়ে ভেজে ধুলোর মত গুঁড়ো কোরতে হবে, পরে মাংস খুব মিহি করে বেটে, মাংসের সাথে ঐ গুঁড়ান ডাল, মস্‌লার গুঁড়ো এবং আদার রস মিশাতে হবে, তারপর কড়াই জ্বালে চাপিয়ে ঘি দেবে, গ্যাজলা ম'রে গেলে, ঐ মেশানো মাংস ভালভাবে ভেজে নিতে হবে। তারপর ময়দার লেচি কোরে তার ভিতর ঐ মাংসের পুর দিয়ে লেচি বরফির আকারে গ'ড়ে নিয়ে মাঝখানে একটু চেপে দিতে হবে। এইবার এগুলো ঘিয়ে ভেজে নিলেই মাংসের দোশা তৈরী হোল। সকালে বিকালে চায়ের টেবিলে এর উপস্থিতি উপেক্ষা করা যায় না।

কুয়াশের ঘণ্ট

উপকরণ:—কুয়াশ পরিমাণ মত, ফুলবড়ি এক ছটাক, জিরে-মরিচ আধতোলা, ধনে আধ তোলা, তেজপাতা তিন খানা, তিল বাটা এক তোলা, দুধ আধ ছটাক, চিনি আধ তোলা, লবণ, ঘি, লঙ্কা, পেস্তা, বাদাম ও জল পরিমাণ মত: কুয়াশের খোসা ছাড়িয়ে লাউয়ের ঘণ্টের মত কুচি-কুচি কোরে কেটে ভাল ক'রে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর পরিমাণ মত লবণ মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। পরে সেগুলো চেপে ভাল ক'রে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে এই কুয়াশ সম্বরা দিয়ে নাড়্‌তে থাকুন, এর আগেই বড়িগুলো ভেজে রাখবেন। কুয়াশ সাঁতলান হলে তিল ও মশলা বাটাগুলো জলে গুলে তাতে ঢেলে দিন। ফুটে উঠলে বড়ি আর চিনি দিতে হবে। তারপর লবণ দিয়ে নাড়তে থাকুন, সুসিদ্ধ হলে বাকী ঘিটুকু দিয়ে নেড়ে নাবিয়ে রাখুন। অল্প খরচে প্রস্তুত খাদ্য তালিকায় এটি মুখোরোচক এক খাদ্য বলে অন্যতম আসন পাবে এই আশা রাখি। পাঠিকা বোনদের এই রান্না ছুটো পছন্দ হোলে ভবিষ্যতে এই বিভাগে আরো মুখোরোচক নতুন ধরণের রান্না দেওয়ার ইচ্ছে রইল।
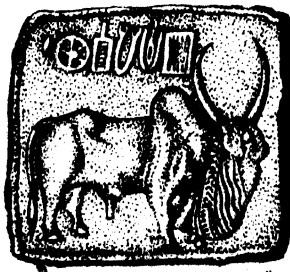
রেঙ্গুন প্রবাসী বাঙ্গালীর দান—

ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন প্রবাসী প্রবীণ বাঙ্গালী ব্যবহারজীবী শ্রীবসন্তকুমার হালদার রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার স্থাপনকল্পে একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ পাঠাগারের নাম হইবে হালদার লাইব্রেরী। বসন্তবাবু কোচবিহারের লোক, বয়স ৯১ বৎসর—গত ৬১ বৎসর ব্রহ্মদেশে বাস করিতেছেন। ইহার পূর্বে তিনি নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন—(১) ব্রহ্মের পিনমানায় ডিস্পেন্সারী ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (২) বাংলা দেশে বিদ্যালয় স্থাপনে প্রচুর অর্থ দান (৩) রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে ৪০ হাজার টাকা (৪) কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে ৫০ হাজার টাকা ও (৫) শিক্ষা বিস্তারের জন্য ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে প্রথম কিস্তিতে ২০ হাজার টাকা। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি ভারতে আসিয়া দেরাদুনে বাস করিয়া গিয়াছেন।

নির্বাচনী প্রচারে ছাত্রছাত্রী—

গত ৩১শে আগষ্ট দিল্লীতে লোক সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংসদ-সচিব ডাঃ এম-এম-দাস জানাইয়াছেন—সকল রাজ্য সরকারকে একথা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে বালকবালিকাদিগের নির্বাচনী প্রচার কার্য্যে অংশ গ্রহণ জাতির স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। বিভিন্ন রাজনীতিক দল কর্তৃক দলীয় স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়োগ দেশের সত্যিকারের অগ্রগতির পক্ষে অন্তরায় এবং নিয়ম শৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও উহার ফলে নানারূপ অসুবিধার উদ্ভব হয়। এই নির্দেশের ফলে যদি ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতিক কার্য্য হইতে দূরে রাখার ব্যবস্থা হয়, তবে তাহা অবশ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে। সকল শিক্ষা-ব্যবস্থা ক্রমে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে চলিয়া যাইতেছে, এ অবস্থায় সরকারী নির্দেশ সর্বত্র পালিত হইতে দেখিলে দেশবাসী আশ্বস্ত হইবে।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বাণী—

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বেতার ভাষণে নিম্নলিখিতরূপ বাণী প্রচার করেন —"আট বৎসর পূর্বে প্রথম যখন আমরা যাত্রা সুরু করিয়াছিলাম, তখন সমগ্র দেশে ছিল বিশৃঙ্খলা, সর্বগ্রাসী অভাব, আর হতাশার এক কালোছায়া। নানা সমস্যার জটিলতায় বন্ধুর হইয়া উঠিয়াছিল আমাদের যাত্রা পথ। সেই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে পদে পদে বাধা পাইয়াও কিন্তু আমরা রণে ভঙ্গ দিই নাই, নিরুৎসাহ হই নাই। দেশ গঠনের, জাতি গঠনের দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া সতর্ক পদক্ষেপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছি অভীষ্টের পথে। আমাদের মন্থর সমালোচনাও হইয়াছে—কিন্তু আজ তা বাস্তব বিচারেরই নিদর্শন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই দিনে প্রতি বছর আমরা যখন অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের কৃতকর্মের পর্য্যালোচনা করি, তখন ব্যর্থতার কোন গ্লানি আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে না, অভূতপূর্ব সাফল্যের গৌরবও আমাদিগকে মোহগ্রস্ত করে না—তার পরিবর্তে এই অবিস্মরণীয় দিনটি আমাদের মনে আশার সঞ্চার করে, গম্য পথে প্রেরণা জোগায়, আর স্মরণ করাইয়া দেয় দেশের প্রতি আমাদের কর্তব্যের কথা।" ডাক্তার রায়ের এই কথাগুলি প্রত্যেকের মনে উৎসাহের সঞ্চার করিবে।

ভারত কর্তৃক ব্রহ্মকে ঋণ দান—

ব্রহ্ম-দেশের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ায় গত আগষ্ট মাসের প্রথমে ব্রহ্মের বাণিজ্য-উন্নয়ন-মন্ত্রী মিঃ রসিদ ভারতে আসিয়া সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশকে ২০ কোটি টাকা ঋণ দান করিয়াছে। ব্রহ্মে উৎপন্ন চাউল এখন আর পৃথিবীর অন্য কোন বাজারে বিক্রীত হইতেছে না—সে জন্যই ব্রহ্মদেশে অর্থ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মের চাউল যদি সুলভে পাওয়া যায়, তবে তাহা ভারতে আসিলে দরিদ্র ভারতবাসীরা তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে। ভারত এখন চাউল সম্বন্ধে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। তাহা সত্ত্বেও সুলভে বেশী চাউল পাইলে লোক তাহা অন্য খাদ্যের পরিবর্তে গ্রহণ করিবে। মাদ্রাজের মত অন্য প্রদেশেও চাউলের ব্যবহার বাড়াইবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না।

কলিকাতায় শিশু স্বাস্থ্য নিকেতন—

কলিকাতা পার্ক সার্কাস ময়দানের কিছু পূর্বে ৯৫নং দিলখুসা ষ্ট্রীটে কলিকাতা কর্পোরেশন প্রদত্ত ৩ বিঘা জমীর উপর শিশু স্বাস্থ্য নিকেতন নামে একটি শিশু চিকিৎসালয় স্থাপিত হইতেছে। ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাহা নির্মিত হইবে। উহার একাংশের নির্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে—১০০ শিশুর পরিচর্য্যার উপযোগী একটি বহির্বিভাগ, সপ্তাহে অন্ততঃ ১০০ শিশুর তত্ত্বাবধান করার মত শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, বৎসরে ৫ শত ছাত্র ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ও এক মাইলের মধ্যে প্রতি গৃহে
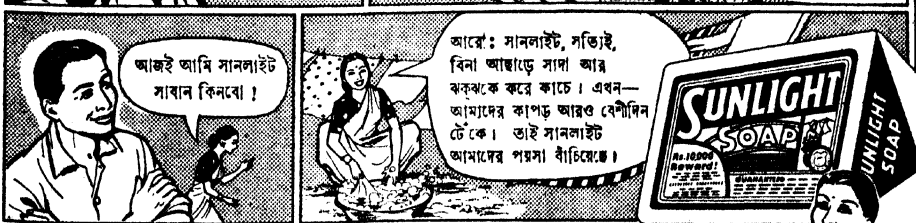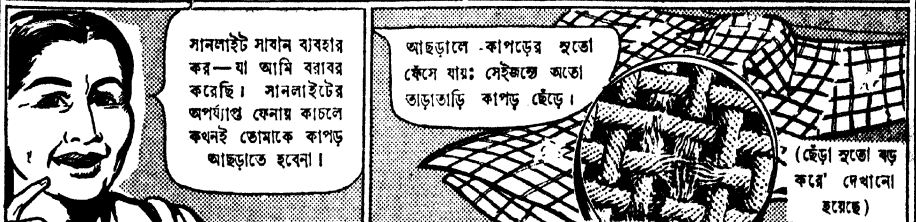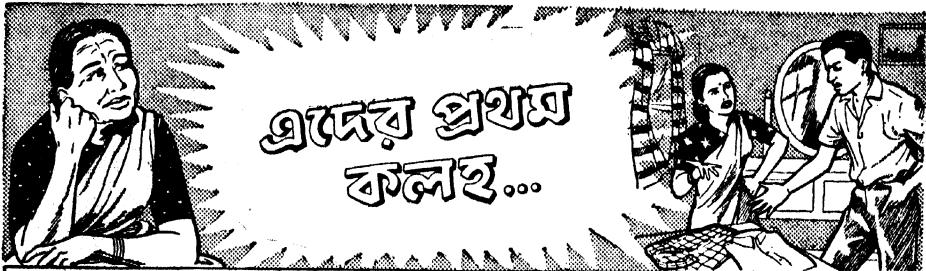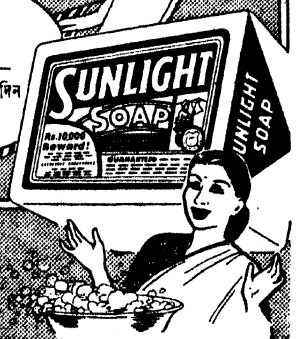
স্বাস্থ্য পরিদর্শক পাঠাইয়া শিশু স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান করা হইবে। দ্বিতীয় অংশ নির্মিত হইলে ৫০ শয্যাযুক্ত এক ইনডোর হাসপাতাল খোলা হইবে। ইহা সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান—খ্যাতনামা শিশু-চিকিৎসক ডাঃ ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী ইহার পরিচালক। ইহাতে ইতিমধ্যে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে—এজন্য আর ২০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস, সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য পাইয়া এই নূতন প্রতিষ্ঠান সত্বর সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়—

যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজটিকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য বিধান সভার বর্তমান অধিবেশনে একটি আইন উপস্থিত করিবেন। গৌরীপুরের শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, মৈমনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ও রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের দানে ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যাদবপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, পরে ১৯১০ সাল হইতে উহার সহিত এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়। সেই দিনের জনগণের প্রতিষ্ঠান আজ স্বাধীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হইল, তাহাতে দেশবাসী অবশ্যই আনন্দিত হইবেন। যাদবপুর কলেজ বাংলার গৌরবের জিনিষ—শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ইহাও বাঙ্গালী রক্ষা ও পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইবে।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুকে উপাধিদান—

ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুকে গত ১৫ই জুলাই রাত্রিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে এক ভোজ সভায় রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক সম্বর্দ্ধনা করা হয়। মানব সমাজে শান্তিস্থাপনকল্পে বীরোচিত চেষ্টার জন্য তাহাকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে তথায় ভূষিত করা হয়।

পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষা শিক্ষা—

১২ই জুলাই ঢাকায় যুক্ত ফ্রন্টদল পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াই—পূর্ববঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক উর্দূ শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন। মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ৪ বৎসর পূর্বে ঐ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিল। নূতন আদেশে উর্দূ ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদিগের পক্ষে বাংলা ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। মৌলবী আসরাফুদ্দীন আমেদ চৌধুরী বর্তমানে পূর্ববঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী। যুক্ত ফ্রন্টদল বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দান করিবার দাবী জানাইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভার এই কার্য্য সেখানকার অধিবাসীদের মনে নূতন আশা দান করিয়াছে।

বৌদ্ধ তীর্থস্থানের উন্নয়ন—

২৬শে জুলাই দিল্লীতে লোকসভায় প্রশ্নোত্তরের সময় জানা গিয়াছে যে কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত ৯টি বৌদ্ধ তীর্থস্থানের উন্নয়ন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন—(১) বুদ্ধগয়া (২) সাঁচী (৩) রাজগীর (৪) সারনাথ (৫) কুশীনগর (৬) শ্রাবস্তী (৮) সঙ্কাশ্যা (৮(নালন্দা ও (৯) লুম্বিনী। এই কার্য্যে ৬১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছে। ভারতের বৌদ্ধ তীর্থগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন। ইহার পর ক্রমে হিন্দু তীর্থস্থানগুলিরও যাহাতে রক্ষার ব্যবস্থা হয়, সেজন্য আশা করি, যথাযথ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইবে।

মদ্যপান নিষিদ্ধ—

নয়া দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ—ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মদ্যপান বর্জন তদন্ত কমিটী নির্দেশ দিয়াছেন—দেশবাসী মাদক দ্রব্য বর্জনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে রাজ্য সরকারকে আগামী আর্থিক বৎসর হইতে হোটেল, রেস্তোরা, পানাগার, ক্লাব প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানসমূহে মদ্যপান নিষিদ্ধ করিতে হইবে। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও মদ্যপান নিষিদ্ধ হইবে। ভবিষ্যতে সরকারী কর্মচারীদের চাকুরীতে নিয়োগের পূর্বেই তাঁহারা মদ্যপান করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। কয়েকজন মদ্যপ ছাড়া বোধহয় কাহারও এ ব্যবস্থায় আপত্তি হইবে না। মদ্যপান বর্জন আন্দোলন বহু পুরাতন। স্বাধীন ভারতের সরকার যে এতদিনে এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে আনন্দের সংবাদ।

গোয়া সত্যাগ্রহের সহীদ—

গত ৩রা আগষ্ট গোয়ায় সত্যাগ্রহ করিতে যাইয়া পুলিসের গুলীতে প্রথম যে ২জন সত্যাগ্রহী নিহত হন তাঁহারা (১) মধ্যপ্রদেশের শ্রীবি-কে-থোরাট ও (২) পশ্চিমবঙ্গের শ্রীনিত্যানন্দ সাহা। নিত্যানন্দ পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তু—সে নদীয়া জেলার রাণাঘাট প্রীতিনগর কলোনীর অধিবাসী—তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর। তিনি কম্যুনিষ্টদলের সদস্য। মথুরার শ্রীঅমিচাঁদ গুপ্ত গোয়া-সত্যাগ্রহের প্রথম সহীদ—পর্তুগীজ পুলিস তাহাকে পিটাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পর আরও বহু সত্যাগ্রহী গোয়ায় নিহত হইয়াছে। আমরা তাহাদের সকলের জন্য আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করি।

নেপালে নূতন পথ—

হিমালয় পর্বতমালার মধ্যে নেপাল চিরতুষারাবৃত অংশ। সকল ঋতুতে যাহাতে পাটনা হইতে বিমানযোগে নেপাল যাতায়াত করা যায়, সেজন্য কাঠমুণ্ডুতে একটি নূতন বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করা হইয়াছে। ঐ ঘাঁটিতে সকল ঋতুতে বিমান উঠা নামা করিতে পারিবে। পাটনা হইতে বিমানে নেপাল যাইতে মাত্র ১ ঘণ্টা সময় লাগে। তাহা ছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ নেপালের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ভেসে ধোবান ও থানকোটের মধ্যে একটি ৭৯ মাইল রাস্তা নির্মিত হইতেছে। আমলেখ-গঞ্জ ও বীমফেড়ীর মধ্যে যে ছোট রাস্তা আছে তাহা নূতন পথের একটি অংশ হইবে। ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঐ পথ নির্মিত হইবে—উহার নাম হইবে 'ত্রিভুবন রাজপথ'। উঁচু পাহাড় ও ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া ঐ রাস্তা চলিয়াছে। ৫ শত সৈনিক ও ৭ হাজার শ্রমিক ঐ পথ নির্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত আছে—১৯৫৬ সালে পথ নির্মাণ শেষ হইবে। নেপাল

খনিজ দ্রব্য ও অন্যান্য বহু মূল্যবান জিনিষে পূর্ণ। সে সকল দ্রব্য আনয়নের সুলভ ব্যবস্থা হইলে বাণিজ্যের দ্বারা নেপাল উন্নত হইবে এবং পৃথিবীর লোকও উপকৃত হইবে।

স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন—

কলিকাতার নিকট বাগজলার চারিধারের জলাভূমিগুলি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নকল্পে পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত ২ হাজারের অধিক উদ্বাস্তু পরিবার সাড়ে ৪ মাইল দীর্ঘ এক খাল খনন করিয়া যে আত্মনির্ভরতার পরিচয় দিয়াছেন—গত ৪টা আগষ্ট কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না তাহা দেখিতে যাইয়া বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করেন। তাঁহার সহিত পশ্চিমবঙ্গের উপমন্ত্রী শ্রীবীজেশ সেন, শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস ও শ্রীএ-বি চট্টোপাধ্যায় আই-সি-এস তথায় গমন করিয়াছিলেন। উদ্বাস্তুদের এই স্বেচ্ছাশ্রমে উন্নয়ন কার্য্য সত্যই বিশেষ প্রশংসনীয়। সর্বত্র উদ্বাস্তুরা এইভাবে আত্মনির্ভর হইলে সরকারের পক্ষে সত্বর পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা সহজ হইবে।

চীনের শিল্প সংস্কৃতি—

খ্যাতনামা পণ্ডিত, রাজ্যসভার সদস্য ডাঃ রঘুবীর তিন মাস তিব্বত, মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া ভ্রমণ করিয়া চীনের শিল্প সংস্কৃতির বহু নিদর্শন লইয়া সম্প্রতি দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—২ হাজার বছরেরও বেশী পুরাতন কয়েকখানি পুঁথি ঐ সঙ্গে আসিয়াছে। তিনি যে সমস্ত জিনিষ আনিয়াছেন, তাহার ওজন ৮ টন—৭৭টি বাক্সে সেগুলি আনা হয়। ইহার মধ্যে সাহিত্য, বিভিন্ন প্রকারের চিত্রশিল্প, লিথোগ্রাফ, নানা রকম ফটো প্রভৃতি আছে। সেগুলি নাগপুরে ভারতীয় সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক একাডেমীতে রাখা হইয়াছে। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ঐ সকল জিনিষ তাঁহাকে সংগ্রহ করিতে ও ভারতে আনয়ন করিতে দিয়াছেন। আগামী অক্টোবর মাসে দিল্লীতে ঐ সকল জিনিষের একটি প্রদর্শনী করা হইবে। ভারত ও চীনের সম্পর্ক কত প্রাচীন, তাহা জানা যায় না। এই সকল জিনিষ হইতে পরে এ বিষয়ে বিশেষ তথ্য সংগৃহীত হইবে।

আসাম রেল লিঙ্ক—

উত্তর বঙ্গ ও আসামে বিধ্বংসী বন্যার ফলে গত ১লা জুলাই হইতে আসাম রেল লিঙ্কে ট্রেণ চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ২৭শে আগষ্ট হইতে তাহা পুনরায় চালু করা হইয়াছে। যে সব ট্রেণ মণিহারী ঘাট হইতে আসিত তাহা চাপরাঘাট পর্য্যন্ত যাইত। যাত্রীরা যাহাতে আই নদী পার হইতে পারে, কর্তৃপক্ষ তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন ও বীজাদি হইতে আমীনাবাদ ট্রেণে যাত্রীদিগকে লইয়া যাওয়া হইবে। আসাম ও উত্তরবঙ্গে রেলে যাতায়াতের এখনও কোন স্থায়ী ব্যবস্থা না হওয়ায় যাত্রী সাধারণকে বিশেষ অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। কবে যে স্থায়ী রেলপথ নির্মিত হইবে তাহা জানা নাই। বিশেষ করিয়া প্রতি বৎসর বর্ষার সময় রেলপথের কোন না কোন অংশ নষ্ট হইয়া যায় ও তাহার ফলে কিছুদিন রেল চলাচল বন্ধ থাকে। আসাম ও উত্তরবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রিত না হইলে আসাম রেল লিঙ্কে ট্রেণ চলাচলের ব্যবস্থা স্থায়ী হইবে না।

শোক সংবাদ

পরলোকে ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু—

গত ২৫শে আগষ্ট সকালে কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ও রসায়ন শিল্পের অন্যতম অগ্রণী ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসু ৮৩ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা ৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৭৩ সালে ২৪পরগণা চাংড়িপোতায় তাঁহার জন্ম হয় ও ১৮৯৭ সালে তিনি ডাক্তারী পাশ করেন। তিনি বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ৮ বৎসর উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টার ছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যধর্ম পঞ্জিকা ও স্বাস্থ্য সমাচার মাসিক পত্রিকা জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছিল। তিনি গ্রামোন্নতিকর কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং বহু কৃষিক্ষেত্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামে কাজ করিয়াছিলেন। নিজে অর্থ উপার্জনের সহিত তিনি নিজেকে সর্বদা জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিতেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতির সহিত একযোগে কাজ করার ফলে তিনি নিজ জীবনে এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

পরলোকে ললিতমোহন সিংহ—

উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট কংগ্রেস-সেবক ললিতমোহন সিংহ ৭৩ বৎসর বয়সে গত ৩০শে আগষ্ট মঙ্গলবার পরলোক গমন করিয়াছেন। ফরিদপুর জেলায় জন্ম হইলেও তাঁহার রাজনীতিক জীবনের অধিকাংশ সময় কলিকাতা, নদীয়া ও মেদিনীপুরে কাটিয়াছে। তিনি পুস্তক প্রকাশকের কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন। তিনি কয়েকবার কারাবরণ করিয়াছিলেন—তাঁহার অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন।

পরলোকে ডাঃ অমরনাথ ঝা

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিহার রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি ডাক্তার অমরনাথ ঝা ২রা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পাটনায় ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী ১৯ বৎসর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ সালে দ্বারভাঙ্গা জেলায় মৈথিলী ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়—তিনি বহু বৎসর এলাহাবাদ বিশ্ব-

বিত্যালয়ের ও কিছুকাল কাশী হিন্দু বিশ্ববিত্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। তাঁহার পিতা সার গঙ্গানাথ ঝাও এলাহাবাদ বিশ্ববিত্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি উত্তর প্রদেশে ও ১৯৫৩ সালে বিহারে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী হারাইয়াছে।

পরলোকে পতিরাম রায়—

পশ্চিমবঙ্গ হইতে নির্বাচিত লোকসভার তপশীলী সদস্য পতিরাম রায় ১৪ই জুলাই দিল্লীতে উইলিংডন হাসপাতালে ৫৫ বৎসর বয়সে রক্তের চাপ বৃদ্ধি রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। খুলনা সাতক্ষীরায় তাঁহার বাস ছিল—দেশ বিভাগের পর তিনি ২৪পরগণা বাদুড়িয়ায় বাস করিতেন। ১৯৩৭ সালে তিনি প্রথম এম-এল-এ নির্বাচিত হন, ১৯৪৬ এম-এল-সি ও ১৯৫২ সালে লোকসভার সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই—'পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়' নামে তিনি একখানি মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের বহু ছাত্র শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছে এবং বহু স্থানে বহু নূতন বিত্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

পরলোকে অমলেন্দু দাশগুপ্ত—

আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম সহ-সম্পাদক অমলেন্দু দাশগুপ্ত গত ১১ই আগষ্ট রাত্রিতে ৫২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ফরিদপুর জেলায় তাঁহার জন্ম—তাঁহার পিতা কবিরাজ ছিলেন। ১৯২০ সালে স্কুলে পড়ার সময় তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন ও পরে ১৯৩০ সালে বি-এ পাশ করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে ১৯৩১ হইতে ১৯৩৮ পর্য্যন্ত তিনি আটক ছিলেন। ১৯৪৬ সাল হইতে তিনি সাংবাদিকতার কাজ করিতেছিলেন। তিনি বন্দীর প্রবন্ধ, ডেটিনিউ, বকসা ক্যাম্প প্রভৃতি বহু বাংলা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সকল রাজনীতিক আন্দোলনের সহিত তিনি আজীবন জড়িত ছিলেন।

পরলোকে ভিক্ষু শীলভদ্র—

লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৌদ্ধ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ও ভারতীয় মহাবোধী সমিতির সহ-সভাপতি ভিক্ষু শীলভদ্র গত ৩রা আগষ্ট রাত্রিতে ৭২ বৎসর বয়সে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে দেহরক্ষা করিয়াছেন। নদীয়া জেলার কুড়ুলগাছি গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়—পূর্বাশ্রমে নাম ছিল কে-কে-রায়। ব্রহ্মদেশে তিনি আইন ব্যবসা করিতেন—স্ত্রী ও একমাত্র কন্যার মৃত্যুর পর তিনি বৌদ্ধ শ্রমণ হন এবং বহু পালি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি সারিপুত্ত ও মোগ্গলায়নের পূত অস্থি লইয়া নেপাল, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে গমন করিয়াছিলেন। কাম্বোডিয়াতে তিনি ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।
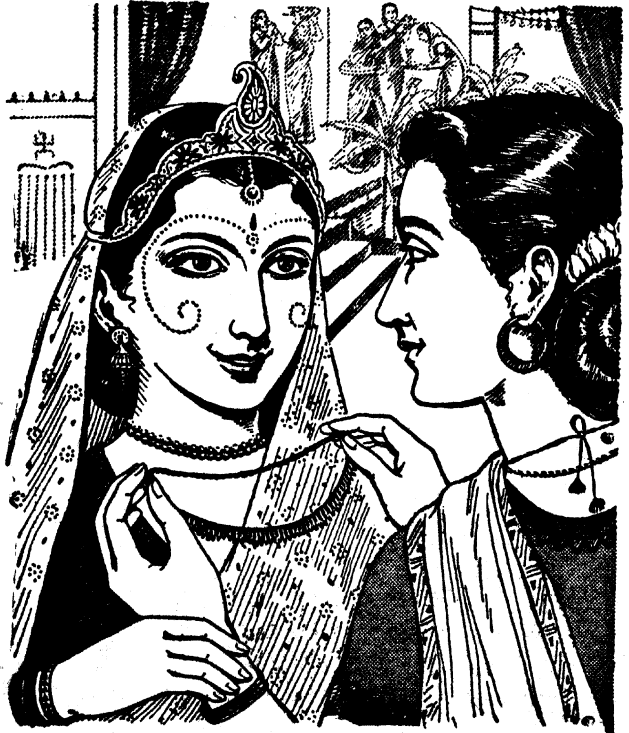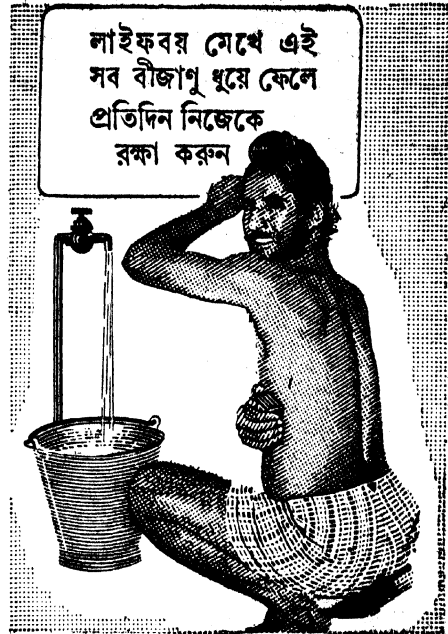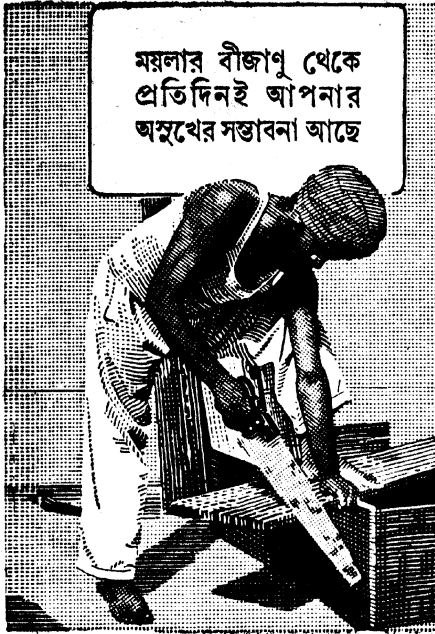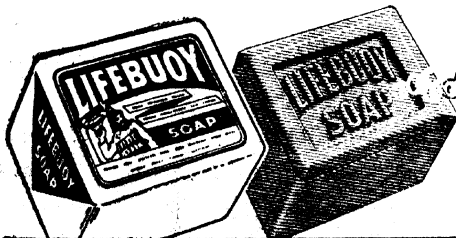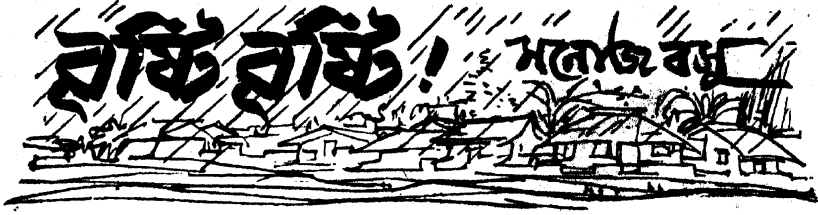
(পূর্বানুবৃত্তি)

পাকে চক্রে কি হয়ে গেল, দেখ! 'ভারতে ইংরাজ' যবে সমাধা হয় হোক গে, আপাতত কাল সকালেই যেতে হচ্ছে বিশ্বেশ্বরের বাড়ি। মেয়েদের অমনি নাচুনে স্বভাব—তাঁরা বদনাম দিলেন, তা বলে সত্যি সত্যি আমি কি মাথায় টোপর চড়িয়ে বর হয়ে বসছি! আর তোমার ছাত্রীকে আচ্ছা করে শাসন করে দিও ইরা, ঐ বয়সে এমন ফাজিল হবে কেন?

দুটো গলি এক জায়গায় পড়েছে, মোড়ের উপর পুরানো শিবমন্দির। তার একটু ওদিকে বিশ্বেশ্বরের বাড়ি। বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে গলিটুকু হাঁটতে হাঁটতে অরুণাক্ষ মন্দিরের পাশে এলো। এসে থমকে দাঁড়ায়। জনকয়েক রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি লাগিয়েছে। জানলা খুলে বিশ্বেশ্বর ভিতরে এসে দাঁড়ালেন।

কি হল বিশ্বেশ্বরবাবু, আজকে দেবার কথা ছিল না?

বিশ্বেশ্বর কাতর হয়ে বলছেন, আস্তে মশায়, আস্তে—

বাপু-বাছা বলে থামাবার চেষ্টা করছেন, পাড়ার মধ্যে চাউর হয়ে না পড়ে! কিন্তু শুনবার পাত্র কি লোকগুলা? উত্তমর্ণের মেজাজই আলাদা।

আজ দেবো কাল দেবো বলে কত কাল হাঁটাচ্ছেন। লজ্জাও করে না!

বিশ্বেশ্বর বিপন্ন কণ্ঠে বললেন, তা সত্যি। অন্যায় হচ্ছে বড্ড। কিন্তু চেষ্টার কসুর নেই, পেরে উঠছি নে আমি। বিশ্বাস করুন, সাধ্যে কুলাচ্ছে না।

অরুণ অনেকটা এগিয়ে এসেছিল। মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়াল মন্দিরের পাশে। এমনি ভাবে এসে পড়ে লজ্জা বোধ করছে। দেখবে আর একটুখানি—এমনি যদি চলতে থাকে, টিপিটিপি সরে পড়বে। এই হল অবস্থা—শতেক লাঞ্ছনা-অপমান মাথায় নিয়ে তবে জ্ঞানের চর্চা করতে হয়।

অনুনয়-বিনয়ের ফলে অবশেষে এ-পক্ষের সুরটা কিছু নরম হল।

ঠিক করে বলে দিন, কোন তারিখে আসব। এবারে যেন কথার খেলাপ না হয়।

বিশ্বেশ্বর পরম কৃতার্থ হয়ে বলেন, বেশ, আসবেন। আসবেন আপনি মঙ্গলবারে।

ঐ দিন আবার ওয়াদা করলে কক্ষণো শুনবো না আমি।

না, না—পেয়ে যাবেন এবারে।

ভিতরে বিশ্বেশ্বর এবং বাইরের অন্যান্যদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করে সে লোকটি গটমট করে চলে গেল। পরের জন—

আমায় বলুন একটা-কিছু। আমি কবে আসবো?

বিশ্বেশ্বর বললেন, ওঁকে মঙ্গলবারে বলে দিলাম। তার পরে তিনটে দিন বাদ দিয়ে আসবেন আপনি। বেশি চাচ্ছিনে, মাত্তোর তিন দিন। শনিবারে আপনাকে দেবো—

লোকটা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, তিন দিন চলবে না—কিছুতে না। খুব বেশি তো দুটো দিন। শুক্কুরবারে আসব।

আমাকে ডোবাবেন নাকি মশায়?

বেশ, তাই—

মাসখানেক ধরে বলে আসছেন, সে রকম নয় তো?

না, না—এবারে ঠিক।

কিন্তু পাওনাদার কি একটা-দুটো? নতুন নতুন আসছে আরও। যা গতিক, পঙ্গপালের মতো ছেঁকে ধরবে বুড়ো মানুষটাকে।

অসহায় দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে বিশ্বেশ্বর বললেন,

চেষ্টার কসুর নেই আমার। কিন্তু ঐ দেখুন। আপনি একা নন, সেটাও বুঝে দেখুন একবার।

লোকটা আরও খাপ্পা হয়ে বলে, হ্যাঁ—হ্যাঁ, বুঝি বই কি! সবাই পেয়ে যায়—আমার সঙ্গে যত ধোঁকাবাজি আপনার—

বিশ্বেশ্বর মরমে মরে গেলেন, আজ্ঞে না। সাধ্যে কুলোয় না বলেই…একেবারে অসাধ্য হয়ে পড়েছে।

সহসা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, আস্তে মশায়, আমার মেয়ে আসছে।

চক্ষের পলকে পাওনাদারের দল ভদ্র হয়ে গেল। ভয় দেখানো কথা নয়—মোড় পার হয়ে সত্যি সত্যি ইরার মূর্তি দেখা দিয়েছে। সকালে সন্ধ্যায় সে দু-জায়গায় পড়ায়। সকালবেলা ফিরবার মুখে বাজারটা ঘুরে আসে এক একদিন। আজকেও তাই, একটা বড় গোছের থলিতে কিছু কিছু আনাজ-পত্র ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে। এসে দাঁড়িয়ে সে ভ্রূকুটি করল।

বাবা, তুমি জানলার ওখানে—হুঁ, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, মেরে ফেলবেন নাকি আপনারা মানুষটাকে? যা অত্যাচার লাগিয়েছেন—আমি বলে দিচ্ছি, কিচ্ছু কেউ পাবেন না। দয়া করে আর আসবেন না—

অরুণাক্ষের দিকে অপাঙ্গে একটু তাকিয়ে বলে, এমনি ভাবে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকলে পথের লোকেই বা কি মনে করে?

যেন কেন্নোর মুখে টোকা পড়েছে। কেউ আর মেজাজ দেখায় না। সেই রগচটা লোকটা মিহিসুরে বলল, বটেই তো! জানলা আটকে দাঁড়াবেন না আপনারা, চলে যান। আসি তবে দাদা, শুক্কুরবারে কথা রইল।

সুড়সুড় করে সকলে সরে পড়ছে। অরুণাক্ষের মুখোমুখি ফিরে দাঁড়িয়ে ইরাবতী বলল, আপনার কি চাই? কাগজ আছে নাকি আপনার?

কাগজ কিসের? বুঝতে না পেরে অরুণ হতভম্বের মতো তাকায়।

ঐ যত এসেছিলেন, সবাই কাগজের লোক। পূজো কবে তার ঠিক নেই—এখন থেকেই পূজো-সংখ্যার লেখার তাগিদ। কাগজ যদি নেই—আপনি কি জন্যে তবে এঁদের সঙ্গে?

অরুণ আমতা-আমতা করে বলে, কারো সঙ্গে নই আমি। এই পথে এমনি যাচ্ছিলাম—

ইরা কঠিন হয়ে উঠল, যাচ্ছিলেন—লোকের হট্টগোল শুনে গাড়ি রেখে মজা দেখতে নেমে এলেন। ভাবলেন, দেনায় বিশ্বেশ্বর সরকারের চুল বিক্রি—সেদিনের চেয়েও বড় মজা। বড্ড নিরাশ হলেন—না?

কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। বলে, আমার বাবা পাগল-ক্ষ্যাপা—সরকার দয়া করে গারদের বাইরে রেখেছেন, নিখরচায় আপনারা সব পাগল দেখতে আসেন। একদিন ভুল করে আপনাদের ডেকে বসেছিলাম। অনেক তো হয়ে গেছে—শাস্তি এখনো শোধ হল না, কতকাল ধরে চলবে বলতে পারেন?

কিছু বলতে দিল না, অরুণের কোন কথা কানে নিল না। ঝগড়াটে মেয়ে এক ছুটে বাড়ির ভিতর গিয়ে দড়াম করে দরজা দিয়ে দিল। বন্ধ দরজার সামনে অরুণাক্ষ লজ্জায় অপমানে ফুলতে লাগল।

অপমান করে মুখের উপর দরজা দিয়ে যায়, প্রতিশোধ চাই এর। পড়তেই হবে বইটা। বইয়ের ভুল বের করে কাগজে কাগজে লিখে নাস্তানাবুদ করবে। দুটো-পাঁচটা খুঁত বেরোবে না, এমন হতেই পারে না—বিশেষ করে ঐতিহাসিক গবেষণা যেখানে। নিজের বিদ্যেয় না কুলায়, সহপাঠীদের ডাকবে। নয় তো খুঁত বের-করা বিস্তর পণ্ডিত আছেন, তাঁদের শরণ নেবে।

ইরাকে দেখেই বিশ্বেশ্বর জানলা থেকে সরে পড়েছিলেন। সন্তর্পণে এদিক-ওদিক চেয়ে আবার তিনি উদয় হলেন। সে ভিতরে চলে যেতে অরুণাক্ষকে ডেকে চাপা গলায় প্রশ্ন করেন, কি বাবা, কি দরকার তোমার?

অরুণ উত্তেজিত স্বরে বলে, আপনার বইয়ে ভুল আছে। তাই আলোচনা করতে এসেছিলাম।

দাম্ভিক ঐতিহাসিক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এক-মুহূর্তে। প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে বিশ্বেশ্বর বললেন, আমার ভুল কক্ষণো হয় না—ওজন করে করে লিখি। ভুল তোমার। আর একদিন এসো—সকাল-সকাল এসো, মেয়ে যে সময়টা থাকে না। সব সন্দেহ মিটিয়ে দেবো।

—ছয়—

মরীয়া হয়ে লাগল অরুণাক্ষ। ভুল বের করবেই। বিশ্বেশ্বর ভাল লোক, তাঁকে নিয়ে কিছু নয়। যত আক্রোশ দাম্ভিক মেয়েটার উপর। ভাবতেও সুখ, ঐ তেজিয়ান মাথা মাটির দিকে নুয়ে পড়েছে, লজ্জায় ঘাড় তুলতে পারছে না। অধ্যাপকদের একজন হলেন ডক্টর গুণসিন্ধু আচার্য—এক দিক দিয়ে বিশ্বেশ্বরেরই দোসর, নিজে ছাড়া আর যে কেউ কিছু জানে, কদাপি স্বীকার করেন না। বিশ্বেশ্বরের কথাবার্তায় কেউ দোষ ধরে না, নিজে তিনি কাজের মধ্যে ডুবে আছেন, তাই দেখে। কিন্তু আচার্য সেই কোন যৌবন বয়সে থিসিস দিয়ে বাহবা পেয়েছিলেন। তারপর থেকে উপদেশ বর্ষণ ছাড়া আর কোন কাজ নেই। ছেলেরা দু-চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু অরুণাক্ষ দায়ে পড়ে ঘন ঘন তাঁর বাসায় গিয়ে বাক্যসুধা পরিপাক করছে। একখানা 'ভারতে ইংরাজ' দিয়ে এসেছে তাঁকে। কিন্তু বইয়ের দাম আটটা টাকাই বরবাদ। গুণসিন্ধুর কেবল ফাঁকিবাজি। দেখা যাচ্ছে, ত্রুটি বের করার ব্যাপারে নিজেদের উপর নির্ভর ছাড়া গতি নেই।

বাবা-মা এসে পড়েছেন ইতিমধ্যে। বাড়ি জমজমাট। অম্বুজাক্ষ কাজে বেরুনোর সময় কখনো কখনো অরুণের ঘরে উঁকি দিয়ে যান। খুব পড়ছে। এমন কি বিকাল-বেলা খেলাধুলার সময়টাও বেরোয় না। অর্থাৎ জেদ চেপেছে শেষ পরীক্ষাটায় ভাল রকম কিছু করবেই। ভালো, খুব ভালো। যা ছেলে—সত্যি সত্যি মন করে লাগলে ও যে পয়লা দু-তিন জনের ভিতরে থাকবে, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।

সুহাসিনীর কিন্তু ভাল লাগে না। হৈ-হল্লা করে বেড়ায় ছেলে—এ তার কি হয়েছে, রাত-দিন ঘরের মধ্যে বই মুখে গুঁজে পড়ে আছে। পড়ার ব্যাপার নিয়ে কর্তা ঘা দিয়ে দিয়ে যেমন করে বলেন, গ্লানি হয়েছে ছেলের মনে। মায়ের প্রাণ মোচড় দিয়ে ওঠে।

ঘরের মধ্যে গিয়ে ছেলের মুখোমুখি বসে পড়লেন।

কি হয়েছে, খুলে বল্ তো আমায়।

পরীক্ষার পড়া—

পরীক্ষা তো আসছে বছর—

সে হল য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষা। মা, তাতে আর কতটুকু পড়তে হয়! তোমার ছেলে তাতে ডরায় না। বরাবর তো দেখে আসছ—না পড়েশুনে তুড়ি মেরে বেরিয়ে আসি।

সুহাসিনী অত শত বুঝলেন না। খোলা বইটা তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে অবজ্ঞা ভরে বললেন, বাংলা বই পড়তে হয় আজকাল?

অরুণাক্ষ হেসে বলে, বাংলা বলেই তো বেশি কড়া। বেশি রকম গণ্ডগোল বাংলায়, ইংরেজি অনেক সহজে বোঝা যায়।

না, অতি-সাবধানী মানুষ বিশ্বেশ্বর। দেখেশুনে নানান রকমে পরীক্ষা করে তবে এক এক লাইন ছাড়েন। এ মানুষকে বেকায়দায় ফেলা অসম্ভব। অন্তত অরুণাক্ষের বিদ্যায় কুলোবে না। তবু আশায় আশায় এগোচ্ছে। অধ্যবসায়ে হয় না, এমন কঠিন কর্ম দুনিয়ায় নেই। তার একটা প্রমাণ, 'ভারতে ইংরাজ'ও শেষ হয়ে এলো। দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়ে এসে পড়েছে। এখন যেন জমেও উঠেছে—গল্পের টানে টানে পড়া হয়ে যাচ্ছে, কসরৎ করতে হয় না। উনিশ শতকে এসে পড়েছি। মানুষগুলো দিব্যি চেনা-চেনা। নীলের চাষ খুব চলেছে। একটু গঞ্জ মতো জায়গা হলেই সেখানে নীলকুঠি। গোড়ায় গোড়ায় খুব সম্প্রীতি নীলকর সাহেবদের সঙ্গে। তারা খালি গায়ে খালি পায়ে মাঠের জলকাদা ভেঙে চাষ-আবাদ দেখে। তামাক খায় গড়গড়ায়। বাংলা কথা-বার্তা বলে, কালীপুজো দেয়, জোড়া-মুরগী মানত করে মাদারের থানে, সামিয়ানার দিকে যাত্রার আসরে বসে গান শোনে রাত দুপুর অবধি। দায়েবেদায়ে পড়শিদের দেখাশুনো করে, সিকিটা আধুলিটা দেয়। সাত সমুদ্র পারে এই সব জলজঙ্গল সাপ-বাঘের গাঁয়ে মেম সাহেবরা এসে থাকতে পারবে না, এরাও গরজ করে না তাদের নিয়ে আসবার জন্য। দেশি কালো মেয়ের সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে ঘর করে···

তাই তো বটে! অরুণাক্ষ দেশে গিয়ে হাড়িপাড়ায় একটা আধফর্সা মেয়েলোক দেখেছিল। বয়সকালে রীতিমত সুন্দরী ছিল, এখনকার চেহারা থেকেই আন্দাজ পাওয়া যায়। ত্রিসংসারে দেখাশুনার কেউ নেই, বড্ড

কষ্ট তার। এর বাড়ি ওর বাড়ি ঢেঁকিতে ধান ভানে, চিঁড়ে কোটে। এই সব করে দিন চলে। লোকে নামটা দিয়েছে ভারি মজার—মেম-ভাঁড়ানি। যারা ধান ভেনে বেড়ায় তাদের ভাঁড়ানি বলে। সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় মেম নামটা জুটে গেছে নামের সঙ্গে। এককালে যে নীলকরেরা হাতে মাথা কাটত, তাদের রক্ত দেহে বয়ে বেড়িয়েও, দেখ, আজ বাড়ি বাড়ি ধান ভেনে খেতে হচ্ছে।

এমনধারা ঘটবে, তারও আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে অধ্যায়ের যত শেষাশেষি এসে পড়ছে। এত সম্প্রীতি দেশি মানুষের সঙ্গে, ক্রমশ সেখানে বিরোধ এসে জমছে। বাংলাদেশে নীলের চাষ করে অচিরে লাল হয়ে যাওয়া যায়, সারা ইউরোপ জুড়ে রটনা। জাহাজ থেকে দলের পর দল এসে পড়ছে নীল-চাষের জন্যে। গোড়ায় এ-দলে ও-দলে রেশারেশি—নীলের দর বাড়িয়েই যাচ্ছে পাল্লা দিয়ে। চাষীদের বড্ড মজা—ধান-চাষ ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে নীলের পত্তনে মেতে উঠল। শেষটা সাহেবরা নিজেদের আহাম্মুকি ধরে ফেলল—সমিতি গড়ল যাবতীয় কুঠিয়ালদের নিয়ে। নীলের দর বেঁধে দেয় সমিতি থেকে, তার উপরে এক আধলা কেউ দেবে না। চাষীদের পোষায় না, ধারদেনা হয়ে যাচ্ছে—আগাম টাকা নিতে হচ্ছে কুঠি থেকে। কান্নাকাটি—নীলের দর বাড়িয়ে দাও সাহেব। কিন্তু গুছিয়ে নিয়েছে তখন দস্তুরমতো, কেবা শোনে কার কথা! করমু না, নীল করমু না মোরা। দাদন নিয়েছিস, বললেই হল নীল করব না! ইত্যাদি, ইত্যাদি। হিন্দু-পেট্রিয়টের ফাইলে হরিশ মুখুজ্জে মশায়ের বিস্তর লেখা ছড়ানো আছে, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক আছে—সে সমস্ত জানেন আপনারা। জানেন না সবিস্তারে রামনিধি সরকারের কথা। এইটা বিশেষ করে বিশ্বেশ্বরের গবেষণা। পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে।

অরুণদের জমিজমা আছে মণিরামপুর অঞ্চলে—সেই জায়গার মানুষ রামনিধি। সদরে সকলের সেরা উকিল। কিন্তু বদনাম আছে। কাশীশ্বর রায়ের চিঠিতে পাওয়া যাচ্ছে—অর্থপিশাচ চশমখোর বলিয়া তোমার সম্পর্কে নিন্দা-রটনা হইতেছে, কলিকাতায় বসিয়াও সেই সমস্ত কানে আসিতেছে। অল্প দিনের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত উকিলকে ছাড়াইয়া গিয়াছ, তাহাদের অন্নে হাত পড়িয়াছে—বুঝিতে পারিতেছি, ইহা তাহাদেরই কারসাজি…'

আচ্ছা, কাশীশ্বর—বারম্বার নাম পাওয়া যাচ্ছে, এই কাশীশ্বরটি কে হলেন? অরুণাক্ষের প্রপিতামহ তো এক কাশীশ্বর। রায় উপাধিও বটে! তিনি নন তো?

এমন পশার, এত নামডাক, পয়সাকড়ি জলস্রোতের মতন আসছে—তবু রামনিধি ওকালতি নিয়ে থাকতে পারলেন না। সেই এক বিচিত্র কাহিনী। ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতো রোমাঞ্চকর। এই অংশটা একেবারে প্রাণ ঢেলে লিখেছেন বিশ্বেশ্বর। কুঠিয়াল ও চাষীদের ঝগড়া ভয়াবহ হয়ে উঠল। গোড়ায় রামনিধি এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, ওকালতি নিয়ে মেতে ছিলেন। একটা মামলায় চাষীর দল মক্কেল হয়ে এলো তাঁর কাছে। তা রামনিধি হলেন ব্যবসাদার মানুষ—যে টাকা দেবে, তার হয়ে লড়বেন। বার দুই-তিন ঠিক মতো টাকা দিল তারা। শেষে আর পেরে ওঠে না। আধাআধি দিয়ে বলে, এর বেশি আর জোগাড় হল না হুজুর। এক তারিখে মোটেই কিছু দিল না। রামনিধি চটে গেলেন, গরিব বলে কি আদালত কোর্ট-ফী'র টাকা মকুব করল? সমস্ত চলবে, উকিলের বেলাই কেবল তাইরে-নারে-না! চাষীরা গ্রামে গেল টাকার জোগাড়ে; হাতে পায়ে ধরে বলে গেল—হাকিমকে বলেকয়ে অন্তত পক্ষে এই তারিখটা সাবকাশ নিয়ে নেন যেন; এক তরফা মামলা খতম হয়ে না যায়। তা বয়ে গেছে রামনিধির, দিনের দিন হাজিরই হলেন না তিনি কোর্টে। কিন্তু ইতিমধ্যেই খেটেখুটে রামনিধি মামলাটা ভালো দাঁড় করিয়েছিলেন। আর, হাকিম মানুষটাও ভালো—বাদী গরহাজির বিধায় তিনি এক কথায় মামলা ডিসমিস না করে নিজে থেকেই আর একটা দিন ফেলে দিলেন। ব্যাপারটা চাউর হয়ে পড়লে সকলে ছি-ছি করতে লাগল। কিন্তু রামনিধি একরোখা মানুষ—অন্যে কি বলল না বলল থোড়াই কেয়ার করেন তিনি।

এর পরেই এক কাণ্ড। মহারাণীর রাজত্বের জুবিলি উপলক্ষে কালেক্টরের বাংলোয় গিয়ে কুসুমপুর-কুঠির টমাস সাহেবের সঙ্গে রামনিধির আলাপ হল। কালেক্টর সাহেবই আলাপ করিয়ে দিলেন। একথা-সেকথার পর

টমাস রামনিধিকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বন্ধুভাবে পিঠে থাবা দিয়ে বলল, তাঁর ব্যবহারে কুঠিয়ালরা অত্যন্ত প্রীত হয়েছে। রামনিধি সরে দাঁড়িয়েছেন—চাষীদের মামলা অত যোগ্যতার সঙ্গে আর কেউ চালাতে পারবে না। এখন তিনি স্পষ্টাস্পষ্টি অবশ্য সাহেবদের পক্ষ নিতে পারছেন না, আইনগত বাধা আছে। তার প্রয়োজনও নেই। রামনিধি শুধু এমনি চুপচাপ থাকবেন, চাষীর হয়ে লড়বেন না। তারই জন্য পাঁচশ' টাকা দেওয়া হবে কুঠিয়ালদের তরফ থেকে।

প্লান্টার্স-ক্লাবের কাগজপত্র থেকে বিবরণ সংগ্রহ হয়েছে। অতএব ভুল আছে বলে তো মনে হয় না। হেন লোভনীয় প্রস্তাবের পর রামনিধি যেন আর একরকম হয়ে গেলেন। হাঁ-না কিছু বলেন না। টমাস চাপাচাপি করতে জবাব দিলেন, ভেবে দেখি! ভেবেচিন্তে খবর পাঠাব দু-পাঁচ দিনের মধ্যে।

ভাবনাচিন্তা বোধহয় সেই মুহূর্তেই হয়ে গিয়েছিল রামনিধির। খবর পাঠাবার প্রয়োজন হল না—দিন দুয়েকের মধ্যে কাকপক্ষীতে এসে টমাসের কাছে খবর দিল, সদর ছেড়ে রামনিধি নিজে চাষীদের গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন, তাদের সঙ্গে বৈঠক করে কুঠির দাদন দেওয়ার পদ্ধতিটা ভালো মতো জেনে-বুঝে নিচ্ছেন। আর শোনা যাচ্ছে, চাষীদের কাছ থেকে এক পয়সাও তিনি নাকি নেবেন না—মুফতে মামলা করবেন। এমন কি কোর্টের খরচাও তিনি দেবেন, চাষীর তরফে খরচের দায় রইল না।

এর উপরে সেই পুরুত ঠাকুরের ব্যাপার। আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। ঐতিহাসিক বিশ্বেশ্বর কিন্তু নিঃসংশয় নন। তিনি লিখছেন, অবিকল এমনি ঘটনা—পুরোহিত কিম্বা কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে অপমান করা একাধিক নীলকর সাহেব সম্বন্ধে শোনা গিয়াছে। কোন এক স্থানে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা যে রামনিধির পুরোহিত সম্পর্কেই—জনপ্রবাদ ছাড়া কোথাও কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না…

সে যাই হোক, লড়াই আচ্ছা রকম জমে গেল—তার পরিচয় তো সর্বত্র ছড়ানো। সারা জেলার মধ্যে যে চাষী যখনই মুশকিলে পড়ত, ছুটে চলে আসত রামনিধির কাছে। অত্যাচারের খবর শুনে শুনে ক্ষেপে গেলেন তিনি। সদরে মামলা করে কতটুকুই বা প্রতিকার হবে, ক-জনের তাগত আছে সদর অবধি হাজির হবার। ওকালতি ছেড়ে সদরের বাসা গুটিয়ে তিনি গাঁয়ে চলে গেছেন। বিধবা মা, স্ত্রী, ভাই-ভাইপো, নিজের দুই ছেলে, এক মেয়ে, এত পশার-প্রতিপত্তি, এক রকম বিনা চেষ্টায় জোয়ারের জলের মতো বিপুল অর্থাগম—কোন-কিছুই আটকে রাখতে পারল না তাঁকে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছেন। কী বীভৎস চেহারা হয়েছিল শেষ অবধি! বড় বড় চুলদাড়ি, ময়লা শতছিন্ন কাপড়। কে বলবে ইনিই রামনিধি সরকার, একদিন সদরের অত বড় উকিল ছিলেন। সত্যি সত্যি ক্ষেপে যাওয়া যাকে বলে। অঞ্চলসুদ্ধ সকলে সেই রকম ভেবে নিয়েছিল। বাড়ির লোকজন তো বটেই। বাড়ির কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কান্নাকাটি হাত-পা ধরাধরি—শেষটা গালি-গালাজ, যাচ্ছেতাই অপমান। এই জন্য নিজের গাঁয়ে এসে ভদ্রপাড়ায় ঢুকতেন না তিনি, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতেন।

ফাঁসি হল এই রামনিধির। কুসুমপুর কুঠিতে আগুন দিয়েছিল, একটা সাদা সাহেব পুড়ে মরেছিল। তার বদলি একগণ্ডা নেটিভের প্রাণ তো চাই। সাক্ষী সাজিয়ে প্রমাণ করে দিল, রামনিধি নিজ হাতে সাহেবটাকে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। বিচারান্তে ফাঁসি। এতকাল বাদে বিশ্বেশ্বর প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে দেখালেন, রামনিধি সে রাত্রে বন্ধু কাশীশ্বরের কলকাতার বাড়ি রয়েছেন। নির্ভুল তাঁর সিদ্ধান্ত। রামনিধিকে সাহেবরা হত্যা করেছে বিচারের ছলনা করে।

হত্যা এই একটিমাত্র নয়—আরো একটা আছে। বদলি ঠিক একগণ্ডা না হোক, একজোড়া হয়েছে। আর যাঁকে মারল, তিনি হলেন রামনিধির অভিন্নহৃদয় বন্ধু কাশীশ্বর। রামনিধির ফাঁসি নিয়ে বিস্তর হৈ-চৈ হয়েছিল, কাশীশ্বরকে তাই আর আদালতে দাঁড় করাতে সাহস করে নি। নেমন্তন্ন খেয়ে কাশীশ্বর গঙ্গার ধারে ধারে ঘোড়ার গাড়িতে ফিরছেন। পরদিন দেখা গেল, চাঁদপাল-ঘাটের পাশে মরে পড়ে আছেন তিনি। পিটিয়ে শেষ করেছে। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানকে জেরা করে বেরুল, মুখোস-পরা জন পাঁচ-ছয় মানুষ গাড়ি আটকে গাদা-বন্দুক তাক করল; গাড়োয়ান অমনি কোচবাক্স থেকে লাফিয়ে পড়ে দে ছুট। কিসে কি হল, কিছুই সে বলতে পারে না।

সে না পারুক, বিশ্বেশ্বর এত কাল পরে সবিস্তারে বলেছেন তাঁর বইয়ে। পুরানো কাগজপত্র ঘেঁটে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা উত্তমরূপ হিসাবপত্র করে, নানাবিধ পরোক্ষ প্রমাণের বিচারে শেষ অবধি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন, নীলকর সাহেবরাই লোক লাগিয়ে কাশীশ্বরকে চুপিসারে হত্যা করেছে। এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। রামনিধির ফাঁসির কথায় আজও লোকের চোখ সজল হয়ে ওঠে—রামনিধি নামের কত ইজ্জত! অথচ, দেখ, কাশীশ্বর রায় ঠিক একই ব্যাপারে প্রাণ দিলেন—বঙ্গবাসী কেউ কোন খবর রাখে না। সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হল এতকাল পরে 'ভারতে ইংরাজ' বইয়ে। বিশ্বেশ্বর বাঙালি জাতির কলঙ্ক-মোচন করলেন।

ক্রমশঃ
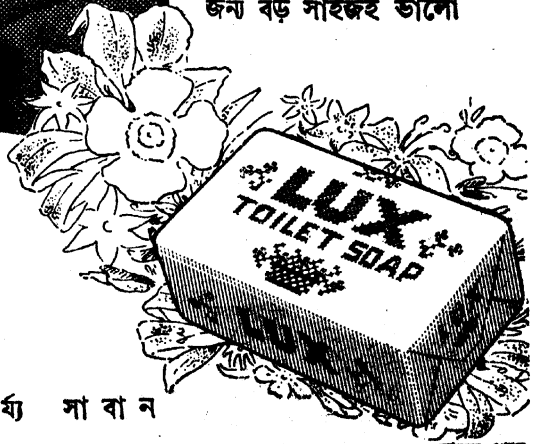
প্যাট ও পীঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

অষ্টম বার্ষিক স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস, এই প্রদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট গুণীর সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেন। এই ধরণের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন, সম্পূর্ণ নূতন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী গুণীজন-সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়া সত্যই একটী প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন। দেশকর্ম্মী, পণ্ডিত, শিল্পী, খেলোয়াড়,

এম. কে. জি প্রোডাক্সনের মুক্তি প্রতিক্ষিত 'ব্রতচারিণী' কথাচিত্রের একটি দৃশ্যে শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী ও মলিনা দেবী

সঙ্গীতজ্ঞ, কবি সাহিত্যিক প্রভৃতি সকল বিভাগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মাল্য-চন্দনে ভূষিত করিয়া তাঁহাদের স্বীয় প্রতিভার স্বীকৃতি দানই এই অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সে উদ্দেশ্য সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য-লাভ করিয়াছে। এই গুণীজন-সম্বর্দ্ধনায় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও নাট্টাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিনের বয়স বর্ত্তমানে ৮৭ বৎসর। তিনি সারা জীবন সুরের মায়াজাল বিস্তার করিয়া সেই সুর-সমুদ্রে ডুবিয়া আছেন। নৃত্য-শিল্পী উদয়শঙ্করের সহিত তিনি সারা ইয়োরোপ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন ও ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের কি অপূর্ব্ব তান-লয়-মান এবং বহু বিচিত্র সুরারোপের কি অসীম ক্ষমতা তাহা দেখাইয়া তিনি ও দেশ-বাসীকে চমৎকৃত করিয়া আসিয়াছেন। নাট্যাচার্য্য শিশির-কুমার অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিয়া যেদিন নাট্যালয় গড়িয়া তোলেন, সেদিন বাংলার নাট্যশালার বড়ই দুর্দ্দিন। এই দুর্দ্দিনে শিশিরকুমার আসিয়া মৃতকল্প নাট্যশালাকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। নাটকের প্রয়োগ নৈপুণ্যে নূতনের ছাপ অভিনয়ে নূতনত্বের ইঙ্গিত, যাহা সমগ্র দেশবাসীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিল। সঙ্গে সঙ্গে নাটকের রূপেরও পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। শিশিরকুমারের শিক্ষায় বহু নূতন নট-নটীর আবির্ভাব ঘটিল। যাহার ফলে বাংলার নাটমঞ্চ নবরূপে, নবভাবে অনুপ্রাণিত হইল। শিশিরকুমারের এই অসামান্য দানে বাংলার নাট্যশালা যে পুষ্টিলাভ করিয়াছে তাহার স্বীকৃতিতে সত্যিই আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ওস্তাদ আলাউদ্দিন ও নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার দীর্ঘজীবন লাভ করুন এই প্রার্থনা করি।

* * * *

কলিকাতা মেট্রো সিনেমার ভূতপূর্ব্ব জেনারেল ম্যানেজার মিঃ বেন, এম্, কন সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে মিঃ কন হলিউডের ইউনিভার্সাল চিত্র প্রতিষ্ঠানের বিজিনেস্ ম্যানেজার। ইউনিভার্সাল পৃথিবীর মধ্যে একটি অন্যতম বৃহৎ চিত্র-প্রতিষ্ঠান। এখানে এক প্রীতি সম্মেলনে কয়েকজন চিত্র ব্যবসায়ী ও চিত্র সাংবাদিকদের নিকট বলেন —আমেরিকায় চিত্র ব্যবসা বেশ ভালই চলিতেছে। তিনি যে প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, সেই ইউনিভার্সাল ফিল্মস্-এর উল্লেখ করিয়া বলেন—দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের বার্ষিক আদায় ছিল—৫ কোটী ডলার, গত বৎসর উহা ৮ কোটী ডলার হইয়াছে। তিনি জানান যে, ইউনিভার্সাল ফিল্মস্ বিভিন্ন রুচির দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য
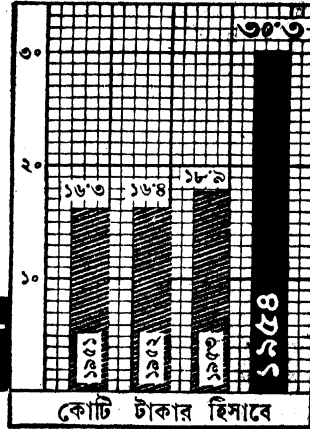
বিভিন্ন প্রকার ছবি তুলিয়া থাকেন। এই কারণে সারা পৃথিবীতে ইউনিভার্সালের ছবির চাহিদা আছে।

*   *   *   *

সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে পাক-ভারত চিত্র-ব্যবসা সম্পর্কে এক চুক্তি হইয়া গিয়াছে। ফিল্ম ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ার কার্য্যকরী পরিষদ তাহা অনুমোদন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ফিল্ম ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীএম্, এস্, ভাসন এতদ্ সম্পর্কে বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিষ্ট এ্যাসোসিয়েসনের সদস্যদের সহিত এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন—যে সকল সর্ত্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক না হলেও উভয় দেশের মধ্যে চিত্র ব্যবসায়ের যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা দূরীভূত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব্ব পাকিস্থানে বৎসরে চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে দশখানি বাংলা ছবি ভারত হইতে গ্রহণ করা হইবে।

এম. সি. প্রোডাকসনের 'সাগরিকা' ছবির এক আবেগ-মধুর দৃশ্য। এখানে দেখা যাচ্ছে—সুচিত্রা, উত্তম, পাহাড়ী ও জীবেন বসু। মুক্তি প্রতীক্ষিত এ ছবিটির কাজ অগ্রগামী পরিচালকবৃন্দ শেষ করে ফেলেছেন

*   *   *   *

ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার উদ্যোগে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের সুবর্ণ জয়ন্তী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে। বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের আয়োজন না করিয়া বোম্বাইতে বিরাট ভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে।

*   *   *   *

নিউ থিয়েটার্স'এর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারকে চেয়ারম্যান করিয়া চিত্র-শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট পাঁচজনকে লইয়া যে কমিটী গঠন করিয়াছেন, তাহার সম্প্রতি একটি অধিবেশন কলিকাতায় হইয়া গিয়াছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কোথায় খোলা হইবে এবং শিক্ষাপদ্ধতি কি হইবে এতদ্ সম্পর্কে কলিকাতার কয়েকজন কলাকুশলীদের সহিত কমিশন আলোচনা করেন। এর পরবর্ত্তী অধিবেশন মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হইবে।

*   *   *

চলচ্চিত্রের ওপরে কপিরাইট্ আইন যাহা গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি বিধিবদ্ধ করিতে চলিয়াছেন, ফিল্ম ফেডারেশন তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। ছবির কোন অংশ-বিশেষের উপর এই আইন প্রযুক্ত না হইয়া সমগ্রভাবে প্রযুক্ত হয়, ইহাই ফেডারেশনের ইচ্ছা। যে কপিরাইট আইন এ দেশে প্রচলিত আছে তাহা এ দেশে যখন প্রয়োগ করা হয় তখন আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের কোন অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং কপিরাইট আইন দেশী-বিদেশী সকল ছবির উপরই প্রযুক্ত হইতে পারে এমন ভাবে বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত।

*   *   *   *

এইচ্, এন্, সি প্রোডাক্সনের "কঙ্কাবতীর ঘাট" সম্প্রতি রূপবাণী, ভারতী ও অরুণায় মুক্তিলাভ করিয়াছে। 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাট্যকার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্তের একটি মঞ্চ-সাফল্য নাটক। অধুনালুপ্ত নাট্য-ভারতীতে এই

নাটক যখন মঞ্চস্থ হয়, তখন ইহার যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল। কাহিনীতে নাটকীয় সংঘাত অপেক্ষা আবেদন থাকায় সহজেই দর্শককে আপ্লুত করে। আজকের সমাজে সতী 'কঙ্কাবতীর ঘাটে'র মাহাত্ম্য মূল্যহীন হইলেও—সতী-সাবিত্রীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এদেশের প্রতিটী পরিবার অনুসরণ করিয়া চলেন। সনাতন যে সমাজ, সে সমাজমনের আজ আর বহিপ্রকাশ না থাকিলেও কার্য্যক্ষেত্রে সেই সমাজমনই স্বীয় আসন করিয়া লয় এবং সমস্ত অন্তরকে জুড়িয়া থাকে। ফলে, বাহিরের কথা ও ভিতরের কাজ অনেক সময় আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। একথা সত্য না হইলে চলচ্চিত্রায়িত 'কঙ্কাবতীর ঘাটের' এ সমাদর কখনই সম্ভব হইত না। চিত্র ও শব্দ গ্রহণ এবং পরিচালনা

এইচ. এন. সি প্রোডাকসনের 'কঙ্কাবতীর ঘাটের একটি দৃশ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী'ও চন্দ্রাবতী

সাধারণ স্তরের। সঙ্গীতাংশ অমুল্লেখ্য। তথাপি চিত্র-নাট্যকার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মূল নাটককে অনুসরণ করিয়া মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য মঞ্চ-নাটক ও চিত্র-নাটক সাজানর মধ্যে পার্থক্য আছে এবং এই উভয়বিধ নাট্য: রচনার মধ্যে মধ্যে একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি আছে। নাটকের প্রয়োজন অনুসারে ঘটনার মধ্যেও অনেক সময় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হয়, তথাপি একটি সম্পূর্ণ নূতন কাহিনীকে চিত্ররূপ দেওয়া অপেক্ষা, সর্ব্বজনসমাদৃত কোন কাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়ার দায়িত্ব সমধিক। কেননা পুরাতন কাহিনী তুলনামূলক বিচারে টিঁকিতে না পারিলে তাহার সাফল্য লাভ করা সুকঠিন। কিন্তু দর্শক সাধারণের এই বিচারে 'কঙ্কাবতীর ঘাট' উত্তীর্ণ হইয়াছে—ইহাই সবচেয়ে আনন্দের কথা। পরিচালক চিত্ত বসু কোন মারপ্যাচের মধ্যে না যাইয়া নাটককে অতি সাধারণভাবে পরিণতির পথে আগাইয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী ইতিপূর্ব্বে মিঃ মুখার্জ্জির ভূমিকায় মঞ্চাভিনয়ে যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আলোচ্য চিত্রে সে খ্যাতি শুধু অক্ষুণ্ণ আছে বলিলেই চলিবে না—বরং অভিনয় মাধুর্য্যে তাহা মধুরতর হইয়া

সানরাইজের আসন্ন 'দেবী মালিনী' ছবির একটি নাটকীয় দৃশ্যে— কাবেরী বসু ও বসন্ত চৌধুরী

উঠিয়াছে। শ্রীমতী সন্ধ্যারাণীকে কলেজের মেয়ে বলিয়া স্বীকার করিতে অন্ততঃ আজকের দিনে বড়ই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। অবশ্য বি-টি কলেজের ছাত্রী হইলে সেকথা স্বতন্ত্র। তবে তিনি অভিনয় গুণে দর্শক-চিত্ত জয় করিয়াছেন। ইহার পরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করিয়াছেন বংশীর ভূমিকায় অনুপকুমার। অন্যান্য ভূমিকায় উত্তমকুমার, কমল মিত্র, শ্যাম লাহা যথাযথ অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর চামেলীর অভিনয় আমাদের মনে আদৌ রেখাপাত করিতে পারে নাই। অন্যান্য ভূমিকাগুলি যথাযথ।

* * * *

মণিশঙ্করের ছাত্রী ১১ বৎসর বয়স্কা কুমারী ব্রততী মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী উৎসবে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সম্বর্দ্ধনা দিবসে ৪৫ মিনিটব্যাপী নৃত্য প্রদর্শন দ্বারা উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে। এই ছবিখানিতে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীউদয়শঙ্কর, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রভৃতি যাঁহারা বিশেষভাবে প্রশংসা করেন তাঁহাদের সহিত কুমারী ব্রততীকে দেখা যাইতেছে। কুমারী ব্রততী শৈশবকাল হইতেই নৃত্যকুশলী এবং পূর্ব্বেই নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন, তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন, নিখিল ভারত মণিমেলা মহাসম্মেলন প্রভৃতিতে উচ্চাঙ্গের নৃত্য প্রদর্শন দ্বারা সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। ইহা ছাড়াও সে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের একজন সুষ্ঠু ও নিয়মিত শিল্পী।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ, সুরশিল্পী আলাউদ্দীন ও নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর সহ কুমারী ব্রততী মুখোপাধ্যায় ফটো—সুনীল ঘোষ

মরু-মানবী

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

না থাক কথার বৃষ্টি, দৃষ্টির দীনতা তবু নয় ;
রুক্ষতার ধূধু মরু আপাত রম্য সে বহ্নিময়।
প্রাণতৃষ্ণা সুগভীর তার দুটি চোখের তারায়,
মুহূর্ত-চেতনা কত জ্বলে জ্বলে ঔজ্জ্বল্য হারায়।
আমিও হারাই দিশা সে গৈরিক দীপ্ত তন্বতীরে,
তবু কী সম্মোহ নিয়ে বাতিঘর ভেবে আসি ফিরে
সন্ধ্যায় করুণ ক্লান্ত—দেখি, তার সব আছে, সেই
নির্জন ছায়ার মায়া হৃদয়ের কোনো স্পন্দ নেই।
সে মরু—মানবী তবু। মরুর মতই বুঝি সেও
ছিলো না আজন্ম রুক্ষ, বুকে তার ভেঙেছিলো ঢেউ—
কামনার। মেঘের ছলনা আর নদীর বঞ্চনা
মরু জানে, এ-মানবী বেদনায় ছিলো অন্যমনা।
সময় নিয়েছে সব—লাবণ্য ভঙ্গিমা লাস্য তার ;
বিপ্রলব্ধ নারী চিত্তে আছে লাভাস্রোত হাহাকার।

স্বাধীনতা উৎসবে গুণীজন সম্বর্দ্ধনা—

এ বৎসর স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় ৬ দিন ৬জন গুণী ব্যক্তিকে সভাপতির আসন দান করিয়া সম্মানিত করা হয়। সম্বর্দ্ধিত ৭জন ছিলেন—(১) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (২) ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ (৩) শ্রীতেনজিং

গত ১৫ই আগষ্ট দিল্লীর লাল কেল্লায় পতাকা উত্তোলন উৎসবে বিপুল জনতার সম্মুখে শ্রীনেহরুর ভাষণ

১৫ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতা উৎসবে সমবেত সুধীবৃন্দ ফটো—শ্রীসুজিত মিত্র

নোরগে (৪) শিল্পী শ্রীযামিনী রায় (৫) অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (৬) কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ও (৭) নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী। ৬জন সভাপতি ছিলেন—(১) নৃত্য শিল্পী শ্রীউদয়শঙ্কর (২) খেলোয়াড় শ্রী গোষ্ঠ পাল (৩) শিল্প-সমালোচক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (৪) অধ্যাপক শ্রী সতীশচন্দ্র ঘোষ (৫) সাহিত্যিক শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও (৬) বাঙ্গালার কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ৭ দিন ধরিয়া ৭জন গুণী সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন—দ্বিতীয় দিন হইতে নটসূর্য্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী। বাঁকুড়া কংগ্রেসও ২জন বঙ্গবিখ্যাত ব্যক্তির সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন (১) খ্যাতনামা পণ্ডিত ৯৬ বৎসর বয়স্ক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ও (২) সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীগোপেশ্বর

বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেস যে শুধু রাজনীতি আলোচনা লইয়া কর্তব্য শেষ করেন না, দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনায় সর্বতোমুখী প্রতিভার উৎসাহ দান কংগ্রেসের যে প্রধান কাজ, তাহাই স্বাধীন দেশে প্রমাণিত হইল। সমাজের বহু স্তরে বহু ব্যক্তি নিজ নিজ সাধনা লইয়া আজীবন কর্মে নিযুক্ত আছেন; আমাদের বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে সেই সকল নিঃস্বার্থ ও নীরব কর্মীদের উপযুক্ত সম্মান দান করিয়া আমরা দেশকে গৌরবের পথে অগ্রসর করিতে সমর্থ হইব। আমরা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে তাঁহাদের এই কার্য্যের জন্য অভিনন্দিত করি।

বিধানচন্দ্র রায় সংবর্ধনা ফটো—শ্রীসুজিত মিত্র

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী গত স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে বাংলার কৃতী মনীষীদের সম্মানিত করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা দিবসে অর্থাৎ ১৫ই আগষ্ট প্রথম তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে সম্বর্দ্ধনা করিয়া সপ্তাহব্যাপী সম্বর্দ্ধনা-উৎসবের উদ্বোধন করেন। ঐ দিন ডাক্তার রায়কে তাঁহার জীবনী গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়। জীবনী গ্রন্থ লিখিয়াছেন—খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীকে-পি-টমাস—উহা ইংরাজিতে লিখিত ও মূল্য ১০ টাকা। নবনির্মিত বিরাট মণ্ডপে সেদিন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না, শ্রম-মন্ত্রী শ্রীখান্দুভাই দেশাই, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ দেশবাসীর পক্ষ হইতে উৎসব পরিচালনা করেন। সেদিনের উৎসব সর্ব-প্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন সম্বর্দ্ধনা—

১৮ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ আলাউদ্দীন খাঁ'কে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী শ্রীউদয়শঙ্কর সে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রারম্ভে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ওস্তাদ আলাউদ্দীন ও শ্রীউদয়শঙ্করের বিরাট খ্যাতি ও অবদানের কথা বর্ণনা করেন। ওস্তাদ আলাউদ্দীনের মত যন্ত্র-সঙ্গীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ যুগে অতি বিরল। উদয়-

সুরশিল্পী আলাউদ্দীন সংবর্ধনা ফটো—শ্রীসুজিত মিত্র

শঙ্করের নৃত্যশিল্প ত শুধু ভারতে নহে—সমগ্র বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

শ্রীতেনজিং নোরগে সম্বর্দ্ধনা—

১৯শে আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এভারেষ্ট বিজয়ী শ্রীতেনজিং নোরগেকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীগোষ্ঠ পাল সেই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম ঐ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীতেনজিংয়ের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করেন। সভাপতি শ্রীগোষ্ঠ পাল বলেন—লেখাপড়া না জানিলেও সাধনা দ্বারা যে মহৎকাজ করা যায়, তেনজিং তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তেনজিং নোরগে সংবর্ধনা ফটো—শ্রীসুজিত মিত্র

শিল্পী শ্রীযামিনী রায়—

২০শে আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের বিশেষভাবে নির্মিত মণ্ডলে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী শ্রীযামিনী রায়কে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। প্রবীণ শিল্প-সমালোচক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। শ্রীরায়ের বয়স ৬৮ বৎসর—তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি উৎসবে কোন কথা বলিতে পারেন নাই। তাঁহাকে গরদের জোড় ও হস্তীদন্তের একটি অশোক স্তম্ভ উপহার দেওয়া হয়। যামিনীবাবু কালীঘাটের পটুয়াদের পদ্ধতিকে নবরূপ দান করিয়া মর্য্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার মহৎ কৃতিত্ব।

শিল্পী যামিনী রায় সংবর্ধনা ফটো—শ্রীসুজিত মিত্র

অধ্যাপক সুনীতি-কুমার সম্বর্দ্ধনা—
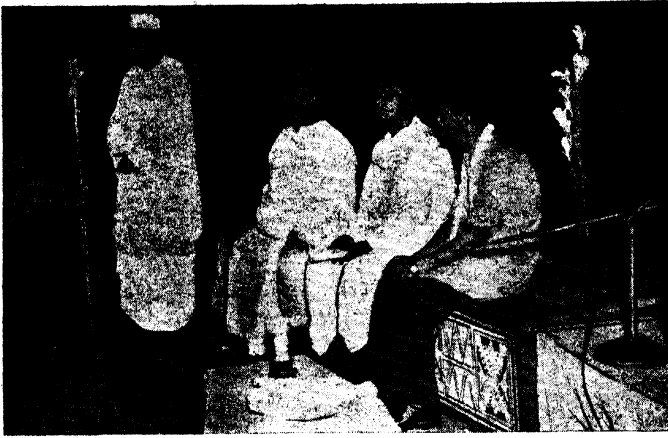
২১শে আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যায় স্বাধীনতা উৎসব উপ-

লক্ষে প্রদেশ কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা কোবিদ, ভাষা-তত্ত্ববিদ ও অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনা করেন—সে উৎসবে সভাপতিত্ব করেন কলিকাতার মেয়র অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ। সতীশবাবু তাঁহার ভাষণে গত ৪০ বৎসর কাল অধ্যাপক সুনীতিকুমারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা বিবৃত করেন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়কে হস্তীদন্ত নির্মিত অশোক স্তম্ভ উপহার দেওয়া হয়।

প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংবর্ধনা ফটো—শ্রীসুজিত মিত্র

কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক—

২২শে আগষ্ট সোমবার কলিকাতা চৌরঙ্গীর নবনির্মিত

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক সংবর্ধনা ফটো—শ্রীসুজিত মিত্র

মণ্ডপে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পল্লীর দরদী কবি, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিককে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। খ্যাতনামা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিনের উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। গরদের জোড় ও হস্তিদন্তের অশোক স্তম্ভ দিয়া কবিকে বরণ করা হয়। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ কবির পল্লী-প্রীতির বিশেষ প্রশংসা করেন। কবি কুমুদরঞ্জন বর্ত্তমান যুগেও সহরের সকল আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে বাস করেন—ইহাই তাঁহার জীবন ও সাধনার বৈশিষ্ট্য।

নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী—

গত ২৩শে আগষ্ট মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। নটসূর্য্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী সেদিনের উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। অহীন্দ্রবাবু দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে হস্তিদন্ত নির্মিত এক অশোক স্তম্ভ দান করিলে শিশিরবাবু সভাপতিকে সস্নেহে আলিঙ্গন করেন। সেই দিন কংগ্রেসের গুণীজনসম্বর্দ্ধনা শেষ হয়—কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেন—কয়দিনে ১৩জন বঙ্গরত্নকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বঙ্গবাসী ধন্য হইয়াছে।

নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী সংবর্ধনা ফটো—শ্রীসুজিত মিত্র

খেলোয়াড় শ্রীগোষ্ঠ পাল—

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত গুণীজন সম্বর্দ্ধনার পর গত ২৪শে আগষ্ট বুধবার চৌরঙ্গীস্থিত বিশেষ মণ্ডপে গোষ্ঠ পাল অভিনন্দন সমিতির পক্ষ হইতে জনপ্রিয় খেলেয়াড় শ্রীগোষ্ঠ পালকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ সে উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। ঐ দিন গোষ্ঠ পালকে রৌপ্যাধারে এক অভিনন্দন পত্র ও ৫ হাজার টাকার এক থলি উপহার দেওয়া হয়। ফুটবল খেলোয়াড় রূপে গোষ্ঠ পাল ভারতের, এমন কি বিশ্বের ক্রীড়াজগতে যে বাংলার গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেদিন উপস্থিত সকলে সেই কথার স্মরণ করেন।

বাঁকুড়ায় গুণী সম্বর্দ্ধনা—

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের মত বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস স্বাধীনতা দিবস উৎসব উপলক্ষে গত ১৬ই আগষ্ট ৯৬ বৎসর বয়স্ক সুবিখ্যাত ভাষাবিদ্ পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়কে ও ১৭ই আগষ্ট বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রথম দিনের সভায় শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা ও দ্বিতীয় দিনের সভায় রেভারেণ্ড সি-সি পাণ্ডে পৌরোহিত্য করিয়াছেন। গোপেশ্বরবাবুর বয়স ৭৬ বৎসর। উভয় গুণীকে একখানি করিয়া মানপত্র দেওয়া হয়। এই ভাবে গুণী সম্বর্দ্ধনা দেশবাসীর মনে নূতন প্রেরণা ও চিন্তাধারা প্রবর্তন করিবে।

খড়দহ মণ্ডলে সম্বর্দ্ধনা—

খড়দহ (২৪পরগণা) মণ্ডল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে গত ২০শে আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যায় পানিহাটী ত্রাণনাথ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মণ্ডলের কৃতী ৩ জন অধিবাসীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সোদপুরের শ্রীবিভূতিকুমার মুখোপাধ্যায় তথায় সভাপতিত্ব করেন। (১) খড়দহ কুলীনপাড়ার প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শ্রীশিরীষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২) রহড়া শান্তিনগরের শিক্ষাব্রতী শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও (৩) ঘোলার খ্যাতনামা সমাজ-সেবক শ্রীসুনীতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল সংবর্ধনা ফটো—শ্রীসুজিত সেন

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সম্মানসূচক 'লাঠি' উপহার লাভ করেন।

শ্রীসুকুমার সেন সম্মানিত—

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন চিফ সেক্রেটারী, বর্তমানে ভারতের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিশনার শ্রীসুকুমার সেন আই-সি-এস সুদানে নির্বাচন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম-নৈপুণ্যে প্রীত হইয়া সুদান সরকার রাজধানী খারতুমের পার্লামেণ্ট ভবনের সম্মুখ হইতে ওমদুরমান পর্য্যন্ত রাজপথ 'সুকুমার সেন রোড' নাম দিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। বিদেশে একজন বাঙ্গালী গুণীর সমাদর—বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের কথা।

১৫ই আগষ্ট গান্ধীঘাটে রাজ্যপাল কর্তৃক মাল্যদান ফটো—তারক দাস

সরকারী সম্মান দান—

গত ৭ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে রাষ্ট্রপতিভবনে এক অভিষেক উৎসবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুকে 'ভারত-রত্ন' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে। ঐ সঙ্গে বিশিষ্ট এঞ্জিনিয়ার ও শিল্পপতি শ্রীএম বিশ্বেশ্বরায়া ও কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার ভগবান দাসকেও 'ভারতরত্ন' করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা কোবিদ অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ উৎসবে 'পদ্মভূষণ' সম্মান লাভ করিয়াছেন। সমাজ উন্নয়ম পরিকল্পনা সংস্থার শ্রী এস-কে-দেও 'পদ্মভূষণ' লাভ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের কেহই পদ্মশ্রী সম্মান লাভ করেন নাই। আমরা অধ্যাপক সুনীতিকুমার ও চিকিৎসক ললিতমোহনের এই সম্মান লাভে তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করি এবং তাঁহাদের সম্মান লাভ বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি।

প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রীর কৃতিত্ব—

কুমারী স্মিতা নিয়োগী এই বৎসর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এস-সি অনার্স পরীক্ষায় রসায়ন শাস্ত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি এখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সি ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। তিনি আই-এস-সি পরীক্ষাতেও উত্তর-

কুমারী স্মিতা নিয়োগী

প্রদেশ ইণ্টারবোর্ডে ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন। কুমারী স্মিতা দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ের মুখ্যবাস্তুকার (চীফ ইঞ্জিনিয়র) শ্রীপ্রভাতচন্দ্র নিয়োগীর কন্যা এবং বাংলার জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী সমূহের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার স্বর্গীয় নরেন্দ্রকুমার মজুমদারের দৌহিত্রী। আমরা কুমারী স্মিতার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

পূর্ববঙ্গে তিনজন হিন্দু মন্ত্রী—

৬ই সেপ্টেম্বর পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ আবুহোসেন সরকার মন্ত্রিসভায় নূতন ১০জন সদস্য গ্রহণ করিয়াছেন—পূর্বে গৃহীত ৫ জন মন্ত্রী লইয়া এখন মন্ত্রী-সভার সদস্য সংখ্যা হইল ১৫ জন। জাতীয় কংগ্রেস দল হইতে শ্রীবসন্তকুমার দাস ও শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার মন্ত্রী হইয়াছেন এবং তপশীল ফেডারেশনের সদস্য শ্রীমধুসূদন সরকারকে মন্ত্রীকরা হইয়াছে। প্রকাশ ঢাকা জেলা হইতে

আরও ২ জন মন্ত্রী গ্রহণ করা হইবে। মিঃ আবুহোসেন সরকার রঙ্গপুরের অধিবাসী এবং জাতীয়তাবাদী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি ৩জন হিন্দুকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করায় পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মনোভাবের পরিবর্তন হইবে এবং আমাদের বিশ্বাস, নূতন হিন্দু মন্ত্রীরা পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের নূতন আশা ভরসা দিতে সমর্থ হইবেন।

কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটী—

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত কয়জন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন সমিতির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন—(১) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী (২) শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী (৩) শ্রীকামরাজ নাদর (৪) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও (৫) শ্রীইউ-এস মালিয়া।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার সংবর্ধনায় সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ

ফটো—তারক দাস

মহাবলীপুরমে বাঙালী সাংবাদিকগণ

ফটো—তারক দাস

কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের নিম্নলিখিত ৬জন সদস্যও উক্ত কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটীর সদস্য আছেন—(১)শ্রীইউ-এন ডেবর (২) শ্রীজহরলাল নেহরু(৩)পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ(৪)মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (৫) শ্রীমোরারজী দেশাই ও (৬) শ্রীজগজীবন রাম। ১১ জন সদস্য লইয়া গঠিত এই কমিটী ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসপ্রার্থী মনোনীত করিবেন ও নির্বাচন কার্য্য পরিচালনা করিবেন। কংগ্রেসের আগামী নির্বাচন সংক্রান্ত কার্য্য এই ভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে।

অর্থাভাবের জন্যই কর্ত্তৃপক্ষ আগ্রহ থাকিলেও এতদিন ডিগ্রি ক্লাস খুলিতে পারেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে বিগত কয়েক বৎসরে পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কলেজে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা এখন ক্রমবর্দ্ধমান এবং এই সঙ্গে উন্নত পঠন-পাঠনের জন্য কলেজের সুনাম বর্ত্তমানে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। অধ্যক্ষ শ্রীকিরণচন্দ্র গুপ্ত, সহ-অধ্যক্ষ শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় এবং সুযোগ্য অধ্যাপকবৃন্দের সহযোগিতায় কলেজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে সর্ব্বদাই সচেষ্ট আছেন। এই বৎসর

গত জন্মাষ্টমিতে দক্ষিণ কলিকাতা দেশপ্রিয় পার্কে ধর্ম-সম্মেলন। ছবিতে ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ প্রভৃতিকে দেখা যাইতেছে

উত্তর পাড়ার কলেজের অগ্রগতি—

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উত্তরপাড়া কলেজের (বর্ত্তমান নাম রাজা প্যারীমোহন কলেজ) সাম্প্রতিক অগ্রগতিতে শিক্ষানুরাগী সকলেই সন্তোষলাভ করিবেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত এই কলেজটি দীর্ঘকাল নানা অসুবিধার ভিতর দিয়া স্থানীয় জমিদারবর্গের অর্থানুকূল্যে কোনক্রমে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, হইতে উত্তরপাড়া কলেজে বি-এ ক্লাস খোলা হইয়াছে এবং আগামী বৎসর হইতে বি-এস-সি ক্লাস খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এতদুদ্দেশ্যে কলেজ ভবনটি বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বি-এস-সি ও বি-কম ক্লাস খোলা হইলে প্রভূত সম্ভাবনাময় এই কলেজটি শিক্ষা সংক্রান্ত সকল অভাব মিটাইয়া স্থানীয় জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ডেভিস কাপ ঃ

১৯৫৫ সালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়া ৫-০ খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত ক'রে ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে। ডেভিস কাপের খেলা সুরু হয়েছে ১৯০০ সালে অর্থাৎ ৫৫ বছর আগে। হিসাব অনুযায়ী ৫৫ বছর খেলা হওয়ার মনে করা হয়। পৃথিবীর লন্ টেনিস ক্রীড়ারত দেশগুলি এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে থাকে; শুধু ডেভিস কাপ খেলায় যোগদান করাটাই খেলোয়াড়-জীবনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য মনে করা হয়; এমনই এই প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক খ্যাতি।

সুদীর্ঘকালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে

১৯৫৫ সালের লীগ বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাব

ফটো ঃ ডি রতন

কথা, কিন্তু ১৯০১ ও ১৯১০ সালে এবং বিশ্বযুদ্ধের দরুণ ১৯১৫-১৯১৮ এবং ১৯৪০-৪৫ সাল পর্য্যন্ত ডেভিস কাপের কোন খেলা হয় নি। অর্থাৎ ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ৫৫ বছরের ইতিহাসে ১২ বছর খেলা বাদ পড়েছে। লন্ টেনিস খেলায় বিশ্ব প্রতিযোগিতা না থাকার দরুণ ডেভিস কাপ জয়লাভের সম্মান বিশ্ব-জয়লাভের সমান গুরুত্বপূর্ণ মাত্র এই চারটি দেশ ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে—আমেরিকা ১৭ বার, অষ্ট্রেলিয়া ১২ বার, বৃটেন ৯ বার এবং ফ্রান্স ৬ বার।

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছে এই ৬টি দেশ—আমেরিকা ৩৭ বার, অষ্ট্রেলিয়া ২৪ বার, বৃটেন ১৬ বার, ফ্রান্স ৯ বার, বেলজিয়াম ১ বার এবং জাপান ১ বার।

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ৫টি খেলার (৪টি সিঙ্গলস এবং ১টি ডবলস) ফলাফলের ওপর দলের জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হয় এবং এই প্রতিযোগিতাটি হ'ল পুরুষদের দলগত অনুষ্ঠান।

১৯৩৮-১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত (এরমধ্যে ১৯৪০-১৯৪৫ পর্য্যন্ত খেলা বন্ধ থাকে), এই ১২ বছরের খেলায় আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া এই দুটি দেশই কেবল চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অর্থাৎ ফাইনাল খেলেছে। ফলাফল দাঁড়িয়েছে আমেরিকার জয় ৬ (১৯৩৮, ১৯৪৬-৪৯ এবং ১৯৫৪) এবং অষ্ট্রেলিয়ারও জয় ৬ বার (১৯৩৯, ১৯৫০-১৯৫৩ এবং ১৯৫৫)। এই

সালাম (রাজস্থান)

হিসাব থেকে আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস খেলায় আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার নিরঙ্কুশ একাধিপত্য প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য বছরের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের প্রথম দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়া দুটি সিঙ্গলসে জয়ী হয়ে ২-০ খেলায় অগ্রগামী হয়।

২য় দিনের ডবলসে অষ্ট্রেলিয়ান জুটি জয়ী হ'লে অষ্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ পুনরুদ্ধার করে।

৩য় দিনের দুটি সিঙ্গলসে অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হ'লে ৫টি খেলাতেই অষ্ট্রেলিয়ার জয় হয়।

খেলায় সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

কেন্ রোজওয়াল (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ১০-৮, ৪-৬, ৬-২ গেমে ভিক্ সিক্সাস-কে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

লুই হোড (অষ্ট্রেলিয়া) ৪-৬, ৬-৩, ৬-৩, ৮-৬ গেমে এ বছরের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান টনি ট্রাবার্ট-কে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

লুই হোড এবং রেক্স হার্ট উইগ (অষ্ট্রেলিয়া) ১২-১৪, ৬-৪, ৬-৩, ৩-৬, ৭-৫ গেমে টনি ট্রাবার্ট এবং ভিক্ সিক্সাস-কে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

লুই হোড ৭-৯, ৬-১, ৬-৪, ৬-৪ গেমে ভিক্ সিক্সাস-কে পরাজিত করেন।

সুশান্ত ঘোষ (উয়াড়ী)

কেন্ রোজওয়াল ৬-৪, ৩-৬, ৬-১, ৬-৪ গেমে হ্যামিণ্টন রিচার্ডসন-কে পরাজিত করেন।

ইণ্টার-রেলওয়ে ফুটবল ঃ

ইণ্টার-রেলওয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে সাউদার্ণ রেলওয়ে ২-০ গোলে ওয়েষ্টার্ণ রেলদলকে পরাজিত করেছে।

ইংলিস কাউণ্টি ক্রিকেট ঃ

১৯৫৫ সালের ইংলিস কাউণ্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় সারে ক্রিকেট দল চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এ নিয়ে সারে উপর্য্যুপরি চার বছর চ্যাম্পিয়ান হ'ল। গত

২৫ বছরের খেলার ইতিহাসে উপর্য্যুপরি চার বছর চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ড সারে দল প্রথম করলো।

সার্ভিসেস ফুটবল ঃ

বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত সার্ভিসেস ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় সাউদার্ণ কম্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে।

ইংলণ্ড—দঃ আফ্রিকা টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ইংলণ্ড ঃ ১৫১ (গডার্ড ৩১ রানে ৬ এবং টেফিল্ড ৩৯ রানে ৩ উইকেট) **২০৪** (মে নট আউট ৮৯। টেফিল্ড ৬০ রানে ৬ উইকেট)

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ১১২ (লক্ ৩৯ রানে ৪ উইকেট) ও **১৫১** (ওয়েট ৬০। লেকার ৫৬ রানে ৫ এবং লক্ ৬২ রানে ৪ উইকেট)

খেলার প্রথম দিন বৃষ্টির দরুণ মাত্র আড়াই ঘণ্টা খেলা সম্ভব হয়। ইংলণ্ড ৩ উইকেটে ৭০ রান করে। ২য় দিনে ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস ১৫১ রানে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ১ম ইনিংস ১১২ রানে শেষ হ'লে ইংলণ্ড ৩৯ রানে এগিয়ে যায়। ৩য় দিনে ইংলণ্ড ২য় ইনিংসের খেলায় ৮ উইকেটে ১৯৫ রান করে। ৪র্থ দিনে ইংলণ্ডের ২য় ইনিংস ২০৪ রানে শেষ হয়। হাতে কিছু কম ২ দিনের খেলার সময়—দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে জয়লাভের জন্য ২৪৪ রান প্রয়োজন। আরম্ভটা খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই হ'ল ; কিন্তু ৫৫ মিনিটে ২৮ রান হওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকার দারুণ ভাঙ্গন ধরলো—দশটা বলে মাত্র এক রান উঠে ৩টে উইকেট পড়ে গেল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ৪টে উইকেট হারালো

সনৎ শেঠ (এরিয়ান্স)

সুধীর রায় (ইষ্টবেঙ্গল)

৫ রানের ব্যবধানে। লাঞ্চের সময় রান ছিল ৪ উইকেটে ৫৭। ওয়েট ইংলণ্ডের আক্রমণের বিরুদ্ধে ধীরভাবে খেলে যা কিছু রান করেন। তিনি ৬০ রানে আউট হ'ন। চা-পানের সময় রান হ'ল ৮ উইকেটে ১১৮। চা-পানের কিছু পর দক্ষিণ আফ্রিকার ২য় ইনিংস ১৫১ রানে শেষ হ'লে ইংলণ্ড ৯২ রানে জয়ী হয় এবং 'রাবার' খেতাব লাভ করে। ইংলণ্ড-দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে টেষ্ট খেলা সুরু হয়েছে ১৮৮৮ সালে। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজের ফলাফল ধরে বর্ত্তমানে নিম্নরূপ ফলাফল দাঁড়িয়েছে।

ওভালের ৫ম অর্থাৎ শেষ টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ৯২ রানে দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দলকে পরাজিত ক'রে আলোচ্য টেষ্ট পর্য্যায়ে 'রাবার' জয়ী হয়েছে। টেষ্ট অধ্যায়ের পাঁচটি খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ইংলণ্ডের জয় ৩ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ২।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ইংলণ্ড ১ম ও ২য় টেষ্ট খেলায় জয়ী হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ৩য় ও ৪র্থ টেষ্ট খেলায় জয়ী হ'লে খেলার ফলাফল সমান দাঁড়ায়। ফলে এই ৫ম টেষ্ট খেলার ফলাফলের ওপরই 'রাবার' খেতাব নির্ভর করে।

স্থান	প্রথম খেলা	ইং জয়ী	দঃ আঃ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংলণ্ড	১৯০৭	১৮	৪	১৪	৩৬
দঃ আফ্রিকা	১৮৮৮	২২	১১	১৫	৪৮
খেলার মোট ফলাফল :		৪০	১৫	২৯	৮৪

টেষ্ট সিরিজে 'রাবার' খেতাব লাভের ফলাফল ঃ

মোট সিরিজ ২০টি, ইংলণ্ড জয়ী ১৫টি, দঃ আফ্রিকা জয়ী ৪ এবং সিরিজ অমীমাংসিত ১।

হুইটম্যান কাপ ঃ

পুরুষদের দলগত লন্ টেনিস খেলায় যেমন ডেভিস কাপের আন্তর্জাতিক খ্যাতি তেমনি মহিলাদের দলগত

পি. মজুমদার (এরিয়ান্স)

খেলায় হুইটম্যান কাপের। তবে এ খেলা কেবল ইংলণ্ড এবং আমেরিকা এই দু'দেশের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫ সালের প্রতিযোগিতায় আমেরিকা ৬-১ খেলায় ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছে।

বিশ্ব-যুব ক্রীড়ানুষ্ঠান ঃ

ওয়ারশর সেণ্ট্রাল ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ব-যুব ক্রীড়ানুষ্ঠানে ৪২টি দেশের ৪৬৩১ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। অনুষ্ঠানটি ১৪ দিন স্থায়ী ছিল। ক্রীড়ানুষ্ঠানে নতুন ভাবে ৫টি বিশ্ব-রেকর্ড এবং ২টি ইউরোপীয় রেকর্ড স্থাপিত হয়। বিশ্ব যুব ক্রীড়ানুষ্ঠানকে নিঃসন্দেহে বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যেতে পারে।

নীলু (এরিয়ান্স)

রাশিয়া সর্ব্বাধিকসংখ্যক পদক লাভ ক'রে ১ম স্থান লাভ করেছে। পদকপ্রাপ্ত দেশগুলির নাম এবং সেই সঙ্গে তাদের মোট পদক সংখ্যা দেওয়া হল।

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
রাশিয়া	৬৭	৫১	৪৪	১৬২
পোল্যাণ্ড	২৭	৩১	৩৩	৯১
চেকোশ্লোভাকিয়া	১৫	৩৪	১৯	৬৮

হাঙ্গারী ৫৬, পূর্ব্ব জার্মানী ৩৯, রুমানিয়া ৩৮, বুলগেরিয়া ১৮, ইজিপ্ট ১১, জাপান ৮, অষ্ট্রিয়া ৭, ইরাণ ৬, চীন ৬,

অমল দত্ত (ইষ্টবেঙ্গল)   ফটো : স্বরাজ দাশগুপ্ত

অষ্ট্রেলিয়া ৫, বৃটেন ৪, ফিনল্যাণ্ড ৩, মিক্সিকো ২, ভারতবর্ষ ১ এবং ফ্রান্স ১।

দলগত খেলায় বিজয়ী দেশের নাম ঃ

ফুটবল : রুমানিয়া। হকি : ভারতবর্ষ। ভলিবল : পুরুষ বিভাগে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং মহিলা বিভাগে রাশিয়া। সাইকেল : গ্রেটবৃটেন। ওয়াটার পোলো : হাঙ্গেরী।

নতুন বিশ্ব রেকর্ড

(১) ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ : ১ম লাভরভ (রাশিয়া); সময় ৪ ঘঃ ১৬ মিঃ ৫১.২ সেঃ।

(২) হ্যামার-থ্রো : ক্রিভনোসভ (রাশিয়া); দূরত্ব—৬৫.৩৩ মিটার।

(৩) ভারোত্তোলন (ব্যাণ্টমওয়েট) : ১ম ষ্টেগোভ (রাশিয়া); ওজন ৩২৫ কিলোগ্রাম।

(৪) ১০০ মিটার দৌড় (মহিলা বিভাগ) : শার্লি ষ্ট্রিক্ল্যাণ্ড (অষ্ট্রেলিয়া); সময় ১১.৩ সেঃ।

(৫) ৪০০ মিটার দৌড় (মহিলা বিভাগ) : ১ম ডেনেথ (জার্মানী); সময় ৫৪.৪ সেঃ।

নতুন ইউরোপীয় রেকর্ড

(১) হপ-স্টেপ-জাম্প : ১ম স্কারবাকোভ (রাশিয়া); ১৬.৩৬ মিটার।

(২) ব্রড জাম্প (মহিলা বিভাগ) : ১ম ভিনোগ্রোভোভা (রাশিয়া), দূরত্ব ৬.২৭ মিঃ।

রাশিয়া সফরে ভারতীয় ফুটবল দল ঃ

এ পর্য্যন্ত খেলার ফলাফল—(১) লোকোমোটিম স্পোর্টস ৩ : ভারতবর্ষ ০; (২) ডায়নামো ৬ : ভারতবর্ষ ০; (৩) আর্মেনিয়া সাধারণতন্ত্র ২ : ভারতবর্ষ ২; (৪) ভারতবর্ষ ১ : ওডেসা ০।

সন্তরণে ইংলিস চ্যানেল পারাপার ঃ

বারটি দেশের ষোলজন সাঁতারু (চারজন মহিলাসহ) এই সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। একমাত্র ভারতীয় সাঁতারু ছিলেন মিহির সেন। মাত্র চারজন পুরুষ সাঁতারু লক্ষ্যস্থলে পৌছাতে সক্ষম হ'ন। ১১½ ঘণ্টা সাঁতার দিয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌছাতে প্রায় ৪ মাইল থাকতে মিহির সেন অবসর গ্রহণ করেন। প্রথমে লক্ষ্যস্থলে পৌছান ইজিপ্টের আব্দেল লতিফ এবু হেফ। ফ্রান্সের উপকূল থেকে ইংলণ্ডের উপকূল—এই ২২ মাইল দূরত্বপথ সন্তরণে অতিক্রম করতে তাঁর ১১ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট সময় লাগে। তিনি প্রথম পুরস্কার পান। ২য় স্থান লাভ করেন ক্যালিফোর্ণিয়ার টম পার্ক; তাঁর সময় লাগে ১২ ঘঃ ২ মিনিট। ৩য় স্থান পান মেক্সিকোর দামিয়ান পিজা বেণ্টন।

পিয়ন

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

কলকাতা এসেই মঞ্জু চিঠি দিয়েছে বিনয়কে।

বিনয় চিঠি পায়নি। পাকিস্থান হওয়ার পর চিঠিপত্র ঠিকমতো বিলি হচ্ছিল না পূর্ববঙ্গে। আরো লিখেছিল এন্‌ভেলপে। সেন্‌সর বিভাগের হাতে পড়ে হয়তো আটক রয়েছিল চিঠিখানা।

দৌলতপুরের বিনয় দাসের স্ত্রী মঞ্জু। বিয়ে হ'য়েছে কয়েক বছর আগে—ছেলেপুলে হয়নি। সংসারে ঘরে-বাইরে ওরাই ছ'জন। বিষয় সম্পত্তিতে বেশ চলছিল সংসার। ছিলও শান্তিতে। কিন্তু বাস্তব দুঃস্বপ্নের মতো পাকিস্থানের নিষ্ঠুর হাত তা'দের শান্তি কেড়ে নিয়ে বসল।

তারা-ঘেরা চাঁদের মতো দৌলতপুর গ্রামের চারপাশে মুসলমান গ্রাম। তবুও জমিদারের প্রতাপে দৌলতপুরের কাছেই মাথা নত করে থাকত তারা। সেলাম দিত ছ'বেলা। পাকিস্থান হওয়ার পর জমিদার গ্রাম ছেড়েছে। অন্য যাদের সামর্থ্য ছিল তারাও ছেড়ে গেছে বাড়ীঘর। যারা নিরুপায় তারাই রয়েছে অপমানে হাজার মরণে মরে। ভয়ে এতোটুকু হ'য়ে গেছে তা'রা। রাতে কেউ বের হয় না ঘর থেকে। বিনা প্রয়োজনেও দিনের বেলা অন্য বাড়ী যায় না কেউ। রাতদিন হ'য়ে গেছে সমান।

পাঠশালা থেকে বিনয়ের বন্ধু করিম। তাই সে করিমকে বলল, এখানে কি আমরা থাকতে পারব ?

—পাকিস্থান পবিত্র স্থান! থাকতে না পারার কি হইছে। হাসতে হাসতে জানাল করিম।

একটু নীচু গলায় বিনয় বলল, যে ভাবে সময় অসময় বাড়ীর আগান-বাগান দিয়ে হাটাহাটি আরম্ভ হ'য়েছে তাতে তো ভয় হওয়ার কথা!

—তোর বউ চুরি হবে না। নিশ্চিন্তে থাক্।

সুরে কাতরতা মিশিয়ে বিনয় আবার বলল, তুই ঠাট্টা মনে করিস না করিম।

—তেমনই যদি বোঝাস্, বৌদিরে আমার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিস্। একটু থেমে করিম যোগ দিল—তুই-ও না হয় সঙ্গে যাইস্।

বিপদের আশঙ্কায় বন্ধুর উপদেশ চেয়েছিল বিনয়। কিন্তু করিম এতটুকু গুরুত্ব না দেওয়ায় আর কথা বাড়াল না সে।

হিন্দুদের কাছে রাতের অন্ধকারও যেন বেড়ে গেছে পাকিস্থানে। তাতে বিনয়ের বাড়ীখানা আবার গ্রামের একপাশে। এক শরিকের বাড়ী। সন্ধ্যার পরেই ঘরে ঘরে পড়ে দুয়ার। কিন্তু দুয়ার দিলেই যদি বিপদ কাটত তবে আর কথা ছিল না। বিনয়ের দালানে লোহার কবাটই বলা যেতে পারে। তবুও রক্ষা পেল কৈ।

রাত গোটা দশের সময় দলটা এসে পড়ল বিনয়ের বাড়ীতে। সঙ্গে বড় বড় মশাল। চারদিকে আলোয় আলোময়—যেন বরযাত্রী আসছে। বিনয়ের বুঝতে আর বাকী রইল না কিছু। ভয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেল মঞ্জু। থর থর করে কাঁপছিল বিনয়। দেয়ালে পেরেকের সঙ্গে টাঙান রাম-দাখানা খুলতেই তা'র সময় লেগে গেল অনেক। শেষ পর্যন্ত খুলতেই পারল না। কুড়ুল দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে তখন এসে পড়েছে ওরা! বন্দী করে ফেল্‌ল বিনয়কে। টাকা-পয়সা সোনা-দানা কিছুই নয়, ডাকাতির একমাত্র লক্ষ্য মঞ্জু।

মঞ্জুর যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন সে একখানি চলমান নৌকায়। চোখ মেলতেই নৌকায় কেরোসিন তেলের প্রদীপে করিমকে দেখে চম্‌কে উঠল সে! বাতাসের আঘাতে নদীর চঞ্চল বুকখানির মতো মঞ্জুর বুকেও তখন প্রবল ঝড়। কোন রকমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বল্‌ল, বড়মিঞা তুমি! আমাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?

—তোমার কোন ভয় নাই বৌদি। আস্তে কথা কও। রাত বেলায় জলের ওপরের কথা অনেক দূরে যায়।

এর চেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে থাকাও ভালো ছিল। মঞ্জু তখন আধ-পাগোলিনী। নৌকার পাটাতনে মাথা কুটে বলতে লাগল, তুমি আমার ধর্মের ভাই বড় মিঞা!—বল কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—তুমি অস্থির হইও না। আমারে বিশ্বাস করো। এতদিন তো গ্যাখ্‌ছো আমারে। সব কথাই তোমারে খুইল্যা কব।

—বল তবে।—এখনই।

—তোমারে কইলকাতা নিয়া যাইতে আছি—তোমার দাদার বাসায়। এই গ্যাখো হিন্দুর পোষাক করছি।

—তোমার সব মিথ্যা। এতো জঘন্য তুমি?—তোমার বন্ধু কোথায়?

—জঘন্য আমি না বৌদি। কিন্তু দলে ছিলাম। ছিলাম তাই রক্ষা। না থাকলে উপায় কি হইত? অনেক —ঝগড়া করছি অগে সঙ্গে, পারলাম না! শ্যাষে সবাই ঠিক কইরা দিছি—তুমি আমার ভাগে…

মঞ্জুর সারা শরীরে তখন ঘৃণার বিদ্যুৎগতি। আমি তোমার!! ঘৃণামাখা সুরে অস্পষ্ট হ'য়ে কথাটা বেরোল মঞ্জুর মুখ থেকে—অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল বুঝি আবার।

—ছিঃ বৌদি! এমন গুণার কাজ! আল্লা কসম্। তোমারে কইলকাতা নিয়া যাইতে আছি তোমার দাদার বাসায় রাখতে। আগের বাসাতেই তোমার দাদা আছে তো?

—আছে কিন্তু তুমি সত্যি বলছ তো!

—সাচা কথা। আল্লা কসম বৌদি।

—তোমার বন্ধু কোথায়?—সে কোথায় আছে?

—তার জন্যে তুমি মোটেই চিন্তা কইরো না বৌদি। তার গায়ে কেউ নোখের টোকাও দেবে না সে বন্দোবস্ত আমি কইরা আইছি।

সত্যি সত্যি বিনয়ের গায়ে কেউ আঘাত করেনি। কিন্তু মঞ্জুহারা হ'য়ে শারীরিক আঘাত পাওয়ার চেয়েও মর্মান্তিক আঘাতে জর্জরিত হ'য়ে রয়েছে সে। গোটা বাড়ী শ্মশানপুরী। কান্নায় বুক ভেঙে গেছে তার। চোখ দু'টো হ'য়েছে শ্রাবণের আকাশ।

বিনয় তখন বিনয় নয়। একটা অর্দ্ধেক রাত তা'কে একেবারে রোগা ক'রে দিয়েছে, দিয়ে গেছে অনেক বছর বয়েস বাড়িয়ে। তবুও তার ভাবনার কি শেষ আছে?—কোথায় আছে মঞ্জু? কি অবস্থায়, কোন পরিবেশে? ভাবতে গিয়েও কি যেন কল্পনায় দেখে চোখ বুজল সে—আর ভাবতে পারল না। বেরিয়ে সোজা চলে গেল করিমের বাড়ী। পাকিস্থান হওয়ার পর সেই তো ও-অঞ্চলের মাতুব্বর—বড় মিঞা! তা'র কথাতেই ওঠে-বসে সব। বন্ধু সে।

মঞ্জুকে ফিরে পাওয়ার যে ক্ষীণ আশাটুকু বিনয়ের মনে ছিল তাও শূন্যে মিলিয়ে গেল করিমকে বাড়ীতে না পেয়ে। নিশ্চল, গতিশূন্য হ'য়ে গেল বিনয়। মনে তখন একটা হিসাব মেলানোর চেষ্টা। চাপা গলায় কে যেন দুর্ঘটনার সময় বলেছিল, 'মাইর-ধইর করিস না'। চাপা হ'লেও গলাটা চেনা চেনা মনে হ'য়েছিল বিনয়ের। করিমকে বাড়ী না পেয়ে হ'য়ে গেল একেবারেই চেনা। সঙ্গে সঙ্গে মিলে যেতে লাগল আরো অনেক। মনে পড়ল সব। তখনও পাকিস্থান হয়নি। দিনে আর না হক দু'তিনবার করিম আসতই তা'দের বাড়ী। বাড়ীর সীমানায় পা দিয়ে উঁচু গলায় ডাকত, কই গো আস্মানের চাঁদ বৌদি। পান সাজো। পান সেজে দিলে বলত, ক্যামন মাইনসের ঝি তুমি বৌদি! খালি মুখে পান খামু? মঞ্জু তখনই দিত কিছু খেতে। খেয়ে খান চিবাতে চিবাতে করিম বলত, কি কমু বৌদি! তুমি যাতা ছোট পানই গ্যাও না কেন, তাতেই আমার সারামুখ একাবারে ভইরা যায়। আর কি যে আস্বাদ দিয়া বানাও সারাদিন খোস্‌বু লাইগ্যা থাকে আমার মুখে। বোঝ্‌লা বৌদি! বৌ—দি!!

আরেকদিন করিম মঞ্জুকে বলেছিল, তোমার জন্যে আমার ভারী দুঃখু হয় বৌদি।

—কেন?—জিজ্ঞেস করেছিল মঞ্জু।

—তোমার পাশে আমার ঐ রোগা বন্ধুরে মোটেই মানায় না, বলেই নিজের ডান হাতের মাংস পেশীর ওপর বাঁ হাতখানাকে পালোয়ানী কায়দায় ফেল্‌ল করিম।

মঞ্জু ছিল বোবা। উত্তর করল বিনয়, তোর উদ্দেশ্য কি রে করিম? আমাদের মধ্যে তুই বিচ্ছেদ ঘটাবি দেখ্‌ছি।

—না ভাই—তা আমার ইচ্ছা না। মাঝে মাঝে বৌদির

হাতের যা পাক করা খাই তা' আমার কাছে অমৃতের মতো লাগে। তেমন পাক করা খাইয়া তোর শরীর ভালো হয় না ক্যান্ তাই ভাবছি। আমি যদি রোজ বৌদির হাতের পাক করা খাইতে পারতাম তয় থ্যাখ্তি এই মুল্লুকটারে রাখতাম আমার পাঞ্জার মধ্যে।

তখনকার পরিবেশে করিমের এই কথাগুলোকে বন্ধু ও বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা ছাড়া আর কিছুই ভাব্তে পারেনি বিনয়। করিম তার সমবয়েসী—অকৃত্রিম বন্ধু। পাঠশালা থেকে একসঙ্গে ম্যাট্রীক পাশ করেছে। দুজনে এক প্রাণ। আপদে বিপদে দু'জন দুজনকে সাহায্য করেছে অর্থ দিয়ে, প্রয়োজন হলে লোক দিয়েও। সেই করিমের এমন কাজ। পৃথিবীর রং যেন হঠাৎ বদ্লে গেল বিনয়ের চোখে। বাতাস যেন বইছে না। আকাশের সূর্যটাও যেন খসে পড়বে তর্ তর্ ক'রে কাঁপছে। করিমের আরো অনেক দিনের ছেঁড়াছেঁড়া কথা, হাব-ভাব ছুটে এসে জড় হতে লাগল বিনয়ের মনের পটে। গড়ে তুল্ল এক ঘৃণ্য করিমকে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল করিমের চোখ দু'টীকে। হ্যাঁ—হ্যাঁ ঠাট্টা-তামাসা করার সময় করিমের লোভাতুর মন উঁকি দিয়েছিল তা'র ঐ চোখ দু'টীর মধ্য দিয়েই।

কয়েকদিন পরে। করিম মঞ্জুকে কলকাতা রেখে ফিরে এসেছে বাড়ীতে। মঞ্জুর সকাতর অনুরোধ মনে আছে তা'র। তাই বাড়ীতে পা ছুঁইয়ে বেরোল বিনয়ের খোঁজে। বিনয়ের বাড়ী অন্ধকার! দরজায় তালা লাগান। লক্ষ্মী না থাকায় অলক্ষ্মী এসে বাসা বেঁধেছে। গোয়ালঘর শূন্য। কুকুরটা চুপ্‌ষে পেটে জিব্ বের করে ধুকছে একটা গাছের গোড়ায়। সম ব্যথায় ব্যথী বেড়ালটী সব ঝগড়া ভুলে ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে জলভরা চোখে। উঠান ভরা ঝড়া পাতার মেলা! রান্নাঘরের চালের ওপর লাউপাতার সবুজ আলপনা রোদে যেন এক পোড়া।

করিম দেখল সব। বুঝল বিনয়ের ব্যথা। পা' চালাল অন্য বাড়ীর দিকে। যতো তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় বিনয়কে ততই ভাল। দুশ্চিন্তা দুর হবে তা'র। একটা স্বচ্ছ হাসি ফুটে উঠবে তা'র মুখে। বিনয়ের মুখের ঐ হাসিটী দেখতেই তখন করিমের মন উৎফুল্ল।

বিনয়কে পেয়ে তা'র নিজের বাড়ীতেই নিয়ে এলো করিম। সব কথাই খুলে বল্ল তা'কে। শেষে জানাল অনুরোধ: কাইলই কইলকাতা রওনা কর ভাই। বৌদি আছে মরার মতো হইয়া। তুই না গেলে নাকি ভাতে হাত দেবে না।

শুনে আনন্দে আত্মহারা বিনয়—বিস্ময়ে সে অভিভূত। কৃতজ্ঞতায় করিমকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্ল, তা' হলে তোরই দয়ায় আমি মঞ্জুকে আবার ফিরে পাচ্ছি। সত্যিকারের বন্ধু তুই। মানুষ তুই করিম!!

তখন পর্যন্ত বিনয় তার আরেকটী মনের খবর পায়নি। সে-মনে ধীরে ধীরে পা' ফেলে এগোচ্ছিল একটা সন্দেহ। যদিও কোন সম্পত্তির ওপর তার আর লোভ ছিল না তবুও সন্দেহের দোলায় দুলে উঠল সে। ভেতরে ভেতরে বদল হ'য়ে গেল বিনয়। মনে মনে চীৎকার করে উঠল, ষড়যন্ত্র! নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্র!! মঞ্জুকে তো নিয়েছেই, এখন তা'র সম্পত্তি নেওয়ার জন্যে নূতন কৌশল! বার কয়েক উচ্চারণ করল কথাটী, তারপরে অকস্মাৎ উঠল অট্টহাসি দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটী মনের সিংহ গর্জন: করিমই বড় মিঞা—মাতুব্বর। একাই তো রয়েছে—দেবে নাকি শেষ করে?

ঠিক তখনই উঠে দাঁড়িয়ে করিম বল্ল, যাই ভাই! অনেক রাইত হইছে। অনেকদিন পর বাড়ী আইছি—খোঁজখবর লই গিয়া। তুই কিন্তু কাইলই রওনা হবি!

—নিশ্চয়ই, জানাল বিনয়। তোর সঙ্গে কিছু কথা আছে। কালকে একবার আসিস্।

রাত্রে আর ঘুমাতে পারল না বিনয়। সন্দেহে সারা মন আচ্ছন্ন। যদিও বা একটু তন্দ্রা নামে চোখে ভর করে, বিনয় যেন শুনতে পায় সে-ভয়াবহ রাতের এলোমেলো চীৎকার। অমনি চোখের পাতা পায় ভয়! লাফ দিয়ে উঠে বসে বিছানায়।

ধারাল রাম-দা খানা সেদিন ওরা নিয়ে গেছে। খুজেপেতে বের করল খেজুরগাছ-কাটা একখানা জং-ধরা ছেন-দা। অর্দ্ধেক ধার উঠলেই যথেষ্ট। বাকী রাত বসে বিনয় ধার দিল ওতে। দায়ে উঠল ধার, আর তা'র মনেও পড়ল শান্। প্রতিহিংসায় শান্ পড়া মন তখন।

করিমকে হত্যা করার জন্যে বিনয়ের মানসিক প্রস্তুতি তখন কানায় কানায়। প্রতিশোধ সে নেবেই। তার সুখের সংসার ভেঙ্গেছে যে, তাকেও সে পাঠাবে যমালয়ে এ-সংসার থেকে। কিসের বন্ধুত্ব? বন্ধু হ'য়ে যে করেছে এমন পাপ কাজ, তার প্রতিশোধ নিতে তা'রই বা হাত কাঁপবে কেন? দা-খানা রাখল হাতের কাছে, চোখের আড়ালে। করিমকে বসতে দেওয়ার জায়গাও ঠিক করে রেখেছে সুবিধামতো। ধার পরীক্ষায় শুধু করিমের আসতে যা' বাকী!

বারেন্দা দিয়ে পায়চারী করছে বিনয়, আর মনের পটে ভাবনার বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হচ্ছে ঘন ঘন। একবার বিড় বিড় করছে আপন মনে। একবার গিয়ে দা-খানই হাতে নিয়ে দেখছে চোখ বড় বড় করে। কখনও হা[illegible] অকারণ হাসি, আবার কখনও মঞ্জুর ফটোখানার [illegible] তাকিয়ে নীরবে ফেলছে চোখের জল। নিশ্চ[illegible] কিন্তু রক্ত তা'র চঞ্চল। উদ্দামগতিতে ছুটা[illegible] শিরায় শিরায়। সে তখন অন্য মানুষ—অন্য

রাঙা চোখে ভয়াল দৃষ্টি! খুন করার জন্যে খুন চেপেছে মাথায়।

একটা হাসি সব সময়েই মুখে লেগে থাকত করিমের। বন্ধুর কথা রক্ষা করতে এসে হাসিমুখেই বল্ল, কি কথা কবি তাড়াতাড়ি কইয়া ফেলা—আমার আবার বৈঠক আছে।

—আমার যা' কিছু সবই তোকে দিয়ে যাচ্ছি। একটু বোস্—কাগজ-পত্র সব তোর হাতে দিয়ে যাই।

—যা' আমার আছে তাই যথেষ্ট, বাধা দিয়ে করিম বল্ল।

কে শোনে কা'র কথা! বিনয় তখন ঘরের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছে। একটা দম্ নিয়ে দা-খানাকে ধরল শক্ত মুঠে—বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ধার পরীক্ষা করল শেষবারের মতো।—ঠিক আছে। কব্জিতে আছে জোর, অনেকদিন পড়ে থাকা দায়ের বুকেও আছে তৃষ্ণা। এতোদিন খেয়েছে খেঁজুর গাছের রস—আর এখন খাবে মানুষের রক্ত।

ঠিক এমন সময়েই কা'র গলা কানে গেল বিনয়ের—চিঠি আছে—চিঠি—বিনয়চন্দ্র দাস।

চমকে উঠল বিনয়। পিয়ন!! দা-খানা কোন রকমে রেখে অন্তর-কাঁপা নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল,—আমার চিঠি?

তর্ সইছিল না বিনয়ের। চিঠিখানা পড়ে ফেল্ল এক নিশ্বাসে। এ-পিঠ-ও-পিঠ করে দেখল, সিলটা কলকাতারই। হাতের লেখাও অতি পরিচিত, মঞ্জুর, আর মঞ্জুর চিঠির মধ্যেই মঞ্জুর দাদার।

—কার চিঠি? জিজ্ঞেস করল করিম।

বিনয় তখনও কাঁপছে—কি করতে যাচ্ছিল সে! ভেতরে ভেতরে এতোটুকু হ'য়ে গেল সে। পারছিল না কথা বলতে।

দুশ্চিন্তা মুক্তির ক্লান্তিতে আর আনন্দে আত্মহারার অবসন্নতায় বিনয় তখন চোখ দু'টী অপলখভাবে তুলে ধরল করিমের দিকে। নিজেকে যেন আর ধরে রাখতে পারছিল না সে। কোন রকমে চিঠিখানা করিমের হাতে দিয়ে পরিশ্রান্তের মতো টেনে টেনে বলতে লাগল, মঞ্জুর চিঠি···পড়ে দেখ!

সুরে রসিকতা ঢেলে করিম বল্ল—বুঝিস কিন্তু পড়ব?

নিশ্চয়ই পড়বি—তুই আমার সত্যিকারের বন্ধু! কতো যে তোর কাছে আমি ঋণী করিম! কোন সম্পত্তিতেই এ-ঋণ পরিশোধ হয় না—জানি তবুও আমার যা' আছে তা' সবই তোকে দেব করিম—তোর কোন আপত্তিই আমি আর শুনব না।

—পুরস্কার?

—তা' বলে তোর এতো বড় মহৎ কাজকে ছোট করতে চাই না। আকাশ সীমাহীন—তোর মহত্বও যে সীমাহীন করিম!

—থাম্ তুই। বন্ধুর যা' কাজ তাই করছি। পুরস্কার দিতে চাইলে মনে করব আমারে তুই বন্ধুর সামন থিকা দূর কইরা দিতে চাস্।—থাউক সে-কথা। তুই এখন রওনা হওয়ার যোগাড় কর।

রওনা না হ'য়েও বিনয় যে তখন পৌঁছে গেছে কলকাতায়, উপস্থিত হ'য়েছে মঞ্জুর সাম্‌নে—করিম তা' বুঝতে পারছিল না।

অন্ধকারের দেশে ঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

কলকাতায় সভ্য সমাজের বাইরে খুনী, চোর, ডাকাত প্রভৃতি গুণ্ডাশ্রেণীর লোকদেরও এক একটা দল বা আড্ডা আছে। এই গুণ্ডারা যেমন সংঘবদ্ধ তেমনি চুরিডাকাতি বিদ্যায়ও রীতিমত সুশিক্ষিত। এদের গুরু আছে, নেতা আছে, দালাল আছে, এমন কি জামিনদারও আছে। সহরে পুলিসের কড়া শাসন সত্ত্বেও এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিস কর্মচারী অসৎ ও ঘুষখোর হলে তো কথাই নেই! এরা অতি সহজেই তাদের হাত করে ফেলে। ফলে এদের গুণ্ডামী নির্বিবাদে চলতে থাকে। এই সব সংঘবদ্ধ পাকা গুণ্ডাদের শায়েস্তা করতে একজন সৎ এবং কর্তব্য ও ন্যায়নিষ্ঠ পুলিস অফিসারকে যে কিরূপ বেগ পেতে হয় তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। "অন্ধকারের দেশের" লেখক শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল নিজে একজন পুলিস বিভাগের সুযোগ্য উচ্চপদস্থ অফিসার। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথাই গল্পচ্ছলে এই গ্রন্থে বলেছেন।

এই গুণ্ডারা এমনি সংঘবদ্ধ ও পাপবুদ্ধিতে প্রতিভাবান যে এদের যদি কোন ভাল কাজে লাগানো যেতো, তাহলে এরা সেক্ষেত্রেও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারতো। পঞ্চাননবাবু একজন পুলিস অফিসারের মুখ দিয়ে গুণ্ডাদের এক দলপতির কাছে তাই বলিয়েছেন —"আমি কয়দিনে যে বিরাট প্রতিভা ও সংগঠন শক্তির পরিচয় আপনাদের মধ্যে পেয়েছি, তা ভালো কাজে লাগলে আপনারা শুধু নিজেদের নয়, দেশের ও দশেরও বহু উপকারে আসতে পারতেন। আপনারা গড়ে তুলতে পারতেন বড় বড় ক্ষেতখামার ও কলকারখানা। যে অর্থ দস্যুগিরি ও নিষিদ্ধ দ্রব্যের বে-আইনি ব্যবসা করে উপায় করেন, তার চেয়ে শতগুণ অর্থ আপনারা উপায় করতে পারতেন দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়িয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করে।"

সহরের বস্তি অঞ্চলের নাম করা গুণ্ডারা চুরি, ডাকাতি ও খুন-খারাপি করে কিভাবে জীবন কাটায়, তারা কথায় কথায় মানুষের বুকে কি ভাবে ছুরি বসায়, মদ ও মেয়ে নিয়ে তারা কি রকম হুল্লোড় করে, পতিতারা কিভাবে জীবন কাটায়, পতিতাপল্লীর গুণ্ডাদের কাহিনী, সহরের ভণ্ড ব্যবসাদার ভিক্ষুক সমাজের কাহিনী প্রভৃতি অনেক কথাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চাননবাবু নিজে পুলিস বিভাগের লোক হওয়ায় এবং গুণ্ডামনে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকায় গ্রন্থখানি এতটা সুখপাঠ্য হয়েছে। লেখা ও বর্ণনার গুণে ঘটনাগুলি জীবন্ত বলে মনে হয়। শুধু লেখাই নয়, গ্রন্থখানির ছাপা, বাঁধাইও উচ্চাঙ্গের। সভ্য সমাজের বাইরে যে "অন্ধকারের দেশের" কথা পঞ্চাননবাবু এই গ্রন্থে বলেছেন, বইখানি পড়লে সাধারণের অজ্ঞাত সেই অন্ধকারের দেশের অনেক খবর জানা যায়।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ; ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬, দাম—৩॥০ আনা]

গো. রা.

নব জন্ম ঃ আশাপূর্ণা দেবী

লেখিকার অন্যান্য গল্পের মত এটিও বেশ রসাল ও উপভোগ্য হয়েছে। কিন্তু কাহিনীর শেষে শশধর যে কেন বলছে "জানোয়ার থেকে মানুষ জন্ম," একথা ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। শশধরের মুখে এ স্বীকারোক্তি দিয়ে লেখিকা কি প্রমাণ করতে চান? একটি নারীর ও একটি পুরুষের বন্ধুত্বকে নারীটির স্বামী যদি ভাল চোখে না দেখে, তবে তাকে জানোয়ারের সমান হতে হবে? তারপর তিনি বলছেন, "অতো বড়ো একটা দাম্ভিক লোকের"......কিন্তু আমরা বইএর কোথায়ও শশধরের দম্ভের কোন লক্ষণ দেখতে পাই নি?

লেখিকা নারীপুরুষের মধ্যে বন্ধুত্বের একটা আদর্শ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর গল্পের নায়িকা সম্বন্ধে তিনি বলছেন; "বাসন্তীর সাহস আছে। পুরুষের বন্ধুত্বকে স্বীকার করে নেবার মত জোরালো সাহস।" তিনি প্রশ্ন করেছেন, "তারা (মেয়েরা) কি তাদের বন্ধুত্বের ক্ষুধা মেটাতে অন্য জগতের দিকে তাকিয়ে দেখবে না? সেখানে যদি এমন কাউকে পায় যার সঙ্গে চিত্তবৃত্তির মিল আছে তাকে (পুরুষকে) বন্ধু বলে গ্রহণ করলেই রসাতলে যাবে সতীধর্ম?" কে বল্লে যাবে? যে যুগে সাতটা স্বামী পাল্টালেও সতীধর্ম নষ্ট হয় না, সে যুগে সেই পুরানো আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামাতে কে উৎসাহ দিলেন লেখিকাকে? লেখিকা এক জায়গায় বলেছেন, এযুগে যে পরমাণু বোমাও সেকেলে হয়ে গিয়েছে সে বার্তা ওদের কাছে পৌঁছয় নি।" মনে হতে পারে, একথা স্বয়ং লেখিকার পক্ষেও প্রযোজ্য।

বলতে পারেন ভারতের সতীধর্মের আদর্শ তো অন্য দেশের মত নয়। এক স্বামীই ভারতীয় সতীত্বের আদর্শ। লেখিকা মাত্র তার অতিরিক্ত পরপুরুষের সহিত বন্ধুত্ব রেখেও তাকে বজায় রাখতে চান। বেশীদূর এগিয়ে ইউরোপীয় সতীত্বের কথা ভাববার তার দুঃসাহস নেই। যদি তাই হয় তবে তাকে স্মরণ রাখতে হবে ভারতীয় ঋষির অমোঘ মন্ত্র —'মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।' মাতা বোন বা দুহিতার সঙ্গেও একা থাকবে না। কারণ, "বলবান্ ইন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাং সমপি কর্ষতি"—বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাম আকর্ষণ

করে থাকে। এ সত্যকে প্রতীচ্যের বড় বড় মনোবৈজ্ঞানিক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ও ঘোষণা করেছেন।

[প্রকাশক: শ্রীবাসুদেব লাহিড়ী, ইষ্ট লাইট বুক হাউস; ২০ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা—১। মূল্য ২॥০ আনা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

পথে পথে: শ্রীপরিমল গোস্বামী

পুস্তকখানিতে আছে লেখকের দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা। ইহা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত মাত্র নয়—রীতিমত রস-সাহিত্য। উপন্যাসের মত সরস অথচ বিষয়বস্তু বাস্তব। এই শ্রেণীর ভ্রমণ-সাহিত্য বাঙ্গলা ভাষায় অল্পই আছে। সরস বক্রোক্তিময় রচনা ভঙ্গীতে পরিমলবাবু এই ভ্রমণ-সাহিত্যের পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধটির প্রাকৃতিক আলম্ব অরণ্য এবং মানবিক আলম্ব আরণ্যক সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ। এই নিবন্ধটি স্মৃতিকথা পর্যায়ে পড়ে। এই নিবন্ধে বিভূতিভূষণের চরিত্রটি সহৃদয়তার প্রফুল্লমধুর পরিবেশের মধ্যে চমৎকার পরিস্ফুট হইয়াছে। ডুয়ার্সের পথে নিবন্ধের হাতী-খেদায় হাতী ধরার বর্ণনাটি কৌতূহলী পাঠকের পক্ষে বড়ই চিত্তাকর্ষক। ভ্রমণ-পথের বিচিত্র পরিবেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা সর্বত্রই কবিত্বময় হইয়াছে। লেখকের ক্যামেরায় তোলা আলোকচিত্রগুলি ও লেখনীর মুখে তোলা আলোকচিত্রগুলি দুইই অপূর্ব। আঙটির পাথরে প্রতিফলিত বিশ্বচিত্রের মত তাঁহার অভিজ্ঞতার নখদর্পণে চীনদেশের একটি ছবির আবিষ্কার বড়ই কৌতুকাবহ।

গ্রন্থখানির প্রধান দানের বস্তু রসসাহিত্য—দানের দক্ষিণা কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য—ইহাই উপরি পাওনা।

[প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জির ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—৩৲ টাকা]

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

নয়া ইতিহাস: শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী

গ্রন্থকর্ত্রী বহুপূর্ব্বেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে 'লীলা পুরস্কার' ও নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি 'লীলা স্বর্ণপদক' দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আন্তর্জ্জাতিক গল্প প্রতিযোগিতায় বাংলা গল্পের মধ্যে এঁর রচনা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করায় এঁর কথা-শিল্প কৌলিন্যের মর্য্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি ভারতসরকার কর্তৃক অন্যতম গণ সাহিত্য হিসাবে নির্ব্বাচিত হয়েছে, এটা খুব আনন্দের কথা।

'নয়া ইতিহাস'কে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না, বড় গল্প বললেই বোধহয় বিচারের মাপ কাঠিতে শোভন হয়। গ্রন্থের নাম করণ হয়েছে বর্দ্ধমান ছাড়িয়ে প্রায় বিশ পঁচিশ মাইল ভেতরে অজয় নদের তীরের একটি সেবায়তনকে কেন্দ্র করে।

যে শান্তনুকে উর্ম্মী ভালোবেসেছিল সহরের জনতা মুখর সভ্যতার রাজপথে, সে তার পিতার পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্যে উর্ম্মীকে পল্লী লক্ষ্মী করে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। শান্তনুর পিতা প্রশান্তবাবুর ইচ্ছা ছেলে তাঁর বিদ্যায়তনকে পরিচালনা করবে আর তাঁর পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের মহিলা বিভাগটী পরিচালিত করবে তাঁর শিক্ষিতা পুত্রবধূ। উর্ম্মীর পুঁজিবাদী পিতা অশোককুমার চৌধুরী শান্তনুকে জামাতা করে সহরের ঐশ্বর্য্যের সৌধে রাখ্‌তে চেয়েছিলেন ভোগবিলাসের সমারোহে; উর্ম্মীরও সেই ইচ্ছা। সব আশা ব্যর্থ হয়ে গেল। 'ইজ্‌মের' সংঘাতে আদর্শের চেয়ে প্রেম বড় হোলো না। পত্রের মাধ্যমে তরুণ তরুণীর মধ্যে বোঝা পড়া হয়ে গেল। শান্তনু নিভৃত পল্লীতে পিতার আদর্শকে রূপায়িত করতে লাগ্‌লো, উর্ম্মী রইলো সহরে ভোগবিলাসের প্রাচুর্য্য সম্ভোগে। হঠাৎ বর্দ্ধমানের পল্লী অঞ্চলে ওকে যেতে হোলো মাসির বাড়ীতে। এখানেই ঘটনা সূত্রে শান্তনুর সঙ্গে আবার উর্ম্মীর দেখা—পুনর্ম্মিলনও বটে। এলাহাবাদ থেকে মোটরে কল্‌কাতায় আসার পথে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটলো যার ফলে মুমূর্ষু শান্তনুকে নিয়ে আসা হোলো এই পল্লীর হাসপাতালে অচৈতন্য অবস্থায়।

উপসংহারে ওদের ভাবী জীবনের নয়া ইতিহাস গড়ে তোল্‌বার ইঙ্গিত অদৃষ্ট দেবতাকে দিয়ে গ্রন্থকর্ত্রী কাহিনীর পূর্ণচ্ছেদ করেছেন। পাঠক-পাঠিকা সমাজে গ্রন্থখানি সমাদরলাভ করবে বলে আশা করা যায়।

[প্রকাশক—এশিয়া পাব্‌লিশিং কোং। ১৬।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—১৲ টাকা।]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পদসঞ্চার" (২য় সং)—৫৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "চরিত্রহীন" (১৫শ সং)—৫৲, "স্বামী" (২৯শ সং)—১।০, "শেষ প্রশ্ন" (১৮শ সং)—৫৲, "অরক্ষণীয়া" (২২শ সং)—১।০
বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত রন্ধন-বিজ্ঞান "পাক-প্রণালী" (১০ম সং)—৬৲
পি, সি, সরকার প্রণীত যাদুবিদ্যা "ইন্দ্রজাল" (১ম খণ্ড)—৫৲
সত্য গুপ্ত-অনূদিত মাকসিম গর্কির উপন্যাস "ফোমা গরদিয়েফ"—৩৲
শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মিলনের পথে"—২॥০
শ্রীপ্রবুদ্ধকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-শিক্ষা "রাগেশ্বর" (১ম ভাগ)—১।০
শ্রীঅলককুমার ঘোষ প্রণীত শিশুপাঠ্য "প্রবাদের গল্প"—৸০
শ্রী এন এন সিংহ প্রণীত "পাকিস্তানে বাঙালীর জাতীয়তা"—৩৸০
অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মেঘ ও চাঁদ"—৸০
রায়স্বরূপ প্রণীত "কমিউনিজম ও কৃষক"—১৲
সীতারাম গোয়েল প্রণীত "কৃষকের রক্তে লাল চীন"—।০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়
... ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

শিল্পী—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত   ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

কার্ত্তিক—১৩৬২

প্রথম খণ্ড | ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

প্রাচীন ভারতে দেব-বাদ

শ্রীউপেন্দ্র রাহা বিদ্যাভূষণ

মানব-সভ্যতার আদিযুগে আর্যঋষিগণ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য ও শক্তির আধার বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকের এবং জাগতিক প্রত্যেক ব্যাপারের মূলেই এক একটি দেবতার কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিকে আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগই কতিপয় দেবতার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আকাশের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে দ্যৌ, কিরণোজ্জ্বল নভোমণ্ডলের ও দিবসের দেবতাকে মিত্র, তামস খ-মণ্ডলের ও সন্ধ্যার দেবতাকে বরুণ, আদিত্য-মণ্ডলের দেবতাকে সূর্য, প্রভাত-রবির দেবীকে সাবিত্রী, প্রভাত ও সায়াহ্নের যুগ্মদেবতাকে অশ্বিনী-যুগল এবং ঊষাকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে ঊষা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। আবার অন্তরীক্ষ-চারী দেবতাদের মধ্যে অন্ধকার হইতে আলোক এবং আলোক হইতে অন্ধকারে পরিবর্তনের মূলকারণ ও বৃষ্টির দেবতাকে ইন্দ্র, ঝড়ের দেবতাকে মরুৎ, পবনের দেবতাকে বায়ু ও বাত, বর্ষণের দেবতাকে পর্জন্য এবং বিদ্যুৎসমন্বিত ঝটিকার দেবতাকে রুদ্র নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আবহ-ব্যাপারের মূলে অধিষ্ঠিত আরও অনেক দেবতা ঋষিদের কল্পনায় স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভূমণ্ডলস্থিত দেবতাগণের মধ্যে পৃথ্বীদেবী, অনলের দেবতা অগ্নি, সরস্বতী ও অন্যান্য নদী তাঁহাদের কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কখনও কখনও ঊষাকে

ধরিত্রী ও আকাশ হইতে যুগপৎ উদীয়মান কল্পনা করিয়া তাঁহাকেও পৃথ্বী-দেবতার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই সকল দেবতার মধ্যে শক্তি, ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ইঁহাদের উপাসনাও প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ঋষিদিগের কল্পিত দেবকুলের মধ্যে ঋতু ও বর্ষণ প্রভৃতি পার্থিব ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় নক্ষত্র ব্যতীত অপর কোন তারকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং এই সকল তারকাও শ্রেষ্ঠ দেবতার পর্যায়ভুক্ত হয় নাই। সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক অন্যান্য শক্তির ন্যায় মানুষের দৈনন্দিন ব্যাপারে এই সকল তারকার তেমন প্রভাব উপলব্ধ না হওয়াই ইহার কারণ।

উপরি-উক্ত দেবমণ্ডলীর মধ্যে প্রত্যেক দেবতারই অধিকার বা অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র যে বিশেষরূপে চিহ্নিত ছিল, তাহা নহে। একই প্রাকৃতিক ব্যাপারের মূলে কতিপয় ভিন্ন ভিন্ন দেবতার, আবার বিভিন্ন প্রাকৃতিক ব্যাপারের মূলে একই দেবতার কল্পনাও করা হইত। ঋষিদের প্রাকৃতিক ব্যাপারসমূহ সূক্ষ্মরূপে পর্যবেক্ষণের ফলেই ভারতবর্ষে দেব-বাদের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহারা পৃথিবী, বায়ু ও আকাশ, প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও রাত্রি, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শীত—প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন নামরূপে প্রকাশিত এই সকল এবং এবম্বিধ অন্যান্য বিষয়ের মূলে অধিষ্ঠিত তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ইহাদের প্রত্যেকের মূলে যে এক একটি শক্তি কার্য করিতেছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া এই সকল শক্তিকে দেবতা নামে অভিহিত করেন।

ঋগ্বেদ ও আবেস্তাগ্রন্থে দেবতাদের সংখ্যা ৩৩টি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বেদে আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর অধিষ্ঠাতা বিভিন্ন দেবতার উল্লেখ আছে। এই তিন বিভাগের প্রত্যেক বিভাগই একাদশ দেবতার অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া কল্পিত হইত। এই হিসাবে উপরোক্ত তিন বিভাগে দেবতাদের সংখ্যা ৩৩ বলিয়া গণ্য হইত। এই সকল দেবতার মধ্যে বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বদেবগণ ও মরুৎগণের নাম পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, প্রতি বিভাগে সাতজন দেবতা ছিলেন। কিন্তু বেদে সপ্ত মরুৎ ও সপ্ত রুদ্রের নাম পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ অগ্নি, আদিত্যগণ, মরুৎ, ইন্দ্র, উষা, অশ্বিনী-যুগল ও সোম এই সপ্ত দেবতার সমষ্টিকে সপ্ত বসু বলা হইত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বরুণ, মিত্র, অর্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ ও ত্বষ্টৃ—ইঁহারা সপ্ত আদিত্যের পরিচায়ক। কিন্তু ইহার সপক্ষেও কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। পরবর্তীকালে অষ্টবসু, একাদশ মরুৎ, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি—এই তেত্রিশটি দেবতার কল্পনা করা হয়। বৎসরের প্রত্যেক মাসেই এক একটি আদিত্য কল্পনা করিয়া আদিত্যের সংখ্যা দ্বাদশে পরিণত করা হইয়াছে।

কালক্রমে কতিপয় দেবতাকে সমষ্টিগতভাবে একই নামে অভিহিত করার রীতি প্রচলিত হয়। এই সকল দেবতা গণ-দেবতা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। বসু বলিতে সমষ্টিগতভাবে অষ্টবসু, মরুৎ বলিতে একাদশ মরুৎ এবং আদিত্য বলিতে দ্বাদশ আদিত্য বুঝায়। কালক্রমে বহু দেবতাকে সমষ্টিগতভাবে একই নামে বুঝাইবার জন্য 'বিশ্বদেব' নামের সৃষ্টি হয়। 'বিশ্বদেব' বলিতে প্রত্যেক দেবতাকে স্বতন্ত্রভাবে বুঝায় না, ইহা দেবগণের সমষ্টিগত নাম। মরুৎগণকে সমষ্টিগতভাবে 'বিশ্বমরুৎ' বলা হয়। বিশ্বদেবের উদ্দেশে রচিত স্তোত্রসমূহে অসংখ্য দেবতার নাম পাওয়া যায়। এই সকল দেবতার মধ্যে ইন্দ্রই শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহাকে 'ইন্দ্রজ্যেষ্ঠ' বলা হইয়াছে। এমন বৈদিক দেবতা খুব কমই আছে, যাহার নাম এই সকল স্তোত্রে উল্লিখিত হয় নাই। এই সকল স্তোত্রে বিভিন্ন দেবতাকে একই শ্রেণীবদ্ধ করার প্রথম প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ব্যাপক অর্থে আদিত্য, বসু ও রুদ্র—এই সকল গণ-দেবতাকেও বিশ্বদেবের সংজ্ঞাভুক্ত করা যাইতে পারে।

বিশ্বদেব নামের সৃষ্টি দ্বারা অনেক বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন দেবতাকে একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহাদের একত্ব বিধানের চেষ্টা হইয়াছিল। ইহা হইতেই ক্রমে বহু দেবতার স্থলে এক দেব-বাদ প্রতিষ্ঠার অভিমুখী প্রচেষ্টা প্রবর্তিত হয়। তখন বিভিন্ন দেবতা একই প্রকার প্রাকৃতিক কার্যের মূলে অধিষ্ঠিত হওয়ায় যুক্তভাবে ইঁহাদের নাম উল্লিখিত হইত। যথা, অগ্নি দেবতা যে কেবল ইন্দ্র ও সাবিত্রীর সহযোগে প্রাকৃতিক কার্য নির্বাহ করিতেন তাহা নহে, পরন্তু কতকগুলি ব্যাপার সম্পর্কে তিনে এক অর্থাৎ যেই অগ্নি, সেই ইন্দ্র, সেই সাবিত্রী বুঝাইত। এইরূপে ইন্দ্র-অগ্নি, মিত্র-বরুণ, অগ্নি-সোম, অশ্বিনী-যুগল এইরূপ বহু যুগ্ম দেবতা কল্পিত হয়। আবার কোন কোন স্থলে অর্যমা-

মিত্র-বরুণ অথবা অগ্নি-সোম-গন্ধর্ব এইরূপ ত্রিত্বও লক্ষিত হয়। আবার একই দেবতার নাম বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইত, এরূপও দেখা যায়। যেমন অদিতি আকাশ ও বায়ুর সমার্থক, আবার অদিতি শব্দ দ্বারা মাতা, পিতা, পুত্র, সমস্ত দেবতা, মানুষের পঞ্চজাতি, অতীত এবং ভবিষ্যৎও বুঝাইত।

কালক্রমে ঋষিগণ কেবল ইন্দ্র, অগ্নি অথবা বরুণ অর্থাৎ একটিমাত্র দেবতার উদ্দেশ্যে স্তোত্র রচনা করিয়া একমাত্র সেই দেবতারই উপাসনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিভিন্ন দেবতা হইতে ক্রমশঃ একই দেবতার অভিমুখী হওয়ায় বহু দেবতার স্থলে এক দেব-বাদ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইল। ঋষিরা তখন সকল দেবতার ঊর্ধ্বে যে এক অদ্বিতীয় মহান্ দেবতা আছেন, ইহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, 'তদেকম্'। ভিন্ন ভিন্ন দেবতা সেই একমাত্র পরম দেবতারই যে বিভিন্ন প্রতীক মাত্র, তাঁহারা তখন উদাত্তকণ্ঠে এই মহাসত্য প্রচার করিলেন।

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি, অগ্নিন্ যমম্ ক্ষতরিশ্বানম্ আহু। (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬)

তিনি এক, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে অগ্নি, যম, বায়ু প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। আবার 'একং সতং বহুধা কল্পয়ন্তি' (ঋগ্বেদ ১।১১৪।৫) তিনি এক ও সৎ অর্থাৎ নিত্য, লোকে তাঁহাকে বিভিন্ন নাম দিয়া থাকে—এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

বর্তমানে ঋগ্বেদ যে অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মাত্র ১,০১৭টি স্তোত্র আছে। এই সকল স্তোত্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কোন কোন স্থলে এই সঙ্কলন সুপ্রণালীসম্মতভাবে, অপরাপর স্থলে যদৃচ্ছাক্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বৈদিক যুগে যে সকল স্তোত্র মন্ত্র রচিত হইয়াছিল, তাহার শতাংশের একাংশও আমাদের হস্তগত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তখন মুদ্রাযন্ত্রের বা লিখন-প্রণালীর প্রচলন ছিল না। গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে মন্ত্র ও স্তোত্রসমূহ শ্রুতিরূপে এক পুরুষ হইতে পরবর্তী পুরুষের স্মৃতিগত হইত। পরবর্তী কালে লিখন-পদ্ধতির প্রচলনের পরও জলবায়ুর প্রভাব, কীটকুলের দংশন এবং অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থা—বিশেষতঃ রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম-বিপ্লবের ধ্বংসকারী আক্রমণে যে কত অমূল্যরত্ন সর্বসংহারী কালগর্ভে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় যদি কোন বেদের কোন স্থলে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত একটিমাত্র স্তোত্র পাওয়া যায়, তবে সেই দেবতা যে অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা কম পূজা পাইতেন, কিম্বা তাঁহাদের অপেক্ষা হীন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। হয়ত তাঁহার উদ্দেশ্যে রচিত অন্যান্য স্তোত্র কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না।

ভারতবর্ষে স্বাভাবিক ভাবে এবং ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইন্দ্রের অলৌকিক কার্যের জন্য ঋগ্বেদে তাঁহার যে স্তুতি আছে, (ঋগ্বেদ ৮।৮৯), তাহাতে তিনি শতক্রতু, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমানরূপে অভিহিত হইয়াছেন এবং তাঁহার কৃপাতেই সূর্য কিরণদান করে, ইহাও বলা হইয়াছে। পরিশেষে 'বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবঃ সগুন্' এইরূপে তাঁহার স্তব করা হইয়াছে। ইহাতে ইন্দ্রের প্রতি যে বিশ্বদেবত্ব আরোপ করা হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে একই দেবতাকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বস্রষ্টা বলিয়া অভিহিত করায় তাঁহাকে যে ঈশ্বরের পদবীতে উন্নীত করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পরবর্তীকালে ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। পূর্বে ত্বষ্টৃকে স্রষ্টারূপে কল্পনা করা হইত। তিনি দেবতাদিগের বিশ্বকর্মা ছিলেন। শরণ্যু ও বিশ্বরূপ নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তাঁহার ঈশ্বরের পদবীতে আরূঢ় হওয়ার যোগ্যতাও ছিল; তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টারূপে এমন কি সমস্ত পদার্থের প্রসবয়িতারূপে বর্ণিত হইয়াছেন (ঋগ্বেদ ১০।১১০)। তিনি অগ্নি, ইন্দ্র ও ব্রহ্মানস্পতিরও স্রষ্টা বলিয়া ঋগ্বেদে কথিত হইয়াছে। (ঋগ্বেদ ১০।২।৭; ১১।২৩)। কিন্তু তিনি বৈদিক যুগের অতি প্রাচীন দেবতা বলিয়া প্রজাপতি বা বিশ্বকর্মার ন্যায় মর্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই। ত্বষ্টৃ শরণ্যুর পিতা ও অশ্বিনী যুগলের পিতামহ ছিলেন।* ত্বষ্টৃর সাহে

* পরবর্তীকালে ইন্দ্র অতিশয় প্রভাবশালী হইয়া দ্যৌ প্রভৃতি প্রাচীন দেবতাকে সমূলে উৎখাত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই ত্বষ্টৃর প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় এবং বিশ্বকর্মা, প্রজাপতির বা হিরণ্যগ তাঁহার স্থান অধিকার করেন। ত্বষ্ট এবং তাঁহার পুত্র বিশ্বরূপে

বিশ্বকর্মার প্রভেদ এই যে, বিশ্বকর্মার কোন পূর্বেতিহাস, পিতা মাতা বা সন্তান-সন্ততি ছিল না ; (ঋগ্বেদ ১০।৮১।৪)। বিশ্বকর্মা সম্বন্ধে ঋগ্বেদে এরূপ উক্তি আছে যে, সর্বদ্রষ্টা বিশ্বকর্মা কিসের উপর ভিত্তি করিয়া, কি অবলম্বন পূর্বক, কিরূপে—কি বা কোন্ বস্তু হইতে স্বীয় শক্তিবলে পৃথিবী ও বিস্তীর্ণ আকাশ সৃষ্টি করিলেন ? তিনিই একমাত্র দেবতা যাঁহার প্রত্যেক দিকে চক্ষু, মুখ, বাহু, পদ আছে ; তিনি স্বর্গ ও পৃথিবী নির্মাণকালে বাহু ও পক্ষ দ্বারা হাপরের কাজ করিয়াছিলেন।' পরবর্তীকালে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (তৈঃ ব্রাঃ ২।৮।৯।৬) বিশ্বকর্মার উপরোক্ত কার্যসমূহ ব্রহ্মার প্রতি আরোপিত হইয়াছে।

নিখিল বিশ্বের মহান্ স্রষ্টা ও নিয়ন্তা মহেশ্বরের যে অনুভূতি ঋষিদিগের হৃদয়ে পতিত হইয়াছিল, তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহারা সর্বস্রষ্টা বিশ্বদেবতা বা বিশ্বকর্মার উদ্দেশ্যে স্তোত্র রচনা পূর্বক তাঁহার উপাসনা করিয়াছিলেন এবং এই অনুভূতির দরুণই তাঁহারা সকল ভূতের প্রভুরূপে প্রজাপতির কল্পনা করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে সোম, সাবিত্রী ও অন্যান্য কতিপয় দেবতা প্রজাপতির নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের একটি স্তোত্রে (১০।১২১।১০) হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতিকে স্বর্গ, মর্ত্য, জল, স্থল-অন্তরীক্ষের সৃষ্টি ও স্থিতির কর্তা, সকলের পিতা ও সকলের প্রভু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে বৈদিক ঋষিগণ প্রজাপতিকে নিখিল জগতের অধীশ্বরত্ব ও সর্বেশ্বরত্বে অভিষিক্ত করিয়া একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করিলেও তাঁহারা অন্যান্য দেবতার অস্তিত্বও স্বীকার করিয়াছেন। একেশ্বরের প্রতীক বিশ্বকর্মা ও প্রজাপতির ন্যায় হিরণ্যগর্ভ, প্রাণ, স্কম্ভ, ধাতা, বিধাতা, নামধা প্রভৃতি একেশ্বরের বোধক নামও ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় (ঋগ্বেদ ১০।৮২।৭)। কিন্তু ইঁহারা একেশ্বরবাচক হইলেও প্রজাপতির ন্যায় সর্বেশ্বরত্ব ইঁহাদের প্রতি আরোপিত হয় নাই। পরবর্তীকালে এই সকল দেবতার নাম নানাভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-যুগে এবং অথর্ববেদের স্তোত্রসমূহেও এইরূপ কতিপয় দেবতার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, এমন কি, আধুনিক যুগের দেবমণ্ডলীর মধ্যেও ইঁহাদের কতিপয় নাম প্রচলিত আছে ; অপর দেবতাদিগের নাম কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই সকল দেবতার উপাসনা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যে একেশ্বরবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা এখনও হিন্দুজাতির সকল ধর্মকর্মের মূলে বিদ্যমান আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াই এই সকল পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পরবর্তী-কালে শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা এবং কালী, দুর্গা, পার্বতী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক দেবতার পূজা প্রবর্তিত হইলেও উচ্চাধিকারী পূজকগণ ইঁহাদের উপর সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিসত্তা প্রভৃতি ঈশ্বরোচিত গুণ আরোপ করিয়াই ইঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন।

উপরে যে সকল দেবতার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহারা বিভিন্ন নামরূপের মধ্যে দীক্ষিত। এইজন্য ইঁহারা—এমন কি, প্রজাপতি বা বিশ্বকর্মা ও সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ব্রহ্মের স্থান পূরণ করিতে পারেন নাই। এই সকল দেব বা দেবী পুং বা স্ত্রীলিঙ্গের দ্যোতক। কিন্তু ঋষিগণ যখন ব্রহ্মকে 'তদেকম্' রূপে অনুভব করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাতে পুরুষত্ব বা স্ত্রীত্বের অতীত লিঙ্গ আরোপ করিয়াছেন। তাঁহারা সাধারণতঃ নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মের প্রতি ক্লীবলিঙ্গ, আবার এই ব্রহ্মাই যখন সগুণ হইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতি প্রায়ই পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করিয়াছেন। একই সত্যস্বরূপ মহেশ্বর যে অগ্নি, যম, বায়ু প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

আর্য ঋষিগণ অচিন্ত্যতত্ত্বের গভীর গহনে প্রবেশ করিয়া নির্মল বুদ্ধি ও সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে ধ্যানলোকে যে বিরাট সৃষ্টির মূলে অবস্থিত এক অব্যক্ত মূলতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন, ঋগ্বেদে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১০।৯০ সূক্তে উক্ত আছে, 'তাঁহা হইতে যজ্ঞের দ্বারা সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে'। আবার ১০।৭২।৬ ও ১০।৮২।৬ সূক্তে প্রথমে অম্ভ (জল) ছিল, তাহাতে প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন এবং ১০।১৯০।১ সূক্তে 'ঋত ও সত্য প্রথমে উৎপন্ন হইল, অনন্তর রাত্রি (অন্ধকার)

অসুর নামে অভিহিত করা হইত। এস্থলে অসুর শব্দ দৈত্যজাতির বোধক নহে এবং অন্যান্য প্রাচীন দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্র সমূহেও অসুর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

অবগত হওয়া যায়। ইহা ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯তম সূক্ত। এই সূক্তই তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে (তৈঃ ব্রাঃ ২।৮।৯)। মহাভারতের নারায়ণীয় পাঠাধ্যায়ে এই সূক্তেরই আধারে জগতের প্রাথমিক সৃষ্টির বর্ণনা করা হইয়াছে (ম-ভা-শান্তিপর্ব ৩৪২।৮)। মানব-সভ্যতার অতি প্রাচীন যুগে যখন ঋগ্বেদেরও অধিকাংশ স্থূল নামরূপ বিশিষ্ট বহুসংখ্যক দেবতার স্তব-স্তুতিতে পরিপূর্ণ ছিল, তাহার মধ্যেও জগতের মূলতত্ত্ব এবং তাহা হইতে এই দৃশ্য-জগতের উৎপত্তি বিষয়ে এই সূক্তের ঋষি অপূর্ব মনীষা সহকারে যে সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন, এই প্রকার গভীর অধ্যাত্ম বিচারপূর্ণ অতি প্রাচীন রচনা সম্ভবতঃ জগতের অন্য কোন ধর্মগ্রন্থেই নাই। হিন্দুধর্মের ধর্মানুষ্ঠানমূলক দেব-দেবীর পূজাবহুল কর্মকাণ্ড এবং সুগভীর অধ্যাত্ম চিন্তামূলক জ্ঞানকাণ্ডের ধারা আবহমানকাল হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; ঋগ্বেদের নারদীয় সূক্তের ঋক্‌ গুলিতেই এই শেষোক্ত ধারার মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ধারা বহু জ্ঞান-তপস্বী ঋষির ঐকান্তিক সাধনালব্ধ জ্ঞানরসে পরিপুষ্ট হইয়া ভারতের অধ্যাত্মদর্শনরূপ সুগভীর ও সুবিশাল জ্ঞান প্রবাহে পরিণত হইয়াছে।

বৈদিক যুগে অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, সাবিত্রী, বরুণ প্রভৃতি বহুসংখ্যক দেব-দেবিগণ লক্ষ লক্ষ হিন্দুর হৃদয়ে পূজার আসন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল দেবতার পূর্বেই 'অসৎ' অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে 'সৎ' অর্থাৎ ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। 'দেবানাং পূর্ব্ব্যেযুগেঽসতঃ সদজায়ত' (ঋগ্বেদ ১০।৭২।৭)। সুতরাং দেবতারাও দৃশ্যজগতের সৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার পর উৎপন্ন হওয়ায়, তাঁহাদের জন্মের পূর্বে অনুষ্ঠিত সৃষ্টির মূলতত্ত্ব অবগত ছিলেন না। কিন্তু হিরণ্যগর্ভ দেবতাদের অনেক প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ। তিনিই আরম্ভে ভূতসমূহের পতি বা কর্তা ছিলেন—ভূতস্যজগতঃ পতিরেক আসীৎ (ঋগ্বেদ ১০।১২১)। কিন্তু তিনিও 'এই সৃষ্টির বিস্তার কোথা হইতে হইল, তাহা পরম আকাশে অবস্থিত এই জগতের অধিপতি জানেন' এই বলিয়া পরে না জানিতেও পারেন বলিয়া সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষ্‌ঃ পরমে ব্যোমন্ যো অঙ্গ বেদ যদি
বা ন বেদ॥
(নারদীয় সূক্ত, ৭ম ঋক্)

আকাশস্থ পরম দেবতা সৎ, অসৎ, আকাশ ও জল এবং ইহাদেরও পূর্ববর্তী বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন, এবং অব্যক্ত ও নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত নামরূপাত্মক মূলপ্রকৃতির সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হইল, নারদীয় সূক্তের ঋষির তৎসম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইয়াছিল কিনা, তাহা বুঝা না গেলেও সৃষ্টির মূলে যে এক অব্যক্ত, অচিন্ত্য ব্রহ্মশক্তি আছেন, ঋষির চিত্তে তদ্বিষয়ে কোন দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। 'এতাবান্ অস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ' (ঋগ্বেদ ১০।৯০।৩)। সমস্ত বিশ্বই যাঁহার মহিমা স্বরূপ, সেই মূল ও অনাদিতত্ত্ব যে সকলের অতীত ও সকল হইতে শ্রেষ্ঠ ও ব্যতিরিক্ত—ঋষি তাহা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ধ্যানসিদ্ধ ঋষি-তাপসের এইরূপ উপলব্ধির ফলেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা হয়।

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষ্‌ঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো
নির্গুণশ্চ॥
(শ্বেতাশ্বতর উঃ ৬।১১)

এক অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা সকল প্রাণীতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, তিনি সর্বব্যাপী ও সকলের চৈতন্যাভিব্যক্তির কারণ, নিরুপাধিক ও নির্গুণ—ঋষিরা এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়া সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মের ধ্যান-ধারণায় সমাহিত হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন। তাঁহাদের ধ্যানলব্ধ সত্যই একেশ্বরবাদের মূল ভিত্তিরূপে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

অধিকারী-ভেদে উপাসনা-পদ্ধতির ভেদ হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য। একদিকে ঋষি, তাপস ও উচ্চাধিকারিগণ জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভে পরিতৃপ্ত হইলেন। কিন্তু সমাজে এই শ্রেণীর জ্ঞানীর সংখ্যা অল্প। ইঁহাদের অতিরিক্ত বিপুল জনমণ্ডলী যাহারা নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা করিতে পারে না, তাহাদের ধর্ম-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রতীক উপাসনার ব্যবস্থা হইল। তাঁহারা তাঁহাদের আরাধ্য দেব-দেবীকে মৃত্তিকা, পাষাণ বা ধাতু-মূর্তিতে রূপায়িত করিয়া তাহাতেই ঈশ্বরত্ব আরোপপূর্বক সেই সকল প্রত্যক্ষদৃষ্ট দেবতার পূজায় আত্মনিবেদন করিলেন। কালক্রমে বৈদিক দেব-দেবীর অধিকাংশই লুপ্ত হইয়া গেল এবং পৌরাণিকযুগে বহুসংখ্যক দেব-দেবীর আবির্ভাব হইল এবং জনসমাজে তাঁদের পূজা প্রচলিত হইল। বৈদিকযুগের ৩৩টি দেবতার স্থলে পৌরাণিকযুগে দেব-দেবীর সংখ্যা ৩৩ কোটিতে পরিণত হইল। এইরূপে একেশ্বরের উপাসনা ও দেব-দেবীর পূজা হিন্দু-সমাজে যুগপৎ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।*

* এই প্রবন্ধ মূলতঃ অধ্যাপক মোক্ষমূলর প্রণীত 'Six Schools of Indian Philosophy' (ভারতীয় ষড়দর্শন) নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

একটি গুহার অভ্যন্তর। পিছনদিকে পাথরের গায়ে আঁকাবাঁকা ফাটল রহিয়াছে, উহাই গুহার প্রবেশ-পথ। ফাটল দিয়া দেখা যায় বাহিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া মেঘ ডাকিতেছে। গুহার ভিতরে মলিন স্যাঁতা আলোয় স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না।

পিছনের ফাটল দিয়া একটি যুবক ও একটি যুবতী ঢুকিয়া পড়িল। তাহাদের কাপড় চোপড় ভিজিয়া গিয়াছে। যুবকের হাতে একটি বড় টিফিন্-বাক্স, যুবতীর কাঁধ হইতে চামড়ার ফিতায় জলের বোতল ঝুলিতেছে

যুবতী: ব্বাবা—কী বিষ্টি! কী বিষ্টি।

যুবক: দুর্যোগ। আকাশ ভেঙে পড়ছে—বাপ! ভাগ্যিস গুহাটা ছিল—

যুবক হাতের টিফিন্-বাক্স মাটিতে রাখিল, যুবতী জলের বোতল নামাইল। ইতিমধ্যে পিছনের ফাটল দিয়া তৃতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করিল। বিরাটকায় এক কুলি; মাথার উপর সুট-কেস্ বিছানার হোল্‌ড‌ল্, হাতে বল্লমের মত তীক্ষ্ণাগ্র একটা লাঠি। সে আসিয়া মোট নামাইল, গামছা দিয়া মুখের ও গায়ের জল মুছিতে মুছিতে ভারী গলায় বলিল—

কুলি: আজ রাত্তিরে বিষ্টি ছাড়বেন না কর্তা।

কুলির চেহারা ভীমদর্শন হইলেও কথা বলিবার ভঙ্গীটি বেশ সরল ও গ্রাম্য—

যুবক: বলিস কি রে! তাহলে উপায়?

কুলি: উপায় আর কি আজ্ঞে, রাত্তিরটা এখানেই কাটাতে হবে।

যুবতী শঙ্কিতভাবে গুহার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল

যুবক: নাও—বোনের বিয়ে ভাখো এবার। এমন হতচ্ছাড়া দেশ তোমার বাপের বাড়ি—যে ষ্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে শহর। ষ্টেশনে একটা ট্যাক্সি পর্যন্ত পাওয়া যায়না।

কুলি: আজ্ঞে টেক্‌সি পাওয়া যায় কর্তা। আজ রেলগাড়ী দু'ঘণ্টা লেট্ ছিলেন, তাই টেক্‌সি-ওয়ালারা যে-যার ঘরে চলে গিয়েছেন।

যুবক: তখনই বলেছিলুম আজ ওয়েটিং রুমে রাত কাটানো যাক, কিন্তু তুমি বোনের বিয়ে দেখবার জন্যে একেবারে ছিঁড়ে পড়লে।

যুবতী স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, স্বামীর মুখের পানে ভীরু দৃষ্টি তুলিয়া বলিল,—

যুবতী: আমি কি জানতুম রাস্তার মাঝখানে ঝড়-বিষ্টি সুরু হয়ে যাবে? বোনের বিয়েতে এসেছি, বিয়েটাই যদি না দেখতে পেলুম—

যুবক: যাক গে, এখন আর ভেবে লাভ কি!— হ্যাঁ রে, বিষ্টি থামবে না তুই ঠিক জানিস?

কুলি: আজ্ঞে, এ সময়ের বিষ্টি একবার আরম্ভ হলে সহজে ছাড়েন না কর্তা, যদি ছাড়েন তো সেই শেষ রাত্তিরের দিকে।

যুবক: তাহলে আর উপায় কি? এ দুর্যোগে বেরুনো যাবে না, বেরুলে হয়তো পথ হারিয়ে বাঘের মুখে পড়ব। হ্যাঁ রে, এ গুহায় বাঘ ভাল্লুক আসে না তো?

কুলি: না কর্তা, বাঘ ভাল্লুক তো জঙ্গলে থাকেন, এখানে আসবেন কি জন্যে? আগে এই গুহায় সায়েব মেমেরা আসত চড়ুই ভাতি করতে, রাত্তিরে থাকত। ভয়ের কিছু নেই আজ্ঞে।

যুবকের ক্ষোভ ও দুশ্চিন্তা কাটিয়া গেল, অনিবার্যের নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়া সে হাসিয়া উঠিল

যুবক: তাহলে আমরাও আজ চড়ুই ভাতি করি। (স্ত্রীকে) কি বল? বোনের বিয়ে দেখতে পেলে না বটে, কিন্তু একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার তো হল।

যুবতীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল

যুবতী : আমার খুব ভাল লাগছে। সঙ্গে খাবার আছে, বিছানা আছে, কোনও কষ্ট হবে না। বরং—

যুবতী স্বামীর মুখের পানে অর্থপূর্ণ সলজ্জ দৃষ্টিতে চাহিল, তারপর বাহুতে হাত রাখিয়া হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—

যুবতী : হ্যাঁ গা, কুলিটাও থাকবে নাকি ?

যুবক যুবতীর মনের ভাব বুঝিয়া মৃদু হাসিল, তারপর কুলিকে প্রশ্ন করিল—

যুবক : তুই কি ঘরে ফিরে যেতে চাস্ ?

কুলি : এই ঝড়-বাদলে কোথায় যাব কর্তা। এখানেই এক পাশে গামছা পেতে শুয়ে থাকব আজ্ঞে।

যুবক : তা—বেশ।

যুবক-যুবতী পরস্পরের পানে চাহিয়া নিরাশা ব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিল। তারপর যুবক গুহার চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল—

যুবক : এস, গুহাটা ঘুরে ফিরে দেখা যাক।—বেশ বড় গুহা। হয়তো হাজার হাজার বছর আগে এখানে বর্বর মানুষ বাস করত। কে জানে—কেমন ছিল তাদের জীবনযাত্রা—

যুবক যুবতী অসমতল গুহাগাত্রের পাশে পাশে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। কুলিটা দুই হাঁটু তুলিয়া বসিয়া করতলে খৈনি ডলিতে আরম্ভ করিল। বাহিরে একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, বাঘের অন্তর্গূঢ় গর্জনের মত মেঘ ডাকিল

যুবতী : ওগো, ছাখো ছাখো—

যুবক যুবতী পরস্পর হইতে একটু পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, এখন যুবক যুবতীর কাছে গেল

যুবক : আরে! এ যে একটা পাথরের পাটা! খাসা বিছানা হবে এর ওপর।

যুবতী কিছুক্ষণ মোহাচ্ছন্ন চক্ষে প্রস্তরপট্ট নিরীক্ষণ করিল

যুবতী : মনে হচ্ছে যেন এই পাথরের ওপর কতবার শুয়েছি—(বিভ্রান্তভাবে চারিদিকে চাহিয়া) এখন যেন সব চেনা-চেনা লাগছে—। তোমার লাগছে না ?

যুবক : সে কি, চেনা-চেনা লাগবে কি করে, আগে তো কখনো এখানে আসিনি। তুমি হয়তো ছেলেবেলায় এসেছিলে—

যুবতী : না, এ গুহার কথা আমি জানতুমই না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—(হঠাৎ) ছাখ তো, ওই দেয়ালের খাঁজে কুলুঙ্গীর মত একটা ফুটো আছে কিনা।

যুবতী অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। যুবক নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখিল সত্যই দেয়ালের গায়ে একটি গর্ত আছে। সে বিস্মিত মুখে স্ত্রীর দিকে ফিরিল

যুবক। হ্যাঁ—আছে। তুমি জানলে কি করে ?

যুবতী : কি জানি।—কুলুঙ্গীর মধ্যে কিছু আছে ?

যুবক : (দেখিয়া) কিচ্ছু না—

যুবতী কাছে আসিল

যুবতী : কিচ্ছু নেই ?···কি যেন একটা থাকত ওখানে···মনে করতে পারছি না—

যুবক যুবতীর কাঁধ ধরিয়া নাড়া দিল

যুবক : কী যা-তা বকছ ? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

যুবতী এতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে কথা বলিতেছিল, এখন যেন তন্দ্রা ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিল। চোখের উপর দিয়া হাত চালাইয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিল

যুবতী : না—না—কল্পনা।—আজ তো এখানেই থাকতে হবে। তোমার খিদে পেয়েছে ?

যুবক : একটু একটু পেতে আরম্ভ করেছে।

যুবতী : এসো, খেয়ে নিই।

দু'জনে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। দেখিল, কুলি দুই হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া বোধহয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে

যুবক। তুমি খাবার বের কর, আমি ততক্ষণ বিছানাটা পেতে ফেলি।

হোল্ডল্ তুলিয়া লইয়া যুবক প্রস্তরপট্টের দিকে চলিয়া গেল, যুবতী টিফিন-বক্স খুলিয়া খাবার বাহির করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে যুবক বিছানা পাতিয়া ফিরিয়া আসিল। যুবতী তাহার হাতে টিফিন-বক্সের একটি বাটি দিল। যুবক খাবার মুখে তুলিতে গিয়া নিম্নস্বরে বলিল—

যুবক : ওর কুলোবে তো ?

যুবতী : কুলোবে।

যুবতী একটি বাটি হাতে কুলির কাছে গিয়া দাঁড়াইল

যুবতী : শুনছ ? একটু খেয়ে নাও—

কুলি হাঁটু হইতে মুখ তুলিয়া আরক্ত চক্ষে যুবতীর পানে চাহিল। যুবতী হঠাৎ ভয় পাইয়া পিছাইয়া গেল। কুলি হাত বাড়াইল, যুবতী

বাটি মাটিতে রাখিয়া পিছনে সরিয়া গেল। কুলি বাটি টানিয়া লইয়া খাদ্যদ্রব্যগুলি নিরীক্ষণ করিল, তারপর খাইতে আরম্ভ করিল।

যুবতী ফিরিয়া গিয়া স্বামীর পাশে দাঁড়াইল এবং শঙ্কিত চক্ষে কুলির দিকে চাহিয়া রহিল। যুবক আহার করিতে করিতে প্রশ্ন করিল—

যুবক : কি দেখছ ?

যুবতী : (চুপি চুপি) কিছু নয়···লোকটা এমনভাবে আমার পানে তাকালো যে আমার বুক কেঁপে উঠল। —হ্যাঁ গা, লোকটা ভাল তো ? যদি রাত্তিরে—

যুবক : কোনও ভয় নেই, আমার সঙ্গে পিস্তল আছে।—তুমি খেয়ে নাও।

দুইজন বাটি হাতে লইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে আহার করিল। যুবতীর উদ্বিগ্ন চক্ষু কিন্তু বারম্বার কুলির দিকে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। কুলির বাটিতে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে মাংসের হাড় ছিল, সে সেই হাড় মুঠিতে ধরিয়া অনেকক্ষণ চিবাইল। তাহার হাড় চিবাইবার ভঙ্গীতে যেন একটা বন্য ভাব রহিয়াছে।

ক্রমে আহার শেষ হইল। যুবক বোতল হইতে জল ঢালিয়া যুবতীকে দিল, নিজে পান করিল। তারপর কুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

যুবক। তুমি জল খাবে ?

কুলি : না হলেও চলে। যদি থাকে, দেন একটু।

যুবক কুলির অঞ্জলিতে জল ঢালিয়া দিল, কুলি পান করিল। পান করিতে করিতে সে চোখ তুলিয়া যুবকের পানে চাহিতে লাগিল। দু'জনের চোখেই উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা। শেষে কুলি মুখ মুছিয়া বলিল—

কুলি : এবার আপনারা শুয়ে পড়ুন আজ্ঞে। কোনও ভয় নেই, আমার সঙ্গে বরছা আছে। আমি গুহার মুখ আগ্‌লে শুয়ে থাকব।

যুবক : তোমারও কোনও ভয় নেই। আমার সঙ্গে পিস্তল আছে—এই ছাখো।

যুবক পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া দেখাইল

কুলি : আজ্ঞে ওটা কী কর্তা ?

যুবক : পিস্তল—ছোট বন্দুক। ফায়ার করব—দেখবে ?

যুবক পিস্তল উর্ধ্বদিকে ফায়ার করিল। গুহার মধ্যে প্রতিহত শব্দ ভীষণ শুনাইল

কুলি : ওরে ব্বাস্‌রে।

কুলি বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া পিছু হটিতে হটিতে গুহার মুখের দিকে চলিয়া গেল এবং সেখানে গামছা পাতিয়া শয়নের উপক্রম করিল।

যুবক তখন যুবতীর পানে চাহিয়া একটু অর্থপূর্ণ হাসিল, তারপর সুটকেস তুলিয়া লইয়া প্রস্তরপট্টের অভিমুখে গেল। জলের বোতল ও টিফিন-বক্সের বাটিগুলি লইয়া যুবতী তাহার পিছনে গেল। দুই জনে প্রস্তরপট্টের পাশে বসিল।

যুবক : (হাতের ঘড়ি দেখিয়া) রাত হয়েছে, এবার শুয়ে পড়া যাক।

যুবক কোট খুলিতে খুলিতে গুহার উর্ধ্বদিকে ইতস্তত তাকাইতে লাগিল, যুবতী নিজের খোঁপাটিকে কাঁটা দিয়া শক্ত করিয়া আঁটিতে প্রবৃত্ত হইল। যুবক যুবতীর দিকে দৃষ্টি নামাইল, তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—

যুবক। বেশ নতুন নতুন লাগছে—না ?

যুবতী : না।

যুবক একটু বিস্মিত ভাবে চাহিল

যুবক : নতুন লাগছে না ?

যুবতী : ভাল লাগছে, কিন্তু নতুন লাগছে না। মনে হচ্ছে এই পাথরের ওপর আমরা দু'জনে কতবার শুয়েছি—

যুবক : তোমার মাথা গরম হয়েছে। নাও, শুয়ে পড়।

যুবকের মুখে কিন্তু বিস্ময়ের সহিত উদ্বেগ মিশ্রিত হইয়া রহিল

গুহার মধ্যে আলো ক্রমশ কমিতে লাগিল, তারপর গাঢ় অন্ধকারে সব ঢাকা পড়িয়া গেল। কেবল গুহার প্রবেশ পথের ফাটল দিয়া মাঝে মাঝে বিদ্যুচ্চমকের প্রভা স্ফুরিত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে আবার ধীরে ধীরে গুহার মধ্যে আলো ফুটিতে আরম্ভ করিল। আলো স্পষ্ট হইলে দেখা গেল, গুহা ঠিক তেমনি আছে, কেবল বিছানা সুটকেস প্রভৃতি আধুনিক জিনিষপত্র অন্তর্হিত হইয়াছে। গুহার মধ্যস্থলে খানিকটা ভস্ম পড়িয়া আছে, যুবতী নতজানু হইয়া অঙ্গার-গর্ভ ভস্মের উপর শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে ফুঁ দিতেছে। যুবতীর পরিধানে হাঁটু হইতে কাঁধ পর্যন্ত পশুচর্ম, মাথায় একমাথা জটিল রুক্ষ চুল। গুহায় আর কেহ নাই, পিছনের ফাটল দিয়া বাহিরের উজ্জ্বল দিবালোক দেখা যাইতেছে।

যুবতীর ফুৎকারে আগুন জ্বলিল। সে তখন উঠিয়া কুলুঙ্গীর কাছে গেল। এই কুলুঙ্গী তাহার ভাড়ার, তাহার ভিতর হাত ঢুকাইয়া একটি মুষলাকৃতি আস্ত হরিণের ঠ্যাং বাহির করিয়া আনিল এবং আগুনের উপর ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সেটি ঝলসাইতে লাগিল। মাংস ঝলসাইতে ঝলসাইতে সে মাঝে মাঝে তাহা আঘ্রাণ করিয়া দেখিতে লাগিল এবং উৎসুক চক্ষে বারবার ফাটলের দিকে চাহিতে লাগিল। যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে।

গুহার বাহির হইতে দূরাগত মনুষ্য কণ্ঠের আওয়াজ আসিল—'কুউ—উ—'

যুবতী তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া উত্তর দিল—

যুবতী : কুউ—উ—

কিছুক্ষণ পরে ফাটলের ভিতর দিয়া যুবক প্রবেশ করিল, তাহার পরিধানে মৃগচর্ম, হাতে তীর ধনুক, চক্ষে ভয়ার্ত উত্তেজনা। সে আগুনের কাছে আসিয়া তীর ধনুক ফেলিয়া হাঁপাইতে লাগিল, যেন বহুদূর ছুটিয়া আসিয়াছে।

যুবতীর হাত হইতে অর্ধদগ্ধ রাং পড়িয়া গেল

যুবতী : কী—কি হয়েছে ?

যুবক : (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) ভিল্লা জানতে পেরেছে।

যুবতী : (সংহতস্বরে) জানতে পেরেছে !

যুবক : হাঁ, আমরা কোথায় লুকিয়ে আছি জানতে পেরেছে, আমাদের গুহার সন্ধান পেয়েছে—

যুবতীর মুখ হইতে একটা অবরুদ্ধ কাকুতি বাহির হইল, সে যেন তাহা রোধ করিবার জন্যই নিজের বাঁ হাতের কব্জি তীক্ষ্ণদন্তে কামড়াইয়া ধরিল

যুবক : (অসংলগ্নভাবে) বনের মধ্যে শিকার পেয়েছিলাম—একটা হরিণের পিছু নিয়েছিলাম—কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ দেখলাম। ভিল্লাও হরিণটার পিছু নিয়েছে—ভিল্লার হাতে ছিল শুধু বরছা—আমি তাকে দেখার আগে সে আমাকে দেখেছিল—বরছার পাল্লার বাইরে ছিলাম তাই মারতে পারেনি—আমি তাকে যেই দেখতে পেয়েছি অমনি সে হা হা করে হেসে উঠল—হরিণটা পালিয়ে গেল—

যুবতী : তারপর ?

যুবক : ভিল্লা হেসে বললে—'আর তুই যাবি কোথায়, আমার তিন্নিকে চুরি করে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস আমি জানতে পেরেছি, এবার তোকে কুচি কুচি করে কাটব।' আমি ধনুকে তীর পরালাম, অমনি ভিল্লা একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। আমি তখন ছুটে চলে এলাম।

যুবতী : (কাঁদিয়া উঠিয়া) কী হবে—কী হবে ! ভিল্লা ভয়ানক কুচুটে, সে তোকে মেরে ফেলবে—তার গায়ে ভীষণ জোর—

যুবক তীর ধনুক তুলিয়া লইল, তাহার চক্ষু হিংস্রভাবে জ্বলিয়া উঠিল

যুবক : ভিল্লা যদি আমার গুহায় আসে আমি তাকে তীর দিয়ে বেঁধে মেরে ফেলব।

যুবতী : তাকে মারতে পারবি না—সে কুচুটে—ভয়ানক ফন্দিবাজ—তার গায়ে গণ্ডারের মত জোর—আমি জানি তুই তাকে মারতে পারবি না—

যুবতী মাটিতে বসিয়া পড়িল, সম্মুখে ও পিছনে দুলিতে দুলিতে সুর করিয়া বলিতে লাগিল—

যুবতী : আমি জঙ্গলের মেয়ে, নিজের জাতের মধ্যে জঙ্গলে ছিলাম—ভিল্লা ছিল সর্দারের ছেলে—সে আমাকে চাইত, ভালুক মেরে আমাকে চামড়া এনে দিত—আমার তাকে ভাল লাগ্‌ত না—তুই ভিন্‌ জাতের মানুষ, তোকে ভাল লাগ্‌ল—তোর সঙ্গে তোর গুহায় পালিয়ে এলাম !—এখন কী হবে—এখন কী হবে ? ভিল্লা তোকে মেরে ফেলবে—সে বড় হিংসুক—

সহসা যুবতী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যুবকের বাহু দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্রস্বরে বলিল—

যুবতী : চল্‌ আমরা পালিয়ে যাই, গুহা ছেড়ে পালিয়ে যাই, তাহলে ভিল্লা আমাদের খুঁজে পাবে না—

যুবক : (গর্জিয়া উঠিল) না, আমার গুহা আমি ছাড়্‌ব না—ভিল্লাকে আমার গুহা দেবনা—

এই সময় বাহিরে একটা বিকট শব্দ হইল। যুবক যুবতী ক্ষণকাল স্তব্ধ একাগ্রভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আবার বিকট শব্দ হইল। যুবতী উত্তেজিত নিম্নস্বরে বলিল—

যুবতী : ভাল্লুক ! ভাল্লুক ডাকছে !! বোধহয় পোড়া মাংসের গন্ধ পেয়ে এদিকে আসছে—

যুবক ত্বরিতে তীর ধনুক তুলিয়া লইল

যুবতী : তীর ধনুক দিয়ে ভাল্লুক মারতে পারবি না। দাঁড়া, আমি ভাল্লুক তাড়াচ্ছি। আগুন দেখলেই পালাবে।

যুবতী একখণ্ড ধূমায়িত কাঠ তুলিয়া মশালের মত ঊর্ধ্বে ধরিয়া ফাটলের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। যুবক ধনুকে তীর সংযোগ করিয়া শক্ত সতর্ক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবতী ফাটল দিয়া বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তাহার

কণ্ঠের তীব্র মর্মান্তিক চীৎকার শোনা গেল। যুবক ধনুর্বাণ হাতে কাটলের দিকে ছুটিল, তারপর থমকিয়া দাঁড়াইল।

কাটলের ভিতর দিয়া যুবতী আসিতেছে, তাহার পিছনে ভালুকের মত কালো রোমশ একটা জীব। যুবতীর দুই হাত ভীতভাবে সম্মুখে প্রসারিত; ওষ্ঠাধর চীৎকারের ভঙ্গিতে উন্মুক্ত, কিন্তু কণ্ঠ দিয়া চীৎকার বাহির হইতেছে না।

যুবক: (চমকিয়া) ভিল্লা!

ভিল্লা: হ্যাঁ, ভাল্লুক নয়—আমি ভিল্লা। তীরধনুক ফেলে দে, নৈলে তিন্নিকে বরছা বিঁধে মেরে ফেল্‌ব।

যুবক: ভিল্লা, ছেড়ে দে—আমার তিন্নিকে ছেড়ে দে—

ভিল্লা: তুই আগে তীরধনুক ফেলে দে।

যুবতীর পিছনে ভল্লুকের চামড়া পরিয়া আসিতেছিল ভিল্লা। সে বিকট অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

যুবক তীরধনুক ফেলিয়া দিতেই ভিল্লা যুবতীকে সজোরে সামনে ঠেলিয়া দিল। যুবতী কয়েক পা আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে ভিল্লা হাতের বল্লম ছুঁড়িয়া যুবককে মারিল। যুবক আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল।

এতক্ষণে ভিল্লাকে দেখা গেল। সে আর কেহ নয়, পূর্বে যাহাকে কুলিরূপে দেখা গিয়াছিল সেই ভীষণাকৃতি লোকটা। সে এখন বল্লবিদ্ধ যুবকের বুকের উপর লাফাইয়া পড়িল এবং তাহার মাথাটা বারবার মাটিতে ঠুকিতে লাগিল।

যুবতী ছুটিয়া আসিয়া পিছন হইতে ভিল্লার চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে উন্মত্তার মত বলিল—

যুবতী: ছেড়ে দে—ওকে ছেড়ে দে—রাক্ষস—

ভিল্লা উঠিয়া যুবতীর হাত চাপিয়া ধরিল, সবলে আকর্ষণ করিয়া উল্লসিত স্বরে বলিল—

ভিল্লা: মরে গেছে—ওকে মেরে ফেলেছি। এখন তুই আমার—আমার—

যুবতী হাত ছাড়াইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। ভিল্লা তাহাকে আগুনের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। আগুনের পাশে অর্ধদগ্ধ অস্থিমাংস পড়িয়াছিল, সে তাহা বাঁ হাতে তুলিয়া লইয়া মহানন্দে হা হা হাস্য করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। যুবতী হাত ছাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টায় ফুঁপাইতে লাগিল—

যুবতী: ছেড়ে দে—রাক্ষস! ছেড়ে দে আমায়—

ভিল্লা তাহার আকুতি গ্রাহ্য করিল না, বিজয়দীপ্ত চক্ষে গুহার চারিদিকে চাহিল, মাংসে কামড় দিয়া পরিপূর্ণ মুখে বলিল—

ভিল্লা: এ গুহা আমার—তুই আমার—(যুবকের মৃতদেহ দেখাইয়া) ওকে গুহার মুখের কাছে পুতে রাখব—ও যক্ষি হয়ে আমার গুহা পাহারা দেবে।

ভিল্লা ভুক্তাবিশিষ্ট মাংস যুবতীর মুখের কাছে ধরিয়া বলিল—

ভিল্লা: নে—খা—

যুবতী: (সতেজে) খাবনা।

ভিল্লা হাড়সুদ্ধ মাংস যুবতীর মুখে গুঁজিয়া দিয়া ক্রুদ্ধ গর্জনে বলিল—

ভিল্লা: খা—খেতে হবে। আজ থেকে তুই আমার—তোকে আমার এঁটো খেতে হবে।—কী। খাবিনা?

ভিল্লা মুগুরের মত অস্থিখণ্ড দিয়া যুবতীর মাথায় প্রহার করিল. যুবতী মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। ভিল্লা অস্থিখণ্ড ফেলিয়া দিয়া আরক্ত চক্ষে মূর্ছিতা যুবতীর পানে চাহিয়া রহিল—

ভিল্লা: আজ খাবিনা কাল খাবি। না খেয়ে তুই যাবি কোথায়। তুই আমার—একবার পালিয়েছিলি, আর পালাতে দেব না—

যুবকের দিকে ফিরিয়া সে তাহার দেহ হইতে বরছা টানিয়া বাহির করিয়া লইল, কিছুক্ষণ তৃপ্তিপূর্ণ চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিল—

ভিল্লা: তোকে পুতবো—তুই আমার গুহা পাহারা দিবি—

ভিল্লা নতজানু হইল, ভল্লের অগ্রভাগ দিয়া মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল—

আবার গুহার আলো ক্ষীণ হইয়া সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে যুবতীর কণ্ঠের তীব্র চীৎকার শোনা গেল—তারপর দ্রুত আলো ফুটিয়া উঠিল।

দেখা গেল গুহা আবার বর্তমান কালে ফিরিয়া আসিয়াছে. প্রস্তরপট্টের শয্যায় যুবতী আলুথালু ভাবে উঠিয়া বসিয়া যুবকের গা ঠেলিয়া জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। যেখানে ভিল্লা মাটি খুঁড়িতেছিল সেখানে কুলি বরছা দিয়া মাটি খুঁড়িতেছে। মানুষগুলির বেশবাস পরিবর্তিত হইয়া আবার বর্তমান কালের বেশবাসে পরিণত হইয়াছে

যুবতী: ওগো—ওগো—

যুবক ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল

যুবক: কে?—কী—ভিল্লা কোথায়?

যুবতী: অ্যাঁ! তুমিও স্বপ্ন দেখেছ?

দুই জনে ব্যাকুলভাবে পরস্পরের পানে চাহিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তারপর যুবক শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; মুখের উপর হাত চালাইয়া বলিল—

যুবক : স্বপ্ন !—ভিল্লা কোথায় গেল ?

যুবতী কুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া শিথিল দেহে আবার শুইয়া পড়িল। যুবক দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল কুলি তাহাদের দিকে পিছন করিয়া বল্লম দিয়া মাটি খুঁড়িতেছে। যুবক বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কুলির পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

যুবক : এই ! কি করছিস ?

কুলি বরছা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তন্দ্রাবিষ্ট চোখে যুবকের পানে চাহিয়া রহিল।

যুবক তাহার গায়ে একটা মৃদু রকমের ঠেলা দিল।

যুবক। কি করছিস ? মাটি খুঁড়ছিস কেন ?

কুলি যেন চমকাইয়া তন্দ্রাবেশ হইতে জাগিয়া উঠিল, চকিতে চারিদিকে চাহিয়া স্খলিতস্বরে বলিল---

কুলি : অ্যাঁ ! আমি তো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আজ্ঞে—

যুবক : মাটি খুঁড়ছিলি কেন ? মাটির তলায় কি আছে ?

কুলি : (মাথা চুল্‌কাইয়া) তা তো জানিনে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি যেন স্বপ্ন দেখলাম আজ্ঞে—

যুবক : তুইও স্বপ্ন দেখেছিস ? বেশ তবে খোঁড়্।

কুলি : খুঁড়্‌ব ?

যুবক : হ্যাঁ খোঁড়্। হয়তো কিছু আছে।

কুলি : আজ্ঞে।

কুলি আবার খুঁড়িতে আরম্ভ করিল, যুবক কিছু দূরে সরিয়া আসিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ কুলি ভীতভাবে বরছা ফেলিয়া পিছু সরিয়া আসিল

কুলি : ওরে ব্বাবা।

যুবক : কি হল ?

কুলি : ওখানে কি একটা রয়েছেন।

যুবক : কী রয়েছে ?

কুলি : আজ্ঞে মড়ার মাথা। আপনি দেখেন না কর্তা—মড়ার খুলি। ওরে ব্বাবারে !

যুবক গর্তের কাছে গিয়া বল্লমের চাড়া দিয়া একটা নর-করোটি বাহির করিল। করোটি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া সে একদৃষ্টে তাহা দেখিতে লাগিল

যুবক : কার করোটি···আমার ?

পিছনের ফাটল দিয়া তখন মেঘাচ্ছন্ন ভোরের আলো দেখা দিয়াছে

বিদ্যাসাগর

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কত রূপে হেরিয়াছি তোমারে সাগর,
দৈন্যের তামসীরাত্রে দীপ্তচূড় তরঙ্গে সুন্দর,
করুণার চন্দ্রিকায় আনন্দে উজ্জ্বল
সংগ্রামে ঝঞ্ঝার সাথে উদ্বেল উচ্ছল
তোমার নীলিমা
মিশিয়া ব্যোমের সাথে খুঁজিয়াছে অনন্তের সীমা।
তোমার ঘটনাঘন জীবনের কথা
স্মরিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ, কখনও বা পাইয়াছি ব্যথা।

সকলি ভুলিয়া গেছি, স্মরি যবে জীবন তোমার
একটি সামান্য তুচ্ছ চিত্র মনে জাগে বার বার।
দরিদ্র সংসারে তৈল, বাতি কোথা পাবে ?
গৃহে তাই আলোর অভাবে
পথের আলোর পাশে পুঁথিখানি হাতে
পড়িছ তদ্‌গত চিত্তে দাঁড়াইয়া তুমি ফুটপাথে।
জনকোলাহলময় পাশে রাজপথ
গর্জ্জিয়া চলিয়া যায় কত অশ্ব রথ,
উড়িছে শলতকুল মাথার উপরে
বাহ্যজ্ঞানশূন্য তুমি মগ্ন শুধু পুঁথির অক্ষরে।

কত লোক এলো গেলো চাহিল কি কেহ অপলকে ?
চিনিল কি মহামানবকে ?
বুঝিল কি দীনহীন সাজে
"স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেধাপেক্ষঃ" সেথায় বিরাজে ?
বুঝিল কি পথচারী কোন নারীনর
পথপাশে সে গোষ্পদে সংহত সাগর।

বাংলার সঙ্গীত-পরিক্রমা

শ্রীজয়দেব রায়

বাংলার সঙ্গীত পরিক্রমার প্রাচীনতম নিদর্শন রহিয়াছে দশম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী চর্য্যাগান, গীতগোবিন্দ এবং লোচন পণ্ডিতের রাগ তরঙ্গিণীতে। চর্য্যাগানগুলি ছিল বৌদ্ধ সাধকদের সাধনসঙ্গীত, এগুলির শীর্ষদেশে নানা কুলীন শ্রেণীর রাগরাগিণীর নাম আছে, তবে গানের ভাব, ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীর ধরণ দেখিয়া অনুমান করা হয়, তাহাদের গীতিরীতি লোক-সঙ্গীতের গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল।

এ সকল গানে 'ধ্রু' কথাটি অনেক স্থানে রহিয়াছে; 'ধ্রু' ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদের সঙ্কেতচিহ্ন বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া মনে হয়—যে উদ্দেশ্যে এ গানগুলি রচিত হয়, 'ধ্রুপদের' নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিলে তাহা সিদ্ধ হইত না। সাধারণ জনগণের কাছে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের রীতিনীতি প্রচারই চর্য্যাগানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

'গীতগোবিন্দ' বিদেশী শাসনের সূত্রপাতের আগেই রচিত। আমরা আজ যে উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত, তাহার উদ্ভব মুসলমান আমলের দরবারে। শ্রীজয়দেবের সময়ে সে দরবারী সঙ্গীতের প্রভাব বাংলাদেশে সঞ্চারিত হয় নাই। গীতগোবিন্দের সুরতালে দক্ষিণী বা কর্ণাটীয় সঙ্গীতের প্রভাব সুস্পষ্ট। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বলেন,—

"যে সব ঘরানাতে জয়দেবের গান সংরক্ষিত আছে, সেখানে গীতগোবিন্দের গান শিখিতে গিয়া বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব্ব সঙ্গীতাধ্যাপক মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিত ভামরাও শাস্ত্রী তাঁহার স্বরলিপি ও তানের বাঁট লইয়া আসেন। সেই বাঁট দেখিয়া আচার্য্য ভাতখণ্ড বলেন, "একি! এসব যে মালাবারের জিনিষ!"

জয়দেবের ঠিক পূর্ব্বে বল্লাল সেনের রাজসভায় সভাগায়ক ছিলেন লোচন পণ্ডিত। তিনি ছিলেন ভারতীয় সঙ্গীতের যুগ প্রবর্ত্তক আচার্য্য। শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর'কেই ভারতীয় সঙ্গীতের আদি ও প্রাথমিক সঙ্গীত শাস্ত্র বলিয়া ধরা হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে রচিত হয় এই গ্রন্থ। তাহারও বহু পূর্ব্বে বাংলার সঙ্গীতাচার্য্য লোচন পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গীত-তরঙ্গিণী রচনা করেন।

লোচন সঙ্গীতকে দুইটি শাখায় বিভক্ত করিয়াছিলেন—'মার্গ সঙ্গীত' এবং 'দেশী সঙ্গীত'। তিনি রাগশ্রেণীকে 'জনক' এবং তাহা হইতে জাত ধারাকে 'জন্য' নামে অভিহিত করেন।

লোচনের পরে সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু সঙ্গীত বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, শার্ঙ্গদেব রচনা করেন 'সঙ্গীত রত্নাকর', দামোদর মিশ্র 'সঙ্গীত দর্পণ', অহোবল 'সঙ্গীত পারিজাত'; তাহা ছাড়া সঙ্গীত রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ, রাগমঞ্জরীর রচয়িতা পুণ্ডরীক বিট্ঠল; রাগবিরোধ ও স্বরমেলকলানিধি রচয়িতা রামামাত্য এবং হৃদয়নারায়ণ, ভাবভট্ট, শ্রীনিবাস পণ্ডিত, রাগকল্পদ্রুম রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ ব্যাস প্রভৃতি বহু গুণী প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাঁহারা সকলেই লোচনের মতামত শ্রদ্ধান্তরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে বহু রাগরাগিণীর নাম আছে, কিন্তু এ সকল গানের গীতিরীতি মোটেই অভিজাত শ্রেণীর ছিল না। তারপর বহুদিন বাংলা দেশের সঙ্গীতে রাগকৌলীন্য ছিল না বলিলেই হয়।

শ্রীচৈতন্যের পরে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক নব জাগরণ আসিল। কীর্ত্তন গানের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপিত হইল। এই সময়ের বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন নরহরি চক্রবর্ত্তী। তাঁহার 'ভক্তিরত্নাকরে' সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। তিনি ঐ সকল প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্র হইতে নানা উদ্ধৃতি চয়ন করিয়াছেন। তাহা হইতে বাংলাদেশের সঙ্গীতের ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণও পাওয়া যায়।

ভারতীয় রাগরাগিণীর বিশ্লেষণ করিয়া তিনি তাহার বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর কীর্ত্তন গানের প্রবর্ত্তন ও প্রতিষ্ঠা করেন। নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার যোগ্য সম্মান পান নাই।

তাঁহার নির্দিষ্ট পন্থানুসারে সমগ্র পদাবলী গীত হইত। কীর্ত্তনের রীতিতে গায়করা সুরের একটি অবাধ স্বাধীনতা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা নিজেদের মনোমত আঁখর সংযোজন করিয়া গানগুলি গাহিতে পারিতেন। তাহার ফলে সুরের নব নব রূপরূপান্তর ও সংস্করণ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

পদাবলী গানগুলিকে সংকলন করিয়া যে সকল পদসংগ্রহ রচিত হইয়াছে, সেগুলিতে সম্পাদকগণ রাগরাগিণীর এবং তালের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অনুমান করা যায় যে পূর্বে ঐ সকল বিশিষ্ট রাগিণী কীর্ত্তন গানে নিষ্ঠাভরে অনুসৃত হইত। বাংলা দেশের মন্ত্রোচ্চারণ, লৌকিক পূজাগীতিতেও এই রকম উচ্চাঙ্গের রাগিণীর উল্লেখ আছে।

বাংলা দেশের সঙ্গীতের রাগনিষ্ঠার এই উদাহরণ লক্ষণীয়। সকল প্রাচীন গানের শীর্ষে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। স্বরলিপি রচিত হয় নাই, গীতভঙ্গী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রাগিণীর নামোল্লেখ যথারীতি গানগুলি বহন করিয়া আসিতেছে। নানা নূতন নূতন রাগিণীরও উল্লেখ আছে। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গের রাগিণীর সঙ্গে মিশ্রণ করিয়া বাঙ্গালা দেশে গৌড়ী, বঙ্গাল প্রভৃতি নামাঙ্কিত নানা নূতন নূতন রাগিণীর উদ্ভব হইল।

কীর্ত্তন গান বাঙ্গালীর এক নিজস্ব বিশিষ্ট সৃষ্টি। কবি রবীন্দ্রনাথ তাহার সুরের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"বাংলা দেশে কীর্ত্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ।"

এই প্রবল হৃদয়াবেগের আকর্ষণে দেশের সমস্ত কবি এবং সঙ্গীত

কীর্তনের সুরে মাতিয়া উঠিলেন। এই সুরে সকলে মিলিয়া যেমন রচনা করিলেন পদাবলী সাহিত্য, তেমনি করিলেন অসংখ্য পল্লীসঙ্গীত। সাধারণ পল্লীসঙ্গীতের সুর সৌষ্ঠবের মধ্যে যে উচ্চাঙ্গ রাগরাগিণীর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহা এইভাবে কীর্তনের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিচিত্র কলাকৌশলের সঙ্গে অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও কি ভাবে যে উচ্চাঙ্গের রাগিণী তাঁহাদের গানে আশ্রয় পাইয়াছে ভাবিলে বিস্ময় লাগে !

কীর্তন গানের মধ্যে এক বহুশাখান্বিত নাট্যরসের সন্নিবেশে এক একটি পালার সৃষ্টি হইয়াছে। সুরের সাহায্যে সেগুলির অভিনয় হইত। উচ্চাঙ্গের কীর্তন গানের মধ্যে গুণীরা ধ্রুপদী ভঙ্গীর সমাবেশ করিতেন। রাগরাগিণীর কালোয়াতি কসরৎ বাঙ্গালী শ্রোতারা পছন্দ করিত না, সেই কারণে উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চা একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর ছিল এই রকম একটি গোষ্ঠী কেন্দ্র।

বাংলা দেশে কীর্তনের পরেই টপ্পারীতির সমাদর হয়। কীর্তনের মতন টপ্পাতেও এদেশের গুণীরা নূতন ভাব সঞ্চারিত করিলেন। নিধুবাবু হিন্দীতে রচিত 'শোরীর টপ্পা'র হুবহু অনুকরণে বাংলা টপ্পা রচনা করিলেও তাহার সুরের কলাকৌশলের সূক্ষ্ম জটিলতা প্রাঞ্জল করিয়া লইলেন। তাঁহার টপ্পার মধ্যে যে রকম সুরের লীলায়িত স্বচ্ছন্দ-গতির সাফল্য দৃষ্ট হয়, কীর্তন গানের মধ্যে তাহা নাই। কেবল টপ্পাই নয়, কীর্তন এবং বাউল ছাড়া সকল প্রকার প্রাচীন বাংলা গানে কথার দায়িত্ব সুরের গতির উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হইত। গানের কথাকে প্রসারিত করিয়া গায়করা টপ্পা গানে বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিলেন।

কীর্তন ও টপ্পাই বাংলার সকল প্রকার গানের প্রকাশ পথ বা গীতিরীতি। টপ্পার প্রভাবে বাংলার অতি সাধারণ পল্লীগানেও সাতটি সুরের সমাবেশ হইয়াছে। অন্য কোন দেশের লোকসঙ্গীতে এক সঙ্গে সাতটি সুরের লহরী দেখা যায় না। টপ্পা গানের রীতিই বাংলা দেশের আসরী সঙ্গীতের অবলম্বন হইয়া উঠিল; কবির গান, পাঁচালী গানের মধ্যে তাহা অঙ্গাঙ্গী ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া গেল।

বাংলা দেশের রাজরাজড়া জমিদার শ্রেণীর লোকেরা ধ্রুপদ-খেয়াল অঙ্গের কালোয়াতি গানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। বিষ্ণুপুরে যেমন একটি সঙ্গীতকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই রকম ত্রিপুরা ও ঢাকার দরবারও সঙ্গীতচর্চার কেন্দ্র হইয়া উঠে। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রের সভায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সুরগুরু যদুভট্ট।

কলিকাতার আভিজাত ধনীরাও সঙ্গীতের আদর করিতেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উনবিংশ শতাব্দীতে আর একটি সঙ্গীতের পরিবেশ সৃষ্ট হয়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী এবং পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীতে অনেক গুণী সঙ্গীতজ্ঞ স-সমাদরে আশ্রয় পাইলেন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, নুলো গোপাল (গোপাল চক্রবর্তী), নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি গুণীদের অনেকে কেবল সঙ্গীতচর্চাই করেন নাই, সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয় লইয়াও আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে হিন্দী রাগসঙ্গীতের অবিকল অনুকৃতিতে বাংলা গান রচনা সুরু হইল। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার পুত্র প্রমোদকুমার ঠাকুর এদেশে বিলাতী সঙ্গীতের আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সহজ আকারমাত্রিক স্বরলিপি সম্পাদন করিয়া সুরকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার নির্দেশ দিলেন। শৌরীন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও ছিলেন সঙ্গীতের একজন পৃষ্ঠপোষক।

অঘোর চক্রবর্তী, অনন্তলাল চক্রবর্তী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবলাল চক্রবর্তী, গঙ্গানারায়ণ গোস্বামী, গুরুপ্রসাদ মিশ্র, আবদুল করিম, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, লালচাঁদ বড়াল, শ্যামসুন্দর মিশ্র, উদয়চাঁদ গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গায়করা এককালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।

বাংলা দেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গতি তারপর সহসা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেকালের সেই রসবিমুগ্ধ সমজদার শ্রোতারা আজ আর নাই, রবীন্দ্রনাথ একদিন তাই গভীর আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন—

"পঞ্চাশ বছর আগে একদিন ছিল যখন বড় বড় গাইয়ে দূর দেশ থেকে কলকাতা শহরে আস্‌ত। ধনীদের ঘরে মজলিস বস্‌ত, ঠিক সমে মাথা নাড়্‌তে পারে এমন মাথা গুণ্‌তিতে নেহাত কম ছিল না। এখন আমাদের শহরে বক্তৃতা সভার অভাব নেই, কিন্তু গানের মজলিস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত তানমানলয় সমেত বৈঠকী গান পুরোপুরি বরদাস্ত করতে পারে এত বড় মজবুত লোক এখনকার যুবকদের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না।"
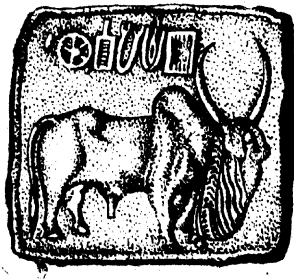
প্রতিভা-পরিচিতি

চিত্রশিল্পী মেসনেয়ার

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ফরাসীর প্রতিভাবান শিল্পী জাঁ লুই আর্নেষ্ট মেসনেয়ার তাঁর শিল্পী-জীবনের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্য্যন্ত যে কঠোর সংগ্রাম এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যাপন করেছেন, অন্য কোন সাধারণ মানুষ হলে সে-অবস্থায় হয়ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হোয়ে নিশ্চিহ্ন হত। কিন্তু মেসনেয়ারের মনোবল ছিল অসীম, সাহস ছিল দুর্জ্জয়, অধ্যবসায় ছিল অদম্য এবং সর্ব্বোপরি ছিল অপ্রতিরোধ্য প্রতিভার দীপ্তি, যার তেজ শেষ পর্য্যন্ত সকল বাধাবিঘ্নকে হটিয়ে দিয়ে তাঁকে জগতের কাছে দীপ্যমান করেছে।
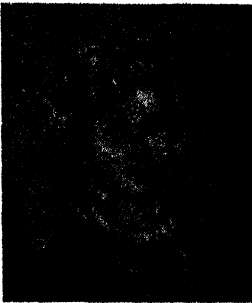
মেসনেয়ারের বাল্যকালের ছবি : তাঁর মায়ের আঁকা

মেসনেয়ারের বাবা
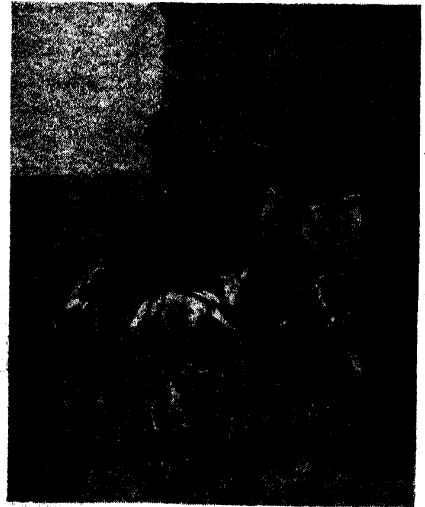
মেসনেয়ারের মা

গার্ড রুম : মেসনেয়ারের একটি শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন

নাটকের মতো ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁর জীবনের প্রতি অঙ্ক রোমাঞ্চিত। প্রতি দৃশ্যে অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্র, অকল্পিত বিস্ময়। বয়স তখন আঠারো কি কুড়ি। বাপের সামনে দাঁড়িয়ে সবিনয়ে কিশোর মেসনেয়ার বললেন—"আমায় তিনশো ফ্রাঁ (ফরাসী মুদ্রা) দাও। আমি আর কখনো তোমার কাছে কিছু চাইব না। এবং যতদিন না নাম করতে পারি বা উপার্জ্জন-সক্ষম হই ততদিন এ বাড়ীর চৌকাঠ আর মাড়াবো না।"

ছেলের কথা শুনে বাপ তো স্তম্ভিত! তিনশো টাকা নিয়ে ছেলে কোথায় যাবে, কি করবে, কেমন ক'রে কতদিনই বা ঐ সামান্ত টাকায় তার চলবে? কিন্তু দেখলেন, ছেলের জেদ চেপেছে ভয়ংকর। ভারী এক-রোখা ছেলে। তাছাড়া জানতেন, ছেলে তাঁর নির্ব্বোধ নয়, ছবি আঁকবার হাতও তার আছে. তাই তার প্রেরণাকে নিরুদ্ধ না ক'রে তিনি ছেলেকে একটি সর্ত্ত দিলেন। মেসনেয়ার যদি এক সপ্তাহের মধ্যে কোন বড় শিল্পীর কাছে শিক্ষানবিশী জোটাতে পারেন তাহলে তাঁর বাবা বুঝবেন যে, হ্যাঁ, ছেলের সত্যিই এলেম আছে এবং তাহলে তিনি তাকে টাকা দেবেন।

মেসনেয়ার বেরুলেন শিক্ষকের খোঁজে—কোথায় গুরু, কোথায় সেই শিক্ষক যিনি এক উন্মেষ-উন্মুখ প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করবেন? জুল্স্ পশিয়ে শহরের সে-সময়কার সবচেয়ে বড় চিত্রশিল্পী রূপে স্বীকৃত হতেন। মেসনেয়ার তাঁর কাছে গেলেন। ছবি এঁকে জীবিকা অর্জ্জন করতে চাও? আমার কোন ছেলে থাকলে তাকে জুতো সেলাইএর কাজ করতে বলতাম, তবু ছবি আঁকতে বলতাম না। উপদেশ দিলেন পশিয়ে। কিন্তু নাছোড়বান্দা মেসনেয়ার। তাঁর কাজগুলো দেখুন না পশিয়ে একবার! পশিয়ে দেখলেন, বললেন, সত্যিই তোমার আঁকা? মেসনেয়ার সেইখানে বসে সত্ত সত্ত একটি ছবি এঁকে দেখালেন। তাঁর পিঠ চাপড়ে শিক্ষক বললেন—আজ থেকে তুমি আমার ছাত্র হোলে। ছাত্রের কাছে গুরু যে শিগগিরই কাৎ হবে তাতে আর সন্দেহ নেই। তোমার বাবাকে বলে দাও গে।"

এমনি নাটকীয়ভাবেই মেসনেয়ারের চির-সাধের শিল্পী-জীবন শুরু হোয়েছিল।

মেসনেয়ার অঙ্কিত তিনটি বিভিন্ন চরিত্রের অভিব্যক্তি

মেসনেয়ারের আঁকা "সরাইখানা"

* * *

১৮১৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী লিয়নস শহরে মেসনেয়ারের জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকবার দিকে তাঁর অদম্য আকর্ষণ ছিল। ইস্কুলের ক্লাসে বসে খাতার মধ্যে অঙ্কের হিসাবের চেয়ে ছবির লাইন-গুলিই বেশী ক'রে ফুটে উঠ্‌তো। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছাত্রের

সম্বন্ধে তার মায়ের কাছে রিপোর্ট পাঠালেন যে, ছাত্রটি এদিকে খুবই ভাল, কিন্তু লেখাপড়ায় তার মন নেই. সময় নেই অসময় নেই, খাতার পাতায় ছবি আঁকে, এমন ধারা ছাত্রকে নিয়ে তিনি একটু মুস্কিলেই পড়েছেন।

মেসনেয়ারের মা নিজে ছিলেন চিত্রাঙ্কন-বিদ্যায় পারদর্শিনী। আর্টের সমজদার ছিলেন তিনি। নিজের ছেলের যে প্রতিকৃতি তিনি পেন্সিল দিয়ে এঁকেছিলেন তা মেসনেয়ার চিরদিন অমূল্য সম্পদের মতো সযত্নে রক্ষা করে রেখেছিলেন।

মেসনেয়ার অংকিত : "রাজরাস্তায় দাঙ্গাবাজি"

মেসনেয়ারের আঁকা : "বন্ধুর কাছে বন্ধুর চিঠি পড়া"

বাপ দিলেন অনেক বকুনি। কিন্তু মা দিলেন উৎসাহ। মায়ের কাছে প্রেরণা আর সহানুভূতি না পেলে মেসনেয়ারের জীবন অন্য পথেই সম্ভবত প্রবাহিত হত। অকস্মাৎ ১৮২৫ সালে সেই স্নেহময়ী মাকে হারিয়ে মেসনেয়ার চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখলেন। যে জীবন সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল সেই নিষ্করুণ সংঘাতময় পরিবেশের মধ্যে তাঁর মা-ই যে ছিলেন একমাত্র প্রেরণা আর একমাত্র সহায়!

মায়ের কথা কোনদিন ভোলেন নি তিনি। সত্তরবছর বয়সে তাঁর ভক্তরা ঘটা ক'রে যে জন্মজয়ন্তীর আয়োজন করেছিল সেই অনুষ্ঠানে তাঁর আবেগময় ভাষণের মধ্যে তাঁর জননীর কথাই ছিল বেশী!

মাতার মৃত্যুর পর মেসনেয়ারের বাবা পুত্রকে প্যারিসে এক আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আর শিল্পচর্চ্চার বিলাস নয়, লেখা-পড়া শিখতে হবে, অঙ্ক শিখতে হবে, বড় হিসাব-নবিশের আপিসে কাজ করতে হবে। সহানুভূতি নেই, নেই মমতা বা স্নেহের স্পর্শ, কঠিন শৃঙ্খলা আর ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে মেসনেয়ারের জীবন নতুন ক'রে আরম্ভ হল।

* * *

১৮৩০ সালের বিদ্রোহ যখন বাধলো তখন মেসনেয়ার অদম্য আগ্রহের সঙ্গে সেই বিপ্লবের খবরাখবর জানবার আকাঙ্ক্ষায় পড়া-শোনা ছেড়ে মেতে উঠলেন। এমন কি কয়েকজন সহপাঠীকে জুটিয়ে তিনি নিজেই একটা ছোট দল তৈরী করে ফেললেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে তাঁদের গুপ্ত কার্য্যকলাপ ধরা পড়ে গেল। মেসনেয়ার স্কুল থেকে বিতাড়িত হলেন।

বাড়ী ফিরলেন। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়ায় যেন দম আটকে আসতে লাগল। পিতার তিরস্কার আর সহানুভূতিশূন্য ব্যবহারে তাঁর শরীর মন ভেঙে পড়ল। কিন্তু চরিত্রের তেজ ছিল অসাধারণ। শিল্পী তিনি হবেনই, মায়ের আকাঙ্ক্ষা আর আশীর্ব্বাদকে ব্যর্থ হোতে

রবেন না কোনমতে। ছবি আঁকতে লাগলেন। এক একটি ক'রে নেকগুলি ছবি জমা হল। প্রাকৃতিক দৃশ্য, জীবজন্তুর ছবি, মানুষের চহারা। শিল্পকর্ম হিসাবে সেগুলি যে কতখানি উঁচুদরের হয়েছিল সে-ারণা তাঁর নিজেরও ছিল না, ছবিগুলি বিক্রয় করবার ইচ্ছায় তিনি াকদিন সেগুলি নিয়ে এক ষ্টুডিওয় হাজির হলেন। ষ্টুডিওর কর্তৃপক্ষ অনিচ্ছার ভান দেখিয়ে খুব অল্প পয়সায় সেগুলি কিনে নিলে। নিজের াাফল্যে পরম চরিতার্থ বোধ ক'রে মেসনেয়ার সেই সংবাদ তাঁর বাবাকে জানালেন এবং তারপর যে-কথা বললেন, তা এই নিবন্ধের শুরুতে লেখা হয়েছে।

শিল্পী পশিয়ের কাছে কাজ নিয়ে পরম উৎসাহে মেসনেয়ার তাঁর

মেসনেয়ার অংকিত : "বংশীবাদক"

শিল্পসাধনায় মগ্ন হলেন। প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করাই ছিল তাঁর শিল্পধর্ম্ম। কোন শিল্পকাজ ফাঁকী দিয়ে তাড়াহুড়ো ক'রে তিনি কোনদিন শেষ করেন নি। একাগ্র নিষ্ঠা আর অটুট অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রচুর পরিশ্রম করতেন তিনি।

ক্রমে তাঁর ছবির চাহিদা বাড়তে লাগল। যে ষ্টুডিওয় তিনি প্রথম ছবিগুলি বিক্রয় করেছিলেন তাঁরা তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে আরও ছবির অর্ডার দিলেন। একটি ছোট প্রদর্শনীতে তাঁর অনেকগুলি ছবি বিক্রিত হল। শিল্পী মেসনেয়ারের নাম শোনা যেতে লাগল চারিদিকে।

ইতিমধ্যে মেসনেয়ারের বাবা দ্বিতীয়বার বিবাহ ক'রে যে নতুন সংসার পেতেছিলেন সে-গৃহস্থালীতে মেসনেয়ারের স্থান হল না। তাঁর বাবা তাঁর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করে দিলেন এবং একটি মাসিক বৃত্তির দ্বারা ছেলেকে সাহায্য করতে লাগলেন। মেসনেয়ারের বাবা সেদিক থেকে অবিবেচক ছিলেন না, তা স্বীকার করতেই হবে, এবং মেসনেয়ার নিজেও তা স্বীকার করেছেন বরাবর।

*　　*　　*

১৮৩৮ সালে মেসনেয়ার বিবাহ করলেন। এক সতীর্থের ভগ্নীর সঙ্গে মনের মিতালী ঘটেছিল কিছুদিন থেকে। তাঁকেই তাঁর দরিদ্র ঘরের ঘরণী ক'রে নিয়ে এলেন। পিতৃদত্ত সামান্য কিছু মাসিক বৃত্তি, আর ছবি বিক্রয়ের অনিশ্চিত উপার্জ্জন—তারই উপর নির্ভর ক'রে নবদম্পতী তাঁদের যে নীড় রচনা করলেন তার মধ্যে না ছিল কোন বিলাস-ব্যসনের আয়োজন, না কোন আমোদ-প্রমোদের সুযোগ। কিন্তু,

প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত মেসনেয়ারের মর্ম্মরমূর্ত্তি

দীর্ঘ দিন ধ'রে অবিচ্ছিন্ন কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্যেও মেসনেয়ার তাঁর আদর্শ থেকে কখনো বিচ্যুত হন নি, শত প্রলোভনেও শিল্পের মর্য্যাদাকে কখনো ক্ষুণ্ণ করেন নি, আত্মসম্মান বজায় রেখে এমনভাবে দারিদ্র্যকে মহিমামণ্ডিত ক'রে তোলার দৃষ্টান্ত খুব কম মানুষের জীবনেই দেখা গেছে, যেমন দেখা গেছে এই শিল্পী-দম্পতীর জীবনে। আদর্শ সহধর্ম্মিণী পেয়েছিলেন মেসনেয়ার।

গ্রন্থের প্রচ্ছদপট নূতন ধরণের শিল্পপদ্ধতিতে আঁকা নানা অক্ষরের সমন্বয়, গল্প-কাহিনীর অলংকরণ—এইসব কাজে মেসনেয়ার যুগ-প্রবর্ত্তন

করেছিলেন বলা যেতে পারে। তাছাড়া বহু রকমের ও বহু ধরণের ছবিও এঁকেছেন প্রচুর।

এক বিষয়ে মেসনেয়ার অদ্বিতীয় ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। সে হচ্ছে তাঁর সর্বস্পর্শী শিল্পদৃষ্টি। আমরা কোন মানুষ বস্তু বা দৃশ্য দেখি, তারপর তাদের ভুলে যাই, অথবা আবছা আবছা তাদের মনে করতে পারি। কিন্তু মেসনেয়ার যা দেখতেন, তার প্রত্যেক খুঁটিনাটি তাঁর মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যেতো চিরকালের মতো এবং যখন সেই দৃশ্য বা ঘটনাটিকে রঙে-রেখায় ফুটিয়ে তুলতেন তখন যাতে কোন তুচ্ছতম অংশটিও বাদ না পড়ে সেদিকে তাঁর লক্ষ্য থাকতো প্রখর। তাই তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টি নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হত।

যাকে বলে ছবির অ্যানাটমি, অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশীসমূহের সুবিন্যস্ত সমতা—তা মেসনেয়ারের শিল্পকর্ম্মে আশ্চর্য্য সঙ্গতির সঙ্গে ফুটে উঠ্‌তো এবং সেজন্যে তিনি যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় স্বীকার করতেন তাও বড় কম বিস্ময়কর নয়।

ছুটন্ত ঘোড়ার ছবি আঁকবেন ; সেজন্যে এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করলেন। একটি যন্ত্রচালিত ট্রলির উপর ব'সে সেই ট্রলি চালাতে লাগলেন আর তাঁর সহিসকে বললেন, একটি ঘোড়াকে সেই চলন্ত ট্রলির পাশ দিয়ে দৌড় করাক। ট্রলির পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটতে লাগল, আর ট্রলির উপর ব'সে মেসনেয়ার সেই ধাবমান অশ্বের চিত্র আঁকতে লাগলেন।

রাজপ্রাসাদের সামনে প্রহরীদের সময়-বদলের যে-চিত্র এই সঙ্গে মুদ্রিত হল সেই ছবি আঁকার জন্যে দিনের পর দিন তিনি অদূরে দাঁড়িয়ে ঘোড়াগুলির এবং প্রত্যেকটি গার্ডের গতিবিধি ও অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে তার পর চিত্রটি এঁকেছিলেন। এই ছবিখানিকে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে গণ্য করা হয়।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইতালির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সমরাভিযানে মেসনেয়ার যুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং রণস্থলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে কয়েকটি বিস্ময়কর যুদ্ধের ছবি এঁকেছিলেন।

১৮৪৫ সালে পয়সি সহরে তিনি ছোট একটি জমিদারি খরিদ করেন এবং নিজের নতুন বাড়ীর বড় বড় ঘরে নানা পুরানো জিনিষ, ছবি, বাসন এবং ঐতিহাসিক-মূল্যসমৃদ্ধ অলংকার ও আসবাবে সজ্জিত করেন। তিনি একজন সু অভিনেতা ছিলেন। নানা ধরণের চরিত্র অভিনয় করতে পারতেন।

কাজ-পাগল মানুষ ছিলেন মেসনেয়ার। হাতে যখন ছবি আঁকার কাজ থাকতো না তখন তিনি দোকানে দোকানে ঘুরে পুরনো জিনিষ সংগ্রহ করতেন, নয়ত বা লাইব্রেরীতে গিয়ে প্রত্নতত্ত্বের পুথি আর বইএর মধ্যে বিশেষ করে চিত্রশিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি পাঠ করে নোট নিতেন।

১৮৭০ সালে কঠিন অসুখে আক্রান্ত হয়ে তিনি কর্ম্মে অপটু হোয়ে পড়েন। অসুস্থতার মধ্যেও বন্ধু ও হিতৈষীদের সঙ্গে ছবি আর চিত্রশিল্প ছাড়া অন্য কথা ছিল না। আক্ষেপ করে বলতেন, কত কাজ বাকী রয়ে গেল, আরও কত বড় বড় ছবি আঁকবার সাধ ছিল তাঁর।

রাষ্ট্রের কাছ থেকে 'লীজন অফ অনার' উপাধিতে সম্মানিত হবার পর ১৮৯১ সালে তাঁর কর্ম্মময় প্রতিভাদীপ্ত এবং মহৎ আদর্শ জীবনের অবসান হয়।

শরতের গান

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বর্ষা অঝোরে কাঁদিয়া কহিল, "ওগো, আবরণ টানি'
রহিলে এখনো ? তোল তোল আজ অবগুণ্ঠনখানি।"
বজ্র হাঁকিল, গুরু গুরু মেঘ ডেকে ডেকে হ'ল সারা,
তড়িৎ-চমকে দীর্ণ গগন, তবু মিলিল না সাড়া।
বৃথা হ'ল সব সাধ্য-সাধনা, আড়ালে রহিল সে যে,
ওঠে উচ্ছল জল-তরঙ্গ বিলাপের মত বেজে।
নিঃশ্বসি ওঠে সজল পবন যুথির গন্ধ-ভরা,
কলো আকাশের নয়ন-সলিলে সিক্ত বসুন্ধরা।
ব্যর্থ প্রতীক্ষায়
কেটে যায় দিন ধূসর মলিন, বর্ষা ফিরিয়া যায়।

তোমার প্রকাশ শুভ্র শরতে প্রভাত স্বর্ণালোকে,
বিকচ পদ্মে চরণ ফেলিয়া নামিলে মর্ত্তলোকে।
উর্দ্ধে যেথায় নিবিড় নীলিমা সেথায় কি ছিলে তুমি ?
নিশীথে যেথায় জ্যোৎস্না-প্লাবনে বিনিদ্র বনভূমি
ছিলে কি সেথানে ? স্বপ্নে ছিলে কি, ছিলে জাগরণ-মাঝে
স্রোতস্বিনীর কলধ্বনিতে তোর আগমনী বাজে।
ছায়ার রাজ্যে দেখা ত মেলেনি, আলোতে আসিলে আজি
এ-কি লাবণ্য ঝলমল করে, তুমি যে জ্যোতির্ম্ময়ী !
সার্থক হ'ল প্রাণ,
আলোর ছন্দে আনন্দময় বাজে শরতের গান।

চুলে কলপ, বাজপাখী প্যাটার্ণ বাঁকানো নাক, খুদে চোখ কিন্তু চাউনি ধারালো, ঝুলে পড়া ঠোঁট। দু-হাতে আটটা আংটি। পলা, পান্না থেকে গোমেধ। কখন কোন গ্রহ রুষ্ট হয় বলা মুস্কিল। কোঁচানো ধুতি, গায়ে ঝলঝলে পাঞ্জাবী।

পারুল ঢুকতেই হরগোবিন্দবাবু হাত থেকে গড়গড়ার নলটা সরিয়ে রাখলেন। ঘর খালি। এখন লোকজন আসার সময়ও নয়। আপাদমস্তক দেখলেন চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে। চেহারা তো নিন্দার নয়। আটসাঁট গড়ন, বাড়ন্ত পুঁইডগার মতন চিকচিকে ভাবও একটা আছে। কিন্তু হয়তো ওই চেহারা সর্বস্ব। মুখ দিয়ে একটি কথা বলাতে গেলেই দাঁত-কপাটি হল ভর্তি, মানুষের সামনে দাঁড়াতে হ'লেই মূর্ছা।

পারুলকে ডিঙিয়ে হরগোবিন্দবাবু অমিয়নাথের দিকে চোখ ফেরালেন।

—তারপর অমিয়নাথ কি খবর বলো ?

অমিয়নাথ চৌকাঠের কাছ বরাবর দাঁড়িয়েছিল, এবার ঘরের মধ্যে এলো। হরগোবিন্দবাবুর সামনে এসে মুচকি হাসির ভাণ করে বলল, খবর তো আপনার সামনে এনে হাজির করেছি স্যর।

আর একবার হরগোবিন্দবাবু পারুলের দিকে চাইলেন। জরিপ করার ভঙ্গীতে চোখ কুঁচকে দেখলেন—তারপর অমিয়নাথের দিকে ফিরে বললেন, কি নাম ?

অমিয়নাথ নয়, পারুলই বলল নাম।

—এ লাইনে আগে এসেছিলে কখন ? মানে অভিনয়-টভিনয় করেছিলে এর আগে ?

অভিনয় যে করেনি তা হরগোবিন্দবাবুর জানা। এ ব্যবসায় আজ ত্রিশ বছরের ওপর রয়েছেন। এক নজরে সব বলে দিতে পারেন। শুধু পারুলের গলার আওয়াজটা পরখ করতে চেয়েছিলেন। মিহি না মোটা, মিষ্টি না কর্কশ।

দু-এক মিনিট পারুল ভাবল। মেয়েদের আবার অভিনয় শিখতে হয় নাকি। এ তো ওদের সহজাত। ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের মধ্যে মিশে যায়। তা ছাড়া অভিনয়ে যে পারুল কত দক্ষ তার সাক্ষী-সাবুদও আছে। সেকেণ্ড মাষ্টারকে ডেকে আনতে হয় কুসুমপুর থেকে, কিংবা নিখোঁজ হওয়া তারাচরণকে। মুখে রং মাখেনি বটে পারুল, ফ্লাড লাইটের উগ্র আলোয় দাঁড়ায়নি, কিন্তু অভিনয়ে আশ-পাশের লোকের তারিফ কুড়িয়েছে। নির্ভেজাল প্রশংসা।

কিন্তু এসব কথা তো আর বাণীপীঠের মালিককে বলা যায় না। পায়ের নখ দিয়ে পারুল মেঝে আঁচড়ালো। থেমে থেমে বলল, না এ লাইনে কোনদিন ছিলাম না, কিন্তু আমার মনে হ'চ্ছে আমি পারবো। ঠিক পারবো।

এ আত্মপ্রত্যয়টুকু হরগোবিন্দবাবুর খুব ভাল লাগল। এর দাম আছে। নিজের চোখে দেখেছেন। শাড়ী জড়ানো জড়ভরত মেয়ে, জড়িয়ে জড়িয়ে হাঁটে, যুক্তাক্ষর উচ্চারণ করতেই ঘায়েল, কিন্তু মনের জোরে ঠিক উৎরে গেছে। কোথা থেকে সাহস এনেছে মনে, সারারাত জেগে পার্ট মুখস্থ, মোশন মাষ্টারের প্রাণান্ত, কিন্তু ঠিক দাঁড়িয়ে গেছে। চাকরাণী থেকে রাজরাণী, বাঁদী থেকে বেগম ধাপে ধাপে ওপরে উঠেছে।

—একটু বসো। মোশনমাষ্টার এসে পড়চে এখনি। দু-একটা লাইন আওড়ালেই বুঝতে পারবো।

পারুল এদিক-ওদিক চাইলো। ঘরের এক কোণে একটা সতরঞ্চ জড়ো করা। বসতে হলে ওটাই পাততে হয়।

অমিয়নাথই সরে এলো। হাত দিয়ে সতরঞ্চটা টেনে

পেতে দিল এদিকে। নিজেও বসলো, পারুলকেও বসালো।

—নতুন বই কিছু ধরছেন নাকি? অমিয়নাথ জিজ্ঞাসা করল। সরিয়ে রাখা গড়গড়ার নলটা হরগোবিন্দবাবু মুখে তুললেন। অল্প ধোঁয়া ছাড়লেন—তারপর ভ্রূ কুঁচকে বললেন, না, মিছামিছি খরচ করে নতুন বই নামিয়ে লাভ কি। যত ভিড় তো কেবল সিনেমার দরজায়। থিয়েটার ফাঁকা। গড়ে পিটে এক একজনকে মানুষ করছি আর অমনি ডিরেক্টররা এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে—টাকার লোভ দেখিয়ে। পূজো অবধি পুরনো বই-ই চালাবো। দেখি বাজারটা।

হরগোবিন্দবাবু কথা শেষ করবার আগেই সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ। হাসির আওয়াজ। শাড়ীর আঁচলে মুখ মুছে পারুল ঠিক হয়ে বসলো।

দুটি ভদ্রলোক, পিছনে একটি মেয়ে।

হরগোবিন্দবাবু মেয়েটির দিকে চাইলেন, কটা বেজেছে খেয়াল আছে?

মেয়েটি নাঁকি-সুরে উত্তর দিল, আমি কি করব, আমি তো বেলা দুটো থেকে রেডি। ওই মাষ্টার মশাইয়ের কাণ্ড। ম্যাটিনিতে সিনেমায় নিয়ে গেলেন। বাব্বা, কি বই। মাথা ধরে গেছে।

নাদুস-নুদুস মাঝবয়সী ভদ্রলোকটি হাসল, তোমরা তো সিনেমা সিনেমা করে পাগল। তাই তোমাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম, তবু যদি চোখ ফোটে।

—কি বই মাষ্টার? হরগোবিন্দবাবু নল টানার ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—ধূসর ধরণী। আমাদের পারিজাত দেবী যে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

—কোন পারিজাত? হরগোবিন্দবাবু ঠিক চিনতে পারলেন না। ঝাঁক ঝাঁক পায়রা উড়ে এসে বসেছে। কেউ মাসখানেক থেকেছে, কেউ বা আবার বছরের পর বছর। নানা রংয়ের, নানা জাতের। সকলকে মনে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু সিনেমায় নায়িকার পার্ট করছে এমন মেয়েকে তো মনে থাকবার কথা।

—কে বল দেখি মাষ্টার। আমার তো ঠিক ঠাওর হচ্ছে না।

মোশন মাষ্টার হেসে উঠলো ভুঁড়ি দুলিয়ে।

—আরে আপনি চিনবেনই বা কেমন করে। আমার বলাই অন্যায় হয়েছে। এখানে তো নাম ছিল পাঁচী।

পাঁচী। হরগোবিন্দবাবু একটু ভাবতেই মনে পড়ে গেল। প্যাকাটি প্যাকাটি চেহারা। হাতে মাদুলীর বোঝা। মেদিনীপুর না কোথা থেকে এসেছিল। মাসের মধ্যে দশদিন ম্যালেরিয়ায় কোঁ কোঁ করতো। একদিন তো ষ্টেজে নাদিরার পাট করতে করতেই জ্বর এসে গেল। সে কি কাণ্ড। লোকেরা হৈ রৈ চেঁচামিচি করাতে ড্রপই ফেলে দিতে হ'লো। সেই পাঁচী পারিজাত হয়েছে সিনেমায়। সর্বনাশ। গলাটা মেয়েটার ভাল ছিলো। টিকে থাকলে একদিন ভালই হ'তো। কিন্তু সিনেমা টিকে থাকতে দিলে তো। পাঁচী পরিজাত হচ্ছে, পদ্মি-পদ্মিনী। হরদম।

—যাক্! গড়গড়ার নলটা হরগোবিন্দবাবু ছেড়ে দিলেন, যার যা ইচ্ছা করুক। মাষ্টার, এই একটি মেয়ে অমিয়নাথ এনেছে, দেখো দেখি পরখ করে।

সঙ্গে সঙ্গে সব কটা চোখ পারুলের ওপর পড়লো। এতক্ষণ কেউ দেখেও দেখে নি। রোজ রোজ কত মেয়ে আসছে। সকলের দিকে চোখ ফেরাবার মতন অঢেল সময় কোথায়। কিন্তু এ মেয়ের বিশেষত্ব আছে। অমিয়নাথ এনেছে। এতদিন 'বাণীপীঠে' বই যোগাতো অমিয়নাথ, আজকাল মন্দার বাজারে বুঝি এসবও যোগাচ্ছে।

—চেহারা তো মন্দ নয়, মস্ত নাকে দিতে দিতে মোশন মাষ্টার বলল, এখন রাঙা পলাশ না হ'লেই বাঁচি।

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা বই বের করে, পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় থামলো, নাও দেখি ওঠো, একটা লাইন বল দেখি। শানুবাবু আপনিও উঠুন।

—আবার আমাকে কেন? ভদ্রলোক আড়ামোড়া ভাঙলো। হাই তুললো একবার, তারপর ভ্রূ দুটো কায়দা-মাফিক তুলে জিজ্ঞেস করলো, কোনখানটা?

—ওই যে, শম্বুক হত্যার সিনটা। তুমি রামের প্রক্সিটা দাও। আর তুমি তুঙ্গভদ্রা। স্বামীকে হত্যা করার জন্য অভিশাপ দিচ্ছো রামচন্দ্রকে।

পারুল দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। কাঁপছে দুটো

পা। এমনি দাঁড়াতে গেলেই বোধ হয় ছিটকে পড়বে মেঝেয়। আন্দাজে বুঝতে পারলো কপালে ঘামের ফোঁটা জমেছে। তালু পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। একটু জল পেলে হতো। এক চুমুক।

এদিক ওদিক চাইতে গিয়েই অমিয়নাথের চোখে চোখ পড়ল। আকুল আগ্রহই কেবল নয়, অমিয়নাথের দৃষ্টিতে প্রত্যাশার আভাস। মনে মনে পারুল দৃশ্যটা কল্পনা করে নিল। পায়ের তলায় অমিয়নাথের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। এই মৃত্যুর জন্য দায়ী শানুবাবু।

মোশন মাষ্টারের কথা শুনে শুনে পারুল বলে গেল। ভয়কম্পিত গলার স্বর। চড়াতে গিয়ে পারলো না। কিন্তু তাতেই কাজ হলো। হরগোবিন্দবাবু কানের দু'পাশে দুটো হাত রেখে শুনলেন। উটপাখীর মতন গলা বাড়িয়ে।

মোশন মাষ্টার তারিফ করল, অবশ্য খুব উচ্ছ্বসিত না হ'য়ে—গলা ভাল, তবে আরো মাজা-ঘষা করতে হবে। একটু ফ্ল্যাট, ওঠানামা নেই গলার।

—মাষ্টার, হরগোবিন্দবাবু কথা বললেন, শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। হাতে সময়ও তো আর বেশী নেই।

পারুল বহাল হ'ল। মাইনেপত্র সব কিছু অমিয়নাথই ঠিক করবে। কথা হবে হরগোবিন্দবাবুর সঙ্গে। দিন সাতেক পর থেকেই মহলা শুরু হবে।

ঘোড়ার গাড়ীতেই দুজনে ফিরল। অমিয়নাথ আর পারুল।

বাড়ীর দরজায় নেমেই অমিয়নাথ পিছিয়ে এলো। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওপরের বারান্দায় মোটঘাট। বাক্স, বিছানা, ঘটি বাটি। তারই একটার ওপর অমিয়নাথের মা বসে।

— সর্বনাশ, মা ফিরে এসেছেন।

পারুল পা ঝুলিয়ে নামতে যাচ্ছিলো, অমিয়নাথের কথায় গুটিয়ে নিলো নিজেকে।

—উপায়? ফিসফিসিয়ে অমিয়নাথকে জিজ্ঞাসা করলো।

উপায়! ভেবে কূলকিনারা পেলো না। একমাত্র উপায় বাণীপীঠে ফিরে যাওয়া। হরগোবিন্দবাবুকে ব'লে ওখানেই থাকার বন্দোবস্ত করা। ঘর আছে অবশ্য গোটা দুয়েক। আগের দিকে দু'একজন অভিনেত্রী থাকতো, কিন্তু পারুলের হয়তো অসুবিধা হবে।

কথাটা পারুলকে বলতেই সে মাথা নাড়লো, হলোই বা একটু অসুবিধা, তার আর উপায় কি? অমিয়নাথের বাড়ীতে গিয়ে ওঠবার পথ তো বন্ধ। কি পরিচয় দেবে অমিয়নাথ মায়ের কাছে। কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির থেকে এটিকে সংগ্রহ করেছি। জাত জানি না, পরিচয় জানি না, হেঁসেলের ভার তুলে দিয়েছি হাতে, খেলাঘরের সংসারে বৌ বৌ খেলার মতন ঘর করছি একে নিয়ে।

হরগোবিন্দবাবু ছিলেন না, হিন্দুস্থানী দরওয়ান ছিলো। অমিয়নাথকে জানে অনেক বছর ধরে, সেই বন্দোবস্ত করে দিলো। রাত্রে দোকান থেকে খাবার আনা, জলের ব্যবস্থা সব করেদিলে।

অমিয়নাথ কথা দিলো, পরের দিন পারুলের বাক্সটা দিয়ে যাবে।

যাবো যাবো করেও অনেকক্ষণ অমিয়নাথ গেলো না। ঘোরাঘুরি করলো বারান্দায়।

—কি হলো, এখনও দাঁড়িয়ে যে? ওদিকে বুড়ী মা বন্ধ দরজার সামনে বসে আছেন। পারুল তাগাদা দিল।

—যাচ্ছি। অমিয়নাথ সোজাসুজি চাইলো না পারুলের দিকে। চাইতে পারলো না। অনেকদিন ঘর-করা-বৌকে যেন ছেড়ে যাচ্ছে এমন ভাব।

—যাও, আবার কাল এসো, পারুল এগিয়ে এসে দাঁড়ালো অমিয়নাথের মুখোমুখি।

অমিয়নাথ আর দাঁড়ালো না। তর তর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো।

মাসখানেক, তার মধ্যেই পারুল অনেকটা তৈরী হ'য়ে নিল। আর দাঁড়ালে তেমন পা কাঁপে না, গলার আওয়াজেও কোন জড়তা নেই। পাঠও বেশ মুখস্থ হ'য়ে এসেছে।

মাঝে মাঝে রিহার্সালে অমিয়নাথ থাকে। মহলার শেষে ঘর-সংসারের কথা হয়। অমিয়নাথ বলে, পারুল শোনে।

—জানো, অমিয়নাথ মুখ টিপে হাসলো, মা খুব ধরেছে। কিছু পারুল বুঝলো। কিন্তু না বোঝার ভাণ করলো।

—কি ব্যাপার ?

—মানে, দক্ষিণেশ্বরে কাকে দেখে মার খুব পছন্দ হয়েছে, সেখানে পাকা কথা দিতে চায়।

—বা, এতো সুখবর। রাজী হয়ে গেছো নিশ্চয়।

—হুঁ, অমিয়নাথ ঘাড় নাড়লো মাথা নিচু করে। খুব আস্তে আস্তে বললো। গলার স্বরে খেদের মিশেল।

—নিজেরই অন্ন জুটছে না, আবার লোক বাড়াবো।

পারুলের বুকের মাঝখানটা ধক ক'রে উঠলো। জ্বালা করে উঠলো চোখ দুটো। শুধু টাকা পয়সার কথাটাই অমিয়নাথের মনে পড়লো। বাড়তি একটা মুখের গ্রাস জোটাবে কোথা থেকে সেই। এ কথা একবারও বললো না, এতদিন ঘর করেছে পারুলকে নিয়ে, অন্য কাউকে সে জায়গায় বসাতে চাইছে না। শুধু পারুলের মুখ চেয়েও তো বলতে পারতো এমন একটা কথা।

অমিয়নাথ চলে যাবার পর পারুল বারান্দায় হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। এখনো বাতি জ্বালানো হয় নি। সিঁড়ির খাঁজে খাঁজে জমাট অন্ধকার। অনেকটা ওর অনাগত জীবনের মতই। শ্যাওলার মতন ভেসে বেড়াচ্ছে। এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে। মাটির আশ্রয় নেই, শত জীবনের বাঁধন নয়, ঢেউয়ের তালে তালে শুধু ভেসে যাওয়া। দুহাত দিয়ে যখনই যাকে আঁকড়ে ধরতে গেছে, সেই ছিটকে সরে গেছে। এ ঘরবাঁধার খেলায় হার হয়েছে পারুলের। জীবনে অসহ ক্লান্তি, মরারও সাহস নেই পারুলের। কিন্তু কতদিন কাটবে এই জীবন্মৃত অবস্থায়।

বারান্দায় আঁচল পেতে পারুল শুয়ে পড়ল।

অনেকগুলো পায়ের শব্দে পারুলের তন্দ্রা ভেঙে গেল। উঠে বসল ধড়মড়িয়ে।

হরগোবিন্দবাবুর গলা, কই গো, কোথায় গেলে। ঘরদোর অন্ধকার কেন। বাতিটা জ্বালাও।

বেসামাল কাপড় ঠিক ক'রে পারুল সুইচ টিপে দিলো।

প্রথমে হরগোবিন্দবাবু, পিছন পিছন দুজন কুলি একটা তক্তাপোষ বয়ে আনছে।

মেঝেয় শোয়াটা ঠিক নয় এ সময়ে। ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লেগে গেলেই সর্বনাশ। গলা ধরে যাবে, ছিটে ফোঁটা আওয়াজ বের হবে না গলা দিয়ে।

হরগোবিন্দবাবুর নির্দেশে তক্তপোষ ঘরের মধ্যে পাতা হ'লো। দেয়াল ঘেঁসে। হরগোবিন্দবাবু কুলিদের বিদায় দিয়ে তক্তপোষের ওপর বসলেন।

—বেশ মন দিয়ে শেখো। এ লাইনে নাম করতে পারলে পয়সার অভাব থাকবে না। সিনেমার লোকদের একেবারে পাত্তা দেবে না। বুঝলে। ওরা এক একটি মাথা বিগড়োবার যম।

হরগোবিন্দবাবু গলার স্বর পালটালেন।

—এখানেই থেকে যাও। কোন অসুবিধা হ'লে আমাকে বলো। আমি মাঝে মাঝে আসবো এখন। এই নাও।

হরগোবিন্দবাবু হাত প্রসারিত করে দিলেন। হাতে দশ টাকার নোট।

—নাও, রেখে দাও। খাওয়া দাওয়ার খরচ তো আছে। ভগবানের ইচ্ছায় পূজোর সময় বইটা যদি জমে যায় তা হ'লে আর দেখতে হবে না। তখন দেখবে হরগোবিন্দর বুকের পাটা। দিতে থুতে একটুও পিছপা নয়।

কথার মাঝখানেই হরগোবিন্দবাবু দাঁড়িয়ে উঠলেন, উঠি আজ। সিন টিন দু একখানা আঁকাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। আর বেশী সময়ও নেই হাতে।

হরগোবিন্দবাবুর বরাত—না পারুলের কপাল বোঝা গেলো না। মাস কয়েকের মধ্যেই অবস্থা পালটে গেলো। শুধু অবস্থাই নয়, নামও পালটে গেলো পারুলের। পারুল থেকে পলি। ওরই নাম দিয়ে বাণীপীঠের বিজ্ঞাপন শুরু। ফুলের তোড়া, হাততালি, কাগজে কাগজে পাতাজোড়া প্রশংসা, মন কেড়ে নেওয়া ঢঙে নিত্য নতুন ফটো।

হরগোবিন্দবাবু আগে সপ্তাহে একদিন আসতেন। খোঁজ খবর নিতে। এখন রোজ বিকেলে আসেন একবার। উপদেশ, পরামর্শ। থিয়েটার ছেড়ে কোনদিন সিনেমার নেশা না পেয়ে বসে সে বিষয়ে সৎযুক্তি।

আগে ফাঁকা ছিলো দেয়াল। এখন গোটা পাঁচ ছয় ছবি টাঙানো হ'য়েছে। হরগোবিন্দবাবুই পাঠিয়ে দিয়েছেন। গঙ্গাবতরণ, কালীয়দমন থেকে শুরু করে কংসবধ আর সমুদ্র-মন্থনের ছবি। ওরই মধ্যে হরগোবিন্দবাবুর ফটো

একটা আছে। ছোট সাইজের। তা আর দোষের কি। অন্নদাতা জীবনদাতারই সামিল। যত্ন করে পারুল সে ছবিও টাঙিয়েছে। পাঞ্জাবী চাদর জড়ানো হরগোবিন্দ-বাবুর যৌবনের ছবি।

ধাপে ধাপে পারুল যত উঠেছে ওপরে, আস্তে আস্তে অমিয়নাথ তত সরে গিয়েছে দূরে। মাঝে মাঝে অভিনয়ের শেষে গ্রীণরুমের দরজায় দেখা হয়েছে।

—এখনও যে গালে কপালে রঙ লেগে রয়েছে, অমিয়নাথ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে।

—ও রঙ নয়, কালি। হাজার ধুলেও উঠবে না। পারুল মৃদু হেসেছে। তারপর তোমার খবর কি? বিয়েথা করলে বৌকে একবার দেখালেও না। পারুল ফুলের তোড়াগুলো জড়ো করতে করতে বলেছে।

অমিয়নাথ আর দাঁড়ায় নি। ছলছুতো ক'রে মিশে গেছে ভিড়ের মধ্যে। দিনকতক একেবারে গা-ঢাকা। ধারে কাছে কোথাও দেখা যায় নি।

অমিয়নাথকে দেখা গেল দিন সাতেক পরে। উস্কো খুস্কো চুল। অপরিচ্ছন্ন পোষাক। ম্যাটিনী শো শেষ ক'রে বাইরে আসতেই পারুলের সঙ্গে মুখোমুখী দেখা।

—কি ব্যাপার, শরীর খারাপ নাকি? পারুল উৎকণ্ঠিত হ'লো।

এক হাত দিয়ে চুলগুলো অমিয়নাথ মুঠো করে ধরলো, তারপর বললো, না শরীর ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

পারুল ভ্রূ কোঁচকালো। ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের ছিটে, হলো কি? বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে এসেছ নাকি?

অমিয়নাথ মাথা নাড়ল, এখন নয় কাল যাবো তোমার কাছে। কাল তো প্লে নেই। বাড়ীতেই আছো তো। দ্রুত গলায় অমিয়নাথ কথাগুলো বলে গেল। বুকের অশ্রান্ত দাপাদাপির চিহ্ন ফুটে উঠল গলার স্বরে।

—বাড়ীতে থাকবো না তো আর যাবো কোথায়। পারুল খুব আস্তে কথা বলল।

—ঠিক আছে। কাল দেখা করবো। অমিয়নাথ বাইরে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পারুল চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। সাড় নেই, চেতনা নেই।

প্রম্পটার নিতাইবাবুর গলার আওয়াজে চমক ভাঙলো।

—কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন নাকি। নিতাইবাবু বিনয়ে বিগলিত দুটো হাত জড়ো করে রাখলো বুকের ওপর।

—অপেক্ষা? না অপেক্ষা আর কার জন্য। চলি।

পারুল দ্রুত পায়ে বাইরে চলে এলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠলো খুব আস্তে আস্তে। দু একটা ধাপে থামলোও কিছুক্ষণের জন্য। যতই ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলো পারুল, ততই যেন চিন্তাটা আঁকড়ে ধরলো তাকে। এক চিন্তা। একটা মানুষের।

খুব বিপদে পড়েছে বোধ হয় অমিয়নাথ। নয়তো ফিটফাট মানুষটা এমন অগোছালভাবে ছুটে আসে! কিন্তু কিসের দরকার।

আন্দাজে হাতড়ে তালাটা খুলে পারুল বিছানায় শুয়ে পড়লো। জামাকাপড় না বদলে।

কি দরকার বুঝতে এত দেরী হ'লো পারুলের। যখন সে অমিয়নাথের বাড়ী ছেড়ে ছিলো তখনই তো সংসার-পানসীর টলমলে অবস্থা। দুদিক দিয়ে জল উঠছে। ভার লাঘব করার জন্যই পারুল সরে এসেছিলো। কিন্তু তাতেও কি সুরাহা হয়েছে। মা এসে উঠেছেন, নতুন মানুষ সংসারে ঢুকেছে ঘোমটা দিয়ে। একটা মানুষ, কতদিক সামলাবে।

ছি, ছি, কথাটা মনে হ'তেই পারুল বিছানার ওপর উঠে বসলো। বলতে নেই পারুলের অবস্থা ফিরেছে। বাঁধা মাইনে ছাড়াও যখন দরকার হরগোবিন্দবাবু টাকা-পয়সা দিয়েছেন। বাড়তি জিনিষপত্র। তার কারণও আছে অবশ্য। পারুলের দাম হ'য়েছে। পারুল ছাড়লে বাণীপীঠের পথ কেউ মাড়াবে না, তা হরগোবিন্দবাবুর জানা। এখন বাড়তি চেয়ার দিয়ে কুলিয়ে ওঠা দায়, তখন কেবল ছারপোকার রাজত্ব। ইতিমধ্যেই 'অজন্তা' থিয়েটার পারুলের পিছনে লেগেছে। মোটা টাকার টোপ। পাঁচ বছরের চুক্তি। হরগোবিন্দবাবু দুটো ডানা দিয়ে পারুলকে আগলে রেখেছেন।

কিন্তু পারুলেরই না হয় অবস্থা ফিরেছে, অমিয়নাথের

—গ্রীণরুমের চাবিটা একবার দাও তো রামলোচন, কাল রাত্রে মাথার সোনার কাঁটাটা ফেলে এসেছি।

খাটিয়ায় বসে রামলোচন তুলসীদাস পড়ছিলো, দাঁড়িয়ে উঠে পৈতেয় বাঁধা চাবির গোছা পারুলের হাতে তুলে দিলো।

নিজের রুমে নয়, চাবি খুলে পারুল শান্তনুবাবুর কামরায় ঢুকলো। বেশী খুঁজতে হ'লো না, ড্রয়ারের কোনে চ্যাপ্টা বোতল। মন তাজা রাখবার ওষুধ। মেজাজ খুশ রাখার মন্ত্রগুপ্তি। শাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে পারুল সাবধানে বোতলটা ওপরে নিয়ে এলো।

সময় খুব কম। বিকাল হবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো অমিয়নাথ এসে হাজির হবে। নটীকে ঘরণী করে তোলার প্রলোভন দেখাবে। মরুবারিণীকে মরুস্থানের ইসারা। কিন্তু অমিয়নাথের জীবনকে বিষময় করে তোলার তার কোন অধিকার নেই। অমিয়নাথের মার কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ফিরিয়ে দেবে অমিয়নাথকে।

আঁচল দিয়ে পারুল বার বার চোখের জল মুছলো। পোড়া চোখের জলের যেন আর শেষ নেই। দামী শাড়ী বের করলো, জমকালো ব্লাউজ। সযত্নে প্রসাধন সারলো। সব শেষে বোতলের ছিপি খুলে সারা গায়ে ফোঁটা ফোঁটা ঢাললো। গাড়ীতে, জামায়, ঠোঁটের কাছেও মাখালো। উগ্র গন্ধ। গা বমি বমি করে উঠলো পারুলের। বারান্দার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। এখান থেকে রাস্তার মোড় পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। অমিয়নাথ এলেই নজরে পড়বে।

শবরীর প্রতীক্ষা। পারুলের দুটো পা ট'ন ট'ন করে উঠলো। কোমরে ব্যথা। মনে ভাবলো বিছানায় একটু গড়িয়ে নেবে। সারাটা দিন পেটে কিছু নেই। মোচড় দিয়ে উঠছে নিস্তেজ স্নায়ু-তন্ত্রী। সরে আসবার মুখেই অমিয়নাথকে দেখা গেলো। দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে।

খুব আস্তে পারুল ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। সন্তর্পণে বন্ধ করলো দরজাটা। হাত দিয়ে চুল এলোমেলো করে দিলো। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল হ'য়েই ছিলো। বেশবাস অবিন্যস্ত। চুপ করে বসে রইলো বিছানায়।

ঠুক্, ঠুক্, ঠুক্। অমিয়নাথের মতনই শান্ত করাঘাত। খুব মৃদু গলার স্বর, পারুল, পারুল।

পারুল উঠে দাঁড়াল। দাঁত দিয়ে সজোরে কামড়ে ধরলো নিচের ঠোঁট। দুটো হাতে বুক চেপে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালো অমিয়নাথের মুখোমুখি।

অমিয়নাথ পিছিয়ে গেলো। উগ্র গন্ধ। চোখ লাল, বাতাসে উড়ছে এলোমেলো চুলের রাশ। পা দুটোও টলছে।

অমিয়নাথ কিছু বলবার আগেই পারুল মুখ খুললো, কি করতে ঘন ঘন আসো বলো তো? পকেটে তো কানা-কড়ির জোর নেই, অথচ সখ আছে ষোল আনা। এখানে সুবিধা হবে না, অন্য কোথাও যাও।

—পারুল, পারুল, অমিয়নাথের গলায় অসহায় কাকুতি।

—থামো, থামো, শুকনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না। পারুল, পারুল! পারুল যেন ওঁর কেনা দাসী। বেরিয়ে যাও সামনে থেকে, নয়তো দরোয়ান ডাকবো।

আর একটি কথাও নয়। অমিয়নাথ আস্তে আস্তে নেমে গেলো। মাথা নিচু করে।

খুব ভয় পেয়েছিলো পারুল। হয়তো পারবে না। ভেঙে পড়বে অমিয়নাথের সামনে। পা দুটো জড়িয়ে বলবে, তুমি আমাকে নাও। পথের ধূলো থেকে কুড়িয়ে তোমার আঙিনায় স্থান দাও।

কিন্তু পারুল পেরেছে। এলেম আছে মোশন মাষ্টারের। শুধু কথাগুলোই নয়, হাবভাব চালচলন নিখুঁত।

আর এ পথে আসবে না অমিয়নাথ।

কিন্তু আশ্চর্য, কথাটা মনে হ'তেই পারুল ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলো। চোখের জলে মুখের রং নিশ্চিহ্ন। অভিনেত্রীর মুখোস খুলে নীড় বাঁধার প্রত্যাশী এক অসহায় নারীর রূপ ফুটে উঠলো। ক্লান্ত, বুভুক্ষ এক নারী।

শ্রীগীতগোবিন্দ ও ভক্তিধর্ম্ম

অধ্যাপক ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালী কবি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ এক অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে রাধামাধবের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করিয়া এই পরম ভগবদ্ভক্ত কবি যে গীতিকাব্য সুললিত সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আজিও রসিক ভক্তজনের হৃদয় অপরিসীম মাধুর্য্যপূর্ণ ভগবদ্ভক্তিরসের সুধাধারায় প্লাবিত করিয়া থাকে। এই কাব্য রচিত হইবার অল্পকালের মধ্যেই ইহা বাংলার বাহিরে ভারতবর্ষের অন্যান্য কয়েকটী প্রদেশে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং কবি পরবর্ত্তীকালের ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে একটী বিশেষ স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হয়। ইহার 'ছন্দঃস্বাচ্ছন্দ্য, পদলালিত্য ও গীতিমাধুর্য্য' এই ভক্তিরসাত্মক কাব্যটিকে এক মনোহর শ্রীমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং ইহার নিজস্ব ভাব, ভাষা ও ছন্দঃ ব্যঞ্জনার বৈশিষ্ট্যগুণে ইহা সংস্কৃত গীতিকাব্যের একটী উৎকৃষ্ট সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

ভক্তিসাধনায় সঙ্গীতের প্রয়োগ শুধু আমাদের দেশেই নহে, অন্যান্য অনেক দেশেই বহু প্রাচীন যুগ হইতেই প্রচলিত ছিল। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বিষ্ণুভক্ত ও শিবভক্তগণ যথাক্রমে 'আড়বার' ও 'নায়নার' বা 'নায়নমার' নামে পরিচিত। 'আড়বার' একটী তামিল শব্দ; ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল 'নিমজ্জিত' অর্থাৎ যাঁহারা সদাসর্ব্বদা বিষ্ণুভক্তির রসঘন আনন্দসমুদ্রে সম্পূর্ণ নিমগ্ন থাকেন। এই আড়বারগণের সংখ্যা সাধারণতঃ দ্বাদশটী, এবং ইঁহাদের অন্যতম প্রধান ছিলেন 'স্মম আড়বার' বা 'সাধু শঠকোপ'। পরম বৈষ্ণব শঠকোপ তাঁহার অন্তরস্থিত ঐকান্তিকী বিষ্ণুভক্তি তামিল ভাষায় রচিত সুললিত গীতাবলির মাধ্যমে ভগবচ্চরণে নিবেদন করিয়াছিলেন। শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্যতম আদি প্রবর্ত্তক আচার্য্য নাথমুনি (যামুনাচার্য্যের পিতামহ) এই ভক্তপ্রবরের ভক্তিরসাত্মক গীতমালা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে 'আড়বার'-গণ সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে গজেন্দ্র কর্ত্তৃক শ্রীহরিস্তুতির বিংশসংখ্যক শ্লোক এইরূপ— একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ। অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥ অর্থাৎ 'যে সকল ঐকান্তিক (ভক্ত) ভগবচ্চরণে সম্যক শরণ পরায়ণ হইয়া এবং কোনও বস্তুরই প্রার্থী না হইয়া শ্রীভগবানের অত্যাশ্চর্য্য মঙ্গলময় চরিতাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে (ভক্তিরসের) আনন্দসমুদ্রে চিরনিমগ্ন থাকেন'। বাঙ্গালী কবি ভক্তিসাধক জয়দেব গোস্বামীও এইরূপ তাঁহার হৃদয়দেবতা ভগবান্ শ্রীরাধামাধবের আনন্দঘন কল্যাণময় চরিত্র তাঁহার রচিত মধুর, কোমল ও কান্তপদাবলীর সাহায্যে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই সুললিত অপরূপ কাব্যসুষমামণ্ডিত গীতাবলি প্রধানতঃ আদি রসাত্মক হওয়াতে কোনও কোনও তথাকথিত রুচিবাগীশ আপত্তি তুলিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা বিষ্ণু-কৃষ্ণভক্তির পীযূষধারায় সুস্নাত হইয়াছেন বা যাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে ইহার স্নেহধারা কিছু মাত্রায় সিঞ্চিত হইয়াছে তাঁহাদের মনে এরূপ বিরূপ আলোচনা আদৌ স্থান পাইতে পারে না। ভক্তিরসের অন্যতম আকর এই গীতাবলির রসাস্বাদনের প্রকৃত অধিকারী তাঁহারাই 'যাঁহাদের হরিস্মরণে মন সরস হয়, যাঁহাদের শ্রীভগবানের বিলাসকলা জানিবার কৌতূহল থাকে'। কবি সেজন্যই বলিয়াছেন :—

'যদি হরিস্মরণে সরসংমনো যদি বিলাসকলাসু কুতুহলম্।
মধুরকোমল কান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্'॥

'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' গ্রন্থ সুলেখক বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আজ প্রায় ২৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় পাঠকসমাজে ইহা সমধিক আদরপ্রাপ্ত হওয়ায়, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা গ্রন্থকারের পক্ষে শ্লাঘা ও কৃতিত্বের কথা যে উহার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। গত ৬ই আষাঢ় ৺রথযাত্রার পুণ্যদিবসে ইহা আত্মপ্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের কবি জয়দেবের ও তাঁহার শ্রীগীতগোবিন্দের প্রতি ভক্তিপূর্ণ প্রীতির, এবং নানাবিধ তথ্যপূর্ণ ভূমিকা, বিশদ টীকা ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদসহ ইহার পরিবেশন রীতির প্রতি প্রশংসাপূর্ণ আস্থার পরিচয় প্রদান করিতেছে। গ্রন্থকার প্রতি পরবর্ত্তী সংস্করণে ভূমিকাদিতে নূতন নূতন অংশ সংযোজিত করিয়া এই গ্রন্থ উত্তরোত্তর তথ্যসমৃদ্ধ ও জ্ঞানবহুল করিয়া তুলিয়াছেন। তাই এই তৃতীয় সংস্করণে দেখিতে পাইতেছি যে অন্যূন পঞ্চবিংশ খণ্ডে বিভক্ত এবং ২৪৪ পৃষ্ঠায় পরিবেশিত একটী বিস্তৃত ভূমিকা। দ্বাদশ সর্গাত্মক গীতিকাব্যের শ্লোকগুলি পূজারি গোস্বামীর টীকা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত হইয়া দ্বিতীয় অংশে ১৫২ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ভূমিকায় আলোচিত প্রসঙ্গ সমৃদ্ধির স্বরূপ নিম্নোক্ত আংশিক বিষয় তালিকা হইতেই প্রতীয়মান হইবে; যথা, (১) সাত্বত ধর্ম্ম, (২) বীরভূমি, (৩) কবি সাময়িকী, (৪) কবি-জীবন, (৫) কাব্যকথা, (৬) শ্রীগীতগোবিন্দে গীত, (৭) শ্রীগীতগোবিন্দে গোবিন্দ, (৮) শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ, (৯) শ্রীরাধা-প্রসঙ্গ, (১০) শ্রীরাধাতত্ব, (১১) কংসারির সংসার (এ নিবন্ধটী সম্পূর্ণ নূতন—পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণ দুটীতে ইহা ছিল না), শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতগোবিন্দ প্রভৃতি। 'শ্রীগীতগোবিন্দে 'গীত' ও 'জয়দেবের ছন্দ' (১২) এই প্রসঙ্গ দুইটী যথাক্রমে সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অধ্যাপক শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্যের রচনা। তৃতীয় সংস্করণের নিবেদনে গ্রন্থকার ইঁহাদের নিকট সকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। আরও দুই চারিজনের নিকট তিনি যে কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন,

তাঁহাদের নামোল্লেখও তিনি করিয়াছেন। তবে এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক মনে করি যে সুচিন্তিত ও সুলিখিত ভূমিকাটীর আঙ্গিক ও অনুব্যঞ্জনা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। নানাপ্রসঙ্গের বিচারে ও বিশ্লেষণে যে সমস্ত মত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ঐগুলি আলোচনা করিলে হয়ত প্রত্যেকটীই সমর্থনযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার বলিষ্ঠ লিখনভঙ্গী ইহাদের প্রত্যেকটীকে একটী বিশিষ্টরূপ প্রদান করিয়াছে। আমি কেবল তাঁহার ভূমিকায় প্রথম প্রসঙ্গটীর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র সমালোচনামূলক প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

গ্রন্থকার সাত্বতধর্ম্মকে বৈদিকধর্ম্ম এই আখ্যা দিয়া প্রথম প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক বিচারে কিন্তু সাত্বতধর্ম্ম যাহা পরে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব নামে পরিচিত হইয়া পড়ে বৈদিক আখ্যায় অভিহিত হইতে পারে না। সাত্বত বা বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে ভক্তিধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় উহা যে বৈদিক নহে তাহা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। মহাভারতেও সাত্বত বা পাঞ্চরাত্রধর্ম্ম এবং শৈব পাশুপতধর্ম্ম যে অবৈদিক ছিল এই মত সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ভক্তিধর্ম্মের প্রথম সম্প্রসারণ হয় যখন বাসুদেব কৃষ্ণের সহিত তাঁহার আরও চারিজন আত্মীয় যথা অগ্রজ সঙ্কর্ষণ (বলরাম), জ্যেষ্ঠপুত্র প্রদ্যুম্ন (তাঁহার প্রধানা পত্নী রুক্মিনীর গর্ভজাত), অন্যতম পুত্র শাম্ব (অন্যতমা পত্নী জাম্ববতীর গর্ভে উৎপন্ন) এবং পৌত্র অনিরুদ্ধ (প্রদ্যুম্নের পুত্র) দেবতার পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েন। ইঁহারাই মোরা শিলালেখটীতে ও বায়ুপুরাণে বৃষ্ণিবংশীয় পঞ্চবীর এবং মনুষ্যপ্রকৃতি দেবতা নামে অভিহিত হইয়াছেন। যে কোনও কারণেই হউক সাত্বতধর্ম্মাবলম্বীগণ এক সময়ে এই তালিকা হইতে শাম্বকে বাদ দিয়া আর চারিজনকে ভগবানের 'ব্যূহ'রূপে কল্পনা করেন। সাত্বত বা পাঞ্চরাত্রধর্ম্ম মতের এই চতুর্ব্ব্যূহবাদ একটী বিশিষ্ট অঙ্গ। এই ধর্ম্মাশ্রয়ীগণ তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ উপাসনার বস্তু ভগবান শ্রীবাসুদেবকে পঞ্চরূপে ভাবনা করিতেন ; এই রূপগুলি যথাক্রমে 'পর', 'ব্যূহ', 'বিভব', 'অন্তর্য্যামী' ও 'অর্চ্চা' বা 'শ্রীবিগ্রহ'। এই মতবাদ যে কোন্ সময়ে পূর্ণাঙ্গ বিকাশলাভ করে তাহা বলা কঠিন, তবে ইহা যে গুপ্তযুগ প্রারম্ভের বেশ কিছু পূর্ব্বে বিকশিত হয় তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। বাসুদেব-কেন্দ্রিক ভক্তিধর্ম্মে প্রাক্‌খৃষ্টীয়যুগের কোনও সময়ে বৈদিক আদিত্য-বিষ্ণু এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থোক্ত দেবতা নারায়ণের পরিকল্পনা সম্মিলিত হইয়া যায়, এবং 'বাসুদেব কৃষ্ণ', 'আদিত্য বিষ্ণু' ও 'নারায়ণ' এই তিনটীর মিলিতরূপ পরবর্ত্তীকালে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবধর্ম্মের একমাত্র প্রধান প্রতীকরূপে গৃহীত হয়। তবে এখানে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে সাত্বতধর্ম্মের এই সম্প্রসারণ বৈদিকযুগের অনেক পরে সংঘটিত হয়। ইহাও এ প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে সাম্প্রদায়িক হিসাবে বৈষ্ণব পদটীর প্রয়োগ ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের এবং প্রত্ন লেখমালার অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন অংশেই পাওয়া যায় ; গুপ্তযুগের মধ্যকালের পূর্ব্বে এই নামের প্রচলন ছিল না। বৈদিক 'আদিত্য বিষ্ণু' ও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান প্রতীক 'বিষ্ণু' এক নহেন এবং সাত্বতধর্ম্ম বৈদিক নহে। বৃষোৎসর্গ পদ্ধতি হইতে গ্রন্থকার যে অনন্তদেবের পূজামন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ঋগ্বেদের-কালে কালীয়-দমন লীলা কাহিনী প্রচলিত থাকার ইঙ্গিত করিয়াছেন, উহা সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ মন্ত্রটী কোনও ঋকসূক্তে নাই এবং উহা আদৌ বৈদিক মন্ত্র নহে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন (৫ পৃষ্ঠা) যে বেষনগর লিপিতে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু, তালধ্বজ সঙ্কর্ষণ, মকরধ্বজ প্রদ্যুম্ন ও মৃগধ্বজ অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্ব্যূহের পরিচয় পাওয়া যায় ইহা সত্য নহে। এই লিপিতে ইঁহাদের কাহারও উল্লেখ নাই। উক্ত লেখ হইতে আমরা ইহা জানিতে পারি যে তক্ষশিলার যবনরাজ কর্ত্তৃক বিদিশার সুঙ্গ রাজার নিকট প্রেরিত যবনদূত হেলিওদোর ভাগবত-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতা দেবদেব বাসুদেবের উদ্দেশ্যে বিদিশা নগরীতে একটী গরুড়ধ্বজ নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। নবম পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার সপ্তবিধ পঞ্চরাত্রের উল্লেখ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে ইহাদের সংখ্যা একশত আট। কিন্তু বহুপূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিত শ্রেডার দেখাইয়াছেন যে আমরা অধুনালব্ধ পাঞ্চরাত্র গ্রন্থাবলী হইতে অন্ততঃ ২১৬খানি পাঞ্চরাত্র বা সাত্বত গ্রন্থের পরিচয় পাই, এবং ইহাও ইহাদের পূর্ণ পরিচয় নহে। 'পাঞ্চরাত্র' এই নামটীর কোনও সর্ব্ববাদীসম্মত ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায় নাই।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করার আর প্রয়োজন দেখি না। উপরে যে কয়েকটী ত্রুটিবিচ্যুতির কথা লেখা হইল, তাহা গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নহে। গ্রন্থকার ঐতিহাসিক নহেন, কাজেই ভূমিকায় এ ধরণের অল্পস্বল্প ভ্রান্তির প্রবেশ লাভ আদৌ বিচিত্র নহে। কিন্তু একজন চিন্তাশীল ও সুলেখক পরম বৈষ্ণব যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাচীন বাঙ্গালী কবি জয়দেব ও তাঁহার অতুলনীয় ভক্তিরসাত্মক গীতি-কাব্য শ্রীগীতগোবিন্দ সম্বন্ধে এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন এবং সুললিত কাব্যটীর মূল, বঙ্গানুবাদ ও বিশদ টীকা দেশের জনসাধারণের নিকট এরূপ সুন্দরভাবে পরিবেশন করিয়াছেন, এজন্য তিনি বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

নিষ্কাম কর্ম

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়োহ্যকর্মণঃ
শরীর যাত্রাপি তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ। (গীতা ৩।৮)

সর্বদা কর্ম করিয়া যাও, কর্মশূন্যতা অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ঠ। কর্ম না করিলে তোমার দেহধারণ করাও সম্ভবপর নয়।

জীবনকে নিরন্তর কর্মময় রাখিতে হইবে, অলস জীবনযাপন অনুচিত—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। যাহারা শাস্ত্রবাক্য মানে না, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের শেষের দিকটা বেশ ভাল করিয়া বুঝে। তাহারা জানে যে অন্ততঃপক্ষে উদরান্নসংস্থানের জন্য কর্মের প্রয়োজন আছে। কর্ম যে করিতে হইবে, তাহা ত আর বুঝাইতে হইবে না। সুতরাং এ আর কোন্ নূতন কথা? আর শরীরযাত্রানির্বাহের কথা শুধু মানুষ কেন, জীবমাত্রেই বুঝে। কোনও প্রকার বাঁচিয়া থাকার জন্যই ত জগতের অগণিত নরনারী উদয়াস্ত কর্ম করিয়া যাইতেছে। তথাপি সুখ নাই, শান্তি নাই, চিত্তের প্রসন্নতা নাই, জীবনে পূর্ণতা নাই। সুতরাং কেবল কর্ম করিলেই হইবে না; কিরূপ কর্ম করিতে হইবে তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। কিরূপ কাজ করিলে এই দুর্বহ জীবনভারের লাঘব হইতে পারে, জীবন আনন্দময় ও পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হইতে পারে এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত।

বর্তমান যুগের জনপ্রিয় সমাজতান্ত্রিকগণের মতে দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানই জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে সকলের অশনবসন ও বাসভবন সমান করিয়া দিতে হইবে। পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় লোক অসংখ্য মানুষের শ্রমার্জিত সম্পদ ছলেবলে কৌশলে কাড়িয়া লইয়া ধনসঞ্চয় করিয়া আরামে বিলাসীর জীবনযাপন করিতেছে, আর যাহাদের ধনসম্পদ লইয়া তাহাদের এই বিলাসব্যসন তাহারা অভাবের তাড়নায় আর্তনাদ করিতেছে। সুতরাং বর্তমান সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জগতে ধনসাম্যের প্রতিষ্ঠা কর। মানুষের প্রতিটি কর্মের পশ্চাতে একমাত্র ঐকান্তিক কামনা থাকিবে ধনসাম্যের প্রতিষ্ঠা। এই কামনার পূর্তির জন্য ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা যাহা প্রয়োজনীয় বোধ হইবে তাহারই আশ্রয়ে কর্ম করা উচিত। যে কার্য্যের দ্বারা ধনসাম্যের রাজ্য আসিতে পারে সেইরূপ কার্য্যই করণীয়।

এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক। তথাকথিত ধনসাম্যের দ্বারা সহজে জীবন ধারণকরা সম্ভবপর হইতে পারে, কাম্যবস্তুর ভোগ অনায়াসলভ্য হইতে পারে, ইন্দ্রিয়পরিচর্য্যার পথ প্রশস্ত হইতে পারে কিন্তু সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য না থাকায় মানুষ প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হইবে। যন্ত্রের আনন্দই বা কি আর শান্তিই বা কি? ইন্দ্রিয়তর্পণের ও দেহ-পূজার প্রাচুর্য্য ক্রমবর্ধমান হইলে কোনও কালে শান্তি আসিবে না।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে। (বিষ্ণুপুরাণ)

কাম্যবস্তুসমূহের উপভোগের দ্বারা কামনার শান্তি হয় না। ঘৃতবর্ষণে অগ্নি নির্বাপিত না হইয়া যেমন উত্তরোত্তর বাড়ে, তেমনই উপভোগের দ্বারা কামনার বৃদ্ধি হয়।

দুষ্পূরণীয় কামনা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া চলিবে, সেই নবনবায়মান কামনার অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার জন্য জীবন অশান্তিতে পূর্ণ হইবে, সুখ বা স্বস্তি কোনও দিন আসিবে না। অতএব সমাজতন্ত্র বিহিত কর্মের দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনে বা সমাজে শান্তিপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই। সেরূপ কর্ম করণীয় হইতে পারে না।

পাশ্চাত্য হিতবাদিগণের (utilitarian) মতে সে কর্মের দ্বারা অধিক-সংখ্যক লোকের প্রচুরপরিমাণে হিতসাধন করা সম্ভব, তাহাই করণীয়। যীশুখ্রীষ্টের উপদেশ প্রায় অনুরূপ। তিনি অধিক-সংখ্যক লোকের কথা না বলিয়া সকল লোকের কথাই বলিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক মানুষকে নিজের মত করিয়া ভালবাসিতে বলিয়াছেন। Love thy neighbour as thyself. কেন অধিকাংশ লোকের হিতসাধন করিতে যাইব, কেনই বা প্রত্যেককে আপনার মত করিয়া ভালবাসিব—এ প্রশ্নের উত্তর হিতবাদিগণ বা যীশুখ্রীষ্ট দিতে পারেন নাই। বহু পাশ্চাত্য মনীষী এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশও করিয়াছেন। বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর ডসেন বলেন,—

The Gospels fix quite correctly as the highest law of morality—"Love thy neighbour as thyself! But why should I do so, since by the order of nature I feel pain and pleasure in myself and not in my neighbours? The answer is not in the Bible, but it is In the Vedas—in the great formula তত্ত্বমসি which gives in three words তৎ, ত্বম্ and অসি metaphysics and morality together.

—মানুষকে নিজের মত ভালবাস—এই অনুশাসনের দ্বারা বাইবেল যে সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক বিধানের কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল। কিন্তু কেন আমি তাহা করিতে যাইব? আমি যে প্রকৃতির নিয়মে দেখি আমার সুখদুঃখ আমার মধ্যেই অনুভূত হয়, অন্যের মধ্যে হয় না। প্রশ্নের উত্তর বাইবেলে নাই, বেদে আছে। বেদের মধ্যে তত্ত্বমসি এই তিনটি শব্দের মধ্যে সমগ্র দর্শনশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র নিহিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণ নিয়ত কাজ করিতে বলিয়াছেন এবং কি ভাবে করিতে হইবে তাহাও বলিয়াছেন।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি। গীতা ২।৪৭

কেবলমাত্র কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কদাচ তোমার অধিকার নাই। কর্মফলের আশায় যেন তোমার কর্মে প্রবৃত্তি না হয় বা কর্মপরিহার করিবার মতিও যেন তোমার না আসে।

কর্মফলের আশা না করিয়া কর্ম করা যায় কি না এই প্রশ্নের সহিত "তত্ত্বমসি" বাক্যের নিবিড় সম্বন্ধ আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথমতঃ কর্মের ফলের কথা না ভাবিয়া কাজ করা একেবারে অস্বাভাবিক অসম্ভব অযৌক্তিক ও আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়। ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিলে ফলের আশা না করিয়াও মানুষ কাজ করে। যাহারা তাস পাশা বা সতরঞ্চ খেলে তাহারা জয়লাভের জন্যই খেলে না, খেলার আনন্দে খেলে. হারিয়া গেলেও খেলে। আবার যাহারা রেস খেলিতে যায়, তাহারা খেলার আনন্দে যায় না, জয়লাভের তথা অর্থলাভের আশায় যায়। তাহারা খেলায় হারিয়া গেলে মনে মনে বিশেষ কষ্ট পায়। রেস-খেলার জুয়াড়ীদের মত যাহারা ফলের আশায় কাজ করে, তাহারা অভীষ্ট ফললাভে বঞ্চিত হইলে দুঃখবোধ করে। সংসারের প্রায় সকল লোকই এই রেসের জুয়াড়ী আর সেইজন্যই তাহাদের দুঃখেরও অন্ত নাই। ফলের আশা না রাখিয়া বা এক কথায় নিষ্কাম হইয়া কাজ করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও অসাধারণ বটে। জগতে নিষ্কামকর্মী বিরল। কিন্তু এই নিষ্কামতাই হিন্দুধর্মের, হিন্দু-দর্শনের ও হিন্দু-সমাজ বিধানের মূল কথা এবং সকলের মূলে তত্ত্বমসি মহাবাক্য। তস্য ত্বম্ অসি—তুমি তাহার। তোমার পৃথক স্বাধীন সত্তা কিছু নাই। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস." ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন,—গৃহস্থের বাড়ীর দাসীরা সংসারের যাবতীয় কাজ করে, ছেলেমেয়েদের লালনপালন করে, তাহারা মরিয়া গেলে রোদনও করে কিন্তু মনে মনে ভাল করিয়াই জানে যে সংসার তাহাদের নয়, ছেলেমেয়েগুলিও তাহাদের কেহ হয় না। ভগবানের সংসারে এই দাসীদের মত থাকিতে হইবে।

আগেকার দিনে প্রত্যেকটি পরিবারে বিগ্রহসেবা থাকিত। নারায়ণেরই যেন সংসার—সংসারের লোকগুলি ভৃত্যমাত্র, নারায়ণের প্রসাদজীবী মাত্র। যে গৃহস্থ এই ভাবিয়া বিগ্রহসেবা করেন তাঁহার সংসার বৈকুণ্ঠ এবং তাঁহার কর্ম নিষ্কাম ও পুণ্যময় না হইয়া পারে না। এইরূপ মানুষের কর্মফলের আশায়ই বা কি প্রয়োজন? সকলই ত নারায়ণের।

জীবনের প্রতিটি কার্য্যের সহিত ভগবানকে যুক্ত করিয়া রাখিলে কর্ম নিষ্কাম হইতে বাধ্য। তাঁহাকে ভালবাসিলেই তাঁহার সহিত যুক্ত হওয়া যায়। মানুষ যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে নিজের সব কিছু দিতে চায়। তাই ত গীতা বার বার সর্বকর্মফল ভগবানে অর্পণ করিতে বলিতেছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ মদর্পণম্ (গীতা ৯।২৭)

হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, হোম কর, দান কর, তপস্যা কর—সমস্তই আমায় অর্পণ কর।

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে,—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ
করোতি যৎ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ। (১১।২।৩৬)

শরীর, মন, বাক্য ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি অথবা আত্মার দ্বারা কৃত কিংবা স্বভাব হইতে অনুসৃত সকল প্রকারের কর্মই পরমপুরুষ নারায়ণে অর্পণ করিবে।

এখানে শুধু যজ্ঞ, হোম, তপস্যা বা দানের কথাই নয়, জীবনের যাহা কিছু কাজ তাহার প্রত্যেকটি ভগবানে অর্পণ করিতে বলা হইয়াছে। কাজও তাঁহার, কাজের ফলও তাঁহার আর তুমি নিজেও তাঁহার। সুতরাং তাঁহাকে না দিয়াই বা উপায় কি?

বৈষ্ণবশাস্ত্রে "আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা"কে কাম বলা হইয়াছে। নিজের সুখ কামনাই কাম। এই কামকে সরাইতে হইলে প্রেমের প্রয়োজন।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা তারে কহে কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।

ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম করিলেই সেই কর্ম প্রেমময় হইবে, নিষ্কাম হইবে। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি বলিয়া সংসার কর্ম আরম্ভ করিতে পারিলেই নিষ্কাম কর্ম করা সম্ভবপর হইবে। তখন আর ক্ষয়ক্ষতির ক্ষোভ হইবে না, পরাজয়ের গ্লানি মনকে ম্লান করিবে না। পক্ষান্তরে—প্রিয়তমের ঈপ্সিত কার্য্য করিতে পারিতেছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ ও আনন্দলাভ হইবে, সকল দুঃখের অবসান হইবে। শুধু ব্যক্তিগত অশান্তিরই অবসান হইবে, তাহা নহে। বিশ্বব্যাপিনী শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

নিষ্কাম কর্ম একেবারেই অসম্ভব নয়, জীবন যে মুহূর্তে ভাগবতজীবন হইবে, সেই মুহূর্তেই জীবনের সকল কর্ম আপনা হইতে নিষ্কাম হইয়া যাইবে। তোমার হৃদ্দেশে যাঁহাকে উপলব্ধি করিবে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁহাকে দেখিয়া তোমার জীবন মধুময় হইবে। শ্রীকৃষ্ণ "নিয়তং কুরু ত্বম্" বলিয়া কর্মবীর হওয়ার জন্য যে উদাত্ত আহ্বান করিয়াছেন তাহার মুখ্য কথা আত্মসত্তাকে ভগবদভিমুখিন করা। এ আহ্বান প্রেমের আহ্বান—জীবকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করার নিমিত্ত মুরলীগীতি।

ভূদান আন্দোলন

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে চার বছর আগে ১৯৫১ সালের বসন্তকালে একটি শীর্ণকায় ক্ষীণজীবী মানুষ পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন হায়দরাবাদের সন্ত্রাস-সংক্ষুব্ধ তেলেঙ্গানার গ্রামে গ্রামে। এইসব অঞ্চলে তখন শান্তি ছিল না, জমীহীনদের জমীর লড়াইএর আন্দোলন সুরু হয়েছিল ভীষণ ভাবে। সেই ক্ষীণজীবী মানুষটির নিরাপত্তার জন্যে কোন পুলিশ বা অন্য কোন পাহারা নেই। প্রতি বাড়ী, প্রতি কুটীরে কুটীরে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন নির্ভীক ভাবে। সর্ব্বশ্রেণীর নারী পুরুষ সকলের সঙ্গেই আলাপ আলোচনা করছেন, ধৈর্য্যধরে তাদের দুঃখের কথা শুনছেন। তিনি জানতে চান তাদের সমস্যার কথা, তাদের দুঃখ কষ্টের কথা।

এই ক্ষুদ্র মানুষটি আর কেউ নন, মহাত্মা গান্ধীর প্রধান শিষ্য আচার্য্য বিনোবা ভাবে।

একদিন পোচাম্পাল্লি গ্রামের ভেতর দিয়ে তিনি চলেছেন, এমন সময় প্রায় ৪০টি হরিজন পরিবারের লোকজন এসে ঘিরে ধরল তাঁকে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও তোমরা?" তারা উত্তর দিলে "জমী।" আচার্য্যের তো নিজের কোন জমী নেই। তিনি কিছুক্ষণের জন্যে নীরব থেকে বল্লেন—"বেশ, এবিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা ক'রব আমি।" কিন্তু এ উত্তর তো ঠিক হোলো না। মিনিটখানেকের জন্যে সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আচার্য্য ডুবে গেলেন গভীর চিন্তায়। অল্পক্ষণ পরেই আবার চোখ খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কোন জমীদার উপস্থিত আছেন কি না?" তারা বল্লে "আছে।" তিনি জানতে চাইলেন এইসব হতভাগ্য মানুষদের দাবি পুরণ করার জন্যে কোন জমীদার তাঁর কিছু জমী দান করতে রাজি আছেন কি না। তাঁর এই প্রশ্নে আবার সেখানে নেমে এলো নিস্তব্ধতা।

হঠাৎ সকলকে বিস্মিত ক'রে দিয়ে একজন বলে উঠলেন—"আমি পারি আমার নিজের জমী থেকে ১০০ একর জমী দান করতে।" এই ভাবে সুরু হোলো 'ভূদানযজ্ঞ' আন্দোলন। প্রথম যিনি জমী দান করলেন তাঁর নাম ভি, আর রেড্ডি। সেই থেকে দিনে দিনে এই আন্দোলন বেড়ে উঠেছে শক্তিশালী হয়ে। ইতি মধ্যেই প্রায় চার লক্ষ দাতার কাছ থেকে এই মহৎ যজ্ঞে দান হিসাবে পাওয়া গেছে ৩৮ লক্ষ একরেরও বেশী। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পাঁচ কোটি একর জমী সংগ্রহ করা আচার্য্য বিনোবাভাবের লক্ষ্য। তাঁর প্রবর্ত্তিত এই আন্দোলন ভারতের চারকোটি জমীহীন কৃষকের জীবনে জ্বেলে দিয়েছে আশার আলো।

আচার্য্যের মতে এই ভূদান একটি পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠান, এই যজ্ঞে অন্য কোন ধন সম্পদের পরিবর্ত্তে দান করা হয় জমী। "জনসাধারণের কল্যাণে অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞে যে কেউ অংশ গ্রহণ করতে পারেন।"

ভূদান আন্দোলন ইতিমধ্যেই দেশের সুদূরপ্রসারী ভূমি সংস্কার চালু করার সুস্থ ও অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এই আন্দোলন নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করেছে যে ভূমি-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হ'তে পারে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পন্থায়। এই আন্দোলন জনসাধারণের মনকে প্রস্তুত ক'রে তুলেছে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক বিপ্লবের জন্যে। সংলাপ সম্মতির মধ্য দিয়ে আসবে এই বিপ্লব, বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে নয়। এ বিপ্লব হ'বে এক অভিনব ধরণের বিপ্লব, যা পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও নেই।*

* 'কুরুক্ষেত্র'—১৯৫৫, জুলাই সংখ্যা হইতে।

ফিকে রোদ

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

বিগত দিনের সুর আজ তার মানে কিছু নাই
শিরীষ ডালের ফাঁকে ফিকে রোদ সরে সরে যায়,
বিকেলের মেঘ যেন কত মায়া—দূরের শানাই
একটি গানের সুর ডাকে ইশারায়।
পঞ্চদশী কোন মেয়ে সেদিনের স্নিগ্ধ সন্ধ্যা-ছায়া—
হিজলের ছায়া-ঘেরা ঘাটে এসে করে জলকেলি;
হৃদয়ের ভীরুখেলা—কত কাছে, কত দূরে হায়—
মুছে যাওয়া সেই রঙ হারাইয়া ফেলি!

আজো আছে সেই ঘাট, শিরীষ সরিয়া গেছে দূরে,—
লুকোচুরি ছায়া নাই, বিকেলের রোদ আছে শুয়ে
জীবনের কোলাহল, কত ভিড়—ডাকে নব সুরে
সেদিনের ফিকে রোদ শুধু যায় ছুঁয়ে।
আহা সেই অপরাহ্ণ! আলো-ছায়া আবেশ সুরের
একটি গানের কলি: কলরব নাই কোনখানে,
ঘুমাতেছে সেই দিন, সেই সুর প্রচ্ছন্ন মনের
থেকে থেকে জেগে ওঠে নেই কোন মানে।

বিশ্বশান্তি মহাসম্মেলন

নরেন্দ্র দেব

দিল্লীর নিখিল ভারত শান্তি-সমিতি কর্তৃক তাঁদের পশ্চিম বঙ্গীয় শাখার মাধ্যমে এক নিমন্ত্রণ এল।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের হেল্‌সিংকী শহরে এবার বিশ্বশান্তি মহাসম্মেলন বসছে। ভারতের প্রতিনিধি রূপে এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য আমাদের তাঁরা আহ্বান জানাচ্ছেন। যাতায়াতের প্লেন ভাড়া কাবুল দিয়ে গেলে দেড় হাজার টাকা দিতে হবে। আর য়ুরোপ ঘুরে গেলে আড়াই হাজার টাকা পড়বে। 'পীস্ কমিটি'কে দু'শো টাকা দক্ষিণা দিতে হবে। হেলসিংকীতে থাকা ও খাওয়ার জন্য প্রতিদিন হোটেল খরচ মাথাপিছু ছ'ডলার লাগবে। এসব তাঁরা আমাদের নিমন্ত্রণপত্রে খোলসা করেই লিখেছিলেন।

আমি এখানে প্রায় পাঁচবছর 'বালিগঞ্জ আঞ্চলিক শান্তি সমিতি'র সভাপতি আছি। শান্তির নামে আহ্বান পেয়েই এতে যোগ দিই। যদিও পরে জানতে পারি যে এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের বহু অশান্তি সৃষ্টিকারী,
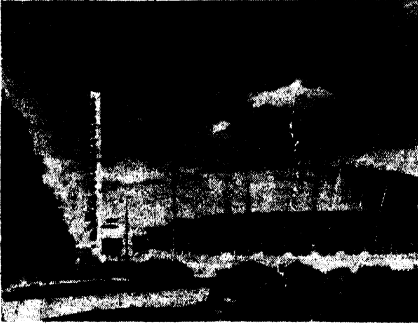
"ওলিম্পিক স্টেডিয়াম—হেলসিংকী (স্মরণ চূড়াটি ৩২তলা উঁচু)

কোনও রাজনৈতিক সম্প্রদায় কর্তৃকই পরিচালিত, তবু, এর সঙ্গে আম সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিনি। বন্ধুবান্ধবরা ওর মধ্যে না-থাকবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু, যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য, বিশ্বের কল্যাণের জন্য 'শান্তি আন্দোলন' সত্যই প্রয়োজন বুঝে আমি এ ব্যাপারে এদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হই। হলেনই বা এঁরা বিশেষ কোনও রাজনৈতিক মতবাদী,—শান্তি আন্দোলনটা সব রকম মতবাদীদেরই মতে ভাল কাজ। সৎকাজে সহযোগিতা করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য। এঁদের "বন্ধ করো!" "জবাব চাই!" প্রভৃতি মনুমেন্টিয় মিটিং, বা "মানবো না!" "চলবে না!" ইত্যাদি 'রণংদেহি' মিছিলে এঁরা দেশে যেরকম অশান্তির সৃষ্টি করেন শান্তি-আন্দোলনের মধ্যে সে উত্তাপ ও উত্তেজনা সৃষ্টির অবকাশ নেই। বরং এর স্নিগ্ধ-প্রলেপে তাঁদের আঘাহত জীবনের বহুক্ষত প্রশান্ত হ'তে পারে এই বিশ্বাসে উৎসাহের সঙ্গেই এঁদের 'শান্তি আন্দোলনে' যোগ দিয়েছি।

'শান্তি'-সম্মেলনের আমন্ত্রণ পত্রে যে অর্থব্যয়ের ফর্দ ছিল হিসাব ক'রে দেখা গেল তাতে আমাদের দু'জনের প্রয়োজনীয় খরচ ও অন্যান্য বিবিধ রাহা খরচ নিয়ে য়ুরোপের পথে যেতে সাড়ে সাত বা আট হাজার টাকার ধাক্কা এসে লাগছে। কাবুলের পথে অবশ্য হাজার দুই কম হবে। "শান্তি" যে এত ব্যয়সাধ্য বস্তু আগে তা' জানা ছিল না। এতো প্রায় ব'লতে গেলে 'যুদ্ধের' খরচেরই সমান! এই মূল্যবান বা মহার্ঘ শান্তি সম্মেলনের আকর্ষণ হয়ত' আমরা এই অর্থকৃচ্ছ্র তার দিনে ত্যাগই
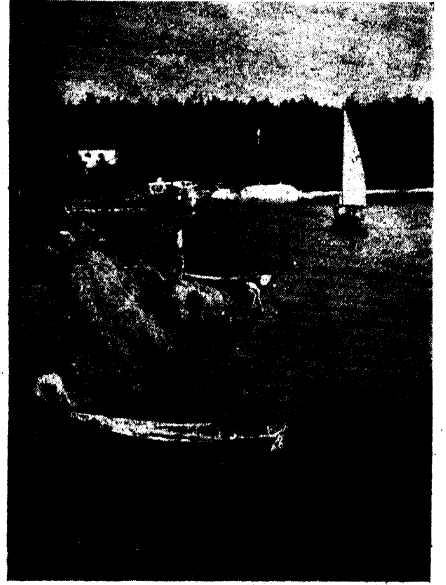
সাগরমেখলা—অরণ্যঅঞ্চলা হেলসিংকী।

করতুম, যদি সেই নিমন্ত্রণ পত্রে এই লোভনীয় সংবাদটুকু না থাকতো যে 'শান্তি-আন্দোলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিবর্গকে 'সোভিয়েট রাশিয়া' পরিদর্শনের জন্য সাদর আহ্বান জানানো হয়েছে।'

কবিগুরুর 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই রাশিয়া বেড়িয়ে আসবার ইচ্ছাটা আমাদের প্রবল হ'য়ে উঠেছিল। গত ১৯৫০ সালে যখন সারা য়ুরোপ ঘুরতে বেরিয়েছিলুম, রাশিয়া দেখে আসবারও যথামতো চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু, কিছুতেই সরকারী অনুমতি পাওয়া যায় নি। ঠিক সেই সময়ই 'কোরিয়ায়' যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় রাশিয়া ভ্রমণ একেবারেই

নিরাপদ নয় ব'লে কর্তৃপক্ষ আমাদের নিরস্ত করেছিলেন। এবার সে সুযোগ অযাচিত দ্বারে এসে উপস্থিত! একি ছাড়া যায়? যেতেই হবে স্থির করলুম।

ইতোমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ শান্তি-সমিতির কর্মীরা এসে জানালেন—সুখবর আছে! কাবুলের পথেই 'প্লেন' পাওয়া গেছে। সুতরাং অতিরিক্ত দু'হাজার টাকা আর লাগবে না। আপনারা ৬ই জুন তারিখে কলকাতা থেকে দিল্লী রওনা হ'য়ে যান। ৯ই সকালে আপনাদের প্লেন ছাড়বে। একদিন আগে গেলে একটু বিশ্রামের অবকাশ পাবেন।

ওতানিয়েমীর টেক্‌নিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাস

তাড়াহুড়ো করে ৬ই জুন তারিখেই দিল্লী রওনা হয়ে গেলুম। আমাদের বন্ধু ঔপন্যাসিক শ্রীচরণদাস ঘোষ তাঁর বেহাই ডাক্তার কে, এন, বসুকে আমাদের দিল্লী যাবার কথা লিখেছিলেন। তিনি স্টেশনে এসে আমাদের ধরে তাঁর বাংলো রোডের নতুন বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুললেন। আপত্তি করলুম না। মাত্র একটা দিন ও এক রাত্রির ব্যাপার বই ত না। যদিও দিল্লীতে আমাদের একাধিক নিকট-আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব রয়েছেন, তবু বেয়ানঠাকুরুণদের আকর্ষণটাই বড় হয়ে উঠলো। ওঁদেরই

পার্লিয়ামেণ্ট ভবন, হেলসিংকী

আতিথেয়তা গ্রহণ করলুম। এখানে আমাদের যত্ন আদরের সীমা ছিল না। খুব আনন্দেই দিন কাটানো গেল কুটুম্ব বাড়ীতে।

কাল কখন কোন সময়ে কোন বিমানঘাঁটি থেকে প্লেন ছাড়বে জানবার জন্য সকালে উঠে দিল্লীর কমলা মার্কেটে শান্তি-সমিতির অফিসে গেলুম। কার মুখ দেখে উঠেছিলুম জানি না। ওখানে গিয়ে শুনলুম আফগান সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ বাধার সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠেছে ব'লে পেট্রল 'সংরক্ষিত বস্তু' হিসাবে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং তৈলাভাবে ও পথে যাওয়া বন্ধ। য়ুরোপের পথে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন গতি নেই। অতএব, আমাদের প্রত্যেক প্রতিনিধিকে অতিরিক্ত হাজার টাকা ক'রে এক সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে হবে। কারণ এক সপ্তাহ আগে য়ুরোপগামী কোনও 'চাটার্ড প্লেন' পাওয়া যাবে না। এই এক সপ্তাহকাল আমাদের দিল্লী শহরেই অবস্থান করতে হবে।

মন খারাপ হয়ে গেল। কুটুম্ববাড়ী বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টা থাকা চলে। সাতদিন থাকা কল্পনাতীত। দু'জনে পরামর্শ করে স্থির করলুম, বেহাই বেয়ানদের কিছুই বলা হবে না। যথাসময়ে আমরা প্লেন ধরতে যাচ্ছি বলে ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। তারপর, দিল্লীর কোনও হোটেলে গিয়ে ওঠা যাবে। প্ল্যান অনুসারে বেরিয়ে পড়া হল পরদিন সকালে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানীর দিল্লীর এজেণ্ট, আমাদের পরিচিত শ্রীযুক্ত ডি, পি, সেন মহাশয়ের দরিয়াগঞ্জের বাড়ীতে আমাদের মাল-পত্রগুলো জমা রেখে, আমরা হোটেল ঠিক করতে বেরুলুম। আমাদের এক বন্ধু টেলিফোনে দিল্লী কালিবাড়ীর সঙ্গে কথা বলে তাঁদের গেস্ট-হাউসে আমাদের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। শুনলুম যুগান্তর-সম্পাদক স্নেহাস্পদ বন্ধুবর শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সেখানে রয়েছেন। তিনিও বিশ্ব-শান্তি মহাসম্মেলনে যোগ দিতে আমাদের সঙ্গেই এক ট্রেনে দিল্লী এসেছেন। ৺শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যত্নে ও চেষ্টায় দিল্লী কালিবাড়ী প্রবাসী বাঙালীদের এখন আকর্ষণের স্থান হয়ে উঠেছে।

দেখতে দেখতে পাঁচ সাতদিন দিল্লীতেই কেটে গেল। দিল্লীর আবহাওয়া তখন অগ্নিবর্ষী। একশ' দশ বারো টেম্পারেচার চলেছে।

দোর জানালা বন্ধ করে পাখার নিচেও ঝলসে যাচ্ছি। এর মধ্যেও দিল্লী কালিবাড়ীর প্রশস্ত হ'লে সাহিত্য প্রেমিক দেবেশ দাস মহাশয়ের উদ্যোগে এক সাহিত্য সভা হ'ল। এতে কার কি লাভ হ'য়েছিল জানি না, কিন্তু আমাদের পরম উপকার হয়েছিল। এই সভায় এসেছিলেন দিল্লীর রাজকর্মচারী শ্রীশচীন্দ্রকুমার বসুর পত্নী কল্যাণীয়া শ্রীমতী নির্মলা বসু। ইনি আমার পত্নীর সঙ্গে কুটুম্বিতার সূত্রে কন্যাস্থানীয়া। যে কদিন আমরা দিল্লীতে ছিলুম এঁর অপরিসীম আদর যত্ন, সেবা ও পরিচর্যা আমাদের প্রবাস বাসের সকল অসুবিধা নিঃশেষে দূর করে দিয়েছিল। বন্ধুবর শিল্পী শ্রীমুকুল দে ও তাঁর পত্নী বীণা দে তখন দিল্লীতে। তাঁরা একদিন সকালে প্রাতরাশে আমাদের পরিতৃপ্ত করলেন। সাহিত্যিক-সতীর্থ শ্রীদেবেশ দাস কনৌট প্লেসের একটি প্রসিদ্ধ হোটেলে আমাদের নৈশভোজ দিলেন। সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর একদিন চায়ে নিমন্ত্রণ করলেন। শান্তি-সম্মেলনে যাত্রাক্ষণে শ্রীযুক্তা শান্তি কবীরের আতিথেয়তা শান্তিজল-সিঞ্চন করেছিল মনে। দরিয়াগঞ্জের

হেলসিংকী রেল ষ্টেশান

শ্রীডি, পি, সেনও একদিন আমাদের মুখমিষ্টি না-করিয়ে ছাড়লেন না। আর কল্যাণীয়া নির্মলার যত্নের কথা বলে শেষ করা যাবে না। নিজে হাতে রকমারী রান্না ক'রে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজ দিয়েও তিনি তৃপ্ত নন। প্লেনে যাবার দিনও অনেকটা পথ তাঁর হাতের তৈরি খাবার, আর তাঁর সেজে-নিয়ে-আসা পান আস্বাদন করতে করতে গেছি।

খবর এলো 'চার্টাড প্লেন' পাওয়া গেছে। ১৪ই জুন রাত্রে পালাম বিমান ঘাঁটি থেকে উড়বে। আমরা যেন প্রস্তুত হয়ে রাত্রি আটটার মধ্যেই কনৌট প্লেসের Air India International কোম্পানীর অফিসে হাজির হই।

এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশানালের সুবৃহৎ বিমান "Sky-Master" ভারতের নানা প্রদেশের ৬১জন প্রতিনিধি নিয়ে ১৪ই জুন রাত্রি ১১টায় দিল্লী ছেড়ে উড়লেন। পালাম বিমানঘাঁটিতে অত রাত্রেও শ্রীযুক্ত অশোক সেন, মুকুল দে, বীণা দে প্রভৃতি বন্ধুরা বিদায় দিতে এসেছিলেন। আমাদের গতিপথ ছিল এই রকম, দিল্লী থেকে কারাচি। কারাচি থেকে ইরাক। ইরাক থেকে সাইপ্রাস্। সাইপ্রাস্ থেকে রোম। রোম থেকে আমস্টার্ডাম। আমস্টার্ডাম থেকে হেলসিংকী। কিন্তু আমাদের বিমান চালক শ্রীযুক্ত রণধাওয়া সিং কারাচিতে নামলেন না। তিনি বললেন, কারাচিতে নামলে আপনাদের দু'তিন ঘণ্টা সেখানে বিলম্ব হয়ে যাবে। কারণ, কারাচিতে নানা রকম ফর্ম্ সই করানো, পাসপোর্ট পরীক্ষা ও হেল্থ সার্টিফিকেট দেখা প্রভৃতি ব্যাপারের অজুহাতে বহুক্ষণ আটকে রাখে। সুতরাং, আমি যদি একেবারে ইরাকের 'বাহেরিন' বিমান-বন্দরে গিয়ে নামি আপনাদের আপত্তি আছে কি? আমরা সকলে এ বিষয়ে একমত্ হওয়ায় একেবারে পরের দিন সকালে বাহেরীনে অবতরণ করা হল।

এখানে প্রাতরাশ সেরে আমরা রওনা হলুম সাইপ্রাসের দিকে। সেখানে 'নিকোশিয়া' বিমান-বন্দরে নেমে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজ সমাপ্ত করলুম। তারপর একেবারে রোমে গিয়ে নৈশ-ভোজ সমাধা হল। রোম থেকে আমস্টার্ডামে গেলুম পরদিন সকালে। সেখানে প্রাতরাশ সেরে চললুম হেলসিংকী। সন্ধ্যার কিছু আগেই আমরা হেলসিংকীতে

শিউরা-সারী দ্বীপের প্রাচীন পল্লী প্রদর্শনী

উপস্থিত হলুম। মধ্যাহ্ন ভোজটা বিমানের মধ্যেই সংক্ষেপে সেরে নেওয়া হ'ল।

আমাদের বিমান-চালকেরা এবং আরোহীবৃন্দ সকলেই ভারতীয় বলে আমরা প্লেনে বেশ আড্ডা জমিয়ে নিয়েছিলুম। অভারতীয় কেউ নেই। সুতরাং, আমাদের কুণ্ঠা বা সংকোচের কোনো কারণ ছিল না। যাকে বলে একেবারে স্বচ্ছন্দ-বিহার! সারা বিমানখানি হয়ে উঠেছিল যেন একটি সর্বভারতীয় উড়ন্ত বৈঠকখানা! কেউ গান গাইছেন, কেউ আবৃত্তি করছেন, কেউ বক্তৃতা দিচ্ছেন। পরিহাস রেস নির্ঘোষেরও ছড়াছড়ি। দু'টো দিন যে আকাশ পথে-মেঘের রাজ্য ভেদ ক'রে কেমন করে কেটে গেল টেরই পাওয়া গেল না!

মাঝে মাঝে প্লেন-চালকেরা আলোক সংকেতে 'কোমরে বেল্ট বাঁধুন' ছাড়া ও ঘোষণাপত্র দ্বারা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন

আমরা কতদূর এলুম, কত উঁচু দিয়ে বিমানখানি উড়ছে। এইবার আরবের মরুভূমি পার হচ্ছি। ভূমধ্য সাগর উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। সাইপ্রাস্ দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। রোমের আলোকমালা পরিদৃশ্যমান! অদূরে আমস্টার্ডাম্ শহরের ছবি ফুটে উঠছে। কিন্তু, হেলসিংকী পৌছবার একটু আগেই আকাশ ছেয়ে ঘনঘটা নেমে এল। জলভরা কালো মেঘের আড়ালে আর কিছুই চোখে পড়ে না। বৃষ্টি নামলো। বিমান টলমল করছে। আমাদের মুখ শুকিয়ে উঠেছে!

ফিনল্যাণ্ডের চারিদিক নিবিড় কুয়াশায় আচ্ছন্ন। বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু বিমান-বন্দর সম্পূর্ণ অদৃশ্য। আমরা ভাবছি তরী বুঝি কূলে এসে ডুবলো! প্লেনখানি ঘন ঘন Air-Pocketএর মধ্যে পড়ে বিপুল ঝাঁকুনী খাচ্ছে। অনেক যাত্রীরই Air-Sickness শুরু হয়ে গেছে। হেলসিংকীতে নামা আর কিছুতে সম্ভব হচ্ছে না! বিমান ঘাঁটির উপর এসেও প্লেন ক্রমাগত আমাদের নিয়ে ঘুরতে লাগলো। নামবে কোথা? 'Run-away' দেখা যাচ্ছে না, ঘন কুজ্ঝটিকায় সকল দিক ঢাকা পড়ে গেছে। সমূহ বিপদের সম্ভাবনা!

মৃত্যুভয় ভীত যাত্রীর দল বোধ করি সবাই একাগ্রমনে ভগবানকে স্মরণ করে ইষ্টমন্ত্র জপ করছিল। করুণাময় কৃপা করে মুখ তুলে চাইলেন। দেখতে দেখতে সমস্ত কুয়াশার আবরণ যেন হুহু ক'রে অপসৃত হয়ে গেল। মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নের মৃদু আলোকে চারিদিক বেশ সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হ'ল। আমাদের প্লেন তখন ফিনল্যাণ্ডের এক বিস্তীর্ণ জলাশয়ের ধারে গহন গম্ভীর পাইন বনের মাথার উপর বিচরণ করছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের সুদক্ষ ভারতীয় পাইলট্ রাণধাওয়া প্রকাণ্ড প্লেনখানি নিরাপদে হেলসিংকীর বিমান-বন্দরে নামিয়ে দিলেন। একষট্টিজনের কণ্ঠে উঠলো আনন্দ উল্লাস! সবাই যেন যমের মুখ থেকে ফিরে এসে পুনর্জীবন পেলেন!

হেলসিংকী বিমান-বন্দরে অপেক্ষমান স্থানীয় শান্তি সমিতির সদস্যবৃন্দ ও অভ্যর্থনা সমিতির কর্তৃপক্ষ আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। প্রত্যেকের হাতে পুষ্পস্তবক উপহার দিয়ে তাঁরা আমাদের অভিনন্দিত করলেন। স্বাস্থ্য, শুল্ক ও পুলিশের চিরাচরিত পর্য্যবেক্ষণ শেষ হবার পর দু'খানি বড় বড় আরামদায়ক 'ওম্নিবাসে' তুলে আমাদের হেলসিংকীর

স্টকম্যানের প্রাসাদোপম বিপণি
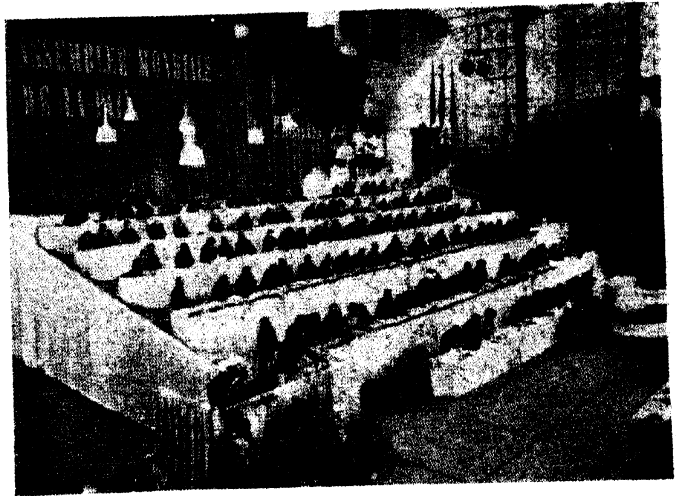
মেসুহালির বিরাট হল—সভাপতি মণ্ডলীর আসনের বামদিকে বক্তার নির্দ্দিষ্ট মঞ্চ

অলিম্পিক্ স্টেডিয়ামে স্থাপিত বিশ্ব-শান্তি মহা সম্মেলনের অফিসে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

সেখানে প্রচুর জলযোগান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর আমাদের নিয়ে এলেন তাঁরা হেলসিংকী শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে 'ওতানিয়েমী' নামে একটি নিভৃত সুন্দর পল্লীতে। সবুজ পাইন বনে ঘেরা এক নির্মল

মেসুহালির বিরাট হল—প্রতিনিধি ও দর্শকদের আসন
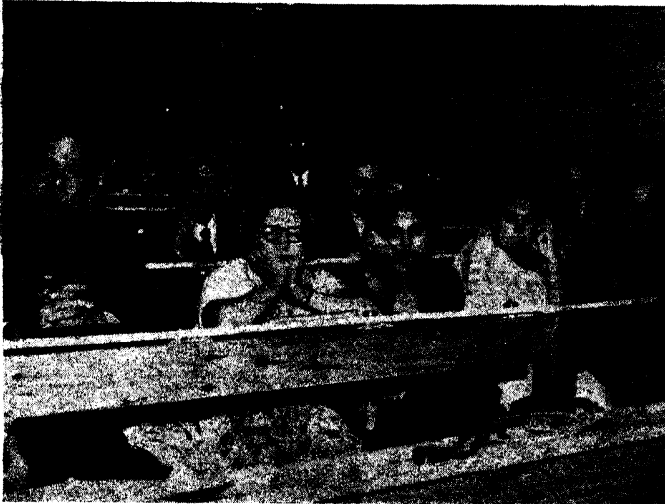
শ্রবণযন্ত্র-কানে শান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা শ্রবণে রত

জলাশয়ের তীরে ছিল ফিণল্যাণ্ডের বিখ্যাত টেকনিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাস। সেথানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ছাত্রাবাসগুলি সবই চারতলা পাকাবাড়ী। শোনা গেল ছাত্রেরাই প্ল্যান করে নাকি নিজেদের হাতে এই ছাত্রাবাস তৈরি করেছেন। বিস্ময়কর সন্দেহ নেই!

১৬ই জুন সন্ধ্যায় আমরা হেলসিংকী পৌঁছে গেলুম বটে, কিন্তু বিশ্বশান্তি মহাসম্মেলন শুরু হবার কথা ২২শে জুন থেকে। সপ্তাহব্যাপী এই সম্মেলন ২৯শে জুন পর্যন্ত চলবে। হিসাব করে দেখা গেল পুরো পাঁচটি দিন আমাদের এখানে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কাটাতে হবে। কথা ছিল এখানে থাকা খাওয়ার খরচ মাথা পিছু দৈনিক ছ' ডলার অর্থাৎ, তিরিশ টাকা করে দিতে হবে। প্রতিনিধিরা আপত্তি জানালেন। আমাদের এত আগে আনা হল কেন? আমরা খরচ দেবো মাত্র সম্মেলনের সাতদিনের। বাকী খরচের জন্য আমরা দায়ী নই। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পরে রফা হল যে মাথা পিছু প্রত্যেকে কুড়ি পাউণ্ড দিলেই, অর্থাৎ ২৬৭॥০ আনা পেলেই তাঁরা এখনকার খরচ চালিয়ে নিতে পারবেন। এ প্রস্তাবে সকলেই রাজী হলেন।

কিন্তু, এই পাঁচদিন ধরে এই গ্রামে ব'সে কি করা যায়? ছোট্ট ওতানিয়েমী পল্লী। যেন পটে আঁকা ছবি। একদিনেই আমরা তার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এলুম। তারপর স্থির করা গেল এই পাঁচদিন ধরে ফিনল্যাণ্ড চষে বেড়ানো যাক। কিন্তু, দু'দিন ধরে ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়ায় কেউই বেরুতে পারিনি। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় ও শীতে জমে উঠছিলুম যেন! Heater ছাড়া ঘরেও টেকা যায় না?

পৃথিবীর উত্তর মেরু চূড়ায় অবস্থিত এই দেশটি প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্যে একান্ত মনোরম। অসংখ্য কাকচক্ষু হ্রদে ঘেরা দীপ্ত সবুজ উপত্যকা ও ঘন পাইন বনে সমাচ্ছন্ন ফিনল্যাণ্ড। মাঝে মাঝে সবুজ মাটি ভেদ করে পৃথিবীর আদিকালের রুক্ষশিলা শৈলপৃষ্ঠ যেন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা ক'রে থেমে গেছে! রূপকথার স্বপ্নরাজ্যের মতো সুন্দর এ দেশ। দেশবাসীরাও সুন্দর। শিশুগুলি যেন দেব-শিশু! সুন্দর সুদৃশ্য বাড়ী ঘর। চমৎকার পথ ঘাট। অসংখ্য রম্যোদ্যানে ভরা হেলসিংকী

নগর। দারিদ্র্যের মালিন্য নেই কোথাও। চারিদিকই সৌন্দর্যে উজ্জ্বল। আনন্দে ঝলমল করা দেশ। বিশ্ববিখ্যাত ফিনিশ কবি ও সুরকার সাইবেল্যুসর গীতি কবিতা ও 'কালেভালা' লোক-সঙ্গীতের সুযোগ্য জন্মভূমি?

হেলসিংকী প্রকৃতপক্ষে একটি বন্দর-নগর। এখানে সমুদ্রকূলে চার চারটি বন্দর আছে। বিশ্বের বহু বিবাদের মূল বাল্টিকসাগর তীরে—কয়েকটি সুজলা সুফলা অরণ্য-শ্যামলা দ্বীপ ও উপদ্বীপের সংযোগে এই মনোরম ফিনল্যাণ্ড প্রদেশ গড়ে উঠেছে। ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে প্রবাহিত ভান্তা ও তালীন দুটি নদী যেন দুই বাহুর আলিঙ্গনে একে উর্বরা ক'রে তুলেছে। রাজধানী হেলসিংকী শহরটি 'ভাইরোনিয়েমী' অন্তরীপে অবস্থিত।

এখানকার বাড়ী ঘর বেশ সুদৃশ্য হলেও, অধিকাংশই—এখনও "দারুগৃহ" বা কাঠের তৈরি বাড়ী! শুনলুম আগে সব ঘরই ছিল নাকি ছোট ছোট কাঠের কুটীর। প্রায় দেড়শো বছর আগে একবার এখানে প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড হয়ে খাণ্ডব দহনের মতো সমস্ত ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তারপর থেকে এখানে পাকাবাড়ী বা দালানকোঠা উঠতে শুরু হয়েছে। চারতলা, ছ'তলা, আটতলা বাড়ীরও অভাব নেই এখন।

হেলসিংকী বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স প্রায় ১২৫ বছর হ'ল। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই কম বেশি শিক্ষিত লোক। মোট অধিবাসীর সংখ্যা দেড়শো বছর আগে ছিল মাত্র চার হাজার। এখন তাদের সংখ্যা এসে চার লক্ষয় পৌঁছেচে। সারা ফিনল্যাণ্ডের লোক সংখ্যা চার কোটির বেশি নয়। বিশ্ববিদ্যালয় যখন গড়েছিল এরা, সেই সঙ্গে ক্রমে ক্রমে রঙ্গালয়, সঙ্গীত ভবন, চিত্রশালা, রাষ্ট্র পরিষদ, প্রভৃতি সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানও একে একে তৈরি হয়েছিল। ফলে, ফিনিশ সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ও নাগরিক সভ্যতার মূল উৎস হয়ে উঠেছে এখন হেলসিংকী! এখানে পার্লিয়ামেণ্ট হাউস একটি মনোরম ভবন। এ্যাটিনিয়ম আর্ট গ্যালারীও একটি দ্রষ্টব্য স্থান। স্থাপত্যকলা বৈশিষ্ট্যে চিত্তাকর্ষক, হেলসিংকী রেল ষ্টেশানের কাছেই একটি সুদৃশ্য ভবনে এই চিত্রশালা স্থাপিত হয়েছে। ফিনল্যাণ্ডের অতি আধুনিক শিল্পকলার সঙ্গে কিছু বিদেশী শিল্পীদের প্রসিদ্ধ ছবি এবং প্রাচীন চিত্রেরও এখানে সমাবেশ করা হয়েছে দেখলুম।

ম্যানারহাইম ষ্ট্রীটের উপর এদের সুদৃশ্য জাতীয় যাদুঘর বা ন্যাশানাল মিউজিয়মটি দেখে আসবার মতো। এখানে এলে ফিনল্যাণ্ডের প্রাগৈতিহাসিক, অনৈতিহাসিক ও সাম্প্রতিক সম্পদের সঙ্গে এদের জাতি তত্ত্বের ক্রমবিকাশটাও চথে পড়ে।

'শিউরাসারী' দ্বীপে এদের একটি মুক্ত-প্রাঙ্গণ 'মিউজিয়ম' আছে। সুইডিশ থিয়েটারের সামনে থেকে ২১ নং বাস ধরে যাওয়া যায়। গিয়ে দেখলুম সে এক আজবখানা! প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মনোরম পরিবেশের মধ্যে ফিনল্যাণ্ডের গ্রাম্যজীবন যাত্রার ছবিটি এঁরা ধরে রেখেছেন এখানে। আমরা এখানে গ্রামে এসেই উঠেছি এবং আশে পাশের গ্রামেই ঘুরে ঘুরে বেড়াই। আমাদের কাছে এর কোনো নূতনত্ব নেই। তবে, য়ুরোপের সকল দেশে গ্রামও ক্রমে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে আধাশহর হয়ে উঠছে, এ কিন্তু একেবারে আদি ও অকৃত্রিম পল্লী চিত্র!

হলের মধ্যে অশীতিপর রুশ প্রতিনিধির করমর্দন

আরও অনেক কিছু দেখবার আছে, যেমন—কৃষির যন্ত্রপাতি, রেল-পথের ইতিকথা, দেশী ও বিদেশী শিল্প সামগ্রীর সঙ্গে প্রাচ্য শিল্পকলার সমাবেশ ইত্যাদি প্রদর্শনীগুলি। এক ষ্টকম্যানেরই প্রাসাদতুল্য বিশাল বিপনিতে সারাদিনটি কাটিয়ে আসা যায়। এখানে পাওয়া যায় না হেন জিনিস নেই! যেন সব পেয়েছির দেশে এসে ঢুকেছি মনে হবে!

হেলসিংকীর চিড়িয়াখানাও 'পোলার বেয়ারের' আকর্ষণ যুক্ত। কিন্তু এগুলো আমরা দেখতে যাইনি। একটা কথা মনে পড়লো—বলে নিই, এখানে কয়লা নেই। কাঠ জ্বেলে রেলের ইঞ্জিন চলে। চলে বেশ, তবে একটু ঢিমে তালে। কয়লার গনগনে আগুনের সে শনশন্ গতিবেগ পায় না এরা।

মেরুসুন্দরী ফিনল্যাণ্ডের প্রকৃতি বড় রহস্যময়ী। শীতের দিন তিনি থাকেন দীর্ঘকাল অসূর্যম্পশ্যা! তাঁর তুষারশুভ্র তনুর সর্বাঙ্গ আঁধারঅবগুণ্ঠনে আবৃত করে রাখেন। দিনের আলোর এতটুকু ছোঁয়া গায়ে লাগতে দেন না। তখন এঁর মুখ দেখতে হলে চাই—সেই দুর্লভ 'সুমেরু-জ্যোতি'র দীপ-রশ্মি, যাকে বৈজ্ঞানিকেরা নাম দিয়েছেন—"আরোরা বোরিয়ালিস্—" আবার মধু-মাধবীর আনন্দোচ্ছল আবির্ভাবে এঁর লাজবাস খসে পড়ে। রবিকরোজ্জ্বল নিদাঘ দিনে ইনি থাকেন অষ্টপ্রহর আদিত্যবরণা হয়ে। বসন্তারম্ভ থেকে হেমন্তাগম পর্যন্ত সূর্য আর অস্তাচলে ফিরে যেতে চান না। রাত্রি দু'টোয় উঠেও দেখা যায়—রোদে ঝলমল করছে চারিদিক! গোধূলির সোনালী আলো এখানে দ্বিপ্রহর রজনীকেও তিমিরহরা করে রাখে। সারা ফিনল্যাণ্ড যেন বিশ্বের সেই মহা সৃজন-শিল্পীর হাতে আঁকা—রূপে রসে বর্ণে বৈভবে ভরা-একখানি অপরূপ নিসর্গ চিত্র হয়ে উঠে!

হলের প্রবেশ পথে ইরাণের প্রধান মুফ্‌তির পাশে

কিন্তু হলে কি হবে! মানুষের জীবন যেমন ক্ষণস্থায়ী, এই ফিনল্যাণ্ডের ঋতু-প্রকৃতিও তেমনি ক্ষণস্থায়ী! সুখের দিনটুকু যেন তার পাশ ফিরতেই কেটে যায়! তিনটি মাস মাত্র। বোধ করি এর রূপ মাধুরী ক্ষণিকের বলেই এত মধুময়!

এখানকার গ্রীষ্ম মানে আমাদের দেশের পৌষ মাঘ মাসের ঠাণ্ডা। আমরা এসময় কম্বলমুড়ি দিই, কিন্তু এঁরা এসময় ঘেমে ওঠেন! অবশ্য শীতের সময় বরফাচ্ছন্ন আঁধার দিবানিশির যে কঠোর ঠাণ্ডা তা' মৃত্যুর মতই হিম-শীতল। কিন্তু, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে শীতের প্রকোপ লোপ পেয়েছে। এখন সর্বত্র গ্যাস ও ইলেক্‌ট্রিক হিটার প্রচলিত হওয়ায় ঠাণ্ডা একেবারে জব্দ হয়ে গেছে। শীতও এখানে স্বল্পায়ু। কিন্তু, বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি! বারোমাসই যখন তখন আকাশ মেঘে ছেয়ে আসে। নামে ঝির্ ঝিরে বৃষ্টি। যেন বিরাম নেই তার। টেম্পারেচার হু হু করে নেমে চলে জিরো পয়েন্টের দিকে! বেরুতে পারা যায় না বাড়ী থেকে। বিরক্তি বোধ হয়!

বিশ্বশান্তি মহাসম্মেলনে যোগ দেবার জন্য হেলসিংকীতে দেশ

হেলসিংকীর পোষ্ট অফিস

দেশান্তরের প্রতিনিধিরা প্রতিদিনই দলে দলে এসে পড়ছিলেন। তাঁরা নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁদের মধ্যে রাষ্ট্র নেতারা আছেন। রাজ্যসভার সদস্যেরা আছেন। শিল্প বাণিজ্যের বড় বড় ব্যবসায়ী আছেন। ট্রেড ইউনিয়নের কর্তারা আছেন। বিজ্ঞানাচার্যেরা আছেন। ধর্মগুরুরা আছেন। সাহিত্যরথীরা আছেন। আইন আদালতের ব্যবহার-জীবীরা আছেন। বড় বড় চিকিৎসকরা আছেন। শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপকেরা আছেন। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা আছেন। সমাজসেবী ও অন্যান্য জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা আছেন। আর আছেন, চিত্র শিল্পী, মঞ্চ শিল্পী, নৃত্যশিল্পী, নাট্যকার এবং ছায়াচিত্রের কর্ণধারেরাও। এঁদের সংখ্যা মোটামুটি প্রায় ১৯০০ বা দুহাজার হবে।

হেলসিংকীর বন্দর

একা ভারতবর্ষ থেকেই তো এসেছেন দেখলুম আমাদের বিমান-সঙ্গী ৬১ জনলোককে ধরে মোট চুয়ানব্বই জন। অন্যান্যরা অন্য পথে ও অন্য বিমানে এসেছিলেন।

এঁদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয়ের দুর্লভ সৌভাগ্য হয়ে

গেল। প্রতিনিধি দলের মধ্যে আছেন দেখলুম এক এক দেশের একাধিক বিশ্ববিশ্রুত দিকপালেরা !

বিশ্ব-শান্তি মহাসম্মেলনের অধিবেশনে তাঁদেরই বেছে নিয়ে সভাপতি-মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল। সভাপতি মণ্ডলীতে যে দেড়শ জন মনীষী নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ভারতবর্ষের আটজন বিখ্যাত ব্যক্তিও স্থান পেয়েছেন দেখে আমাদের যথেষ্ট আনন্দ ও গর্ববোধ হয়েছিল। তাঁরা হলেন বোম্বাইয়ের বিখ্যাত লেখক শ্রীমুলক্‌রাজ আনন্দ, নাগপুরের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রী সি, পি, ভারুকা, পুণার অঙ্ক-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রী দামোদর কৌশাম্বী, দিল্লী খ্যাতনামা চিকিৎসক মেজর জেনারেল সাহেব সিং সোখে, ত্রিবাঙ্কুরের রাষ্ট্র-পরিষদের স্পীকার শ্রীগঙ্গাধরণ নায়ার, বাংলার বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা, সর্বভারতীয় শান্তিসম্মেলনের সহ-সভাপতি ও যুগান্তর পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং ভারতবর্ষের সাম্যবাদী দলের জনপ্রিয় নেতা শ্রী এস, জে, ডাঙ্গে।

ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা-রূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন অধ্যাপক কৌশাম্বী। বিশ্বশান্তি মহা-সম্মেলনের অধিবেশন বসেছিল হেলসিংকীর 'মেসুহালি' নামে খ্যাত এক বিরাট হলের মধ্যে। হলটি উৎসবোপযোগী পত্রপুষ্প পতাকায় সজ্জিত করা হয়েছিল। বিভিন্ন ভাষায় শান্তির প্রাচীর পত্র শোভা পাচ্ছিল। তার মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রভাষাতেও একটি প্রাচীরপত্র দেখেছি। বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকাও ছিল। আমাদেরও অশোকচক্র লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা সেখানে স্থান পেয়েছিল। সভাপতি মণ্ডলীর জন্ত নির্দ্দিষ্ট মঞ্চাসনের দক্ষিণে একটি শান্তির 'পাইন-তরু' রোপিত ছিল। পশ্চাতে বিরাট এক শান্তি-কপোতের চিত্র। প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিদের জন্ত নির্দ্দিষ্ট আসনের সম্মুখে ডেস্কের উপর সম্মেলনের কার্যবিবরণী অনুসরণে সাহায্য হবে বলে এক একখানি বড় ও সুন্দর বাঁধানো এবং পেন্‌সিল সংলগ্ন প্রয়োজনীয় নোট বই ও ফাইল, মাইক্রোফোন সংযুক্ত শ্রবণ-যন্ত্রও (Ear-Phone) প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছিল। এই শ্রবণযন্ত্রে ছ'টি বিভিন্ন ভাষা বোঝবার ব্যবস্থা ছিল। ইংরাজী, ফরাসী, জার্মাণ, ইতালিয়ান, রাশিয়ান ও চাইনীজ।

শেষদিনে হেস্পেরিয়া পার্কে বিপুল বিদায় সংবর্দ্ধনা

বিদায়ের পূর্বে 'স্মারক-চিহ্ন' বা সুভেনির সংগ্রহে ব্যস্ত

হলের বাম দিকে সর্বপ্রথম সারিতেই চাইনীজ প্রতিনিধিদের জন্য আসন নির্দিষ্ট হয়েছিল। তারপরই ভারতীয়দের আসন। প্রতিনিধি ও দর্শকের সমাগমে সমস্ত হলটি ভ'রে গিয়েছিল। এখানে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার। তাই, মেয়েদের জন্য কোনও পৃথক আসনের ব্যবস্থা ছিল না। মহিলা প্রতিনিধি ও দর্শকও অগণিত এসেছিলেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন বোম্বাইয়ের শ্রীমতী মঙ্গলা ভাগবত, শ্রীমতী কপিলা বেন মেহতা ও শ্রীমতী ইসমৎ চুঘতাই। বাংলার শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ও রত্না সেন। দিল্লীর শ্রীমতী লিটা ঘোষ ও পেরীন চন্দ্র। কানপুরের শ্রীমতী বিমলা কাপুর। সৌরাষ্ট্রের কুমারী উষা বেন পাঠক ও ডাক্তার সুশীলা ভিগ্‌নে। লক্ষ্ণৌয়ের শ্রীমতী প্রকাশবতী পাল ও বরোদার শ্রীমতী জাভেরী।
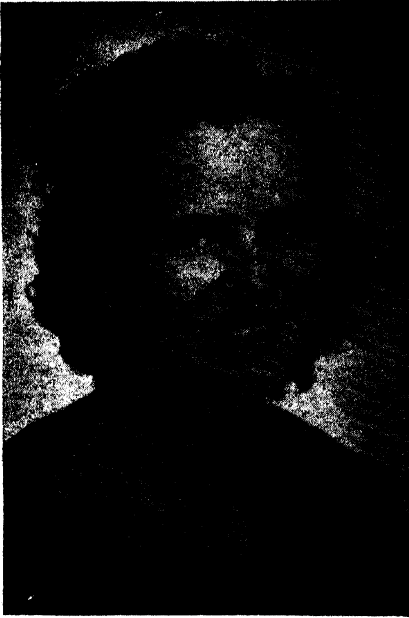
ফিনল্যাণ্ডের মহিলা কবি শ্রীমতী সিরকা সেলজা

এই সম্মেলন উপলক্ষে ফিন্‌ল্যাণ্ডের তরুণী কবি শ্রীমতী সিরকা সেলজা, শ্রীমতী এলভী সাইনার্ভো এবং নবীনা শিল্পী শ্রীমতী ঈভা লেডারষ্ট্রম এই তিনজনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হবার সুযোগ হয়েছিল। শ্রীমতী সিরকা সেলজা তাঁর দুখানি কাব্যগ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়েছেন তাঁর প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিশ্বশান্তি মহাসম্মেলনের অধিবেশন চলতো। মাঝে অবশ্য দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য ঘণ্টা দুই সময় দেওয়া হত। সপ্তাহ কাল ধ'রে সম্মেলন চললো। তথাপি বহু লোক, যাঁরা সম্মেলনে কিছু বলতে চেয়েছিলেন, তাঁরা বলার সুযোগ পাচ্ছেন না দেখে অতিরিক্ত দুটি নৈশ অধিবেশনেরও আয়োজন হয়েছিল সপ্তাহের শেষের দিকে।

এই বিরাট মূল সম্মেলনটি ছাড়াও ছোট ছোট সাতটি উপসমিতিরও সম্মেলন ব'সেছিল হেলসিংকীর বিভিন্ন স্থানে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে উপসমিতি গঠিত হয়েছিল :—

১। আণবিক বোমা ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র সংবরণ।

২। সামরিক সাহায্য চুক্তি ও জাতীয় নিরাপত্তা।

৩। শান্তি ও স্বাধীনভাবে স্বরাষ্ট্র শাসন-অধিকার।

৪। আর্থিক ও সামাজিক সমস্যাবলী।

৫। পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়।

৬। শিক্ষা ও যুবসমাজের সমস্যা।

৭। শান্তির জন্য শক্তিশালী সক্রিয় সহযোগিতা।

ভারতীয় প্রতিনিধিরা এগুলির মধ্যেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এবং বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ বিচার বিতর্কের পর মূল সভায় পেশ করবার জন্য প্রস্তাবাবলী রচনায় সাহায্য করেছিলেন।

সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার সময় প্রায় প্রত্যেকটি দেশের কোন না-কোনও বিশিষ্ট সদস্য একের পরে এক উঠে ভারতবাসীর ঐকান্তিক শান্তি প্রচেষ্টার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর যুদ্ধ-বিরোধী অহিংস দুঃসাহসিকতার বিপুল জয়ধ্বনি তোলেন। এ ব্যাপারে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সম্মান ও মর্যাদা সবার উপরে এসে পৌচেছিল। আমাদের বুক যেন গর্বে ও গৌরবে দশ হাত!

নেহরু-চৌ-এন-লাইয়ের বিঘোষিত 'পঞ্চশীলের' জয় জয়কারে শান্তি সম্মেলন ঘন ঘন মুখরিত হয়ে উঠছিল। যুদ্ধ নিবারণের ও বিশ্বের শান্তি সংরক্ষণের পক্ষে 'পঞ্চশীল' পালনই যে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা এ বিষয়ে আর কারুর দ্বিমত শোনা যায়নি। বিরাট বিশ্ব শান্তি মহাসম্মেলনে পৃথিবীর ৬৮টি দেশের বহু প্রতিনিধি এসেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় পাকিস্থানের কোনো প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নি।

সম্মেলন-সপ্তাহের মধ্যেই একদিন ভারতীয় প্রতিনিধিদের চীনের প্রতিনিধিরা মধ্যাহ্নভোজে সংবর্ধিত করলেন। জার্মাণ প্রতিনিধিরা একদিন নৈশ-ভোজে আমাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন। ভিয়েটনামী প্রতিনিধিরা একদিন আমাদের যামিনী-জলযোগে (Supper) আপ্যায়িত করলেন। ফিনল্যাণ্ডের লেখক সম্প্রদায় একদিন আমাদের নিয়ে একটি 'ককটেল' পার্টি করলেন। ফিনল্যাণ্ডের শান্তি-সমিতি আমাদের একাধিক দিন থিয়েটার, সিনেমা ও নৃত্যগীতের আসরে নিয়ে গিয়ে মনোরঞ্জন করেছিলেন এবং সম্মেলন শেষে বিদায়-নিশায় হেলসিংকীর হেস্পরিয়া পার্কে এক বিরাট বিদায়-সম্মেলনের আয়োজন করেন। এখানেও নৃত্যগীতের বিপুল আয়োজন হয়েছিল। সম্মেলনান্তে সোভিয়েট রাশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া পরিদর্শনের আমন্ত্রণ পেয়ে মহানন্দে আমরা য়ুরোপের এই সব আদর্শে গঠিত দেশগুলি দেখতে গেলুম।

(পূর্বানুবৃত্তি)

পরের দিন সেন দিদি চলে গেলেন।

সৌরভী বললে, একটি মানুষের মত মানুষ চলে গেল।

পুরুতগিন্নী বললে, মেয়ে দুটোর কাণ্ড দেখলি তো সবাই ?—আবার বলে—মামার বাড়ী গেছে! একযুগ থেকে দেখছি—তিনকূলে কেউ কোনদিন খোঁজ নিলে না—এখন মামা গজাল কোথা থেকে! ভোরবেলা সদর খোলা—সেইদিন থেকে মেয়ে উধাও—। আমরা তো ধান খাইনা—ধানের বীচি খাই! দোষেগুণে মানুষ তো ভাল—কিন্তু মিথ্যে কথার জাহাজ। এত মিথ্যে বলে, ওপরে ওই এক জনার কাছে—জবাব দেবে কি করে বলতে পারিস ?—শূন্যে-নিবদ্ধ বিস্ফারিত চক্ষু নামিয়ে সকলের কৌতুকদীপ্ত মুখের দিকে বুলিয়ে নিতে লাগলেন। যেন জাহাজের শক্তিশালী—সন্ধানী আলো—জল থেকে নদীতীর—এবং নদীতীর থেকে জল পর্য্যন্ত ক্রমাগত—ঝাঁট দিয়ে দিয়ে চলেছে—কোথাও এক টুকরো ময়লা আবর্জ্জনা পড়ে আছে কিনা।

মাত্র দু'টি দিন খালি রইল ঘর—তৃতীয় দিন বিকেল বেলায় একখানা ঠেলা গাড়ীতে জিনিসপত্র চাপিয়ে নতুন ভাড়াটিয়া এল। সৌখান ভাড়াটে—। খান চারেক চেয়ার—একটা টেবিল—ছিটের রঙীন পরদা কয়েকটা··· একটা হারমোনিয়াম, ছোট একটা আলমারি—খোলা র‍্যাক দুটো—একরাশ ছবিওলা পত্রিকা—আরও টুকিটাকি বহু জিনিস—যা বাড়ীতে এই প্রথম এল। হোল্ড-অলে মোড়া দুটো বিছানার বাণ্ডিল দেখে অন্য ভাড়াটেরা বলাবলি করলে—নিশ্চয় পয়সা আছে।

পুরুতগিন্নী নিজের ঘরে যাবার মুখে একবার ডিঙ্গি মেরে এদিকে এলেন। জানালা দিয়ে দেখলেন—ঘরের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে দু'খানা চেয়ার টেনে বসে গল্প আর হাসাহাসি করছে। মেঝেয় পড়ে আছে একরাশ জিনিস—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। দু'জনের বেশবাসে আধুনিকত্ব মাখা। পুরুষটির বয়স বছর ত্রিশেক হবে—যতই পিছন-ঠেলা চুলকে কালো চক্‌চকে করে রাখুক—গোঁপকে নতুন ওঠা গোঁপের মত সরু দেখাক, আর জুলপিকে গালের আদ্ধেক নামিয়ে আনুক। গায়ে রঙীন চুড়িদার পাঞ্জাবী—অবশ্য ভালই মানিয়েছে। শ্যামবর্ণের ওপর মানুষটির শ্রী আছে—কারণ চোখ দুটি ভাসন্ত—আর নাকটি টিকলো, ঠোঁট দু'খানি ঈষৎ পুরু—কপালটা একটু চওড়া। মানুষের শোভা মুখে—একথা সবাই বলবে। আর মেয়েটি ?—বেশবাস যেন বেশী উগ্র। মুখখানায় রং লেপা, কি সত্যিই অমন গৌর কে জানে ?···জানালা দিয়ে উঁকি মেরে কী-ই বা বোঝা যায়। দু'কানে দুটো দুল—যেন দুখানা গরুর গাড়ির চাকা দুলছে। চুলটা ফাঁপিয়ে—কান ঢেকে দিয়েছে—একটা ছেয়ে-রঙের বেঁটে আলোয়ান কাঁধে জড়িয়ে বুকের কাছে দুটো ধার টেনে নিয়েছে—মেম মাগীদের ফ্যাসান। তারই ফাঁকে সরু পাড় শাড়ী আগে যা পুরুষ মানুষ পরত—তাই দেখা যাচ্ছে। পায়ে চটি রয়েছে—ঘরের মধ্যে গেছে তবু দোরগোড়ায় চটি জোড়া ছাড়েনি। দেখতেও তো কচি নয়—বয়স পুরুষটিরই সমান; বেশী বই কম নয়। পুরোপুরি ম্লেচ্ছ ভাড়াটে এল দেখছি বাড়ীতে! ডিঙ্গি মেরে মেরে এধারে সরে এসে দেখলেন—কেষ্টর মা একরাশ কাঁথা নিয়ে···নামছে ছাদ থেকে। বললেন, নতুন ভাড়াটে এল সেন-গিন্নীর ঘরে—দেখলি ?—

না দিদি—দিনরাত সংসার নিয়ে নাটাঝামটা খাচ্ছি—কোনোদিকে তাকাবার যো আছে কি আমার। তা যেন

সেন-গিন্নীর মত হাঁসের পাল তো? তাহলেই কল জল নিয়ে—নাকানি চোবানি খেতে হবে।

নালো—সেদিক দিয়ে ভাল। কত্তা আর গিন্নী। আপনি আর কপনি।

তবু রক্ষে—একটু জল খরচ করে বাঁচব।

তাই বেঁচো—কিন্তু কি জাত তার ঠিক কি। যেন কেমন-কেমন বোধ হচ্ছে। খৃষ্টান-খৃষ্টান। নতুন ভাড়াটে এসে পাশের ঘরের লোকের সঙ্গে আলাপ করে—তা নয় কত্তা গিন্নী মুখোমুখি বসে হাসি তামাসা করছে। ঘরে একরাশ জিনিস—যেন কার জিনিস না কার জিনিস। কোথায় শোবে—কি খাবে—কোন চিন্তে ভাবনাই নেই।

দুর্ভাবনটা যেন তাঁরই ষোল আনা—এমনি মুখের ভাব করলেন।

—রহস্যটা কেষ্ট ফাঁস করলে রমার কাছে। জান রমাদি, নতুন ভাড়াটে যে সে লোক নয়—একজন বড় আর্টিষ্ট।

ছবি আঁকেন বুঝি? রমা শুধোল।

না—ছবিতে নামেন। প্রায় প্রত্যেক ছবিতে।—অবশ্য বড় বড় পার্ট নয়—ছোটখাটো পার্ট নিয়ে।

আর বউটি? ও-ও বুঝি পার্ট করে?

না—ওকে ঠিক বুঝতে পারছি নে। মেয়েদের সাজলে সব এক রকম দেখায়।

রমা হেসে বললে, পুরুষরা বুঝি আলাদা আলাদা?

কেষ্টও হাসলে। বললে, লোকটার সঙ্গে ভাব জমাতে হচ্ছে রমাদি। যদি—সত্যিই সিনেমার লোক হয়—তাহলে—উঃ—একখানা বইও আর বাদ যাবে না।

তুই বুঝি বড্ড সিনেমা দেখিস? তাই তোর পয়সার দরকার হয়?

···সিনেমা কে না দেখে! আমরা না হয় খারাপ ছেলে—কিন্তু কত ভাল ভাল ছেলে বই বিক্রী করে সিনেমা দেখে জান?

ভাল ছেলে তারা নিশ্চয় নয়—যারা পড়ার বই বিক্রী করে দেয়।

কি করবে—পয়সার থ্যাঁচ ধরলে সবাই ও রকম করে। তার পর—ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে বললে, আজকে নো সেল। বাজার মিইয়ে পড়ছে। এত লোকে জামা ইজের তৈরী করছে—যে দোকানদাররা পর্য্যন্ত দাঁও খুঁজছে। বলে মজুরি কমাও তো জিনিস নেব—না হলে পথ দেখ।

তাহলে রেলিঙেই বরং—

ওই সাজিয়ে রাখাই সার—সকলকারই ট্যাঁক গড়ের মাঠ। মাসের প্রথম হপ্তায় যা কিছু বিক্রী—তারপর জামা ইজেরে ধুলো জমে। লোকে আসে—এটা ওটা নাড়ে—দাম জিজ্ঞেস করে—আবার রেখে দিয়ে চলে যায়। কিনতে ইচ্ছে করে—ট্যাঁকের রেস্ত ফুরিয়েছে—কি করবে বল! ও যাই বল রমাদি—চানাচুর বিক্রীই ভাল। চার পয়সার মামলা—মাসকাবারের পরোয়া করে না কেউ।

কিন্তু একটি দিন শরীর খারাপ হলে—

তেমনি শরীর কিনা—রীতিমত আখড়ার মাটি মাখি।

তোর সব দিকেই ধার আছে ভাই—যদি পড়ার দিকটা—

কেষ্ট ঘুরপাক মেরে গেয়ে উঠল :

লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে,
মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে।

—না হাল দেখছি খারাপ—ও পথে আর শর্ম্মা যাচ্ছে না।

মিথ্যা বলেনি কেষ্ট। কি অবস্থা এই কলম-পিষিয়ে দলের। সংসার যদি মসৃণ গতিতে চলে—ওরা চোখ বুজে চলবে সেই পথে। বাঁধা সময়—বাঁধা কাজ। সংসারে যদি দুরন্ত ঝড় ওঠে—ওরা ছিটকে পড়বে—এধার ওধার—যেন ঝড়ের মুখে অসহায় তুলো।···এ জীবন বাদুলে পোকার জীবন। হাসি আনন্দ সখ সৌখীনতা—ঐ মাপা কালের মধ্যেই। যেন গণ্ডী ঘিরে রাখা খানিকটা জায়গা। তারপর মাথা গুঁজে সেই যে পড়বে কাদায়—তখন 'মারো জোয়ান হেঁইয়ো' বলে চীৎকার করে ও দেহের সর্ব্ব শক্তি প্রয়োগ করেও কূলে ঠেলে ওঠার সামর্থ্য থাকবে না। আর নীচেয় যারা ময়লা পোষাক পরে—অপরিমিত খাটে—অকারণে চেঁচায়—আনন্দ করে পাগলের মত—মরে একটা ক্ষুদ্র পোকার মত—সুখ বা দুঃখ কোনটিই পরিমিত বা গভীর নয় যাদের—তাদের জীবনও সুখ-দুঃখকে অগ্রাহ্য করে—প্রবল প্রবাহের মত বয়ে যাচ্ছে। সে যেন জীবনই। আলো উত্তাপ—উত্তেজনা ক্রূরতা সবের সীমাই সেখানে হারিয়ে যায়। স্নেহের বন্ধন হয়তো শিথিল—প্রেমের

মর্য্যাদা হয়ত দেয় না—পাঁচজন আত্মীয়কে লৌকিকতার বাহু দিয়ে হয়তো জড়িয়ে ধরে না—পশুবৃত্তির অত্যন্ত কাছাকাছি পৌচেছে—তবু তার মধ্যে অভ্যাসের কৃত্রিমতা কম। এখানে একটুখানি মানুষ—অনেকখানি পোষাকে ঢাকা। যেন পোষাকেরই মানুষ—মানুষের পোষাক নয়।

সন্ধ্যা দেখিয়ে রমা গিয়ে বসল সুরমার ঘরে। বললে, বউদি, সেলাই আর সান্ত্বনা দিতে পারছে না। আমাকে পড়াবে খানিক করে?

পড়া? পড়ে কি করবি?

পড়ে কি করে মানুষ—দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য পুরুষ মানুষ হলে বলতাম—লেখাপড়া শেখা দুঃখের হেতু।

না রমা—ভাল করে না শেখার ছল ওটা। চাকরি করব এই মন নিয়ে লেখাপড়া শেখায় অনেক দুর্গতি।

চাকরি নেয়া ছাড়া এর আর সার্থকতা কি!

কতদূর পড়েছ রমা?

রমা মাথা নামিয়ে বললে—ক্লাস এইট পর্য্যন্ত। তারপর মা মারা গেলেন।

—যাক তোমায় তো চাকরি নেয়ার জন্য পড়ানো হয়নি, কেমন লাগত বল ত?

চাকরি নেয়ার জন্য নয়ই বা বলি কেন রমাদি। আমাদের যে চাকরি—তা নিতে হলেও তো পাস দু একটা দিতে হয়!

ওঃ—ভুলে গেছলাম। সুরমা হাসলে।

হাসলে যে—মিথ্যে বলেছি? আমাদের কি একটা কোর্স?—চৌষট্টি কলায় পারদর্শিনী না হলে—ঘর মেলে না।

বুঝেছি—তাই পড়তে চাও?

বোঝনি বউদি। চাকরি নেয়ার সাধনা ছেড়েছি—এখন দেখিই না এ জগতের হালচাল কি।

বলব তোমার দাদাকে।

না—ভারি লজ্জা করবে কিন্তু। তুমি পার তো কিছু তালিম দিও।

আমার পুঁজিও সামান্য। ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত কিন্তু নোট বই আর মেড-ইজির দৌলতে নদী পেরিয়েই নৌকো হারিয়েছি।

রমা বললে, তা হোক যতটুকু জান আমাকে দাও।

বই?

কেষ্টকে বলব'খন।

রমার যে কথা সেই কাজ। পরের দিনই বই নিয়ে এসে ডাকলে, বউদি। বিরক্ত করছি না তো?

না—আমি অবাক হচ্ছি। তোর মধ্যে এমন প্রাণ-শক্তি আছে—অথচ কাঁচের ঘেরায় কেরোসিনের বাতি। জ্বলে কিন্তু ধোঁয়ার জন্য উজ্জ্বল হয় না। সেলাইয়ের সময় নষ্ট হবে না?

না। সংসারে কিছু কম সময় দেব মনে করছি।

পুরুতগিন্নি আর কতদিক দেখবেন—সৌরভীকে ডাকলেন অগত্যা। বলি ও মেয়ে—শোন। এই বাড়ীতে কতই দেখলাম! এদিকে কলেজ বসেছে, দর্জ্জিখানা হয়েছে, আবার ও-ধারে বায়স্কোপ। নতুন ভাড়াটেদের সঙ্গে আলাপ হল? শুনছি নাকি—বায়স্কোপের মানুষ! মাগোমা—কি ঘেন্নার কথা—মঙ্গলা-বুড়ির কি ভীমরতি হল—শেষকালে হাটের মানুষ এনে ঘরে তুললে।

সৌরভী বললে, তা কদিন তো এসেছে—বেচাল দেখলুম নি তো।

দেখেছিস ওদের ঘরের কীর্ত্তি? জুতো পায়ে ঘরের মধ্যে মস্ মস্ করে ঢোকে—টেবিলে বসে খানা খায়? মাগীটা নাকি সিগ্রেট খায়।

না বামুন-মা—দেখিনি। ওদিকে যাবার সময় হয়নি এ কদিন।

ওমা—সেকিলো? এ সবে তোরও শেষে অরুচি হল!

সৌরভী মৃদু স্বরে বলল, কি করব বামুন-মা—ভাল লাগে না।

পুরুতগিন্নী অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। খানিক পরে বললেন, তোর কি কোন অসুখ-টসুখ হলো?

না ভালই আছি। সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে সৌরভী সরে গেল।

২১

ক্রমে শীত গিয়ে বসন্ত এল। ঋতুর এই পরিবর্ত্তন সাদা চোখে দেখা যায় না। শৈত্যাভাবের অবসান হ'ল, দেহের ত্বকে নূতন একটা স্বাক্ষর পড়ল এই পর্য্যন্ত, নতুবা

ধুসর আকাশ কবে থেকে নীল হতে সুরু করেছে, গাছের শাখায় দেখা দিয়েছে নবাঙ্কুর, কচি পাতার আড়ালে বসে সুর সাধছে কোকিল আর তার সতীর্থরা—দৃষ্টিও শ্রুতিলভ্য এই সব বস্তু শহরবাসীদের জ্ঞানের সীমানাতেই ধরা দেয় না। এখানে প্রতি ঋতুতে প্রভাত সঙ্গীত গীত হয় বায়সকণ্ঠে, কলের জল-পড়া-শব্দ ঋতু ভেদে বৈচিত্র্য আনে না, ধোঁয়া আর কলহের মধ্যে একটি দিন আর একটি দিনকে ঠেলে নিয়ে যায়—সূর্য্য যেমন পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে হেলা পর্য্যন্ত শিশু দিনকে বার্দ্ধক্যের ছায়ায় অস্তমিত করে। বসন্ত শহরে সৌন্দর্য্য দেখায় না, আনে মারী ভয়। ভয়ের দোলায় দুলতে দুলতে ভাবনার রজ্জুটি শক্ত করে চেপে ধরে মানুষ এবং সেই রজ্জু টেনে টেনে চারিদিকে জট পাকায় ভাল করে।

ছোট ছেলে মেয়েদের টীকা নেওয়া শেষ হ'ল—টীকাদার বললে বড়দের, আপনারাও নিন।

বড়রা হাসলেন। আমরা টীকা নেব? আমরা কি স্বাস্থ্যতত্ত্ব বুঝি না? মা শীতলার মাহাত্ম্য জানি না? দৈববলে বিশ্বাস করি না? ষেটেরা পূজোর দিন—বিধাতাপুরুষ যা লিখেছেন কপালে—হাজার ঘষাঘষি করলে তা মুছে ফেলতে পারব? দুঃখ কষ্ট যদি কেউ ইচ্ছে করলেই তাড়াতে পারত তাহলে আর—পুরুতগিন্নী বললেন, সীতার এত দুঃখ ভোগ হবে কেন! কথায় আছে না,

অদৃষ্টের ফল—কে খণ্ডাবে বল,
তার সাক্ষী দেখ—দময়ন্তী নল।

কপালে থাকে মায়ের অনুগ্রহ হবে—তোদের বিষ মাখানো ছুরি ছোঁয়াতে দেব কেন দেহে?

ভগবতী সজল চক্ষে বললেন, তুমি সত্যিই নেবে না?

অমরনাথ বললেন, নেব না—ঠিক এই কারণেই নয়। জান তো আমার বাংলা টিকে হয়েছে ছেলেবেলায়—তারপর শুদ্ধাচারে যদি থাকি···

ভগবতী বললেন, তাহলে আমিও নেব না।

ভূপতিবাবু বললেন উমা দেবীকে, এত বছর কাটালাম শহরে—ভয় করেনি কখনও। শুনেছি ভয় করলেই মা ভর করেন।

উমা দেবী বললেন, আমাদের নেওয়ালে কেন তবে? অকেজো প্রাণের কি এতই দাম?

তোমাদের বিশ্বাস কম—ভয় বেশী—ভূপতিবাবু বললেন।

রাগ করে উমা দেবী কোন কথা বললেন না।

শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল ভয় না করলেও মা অনুগ্রহ করতে কার্পণ্য করেন না। আপিস থেকে জ্বর নিয়ে বাড়ী এলেন ভূপতিবাবু। বললেন, এক কাপ আদা-চা করে দাও তো—সর্ব্বাঙ্গে যেন আড়ষ্ট ব্যথা। মাথায় যন্ত্রণা।

উমা দেবী বললেন, এখন আমরা কি করব!

ভয় নেই—ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। কালই ঠিক হয়ে যাবে।

পরের দিন জ্বর বাড়ল—ভূপতিবাবু আধ-অজ্ঞান হয়ে কেমন এলোমেলো বকতে সুরু করলেন। উমা দেবী পুরুতগিন্নীকে গিয়ে অনুনয় করলেন, মাগো—একবারটি চলুন দেখবেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে।

চল। ঘরের মধ্যে আর ঢুকলেন না তিনি, দোর গোড়ায় ডিঙ্গি মেরে বললেন—হু—যা ভেবেছি তাই। বাইরে এসে বললেন, মায়ের অনুগ্রহ। কোবরেজ ডাকাও—জরিবুটি করুক। জারির জল খাওয়াও—পাঁচটা পয়সা কপালে ঠেকিয়ে মা শেতলার নাম করে তুলে রাখ—পান এনো না—মাছ এনো না—কালো ময়লা কাপড় পরে ঘরে ঢুকো না। ধূনো গঙ্গাজল দাও—ভাল করে মানত চেনত কর। আহা মা যেন পদ্মহস্ত বুলিয়ে ভাল করে দেন।

তারপর এধারে আর এলেন না। খবর পেয়ে অমরনাথ আর ভগবতী এলেন। যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিলেন—সেবা করলেন। রোগী তখন বাকশূন্য কিন্তু চৈতন্যহারা হয়নি। অমরনাথকে কাছে ডেকে কি বলবার চেষ্টা করলেন—পারলেন না। দু'চোখ গড়িয়ে দুটি ধারা নামল—ঠোঁট দু'খানি থর থর করে কাঁপতে লাগল।

উমা দেবী যথাসম্ভব দূরে দূরে রইলেন। রমা এসে বসল শয্যা শিয়রে। রমার যে অনেক কিছু যেতে বসেছে। নারীর যা সব চেয়ে সেরা আশ্বাস—সেই আশ্রয়। এই আশ্রয় হারালে রমার কি দশা হবে।

ব্যাকুল সেবা দিয়েও রমা নিয়তিকে নিরস্ত করতে পারলে না। ভূপতিবাবুর মৃত্যু হল। মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার যেন জ্ঞান ফিরে এসেছিল। বলেছিলেন, তাইত

মা—তোর কিছু করতে পারলুম না। কার হাতে দিয়ে যাব তোকে?

কেন বাবা—যিনি সকলের আশ্রয় তাঁর হাতে দিয়ে যাও।

তাই দিলুম। তিনি তোকে আশ্রয় দিন।

এই আশ্বাসই ভূপতিবাবুর শেষকৃত্য সুসম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত রমাকে বলিষ্ঠ করে তুললে। সব কাজ শেষ হয়ে গেলে—রমা বললে অমরনাথকে, আর কি করতে হবে কাকাবাবু?

আর কিছু নয়—শুধু প্রার্থনা কর তাঁর আত্মা যেন পরমগতি লাভ করে।

সমস্ত মিটলে উমা দেবী আত্মপ্রকাশ করলেন, শোন রমা—এইবার আমাদের ব্যবস্থা একটি করে নিতে হবে। এ বাড়ীতে ভাড়া দিয়ে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মনে করে দেখ—তোমার কেউ আপনার লোক আছে কি না।

কে আর থাকবে মা—তুমি ছাড়া।

কিন্তু আমিও তো স্বাধীন নই—আমাকেও অন্যের আশ্রয়ে যেতে হবে। তুমি যদি পেটের মেয়ে হতে আলাদা কথা। ভায়েরা আমার সঙ্গে তোমাকেও ঠাঁই দিত বাড়ীতে। কিন্তু, তারা যদি বেঁকে বসে? বেশ করে ভেবে দেখ—কোথাও কেউ আপনজন আছে কি না তোমার?

রমা অনেক ভেবে বললে, কেউ নেই মা। যারা ছিল—তাদের সঙ্গে বাবা সদ্ভাব রাখতে পারেন নি—নতুন বিয়ে করে। তারাই বা কেন ঠাঁই দেবে বল!

তাহলে শোন—যাঁরা আমাকে ভাল চোখে দেখেন নি তাঁদের দায়িত্ব আমিই বা নেব কোন ভরসায়! না—সে আমি পারব না।

তাহলে—আমায় কিছু দাও যাতে আমি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারি।

উমা দেবী সবিস্ময়ে বললেন, টাকা চাও? টাকা আমি পাব কোত্থেকে। আমারও সমস্ত জীবন পড়ে রয়েছে—আমাকেও পরের হাত তোলায় থাকতে হবে।

কলহ করে লাভ নেই। পিতাকে আজ নতুন হারাল না রমা। তাঁর অর্থে রমার কি অধিকার। ঘর তো রমার নয়—উমা দেবীর। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রমা। ভাবলে কার কাছে যাব এই দুঃসময়ে। কে বইবে এই ব্যয়ভার? তার চেয়ে গঙ্গায় তো অনেক জল আছে—সব ভার সেই সর্ব্বসন্তাপহারিণীর কোলে ফেলা দেওয়া যায় না?

থট্ থট্ থট্—ঠিন্ ঠিন্। কি মধুর আহ্বান। কালো কলের কণ্ঠে জীবন ধারণের পরম আশ্বাস। কর্ম্ম দিয়ে ও দুঃখকে জয় করবে—শোককে ভুলিয়ে দেবে—মৃত্যু পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ করিয়ে দেবে।

এক পা দু'পা করে সুরমার সামনে এসে দাঁড়াল। কল থেকে উঠে দাঁড়াল সুরমা। বললে, বোস এখানে। আমার আঙুলে একটা ফোড়া মত হয়েছে—সেলাই করতে কষ্ট হচ্ছে। এটা শেষ করে দেনা ভাই।

আশ্চর্য্য, সুরমা—রমাকে কোন আশ্বাস দিলে না—শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার বিধিও বুঝি ভুলে গেল! শুধু জানিয়ে দিলে বহু কাজ এখনও তার অপেক্ষায় আছে—সংসারে তার প্রয়োজন তিলমাত্র কমে নি। পৃথিবী এত বড় যে মৃত্যুর পদধ্বনি তার বায়বীয় সত্তা ডিঙ্গিয়ে মনে মনে প্রতিধ্বনি তুলতে পারে না। রমা সেলাই কলে ঘটাঘট শব্দ তুলে অঙ্গাবরণ বুনতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

সমর্পণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

১

সে তো আসে নি···আজো আসে নি···
আসে নি সুধাধার
ঝরায়ে আসার সুরেলার···
শুধু কে গভীর অন্তরে শুনি যেন গুঞ্জরে :
"ফুটিবে সে-মধু ঝংকার ॥"

২

জানি : গায় প্রাণ শুনি' গান তারি চিরসুমধুর,
জানি যে সে এত কাছে, তাই মনে হয় দূর,
জানি যে সে ভালোবাসে, ডাকিলেই কাছে আসে
মুরলী বিলাসে অনিবার।
তাই ক্ষণিকের অতিথিও হয় বল্লভ প্রিয়
আনে বাণী সে-ভালোবাসার ॥

৩

আমি জানি না—কবে যে হব তাহার মনের ম'ত,
জানি—শুধু সে-আশায়ই যাপি এ-জীবন-ব্রত,
জানি—ভালোবাসা নয় শঙ্কিত মন্ময়
সাধ তার—সব হারাবার।
জানি : হারাতে যাহার ভয়, নয় সে প্রেমিক নয়
সে বণিক স্বভাবে তাহার ॥

সমর্পণ

ইন্দিরা দেবী

১

সুন সুন রী···হে রি হে সখী !
আয়ে ন পিয়া মেরে দুয়ার,
করুণাকি পরত ফুয়ার···
জানু ন কুঁ্য অঙ্গ অঙ্গ গুঁজ রহি হৈ তরঙ্গ :
"আয়ে গি রি মধুর বহার ॥"

২

জীবনকা গীতে ক্যা হৈ ?—মুরলীকি তান হৈ,
নৈন কহেঁ দূর জিসে তনমে রো প্রাণ হৈ,
জানু প্রেমকা পূজারী আয়ে আয়েগা মুরারি
অধর মুরলিয়া সঁভার।
যে পিয়া অঞ্জান নহি, পলকা মেহমান নহি
যুগ যুগকা হৈ ইসসে প্যার ॥

৩

ময় তো জানু নহি কৈসে হরিকো রিঝাউঙ্গী,
জানু—ইসি আশমে ময় জীবন বিতাউঙ্গী,
জানু—প্রেম খেল নহি, দুই হয় তো মেল নহি
দেবে প্রেমী তন মন বার।
জানু—দুজি রীত নহি, দুই হৈ তো প্রীত নহিঁ,
পাবে রহি দে সভি জো হার ॥

২

জানি : অকূল-পাথারে শুধু কাটে তটবন্ধন,
জানি—যদি করি তারে সকলি সমর্পণ,
মিটিবে মিটিবে তৃষা, পোহাবে পোহাবে নিশা,
মিলিবে মিলিবে দিশা তার।
যেই বলি—বাঁশি সুরখানি সাধিব কণ্ঠে, জানি
করে সে তাহার সুরকার॥

৩

জানি : সাধনায় তারে চায় ধরিতে যে—পায় না,
শুধু, যে শরণ চায় সে তারে হারায় না,
যে তার চরণ ধরে, তারে সে বরণ করে,
নিয়ে যায় তুফানের পার।
কেন তবুও পারের কড়ি তরে হায় কেঁদে মরি
ভরসা পেয়েও করুণার ?

২

তবু কেন বলি বেদনায় : "ধরিল না সে তো রূপ !"
থামে বাঁশি, থামে না তো রেশ তার অপরূপ !
যেখানে যা কিছু আছে জানা অজানার মাঝে
গায় গান তারি সুষমার।
শুধু এই কোরো—যেন চাই, পাই কিবা নাই পাই
দিতে পারি যা আছে আমার॥

২

নৈয়া পার লগেগি কটেঙ্গে তটবন্ধন,
বিধনা জগেগি জো করুঙ্গি সব অর্পণ,
মিটেগি পিয়াস মেরি, রৈন কাটগি অঁধেরি
জীবনকি নাব হোগি পার।
মিলেঁ সুর প্রাণকে জো মুরলিকি তানসে তো
প্রেমবীণাকে বজেঙ্গে তার॥

৩

বুধ বল গুণসে তো হাথ নহি আয়ে বো,
আসরা জো লে প্রভুকা শরণ লগায়ে বো,
জো সখি শরণ আয়ে, করুণাসে অপনায়ে,
লে জায়ে বো তুফানোঁকে পার।
মন রে, তু ডরে কাহে কৈসি করে হায়ে হায়ে ?
অমর খিবৈয়া দেগা তার।

২

বিরহাকি পীর কৈসি বেদনাকে গান কুঁ্য ?
সুন সুন বাঁসুরিকি মধভরি তান তু।
রাগরঙ্গ জগমায়া উসি রূপকি হৈ ছায়া
হরিকি নূপুর-ঝনকার।
ইতনা হি বর চাহুঁ—পাউঁ মন্ন য়া নহি পাউঁ
তন মন হরি পে দুঁ বার॥

স্তবকগুলি ১ ২ ৩ চিহ্নিত হ'ল দেখাতে কোন্ কোন্ স্তবকের সুর এক। এ-সুরটির যথা পর্য্যায় এই : অস্থায়ী অন্তরা, সঞ্চারী অন্তরা, সঞ্চারী অন্তরা

II মা মা I সা পা পা -া | -া -া ধা পা I সা ধা ধা -া | -া -া -া -া I
সে তো আ সে নি - - - আ জো আ সে নি - - - - -
সু ন সু ন রী - - - হে রি এ স খী - - - - -

ণা ণা ণা ধা | ণা ধা র্সা না I র্রর্সা নর্সা -া -া | ণা -া -া -া I
আ সে নি - - - সু ধা সা - - - - - - র্
আ য়ে ন পি য়া মে রে তু য়া - - - - - - র্

ণা ণা ণা ণা | ধপা ধা পমা পা I ধা -া -া -া | -া ধা ধা ধা I
ঝ রা য়ে আ সা র্ সু রে লা - - - - র্ শু ধু
ক রু ণা কি প র ত ফু য়া - - - - - - র্

ধা ধা ধা ধা | ধা -া র্সা র্সা I পা পা পা পা | মপা ধা ধা ধা I
কে গ ভী র অ ন্ ত রে শু নি যে ন গুন্ - জ রে
জা নুঁ ন কূ্ঁ অ ঙ্গ অ ঙ্গ গূঁ জ র হি হৈ ত র ঙ্গ

পমা মা মা মগা | রা গা ধা পা I মা -া -া -া | -া -া মা মা I
ফু টি বে সে ম ধু ঝ ং কা - - - - র্ জা নি
আ য়ে গি রি ম ধু র ব হা - - - - র্ - -

মা গমা পা পা | পা পা পা ধা I মা পা ধা পা | ধা ধা ধা -া I
গা য় প্রা ণ্ শু নি গা ন্ তা রি চি র সু ম ধু র্
জী ব ন্ কা গী ত ক্যা হ্য় মু র লি কি তা ন হৈ -

ণা ণা ণা ণা | ধা ণা ধা ণধা I পা ধা পা র্সা | র্সা -া র্সা -া I
জা নি যে সে এ ত কা ছে তা ই ম নে হ য় দূ র্
নয়্ ন ক হেঁ দূ র জি সে ত ন মে রো প্রা ণ হ য়

র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা না র্রা র্সা I ণা ণা ণা -া | ণা ণা র্সা ণা I
জা নি যে সে ভা লো বা সে ডা কি লে ই কা ছে আ সে
জা নুঁ প্রে ম কা পূ জা রী আ য়ে আ য়ে গা মু রা রি

ধা ণা ধা ণা | পা ধা মা পা I মপা ধণা পধা -া | -া -া ধা ধা I
মু র লী বি লা সে অ নি বা - - - - র তা ই
অ ধ র মু র লি য়া সঁ তা - - - - - - র

মা র্মা র্মা -া | র্গা র্গা র্মা র্গা I র্রা -া র্গা র্রা | না র্রা র্মা র্সা I
ক্ষ ণি কে র অ তি থি ও হ য় ব ল্ ল ভ প্রি য়
য়ে পি বা অন্ জা ন ন হি প ল কা মেহ্ মা ন ন হি

ণা ণা ধা ধা | পা পা র্সা র্সা I মা -া -া -া | -া -া মা মা I
আ নে বা ণী সে ভা লো বা সা - - - - র আ মি
যু গ যু গ কা হয়্ ইস্ সে প্যা - - - - র - -

সা সা সা সা | রা রা রা গা I সা রা গা রা | গা গা গা গা I
জা নি না ক বে যে হ ব আ হা রি ম নে র ম' ত
ময়্ তো জা নু ন হি কৈ সে হ রি কো রি মা ড়ুং গী -

মা মা মা মা | মা মা গা ^সগা I রা গা রা পা | পা পা পা পা I
জা নি শু ধু সে আ শা য়ি জ পি এ জী ব ন ব্র ত
জা নুঁ ই সি আ শ মে ময় জী ব ন বি তা উং গী -

পা পা পা পা | পা পা ধা পা I মা -া মা মা | মা -া পা মা I
জা নি ভা লো বা সা ন য় শ ং কি ত ম ন্ ম য়
জা নুঁ প্রে ম খে ল ন হি সৌ দা হৈ তো যে ন ন হি

গা মা গা মা | রা গা সা রা I সরা গমা ^রগা -া | -া -া গা গা I
সা ধ তা র স ব হা রা বা - - - - র জা নি
দে রে প্রে মী ত ন ম ন রা - - - - - - র্

সা র্সা র্সা র্সা | না র্রা র্সা ণা I ণা -া ণা ধা | পধা ণা ণা -া I
হা রা তে যা হা র ভ য় ন য় সে প্রে মি ক ন য়
জা নুঁ দু জি রী ত ন হি দু ই হয়্ তো প্রী ত ন হি

ধা ণা ধা ণা | পা ধা ণা ধা I পা -া -া -া | -া মা মা -া I
সে ব নি ক স্ব ভা বে তা হা - - - - র জা নি
পা য়ে র হি দে স ভী জো হা - - - - - - -

এ-দুটি গান দ্বিজেন্দ্রলালের “সাজাহানের” বিখ্যাত আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে নিয়ে এই হাসিরূপ গান—এই নৃত্যসঙ্গীতটির ছন্দে সুরে বাঁধা। ইন্দিরা দেবী আমার গানটি অনুবাদ করতে হিন্দি ছন্দে প্রথম অক্ষরবৃত্ত রীতি প্রবর্তন করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি হিন্দি গানে ত্রিস্বর স্বরবৃত্ত প্রবর্তন করেছেন যে ছন্দটি হিন্দিভাষীরা সানন্দে গ্রহণ করেছেন। এ-গানটির হিন্দি প্রতিরূপে প্রতি অক্ষরই একমাত্রিক এবং প্রতি গুরু স্বরও একমাত্রিক। হিন্দি ছন্দে এ-রীতি এখনো চালু হয় নি, তবে এ ছন্দটিতে ইন্দিরা দেবী এমনই অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যে তাঁর ত্রিস্বর স্বরবৃত্ত ছন্দের মতনই এ-ছন্দটি হিন্দি কাব্যকে সম্পৎশালী করবে। পরিশেষে দ্বিজেন্দ্রলালের এই গানটির অপরূপ সুরের কথা মনে হয়—অর্ধ শতাব্দী পূর্বে রচিত যে-সুরটি এখনো তেমনি সজীব ও তরুণ আছে। শুধু তাই নয় বাংলা সুরের সঙ্গে বিদেশী গীতিভঙ্গির সমন্বয় ক'রে তিনি যে-সব অপরূপ গান বেঁধে গেছেন তাদের মধ্যে এ-গানটির ভঙ্গি ও গাঢ়বন্ধ ভারতীয় সঙ্গীতে অপূর্ব ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আমার বহু পাশ্চাত্য বন্ধুরা বলেন সোচ্ছ্বাসে যে এসব সুরের গতিভঙ্গিতে তাঁদের প্রাণে উল্লাস জাগে। অথচ এ-সুর বিলিতি নয়—আদ্যন্ত ভারতীয়। এইখানেই সুরকার হিসেবে তাঁর অদ্বিতীয় প্রতিভা।

মাধ্যমিক শিক্ষায় অর্থনীতি

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-টি

ইউরোপীয় বা আমেরিকান দেশসমূহে সরকারী যে শিক্ষা বিভাগ আছে, তাহাদের প্রধান কার্য্য হইতেছে বিদ্যায়তনগুলিকে সাহায্য করিয়া তাহার বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতায় সহায়তা করা। স্কুলগুলিই ছাত্র তথা নাগরিক গঠন করে, কাজেই তাহাদের প্রতি দরদ বুদ্ধিমান দেশের লোকদিগের থাকাই স্বাভাবিক। ভারত স্বাধীন হইয়াছে আট বৎসর, শিক্ষার নানা সমস্যা সমাধান কল্পে কমিশন রিপোর্টের ছড়াছড়ি—কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারটা ইতিমধ্যে নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছে। অর্থাৎ হবুচন্দ্রের রাজ্যে জুতা আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ উনিশ পিপা নস্য উড়াইয়া যেরূপ প্রতিকার করিয়াছিলেন ব্যাপারটা সেইরূপই দাঁড়াইয়াছে। শিল্পোন্নতি যতই হইতেছে ততই বেকার বৃদ্ধি হইতেছে, যতই শিক্ষাখাতে টাকা ঢালা হইতেছে শিক্ষা ততই দুর্লভ হইতেছে। ছেলেরা কেন পড়ে না, পাস করে না কেন, অসততা অবলম্বন করে কেন, সে প্রসঙ্গে পূর্ব্বে একবার আলোচনা করিয়াছিলাম—অতএব তাহা নিষ্প্রয়োজন।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করিয়াছে সত্য কিন্তু তাহার বুরোক্রেটিক সরকারী কাঠামোটা রাখিয়া গিয়াছে—তাহারাই আজও সরকারের কর্ণধার। ভারত স্বাধীন হইলেও তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় নাই। অন্যান্য দেশের মত শিক্ষায়তনগুলির বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই, কি করিয়া সরকারী অর্থ বাঁচান যাইতে পারে এবং স্কুলকে কম দেওয়া যাইতে পারে তাহাই তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় আলোচনা হইয়াছে,—কর্ম্ম-দক্ষতায় তাহারা রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন—সে সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে সকলেই জানেন মাধ্যমিক-শিক্ষা বোর্ডের উপরেই নির্ভরশীল। তাঁহারাই সাহায্য দেন, বেতন, নিয়োগ প্রভৃতির কর্ত্তা এবং স্কুলের অর্থ তাঁহারাই খবরদারী করেন। কমিটির হাতে কোন ক্ষমতাই নাই, শিক্ষক নিয়োগ তাঁহারা করিতে পারেন কিন্তু তাহা পরিদর্শক ও বোর্ডের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া দরকার। বর্ত্তমানে যে সাহায্য দেওয়া হয় তাহা ঘাটতি-পূরণ প্রণালী অনুযায়ী। অর্থাৎ ধরুন একটি স্কুলের বাৎসরিক আয় ১২০০০৲ টাকা কিন্তু ব্যয় ১৬০০০৲ —অতএব সরকার ৪০০০৲ টাকা দিবেন। সাধারণের নিকট কথাটা চমৎকার, স্কুলের আর দুঃখের কি কারণ থাকিতে পারে? কিন্তু কি করিয়া কখন কি রীতি অনুসারে এইটাকা দেওয়া হইবে সেটা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে এ পদ্ধতিতে স্কুলের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সম্ভব নয়, বরং ইহা অপেক্ষা পূর্ব্বে যে মাসিক একটা ভাতা দেওয়া হইত সে পদ্ধতি কার্য্যকরী ছিল।

একটি স্কুলের কথাই উদাহরণ স্বরূপ আলোচনা করিলে ব্যাপারটা স্পষ্টতর হইবে। একটি স্কুলে সাধারণতঃ রিজার্ভ, জেনারাল ও সাবসিডিয়ারী ফাণ্ড থাকে এবং টাকা পোষ্টাফিস সেভিং ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া আইন। সরকারী সাহায্য সেক্রেটারীর নিকট দেওয়া হয়, তিনি সেটা ভাঙ্গাইয়া স্কুলে দেন। যদি না দেন, বা অন্য রকম করেন তবে বোর্ড কিছুই করেন না, স্কুলকে অনুমোদিত না করিয়া শিক্ষায়তনটিকে তুলিয়া দেন বা দিতে পারেন। অর্থাৎ ক নামক ব্যক্তির পাপে দেশশুদ্ধ লোকের ছেলেপুলে মূর্খ হইল।

ধরা যাউক একটি স্কুলের মাসিক বেতন আদায় ১০০০৲ এবং বেতনাদি বাবদ খরচ ১৩০০৲। জেনারেল ফাণ্ডে ১০০০৲ আছে,—তদ্দ্বারা তিনমাস চলিল, পরে টাকা ধার করিয়া বেতন দিতে হইল। সাবসিডিয়ারী ফাণ্ড যথা—খেলাধুলা, লাইব্রেরী, প্রাইজ, আসবাব প্রভৃতি ফাণ্ড হইতে ধার লইয়া তিনমাস চলিল। অর্থাৎ ঐ সকল ফাণ্ডের কার্য্য বন্ধ রহিল। লাইব্রেরীর বই কিনিলে, চেয়ার বেঞ্চি কিনিলে বেতন বন্ধ হইবে অতএব শিক্ষক থাকিবে না—ইত্যাদি কারণে সমস্ত বন্ধ করিয়া বেতন দেওয়া হইল। ৬ মাস বাদে কিছু সাহায্য পাওয়া গেল, ধার শোধ দিয়া কিছু থাকিল না।—পুনরায় ঐরূপ অবস্থা হইল এবং বৎসরান্তে সাহায্য পাওয়া গেল।

কিন্তু সাবসিডিয়ারী ফাণ্ডগুলির টাকা খরচ হইতে পায় নাই, অতএব বোর্ড উক্ত টাকা unspent balance গণ্য করিয়া কাটিয়া লইলেন। উক্ত বৎসরে পণ্ডিত মহাশয় স্কুল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন জুন মাসে, বিজ্ঞাপন দিয়া যে প্রার্থী পাওয়া গেল তাহার মধ্যে ম্যাট্রিক কাব্যতীর্থ নাই। অথচ ছেলেদের ক্ষতি হয় মনে করিয়া কমিটি নন-ম্যাট্রিক কাব্যতীর্থ নিয়োগ করিলেন—কেননা গ্রাম্য স্কুলে ভাল শিক্ষক পাওয়া যায় না। তিনি পঞ্চাশ টাকা হারে বেতন লইলেন ১০ মাস—৫০০৲। বোর্ড সাহায্য দিবার সময় বলিলেন ও নন-ম্যাট্রিক কাব্যতীর্থকে নিয়োগ বাতিল এবং ৫০০৲ বেতন দিলেন না। ফলে জেনারেল ফাণ্ডে পরবর্ত্তী বৎসরে দাঁড়াইল ৫০০৲ টাকা—এবং অবস্থা আরও কাহিল—

আরও, পূর্ব্ব বৎসরে বার্ষিক উপার্জ্জন যদি ১২০০০৲ টাকার স্থলে ১৩০০০৲ হইয়া থাকে তবে Excess income বাবদ সেটাকাও কাটা গেল। ফলে স্কুলের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। পদ্ধতিটা এইরূপ যে, বেশী হইলে সেটা লইব কিন্তু কম পড়িলে দিব না—সেটা যেন তেন প্রকারেন কাটিয়া লইব। এইরূপ আর্থিক অবস্থায় স্কুলের পুষ্টি ও বৃদ্ধি কি সম্ভব?

তাহার পর ধরা যাক্ পূর্ব্বতন অনুমোদন তিন বৎসরের জন্য। তাহাতে সর্ত্ত ছিল যে, স্কুলকে ৪০০ বর্গগজ পরিমিত একটি বিজ্ঞানাগার

নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং ছাত্রদিগের উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করা চাই। কিন্তু তিন বৎসরে উপরিউক্ত উপায়ে স্কুলের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়াছে এখন ঘর তৈয়ারী করিতে ৮০০০৲ টাকা লাগিবে। কে দিবে? জনসাধারণ? তাহারা দিবে না,—প্রথমতঃ তাহারা করভারে পীড়িত। খাদ্য বস্ত্র বিনা চোখে সরিষাপুষ্প দেখিতেছে। বদান্য জমিদারগণ পূর্ব্বে দিতেন—কিন্তু জমিদারী উঠিয়া গেল। ব্যবসায়ীগণ দান বিমুখ,—গ্রামে ব্যবসায়ীগণ নাই। কে দিবে? কমিটি? সভ্য-বলিলেন, আমি অ-সভ্য হইতে প্রস্তুত আছি কিন্তু এ দায়িত্ব লইব না। অনুমোদনের সর্ত্ত পূর্ণ হইল,—অননুমোদিত হইয়া স্কুল উঠিয়া গেল। এখনও অবশ্য বেশী স্কুল উঠে নাই তবে ৩।৪ বৎসরে অনেকগুলি উঠিবে।

শিক্ষাবিমুখ গ্রামে শিক্ষার প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। সেখানকার স্কুলের কমিটির সভ্য কাহারা? সাধারণতঃ বেশীর ভাগই ম্যাট্রিকপাশও নয় এবং শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে তাহাদের বক্তব্য ও করণীয় কিছু নাই। তাহাদের মূল করণীয়, পাড়ার ছেলেগুলিকে ফ্রি করিয়া দেওয়া এবং ফাঁকে চক্রে আত্মীয়স্বজনের চাকুরী করিয়া দেওয়া।

উপরে যে একটি গ্রাম্য স্কুলের অর্থনীতির আলোচনা করা হইল তাহাতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে বর্ত্তমান ঘাটতি পূরণপদ্ধতিতে স্কুলে অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতেছে। অন্ততঃ যে দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সেটাকে চালু রাখা হইয়াছে তাহাতে কোন বিদ্যালয়েরই বৃদ্ধি ও পুষ্টি হইতে পারে না।

সরকারী উদ্দেশ্য কি তাহা অবশ্য আমার জানা নাই। প্রাথমিক শিক্ষা যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে প্রাইমারী পাসকরা ভাল ছেলেও ক্লাস ফাইভের পাঠ্য অনুসরণ করিতে পারে না। প্রাইমারী শিক্ষার জন্য দরাজ ও দরদী হাতে অর্থ বিতরিত হইতেছে। একজন বেসিক স্কুলের ম্যাট্রিক শিক্ষক ৮৫৲ বেতন পাইলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট শিক্ষক পান ৬০৲+৩৫৲=৯৫৲ বা ৩০৲+২০৲=৮০৲। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাপারে সরকার ব্যয়কুণ্ঠ। হয়ত এরূপ হইতে পারে যে সরকার চান দেশের নিরক্ষরতা দূরীভূত হোক, লোকে শিক্ষিত না হইলেও চলিতে পারে। অথবা মাধ্যমিক শিক্ষা যতই বাড়িবে বেকার সমস্যা ততই বাড়িবে অতএব মাধ্যমিক অবস্থায় শিক্ষাটীকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হউক।

যাহাই হোক বর্ত্তমান দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহায্য দান পন্থা লইয়া মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা টানিয়া হেঁচড়াইয়া চালু রাখার কোন সার্থকতা নাই। সরকার যদি মনে করেন মাধ্যমিক শিক্ষা সীমাবদ্ধ হইবে কেবলমাত্র ভাল ছেলেদের জন্য—তবে তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া উৎকৃষ্ট করা দরকার এবং অপ্রয়োজনীয় স্কুল তুলিয়া দেওয়াই সঙ্গত আর যদি মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন তবে তাহাকে বৃদ্ধি ও পুষ্টির সুযোগ দেওয়া দরকার। স্কুলের যাহা প্রয়োজন তাহা দিবার ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে উৎকৃষ্ট বিদ্যায়তনে পরিণত করাই সরকারী কর্ত্তব্য। স্কুলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভর করে তাহার প্রধান শিক্ষকের কার্য্যদক্ষতার উপর। দায়ীত্ব তাহার উপর অনেকই এবং তাহার কর্ত্তা প্রথমতঃ কমিটির, দ্বিতীয়তঃ পরিদর্শক, তৃতীয়তঃ পর্ষৎ। কিন্তু বর্ত্তমানে একজন প্রধান শিক্ষকের অবস্থা কণ্টক শয্যার সহিত তুলনীয়। যেদিকেই চাহিবেন, খোঁচা অনিবার্য্য। যথা—

জানুয়ারী মাস, ছেলে ভর্ত্তি করিতে হইবে। স্কুলে স্থান নাই হয়ত ৪০টি ছাত্র ভর্ত্তি করা হইবে পঞ্চম শ্রেণীতে। প্রার্থী ৬০ জন, তিনি পরীক্ষা করিয়া ভাল ৪০ জনকে লইলেন—অমনি বিক্ষোভ। অথচ কমিটি ঘর, বেঞ্চি করিতেছেন না। তাহার পর আসিল সুপারিশ,—না শুনিলে পীড়ন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট তাঁহার গাধা-পুত্রকে লইতে বলিলেন, ন্যায়তঃ নেওয়া চলে না। আপনার ট্যাক্স ৫৲ হইতে ২৫৲ টাকা হইল। গয়লার ছেলেকে লইলেন না, সে দুধ বন্ধ করিল। ইত্যাদি

স্কুলে বেঞ্চি নাই, ছেলেরা প্রতি ক্লাসে মারামারি বাধাইয়াছে, হেড মাষ্টার ধমকাইলেন, কিন্তু বসিতে দিবেন কোথায়? সেক্রেটারীর হাতে টাকা, তাঁহাকে জানানো হইল, তিনি বলিলেন, টাকা নাই। নিত্য এই ঝামেলা হেড মাষ্টারকে পোহাইতে হইল। ম্যাপ নাই, শিক্ষক কহিলেন—ম্যাপ বিনা ক্লাসে যাইতে পারিব না—ফলে ঝগড়া (এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক, সরকারী সাহায্য বা স্কুলের যাবতীয় টাকা সেক্রেটারী নাড়াচাড়া করেন,—হেড মাষ্টারের কোন হাত নাই। তাহারা ৩১শে মার্চ্চ টাকাটা যথাযথ দেখাইয়া খালাস—বৎসরের অন্য সময় টাকাটা কি হইতেছে তাহার খোঁজ কেহ রাখেন না। আমি এমনও জানি কাপড় কণ্ট্রোলের যুগে একজন সেক্রেটারী শিক্ষকগণের সরকারী মাগ্গী ভাতার টাকা ভাঙ্গাইয়া ভাইপোর দোকানের কাপড় আনিয়াছেন এবং বস্ত্র বিক্রয়ান্তর টাকাটা শিক্ষকগণ ৫৲, ১০৲ করিয়া পাইয়াছেন। তাহা ছাড়া কন্যার বিবাহ, জমি ক্রয়, লাটখাজনা দেওয়া প্রভৃতি সময় ত স্কুলের টাকা লাগিয়াই থাকে) হেড মাষ্টার টাকা পয়সা লইয়া গোলমাল করিলে, তাহাকে অযোগ্য আখ্যা দিয়া উৎপাত করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া। কোনও গ্রাম্য স্কুলে ৩।৪ বৎসরের বেশী কোন প্রধান শিক্ষক টিকেন না।

ছেলেরা বলে, লাইব্রেরীর বই দিন স্যর। নতুন বই কিনুন স্যর। শিক্ষক স্তোকবাক্য দেন, এই কিনবো কিন্তু টাকা আটকা। খরচ করিলে নিজে মাইনা পান না। বই দিবেই বা কে? লাইব্রেরীয়ানকে কোন বেতন দেওয়া হয় না,—দিলে বোর্ড মঞ্জুর করেন না। অতএব পড়া হয় না।

স্কুলের পাসের হার খারাপ, পাস না করিলে বোর্ডের হুমকি। প্রমোশন না হইলে কমিটির হুমকি। ট্যাক্স বাড়িবে···ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কণ্টক শয্যার মধ্যে নিরুপায় প্রধান শিক্ষক স্কুল পরিবর্ত্তন করেন, কিন্তু তাহা কটাহ হইতে উনুনের আগুনে মাত্র। যাহাদের জন্য স্কুলের অর্থ ব্যয়িত হইবে তাহাদের সম্মুখীন হইতে হয় প্রধান শিক্ষককে, অথচ অর্থের উপরে তাহার অধিকার নাই। অস্বাভাবিক অবস্থাও হইতে দেখা যায়,—সেক্রেটারী হুকুম দিলেন সব ছেলে ভর্ত্তি করুন—(সাধারণের চাপে) ঘর করিয়া দিব। ভর্ত্তি হইল,—বসিবার স্থান নাই, ছেলেরা

কোলাহল করে, সেক্রেটারী তখন গৃহে বসিয়া পরম নিশ্চিন্তে দিবানিদ্রা দিতেছেন। ঘর হয়ত হইল না,—হইল হয়ত পর বৎসরে।

ফর্দ্দ বাড়াইয়া লাভ নাই। উপরোক্ত বর্ণনা হইতে পাঠকগণ হয়ত আভ্যন্তরিণ অবস্থা কিছুটা বুঝিতে পারিবেন। মোটের উপর অবস্থাটা শিক্ষার অনুকূল নহে।

পূর্ব্বে ব্রিটিশ আমলে শিক্ষকগণের চাকুরী অবশ্য ভঙ্গুর ও খেয়াল খুশীর উপর নির্ভর করিত কিন্তু স্কুলগুলি বাড়িত এবং শিক্ষার অনুকূল ছিল। সরকার শিক্ষার প্রতিকুল বা অন্তরায়, অতএব জনগণের মাঝে শিক্ষার ভিত্তিকে পাকা করিবার একটা প্রেরণা ছিল। সাধারণের দানে স্কুল গড়িত, স্কুলের নামে চাঁদা চাহিলে কেহই না বলিত না। এটা গ্রাম্য বারোয়ারীর চাঁদার মত অপরিহার্য্য ছিল। তখন স্কুল পরিদর্শক হয়ত অনুমোদনের বিপক্ষে রির্পোট দিলেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন করিলেন—জনগণের সরকার-বিরোধী মনোবৃত্তি শিক্ষাকে অগ্রগতি দিতে। বর্ত্তমানে জনগণ সরকারী কার্য্যকুশলতার প্রতি আস্থাশীল না হইলেও নির্ভরশীল। অর্থাৎ যাহা কিছু স্বাধীন সরকারই করিবে, আমাদের কর্ত্তব্য কিছু নাই এমনি একটা মনোভাব দেখা দিয়াছে। তাহা ছাড়াও আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা তাহাদিগকে অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক করিয়া তুলিয়াছে। তাহার ফলে সাধারণের সহানুভূতি হইতে শিক্ষায়তনগুলি প্রায়শঃই বঞ্চিত। অবশ্য সর্ব্বত্র সব স্কুলের অবস্থাই এইরূপ নয়—তবে গ্রাম্য স্কুলের অন্ততঃ ৮০ ভাগই এইরূপ আর্থিক দুর্গতিতে ভুগিতেছে একথা সত্য।

কমিশন রিপোর্ট প্রভৃতি যাহা হইতেছে তাহা শহরে বসিয়া, বিলাতী কেতাব খুলিয়া নিদর্শন দেখিয়া একটা কিছু খাড়া করা হইতেছে। কিন্তু শহরেই কি কেবল শিক্ষার স্থান? গ্রামের লোকই শতকরা ৯৩% তাহাদের স্কুলগুলির প্রকৃত অবস্থা বিচার করিয়া দেখা আশু প্রয়োজন।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অর্থনীতি, প্রণালী, পাঠ্যবিষয়, পারিপার্শ্বিকতা প্রভৃতি দেখিয়া কেবলই মনে হয়,—

করিতে ধূলা দূর
জগত হ'ল ধূলায় ভরপুর·
বড়জোর না হয়,—ধূলারে মারি করিয়া দিল কাদা।

অতনু

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সমগ্র পৃথিবী ব্যাপি' চলিতেছে একই অভিনয়;
অনেক লোকের ভীড়, কাছে এসে বসেছ কখন
কিছুই জানি না আমি, অন্যমনা ছিলাম তখন
হাতে হাত দিলে তুমি, উষ্ণ স্পর্শে জাগিল বিস্ময়।

একেলা এসেছ তুমি পায়ে হেঁটে বহু দূর হতে
শ্রান্ত, তবু হাসিটুকু মাখা তব বিশুষ্ক অধরে
যে বাসনা ছিল তব গত রাত্রে উদ্বিগ্ন অন্তরে
তারি ছায়া দেখিলাম; ঢাকিয়া রেখেছ কোনমতে
অনুরাগে আরক্তিম কি সুন্দর আননে তোমার;
বিনিদ্র নয়নে বুঝি জমে ছিল দু'টি অশ্রুকণা,
তারও চিত্র মুছে নাই দেখিলাম; কবির কল্পনা
যতদূর প্রসারিত—তারও পরে ব্যর্থ সান্ত্বনার
প্রসাধনে ঢাকিয়াছ প্রতীক্ষার ক্লান্তি অবসাদ।
আমি জানি কি নৈরাশ্যে তুমি আজ হলে উদাসীন
তোমার আহুতি ব্যর্থ, নিরুদ্দেশে কামনা বিলীন,
ভালবেসেছিলে তুমি—সেই মাত্র তব অপরাধ।

তনু দেহে জেগেছিল বসন্তের আনন্দ মঞ্জরী
ঋতু রঙ্গে কামনার অনুদ্ভিন্ন রক্ত শতদল,
আকাশে আশ্চর্য রঙ—দেহ মন আবেশে চঞ্চল
বাতাসে মর্মের কথা দিকে দিকে বেড়ায় সঞ্চরি'।

রিক্ত হস্তে ফিরে গেলে—শূন্যঘরে শ্বসিছ পবন
আকাশের লক্ষ তারা জ্বলে জ্বলে নিভিল প্রভাতে,
এমনি কত না রাত্রি কাটিয়াছে হীন বঞ্চনাতে
বেদনা-বিহ্বল দিন দীর্ঘতর লেগেছে তখন।

কত অন্ধকার রাত্রি চুপে চুপে দিয়েছিল ডাক
নির্জন নিরালা ঘরে শূন্য শয্যা বিনিদ্র নয়ন
তুমি কি নিকুঞ্জবনে সন্ধ্যামণি করিতে চয়ন
গিয়েছিলে আনমনে, কথা নাই নিস্পন্দ নির্বাক?

জানি না তোমার মনে কে জাগাল প্রেমের স্বপন
নয়নে জাগাল মোহ কোন নয়নের দিব্য আলো,
হৃদয়ে তোমার কোন হৃদয়ের পরশ ছোঁয়ালো
অনুরাগে ভস্ম হল স্বপ্নময় তনুদেহ মন।

ভস্ম হতে আর বার লীলাচ্ছলে জাগাও অতনু
অভিশাপ মুছে যাক, অব্যর্থ হউক পুষ্পধনু।

অশ্রুমতী
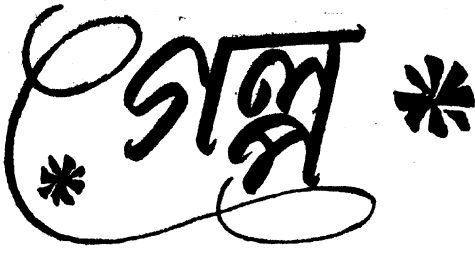
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈকালী খবরের কাগজটা হাত থেকে পড়ে গেলো সত্যব্রতের। আগুনের গোলার মত অক্ষরগুলো বহ্নিময় হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো চোখের উপর। অভিভূতের মত সে খাণিকক্ষণ চুপ হয়ে রইলো। হ্যাঁ সত্যিই—মহামান্য শিবেন্দ্রচন্দ্র গতায়ু হয়েছেন—প্রশস্তির শেষ নেই, গদগদ ভাষায় তাঁর বিস্তৃত জীবনের নানা সরস কাহিনী বলা হয়েছে। তিনি কর্ম্মী, তিনি আদর্শবাদী, তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, গুণী, কত কাজ তিনি করেছেন, কত প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেছেন, কত বিদ্বজ্জন সভায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ পড়েছেন, কতো লোককে কত রকমে সাহায্য করেছেন, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, চিকিৎসার ভার, বৎসরের পর বৎসর।

সত্যব্রত আবার চোখ বুলিয়ে নিলে কাগজের উপর—হ্যাঁ, ব্যাঙ্কার ব্যবসাদার কাউন্সিলের মেম্বার, কত কমিশনের সদস্য, বিগত মেয়র মায় মন্ত্রী শিবেন্দ্রচন্দ্র সম্ভ্রমৃত হয়েছেন একথা ছাপার অক্ষরে সত্যই বলছে। এই শিবেন্দ্রচন্দ্রই আবার এক বিগত যুগের সাগ্নিক হোতা ছিলেন—রিভলভার আর বোমা হাতে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তৎপর হয়ে বনে বাদাড়ে, পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তখনকার দিনের সেই তরুণ শিবেন্দ্র ছিলেন এক অদ্ভুত কর্ম্মী, নিষ্ঠায় সেবায়, অনলস, ভাবে বিভোর, তাঁর কাছে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।

লোকে বলে তাঁর সহকর্ম্মী ব্রজেনের বোন অনিলাই নাকি তাঁর উদ্দীপনার মূল শক্তি ছিল। শিক্ষায় দীক্ষায় তপস্বিনী, মনস্বিনী এই মেয়েটি নাকি শিবেন্দ্রচন্দ্রকে গভীর ভাবে ভালোবেসে ফেলেছিল। কিন্তু তার মধ্যে কোথাও কোন আবিলতা ছিল না, ঘন উষ্ণ স্পর্শের মোহ মাদকতায় কোনদিন তা মাতাল হতে চায়নি। কিন্তু দুইজনের রক্তে যখন একই বান ডাকে, তখন নির্মম প্রকৃতি তার প্রতিশোধ কখনও নেয় বই কি? ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম—পুলিশ তখন কুলিশপাণি হয়ে পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্চে শিবেন্দ্রচন্দ্রের, দু-এক জায়গায় ছোট খাটো অগ্নি বিনিময়ও হয়ে গেছে। হঠাৎ এক গ্রামে এক বাড়ীর ছাদ থেকে পালাতে গিয়ে আহত হয়ে পড়লো শিবেন্দ্র। অনিলাই মৃত্যু তুচ্ছ করে সন্ধান করে তাকে নিয়ে এসেছিল এক নিরাপদ স্থানে।

সেদিন শিবেন্দ্র তাকে প্রশ্ন করেছিলো—একী করছো, অনিলা—তুমি গেরস্ত ঘরের মেয়ে, তায় বয়স হয়েছে, বিয়ে হয়নি, আমাদের মত বামুণ্ডুলে বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্চো কেন? ছিঃ ছিঃ, লোকে বলবে কি—

অনিলা শুধু ডাগর চোখ দুটো তুলে তার দিকে চেয়ে ছিল, জবাব দেয়নি।

শিবেন্দ্র তখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে অনিলার অক্লান্ত সেবায়। সেদিন আকাশভরে বাদলের গুরু গুরু মাদল বাজচে, মাঠ-ঘাট জলে ভর্ত্তি, সামনের নদীটা ফুলে উঠে গজরাচ্চে, তারই দিকে চেয়ে অনিলা অনেকদিন পরে সেতারটা নিয়ে বসেছিল শিবেন্দ্র—আস্তে আস্তে তার পাশে এসে বসলো, বললে—গান থাক্, এসো গল্প করি—

মাথা নীচু করে ছিল অনিলা।

শোনো, এই একমাসে অনেক ভেবে দেখেছি অনিলা, জানো এক-একবার মনে হচ্চে ভুল পথে চলেছি, হিংসায় কিছু সিদ্ধি হয়না, মহৎ কাজ ত নয়ই—

কিন্তু তোমার ব্রত, তোমার আকৌমার্য্যের প্রতিশ্রুতি—লক্ষ্যই আসল, পথটা বড় নয়—পরমহংসদেব যা বলতেন—ছাদে ওঠা নিয়ে হোল কাজ—তোমার কি মনে হয়—

আমারও ঐ কথাই মনে হোত বরাবর—হিংসায় কখনও কিছু হয়?—তা ছাড়া আমরা মায়ের জাত—ভালোবাসাই আমাদের ধর্ম্ম—আমরা স্বামীকে ভালবাসি, ছেলেকে

ভালবাসি, নিজের মনের মাধুরী দিয়ে সংসার গড়ে, নীড় রচনা করি—

হ্যাঁ, নীড়বিরাগী হৃদয় উধাও হোল না বুঝি এতদিনেও—

অনিলা চুপ করে যায়—

শিবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করে—এই যে তুমি দিনরাত এখানে আসো, কাটাও, আত্মীয় স্বজনরা কেউ কিছু বলে না ?

অনিলা বল্লে—বলে না আবার, বলে মা নেই, বাপ বুড়ো, তাই জেলে—মেয়েটা ধিঙ্গী হয়ে নেচে নেচে বেড়িয়ে কুলে কালি দিলে গা—নষ্ট ভ্রষ্ট মেয়েদের রীতিনীতিই এই —সেদিন কুলদা পিসি এসে বাবাকে যা না তাই বলে গেলো—বাবা শুধু বললেন—আমিই স্কুলে সামান্য মাষ্টারী করেছি, ছেলে আর মেয়েকে কিছুই দিতে পারিনি শুধু একটা শিক্ষা ছাড়া। বলেছি ওরে মহাভারতের গল্প পড়েছিস ত কর্ণ কুন্তীর সংবাদ—মদায়ত্তং হি পৌরুষং—জীবনে ঐ বীর্য্যটাকেই জাগিয়ে তোল্—আমার বিশ্বাস আছে, ওরা ঠিক পথেই চলবে—

পিসী মুখনাড়া দিয়েছিল—বলি, ঐ শিবেন ছোড়াটার সঙ্গে তোমার ঐ সোমত্ত মেয়ের এত ঘোরাঘুরি কেন বাপু —কথায় বলে, ঘি আর আগুন—

শিবেন তার শান্ত মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে —আচ্ছা, আমায় তোমার ভয় করে না—

ঈষৎ হাসি হেসে অনিলা জবাব দিয়েছিল—কি যে বলো, তুমি কি দৈত্য দানব না রাক্ষস—

শিবেন গম্ভীরভাবে জবাব দিয়েছিল—না আমি মানুষ—অনিলা বলেছিল—আমি জানি তুমি অন্যায় করতে পারো না—তোমার ব্রত ভঙ্গ হতে আমি দেবো না—শিবেন স্তব্ধ হয়ে বলেছিল—কিন্তু মন্ত্র বদলে যায় যদি…

অনিলা বলেছিল—সে কথা যাক্—তোমার ধর্ম্ম আমি পালন করবো, সেখানেই আমি সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী—তার বেশী দরকার কি—

তার কিছুদিন পরেই শিবেন্দ্র পড়লো ধরা—একেবারে সাতটি বৎসর জেল—অনিলা শুনলো শুধু স্তব্ধ হয়ে—ফিরে গেলো আদালত থেকে বাপের আশ্রয়ে। বাপ শুধু মাথায় হাত দিয়ে বললেন—কি মা, আঘাতটা জোর হোল না ?

এরই পরে আর একটি ঘটনা ঘটলো। তার বাবা একদিন এসে বললেন—একটা কথা বলবো মা, বিয়ে-থা ত তুই করলিনা, শিবেনও কবে ফিরবে জানি না, আমি ভাবছি আয়না, তোতে আমাতে কয়েকটা ছোট ছোট ছেলের ভার নিই, শিশুকাল থেকেই গড়ে তুলি। এমন ছেলে নেবো যাদের বাপ-মা কেউ নেই, আত্মীয়-স্বজনরা ভার নেয়না।

অনিলা উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠে বলেছিল—ঠিক বলেছো বাবা—মেয়েরা যে ছেলে মানুষ করতেই চায়, তাদের কাজই যে ঐ গড়ে তোলা। শুধু রক্ত মেদ-মজ্জা দিয়ে নয়, সমস্ত মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে মায়েরা গড়ে তোলে।

তিনটি শিশু নিয়েই কাজ সুরু হলো। তারই একটি সত্যব্রত। অনাথ শিশু মায়ের আদরেই মানুষ হয়েছে অনিলার কাছে, মা বলেই ডেকেছে, মা বলেই জেনেছে, মা বলেই স্বীকার করে নিয়েছে সমস্ত সত্তা দিয়ে।

কয়েক বছর পরে শিবেন ফিরলো জেল থেকে—জেলের গেটের ধারে দাঁড়িয়েছিল তপঃশীর্ণা এক রমণী ছেলের হাত ধরে। এক যৌবন লক্ষ্মী দেহের সীমানা থেকে বিদায় নিলেও আর এক অপরূপ সৌন্দর্য্য তাকে মহিমময়ী করে তুলেছিল।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছিল অনিলা—প্রণাম করে পদধূলি নিয়েছিলো…

শিবেন একটু ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে শুষ্ককণ্ঠে বলেছিল—কি অনিলা, সব ভালো ত—

কথার ভিতরে উত্তাপ, আবেগ, আকুলতা সব যেন শুকিয়ে গেছে।

চেয়ে রইলো অনিলা তার মুখের দিকে—কি যেন বদল হয়ে গেছে—মানুষটা আছে—মনটা নেই।

শিবেন উসখুস করতে লাগলো, ধরা গলায় বললে—আচ্ছা, চলি, দেখা হবে, তা এটি কে তোমার সঙ্গে—

ততক্ষণে সত্যব্রত অনিলার আঁচল ধরে টানছে—চলো না মা বাড়ী, ভাল লাগছে না—

শিবেন একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার ছেলে, বেশ, বেঁচে থাক্—

অনিলা একটু শক্ত হয়েই বললে—হ্যাঁ, আমার ছেলে, প্রণাম করো ত বাবা—

আদি পর্ব্বের শেষ সেইখানেই। অন্তিম পর্ব্বের সামনে দাঁড়িয়ে সেই কথাগুলোই রোমন্থন করতে লাগলো সত্যব্রত।

সিনেমার চিত্র যেন চোখের সামনে ঘুরছে। তা ছাড়া তার আরও একটা কর্ত্তব্য আছে। মন স্থির করে উঠে পড়লো সে। বেরিয়ে পড়লো—বালীগঞ্জের লেক পল্লীর চওড়া পাড়ায় মোসেইক মার্ব্বেল মণ্ডিত বাড়ীর দিকে, একবার দেখেই আসা যাক্। কাগজেই পড়েছে সে, শিবেন্দ্রচন্দ্র মারা গেছেন রক্তের চাপে। ডাক্তাররা অনেক দিনই নিষেধ করেছিল যে ভোজন কমাতে হবে,নইলে পদবৃদ্ধির সঙ্গে মেদবৃদ্ধি অনিবার্য্য এবং ঐ স্তূপীকৃত মেদের গুরু চাপে শুধু ব্লাডপ্রেসার নয় অনেক কিছু চিন্তামণিকে চিনি জোগাতে হবে। হেসেছিলেন শিবেন্দ্রচন্দ্র—গরীবের ঘরে জন্ম তার—অন্ন বহু ত হয়ইনি, জোটেইনি কতদিন। মনে পড়ে যখন তিনি আহত হয়ে শয্যাগত তখন অনিলাকে বলেছিলেন—অনিলা, কাল আমার জন্মদিন, পায়েস খেতে ইচ্ছে করছে—একটু জোগাড় করতে পারো—

কয়েক রকমের পায়স রেঁধে সেদিন পরিপাটী করে সাজিয়ে থালা ধরে তার সামনে দেবে এমন সময়েই পুলিশ দিয়েছিল হানা—সেই পরমান্নই হয়েছিল কাল—ভোজনবিলাসী শিবেন্দ্রচন্দ্র খেতে বসবে এমন সময়ই পড়লেন ধরা—হয়তো সেই লোভটুকু না থাকলে পালিয়ে গেলেও যেতে পারতেন—অনিলা কাঁদো কাঁদো স্বরে হাত ধরে বলেছিল—মাথা খাও একটু মুখে দিয়ে যাও—আজ তোমার জন্মদিন, নতুন জন্ম তোমারও হোক্ আমারও হোক্। হয়েছিল তাই। সেই পানিগ্রহণই শেষ গ্রহণ।

বাড়ীর সামনে এসে সমারোহের পরিমাণটা সত্যব্রত পরিমাপ করতে পারে। লোকে বলছে—আহা ভোগের শরীর, একটু অনিয়ম সহ্য হয় না,···ইন্দ্রপাত হলো—

কি হয়েছিলো হে, ইদানীং ত ভালই ছিলেন—মিসেস্ ত ক্লাবে সেই কথা বলছিলেন—কন্টিনেণ্ট থেকে ঘুরে এসে নতুন ট্রিটমেণ্টটা বেশ ফলই দিচ্ছিলো। মিসেস্ অবশ্য তার তৃতীয় পক্ষের উনত্রিশ বছরের গৃহিণী সুনয়নী, শুধু আপটুডেট, শিক্ষিতা, সুন্দরী, গ্ল্যামার গার্ল ই নন্—দস্তর মত কলা ও নৃত্যের চর্চ্চা করেন। অবশ্য নিন্দুক কুচক্রীরা ও দুষ্ট দুর্ম্মুখরা পিছনে বলতো যে বান্ধবীমহলে শিবেনবাবু ও শুধু উদ্যোগী পুরুষসিংহ নন্ দস্তরমত পুরুষোত্তম। অনেক তারকার হৃদয়াকাশে অনেক চন্দ্রাবলীর নিভৃত কুঞ্জে অনেক বিশাখা সখীর দুয়ারে তাঁকে দেখা যেতো—প্রকাণ্ড ক্যাডিলাকে যেমন স্টকএক্সচেঞ্জে, মাড়োয়ারীর গদিতে, ক্লাবে কন্টিনেণ্টালে ফার্পোর কমার্স চেম্বারে, কাউন্সিলের মিটিংএ।

গাড়ীতে আলোতে ফুলেতে সমস্ত জায়গাটা যেন উৎসবের জয়জয়ন্তী বাজচে। বড় বড় ছেলেরা ছুটোছুটি করছে, মিনিটে মিনিটে টেলিফোন টেলিগ্রাম চিঠি। সুবেশিনারা আসছে যাচ্ছে ঘুরছে ফিরছে। সত্যই গীতা এরা পড়েছিল বটে—এই বিগতশোক অনুদ্বিগ্নচিত্ত লোকেরা।

ফুল, ফুল—

চন্দন কাঠ অন্ততঃ মণখানেক—হ্যাঁ এখনি—

স্যার এণ্টনিকে খবর দেওয়া হয়েছে—

কেবল গেছে আমেরিকায়—

ইউ পি আইএর লোক এসেছে—

কীর্ত্তনওয়ালারা কই—

নিউজরীলে ছবি নেবার কি ব্যবস্থা হলো—

শেরীফকে বলুন—পরশুই মেমোরিয়াল মিটিং—

দিল্লীতেও যাতে মিটিং হয় তার ভার কার উপর—

ক্যাবিনেটের কনডোলেন্সটা কোথায়—

গরদ, চেলী, জোড়—নতুন খাট, ফুল, ফটোগ্রাফার, খোলকরতালের মধ্যে মৃত্যুর যে অমৃত মহিমা সত্যব্রত দেখলে তার মধ্যে বিশীর্ণ চোখের জলের একটি ক্ষীণধারাও সে খুঁজে পেলে না। স্বয়ং সুনয়নী এসে স্বামীর গলায় শেষমালা পরিয়ে দিয়ে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক করে ফ্ল্যাশলাইটে রিপোর্টারদের ক্যামেরাও দুলে উঠলো। কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রবাহ শশ্মানঘাটের দিকে ছুটলো—

নদীয়ানাথ চলিল আজিকে নদীয়া করি টলমল
হৃদয়রাজ বিহনে হইল নন্দপুর চনচল

সত্যব্রত বোকার মত সঙ্গে সঙ্গে যায়—নন্দপুর ত অন্ধকার দেখাচ্ছে না। শ্মশানবন্ধুদের চোখের জলে বুকের পাঁজর ত ভেসে যাচ্ছে না। মৃত্যুর কালোছায়া কোথাও নেই, এ যে উৎসবমুখরিত উচ্ছ্বাসের আয়োজন! সত্যই এরা সাধক বটে—মৃত্যুর সামনেও অচঞ্চল।

ভাবতে ভাবতে কেওড়াতলার বহ্ন্যুৎসব প্রাঙ্গণে হাজির হলো সেই জনসমুদ্র। কোলাহলের মাঝখান থেকে বেরিয়ে পড়লো সত্যব্রত। তার কর্ত্তব্য এখনও শেষ হয়নি।

আদি গঙ্গার ধারে টালিগঞ্জের ছোট্ট রাস্তা দিয়ে এগুলো সে। হঠাৎ তার হারানো সম্বিৎ সে ফিরে পেলে একটা ভাঙা সুরের প্রশ্নে। আকুলতা ধরা পড়ছে প্রতিটি কথায়।

হ্যাঁগা, কে গেলো গা—কার সর্ব্বনাশ হলো—

চমকে উঠলো সত্যব্রত। এ কণ্ঠ তার বহুদিনের চেনা—এরই কাছে সে যাচ্ছিল যে, অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে সে ডাকলে মা—

কে, সত্যব্রত, আয় কাছে আয়—কে গেলো—

সামনে মধ্যবয়সী বিগত-যৌবনা এক নারী—শান্ত স্নিগ্ধ মহিমায় অচঞ্চল সীমন্তে সিঁন্দুর জ্বলজ্বল করছে—আর চোখ দুটো ছলছল—

চুপ করে রইলো সত্যব্রত। কবছর ধরেই তিনি একা এই পীঠস্থানে থাকেন। সত্যব্রত কতো বুঝিয়েছে—চলো না মা ছেলের কাছে—হেসে তিনি জবাব দিয়েছেন—বিয়ে-করে ঘর সংসারী হবি যেদিন, সেদিন তোদের আশীর্ব্বাদ করে আসবো—

সন্ন্যাসিনীর দু-চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগলো। প্রায় চুপি চুপি বললেন—তাই বুঝি আজ মায়ের মন্দিরে গিয়ে মনে হোল প্রসাদী সিঁদুর কিছুটা চেয়ে লাগিয়ে নিই—সেইখান থেকেই ফিরছি—

অশ্রুধারা আর বাধা মানলো না। হয়তো আকাশস্থ নিরালম্ব বিদেহী আত্মা কিছুটা তৃপ্ত হলো।

মানবতা

শ্রীমুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশুত্ব প্রভাব যেন বাড়ে দিন দিন,
কেঁদে ফিরে মানবতা আশ্রয় বিহীন।
ধনীর প্রাসাদ কিম্বা পর্ণ-গেহ নয়;
চাই মুক্ত-সমুন্নত, প্রশস্ত হৃদয়।

পশুত্বের নখাঘাতে রক্ত কলঙ্কিত—
অসহায় মানবতা সতত শঙ্কিত।
এখনো সে ক্ষীণ বক্ষে পদাঘাত করি'
তিলে তিলে অপমৃত্যু নিতে হবে বরি ?'

অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, চাই—আরো চাই;
এ জীবনে যে চাওয়ার শেষ কভু নাই।
যাহার অভাবে ব্যর্থ সমগ্র জীবন,
তারে হেরি মৃত্যুমুখে, কাঁদেনা ত মন!

আন্দোলিয়া প্রাণ-মন প্রশ্ন জাগে তাই—
গবাক্ষের বাহিরে কি মহাকাশ নাই ?
চাই নাকি হীনতার চির নির্ব্বাসন,
প্রাণে প্রাণে পূর্ণতার অক্ষয়-আসন।

তৃপ্তি

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী

শ্রম-ক্লান্ত দেহ নিয়ে দিবসান্তে গৃহে আসি ফিরে
শ্রান্ত আঁখি মুদে আসে সান্ধ্য ছায়া নামে ধীরে ধীরে
মনে পড়ে ফেলে আসা জীবনের যে কটি বরষ
যারা ছিল একদিন রূপে রসে কত না সরস,
আজ যেন তারা নেই—এ জীবন ধূসর বিফল
বসন্তের গাঁথা মালা তাও যেন আজিকে শিকল,
পুত্র, কন্যা, পরিজন—সর্ব্বোপরি দৈন্য অন্তহীন···
ঢেকে দেছে মুছে দেছে আনন্দের স্মৃতিটুকু ক্ষীণ।

হতাশার শ্বাস ফেলি, পরিপূর্ণ ব্যর্থতার ক্ষোভ
তারি মাঝে উঁকি দেয় এ মাটীর অঙ্কুরিত লোভ।
ক্লান্ত হিয়া সঞ্জীবিত নব বল ফিরে যেন আসে
শঙ্কা যাহাদের লাগি, অঙ্কে বসে তাহারাই হাসে।

আপনার দুঃখ ভুলি, দুঃখ, পাছে এরা দুঃখ পায়
আছে তাই নাই নাই, তা নহিলে অভাব কোথায় ?
ছন্দহীন নিরানন্দ, তারি মাঝে কণা মাত্র সুর
মন বলে এই ঢের, এ জীবনে তাও যে প্রচুর।

মাতৃ-আরাধনায় প্রসাদী-সঙ্গীত

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীশ্রীদুর্গা—বিশ্ব-জননী, বিশ্ব-মাতা, কল্যাণময়ী, দশভুজা। মা আসছেন এ বারতা মধুর লহর তোলে আকাশে-বাতাসে, রাঙিয়ে তোলে শরতের প্রভাত ও সন্ধ্যার টুক্‌রো মেঘ। আগন্তুক আনন্দের জ্যোতি উদ্ভাসিত করে প্রবীণ নবীন তরুণ ও শিশুর চিদাকাশ। কেন? কোন্ অজানা পুরীর সমাচার আনে আগমনীর প্রীতি-গান। ঘরের কথা গায় ভিখারী গায়ক—এসেছিস্ মা থাকনা উমা দিনকত। ব্রহ্মময়ী না কন্যা? কার আগমনী?

সত্যই কি এ লহর ধর্ম্মের প্রবাহ, ওপার ছোটা স্রোত কলিকালকে করতে আসে নিষ্পাপ? কে জানে কার প্রাণে জাগে সে পরমার্থ লাভের চরম চেতনা? জন-সাধারণের আনন্দের উৎস-মুখ হতে নির্গত হয় প্রিয়-মিলনের শুভ বাসনা। বছরের পুঞ্জীভূত গ্লানিকে উৎসব-প্লাবনের স্রোতে বিসর্জ্জন দেবার। ঔৎসুক্য জাগে চিত্তে, নবীন প্রাণ চায় এই শুভদিনে প্রার্থনা করতে শক্তিময়ী মঙ্গলময়ীর বেদীতলে নূতন জীবনীশক্তি লাভের আশায়। দারিদ্র্য, নিরাশা, প্রবলের ভ্রূকুটি, ধনীর ক্ষুদ্রত্ব ভস্মীভূত করে প্রাণের সকল শুভ প্রেরণা দৈনিক জীবনের কুরুক্ষেত্রে। মন চায় রণ-বিরতি—ভাববার অবকাশ, শ্রান্ত প্রাণে। তাই প্রাণ নাচে উৎসবে—নূতন উদ্দীপনা সঞ্চয়ের আবেগে।

কিন্তু মাত্র তেমন সংগ্রহ প্রয়াস তো উৎসবময় করেনা চেতনাকে। কে জানে কোন্ সংস্কার চিত্তের লুকানো ভাণ্ডারে পুঞ্জীভূত করে রেখেছে অজানাকে জানবার বাসনা, কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা, নিজের ক্ষুদ্রতাকে লোপ করবার আহ্বান। আনন্দের দিনে মায়ের মূর্ত্তির দিকে তাকাই। ঋষির পরিকল্পনা মৃত্তিকায় গড়া মূর্ত্তিতে রূপ পেয়েছে। কার মূর্ত্তি? মায়ের মূর্ত্তি। কোথায় নিবাস সে অনন্ত-শক্তিরূপা ব্রহ্মময়ী বিশ্ব-জননীর? সারা বিশ্বে? সে বিশ্বে আমার স্থান কোথা?

ভিখারী গায়ক গেয়ে যায় উষার আলোক-ধোয়া পল্লী পথে—

ডুব দে রে মন কালী ব'লে হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না মেলে
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুল-কুণ্ডলিনীর কুলে।

চমক ভাঙ্গে, ভোরের ঘুম-ঘোর কাটে। সত্যই তো মানুষের হৃদয় রত্নের আকর। রত্ন মেলে হৃদয়ের অগাধ জলে। সে অগাধে নিহিত রত্ন-ভাণ্ডার হ'তেও তো আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়-সাগরের ওপরে ভেসে আসে বিশ্ব-জ্ঞানের টুক্‌রা। সে সন্ধান দেয় রত্নাকরের অতলে নিহিত রত্নের। বিশ্ব-চেতনার সঙ্কেত পাই আমার হৃদয়ে। আমিই তো আমাকে ছোট ক'রে রেখেছি। আবার কানে আসে গানের কথা—

জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন শক্তি-রূপা রত্ন ফলে—

হাঁ! সত্যই তো দুর্গাপূজা শক্তিপূজা। ঋষি-পরিকল্পনায় রচা মূর্ত্তি—শক্তিরূপিণীর। জ্ঞান-সমুদ্রের অগাধ জলে কুড়িয়ে পাওয়া রত্ন দিয়ে গড়া আমার মায়ের মূর্ত্তি। আমিও সন্ধান করি হৃদি-সমুদ্রে মার মূর্ত্তি—কোন্ অনন্ত শক্তির সঙ্কেত। জ্ঞানকে বাড়ালে আমিও লাভ করি বিস্তৃতি। সে পাঠশালায় আমার স্থান।

মুখস্থ করা অস্পষ্ট বিদ্যার অর্থ বুঝি সাধক রামপ্রসাদের গানে। মায়ের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ আলেখ্য সত্যের। সবটা বুঝি না। তপস্যা নাই, সম্যগজ্ঞান নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই। বুঝি সম্ভাবনা। আমার এই দীন অজ্ঞতা, মাত্র কুহেলিকা, যার অপসরণের ব্যবস্থা করতে পারে আমারি হৃদয়-রত্নাকরের অতলে লুকানো বিশ্ব-শক্তি। উপনিষদে বর্ণিত সত্যের অর্থ উপলব্ধি হয়—

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ-জ্ঞানেন
ব্রহ্মচর্য্যেন নিত্যম।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।

শরীরের অন্তরে স্থিত জ্যোতির্ম্ময় নিত্য, শুভ্র আত্মাকে

লাভ করা যায় সত্য, তপস্যা এবং ব্রহ্মচর্য্যাসহকারে। কামাদি-দোষ রহিত শুদ্ধ-চিত্ত যতিগণ তাঁকে দর্শন করেন।

দম-সামর্থের কথাও তো বলেছেন সাধক রামপ্রসাদ। কুল-কুণ্ডলিনীর কুণ্ডলেই তো পাওয়া যাবে—আত্মার সন্ধান।

মায়ের মূর্ত্তি দেখি। মা যে বিশ্ব-শক্তি। দশ-প্রহরণ-ধারিণী দশ দিকে বিস্তৃত তাঁর শক্তি। আমারি হৃদি-রত্নাকরে নিহিত আত্মাই পরম-শক্তি। আমিও তো সেই সূত্রে গাঁথা মণি। বিশ্ব-শক্তি ছাড়া আমি নয়। আমি বাহিরে নই বিশ্ব-শক্তির।

মূর্ত্তির অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় কথঞ্চিত। মূর্ত্তিতে ভাষা ফোটে। ভাষা জাগায় ভাব মনের গভীরে। মায়ের পদতলে শূলবিদ্ধ মহিষাসুর। মৃত্যুর দুয়ারেও তার স্পর্দ্ধার আস্ফালন—জমাটি অজ্ঞতা। এ মহিষাসুরও তো আমারই একরোখা অবুঝ মনোবৃত্তির রূপান্তর। এ পশু-বৃত্তির নিধন না হলে কেমনে সম্ভব নিত্য শুভ্র জ্ঞানের বিকাশ? জ্ঞান-রূপিণী শুভ্র-মূর্ত্তিও যে মায়ের পার্শে বিরাজিত পূজা-বেদীতে। বাণী বিত্তাদায়িনী। শ্বেত শতদল জ্যোতির্ম্ময় তাঁর স্পর্শে। আমারও হৃদি-পদ্ম উঠ্‌বে ফুটে—জ্ঞানের ভাতিতে—এ সঙ্কেত বেদীতে। তখন মনের ময়লা যাবে ছুটে।

মানব-মনের সু-প্রবৃত্তি ও কু-প্রবৃত্তির অন্তিম সমরের সমাচার, চাক্ষুষ জ্ঞানের চিত্র—দুর্গামূর্ত্তি। মানব-মনে বিত্তমান প্রগাঢ় আত্মস্পর্দ্ধা পশু-প্রবৃত্তি প্রতিষ্ঠার। এরাই তো অসুর। এই ঘন স্পর্দ্ধার মূঢ় প্রতীক তো মহিষাসুর—প্রবল এক-মন পশু-শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় পরিচয় দিয়েছেন কতকগুলি প্রধান অসুর শক্তির—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য, অজ্ঞান, হে পার্থ, এরা জন্মাবধি মানুষের আসুরী সম্পদ। এরাই বন্ধনের হেতু।

এ বন্ধন কাটাতে পারা যায় দৈবী-সম্পদের উদ্বোধনে। এই দৈবী-সম্পদে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চির-আয়োজনই তো দেবাসুর সংগ্রাম। মায়ের অনন্ত-শক্তি সকল দৈবী-সম্পদের কেন্দ্রীভূত সার—সে কথা তো বলেছেন শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ঋষি। মায়ের পূজা-মণ্ডপে চণ্ডী-পাঠ হয় গোলমালে। তাই তো বুঝি না। কেহ বোঝায় না। সবাই পূজার আমোদে বিভোর। পুরোহিত ব্রাহ্মণ অনুষ্ঠানকে ত্রুটিবিমুক্ত করতে ব্যস্ত। তাই পূজার আসরেও আধিপত্য করে অসুর—অজ্ঞানের অসুর। ঝাপ্‌সা জ্ঞানের অসুর। ঋষি বর্ণিত—চামর অসুর।

শ্রীশ্রীচণ্ডীপুরাণে অসুর-প্রধানদের স্পষ্ট রূপক বিবরণ নিবদ্ধ। মহিষাসুরের এক সেনাপতি চিক্ষুর—আমাদের মনের সেই অসুর যে সদাই বিক্ষিপ্ত করে মনের শক্তি, ছড়িয়ে দেয় টুক্‌রো মেঘের মত মনের বৃত্তিকে। শুভকামনা এলে তাকে বিক্ষিপ্ত ক'রে লোভের পথে নিয়ে যায় কামিনী-কাঞ্চন লাভের। চামর অসুর ঢেকে রাখে মনকে লোমের ঘন আবরণে—পাছে সত্যের মুখ দেখে মন পায় দৈবশক্তির সন্ধান। উদগ্র অসুরের মাথা সদাই ওপর দিকে। সেই অসুরই তো আমাদের মস্তককে বিকৃত করে বৃথা স্পর্দ্ধায়—পদ-মর্য্যাদার চাকচিক্য দেখিয়ে, সোণা-রূপার মধুর নিক্কণ শুনিয়ে, বৃথা যশের ক্ষণস্থায়ী সঙ্গীতের রেশে। অশিলোম অসুর মনের মধ্যে আধিপত্য করতে সদাই ব্যস্ত—এর প্রত্যেক লোম যেন অসি—রূঢ় ভাষা, বৃথা বড়াই, দুনিয়ার সবার প্রতি হিংসা, সকলকে লোম-খড়্গের খোঁচা দেবার দুষ্প্রবৃত্তি। হিংসা ঈর্ষা পরশ্রীকাতরতার অসুর ভয়ঙ্কর নীচতা জন্মায় চিত্তে। এমন বহু অসুরের বর্ণনা পাই, আমার হৃদয়ে প্রাণ-শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে দিনের পর দিন এই অসুরের দল।

দেব-শক্তি দ্যোতন-শক্তি। দৈবীসম্পদও অভিজাতের জন্মগত সংস্কার। তারা মূর্ত্ত হয় দেব-শক্তির সাধনায়। বিশ্ব-শক্তির অংশীদার আমার মন। গীতা দেব-শক্তির তালিকা দিয়েছেন—

অভয়, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা, দম, দান, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, ঋজুতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরের দোষ প্রচারে আগ্রহ-হীনতা, জীবে দয়া, অলোভ, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ এবং অমানিত্ব। এ সব শক্তিগুলি দৈবী সম্পদ। আমার মনে বিশ্ব-চেতনায় এরাও বিত্তমান আজন্মকাল।

আসুরী বা দৈবীসম্পদে সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের কেমন চিন্তা, কিসে অভিরুচি, তার পরিণাম কি—এসব কথা বিশদভাবে বর্ণিত হ'য়েছে গীতায়।

আমাদের অন্তরে সদাই অনুভব করি দেব-শক্তি এবং আসুরী শক্তির সংগ্রাম। বলা বাহুল্য সংসারী আমরা

সদাই পরাজয় স্বীকার করি অসুরের কাছে। মনে করি বিনয়ী হব, দম্ভের অসুর হয় বিজয়ী। মনে হয় ভোগাভিলাস তুচ্ছ। কিন্তু বাস্কল অসুর হয় বিজয়ী—সে ভোগাভিলাসের অসুর। অহিংসার অমল জ্যোতি রাঙিয়ে তোলে চিত্তকে। হিংসা ভুলে যাই নিমেষের তরে। পরার্থপরতা লাফিয়ে ওঠে। উপলব্ধি করি বৈরিতা আনে শত্রুতা। কিন্তু তখনি বিড়ালাক্ষ মনের অসুরের চোখ ওঠে জ্বলে। সে মিউ মিউ সুরে বলে দিন রাত আমার চক্ষু জ্বলে। শাস্ত্র বলে সম্যক-জ্ঞান, বুদ্ধ ভগবান বলেন, সম্যদ্দিষ্ঠি—সে সম্যক্ দৃষ্টি তো আমার। এ পৃথিবী ভোগ্য আমার। পৃথিবী মুষিক স্ত্রী পুরুষে পূর্ণ। মার্ সব ইঁদুর প্রাণকে। এমনি সব অসুরের কাছে হার মানে আমাদের মত ক্ষুদ্র-শক্তি নরের দেব-শক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে। আমার সাথে আছে সারাবিশ্বের সংযোগ—সে কথা বিশ্বাস করতে অবকাশ দেয় না স্বার্থপর আসুরী শক্তি।

এ সমর চিরদিনের। বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, ভাগবত সবাই সত্যের পথ দেখিয়েছেন এ পুণ্য দেশে। ছান্দোগ্য বলেছেন—

দেবা সুরা হবৈ যত্র সংযেতিরে।

এ সূত্রের অন্তর্নিহিত সত্যে চিত্ত অবহিত হলে জ্ঞানের কপাট খুলে যায়। মার মাটির রূপ প্রাণ পায়—দীপ্ত হয় মনে। এই কথাই বলেছেন ঋষি শ্রীশ্রীচণ্ডী পুরাণে—

দেবাসুরমভূদযুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে।

পূর্ণ এক শতক অব্দ যুদ্ধ। মানব-জীবন শতবর্ষব্যাপী তাই সারা জীবনব্যাপী সংগ্রাম। পুরন্দর হৃদয়পুরের দেবতা—জীবন দেবতা। যুদ্ধক্ষেত্র প্রত্যেকের প্রাণ। আবার রামপ্রসাদের কথায় বলি—এদের সবার সন্ধান পাওয়া যায় হৃদিরত্নাকরে ডুব দিলে, শিবশক্তি উদ্বোধন করলে।

উপনিষদের শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন শঙ্করাচার্য্য—"দেবা দীব্যতের্দ্যোতনর্থস্য শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ।" অর্থাৎ শাস্ত্রোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিই দেবতা।

তিনি বলেন—অসুরাস্তদবিপরীতাঃ। অসুর তার বিপরীতবৃত্তি।

দেবশক্তি চায় ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে শাসন ক'রে, সংযম ক'রে এই নরদেহের শক্তির মাধ্যমেই মোক্ষপথের পরিচয়। অসুর শক্তি চায় উল্টা পথ দেখাতে। কিন্তু মানুষের মধ্যে সুপ্রবৃত্তি এবং কু-প্রবৃত্তি উভয়েই বিদ্যমান আজন্মকাল। এদেশের শাস্ত্র তাদের উভয়কেই মেনে নিয়েছেন—উভয়েই সৃষ্টি লীলায় বিকাশ। চণ্ডী বলেছেন সুকৃতজনের ঘরের যিনি লক্ষ্মী, তিনিই দুরাত্মার ঘরের অলক্ষ্মী। দেবশক্তি এবং আসুরিশক্তি—মায়ের গড়া। তাইতো প্রকৃতি-গড়া জীবদেহে তাদের নিবাস।

য়িহুদী আসুরী-শক্তিকে শয়তান নাম দিয়ে জিহোভারও শত্রু করেছেন। জরাথুস্ত্রও অরিমনকে অসুরমজদার প্রতিদ্বন্দ্বী-শক্তি বিবেচনা করেছেন।

সুর (পাশা মতে অসুর) ও অসুর (পার্শী মতে সুর) চিরদিন দ্বন্দ্বরত সবার মতে। সে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র মন। পূর্ণ শতবর্ষ—অর্থাৎ মনুষ্যের সারাজীবনব্যাপী এ সংগ্রাম। বলা বাহুল্য ব্যষ্টিমন বিশ্বমনের অংশ—তাই সৃষ্টি লীলার সাথে জড়ানো—সুরাসুরের সমর।

শ্রীচণ্ডী বলেছেন—যখন সমস্ত দেবতা অসুর শক্তির দ্বারা চ্যুতরাজ্য হ'লেন মহিষাসুর হ'ল ইন্দ্র। তখন পরাজিত দেবগণ প্রজাপতিকে নিয়ে হরিহরের নিকটে গেলেন। মনোবেদনা জানালেন। কুকর্মে ক্লান্ত হই। বুঝি অসুরের রাজত্বে বাস করছি। তখন আমরা উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করি দেব-শক্তি। শ্রীশ্রীদুর্গামাতা সকল দেব-শক্তির কেন্দ্রীভূত শক্তি। তাঁর দেহে কোন্ দেবতার কোন্ তেজ কোন্ অঙ্গ সৃষ্টি করলেন সে রূপক বর্ণনা বড় মনোজ্ঞ। তাতে খোলে আমাদের জ্ঞানচক্ষু। তারপর মায়ের অস্ত্র। তারাও দেব-শক্তির কর্ম-পথের রূপক। এমন কি শ্রীশ্রীদুর্গামাতার প্রত্যেক আভরণ দেব-শক্তি হ'তে লব্ধ, দেবত্বের প্রতীক।

একটু ধীরভাবে চণ্ডী-পাঠে মনোযোগ দিলে এ রহস্য অভিভূত করে চেতনা। শ্রীসত্যদেব সাধন-সমর গ্রন্থে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন চণ্ডী-তত্ত্বের। ব্যাখ্যা যে ইঙ্গিত মাত্র। সঞ্চয়ের চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ ও দ্যোতনশক্তি উদ্বোধন আবশ্যক।

দুর্গাপূজার আনন্দ বহুগুণ বাড়ে আমরা বুঝলে মায়ের মূর্ত্তির রহস্য, অস্ত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য, আভরণের প্রকৃত রূপের ছটা।

আমরা পূজার দিনের আমোদকে কি সাত্ত্বিক

অনুভূতির আনন্দে পরিণত করতে পারি না? নিশ্চয় পারি। সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজার কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে ব্যবস্থা করলে সত্যই পূজার মণ্ডপ হবে মনের ঘন আঁধার নিরাকরণের মানসে দীপ জ্বালা। তখন অনেক সাধক আবার প্রসাদী গানের মর্ম বুঝবে—

"মন তোমার কি ভ্রম গেল না
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তাই জাননা
কোন্ প্রাণে তাঁর মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে করিস উপাসনা।"

একথা জ্ঞানী সাধকের পক্ষে। তাঁর হৃদয়ে উপলব্ধি হবে এ সত্য মৃত্তিকা মূর্ত্তি পূজার আয়োজন সম্যক বুঝলে। ফুটে উঠেছে গানে বিশাল ভক্তি—যে সহ্য করতে পারে না আরাধ্যকে অনন্তরূপে না দেখা। কবির আরও অভিমান—

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা
কোন্ লাজে সাজাতে চাস তাঁয়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা।

নৈবেদ্য দেব মাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে যেন সাধকের কথা বুঝতে পারে মন। ভ্রম কাটাতে এই গান—

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা।
কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয়
আলো চাল আর মুগ ভিজানা।

আর বলিদান? অন্য গানে ঝাড় লণ্ঠনের ভাবনা হতে বিরত হতে বলে ভ্রান্ত মনকে বলেছিলেন রামপ্রসাদ—

মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে বলি দাও ছয় রিপুগণে।

শ্রীরামপ্রসাদ সাদা চলতি ভাষায় সার সত্যের সন্ধান দিয়েছিলেন বলেই তো শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তখন গাইতেন রামপ্রসাদী গান। তিনিও সাদা কথায় সাধারণ পদার্থ ও কর্মের উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন আমাদের অনন্ত সত্য।

রামপ্রসাদ মায়ের মূর্ত্তির সিংহাসনের সম্মুখে বসে পূজা ক'রে মায়ের সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন বলেই তো মানস পূজায় মায়ের উপস্থিতি উপলব্ধি করতেন। সাধারণ সংসারীকে মনস্থির করতে হয়, পুস্তক পাঠ ক'রে, চিত্র দেখে মূর্ত্তির মাধ্যমে তাৎপর্য্য বুঝে। প্রাচীন ঋষি আত্ম-জ্ঞানের ফলে বলেছিলেন—

ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে পাষাণে ন চ মৃন্ময়ে
দেবো হি বিদ্যতে ভাবে তস্মাৎ ভাবো হি কারণম।

সত্যইতো দেবতা কাষ্ঠে, পাষাণে বা মাটির মূর্ত্তিতে থাকেন না। তিনি থাকেন ভাবে—ভাবই কারণ। কিন্তু এ বিশ্বাস কার জন্য? বিজ্ঞের জন্য। সে কোঠায় উঠে তখন মানস-পূজায় ঘন আনন্দ লাভ করা সম্ভব। বিষ্ণুপুরাণ বলেছেন সেই কথা—

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য শরীরিণঃ
সাধকানাম হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।

সাধকের হিতার্থে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা। অবশ্য তিনি চিন্ময়, অপ্রমেয়, গুণের অতীত।

ঋষি ব্যাসদেব অমূল্য গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবদ রচনা ক'রে ভক্তি-বিনম্র চিত্তে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন অরূপের নিকট। তখন তো তিনি মুক্ত। তিনি বলেছিলেন—

রূপমরূপবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্
স্তত্যানির্ব্বচনীয় অখিলোগুরো-দুরিতম যৎ ময়া
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতম ভগবতো যৎ তীর্থযাত্রাদীনা
ক্ষন্তব্যম্ জগদীশ তদবিকলতা দোষত্রয়ম মৎকৃতম্।

যিনি রূপ বর্জ্জিত ধ্যানে তাঁর রূপ কল্পনা করেছি, যিনি অনির্বচনীয়, স্তুতি করে সেই অখিলগুরুর পাপ অর্জ্জন করেছি, তিনি সর্ব্বব্যাপী তীর্থযাত্রাদি ক'রে সে কথা অস্বীকার করেছি। হে জগদীশ্বর সেই বিকলতা দোষ তিনটি ক্ষমা করুন।

আমাদের বিক্ষিপ্ত মনকে স্থির করতে যদি পারি ক্ষণতরে সেই তো আমাদের পুণ্য। স্বর্গে ওঠবার প্রথম সোপান—মূর্ত্তি-পূজা।

মাগো আজ এই শুভদিনে উদয় হও তোমার সন্তানদের প্রাণে। আদ্যা-শক্তি জননী—মঙ্গল কর, কল্যাণ কর, সবার কর হিত; বিশ্বে বিস্তার করো দেব-শক্তি—নিহত হ'ক মা মানবমনের আসুরী ভাব দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মহা-সমরে।
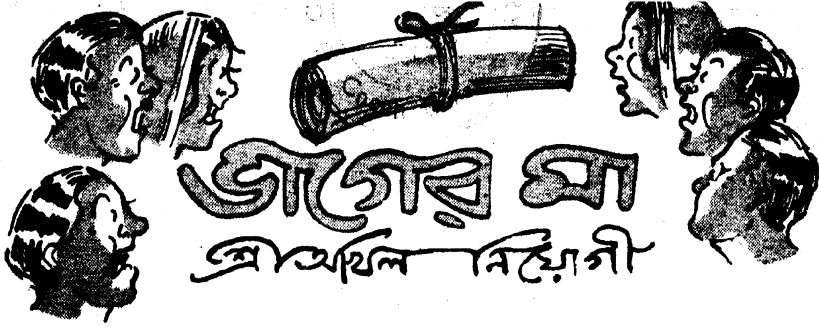
রায়বাহাদুর গৃহিণী জগদ্ধাত্রী দেবীর বয়েস হয়েছে সত্যি, কিন্তু তিনি যে হঠাৎ বিছানায় একেবারে নেতিয়ে পড়চেন—ছেলেরা কিম্বা মেয়েরা কেউই একথা ভাব্‌তে পারেনি!

যতদিন রায়বাহাদুর বেঁচে ছিলেন জগদ্ধাত্রী দেবী দশহাতে সংসারটাকে আগ্‌লে রাখ্‌তেন।

এই পরিবারের আত্মীয়-স্বজন, পোস্য ও অনুগৃহীতজন আড়ালে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত যে, বাড়ীর গৃহিণীর জগদ্ধাত্রী নাম সার্থক। যেমন জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ, তেমনি রায়বাহাদুর সারা জীবন উপার্জ্জন করে এনেছেন—আর জগদ্ধাত্রী দেবী দশহাতে তা জমিয়ে গোটা সংসারে এতটুকু আঁচ লাগ্‌তে দেন নি!

জগদ্ধাত্রী দেবীর হাতে প্রচুর টাকা জমেছে - এই কথা যে শুধু পাড়ার পাঁচ জনেই বল্‌ত তা নয়—আত্মীয়, কুটুম্ব, পরিচিত, অর্দ্ধপরিচিত সকলের মধ্যেই প্রবাদ বাক্যের মতো প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাড়ীর গৃহিণীর কাছে এ সম্পর্কে আলোচনা করবার সাহস কারো ছিল না।

যতদিন রায়বাহাদুর বেঁচে ছিলেন—জগদ্ধাত্রী দেবী—দেবী-জগদ্ধাত্রীর মতোই দশ হাতে দশ দিক রক্ষা করতেন। বাড়ীর অসংখ্য ঝি-চাকর—ঠাকুরেরা কানাকানি করত যে, গিন্নির দাপটে কেনাকাটা বা বাজার খরচ থেকে এক পয়সা এদিক ওদিক করবার যো নেই! ত্রি-নয়নে তিনি সব দিকে দৃষ্টি রাখ্‌তেন এবং দশহাতে সব কিছু সাম্‌লাতেন।

রায়বাহাদুর যখন হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে মারা গেলেন—লোকে হায় হায় করে উঠে বল্লে, ইন্দ্রপতন হল! কিন্তু রায়বাহাদুরের ছেলে-মেয়েদের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল! ছেলেরা এখন সবাই সাবালক, সবাই কৃতী। বড় ছেলে ভারত সরকারের দপ্তরে দিল্লীতে বড় অফিসার। তার নাম নৃপেন। মেজো ছেলে ধীরেন—বোম্বায়ের কোন একটা রসায়নাগারের কেমিষ্ট। সেজো ছেলে বীরেন—আসাম সরকারের অধীনে ইঞ্জিনিয়ার। ছোট ছেলে হীরেন—ডাক্তার। সেই কল্‌কাতার বাসা আগ্‌লে আছে। সত্যি কথা বল্‌তে কি—এই ছোটছেলে হীরেনেরই তেমন পশার জমেনি। বাড়ী ভাড়া গুণ্‌তে হয় না বলে কোনো রকমে সংসার চালাতে পারছে।

স্বামীর মৃত্যুর পর জগদ্ধাত্রী দেবী পালা করে ছেলেদের কাছে থাক্‌তে সুরু করলেন। কখনো দিল্লীতে, কখনো

জগদ্ধাত্রী দেবী

আসামে, কখনো বোম্বাইয়ে, আবার কখনো বা ছোট-ছেলের কাছে কল্‌কাতায়।

যখন তিনি যেখানে থাকেন—ছেলেরা যেন একেবারে

বর্ত্তে যায়। ছেলেবৌরা শাশুড়ীকে পূজোর টাটে কি মাথায় তুলে রাখ্‌বে ঠিক করতে পারে না। যাতে বেশী সময় তাদের বাড়ীতেই জগদ্ধাত্রী দেবী থাকেন সেজন্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই কারো।

এ জন্যে মেয়েরা আবার মুখ ভার করে মায়ের কাছে আবদার জানায়!

—তুমি ছেলেদেরই বেশী ভালোবাসো। মেয়েদের দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারো না! কেন, আমাদের বাড়ীতে এসেও ত' কিছুদিন কাটিয়ে যেতে পারো। আমার ছেলে-মেয়েরা দিদাকে দেখ্‌বার জন্যে একেবারে দিনরাত হাম্‌লাচ্ছে! কিন্তু তুমি এত পাষাণ মা, যে দিনান্তে একবার তাদের কথা ভাবোও না।

এই জাতীয় অভিযোগ আর অভিমানপূর্ণ পত্র জগদ্ধাত্রী দেবী মেয়েদের কাছ থেকে প্রায়ই পেয়ে থাকেন।

জগদ্ধাত্রী দেবীর মেয়ের সংখ্যাও চার। তাদেরও ভালো ঘরে বরে বিয়ে দিয়ে গেছেন রায়বাহাদুর। বাপের মৃত্যুর পর যদিও এখন আর তাদের ঘন-ঘন বাপের বাড়ী আসা হয় না, তবে এ জন্যে তাদের মনে বিশেষ দুঃখ আছে বলে মনে করবার কোনো হেতু নেই! চার ছেলে—আর চার মেয়ে—এদের প্রত্যেকেরই মনের বাসনা—মা এসে তার ওখানেই অধিষ্ঠিত হোক্‌। এত ছুটোছুটি টানা পোড়েনের দরকার কি?

মা কিন্তু নির্ব্বিকার। ঋতু পরিবর্ত্তনের মতোই বিভিন্ন ছেলের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হন। সেজন্যে আবাহন আর বিসর্জ্জনের প্রয়োজন করে না! মেয়েদের শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়ে থাকৃতে জগদ্ধাত্রী দেবীর ভয়ানক আপত্তি! কুটুম্ব বাড়ীর ভাত কি গলা দিয়ে নাম্‌তে চায়? সে ভারী লজ্জার কথা।

তবু মেয়েদের পত্র পাঠাবার কামাই নেই।

মেজো মেয়ে একবার চিঠি লিখ্‌লে, মা, তুমি ত' জানো না, আমার বড় মেয়ে শান্তা কেমন চমৎকার নাচ্‌তে শিখেছে। তোমাকে না দেখাতে পারলে ওর রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না! ও বাড়ীর সবাইকে বলে বেড়ায়, দেখো তোমরা, দিদা আমার নাচ দেখ্‌লে নিশ্চয়ই একটা মুক্তোর হার উপহার দেবে। ছোট মেয়ের মনে দুঃখ দিতে নেই! মাথা খাও, আমার এখানে এইবার একবার অবশ্য আস্‌বে।

সেজো মেয়েও পত্রাঘাত করতে ভোলেনি। সে লিখেছে—মা, তুমি বোধ করি ভুলেই গেছ যে, তোমার নাতি প্রদীপের জন্মদিন আগামী ২০শে শ্রাবণ। প্রতি বছর জন্মদিনে দিদার উপহার না পেলে ওর মন ভরে না! সেকথা ত তুমি জানো মা! আজকাল তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ! আমাদের কেবলি দূরে ঠেলে দিচ্ছ। তোমার জামাই টেলিগ্রাম করতেই বলেছিল। কিন্তু টেলিতে ত' সব কথা গুছিয়ে লেখা যায় না! তাই আমি খামেই লিখ্‌লাম। ও শুন্‌লে কিন্তু ভারী রাগ করবে। আর একদিনও দেরী না করে চট্‌পট্‌ চলে এসো।

আবার ছোট মেয়ের কাছ থেকেও চিঠি আসে। —এখানে কত বড় রাসের মেলা হয়—তা ত' তুমি জানো। দেশ-দেশান্তর থেকে কত আত্মীয়-স্বজন আসে এই রাসের মেলা দেখ্‌তে। তারপর এখানে আমাদের লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে নিত্য-ভোগ হয়। বাবার মৃত্যুর পর তোমাকে ত' কেউ এতটুকু শান্তি দিতে পারল না! কেন মিছি-মিছি হিল্লি-দিল্লী করে বেড়াচ্ছ? সুস্থ দেহকে কেবলি ব্যস্তকরা। তার চাইতে আমার এখানে এসে কিছুদিন কাটিয়ে যাও। ঠাকুর-দেবতা, পূজো-আর্চ্চা নিয়ে থাকো, মনে শান্তি পাবে। তা ছাড়া আমার ছেলেমেয়েরা দিদাকে দেখবার জন্যে পাগল। কতবার লিখ্‌লাম, একটা ফটো তুলে পাঠিয়ে দাও, আমাদের ফ্যামিলি অ্যাল্‌বামে রাখ্‌বো। তা সেদিকে কোনো গরজই নেই! সারাটা দিন যে কি ভাবে কাটে—ভেবে আমি এখান থেকেই হাঁপিয়ে উঠছি। দাদারা সব সায়েব হয়ে গেছে। তাদের সংসারে থেকে তোমার কি এই বয়েসে অনাচার করা সাজে? তুমিই বল না মা!

জগদ্ধাত্রী দেবী মেয়েদের সবগুলি চিঠিই আল্‌গোচে সরিয়ে রেখে দেন। হয়ত একটু মৃদু হাসির রেখা ঠোঁটের কোনে জেগেই আবার তখুনি মিলিয়ে যায়। মনে-মনে নিজেকে প্রশ্ন করেন, এ ভালোবাসা—তাঁর জন্যে—না, তাঁর সঞ্চিত অর্থের জন্যে?

মায়ের অর্থ যে কোথায় লুকোনো আছে—ছেলে-মেয়েরা তার কোনো সন্ধানই জানে না! অথচ সাম্‌না-সাম্‌নি একথা জিজ্ঞেস করবার সাহসও কারো নেই!

জগদ্ধাত্রী, দেবীর সাম্‌নে মুখ তুলে কথা বল্‌তে পারে—ছেলেমেয়েদের এতখানি সাহস এখনো জন্মায় নি।

পেছন দিক থেকে অবশ্য ছেলেবৌরা ছেলেদের প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে, আর জামাইরা দিনরাত মেয়েদের কানে ফুস্‌মন্তর দিচ্ছে! কিন্তু জগদ্ধাত্রী দেবী সে সম্পর্কে একেবারে নির্ব্বিকার। তাই যখন তিনি যেখানে থাকেন সেই ছেলে ছাড়া অন্য সবাইকার অনিদ্রা রোগ দেখা দেয়!

কোনো ডাক্তার কব্‌রেজ, অবধূত—সেই রোগ সারাতে পারে না!

মা যখন কল্‌কাতায় থাকেন—তখনই ছেলেমেয়েদের উদ্বেগ আরো বেড়ে যায়! ছোট ছেলে হীরেনের উপার্জ্জন কম। তাই তার ওপর মায়ের দুর্ব্বলতাটা একটু বেশী। কি জানি, কে বল্‌তে পারে—মা হীরেনের হাতেই যথা-সর্ব্বস্ব তুলে দেবেন কিনা! মার গয়না, কোম্পানীর কাগজ, চা-বাগানের শেয়ার, ব্যাঙ্কের জমানো টাকা—কোথায় যে কী ভাবে আছে ছেলেমেয়েরা কেউ তার হদিশ রাখে না! অথচ বাবা সারা জীবনের সব কিছু মায়ের নামেই করে গেছেন। এই গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া বড় সোজা কথা নয়।

ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কোনো ছেলে কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না! মেয়েরা পরস্পরের দিকে আড়-চোখে তাকায়। বোনেদের মধ্যে যে সহজ প্রীতির সম্পর্ক থাকে—অর্থের উদ্বেগে তা বানচাল হতে বসেছে।

সেই মা যখন কল্‌কাতার বাড়ীতে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন—তখন বিভিন্ন অঞ্চলে সবাইকার চোখ ছানাবোড়া হয়ে উঠ্‌ল।

প্রথমে বিদ্যুতে বাহিত হয়ে উড়ে আস্‌তে লাগ্‌লো টেলিগ্রাম। দিল্লী, বোম্বাই, আসাম থেকে ঘন ঘন তার আস্‌তে লাগ্‌লো উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। মেয়েদের বাড়ী থেকেও খবর নেবার কামাই নেই! সব তারেরই ভাষা প্রায় এক রকম। সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ,—মা কেমন আছেন টেলিতে জানাও।

হীরেন রীতিমত অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। এদিকে মায়ের চিকিৎসা আর শুশ্রূষা করবে—না, ক্রমাগত টেলিগ্রামের জবাব দেবে? দাদা আর দিদিদের টেলিগ্রামের উত্তর দিতে দিতেই না সে ফতুর হয়ে যায়।

হীরেন

মায়ের কিন্তু উন্নতির কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। হীরেন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞার কোনো পন্থাই বাকি রাখ্‌লে না। যে উপায়েই হোক্, মাকে সুস্থ করে তুলতে হবে। হীরেনের রাত-দিন জ্ঞান থাক্‌লো না। অষুধ-পত্র, ইন্‌জেক্‌সন, থার্ম্মোমিটার, অক্সিজেন, নানাবিধ ফল, পেটেণ্ট অষুধ, ডুস, বিবিধ যন্ত্রপাতি, নার্স, সঙ্গী ডাক্তার, আত্মীয়-স্বজনে ঘর একেবারে ভর্ত্তী হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু ছেলের এত চেষ্টাকে উপেক্ষা করে রোগটা যেন বাঁকা পথই ধরল!

তখন আর দূরে থাকা সমীচীন নয় মনে করে একে একে হাজির হতে লাগ্‌লো—ছেলেরা আর মেয়েরা।

এ পর্য্যন্ত সাধ্যের অতিরিক্ত হলেও হীরেন সবাইকে তারযোগে মায়ের খবর সরবরাহ করে এসেছে। শেষকালে যখন বুঝল যে, দায়িত্ব আর সম্পূর্ণরূপে নিজের কাঁধে রাখা উচিত নয়,—তখুনি সকলকে রওনা হতে লিখ্‌লো। বড়ভাই নৃপেন বকাবকি সুরু করে দিলে।

—একি করেছিস্ রে! মাকে যে একেবারে শেষ করে আমায় খবর দিয়েছিস! আমি ভেবেছি, হীরেন ডাক্তার। আমাদের চাইতে সেই ভালো বুঝ্‌বে। চিকিৎসা ওর হাতে ভালো হবে। আগে বুঝ্‌লে,প্লেনে করে আমি মাকে দিল্লীতে নিয়ে যেতাম। সেখানে মেজর ভোঁস্‌লে, ডাঃ ত্রিবেদী আমার সব পার্সনাল ফ্রেণ্ড। বেষ্ট মেডিক্যাল এড আমি দিতে পারতাম! তা নয় কিনা···আরে রাম রাম, ছিঃ!

নাকটা একটু কুঁচকে বড় ভাই তার বক্তব্য শেষ করলে। মেজভাই ধীরেন ফোড়ন দিলে, এ আমাদের হয়েছে ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো। নইলে এই রকম একটা সিরিয়াস্ কেস্ হীরেনের হাতে রাখাই আমাদের ভুল হয়েছে। কেন, কল্‌কাতায় কি ভালো চিকিৎসক নেই?

কুণ্ঠিত ভাবে হীরেন উত্তর দিলে, না না, আমি সব রকম মেডিক্যাল ম্যানের অ্যাড্‌ভাইস্ নিয়েছি। স্পেসালিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা না করে আমি মাকে এক ফোঁটা ওষুধও খাওয়াই নি।

অসহিষ্ণু হয়ে সেজোভাই বীরেন বল্লে, কি চিকিৎসা হয়েছে—তা তুইই জানিস্! কিন্তু আমি ত মার অবস্থা আদপেই আশাপ্রদ বুঝছি নে!

এইবার হীরেন মুখ কাচুমাচু করে উত্তর দিলে, দেখ বড়দা, আমার হাতে যা কিছু ছিল—সব খরচ করে আমি মার চিকিৎসা করিয়েছি। এইবার তোমরা সবাই এসে পড়েছ। যেভাবে তোমাদের চিকিৎসা চালাবার ইচ্ছে তাই চালাও আমাকে রেহাই দাও—

বড়দা বল্লে, তার মানে?

বড়ছেলে

মেজদা বল্লে, তুই কি ইতর হয়ে গেছিস হীরু—

সেজদা বল্লে, কিন্তু মার টাকা? সে সব কোথায়? মায়ের টাকার কথায় সবাই যেন চঞ্চল হয়ে উঠল।

এ ওর মুখের দিকে তাকায়। এর পর যে কি বলা উচিত ঠিক ঠাহর করতে পারে না।

এই অস্বস্তিকর অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠবার জন্যে বড়দা বল্লে, আচ্ছা, সে সব পরে হবে'খন। টাকার দরকার সেকথা আমায় টেলিতে জানাবি ত? এই বলে খস্ খস্ করে একটা মোটা টাকার চেক্ লিখে দিলে।

মেজভাই দেখ্‌লে, সম্মান রক্ষার জন্যে তারও একটা কিছু করা প্রয়োজন। তাই সেও পকেট থেকে নগদ টাকা কিছু বের করে দিলে।

আবার মায়ের চিকিৎসা আড়ম্বরের সঙ্গে চল্‌তে লাগ্‌লো।

দিন দুয়েক একই ভাবে কাট্‌ল।

তখন আবার ওপরের ঘরে গোপন বৈঠক বসল।

বৈঠকে উপস্থিত চার ভাই আর চার বোন।

বর্ত্তমানে বাড়ীর কর্ত্তা হিসেবে বড়ভাইই প্রথমে কথা সুরু করলে।

নৃপেন বল্লে, মা যেভাবে শয্যা নিয়েছেন—তাতে যে আমাদের কিছু বলে যেতে পারবেন এমন মনে হয় না—

ধীরেন মন্তব্য করলে, আরো আগে আমাদের চলে আসা উচিত ছিল। হীরুর খবরের ওপর নির্ভর করাই আমাদের ভুল হয়েছে—

হীরেন মৃদু প্রতিবাদ করে উত্তর দিলে, বারে! তোমরা যা-যা জান্‌তে চেয়েছ—আমি প্রত্যেকটি টেলিগ্রামের উত্তর দিয়েছি। এদিকে মাকে নিয়ে ক্রমাগত রাত জাগা চল্‌ছে। আমি একা মানুষ, কোন দিক সাম্‌লাই বলো—

বীরেন বল্লে, ইতিমধ্যে যা ঘটে গেছে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই—

বড়বোন সবাইকে থামিয়ে দিয়ে মন্তব্য করলে, এখন আমাদের সবাইকার মাথার ওপর খাঁড়া ঝুল্‌ছে। এ-সময় ঠাণ্ডা মাথায় না থাক্‌লে একটা ঝগড়া-বিবাদ হবার সম্ভাবনা—

নৃপেন বল্লে, না—না, ঝগড়া-বিবাদ কেন হবে? আমরা সবাই শিক্ষিত। স্থির হয়ে বসে আমাদের সব কিছু মীমাংসা করে নিতে হবে। বাড়ীর বড়ছেলে হিসেবে আমি হীরুকে জিজ্ঞেস্ করছি,—মার গয়না,

ব্যাঙ্কের পাশ বই, কোম্পানীর কাগজ—সব কোথায় আছে ?

হীরু বল্লে, ভালো রে ভালো! আমি তার কি জানি? আমি আগাগোড়া মার চিকিৎসা নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। তা ছাড়া এ সব ব্যাপার মা আমাকে কিছুই বলেন নি।

বড়বোন বাঁকা চোখে বল্লে, তুই মার কাছটিতে রয়েছিস্ তাই এ সব ত' তোরই জান্‌বার কথা। ভালো করে ভেবে দেখ হীরু—মা হয়ত তোকেই বলে থাক্‌বেন। সাত কাজে হয়ত তুই ভুলে বসে আছিস!

মেজছেলে বল্লে, মার যে রকম অবস্থা দেখ্‌ছি তাতে যে তাঁর জ্ঞান ফিরে আস্‌বে এমন ত' মনে হয় না। কাজেই তিনি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে এর একটা ফয়সালা হওয়া দরকার!

সেজোছেলে মন্তব্য করলে, মা বেশীর ভাগ সময় এই কল্‌কাতার বাড়ীতেই কাটাতেন। কাজেই হীরুর পক্ষেই জানা সম্ভব—যে তাঁর সিন্ধুকের চাবি কোথায় থাকে?

হীরু উত্তর দিলে, একটা বড় চাবি মা অসুখে পড়বার পর আমার হাতে দিয়েছিলেন বটে! কিন্তু সেটা কিসের চাবি আমি তা জানিনে!

মায়ের দেয়া বড় চাবির খবরে সবাই সচকিত হয়ে উঠ্‌ল। ভাইবোনেরা একসঙ্গে বল্লে, দেখি সে চাবি—

হীরু উঠে গিয়ে তার সুটকেস থেকে একটা বড়-সড় চাবি বের করে নিয়ে এলো।

সবাইকার দৃষ্টি সেই দিকে। সত্যযুগের মতো মানুষের চোখের দৃষ্টিতে যদি আগুন থাক্‌ত—তা হলে বোধকরি চাবি শুদ্ধ হীরু একেবারে ভস্ম হয়ে যেতো।

বড়ভাই বাড়ীর কর্ত্তা। তার দাবী সর্ব্বাগ্রে। কাজেই সে এগিয়ে এসে খপ করে হীরুর হাত থেকে চাবিটা কেড়ে নিলে। তারপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, এই চাবি দিয়ে সিন্ধুক খুলে কিছু সরাস নি ত?

হীরু তার বড়দার কথার কোনো উত্তরই দিলে না, জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়ীর গিন্নির সিন্ধুকের চাবি পাওয়া গেছে—এই খবর পেয়ে ছেলে-বৌরাও এসে সেই ঘরে ভীড় করল।

আর সত্যি কথাই ত!

তাদেরও ত' ন্যায্য দাবী আছে শাশুড়ীর জিনিসে। বড়ভাই আস্তে আস্তে গিয়ে সকলের চোখের সাম্‌নে মায়ের বিরাট সিন্ধুক খুলে ফেল্লে। আচম্‌কা আলো পড়তে—ফর্‌ ফর্‌ করে—কতকগুলো আরশুলা বেরিয়ে ঘরময় ছুটোছুটি করতে লাগ্‌ল।

এই কাণ্ড দেখে ভাইবোনদের ত' চক্ষু একেবার স্থির! বৌদের মরা কান্না সুরু করবার উপক্রম!

বড়বৌ

সবাইকার অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি আবার হীরেনের ওপর গিয়ে স্থির হয়ে রইল।

কিন্তু এটা ঘোর কলিকাল—সমবেত দৃষ্টিতে কোনো অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেল না!

এইবার বড়দি এগিয়ে এসে—গোটা সিন্ধুকটা হাত্‌ড়ে একটি উইল বের করলে।

উইল দেখে সকলে আবার ভালো হয়ে নড়ে-চড়ে বসল।

বড়দা উইল খুলে ফেল্লে।

তারপর ভাইবোনদের পড়ে শোনাতে লাগ্‌লো:

"যেহেতু আমার ছেলেরা সবাই কৃতী সন্তান এবং মেয়েদের ভালো ঘরে বিবাহ হইয়াছে তজ্জন্য আমার

স্বামী নগদ অর্থ দান করিয়া তাঁহাদের কৃতিত্ব ও গুণপণাকে খাটো করিতে চাহেন নাই। স্বামীর ইচ্ছানুসারেই তাঁহার পরিত্যক্ত দশ লক্ষ টাকা বিভিন্ন দাতব্য চিকিৎসালয়ে দান করা হইল।”

শ্রীজগদ্ধাত্রী দেবী

উইলে যে তারিখ রয়েছে—তার পর দশ বছর চলে গিয়েছে।

এত সংক্ষিপ্ত উইলের জন্তে কেউই প্রস্তুত ছিল না! ভাইবোনেরা সকলেই একেবারে পাথরের মূর্ত্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইল!

বড়দাই প্রথম এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বল্লে, আমার আর একদিনও ছুটি নেই। আজকেই আমাকে রওনা হতে হবে।

তার পর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বল্লে, এক্ষুণি সব গোছ-গাছ করে নাও। আমি ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি—

বড়দি এগিয়ে এসে বললে, আমার শাশুড়ী বাতে একেবারে পঙ্গু। আমার কি সংসার ছেড়ে দুদণ্ড বাইরে থাকবার যো আছে? নেহাৎ মায়ের অসুখ তাই আসা। আমাকেও আজ্‌কে রওনা হতে হবে—

মেজদা বল্লে, আমার অফিসের এত কাজ যে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। মায়ের অসুখের খবর শুনে ছুটি না নিয়েই চলে এসেছিলাম। এর পর না গেলে—চাক্‌রী নিয়েই টানাটানি হবে—

সেজদা বল্লে, আমার ত' ছুটিই পাওনা নেই। এর পর আর একদিনও থাকা অসম্ভব।

এইবার দিদিরা বল্লে, তাদের অসুবিধের কথা। কার ননদের বিয়ে, কার শ্বশুরের জন্মদিনের উৎসব, কার বা ছেলের পরীক্ষা!

হীরেন চুপ করে সব কথা শুনে গেল। কোনো প্রতিবাদ করল না।

সন্ধ্যের মুখে দেখা গেল বাড়ীতে আর জনপ্রাণী কেউ নেই। সবাই ট্যাক্সি ডেকে যে যার মতো সরে পড়েছে!

সব চাইতে কৌতুকের কথা—নীচের ঘরে এখন মায়ের কি অবস্থা সে কথা কেউ জানে না!

হীরেন মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, সতি কি তাহলে ভাগের মা গঙ্গা পায় না?

দিন-লিপি

গোপাল ভৌমিক

ঘুম ভাঙা আর ঘুমুতে যাবার মাঝে
ঘণ্টাকয়েক কেটে যায় নানা কাজে,
কখনও মানুষ কখনও সঙের সাজে।

রোজ উঠে ভাবি কিছু-না একটা কিছু
ঘটবে জীবনে, দিন হবে উঁচু নীচু:
ঘটেনা কিছুই, প্রতিদিন ছুটি আলেয়ার পিছু পিছু।

মুখ ধোওয়া আর চা খাওয়ার থেকে
দিনান্তে ঘোরা লেকে
অর্থ-বিহীন, বুঝেছি সে-কথা জীবনে অনেক ঠেকে।

অভ্যাস বশে তবু করে যাই
না করলে যে-টা কোন ক্ষতি নাই,
যা পেলে জীবন হত রমণীয় দূরে
থেকে যায় তাই।

এদিকে হৃদয় করে হাঁস-ফাঁস,
অচেনা জগতে এ যে বনবাস,
কৃশ মন করে স্ফীত দেহে পরিহাস।

অফিস বাজার সব করি রোজ,
হাসি মুখে করি অনেকের খোঁজ,
নিজের বেলায় শুধু উপবাস, নিষিদ্ধ মহাভোজ।

অশান্ত মনে করি ছুটোছুটি
জোটাতে দেহের দু' বেলার রুটি,
দেখেও দেখিনা ধূধূ-প্রান্তরে সূর্যের লুটোপুটি।

পরিচালক—উপানন্দ

মাতৃপূজার দিনে

আকাশ মেঘমুক্ত—যেমন সুন্দর, তেম্নি নীল। বর্ষাধারায় দূর হোলো প্রকৃতির সকল রকম আবিলতা, চারিদিকে পড়্‌ছে ঝরে সোনালী আলো। নদী, খাল, বিল আর ডোবার জল কাকের চোখের চেয়েও যেন চক্ চক্ করছে। জলে নেমেছে হাঁসেরা, ওদের মিঠে আওয়াজ আস্‌ছে কানে। সবুজের সমারোহ, তার মাঝে দিগন্তপ্রসারী ধানের ক্ষেত, ধান পেকে উঠ্‌ছে, মাঠে যেন ফলে আছে সোনা। মৃদুমন্দ বাতাসে শতদল ঘুম ভেঙে উঠে করছে সূর্য্য-প্রণাম।......

নদীর স্রোত গতি-মন্থর, ওর বুকে ভেসে চলেছে নৌকা, আবর্ত্তিত জলস্রোতে ভেসে উঠ্‌ছে পানকৌড়ি। তটকিনারায় বক, কাদাখোঁচা আর বুনো হাঁসের ঝাঁক। পাখ্‌না মেলে উড়ে চলেছে বলাকাশ্রেণী। ঝোপের ধারে শালিখ ডেকে গেল।

এখানে নাম্‌লো প্রভাত, বোধনের বাঁশী বেজে উঠ্‌ছে—তোমরা যারা এসেছ আমাদের ঘরে নবীন অতিথি, বেঁধেছ খেলাঘর আমাদের সংসারে, দাঁড়াও এসে মন্দিরপ্রাঙ্গণে নতুন বেশ পরে নতুন আশায়, নবীন উৎসাহে —ফুলের মত তোমরা সুন্দর, মনে তোমাদের অজস্র প্রফুল্লতা। তোমাদের নিয়েই তো মায়ের আনন্দ—জননী জন্মভূমির তোমরা আদরের দুলাল।

বনে বনে হরিৎশ্রী। লতায় লতায় ফুল। কুমুদকহ্লার আর কুসুমের শোভা। কুসুমের বুকে উঠ্‌ছে ভ্রমর গুঞ্জন—পাপিয়া চন্দনা দোয়েল শ্যামা—এরা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। ওদের কূজনধ্বনির মধ্য রয়েছে সকালবেলাকার সুর। কালরাত্রে দেখেছ জ্যোৎস্নার রূপশ্রী, আজ প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের স্বর্ণচ্ছটা আর সন্ধ্যায় দেখ্‌বে হিরণ রেখায় অপূর্ব্ব অনুরাগ। বাংলার আকাশ আলো ঝলমল। আজ আমাদের মনে কে যেন দোল্ দিয়ে যায়! কে যেন গেয়ে ওঠে—'শরতে আজ কোন অতিথি এলো প্রাণের দ্বারে—'

রাখাল চলেছে মাঠে, ওর পেছনে গাভীর দল। শেফালীর সৌরভে পরিকীর্ণ মাঠ ঘাট আর বনবীথি। উৎসবের পটভূমিকায় আসে আমন্ত্রণ পত্র—লেখা আছে—'মা এসেছেন, তোমরা এসো—'

সারা বৎসরে যাদের মুখে ফোটেনি হাসি, আজ মায়ের আগমনে তাদের প্রাণে বেজে উঠ্‌ছে আনন্দের সুর। দ্বারে দ্বারে বাউল গেয়ে চলেছে আগমনীর গান রামপ্রসাদের পদাবলী বুকে নিয়ে।

এদিন তোমাদের কাছে অনেক কথা বল্‌বার ইচ্ছে হয়, অনেক কথা বল্‌বারও আছে—বল্‌বার আগে তবু যেন অনেক কথা হারিয়ে যায়। কতদিন তোমরা আমাদের স্বপ্নের তরঙ্গে দিয়েছ পাড়ি। আজ তোমরা এসেছ আমাদের ঘরে দেহের ভিতরে আত্মার মত। তোমরা কি পেয়েছ অনুকূল আবহাওয়া আমাদের ভালোবাসার আঙিনায়? তোমাদের আমরা কিইবা দিলাম!—উৎসবের দিনে এই কথাই মনে জাগ্‌ছে।...

ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে নেমে আসে অনেক কথা, ওরা মুখর হতে চায়—তবু যেন বাধা পাই, ব্যথা জাগে। কবে রাজা কংসনারায়ণ বাংলা দেশে প্রথম দুর্গাপূজা প্রবর্ত্তন করেছিলেন সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত বহু বৎসর কেটে গেল—আমরা আজও শক্তি আরাধনা করে আস্‌ছি এম্নি ঋতুতে এম্নি তিথিতে বর্ষে বর্ষে। পঞ্চাশ বৎসর আগেও বাংলায় যেরূপ উৎসব সমারোহ ছিল, আজ তা নেই। বর্ত্তমান সমাজের মেরুদণ্ড হীনতা আর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিড়ম্বনা ভোগের ভেতর তবু উপভোগ করি শারোদোৎসবের আনন্দ।

ভাগ্যচক্রে সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত, বাংলার ভৌগোলিক সীমা তেম্নি আছে, নেই তার আজ্‌কের দিনে ভারতের মানচিত্রে পূর্ব্বের মত পরিস্থিতি। রাজনৈতিক অদৃষ্টের দুর্য্যোগে আর স্বার্থসঙ্কটে হারিয়ে গেছে আমাদের জন্মভূমির সীমা, হারিয়ে গেছে 'জীবন সম্পদ' আর প্রাণের ফসল। ফসল তোলার দিনে নেই আমাদের বিশেষ সম্বল।

জন্ম নিয়েছে বাংলার বুকে নতুন রাষ্ট্র, সুরু হয়েছে স্বতন্ত্র কাহিনী, সংস্কৃতি বিকাশের আশাহত পথে লক্ষ্য করা গেল বুদ্ধি ভ্রংশ,—আশা করে আছি তোমাদের পথ চেয়ে জীবনের মালিন্য ও অশুদ্ধি থেকে ত্রাণ পেতে।

স্বল্পপরিসর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আজ তাদের পরমোৎসব, যারা স্বাধীনতার জন্যে দীর্ঘ শতাব্দী ধরে করে এসেছে দুশ্চর তপস্যা, দিয়েছে

আত্মবলি, আর নেপথ্যে রয়েছে অনন্যসাধারণ কর্ম্ম—তাদের বহু রক্তক্ষয়ের মূল্যে এলো স্বাধীনতা—তারা পেলো না স্বদেশকে আর স্বজাতিকে সমগ্রভাবে। বাংলার বৃহত্তম পরিবার ভেঙে গিয়ে হোলো ছন্নছাড়া—সান্ত্বনা এই, স্বাধীনতা লব্ধ হোলো। স্বাধীন বাংলার দুর্গোৎসবের দিনে শক্তি সঞ্চয় করবার জন্যে শক্তি আরাধনা করতে তোমাদের আমন্ত্রণ জানাই—ঐতিহাসিক ব্রতের উদ্‌যাপন করে যেতে হবে, একথাটি স্মরণ করিয়ে দিই।

সাময়িক প্রয়োজনীয়তায় যে বিচ্ছিন্নতা আমাদের অবস্থাকে করেছে জটিল আর করুণ, আমাদের বৃহত্তম বাংলার পরিবারকে করেছে ভগ্ন, আর সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে এনেছে আমাদের অবস্থা-বিপর্য্যয়. সে বিচ্ছিন্নতার খণ্ড খণ্ড সূত্রগুলি দিয়ে যাবো তোমাদের হাতে, তোমরা সেগুলি নিয়ে সৃষ্টি করবে অখণ্ডতা—আগামী ইতিহাসের মধ্যে অপেক্ষা করছে অখণ্ড মিলনের ঐক্যসূত্র, আর তোমাদের মধ্যে অপেক্ষা করছে বাংলার সুমহান ঐতিহ্য আর সুবিপুল মানসিক ঐশ্বর্য্য। বাংলার আশা, বাংলার ভাষা, বাংলার জীবন তোমাদের পানে চেয়ে আছে……তোমরা যারা অধ্যয়নব্রতী ভুলোনা তোমাদের উদ্দেশ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে বাণী দিয়েছেন—

"ছাত্রগণ,

……তোমাদের সেই অনাঘ্রাত পুষ্পের মতো, অখণ্ড পুণ্যের ন্যায়, নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বত বর্গের নামে আহ্বান করিতেছি: দেশের কাব্যে গানে ছড়ায় প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্ব্বণে ব্রতকথায় পল্লীর কৃষিকুটীরে, প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীনচিন্তা ও গবেষণা দ্বারা জানিবার জন্য—শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। এই আহ্বানে যদি তোমরা সাড়া দাও তবেই তোমরা যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে পারিবে, তবেই তোমরা সাহিত্যকে অনুকরণের বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে এবং দেশের চিৎশক্তিকে দুর্ব্বলতার অবসাদ হইতে উদ্ধার করিয়া জগতের জ্ঞানীসভায় স্বদেশকে সমাদৃত করিতে পারিবে।"

আজ বাংলার শক্তি পূজার বোধন-ঘটই হবে তোমাদের পূজার মঙ্গল ঘট, এই আশাই করে আছি। যেখানে আমাদের পরাজয়ের গ্লানি গভীর হয়ে আছে, সেখান থেকেই জন্ম নিচ্ছে তোমাদের জয়ের গৌরব, যেমন করে পঙ্ক থেকে জন্ম নেয় পঙ্কজিনী দেবতার অর্ঘ্য হবার জন্যে।

অখণ্ড বাংলায় একদা যে দুর্গোৎসব হোতো, আজ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আমরা সে উৎসব কোথায় পাবো? তার ভগ্নাংশও তোমাদের দেখাতে পারবো না? দেহের ভিতরে তোমরা অন্তরের মত, তোমাদের যৌবন দিয়ে জাগাবো আমরা আমাদের জীবনের স্বপ্ন, তোমরা এসো—শক্তি পূজায় বসো—জননীর কাছ থেকে বরাভয় নিয়ে বিশ্বজয়ী হও—মরা বাংলায় আবার জোয়ার আনো, মরা বাঙ্গালীকে করো অমর। অতীত ও ভবিষ্যতকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করবার মন তোমরা গড়ে তোলো, বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের মধ্যে সন্ধান করো আমাদের মূলগত ঐক্য যোগসূত্র. তোমরা আমাদের আশা ও ভরসা স্থল—নতুন যুগের নব সৃষ্টির পদধ্বনি তোমাদের যাত্রাপথে শোনা যাচ্ছে—এসো উৎসবে, এসো প্রকৃতি ও মানুষের মহামিলনে, এসো পার্ব্বণ সমারোহে পুষ্পের মত শুচিতা নিয়ে জাগ্রত হও, আর মাকে বলো পূজামণ্ডপে গিয়ে—

'অন্নহারা বস্ত্রহারা সৃষ্টি ছাড়া নিঃস্ব দলে,
এক পলকে আন্ মা ডেকে তোর বরাভয় ছত্রতলে,
কাটিয়ে দিয়ে মনের মসী, টুটিয়ে সকল দৈন্যদশা
সারদে মা, এই শ্মশানে আনন্দ হাট আবার বসা।

আশীর্ব্বাণী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিপুল বিশাল পুণ্য ভারত—
তুলনা নাহিক যার,
জানিও তোমরা সন্তান সবে,
মহিমাময়ী সে মার।
বীর, তেজস্বী, সংযমী হতে হবে,
হও প্রতিভার অধিকারী হও সবে,
ভারত-তনয় গৌরব হবে—
তোমরা যে বসুধার।

সারা বিশ্বের বিস্ময় হও,
শত্রুর হও ভীতি,
লও ভারতের শিক্ষা দীক্ষা
ভারতের রীতি নীতি।
মৈত্রীর জয়যাত্রায় বাহিরাও,
নেবার যা নাও, দেবার যা তুমি দাও,
পুণ্য শুচিতা ভারতীয় বলে
দিক তব পরিচিতি।

শরতের আবাহন

শ্রীকালিদাস রায়

স্বাগত শরৎ আবার মরতে ভারতভূমে
নেমে এসো পুন মুছায়ে ঘুচায়ে মেঘের ধূমে।
এসো তুমি পুন গগনে গগনে জোছনা বানে,
এসো পুন নেমে গহনে গহনে পাখীর গানে।
এসো ফিরে এসো তড়াগে তড়াগে মরাল দলে
স্বচ্ছ সলিলে কুমুদে কমলে নীলোৎপলে।
শেফালি বনের সৌরভে এসো মৃদুল বায়ে,
আসিয়া দাঁড়াও ছাতিম পাতার ছাতার ছায়ে।
এসো ঝিকিমিকি রোদের খেলায়, পাতার ফাঁকে,
এসো চিকিমিকি নদীর বেলায় বকের ঝাঁকে।
এসো কাশবনে গাঙশালিকের মহোৎসবে,
এসো বাঁশ বনে কুহরে কুহরে বেণুর রবে।
এসো ফিরে পুন আমন ধানের চিকণ গায়,
নীহারে নাহিয়া এসো ক্ষেত-ভরা শ্যামলতায়।
ফিরে এসো তুমি গেহে গেহে শুভ শঙ্খ তানে
নব লাবণ্যে দেহে দেহে পুন তোমার দানে।
এসো বনে বনে ছায়া আলোকের আলিঙ্গনে,
এসো মনে মনে নব জীবনের সঞ্চরণে।

আমি যদি পাখী হই

শ্রীসুনির্মল বসু

আমি যদি পাখী হই উড়ে যাই আকাশে,
দূরে দূরে চলে যাই ফুরফুরে বাতাসে।
কোন্‌-ঠাসা হয়ে আর ঘরে বসে থাকিনা,
ছেড়ে চলে যাই এই বাংলার আঙিনা।
বাসা ছেড়ে একদিন শুভ কোন্‌ লগনে—
উড়ে যাই ডানা মেলে সীমাহীন গগনে।
পরোয়া না করি ভাই জঙ্গল পাহাড়ে,
গান গেয়ে উড়ে যাই, ডরাই না কাহারে।
চলে যাই মরুদেশে, বালু যেথা ধূ-ধূ-রে;
বরফের মেরুদেশ দেখে আসি সুদূরে।
দুর্গম অঞ্চল, বিদেশে ও স্বদেশে,
অজ্ঞাত প্রান্তরে, অখ্যাত প্রদেশে।
প্রতিপদে বিপদের যেথা ভয় রয়েছে—
যেথা যেতে মানুষের কত ক্লেশ হয়েছে,
সেই সব দেশে যাই, ভূগোলে যা পড়েছি
মনে মনে যে দেশের কল্পনা করেছি।
সেই সব দেশে যাই ঘর-বাড়ী ফেলিয়া
অসীম আকাশে মোর ডানা দুটি মেলিয়া।

অপেক্ষায়

ভেসে যায়

কিশোর ফটোগ্রাফী

ফটো: উৎপলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৮ বৎসর)

মনিয়া

ডাঃ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি

বিলেত হ'তে শিশু-চিকিৎসায় উপাধি নিয়ে সবে দেশে ফিরেছি। কোথায় কি করবো ঠিক করিনি তখনও। নিজের একটা শিশু-হাসপাতাল খুলবো—এইরকম ইচ্ছাই মনে মনে ছিলো—কিন্তু সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছিলাম না। এমন সময়ে খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি দেখলাম :

"মন্নুরাম শিশু-আরোগ্য-নিকেতন"

বিহার-প্রদেশে পাটনা-জেলার অন্তর্গত বাঢ় নামক স্থানে এই আরোগ্য-নিকেতনটি তৈয়ারী হইতেছে। ইহার জন্য সুযোগ্য শিশু-রোগে বিশেষ-অভিজ্ঞ একজন প্রধান চিকিৎসক চাই। বেতন মাসিক ৫০০৲ হইতে ১০০০৲ পর্যন্ত। বাসস্থান ও সর্বরকম সুবন্দোবস্ত আছে। সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন।"

—আশ্চর্য হলাম। ঐ রকম গ্রাম-জায়গায় এতো মাইনে দিয়ে ডাক্তার চাইছে—নিশ্চয়ই বড়ো ব্যাপার। দেখে আসতে ক্ষতি কি? তাছাড়া স্বাস্থ্যকর নিরিবিলি জায়গা। তাই আবেদন করে দিলাম। কিছুদিন পরেই সেক্রেটারী [illegible] সিংহ মশায়ের কাছ হ'তে নিয়োগ-পত্র চলে এলো। তিনি লিখেছেন—আমি যেন সোজা চলে আসি এবং পাটনায় তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে দেখা করি। ইচ্ছা করলে বাঢ় হয়েও আসতে পারি। সেখানে হাসপাতাল এখন সবে তৈরী হচ্ছে এবং উপস্থিত কিছুদিন এখন আমাকেই সব দেখাশোনা করতে হবে। পরে প্রয়োজন-মতো অন্যান্য ডাক্তার নার্স ইত্যাদি বহাল করা হবে। এখুনি আমাকে ওখানে বিশেষ প্রয়োজন, কেন না গোড়া হ'তেই একজন বড়ো ডাক্তার ওখানে থাকলে চারিদিকে প্রচার হবে এবং কিছু কিছু চিকিৎসার কাজও হাসপাতাল তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে চলতে পারে। ডাক্তারের বাংলো প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে—সুতরাং আমার থাকার কোনও অসুবিধা হবে না। পাটনা আসার পথেই বাঢ় ষ্টেশন পড়বে—যদি নেমে দেখে আসি তাহলে আলাপ-আলোচনায় সুবিধাই হয়।"

মনটা একটু দমে গেলো। এখন কতোদিনে হাসপাতাল তৈরী শেষ হবে—তবে বিছানা (বেড্) পড়বে—রুগী আসবে। ততোদিন কেবল রাজ-মজুর আর ঠিকাদারের সঙ্গে হৈ হৈ করতে হবে। ততোদিনে চিকিৎসা ভুলেই যাবো। যাক্—তবুও বেরিয়ে পড়াই স্থির কোরে ফেললাম।

টাইম-টেবল খুলে দেখলাম—সত্যিই বাঢ় বলে ষ্টেশন আছে এবং সেখানে কয়েকটা এক্সপ্রেস ট্রেনও থামে। রাতে হাওড়া ছেড়ে ভোরেই পৌঁছে যায়। সুতরাং শরতের একটি ভোরে বাঢ়ে পঁহুছিলাম। একটা এক্কা-গাড়ী কোরে ভুট্টা-ক্ষেতের পাশ দিয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে খানিকটা গিয়ে দেখি—এক জায়গায় একটা বড়ো সাইন-বোর্ডে হিন্দীতে লেখা রয়েছে—"মন্নুরাম শিশু-আরোগ্য-নিকেতন।" পাশেই একটি নতুন তৈরী সুন্দর বাংলো। আর তার আশেপাশে অনেক ইঁটের পাঁজা আর ইঁট সাজিয়েই কুলীদের জন্য ছোট-ছোট মাথা গোঁজবার বাসা। তখন সবে তারা উঠছে। আমার পরিচয় পেয়ে ওদের ঠিকাদার এসে আমায় খুব খাতির কোরে সেই নতুন বাড়ীতে একটি চেয়ার এনে বসালো। সেখানে তখনও ঘরগুলি চূণকাম হয়নি—কয়েকটা জানালাও লাগানো বাকী আছে। তবে বাড়ীটি বেশ পছন্দ হলো। বড়ো বড়ো জানালা দিয়ে চারপাশের খোলা শ্যামল প্রকৃতি যেন উদার উন্মুক্ত হাওয়ার ভারে ঘরের মধ্যে ভেঙ্গে পড়চে। ঠিকাদার রামখিলাওন সিংহ বিনয় কোরে—কেবলই হাতযোড় কোরে নানা কথা বলতে লাগলেন—"এখানে হুজুরের কোনও তকলিফ্ (অসুবিধা) হবে না—এ তল্লাটের আপনিই রাজা হবেন। লোকে এখানের ডেপটিকেও এতো সম্মান করবে না। আমাদের যা হুকুম কোরবেন তাই করবো। আপনার এখানে পয়সারও কমি হবে না। তাছাড়া পয়সাই তো সব নয়। আপনার দেশের লোকই তো এই হাসপাতালের জন্য টাকা দিয়ে গেছেন। তুলসীদাসজী বলেছেন যে—সংসারে সেবা যে করে—সেই ধনী—রাজাও তার সমান নয়।"—ইত্যাদি আরও অনেক কথা। গরম দুধ, পুরী ইত্যাদি প্রচুর এলো।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

মাটির মানুষ

ফটো :—রঞ্জন বিশ্বাস
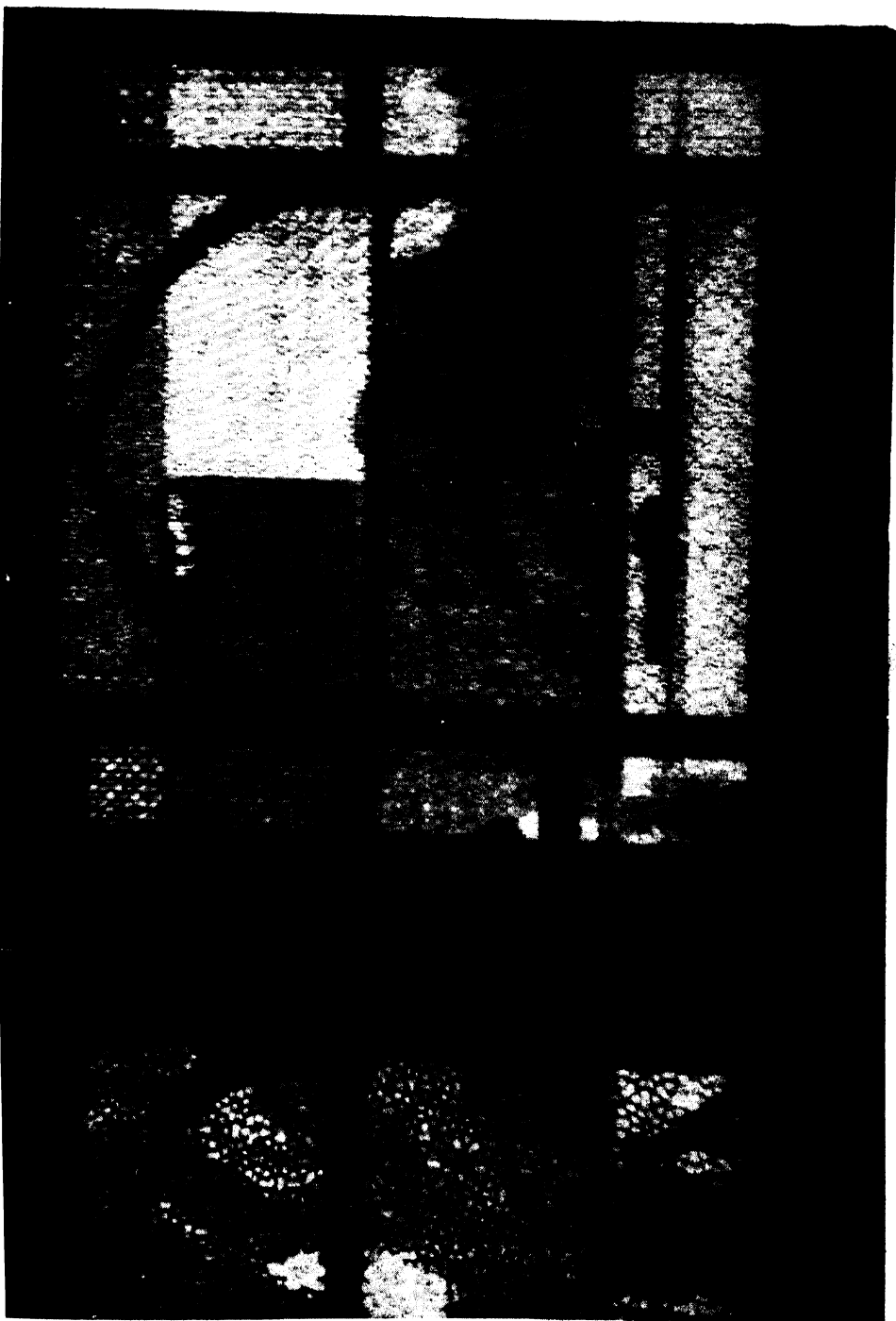
ঠিকাদার বললেন—তিনি চিঠি পেয়েছেন লালবাহাদুর সিংহের কাছ হ'তে যে আমি আসছি—এবং লিখেছেন যেন আমার কোনও অসুবিধা না হয়। আমিই এসবের দেখাশুনো করবো। তাছাড়া কুলী-মজুরদের অসুখ-বিসুখ হ'লে তাদের চিকিৎসার ভাবনা হবে না। আরও লিখেছেন কাজ যেন দ্রুত চলে—ছয়মাসের মধ্যেই হাসপাতালের যথারীতি কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে। পয়সার জন্য আটকাবে না। কুলী-মজুরদের সুখদুঃখ সব তিনি দেখবেন।··· জিজ্ঞাসা কোরলাম—"কে টাকা দিয়ে গেছেন এই হাসপাতালের জন্য ?"

বললে, "কে একজন বাঙালী বাবু—খুব বড়োলোক তিনি—মৃত্যুর সময়ে এই দান কোরে গেছেন। লালবাহাদুর সিংহ তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন—লালবাহাদুর সিংহের ওপরই এ-বিষয়ে যাবতীয় ক্ষমতা ন্যস্ত কোরে দিয়ে গেছেন তিনি। লালবাহাদুর সিংহ বিহারের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ায় নিজে বাড়ে বড়ো-একটা আসতে পারেন না—তবে তিনি এখন এই হাসপাতালের ভাবনা নিয়েই আছেন। আপনি সবই তাঁর কাছে জানতে পারবেন ডাক্তার সাহেব !"

রামখিলাওনের সঙ্গে আর একবার চারদিক ভালো কোরে ঘুরে দেখে নিয়ে আবার স্টেশনে চলে এসে পাটনার গাড়ী ধরলাম। বেলা দশটায় লালবাহাদুর সিংহের বাড়ীতে পৌছলাম। হালফ্যাশনের বিরাট অট্টালিকা এবং কেতাদোরস্ত চাকর-বাকর দেখে তিনি যে একজন বিশেষ অবস্থাপন্ন সম্রান্ত ভদ্রলোক তা বেশ বুঝতে পারলাম। বৃদ্ধ লালবাহাদুর সিংহ স্বয়ং এসে আমাকে অভ্যর্থনা কোরে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং আমার আদর-আপ্যায়ন কোরতে খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। কিন্তু আমি প্রথমেই তাঁকে দুএকটা কথাবার্তার পর বললাম, "দেখুন ! আমি হয়তো এ-কাজ নেবো না—কারণ এখন হাসপাতালের অনেক দেরী—তাছাড়া এখানে রুগীপত্তর তেমন পাবেন কি কোরে বুঝতে পারছিনে। ঐ রকম গ্রাম-জায়গায় এতো বড়ো হাসপাতাল না কোরে সহরে করলেই তো সাধারণের পক্ষে বেশী লাভজনক হতো। আর এখানে তেমন নানান্ ধরণের রোগের 'কেস্'ও পাওয়া যাবে না।" ···এই রকম আরও কয়েকটি অসুবিধার কথা আলোচনা কোরলাম। বৃদ্ধ একটু হতাশ হয়ে পড়লেন—তারপর একটু চুপ কোরে থেকে বললেন—"বেশ ! ডাক্তার সাহেব এখন ওকথা থাক। আপনি আজ আমার এখানেই থাকুন—খেয়েদেয়ে একটু আরাম করুন। তারপর বিকেলে একটু সহর ঘুরে আসুন ! হাসপাতালের কথা এখন ভুলে যান—রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা এ-বিষয়ে ধীরে-সুস্থে আলোচনা কোরব।—কেমন রাজী তো ?" তাঁর স্নেহপূর্ণ ও সম্ভ্রম-যুক্ত কথায় রাজী না হয়ে উপায় ছিলো না।

সুতরাং স্নান-আহার সেরে বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়ে বিকেলে পাটনায় এক বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে গেলাম। বন্ধু পরিতোষবাবু তো যেমন অবাক—তেমনি খুশী আমায় দেখে ! খুব চা-টা, গল্প-সল্প হলো তার সঙ্গে। বললে, "আরে—লোকে বলে ওই লালবাহাদুর নাকি কি রকম কায়দা কোরে করুণা-নিধানবাবুকে দিয়ে ভদ্রলোকের মৃত্যুর আগে উইল করিয়ে নেয়—যে করুণা-নিধানবাবু তাঁর সমস্ত টাকা ও বইপত্রের বিক্রীর লাভাংশ ওই একটা বিদেশী বাজে গেঁয়ো-জায়গায় হাসপাতালের জন্য দিয়ে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে যাবতীয় ক্ষমতাও আবার লাল-বাহাদুরকেই দিয়ে যান। যদিও লালবাহাদুরের সঙ্গে করুণা-নিধানবাবুর যোগাযোগ খুবই গভীর ছিলো এবং কোলকাতাতেও করুণাবাবুর বাড়ীর কাছেই লালবাহাদুরও বাড়ী কোরেছেন বলে তাঁদের দুই পরিবারেও সম্প্রীতি ছিলো অটুট। এই তো বছর দশেক আগে করুণাবাবু এখানে লালবাহাদুরের বাড়ীতে মাসখানেক ছিলেন। সঙ্গে এসেছিলো বড় ছেলের মেয়ে রানটু—তার ওপর দুই বুড়োর আদরের ওজনে একটুও তফাৎ ছিলো না—বোঝা যেতো না কে সত্যি দাদু ! লালবাহাদুর বাংলা লেখাপড়াও ভালো জানেন।···সে যাই হোক্—এ হলো আলাদা ব্যাপার—বৈষয়িক লাভ ক্ষতি এবং স্বার্থের সংঘাত ! করুণাবাবুর ছেলেদের সঙ্গে এ নিয়ে লালবাহাদুরের খুব একচোট মামলাও হলো। কিন্তু লালবাহাদুর হলো পুরানো ঘুঘু লোক—দুই পুরুষে জজ ! সে সব হাঙ্গামা সামলে নিয়ে এখন তো বছর-দেড়েক হ'তে হাসপাতাল তৈরী কোরতে লেগে গেছে। জানো ভাই অরুণ ! ব্যাপারটা খুবই জটিল।"

মনটা একেবারেই দমে গেলো। এক রকম স্থির কোরেই ফেললাম যে বৃদ্ধের কোনও কথাতেই আসব না। ফিরে এসে রাতে আবার সেই রকম ভূরি-ভোজন ও আদর-আপ্যায়নের মধ্যে পড়লাম। লালবাহাদুর স্বয়ং তদারক করতে লাগলেন পাশে বসে, আর নানান্ খোশ গল্প করতে লাগলেন। বিলেতে তিনিও তিন বৎসর ছিলেন। তখনকার দিনের বিলেত আর ভারতীয়দের সাহেবিয়ানার চেষ্টা—আর তার নানারকম হাস্যকর পরিণতির কথা বলে হাসতে ও হাসাতে লাগলেন। লোকটিকে বেশ ভালোই লাগছিলো।

যাই হোক খাওয়া-দাওয়ার পর বৃদ্ধের নিজস্ব বসবার ঘরে গিয়ে দুজনে বসলাম। ভৃত্য কফি দিয়ে গেলো। বৃদ্ধ নিজ হাতে এক পেয়ালা আমার জন্য ঢেলে দিলেন ও আর এক পেয়ালা নিজের জন্য ঢেলে নিয়ে—দু এক চুমুক দিয়ে রেখে দিলেন। দুহাত কোলের ওপর জড়ো কোরে রেখে কিছুক্ষণ যেন কি ভাবতে লাগলেন—সহসা তিনি খুব শান্ত ও উদাস হয়ে গেলেন যেন। তারপর আস্তে আস্তে চুরুট ধরালেন। সব চুপচাপ। পর্দা-ঠেলা দোরের পাশে কেবল একজন ভৃত্য দাঁড়িয়েছিলো—কখন কি দরকার হয় দেখবার জন্য। লালবাহাদুর তাকে যেতে ইসারা কোরে মৃদুস্বরে বললেন,—"ডাক্তার সাহেব! আমি আপনাকে একটা গল্প বলছি—শুনুন!" তাঁর মুখে একটি পরম কোমল মমতার ভাব ফুটে উঠলো।···বৃদ্ধের হাতের চুরুট হ'তে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগলো। বৃদ্ধ বলতে লাগলেন :—

"বছর চারেক আগে অঘ্রাণের কাছাকাছি—শীত তখন সবে জাঁকিয়ে বসচে—এমন সময় একদিন সকালেই এক 'তার' এসে হাজির কোলকাতা থেকে—পরম বন্ধু করুণা-নিধানের তার—'পত্র পাঠ এসো—অত্যন্ত প্রয়োজন—অন্যথা করিও না।' বেশ বিপদে পড়ে গেলাম—কেন না বাতের ব্যথায় তখন বড়ই কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু উপায় নেই।···আকৈশোর বন্ধু আমরা। হয়তো তার শরীর খুব খারাপ হয়েছে। মাস তিনেক মাঝে কোনও খবর পাইনি বটে। আমার সঙ্গ চাইছে কোন প্রয়োজনে—ভাবতে লাগলাম। অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো করুণা? বছর খানেক তাকে দেখিনি—মনও খুব চঞ্চল হয়ে পড়লো, তাই সকালের ট্রেণেই বেরিয়ে পড়লাম। রাতে করুণার বাড়ী পৌঁছে শুনলাম সে খুব অসুস্থ—হার্টের অসুখ। তখন সে ঘুমুচ্ছে···দুপুরে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলো—ও বলেছে যেন আমি এলেই তাকে জানানো হয়। হাতমুখ ধুয়ে সামান্য কিছু খেয়ে আমি ওর ঘরে গিয়ে ওর মাথার কাছে সোফায় বসলাম। একটু পরে করুণা আপনিই চোখ মেলে যেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চারিদিকে চাইলো। তারপর আমার ওপর নজর পড়তেই স্থির দৃষ্টিতে আমায় দেখতে লাগলো। আমি ঝুঁকে পড়ে ওর হাতটা আমার হাতে নিলাম। করুণার মুখে যেন একটা শান্তির হাসি ফুটে উঠলো—অতি মৃদুস্বরে আমায় বললে—'সকালে কাজের কথা হবে ভাই—।'···

···সকালে চায়ের পরে করুণার ঘরে এসে দেখলাম সেখানে অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত হয়েছেন। করুণা পাণ্ডুর মুখে, চুপ কোরে চোখ বুজে শুয়ে আছে। আমি ওর মাথার কাছে গিয়ে বসলাম—মনটা বেদনার্ত হয়ে উঠেছিলো। নার্স ওর কানে-কানে বললে,—'লালবাহাদুর এসেছেন।' করুণা চকিতে চোখ চেয়ে আমায় দেখে খুব আস্তে আস্তে বললেন—'লালবাহাদুর ও সমবেত ভদ্রবৃন্দ। আপনাদের আমি একটু কষ্ট দিলাম। আমি মুমূর্ষু হয়ে পড়েছি—একটা 'উইল' কোরতে চাই।··· লাল! তুমিই লিখে নাও—মিঃ চ্যাটার্জি! আপনিও এদিকে আসুন—মিঃ চ্যাটার্জি আমার 'সলিসিটর!'··· করুণা একটু থামলেন—আমায় কে একজন একটা কাগজ আর কলম এগিয়ে দিলো। করুণা আবার বলতে লাগলেন—'আমি করুণা-নিধান বন্দ্যোপাধ্যায় সজ্ঞানে ও সম্পূর্ণ সুস্থ চিত্তে আমার সম্পত্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করছি। আমার এই বাসভবনটি, ভবানীপুরের বাড়ীটি ও পৈত্রিক রাঁচীস্থ বাড়ীটি এবং জমিজমা ও যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি আমার দুই পুত্রকে সমান অংশে দিয়ে গেলাম। কেবল আমার ব্যাংকে এবং ইন্সিওরেন্সে যা ধন আছে—প্রায় দেড়লক্ষ খানেক মনে করি—আর আমার বইপত্র বিক্রীর যা লাভাংশ হবে—তা আমি একটি দাতব্য শিশু-চিকিৎসালয়ের জন্য দিয়ে গেলাম। এই চিকিৎসালয়ের নাম হবে—"মনুরাম শিশু আরোগ্য নিকেতন" এবং এটি স্থাপিত হবে বিহার প্রদেশের পাটনা লাইনে বাঢ় নামক

স্থানে। এ সম্বন্ধে যাবতীয় ক্ষমতা ও ভার আমি আমার বন্ধু লালবাহাদুর সিংহের ওপর ন্যস্ত কোরলাম—সকলের সম্মুখে সজ্ঞানে আমি এই উইল করলাম।" এতোখানি কথা বলে করুণানিধান চুপ কোরলেন—খুব হাঁফিয়ে পড়েছিলেন। সকলেই খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। করুণার একজন বন্ধু বললেন,—"করুণা এটা তুমি ভেবে-চিন্তে বলেছ তো? তোমার এ সমস্ত ইচ্ছার কথা তো আমরা কেউই এতোদিন জানতাম না। বাঢ় কোথায়? পৈত্রিক ধনে তোমার ছেলেদের বঞ্চিত কোরে যাচ্ছ?—পথে বসলো ওরা।" করুণার দুই ছেলের কাছে বম্বে ও দিল্লীতে তার গিয়েছিলো—তখনও তারা এসে পৌছায়নি—বাড়ীতে কেবল করুণার বড়ো পুত্রবধূ ও তিনটি নাতি-নাতনী। তার একমাত্র মেয়েও এসেছিলো শ্বশুরবাড়ী হ'তে! করুণার স্ত্রী তিন বৎসর আগে মারা গিয়েছিলেন—সুতরাং করুণার এ উইলের বিশ্লেষণ করবে কে তখন? চ্যাটার্জি সাহেব আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি এ বিষয়ে কোনদিন কিছু শুনেছিলেন?" আমি নিজেই অবাক হয়েছিলুম উইল শুনে—বললাম—"না, এরকম কথা এর আগে ওর মুখে কখনও শুনিনি—অবশ্য বছর খানেক আগে ওর কাছে এসেছিলাম। বাঢ় অবশ্য জানি—পাটনার কাছে একটি ছোট জায়গা—সেখানে এই হাসপাতাল কোরে কি হবে বুঝ্‌তে পারছি না।"

ভদ্রলোকদের অনুরোধে আমি আবার করুণার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আস্তে বললাম—"ভাই করুণা—আমরা সকলেই তোমার উইলে আশ্চর্য হয়েচি। এই কি তোমার শেষ সিদ্ধান্ত? আর কিছুই তোমার কি বলবার বা ভাববার নেই?" করুণানিধান এবার আমার দিকে দু'চোখে চেয়ে স্পষ্ট বললেন—"না!" সকলে স্তব্ধভাবে উইলে সই করা শেষ করলো। এরপরে সকলেই একে একে চলে যেতে করুণানিধান ইঙ্গিতে আমায় কাছে এসে বসতে বললেন—নিভে-আসা কণ্ঠস্বরে অতি ধীরে বললেন, "ভাই লাল! তুমি আমার এ কাজটা কোরবে! হয়তো অনেক বাধা পাবে কিন্তু তুমি তা কাটিয়ে উঠবেই। আমার কথাবলার শক্তি আর নেই—তবে এটা স্থির জেনো—আমি এ হঠাৎ খেয়ালের বশে করছি না—এতো পরিষ্কার মাথা আমার খুব কম সময়েই থেকেছে। এ উইল আমার অন্তরাত্মার উইল……এবার তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি!" আমি অনুভব কোরলাম করুণার স্পর্শ আমার হাতের মধ্যে যেন আরও নিবিড় হয়ে এলো। আমি আর কিছু বলতে পারলাম না—কেবল বললাম, "কিন্তু এতো জায়গা থাকতে বাঢ় নির্বাচন করলে কেন ভাই? আর ঐ নামটি কার?" করুণার চোখ দুটি হঠাৎ বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো—কি যেন বলতে গিয়ে বলতে পারলেন না—তারপর একটা গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর দুই চোখ নিবিড় প্রশস্তিতে মুদে এলো। আর তাঁর হাত আমার হাতের মধ্যে কেমন নির্জীব হয়ে এলো।……তারপর আর কি! করুণানিধান চলে গেলেন।

—তারপর আমি পাটনা ফিরে এলাম। খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম বই-বিক্রীর টাকা করুণানিধানের প্রায় বছরে কুড়ি-পঁচিশ হাজারের কাছাকাছি। বিলেতে কয়েকটি বই ওর খুব চলছে। আমার অন্যান্য অধ্যাপক বন্ধুদের কাছ হ'তেও শুনলাম—ওর নাকি পরে আরও নাম হবে। করুণানিধানের দার্শনিক চিন্তার মূল্য দেশ-বিদেশের লোকে উত্তরোত্তর আরও নাকি দেবে। সুতরাং হাসপাতাল ভালোভাবেই চলবে—তাছাড়া এরকম বিরাট একটা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে বিহার সরকার হ'তেও কিছু সাহায্য আদায় কোরতে পারবো। এই সব নানা চিন্তার পর তোড়-জোড় কোরে তো কাজে নামলাম—কিন্তু প্রথমেই বাধা। করুণার ছেলেরা মামলা শুরু কোরে দিলো উইলের বিপক্ষে। ওদের উকীল বললে যে করুণানিধান মৃত্যুর সময়ে সুস্থমস্তিষ্কে ছিলেন না। কারণ বাঢ়ে হাসপাতাল স্থাপনের মতো এমন অসম্ভব কল্পনা কেহই করতে পারেন না এবং তাছাড়া বাঢ়ের সঙ্গে ওর কোনোকালেই কোনও সম্বন্ধই ছিলো না।

(আগামী বারে সমাপ্য)

অনেক আগের পূজোর ছুটি

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

অনেক আগের পূজোর ছুটি পড়ছে মনে আজ।
সেদিন ছিল দেশ পরাধীন, ছিল বৃটিশরাজ।
যুদ্ধ কোনো বাধেনি তাই শান্তি ছিল দেশে।
লোকের মনে তৃপ্তি ছিল পরিশ্রমের শেষে।
বাজার ছিল সস্তা, ছিল সবার মুখে হাসি।
ছুটি হ'লেই রেলগাড়ীতে লোকের ঠাসাঠাসি!
হাজার হাজার নৌকো ছাড়ে নদীর ঘাটে ঘাটে;
হাজার হাজার গরুর গাড়ী, সঙ্গে মানুষ হাঁটে।
গ্রামের পূজো, দেশের পূজো, খুসি সবার মনে।
সেদিন কোথায় হারিয়ে গেছে কোন অতীতের কোণে!

রাঁচী, পুরী, ওয়াল্‌টেয়ার ভরত লোকের ভিড়ে।
চেঞ্জে যাবার লোভে সবাই ছাড়ত শহরটিরে।
কলকাতাটা লাগ্‌ত সেদিন বেজায় খালি চোখে।
ধনীর বাড়ী পূজো হ'ত, দেখ্‌ত বাড়ীর লোকে।
প্রতিবেশী পেতনা ঠাঁই নিমন্ত্রিতের মাঝে।
সেদিনের সে অবহেলা কতজনের বাজে।

আজ্‌কে চাকা ঘুরে গেছে, সবেরি দাম চড়া।
স্বাধীনদেশে নতুন ধারায় নতুন আমোদ করা।
নৌকো যত, রেলগাড়ী সব আজ ভরা যে ভিড়ে,
শহরমুখী সবাই, আসে গঙ্গানদীর তীরে।
পাড়ায় পাড়ায় সার্ব্বজনীন আলোয় আলোয় সাদা।
সিনেমা দিন করেছে রাত, চোখে লাগায় ধাঁধা!

আজ্‌কে যত পূজোর আমোদ কৃত্রিমতার মাঝে
রঙ্‌বেরঙের কাপড়চোপড় রঙ্‌বেরঙের সাজে।
আনন্দ গান চতুর্দ্দিকে, আলোয় আলো সবি।
তবু ভালো লাগ্‌ছে আমার সেই সেদিনের ছবি—
ফিকে চাঁদের আলোয় মাঝি নৌকো চলে বেয়ে;
সন্ধ্যাতারা আছে যেন মায়ের মতন চেয়ে;
মন্দিরেতে ঘণ্টা বাজে; তীরে একটি ছুটি
জল্‌ছে আলো। বছর পরে এলো পূজোর ছুটি।
ছুটির কদিন কাট্‌ত ভালো আপন জনের মাঝে।
আজো কাণে সন্ধিপূজোর ঘণ্টা যেন বাজে।

শান্তি ছিল বাংলাদেশে, নেই যেটা আজ।
একটি কেবল দুঃখ ছিল, ছিল বৃটিশরাজ।

ঘড়ির কাঁটা

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

ঘড়ির কাঁটায় আটটা বাজে,
চোখের কাঁটায় রাত বারো।
ঘড়ির কাঁটায় চোখের কাঁটায়
এমন অমিল হয় কারো?
সন্ধে হলো। জললো আলো।
পড়ার ঘরে বই খুলে
পড়ছে খোকন উচ্চ সুরে
আহার নিদ্রা সব ভুলে।
পরক্ষণেই—ব্যাপারটা কি?
ঘরটা কেন রাত-নিঝুম?
বইতে রেখে ক্লান্ত মাথা
ঘুমায় খোকন অঢেল ঘুম।
হচ্ছে কিগো খোকন সোনা,
এর নাম কি বই পড়া?
ধড়মড়িয়ে আঁত্‌কে উঠে
জুড়বে পড়া সুর-করা।
শুধাও যদি: খোকনমণি,
সবে তো রাত আটটা।
এরই মধ্যে ঘুমাও তুমি?
বলবে হেসে: ঠাট্টা!
ঘড়ির কাঁটায় আটটা বাজে,
কথা তোমার সত্যি।
চোখ-ঘড়িতে বাজলো বারো,
মিথ্যে নয় একরত্তি।

চোখ যদি হায় কাজ করে যায়
নিজের ঘড়ি ধরে,
তোমার ঘড়ির সময় দিয়ে
রুখবে কেমন করে ?

—

মা-লক্ষ্মী জব্দ !

(বাঙলার অতি-প্রাচীন রূপকথা)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এক বামুন আর বামনী। বামুন ভারী গরীব। ভিক্ষা করে বামুন যা পায়, দিন আর তাতে চলে না। দুজনে একদিন যদি কিছু খায় তো,তার পর তিনদিন উপোস করে কাটে। গাঁয়ে ভিক্ষাও রোজ মেলে না। বামুন-বামনী ভগবানকে ডাকে—বলে, আর কিছু চাই না ঠাকুর—শুধু একবেলা করে দুটি খেতে পাই যেন।

গরীবদের এ ডাক ভগবানের কাণেও যায় না—বামুন আর বামনীর দুঃখও ঘোচে না।

দেশের রাজা এক মস্ত বাজার তৈরী করেছেন। রাজার ঢ্যাঁড়ায় ঘোষণা হলো দিকে-দিকে এ বাজারে যারা জিনিষপত্তর বেচতে আসবে, দিনের শেষে কোনো জিনিষ বিক্রী না হয়ে যদি মজুত বাকি থাকে, তাহলে রাজার সরকার সে-সব জিনিষ কিনে নেবে—কিনে রাজার ভাণ্ডারে তা জমা দেবে। তা যে-জিনিষই হোক—নোটে-পালং শাক থেকে হাতী-ঘোড়া পর্য্যন্ত।

ঢ্যাঁড়া শুনে বামনী বামুনকে বললে—ডাঁটিশুদ্ধ কতকগুলো কলাপাতা জোগাড় করে আনো, আর সেই সঙ্গে মাটীর একটা বড় হাঁড়ি।

বামুন ঘুরে ঘুরে ডাঁটিশুদ্ধ ক'খানা কলাপাতা আর একটা মাটীর ভিজেল হাঁড়ি নিয়ে এলো। বামনী তখন কলাপাতার ডাঁটিগুলো নিয়ে কুচি কুচি করে কাটলো —কেটে সেই ভিজেল হাঁড়িতে ভরে হাঁড়ির মুখ কলাপাতা দিয়ে মুড়ে কলার ছেটো দিয়ে মজবুত করে বাঁধলো—বেঁধে বামুনকে বললে—এই হাঁড়ি নিয়ে বাজারে গিয়ে বসো। কেউ যদি বলে—কি বেচতে এনেছো ? তাহলে বলবে—আমাদের যত দুঃখ-দুর্দ্দশা বেচতে এনেছি ! যদি বলে, কত দাম ? তা বলো এক হাজার টাকা—তার এক পয়সা কম দিলে চলবে না !

হাঁড়ি নিয়ে বামুন এসে বাজারে বস্‌লো। বাজারে কত খদ্দের এসেছে, কত জিনিষ কিনছে। বামুনকে দেখে তারা বললে—তোমার হাঁড়িতে কি আছে গো ? কি এনেছো বেচতে ? বামুন বলে—আমার হাঁড়িতে আছে আমাদের যত দুঃখ-দুর্দ্দশা—নেবে ? এক হাজার টাকা দাম !

শুনে খদ্দেররা শিউরে সরে যায়, বলে—দুঃখ-দুর্দ্দশা আবার নতুন করে কে কিনবে ? একেই নিজের নিজের দুঃখ-দুর্দ্দশা নিয়ে জ্বলে-পুড়ে মরছি—তার উপর আবার নতুন করে পরের দুঃখ-দুর্দ্দশা কেনা !

হাঁড়ি নিয়ে বামুন সারাদিন বসে রইলো—কেউ তার দুঃখ-দুর্দ্দশা কিনলো না।

দিনের শেষে বাজার ভাঙছে—দোকান-পশারীর দল টাকা গুণে গেঁজেয় ভরে যে যার বাড়ী ফিরছে—রাজার সরকার এলো তার পাইক পেয়াদা নিয়ে—কার কি জিনিষ বিক্রী হলো না, রাজার তরফ থেকে কিনে রাজার ভাণ্ডারে জমা পাঠাবে—

বামুনকে দেখে সরকার বললে—কি ঠাকুর—তোমার হাঁড়িতে কি আছে—বিক্রী হলো না ?

বামুন বললে—আমার হাঁড়িতে আছে আমাদের যত দুঃখ-দুর্দ্দশা—রাজার বাজারে বেচতে এসেছি—তা কেউ কিনলো না।

শুনে সরকার বললে—দুঃখ-দুর্দ্দশা কি কেউ সখ করে কেনে ঠাকুর যে তুমি এসেছো তাই বিক্রী করতে।

বামুন বললে—আজ্ঞে, এ ছাড়া আমাদের এমন কিছু তো নেই যা বিক্রী করে দু-পয়সা পাবো ! তা বিক্রী হলো না যখন—কথাটা বামুন শেষ করলো না···সরকার বুঝলো। রাজার ঢ্যাঁড়া দেওয়া আছে, যার যে জিনিষ বিক্রী হবে না রাজা তা দাম দিয়ে কিনবেন। আর এ বাজারে তাই হয়ে আসছে রোজ। তা বলে দুঃখ-দুর্দ্দশা কেনা ? তাই তো।

সরকার বললে—তুমি বসো ঠাকুর—তোমার দুঃখ-দুর্দ্দশা বিক্রী হলো না—মহারাজের হয়ে দাম দিয়ে এ জিনিষ

কেনা—এমন জিনিষ বিক্রীর কথা কখনো শোনা যায়নি তো—তা মহারাজকে একবার কথাটা বলি গিয়ে···

সরকার এলো ঘোড়ায় চড়ে রাজার কাছে, এসে রাজাকে বললে, বামুনের কথা।

শুনে রাজা বললেন—তা হোক—আমি যখন কথা দিয়েছি—বাজারে বেচতে এসে যার যে জিনিষ বিক্রী হবে না—পড়ে থাকবে, আমি সে জিনিষ দাম দিয়ে কিনবো—তখন আমার সে কথার নড়চড় হতে পারে না। বামুন যখন তার দুঃখ-দুর্দ্দশা বেচতে এনে বেচতে পারেনি, তখন ওর ও দুঃখ-দুর্দ্দশা কিনতেই হবে। না হলে সত্য ভঙ্গের পাপ হবে। তুমি যাও, দাম দিয়ে ওর দুঃখ-দুর্দ্দশা কিনে নিয়ে এসো।

সরকার ফিরলো বাজারে—ফিরে বামুনকে বললে—বেশ, মহারাজ কিনবেন তোমার এ দুঃখ-দুর্দ্দশা। তা এর জন্য দাম দিতে হবে কত?

বামুন বললে—এক-হাজার টাকা। তার এক পয়সা কম হলে চলবে না।

এক হাজার! শুনে সরকারের দু চোখ যেন ঠিক্‌রে পড়লো! সরকার বললে—একে তো দুঃখ-দুর্দ্দশা কেনা—তার জন্য দাম দিতে হবে এক-হাজার টাকা। তুমি পাগল হায়ছো, ঠাকুর···

বামুন বললে—হুঁ—না মশাই, পাগল আমি নই। এর দাম দিতে হবে এক হাজার-টাকা!

মুস্কিল তো! সরকার আবার এলো রাজার কাছে—এসে হাতজোড় করে বললে—দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্য বামুন দাম চায় মহারাজ—এক-হাজার টাকা।

শুনে রাজা বললেন—যে দাম চায়, তাই দেবে। না হলে সত্য-ভঙ্গের পাপ হবে।

সরকার আবার এলো বাজারে। এসে বামুনকে এক-হাজার টাকা দাম দিলে—দিয়ে বামুনের হাঁড়ি নিয়ে রাজপুরীতে ফিরলো—রাজা বললেন—ভাণ্ডারীকে হাঁড়ি দাও—ভাণ্ডারে যেমন সব জিনিষ জমা থাকে, তেমনি এ হাঁড়ি জমা থাকবে।

এরপর একদিন যায়—দুদিন যায়—তিনদিনের দিন, তখন অনেক রাত—পুরী নিঝুম নিস্তব্ধ—সকলে ঘুমোচ্ছে—রাজার কিছুতে আর ঘুম হয় না। মাথা দপদপ করছে—বিছানা ছেড়ে রাজা এলেন ঘরের বাহিরে যে বড় বারান্দা, সেই বারান্দায়। আকাশে এক-ফালি চাঁদ···চাঁদের জ্যোৎস্না পড়েছে চারিদিকে—সে জ্যোৎস্নায় রাজা দেখেন—পুরী থেকে একটি মেয়ে—পরণে ঝক্‌ঝকে জরির শাড়ী—গায়ে গহনা, মুখে মস্ত ঘোমটা···মেয়েটি পা টিপে টিপে চলেছে পুরীর দেউড়ীর দিকে! কে? কে ও মেয়ে? রাজা বেশ চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কে? কে তুমি? মেয়েটি সাড়া দিলে না—ফিরেও তাকালো না—যেমন যাচ্ছিল তেমনি চলেছে।

রাজা তখন প্রায় ছুটে নীচে নেমে এলেন। মেয়েটি তখন দেউড়ির সামনে—রাজা এসে বললেন—কে তুমি?

মেয়েটি দাঁড়ালো···বললে—আমি এ পুরীর লক্ষ্মী! রাজা বললেন—এত রাত্রে পুরী ত্যাগ করে কোথায় চলেছেন মা লক্ষ্মী?

মা-লক্ষ্মী বললেন—পুরীতে আর কি করে থাকি বলো? তুমি কার দুঃখ-দুর্দ্দশা কিনে পুরীতে এনেছো—যেথানে দুঃখ-দুর্দ্দশা সেখানে আমি থাকি না—থাকতে পারি না তো।

রাজা বললেন—কিন্তু আমি সত্য রক্ষা করেছি, মা লক্ষ্মী! কথা দিয়েছি, বাজারে যারা জিনিষ বিক্রী করতে আসবে, তাদের সে জিনিস যা বিক্রী হবে না, আমি সে জিনিস দাম দিয়ে কিনবো—তা যে জিনিষই হোক। কাজেই আমি বামুনের দুঃখ-দুর্দ্দশা কিনে সে কথা রক্ষা করেছি,—ও জিনিষ না কিনলে আমার সত্যভঙ্গের পাপ হতো। এ জিনিষ কিনে আমি কোনো পাপ করিনি যখন—তখন আপনি কি বলে আমার পুরী ত্যাগ করে যাবেন?

মা-লক্ষ্মী বললেন—তবু যেতে হবে, মহারাজ। কেন না দুঃখ-দুর্দ্দশার সঙ্গে লক্ষ্মী এক পুরীতে কথনো থাকে না। কাজেই আমায় যেতে হবে মহারাজ।

রাজা বললেন—বিনা-পাপেও আমাকে যদি ত্যাগ করে যান—কি করবো, উপায় নেই। তা বলে সত্যভঙ্গ করবো না আমি।

মা-লক্ষ্মী চলে গেলেন। রাজা শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, মা-লক্ষ্মীকে আর কোনো কথা তিনি বললেন না।

পরের দিন রাত্রেও রাজার ঘুম হচ্ছে না…রাজা এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। দাঁড়াতেই দেখেন, সুন্দর সুপুরুষ এক ব্রাহ্মণ পুরী থেকে চলেছেন দেউড়ির দিকে! রাজা নেমে এসে তাঁকে বললেন—আপনি কে?

ব্রাহ্মণ বললেন—আমি হলুম ধর্ম্ম।

রাজা বললেন—এত রাত্রে পুরী ত্যাগ করে কোথায় চলেছেন।

ধর্ম্ম বললেন—এ পুরী আমি ত্যাগ করে যাচ্ছি। লক্ষ্মী যে জায়গা ছেড়ে যান—আমিও সে জায়গায় থাকি না। লক্ষ্মী যেখানে গেছেন, আমিও সেই জায়গায় যাচ্ছি।

রাজা বললেন—কিন্তু আমার অপরাধ? আমি পাপ করিনি, অধর্ম্ম করিনি, আপনি কি বলে ত্যাগ করে যাবেন?

ধর্ম্ম চট্ করে একথার জবাব দিতে পারলেন না—ভাবতে লাগলেন।

রাজা বললেন—বুঝেছি, আমি ঐ বামুনের দুঃখ-দুর্দ্দশা কিনে পুরীতে এনেছি, তাই আপনি চলে যাচ্ছেন। কিন্তু ও দুঃখ-দুর্দ্দশা কিনে আমি সত্যরক্ষা করেছি—আপনারই মান রেখেছি। আমি যদি না কিনতুম, তাহলে আপনার অপমান করতুম—আমার অধর্ম্ম হতো। এর জন্য আপনি আমাকে কিছুতে ত্যাগ করে যেতে পারেন না—যদি যান, আপনি তাহলে ধর্ম্ম হয়ে অধর্ম্ম করবেন!

ধর্ম্ম বললেন—রাজা ঠিক কথা বলেছেন! তিনি খুশী হলেন, বললেন—তুমি ঠিক কথা বলেছো, মহারাজ—আমি এ পুরী ত্যাগ করে গেলে আমার মহা-অধর্ম্ম হতো। ত্রিভুবনে কেউ তাহলে আর ধর্ম্মকে মানতো না। তুমি আমাকে খুব রক্ষা করেছো। আমি এ পুরী ত্যাগ করে যাবো না।

এ-কথা বলে ধর্ম্ম দেউড়ি থেকে ফিরে পুরীতে ঢুকলেন, রাজা চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে পুরীতে ফিরবেন হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ শুনলেন। ফিরে তিনি দেখেন, মা-লক্ষ্মী পুরীর দেউড়িতে।

রাজা বললেন—মা-লক্ষ্মী! আপনি ফিরে এলেন।

মা-লক্ষ্মী বললেন—হ্যাঁ মহারাজ। আমাকে ফিরতে হলো, কেন না, ধর্ম্ম যেখানে থাকেন, সেখানে আমাকে থাকতে হবে। ধর্ম্মকে যে মানে, সে কখনো লক্ষ্মীছাড়া হতে পারে না। যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই লক্ষ্মী! আমার ভুল হয়েছিল মহারাজ, তাই চলে গিয়েছিলুম। পরের দুঃখ-দুর্দ্দশার ভার যে নিতে পারে তার মতো ধার্ম্মিক আর কেউ নেই। তুমি যতদিন ধর্ম্মকে এমনি মেনে চলবে—তোমার পুরী থেকে আমার যাওয়ার সাধ্য থাকবে না—কখনো আমি এ পুরী ত্যাগ করে যেতে পারবো না।

এর পর থেকে রাজার সুখ আর ঐশ্বর্য্য দিনে দিনে বাড়তে লাগলো—রাজার পুণ্যধর্ম্মে রাজ্যে প্রজাদেরও আর কোনো দুঃখ-দুর্দ্দশা রইলো না।

চাঁদমারির বাড়ী

নরেন চক্রবর্ত্তী

মোটরটা ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল একটা ছোট মাঠের সাম্‌নে। অবনী বল্‌লে—এইখানেই আমাদের নামতে হবে মৃণাল। মাঠটা ছোট ছোট আগাছায় ভর্ত্তি, তার ওপর দিয়ে কিছুতেই গাড়ী নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। মাঠটা পেরলেই আমাদের সেই চাঁদমারির বাড়ী। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই মাঠটা সাহেবদের বন্দুক ছোঁড়া শেখবার জন্যে ব্যবহার হতো, তাই এর নাম হয়েছিল চাঁদমারি। তারপর বাড়ীটা তৈরি হতে তার নাম হয়ে গেল চাঁদমারির বাড়ী।

মৃণাল চার ধার ভাল করে দেখে নিয়ে বল্‌লে—জায়গাটাতো বেশ ভালই মনে হচ্ছে ছোট মামা। সকলে কেন যে বাবাকে বাড়ীটা কিন্‌তে বারণ করছে তার তো কারণ খুঁজে পাই না। এই মাঠটাও বাবা কিন্‌বেন বলেছেন, তাহলে কি সুন্দর হবে বলতো বাড়ীটার বাহার! মাঠের একপাশে থাক্‌বে টেনিস লন, এক পাশটা হবে বাগান। মধ্যে থাকবে কাঁকর বিছান চওড়া রাস্তা, তার ওপর দিয়ে চল্‌বে আমাদের গাড়ী। কল্‌কাতার এত কাছে, এমন সস্তায় এরকম একটা বিষয় পাওয়া আমার তো মনে হয় মস্ত একটা দাঁও।

অবনী বল্‌লে—বাড়ীটা তো এখনো চোখে দেখনি, অথচ এমন লাফাচ্ছ?

মৃণাল হেসে বল্‌লে—তোমার কাছে শুনে শুনে বাড়ীর ছবিটা আমার মনে আঁকা হয়ে গেছে। চল ছোট মামা এগোনো যাক্।

অবনী ড্রাইভারকে বল্‌লে—শরত, তুমি গাড়ীটা বন্ধ করে আমাদের সঙ্গে এস, আর ফ্লাস্কটাও অমনি নিয়ে এস। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে, একটু ভিজে যেতে হবে, পৌঁছেই এক কাপ কফি খাওয়া যাবে।

মৃণাল বল্‌লে—ছটা বেজে গেছে ছোট মামা। তাড়াতাড়ি কিন্তু

ফিরে যেতে হবে, বসুশ্রীতে ন'টার শোর টিকিট কেনা আছে মনে থাকে যেন।

শরত ফ্লাসক্ নিয়ে ফিরে এলে তিনজনে বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল, আর এক ঝলক বিদ্যুতের সঙ্গে বৃষ্টিটাও সেই সময় চেপে এল। মৃণাল দেখ্‌লে—সাদা একতলা বাড়ী—একতলা বটে কিন্তু বেশ উঁচু। সামনের রাস্তাটা চওড়া নয় বটে, কিন্তু ওই মাঠটা দখলে এলেই সে অসুবিধা থাক্‌বে না।

অবনী বল্‌লে—হাঁ করে আর বাইরে দাঁড়িয়ে থেকো না মৃণাল, বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়ি চলো। ভিজে একেবারে মেয়ে গেলুম।

শরত হেসে বল্‌লে—বাবুকে ধরে বাড়ীটা কিনে ফেলুন দাদাবাবু। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসবার খুব ভালো জায়গা হবে।

মৃণাল বল্‌লে—বাবার তো খুবই ইচ্ছে, কিন্তু মেয়েরা বড্ডো বেঁকে বসেছেন। তাঁরা বলেন—বাড়ীটা বড় অপয়া। তাইতো আমি নিজে দেখ্‌তে এলুম।

শরত জিজ্ঞাসা করলে—অপয়া কেন দাদাবাবু?

মৃণাল বল্‌লে—পিসিমা কোথা থেকে শুনেছেন যে, যে ভদ্রলোক এই বাড়ীটা তৈরি করান তিনি নাকি বেশি দিন ভোগ করতে পারেন নি, আর মৃত্যুও হয় আকস্মিক। সেই মৃত্যুর সঙ্গে কি যেন একটা রহস্যও জড়িয়ে আছে।

অবনী ততক্ষণে সদর দরজার চাবিটা খুলে ফেলে ডাক্‌ছে—ভেতরে ঢুকে পড়ো—ভেতরে ঢুকে পড়ো। ভিজে একেবারে জাব্ হয়ে গেলুম।

সকলেই ভেতরে ঢুকে পড়লো।

মৃণাল বল্‌লে—জামাগুলো খুলে একটু দালানে ছড়িয়ে দেওয়া যাক্। এখনি শুকিয়ে যাবে। শরত একটু কফি ঢালো ভাই, শীত শীত লাগছে।

কফি ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে শরত জিজ্ঞাসা করলে—রহস্যের কথা কি বল্‌ছিলেন দাদাবাবু?

মৃণাল বল্‌লে—যিনি বাড়ীটা তৈরি করেছিলেন তিনি নাকি সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে এক অপরিচিত লোককে বাড়ীর ভেতর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখেন। দেখ্‌বার পরই সেই লোকটা নাকি অদৃশ্য হয়ে যেতো। আর তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতো না। একদিন এমনি এক বর্ষার সময় সেই ভদ্রলোক—

অবনী বল্‌লে—এখন গল্প রাখো। পায়ে যেরকম কাদার ছিটে লেগেছে, এমনি বসা যায় না। চল, উঠোনে একটা কুয়া আছে জানি, হাত পা পরিষ্কার করে এসে কাফি খাওয়া যাবে আর তোমার গল্প চল্‌বে।

আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে। বৃষ্টির ধারাও সমানে বর্ষণ হচ্ছে। অবনী, মৃণাল আর শরত উঠানের দিকে এগিয়ে যেতেই শরত চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—কে, কে ওখানে দাঁড়িয়ে? টর্চটা বার করুন দাদাবাবু—শিগ্‌গির টর্চটা বার করুন।

টর্চ জ্বল্‌লে দেখা গেল—এক বৃদ্ধ উঠানের প্রান্তে একটা চালার নিচে দাঁড়িয়ে, একেবারে দেওয়ালের গা ঘেঁসে, যেখানটায় সব চেয়ে বেশি অন্ধকার।

টর্চের আলো বৃদ্ধের পায়ের ওপর পড়তে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। অতি নোংরা ছেঁড়া একটা কাপড় তার পরণে, খালি গা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, অত্যন্ত রোগা আর খুব লম্বা তার চেহারা। অবনী জিজ্ঞাসা করলে—কে তুমি?

সে বল্‌লে—আজ্ঞে, আমি ভীমসেন।

মৃণাল হেসে বল্‌লে—কলির ভীম কিনা, তাই চেহারা এই রকম পাকিয়ে গেছে।

ভীমসেনও হেসে ফেল্‌লে। বল্‌লে, আজ্ঞে বাবুরা, ছেলেবেলায় আমি খুব মোটা ছিলুম, আর খেতেও পারতুম খুব, সেইজন্যে সকলে ভীমসেন বলে ডাক্‌তো, সেই থেকে এই নামই চল্‌তি হয়ে গেল—ভীমসেন হালদার।

অবনী বল্‌লে—কিন্তু, বাবা, ভীমসেন! তুমি হঠাৎ এ বাড়ীতে ঢুকেছ কেন?

ভীমসেন বল্‌লে—আজ্ঞে বাবুরা, আমার ঘরটা দিনকতক হ'লো ঝড়ে পড়ে গেছে, এখনও মেরামত করে উঠতে পারি নি। তাই আজ্ঞে, বাড়ীটা খালি আছে বলে এইখানেই ক'দিন আছি। তবে হুজুর, ওই কোঠা দালানে কখনো উঠিনা, এই চালাটাতেই পড়ে থাকি।

অবনী মৃণালকে বল্‌লে—এ যেন একটা রহস্যের পূর্ব্বাভাষ বলে মনে হচ্ছে। বাড়ী তালাবন্ধ অথচ তারি মধ্যে এক বুড়ো জরাজীর্ণ ভীমসেন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে। এ যেন তোমার গল্পের ফ্ল্যাশ্ ব্যাক্ ছবি হচ্ছে মৃণাল।

ভীমসেন উত্তর দিল—আজ্ঞে বাবুরা, খিড়কির দরজাটা ভেঙে পড়ে আছে কিনা, সেই পথ দিয়েই আমি এসেছি বাড়ীর ভেতর। কি করবো বাবু, আর যে কোথাও জায়গা পাই নি।

শরত চেয়ে দেখ্‌লে পেছনের দেওয়ালে একটা ছোট দরজা রয়েছে বাইরে যাবার, তার একটা পাল্লা খুলে উঠানে পড়ে আছে। শরত চেয়ে রইলো সেই ভাঙা পাল্লাটার দিকে। কি যেন সে ভাবছে।

ভীমসেন জিজ্ঞাসা করলে—হুজুররাই কি এ বাড়ীটা কিনেছেন?

মৃণাল বল্‌লে—কেনা হয় নি এখনো। তবে কেনার মতলবে আছি।

ভীমসেন বল্‌লে—কিনে ফেলুন বাবু, খুব ভাল বাড়ী। তবে দয়া করে এই চালাটার নীচে আমাকে কিছুদিন থাক্‌তে দেবেন। বর্ষা কাটলেই আমি ঘরটা ঠিক করে নেব, আর এখানে থাক্‌বো না।

মৃণাল বল্‌লে—তার জন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই ভীমসেন, যদি বাড়ীটা কেনাই হয়, তবে বরাবরই তুমি এখানে থেকে যেতে পারো, তাতে আমাদের কোন আপত্তি হবে না। এখন, তুমি যদি একটু উপকার কর আমাদের—বড্ড অন্ধকার হয়ে গেছে, একটা যদি আলো এনে দিতে পারো!

ভীমসেন বল্‌লে—আপনারা হাতপা ধুয়ে ঘরে বসবেন চলুন বাবুরা। ঘরের মধ্যে লণ্ঠন আছে, কিছু পয়সা দিন, আমি তেল কিনে এনে এখনি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

ভীমসেন তেল কিনতে গেল। অবনী মৃণাল আর শরত হাতপা ধুয়ে সামনের ঘরটায় এসে ঢুকলো। ঘরটা বেশ বড়, চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজান, টেবিলের ওপর একটা ল্যাম্প রয়েছে।

বাড়ীর মালিক আসবাব সমেত বাড়ীটা বেচবেন।

মৃণাল বললে—ছোটমামা আমার কিন্তু বেশ লাগ্‌চে।

অবনী বললে—কিন্তু অন্ধকারে ভীমসেনকে দেখে বেশ লাগিনি নিশ্চয়।

মৃণাল হেসে বললে—এই ভাবেই তো লোকে ভূত দেখে।

শরত বললে—লোকটা কি সব সত্যি কথাই বললে দাদাবাবু?

মৃণাল বললে—দায়ে ঠেকে এসেচে এটাতো বোঝাই যাচ্ছে। কি সোনাদানা এখানে আছে যে তাই চুরি করতে আসবে? কাঠ কাটরার জিনিষ এরা ছোঁবেও না।

খানিকটা সময় এইভাবে কেটে গেল।

অবনী বললে—লোকটা তেল আন্‌তে এত দেরি করছে কেন বলতো? শরত একটু এগিয়ে দেখ্‌বে নাকি?

শরত বললে—আমিও সেই কথা ভাবছি মামাবাবু। যে রকম ঘুটঘুটে অন্ধকার, তায় আবার অজানা জায়গা, বাড়িটাও খালি পড়ে রয়েছে অনেকদিন—সাপ বিছেও তো থাক্‌তে পারে। আমি বরং একটু এগিয়ে দেখি।

এমন সময় ভীমসেন পৌঁছে গেল, তার গা দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরছে। বললে—তেল যে পাওয়া গেল না বাবু মশাইরা। যে দুর্য্যোগ, দোকানী দোকানে ঝাঁপ ফেলে দিয়ে বাড়ি চলে গেছে।

শরত বললে—অন্য দোকানে দেখ্‌লে পারতে বাপু, এখন এই অন্ধকারে কি করি বলতো? যা বৃষ্টি আর সাঁই সাঁই ঝড়ের আওয়াজ, বাবুরা যে বাড়ী যাবেন তারো কোন উপায় নেই। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বলা যায় না।

ভীমসেন বললে—আজ্ঞে, এ তল্লাটে দোকানতো ঐ একটাই কিনা, অন্য দোকান আছে পোয়া তিনেক পথ তফাতে, এত বৃষ্টিতে যাই কেমন করে বলুন।

মৃণাল বললে—থাক্‌ না শরত, এতো বেশ লাগ্‌চে। কতক্ষণই বা থাক্‌বো, বৃষ্টিটা একটু ধরলেই বেরিয়ে পড়বো। ততক্ষণ এই টর্চেই চলে যাবে।

মৃণাল টর্চটা জ্বেলে চারিদিক দেখ্‌তে লাগ্‌লো। টর্চের আলো গিয়ে আটকালো একটা বড় অয়েলপেন্ট ছবির ওপর—বেশ সুপুরুষ চেহারা বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন। মৃণাল জিজ্ঞাসা করলে—এটি কার চেহারা ছোটমামা?

জবাব দিল ভীমসেন—আজ্ঞে উনিই এ বাড়ীর প্রথম মালিক। আজ্ঞে বাবু-মশাইরা উনিই এ বাড়ী তৈরি করেছিলেন। তা আপনারা কি এখনি চলে যাবেন?

মৃণাল বললে—হ্যাঁ, এখন আমরা বাড়ীটা একবার দেখ্‌তে এসেছি। কেনা হয়ে গেলে আপাততঃ মাসখানেকের জন্যে আমি এখানে এসে বাস করবো, তখন কিন্তু তোমাকে আমার দরকার লাগ্‌বে ভীমসেন। অজানা জায়গাতো, তুমি পুরোণো লোক, অনেক কিছুরই হদিশ্‌ দিতে পারবে। আর ও চালাটার মধ্যেই বা তুমি থাক্‌বে কেন? বৃষ্টি হলেই তো ছাটে একেবারে ভিজে যাবে। এই সামনের দালানটাতেই তুমি এখন থেকে থাক্‌লে পারো।

ভীমসেন অতি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠ্‌লো—না-না বাবু, তা হবে না, এখানে আমি থাক্‌তে পারবো না, এখানে থাক্‌তে আদেশ করবেন না। চালার মধ্যেই আমি ভাল থাক্‌বো।

শরত মৃণালকে বললে—দালানের ব্যবস্থা করাতে ও কি রকম ভয় পেয়ে গেল দেখলেন দাদাবাবু।

মৃণাল জিজ্ঞাসা করলে ভীমসেনকে—কেন হে, এমন সুন্দর কোঠা জায়গায় তোমায় থাক্‌তে বলছি, তাতে তোমার অত আপত্তি কিসের?

ভীমসেন গৃহকর্ত্তার অয়েলপেন্টএর দিকে খানিক চেয়ে থেকে বললে—কর্ত্তাবাবুর ওই ছবিটা রাতে জ্যান্ত হন্‌ বাবু মশাই।

অবনী বললে—জ্যান্ত হন্‌! কি বলচো তুমি।

টর্চটা টেবিলের ওপর পড়েছিল। শরত সেটা তুলে নিয়ে ছবিটাকে ভাল করে দেখ্‌লে। তার মনে হলো সেই সুন্দর মূর্ত্তিটির মুখে যেন হাসি ভেসে উঠেছে।

ভীমসেন বললে—সত্যি বাবু-মশাইরা। যাঁরা এ-বাড়ীতে এরআগে থাক্‌তেন তাঁরা সকলেই এ কথা জানেন। যিনি সেই সময় এই মূর্ত্তির সাম্‌নে এসে পড়েছেন তাঁকে আর বাঁচ্‌তে হয় নি। তাঁকে দেখেই জ্ঞান হারাতো, আর জ্ঞান ফিরতো না।

শরত ব্যস্ত হয়ে বললে—বৃষ্টি দেখছি আজ সারারাত ধরেই হবে, এখানে বসে আর লাভ নেই দাদাবাবু, চলুন আমরা গাড়ীতে উঠিগে। বাড়ী দেখ্‌তে এসেছেন, দেখাতো হলো, আর কেন? তবে এ-বাড়ী আর কিনে দরকার নেই দাদাবাবু—এটা নিশ্চয় ভূতুড়ে বাড়ী।

মৃণাল বললে—তুমি ভয় পেয়ে গেলে শরত? আরে এটা বুঝ্‌লে না, ভীমসেন বললে, ওই মূর্ত্তির চলমান অবস্থা যে দেখ্‌তো সে তখনই জ্ঞান হারাত, আর জ্ঞান ফিরে পেতো না। তাই-ই যদি হয় তবে এ ঘটনা সে লোকের কাছে বলবার সময় পাবে কখন? বলে মৃণাল হোঃ হোঃ হেসে উঠ্‌লো।

ঠিক সেই সময় বাইরে থেকেও শোনা গেল একটা বিকট হাসির শব্দ—ঘরের জানালার ঠিক ও পাশেই কে যেন হেসে উঠ্‌লো—হাঃ হাঃ হাঃ। শরত চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—ও কি?

অবনী বলে উঠ্‌লো—কে হাস্‌লো?

মৃণাল বললে—ঠিক জান্‌লার কাছ থেকেই হাসির শব্দটা এসেছে। এই দারুণ বৃষ্টিতে কে ওখানে দাঁড়িয়ে অমন ভাবে হাস্‌তে পারে। বলে টর্চ নিয়ে ছুট্‌লো জান্‌লার দিকে।

ভীমসেন বললে—ভয় পাবেন না বাবু মশাইরা। ওর নাম মেঘনাদ।

মৃণাল বললে—মেঘনাদ!

শরত বললে—মানুষ তো?

ভীমসেন বল্‌লে—আজ্ঞে মানুষ বটে, তবে পাগল। আর পাগল না হলে কেউ কখনো মুষল ধারা বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে অমন ভাবে হাস্‌তে পারে?

শরত বল্‌লে—আচ্ছা জায়গায় এসে পড়লুম দাদাবাবু। একবার শুনছি ছবি রাত্তিরে ভূত হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে, আবার দেখ্‌ছি এক উন্মাদ বৃষ্টির মধ্যে পথে পথে হা-হা করে হেসে ঘুরে বেড়ায়। উঠে পড়ুন দাদাবাবু। দরকার নেই আমাদের চাঁদমারির বাড়ী।

অবনী বল্‌লে—দাদাবাবুকে তো উঠ্‌তে বল্‌ছো শরত, কিন্তু ওই পাগলটা যদি এতক্ষণে মোটরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তখন?

ভীমসেন বল্‌লে—ও কখনো কারো অনিষ্ট করেছে বলে শুনিনি বাবুরা। ওই রকম করে ঘুরে বেড়ায়।—কখনো এখানে থাকে, কখনো আবার কোথায় চলে যায়।

মৃণাল জিজ্ঞাসা করলে—লোকটা পাগল হলো কেন?

ভীমসেন বল্‌লে—সে বড় দুঃখের কথা বাবু মশাই। মেঘনাদের একটি ছেলে হবার পর থেকেই ওর স্ত্রী অসুখে ভুগ্‌তে থাকে। অনেক ডাক্তার-বদ্যি দেখেছিল, এখানকার ডাক্তারখানা, সহরের হাসপাতাল কোথাও যেতে বাকি রাখেনি। শেষে মেঘনাদ এক রোজা নিয়ে আসে। রোজা বল্‌লে—ওর ওই ছেলেটা আসলে একটা অপদেবতা, ছেলে হয়ে ওর পেটে এসেছে ওকে মারবার জন্যে। যতদিন ছেলেটা বাঁচবে ততদিন মেঘনাদের বউকে ওই রকম ভুগ্‌তে হবে। শেষে বউটাকে একেবারে শেষ করে অপদেবতা ওর ছেলের দেহ ছেড়ে চলে যাবে। তখন ছেলেটাও যাবে মারা। সেই রাতেই মেঘনাদ পরিবারকে বাঁচাবার জন্যে ছেলেটার গলাটা টিপে ধরলো। একেই আধমরা হয়ে ছিল বাচ্চাটা, একটু টিপ্‌তে একেবারে মরে গেল। মেঘনাদ তখন ঘুমন্ত স্ত্রীকে জাগিয়ে সেই মরা ছেলেকে দেখিয়ে বল্‌লে—ভাবিস্‌নি বউ, এইবার তুই সেরে উঠ্‌বি। ওই ছাখ্‌, অপদেবতাটাকে সরিয়ে দিয়েছি। মেঘনাদের স্ত্রী দেখ্‌লে মেঝেতে ছেঁড়া মাদুরের ওপর তার সন্তান মরে পড়ে আছে। সে চেঁচিয়ে ছেলেটার ওপর আছড়ে পড়লো। আর উঠ্‌লো না। দুর্বল শরীর তো, সঙ্গে সঙ্গে দম বন্ধ হয়ে গেছ্‌লো বাবু মশাই।

অবনী বল্‌লে—তার পর?

ভীমসেন বল্‌লে—তার পর থেকেই মেঘনাদের ওই অবস্থা।

আবার মেঘনাদের অট্টহাসি আকাশের বজ্রের শব্দের সঙ্গে মিশে তাদের কানে এসে পৌঁছল।

শরত বল্‌লে—মামাবাবু!

মৃণাল বল্‌লে—দেখতো ফ্লাস্কটা শরত, আরেকটু কফি হবে কিনা?

তখনও মেঘনাদের হাসির রেশ তাদের কাণে বাজ্‌ছে, শোনা যাচ্ছে বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ, জানালা ফুঁড়ে মাঝে মাঝে ঘরে ঢুক্‌ছে বিদ্যুতের ঝলক।

মৃণাল ভীমসেনকে জিজ্ঞাসা করলে—বাড়ীর কর্ত্তা, যাঁর ওই ছবি, উনি কতদিন মারা গেছেন জানো ভীমসেন?

ভীমসেন বল্‌লে—আজ্ঞে তা অনেক দিন, প্রায় বছর পাঁচ সাত হবে।

অবনী জিজ্ঞাসা করলে—তার পর এ বাড়ীতে ক'জন মারা গেছেন?

ভীমসেন বল্‌লে—তিন জন। তারা প্রত্যেকেই রাতের বেলা হঠাৎ মারা যান—আর তাঁদের দেহ দেখা যায় ভোর বেলা এই দালানে পড়ে আছে। সকলে বলে—কর্ত্তাবাবু বেশি রাত হলে ওই ছবিটা থেকে বেরিয়ে এসে দালানে পায়চারি করেন। যখন তিনি বেঁচে ছিলেন তখনও তাঁর অভ্যেস ছিল রাতের বেলা খাওয়া হয়ে গেলে অন্ততঃ আধঘণ্টা এক ঘণ্টা দালানে পায়চারি করে বেড়ানো।

মৃণাল বল্‌লে—সামনে অমন সুন্দর চাঁদমারির মাঠ, বাড়ীর মধ্যে উঠান, সে সব ছেড়ে উনি দালানে পায়চারি করতেন কেন?

ভীমসেন বল্‌লে—কি করে জান্‌বো বাবু মশাই? তবে শুনেচি রাতে তাঁর তেমন ঘুম হতো না, তাই রাতের বেলাও মাঝে মাঝে দালানে পায়চারি করতেন। একদিন ভোরে সবাই দেখ্‌লো তিনি দালানে মরে পড়ে আছেন।

মৃণাল অবনীকে বল্‌লে—ব্যাপারটা বুঝ্‌লে ছোটমামা? ভদ্রলোকের খুব বেশী ব্লাড্‌প্রেশার ছিল। আর এটাও বোঝা যাচ্ছে, মারা গেছেন করোনারি থ্রমবসিস্‌ রোগে হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে।

অবনী বল্‌লে—এঁর বেলা নাহয় সে যুক্তি খাট্‌তে পারে, কিন্তু আর তিনজনের বেলায়? এ বাড়ীতে যে আসে তারই কি ঐ রোগ হয় আর দালানে হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে পড়ে যান, আর সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল হয়? যাই বলো—ব্যাপারটার ঠিক হদিস্‌ পাওয়া যাচ্ছে না।

এই সময় ভীমসেন বলে উঠ্‌লো—বৃষ্টিটা এইবার থেমে গেছে বাবু মশাই। যদি যেতেই হয় তবে এখনই বেরিয়ে পড়ুন। আবার যদি চেপে জল আসে, তাহলে আর যেতেই পারবেন না হয়তো।

মৃণাল লাফিয়ে উঠে পড়লো। বল্‌লে—ঠিকই তো, রহস্য উদ্‌ঘাটনেই মেতে আছি আমরা, আকাশের দিকে লক্ষ্যই রাখি নি। চল ছোট মামা, আর দেরি নয়, বেরিয়ে পড়া যাক্‌—শরত চল···একি শরত কোথা গেল? শরত—শরত—

শরতের সাড়া পাওয়া গেল না।

অবনী বল্‌লে—বৃষ্টি ধরে গেছে দেখে বোধহয় সে গাড়ীতে গিয়েই বসেছে। চল আমরা এগোই।

সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দু এক পা এসে ভীমসেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার পর ভয়জড়িত কণ্ঠে বল্‌লে—আপনাদের হাত-বাতিটা একবার আলুন তো বাবু—ও পাশে যেন কে পড়ে আছে না।

টর্চের আলোয় দেখা গেল দালানের শেষ প্রান্তে মুখ গুঁজে পড়ে আছে শরত সংজ্ঞাহীন।

অবনী তাড়াতাড়ি তার নাড়ী দেখে বল্‌লে—না-না মরে নি, এখনও বেঁচে আছে। ভীম সেন শীগ্‌গির জল নিয়ে এস···শীগ্‌গির। মুখে জলের ঝাপটা দিলে এখনি জ্ঞান হবে।

ভীমসেন ছুটে গেল জল আনতে।

মৃণাল বললে—নিশ্চয় কোন কারণে ভয় পেয়ে গেছ্‌লো শরত।

সেই সময় উঠান থেকে ভীমসেনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বাবু মশাই, মরে গেলুম—বাবু…

স্বরটা যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

মৃণাল ও অবনী ছুটে গিয়ে দেখে উঠানের ওপর পড়ে আছে ভীমসেন অচৈতন্য অবস্থায়।

মৃণাল বললে—ব্যাপার কি বলতো ছোট মামা?

অবনী তখন আতঙ্কিত চোখে সামনের চালার দিকে চেয়ে আছে। মৃণালের কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে—টর্চটা একবার জ্বালাতো মৃণাল, চালাটার নীচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে।

টর্চের আলো পড়তেই দেখা গেল একটা লোক খিড়কির ভাঙা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

মৃণাল বললে—চলো ছোট মামা, লোকটাকে ধরি গে।

পেছন থেকে বললে—দরকার নেই বাবু মশাইরা—ওকে এখন ধরতে যাবেন না, ওর মাথায় খুন চেপেছে।

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ভীমসেন।

অবনী বললে—ও কে ভীমসেন?

ভীমসেন বললে—আজ্ঞে মেঘনাদ। ও-ই হঠাৎ আমার গলাটা টিপে ধরেছিল। আপনারা ছুটে না এলে আমাকে মেরেই ফেলতো।

শরত তখন জ্ঞান ফিরে পেয়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। শরত মৃণালকে বললে—একদণ্ডও আর এখানে থাকবেন না দাদাবাবু। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন।

মৃণাল বললে—হ্যাঁ চলো শরত। তোমার শরীর ভাল নয়, তুমি বসে থেকো, আমিই ড্রাইভ করবো। এখন পৌনে আটটা—নটার শো দেখ্‌তেই হবে ছোট মামা, আর দেরি নয় কিন্তু।

তারা মোটরে স্টার্ট দিতে যাবে—এমন সময় গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো মেঘনাদ। মৃণালের দিকে চেয়ে সে হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ! তারপর গাড়ীর জানালার ভেতর দিয়ে তার দুটো হাত বাড়িয়ে দিলে মৃণালের দিকে। মৃণাল হতভম্ব, সে যেন ভুলে গেল গাড়ীতে স্টার্ট দিতে। শরত পিছনের সিটে হেলান দিয়ে পড়েছিল, সে তখনই চেঁচিয়ে উঠলো—দাদাবাবু, শিগ্‌গির গাড়ী চালিয়ে দিন, শিগ্‌গির। বলেই সে এক ধাক্কায় মেঘনাদকে পাশে ফেলে দিলে। কলিকাতার দিকে গাড়ী ছুটে বেরিয়ে গেল।

অবনী বললে—বুঝলে শরত চাঁদমারির বাড়ীর রহস্যটা। এই মেঘনাদই হচ্ছে এই ঘটনার নায়ক। এ-বাড়ীতে যাঁরা মারা গেছেন সকলেরই হত্যাকারী এই মেঘনাদ—নিজের ছেলেকে গলা টিপে মারবার পর যখন সে দেখ্‌লো স্ত্রীও সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল তখন তার মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিল। যখন ভাল থাকে তখন কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু যখন রোগটা দেখা দেয় তখন তার ঝোঁক হয় কাকেও গলা টিপে মারবার। এ-বাড়ীর খিড়কি দরজাটা ভাঙা দেখেছ তো। মেঘনাদ এইখান দিয়েই মাঝে মাঝে বাড়ীতে ঢোকে অন্ধকার রাতে এবং সেই সময় তাদের সামনে পেয়ে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। যেমন আজই চেষ্টা করেছিল তোমাকে আর ভীমসেনকে মেরে ফেলতে।

মৃণাল বললে—এরকম সাংঘাতিক পাগলকে এখানকার লোক পুলিশে ধরিয়ে না দিয়ে ব্যাপারটা চেপে রেখেছে?

অবনী বললে—সে কাজ আমাদের করতে হবে। এখানকার বাসিন্দারা সব অশিক্ষিত। এ সব ঘটনাতে এরা একটা ভৌতিক ছাপ বসিয়ে রেখে দেয়। চিন্তাও করে না আসল রহস্যটুকু বার করতে।

তারপর অবনী ও মৃণালের চেষ্টায় মেঘনাদ ধরা পড়ল। ভূতের বাড়ীর রহস্যও পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপর আর কাউকেই ও বাড়ীতে ঐ ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয় নি!

গান

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

ঝর ঝর ঝর ঝর বাদল ঝরে,
উন্মনা মন কাঁদে কাহারি তরে।
বর্ষারি অনুরাগে
স্মৃতিখানি কারি জাগে,
সজল মেঘ-ছায়া মনের-'পরে।

উদাস, ব্যাকুল হাওয়ারি সাথে,
শাওন-ঘন এই তামসী রাতে,
মন চলে যায়
এই নিরালায়
বিরহী যেথা কাঁদে আমারি তরে।

পুর্বরাগ

শ্রীদেবেশ দাশ

না। রাগারাগি নয়। নিছক যাকে বলে পূর্বরাগ।

শ্রীমতী তনিমা দেবী তার বিরাট তনু নিয়ে ব্যস্ত সমস্ত। আজ বিকেলে তার বাড়ীতে চায়ের বড় পার্টি। খুব ভারী হাতে আয়োজন হয়েছে। কিন্তু হালকা ভাবে তার পেছনে একটা উদ্দেশ্য মেশান আছে। উদয় রায় যে এ বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্নে আসছে।

বড়লোকের ছেলে। পড়াশোনা শেষ পর্য্যন্ত শেষ করে এখন সুরু করেছে পলিটিক্স। কলেজের ডিবেটিং ক্লাবের ডেস্ক থেকে প্রমোশন পেয়েছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের প্যাকিং বক্সে। পেটের জন্য চাকরী করতে হবে না। না পলিটিক্সের জন্য জেল। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তনিমা দেবী হিসাব কষে দেখলেন যে এ ছেলে অন্তত একটা নেতা বা নিদেন পক্ষে উপমন্ত্রী নিশ্চয়ই হবে।

তাই তিনি বেশ হুশিয়ার ভাবে জাল গুটিয়ে আছেন। কিন্তু সময় থাকতে এ হেন রত্নকে সাগর থেকে ছেঁচে আনতে হবে। চারদিকে মায়ের দল মেয়ের বিয়ের জন্য এমন সব অশোভন কাড়াকাড়ি লাগায়। বিয়ের যোগ্য তৈরী ছেলেদের বিশ্রীভাবে ছেঁকে ধরে ওরা। তাই তিনি একটু ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে হিসাব কষছেন। করো তোমরা চাকুরে জামাই পাবার জন্য খরচা-পত্তর, সাধ্য-সাধনা। উদয় রায় যখন মিনিষ্টার হয়ে ফুঁড়ে বেরোবে তখন বুঝো ঠেলা।

কিন্তু এ হেন ছেলের সঙ্গে তার আধুনিকা মেয়ের ত আর ঘটক পাঠিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ করা চলে না। সে একেবারে সেকেলে কারবার। একালে চাই হালকা একটু পূর্বরাগ। পঞ্চশরের জন্যে চাই চায়ের আসর।

হুশ করে হাজির হলেন মিষ্টার আর মিসেস বটব্যাল। সময়ের একটু আগেই। মিসেস সে জন্য যেন একটু লজ্জা পেলেন। একটা অজুহাত দেওয়া দরকার। বললেন—এই দেখুন না, ভয়ে ভয়ে একটু আগে ভাগেই রওনা হতে হল। আমাদের মটরটা আবার রাস্তায় মাঝে মাঝে বেগড়ায় কিনা। বলুন ত তনিমা দেবী, কি করে এটার হাত থেকে রেহাই পাই?

তনিমা দেবীর বন্ধু মহলে বুদ্ধি বিবেচনার জন্য নাম আছে। মৃদু হেসে চটপট বুদ্ধি বাৎলে দিলেন—কেন? আপনার পাশের বাড়ীর পাকড়াশীদের বিক্রী করে দিন।

—সে কি কথা? ওরা যে বড্ড কম দাম দিতে চায়?

—তাতে আর কি? তারপর মটর নিয়ে পাকড়াশীদের যে অবস্থা দেখবেন তাতেই লোকসানটা পুষিয়ে যাবে।

—কিন্তু আপনি চেনেন না ওদের। কথায় কথায় ফুটোনী ফুঁড়ে বের হয়। এই দেখুন না। ওদের নীচের তলার সামনের ঘরটা একজন আর্টিষ্টকে ভাড়া দিয়েছে। বেচারার প্রতিভা আছে, কিন্তু নাম নেই। ভাড়া দেবে কোথ্ থেকে? পাকড়াশী নিজে এসে ভাড়ার জন্য হাঁকা-হাঁকি করতে লাগল।

তা আর্টিষ্ট তাতে ঘাবড়াবে কেন? তার নিজের ভবিষ্যতের উপর পুরো বিশ্বাস আছে। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলল—আপনি বুঝছেন না পাকড়াশী সাহেব, কয়েক বছরের মধ্যে লোকে এই ছন্নছাড়া ঘরটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাবে। বলবে—আমি এইখানে বসে শিল্পী-জীবন কাটিয়েছি।

তনিমা দেবীর আর্টিষ্টের জন্য প্রাণ কেঁদে উঠল। বললেন—বটে, আর্টিষ্টদের এ হেন অশ্রদ্ধা? শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিক—এরাই ত দেশের ভবিষ্যৎ।

রাজনীতিক কথাটা জুড়ে দিতে ভুললেন না। কারণ উদয় রায়ের সম্বন্ধে একটা আশা আছে।

—কিন্তু পাকড়াশীর কি আর লজ্জা আছে? না, সভ্যতা আছে? দিব্যি জবাব দিল—বেশ, বেশ। তাই

ব্যবস্থা চটপট করে দিচ্ছি হে ছোকরা। আজ রাতের মধ্যে যদি তুমি ভাড়াটা না মিটিয়ে দাও ত কাল সকাল থেকেই লোকে সে কথা বলতে সুযোগ পাবে।

ইতিমধ্যে আরো অনেকে এসে হাজির হয়েছেন। বেশীর ভাগই মহিলা। অনেকে আবার তরুণী মেয়ে নিয়ে এসেছেন। সেটা তনিমা দেবীর প্রাণে কি করে সহ্য হয়? মনটা একটু বিগড়ে রইল। এষারও মতিগতি যেন একটু কেমন কেমন। আজকালকার মেয়েকে বোঝা শক্ত।

এমন সময় উদয় এসে পৌছল। সদ্য এক মিটিং থেকে ফিরছে। তাই সন্ধ্যেবেলার স্যুট নয়, বিকেল বেলার মোটা ধুতি চাদর তার গায়ে। হাতে এখনোশোভা পাচ্ছে এক তাড়া কাগজ। যেন সুরু করবে এখ্‌খুনি—ভাইয়োঁ আর বহিনোঁ…

এই যে আসুন, আসুন। হৈ হৈ করে সবাই উদয়কে অভ্যর্থনা জানাল। তনিমা দেবীর মেয়ে এষার সঙ্গে আগে থেকেই অনেকটা আলাপ পরিচয় ছিল।

—ওঃ, একেবারে মিটিং থেকে আসছেন দেখছি, উদয়বাবু। আজকে যে বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন তাই নিয়ে এখনো ভাবছেন না কি?

হাসি মুখে উদয় পাণ্টা প্রশ্ন করল—আপনিই আন্দাজ করুন।

—বা রে, আমি কি করে আন্দাজ করব। ইয়োরোপে শুনেছি, মনের কথা ধরবার যন্ত্র এক রকম বেরিয়েছে। তা দিয়ে নাকি পলিটিশিয়ানদের মনের কথা ধরা যায়।

উদয়ের 'শিভ্যালরির' জন্য নাম-ডাক আছে। সে তখ্‌খুনি বলল—তাতে অবশ্য আমরা পুরুষরা ধরা পড়ব। কিন্তু আপনাদের কোন ভয় নেই।

—কেন, কেন? মেয়েরা পার পেয়ে যাবে কি করে?

—এষা দেবী, মেয়েদের মন হচ্ছে অপার। তার তল নেই, পারও নেই। সামান্য মেশিনে মেয়েদের মনের নাগাল পাবে কোথা থেকে, বলুন?

ঘরশুদ্ধ সবাই শুনে খুসী। শুধু খুসী কেন, চমৎকৃত। আর তনিমা দেবী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তার হাতে চায়ের পটটা আটকিয়ে রইল একটু বেশীক্ষণ। ভেতরের চায়ের জলের রঙ হয়ে উঠল সোনালী।

চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে সকলেই উদয়কে ঘিরে বসলেন। বক্তৃতার ট্রেড সিক্রেট জানতে চাই। কি মন্ত্রে পলিটিশিয়ানরা হাজার হাজার লোককে যাদু করে ফেলেন

ভাইয়োঁ আর বহিনোঁ

সে কথা তাদের কাছে জানতে চাইলে তারা ফাঁস করবেন না। সেটা হচ্ছে গোপন মন্ত্র। কিন্তু উদয় হচ্ছে—কি হচ্ছে তা বলতে গিয়ে একজন ভদ্রমহিলা কথা খুঁজে পেলেন না। যেন পায়ের কাছে এসে হাবুডুবু খেতে লাগলেন।

তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে এষা বলে উঠল—ভবিষ্যতের অগ্রদূত।

ঠিক, ঠিক—সবাই সায় দিল।

ভদ্রমহিলার এরকম একটা গায়ে পড়ে বাহাদুরী নেওয়া পছন্দ হল না। একটু বাঁকা সুরে বললেন—না, না, ও সব দূত টুত নয়। উদয় হতে যাচ্ছে—এ যুগের লীডার।

—লীডার অর্থাৎ চালক। তার মানে চালাক। আমি কিন্তু অত্যন্ত সাদাসিধে গোবেচারা—এই কথা বলতে বলতে উদয় ততক্ষণে ওদের আওতা থেকে কেমন করে কেটে পড়েছে। যে কোণায় তরুণ তরুণীরা জমা হয়েছে সেখানে গিয়ে হাজির হল। অন্য তরুণদের মুখে তখন মেঘ, আর তরুণীদের চোখে বিদ্যুৎ।

তারা সবাই উদয়কে 'হিরো' মনে করে। ললিতা খুব মিহি গলায় তার হিরোকে জিজ্ঞেস করল,—আচ্ছা উদয়বাবু, আপনি, শুনেছি এত সুন্দর বক্তৃতা দেন। কি করে প্রথমে অভ্যেস করলেন বলুন না।

—সে বড় দুঃখের কথা। অনেক ভেবে দেখলাম যে নাম করতে গেলে চাই বক্তৃতা। আজকাল আর কোন পথেই সহজে সিদ্ধি হয় না। এদিকে ছাই আমার মুখে কথাই জোগাত না। একেবারে স্রেফ গণেশ। ঘরের দরজা বন্ধ করে রোজ দু ঘণ্টা করে জিভে শাণ দিতে সুরু করলাম।

এষা অনেকক্ষণ থেকে কি যেন বলার তালে ছিল। এখন খোঁচা পেয়ে সে কথা ঝেড়ে দিল—অর্থাৎ ডু অর ডাই মিশন। একেবারে গান্ধীজী। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

—ঠিক বলেছেন এষা দেবী। ভাবলাম আমি ত করেঙ্গে; মরেঙ্গে তার নিজের হিসাব কষতে থাকুক। তার জন্য ত আমার মত বা সাহায্যের দরকার হবে না।

একটি তরুণী পেছন থেকে চশমা মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করলেন—তা, আপনার প্রথম বক্তৃতাটা কেমন উৎরোল ?

চায়ের ধোঁয়োর সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস মিশোল উদয়। তার পর এক চুমুক খেয়ে হতাশার ভাব দেখিয়ে বলল—সে এক দুর্ঘটনা। মহা এক ট্র্যাজেডি। শুনলে আপনাদেরও দয়া হবে।

অভিমানে ললিতা ঠোঁট উলটিয়ে ফেলল—তার মানে, আপনি আমাদের হৃদয়হীনা মনে করেন ?

তুলনাহীনা ত নিশ্চয়ই। রবি ঠাকুর নিজে গেয়ে গেছেন। দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।

এষার সইল না। সে একটু ঝাঁজ দিয়ে বলল—আচ্ছা বক্তিয়ার খিলজী মশায়, আপনার গল্পটা···

উদয় বুঝল ব্যাপারটা। বক্তিয়ার খিলজীর মধ্যে খোটা আছে। তার কারণটা ভেবেও সুখ। অনেক তরুণীর মনোযোগ পেলে প্রত্যেকেই মনে মনে হিংসা করে। তরুণ আর তরুণী দু দলই। তবে তরুণীদের

মানসী নয়, মনসা

চটাতে নেই। অনেক চা আর অনেক ডিনার খেয়ে উদয় আর কিছু না হোক এটুকু শিখেছে যে রেগে গেলে মানসীকে পর্য্যন্ত মনে হয় যেন মানসী নয়, মনসা।

তাই খুব মিষ্টি করে সে বলল—একদিন খুব তৈরি হয়ে এসেছি। কলেজের ডিবেটিং হলে বক্তৃতা করছে একজন পাঁড় বক্তৃতাবাগীশ। কিন্তু পেছনে হল্লা হচ্ছে খুব। সে চেঁচিয়ে উঠল—আজ দেখছি অনেক বুদ্ধু জমা হয়েছে এই মিটিংএ—তা এক সময়ে একজন চেঁচালেই সুবিধে হয় না কি ?

আমি অমনি লাফিয়ে উঠে বলে ফেললাম—অবশ্যি, অবশ্যি; আপনিই এখন চালিয়ে যান।

সভা শুদ্ধ সবাই প্রথমে থ। তার পর কথাটার মানে বুঝতে পেরে সে এক মহা হাসির হররা। নিজে বুদ্ধু বনে বেচারা নেমে এল।

এষা একটু ফোড়ন কাটল—আর আপনি উদয় হলেন?

না, এষা দেবী। জয়ের পথ অত সোজা নয়। নারীর মন আর মিটিংয়ের মন দুই-ই সমান।

এই পর্য্যন্ত বলেই উদয় এষার দিকে একবার ভাল করে তাকাল। তার পর যোগ করে দিল—

—দুই-ই সাধনার ধন।

—তা আপনার দ্বিতীয় সাধনাটার কথাই প্রথমে শুনি।

খুসী হয়ে উদয় সুরু করল—প্রথমেই মহা বিপদ। বন্ধুরা সব ঠেলে এগিয়ে দিতে লাগল। বলে—চ্যালেঞ্জ

বন্ধুদের হাত থেকে রক্ষা কর

দিয়েছিলে, এখন সামলাও ঠ্যালা। বলেই ওরা আমায় ঠেলে দিল একেবারে অথৈ জলে।

অথৈ জলে? হে ভগবান, বন্ধুদের হাত থেকে রক্ষা কর—তরুণীরা চোখ কপালে তুলে ফেলল।

একেকেবারে। ঠিক এখন যেমন অবস্থা আমার—বলেই উদয় একটু রহস্যময় হাসি হাসল।

ললিতা একটু ক্ষেপে গেল। মনে মনে উত্তর ঠিক করে নিয়ে উদয়কে দু'কথা শুনিয়ে দিতে চাইল—আধুনিকা তরুণীদের বিপদের সঙ্গে তুলনা? রবি ঠাকুর যে বলে গেছেন "ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়" সে ত হচ্ছে এ যুগের আধুনিকা তরুণী।

হেসে ফেলল হো হো করে উদয়। বলল—শুধু তাই নয় ললিতা দেবী। আপনারা শুধু বিপদ নয়, একেবারে য়্যাটম বোমা।

ওর চারদিকে সবাই ভিড় করে দাঁড়াল। সবারই প্রশ্ন—কেন? কেন মেয়েরা এত সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াল পুরুষদের কাছে?

উদয় সবিনয়ে জানাল—যে পুরুষদের ছোঁড়া য়্যাটম বোমা আর মেয়েদের ছোঁড়া য়্যাটম বোমায় অবশ্য একটু তফাৎ আছে। প্রথমটা আসে শূন্য থেকে, ভেঙ্গে দেয় ঘর সংসার। আর দ্বিতীয়টা আসে চাঁদ থেকে, তাকে গড়ে তোলে, ভরে তোলে।

চাঁদের কথায় শান্তি ফিরে এল। এষাও খুসী হল। তার পার্টিতে এসে বান্ধবীরা চটে মটে ফিরে যাবে না। আজকের দিনের যাকে বলা যায় প্রধান অতিথি—সেই তরুণী মহলে নামকরা উদয় রায় তাদের সন্তুষ্ট করেছে। কাজেই এবার তার সঙ্গে একটু বিশেষভাবে আলাপ করা দরকার। তার দিকে একটু আলাদা মনোযোগ দেওয়া উচিত। তাতে মা-ও একটু খুসী আর নিশ্চিন্ত থাকবেন।

দূর থেকে তনিমা দেবী তা নজর করে বিশেষ খুসী হলেন।

উদয়ও এতক্ষণ শুধু পাইকিরি ভাবে কথা চালিয়েছে। সেটা ভাল লাগে, কিন্তু ভাব হয় না তাতে। তারো এখন শুধু একজনের দিকে একটু নিবিড় করে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

—সত্যি এষা দেবী, আপনি কি সুন্দর করে কথা বলেন। যেন মুক্তো ঝরে।

—আপনি ঠাট্টা করছেন উদয়বাবু। আপনি হচ্ছেন ত বড় বক্তা। এই বয়েসেই যুবনেতা হয়েছেন আপনি।

—ওটা ত শুধু বাইরের ভোল। বলতে গেলে শুধু ওতা। কিন্তু আপনি যখন বলেন—মনে পড়ে শুধু স্কৃত কথাগুলো—বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।

এষা একটু উসখুস করতে লাগল।

করতে চাই বিশ্বজয়

তা লক্ষ্য করে উদয় বলল—আপনি চুপ করে আছেন কিন্তু।

—না, কই।

অবশ্য আপনি বলতে পারেন যে নারীর ভাষা হচ্ছে চোখে আর পুরুষের ভাষা মুখে। সে কথা আমি অস্বীকার করব না। এই মুখের জোরেই ত করতে চাই বিশ্বজয়। অবশ্য যদি প্রেরণা পাই, সহযোগিতা পাই। অর্থাৎ চোখের ভাষা পাই।

এষা উদয়ের সৌভাগ্য কামনা করল। বলল—নিশ্চয়ই আপনার বিশ্বজয় হয়ে যাবে।

আপনিই এবার আমায় ঠাট্টা করছেন এষা দেবী। একটি মনও জয় করতে যে পারে না তাকে এসব কথা বলা ঠাট্টা ছাড়া আর কি বলুন ?

এষা যেন কথাটাকে আমলই দিল না। বলল—জনতার মন ত আপনি জয় করে চলেছেন।

আপনি যদি তা মনে করেন তাহলে একবার আসুন না আমার মিটিংয়ে। আপনার নিজের বিচার দিয়ে যাচাই করতে চাই আমার বক্তৃতাকে।

কিন্তু এষার কি আর সময় হবে ? কোন দিনও ? হাতঘড়ির সোনার বাঁধনটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল—আপনার বক্তৃতা ত শোনার অপেক্ষা রাখে না। আপনি ত দেশের জন্য জীবনটাই বিসর্জন দিতে তৈরী আছেন।

একটু গলার স্বর ভারী করে উদয় বলল—মোটেই না। আমি দেশের জন্য জীবনটা বাঁচিয়ে রাখতে তৈরী আছি। মরতে রাজী ত সবাই, বাঁচতে রাজী ক'জনা ?

কিন্তু ওদিকে এষার কব্জিতে যে ঘড়িটা টিকটিক করছে। এষার সে কথা মনে পড়েছে। অর্থাৎ উদয়ের এখন নিজে থেকে উঠে পড়াই হবে রাজনীতি। তনিমা দেবী অবশ্য আপত্তি করলেন, কিন্তু উদয়ের এখনো মিটিংএর কাপড়ই ছাড়া হয় নি।

পেছনের দিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল আরেকজন

এদের প্রথম কলহ...
এরা নব-বিবাহিত, কিন্তু...
দেখো মা, এই ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে আমায় ঘুরতে হয়, আর...
আমি ওঁর জন্যে যথাসাধ্য করি, তবুও...
ঝগড়া কোরো না। আমি বুঝেছি গলদ কোথায়।
লক্ষ্মী, তোমার কাপড় কাচার ধরণেই রয়েছে গলদ
কিন্তু, কাপড় কাচতে খাটুনি তো আমি কম করি না!
কিন্তু কাপড় তুমি আছড়ে কাচো যে!
এ ছাড়া পরিস্কার করে কাচার উপায়ই বা কী?
সানলাইট সাবান ব্যবহার কর—যা আমি বরাবর করেছি। সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনায় কাচলে কখনই তোমাকে কাপড় আছড়াতে হবেনা।
আছড়ালে কাপড়ের সুতো ফেঁসে যায়; সেইজন্যে অতো তাড়াতাড়ি কাপড় ছেঁড়ে।
(ছেঁড়া সুতো বড় করে' দেখানো হয়েছে)
আজই আমি সানলাইট সাবান কিনবো!
আরে: সানলাইট, সত্যিই, বিনা আছাড়ে সাদা আর ঝকঝকে করে কাচে। এখন—আমাদের কাপড় আরও বেশীদিন টেঁকে। তাই সানলাইট আমাদের পয়সা বাঁচিয়েছে।
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।

যুবক। একটা বকুলগাছের আড়ালে। সন্ধ্যার আলো এসে পড়েছে এগিয়ে আসা এষার মুখে।

—বাঃ বাঃ, একটু ওইখানেই দাঁড়াও এষা। মনে মনে একটি ছবি এঁকে নিই।

—আঃ বরুণ, তোমার শিল্পীটিকে একটু বিশ্রাম দাও; খালি আর্ট আর আর্ট।

বরুণ উজ্জ্বল মুখে জবাব দিল—হবে না? আর্ট যে হচ্ছে প্রকৃতির ছবি।

—কিন্তু প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের ছবি।

—তাই ত আমার শিল্প ভগবানের সৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়। জান, এষা তোমাকে এঁকে আমি নিজেকে অমর করে তুলব।
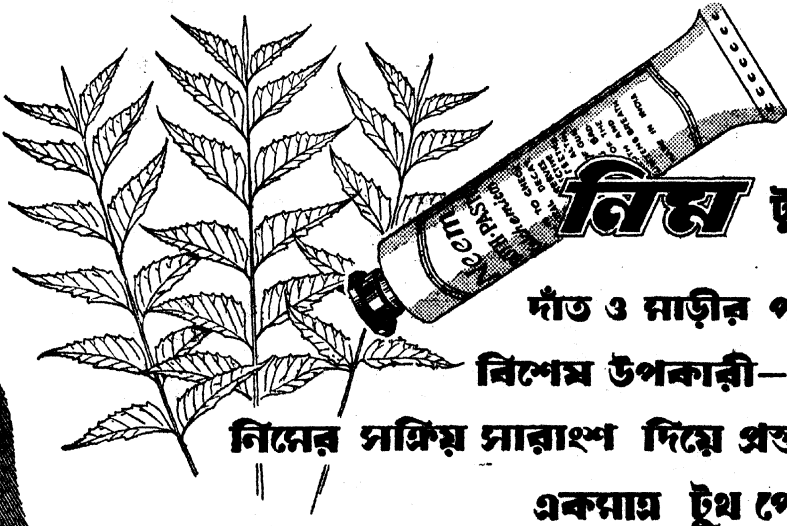
—সে কথা বলো না বরুণ। তোমার তুলিতে আমিই হয়ত অমর হয়ে থাকব। জান, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, কিন্তু চায়ের পালা যেন শেষ হতে চায় না। উদয় রায়ের অস্ত হবার কোন লক্ষণই নেই। এদিকে সন্ধ্যার আলো শেষ হয়ে গেলে তোমার ছবির রঙের আইডিয়াটা ঠিক মত ধরা যাবে না বলেছ। কত কষ্ট করে ওকে বিদেয় দিলাম।

শিল্পীকেও ঘর ভাড়া দিতে না পারার জন্য বিদায় দিতে চাচ্ছে বাড়ীওলা। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল বরুণ। আস্তে আস্তে বলল—সত্যি, কত অসুবিধার মধ্যে দিয়ে, সব দিক ভেবে চিন্তে তোমায় আমায় এই মিলনটুকু হয়। তুমি যে কতখানি ভালবাস তারই এই প্রমাণ। তোমার ভালবাসাকে আমি এতদিনে ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে পারব মনে হচ্ছে। নাম কি দিতে চাই জান? ঈভের পূর্বরাগ।

এষা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বরুণের দিকে। ওর হাত ধরে বলল—বাঃ, চমৎকার নাম হবে। ঈভ আর আদম ত স্বর্গ থেকে একসঙ্গে নেমে এসেছিল।

গভীর স্বরে বরুণ বলল—না, ওরা নেমে এসেছিল শূন্য থেকে—দুজনের বাহুর বাঁধনের স্বর্গে।

পাট ও পীঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে গত ১৭ই সেপ্টেম্বর নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার শ্রীরঙ্গম মঞ্চে ঐদিন এক ভাষণ প্রদান করেন। রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের অসামান্য দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় রঙ্গমঞ্চগুলি তাঁহার জন্মতিথি পালন করেন না। শিশিরকুমার তাঁহার ভাষণে বলেন—

পালন করা উচিত।" নাট্যাচার্য্যের এই ভাষণের ফলে আগামী বৎসর হইতে কলিকাতার সমস্ত রঙ্গমঞ্চ যদি ঐদিন শরৎচন্দ্রের নাটকাভিনয়ের আয়োজন করেন, তাহা হইলে রঙ্গমঞ্চের পক্ষে অমর কথাশিল্পীর প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হইবে।

*　*　*　*

ভারতীয় বিদ্যালয়গুলিতে চলচ্চিত্র বিষয়ক শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষাদপ্তরের সহকারী সম্পাদক শ্রীকে, জি, সোয়াইদেন-এর নেতৃত্বে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে, চলচ্চিত্র-শিল্পশিক্ষা সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এই সময় এ সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারিলে শিক্ষা-বিভাগ সত্যই
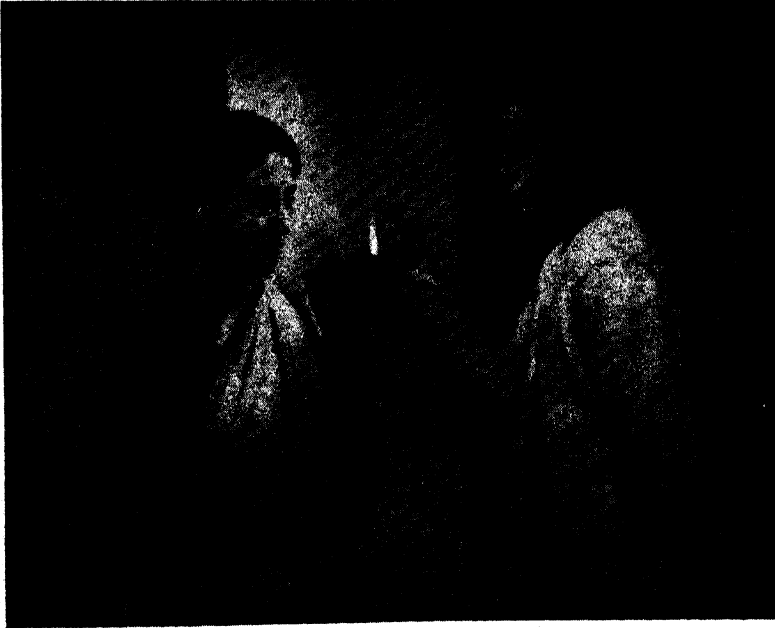
বিমল রায় পরিচালিত শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' হিন্দি কথাচিত্রে পার্বতী ও দেবদাসের ভূমিকায় শ্রীমতী সুচিত্রা সেন ও দিলীপকুমার

বিলেতে সেক্সপীয়রের জন্মতিথি বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এতদুপলক্ষে পৃথিবীর নানান দেশের শিল্পীরা ষ্ট্যাফোর্ড-অন্-আভনে সমবেত হন এবং সেক্সপীয়রের নাটক অভিনয় করে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার আয়োজন সম্পূর্ণ করেন। আমাদের দেশেও শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি সেইভাবে

একটী মহৎ কাজ করিবেন সন্দেহ নাই। কমিটি চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে বোঝানর জন্য 'ফিল্ম-সোসাইটী' গঠনের পরামর্শ দিয়াছেন।

*　*　*　*

বোম্বাইতে প্রবাসী বাঙ্গালী শিল্পীরা 'ক্রমশঃ' নামে

একটী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করিয়াছেন। এঁরা মধ্যে মধ্যে বাংলা নাটকাভিনয় ও সঙ্গীতের জলসার দ্বারা বাংলা বাঙালীর কৃষ্টি প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। বিপিন গুপ্ত, রুমা গাঙ্গুলী এবং বোম্বাই-এর অন্যান্য প্রবাসী বাঙ্গালী শিল্পীরা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। প্রবাসী শিল্পীদের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার আমরা সাফল্য কামনা করি।

* * * *

শোনা যাইতেছে, বোম্বাই-এর পরিচালক মিঃ পি, কে, আত্রে রাশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া নাকি একটি ছবি তুলিবেন মনস্থ করিয়াছেন। শোনা যাইতেছে তিনি এতদুদ্দেশে শীঘ্রই রাশিয়ায় যাইবেন। মিঃ আত্রের খেয়াল দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছে—রাজকাপুরের সাম্প্রতিক রাশিয়া সফর ও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন তাঁহাকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন নাই ত?

* * * *

সম্প্রতি বাংলা দেশের শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই বোম্বাই-কলিকাতা করিতেছেন। বোম্বাই-এর প্রবাসী বাঙ্গালী চিত্র পরিচালকদের মধ্যে কেহ কেহ সেখানে বাংলা ছবি তোলা সুরু করিয়াছেন। ফলে, বাংলার জনপ্রিয় শিল্পীদের ডাক পড়িতেছে। ছবি বিশ্বাস, রাজলক্ষ্মী (বড়) ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বোম্বাই ঘুরিয়া আসিয়াছেন। শিল্পীদের লইয়া টানাপোড়েন না করিয়া বাংলা ছবি এখানের ষ্টুডিওতে আসিয়া কি পরিচালকেরা তুলিতে পারেন না? অবশ্য বোম্বাই-এর স্বতন্ত্র্য ষ্ট্যাম্পের মোহ থাকিলে সেকথা আলাদা।

* * * *

সম্প্রতি যে সকল ছবি মুক্তিলাভ করিয়াছে তাহার মধ্যে 'পথের পাঁচালী' দর্শকদের বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। চিত্র জগতে "পথের পাঁচালী" নানা কারণে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। প্রথমতঃ প্রযোজনা ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের উৎসাহ দান। দ্বিতীয়তঃ বর্হিদৃশ্য গ্রহণে অসামান্য কৃতিত্ব প্রকাশ, তৃতীয়তঃ 'পথের পাচালী'র ন্যায় কাহিনীকে চিত্রায়িত করার দুর্জ্জয় প্রয়াস এবং সে প্রয়াসকে সার্থক করিয়া তোলা। চতুর্থতঃ কোনরূপ মেক-আপের আশ্রয় না নিয়া চরিত্রানুগ বয়সের শিল্পীদের দ্বারায় অভিনয় করান। পরিচালনা ক্ষেত্রে যাঁহারা প্রধান তাঁহাদের পক্ষে এ সাহস করা সম্ভব হইত কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কেননা বিধিনিষেধের গণ্ডী পার হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন হইত। তবে একথা সত্য যে ব্যবসা-বুদ্ধি প্রণোদিত না হইয়াই এ ছবির কাজ

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' কথাচিত্রের একটি দৃশ্যে সর্বজয়া, দুর্গা ও অপু

সুরু হইয়াছিল। কেননা, আলোচ্য চিত্রের কাজ শেষ করিতে প্রায় দুই বৎসরের অধিককাল সময় লাগিয়াছে। এই দীর্ঘ সময় সাধারণ প্রযোজকের কাছে পাওয়া অথবা পরিচালকের পক্ষে চাওয়া কোনটাই সম্ভব অথবা সঙ্গত নয়। "পথের পাঁচালীর" সংগঠনকারীরাই প্রযোজক ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে খেয়াল খুশীমত চিত্র-গ্রহণ করা

'পথের পাঁচালী'র অপর একটি দৃশ্য—ইন্দির ঠাকরুণ ও দুর্গা

সম্ভব হইয়াছে। তবে একথাও অনস্বীকার্য্য যে অনুশীলন ক্ষেত্রে—তাঁহারা যেমন সাফল্যলাভ করিয়াছেন, অপরদিকে এতকাল অসম্ভব বলিয়া যাহা চলিয়া আসিতেছিল, তাহা সম্ভব করিয়া তোলার জন্য অতঃপর অনেকেই স

হইবেন। 'পথের পাঁচালী'র স্রষ্টারা এ বিষয়ে স্মরণীয় হইয়া রহিলেন, সন্দেহ নাই। একাগ্রতা ও নিষ্ঠাই 'পথের পাঁচালী'র প্রাণসম্পদ।

আলোচ্য চিত্রকে নূতনের সার্থক জয়-যাত্রা বলা যাইতে পারে। কেননা, পরিচালক, আলোক চিত্রকর, শিল্প-নির্দ্দেশক প্রভৃতি সকলেই প্রায় এ কাজে নূতন ব্রতী! শিল্পীদের মধ্যে প্রায় সকলেই নূতন। একমাত্র কানু বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাতনদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতরণ করিয়াছেন এবং দুইটী পার্শ্ব চরিত্রে তুলসী চক্রবর্ত্তী ও অপর্ণা দেবীকে দেখা গিয়াছে। এ ছাড়া ছবিতে ছয় হাজারের নায়ক বা বারো হাজারের নায়িকা নাই। কাজেই সরকার এই চিত্রকে গ্রহণ করার পূর্ব্বে কোন পরিবেশকই এঁদের টাকা দিতে সাহস করেন নাই। এই বিষয়ে নূতনের দল—একদিকে যেমন পরিবেশকদের নিকট আজ দৃষ্টান্ত স্থল, অপর দিকে তেমনি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা, সত্যই একটী চমকপ্রদ ঘটনা। সরকার এ বিষয়ে অগ্রণী না হইলে 'পথের পাঁচালী'র সম্যক প্রতিভা স্ফুরিত হইত কিনা কে জানে?

পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় একজন কৃতী শিল্পী। দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া তিনি 'পথের পাঁচালী'কে বিচার করিয়াছেন, তারপর তিনি কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিয়াছেন, বাস্তব ও কল্পনার এই নির্ভুল বিচার ছবিখানিকে সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য আনিয়া দিয়াছে।

ছবির ইন্দির ঠাকরুণ আর গল্পের ইন্দিরা ঠাকরুণ এক হইতে একাকার করিয়াছে। গল্পের ইন্দিরা ঠাকরুণ যেমন আজকের লোক নন্ ছবির ইন্দির ঠাকরুণও ঠিক তাই। চুণীবালা গিরিশচন্দ্রের আমলের অভিনেত্রী। বংলার নাট্য-আন্দোলনের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন—ব্যালে। অর্থাৎ নর্ত্তকীর দলে নাচিতেন। তাহার পর কোহিনুরে, মিনার্ভায়, ষ্টারে কত নাটকেই না তিনি সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিয়াছেন। সে ইতিহাস আজ বিস্মৃতির অতল তলে। একদা চুণীবালা নাম্নী যে কোন অভিনেত্রী ছিলেন, একথাও মানুষ ভুলিয়া গিয়েছেন। জীবনের শেষ প্রান্তেই শুধু নয়, বলা যায় পরমায়ুর 'ফাউ' গুণিতে গুণিতে তিনি অভিনেত্রী হিসাবে দর্শকদের 'ফাউ' দিলেন—ইন্দিরা ঠাকরুণ। মহার্ঘ্য বস্তুর 'ফাউ' মেলে না—'ফাউ' দেওয়াও চলে না। কিন্তু চুণীবালা তা দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার দেহ লয়প্রাপ্ত হইলেও—ইন্দিরা ঠাকরুণ বাঁচিয়া থাকিবেন! অশীতিপর বৃদ্ধাকে নামাইয়া পরিচালকও কম সাহসের পরিচয় দেন নাই। এত বৃদ্ধ বয়সে পৃথিবীর আর কোথাও কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী অভিনয় করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইন্দিরা ঠাকরুণ যখন গাহিতে থাকেন—"দিন যে গেল, সন্ধ্যে হোল পার কর আমারে" তখন মনে হয় সত্যই যেন তিনি পারে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। ছবির

জেমিনীর 'ইনসানিয়ৎ'-কথাচিত্রের একটি দৃশ্য

আঙ্গিক দিক, আবহ সঙ্গীত, অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। নূতন শিল্পীদের মধ্যে সর্ব্বজয়া করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গা (বড়) উমা দাশগুপ্তা, অপু শ্রীমান্ সুধীর এবং ছোট দুর্গার ভূমিকায় কুমারী রুণ কি এককথায় অপূর্ব্ব! ছবিখানিকে নিখুঁত করিবার জন্য যেখানে এত যত্ন লওয়া হইয়াছে, সেখানে আধুনিক তৈজসপত্রের ত্রুটি ও খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ বহন করা আমাদের চোখে লাগিয়াছে। তৈজসগুলি সেকেলে হওয়া উচিত ছিল। আর পল্লীগ্রামে মৃতদেহ বহনের জন্য কলিকাতা শহরের ন্যায় দড়ির খাটিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ বাঁশের 'চালি' অথবা একটি বাঁশের সাহায্যে মৃতদেহ বহন করা হইয়া থাকে। ইহা খেয়াল করা উচিত ছিল। মোট কথা 'পথের পাঁচালী' বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি পরিচ্ছেদ বিশেষ।

আর্য্য সঙ্গীতে রাগ ও রাগিণী

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ বি-এল্

ইদানীং সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে যখনই কোন মার্গ সঙ্গীত বেতার যোগে শুনা যায় তখনই দেখা যায় যে ঘোষণাকারী কোন সুরের নাম বলিবার সময় ইহা অমুক রাগ বলিয়া ঘোষণা করেন যদিও তাহা রাগিণী। ইহার কারণ আধুনিক সঙ্গীত শাস্ত্র বিদদের মতে সমস্তই রাগ, রাগিণী বলিয়া কোন কিছুই নাই। তাঁহারা বলেন যে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে রাগিণী বলিয়া কিছুই নাই এবং এতদ্দেশীয় সঙ্গীত পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে আসিয়াছে এবং অনেক সঙ্গীত শাস্ত্রবিদরা এই পাশ্চাত্ত্য ও এতদ্দেশীয় সাঙ্গীতের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া এই কথাই বলিয়া থাকেন। এমন কি কোন প্রথিত নামা সঙ্গীত শাস্ত্রবিদ্ "খাম্বাজ" রাগিণীর আলোচনাকালীন তাহাকে রাগ বলিয়া পরিচয় দিয়া কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা দেখিলেই বুঝা যায় উহা রাগিণী না হইয়া যায় না। এই সকল সঙ্গীত শাস্ত্রবিদদের মতে প্রকৃতি বলিয়া কিছুই নাই। এই সকল শাস্ত্রবিদ্‌রা বৌদ্ধদের ন্যায় পথে বাহির করিতে পারেন কিন্তু গন্তব্যের সন্ধান জানেন না। ইঁহাদের মতে আধার আছে আধেয় নাই। হাঁড়ির কপোল আছে কপাল নাই। কিন্তু কথা হইতেছে চির প্রচলিত বেদে পুরাণে উক্ত ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী কি এত সহজেই চলিয়া যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উল্লিখিত আছে যে ব্রহ্মা সমুদায় বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া পরিশেষে কামুক পুরুষের ন্যায় প্রিয়তমা সাবিত্রী দেবীতে আসক্ত হইয়া গর্ভাধান করিলেন। সুপ্রসবা সাবিত্রীদেবী দিব্য শত বর্ষ কাল সুদুঃসহ গর্ভাভার বহন করত বেদ চতুষ্টয়, মনোহর দিব্যমূর্ত্তি ছত্রিশ রাগিণী এবং নানা প্রকার তাল যুক্ত মনোহর ছয় রাগ প্রসব করিলেন।

জীবের অন্তরে বেদন ও সংজ্ঞা দ্বারা জীবের বোধ ও তাহাকে বাহ্য-জগৎ প্রদর্শন করান প্রসবৃত্তি শক্তি হইল সাবিত্রী যিনি ব্রহ্মার দক্ষিণে অবস্থিত। যে শক্তি জীবের প্রাণকে আকৃষ্ট করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সক্রিয় করে তাহাই রাধা। এইজন্য জীবের অন্তরে রাধামাধব বিরাজমান। মন ইন্দ্রিয় ভিন্ন কার্য্য করে না। তাই মতির মালা শ্রীরাধার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া সদাই দোদুল্যমান।

যে শক্তির দ্বারা জীব তাহার স্বকীয় অন্তরের বেদন অপরের নিকট প্রকাশ করে তাহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী যিনি ব্রহ্মার বামে অবস্থিত। যে শক্তি দ্বারা বাক্য ছন্দ বদ্ধ করিয়া গানাকারে ব্যক্ত করে তাহাই গায়ত্রী। ধ্বনি ব্যতীত বাক্য নাই এবং বাক্যের বিশেষ গতির জন্য ধ্বনির বিশেষ গতি।

দেবী সরস্বতী অন্তঃকরণের প্রশান্ত অবস্থায় শরীরস্থ অগ্নির সাহায্যে বেদন হইতে তরঙ্গ উত্তোলন করেন। "সরস্বতী মহোর্ণব প্রচেতয়তি কেতুনা" (ঋগ্বেদ)। সেই তরঙ্গ বিষয়ের বিশেষভাবে ভাবিত হইয়া অন্তঃকরণকে অনুরঞ্জিত করিয়া রাগ উৎপন্ন করে। ঐ রাগ জীবে প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী উদীপ্ত হয়। অন্তঃকরণ রাগের অধীন শরীরস্থ বায়ুকে সঞ্চারণ করে। কারণ রাগ উদীপ্ত অগ্নিস্বরূপ। ম বিষয়ের বিশেষজ্ঞের ভাব অন্তঃকরণকে আচ্ছাদন করিয়া বন্ধন করে তাহাতে প্রাণবায়ুর ছন্দ উৎপন্ন হয়। তাহাই অনাহত ধ্বনি। যা হইতে ধ্বনি উৎপন্ন হয় বস্তুতঃ তাহা শব্দহীন। ছন্দে আবদ্ধ বা শরীরস্থ বিশেষ অঙ্গের স্পন্দন সৃষ্টি করিয়া শব্দ নির্গত করে। কল্পিত রসন কণ্ঠ, তালু, দন্ত, মূর্দ্ধা ও ওষ্ঠ দ্বারা আঘাত নিমিত্ত বিভিন্ন শব্দ প্রকাশি হয়। ইহাই আহত বা আঘাত হইতে উৎপন্ন ধ্বনি। অনাহত ধ্ব সপ্তস্বর প্রসব করে এবং আহত ধ্বনি তাহা প্রকাশ করে। এ সপ্তস্বর হইতে চতুর্দ্দশ স্বরবর্ণের উৎপত্তি (দ্বিগুণশ্চোত্তরঃ)। আহ ধ্বনি স্বরকে ব্যাঘাত প্রদান করিয়া বঞ্জনা করে। এবং ছয় স্থা ব্যাঘাত হেতু ছত্রিশ ব্যঞ্জন বর্ণের উৎপত্তি। কারণ পরস্পর গুণি হেতু ছত্রিশ। এই ছয় স্থানে ছয় রাগ অধিষ্ঠিত এবং এই ছত্রিশ ব্যঞ্জ বর্ণই ছত্রিশ রাগিণী। ইন্দ্রিয়াগ্নি হইতে অক্ষর কারণ অক্ষ অ ইন্দ্রিয় ও "র" অর্থে তেজ। সেই হেতু স্বয়ম্ভু অক্ষমালা ধারণ করেন।

"সদ্যোজাতাচ্চ শ্রীরাগো বামদেবাদ্বসন্তকঃ।
অঘোরাদ্ভৈরবোভূত্তৎপুরুষাৎ পঞ্চমোভবেৎ॥
ঈশানাখ্যান্মেঘ রাগঃ নাট্যারম্ভে শিবাদ্ভূৎ।
গিরিজায়া মুখাল্লাস্যে নটনারায়ণো ভবেৎ॥"

অনুপ সঙ্গীত রত্নাকর

সদ্যোজাত মুখ হইতে শ্রীরাগ। যিনি সদ্যোভূত তিনিই সদ্যোজাত সমুদ্র মন্থনে শ্রীই সদ্যোভূত। ধ্বনি কণ্ঠেই প্রথম উদ্ভূত হয় সেই হে কণ্ঠে শ্রীরাগের অধিষ্ঠান।

বামদেব অর্থে কন্দর্প এবং কন্দর্পের ক্রিয়া বসন্তে। সেইজন্য বামদেব মুখ হইতে বসন্ত। কন্দর্প অর্থে কাম। কামের প্রথম ক্রি ওষ্ঠে। সেই হেতু বসন্ত রাগের অধিষ্ঠান ওষ্ঠে।

অঘোর অর্থে যাহার ঘোর নাই অর্থাৎ যাহার বিকার নাই সেই হেতু অঘোর মুখ হইতে ভৈরব। অঙ্গচালনে তালুর বিকার নাই সেই জন্য ভৈরব রাগের অধিষ্ঠান তালুতে।

তৎ পুরুষ অর্থে আদি পুরুষ অর্থাৎ ভূতনাথ যিনি সকল ভূতে অধিপতি। সেই হেতু পঞ্চম রাগ এই মুখ হইতে উদ্ভূত। রসন সকল ভূতের অধিপতি। সেই কারণ পঞ্চম রাগের অধিষ্ঠান রসনায়।

ঈশান মহাদেবের সূর্য্যমূর্ত্তি জ্ঞাপক এবং সূর্য্য হইতেই মেঘে উৎপত্তি। সেই হেতু মেঘ রাগের আবির্ভাব ঈশান মুখ হইতে। মে

গিরি শীর্ষে উত্থিত হইয়া রস বর্ষণ করে। সেইজন্য মেঘ রাগের অধিষ্ঠান হয়।

গিরিজায়া এই সকল শ্রবণে আনন্দে প্রমত্ত হইয়া নিজে একটি গাহিলেন। সেই গায়নকালে তাহার আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হয়। নার অর্থে আপ এবং অয়ন অর্থে আশ্রয়। যে হেতু নায়নাশ্রুতে তাঁহার দেহ আপ্লুত সেই হেতু এই রাগের নাম নটনারায়ণ। কারণ মহাদেবের নাম নটরাজ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উল্লিখিত আছে যে দন্তই হইল বল অর্থাৎ শক্তির প্রতীক। গণপতি এক দন্ত হওয়া হেতু তাঁহার তুল্য শক্তিমান কেহই নাই। এই কারণ বশতঃ নটনারায়ণ রাগের অধিষ্ঠান দন্তে।

এই প্রত্যেক স্থানে ছয় রকম ভাবে ব্যঞ্জন হওয়া হেতু ছত্রিশ রাগিণী। ইহার আলোচনা পরে করিবার বাসনা রহিল।

ব্রহ্মাণ্ড আধার ও আধেয় রূপে পরিক্লৃপ্ত। আধার ব্যতীত আধেয়ের অভাব হয় না। ফলের আধার পুষ্প, পুষ্পের আধার পল্লব, পল্লবের আধার শাখা, শাখার আধার বৃক্ষ, বৃক্ষাধার বীজযুক্ত অঙ্কুর, অঙ্কুরাধার সৃষ্টি, অষ্টি আধার বসুধা, বসুধা আধার অনন্ত, অনন্তাধার কূর্ম্ম, কূর্ম্মাধার কারণবারি এবং সর্ব্বকারণের আধার রাধা যিনি ধারাকে প্রবাহিত করিয়া কৃষ্ণাধার। সেইজন্য পুরুষ ও প্রকৃতি অভিন্ন। সেই হেতু শক্তিমান ঈশ্বর শক্তি ব্যতীত নাই। এইজন্যই রাধামাধব অভিন্ন ও সদাই বিরাজমান। তাঁহাদের ছাড়াছাড়ি নাই বা তাঁহাদের ভেদ নাই। রাধাই শক্তিসমূহ ও ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি। রাধাই শরীর স্বরূপ ত্রিগুণের আধাররূপিণী। কৃষ্ণ রাধার সহযোগে চেষ্টাবান। পুরুষ হইতে বীজ উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতি কলাসম্ভূতা কামিনী তাহার আধার-রূপিণী। দেহ ভিন্ন আত্মা বা আত্মা ভিন্ন দেহ থাকিতে পারে না। উভয় ব্যতীত কাহারও উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি, জল ও তাহার শৈত্য, দুগ্ধ ও তাহার ধবলতা সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। ইহাই হইল শিব-শক্তি তত্ত্ব। সাধকের সাধনাতত্ত্ব ও ভক্তের আরাধনাতত্ত্ব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সাবিত্রী দেবী হইতে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী উদ্ভব হইয়াছে। ইহা কিরূপে সম্ভব তাহা বৈদিক কালচক্র সহায়ে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে শুক্র রাশিস্থ রোহিণী নক্ষত্র ঈশ রাশিস্থ হস্তা নক্ষত্রের সহিত সম্বন্ধ বদ্ধ এবং তাহা পুনরায় তপ রাশিস্থ শ্রবণা নক্ষত্রের সহিত সম্বন্ধ বদ্ধ। রোহিণী নক্ষত্রের দেবতা প্রজাপতি ব্রহ্মা যিনি সৃষ্টি করেন এবং হস্তা নক্ষত্রের দেবতা সবিতৃ যিনি রব প্রসব করেন এবং শ্রবণা নক্ষত্রের দেবতা বিষ্ণু যিনি ধারণ করেন। এই শ্রবণা নক্ষত্রের সংখ্যা হইল বাইশ। অর্থাৎ বাইশটী শ্রবণযোগ্য ধ্বনির উৎপাদন হয়। এই বাইশটী ধ্বনিই হইল আর্য্য-সঙ্গীতে বাইশটী শ্রুতি (শ্রুয়তে সা-শ্রুতি)। এই বাইশটী শ্রুতির সংযোগে যাবতীয় রাগ ও রাগিণী সৃষ্ট।

এই শ্রুতিসমূহের বিশিষ্ট বণ্টনে সপ্তস্বর অধিষ্ঠিত। ইহা পূর্ব্বে শ্রুতি ও স্বর নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। চতুর্থ শ্রুতিতে ষড়জ, সপ্তম শ্রুতিতে ঋষভ, নবম শ্রুতিতে গান্ধার, ত্রয়োদশ শ্রুতিতে মধ্যম। এই মধ্যম স্বর সপ্তকটীকে দুইটী সমান অংশে বিভাগ করিয়া অবস্থিত হওয়া হেতু তাহাকে স্বার্দ্ধস্বর আখ্যা প্রদান করা হয়। অর্থাৎ মাতা যেমন পিতা ও পুত্রকে ধারণ করিয়া থাকেন সেইরূপ মধ্যমস্বর স্বরসপ্তকের মধ্যমে অবস্থিত হইয়া দুই অর্দ্ধকে ধারণ করিয়া অবস্থিত। সপ্তদশ শ্রুতিতে পঞ্চম, বিংশ শ্রুতিতে ধৈবত এবং দ্বাবিংশ শ্রুতিতে নিষাদ অবস্থিত। এই স্বর সমূহের দেবতা সকল শ্রুতি ও স্বর নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে তথাপি তাহার পুনরালোচনা প্রয়োজন। ষড়জ স্বরের দেবতা ব্রহ্মা, ঋষভের অগ্নি, গান্ধারের দেবতা শঙ্কর, মধ্যম-স্বরের দেবতা ভারতীদৈবত, পঞ্চমের স্বয়ম্ভু, ধৈবতের শম্ভু ও নিষাদের দেবতা গণপতি।

এই যে সপ্তস্বর ইহাই হইল আদি স্বরসপ্তক এবং ইহাকে ষাড়জীগ্রাম নামে অভিহিত করা হয়। কারণ ষড়জ স্বর হইতে সকল স্বরের উদ্ভব এবং এই ষড়জস্বর ধরিয়া সপ্তকটী গঠিত।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে গ্রাম কাহাকে বলে। সাধারণতঃ যখন কোন স্থানে লোক বসতি করে তখন সেই বিশিষ্ট স্থানটীকে গ্রাম আখ্যা প্রদান করা হয়। এইরূপে একদেশে বহুগ্রাম অবস্থিত। সেইজন্য সঙ্গীত শাস্ত্রে স্বরসমূহকে গ্রাম বলে।

"গ্রামঃ স্বর সমূহঃ।
যথা লোকে জন সমূহো গ্রাম ইত্যুচ্যতে,
এবমত্র স্বর সমূহো গ্রাম ইতি বিবক্ষিতঃ॥"

"সঙ্গীত রত্নাকর"

অনেকের ধারণা মন্দ্র, মধ্য ও তার এই ত্রিস্থান তিনটী গ্রাম। এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। ইহারা গ্রাম নহে—ইহাদের স্থান বলা হয়। এই প্রত্যেক স্থানেই তিন গ্রাম অর্থাৎ ষাড়জী, মধ্যম ও গান্ধার গ্রাম অবস্থিত। এই তিন স্থানের দেবতা—

"স্থানত্রয়ে দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরঃ।"

"সঙ্গীত রত্নাকর"

মন্দ্র-স্থানের দেবতা ব্রহ্মা, মধ্য-স্থানের দেবতা বিষ্ণু ও তার-স্থানের দেবতা মহেশ্বর। এই তিন দেবতা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের দ্যোতক। মন্দ্র-স্থানে স্বরের উৎপত্তি, মধ্য-স্থানে তাহার স্থিতি এবং তার-স্থানে তাহার লয়।

আর্য্য সঙ্গীতে দুইটীমাত্র গ্রামের প্রচলন এবং তাহার মধ্যে ষড়জ-গ্রাম আদি।

"তৌ দ্বৌ ধরাতলে তত্র স্যাৎ ষড়জগ্রাম আদিমঃ॥"

"সঙ্গীত রত্নাকর"

এই ষড়জ গ্রামের স্বরাবলীর মধ্যে কোন বিকৃত স্বর অর্থাৎ কড়ি বা কোমল স্বর নাই। ইহারা সকলেই শুদ্ধ। এই স্বরাবলীকে বিকৃত করিবার জন্য দ্বিতীয় বা তৃতীয় গ্রামের উৎপত্তি।

যখন কোন বিশিষ্ট স্বর লইয়া সপ্তক গঠন করা হয় তখন যে স্বরটী লইয়া সপ্তক গঠিত হয় সেই স্বরটীর নামানুযায়ী স্বর সপ্তককে সেই গ্রাম বলা হয়। অর্থাৎ যদি ষড়্জ স্বর হইতে সপ্তক গঠন করা হয় তখন সপ্তকটাকে ষড়্জ গ্রাম বলা হয়। সেইরূপ গান্ধার, মধ্যম ইত্যাদি। কিন্তু আর্য্যসঙ্গীতে মাত্র দুইটী গ্রাম প্রচলিত যথা—ষাড়্জী ও মধ্যম। যদিও গান্ধার নামক আর একটী গ্রাম সঙ্গীতশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে কিন্তু তাহার প্রচলন নাই। কারণ গান্ধার স্বর উপান্তে অবস্থিত হওয়া হেতু তাহা ধরাতলে প্রয়োগ সম্ভব নহে।

যেমন পৃথিবীর উত্তর বিন্দু হইতে দক্ষিণ বিন্দু পর্য্যন্ত কল্পিত রেখাকে মেরু বলা হয় সেইরূপ আদিস্বর সপ্তককে মেরু কহে। এই মেরুকে যখন খণ্ডিত করা হয় তখন খণ্ডমেরু আখ্যাপ্রদান করা হয়। এই মেরুকে খণ্ডন করিয়া মধ্যম বা গান্ধার গ্রামের উৎপত্তি। সঙ্গীত পারিজাত বলেন—"মধ্যমে মেরু সংস্থেস্মিন্ মধ্যম গ্রাম সম্ভবঃ।"

অর্থাৎ মধ্যম স্বরকে অবলম্বন করিয়া যখন সপ্তক গঠন করা হয় তাহাকে মধ্যম গ্রাম বলা হয়। সেইরূপ গান্ধার স্বর অবলম্বনে যে সপ্তক গঠন করা হয় তাহাকে গান্ধার গ্রাম বলা হয়—

"যদা গ মেরুগো ভবেৎ গান্ধার গ্রাম ইষ্যতে।
প্রবর্ত্ততে স্বর্গলোকে গ্রামোসৌ ন মহীতলে॥"
—সঙ্গীত পারিজাত

এই গান্ধার গ্রাম স্বর্লোকে অবস্থিত। মহীতলে ইহার প্রচলন নাই।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে মেরু শব্দের অর্থ কি। মেরু কথাটী মি+রু+ক প্রত্যয়ে উৎপন্ন। মি অর্থে ক্ষেপন। মিনোতি ক্ষিপতি। মেরু হইল প্রকৃতি শক্তি দ্বারা ভূত ক্ষেপন কর্ত্তা। এই হেতু পূজায় ধূপ, ধূনার ব্যবহার। কারণ ইহাদের গন্ধ ক্ষেপন ক্ষমতা আছে। সেইজন্য ইহাদের মেরুক বলা হয়। মিনোতি ক্ষিপতি গন্ধান। পৃথিবীর সুমেরু (North Pole) ও কুমেরু (South Pole) সূর্য্যের গতি ক্ষেপন করিয়া উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন প্রবর্ত্তন করে। অর্থাৎ স্বর্গে তে'লে আবার পৃথিবীতে জন্ম দেয়। বেদে দ্যাবা পৃথিবী ইহাকেই বুঝায়। এই কারণবশতঃ জপমালায় মেরু অবলম্বন করিয়া জপ করিতে হয়। তাহা লঙ্ঘন করিতে নাই। এই বিক্ষেপনী শক্তি যাহার আছে তাহাই মেরু। মানবদেহে গুহ্যপ্রদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত পৃষ্ঠদেশে পর্ব্বযুক্ত যে অস্থিদণ্ড অবস্থিত তাহাকে মেরুদণ্ড কহে। এই মেরুদণ্ডে তেত্রিশটী পর্ব্ব আছে। উহা হইতে গ্রহণী ও বিক্ষেপণী নাড়ীর উৎপত্তি (efferent and afferent nerves)। এই মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে বামে ও দক্ষিণে দুইটী সূক্ষ্ম নাড়ী অবস্থিত। তাহাদের নাম ইড়া ও পিঙ্গলা এবং তাহাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম নাড়ী আছে তাহার নাম সুষুম্না। এই সুষুম্না নাড়ী হইল ব্রহ্ম নাড়ী। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয় হইল গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী। এই ত্রিনাড়ীর মিলন স্থানকেই ত্রিবেণী বলা হয়। এই ত্রিনাড়ীর গতি আমাদের বাহ্যজগৎকে জানায় এবং মন ও দেহকে বিক্ষেপ করে। মেরুদণ্ডই পঞ্চভূতের আধার স্বরূপ পঞ্চভূতাত্মক দেহধারণ করে এবং তাহাদেরই জ্ঞানের সহায় আমাদের মস্তিষ্ককেও ধারণ করে। এই সুষুম্না নাড়ীকে বেষ্টন করিয়া নাদরূপী কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থিত। এই তিন নাড়ীই হইল রবি, চন্দ্র ও অগ্নি। চৈতন্যস্বরূপ রবির সংখ্যা হইল ৩৩ এবং আমাদের মধ্যে যে ব্যভিচারি ভাব অবস্থিত তাহারও সংখ্যা ৩৩। বেদে দেবতার সংখ্যাও তেত্রিশ—যথা দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, প্রজাপতি ও বষট্‌কার। ইহারাই কোটী শক্তিসম্পন্ন হওয়া হেতু তেত্রিশ কোটি।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে মধ্যম স্বরে মেরু সংস্থাপনের তাৎপর্য্য কি। মধ্যম স্বরে মেরু সংস্থাপনের কারণ ষাড়্জী গ্রামের শুদ্ধত্বের হানি করিবার জন্য। ষাড়্জী গ্রাম শুদ্ধ স্বরসপ্তকের দ্বারা গঠিত। শাস্ত্র-যথা—"শুদ্ধাশ্রয়ত্বাত্তত্রাত্বঃ ষড়্জ গ্রামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" যেহেতু ষড়্জগ্রাম শুদ্ধ স্বরাবলীর দ্বারা গঠিত সেই হেতু ইহাকে পুরুষ বলা হয়। এই শুদ্ধ স্বরাবলীকে পুরুষ বলিবার হেতু এই যে ইহাদের অধিষ্ঠান হইতেই অন্যান্য স্বরাবলীর বিকাশ প্রতীয়মান হয়। যেহেতু ইহারা শুদ্ধ সেই হেতু ইহাদের বিকার নাই। এই শুদ্ধ স্বরাবলী বিকৃত স্বরাবলীর নিমিত্ত কারণ হওয়া হেতু পুরুষ। এই কারণবশতঃ ষাড়্জী গ্রামকে পুরুষ আখ্যা প্রদান করা হয়।

মধ্যম স্বরের দেবতা ভারতী দৈবত যাহা আর্য্যদিগের একাধারে সাবিত্রী, সরস্বতী ও গায়ত্রী। এই মধ্যম স্বরে মেরু সংস্থাপনের হেতু মধ্যমগ্রামের উৎপত্তি। ইহাকেই বলা হয় প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই হইল ব্রহ্মের বিভু বা শক্তি। প্র-শব্দে প্রকৃষ্টার্থ বুঝায় এবং কৃতি শব্দের অর্থ সৃষ্টি। অতএব সৃষ্টি কার্য্যে যিনি প্রকৃষ্টা তিনিই প্রকৃতি। শ্রুতিতে প্র-শব্দে প্রকৃষ্ট সত্ত্বগুণ কৃ-শব্দে রজোগুণ এবং তি-শব্দে তমোগুণ—অর্থাৎ যিনি ত্রিগুণাত্মিকা সর্ব্বশক্তিসম্পন্না এবং সৃষ্টি ব্যাপারে প্রধানা তিনিই প্রকৃতি। আবার প্র-শব্দের অর্থ প্রথম এবং কৃতি-শব্দের অর্থ সৃষ্টি। অতএব যিনি সৃষ্টি ব্যাপারে আদিভূতা তিনিই প্রকৃতি। এই প্রভৃতিই ব্রহ্মকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। তাহাদের কখন ছাড়াছাড়ি নাই। যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি। এই কারণবশতঃই আর্য্যদিগের বিবাহ-বিচ্ছেদ নাই। এই সৃষ্টিকার্য্য হেতু প্রকৃতির বিকার হয়। এই কারণবশতঃ মধ্যম গ্রামস্থ স্বরাবলীর বিকারপ্রাপ্ত হয়।

সেইরূপ গান্ধার স্বরে মেরু সংস্থাপন হেতু গান্ধার গ্রাম উৎপন্ন। গান্ধার স্বরের দেবতা শঙ্কর যিনি পরশু দ্বারা বুদ্ধিতত্ত্বকে দ্বিধা করিয়া অহং ও ইদং জ্ঞানের উৎপত্তি করেন। ইদং জ্ঞানই হইল প্রকৃতির জ্ঞান। এই ইদংএরই বিকার হয়। অহংএর বিকার নাই। এই বিকার হেতু ইহা প্রকৃতি। এই কারণবশতঃ গান্ধার গ্রামস্থ স্বরাবলী বিকারপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য মধ্যম ও গান্ধার গ্রাম উভয়ই প্রকৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত।

এই তিন গ্রামের স্বরাবলীর মূর্চ্ছনার সমন্বয়ে যাবতীয় রাগ ও রাগিণী সৃষ্ট। যেখানে ষাড়্জী গ্রামের মূর্চ্ছনা প্রবল তাহা রাগ নামে অভিহিত। কারণ ষাড়্জী গ্রামকে পুরুষ বলা হয় এবং যেখানে মধ্যম বা গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা প্রবল তাহা রাগিণী নামে পরিচিত।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে মূর্চ্ছনা কাহাকে বলে। মূর্চ্ছনা কথাটি মূর্চ্ছ+

অন্ ভা+আপ্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। মূর্চ্ছ অর্থে মূর্চ্ছিত হওয়া। মূর্চ্ছিত অর্থে মোহপ্রাপ্ত, বিস্তৃত, ব্যাপ্ত। অর্থাৎ ব্যাপ্তি হেতু যাহা মোহগ্রস্ত বা সম্মোহিত করে তাহাই মূর্চ্ছনা। ব্রহ্মার মানস পুত্র অনঙ্গ হইয়া সর্ব্বশরীরে বিচরণ করত যখন সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করেন তখনই মোহ হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রে স্বরাবলীর আরোহণ ও অবরোহণ ক্রমে এই সম্মোহন শক্তি অবস্থিত হওয়া হেতু তাহাকে মূর্চ্ছনা কহে। শাস্ত্র যথা—

"ক্রমাৎস্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্।
মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামদ্বয়ে তাঃ সপ্ত সপ্ত চ ॥"—সঙ্গীত রত্নাকর

এই মূর্চ্ছনা প্রতি গ্রামে সপ্ত সপ্ত করিয়া অর্থাৎ ষাড়্জী গ্রামে সপ্ত এবং মধ্যম গ্রামে সপ্ত। এই মোট চতুর্দ্দশ মূর্চ্ছনা। যদিও গান্ধার গ্রামে সপ্ত মূর্চ্ছনা অবস্থিত কিন্তু মহীতলে তাহাদের প্রচলন নাই। ষাড়্জীগ্রামে সপ্ত মূর্চ্ছনা যথা—

"আদাবুত্তর মন্দ্রা স্যাদ্রজনী চোত্তরায়তা।
চতুর্থ শুদ্ধষড়্জা চ পঞ্চমী মৎসরীকৃতা ॥
অশ্বক্রান্তা তথা ষষ্ঠি সপ্তমী চাভিরুদ্গতা।
ষড়্জ গ্রামাশ্রিতা হ্যেতা বিজ্ঞেয়াঃ সপ্ত মূর্চ্ছনা ॥"—নাট্যশাস্ত্র

অর্থাৎ—১। উত্তরমন্দ্রা ২। রজনী ৩। উত্তরায়তা ৪। শুদ্ধ ষড়্জা ৫। মৎসরীকৃতা ৬। অশ্বক্রান্তা ৭। অভিরুদ্গতা।

এই মূর্চ্ছনাসমূহের দেবতা—

"যক্ষ রক্ষ নারদাজভবনাগাশ্বিপাশিনঃ।
ষড়্জগ্রামে মূর্চ্ছনানামেতাঃ স্যুর্দেবতাক্রমাৎ ॥"—সঙ্গীত রত্নাকর

অর্থাৎ—১। যক্ষ ২। রক্ষ ৩। নারদ ৪। অজ ৫। ভবনাগ ৬। অশ্বি ৭। পাশিন্।

১। উত্তরমন্দ্রা—ষড়্জ (ব্রহ্মদৈবত)

মন্দ্র, মধ্য ও তার এই ত্রি-স্থান। মন্দ্রস্থানের যাহা উত্তর তাহাই উত্তরমন্দ্রা। মন্দ্রস্থানে স্বরের উৎপত্তি এবং মধ্যস্থানে তাহার স্থিতি। সেই হেতু মধ্যস্থানের ষড়্জ স্বর হইতে যে মূর্চ্ছনার উদ্ভব তাহাকে উত্তর-মন্দ্রা নামে অভিহিত করা হয়। এই মূর্চ্ছনার দেবতা যক্ষ যিনি প্রোথিত ধনরাশির রক্ষক এবং ইনি উত্তরদিকের অধিপতি।

২। রজনী—নিষাদ (গণদৈবত)

রজনী অর্থে নিশা। অর্থাৎ যিনি দিনের অন্তে অবস্থিত। স্বরসমূহের অন্তস্বর লইয়া এই মূর্চ্ছনার উৎপত্তি হেতু ইহার নাম রজনী। এই মূর্চ্ছনার দেবতা রক্ষ যিনি নিশার অধিপতি।

৩। উত্তরায়তা—ধৈবত (শম্ভুদৈবত)

আয়তা—আ+যম্+ক্ত। যাহা সংযমনের উত্তর। অর্থাৎ বোধ ও চিত্ত জন্য ও জনকের মত সম্বন্ধে আবদ্ধ। অর্থাৎ যে শক্তি জ্ঞান দেবতারূপে ধীশক্তির সহিত সম্বন্ধ করে। এই কারণ এই মূর্চ্ছনাকে উত্তরায়তা বলা হয়। এই মূর্চ্ছনায় দেবতা নারদ যিনি কামচর হেতু সর্ব্বত্র গতায়াত করেন। বায়ু পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বত্র গতায়াত করে। স্বর পৃষ্ঠস্থানে ধৃত হওয়া হেতু ধৈবত আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

৪। শুদ্ধষড়্জা—পঞ্চম (স্বয়ম্ভূদৈবত)

আত্মার বিশেষ ক্ষেপণ হেতু এই স্বর উদ্ভূত হয় বলিয়া ইহাতে ষড়্জ স্বরের সকল গুণ নিহিত হওয়া হেতু এই মূর্চ্ছনার নাম শুদ্ধ ষড়্জা। ইহার দেবতা অজ যিনি বিষ্ণুর নাভিকমলোদ্ভব এবং ইনিই ষড়্জ স্বরের অধিপতি হওয়া হেতু এই মূর্চ্ছনার নাম শুদ্ধ ষড়্জা।

৫। মৎসরীকৃতা—মধ্যম (ভারতীদৈবত)

যিনি ইন্দ্রজালে ধৃতা হওয়া হেতু বেদব্যাসের উদ্ভব। মধ্যমস্বরের দেবতা সাবিত্রী। মৎস্যগন্ধা হেতু কুরুকুলের বিস্তার। মধ্যম স্বর হেতু স্বর সমূহের বিস্তার। সেইজন্য এই মূর্চ্ছনার নাম মৎসরীকৃতা। ইহার দেবতা ভবনাগ যাহা চিৎ ও অচিতকে বন্ধন করে। যাহা হইতে উৎপত্তি অর্থাৎ বসতি।

৬। অশ্বক্রান্তা—গান্ধার (শঙ্করদৈবত)

"অশ্বক্রান্তা রথক্রান্তা বিষ্ণুক্রান্তেতি ত্রির্ভবে।
বিভক্তং ভারত বর্ষং বর্ষাণামুত্তমং ॥"
—আহ্নিক দীপিকা

"অশ্বক্রান্তায়া নাম ইষুজাত বর্ষ"। ইষু অর্থে বাণ, তীর। ইষু কথাটী ইষ্+উ+ক প্রত্যয়ে সিদ্ধ। ইষ অর্থে গমন করা এবং আশ্বিন মাস। অর্থাৎ অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে যে বৎসর গণনা করা হয় তাহাই অশ্বক্রান্তা; বা আশ্বিন মাস হইতে যে বর্ষ গণনা করা হয়।

"রথক্রান্তায়া অংশুমানক বর্ষ।" অংশুমান অর্থে অংশুযুক্ত, কিরণ-বিশিষ্ট, প্রভাশালী। সগর পুত্র উদ্ধার কল্পে কপিল মুনিকে স্তবে তুষ্ট করিয়া অংশুমান রাজা গঙ্গা আনয়ন করেন। গঙ্গাই মকর বাহিনী। মকর রাশি হইতে যে বর্ষ আরম্ভ তাহাকে রথক্রান্তা বলে। মকর রাশিতে অংশুমানের প্রবেশ হেতু নেমি শীর্ণ হয় অর্থাৎ উত্তরায়ণ ধরিয়া যে বর্ষ তাহা রথক্রান্তা।

"বিষ্ণুক্রান্তাসেচনক বর্ষ।" অসেচনক অর্থে সৌম্য দর্শন। যাহাকে দেখিয়া তৃপ্তির শেষ হয় না। ন সেচন। সেচন অর্থে উক্ষণ। সেচন —সিচ্+ণক্+ক্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। সিচ অর্থে সিক্ত করা। যাহার পদ হইতে রস ক্ষরণ হইয়া সর্ব্বাদি সিক্ত। বিষ্ণুর ত্রিপাদ হেতু ত্রিকাল রূপ বর্ষ। ক্রান্ত অর্থে ব্যাপ্ত—যাহার ত্রিপাদ ত্রিলোক ব্যাপ্ত। বিষ্ণুর পাদ হইতে সেচন হেতু গঙ্গার উদ্ভব এবং তিনি ত্রিলোক ব্যাপ্ত হয়েন সেইজন্য তিনি বিষ্ণুপদী। সেচন হইল বর্ষণ। বৃষ রাশি হইল ধর্ম্ম রাশি। বৃষণ হইতে বর্ষণ। সুতরাং বৃষ রাশিস্থ কৃত্তিকা নক্ষত্র অবলম্বন করিয়া যে বর্ষ তাহাই বিষ্ণুক্রান্তা।

গান্ধার স্বর হইতে যে মূর্চ্ছনার উদ্ভব তাহার নাম অশ্বক্রান্তা। কারণ অশ্বের গতি হইল চার দুই এক তিন। ষড়্জ স্বর চতুশ্রুতি সম্পন্ন এবং গান্ধার স্বর দুইশ্রুতি সম্পন্ন। এই স্বরের দেবতা হইল শঙ্কর যিনি অহং ও ইদংজ্ঞান উৎপন্ন করেন। এবং এই মূর্চ্ছনায় দেবতা হইল অশ্বি। অশ্বি হইল সংজ্ঞাসুত। সংজ্ঞা উৎপন্ন না হইলে [illegible]

৭। অভিরুদ্ধতা—ঋষভ (অগ্নিদৈবত)

অভিরু অর্থে ভৈরব। শিব যিনি পরশু দ্বারা অহং ও ইদং জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া পাশ দ্বারা বন্ধন করেন। সেই জন্য এই মূর্চ্ছনার দেবতা পাশিন্—অর্থাৎ বরুণ যিনি পাশদ্বারা বন্ধন করেন। রবির দেবতা শিব ও অগ্নি। বেদে রুদ্রই অগ্নি।

এই সমস্ত মূর্চ্ছনা ষাড়জী গ্রামের এবং ইহাই হইল পুরুষ। এক্ষণে মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা যথা—

"সৌবীরী হরিণাশ্বথ স্যাত্কলোপনতা তথা।
শুদ্ধমধ্যাতথাচৈব মার্গী স্যাচ্ছোরবীতথা ॥
হৃষ্যকা চেতি বিজ্ঞেয়া সপ্তমী দ্বিজসত্তমাঃ।
মধ্যম গ্রামজা হ্যেতা বিজ্ঞেয়াঃ সপ্ত মূর্চ্ছনাঃ ॥"
— নাট্যশাস্ত্র

অর্থাৎ—১। সৌবীরী ২। হরিণাশ্ব ৩। কলোপনত ॥
৪। শুদ্ধ মধ্যা ৫। মার্গী ৬। পৌরবী ৭। হৃষ্যকা।

মধ্যমগ্রামের মূর্চ্ছনায় দেবতা—

"ব্রহ্মেন্দ্র বায়ু গন্ধর্ব্ব সিদ্ধক্রহিণ ভানবঃ।
স্যরিমা মধ্যম গ্রাম মূর্চ্ছনা দেবতা ক্রমাৎ ॥"
—সঙ্গীত রত্নাকর

অর্থাৎ—১। ব্রহ্মা ২। ইন্দ্র ৩। বায়ু ৪। গন্ধর্ব্ব ৫। সিদ্ধ
৬। ক্রহিণ ৭। ভানু ॥

১। সৌবীরী—মধ্যম।

পুরাণে উল্লিখিত আছে যে মনস্যু রাজের স্ত্রী সৌবীরীর গর্ভে অশ্বগভানুর উৎপত্তি। অর্থাৎ মনেতে যে শক্তির প্রভাবে স্বর উৎপন্ন হয়। সৌবর অর্থে ধ্বনির শক্তি। এই মূর্চ্ছনায় দেবতা ব্রহ্মা যিনি ধ্বনি সৃষ্টি করেন।

২। হরিণাশ্ব—গান্ধার।

হরিণাশ্ব—পৃষদশ্ব, বায়ু। অর্থাৎ বায়ু হইয়াছে অশ্ব যাহার। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। সেই হেতু এই মূর্চ্ছনায়—দেবতা ইন্দ্র।

৩। কলোপনতা—ঋষভ।

মধুর অস্ফুট ধ্বনি। ধ্বনির বাহক বায়ু। সেই হেতু এই মূর্চ্ছনায় দেবতা বায়ু।

৪। শুদ্ধ মধ্যমা—ষড়জ।

যাহা হইতে ষড়জ স্বর উৎপন্ন। ষড়জ স্বর হইল আদি স্বর—সেই হেতু ইহা শুদ্ধা। ইহার দেবতা গন্ধর্ব্ব যাহার উদ্ভব ব্রহ্মার কান্তি হইতে এবং যাহার ধর্ম্ম হইল গান।

৫। মার্গী—নিষাদ।

এই মূর্চ্ছনায় দেবতা সিদ্ধ। যিনি দিনান্তে তপাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন তিনিই সিদ্ধ। নিষাদ দিনান্তে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা হেতু মার্গী।

৬। পৌরবী—ধৈবত।

যিনি পুরণ করেন। পুরুরাজ নিজ যৌবন দান করিয়া পিতার যৌবন পুরণ করা হেতু তিনি পুরু। এই মূর্চ্ছনায় দেবতা দ্রুহিণ যিনি কাম ক্রোধাদির বিরুদ্ধে দ্রোহ করিয়া পৌরবী।

৬। হৃষ্যকা—পঞ্চম।

হৃষ্যকা অর্থে রোমাঞ্চ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় রোধ হেতু আত্মার বিশেষ ক্ষেপন বশতঃ রোমাঞ্চ। সেই জন্য ইহার দেবতা ভানু অর্থাৎ যাহা আত্মা বিশেষ।

এই সপ্ত মূর্চ্ছনা মধ্যম গ্রামের এবং ইহাই হইল প্রকৃতি। আর্য্য সঙ্গীত এই চতুর্দ্দশ মূর্চ্ছনার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। যেখানে ষাড়জী গ্রামের মূর্চ্ছনা প্রবল তাহা রাগ এবং যেখানে মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা প্রবল তাহা রাগিণী। ইহাই হইল পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন এবং ইহাদের কখনও ছাড়াছাড়ি নাই।

এক্ষণে প্রচলিত ভূপালি সুরটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক ইহা রাগ বা রাগিণী। সকলেরই জানা আছে যে এই সুরটীতে পাঁচটী স্বর ব্যবহার করা হয় যথা—স র গ প ধ। মধ্যম ও নিষাদ বর্জ্জিত। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে যে সপ্ত স্বরের মধ্যে বিশেষ করিয়া মধ্যম ও নিষাদ স্বরদ্বয়কে বর্জ্জিত করিবার কারণ কি। ভূপালি অর্থে ভুর পালন কর্ত্তা। পালক ও পালিতের মধ্যে কাহারও মধ্যস্থ চলে না। সেই হেতু মধ্যম স্বর বর্জ্জিত। পালক শান্ত ভাবাপন্ন হইল শাসন চলে না। সেই কারণ নিষাদ ব্যবহার করা যায় না কারণ নিষাদ স্বর শান্তভাব জ্ঞাপক। অবশিষ্ট ঋষভ, গান্ধার ও ধৈবত সকলেই তীব্র অর্থাৎ চতঃশ্রুতি সম্পন্ন। অতএব দেখা যায় মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা প্রবল কারণ ষাড়জী গ্রামে ইহারা তিন ও দুই শ্রুতি সম্পন্ন। এই হেতু ইহা রাগিণী।

বর্ত্তমান যুগে তথাকথিত সঙ্গীত শাস্ত্রবিদরা কি ভাবে রাগ বা রাগিণী গঠিত এবং কি কারণে গ্রামএর ও কি কারণেই বা মধ্যম ও গান্ধার গ্রামের উদ্ভব তাহা সম্যক বুঝিবার প্রচেষ্টা না করিয়া দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে রাগিণী বলিয়া কিছুই নাই—সমস্তই রাগ। এই সকল সঙ্গীত শাস্ত্র বিদদের নিকট ইহাই আবেদন যে সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কিছু অভিমত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাহারা যেন শাস্ত্র সমূহ যাহা কহিতেছে তাহা সম্যক উপলব্ধি করেন এবং অর্বাচীনের ন্যায় নিজেদের অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া কৃতিত্ব প্রকাশ না করেন।

শিবম্

আরও মসৃণ, কমনীয় ত্বক্
দিনে দিনে...

হিতোপদেশ

অনুবাদ ঃ প্রফুল্লকুমার বসু

[সমারসেট মমের—Ant and the grasshopper গল্পের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ]

তখন খুবই ছোট আমি। হিতোপদেশের কতকগুলো গল্প আমায় পড়তে হতো। বড়রা তার সারমর্ম বুঝিয়ে দিতেন। যে-সব গল্প পড়েছিলাম তার মধ্যে একটি পিঁপড়ে আর ফড়িং-এর গল্প। এ গল্পে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বোঝান হয়েছে, এই ভেজাল পৃথিবীতে পরিশ্রমীরাই কেবল সুখভোগ করবে, আর কুড়ের দলের দুঃখের শেষ থাকবে না। প্রায় সবাই এ গল্প জানেন। তাই আবার তার পুনরাবৃত্তি করছি বলে গোড়াতেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। পিঁপড়ে সারা গরমকালটা খুব পরিশ্রম করলে, এতেই তার সারা বছরের সঞ্চয় হ'য়ে গেল। ফড়িংটা কিন্তু কুড়ের বাদশা। একটুও খাটবে না। সারাদিন কখনো ঘাসের ওপর, কখনো গাছের পাতায়, বসে বসে সূর্যদেবকে গান শোনায়। এমনি করে নেচে-গেয়ে, হেসে-খেলে তার দিন যায়। তারপর এক সময় হাড় কাঁপিয়ে শীত আসে। পিঁপড়ের কোনো অভাব নেই, সে তো আগেভাগেই সব গুছিয়ে রেখেছে। ফড়িং-এর কিন্তু ভারি দুর্দিন। খাবার জোটে না। না খেয়ে আর কতদিন থাকা যায়। তাই শেষে তাকে পিঁপড়ের শরণাপন্ন হতে হয়। পিঁপড়ে হিসেবী লোক। কুড়েমি বরদাস্ত করতে পারে না। বল্লে ঃ

"গরমকালে কি করছিলে বাপু ?"

"সারাদিন সারা রাত আমি গান গেয়ে বেড়িয়েছি।"

"ওঃ! তাহলে এখন নেচে বেড়াও।"

পিপড়েটাকে কিছুতেই আমি সমর্থন করতে পারতুম না। মানসিক বিকৃতি অবশ্য তার কারণ নয়, বরং শৈশবের নীতিহীন অপরিণামদর্শিতাই আমাকে লক্ষীছাড়া ফড়িংটার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। ছেলেবেলায় ফড়িং দেখলে কি আনন্দই হতো। আর পিঁপড়ে? পিঁপড়ে দেখলেই পা দিয়ে মাড়িয়ে দিতুম। সংসারী লোকদের প্রতি এইভাবে আমি আমার শিশু মনের ঘৃণা প্রকাশ করতুম।

কোনো এক রেস্তোরাঁয় জর্জর‍্যামসেকে দেখে হঠাৎ আমার সেই পুরনো গল্পটা আবার মনে পড়ে গেল। জীবনে কাউকে কোনোদিন এতটা বিমর্ষ হতে দেখিনি। শূন্য দৃষ্টি, বর্ষার মেঘমেদুর আকাশের মতো মুখখানা। জগতের সমস্ত দায় যেন ভগবান তার কাঁধেই চাপিয়ে দিয়েছে —এমনি ভাব। দেখে ভারি দুঃখ হলো। হতভাগা টমটা নিশ্চয় আবার জর্জকে জ্বালাতে শুরু করেছে।

কেমন আছ ?

ভাল নয়।

কেন ? আবার কি টম······ ?

জর্জ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। তবে কী টমের কোনো বিপদ-আপদ হয়েছে ? কিম্বা ? টম যতো পাজীই হোক। হাজার হোক মায়ের পেটের ভাইতো। দুঃখ তো হবেই।

—টমটা কি করেছে জান ?—বলে জর্জ আবার চুপ করে রইল। ওর কথায় খানিকটা আশ্বস্ত হলুম। টম তাহলে বেঁচেই আছে।

—ওকে একেবারে ছেঁটে ফেলছ না কেন ? অনেক তো করলে। কিছু কি হলো ? ওটা একেবারে বাউণ্ডুলে।

প্রত্যেক পরিবারেই একটা না একটা নচ্ছার থাকে।

টমও তাই। ভদ্রলোকের ছেলে। ভদ্রভাবেই তার জীবন-যাত্রা শুরু হয়। ব্যবসা করে বেশ দু'পয়সা ঘরে আনে। তারপর বিয়ে-থা করে সংসারী হয়। ছেলে-মেয়েও হয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই তার ওপর খুব খুশি। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, বংশের মুখোজ্জ্বল করবে—সকলের এই বিশ্বাস। কিন্তু হঠাৎ একদিন বিনামেঘে বজ্রপাত। টম সকলকে জানিয়ে দেয়, আর সে কাজকর্ম করবে না, বিয়ে করাও তার উচিত হয়নি, কারণ বিয়ের সে নাকি যোগ্য নয়। জীবনকে উপভোগ করতে চায় সে। কারুর কোন কথাই মানবে না ইত্যাদি। তারপর স্ত্রী-পুত্র, কাজ-কারবার সব ছেড়ে উধাও। হাতে তখন তার প্রচুর টাকা। ইয়োরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে দুটো বছর বেশ সুখে কাটলো। মাঝে মাঝে তার সম্বন্ধে নানা কথা আত্মীয় স্বজনদের কানে আসতো। তা শুনে তারা গালে হাত দিত। কেউ কেউ বলতো—"এখন বাবু বুঝছেন না। টাকা ফুটকড়াই হলে টের পাবেন।"

টাকা ফুটকড়াই হতে বেশিদিন লাগলো না। টম ধার করতে শুরু করেছে। ধার করতে তার মতো ওস্তাদ ছেলে জীবনে আর কাউকে দেখিনি। টম ধার চাইলে, কিছুতেই না বলা যায় না। বন্ধু-বান্ধবদের ঘাড় ভেঙে কিছু আমদানী হয়। লোককে জমাতেও একনম্বর ওস্তাদ। প্রায়ই টম বলতো—"যে টাকা নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসে ব্যয় হয়, তাতে কোন রস নেই, বিলাসিতার জন্যে যে টাকা, সেই টাকাই টাকা।" আর এর জন্যে সে ভাইয়ের ওপর নির্ভর করতো। জর্জ গম্ভীর প্রকৃতির লোক। টমের চালাকি তার কাছে বেশি দিন চলতো না। দু'একবার···টমের ভাল হবার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে বেশ কিছু টাকা তাকে দিয়েছিল—যাতে সে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে! সে টাকা দিয়ে টম অবশ্য একটা মোটর গাড়ি আর কিছু দামী গহনা কিনে ফেলে। জর্জ এবার বুঝেছে, টম আর কোনদিন সংসারী হবে না। ভাইয়ের সম্বন্ধে সব আশাই ছেড়ে দিয়েছে ও। টম কিন্তু জর্জকে ছাড়েনি। চাইলে যখন টাকা পাওয়া যায় না। বাধ্য হয়েই তাকে অন্য পথ ধরতে হয়।

ভাইকে তারই কোন প্রিয় রেস্তোরাঁয় ককটেল তৈরি করতে কিম্বা ট্যাক্সী চালাতে দেখলে জর্জের মতো একজন সর্বজনবরেণ্য আইনজীবীর—পক্ষে মুস্কিল হয় বৈকি তার পক্ষে এটা অগৌরবেরও বটে। টম কিন্তু একথ স্বীকার করে না। সে বলে, "দেখ তোমরা এই সামান্য বিষয়টা নিয়ে এত হৈ চৈ করছো কেন বুঝতে পারছি না। চুরিও করিনি, ডাকাতিও করিনি। খেটে খাব, তাতে লজ্জা কি? মদের দোকানে চাকরি করা ট্যাক্সি-চালান ছোট কাজ তো নয়ই, বরং খুবই সম্মানের কাজ। তবে দাদা যদি আমায় হাজার পাঁচেক টাকা দেন তো কোন কথাই নেই। তোমরা যখন বলছো, এতে আমাদের পরি-বারের মর্যাদা হানি হচ্ছে, আমি এসব ছেড়ে দিতে রাজি আছি।" জর্জকে বাধ্য হয়েই টাকাটা দিতে হয়।

একবার তো হতভাগাটা জেলে যেতে যেতে কোনরকমে বেঁচে যায়। জর্জ সেবার খুবই বিচলিত হয়েছিল। সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া তলিয়ে দেখে মুখখানা তার একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। না, হতভাগাটা সত্যিই বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। নিঃসঙ্কোচ, নিঃশঙ্ক আত্ম-কেন্দ্রিক বদখেয়ালী বটে, কিন্তু আগে কখনো সে এরকম জঘন্য অর্থাৎ বেআইনী (জর্জের মতে) কাজ করেনি। মামলা যদি কোর্ট পর্যন্ত গড়ায় তো ওর জেল অনিবার্য। আর বাদীও মামলা দায়ের করতে বদ্ধপরিকর। লোকটা যেমন একগুঁয়ে, তেমনি অসভ্য। জর্জের মুখের ওপর বললে, "পাষণ্ডটার জেল হওয়াই উচিত।" ব্যাপারটা মেটাতে জর্জকে কম মেহনত করতে হয়েছে? আর টাকার শ্রেফ্ শ্রাদ্ধ—হাজার দশেক টাকা বেরিয়ে গেল। কি করা যাবে? হাজার হোক মায়ের পেটের ভাই জেলে যাবে, এওতো বসে বসে দেখা যায় না। টম কিন্তু চেকট ভাঙিয়ে মন্টিকারলো বেড়াতে যায়। সঙ্গে অবশ্য বাদী ছিল। এ খবর পেয়ে জর্জ তো রেগে আগুন। এরকম রাগতে কখনো ওকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

কুড়ি বছর ধরে টম রেস আর জুয়া, মদ আর মেয়েমানুষ —এই নিয়ে কাটিয়েছে। বড় বড় রেস্তোরাঁয় খেয়েছে আর নাচ-গান হৈ-হল্লা করে বেড়িয়েছে। এমন সপ্রতিভ পৌরুষ আর কোথাও দেখেছি বলে তো মনে হয় না। পোশাক-পরিচ্ছদেও তেমনি কেতাদুরস্ত—যে কোন সময় দেখলে মনে হয়—এইমাত্র বুঝি সেজেগুজে বেরিয়েছে বয়েস প্রায় ছেচল্লিশ—কিন্তু পঁয়ত্রিশের বেশি মনে হয় না।

সঙ্গী হিসেবেও খুব আমুদে। ওর অপদার্থতা সম্বন্ধে হয়তো আপনাদের মনে কোন সন্দেহ না থাকতে পারে, কিন্তু কাছে পেলে ওকে আপনাদের ভালো লাগবেই। কিছুতেই ছাড়তে চাইবেন না। মাঝে মাঝে আমার কাছ থেকেও টম টাকা ধার নিত। অবশ্য বেশি নয়। জীবন-ধারণের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের জন্যেই আমার কাছে ও হাত পাততো। আর এ টাকা দিতে আমিও কখনো কুণ্ঠিত হইনি। ওর কাছে কেন জানি না নিজেকে সব সময় ঋণী বলে মনে হতো। আর একটা মস্ত গুণ ছিল ওর—পরিচয়ের অন্তহীন পরিধি। দুনিয়াশুদ্ধ সকলে ওকে চিনতো—সকলে হয়তো ওকে সমর্থন করতে পারতো না, তবে ভাল ওকে লাগতই।

জর্জ টমের চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়। কিন্তু দেখায় ষাট বছরের বুড়োর মতো। বিগত পঁচিশ বছর ধরে জীবনে কখনো পনের দিনের বেশি এক সঙ্গে ছুটি উপভোগ করেনি। রোজ সকাল সাড়ে ন'টার আগে অফিসে আসে, আর ছ'টার আগে কোনদিন অফিস থেকে বেরোয় না। সৎ, পরিশ্রমী, কৃতী পুরুষ। তার স্ত্রীও লোক হিসেবে খুবই ভাল। স্ত্রীর প্রতি মনে মনেও কখনো সে অবিশ্বাসী হয়নি। ছেলেমেয়েদের প্রতি কর্তব্যেও কোনদিন এতটুকু শিথিলতা প্রকাশ পায়নি। প্রতি মাসে আয়ের এক-তৃতীয়াংশ যায় ব্যাঙ্কে—কখনো কোনো কারণেই এর ব্যতিক্রম হয় না। পঞ্চান্ন বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করবে; তারপর গ্রামের বাড়িতে—শহরে আর একটি দিনও নয়। সেখানে শুধু বাগান করা, আর গল্‌ফ্ খেলা—ব্যস।—এই তার একমাত্র স্বপ্ন। আর এই স্বপ্ন-ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণে বিভোর ও। নিষ্কলঙ্ক জীবন—সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। ক্রমবর্ধমান বার্ধক্যর প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার দেহে মুখে সর্বত্র। তবু কোনো ক্ষোভ নেই। প্রকৃতির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, কারুর প্রতিই তার কোনো অভিযোগ নেই, নালিশ নেই। প্রায়ই ও বলতো হাসতে হাসতে:

টমের যখন বয়স ছিল, রূপ ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, তখনকার কথা অবশ্য আলাদা। সবই তখন ভাল লাগে। আমার চেয়ে ও মাত্র এক বছরের ছোট, চার বছর পরেই পঞ্চাশের কোঠায় পৌছবে। জীবনটাকে তখন অত সুন্দর বলে কিছুতেই মনে হবে না ওর। পৃথিবীটা সত্যিই এত সহজ নয়। প্রতি মুহূর্তে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভবিষ্যতের নির্ভরযোগ্য বনিয়াদ গড়ে তুলতে হয়—আর আমি তাই-ই করেছি। একলক্ষ টাকা নিয়ে বাকী জীবনটা কোনোক্রমে কেটে যাবে—এর বেশি আর কিই বা আমার প্রয়োজন। কিন্তু টম? হতভাগাটা তখন করবে কি শুনি? বুঝবে বাছাধন কতো ধানে কতো চাল। আমার কি? করুক যা খুশি ওর।

বেচারা! জর্জের জন্যে আমার কেমন মায়া হোলো। হতভাগা টমটা আবার কি কাণ্ড করে বসে আছে কে জানে? জর্জের উত্তেজিত ভাব দেখে কিছু জিগ্যেস করতে সাহস হ'ল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় সোডার বোতলের ছিপি খোলার মতো বললে ও:

জান কি হয়েছে?

খারাপ একটা কিছু শোনবার জন্যে তৈরি হয়েই ছিলুম। হতভাগাটা এবার নির্ঘাত পুলিশের খপ্পরে পড়েছে। কিম্বা কোথাও আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম খেয়েছে। উত্তেজনায় জর্জের ঠোঁট দুটি কম্পমান, নাসারন্ধ্র স্ফুরিত, নির্নিমেষ চক্ষু রক্তবর্ণ। আবার শুরু করে ও:

—সারা জীবন ধরে কঠোর পরিশ্রম করে আসছি, কখনো কোনো নোংরা কাজ করিনি। সোজা কথা স্পষ্ট করে বলতেই ভালবাসি আমি। তুমি নিশ্চয় এসব অস্বীকার করতে পারবে না। সারাজীবনের হাড়-ভাঙা পরিশ্রম আর মিতব্যয়িতার বিনিময়ে অবসর জীবনে একটু বিশ্রাম, একটু শান্তি—এ কামনা নিশ্চয়ই আমার আছে। আশা করি এটা অন্যায়ও নয়। ভগবান যখন যে অবস্থাতে রেখেছেন, হাসিমুখে মেনে নিয়েছি, কোনো দিন কোনো রকম অনুযোগ করিনি। সব সময় নিষ্ঠার সঙ্গে আমি আমার কর্তব্য করে গেছি। বল, করিনি?

—বটেই তো।

—আর এ-কথাও তুমি স্বীকার করবে যে টমটা লক্ষ্মীছাড়া, অপদার্থ, লম্পট। এক কথায় একটি শয়তান। ন্যায় বিচার বলে যদি কোনো কিছু থাকতো, তবে এতদিনে ওর জেলে পচে মরাই উচিত ছিল।

—বটেই তো। কবে জেল হোলো ওর?

—জেল?

পূজা
দুর্গাপূজা ঘরে ঘরে আনন্দের, উৎসবের বার্তা নিয়ে আসে। সে উৎসবকে রমনীয় করে তুলতে গৃহলক্ষ্মীরা পরিবার ও অতিথিবর্গের জন্য নানারকম মিষ্টান্ন ও খাবারের আয়োজন করেন। আর তার মানেই হচ্ছে ডালডা বনস্পতি, কারণ হিসেবী গৃহিনীরা জানেন যে উৎকৃষ্ট মুখরোচক খাবার করতে ডালডা চাইই। তাছাড়া ডালডায় খরচ কত কম হয়। আর একথা কে না জানেন যে ভিটামিন 'এ'র উৎপত্তিমূল হিসেবে ডালডা ঘি এর মতোই উপকারী। সীলকরা টিনে ডালডা সর্ব্বদাই তাজা ও বিশুদ্ধ থাকে।
এই সব কারণে আপনার পূজার বাজারের তালিকায় ডালডা বনস্পতি নামটা যোগ করতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।
সকলের সুবিধার জন্য ১।২ পাঃ, ১ পাঃ, ২ পাঃ, ৫ পাঃ, ও ১০ পাঃ টিনে সর্ব্বত্রই বিক্রী হয়।
DALDA
ডালডা
ডালডা
মার্কা
বনস্পতি
বিনামূল্যে
উৎসবের রান্নাবান্না
পাকপ্রনালী সম্বলিত এই ছোট বইটি আজই লিখে আনিয়ে নিন। এতে নানারকম রান্নার পাকপ্রণালী ও অন্য খুঁটিনাটি আছে। আজই লিখুন:
দি ডালডা এ্যাডভাইসারি সার্ভিস।
পোষ্ট বক্স নং ৩৫৩, বোম্বাই ১।
HVM. 254-X52 BG
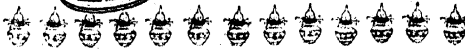
—তবে ? কোথাও কি মারধোর—?

—না, না, ওসব কিছু নয়।

—তবে হ'ল কি ?

—হ'ল আমার মাথা। মাসখানেক আগে মার বয়সী একটা বুড়ীকে বিয়ে করে ও। বুড়ীটা মরেছে। ওর যা-কিছু ছিল সবই এখন টমের। প্রায় এক কোটি টাকা, খাস লণ্ডন শহরে একখানা বাড়ি, আর দেশে একখানা।

এই বলে জর্জ ব্যামসে টেবিলের ওপর সজোরে একটা ঘুশি মেরে আবার ফেটে পড়লো :

—এ ভারি অন্যায়, ভারি অন্যায়। ন্যায় অন্যায় বলে জগতে কিছুই নেই দেখছি।

ওর রাগে টকটকে লাল মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভীষণ হাসি পেল। অনেক চেষ্টা করেও হাসি চাপতে পারলুম না। কে যেন অনবরত ভেতর থেকে শুড়শুড়ি দিচ্ছে। হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে পড়ে মরবার যোগাড়।

এরপর কোনোদিন আর ও আমায় ক্ষমা করেনি। টম কিন্তু প্রায়ই আমায় তার প্রাসাদোপম সুসজ্জিত অট্টালিকায় নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়। মাঝে মাঝে এখনো দু-এক টাকা ধার চায় বটে—ওটা ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

একটি কবিতা

(রাইন মারিয়া রিলকে)

অনুবাদক—সুনীল বসু

প্রভু, সময় এলো যে। গ্রীষ্মের সঞ্চয় ছিল অপর্য্যাপ্ত।
এখন রৌদ্রের-ঘড়িতে থাক্ তোমার প্রচ্ছায়া ছুঁয়ে,
হাল্কা হাওয়াকে আল্গা ক'রে ছড়িয়ে দাও অসীম
প্রান্তরে।

দ্রাক্ষালতিকায় শেষবেলাকার দ্রাক্ষাদের ভারী হ'য়ে
ঝুলতে দাও।
পরিপূর্ণ পক্ব হ'তে আর একবার দাও তাদের কোমল—
দাক্ষিণী ঘণ্টাগুলি ; মদিরার মৌতাতে,
তীব্র মিষ্ট মাধুর্যের শেষবিন্দু অবধি নিংড়ে দাও।

গিয়েছে সময় গিয়েছে,—স্বপ্ন আর প্রাসাদ বানাবার।
থাকবে—থাকবে—একলা নির্জনতা,
সে জাগবে এবং পড়বে—লিখবে অনিঃশেষ পত্রমালা,
লম্বা কত এ্যাভিনিউ ধরে ঘুরবে সে লক্ষ্যহীন,
যখন বাদল আর দমকা হাওয়ায় উড়বে গাছের শেষ পাতা।

নারী ও শিল্পকলা

বেলা দে

কোন দেশের সভ্যতার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে হলে সেই দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলার প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর এবং পশ্চিমাংশ এবং তার একশ বছর পরে পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ মুসলমানদের ছিল—এর পূর্ব্বের যে যুগ তাকেই আমরা প্রাচীন বাংলা বলি, কিন্তু এ যুগের কোন লিখিত ইতিহাস নেই। অল্প কয়েকখানি গ্রন্থ ও শিলালিপি এবং প্রাচীন মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ ছবি এইগুলি অবলম্বন করে এ সম্বন্ধে যে অস্পষ্ট ধারণা করা যায় তার বেশী আর কিছু জানবার উপায় নেই। কাপড় বোনায় বাঙ্গালী খুব প্রাচীনকাল থেকেই বিশেষ দক্ষতালাভ করেছেন। নানাজাতীয় গাছের ছাল বা শাঁস থেকে সুতা তৈরী করে যে সব চিকণ কাপড় তৈরী হোত তার নাম ছিল দুকুল। এখন আমরা যাকে লিনেন বলি অনেকটা সেই জাতীয়, কিন্তু খুব মিহি ও মসৃণ। উনিশ শত বছর পূর্ব্বে একজন গ্রীক্ বণিক্ এদেশে এসেছিলেন—তিনি লিখেছেন যে বাংলাদেশের উৎকৃষ্ট মসলিন কাপড় বহু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। কাজেই সারা ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে অন্যান্য সভ্য জগতে বাংলার কাপড়ের বিশেষ আদর ছিল। এ ছাড়া বস্ত্রশিল্প খুব প্রাচীনকাল থেকে বাংলার বড় রকমের শিল্প ছিল।

মাটীর বাসনপত্র তৈরী করা আর একটী বড় শিল্প ছিল। বাসনপত্র, অন্যান্য তৈজসপত্র ছাড়াও পোড়ামাটীর অনেক জিনিষপত্র তৈরী করে এর উপর সুন্দর খোদাই করা কাজ হোত। পাথরের মূর্ত্তি তৈরী খুব বড় রকমের একটী শিল্প ছিল। এ ছাড়া বেত ও বাঁশের কঞ্চির সাহায্যে ঘরের নানারকম আসবাব ও ব্যবহার-উপযোগী দ্রব্য সামগ্রী তৈরী হোত। আমাদের দেশের শীতলপাটী এক আশ্চর্য্য শিল্প। বলা বাহুল্য এই সব শিল্পের অন্তরালে ছিলেন আমাদের অন্তঃপুরের শিল্পকলাবতীর দল। এগুলি তাঁরা অন্তঃপুরে বসে পুরুষ শিল্পীর সহযোগিতায় সমাধান করতেন। আরো মনে পড়ে তাঁদের কারুশিল্পের কথা—কাঁথায় রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের চিত্র প্রভৃতি এমন সুন্দরভাবে ভিন্ন ভিন্ন সুতো দিয়ে সেলাই করতেন যে হঠাৎ দেখলে তাকে তুলি দিয়ে আঁকা একখানি বৃহৎ চিত্র মনে হোত। এর জন্য তাদের পয়সা খরচ করে জিনিষ কিনতে হোত না। পাড়ের সুতোর সাহায্যেই তার সমাধান হোত। আমার ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনেছি তাঁর শাশুড়ী নাকি এমন কাঁথা সেলাই করতেন, মনে হোত যেন একখানি শাল বুনছেন—এক একখানি কাঁথা তৈরী করতে অনেক সময়—চৌদ্দ বছরেরও বেশী সময় লাগত। যাঁরা এই সব শিল্পকলায় ব্রতী ছিলেন তাদের ধৈর্য্য ও সৌন্দর্য্যের বোধশক্তির কথা মনে পড়লে গর্ব্বে মনটা ভরে ওঠে। পল্লীগ্রামের 'সিকা' আর একটী সুন্দর প্রয়োজনীয় জিনিষ। ছোট্ট একখানি খড়ের ঘরের চালের মাথায় আনন্দলহরী, ফুলঝুরি, সাগরফেনা প্রভৃতি নানারকমের সিকায় রঙ্গীন পানের বাটী, গয়নার ঝাঁপি, সিঁন্দুর কৌটা প্রভৃতি মেয়েদের অতি সখের জিনিষগুলো ঝুলতে থাক্‌তো। আজকাল মাটীর প্রদীপের রীতি উঠে গেছে। এই প্রদীপের সলতে রাখবার জন্য আমাদের প্রাচীনা দিদিমা ঠাকুরমারা রং-বেরংয়ের কাপড় দিয়ে সল্‌তে দানী তৈরী করতেন। তাতেও থাকত নানারকম সূক্ষ্ম কারুকার্য্য। এখনো পল্লীগ্রামের অনেক গৃহস্থ পরিবারে কড়ির আলনা, কড়ির দোল্‌না প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। আজকাল অবশ্য আমরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অনুকরণে গৃহসজ্জা সজ্জিত করে থাকি, কাজেই এদিকে লক্ষ্য আমাদের কম। কিন্তু যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখা যায় তাহলে এই সব খাঁটী স্বদেশী জিনিষগুলির সাহায্যে গৃহসজ্জার মান আরো বাড়াতে পারব। আর

আমাদের সবচেয়ে গর্ব্বের বিষয় হবে যে, একদিন এই শিল্পের মধ্যে দিয়ে বাংলার নারী তাঁর সরল প্রাণ ও প্রেম-পূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে গেছেন।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নারী

শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী বি-এ

সংবাদ সরবরাহ ও আদান প্রদানের উপরই আধুনিক সভ্য পৃথিবীর কাঠামো সুপ্রতিষ্ঠিত। সংবাদ চলাচলের যোগসূত্র যদি কোনও দুর্দৈব বশতঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন তদ্দেশীয় অধিবাসীরা মনে করে যে তারা যেন সভ্য জগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। দেশ বিদেশের সংবাদ আদান-প্রদানের অন্তর্নিহিত গুরুত্বের কথা সহজেই অনুমেয়। সংবাদপত্রে একটী ভুল রিপোর্ট (রাজনীতি, সমাজনীতি, অথবা যে নীতিই হোক্ না কেন) পরিবেশনায় অনেক সময় অনেক বিপদের সূত্রপাত হয়ে থাকে। যদিও এইপ্রকার বিভ্রান্তিমূলক ঘটনা কদাচিৎ ঘটে থাকে, তথাপি এই সব কারণেই সাংবাদিকতার কাজ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ এবং সমস্ত দেশে গ্রাম গ্রামান্তরে সাংবাদিকতার ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত ও উন্নত হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়।

আজকের মানুষের জীবন-যাপনের প্রতিটীক্ষেত্রে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছে। অর্থ-নৈতিক ব্যাপারে এই সত্যটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আমাদের আদিম ঘুণ-ধরা কুসংস্কারপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা আজ বহুলাংশে ভেঙ্গে গেছে। মানুষ আজ হয়েছে এক নতুন যুগের সম্মুখীন। শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ আজ পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। তাই উভয়ের জীবিকা সমস্যা আজ একই। নারী-পুরুষের সমান-অধিকারবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বহুক্ষেত্রে যেমন অনেক শুভ ফল লাভ হয়েছে, অপর দিকে তেমনি অশান্তি অসন্তোষেরও সীমা নেই। এতদিন দেশের পুরুষ-সমাজেই বেকারত্ব চালু ছিল। এখন নারীর সংখ্যাও এসে তার সঙ্গে মিলেছে। তার ফলেই মানুষের কর্ম জীবনে এই ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব দেখা দিয়েছে।

সমাজ জীবনে মেয়েদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা এমন কিছু নতুন কথা নয়। আদিম যুগের মেয়েদের পুরুষের পাশে সমান আসন ছিল। পুরুষের চেয়ে তাদেরই কর্মক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত ও বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ। তারা শস্যক্ষেত্রে রীতিমত পরিশ্রম করে ঘরে সোনার ফসল তুলতো। আর তাদের পুরুষ সমাজ তখন তীর ধনুক নিয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে রীতিমত শীকারে ব্যস্ত থাকতো। এখনও এ প্রথা ভারতের কোনও কোনও পার্বত্য অঞ্চলে চালু রয়েছে। কেবলমাত্র শারীরিক শ্রম দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিল না, মেয়েরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক উৎকর্ষতারও ক্রমবিকাশ সম্ভব করেছিল। সমাজে মেয়েরা যখন প্রথম পরিশ্রম করতে আরম্ভ করে, তখন অন্য কেউ তাদের এ বিষয়ে কোনও শিক্ষা দেয়নি। তারা নিজের ধৈর্য্য, একনিষ্ঠতা ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা নিজেদের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

সেই প্রাক্ সভ্যতার যুগ থেকে আজ আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি এবং কয়েক শত হাজার বছরের ব্যবধানের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অনেক উত্থান পতন ঘটেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হোল, নারী সমাজের ঘোর অবনতি। অবশ্য সেই অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আজ নারী সমাজ বহির্বিশ্বের আলোকে নিজেদের স্বরূপ দেখতে ও চিনতে শিখেছে। তথাপি রাষ্ট্রনীতির পটপরিবর্তনের জন্য মানুষের জীবনের মানও অনেক ক্ষেত্রে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে এবং তার ফল ভোগ করছে বিশেষভাবে বাংলার নারী-সমাজ।

আজ প্রত্যেকটি নারীকে স্বাবলম্বী হতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে চেয়ে এ বিষয়ে পশ্চাদপদ হবার কোনও কারণ নেই। চিরাচরিত পথ ছেড়ে মেয়েদের নতুন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মেয়েদের আজ এগিয়ে আসতে হবে। নিজেদের কৃতিত্বের দ্বারা এপথে তাঁদের সুনাম ও সম্মান অর্জন করতে হবে। যদিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা শিক্ষার ক্লাশে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও সমানভাবে শিক্ষার্জন করে থাকেন, বর্তমান যুগের পক্ষে এটা খুবই সুলক্ষণ; তথাপি কর্মক্ষেত্রে এসব কৃতী মেয়েদের দেখতে পাওয়া যায়না কেন? অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে—সাংবাদিক মহলে মেয়েদের তেমন সাড়া পাওয়া যায় না।
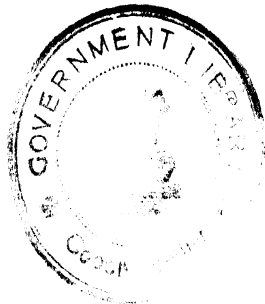
চরম চরিতার্থতা
শরতের নির্মল আকাশে
বৈরাগী মেঘ; বাতাসে
শেফালির স্নিগ্ধ নিমন্ত্রণ।
সোনায় পান্নায় বিজড়িত
দিগন্তে শরতের প্রসন্ন
মহিমা। রঙে রসে
মধুর এই যে উৎসব-
মুহূর্ত, হৃদয়ের আনন্দ-
পানেই এর চরম
চরিতার্থতা। তেমনি
রম্য রুচির চিরন্তন
বিলাস, রূপসাধনার
চরম চরিতার্থতা—
"লক্ষ্মীবিলাসে"।
লক্ষ্মীবিলাস তৈল
এম • এল • বসু য্যাণ্ড কোং লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস : কলিকাতা-৯

যদিও পত্রিকা সম্পাদনার কার্যে মেয়েদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি তাহার সংখ্যা খুবই কম। বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে বিগত শতাব্দীর "ভারতী" পত্রিকা সম্পাদনার জন্য শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী ও বর্তমানে জয়শ্রী পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের নাম ও বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেয়েদের সাংবাদিক মনীষার প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে শ্রীমতী এ্যানি বেসান্তের কথা। যদিও তিনি বিদেশী মহিলা ছিলেন, তথাপি জীবনের অধিকাংশ সময়ই ভারতের কার্যে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর জীবনের সাংবাদিক কর্মনীতি বিশেষভাবে গৌরবোজ্জল। বর্তমানে আমাদের দেশে দুইজন সাংবাদিক মহিলা আছেন, একজন শ্রীমতী বিদ্যামুন্সী, অপরজন মিসেস্ ভায়োলেট আল্‌ভা এম-পি।

মেয়েরা যদি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন তবে অখ্যাত মফঃস্বল সহর ও পল্লীঅঞ্চলগুলি অজ্ঞতা ও কুসংস্কার মুক্ত হবে অতি দ্রুত গতিতে। সাংবাদিক মেয়েরা যদি সহরের বাইরে গিয়ে সহরের পত্রপত্রিকাগুলির প্রতিনিধিত্বের কার্যভার গ্রহণ করেন তাহলে আজকের বাজার-চালু সংবাদপত্রগুলি এক নতুন রূপ ধারণ করবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেননা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের দৃষ্টি থেকে নারীর দৃষ্টি অধিকতর তীক্ষ্ণ এবং তার লেখনীর গতি গভীর অনুভূতিশীলতায় ব্যাপক ও বিস্তৃত—জনসাধারণের মধ্যে সত্য তথ্য পরিবেশনায় লেখনীর মুখে এই ভাবসম্পদ থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়।

আমি জানি ছোট ছোট মফঃস্বল সহরগুলিতে নারী কর্তৃক পরিচালিত ছোট বড় সঙ্ঘ সমিতি ইত্যাদি আছে। সেখানে তাঁরা নানারকম আনন্দ-উৎসব ও জনসেবামূলক কার্য ইত্যাদি করে থাকেন। শিক্ষা সংস্কৃতি বিস্তারে এই সমস্ত উদ্যম খুবই প্রশংসনীয়। এই রকম এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকে, যাহা জনসমক্ষে প্রচারের খুবই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু পল্লীবাসীর অজ্ঞতার জন্য তাদের বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানের কোনও রূপ ব্যবস্থা হয় না। জল যেমন বদ্ধ জায়গায় কিছুদিন রাখলে ঘোলা হয়ে যায়, মানুষের মনের শুভ-প্রচেষ্টাও সেই রকম নিজেদের মধ্যে অধিকদিন সীমাবদ্ধ রাখলে, নূতন কিছুর সন্ধান না পেলে, তার উৎসাহ উদ্দীপনা স্পৃহা সমস্তই নষ্ট হয়ে যায়। অভিজ্ঞতার অভাবে কর্ম-প্রেরণাও বেশীদিন স্থায়ী হয় না। সেইজন্য উল্লেখযোগ্য কাজের কিছুটা প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে এবং এ প্রয়োজন মিটাতে পারে একমাত্র দেশের সংবাদপত্রগুলি। অনেকে হয়ত মন্তব্য করতে পারেন কাজ করবার শুভ ইচ্ছা থাকলেই হোল, সেখানে প্রচার হোক আর নাই হোক তাতে কর্মীদের কিছুই আসে যায় না। একথা সত্য হলেও সকল ক্ষেত্রে কিন্তু প্রযোজ্য নয়। অনেক সময় আর্থিক সাহায্যের জন্য, অনেক সময় সদস্য সংগ্রহের জন্য, অনেক সময় দূর দূর-দূরান্তের লোকের সহযোগিতা ও অবগতির জন্য সংবাদ-প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে আজকের এই ভাঙ্গনের যুগে নতুন কিছু গড়তে গেলে সর্বাগ্রে চাই তার স্বপক্ষে সবল জনমত গঠন। এই সংগঠনের কাজ পরিপূরণের জন্য সংবাদপত্রই একমাত্র সহায় এবং এই সংবাদ সরবরাহের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হলে মেয়েদের সহযোগীতা অগ্রগণ্য। সমসাময়িক যুগের প্রয়োজন মিটাতে হলে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মেয়েদের নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে কাজ করার দিন আজ এসেছে।

মা হবার পর *

সাধনা ভট্টাচার্য

খুব ব্যথা হয়েছিল? হবেই তো। কথায় বলে "মা হওয়া কি মুখের কথা?" ব্যথা যা হ'বার হোক। কিন্তু আপনার মনের আশা পূর্ণ হয় নি, তাই না আপনার দুঃখ? মেয়ে হয়েছে বলে মনটা খারাপ করে বসে আছেন? কি যে আপনাকে বলব? বলুন তো ছেলের চেয়ে মেয়ে কিসে কম?

থাক আপনার ওসব মনোব্যথায় সহানুভূতি প্রকাশ করতে আমরা প্রস্তুত নই। কিন্তু আপনি হেতাল ব্যথায়

* গত 'ভাদ্র' সংখ্যায় প্রকাশিত "মা হবেন যাঁরা" অনেকের ভাল লেগেছে ও কাজেও লেগেছে বলে এই প্রবন্ধটি দিলাম। এটিও বোনেদের ভাল লাগবে আশা করি।

যা কষ্ট পেয়েছেন তা' সত্যি সহানুভূতি জাগায়। যা হোক এ ব্যথার খুব উপকারিতা রয়েছে। প্রসবের পর জরায়ুর মধ্যে রক্তের জমাট যদি কিছু থাকে, সে-সব এ-বেদনায় বেরিয়ে যায়। এতে আপনার মঙ্গলই হয়েছে। তবে এ-ব্যথা যদি ৪৮ ঘণ্টার পরও না সেরে যায় ডাক্তারকে বলবেন। যথাবিহিত ব্যবস্থা তিনিই করবেন।

প্রসবের পর বেশী রক্তস্রাবও খুব খারাপ। খুব বেশী রক্ত বা লালরঙের তাজা রক্তেরস্রাব ভয়ের কারণ। খুব সাবধান এ সম্বন্ধে।

আগেকার দিনে চিকিৎসকেরা প্রসবের পর রোগিণী-দের অন্ততঃ দশদিন পর্য্যন্ত উঠতে দিতেন না। কিন্তু আজ-কালকার ডাক্তারেরা রোগিণীদের যদি সেলাই না হয়ে থাকে তবে দশদিনের মধ্যেই বিছানায় উঠে বসতে, তার পর আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে যেতেও দিয়ে থাকেন। এতে নাকি রোগিণীদের তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে সাহায্য করে। আপনিও যদি নড়াচড়া সুরু করে দিয়ে থাকেন, তবে সাবধান—ভারী জিনিস কিছু তুলবেন না, বা উঁচু থেকে কিছু পাড়বেন না।

প্রসবের পর নানা রকমের অসুখ দেখা দিতে পারে যেমন দুগ্ধজ্বর, শ্বেতপ্রদর, সূতিকাজ্বর, আক্ষেপ প্রভৃতি। তাছাড়া অনেকের আঁতুড়ে-বাই হতে দেখা যায়। এ এক রকমের মানসিক রোগই বটে। তবে ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে সহজেই সেরে যায়।

দুগ্ধজ্বর প্রায় সব মায়েরই হয়ে থাকে। আর তা বেশ কষ্টকর। স্তনের ব্যথায় অনেক সময় চীৎকার করতে হয়। (বায়োকেমিক ডাক্তারদের মতে ফেরামফস ও কেলি-মিয়ুর হ'ল তার অব্যর্থ ঔষধ। দুটো অষুধ পর্য্যায়ক্রমে খেতে হবে।)

আর একটা অসুবিধা দেখা দিতে পারে, সেটি হচ্চে পেট ঝুলে পড়া। দেখতেই যা একটু খারাপ দেখায় আসলে তা রোগ নয়। তবু সাবধান হওয়া দরকার। পেটের বাঁধন ঢিলে হতে দেবেন না। দরকার হলে তলপেটের জন্যে তৈরী বন্ধনীও ব্যবহার করতে পারেন।

আর একটা সমস্যা আপনার দেখা দিতে পারে—সে হচ্চে বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়া। আপনি হয়ত ভাবচেন তাতে আর কি ক্ষতি, ছেলেকে বোতলে করে গ্লাক্সো কি কাউ-এণ্ড-গেট দিতে সুরু করবেন। অনেক মেয়েই আজকাল স্তন্যদানে উৎসাহী নন। সে কিন্তু খুব ভাল কথা নয়। মাতৃদুগ্ধ শিশুর উৎকৃষ্ট খাদ্য—প্রকৃতির নিয়মে আপনার স্তনে তা স্বতঃ উৎসারিত হয়ে থাকে। আপনার শিশুকে সে প্রকৃতিদত্ত খাদ্য থেকে কখনও বঞ্চিত করা ঠিক নয়। তবে যদি আপনার বুকের দুধ শুকিয়ে যায়, তবে সিঙ্গিমাছের ঝোল খাবেন। তার চেয়েও ভাল কার্যকরী পথ্য আছে। সে হচ্চে শামুকের ঝোল। অবশ্য অনেক মেয়ে এর নাম শুনলেই বমি করতে বসে যাবে। কিন্তু এর চেয়ে স্তন্যদুগ্ধ বাড়াতে উৎকৃষ্টতর উপায় নেই। কিন্তু যদি আপনি নিরামিষাশী হোন? আপনাকে প্রচুর দুধ আর ক্যালশিয়াম্ খেতে হবে।

খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আপনাকে খুব সাবধান হতে হবে। প্রসবের পর আপনার ক্ষিধে খুব বেড়ে গিয়েছে তা জানি। আর যা খাওয়া উচিত নয় তা খাবার আগ্রহও অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছে তাও ঠিক বুঝতে পারছি। কিন্তু সাবধান—বলছি যা-তা একদম খাবেন না। খেলে আপনাকে যে শুধু ভুগতে হবে তা নয়, আপনার বাচ্চারও অসুখ করবে। এক টুকুরো গঙ্গার ইলিশ খেয়েছেন কি বাচ্চা বারবার পায়খানা করতে সুরু করেছে। শুধু তাই নয়। আপনারও সূতিকা হতে পারে। অতএব খুব সাবধান। একবার সূতিকায় ধরলে আর ছাড়তে চায় না।

মুক্ত বায়ুতে শরীর চর্চ্চা

লাবণ্য পালিত

মুক্ত বায়ু আমাদের একান্ত দরকার…। পিতামাতা বা ছেলেমেয়েরা প্রত্যহ মুক্ত বাতাসে বেড়াতে পারেন, শুধু তাই নয়, ছোট বড় সব ছেলেমেয়েদের উন্মুক্ত বাতাসে খেলাধুলো বা যে কোন ব্যায়াম সম্বন্ধে উৎসাহ দেওয়া দরকার।

পিতামাতার আলস্যে অনেক ছেলেমেয়েরা মাঠে বা যে কোন ব্যায়ামাগারে যাবার সুযোগ পায় না…অথবা পেলেও সে দু'এক দিনের জন্য…! এ যেনো তাঁদেরই করুণার ওপর নির্ভর করছে সমগ্র পরিবারের স্বাস্থ্য…!! অপর বাড়ীর ছেলে মেয়েরা কেমন সান্ধ্য-ভ্রমণে

যায়···, অমুক বাড়ীর সকলের স্বাস্থ্য ভাল···এ সকল অবান্তর কথা তো বহু দিন ধরেই কানে আসে—কিন্তু নিজে চেষ্টা করে নিজের বাড়ীর স্বাস্থ্য ফেরাবার আগ্রহ দেখিয়েছেন কি ?

দেশবিভাগের ফলে বহু লোকের স্থান করে নিতে হয়েছে এই অল্প

মুক্ত বায়ুতে মেয়েরা ব্যায়াম করছেন

পরিসর কলিকাতায় ; সহরের কথাই বলি, কারণ সহরের বাইরে তবু বেশ খানিকটা খোলা মেলা জায়গা আছে। সহরে যাঁরা গিঞ্জির মধ্যে সঙ্কীর্ণ গলিতে বাস করেন তাঁদের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে গেলে নিজেরা চেষ্টা করে প্রতিদিন রৌদ্র সেবন ও মুক্ত বাতাসে খেলাধুলো বা ভ্রমণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করবেন।

খোলা মাঠে ব্যায়াম অভ্যাস

সকাল কিংবা সন্ধ্যাবেলার পরিষ্কার বাতাসে নিজেদের মেলে ধরুন···, সন্তানসন্ততির মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে, তাদের শরীর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করুন···, ভবিষ্যতে জাতীয় মেরুদণ্ড দৃঢ় করবার চেতনা ফিরিয়ে আনুন নিজেদের মধ্যে···।

মাঠে শিশুরা খেলা করছে

বালিকাদের পশমের কোট

সিপ্রা চট্টোপাধ্যায়

শীতের সময় পশমের তৈরী জামা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়ে থাকে। সেজন্য এখন বালিকাদের জন্য একটি পশমের কোটের প্যাটার্ণ দিলুম। আমার মনে হয় এই কোটটি আপনারা সহজেই এবং অল্প সময়েই তৈরী করতে পারবেন।

ইহার জন্য তিন তারের যে কোন পশম ৪ আউন্স, ২টা ৯নং কাঁটা ও ৪টি বোতাম লাগবে।

সামনে—(ডানদিক)—৬৭টি ঘর তুলুন।

১ম লাইন—১ সোজা, * ১ উল্টা, ১ সোজা, * চিহ্নিত স্থান থেকে পুনরাবৃত্তি করুণ, এইভাবে ৯ লাইন বুনুন।

* ১১শ লাইন—১ সোজা, (১ উল্টা, ১ সোজা) তিনবার, সব সোজা।

১২শ লাইন—১ সোজা, শেষের ৭ঘর পর্য্যন্ত সব উল্টা ; (১ সোজা, ১ উল্টা) তিনবার, ১ সোজা।

১৩শ লাইন—১ সোজা, (১ উল্টা, ১ সোজা) তিনবার, * ৪ সোজা, ২ উল্টা, * চিহ্নিত স্থান থেকে শেষের ৬ ঘর পর্য্যন্ত পুনরাবৃত্তি করুন, ৪ সোজা, ১ উল্টা, ১ সোজা।

১৪শ লাইন—* ২ সোজা, ৪ উল্টা, শেষের ৭ ঘর পর্য্যন্ত

লাইফবয় মাখিয়ে এই সব বীজাণু ধুয়ে ফেলে প্রতিদিন তাদের রক্ষা করুন

লাইফবয় সাবান

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে
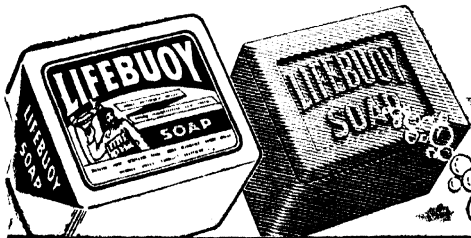
L. 258-X52 BG.

পুনরাবৃত্তি করুন। (১ সোজা, ১ উল্টা) তিনবার, ১ সোজা।

১৫শ লাইন—১ সোজা, (১ উল্টা, ১ সোজা) তিনবার, সব সোজা।

১৬শ লাইন—১ সোজা, শেষের ৭ ঘর পর্য্যন্ত উল্টা, (১ সোজা, ১ উল্টা) তিনবার, ১ সোজা।* *

এবার দুটি তারা (* *) চিহ্নিত স্থান থেকে (* *) চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত ১১বার বুনুন।

তারপর ১ম লাইন—১ সোজা, (১ উল্টা, ১ সোজা) তিনবার, * (১ জোড়া,) ২বার, ৩ ঘর একসঙ্গে জোড়া, * চিহ্নিত স্থান থেকে পুনরাবৃত্তি করুন। শেষে কাঁটায় ৪ ঘর থাকবে। (১ জোড়া) ২ বার। এবার ৩ লাইন 'সাবুদানা' প্যাটার্ণ (সাবুদানা প্যাটার্ণ—১ সোজা, ১ উল্টা, ১ সোজা। পরে লাইন ১ সোজা, ১ উল্টা, ১ সোজা) । করুন।

৫ম লাইন—১ সোজা, ১ উল্টা, ১ সোজা, সাঃ স্থঃ ১ জোড়, * ১ উল্টা, ১ সোজা, * চিহ্নিত স্থান থেকে পুনরাবৃত্তি করুন।

এরপর ৫ লাইন সাবুদানা প্যাটার্ণ করুন।

১১শ লাইন—১ সোজা, (১ উল্টা, ১ সোজা) তিনবার, * ১ ঘর বাড়ান, ১ সোজা, ১ ঘর বাড়ান, ২ সোজা। শেষে কাঁটায় ১ ঘর থাকা পর্য্যন্ত * চিহ্নিত স্থান থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, ঐ ১ ঘর সোজা বুনুন। এখন কাঁটায় ৪৩ ঘর রইল।

১২শ লাইন—১ সোজা, শেষের ৭ ঘর পর্য্যন্ত উল্টা, (১ সোজা, ১ উল্টা) তিনবার, ১ সোজা, ১৩শ লাইন—১ সোজা, (১ উল্টা, ১ সোজা) তিনবার, সব সোজা।

১৪শ লাইন—১২শ লাইনের মত।

১৫শ লাইন—১৩ লাইনের মত।

১৬শ লাইন ৩ ঘর ফেলে দিন। শেষের ৭ ঘর পর্য্যন্ত উল্টা, (১ সোজা, ১ উল্টা) তিনবার, ১ সোজা।

১৭শ লাইন—১ সোজা, ১ উল্টা, ১ সোজা, সাঃ স্থঃ ১ জোড়া, ১ উল্টা, শেষের ৩ ঘর পর্য্যন্ত সোজা বুনুন; ১ জোড়া ১ সোজা।

এরপর সমস্ত সোজা বোনা অর্থাৎ ১ লাইন সোজা, ১ লাইন উল্টা বুনে যান। তবে বোতাম পটির ৭ ঘর করে 'সাবুদানা' প্যাটার্ণ করবেন। এবং হাতে প্রত্যেক লাইনে ১ ঘর করে কমাতে হবে যতক্ষণ না কাঁটায় ৩৭ ঘর থাকে। তারপর ১ লাইন অন্তর ১ ঘর করে কমান যতক্ষণ না কাঁটায় ৩৪ ঘর থাকে। এবার ১৭ লাইন ঘর না কমিয়ে বুনে যান। এই ১৭ লাইনের ৪র্থ লাইনেও ১২শ লাইনে ২টি বোতাম ঘর হবে।

পরের লাইন—১১ ঘর ফেলে দিন; ১ সোজা, ১ জোড়া, সব সোজা। এবার গলার দিকে ১ লাইন অন্তর ১টি করে ঘর কমিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না কাঁটায় ১৮ ঘর থাকে।

এবার সোজা লাইনে কাঁধের গঠন হবে—

১ম লাইন—শেষের ৬ ঘর পর্য্যন্ত সোজা বুনুন এবং শেষে ৬ ঘর থাকতে কাঁটা ঘুরিয়ে নিয়ে ২য় লাইন বুনুন। ২য় লাইন—সব উল্টা। ৩য় লাইন—শেষের ১২ ঘর পর্য্যন্ত সোজা, কাঁটা ঘুরিয়ে নিন। ৪র্থ লাইন—সব উল্টা। ৫ম লাইন—সব সোজা। মাথা বন্ধ করে দিন।

বাঁদিক—৬৭ ঘর তুলুন।

১ম লাইন—১ সোজা * ১ উল্টা, * চিহ্নিত স্থান থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, এবার ১ম লাইনটি ৯ বার পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

* * ১১শ লাইন—শেষের ৭ ঘর পর্য্যন্ত সব সোজা, (১ সোজা, ১ উল্টা) তিনবার ১ সোজা।

১২শ লাইন—১ সোজা (১ উল্টা, ১ সোজা) তিনবার, সব উল্টা।

১৩শ লাইন—১ সোজা, ১ উল্টা, * ৪ সোজা, ২ উল্টা, * চিহ্নিত স্থান থেকে শেষে ১১ ঘর থাকা পর্য্যন্ত পুনরাবৃত্তি করুন, ৪ সোজা, (১ সোজা, ১ উল্টা) তিনবার, ১ সোজা।

১৪শ লাইন—১ সোজা,) ১ উল্টা, ১ সোজা) তিনবার, * ৪ উল্টা, ২ সোজা, * চিহ্নিত স্থান থেকে পুনরাবৃত্তি করুন।

১১ এবং ১২ লাইন পুনরাবৃত্তি করুন।**

এবার * * চিহ্নিত স্থান থেকে * * চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত ১১ বার পুনরাবৃত্তি করুন।

পরের লাইন * (১ জোড়া) ২ বার ৩ ঘর একসঙ্গে জোড়া, শেষে ১১ ঘর থাকা পর্য্যন্ত * চিহ্নিত স্থান থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, (১ জোড়া) ২ বার, (১ সোজা, ১ উল্টা) ৩ বার, ১ সোজা।

৯ লাইন 'সাবুদানা' প্যাটার্ণ বুনুন।

১১ লাইন—* ২ সোজা, ১ ঘর বাড়ান, ১ সোজা, ১ ঘর বাড়ান, * চিহ্নিত স্থান থেকে শেষের ৮ ঘর পর্য্যন্ত পুনরাবৃত্তি করুন, ১ সোজা, (১ সোজা, ১ উল্টা) ৩ বার ১ সোজা। এখন কাঁটায় ৪৩ ঘর রইল ১২ লাইন এবং ১৪ লাইন—১ সোজা (১ উল্টা ১ সোজা) ৩ বার, সব সোজা।

১৩ লাইন—শেষের ৭ ঘর পর্য্যন্ত সব সোজা, (১ সোজা ১ উল্টা) ৩ বার, ১ সোজা।

১৫ লাইন—৩ ঘর ফেলে দিন। শেষের ৭ ঘর পর্য্যন্ত সব সোজা (১ সোজা, ১ উল্টা) ৩ বার, ১ সোজা।

এবার বোতাম পটির জন্য ৭ ঘর 'সাবুদানা' প্যাটার্ণ করে বাকি সব সোজা অর্থাৎ ১ লাইন উল্টা, ১ লাইন সোজা বুনে যান। তবে হাতের দিকে প্রথমে ২য় লাইনে ১টি ও পরে প্রত্যেক লাইনে ১টি করে ঘর কমান যতক্ষণ না কাঁটায় ৩৭ ঘর থাকে। এবার ১ লাইন অন্তর ১টি করে ঘর কমান যতক্ষণ না ৩৪ ঘর থাকে। তারপর ১৬ লাইন ঘর না কমিয়ে বুনে যান।

পরের লাইন—১১ ঘর ফেলে দিন, সব উল্টা।

এবার গলার দিকে ১ ঘর কমান এবং প্রত্যেক ১ লাইন অন্তর ১ ঘর করে কমান যতক্ষণ না কাঁটায় ১৮ ঘর থাকে। এবার ২ লাইন ঘর না কমিয়ে বুনে যান।

এবার কাঁধের গঠন (shape) করুন—

১ম লাইন—১ সোজা, শেষের ৬ ঘর পর্য্যন্ত উল্টা, কাঁটা ঘুরিয়ে নিয়ে ২য় লাইন বুনুন। ২য় লাইন—সব সোজা। ৩য় লাইন—১ সোজা, শেষের ১২ ঘর পর্য্যন্ত সব উল্টা, কাঁটা ঘুরিয়ে নিন। ৪র্থ লাইন—সব সোজা। মাথা বন্ধ করে দিন।

পিঠ—১২১ ঘর তুলুন। ১ম লাইন—১ সোজা, * ১ উল্টা, ১ সোজা, * চিহ্নিত স্থান থেকে পুনরাবৃত্তি করুন। এই ভাবে ৯ লাইন বুনুন। ৯ লাইনের শেষে ১ ঘর বাড়াবেন। এবার সামনের দিকে দেওয়া * * দুটি তারা চিহ্নিত স্থান থেকে * * চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত ১১ বার পুনরাবৃত্তি করুন।

১ম লাইন—* (১ জোড়া) ৩ বার, ৩ ঘর এক সঙ্গে জোড়া, * চিহ্নিত স্থান থেকে শেষের ৫ ঘর পর্য্যন্ত পুনরাবৃত্তি করুন। (২ জোড়া) ২ বার, ১ সোজা। এখন কাঁটায় ৫৫ ঘর রইল। এবার ৯ লাইন সাবুদানা প্যাটার্ণ করুন।

১১ লাইন—৪ সোজা, * ১ ঘর বাড়ান, ১ সোজা, ১ ঘর বাড়ান, ২ সোজা, * চিহ্নিত স্থান থেকে শেষের ৬ ঘর পর্য্যন্ত পুনরাবৃত্তি করুন। ১ ঘর বাড়ান, ৫ সোজা। এখন কাঁটায় ৭৪ ঘর রইল।

১২ লাইন—১ সোজা, সব উল্টা।

১৩ লাইন—সব সোজা।

১৪ লাইন—১ সোজা, সব উল্টা।

এবার সব সোজা অর্থাৎ ১ লাইন সোজা ১ লাইন উল্টা বুনে যাবেন এবং প্রথম ২ লাইন আরম্ভের সময় ৩টি করে ঘর ফেলে দেবেন। তারপর প্রত্যেক লাইনের শেষে ১টি করে ঘর কমিয়ে যান যতক্ষণ না ৬২ ঘর থাকে এবং পরে ১ লাইন অন্তর ১ ঘর কমিয়ে যান যতক্ষণ না ৫৬ ঘর থাকে। এবার ২৭ লাইন ঘর না কমিয়ে বুনে যান।

কাঁধের গঠন—

১ম লাইন—শেষে কাঁটায় ৬ ঘর থাকা পর্য্যন্ত সোজা বুনুন। কাঁটা ঘুরিয়ে নিন।

২য় লাইন—শেষে কাঁটায় ৬ ঘর থাকা পর্য্যন্ত উল্টা। কাঁটা ঘুরিয়ে নিন।

৩য় লাইন—শেষে কাঁটায় ১২ ঘর থাকা পর্য্যন্ত সোজা। কাঁটা ঘুরিয়ে নিন।

৪র্থ লাইন—শেষে কাঁটায় ১২ ঘর থাকা পর্য্যন্ত উল্টা। কাঁটা ঘুরিয়ে নিন।

৫ম লাইন—শেষে কাঁটায় ১৮ ঘর থাকা পর্য্যন্ত সোজা। কাঁটা ঘুরিয়ে নিন।

৬ষ্ঠ লাইন—শেষে কাঁটায় ১৮ ঘর থাকা পর্য্যন্ত উল্টা। কাঁটা ঘুরিয়ে নিন।

৭ম লাইন—সব সোজা বুনে মাথা বন্ধ করে দিন।

হাত—১ম লাইন—১ সোজা, * ১ উল্টা, ১ সোজা, * চিহ্নিত স্থান থেকে পুনরাবৃত্তি করুন। ১ম লাইনটি ১৭ বার পুনরাবৃত্তি করবেন।

১৯শ লাইন—১ সোজা, (১ সোজা, ১ ঘর বাড়ান) ৭ বার, (১ ঘর বাড়ান) ৩ বার, (১ ঘর বাড়ান, ১ সোজা) ৭ বার, ১ সোজা। এখন কাঁটায় ৫০ ঘর রইল।

২০শ লাইন—১ সোজা, সব উল্টা।

২১শ লাইন—সব সোজা। এবার ২০ ও ২১ লাইন পুনরাবৃত্তি করে যান যতক্ষণ না হাতটি আরম্ভ ছেকে ৬½ ইঞ্চি হয়।

(এই ৬½ ইঞ্চি উল্টা পিঠে শেষ হবে)।

তারপর প্রত্যেক লাইনে আরম্ভের সময় ১ ঘর করে কমিয়ে যতক্ষণ না কাঁটায় ৩৪ ঘর থাকে বুনুন। এবার যতক্ষণ না ২৬ ঘর হয় ২ ঘর করে কমিয়ে যান।

তারপর ১ম লাইন—শেষের ২ ঘর পর্য্যন্ত সোজা বুনে কাঁটা ঘুরিয়ে নিন।

২য় লাইন—শেষের ২ ঘর পর্য্যন্ত উল্টা বুনে কাঁটা ঘুরিয়ে নিন।

৩য় লাইন—শেষের ৪ ঘর পর্য্যন্ত সোজা বুনে কাঁটা ঘুরিয়ে নিন।

৪র্থ লাইন—শেষের ৪ ঘর পর্য্যন্ত উল্টা বুনে কাঁটা ঘুরিয়ে নিন।

৫ম লাইন—শেষের ৬ ঘর পর্য্যন্ত সোজা বুনে কাঁটা ঘুরিয়ে নিন।

৬ষ্ঠ লাইন—শেষের ৬ ঘর পর্য্যন্ত উল্টা বুনে কাঁটা ঘুরিয়ে নিন।

৭ম লাইন—সব সোজা।

৮ম লাইন—(১ উল্টা, ১ উল্টা দিকে জোড়া) ৮ বার, ২ উল্টা। মাথা বন্ধ করে দিন।

কলার—১৭ ঘর তুলুন। ১ম লাইন—১ সোজা, * ১ উল্টা, ১ সোজা, * চিহ্নিত স্থান থেকে পুনরাবৃত্তি করুন। এবার ১ম লাইনটি ৭ বার পুনরাবৃত্তি করুন।

৯ম লাইন—(১ সোজা, ১ উল্টা) ৭ বার। কাঁটা ঘুরিয়ে নিন।

১০ম লাইন—(১ উল্টা, ১ সোজা) ৭ বার।

এবার ১ম লাইন থেকে ১০ম লাইন পর্য্যন্ত ৯ বার পুনরাবৃত্তি করুন। তারপর ১ম লাইনটি ৯ বার পুনরাবৃত্তি করে মাথা বন্ধ করে দিন। তাহলেই কলার হ'ল।

এবার কলার, হাত, পিঠ ইত্যাদি পরস্পরের সহিত যথাস্থানে সেলাই করে জামাটি ইস্ত্রি করে নিন।

নতুন মাংস রান্না

সীমা দেবী

মাংস নানা উপায়ে রান্না করা যায়। এখানে যে মাংস রান্নার প্রণালীটি দেওয়া হ'ল তাকে দো-পেঁয়াজী বলে।

এইভাবে মাংস রান্না করলে বেশ মুখরোচক হয়।

উপকরণ—মাংস ১ সের, ঘি ১ পোয়া, পেঁয়াজ আধ পোয়া, পরিমাণমত আদাবাটা, লঙ্কাবাটা, ছোট এলাচ, হলুদবাটা, দারুচিনি ও লবণ।

প্রস্তুত-প্রণালী—প্রথমে মাংস ছোট ছোট খণ্ড করে রাখুন। এবার একটি পাত্রে ৩ ছটাক আন্দাজ ঘি দিয়ে মৃদু জালে চড়িয়ে দিন ও তাতে মাংস, পেঁয়াজ কিছু লবণ দিয়ে উত্তমরূপে মিশিয়ে নিন; এখন পাত্রটি ঢাকা দিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ পরে দেখবেন মাংস থেকে প্রচুর জল বেরিয়েছে। তখন আবার মাংস ভাল করে নেড়ে-চেড়ে ঢাকা দিয়ে দিন। যতক্ষণ না জল শুকিয়ে যায় এইভাবে মাঝে মাঝে নাড়তে থাকুন। তারপর জল শুকিয়ে গেলে হলুদবাটা, লঙ্কাবাটা, আদাবাটা দিয়ে আবার নাড়তে থাকুন এবং মাংসের রং বাদামী মত হয়ে গেলে ছোট এলাচ ও দারুচিনি দিয়ে দিন। তারপর আধসের জল ও প্রয়োজন হলে কিছুটা লবণ দিয়ে যতক্ষণ না পুনরায় জল শুকিয়ে যায় ঢেকে রাখুন এবং জল শুকিয়ে গেলে ও মাংস সুসিদ্ধ হলে ১ ছটাক আন্দাজ ঘি ঢেলে দিয়ে নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ পরে সুঘ্রাণ বেরুবে, তখন নামিয়ে ফেললেই আহারের উপযোগী হ'ল।

এই মাংসের সুবিধা হল যে শীতকালে দু'একদিন পরেও আহারের উপযোগী থাকে। অবশ্য ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আহারের সময় গরম করে নিতে হয়।

ভাতের চপ

শোভনা সিংহ

উপকরণ—একপোয়া চাল, চারটে ডিম, জিরে, আদা, লঙ্কা, পেঁয়াজ, একটু ময়দা, সামান্য চিনি, এলাচ দারচিনি গুঁড়ো, পরিমাণ মত তেল ও নুন।

প্রস্তুত প্রণালী—একটুকরো ন্যাকড়ায় একপোয়া আন্দাজ চাল বেশ শক্ত করে বেঁধে নিন্। ভাতের হাঁড়িতে গরম জলে চাল দেওয়ার সময় হাড়ির মধ্যে বাঁধা চালটা ফেলে দিন্। ফেলবার সময় দেখে নেবেন যেন চাল খুলে পড়ে না যায়। ভাত হয়ে যাওয়ার প্রায় পনের মিনিট পরে সেটা বের করে বেশ করে চট্‌কে নিন্। খুব ভাল করে চট্‌কে নিন্।—এতে সামান্য জিরে-আদা-লঙ্কা-পেঁয়াজ বাটা, একটুকু ময়দা ও সামান্য একটু চিনি ও আন্দাজ মতো নুন দিন। এলাচ ও দারচিনি গুঁড়ো দেবেন ছড়িয়ে। তাঁর পর এটাকে আবার ভালভাবে চট্‌কে মেখে নিয়ে নেচির মতো তৈরী করুন।

চারটে ডিম ভেঙ্গে ফেঁটে নিন্। পরে একে একে নেচিকে ডিমের মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে গরম তেলে ছাড়ুন। একটু সাবধানেই ছাড়বেন যেন ভেঙ্গে না যায়। বেশ ভালভাবে ভাজা ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

এক কাজ করুন না। কাউকে না জানিয়ে আপনি এই ভাতের চপ তৈরী করে পরিবেশন করুন।

খাওয়ার পরে জিজ্ঞেস করুন—জিনিসটা কিসের তৈরী। দেখবেন ভারী মজার উত্তর পাবেন।

যেজন পাষাণ, মিছে তার আশা পাষাণীরে ঘরে নিতে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

দুঃখের রজনী পোহালো না আর,—অশ্রু বাদল বয়,
সূর্য্যোদয়ের তবু কেন আশা করি?
মাটি ও আকাশ মোর পানে চেয়ে কোন কথা নাহি কয়,
আমার বীণায় বাজেনাক আশাবরী।
যে বীজ বপন করেছিনু আমি শ্রাবণের ধারা জলে,
ফসল তাহার হোলো কি কোথাও উর্ব্বর ভূমিতলে?
তুলি ও লিখনে তুলে ধরেছিনু মোর কামনার ছবি,
ছন্দের মালা গেঁথে গেঁথে গেল দিন।
অন্ধকারের জপমালা লয়ে কার নাম বসে জপি?
জীবনে আমার জমে আছে বহু ঋণ।
এখনো কিসের আশা করে আছি অনাগত পথ চেয়ে,
কুসুমের মাঝে ফুটিল না ফুল দখিণা বাতাস পেয়ে।
জনতার ভিড়ে হারালো কি মোর বহু কামনার ধন?
বহু মানবের শুনে গেনু কলরব!
আমার জনম তিথিরে কেহ তো করেনি অন্বেষণ,
কুটিরে আমার হোলোনাক উৎসব!
কত অচেনার তীর হতে তরী ভিড়েছে আমার কূলে,
কেহতো আমারে করেনি প্রশ্ন অতীতের কথা তুলে।
প্রতিমা গড়িয়া বোধন করিতে শুনেছি রোদন ধ্বনি,
পূজামণ্ডপ মন্ত্র মুখর নহে।
কলকোলাহলে অর্চ্চনা সবি তামসিক বলে গণি,
কিছু নাহি যার, সে শুধু মলিন রহে।
তার কথা ভেবে ভুলে গেছি কবে পাষাণেরে প্রাণ দিতে,
যেজন পাষাণ, মিছে তার আশা পাষাণীরে ঘরে নিতে।

মরুর তৃষায় মৃগতৃষ্ণিকা পাগল করেছে মোরে,
বালু ঝটিকায় জীবন দগ্ধ হোলো।
এখনো মনের ভিজে রাজপথ ব্যর্থ নয়ন লোরে,
—তবু কেন আর বেদনার কথা তোলে!
অলবোখরার গন্ধবিহীন বীথির কাহিনী শুনে,
হায় মুসাফির! কোন্ ফাগুনেরে খুঁজিতেছ কাল গুণে?
আয়ুর পাতার ঝরিবার দিন আসিবার বহু আগে
কতনা পাতার বিদায়ের গীতি ভাসে!
যৌবন রাগ না ফুটিতে জরা কত রূপসীরে ডাকে,
হৃদয় হরিতে হারালো হৃদয় ত্রাসে।
বুকের আঁচলে জড়ালো যাহার রক্তিম আভরণ,
আমি যে দেখেছি চিতার বুকেতে তার শেষ প্রসাধন।
কত কামানল চিতানল হয়ে ভেসেছে সাধের ঘর,
বিধাতার সম দেখেছি নীরবে আমি।
তবুও কেন যে তাসের প্রাসাদে কৃত্রিম নির্ঝর—
সাজাতে প্রিয়ার প্রাণ কাঁদে দিবাযামী!
কাচের মতন ভঙ্গুর মন কাঞ্চন দেহে রাখি,
তবুও গর্ব্ব এখনো জীবনে নিখিলেরে দিয়ে ফাঁকি?
হয়তো আমার কথাগুলি জানি হবেনা মনের মত,
আশাবাদীদের ভর্ৎসনা পেতে হবে;
তারা কি কখন ভেবেছে কোথায় জমেছে প্রাণের ক্ষত?
তারা কি জানে না খসে যায় তারা নভে?
গোধূলি বেলার মায়ার হরিণ পুষিলাম মিছে প্রিয়!
আমার শেষের দিনের কথাটি অনাগতদের দিও।

টিয়া

[একাঙ্কিকা]

মন্মথ রায়

একটি শয়নকক্ষ। খুব বড় একটি জানালার পাশে একখানি খাট। জানালার বাহিরেই সুবিস্তৃত বারান্দা। কক্ষের যেদিকে এই জানালা সেই দিকেই কক্ষের দরজা, দরজার সম্মুখেও ঐ বারান্দা। বারান্দার নীচে ছোট একটি ফুলের বাগান। তাহার পরই খুব উঁচু দেওয়াল। দেওয়ালে লতানো গোলাপের গাছ।

ঘরে খাটের উপর রোগ-শয্যায় একটি ছোট মেয়ে, বছর দশেক বয়স হইবে। নাম টিয়া। তাহার মাথার কাছে তাহার মা করুণা বসিয়া আছেন। খাটের পার্শ্বে টিপয়, তদুপরি একটি ঘড়ি টিক্ টিক্ করিয়া চলিতেছে এবং ঔষধপত্র, থার্মোমিটার প্রভৃতি রহিয়াছে।

বারান্দায় কয়েকখানি চেয়ার। তাহাতে টিয়ার পিতা মনুজনাথ এবং তাঁহারই আত্মীয়স্বজন এবং ডাক্তার বসিয়া আছেন।

বারান্দায় ঠিক জানালার সম্মুখে একটি টিয়া পাখীর খাঁচা ঝুলিতেছে। খাঁচাতে পাখী নাই, খাঁচার দরজাটি খোলা। টিয়াপাখীটি উড়িয়া গিয়া দেওয়ালের উপর বসিয়া আছে।

মেয়েটির অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন। সকলেই অত্যন্ত বিষণ্ণ। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দটাও ভালো লাগিতেছে না, তাহারই তালে তালে সকলের বুকের দুরু দুরু শব্দও বুঝি শোনা যায়।—আসন্ন সন্ধ্যা।

মনুজনাথ॥ সন্ধ্যাটাও কি পার পাবে না ডাক্তার?

ডাক্তার॥ নিশ্চয়।

পার পাইবে কি পাইবে না, কোনটা নিশ্চয়, ভাল বোঝা গেল না। কিন্তু এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতেও কেহ সাহসী হইল না।

মনুজনাথ॥ ডাক্তার, তুমি আর একটা ইনজেকশন দাও—

ডাক্তার॥ না।

ললিত॥ ঐটুকু মেয়ে·· আর কত সইবে!

অমিয়॥ বেশ ঘুমুচ্ছে···ওকে আর জ্বালাতন ··

ডাক্তার॥ রোগ হলেই জ্বালাতন হতে হয়।··· আপনারা মনে ভাবছেন ঘুমুচ্ছে, কিন্তু ওকে ঘুম বলা চলে না। তবে ইনজেকশনেরও আর প্রয়োজন নেই।

গভীর নিস্তব্ধতা

মনুজনাথ॥ একি! করুণা উঠে আসছে!

ডাক্তার॥ এইবার যদি ওঁকে অন্য কোন ঘরে পাঠাতে পারেন। বিশ্রাম ওঁর নিতান্ত আবশ্যক। রাতের পর রাত জেগে, দিনরাত রোগীর পাশে থেকে থেকে ওঁর চেহারা যা হয়েছে, দেখলে আমারি ভয় পায়—ওঁর কোন গুরুতর অসুখ করেছে নিশ্চয়।

মনুজনাথ॥ টিয়া ওঁর প্রাণ। টিয়া না বাঁচলে ওঁকেও বাঁচানো যাবে না ডাক্তার। আহার-নিদ্রা ও সাধ করে ত্যাগ করেনি!

ডাক্তার॥ কিন্তু তবু···

মনুজনাথ॥ চুপ—।

করুণা তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন

মনুজনাথ॥ কি করুণা?

করুণা॥ (দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া···) টিয়া-টা এখনো···আছে!

মনুজনাথ॥ কিন্তু আমাদের টিয়া? ঘুমুচ্ছে? কি বুঝছ?

করুণা॥ হ্যাঁ, ঘুমিয়েছে, কিন্তু কথা ব'লে ব'লে ক্লান্ত হয়ে তবে ঘুমিয়েছে।

মনুজনাথ॥ কি—কি বলল?

করুণা॥ ওর ঐ মিতার কথা। তোমার কথা নয়, আমার কথাও নয়, ফল-ফুল-খেলনা···কোন কথাই নয়, শুধু ঐ টিয়ারই কথা।

মনুজনাথ॥ ওটাকে ধরবারও তো কোন উপায় দেখছি না। ধরতে গেলেই—

করুণা॥ (আতঙ্কে) না—না—

ললিত॥ কি করে ওটা খাঁচার বাইরে গেল?

মনুজনাথ॥ ডাক্তার কব্‌রেজ নিয়েই আমরা ব্যস্ত, সেই ফাঁকে—

ডাক্তার॥ টিয়ার টিয়া-টি—

করুণা॥ চুপ। কথা আছে, শুনুন—

ডাক্তার॥ (করুণাকে) আপনি বসুন না—

করুণা॥ না। ব'সে গল্প করবার মত শক্তি নেই। শুধু একটা কথা···জীবন-মরণের কথা···

গভীর নিস্তব্ধতা

মনুজনাথ॥ কি কথা করুণা ?

করুণা॥ জীবন-মরণের কথা।

মনুজনাথ॥ সে কি করুণা ?

করুণা॥ হ্যাঁ, জীবন-মরণের কথা। তন্দ্রায় আমি স্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্ন কেন, আমার মনে, আমার প্রাণে সেই পরম সত্য ধরা দিয়েছে—

মনুজনাথ॥ কি করুণা, কি ?

করুণা॥ টিয়ার প্রাণ ঐ টিয়া। ঐ টিয়া যে মুহূর্তে এখান থেকে উড়ে পালাবে, আমার টিয়াকেও সেই মুহূর্তেই হারাবো—

বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া উদ্গত ক্রন্দন রোধ করিয়া মেয়ের কাছে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন···

···গভীর নিস্তব্ধতা। সকলে দেওয়ালে উপবিষ্ট পাখীটির দিকে চাহিয়া রহিল

ডাক্তার॥ ঐ টিয়া পাখীটি দেখছি রহস্যময় হয়ে উঠ্‌লো।

মনুজনাথ॥ ডাক্তার, এ কথনো সত্যি হতে পারে ?

ডাক্তার॥ কেন, ঠাকুমা ঠাকুর্দার মুখে শোনেননি এমনি ধারা রূপকথা ? রাক্ষসের প্রাণ ভোম্‌রা। রাজকন্যা জানতে পেরে প্রাণ-ভোমরা মারতেই মরে গেল রাক্ষস ! বিশ্বাস হ'ত নাকি, যখন হাঁ করে শুন্‌তেন ?

মনুজনাথ॥ কিন্তু, ডাক্তার কিন্তু··

ডাক্তার॥ এখন তা সত্যি হয় কিনা এই তো ?

মনুজনাথ॥ বল ডাক্তার বল—

ডাক্তার॥ 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।' বিশ্বাসে সব হয়।

মনুজনাথ॥ (চীৎকার করিয়া উঠিলেন) ডাক্তার ! ডাক্তার !

ডাক্তার॥ চুপ। চীৎকার করবেন না, টিয়ার ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

ললিত॥ পাখীটাও ভয়ে উড়ে যেতে পারে।

গভীর নিস্তব্ধতা

ডাক্তার॥ ঐ পাখীটির কি বিশেষ কোন ইতিহাস আছে ?

মনুজনাথ॥ কিছু না। আমার মার ছিল একটা পোষা টিয়াপাখী। আমাকে তিনি বেশী ভালবাসতেন কি ঐ পাখীটাকে বেশী ভালবাসতেন, এ প্রশ্নটা সকলের সঙ্গে আমার মনেও জাগতো। আমার ঐ মেয়ে হ'ল, আদর করে ওর নামও তিনি রাখলেন টিয়া। কিছুদিন পরে পাখীটা মারা গেল। মা তখন ঐ টিয়াকে কিনে এনে নাত্‌নীকে দিলেন, কিন্তু নিজেও আর বেশীদিন বাঁচলেন না। এই তো ওর ইতিহাস।

ডাক্তার॥ এ ইতিহাসে কোন বিশেষত্ব আছে কিনা সে কথা আলোচনা না ক'রে, আমি বরং এই জানতে চাই, ও টিয়া-টা নিয়ে কে বেশি মাথা ঘামায়·· মেয়ে না মা ?

মনুজনাথ॥ দুজনেই। আমার বাড়ীতে ঐ পাখীটার যা আদর, আমারো সে আদর ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাই বলে কি···এ কথা···করুণার ঐ কথা···কখনো সত্যি হয় ডাক্তার ?

ডাক্তার॥ মনে প্রাণে যখন কোন একটি বিশেষ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়, তখন সে বিশ্বাস বিশেষ শক্তিমান হয়ে দাঁড়ায়। সেই শক্তিতেই সে সত্যি হয়, এটা আমি সত্যি সত্যিই দেখেছি।

মনুজনাথ॥ ডাক্তার—ডাক্তার—

ডাক্তার॥ মার ঐ বিশ্বাস মেয়ের মনে সংক্রামিত না হলেই মঙ্গল।

অমিয়॥ সকলের চেয়ে মঙ্গল হয়, যদি ঐ পাখীটি উড়ে না পালায়।

ললিত॥ এও তো হতে পারে, রাতদিন মেয়ের জন্যে ভেবে ভেবে—অনাহারে আর অনিদ্রায় করুণা-মাসীর এই মানসিক বিকার হয়েছে।

করুণা আসিতেছেন দেখা গেল

মনুজনাথ॥ চুপ—।

নিস্তব্ধতার মধ্যে করুণা আসিয়া দাঁড়াইলেন

করুণা॥ (পাখীটার দিকে চাহিয়া) ওরে, আমরা কি দোষ করেছি যে তুই পালাবি? ফিরে আয়, ওরে, ফিরে আয়!

মন্মজনাথ॥ (করুণাকে) ওদিকে যেয়ো না···ও হয় তো···হ্যাঁ, ঐ যে—

করুণা॥ চুপ—চুপ—

নিস্তব্ধতা

ললিত॥ না, আর ভয় নেই। ও স্থির হয়ে বস্‌ল।

করুণা॥ ও খাঁচায় কেন ফিরে আসে না, কেউ বলতে পার? ওকে কি আদরই না করি···কি যত্নেই না ওকে রাখি, তবু আজ···! ওরে আয়—আয়—তোর পায়ে পড়ি, ফিরে আয়—

ডাক্তার॥ আপনি বসুন। আপনার টিয়ার কথা বলুন—এখন কেমন বুঝছেন?

করুণা॥ জেগেছে। জেগেই বললে মিতা কই? আমি দেখালুম। বললে—মাগো, ও আজ আকাশে উড়বে। এখানে আর ওর মন নেই। ও আমার সব গল্প শুনেছে, শুনে ওরও মন ছুটেছে—মেঘের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে কে চলে জানতে, রামধনু কার ধনু তাই দেখতে, সুয্যিঠাকুর কোন পাটে ওঠেন, কোন ঘাটে ডোবেন জানতে, চাঁদের মাঝে যে বুড়ী চরকা কাটে তাকে দেখতে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেষে বলে—মাগো, আমার যদি পাখা থাকতো। মাগো, ওর মত আমার যদি পাখা থাকতো। দুজনে একসঙ্গে উড়ে যেতাম আজ।

মন্মজনাথ॥ চুপ—

অঙ্গুলি-সঙ্কেতে টিয়াটির উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন

করুণা॥ সর্বনাশ!

ছুটিয়া মেয়ের কাছে ঘরে গেলেন

অমিয়॥ না, স্থির হয়ে বসেছে। আর ভয় নেই।

ললিত॥ ওটাকে ধরবার কোন উপায় নেই?

মন্মজনাথ॥ (সাতঙ্কে) না—না—, ধরতে গেলে যদি উড়ে পালায়।

ডাক্তার॥ জোর করে কি কাউকে ধরে রাখা যায় ললিতবাবু?

মন্মজনাথ॥ করুণা আবার—(ছুটিয়া করুণা আসিয়া দাঁড়াইলেন) কি করুণা?

করুণা॥ ওর জন্যে যে নতুন শাড়ী এনেছ, নতুন জুতো, নতুন জামা, নতুন ওড়না···ও চাইছে। এখনি—এখনি—

মন্মজনাথ॥ ললিত, মল্লিকাকে বল—

ললিত॥ (ছুটিয়া যাইতে যাইতে) এখনি আনছি—

করুণা॥ বলে—এ পুরোনো জামা-কাপড় আর নয় মা, নতুন জামা-কাপড় দাও, আজ আমি নতুন সাজে সাজব।—হ্যাঁ খুব খুশী মনেই বল্‌লে।

ডাক্তার॥ আমি বরং একবার দেখে আসি—

করুণা॥ না—না, দরকার নেই। কোনো দরকার নেই। আপনাকে ও দেখতে পারে না। আপনি গেলে ওর মন আবার বিষিয়ে উঠ্‌বে।

ডাক্তার॥ তবু···একটিবার···

করুণা॥ না। কেন আপনি ভয় পাচ্ছেন ডাক্তার-বাবু? বিশেষ এখন? এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছে ওর অসুখই আর নেই। তবে কেন মিছিমিছি ওকে—

মন্মজনাথ॥ হ্যাঁ ডাক্তার, তুমি বরং···ওরে, ডাক্তার-বাবুকে চা দেওয়া হয় নি। (নূতন জামা-কাপড় লইয়া ললিত আসিল) এই যে ললিত—

করুণা॥ (ললিতের দিকে ছুটিয়া গিয়া) দাও—দাও—নতুন এই জামা-কাপড় পরলে ওর আর কোন অসুখই থাকবে না, এমনি খুশী হবে ও। ডাক্তারবাবু, আপনি যাবেন না। দেখুন, কিন্তু কাছে গিয়ে নয়; দূর থেকে, আড়াল থেকে—

জামা কাপড় লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন

মন্মজনাথ॥ ললিত—ললিত—তুমি ছুটে দোকানে দোকানে গিয়ে এখনি আরো সব শাড়ী—আরো সব জামা—ওর সারাটি দেহ মুড়ে দিতে দোকানে যা আছে··· সব—স-ব—যত দামই হোক্—যাও-যাও—

ডাক্তার॥ কিন্তু—আচ্ছা, যাও।

ললিত চলিয়া গেল

মন্মজনাথ॥ ডাক্তারের চা এলো·না। অমিয়, তুমি যাও ভাই—

অমিয়॥ যাচ্ছি—

মনুজনাথ॥ আচ্ছা, শোনো। তুমিও যাও অমিয়—খেলনা, বুঝলে অমিয়—রং-বেরং-এর এতো খেলনা··· কাঠের, রবারের, কাঁচের। লাটিম, বল, নৌকো, হাতী, ঘোড়া, সাপ, একটা বাঁশী, লুডো, কিছু জলছবি, হাতীর দাঁতের একটা বাক্স—ঐ সওদাগরী দোকানে আছে, শ্বেত পাথরের তাজমহল—হ্যাঁ, রান্নাবান্না ওর ভারী সখ, খেলনার কড়াই, ডেক, হাতা, খুন্তি, বেড়ী—জানো তো সব?

অমিয়॥ জানি—

মনুজনাথ॥ পূজো করতে ওর ভারী সখ। ছোট রেকাব, পেতলের সাজি, চন্দনের বাটি, ধূপদানি, পঞ্চপ্রদীপ, মনে থাকবে?

অমিয়॥ থাকবে।

মনুজনাথ॥ দাঁড়াও। ও যেন আমার কাছে সেদিন কি চেয়েছিল, দিতে পারিনি,···কিন্তু আজ তো তা মনে পড়ছে না···টিয়া···টিয়া—

অমিয়॥ চুপ—ঐ দেখুন—

অঙ্গুলি সঙ্কেতে পাখাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। পাখীটি উড়িবার উপক্রম করিতেছিল মনে হইল।···গভীর নিস্তব্ধতা

মনুজনাথ॥ না—না, আর ভয় নেই। ও ভালো করে বসল।···কি চেয়েছিল—কি চেয়েছিল···(স্মরণ করিতে না পারিয়া) মনে পড়ছে না। আচ্ছা ভাই, তুমি এসো—ফিরতে কিন্তু ভাই বিলম্ব করো না—কোনটাই ভুলো না—

অমিয় যাইতেছিল

ডাক্তার॥ ভুলো না। খেলনা—পূজার বাসন—এবং···

অমিয়॥ এবং—?

ডাক্তার॥ যাবার পথেই—

মনুজনাথ॥ কি ভুল করলুম ডাক্তার?

ডাক্তার॥ এক পেয়ালা চা।

হাসিয়া অমিয় চলিয়া গেল। এদিকে করুণা আসিয়া দাঁড়াইলেন

মনুজনাথ॥ করুণা, খবর?

করুণা॥ লণ্ঠনকে দেখেছ?

ডাক্তার॥ লণ্ঠন!

করুণা॥ রায় বাড়ীর সেই ছেলেটা গো।' লণ্ঠনকে এখনি না পেলে তো আর চলছে না।

মনুজনাথ॥ কেন? কেন?

করুণা॥ পুরোনো জামা-কাপড় ছেড়ে নতুন জামা-কাপড় পরতে এখন এক আপত্তি দাঁড়িয়েছে।

মনুজনাথ॥ কি আপত্তি?

করুণা॥ বলে, নতুন সাজে যে সাজব, খোঁপাতে কি দেব?

মনুজনাথ॥ কি চাই?

করুণা॥ তোমার কাছে সে তা একদিন চেয়েছিল। তুমি দাওনি।

মনুজনাথ॥ চেয়ে যে ছিল তা' মনে পড়ছে, কিন্তু কি যে চেয়েছিল সেইটে কিছুতেই মনে পড়ছে না। কি চেয়েছিল?

করুণা॥ ফুল।

মনুজনাথ॥ হ্যাঁ, ফুল। আমি এখনি দিচ্ছি···

করুণা॥ কিন্তু কি ফুল?

মনুজনাথ॥ (স্মরণ করিতে চেষ্টা। না পারিয়া) কি ফুল?

করুণা॥ অভিমানিনী তা আজ আর তোমায় বলবে না। আমায়ও বললে না। বলে, ঘরের লোক যা দেয়নি, বাইরের লোক তাই দেবে। বাইরের সেই লোক লণ্ঠন।

মনুজনাথ॥ তা দিক্···সেই দিক্···কোথায় সে?

করুণা॥ তার খোঁজে এখনই লোক পাঠাও, নইলে অনর্থ হবে—

মনুজনাথ॥ (একজনকে) খুঁজে আনো ভাই রায় বাড়ীর সেই লণ্ঠনকে—তাকে এখনি যেখান থেকে পার ধরে আনো—

করুণা॥ তাকে গিয়ে বল—টিয়াকে তুমি কি ফুল দিতে চেয়েছিলে—দাও নি কেন? টিয়া যে তোমার আশায় বসে আছে। শীগ্‌গির গিয়ে টিয়াকে সেই ফুল দিয়ে এস। ব'লো, টিয়া কাঁদছে···টিয়া রাগ করে তোমার পথ চেয়ে বসে আছে।

সে চলিয়া গেল

ডাক্তার॥ লণ্ঠন। বাপ-মা আর নাম পায় নি!

করুণা॥ তাই টিয়া হেসে বলে—সূর্য্যি যখন ডুবে যাবে, তুমি ভাই লণ্ঠন আমার পাশে থেকো, তোমার মুখের পানে চেয়ে থাকবো, আঁধারের মুখ দেখব না।

ডাক্তার॥ সূর্য্য ডুবতে তো আর বিলম্ব নেই। কিন্তু কোথায় লণ্ঠন—আর কোথায় বা—

করুণা॥ কি ?

ডাক্তার॥ আমার সেই এক পেয়ালা চা !

মনুজনাথ॥ মনে পড়েছে—মনে পড়েছে—কি ফুল··· আমার মনে পড়েছে—কিন্তু ওঃ !

অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন

করুণা॥ ওকি ! অমন করছ যে ? কি ফুল ?

মনুজনাথ॥ না—না—ওঃ !

করুণা॥ (মনুজনাথের প্রতি) কি ফুল, ওগো বল··· কি ফুল ?

মনুজনাথ॥ ঐ লতানে গোলাপ···হলুদ ঐ মার্সাল নীল···দেওয়ালের ঐ মাথায়···টিয়া পাখীর ঠিক নীচে—ঐ যে ফুটে রয়েছে !

করুণা॥ সর্বনাশ ! ও ফুল এ গাঁয়ে—

মনুজনাথ॥ কোথাও নেই—কোথাও নেই—তাই আমি ও ফুল সেদিন তুলিনি···কিন্তু আজ—

করুণা॥ আজ তুলবে ?

মনুজনাথ॥ তুলব ?

করুণা॥ (ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন) না—

মনুজনাথ॥ চুপ—চুপ—

পাখীটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। পাখীটি প্রায় ওড়ে এই অবস্থা

করুণা॥ ওঃ !

আর্তনাদ করিয়া ছুটিয়া ঘরে গেলেন

দেখা গেল দেওয়ালের ওপার হইতে একটি ছোট হাত পাখীটিকে চাপিয়া ধরিয়াছে। পরমুহূর্তেই দেখা গেল সে হাত আর কাহারও নয়, সেই লণ্ঠনের। সে টিয়াটিকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দেওয়ালের উপর উঠিয়া বসিয়া নীচের সেই গোলাপটি ছিঁড়িয়া, এক হাতে টিয়া এবং অন্য হাতে ফুল লইয়া মাটিতে লাফাইয়া পড়িয়া টিয়ার ঘরে লাফাইতে লাফাইতে ঢুকিয়া পড়িল। বাহিরে যাহারা তাহাকে চিনিল, তাহারা সমস্বরে আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিল,—লণ্ঠন ? লণ্ঠন !

ডাক্তার॥ হ্যাঁ, লণ্ঠন এল, কিন্তু আমার চা -

ঘরে-বাহিরে সকলেই হাসিয়া উঠিল
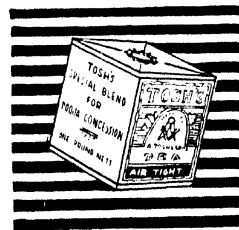
রাজ্য পুনর্গঠন ব্যবস্থা—

রাজ্য পুনর্গঠন ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে—কমিশন স্থির করিয়াছেন, ভারতে ২৭টি রাজ্য ছিল. তাহা ১৬টি রাজ্যে পরিণত হইবে। (১) পশ্চিম বাংলার আয়তন কিছু বর্দ্ধিত হইল—মানভূম জেলার সদর মহকুমা (একটি থানা চাষ বাদে) এবং পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জের একটি অংশ (যাহা মহানন্দা নদের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত) বিহার হইতে পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হইয়াছে—নূতন জমির পরিমাণ ৪৮০০ বর্গমাইল ও তথায় ১৪ লক্ষ লোক বাস করে। মানভূমের অংশে ১১ লক্ষ ও কিষণগঞ্জের অংশে ৩ লক্ষ লোকের বাস। পশ্চিমবঙ্গ যাহা চাহিয়াছিল, তাহার কিছুই পায় নাই। কিষণগঞ্জের অংশ দিয়া ফারাক্কা হইতে উত্তরবঙ্গে রেলপথ তৈয়ার করা চলিবে। (২) অন্ধ্র—বর্তমান অন্ধ্র রাজ্যের সহিত বেলারী জেলার ৪টি তালুক সংযুক্ত হইবে। (৩) আসাম—ত্রিপুরা রাজ্য আসামের সহিত সংযুক্ত হইল···মণিপুর পৃথক ভাবে কেন্দ্রের অধীন থাকিবে ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত এলাকা বর্তমান অবস্থায় থাকিবে (৪) বিহার—পশ্চিমবঙ্গকে যে সামান্য অংশ দেওয়া হইল, তাহা বাদে বিহার যাহা ছিল তাহাই থাকিবে। (৫) বোম্বাই—বোম্বাই রাজ্য হইতে কানাড়া-ভাষাভাষী অঞ্চল বাদ যাইবে—কিন্তু সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ ও হায়দ্রাবাদের মারাঠওদা জেলা বোম্বায়ের মধ্যে থাকিবে (৬) মাদ্রাজ—বর্তমান মাদ্রাজ রাজ্য হইতে মালাবার বাদ যাইবে—কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরের কয়েকটি তালুক মাদ্রাজে সংযুক্ত হইবে। (৭) মহাকোশল—মধ্যপ্রদেশের হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চল, মধ্যভারত, বিন্ধ্যপ্রদেশ ও ভূপাল লইয়া নূতন মহাকোশল রাজ্য গঠিত হইবে। (৮) উড়িষ্যা—কোন পরিবর্তন হইবে না। (৯) পাঞ্জাব—বর্তমান পাঞ্জাব রাজ্যের সহিত পেপসু ও হিমাচল প্রদেশ যুক্ত হইবে (১০) উত্তর প্রদেশ—কোন পরিবর্তন হইবে না (১১) কেরল—ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্য (মাদ্রাজকে প্রদত্ত কয়েকটি তালুক ছাড়া) ও মাদ্রাজের মালাবার লইয়া নূতন কেরল রাজ্য গঠিত হইবে (১২) কর্ণাটক—মহীশূরের সহিত হায়দ্রাবাদ ও বোম্বায়ের কানাড়া ভাষাভাষী অঞ্চল যুক্ত করিয়া নূতন কর্ণাটক রাজ্য গঠিত হইবে (১৩) বিদর্ভ—মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের মারাঠা ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া নূতন বিদর্ভ রাজ্য হইবে (১৪) তেলেঙ্গানা—হায়দ্রাবাদের তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া নূতন তেলেঙ্গানা রাজ্য হইবে। (১৫) রাজস্থান—বর্তমান রাজস্থানের সহিত মাউণ্ট আবু যুক্ত করা হইবে (১৬) জম্মু ও কাশ্মীর—কোন পরিবর্তন হইবে না। দিল্লী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না—আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসাবে ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের জন্য উহা শুধু রাজধানী বলিয়া শাসিত হইবে। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সদস্যগণ সকল বিষয়েই একমত, শুধু একজন উত্তরপ্রদেশকে ২ খণ্ডে ভাগ করার এবং আর একজন হিমাচল প্রদেশকে স্বতন্ত্র রাখার কথা প্রস্তাব করিয়াছেন। এখন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট শুধু দিল্লী, মণিপুর ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের শাসন করিবেন—বাকী ১৬টি রাজ্য সমান অধিকার লাভ করিবে। দক্ষিণ ভারতেই নূতন নামে নূতন রাজ্য গঠিত হইল—হায়দ্রাবাদ ও মধ্যপ্রদেশ ভাগ করিয়া কেরল, কর্ণাটক, বিদর্ভ, তেলেঙ্গানা ও মহাকোশল রাজ্য হইবে। পশ্চিমবঙ্গ এই 'না কোরো-বঞ্চিত' নীতি দ্বারা কখনই সন্তুষ্ট হইবে না। পাঞ্জাবেও নূতন ব্যবস্থা কাহারও সন্তোষ বিধান করিবে না—সেজন্য আগামী ৫ বৎসর তথায় গভর্ণরী শাসন হয়ত চালাইতে হইবে। মারাঠা ভাষাভাষীরাও ২ ভাগে বিভক্ত হওয়ায় সন্তুষ্ট হইবে না। দেখা যাউক—মন্ত্রিসভাসমূহ কি ভাবে এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন।

শ্রীঅমিয়নাথ বসু সম্বর্দ্ধনা—

স্বর্গত নেতা শরৎচন্দ্র বসুর পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীঅমিয়নাথ বসু সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনসংযোগ বিভাগের অবৈতনিক পরামর্শদাতা নিযুক্ত হওয়ায় গত ১০ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবী সংঘের সভাপতি শ্রীমৃণালেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁহাকে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় আপ্যায়িত করিয়াছেন। তথায় সরকারী জনসংযোগ বিভাগের কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছিল এবং কলিকাতার সাংবাদিকগণ জনসংযোগ ব্যাপারে সরকারকে কি ভাবে সাহায্য করিতে পারেন, উপস্থিত সাংবাদিকগণ তাহা আলোচনা করিয়াছিলেন। অমিয়বাবু তাঁহার বক্তৃতায়—তিনি এ বিষয়ে যে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন, তাহা জানাইয়াছেন এবং উপস্থিত সাংবাদিকগণকে এ বিষয়ে তাঁহার সহিত ও সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। নূতন ব্যবস্থার ফলে পশ্চিমবঙ্গে জনসংযোগ বর্দ্ধিত হইলে দেশবাসী ও সরকার উভয়েই লাভবান হইবেন। অমিয়বাবুর চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক, সকলেই তাহা একান্তভাবে কামনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় সড়ক—

৬ই সেপ্টেম্বর দিল্লীর লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে পরিবহন বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীআলাগেশন জানাইয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গে নিম্নলিখিত জাতীয় সড়কগুলির উন্নতিবিধান করা হইতেছে—(১) দিল্লী, আগ্রা, কানপুর কলিকাতা (২নং সড়ক) ১৪৭ মাইল (২) বোম্বাই, নাগপুর, রায়পুর, খড়্গপুর, কলিকাতা (৬নং)—১০০ মাইল (৩) বার্হি, মোকামা, শিলিগুড়ি, কুচবিহার (৩১নং)—১৬০ মাইল (৪) শিলিগুড়ি, রংপু, গ্যাংটক—(৩১-এ নং) ১৯ মাইল (৫) কলিকাতা, বারাসত, গাজোল, ডালখোলা (৩৪ নং)—২৪৯ মাইল (৬) বারাসত, যশোহর—পাকিস্তান

সীমান্ত (৩৫নং)—৩৮ মাইল। মোট ৭২২ মাইল। বর্তমানে নূতন পথ তৈয়ার করা হইবে না—শুধু পুরাতন পথগুলির সংস্কার করা হইবে।

ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত—

গত ২রা অক্টোবর রবিবার বিকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বরাহনগরে (উত্তর কলিকাতা) বেঙ্গল ইমিউনিটি কারখানার গবেষণাগারে উক্ত কোম্পানীর প্রধান পরিচালক স্বর্গত ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের এক পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তির প্রতিষ্ঠা উৎসব করেন। ক্যাপ্টেন দত্তের মত অক্লান্তকর্মী দেশসেবক এ যুগে বিরল। তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং সারাজীবন দেশের শিল্প-উন্নয়ন ও অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সহকর্মী বন্ধুরা সত্যই গুণীর আদর করিয়াছেন। ক্যাপ্টেন দত্তের আদর্শ দেশবাসী অনুকরণ করুক, সর্বান্তকরণে ইহাই আমরা কামনা করি।

অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ সরকার—

গত ৩রা অক্টোবর সোমবার বিকালে কলিকাতা সরকারী সংস্কৃত কলেজ ভবনে স্বর্গত অধ্যাপক, খ্যাতনামা দার্শনিক পণ্ডিত ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের আবক্ষ মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। অনুষ্ঠানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক সরকার শুধু পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। তিনি ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন—সমগ্র জীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থগুলির প্রকাশের স্বত্ব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুরা তাঁহার মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া একজন সাধকের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মূর্তি যেন এযুগের ছাত্রগণকে নূতন প্রেরণা দান করে—ইহাই আমাদের কামনা।

কয়েক বৎসরে বেকার সমস্যার বিলোপ—

কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীইউ-এন-ডেবর গত ২৮শে সেপ্টেম্বর এলাহাবাদের নিকট শিরশাঁ নামক স্থানে জনসভায় বলিয়াছেন—আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশ হইতে দারিদ্র্য দূর না হইলেও বেকার-সমস্যা দূরীভূত হইবে। পরাধীনতার আমলে বৃটীশকে তাড়াইবার জন্য আমরা যেরূপ সংগ্রাম করিয়াছিলাম, আজ দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্যও সেইরূপ আগ্রহ ও উদ্দীপনা লইয়া শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে অগ্রসর হইব। জনগণকে দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। এখন অশ্রু বিসর্জ্জনের সময় নয়, অভিযোগ করিবার সময়ও ইহা নহে, এখন কেবল কাজ করিতে হইবে। আজ দেশের প্রত্যেক অধিবাসীকে বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে ও তাহার প্র কর্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে।

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের আমন্ত্রণ—

২৬শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মিঃ আবুহোসেন সরকার জানাইয়াছেন—হিন্দুরা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে পাক-সরকার তাহাদের সাদরে গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা সরকারের হস্তে তাঁহাদের সম্পত্তির ভার ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছেন, শুধু তাঁহাদেরই প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হইবে। যাঁহারা পাকিস্তানের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা হইবে না। যাহা হউক, মিঃ আবুহোসেন সরকারের এই উক্তিতে একদল হিন্দু আশ্বস্ত হইবেন। বহু হিন্দু তাঁহাদের পাকিস্তানের সম্পত্তি বিক্রয় করেন নাই—তাঁহাদের ফিরিয়া যাওয়ার সুযোগ সুবিধা পাইলে দেশে যাইয়া সুখে বাস করিতে পারিবেন। পূর্ব-পাকিস্তানের নূতন মন্ত্রিসভা এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের লোকই উপকৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

রুশ প্রধান মন্ত্রীর ভারতাগমন—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রী বুলগানিন ও মসিয়ে ক্রুশেভ আগামী নভেম্বর মাসে ভারতে আসিয়া ২ সপ্তাহকাল বাস করিবেন। লোক সভার পরবর্তী উদ্বোধনের দিন বুলগানিনকে তথায় উদ্বোধন বক্তৃতা করিতে বলা হইয়াছে। রুসিয়ার সহিত ভারতের মৈত্রী উভয় দেশের পক্ষে কল্যাণজনক হউক, ইহাই আমরা কামনা করি।

জুয়াচুরি বন্ধের আইন—

কেন্দ্রীয় আইন সভায় একটি নূতন আইন করিয়া জুয়াচুরি বন্ধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শব্দ গঠন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রতিযোগিতা প্রভৃতির নাম করিয়া একদল লোক দেশের সাধারণ মানুষকে ঠকাইয়া অর্থ-উপার্জন করে। ঐ সকল ব্যবসা বন্ধ করিবার জন্য নূতন আইনের প্রয়োজন ছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের চেষ্টায় নূতন আইন প্রণীত হইয়াছে।

বারান্দাযুক্ত ট্রেণ—

গত ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে রেল কর্তৃপক্ষ ভারতে সর্বপ্রথম বারান্দাযুক্ত তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর ট্রেণ চলাচলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ট্রেণে এক দিক হইতে অপর দিক পর্যন্ত বারান্দা থাকার ফলে ট্রেণ চলার সময়ও যাত্রীরা এক কামরা হইতে অন্য কামরায় যাতায়াত করিতে পারিবেন। ফলে ভিড়ের চাপ কমিবে—রেল কর্তৃপক্ষ বিনা টিকিটে ভ্রমণ বন্ধ করিতে পারিবেন। আপাততঃ দিল্লী ও হাওড়ায় যাতায়াতকারী জনতা ট্রেণে ঐ কামরা দেওয়া হইবে এবং প্রতি সোমবার দিল্লী হইতে ও প্রতি শনিবার হাওড়া হইতে ঐ ট্রেণ ছাড়িবে। এই ব্যবস্থার ফলে দরিদ্র তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা উপকৃত হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাই রেলের অধিক অর্থ জোগাইয়া থাকে, কাজেই তাহাদের সুখ সুবিধা বিধানের ব্যবস্থা করা রেল-কর্তৃপক্ষের সর্বপ্রথম কর্তব্য।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

জলে

ফটো :—অজিত মিশ্র

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

স্কুলে

ফটো :—অজিত মিত্র

পূর্বানুবৃত্তি
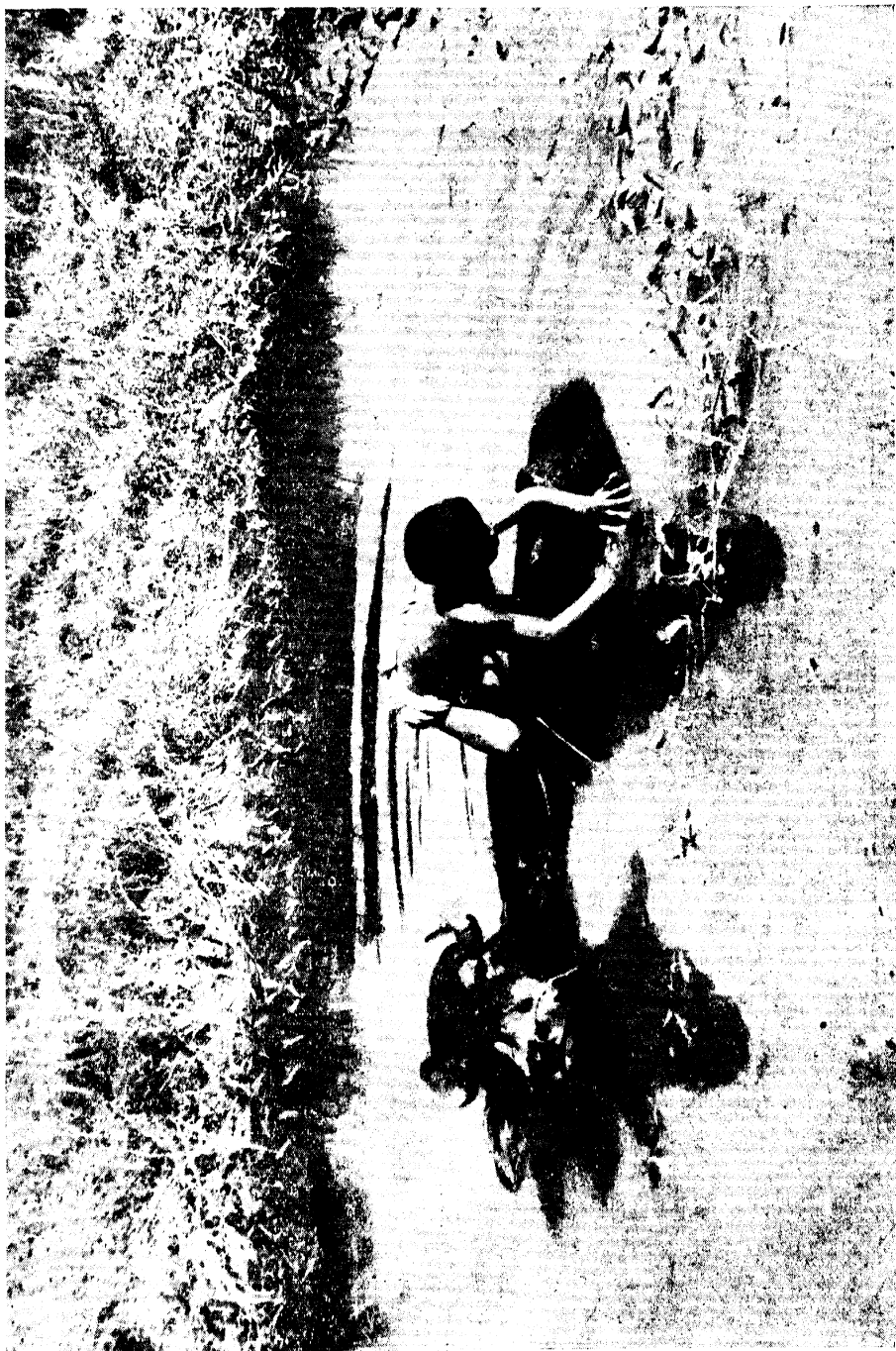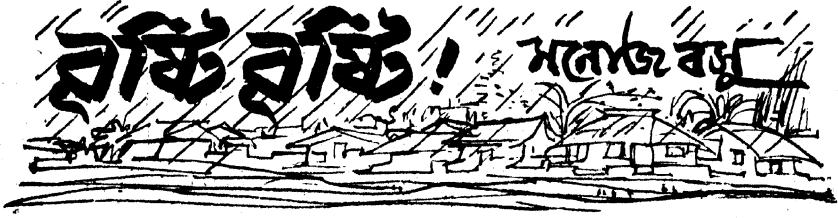
পড়তে পড়তে অরুণাক্ষ লাফিয়ে ওঠে। তাই তো—এ কাশীশ্বর তারই প্রপিতামহ, সংশয়ের কিছু নেই। কাশীশ্বরের সেজ ছেলে কমলাক্ষ, তাঁর ছেলে অম্বুজাক্ষ, অম্বুজাক্ষের ছেলে অরুণ। ঠিক বটে, সাহেববাড়ি খানা খেয়ে ফিরতি পথে কাশীশ্বর মারা যান। একটা গোলমেলে সম্পত্তি কিনেছিলেন—এরা বরাবর জেনে বুঝে এসেছে, সেই সম্পত্তির এক বা একাধিক শরিক আক্রোশ বশে এই কাজ করেছে। কিন্তু ব্যাপার দেখা যাচ্ছে একেবারে আলাদা বিশ্বেশ্বরই প্রথম দেখিয়ে ছিলেন। রায় বংশের নতুন গৌরব এনে দিলেন তিনি।

বাবা বাড়ি নেই। রোগি দেখে দেখে বেড়াচ্ছেন। ফিরবেন সেই কত রাত্রে। অরুণ থাকতে পারে না।

জানো মা, কত বড় কুলীন আমরা—

সুহাসিনী হেসে বলেন, কি বলিস—কায়েতের মধ্যে ঘোষ-বোস-মিত্তির হল কুলীন। সে বটে আমার বাপের বাড়ি। বিয়ের পরে আমি তো জাতে নিচু হয়ে গেলাম।

অরুণাক্ষ ঘাড় নেড়ে জোর দিয়ে বলে, তোমার বাবার চেয়ে অনেক বড় কুলীন আমরা।

ছেলের ক্ষেপানো কথা, সুহাসিনী বুঝতে পারলেন। পানের পিচ কেটে হেসে তিনি বললেন, সে আর হতে হয় না। বাগুটের ঘোষ—কুলীনের সেরা কুলীন, মুখ্যি হলেন আমার বাবা। তোরা তো মৌলিক। গোষ্ঠীপতি বলে দাম বাড়াস, তা হলেও অনেক নিচুতে আছিস আমার বাপের বাড়ির চেয়ে।

অরুণ বলে, না মা, বল্লালী কুলের কথা কে বলছে? এযুগে তা কেউ পোঁছে না। আমার ঠাকুরদাদার বাবা হলেন কাশীশ্বর রায়। বিদেশির অত্যাচার রুখতে গিয়ে যাঁর প্রাণ গেল। প্রাণ দিয়ে দেশের মধ্যে আমাদের সকলের বড় কুলীন করে দিলেন।

কি করবে, অরুণ ভেবে পায় না, কোথায় গিয়ে মনের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে? ছুটে যাবে বিশ্বেশ্বরের বাড়ি—ইরার কাছে? মুখস্থ আছে বলেছিলাম 'ভারতে ইংরাজ', বিদ্রূপ করেছিলে। চোখে আগুন বেরিয়েছিল। আগুন আর অশ্রু একসঙ্গে। দাঁড়ালাম এবারে এই সামনে এসে। যত রকমে যেমন খুশি করো এগজামিন। কিন্তু রাত হয়ে গেছে, কি অজুহাতে সেখানে গিয়ে ওঠা যায়? শাড়ি ফেরত দেবার নাম করে? ধুতি-ছাতা ইরাবতী কবে নিয়ে গেছে—শাড়িটা আছে পড়ে আজও এখানে। হরিহর ধোবার বাড়ি পাঠিয়েছিল, কেচে এসেছে—কিন্তু তার পরেই ঝগড়াঝাটির দরুণ আর খেয়াল হয় নি। কিম্বা লজ্জা বোধ করেছে শাড়ি হাতে ঐ বাড়ি গিয়ে দাঁড়াতে। অথবা ভয়। এমন মিষ্টি মেয়ে এক লহমায় ক্রুদ্ধ সিংহীর মতো হয়ে উঠল। অন্যায়টা অরুণেরই। বিশ্বেশ্বরকে এত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে—অথচ দেখ, বংশ ধরে এত বড় সম্মান দিলেন তিনিই। সম্মান শুধু আজকের নয়, সর্বকালের মানুষের কাছে।

খানিক বাদে অম্বুজাক্ষ চৌরঙ্গির চেম্বার থেকে ফিরলেন। এখন পূজা-আহ্নিক, তার পরে সামান্য আহারান্তে শুয়ে পড়বেন। মতলব ঘুমানোর বটে, কিন্তু প্রায়ই তা হয়ে ওঠে না। মানুষ তখনো এসে হাঁকডাক লাগায়। সাড়া না দিলে দরজা ভেঙে ফেলবে, এই রকম গতিক। ঘুম ভেঙে উঠে বিরক্তমুখে গজর-গজর করতে করতে উপরের বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ান।

কি হয়েছে?

কালীঘাটে বিয়ের নেমন্তন্ন ছিল। বাড়ি এসে ভেদবমি হচ্ছে বড় ছেলেটার। পেটে বিষম যন্ত্রণা—

ভোজে খুব ঠেসেছে, এই আর কি! সে না হয় ছেলে-মানুষ—আপনার খেয়াল রাখা উচিত ছিল যে জিনিষপত্র পরের হলেও পেট নিজেদের—

যা ইচ্ছে বলুনগে ডাক্তারবাবু। একটিবার আপনাকে দেখে যেতে হবে।

কিচ্ছু দেখতে হবে না। আমি একটা অষুধ লিখে দিচ্ছি। এই রাত্রে অষুধই বা কোথায় খুঁজে বেড়াবে? এই মোড়ক দিয়ে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। ঐ খাইয়ে দাওগে, পেট ভাল হয়ে যাবে।

না ডাক্তারবাবু—কেঁদেই ফেলল লোকটা। বলে, এক নজর আপনি দেখে যান। অষুধ লাগবে না, চোখে দেখলেই আরাম হয়ে যাবে। আপনি আসুন।

গতিক তাই বটে! লোকের এমন আস্থা, অম্বুজাক্ষ একবার দেখে দু-চারটে মিষ্টি কথা বললে অর্ধেক রোগ নিরাময় হয়ে যায়। ভিজিটের খুব যে একটা কড়াকড়ি, তা নয়। জলস্রোতের মত তবু টাকাকড়ি আসছে। করপোরেশন ইলেকসনে নিজে দাঁড়াতে চান নি, দশজনে বলে কয়ে দাঁড় করিয়েছিল। এত জনপ্রিয়তা—তাই ভরসা হয়ে ছিল, অবাধে তরে যাবেন। কিন্তু দশচক্রে ভগবান ভূত হয়ে দাঁড়াল—হেরে গেলেন, তা-ও একেবারে ভূতনাথ গুঁইয়ের কাছে।

বাড়ির লোকের মুখ অন্ধকার। অম্বুজাক্ষ খুব যে বিচলিত হয়েছেন, তা নয়। অন্তত বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাবে না। বলেন, অঢেল রোজগারপত্তোর করছি। টাকাপয়সার দিক দিয়ে যদি বলো, আমার জীবন সার্থক বলতেই হবে। কিন্তু নিজের ছাড়া দশের কাজ কবে কি করলাম, বাইরের মানুষ ভালবাসবে আমায় কোন সুবাদে? বন্ধুরাও সান্ত্বনা দেয়, ভাল হয়েছে। করপোরেশনের হল ছ্যাচড়া কাজকর্ম। এর নর্দামা আটকে গেছে; ওর কলে জল আসছে না; ওর পাঁচসিকে ট্যাক্সবৃদ্ধি ঘটেছে, ঐ লোক বে-আইনি এক বারাণ্ডা তুলে বসে আছে। গুঁই মশায় এরই ভিতরে ঢুকে পড়ে দুটো পয়সা বের করে নেবেন, সকলে তো ঐ কর্ম পেরে ওঠে না। আপনি না গিয়েছেন, ভালই হয়েছে। অ্যাসেম্বলিতে চলে যাবেন ডাক্তারবাবু, মন্ত্রী হয়ে বসবেন—আধা-সিকি নয়, পুরোপুরি এক মন্ত্রী।

হেরেগিয়ে তার পরে অম্বুজাক্ষ মানুষ খানিকটা আলাদা হয়ে উঠলেন। দয়াধর্ম খুব এখন, একটু কাতর হয়ে পড়লে বিনাপয়সায় দেখেন, মুফতে অষুধপত্র দেন। গ্রামের দিকে বিশেষ নজর পড়েছে। বলেন, গ্রামের মানুষ শহরে এসে শাদা হবে, এ সমস্ত চলবে না। শহুরে মানুষই ছড়িয়ে পড়বে গ্রামের আলো-হাওয়ায়। গ্রামের সমাজে সর্ব-সাধারণের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে থাকা—এতে দেশের ভাল, নিজেরও ভাল।

এবং মুখের কথা মাত্র নয়। গ্রামে শহরে খুব টানা-পোড়েন চলছে তাঁর ইদানীং। কলকাতায় বরঞ্চ বেশি দুর্লভ হয়ে পড়ছেন। তাই যে ক'টা দিন থাকেন, রোগিরা ছেঁকে ধরে, তিলেক নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ দেয় না। রোগি দেখা শেষ করে অনেক রাত্রে অম্বুজাক্ষ বাড়ি ফিরে এলেন। অরুণ পারতপক্ষে বাপের মুখোমুখি হয় না। কিন্তু আজ ব্যাপার আলাদা। আজকের এই পরম আবিষ্কার প্রতিজনকে না জানিয়ে সোয়াস্তি পাচ্ছে না। বাইরের পোশাক ছেড়ে ফেলে গামছা পরে অম্বুজাক্ষ স্নান-ঘরে যাচ্ছেন, তারই মধ্যে অরুণ গিয়ে পড়ল। হাতে সেই অতিকায় 'ভারতে ইংরাজ'। বইয়ের ভিতর আঙুল ঢোকানো ছিল। সেই জায়গাটা খুলে বলল, পড়ে দেখুন বাবা—

অম্বুজাক্ষ এক নজর তাকিয়ে বইয়ের নাম দেখে নিয়েছেন। বললেন, তোর এগজামিনে লাগবে—তুই পড়বি। আমি কোন দুঃখে পড়তে যাবো রে, আমার কোন দায়?

কাশীশ্বরের কথা আছে—

অম্বুজাক্ষ নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন, কাশীশ্বর কবে মারা গেছেন—স্বর্গধামে সোয়াস্তিতে আছেন। তাঁকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন এতকাল পরে?

উত্তেজনার বশে অরুণাক্ষ খানিকটা পড়ে গেল। সেই মোক্ষম জায়গাটা—চাঁদপালঘাটে মৃতদেহ পড়ে আছে কাশীশ্বরের। ভাল মানুষ পাল্কি-বেহারা লোক-লস্কর নিয়ে নিমন্ত্রণে গেছেন—কে তাঁকে মারল, দেহটা কি ভাবে এখানে এসে পড়ল, তারই সবিস্তার আলোচনা। আলোচনা করছেন ঐতিহাসিক বিশ্বেশ্বর—তাঁর ধরণ-ধারণই আলাদা, এমন সাবধানী লেখক বাংলা দেশে আর দ্বিতীয় নেই। এক একটি কথা লিখছেন—তার আটঘাট-বাঁধা যুক্তি। এক লাইন লিখতে গিয়ে লাইন আষ্টেক তার ফুটনোট। সন্দেহের এতটুকু ফাঁক রাখেন না।

অম্বুজাক্ষ শুনতে শুনতে গম্ভীর হলেন। ঝুঁকে পড়ে জুতোর ফিতে খুলছিলেন, ফিতে ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই রইলেন তিনি। পড়া শেষ হয়ে গেলে বললেন, বইটা রেখে যাও। আরও খান পঁচিশেক কিনে এনো কাল—

অরুণ পুলকিত হল। তবু কিঞ্চিৎ আপত্তির ভাব দেখিয়ে মৃদুস্বরে বলে, দাম ভয়ানক। পঁচিশখানায় পড়বে তো দু-শ' টাকার মতো।

তোমার টাকায় কেনা হচ্ছে না, টাকার ভাবনাটা তোমার নয়।

অরুণ তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, এ কাজে উৎসাহ দেওয়াই উচিত। দামি বই বেশি লোকে তো কেনে না।

শনিবারে গাঁয়ে যাচ্ছি। রথের মেলা বসাবো এবার। আর তল্লাটে যত লাইব্রেরি আছে, একটা করে ঐ বই দিয়ে দেবো। কাশীশ্বরের কথা সকলের জানা উচিত।

কালই কিনে আনব বাবা—

অরুণ চলে যাচ্ছিল, অম্বুজাক্ষ ডাকলেন।

লেখক বিশ্বেশ্বর সরকার কোথায় থাকেন, ঠিকানা বের করতে পারো?

অরুণাক্ষ ইতস্তত কোরে বলে, তা বোধ হয় পারা যায়। সম্বর্ধনা-সভা হয়েছিল, সেই সময় কাগজে যেন ঠিকানা দেখেছিলাম। খুঁজলে পাওয়া যাবে।

বের করো খুঁজে। গিয়ে একবার আলাপ করে এসো।

পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করে অরুণাক্ষ বলে, ইতিহাসের ছাত্র—অমন এক দিকপালের কাছে যাতায়াত থাকলে পরীক্ষাতেও ভাল হবে।

সেজন্যে বলছিনে। একবার ওঁকে গাঁয়ে নিয়ে যেতে পারলে আরও কিছু হৈ-চৈ করা যায়। ইলেকসনের আর পুরো বছরও নেই। ইংরেজ যাদের উপর অত্যাচার করেছে, স্বাধীন-ভারতে তাদের পোয়া-বারো। ওঁকে নিয়ে মীটিং করে নীলকরদের কথাটতা বলে অঞ্চলের মধ্যে খাতির বাড়ানো। এই ঢাউশ বই পড়বার বিদ্যে ক'জনের আছে?

অরুণ বলে, বিদ্যে যত না হোক—ধৈর্যের বেশি দরকার। পরীক্ষার ভয়ে পড়তেই হয় আমাদের, আধ-মুখস্থ রাখতে হয়। বাইরের লোকের তো এ দায় নয়—তারা কষ্ট করতে যাবে কেন?

দোকান থেকে আবার ঠিক তেমনি ভাবে কিনে আনা যায়। কিন্তু বাবার হুকুমে ওবাড়ি যেতে হবে। এবং যাবে যখন কেনাবে ইরাবতীকে দিয়ে। মেয়েটা শত্রু ভেবে বসে আছে, ঠাট্টা-তামাসার কথাটাই মনে গেঁথে বসে থাকে। জানুক, কত বড় গুণগ্রাহী আমরা—

—সাত—

রাত যেন আজ ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে গরুর গাড়ির চালে চলেছে। সকাল আর হতে চায় না। ফর্সা হয়েছে দেখে অরুণ ধড়মড় করে শয্যায় উঠে বসল একবার। উঁহু, পাংশু চাঁদ এখনো আকাশে।

তারপর ভোর হল তো ভাবছে, এত সকালে যাওয়া ঠিক হবে না—বিশ্বেশ্বররা কি ভাববেন? বিশেষ ঐ খাণ্ডারনী মেয়েটা। ভাববে—পঁচিশ কপি বই কেনার খবরটা দেবার জন্য মুকিয়ে বসেছিল। যে রকম বদমেজাজী, হয় তো বা এই নিয়েই বেধে যাবে একখানা। বড়লোকপনা দেখাতে এসেছ—উঁ? দু-শ' টাকার বই কিনে কৃত-কৃতার্থ করেছ, সেইটে জানান দেওয়ার দরকার? যা একখানা মেজাজ—কিসে কি হবে কিছুই বলা যাচ্ছে না। স্ফুরিতাধর—মুখে বজ্রগর্জন, দু'টি চোখ অথচ জলে ভরে আছে। চোখের জল ওদের মধ্যেই থাকে, বিনা নোটিশে বেরিয়ে আসে যখন তখন। লেখাপড়া শিখেছে, বাইরে বেরিয়ে কাজকর্মও করা হয় নাকি, তবু তো শিশিরে-ভেজা জুঁইগাছটি—হাওয়া লেগেছে কি না লেগেছে, টপ-টপ করে জল ঝরে পড়বে। আচ্ছা, অত বড় মেয়ের বিয়ে দেবে না? ওর যে বর হবে, তার দুঃখে শিয়াল-কুকুর কাঁদবে। সারা জীবন নাকানি-চোকানি খেতে হবে যে ভদ্রলোকের!

চা-টা খেয়ে তবে বেরুনো যাক। ওদের বাড়ি চা গিলতে বসা হবে না। একদিনের সেই যে অভিজ্ঞতা—আবার তার উপরে! চা দিয়ে খাতির করবেও না অবিশ্যি। রোদ উঠে গেছে। মিহির ও বিনয় অরুণকে ডাকতে এলো। বিদেশি কয়েকজন ফুটবল-খেলোয়াড় কলকাতায়

এসেছে,' তাদের নিমন্ত্রণ করে আনছে আজ ক্লাবে। সমারোহ ব্যাপার।

যাবো তো ঠিক করেছিলাম ভাই। একশ' বার যাওয়া উচিত। কিন্তু বাবার বই কিনতে যাচ্ছি—বই নিয়ে বাবা সন্ধ্যাবেলা দেশে রওনা হয়ে পড়বেন। দুষ্প্রাপ্য বই, খুঁজে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়। এমনি বই হলে তো দশটার পর যে কোন দোকানে গিয়ে চাইলেই হত। ধাওয়া করতে হচ্ছে এখন লেখকের বাড়ি অবধি। সেখানে গিয়ে কি হবে, কে জানে! বাবা যদি শোনেন, বইয়ের ব্যবস্থা না করে ক্লাবে গিয়েছি, তবে রক্ষা থাকবে না। তোমরাই যাও ভাই—

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পরের মুখ চেয়ে থাকতে হলে এই রকমই ঘটে! তোমরাই যাও, আমার যাওয়া হয়ে উঠবে না।

বুক ফুলিয়ে তারপর অরুণাক্ষ চলেছে ঐতিহাসিক বিশ্বেশ্বরের বাড়ি। নাও পরীক্ষা ইরাবতী, ফুটনোটে কণ্টকিত 'ভারতে ইংরাজ' যত দুর্গমই হোক, আমার তথায় অবাধ বিচরণ। বংশ ধরে গৌরব দিয়ে বিশ্বেশ্বর আমাদের কিনে রাখলেন।

•

আজও মানুষ জানলার ধারে। ভিড় কমেনি এখনো, একজন। না, ইরাবতী অন্যায় কাজ করে না। চার পাতার চটি কাগজটাও এক ঢাউশ পূজা সংখ্যা বের করে পয়সা পিটবার তালে আছে। পাঠকে পড়ুক না পড়ুক একটা-দুটো ওজনদার লেখা চাই কাগজের কদর বাড়াবার জন্য। অতএব ছোট ঐ ভাল মানুষটার কাছে। লেখা নেবে তো একেবারে মুফতে, তার উপরে চোখ গরম করবে একবারের বেশি দু-বার আসতে হলে। ইরাবতী আছে বলে তবু যা হোক কিঞ্চিৎ ভয় রেখে চলে, নইলে ভদ্রলোককে সকলে মিলে পাগল করে ছাড়ত।

লোকটা শেষে দমাদম জানলায় ঘা দিতে লাগল। আস্পর্ধার একটা সীমা থাকা উচিত। 'ভারতে ইংরাজ'-এর লেখক বিশ্বেশ্বর আজকে কেবল ইরাবতীর নয়, অরুণাক্ষদেরও। ইরা কখন হুমকি দিয়ে পড়বে, ততক্ষণ ধরে এই অত্যাচার চোখে দেখা যায় না। মোড় ঘুরে তাড়াতাড়ি সে লোকটার কাছে চলে এলো।

কাকে চাই?

লোকটা মুখ ফিরিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে বলে, এ বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে কি মহারাজ রাজবল্লভের খোঁজ নিচ্ছি মশায়? ডেকে ডেকে খুন হয়ে গেলাম, সরকার মশায় আছেন কি নেই—হ্যাঁ—না একটা জবাব দেবে না।

অরুণাক্ষও তেমনি সুরে বলে, নেই—

লোকটা আগুন হয়ে উঠল। অবিকল সেই আর একদিনের ব্যাপার। বলে, কে বটেন আপনি? মেয়েটা তো মনে হচ্ছে বাড়ি নেই—তার জায়গায় আপনি এলেন মিথ্যে কথার উকিল হয়ে? সকালবেলা ঘরের মধ্যে থেকেও যদি বাড়ি না থাকেন, আমার তবে চলবে কি করে?

না চলে তো তুলে দিন। কে মাথার দিব্যি দিয়েছে, কি দরকায় কষ্ট করে চালাবার?

সেই বন্দোবস্ত হচ্ছে মশায়। তুলেই দেবো। রেণ্ট-কণ্ট্রোল হয়ে ভেবেছেন কলা দেখিয়ে লঙ্কা পার হবেন। চোদ্দ মাসের ভাড়া বাকি—যত নাকে কাঁদুন, তারা কানে নেবে না। তা আমার মনের কথাটা মুখ ফুটে বলে দিলেন আপনি মশায়। তুলেই দেবো, না তুলে উপায় নেই—

অরুণ বেকুব হয়ে তাড়াতাড়ি বলে, বাড়িওয়ালার আপত্তি? আমি ভেবেছিলাম কাগজের লোক, কাগজ তুলে দিতে বলছিলাম। অবস্থা তো দেখছেন—আধখানা ঘরের জন্য মানুষে মাথা কুটে মরছে, বাড়ি থেকে তুলে দিয়ে কি রাস্তায় ফেলে মারবেন ভদ্রপরিবারকে?

লোকটি খারাপ নয়। অরুণের কথায় নরম হয়ে বলে, এক বছরের উপর ভাড়া বাকি—আমার দিকটাও দেখবেন তো! নানান দুয়োর থেকে কুড়িয়েবাড়িয়ে আমায় সংসার করে খেতে হয়। নইলে, পুরানো ভাড়াটে এরা—লোক ভাল, বরাবর দিয়ে এসেছে। বলব কি, দোসরা তারিখে না এসেছি তো তেসরা বাড়ি বয়ে গিয়ে ভাড়া দিয়েছে। চাকরিবাকরি গিয়ে ভদ্রলোক এই বছর তিনেক গোলমালে পড়েছেন। জানি যে ভাড়াটে তুলতে পারলে ভাড়া সঙ্গে সঙ্গে ডবল। কিন্তু বিশেষ জানাশোনা হয়ে গেছে, সেটা আর করতে চাইনে মশায়—

অরুণাক্ষ বলল, ঠিকানা দিচ্ছি, সেখানে যাবেন কাল একবার দয়া করে।

বাড়িওয়ালা চোখ বড় বড় করে বলে, বলেন কি? আপনি দিয়ে দেবেন নাকি? মবলক টাকা—

তা দিলামই বা! ভবিষ্যতেও যাতে নিয়মিত পান, তার ব্যবস্থা হবে। মস্ত বড় লেখক—এই সব ছোটখাট ব্যাপারে মাথা দিতে গেলে সাধনার ব্যাঘাত হয়। এ বাড়িতে আর তাগিদপত্তোর করবেন না।

করে লাভ নেই, সে তো দেখাই যাচ্ছে। আপনি যদি দিয়ে দেন, কেনই বা করতে আসব বলুন। উঃ মশায়, আমার মাথা ঘুরছে—

অরুণ ব্যস্ত হয়ে উঠল, সে কি? কি হল হঠাৎ—

মাথার দোষ নেই। পাপ কলিযুগে এমন দাতাকর্ণ—চোখে দেখেও তো বিশ্বাস করা দায়।

জিভ কেটে অরুণাক্ষ বলে, ছি-ছি! দানের কথা উঠছে কিসে? আমাদের আত্মীয়স্বজন—

পুরানো ভাড়াটে—ওদের নাড়িনক্ষত্র সমস্ত জানা। ঝনাঝন এক কাঁড়ি টাকা ফেলবার মতন এত বড় আত্মীয় আছেন বলে তো জানি নে।

আমাদেরও ঠিক তাই। কাল অবধি জানতাম না যে এত বড় আত্মীয় আছেন এই কলকাতার শহরে।

তারপর একটু বিরক্ত ভাবে বলল, সে যাই হোক—আপনারই বা অত সাত-সতেরো খবরে কি দরকার? ভাড়ার টাকা পেয়ে গেলেই তো হল!

ইরাবতী বাড়ি নেই, মুখের উপর দড়াম করে কেউ দরজা দেবে না। ঢুকে পড়বার এই মহেন্দ্রক্ষণ। বাড়ি ফিরে ফণিনীর মতো ফোঁস-ফোঁস করবে—ইতিমধ্যে জমিয়ে বসে আছি মহৎ মানুষ বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে। নিঃশঙ্ক আশ্রয়। আশে-পাশে অকারণ ফণা দুলিয়ে বেড়াবে তুমি, ছোবল মারার ফাঁক পাবে না।

ডাকাডাকি করতে—সরমা রান্নাঘরে ছিলেন, খুট করে ছিটকিনি খুলে দিলেন। অল্প একটু দরজা খুলে আড়াল থেকে প্রশ্ন করলেন, কোত্থেকে আসছেন আপনি? কি দরকার?

অরুণাক্ষ মরীয়া। অমন ব্যবধান রেখে কথাবার্তা চলবে না। সোজা ঢুকে পড়ে সরমার পায়ে প্রণাম করল। বলে, সন্তান আমি মা। 'আপনি' বলছেন কেন—ইরাবতীকে তো আপনি বলেন না।

সুন্দরকান্তি এমন ছেলেটি প্রণাম করে ভক্তিভরে পায়ের ধূলো নিচ্ছে। সরমা গলে গেলেন। অরুণাক্ষ বলতে লাগল, ইতিহাসের ছাত্র আমি মা। অত বড় ঐতিহাসিকের পায়ের নিচে বসে দুটো কথা শুনব বলে এসেছি। 'ভারতে ইংরাজ' পঁচিশখানারও ভারি দরকার।

সরমা পথ দেখিয়ে দিলেন। দোতলার ঘরে আছেন তিনি। চলো—

সেই তপোবন। তুলট কাগজে লেখা জীর্ণ এক পুঁথি নিয়ে বিশ্বেশ্বর নিবিষ্ট হয়ে আছেন। ভ্রূ কুঞ্চিত, পুঁথির উপরের গোল গোল প্রাচীন লেখাগুলো ধরে এক বিচিত্র রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি যেন। দু-দুটো মানুষ চোখের উপর দিয়ে সঙ্কীর্ণ কুঠুরিতে ঢুকল, তিনি তা টের পেলেন না। কুঠুরিতে এলে অরুণের কেমন গা ছমছম করে। পুরানো কাল শহর কলকাতার জনতা ও সমারোহের কাছে তাড়া খেয়ে এইখানে যেন বাসা বেঁধেছে। আলু-থালু কাপড়-চোপড় আধ-পাকা দাড়ি ডাঁটি-ভাঙা নিকেলের চশমা—সমস্ত মিলে বিশ্বেশ্বরও যেন প্রাগৈতিহাসিক কালের মানুষ। অরুণাক্ষ সহসা কথা বলতে পারে না—এই ঘরের পুঁথিপত্র, তদ্গত ঐ ইতিহাসের মানুষটি—সকলের সঙ্গে শিলামূর্তির মতো সে-ও জমে গিয়েছে যেন।

সরমা অত শত ধার ধারেন না। তিনি শব্দসাড়া করে ডাকলেন, শুনছ? এদিকে দেখ একবার—

বিশ্বেশ্বর মুখ তুললেন। জবাব দিতে হয়, তাই যেন বললেন, অ্যাঁ?

এই ছেলে তোমার কাছে এসেছে।

অরুণাক্ষের দিকে চেয়ে বিশ্বেশ্বর বিরক্তভাবে বললেন, তা উপর অবধি ধাওয়া করেছেন কেন? বলে দিয়েছি তো মঙ্গলবারে দেবো।

অরুণ হেসে ঘাড় নেড়ে বলে, আজ্ঞে না, বলেননি তো!

কি বলেছি তবে? শুক্কুরবারে?

তা-ও নয়—

বিশ্বেশ্বর অতি বিব্রতভাবে বললেন, কোনবারে বলেছি তা হলে?

অরুণাক্ষ বলে, বারের দরকার? আমি কাগজের লোক নই।

কাগজের নন—আমার কাছে এসেছেন, কে আপনি তবে মশায়?

অরুণাক্ষ বলে, আপনার ভক্ত। সেই সভার দিন আপনার ঠিক সামনেই তো বসেছিলাম। দেখেন নি?

বিশ্বেশ্বর আমতা-আমতা করেন, হ্যাঁ—দেখেছি বই কি! সামনে বসেছিলেন যখন, ঠিকই দেখেছি।

ইরা কথা বলে ওঠে। কখন সে ইতিমধ্যে বাড়ি এসেছে, ঘরের মধ্যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলে, মস্ত বড়লোক এঁরা বাবা। গাড়িখানা দেখে এসো একবার। গলির সমস্তটা মুখ জুড়ে রয়েছে, মানুষজন ভাঙা নর্দামার উপর দিয়ে নোংরা জলকাদা মেখে চলাচল করছে।

অরুণ ব্যস্ত হয়ে বলে, কী অন্যায়! ড্রাইভার সরিয়ে রাখে নি? তাড়াতাড়ি সে উঠে দাঁড়াল, আমি বের করে দিয়ে আসছি।

ইরা হেসে বলে, বড়লোকের ড্রাইভার—সকলকে তুড়ে দিচ্ছিল। তা আমি হলাম ডাকসাইটে ঝগড়াটে—পেরে উঠবে আমার সঙ্গে? আমার হুঙ্কার শুনে তার পরে প্রভু সদয় হলেন। আপনার যেতে হবে না, নিজেই সে সরিয়ে নিচ্ছে।

অরুণ বলে, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। এর পরে আর যখন আসব, গাড়ি আনব না। পায়ে হেঁটে আসব।

সরমা বলে ওঠেন, কি জন্যে বাবা? ও মেয়ে কট-কট করে অমনি বলে। ওকে নিয়ে পারবার জো নেই।

ঠিক কথাই তো মা। আমি ইতিহাসের ছাত্র—এ বাড়ি এই ঘর তীর্থভূমি আমার কাছে। পায়ে হেঁটে কষ্ট করে তীর্থে আসতে হয়, নইলে তীর্থফল পুরোপুরি মেলে না।

বলেই খেয়াল হল, ইরাবতী এসে গেছে—বাঁকাহাসি ফুটল বোধহয় তার মুখে। ভয়ে ভয়ে আড়চোখে একটু দেখে নেয়। না শ্রীমতীর মেজাজ মোটামুটি ভালই, কটুবাক্য-গুলো কানেই যায় নি যেন। এবং যেখানে যাওয়ার দরকার, সেখানে ঠিক পৌঁছে গেছে। বিশ্বেশ্বর আহ্লাদে শতখান হয়ে এতক্ষণে পরিচয় নিচ্ছেন, তুমি কে বাবা?

ইরা মাথা বাড়িয়ে বলে, এঁর বাবা মস্ত বড় ডাক্তার—অম্বুজনাথ রায়। সেই যে কর্পোরেশন-ইলেকসনে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন। 'যুগচক্র' তাঁর হয়ে গোড়ায় খুব হৈ-চৈ করেছিল। তাঁকে ছেড়ে শেষটা ভূতনাথ গুঁইকে ধরল।

বাপের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল। এত কথার পরেও বিশ্বেশ্বর কিছুমাত্র আলো পেয়েছেন, এমন মনে হয় না। বলে, বাবা, কাকাবাবু যে রাগ করেন সে-কিছু অন্যায় নয়। 'যুগচক্র' কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়েও দেখ না। তা-ই বা কেন, দশ-বিশ বছরের মধ্যে যা ঘটছে, কোনটারই বা খবর রাখ তুমি? তোমার নজর শুধু ইতিহাসের এলাকায়—

অরুণাক্ষ বলে, বেশ তো, হালফিলের আজেবাজে কথা না বলে সেই ইতিহাসের পরিচয় হোক তবে। আমার প্রপিতামহ হলেন কাশীশ্বর রায়—

চকিত দৃষ্টি মেলে বিশ্বেশ্বর বলেন, কোন কাশীশ্বর?

কাশীশ্বর রায়—সেই যাঁর মাথা ফাটিয়ে গঙ্গার ঘাটে ফেলে দিয়েছিল। ইতিহাসেও তিনি মরে গিয়েছিলেন, আপনি নতুন প্রাণ দিলেন। নতুন কথা বললেন তাঁর সম্বন্ধে।

বিশ্বেশ্বর চটে উঠলেন, নতুন কথা মানে বুঝি মিথ্যে কথা? যত সব মূর্খস্য মূর্খ! কিছু পড়বে না, খোঁজ-খবর নেবে না। রামনিধি আর কাশীশ্বরের দেহই দুটো, তা ছাড়া সর্বরকমে এক—এ-ও আজকে নতুন কথা তোমাদের কাছে!

তারই একটা গল্প শুরু হয়ে গেল। রামনিধির নামে হুলিয়া। ত্রিভুবন ঢুঁড়েও ধরতে পারছে না। ধরবে কি করে? কাশীশ্বর রয়েছেন—পক্ষীমাতা যেমন শাবক আগলে থাকে, তিনি আছেন তেমনি রামনিধিকে ঘিরে। নিয়ে তুলেছেন একেবারে কলকাতায় তাঁর হাটখোলার বাড়িতে।

ইরাবতী বলে, সাহেবদের ঘাঁটি কলকাতা। তাদের অত বড় শত্রুকে ঐখানে নিয়ে তুললেন?

বিশ্বেশ্বর হাসতে হাসতে বললেন, সেই তো সব চেয়ে ভাল—বুঝতে পারলি নে? পাকা বুদ্ধি ধরেন কাশীশ্বর। নয় তো পথের ফকির থেকে অত ঐশ্বর্য করতে পারতেন? সাহেবরা সারা দেশ পাতি পাতি করবে, খুঁজবে না কেবল কলকাতা। আর কাশীশ্বরকে জানত নিজেদের লোক

বলে, তাঁর বাড়ি তো নয়ই। ওদের চোখে ধুলো দিয়ে কাশীশ্বর বরাবর বুদ্ধি আর টাকা জুগিয়ে গেছেন। শেষটা অবশ্যি জানাজানি হয়ে পড়ল, মাথা ফাটিয়ে মেরে ফেলে তখন শোধ নিল। হ্যাঁ বাবা, হাটখোলার সেই বাড়িতে আছ তো তোমরা ?

অরুণাক্ষ বলে, আজ্ঞে না। আপনার বই পড়বার পর বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কাশীশ্বরের আমলেই সে বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়, এখন তার চিহ্নও নেই—ভেঙে চৌরস করে নতুন রাস্তা হয়েছে তার উপর দিয়ে।

তারপর বলল, সে বাড়ি না থাক—কাশীশ্বরের দেশের বাড়ি রয়েছে—সেইখানে যেতে হবে আপনাকে। যেতেই হবে। বাবা বলে দিয়েছেন।

আমি ? সে হয় না, কোথাও আমি যাই নে। বুড়ো হয়েছি, ক-দিন আর বাঁচব! তার মধ্যে অনেক কাজ বাবা—কাজের অন্ত নেই। ঐ কাশীশ্বর একলা নন, আরও কত জনে চাপা পড়ে আছেন। মিথ্যের কবর দিয়ে রেখেছে। অপচয় করবার সময় আছে কি বাবা ?

তখন লোভ দেখিয়ে বলে, কাশীশ্বরের ছবি রয়েছে আমাদের বাড়ি। আরও একখানা আছে—হয় তো বা রামনিধির। গিয়ে দেখতে পাবেন !

বিশ্বেশ্বর উদাসীনভাবে বললেন, ছবিতে দেখবার কি আছে ? দুটো হাত, দুটো পা, একটা মাথা—সে তো সব মানুষেরই। বলি, কাগজপত্র আছে ? কিছু—পুরাণো চিঠি-চাপাটি ? আকাট-মুখ্যুরা কাগজ-পত্র উই-ইঁদুরে খাইয়ে যত্ন করে শুধু ছবি রেখে দেয়।

অরুণ তাড়াতাড়ি বলে, কাগজ আছে বই কি ! অঢেল—তিনটে কাঠের সিন্দুক বোঝাই।

সরমা চলে গিয়েছিলেন, আবার ফিরে এলেন। বিশ্বেশ্বর উচ্ছ্বসিতভাবে বললেন, এই ছেলেটি কে জানো ? আমাদের বড্ড আপনার লোক।

সরমা স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, তা জানি—

কি করে জানলে তুমি ? কাশীশ্বর রায়ের বংশের ছেলে—

অদ্দূর হাতড়াতে যাবো কেন ? ছেলে আমাদের। কি মিষ্টি ওর মুখের 'মা' বুলি !

অরুণের দিকে চেয়ে বললেন, মিষ্টি মুখ করে যেও বাবা। সেদিন ঐ কাণ্ড হল, শুধু-মুখে তোমরা চলে গেলে।

ইরাকে দেখিয়ে অরুণাক্ষ বলে, শুধু-মুখে যাবো কেন মা ? জিজ্ঞাসা করুন ওঁকে, বিস্তর খাইয়েছিলেন। তার পরেও আর একদিন। দেখা হলেই খাইয়ে যাবেন।

হো-হো করে হেসে উঠল। বলে, ভরপেট গালি খাওয়ান। খাওয়াতে ওঁর জুড়ি নেই।

সবাই হাসছেন। ইরাবতীও। সরমা বললেন, হিংসে—বুঝতে পারলে না ? একেশ্বর হয়ে জুড়ে আছে—পাছে ভাগ বসায়, কাউকে তাই ধারে কাছে ঘেঁসতে দেয় না।

সহজভাবে সরমা বললেন। ইরা হাসছিল, সে গম্ভীর হয়ে গেল। তখন খেয়াল হল, কথাটার অন্য রকম মানেও তো দাঁড়াতে পারে। অরুণ কি ভাবে নিল, কে জানে ? কী লজ্জা—ছি-ছি ! বুড়ো বয়স হল, দুটো কথা গুছিয়ে বলতে পারেন না আজও ! (ক্রমশ)

সমুদ্র মন্থন

অশ্বিনীকুমার পাল এম-এ

নয়নের তীরে হেরি সমুদ্র মন্থন,
হেরি সেথা নৃত্যে রত তোমার চরণ।
চরণের তালে তালে নাচে বিশ্ব তল,
প্রলয়ের বেগে কাঁপে সমুদ্রের জল।

মহা স্রোতে ভাসি আমি আদি-অন্ত-হীন,
অসীম তোমার মাঝে হইগো বিলীন।
হারাইয়া যাই আমি তব রাজ পুরে,
সারা বুক জেগে উঠে এক মহা সুরে।

চির-যুবা—চিরজীবী

বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায়

চির-যুবা সেই,—যার শরীরের স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহটি ভেতর হ'তে বাইরে একই সুরে শৃঙ্খলার সঙ্গে ব্যাহত-থাকে। ব্যায়ামই বলুন, আর চিকিৎসাই বলুন, যে ক্রিয়ার দ্বারা ঐ প্রবাহটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা যায়, সেইটিই হ'ল ব্যায়াম শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য।
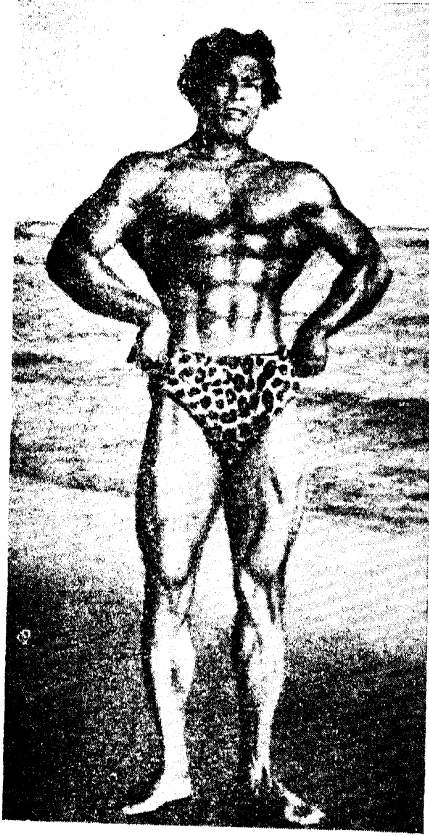
বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায়

মানুষের শরীরে নানা রোগ অল্প-বিস্তর থাকবেই—এটা চিরন্তন নীতি। যদি শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ অনুযায়ী ব্যায়াম-নির্দেশ দেওয়া যায় এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাদানে সক্ষম হওয়া যায় তবেই দেহ-মনের গ্লানিরূপী রোগভোগের অবসানের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। কেন না মনের সঙ্গে বাহ্য-যন্ত্রাদির মিতালী এবং রোগের ক্রিয়ান্তরের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন, সুতরাং বিবর্ত্তনের মাঝে মনের পৌরুষ প্রকাশ না পেলে চিরজীবী হওয়া যায় না।

যুগধর্ম্মের প্রকৃত সম্বার বিকাশ হয় জীবনীশক্তির মাধ্যমে। শাস্ত্র-দৃষ্টির দ্বারা বিচার করলে মানুষ পূর্ব্বাপূর্ব্ব জীবন হ'তে যাবতীয় কর্ম্মসঞ্জাত প্রবৃত্তি বা সংস্কারের বীজ নিয়ে জন্ম নেয়। আর ঐ বীজে বিকাশমুখী একটি পরম শক্তি নিহিত থাকে যা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সাহায্যে প্রস্ফুটিত হয় এবং সেই শক্তি-বিকাশকল্পে যে জড়-বাহিকার প্রয়োজন হয়, তারই সহযোগিতায় আমাদের শরীরের স্নায়ুপথে ঐ শক্তি সক্রিয়তা লাভ করে (vital current)—সেই শক্তির প্রবাহ বহির্মুখী। মানব দেহের দৈনন্দিন ক্ষয়পূরণের জন্য ঐ vital current বা জীবন স্রোত সর্ব্বদাই বহির্মুখে সংগঠিত হ'চ্ছে। এই স্রোতগতিকে অত্যধিক গতিশীল করার নিমিত্তই প্রকৃতির অনুশাসন মেনে চলতে হয়—সাত্বিক সাধনা এবং শারীরিক ও মানসিক ব্যায়াম-চর্চ্চার মাধ্যমে। তবেই রোগ শোক, জড়ের অভিশাপকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করা যাবে। ক্ষমতা আয়ত্ত করবার জন্য জীবনীশক্তির দরকার। যদি সেই জীবনীশক্তি শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চিত না থাকে, রোগ-শোকের সাথে লড়াই করবেন কেমন করে? অথচ-লড়াই না করলে জীবনী-শক্তিরূপী জীবনের শক্তি বর্দ্ধন হয় না। শরীরের প্রতি—যে কোন জাতীয় সতর্কতা অবলম্বনই হ'ল রোগের বিরুদ্ধে লড়াই, আর এর বিশৃঙ্খলায়ই আসে দেহে রোগ বা রোগের গ্লানি। সুতরাং বিশৃঙ্খলাকে দমন করেই দেহ, জীবনী-শক্তি লাভ করে আর তাই হ'ল প্রকৃতির অনুশাসন মেনে চলার পুরস্কার; কাজেই শক্তিকে যেন আমরা অধ্যাত্মশক্তি হ'তে পৃথকভাবে না দেখি—কারণ, এই শক্তি বাক্যমনের অতীত—"অবাংমনসোগোচরম্" সে "শান্তং, শিবং, অদ্বৈতং।"

শক্তির মহিমাই জীব-জনম—স্থাবর, জংগম, সৃষ্টি। সে প্রাণের মাঝে বাস করে—তাকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখবার যে ব্যাকুলতা, তার নাগাল পাবার যে আকুলতা, সেই হ'ল দেহ-মনের সাধনা। আর তখনই দেহ-মনের পূজারী "জীবনং সর্ব্বভূতেষু" রূপের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারেন।

চির যুবার জীবনীশক্তি অহমোস্মি রূপে দেহাভ্যন্তরে স্থিতিলাভ করে। স্বাভাবিক ক্রিয়াই তার স্বরূপ। তাই কোন যন্ত্রের অস্বাভাবিক অনুভূতি, অপ্রকৃতিস্থ শরীরের লক্ষণ।

যেমন ধরুন, আপনার মাথা ধরেছে; কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই আপনার জীবনীশক্তি স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে বাধা পাচ্ছিল এবং

আরও একটি বিরোধ-শক্তি ঐ জীবনী-শক্তির সঙ্গে কাজ করে মাথার যন্ত্রণা অস্বাভাবিকভাবে বর্দ্ধন করিয়েছিল।

স্বাভাবিক লোক কিন্তু এক্ষেত্রে কোন রকম রাসায়নিক ওষুধ দ্বারা প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটাই কি ন্যায্য প্রতিকার? না—।

শরীরে-মেদ (obersity) বৃদ্ধি হ'ল, কি করবেন? নিশ্চয়ই নির্জলা উপবাসের ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। কিন্তু এই অস্বাভাবিক উপবাসের ভয়াবহ পরিণতি আপনার জ্ঞান গোচর থাকলে কিছুতেই ঐরূপ উপবাসের আশ্রয় নিতেন না। উপবাস প্রথাটা অবশ্য ভাল কিন্তু তারও একটা সুনির্দ্দেশ আছে—। অনেকে এই সুনির্দ্দেশ জ্ঞান-রহিত, তাই এ উপবাসের উপযুক্ত ফল-লাভ হয় না।

রাসায়নিক পদার্থ, শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীর জীবনী-শক্তি অপেক্ষাকৃত ক্ষয় করে। ঐ ক্ষয়-ক্ষতি প্রাণযুক্ত খাদ্যের পুষ্টির দ্বারা পূরণ করতে হয়, সেকথা আমাদের অনভিজ্ঞ বুদ্ধি অনেক সময় বিশ্বাস করতে চায় না। জীবনীশক্তিই বলুন আর ধন-দৌলতই বলুন, আপনার যতটুকু সঞ্চিত আছে তার অপব্যয় করাই কি সঞ্চয়ের মাহাত্ম্য? না, তা নয়। সঞ্চিত শক্তির দ্বারা দেহের বহিঃ বা অন্তর্মুখী দুষ্ট বীজকে ধ্বংস করাই হ'ল সঞ্চয়-মাহাত্ম্য।

দেহাভ্যন্তরে, শক্তির আঁধারে ভগবান কতরকম যন্ত্র-সৃষ্টি করে রেখেছেন তার প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—একথা কেউ নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবেন না। মাথা ধরেছে কেন? নিশ্চয়ই গোলযোগ। দেহাভ্যন্তরের 'থাইরয়েড' গ্রন্থির অন্তঃরসের চাহিদার অভাব হলেই সাধারণতঃ আধ-কপালে মাথা ধরে—এইরূপ যদি আপনার হয় ত, ঐ থাইরয়েডের উপযুক্ত ব্যায়াম নির্দ্দেশ নিন, নিয়ে সুস্থিরভাবে চর্চ্চা করুন। দেখুন তার স্বাভাবিক রসক্ষরণের দ্বারা আপনার আধ-কপালে মাথাধরা নিরাময় হয় কি না? কিন্তু ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যের অভাব হেতু, আশু আরোগ্যলাভের জন্য আমরা ঐ থাইরয়েডকে রাসায়নিক ক্রিয়ার স্বাভাবিক অবস্থায় আনাবার জন্য ডোক্তারী ওষুধে আশ্রিত হয়ে পড়ি। থাইরয়েড গ্রন্থির রস দহনক্রিয়া বৃদ্ধি করে এবং দেহাভ্যন্তরের নানাবিধ অপরিষ্কার দূষিত পদার্থগুলিকে ঐ ক্রিয়ার দ্বারা নষ্ট করে দেয়—কিন্তু তা পারে না যদি দহনক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মে চলতে না পারে। সুতরাং রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাময়িক তৎপরতার পরিবর্ত্তে ব্যায়ামচর্চ্চার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা শ্রেয়ঃ।

তেমনি মেদবৃদ্ধি। মেদ যখন দেহে জমতে সুরু করছে তখন বুঝতে হ'বে যে দহনক্রিয়া (Oxidation) ঠিকমত হ'চ্ছে না এবং সেই কারণেই তেল, ঘি, চর্ব্বি এবং শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যাদি চর্ব্বির আকারে দেহমধ্যে এসে স্থূলতা বৃদ্ধি করাচ্ছে। এক্ষেত্রেও থাইরয়েডের অন্তঃরসের প্রাপ্ত চাহিদায় এই চর্ব্বি দহনে সাহায্য করে। তা বলে মোটা লোক মাত্রেই যে ঐ গ্রন্থির অন্তঃরসক্ষরণ হেতু মোটা হয়ে পড়েন, এমন কোন কথা নেই। এই অভাব ছাড়াও অপরাপর কারণে মোটা হ'তে পারেন।

ব্যায়াম-চর্চ্চার মাধ্যমে গ্রন্থিসকলের অস্বাভাবিক রূপ বিশৃঙ্খলাকে চির-বিমুক্ত করতে পারলে দেহের স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

তাই বলছি, নানাপ্রকার ব্যাধির উপসর্গকে ব্যাধিরূপে গণ্য করে আমরা মনের ব্যাধির অবতারণা করে থাকি। ডাক্তারী ওষুধ প্রয়োজন-বোধ কখন করা উচিত? যখন বুঝা যাবে প্রতিরোধমূলক জীবনীশক্তি দেহ হ'তে রোহিত হ'য়ে বিরোধ শক্তিকে বাধা দেওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে, তখন। আর চিকিৎসক তাই তখন রোগের চিকিৎসা না করে

করেন জীবনীশক্তির চিকিৎসা। জীবনীশক্তির সাহায্য ব্যতীত খালি ওষুধে রোগের নিষ্পত্তি সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। তখন ঐ ক্ষুদ্র জীবনী-শক্তির দেহাভ্যন্তরে ছোটখাট লড়াই করে আপনাকে বৃহৎ শক্তিতে ফিরে যায়। সুতরাং চিকিৎসায় যেমন রোগ-লক্ষণ বিচারের প্রয়োজন বা এই বিচারেরই ভুলে জীবন হানির সম্ভাবনা থাকে;—তেমনি ব্যায়াম নির্ব্বাচনের বেলায়ও যদি ব্যায়ামগুরু, ব্যায়ামাচারীর ব্যায়াম বিচারে ভুল নির্ব্বাচন করেন, তাতে বিষময় ফল দেখা দিতে পারে। নির্ব্বাচনে

পরিপূর্ণ দিব্যজ্ঞান থাকা চাই ; তাই সংসারের আবর্ত্তের প্রতি পদক্ষেপে হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন।

অসুস্থবোধ করেন কারা—যাদের দেহযন্ত্রের ছন্দ-পতন ঘটেছে। ঐ ছন্দ-ভঙ্গই দেহ-মনের রোগ বা রোগের ইন্ধন। কেন না মানুষ ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন চৈতন্যমান জীব, চলমান যন্ত্রের ন্যায় অচেতন নয়।

একটা চলমান ইঞ্জিন, বিকল হতে পারে,—তা বলে কি তার রোগ হয়েছে বলাটা ভাষাগত শুদ্ধ হ'বে? ওটা যে জড়পদার্থ—তাই মানুষের মত তার অনুভূতি নেই। মানুষ চেতনা, ধৃতি, সংহতি, এসবের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে, জড়বিজ্ঞানের কি তা থাকে? থাকে না—ইঞ্জিনের স্থূলদেহের কর্ত্তা নেই—মানব দেহে তা আছে—আর সেই কর্ত্তাই হ'ল স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন চৈতন্যময় জীব। এই চৈতন্যময় জীবনের তবে কেন ছন্দ ভঙ্গ হয়? উপরোক্ত জীবনীশক্তি—যার সাহায্যে শরীরের শৃঙ্খলা ও ছন্দ রক্ষিত হয় এবং তা যদি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সম্পন্ন হয় তবেই বিকৃত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না—অন্যথায় দেহ-মনের অসচ্ছল ভাবের উদয় হ'য়ে ন্যায্য প্রাপ্য, স্বাভাবিক আনন্দ উৎসাহ, উদ্দীপনা, স্ফূর্ত্তি, তিরোহিত হয়ে যৌবন-শিয়রে নেমে আসে জীবনসন্ধ্যা। জীবনী-শক্তির বিকৃতি ঘটে শক্তির স্তরে ; তাই জীবনীশক্তির গোলযোগ দূর করে বৈজ্ঞানিক প্রথায় তাকে অধিকতর শক্তিমণ্ডিত করে তুলতে পারলেই দেহাভ্যন্তরের দুষ্ট লক্ষণ, ভেতর থেকে বাইরে প্রকাশ পাবে, এবং সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রথায় আরোগ্য হয়ে জীব, যৌবনের সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন। কিন্তু অজ্ঞতার আঁধারে বসে শাস্ত্র পাঠ করলে কি হ'বে? যুবা যৌবন হারায় কেন? জীবনসংশয় করে তোলে কেন? আজ তার জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নেই। জ্বলন্ত লোহা হাতে লাগালে ফোস্কা পড়বে. পড়বে না যদি সরিয়ে রাখা যায়। আচ্ছা, যদি জ্বলন্ত বস্তুটি একবার দগ্ধ করে দেয় তারপর যদি ঐ বস্তুটিকে জলে ডুবিয়ে দেন বা সরিয়ে রাখেন, আপনার দগ্ধ যাতনা বা দগ্ধ ক্ষত কি বিদূরিত হবে? নিবৃত্তি হবে? হবে না—হ'তে পারে না। প্রকৃতির গড়া নীতির পালন ও ভাঙনের মাঝে এই রহস্য সদাই প্রকট থাকবে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—

ভারতের অন্যতম প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় গত ২৪শে সেপ্টেম্বর ৮০ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। তদুপলক্ষে ঐ দিন তাঁহাকে দেশবাসীর পক্ষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে এক জনসভায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ঐ উৎসবে তাঁহার সতীর্থ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং কলিকাতা সহরের প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ সম্বর্দ্ধনা সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং সেদিনের সভায় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীকালিদাস নাগ, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি হেমেন্দ্রবাবুর গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বহু ব্যক্তি ও বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সেদিন হেমেন্দ্রবাবুকে নানা উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। সকাল হইতেই হেমেন্দ্রবাবুর বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তি তাঁহার গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে মাল্য, সন্দেশ ও নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রবাবু প্রায় ৬০ বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় সাংবাদিকের কাজ করিতেছেন এবং তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান, স্মৃতিশক্তি ও লিখন-শক্তি তাঁহাকে সর্বজনপ্রিয় করিয়া রাখিয়াছে।
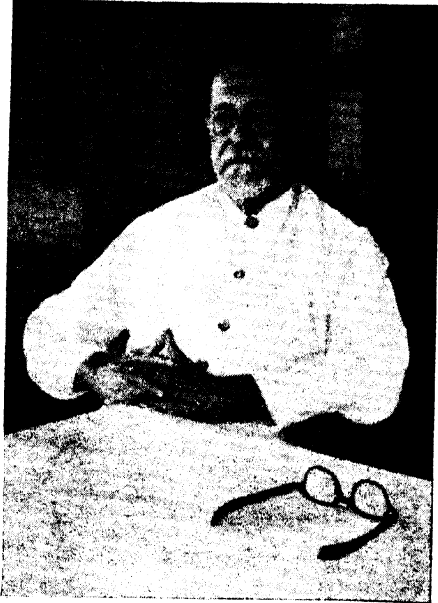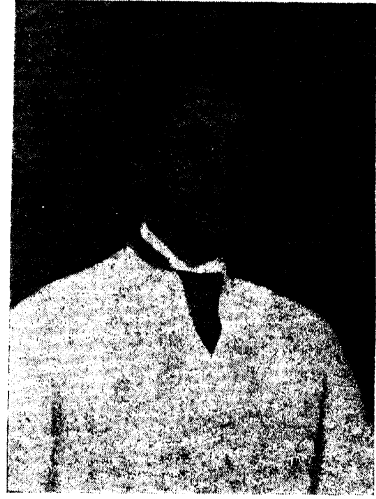
ছাত্রাবস্থায় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

এ যুগে তাঁহার মত বক্তাও অতি বিরল। দেশবাসী সকলের সহিত একযোগে আমরাও প্রার্থনা করি, তিনি শতায়ু হইয়া দেশ ও দশের সেবা দ্বারা জাতিকে সমৃদ্ধ করুন।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় হাওড়ার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে হাওড়া সালকিয়া গোবর্দ্ধন সাহিত্য ও সঙ্গীত সমাজে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। সেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে হেমেন্দ্রবাবুকে

হু প্রকার উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। ১লা অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যায় পানিহাটী বেঙ্গল কেমিকেলের কারখানাতেও হেমেন্দ্রবাবুকে তাঁহার ৮০তম জন্ম-দিবস উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে।

হেমেন্দ্রবাবুর সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে খ্যাতনামা কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক যে কবিতা প্রেরণ করেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের
সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে

দেশবরণ্যে

এখনো কিশোর, বয়স তোমার
পাজিতে বলুক আশী,
তাজা-গোলাপের মত বুক তব,
হয়নি হবে না বাসি।
সব ডাকে আগে তুমি দাও সাড়া,
বজায় রেখেছ সে প্রাচীন ধারা,
ভালবাসি তাই, তোমারে দেখিতে
শিশু সম ছুটে আসি।

(২)

গৌরবময় যুগের গরিমা—
তোমারে ঘিরিয়া আছে,
ধন্য আমরা, হে শান্ত সুধী
তোমারে পেয়েছি কাছে
তোমাকে আমরা গুরু বলে জানি,
তোমাকে আমরা গুরু বলে মানি,
গোটা এ বঙ্গ নিত্য তোমার
দীর্ঘ জীবন যাচে।

(৩)

তোমার গুণের নিরিখ দিবার,
নহি আমি অধিকারী,
তোমার স্নেহ যে কত সুগভীর
তাহাই বলিতে পারি।
বন কুসুমের পাঠাই এ হার,
পাঠাই ভক্তি প্রণতি আমার,
জয়ধ্বনির সঙ্গে পাঠাই
পুলক নেত্র বারি।

বাঙ্গালী মহিলার উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা—

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী বীণা চৌধুরী ৭ই অক্টোবর বোম্বাই হইতে 'পি এণ্ড ও' কোম্পানীর 'ক্যান্টন' জাহাজ যোগে কোপেনহেগেনের পথে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন। শিশু-পালন ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ডেনমার্কের অন্তর্গত

শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

স্কড্‌স্‌বার্গ জেকব মাইকেলসেন্‌স্‌ মিন্‌ডে' শিশু পালন প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। ডেনমার্কের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এ, স্পারে পেটারসেন তাঁহাকে এই বৃত্তির জন্য মনোনীত করিয়াছেন। শ্রীমতী বীণা কবি রবীন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী জগদানন্দ রায়ের দৌহিত্রী এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কর্ম্মী শ্রীকান্তিলাল চৌধুরীর পত্নী।

সাহিত্য তীর্থে শরৎ জন্ম বার্ষিকী—

সাহিত্য তীর্থের শরৎ ঋতুকালীন অধিবেশন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৩১শে

ভাদ্র ও ১লা আশ্বিন দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠান 'মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতিমন্দির ৬৬।১, পাথুরিয়াঘাট ষ্ট্রীটে অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্যসেবী শ্রীগোপালচন্দ্র রায় শরৎচন্দ্রের হাস্যপরিহাস-প্রিয়তার কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দ দান করেন। শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন সাংবাদিক শ্রীযতীন্দ্র সেন, শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ। কবি শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দ্বিতীয় দিনের সাহিত্য-সভা 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্যিক শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ও শ্রীগজেন্দ্র মিত্র বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় বহু তরুণ লেখকলেখিকারা স্বরচিত গল্প কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি পাঠ করেন।

নৃত্য-গীত-নাটক সংস্থা—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে গঠিত নৃত্য-গীত-নাটক সংস্থা কলিকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে রবীন্দ্র-ভারতী ভবনে কাজ আরম্ভ করিয়াছে। বর্তমানে রবীন্দ্র-ভারতীর যে ত্রিতল বাড়ী পাওয়া গিয়াছে, তাহা ছাত্রাবাসরূপে ব্যবহৃত হইবে। ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনটি শাখার শিক্ষাদান কক্ষ ও সরঞ্জামাদি রাখার গৃহ নির্মিত হইবে। বাৎসরিক পরিচালন ব্যয় এক লক্ষ টাকা সরকার প্রদান করিবেন। প্রতি বিভাগে আপাততঃ ২০জন করিয়া ছাত্র গ্রহণ করা হইবে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে সভাপতি, ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীনির্মল-কুমার সিদ্ধান্তকে সহ-সভাপতি এবং শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দকে সদস্য করিয়া সংস্থার একটি পরিচালক সমিতি গঠিত হইয়াছে—তিন বিভাগের প্রধান হইয়াছেন—(১) শ্রীউদয়শঙ্কর, নৃত্য (২) শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, নাটক ও (৩) শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত। আমরা এই নূতন সংস্থার সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

মাছ, দুধ, ডিম প্রভৃতি আমদানী-

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে যে পাক

ভারত বাণিজ্য চুক্তি বলবৎ হইয়াছে, তাহার ফলে উভয় দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। মাছ, হাঁস-মুরগী, ডিম, দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, টাটকা ফল, শাকসব্জি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আমদানী করা সম্ভব হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে লোকসংখ্যা কম ও জমীর পরিমাণ বেশী—অপর পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা বেশী ও জমির পরিমাণ কম। কাজেই ঐ সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গে আমদানী করা হইলে এখানে খাদ্যাভাব কতকটা দূরীভূত হইতে পারে। পূর্ববঙ্গে বর্তমানে ক্রেতার অভাবে ঐ সকল জিনিষের দাম খুবই কম—কাজেই সেখানকার উৎপাদনকারীরাও অধিক মূল্য পাইয়া লাভবান হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ—

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষদ গত বৎসর বাতিল হওয়ার পর হইতে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস উহার পরিচালকের কাজ করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি কেন্দ্রীয় আইন কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইয়া দিল্লী গিয়াছেন—তাঁহার স্থানে অধ্যাপক ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পর্ষদের নূতন পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র—বহু বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক ছিলেন—তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর—১৯৫২ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। নিজে শিক্ষাব্রতী ও বাঙ্গলার শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত তাঁহার সম্যক পরিচয় বর্তমান।

জনসংযোগ উপদেষ্টা—

স্বর্গত নেতা শরৎচন্দ্র বসুর দ্বিতীয় পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীমান অমিয়নাথ বসু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনসংযোগ বিভাগের অবৈতনিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। পশ্চিমবঙ্গে প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ দেশবাসীর মধ্যে প্রকৃত কল্যাণজনক কোন কার্য্য করিতে পারেন নাই। শ্রীমান অমিয়নাথের কর্মনৈপুণ্যের দ্বারা এই বিভাগ হইতে জনকল্যাণ সাধিত হইলে দেশবাসী উপকৃত হইবে।

পরলোকগত মৃদঙ্গবাদক রাধাকৃষ্ণ দাস—

মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক রাধাকৃষ্ণদাস নব্বই বৎসর বয়সে সম্প্রতি পরলোকগমন করেন। তাঁহার জন্মস্থান দোপুকুরিয়াবাজার গ্রামে। প্রথম যৌবনে তিনি গীত-বাদ্য-বিশারদ কীর্ত্তনীয়া শচীনন্দন দাসের নিকট বাজনা শিক্ষা করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই গুরুর নিকটে

মৃদঙ্গবাদক রাধাকৃষ্ণ দাস

ডাহিনের বাদকের আসন লাভে সমর্থ হন। প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি শচীনন্দনের দলে শিরবায়েন ছিলেন। পরে রসিকদাস, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশদাস প্রভৃতি বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়াদের দলে খোল বাজাইয়া সারাদেশে খ্যাতিমান হন। রাধাকৃষ্ণদাস শুধু মৃদঙ্গবাদকই ছিলেন না তিনি কীর্ত্তন গানও জানিতেন। তিনি প্রেমিক ও ভাবুক সদাচারী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া নন্দকিশোরদাস কীর্ত্তনরসসাগর। শ্রীনন্দকিশোরের দলের শিরবায়েন ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল মৃদঙ্গবিশারদ রাধাকৃষ্ণ দাসের ছাত্র।

পরলোকে গিরীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—

বর্দ্ধমানের বিশিষ্ট নাগরিক ও আইন ব্যবসায়ী গিরীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ৭০ বৎসর বয়সে বর্দ্ধমানে পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রথম জীবনে তিনি অধ্যাপক ছিলেন, তাহার পর উকীল হন। তিনি ২৬ বৎসর বর্দ্ধমান মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ছিলেন ও কংগ্রেস গঠিত মিউনিসিপাল বোর্ডে প্রথম চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবেও তাঁহার সুনাম ছিল।

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ রায়—

খ্যাতিমান সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ রায় সম্প্রতি কাশীধামে ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ত্রিপুরা জেলার ইব্রাহিমপুরের অধিবাসী ছিলেন এবং গ্রাম-সেবার সহিত সাহিত্য সাধনা করিতেন। তাঁহার কুললক্ষ্মী, সাবিত্রী সত্যবান, পতিতা প্রভৃতি গ্রন্থ এক সময়ে পাঠক সমাজে খুবই আদৃত ছিল। শিশু সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল এবং তিনি বহু মাসিক পত্রের লেখক ছিলেন। কাশীধামে তিনি অধ্যাত্ম সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বহু গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত আছে।

পরলোকে সার অতুল চ্যাটার্জি—

বৃটেনে ভারতের প্রাক্তন হাইকমিশনার সার অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি গত ৮ই সেপ্টেম্বর সকালে বিলাতে সাসেক্সের সমুদ্রতীরস্থ বেক্সজিনে ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নদীয়া শান্তিপুরের অধিবাসী ছিলেন ও ১৮৯৬ সালে আই-সি-এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যুতে তিনি ১৯২০ সালে মেরী ব্রাউটন নামে এক শ্বেতাঙ্গিনীকে বিবাহ করেন। ১৯২১ হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত তিনি ভারতীয় আইন সভার সদস্য ও ১৯২৩-২৪ সালে বড়লাটের শাসন পরিষদের শিল্প-মন্ত্রী ছিলেন। ১৯২৫ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত তিনি বৃটেনে ভারতের হাইকমিশনার ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন কৃতী বাঙ্গালীর অভাব হইল।

তুমি আছ, আমি আছি

জয়ন্তী লাহিড়ী

অনেক দিয়েছ জীবন ভরিয়া,
অনেক নিয়েছ কেড়ে;
কত যে আমারে বেঁধেছ বাঁধনে,
কত যে দিয়েছ ছেড়ে।

দেওয়া না-দেওয়ার কথা আর কিছু
আজ নাহি মনে আসে,
পাওয়া না-পাওয়ার মৃদু পরশনে
কোন সুর নাহি ভাসে।
আমারে দিয়েছ অসীম মৃত্যু
জীবন নদীর পারে;
তোমারে দিয়েছি জীবনের সীমা,
হারায়েছি তাই তারে।
আজ মোরে তুমি ভালবাস কিনা,
সে কথা জানিতে মন
নতুন করিয়া সাধিতে চাহে না;
নাহি তার প্রয়োজন।

দেখা না-দেখার সীমা অসীমায়
এই কথা জানিয়াছি,
তোমার আমার দু'জনের মাঝে
তুমি আছ, আমি আছি।

সাহিত্যের রূপ

কুমারী লক্ষ্মী ভট্টাচার্য্য বি-এ

সাহিত্যের প্রকৃত সংজ্ঞা নিয়ে মত-বিরোধের আর অন্ত নেই। কিন্তু সকল ভেদকে উপেক্ষা ক'রে একটা কথা অত্যন্ত নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, সাহিত্য তথা সাহিত্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের বেদনার স্থানগুলোকে সাবধানে এড়িয়ে গিয়ে প্রকৃত আনন্দের গান গাওয়া। যেমন গেয়েছেন বিশ্বকবি—তাঁর সৃষ্টির ছত্রে ছত্রে। প্রখর বুদ্ধির অপেক্ষা না রেখে যে সাহিত্য হৃদয়ের অন্তস্তলে আসন পাততে পারে—সেই হ'চ্ছে প্রকৃত সাহিত্য। শরৎচন্দ্র যেমন করে গেছেন।

ঋষি বঙ্কিম বিবেক-বাঞ্ছিত কংক্রিটে গাঁথা দৃঢ়তর রাস্তার ওপর দিয়ে আপনার রথ চালিয়েছিলেন। তাঁর অতুল অন্তর্বৈভব ধরিত্রীর সকল মন্দকে কালুষ্যকে ঘৃণা করতো। তাই লেখনী হাতে নিয়েই তিনি বিষ-বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন রোহিণীকে কঠোর শাস্তি দিতে। তাঁর—যুগে এর প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু আজ আর বোধহয় কেউ একথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করতে চাইবে না যে, রোহিনীর মন নামক কোন বস্তু থাকতে নেই। এর প্রধান অভিব্যক্তি হ'চ্ছে জর্জ বার্ণার্ডশ'এর সাহিত্যে। বাঙলা দেশের লোকেও আজ এর মূল্য বুঝতে পারছে। মনুষ্যত্বের মূল্য দেওয়ার প্রয়োজন যে সাহিত্যের এক প্রধান অঙ্গ একথা ভোলা উচিত নয়। কিরণময়ী, সাবিত্রী, অচলা, বড়দিদি, বিনোদিনী, মুক্তো প্রভৃতির হৃদয়েও যে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা, থাকতে পারে—একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। সহানুভূতি দিয়ে এদের দুর্বলতাকে উপলব্ধি করা সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলনা কিছুই, তাদের বেদনাই দিয়েছে আমার মুখ খুলে, তারাই আমাকে পাঠিয়েছে মানুষের দরবারে, মানুষের নামে নালিশ জানাতে।" এ নালিশ আরও বহুদিন ধরে জানাতে হ'বে। একথা এখনও বাঙলার সাহিত্যিককে মনে রাখতে হ'বে বহুকাল। শ' "মেথুজোলার" যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে তাঁর বিলাস। তেমন দেখার দিন বাঙলার আজও আসেনি। কিন্তু 'বনফুল' স্থাবরের যে স্বপ্ন দেখেছেন, সে অত্যন্ত সত্য স্বপ্ন। নিনানির প্রমত্ত প্রগলভতা জোলমাকে বাঁচতে দেয়নি। কিন্তু নিনানিও মিথ্যে নয়। যুগ যুগান্ত ধরে সেই দিয়েছে প্রগতির প্রেরণা। তাঁকে অস্বীকার ক'রে কোন অনুভূতির জোরে যে অজ্ঞতার অন্ধকারে আলো জ্বালা যায় না একথাই আজ তার-স্বরে চেঁচিয়ে বলতে হ'বে।—

সমাজচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার ভার সাহিত্যিকের। কেননা, সাহিত্যই জাতির মেরুদণ্ড। অত্যন্ত অবহেলিত সমাজের মধ্যেও যে সত্যিকারের মানব-চেতনা থাকতে পারে—একথা পূর্ববর্তী যুগে বাঙলায় কেউ ভেবে দেখতে চাননি। কিন্তু তারাশঙ্করপ্রমুখ কথা-কারেরা সে কথা আজ বুঝতে পেরেছেন। নষ্ট-সুখ, ভ্রষ্ট-নীড় অসংখ্য জনগণের উন্নতির মধ্যে দিয়েই যে জাতির সত্যিকার ইতিহাস রচনা হ'তে পারে এ কথা দেশের সাহিত্যিকদের আজ ভালো ক'রে বুঝতে হ'বে। Pilgrim Fathers একদা emancipation এর যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার ব্যাপক অর্থকে আজ আমাদের জন-জীবনে সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে হ'বে দেশের সাহিত্যিকদের। তবে লেখা হ'বে যথার্থ স্বাধীনতার ইতিবৃত্ত।

শ' বলেছিলেন, "সাহিত্য হ'বে লেবু গাছের ফুল। শুধু গন্ধই নয়, তার মধ্যে থাকবে, ভবিষ্যৎ ফলের প্রচুর সম্ভাবনা।" আজ বাঙলার সাহিত্যে একথা সবিশেষ প্রয়োজন। বাঙলার জাতীয় মেরুদণ্ড অন্তর্বিভেদে আজ ভেঙ্গে পড়েছে। তার যা কিছু আপন সব আজ অবহেলার ঘরে হয়েছে অন্তর্বন্দী। এ যুগ আজ অবক্ষয়ের যুগ। একালের শীর্ষ-শিখরে বণিক বসে আছে অধিকারের রক্তমুকুট পরে। প্রব্রজ্যা—উন্নত নৃপতির রত্ন-রথ-চক্র বিস্মৃতির কোন্—পঙ্ককুণ্ডে যে আবদ্ধ হ'য়ে রইল তার সন্ধান কোন ঐতিহাসিকই আজ দিতে পারে না। কিন্তু একথা আজ অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রে চোখে পড়ছে যে আজ মনুষ্যত্বের কেউ মূল্য দিচ্ছেনা। কিন্তু এ যে কতো বড়ো না দেওয়া, এর পরিণতি যে কতো মর্মান্তিক সে কথার অজস্র প্রমাণ রয়েছে জগতেতিহাসের পাতায় পাতায় ছত্রে ছত্রে। তাই আজ আবার বাঙলাকে সাবধান হ'তে হ'বে। আর এ মর্মান্তিক অবনতির সাক্ষ্য হিসেবে তাকে না স্থান নিতে হ'য় ইতিহাসের অধ্যায়ে বিস্মৃত হ'য়ে। আর সে কথা শোনাবার ভার প্রধানতঃ সাহিত্য-কারকে নিতে হ'বে। অবহেলিতের পক্ষে সংগ্রামের যে রূপ "আনন্দ-মঠের" বিষয়—তাকেই আশার-বর্তিকা-রূপে তুলে ধরতে হ'বে গণ-লোচনের সামনে। বিলাসী অন্তরের পানে চেয়ে মানুষ যাতে বলতে পারে—

"ওগো নন্দিনী, আমরা আজ উপবাসী। আমাদের লুব্ধ করে তুলোনা তোমার লীলায়িত কায়ার প্রতি। আমাদের ক্ষুধার অন্ন চাই—চাইনা তোমার চটুল নর্তনের মধুছন্দ, তোমার বিলোল ভ্রূ-ভঙ্গ। গোলাপের লাবণ্যের প্রয়োজন আমাদের ফুরিয়েছে—আমাদের দেশকে এবার ভরে তোলো কুমড়ো ফুলের অজস্রতায়।"

তাই বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যিকদের সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য আজকের পৃথিবীতে বাঙ্গালীকে মানুষের মত বাঁচবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা। তাদের—আপাতঃ স্থবির অনুভূতিতে স্পন্দন জাগিয়ে প্রাণময় করে তোলা। সে অভাবের সমস্যাসঙ্কুল তাড়নায় অন্তর্শক্তি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে বাঙ্গালী আজ শুদ্ধ মাত্র খাওয়া পরার গ্লানিতে ডুবে গিয়ে অধঃপতনের দিকে অজ্ঞাতসারে এগিয়ে যাচ্ছে, বাঙ্গালার সাহিত্যিকদের সেই অধোগতি রোধ করতে হবে। তাদের—সমস্যা-বিপ্লিত জড় জীবনের প্রতিচ্ছবি তাদের সামনে এঁকে ধরতে হবে। কিন্তু সে ছবি যেন বাঙ্গালীর ক্লিষ্ট মনে বিভীষিকার সৃষ্টি না করে। সে ছবি তাদের—আত্মোদ্বোধনে প্রেরণা জাগাবে। বাঙ্গালীর আজকের সামান্য মাত্র পুঁজি নিয়েই সম্পদময় আনন্দের জীবন গড়ে তোলবার নূতন পরিকল্পনা সাহিত্যিকদের আজ বাঙ্গালীর সামনে মেলে ধরতে হবে। অর্থময় জীবনের—বাস্তব ছবি। বাঙ্গালী সেই ছবিতে যেন দাঁড়িয়ে ওঠবার পথ দেখতে পায়, সে পথে পর-প্রত্যাশী হয়ে নিষ্ফলতায় জীবনের শেষ হয়ে না যায়। সেই পথ হবে সকলে মিলে মিশে জীবনটাকে বাঁচবার মত করে বেঁচে থাকবার পথ।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৫৫ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা নানা দিক থেকে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রতিযোগিতার তালিকা প্রস্তুত হয় ৪০টি দল নিয়ে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৩৭টি দল যোগদান করে। প্রথম রাউণ্ডের খেলায় কটক কম্‌বাইণ্ড এবং জোড়হাট ক্লাব এবং তৃতীয় রাউণ্ডের খেলায় গত বছরের আই এফ এ শীল্ডের রাণার্স-আপ হায়দ্রাবাদ স্পোর্টিং ক্লাব যোগদান থেকে বিরত থাকে। সেমি-ফাইনালে খেলে স্থানীয় ৪টি দল—মোহনবাগান, এরিয়ান্স, ইস্টবেঙ্গল এবং রাজস্থান—১৯৫৫ সালের প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের প্রথম চারটি স্থান অধিকারী দল। এরিয়ান্স ২—০ গোলে মোহনবাগানকে এবং রাজস্থান ১—০ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। উভয় দলই এ নিয়ে দু'বার আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে উঠলো। ১৯৪০ সালে এরিয়ান্স প্রথম আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে খেলে বিজয়ী হয়। রাজস্থান প্রথম খেলে ১৯৫২ সালে মোহনবাগানের বিপক্ষে। এ খেলা দু' দিন ড্র হওয়ার পর পরিত্যক্ত হয়। উভয় দলই তাদের জীবনের প্রথম আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে খেলে মোহনবাগানের বিপক্ষে।

১৯৫৫ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে বাংলার দুই জনপ্রিয় ক্লাব মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের কেউ উঠতে না পারায় আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলায় ক্রীড়ামহলের এক বিরাট অংশের আকর্ষণ কমে গেলেও দু' দিনেরই ফাইনাল খেলায় মাঠে বিপুল দর্শক সমাগম হয়। প্রথম দিন খেলাটি গোলশূন্য ড্র যায়। এ ফলাফল সঙ্গত হয় নি। কারণ এরিয়ান্স দল অনেক ভাল খেলে এবং গোল করার যথেষ্ট সুযোগ পায়। এরিয়ান্স প্রবীণ খেলোয়াড়পুষ্ট রাজস্থানকে নাজেহাল করে। রাজস্থানের পক্ষে মস্ত বাঁচোয়া যে, এরিয়ান্স গোল করতে পারে নি।
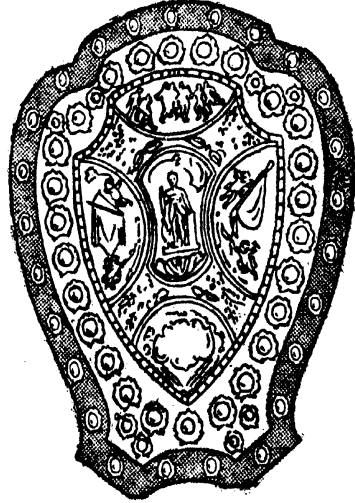
আই এফ এ শীল্ড

বাঙ্গালী তরুণ খেলোয়াড়রা সুযোগ-সুবিধা পেলে যে কৃতিত্ব লাভ করতে পারে এরিয়ান্স তার বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে।

দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলায় রাজস্থান ১—০ গোলে এরিয়ান্সকে হারিয়ে আই এফ এ শীল্ড পেয়েছে। এই দিন এরিয়ান্স প্রথমদিনের মত খেলতে পারেনি। বরং রাজস্থান ভাল খেলেছে; তবে তাদের কয়েকজন খেলোয়াড়

মারাত্মক ফাউল ক'রে খেলেন। রেফারিং খুব খারাপ হয়েছে। ফুটবল খেলার আইন পুস্তকে যে সব ঘটনা উপেক্ষা করার জন্য রেফারীকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে সেদিনের খেলায় রেফারী সেই রকম ঘটনাগুলি উপেক্ষা না করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; ফলে রেফারীর বাঁশীর আওয়াজে বিরক্তির সৃষ্টি হয় এবং খেলার মাধুর্য্য নষ্ট হয়। তাছাড়া এরিয়ান্সেরই বেশী ক্ষতি হয়। খেলায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বে-আইনী ঘটনা রেফারীর চোখ এড়িয়ে যায়। লাইন্সম্যানও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা ক'রে বিফল হ'ন। সব থেকে কৌতুক এবং উত্তেজনা সৃষ্টি হয় যখন তিনি এরিয়ান্সের দেওয়া গোলটি বাতিল ক'রে রাজস্থানের গোলমুখ থেকে আন্দাজ ৪০।৪৫ গজ দূরে রাজস্থানের বিপক্ষে এক ফ্রি-কিক দেন। খেলার ধারাঅনুযায়ী ঐ ফ্রি-কিক দেওয়ার কোন কারণই ঘটেনি। আই এফ এ শীল্ডের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিশেষ ক'রে ফাইনালে পি চক্রবর্ত্তীকে লাইন্সম্যান ক'রে বিজলী মুখার্জিকে রেফারী করা খুবই অশোভন হয়েছে। রেফারী হিসাবে বিজলী মুখার্জি বর্ত্তমানে যে অচল—আশাকরি তাঁর সেদিনের খেলা পরিচালনায় কর্তৃপক্ষের জ্ঞান হয়েছে।

রাশিয়া সফরে ভারতীয় ফুটবল দল ঃ

রাশিয়া সফরে ভারতীয় ফুটবল দল ৭টি খেলায় যোগদান করে। ভারতীয়দল ৫টি খেলায় হারে, ১টিতে জয়ী হয় এবং ১টি খেলা ড্র যায়। নিম্নে ফলাফল দেওয়া হ'ল।

হার (৫): ভারতবর্ষ হার স্বীকার করে মস্কো লোকোমোটিভের কাছে ০—৩ গোলে, জর্জ্জিয়ার কাছে ০—৬ গোলে, কুবেশেভের কাছে ১—৪ গোলে, রাশিয়ার কাছে ১—১১ গোলে এবং লেনিনগ্রাডের কাছে ০—৮ গোলে।

জয় (১): ভারতবর্ষ জয়ী হয় ১—০ গোলে ওডেসার বিপক্ষে।

ড্র (১): ভারতবর্ষ—আর্মেনিয়া দলের খেলা ২—২ গোলে ড্র যায়।

ইংলণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সাফল্য ঃ

১৯৫৫ সালের ল্যাঙ্কাসায়ার এবং সেণ্ট্রাল ল্যাঙ্কাসায়ার লীগ খেলা শেষ হয়েছে। সেণ্ট্রাল ল্যাঙ্কাসায়ার লীগে ভারতীয় টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় পলি উমরীগড় এবং দাত্তু ফাদকার যথাক্রমে ব্যাটিং এবং বোলিং এভারেজ তালিকায় শীর্ষ স্থান লাভ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ল্যাঙ্কাসায়ার এবং সেণ্ট্রাল ল্যাঙ্কাসায়ার ক্রিকেট লীগে পৃথিবীর অনেক খ্যাতনামা খেলোয়াড় পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে নিয়মিত যোগদান করেন।

১৯৪৯ সালে অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত টেষ্ট বোলার জর্জ্জ ট্রাইব ১৫০টা উইকেট পেয়ে এক মরসুমে সর্ব্বাধিক উইকেট পাওয়ার যে রেকর্ড করেন ভারতীয় খেলোয়াড় দাত্তু ফাদকার ১৯৫৫ সালের মরসুমে সে রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন রেকর্ড করেছেন। ফাদকার পেয়েছেন ১৫৪টা উইকেট (এভারেজ ৮. ১৯)। তিনি মোট ৭৪৬ রান (এভারেজ ৩৩. ৯০) ক'রে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ১১শ স্থান লাভ করেন। ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় উমরীগড়ের স্থান প্রথম; তাঁর মোট রান ১,১২০ (এভারেজ ৮৫. ১৫), ২৩ ইনিংসের খেলায়। তিনি ৭৭টা উইকেট (এভারেজ ১৫. ৪৫) পেয়ে বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ১৫শ স্থান পেয়েছেন।

ল্যাঙ্কাসায়ার লীগের খেলায় ভারতীয় টেষ্ট খেলোয়াড় সুভাষ গুপ্তে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। তিনি ১৩৬টি উইকেট (এভারেজ ৯. ৫০) পান। তাঁর খেলার দরুণই রিসটন ক্লাব একই বছরে লীগ এবং উরসলে কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে।

আলোচ্য বছরের লীগের খেলায় এই তিনজন ভারতীয় খেলোয়াড় সহস্রাধিক রান করার কৃতিত্ব লাভ করেন—পলি উমরিগড় ১১২০ রান (গড় হিসাবে ৮৫. ১৫) সেণ্ট্রাল ল্যাঙ্কাসায়ার লীগে ওল্ডহাম দলের পক্ষে, ভিনু মানকড় ১০৪০ রান (গড় হিসাবে ৪৭. ২৭) হ্যাসলিংডন দলের পক্ষে ল্যাঙ্কাসায়ার লীগে এবং বিজয় হাজারে ১,০৩১ রান (গড় হিসাবে ৫৭.২৭) রটেনষ্টল দলের পক্ষে ল্যাঙ্কাসায়ার লীগে।

রাশিয়া-ইংলণ্ড এ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠান ঃ

মস্কো ডায়নামো ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত রাশিয়া বনাম ইংলণ্ডের প্রথম আন্তর্জাতিক এ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানে রাশিয়া পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে ইংলণ্ডকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে।

পুরুষ বিভাগ: রাশিয়া ১৩৭ পয়েণ্ট এবং ইংলণ্ড ৯৩

পয়েন্ট। মোট ২০টি অনুষ্ঠানের মধ্যে রাশিয়া ১৫টিতে জয়লাভ করে অর্থাৎ প্রথম স্থান লাভ করে।

মহিলা বিভাগ : রাশিয়া ৮৩ পয়েন্ট এবং ইংলণ্ড ৪৮ পয়েন্ট। মোট ১১টি অনুষ্ঠানের মধ্যে রাশিয়া ৯টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে।

মহিলা বিভাগের ৩×৮০০ মিটার রীলে অনুষ্ঠানে রাশিয়া নিজেদেরই বিশ্বরেকর্ড ভেঙ্গে নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করে। দূরত্ব পথ অতিক্রম করতে ৬ মিঃ ২৭.৬ সময় লাগে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য উক্ত অনুষ্ঠানে পূর্ব্বের মহিলারাই যোগদান করেছিলেন। রাশিয়া কর্ত্তৃক স্থাপিত পূর্ব্বের বিশ্বরেকর্ড ছিল ৬ মিঃ ৩২.৬ সেকেণ্ড।

মহিলাদের লং জাম্প অনুষ্ঠানে রাশিয়ান মহিলা ৬.২৮ মিটার দূরত্ব অতিক্রম ক'রে বিশ্বরেকর্ডের সঙ্গে সমান করেন। ৪×১০০ মিটার রীলে রেস ৪৫.৬ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে রাশিয়া নিজেদেরই স্থাপিত বিশ্বরেকর্ডের সমান করে।

ইংলণ্ড দলের ম্যানেজার মিঃ জ্যাক ক্রামস এই ক্রীড়ানুষ্ঠান সম্পর্কে বলেন,—"We have no regrets nor excuses at being beaten by such a fine team. The organizetion was perfect and the crowd extremely fair."

হল্যাণ্ডে ভারতীয় হকি দল ঃ

ডাচ জাতীয় হকি দলের বিপক্ষে হল্যাণ্ড সফররত ভারতীয় হকিদল (বিশ্বযুব ক্রীড়ানুষ্ঠানে বিজয়ী হকিদল) তিনটি আন্তর্জাতিক খেলায় যোগদান করে। প্রথম খেলাটি ১—১ গোলে ড্র যায়। দ্বিতীয় খেলায় ভারতীয়দল ৩—০ গোলে জয়ী হয় এবং তৃতীয় খেলাটি ১—১ গোলে ড্র যায়। একটি বে-সরকারী ডাচ হকিদল ২—১ গোলে ভারতীয় দলকে পরাজিত করে। ভারতীয়দল ৭—০ গোলে বে-সরকারী ডাচ হকিদলকে এবং ৩—১ গোলে বেলজিয়ামকে হারায়।

ক্যালকাটা স্পোর্টস বিল ঃ

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় এবং বিধান পরিষদে 'ক্যালকাটা স্পোর্টস বিল' নামে একটি বিল গৃহীত হয়েছে। বিলটি সুদীর্ঘ সুতরাং এই স্বল্পপরিসর বিভাগে তার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। পশ্চিম বাংলার খেলাধূলার ইতিহাসে এই বিলটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বিলটির মুখ্য উদ্দেশ্য—ক'লকাতায় ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণ, রাজ্যের বিভিন্ন খেলাধূলার উন্নতি ও প্রসার, রাজ্যের ক্রীড়া-নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলির সুপরিচালনা এবং খেলাধূলার অনুষ্ঠান সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। বিধান পরিষদে বিলটির আলোচনা প্রসঙ্গে মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেছেন, 'ক্যালকাটা স্পোর্টস বিলটি' কেবলমাত্র ক'লকাতায় নয় সমস্ত পশ্চিম বাংলায় খেলাধূলার উন্নতিকল্পে যে প্রযোজ্য হ'তে পারে এমন বিধি-ব্যবস্থা বিলে আছে।

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ক্রীড়া-নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এবং ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান বিশেষ ক'রে খেলাধূলায় অন্যতম প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন (আই এফ এ) এবং ন্যাশানাল ক্রিকেট ক্লাবের (এন সি সি) কার্য্যকলাপ জনসাধারণের অজানা নয়। এ দু'টি সাধারণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনসাধারণের যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। জনসাধারণ আলোচ্য বিলটির মধ্যে দেখতে পাবেন তাঁদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণের বাস্তব পরিকল্পনা। সেই সঙ্গে চোখে ভেসে না উঠে পারে না সেই দুঃসহ অতীত দিনগুলির ছবি—ফুটবল খেলায় টিকিট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড রোদ এবং প্রবল বারিপাত মাথায় নিয়ে খেলা আরম্ভের দু' তিনদিন আগে থেকে অপেক্ষমান মানুষের সারি, ঘোড়সওয়ারের হাতে দর্শকদের লাঞ্ছনা, ন্যায্য দামের থেকে পাঁচ ছ'গুণ দামে টিকিটের বেচা-কেনা এবং টিকিট সংগ্রহে অকৃতকার্য্য হয়ে গাছের মাথা থেকে খেলা দেখতে গিয়ে হতভাগ্য দর্শকের পতনের ফলে মৃত্যু।

জনসাধারণ এই আইনে আরও দেখতে পাবেন, তাঁদের খেলাধূলার প্রবল আগ্রহের সুযোগ নিয়ে যে কর্ম্মকর্ত্তারা খেয়াল খুশিমত চ্যারিটি ম্যাচের সংখ্যা বাড়িয়েছেন অথচ খেলাধূলার উন্নতি-বিধানে কোন গঠনমূলক কাজ করেননি, দর্শক সাধারণ এবং খেলোয়াড়দের দুঃখকষ্ট উপেক্ষা ক'রে এসেছেন আজ তাঁদেরই পা আইনের জাঁতিকলে পড়েছে। জনসাধারণ এবং আমাদের জাতীয় সরকার এ ধরণের কার্য্য-কলাপ সম্পর্কে যথেষ্ট ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন।

ইণ্ডিয়ান লাইফ্-সেভিং সোসাইটি ঃ

ইণ্ডিয়ান লাইফ্-সেভিং সোসাইটির ৩৩তম প্রতিষ্ঠা-দিবস পালন উপলক্ষে গত ১৭ই সেপ্টেম্বর লেক্ অঞ্চলে সোসাইটির নিজস্ব ভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উৎসবে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এবং সোসাইটির বাৎসরিক জল-ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সফলকাম সভ্য ও সভ্যাদের পুরস্কার বিতরণ করেন রাজ্যপাল-পত্নী শ্রীযুক্তা বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে 'বেহুলা' নামে একটি জল-ক্রীড়া নাটিকা অভিনীত হয়। শ্রীশচীন্দ্র ভট্টাচার্য্য রচিত এই নাটিকা পরিচালনা করেন শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত এবং নৃত্যানুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটিকার সার্থক অভিনয়ে দর্শকদের মন বেদনায় এবং আনন্দে আপ্লুত হয়। অভিনয়ের বেশীর ভাগ ভূমিকায় যোগদান করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এবং তারা সন্তরণ কৌশলে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'বেহুলা' জলক্রীড়া নাটিকায় চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রা

ফটোঃ—এস, কে, ব্যানার্জী

আমেরিকান লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

১৯৫৫ সালের আমেরিকান লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় এ বছরের উইম্বলেডন বিজয়ী টনি ট্রাবার্ট (আমেরিকা) পুরুষ বিভাগের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হয়ে একই বছরে উইম্বলেডন এবং আমেরিকান খেতাব লাভ করেছেন। মিক্সড ডবলসে ভিক্ সিক্সাস এবং ডরিস হার্ট (আমেরিকা) এ বছরও জয়ী হয়ে উপর্য্যুপরি তিনবার জয়লাভের গৌরব লাভ করেন।

ফাইনাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : টনি ট্রাবার্ট (আমেরিকা) ৯-৭, ৬-৩, ৬-৩ গেমে কেন্ রোজওয়ালকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : গত বছরের চ্যাম্পিয়ান মিস ডরিস হার্ট (আমেরিকা) ৬-৪, ৬-২ গেমে মিস প্যাটরিকা ওয়ার্ডকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস : গত দু'বছরের চ্যাম্পিয়ান ভিক্ সিক্সাস এবং ডরিস হার্ট (আমেরিকা) ৭-৫, ৫-৭, ৬-২ গেমে গার্ডানার মুলয় এবং শার্লি ফ্রাইকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

দিল্লী ওয়াণ্ডারার্স হকি দল ঃ

নিউজিল্যাণ্ড হকি এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে এবং দিল্লী ষ্টেট হকি এসোসিয়েশনের উদ্যোগে দিল্লী ওয়াণ্ডারার্স বা ইণ্ডিয়ান ওয়াণ্ডারার্স হকি দলটি নিউজিল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া সফর শেষে স্বদেশে ফিরে এসেছে। দলের ১৭জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ১৯৫২ সালের বিশ্ব অলিম্পিক হকি বিজয়ী ভারতীয় হকিদলের ৫জন খেলোয়াড় ছিলেন। ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশন এই সফর অনুমোদন করেন। দলটি প্রায় ৩½ মাস কাল নিউজিল্যাণ্ডে এবং অষ্ট্রেলিয়াতে অবস্থান করে।

আলোচ্য সফরে দলটি সর্ব্বসমেত ৩৮টি খেলায় যোগদান করে—নিউজিল্যাণ্ডে ৩১টি, অষ্ট্রেলিয়াতে ৫টি, সিঙ্গাপুরে ১টি এবং কলম্বোতে ১টি। মোট ৩৮টি খেলার মধ্যে ভারতীয় হকিদল ৩৭টি খেলায় জয়লাভ করে এবং মাত্র একটিতে পরাজিত হয়—নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায়। নিউজিল্যাণ্ডে ওয়াণ্ডারার্স দল তিনটি টেষ্ট ম্যাচ খেলে। ১ম এবং ৩য় টেষ্টে জয়ী হয়ে ওয়াণ্ডারার্স দল 'রাবার' লাভ করে। আলোচ্য সফরে ওয়াণ্ডারার্স দল ২০৩টি গোল দেয় এবং গোল খায় ২৩টি। ইতিপূর্ব্বে তিনটি ভারতীয় হকিদল নিউজিল্যাণ্ড সফরে যায়—১৯২৬, ১৯৩৫ এবং ১৯৩৮ সালে।

আদিম রিপু—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় দেওয়া যেমন নিষ্প্রয়োজন, তাঁহার 'ব্যোমকেশ' সিরিজের পরিচয় দেওয়াও তেমনি নিষ্প্রয়োজন। আদিম রিপু ব্যোমকেশ সিরিজের সদ্য-প্রকাশিত একখানি সুখপাঠ্য উপন্যাস। বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। কাহিনীটি যেমন চিত্তাকর্ষক ভাষাও তেমনি স্বচ্ছ ও সাবলীল। বর্ণনাভঙ্গী ও চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্য গল্পটীকে প্রত্যক্ষ বাস্তবতার রূপ দিয়াছে। প্রত্যেকটী চরিত্র যেন জীবন্ত বলিয়া মনে হয়। এই উপন্যাস শ্রান্ত মনের অবসরকে আনন্দ দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ সুন্দর হইয়াছে।

[প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩৲ টাকা।]

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ-মুখোপাধ্যায়

ফিরিঙ্গি বণিক্ ঃ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন। কিন্তু তবু সে সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। আজও ভারতের এক কোণে পূর্ব পরাধীনতার কলংক চিহ্নরূপে পর্তুগীজ শাসন তার সমস্ত নৃশংসতা ও বর্বরতা নিয়ে বর্তমান রয়েছে। এই পর্তুগীজ বোম্বেটেরাই ভাস্কো-ডা-গামার নেতৃত্বে ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে কালিকটের বন্দরে এসে প্রথম নেমেছিল। কালিকটের সামরী বা জানোরিণের করুণায় সেদিনে বাণিজ্য কার্যের ও খৃষ্ট-ধর্ম প্রচারের অধিকার তারা পেয়েছিল। কিন্তু ধর্মপ্রচার ও বাণিজ্য ত ছিল তাদের ব্যপদেশ মাত্র। আসল উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন, দস্যুতা, রাজ্যজয়, রাজ্যবিস্তার। ত্রাসে সারা দক্ষিণভারত পতুগীজ জল দস্যুদের উৎপাতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। পতুগীজ বোম্বেটেদের অত্যাচার, আর শান্তিপ্রিয় ভারতের জনসাধারণের দুরবস্থার ইতিহাস এই ফিরিঙ্গি বণিক্। কি ভাবে গোয়ানগরী প্রতিষ্ঠা করেছিল পর্তুগালের এক জলদস্যু ভারতের আর এক জলদস্যুর সহায়তায়—তারই করুণ কাহিনী রচিত হয়েছে সুপণ্ডিত লেখকের দরদী লেখনী স্পর্শে। রাজ্য জয়, বাণিজ্য বিস্তার ও ভোগবিলাসের উচ্ছৃঙ্খলতার যে চিত্র এঁকেছেন তিনি তা তথ্যপূর্ণ ও প্রমাণ গ্রাহ্য। ঐ যুগের কাহিনী যাঁরা পড়বেন, তারা এ যুগের বোম্বেটে বর্বরতায় মোটেই আশ্চর্যান্বিত হবেন না।

পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রামাণ্য ইতিহাস বাংলাভাষায় এই প্রথম। অতএব এ গ্রন্থের সমাদর হবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

[প্রকাশক ঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। কলিকাতা। মূল্য—৩৲ টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

জ্যোতিষী ঃ গজেন্দ্রকুমার মিত্র

কাহিনীকার গজেন্দ্রকুমারের কাহিনী সৃষ্টিতে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেটি হলো, অতি সাধারণ ঘটনা ও অতি সাধারণ গল্পবস্তুকেও তিনি অতি সহজে রসপ্লুত করে তুলতে পারেন। জ্যোতিষী তারই একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

বইখানা ইতিমধ্যেই চিত্রায়িত হয়ে জনসমাজে আদর লাভ করেছে।

[প্রকাশক ঃ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েটেড্ পাব্লিশিং কোঃ লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭, দাম—২৲ টাকা]

রক্তরাঙা দিনে (অনুবাদ গ্রন্থ) ঃ অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত

আলোচ্য গ্রন্থখানি ফরাসী বিপ্লবের রক্তস্নাত পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ভিক্টর হুগোর বিখ্যাত উপন্যাস "নাইনটি থ্রি"র স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। ঘটনার আরম্ভ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসের শেষে ফ্রান্সের অন্তর্গত গা মোদ্রার গহন অরণ্যে, তারপর চলেছে বৈপ্লবিক অভিযান রোমাঞ্চকর ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে—রাজতন্ত্র আর বিপ্লব দুই শক্তি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হোলো ভীষণ সংগ্রাম—অনুসন্ধান বাহিনীর অধিনায়ক গোভাঁ, আর মার্কুইস দ্য গাঁতিনাককে কেন্দ্র করে রক্তরাঙা দিনের লোমহর্ষণ কাহিনী অভিব্যক্ত হয়েছে। দেশদ্রোহী গাঁতিনাক যিনি লা তুর্গ দুর্গে বন্দী ছিলেন তাঁকে গোভাঁ কারা-দ্বার খুলে মুক্ত করলো নিজের গায়ের সেনাপতির পোষাক খুলে। আর নিজে রইলো কারাকক্ষে।

অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত শুধু শিশুসাহিত্য নয়, অনুবাদ সাহিত্যেও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেছেন।

[প্রকাশক ঃ কল্যাণব্রত দত্ত, তুলিকলম ঃ ৪নং মধুপাল লেন, কলিকাতা—৫। দাম—১৷৹]

দেশের মেয়ে ঃ শান্তশীল দাস

দেশের মেয়ে নাটিকাখানির গ্রন্থকার সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত ও সর্বজন বিদিত। এঁর কবিতার সঙ্গে পূর্ব্বেই পরিচয় ঘটেছে।

আলোচ্যগ্রন্থে গ্রন্থকার কিশোর-মহলের উপযোগী দৃশ্য কাব্য রচনা করেছেন আর তা তাদের মনের মতই হয়েছে, নিঃসঙ্কোচে এই অভিমত প্রকাশ করা যায়। সমাজের অবহেলিত মানুষের প্রতি দরদ দেখিয়ে কিশোরী দুর্গা জীবনের জয়গানই করেছে। মানুষ ও প্রকৃতির মিলনের মাধুর্য্য আছে এই আলোচ্যগ্রন্থে। পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলির ভিতর দুর্ব্বলতা নেই,—এদের আনন্দ ভোজের ভেতর অংশ গ্রহণ করতে লোভ হয়। সাতটি দৃশ্যে সমাপ্তি ঘটেছে। যারা এখনও কৈশোরোত্তর স্তরে আসেনি তারা পড়ে আনন্দ পাবে, অভিনয় করেও খুশী হবে।

[প্রকাশক—কল্যাণব্রত দত্ত : তুলিকলম : ৪, মধু পাল লেন, কলিকাতা-৫। মূল্য—বারো আনা]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

তারা পীঠ ভৈরব : শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরভূম জেলা বহু বীরাচারী সাধুর সিদ্ধিস্থল বলে প্রসিদ্ধ। এই জেলার বিভিন্ন স্থানে সতীদেহের বিভিন্ন অংশ পতিত হয়। বান্দিপুরে গলার হার, অট্টহাসে অধঃওষ্ঠ, দুবরাজপুরের নিকট ভ্রুযুগল, নলহাটীতে গলার নলী। ইহাই বীরভূমের বৈশিষ্ট্য। তারাপীঠ বা তারাপুর বশিষ্ঠ দেবের সিদ্ধপীঠ নামে খ্যাত। এ স্থান রামপুরহাট ষ্টেশন হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত, এ স্থানও ৫২ পীঠের অন্তর্গত। এইস্থানটি বিখ্যাত সাধক শ্রীশ্রীবামদেব বা বামাক্ষেপার লীলাভূমি। তারাপীঠ ভৈরবে শ্রীশ্রীবামাক্ষেপার বিবিধ অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ঘটনাগুলি শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের দ্বারা সংগৃহীত এবং কতকগুলি পূর্ব্বেই প্রচারিত। এর বহুল প্রচার হওয়া উচিত। অনেকগুলি বিখ্যাত সাধকের চিত্র পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট এবং প্রচ্ছদপট চমৎকার।

[বামদেব সংঘ : ৮, প্রামাণিক ঘাট রোড, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। দাম—৫৲ টাকা]

বি. না. চ.

বর্ষপঞ্জী (নবমবর্ষ) : সম্পাদক—শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত

আলোচ্য পুস্তকখানি বর্ষপঞ্জীর নবমবর্ষ সংখ্যা। এই সংখ্যায় যে কয়েকটি নূতন অধ্যায় সংযোজন করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভারতীয় জ্যোতিষের বর্ণপরিচয়, গ্রন্থাগার আন্দোলন, মহানগরী কলিকাতা এবং রাজ্যপুনর্গঠন। সালতামামী অধ্যায়ে গত এক বছরে সংঘটিত পৃথিবীর রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। ঘটনাপঞ্জী অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের সংক্ষিপ্তসার ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হইয়াছে। সন্ধি ও চুক্তি অধ্যায়ে আছে ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সন্ধি ও চুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

খেলাধুলা বিভাগে আছে ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য ক্রীড়ানুষ্ঠানের বিবিধ তথ্যাবলী এবং পর্য্যালোচনা। দুইটি পৃথক বিভাগে পশ্চিমবঙ্গ এবং পাকিস্তান সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় পরিবেশিত হইয়াছে। উল্লিখিত অধ্যায়গুলি ভিন্ন আরও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য ইহাতে আছে।

পুস্তকটি বাংলাদেশের ছাত্র, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ পাঠকদিগের যে বিশেষ কাজে লাগিবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

[প্রকাশক : এস. আর সেনগুপ্ত এণ্ড কোং, ২৫-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা—১৩। মূল্য ৪৲ টাকা।]

ক্ষেত্রনাথ রায়

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "গন্ধরাজ"—৩৲
দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "বিমান-বোটে বোম্বেটে"—৫৲
অমরেন্দ্র ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "পদ্মদীঘির বেদেনী" (২য় সং)—৩৲
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ছায়াপথিক" (২য় সং)—৩৲
নিরুপমা দেবী প্রণীত উপন্যাস "দিদি" (৯ম সং)—৫৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "মেজদিদি" (২০শ সং)—১॥০, "রমা" (৯ম সং)—২৲
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রকাশিত "গল্পের আলপনা"—২৲
পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত উপন্যাস "বিবস্ত্র মানব" (৩য় সং)—৪৲
শচীন সেনগুপ্ত কৃত শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যরূপ "পথের দাবী" (২য় সং)—২৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত কিশোরপাঠ্য রহস্যোপন্যাস "পাথরপুরী"—১॥০, মোপাসার মর্ম্মানুবাদ "এ লেডিজ ম্যান"—৩৲
ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মহারুদ্র"—৪৲
শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র"—২৲
শ্রী[illegible]চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "আমার পৃথিবী ভ্রমণ"—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

জন্ম—২৮শে আষাঢ়, ১২৮৮ তিরোধান—২৫শে কার্তিক, ১৩৬২

অগ্রহায়ণ—১৩৬২

প্রথম খণ্ড | ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

কর্মভূমি ভারতবর্ষ

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

শ্রীমদ্ভাবগতে পঞ্চম স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—ভারতবর্ষ কর্মক্ষেত্র এবং অন্য বর্ষগুলি স্বর্গীদিগের পুণ্যশেষে উপভোগের স্থান।

ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে—ভারতের প্রাচীন শিক্ষার আদর্শ ও তাহার উৎকর্ষতা উপলব্ধি করিলে এবং ভারতের প্রাচীন অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিলে—ভারতীয় জনগণমনের প্রকৃতি ও চিন্তার ধারা জানিবার চেষ্টা করিলে ভারতবর্ষ প্রকৃতভাবে কর্মক্ষেত্র ইহার যাথার্থ আমরা সহজেই জানিতে পারি। অন্যদিকে পাশ্চাত্য দেশের দিকে ভোগের বিপুল আয়োজন—ভোগোপকরণের অভূতপূর্ব উন্নতি—ভোগের সহায়ক হিসাবে জড়বিজ্ঞানের অশ্রুতপূর্ব উন্নতি এবং তাহাদের সেই ভোগের বাধকদিগের ধ্বংশের জন্য মারণাস্ত্রের অভাবনীয় ক্রমবিকাশ ও তন্নিমিত্ত প্রতিযোগিতা দেখিয়াই সে দেশ যে ভোগভূমি—ইহার যাথার্থও আমরা অনায়াসে বুঝিতে সক্ষম হই।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—যত্র জীব তত্র শিব—ইহা ভারতের মহাবাক্য। সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন ভারতের উপলব্ধি। ভারতের মর্মকথা—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে—নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈবসুখম্—অল্পে সুখ নাই, ভূমাতে আনন্দ। ভারতের মহীয়সী নারী বিষয় ভোগকে তুচ্ছ করিয়া চলিতে পারেন—যেনাহং নামৃতাস্যাম্ তেনাহং কিং কুর্য্যাম্—যাহাতে আমি অমৃতত্ব না পাইব তাহার দ্বারা আমি কি করিব? ভোগভূমির ভোগায়তনে সুধীগণ এই

সকল বাক্যের মর্ম বুঝিতে আগ্রহশীল নহেন—তাহারা ভোগোপকরণ জড়ের স্বরূপ—জড়প্রকৃতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম অংশের অন্তর্নিহিত শক্তি সর্বদা জানিতে ব্যাকুল। এক্ষণে তাঁহারা এই সামান্য পৃথিবীভোগে সন্তুষ্ট নন—তাঁহারা বিশ্বের অন্যান্য গ্রহ উপভোগে উৎসুক। কিন্তু ভারত জানিতে চাহিয়াছে শুধু আপনাকে—তাহার অন্তরের কথা—আত্মানংবিদ্ধি। ভারত জানিয়াছে—আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং—আত্মাকে দর্শন শ্রবণ মনন দ্বারা জানিলে সকল বস্তুই জানিতে পারা যায়।

ভারতীয় ঋষিগণের দেহ ভোগায়তন ছিল না—ছিল কর্মায়তন। এজন্য ভারত কোনদিন জড়বিজ্ঞানকে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের উপর প্রাধান্য দেয় নাই—এজন্য ভারতে পিরামিড নাই—প্রাচীনতম ভারতের প্রাচীনত্ব প্রদর্শনের কোন জড়বস্তু নাই। ভারতে আছে—অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার—বেদ, উপনিষদ, সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি! মানবের উৎপত্তির সময় হইতে যুগ যুগ ধরিয়া ইহা সঞ্চিত হইয়াছে। এ কারণ ভারতীয় সভ্যতা কত প্রাচীন তাহার মাপকাঠি জড়বস্তু নহে—জ্ঞানবস্তু। এজন্যই পাশ্চাত্য সুধীগণ ভারতের প্রাচীনত্ব উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

ভারতের ব্যক্তি ও সমাজ—ভারতের শাশ্বত ও সনাতন ধর্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতের ধর্ম—কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রচারিত ধর্ম নহে। বহু সত্যদ্রষ্টা ঋষির সত্য-দর্শন—ভারতীয় ধর্মের ভিত্তি—ইহার উৎস সত্যস্বরূপে ভারতীয়—এজন্য ইহা প্রাণবন্ত, অক্ষয় এবং অব্যয়। সহস্র বৎসরের পরাধীনতার শাসনে ও শোষণে ভারতীয় সংস্কৃতির চারিপার্শ্বে যে কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হইয়াছিল—স্বাধীনতা সূর্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই কুহেলিকা অন্তর্হিত হইয়াছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতি উজ্জ্বল মূর্তিতে স্বপ্রকাশিত হইয়া পৃথিবীর সর্বমানবের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে—ভারতীয় শান্তি-বাণী আজ ভোগভূমির দিকে দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া যুদ্ধক্লিষ্ট জনগণের মনে শান্তির আশা আনিয়াছে!

বহু সহস্র বৎসর পূর্বে ভগবান মনু তাঁহার সংহিতায় বলিয়া গিয়াছেন—এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রশিক্ষেরং পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ। এখনও পৃথিবীর সকল মনুষ্য বহু বৎসর ধরিয়া ভারতের নিকট শিক্ষালাভ করিতে পারে এত অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার ভারতে সঞ্চিত আছে। ভোগভূমির দর্শন ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ভারতের দর্শন বিজ্ঞানের তুলনায় গোষ্পদ মাত্র।

সত্যদ্রষ্টা মহাত্মাগণ যখন ভোগভূমিতে ধর্মপ্রচার করিয়াছেন—তখন তাঁহারা সেই দেশের তাৎকালিক অবস্থায় যতটুকু প্রকাশ সম্ভব ততটুকু মাত্র পরিবেশন করিয়াছেন—তাহার অতিরিক্ত কিছু প্রচার করিতে সাহসী হন নাই বা সঙ্গত মনে করেন নাই। এবং যতটুকু ধর্ম-প্রচার করিয়াছেন তাহার ফলে কেহ হত, কেহবা পলায়নে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কর্মক্ষেত্র ভারতে যখনই অধর্মের অভ্যুত্থান হইয়া ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে তখনই ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া লোক সংগ্রহার্থে নরলীলা করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ভগবৎ ইচ্ছায় বহু সত্যদর্শী ধর্মগুরু আবির্ভূত হইয়া ভারতীয় সনাতন ধর্মের কালিমা মোচন করিয়া ভারতীয় জনগণমনকে ভগবৎমুখী করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। ভারতের অপরাপর দেশে এত আবির্ভাব হয় নাই এবং তাহা সম্ভব হয় নাই। এজন্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় ভারত কর্মভূমি এবং অন্যান্য দেশ ভোগভূমি। ভোগভূমির জনগণ ভোগের জন্য শরীর রক্ষা ও তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানকে প্রধানতঃ কর্ম বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতীয় ঋষির মত—শরীর ভোগার্থে নহে—ধর্মার্থে। শরীর যদি সুস্থ এবং সক্রিয় না থাকে তাহা হইলে ধর্মসাধন ব্যাহত হয়। এজন্য ঋষি বাক্য—শরীর রক্ষা আদি ধর্মসাধন—শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনং।

কেহই দুঃখ কামনা করে না—সকলেই সুখ কামনা করে। ইচ্ছাই হউক বা অনিচ্ছাই হউক; জ্ঞান হউক বা অজ্ঞানই হউক, প্রবৃত্তির তাড়নায় হউক—প্রতিদিন আমরা কিছু না কিছু অকর্ম বা বিকর্ম করি বা করিতে বাধ্য হই। তাহার ফলস্বরূপ দুঃখভোগ আমাদের অনিবার্য হইয়া পড়ে। এই অনিবার্য দুঃখভোগের নিষ্কৃতির জন্য দৈনন্দিন যে সাধনা—ভবিষ্যৎ দুঃখের উৎপত্তির মূলধ্বংশ জন্য অসৎ কার্য হইতে নিবৃত্তি এবং ভবিষ্যৎ সুখ বা আনন্দ প্রাপ্তির নিমিত্ত সৎকার্যে প্রবৃত্তির উদ্দেশ্যে দৈনন্দিন যে সাধনা আমাদের করণীয় তাহার প্রশস্ত ক্ষেত্র ভারতবর্ষ।

ভারতের জনগণমন স্বভাবতঃ ভোগবিমুখ ও ভগবৎমুখী; এজন্য ভারতের সহজ সরল পরিবেশ সাধনার সহায়ক।

আমরা যখন যে কার্য করি, আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্ব-রজঃ তমোগুণের একটীর আধিক্যে ও তাহার আশ্রয়ে করি। আমরা সত্ত্বগুণের আধিক্যে ও আশ্রয়ে যে কার্য করি তাহাতে আমরা নির্মল আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করি। রজোগুণের আধিক্যে ও আশ্রয়ে কৃতকর্মে আমরা ক্ষণস্থায়ী সুখ বা দুঃখ উপভোগ করি এবং তমোগুণের আধিক্যে ও তাহার আশ্রয়ে কৃতকর্মে আমরা মোহগ্রস্ত হই।—ইহা আমরা প্রতিদিন আত্মানুসন্ধান করিলে সহজেই বুঝিতে পারি। জড়জগতে যেমন প্রত্যেক আঘাতের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক চিৎ জগতেও তাহাই—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। আমি, আমার সবলতা ও কামনার মত্ততায়, যদি কোন ব্যক্তিকে আঘাত করি বা অপমান করি বা কোনরূপে মর্মব্যথা দিই এবং সেই ব্যক্তি যদি তাহার প্রতিদানে সেইরূপ কিছুই করিতে সক্ষম না হয়—তাহা হইলে প্রকৃতির নিয়মে শীঘ্র বা বিলম্বে আমার উপর সেইরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে বাধ্য। ঐরূপ আমি যদি কোন দুঃখীর দুঃখমোচন করি কিন্তু সেই দুঃখী ব্যক্তি তাহার প্রতিদানে কিছুই করিতে সক্ষম না হয়—তাহার প্রতিক্রিয়াও প্রকৃতির নিয়মে শীঘ্র বা বিলম্বে আমার উপর হইতে বাধ্য। আমরা অনেক সময়ে অযাচিত অপরের নিকট হইতে আঘাত বা অপমান প্রাপ্ত হই বা কোন সময়ে ঐরূপ অপরের নিকট হইতে অযাচিত সাহায্য বা সম্মান প্রাপ্ত হই—তাহার কারণ পূর্বোক্ত কার্যের প্রতিক্রিয়া বলাই সঙ্গত। তাহা না হইলে কারণ ভিন্ন কার্য এবং কার্য ভিন্ন কারণ কল্পনা করিতে হয়—ইহা অসঙ্গত। এজন্য ঋষিবাক্য—মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটীশতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতংকর্ম শুভাশুভং। সুতরাং ইহা সিদ্ধান্ত যে আমরা প্রতিদিন যে কার্য করি তাহার ফলভোগ আমরা করিতে বাধ্য। যে কর্ম সৎ তাহার ফলভোগ সুখ—যে কর্ম অসৎ তাহার ফলভোগ দুঃখ। নিষ্ঠাপূর্বক যজ্ঞ, তপস্যা, দান ও যে কর্ম্ম ঈশ্বরার্থে কৃত এবং যে কর্ম সর্বভূতের হিতকর তাহাই সৎ এবং তাহার বিপরীত কর্ম অসৎ—ইহা সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে।

আমাদের শাস্ত্রে কথিত আছে—কর্মফল ত্রিবিধ—(১) প্রারব্ধ অর্থাৎ যাহার ভোগ আরম্ভ হইয়াছে (২) ক্রিয়মান—যাহার ভোগ শীঘ্র আরম্ভ হইবে (৩) সঞ্চিত—যাহার ভোগ ভবিষ্যতে হইবে। মনুষ্য ভিন্ন প্রাণীগণ তাহাদের কর্মফল ভোগ ভিন্ন তাহাদের ঐ দেহে কোন কর্মফলের খণ্ডন করিতে পারে না। এজন্য মানব ব্যতীত অন্য সকল প্রকার জীবের কেবলমাত্র ভোগদেহ অর্থাৎ এ দেহে তাহারা তাহাদের অর্জিত সুখ দুঃখ ভোগ করে মাত্র। কিন্তু মানবদেহ—কর্ম ও ভোগদেহের সমন্বয়—মানব ইচ্ছা করিলে সাধনা দ্বারা তাহাদের জীবনকালে ক্রিয়মান ও সঞ্চিত দুই কর্মফলের খণ্ডন করিয়া ভবিষ্যৎ দুঃখভোগের নিবৃত্তি করিতে পারেন। একমাত্র প্রারব্ধ ভোগ ভিন্ন খণ্ডিত হয় না সত্য, তবে সৎ অসৎ কর্মভোগ দুঃখভোগ-কালের এবং দুঃখ-ভোগের গভীরতার বৃদ্ধি করিতে পারে। এজন্য মানব এই মরুজগতের শ্রেষ্ঠ জীব—এজন্য কবির বাক্য—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। মানবশরীর সাধনার উপযোগী, অন্য জীবদেহ সাধনার উপযোগী নহে। গীতায় উক্ত আছে—যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ। কর্মফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া অনাসক্তভাবে যজ্ঞার্থে বা ভগবৎপ্রীতি কামনায় যে কর্ম করা যায় তদ্দারা আমরা কর্মে আবদ্ধ হই না। ইহা সাধনার বস্তু—অভ্যাসযোগ দ্বারা সাধ্য। এই সাধনার প্রশস্ত স্থান ভারতবর্ষ—এজন্য ভারতবর্ষ কর্মভূমি। এই ভারতে বহু সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—যাহারা সাধনপন্থী তাহারা এই স্থানে এখনও সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

এক্ষণে কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের শাশ্বত সনাতন ধর্মের উপদেশের সঙ্গে ভোগভূমিতে প্রচারিত প্রধানতম ধর্মের প্রধান কয়েকটি উপদেশের তুলনা করিয়া আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

ভোগভূমির প্রধান চলিতধর্ম মহাত্মা যীশু প্রচারিত খৃষ্টধর্ম। মহাত্মা যীশু তৎকালে ভোগভূমিতে প্রচলিত মূর্ত্তি-পূজার বিরুদ্ধে নিষেধ বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—Thou shalt have no other Gods before me. Thou shalt not make unto thee any Graven images or any likeness of anything that is in the Heaven above,or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth:

Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them: For the Lord thy God am a Jealous God etc..

তৎকালে ভোগভূমিতে যে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল তাহার বিরুদ্ধে এই নিষেধ-বাণী সঙ্গত। তৎকালে তাহাদের দেবতা তাহাদের ভোগের সহায়ক হিসাবে পূজিত হইত, এজন্য তাহা প্রকৃত ভগবৎ নিষ্ঠার বিরোধী। তজ্জন্য ভোগ-ভূমির—জনগণ স্বাভাবিকভাবে ভগবৎ-বিমুখা এজন্য তথায় মূর্ত্তিসৃজন অসৎ। ভোগভূমিতে ভগবান নিজেকে jealous বা ঈর্ষান্বিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ যে কার্যে নিষ্ঠা নাই বা শ্রদ্ধা নাই তাহা অসৎ। ভোগী ব্যক্তির ভোগ সাধনের উদ্দেশ্যে পূজনকে ভগবৎপূজন বলা যায় না। কিন্তু ভারতে জনগণ স্বাভাবিকভাবে ভোগবিমুখ ও ভগবৎমুখী এজন্য ভারতে ভগবান মূর্ত্তি পূজার বিরুদ্ধে কোন নিষেধবাণী উচ্চারণ করেন নাই। বরং ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

যো যো যাং যাং তনুংভক্ত শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাংতামেব বিদধাম্যহম্॥

যে যে ভক্ত যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা সহকারে অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে—আমি সেই সেই ভক্তের সেই দেবতাতে অচলা শ্রদ্ধার বিধান করি। ভারতে ভগবান মূর্ত্তিপূজার প্রতি একটুও ঈর্ষ্যান্বিত নহেন; কারণ কর্ম্মক্ষেত্র ভারতের প্রতিমা-পূজন—অন্য দেশের মূর্ত্তি পূজন হইতে পৃথক। ভারতের প্রতিমাপূজা রহস্যময়। ভারতবর্ষীয়গণ প্রকৃতপক্ষে প্রতিমাকে পূজা করেন না—প্রতিমাতে পূজা করেন। ভারতীয় প্রতিমা সাধকের সাধনালব্ধ বস্তুর প্রতীক, ভগবৎ পূজার আধার-মাত্র—এজন্য তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং বিসর্জ্জন। দেবতার স্নান মন্ত্রে আমরা বলি—

ওঁ সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্বতোবৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং॥

ভারতের প্রতিমা ভোগায়তন অসাধকের দৃষ্টিতে পুতুলমাত্র। কিন্তু সাধকের জ্ঞান দৃষ্টিতে তাহা বিরাট—ব্রহ্মাণ্ডময়।

ভারতের একমেবাদ্বিতীয়ং মহাবাক্যের এক ঈশ্বরবাদের সঙ্গে বহু ঈশ্বরবাদের সমন্বয় কোথায়, তাহা ভোগভূমির ভোগায়তন ব্যক্তিগণের ধারণার বাহিরে। বিভিন্নপন্থী সাধকের হিতার্থে এবং তাহাদের সাধনার সৌকর্যার্থে এক এবং অদ্বিতীয় ভগবান কিভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে বিভিন্ন সাধকগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা যাহারা সাধনপন্থী তাহারা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে লাগিল। ইহা জড় বিজ্ঞান নহে যে পরীক্ষাগারে এই উপলব্ধির যাথার্থ্যের পরীক্ষা হইবে। ইহা বুঝাইবার বস্তু নহে—ইহা সাধনার দ্বারা বুঝিতে হইবে। বন্ধ্যা নারীকে যেমন প্রসব-বেদনা বুঝান যায় না—অন্ধ ব্যক্তিকে যেমন সূর্যালোক দর্শন বুঝান অসম্ভব, তদ্রূপ এক এবং অদ্বিতীয় ভগবানের লীলারহস্য ভোগায়তন ব্যক্তিকে বুঝাইবার চেষ্টা বাতুলতা-মাত্র।

মহাত্মা যীশুর ভোগভূমিতে আর একটী আদেশ—বৃথা ভগবানের নাম করিবে না। Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. For the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. মহাত্মা যীশুর এই উপদেশ তদ্দেশের অবস্থা বিবেচনায় উপযুক্ত হইয়াছে। ভোগী ব্যক্তির ভগবৎ নাম উচ্চারণ উদ্দেশ্যমূলক—ভগবৎপ্রীতি-মূলক নহে। সুতরাং বৃথা নাম উচ্চারণ জনসাধারণের মনে সাধারণভাবে ভগবৎপ্রীতির উৎপাদন না করিয়া ভগবানের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারে। ভোগভূমির জনগণ স্বতঃই ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ভোগমুখী এবং ভগবৎমুখী—সুতরাং বৃথা ভগবানের নাম উচ্চারণ তাহাদিগকে ভগবৎমুখী না করিয়া ভগবৎবিমুখী রাখিবার সহায়ক হইবে। এ সকল কারণে মহাত্মার এই নিষেধবাণী ভোগভূমিতে সার্থক হইয়াছে। কিন্তু ভারতের অবস্থা তাহার বিপরীত। এ স্থানে সাধারণ জনগণমন স্বভাবতঃ ভগবৎমুখী। এজন্য ভারতীয় শাস্ত্রের উপদেশ—সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসেই হউক, নিরর্থকভাবেই হউক, হেলায় বা শ্রদ্ধায় হউক, যে কোন প্রকারেই হউক ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত বস্তুর ন্যায় ভগবৎনাম-শক্তিতে তাহার সমস্ত পাপ দগ্ধ হইবে। যথা—

শ্রীমদ্ভাগবতে—সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠ=নাম-গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥

স্কন্দপুরাণে—গোবিন্দেতি তথা প্রোক্তংভক্ত্যা বা ভক্তি-বর্জ্জিতৈঃ।
দহতি সর্ব্বপাপানি যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ॥

পদ্মপুরাণে—অনিচ্ছন্ অপি দহতি স্পৃষ্টো হুতবহো যথা।
তথা দহতি গোবিন্দ নাম ব্যাজাদপীরিতম্॥

প্রভাসখণ্ডে—সকৃদপি পরিগীতং হেলয়াশ্রদ্ধায়াবা।
ভৃগুবর, নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনামঃ॥

অগ্নিপুরাণে—শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ততে হৃদয়ে মম।

ভারতীয় শাস্ত্রের উপদেশ শুধু কর্মভূমি ভারতবর্ষের জন্য। ভোগভূমির ভোগায়তন ব্যক্তিগণের জন্য নহে। ভারতবর্ষের জনগণ যে ভাবেই হোক, হেলাতে বা শ্রদ্ধাতে হউক ভগবৎ নাম উচ্চারণ করিলে তাহার মনে ভগবৎপ্রেম উজ্জীবিত হইবে ইহাই ভারতীয় ঋষিগণের বিশ্বাস।

মহাত্মা যীশুর অন্যতম আদেশ—Remember the sabbath day to keep it holy. তিনি আদেশ দিয়াছেন—ছয়দিন কাজ কর এবং সপ্তমদিন ভগবানের নাম কর। ভোগভূমির ব্যক্তিগণকে এর বেশী আনুষ্ঠানিক-ভাবে উপাসনা করার আদেশ দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। কিন্তু কর্মভূমি ভারতের উপদেশ—অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত। গীতার উপদেশ—সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। সকল সময়ই ভগবানকে মনন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য কর্ম করা ভগবানের আদেশ। এজন্যই ঋষিবাক্য—যৎকরোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনম্। আমাদের শরীরকে যন্ত্র এবং হৃদ্দেশেস্থিত ভগবানকে যন্ত্রী মনে করিয়া সদা কার্য করা ঋষিগণের উপদেশ—ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

ভোগভূমিতে মহাত্মা যীশুর পরবর্তী আদেশ Honour thy father and mother পিতামাতাকে সম্মান কর। কিন্তু ভারতীয়গণের নিকট ভারতভূমি ও ভারতবর্ষীয় মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী। কর্ম্মভূমি ভারতীয় জনগণের বিশ্বাস—পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ। এখানে পিতা অর্থে পিতা মাতা-পিতৃপুরুষ সকলেই।

মহাত্মা যীশুর অন্যান্য আদেশ—Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultry. Thou shalt not steal, thou shalt love thy neighbour প্রভৃতি। ভারতের সংহিতায় পুরাণে এ সম্বন্ধে অসংখ্য বাক্য আছে এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কর্ম্মভূমি ভারতের জনগণ স্বভাবতঃ অহিংসাপরায়ণ—পরনারীকে মাতৃসমা জ্ঞান করে—পরবস্তুতে লোভ করে না—প্রতিবেশীর প্রতি সংবেদনশীল। সহস্র বৎসরের পরাধীনতার পেষণে কর্ম্মভূমি ভারতের জনগণের আক্ষরিক শিক্ষা পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় অতি নিম্নে। অদ্যাপি তাহাদের স্বাভাবিক অধ্যাত্মজ্ঞান সভ্যদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের তুলনায় বহু উচ্চস্তরে এখনও অবস্থিত। মহাত্মা যীশু আজ প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে তাঁহার ধর্মপ্রচার করিয়াছেন। তাঁহার ভোগভূমিস্থ শিষ্যগণ বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায়, জড়বিজ্ঞানের সাধনায়, পার্থিব ধনসম্পত্তি অর্জনে পৃথিবীর সর্বোচ্চস্তরে অবস্থিত। তথাপি মহাত্মা যীশুর পূর্বোক্ত আদেশগুলি কিরূপ নিষ্ঠার সহিত তাঁহারা পালন করিতেছেন তাহার উল্লেখ এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আজও ভোগভূমির ক্ষুদ্র বৃহৎ শক্তিগণ তাহাদের সাম্রাজ্যবাদ-এর মোহ ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না এবং সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য মুক্তিকামী নিরস্ত্র পরাধীন নরনারীকে নির্মমভাবে হত্যা করিতেছেন। গত বিশ্ব-মহাযুদ্ধে ভোগভূমির নায়কগণ তাহাদের বিপক্ষ-দেশের জনপদের উপর নির্বিচারে বজ্র নিক্ষেপ করিয়া নিরস্ত্র আবালবৃদ্ধ-নরনারীকে হত্যা করিয়াছেন—ভোগভূমির শিক্ষিত সৈন্যগণ তাহাদের অধিকৃত দেশে বহু নারীকে নির্বিচারে উপভোগ করিয়া গিয়াছেন—সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনের অজুহাতে শোষণের বা ধনাপহরণের বিরাম নাই—এই সকল বিষয় সামান্যভাবে চিন্তা করিলে প্রেমধর্মী মহাত্মা যীশুর ধর্মোপদেশ ভোগভূমিতে সামান্যভাবেই কার্যকরী হইয়াছে বুঝা যায় এবং ঐ সকল দেশ যে প্রকৃত ভোগভূমি তাহার যাথার্থতা প্রতিপন্ন করে।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা কর্মক্ষেত্র ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তথাপি আমরা অনেকে পাশ্চাত্য-শিক্ষার মোহে, তাহাদের ভোগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের দেহকে শুধু ভোগায়তন মনে করাই পরমার্থ মনে করিতেছি—সাধন ভজন অনাবশ্যক এবং সময়ের অপব্যয় মনে করিতেছি—এখনও যাহারা একটু সাধনপন্থী আছেন তাহাদিগকে ভণ্ড প্রতারক চিন্তা করিতে আমরা আনন্দ পাই, আমরা যে অমৃতের সন্তান ইহা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। এখনও সময় আছে—আমাদের অন্তরতম প্রদেশে অমৃতস্বরূপ ভগবান সর্বদা উদাত্ত স্বরে বলিতেছেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত। হে অমৃতের পুত্রগণ!—মনকে শূন্যগত করিয়া ভগবানের বাণী শ্রবণ কর—ওঠো! জাগো! আপনাকে জ্ঞাত হও—বর গ্রহণ করো—জ্ঞান লাভ করো! ওঁ তৎসৎ ওঁ।

মরুমায়া

শ্রীযামিনীমোহন কর

কলিকাতা থেকে ট্রেন এসে দাঁড়াল শিলিগুড়িতে। ট্রেন থেকে নেমে এল যাত্রীর দল। নামলেন শ্রীমতী চিত্রা বোস আর শ্রীঅর্জ্জুন রায়। দার্জিলিং যাবার জন্য এক ট্যাক্সি ভাড়া করে ওঁরা উঠে বসলেন। পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। পিছনের সিটে দু'জনে বসে। শ্রীরায় হাত ধরে আছেন শ্রীমতী বোসের। আর শ্রীমতী বোসের মাথা ন্যস্ত রয়েছে শ্রীরায়ের কাঁধে। দু'জনে নিশ্চল, মৌন। হয়ত' পথের শোভা তাঁদের মুগ্ধ করেছে। হয়ত' বা নিবিড় সান্নিধ্য উভয়কে অত্যধিক আনন্দে স্তব্ধ করেছে।

কার্সিয়াং। গাড়ী থামল। ওঁরা নামলেন চা খেতে। স্টেশনের রেস্তঁরায়। চা খেতে খেতে শ্রীরায় বললেন—"চিত্রা, বেশ ভাল করে ভেবে দেখ। এখনও সময় আছে।"

শ্রীমতী বোস উত্তর দিলেন—"না, আর ভাববার কিছু নেই। গৃহত্যাগ করার আগে অনেক ভেবেছি। আর না।"

শ্রীরায় বললেন—"আমি হয়ত' কথাটা ঠিক করে গুছিয়ে বলতে পারি নি। আমি তোমায় ভালবাসি চিত্রা, তাই তোমার যাতে ক্ষতি না হয় সেই চিন্তাই করছি। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কোন কাজ কোরো না। পরে যদি অনুশোচনা আসে তবে প্রেম স্থায়ী হবে না। আমরা এখন বন্ধু আছি মাত্র, কিন্তু পরে—"

শ্রীমতী বোস উদাস কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"এখন আর ওসব কথা কেন? সব চিন্তা শেষ করে এসেছি। ফেরবার কথা আর ওঠে না।"

শ্রীরায় পুনরায় বললেন—"তুমি আমায় ভালবাস জানি। ভালবাসা অতি গভীর না হলে তুমি সব ত্যাগ করে আসতে না তাও জানি। আমি শুধু বলছি, এখনও ফেরবার পথ আছে। ট্রেনে তোমার নামে টিকিট ছিল। দার্জিলিঙে তোমার নামে বাড়ী ভাড়া করেছি। আমার সঙ্গে এখনও তোমার নাম জড়িত হয় নি। কিন্তু পরে হবে। তখন ইচ্ছে থাকলেও ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।"

আর্ত্তস্বরে শ্রীমতী বোস বলে উঠলেন—"আর ওসব কথা বোলো না। থাম—"

চা খাওয়া শেষ করে ওঁরা গাড়ীতে উঠে বসলেন। গাড়ী চলল দার্জিলিঙের পথে।

দার্জিলিং। 'তুষার-ভিলা'র সামনে গাড়ী এসে দাঁড়াল। ট্যাক্সি-চালককে অপেক্ষা করতে বলে ওঁরা নামলেন। শ্রীমতী বোসের মালগুলো শ্রীরায় নামিয়ে রাখলেন বাড়ীর গেটের কাছে। সুন্দর সুদৃশ্য ছোট কটেজ। সামনে একটু বাগান। ভেতরে গিয়ে কটেজের কলিংবেল টিপতেই এক বুড়ো নেপালী দরজা খুলে দিলে। শ্রীরায় বললেন, শ্রীমতী চিত্রা বোস এই বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন। তিনি এসেছেন। নেপালী বললে যে, সে জানে। কলিকাতা থেকে খবর পেয়েছে। সে এখানকার দরোয়ান।

শ্রীরায় বললেন—"মালগুলো গেটের সামনে নামান আছে।"

দরোয়ান বললে—"আপনারা বসুন। আমি নিয়ে আসছি।"

দরোয়ান মাল আনতে চলে গেল। ওঁরা বাইরের ঘরে বসলেন। এমন সময় একটি সুন্দরী নেপালী স্ত্রীলোক ঢুকল। পরিচয় দিলে—সে এই বাড়ীর তত্ত্বাবধান করে। বেশ ভাল বাঙ্গলা বলতে পারে। বয়স প্রায় তেত্রিশ হবে। বললে—"আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর রান্না আমিই করে দেব। বাঙ্গালীদের রান্না আমি রাঁধতে জানি। আমি আপনার সব কাজ করে দেব।"

শ্রীমতী বোসের মুখ লাল হয়ে উঠল। বললেন—"তুমি ভুল করেছ নানী। উনি আমার স্বামীর বন্ধু।"

শ্রীরায় বললেন—"মানে, এই আমি ওঁকে পৌঁছে দিয়ে গেলুম। আমি তো এখানে থাকব না। হোটেলে থাকব।"

নানী কিছুক্ষণ দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে বললে—"ও। তা কর্ত্তাবাবু কবে আসবেন ?"

শ্রীরায় বেশ একটু ঘাবড়ে গেলেন। শ্রীমতী বোস ধীর-কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"কাল। আজও এসে পড়তে পারেন প্লেনে।"

শ্রীরায় তখনই সামলে নিয়ে সায় দিলেন—"হ্যাঁ, কালকে তাঁর আসবার কথা। এক সঙ্গেই আসতেন, বিশেষ কাজে আটকে পড়েছেন। তবে আজও এসে পড়তে পারেন। হ্যাঁ, বটেই তো। কাজ শেষ হয়ে গেলে প্লেনেও চলে আসতে পারেন।"

তারপর ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে বললেন—"আমি এবার চলি। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে। নানী, তুমি আমাকে একটু জল খাওয়াতে পার।"

নানী—"নিশ্চয়ই" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শ্রীরায় একটা সোফায় বসে কপালের ঘাম মুছলেন। নানীর প্রশ্নে এই ঠাণ্ডাতেও তিনি ঘেমে উঠেছিলেন। তারপর বললেন—"খুব সামলে নিয়েছ চিত্রা। কিন্তু এই লুকোচুরি আর ভাল লাগে না। আজ সমস্ত দিন রইল ভাববার। যদি মনে কোন দ্বিধা, শঙ্কা, সঙ্কোচ না থাকে তবে বিকেলে আমায় টেলিফোন করবে। আমি এভারেষ্ট হোটেলে উঠব।"

শ্রীমতী বোস ঈষৎ হেসে উত্তর দিলেন—"বার বার এক কথা বলছ কেন? ভাবা আমার শেষ হয়ে গেছে।"

শ্রীরায় উত্তেজিত হয়ে শ্রীমতী বোসকে কাছে টেনে বললেন—"এই বন্ধুর পথে চলবার সাহস যেন তোমার অটুট থাকে।"

অর্জ্জুন রায় চিত্রাকে আলিঙ্গন করলেন, এমন সময় ভেতরের দরজা দিয়ে জল নিয়ে নানী ঢুকল—আর বাইরের দরজা দিয়ে মালপত্তর নিয়ে দরোয়ান ঢুকল। দু'জনেই থমকে দাঁড়াল। তড়িৎ-স্পর্শের মত চমকে উঠে শ্রীরায় শ্রীমতী বোসকে ছেড়ে দিয়ে বললেন—"আচ্ছা, আজ তাহলে চলি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করে প্রায় ছুটে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শ্রীমতী বোস পাষাণ-প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

স্তব্ধতা ভাঙ্গল নানী। বললে—"সাহেব জল না খেয়েই চলে গেলেন ?"

সম্বিৎ ফিরে এল শ্রীমতী বোসের। উত্তর দিলেন—"তুমি বোধ হয় ভুল শুনেছ। জল তো সাহেব চান নি, আমি চেয়েছি। দাও।"

হাত বাড়িয়ে জলের গেলাস নিয়ে তিনি সেই কনকনে ঠাণ্ডা জল এক চুমুকে নিঃশেষে খেয়ে ফেললেন।

মুচকে হেসে জলের গেলাস নিয়ে নানী বললে—"মেম সাহেব, চলুন। মুখ হাত ধুয়ে নিন। রেলের কাপড়-জামা বদলান। আপনার জিনিষপত্তর শোবার ঘরের পাশের ঘরে রেখে দিতে বলছি।"

নানী দরোয়ানকে বলতে সে মালপত্র নিয়ে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল।

শ্রীমতী বোস তখনও অন্যমনস্কভাবে বসে রইলেন।

নানী আবার বললে—"চলুন মেমসাহেব। আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মুখ হাত ধুয়ে নিন।

শ্রীমতী বোস ক্লান্তকণ্ঠে বললেন—"হ্যাঁ চল।"

* * * *

মুখ হাত ধুয়ে ড্রইংরুমে বসে চিত্রা দেবী চা খাচ্ছেন। সামনে মেঝের ওপর নানী বসে। ঘরে অনেকগুলি ছবি। একটি তৈলচিত্র বেশ বড়। ছবিটি একটি মহিলার। অপূর্ব সুন্দরী। ছবিটাও অপূর্ব। মনে হচ্ছে যেন জীবন্ত। ঘরের দরজা ও জানলায় মোটা সার্টিনের পর্দা। এক ধারে টিপয়ের ওপর টেলিফোন।

নানী বললে—"আপনি চা খেয়ে একটু জিরিয়ে নিন। আমি ততক্ষণ আপনার খাবারের জোগাড় দেখি। কি রান্না করব বলুন ?"

চিত্রা দেবী উদাসভাবে বসে রইলেন। নানী আবার প্রশ্ন করলে—"কি রান্না করব বলুন ?"

চিত্রা দেবী এবার উত্তর দিলেন—"রান্না করতে হবে না। ক্ষিধে নেই। কিছু খাব না।"

নানী হেসে বললে—"খাবেন না কেন? আমি খুব ভাল রান্না করতে পারি।"

চিত্রা দেবী উত্তর দিলেন—"রান্না হয়ত' ভালই করতে পার। তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার শরীরটা ভাল নেই।"

নানী আর একবার হেসে প্রশ্ন করলে—"শরীর না মন?"

চিত্রা দেবী যেন চমকে উঠলেন। বললেন—"কি বললে?"

নানী উত্তর দিল—"কিছু না। বলছিলুম খাবেন না কেন? মন খারাপ হলে, মনে হয় ক্ষিধে নেই। কিন্তু খেতে বসলে দেখবেন ক্ষিধে রয়েছে। আমি এ রকম কত দেখেছি।"

চিত্রা দেবী একটু উষ্ণ স্বরে বললেন—"কি বলছ তুমি? কি দেখেছ?"

নানী একটু হেসে উত্তর দিল—"রাগ করছেন যখন, তবে আর আমি কিছু বলব না। চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। সকলেরই প্রথম প্রথম হয়। পরে সব সয়ে যায়।"

চিত্রা দেবী রাগতস্বরে বললেন—"যাও আমার সামনে থেকে—"

নানী আবার বললে—"এই বাড়ীতে এমন অনেক ঘটনা হয়েছে—"

চিত্রা দেবী এবার ফেটে পড়লেন—"বেরিয়ে যাও ঘর থেকে—"

নানী চায়ের বাটি নিয়ে যেতে যেতে বললে—বেশী ভাবলে মানুষের মেজাজ গরম হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখবেন, দরকার হলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। অনেককেই করেছি।"

নানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চিত্রা দেবী গুম হয়ে বসে রইলেন। চিন্তা করতে লাগলেন তাঁর বিবাহিত জীবনের কথা।

* * * *

বছর চারেক পূর্ব্বের কথা। কলিকাতার এক মেয়েদের কলেজে মিস্ চিত্রা দত্ত তখন থার্ড ইয়ারে পড়তেন। সেই সময় কলেজের এক চ্যারিটি শোতে মেয়েরা অভিনয় করে। নাটকের নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছিল সে। অনেক গণ্যমান্য এবং ধনী ব্যক্তিরা এসেছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে। রাজীব বোসও তাঁদের মধ্যে একজন। তারপরই তার বিয়ের সম্বন্ধ আসে। পাত্র এই রাজীব বোস। লোকে বলে যুদ্ধের সময় কালো বাজারে অগাধ পয়সা করেছিল। অবশ্য শ্রীবোস বলেন, ব্যবসা করে পয়সা। লোহার ব্যবসা। দেশের শিল্পপতিদের একজন। ভদ্রলোক বিপত্নীক। ছেলেপুলেও নেই। বয়স হয়ত' একটু বেশী। পঁয়তাল্লিশের কাছে। তা হোক। স্বাস্থ্যবান চেহারা। চিত্রার বাবা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। আরও ছ'টি অনূঢ়া কন্যা বাড়ীতে রয়েছে। তিনি এ সম্বন্ধ লুফে নিলেন। রাজীবের সঙ্গে চিত্রার বিয়ে হয়ে গেল।

প্রথম দিকে সে যেন এক মধুর স্বপ্ন। ধরায় স্বর্গ। চিত্রা খুশীতে উচ্ছল। মন-ময়ূর সব সময়েই যেন পেখম তুলে নৃত্য করছে। কিন্তু সে আনন্দ স্বল্পস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর। ছ'মাসেই ফুরিয়ে গেল। স্বর্গ থেকে চিত্রা পড়লেন ধরার বুকে নয়, নরকের গভীর গহ্বরে, লেলিহান বহ্নি-শিখার মাঝে।

রাজীব বোস লৌহ-ব্যবসায়ী। যত বড় বড় কাজ কলিকাতায় বা কাছে-পিঠে হয়, সর্ব্বত্রই প্রায় তিনি লোহা জোগান দেন। তাঁর এই রকম একচেটিয়া কাজ পাবার পিছনে আছে এক গূঢ় রহস্য। সেই রহস্যই হ'ল চিত্রার কাল। প্রায়ই তিনি পার্টি দেন সহরের গণ্যমান্য, আভিজাত ধনীদের। সেইখানে স্ত্রীর সঙ্গে সকলের আলাপ করিয়ে দেন। অবশ্য চিত্রার অমত থাকলেও বাধ্য হয়ে রাজী হতে হয়েছে। গরীবের মেয়ে। যাবেন কোথায়? বহু প্রস্পেক্টিভ ক্লায়েন্টের বাড়ী বোস মশাই সস্ত্রীক গেছেন আলাপ করতে। যতবার নতুন কণ্ট্র্যাক্ট পেয়েছেন, স্ত্রীকে নতুন কোন প্রেজেন্ট দিয়েছেন। চিত্রা চুপ করে সহ্য করে গেছেন। কিন্তু ব্যবসা মন্দা পড়াতে রাজীববাবু স্ত্রীর কাছ থেকে আরও বেশী আশা করেছিলেন। মাছ ধরতে গেলে টোপ লাগে। চিত্রা বেঁকে বসেন। তাই থেকে মনোমালিন্য, অশান্তি, গালমন্দ, ইতরামী। শেষে চরিত্রের অপবাদ। সেই সময় আলাপ হয় শ্রীঅর্জুন রায়ের সঙ্গে।

শ্রীঅর্জুন রায় কলিকাতার একজন নামজাদা ধনী। ভারতময় তাঁর ব্যবসা ছড়ানো। বিলাতেও শাখা আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কন্টিনেণ্ট থেকে ফিরেছেন। সেখান থেকে

প্ল্যান করিয়ে এনেছেন, সহরতলীতে এক নতুন বাড়ীর জন্য। অনেক টাকা খরচ করবেন। খবর পেয়ে চিত্রাকে নিয়ে রাজীববাবু শ্রীঅর্জুন রায়ের বাড়ী গিয়ে হাজির। যেন দেখা করতে এসেছেন। একথা সেকথার পর যেন কৌতুহলী হয়ে বিদেশের তৈরী প্ল্যান দেখতে চাইলেন। দেখে বহু প্রশংসা করলেন। পরদিন ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন। তারপর প্রায়ই যাওয়া-আসা। শেষে একদিন স্ত্রীকে শ্রীঅর্জুন রায়ের বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে, "একটা দরকারী কাজ সেরে এখুনি আসছি" বলে বেরিয়ে গেলেন।

রাজীববাবুর ব্যবহারে শ্রীরায় খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। কাজ আদায়ের জন্য স্ত্রীকে এগিয়ে দেওয়া তিনি বিদেশেও দেখেন নি। গৃহলক্ষ্মীকে লক্ষ্মীর জন্য পণ্য, কল্পনাও করা যায় না। তাই তিনি চিত্রাকে হাতের কাছে পেয়েও কোন সুযোগ সুবিধা নিলেন না। বরং তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। চিত্রা বিগত কিছুকাল যাবৎ শুধু অবজ্ঞা এবং অশ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন। লালসার চাহনি তাঁকে মৃতপ্রায় করে তুলেছিল। তাই শ্রীরায়ের শ্রদ্ধা ও ভদ্র আচরণ তাঁকে শুধু সঞ্জীবিতই করেনি, মনটাকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছিল। শ্রীরায়ের সহানুভূতি টেনে বার করে নিল তাঁর দুঃখময় জীবনের কথা। রাজীববাবুর ট্রেড সিক্রেট প্রকাশিত হয়ে পড়ল। শ্রীরায় তবুও যে কণ্ট্রাক্ট রাজীববাবুকেই দিলেন, সে শুধু চিত্রার সম্মানার্থে। আর সঙ্গে উভয়ের হৃদয় বিনিময় হয়ে গেল নিজেদের অজ্ঞাতসারেই।

অর্জুন রায় তাঁকে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, নরকের পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করেছেন, তাঁকে নূতন জীবন দিয়েছেন, হৃদয়ের অন্ধকার প্রেমের আলোকে দূর করেছেন। একথা তিনি ভুলতে পারেন না। চাঁদকে রাহু মুক্ত করেছেন; মুক্তিদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভালবাসা স্বাভাবিক। না, আর ভাববার কিছু নেই। শ্রীরায়কে ডাকবার জন্য তিনি টেলিফোন তুলে নিলেন।

টেলিফোনে কোন স্পন্দন নেই। বিরক্ত হয়ে নানীকে ডাকলেন। টেলিফোনের কথা জিগ্যেস করতে সে বললে, —"বাড়ী খালি থাকলে কেটে দেওয়া হয়। আপনি এসেছেন, কাল লাগিয়ে দিয়ে যাবে।"

চিত্রা দেবী চিন্তিত হয়ে বললেন—"কিন্তু আমার যে এখনই প্রয়োজন ছিল।"

নানী উত্তর দিলে—"এক কাজ করতে পারেন। আপনি যদি একটা চিঠি লিখে দেন, আর কোথায় কার কাছে নিয়ে যেতে হবে বলে দেন, তবে বুড়োকে দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চিত্রা দেবী বললেন—"বেশ তাই হোক।"

শ্রীরায়কে আসবার অনুরোধ জানিয়ে চিত্রা দেবী চিঠি লিখলেন। খামে পুরে ঠিকানা লিখে নানীর হাতে দিলেন। চিঠি নিয়ে বুড়ো দরোয়ান চলে গেল। চিত্রা গেট অবধি এসে ফিরে গেলেন।

শ্রীরাজীব বোস ব্যবসা-সম্পর্কীয় বিশেষ কাজে দিল্লী গিছলেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে শ্রীমতী বোস দার্জিলিঙে চলে এসেছেন শ্রীঅর্জুন রায়ের সঙ্গে। যেদিন তাঁরা কলিকাতা ত্যাগ করেন সেইদিন বিকেলেই অপ্রত্যাশিতভাবে রাজীববাবু কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। দিল্লীতে যে কাজের জন্য গিছলেন তা সফল হয় নি। ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরেছেন। তবে কি সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁকে ত্যাগ করবেন! গৃহে ফিরে দেখেন গৃহলক্ষ্মীও তাঁকে ত্যাগ করেছেন। ক্ষুণ্ণমন উষ্ণ হয়ে উঠল। না, পরাজয় তিনি স্বীকার করবেন না। যেন তেন প্রকারেণ কার্য্যসিদ্ধিই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। উভয় লক্ষ্মীকেই তিনি পুনরায় করতলগত করবেন। খোঁজ নিয়ে পরদিন সকালের প্লেনে তিনি দার্জিলিং যাত্রা করলেন।

'দৈবাৎ'এর ওপর মানুষের হাত নেই। জীবনের অধিকাংশ ঘটনা দৈবাৎ ঘটে। সেই জন্যই মানুষ দৈবকে এতটা বিশ্বাস করে। চিত্রার সন্ধানে সমস্ত বিকেলটা দার্জিলিঙের এদিক ওদিক ঘুরে প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ তাঁর উদ্দেশ্য সফল হ'ল। অকল্যাণ্ড রোড দিয়ে চারিধারে চাইতে চাইতে যাচ্চেন এমন সময় তাঁর নজর পড়ল 'তুষার ভিলার' দিকে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বুড়ো দরোয়ান চিঠি নিয়ে যাচ্ছে। চিত্রা গেট অবধি এসে ফিরে গেলেন। অদ্ভুত যোগাযোগ। কিন্তু জীবনে এই রকম ব্যাপারই ঘটে যার ওপর কোন হাত নেই। রাজীববাবু দরোয়ানের পিছু নিলেন। একবার ভাবলেন, দরোয়ানের কাছ থেকে

চিঠিটা কেড়ে নেবেন। কাকে লিখেছে? তারপর চিঠি নিয়ে চিত্রার কাছে গিয়ে জবাবদিহি চাইবেন। আবার ভাবলেন, তার চেয়ে বেশী নাটকীয় হবে হাতে-নাতে ধরা। চিঠি পেয়ে চিত্রার প্রেমিক নিশ্চয়ই চিত্রার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। তাঁদের রোমান্টিক পরিস্থিতির মধ্যে তিনি ধূমকেতু সম আত্মপ্রকাশ করবেন। এক সঙ্গে দু'জনকেই হাতের মুঠোয় পাবেন। পরে এঁদের দিয়ে অনেক কাজ পাওয়া যাবে। হয়ত' উভয় লক্ষ্মীই উদ্ধার করতে পারবেন। দ্বিতীয় প্ল্যানটাই তাঁর পছন্দ হ'ল। মনে বেশ তৃপ্তি পেলেন।

শ্রীঅর্জুন রায় বিকেল থেকে প্রতীক্ষা করছেন চিত্রা দেবীর কাছ থেকে সংবাদ পাবার। সন্ধ্যা নাগাদ আর ঘরে থাকতে না পেরে হোটেলের সামনে পদচারণা করছেন, এমন সময় চিত্রার দরোয়ান তাঁকে গিয়ে চিঠি দিল। পথের ধারে ল্যাম্পপোষ্টের নীচে দাঁড়িয়ে তিনি চিঠিটা পড়লেন। দূর থেকে রাজীববাবু চিনে নিলেন চিত্রার প্রেমিককে। কার সঙ্গে চিত্রা গৃহত্যাগ করেছেন। সৌভাগ্য বলতে হবে। শাঁসাল মক্কেল। অনেক টাকা আদায় হবে। দ্রুতপদে "তুষার-ভিলা"য় ফিরে গেলেন। পথের ধারে আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন সেই শুভ মুহূর্ত্তের—যখন প্রেমিক যুগলকে তিনি হাতে-নাতে ধরতে পারবেন। একেবারে ড্রামাটিক ক্লাইম্যাক্স।

দরোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে অর্জুন রায় চলেছেন "তুষার-ভিলা"য়। বেশ জোরে হাঁটছেন, বুড়ো তাল রাখতে পারছে না। প্রায় ছুটে চলেছে। হঠাৎ পড়ে গিয়ে তার পা মচকে গেল। অগত্যা অর্জুন রায়কে থামতে হ'ল। বুড়ো মানুষকে তো পথে ফেলে রেখে যেতে পারেন না। একটা রিক্সা জোগাড় করে তাকে নিয়ে ডাক্তারখানায় গেলেন। সেখানে ফার্ষ্ট এইডের পর রিক্সায় করে "তুষার-ভিলা" রওনা হলেন।

ওদিকে রাজীববাবু অপেক্ষা করছেন তো করছেনই। শ্রীঅর্জুন রায়ের দেখা নেই। হঠাৎ তাঁর মনে সন্দেহ হ'ল, পেছনের কোন দরজা দিয়ে অর্জুন রায় হয়ত ভেতরে প্রবেশ করেছেন। তাড়াতাড়ি তিনি বাড়ীর ভেতরে ঢুকে ড্রইংরুমে উপস্থিত হ'লেন।

ঘরটায় অত্যন্ত মৃদু আলো। ভালভাবে সব দেখা যাচ্ছে না। সোফায় চিত্রা একা বসে। চিন্তামগ্না। বাইরে আগন্তুকের পদ শব্দে চিত্রা চমকে উঠে বললেন,—"এত দেরী যে?"

ঘরে ঢুকে হো হো করে আগন্তুক হেসে উঠলেন। শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—"তুমি কি এতক্ষণ আমারই প্রতীক্ষা করছিলে। সতীসাধ্বী নারীর মত স্বামীর পথ চেয়ে বসেছিলে?"

চিত্রা চিনলেন, আগন্তুক শ্রীঅর্জুন রায় ন'ন, রাজীব বোস। কাষ্ঠপুত্তলিবৎ আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন।

ধীর পদক্ষেপে রাজীব বোস চিত্রার কাছে এগিয়ে এসে বললেন—"বল, তোমার প্রেমিক কোথায়?"

ক্ষীণ স্বরে চিত্রা উত্তর দিলেন—"কি বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

রূঢ় কণ্ঠে রাজীববাবু বললেন—"ন্যাকামী রাখ। আমার কথার ঠিক ঠিক উত্তর দাও। অর্জুন রায় কোথায়?"

চিত্রার মুখ দিয়ে অতি কষ্টে বার হল—"আমি জানি না।"

রাজীববাবু চিত্রার হাত ধরে টানতে যাবেন এমন সময় নানী ঘরে ঢুকল। বললেন—"কিসের গোলমাল মেমসাহেব?" তারপর রাজীববাবুর দিকে নজর পড়তে প্রশ্ন করল—"ইনি কে?"

চিত্রার কোন উত্তর দেবার পূর্বেই রাজীববাবু শ্লেষমাখা স্বরে বললেন—"আমি তোমাদের মেমসাহেবের পতি। উপপতিটি কোথায় জানতে চাইছি।"

নানী যেন কিছুই বোঝে নি এমন ভাণ করে বললে—"কি বলছেন আপনি?"

গর্জে উঠলেন রাজীব বোস। চিত্রার দিকে দেখিয়ে বললেন,—"অর্জুন রায়কে উনি চিঠি লেখেন নি?"

নানী হেসে উত্তর দিলে,—"ও! এইবার বুঝতে পেরেছি। রায় সাহেবকে তো আমি চিঠি লিখে দরোয়ানের হাতে তাঁর হোটেলে পাঠিয়েছিলুম।"

রাজীব বোস একটু দমে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—কেন?" ভাবলেন চিঠিটা কেড়ে নিলেই ভাল হ'ত।

নানী উত্তর দিলে, "মেমসাহেব এসেছেন এই খবরট দিতে। আর টেলিফোনের ব্যবস্থার কথাও লিখেছিলুম।'

রাজীববাবু অবিশ্বাসের সুরে বললেন—"তুমি লিখতে জান ?"

নানী আবার হেসে ফেললে। উত্তর দিলে—"আই ওয়াজ ব্রট আপ ইন এ কনভেণ্ট।"

রাজীব বোস একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেলেন। তবু আর একবার চেষ্টা করলেন—"এত রাতে জানাবার কারণ ?"

নানী শান্তভাবেই উত্তর দিলে—"কারণ তিনি সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরেছেন। একটা কাজে লেবঙ্গে গিছলেন। কাল ভোরেই আবার কালিম্পং চলে যাবার কথা আছে।"

শেষ প্রশ্ন করলেন,—"বাড়ীটা কি অর্জুন রায়ের ?"

নানী জবাব দিলে,—"না, বাড়ীটা তাঁর এক বন্ধুর ছিল। এখন আমার। আমি তাঁর বন্ধুর বিধবা।"

তারপর সে প্রশ্ন করলে,—"কিন্তু আমাকে এমনভাবে জেরা করবার কারণ কি ? আর ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকে এ রকম সীন করবার কি অধিকার আপনার আছে জানতে পারি কি ?"

একেবারে মুষড়ে পড়ে রাজীব বোস উত্তর দিলেন—"ক্ষমা করবেন, আমার আচরণের জন্য আমি দুঃখিত।"

নানী বললে, "আপনি বসুন। আমি চা করে আনি। ঘরটা বড্ড অন্ধকার রয়েছে। আলো জেলে দিই। কি বলেন ?"

রাজীববাবু একটা শোফায় বসলেন। নানী আলো জেলে দিল। তীব্র আলোয় ঘর ভরে উঠল।

এতক্ষণ রাজীববাবু ঘরের কিছুই দেখতে পান নি। বড় তৈলচিত্র তাঁর পিছন দিকে ছিল। এইবার সোফায় বসতে সেই দিকে তাঁর নজর পড়ল। যেন সামনে ভূত দেখেছেন এইভাবে লাফিয়ে উঠে ভীত কণ্ঠে বললেন,—"ও কে ? কার ছবি ?"

নানী বিস্মিত হয়ে বললে,—"আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন ? ও আমার এক দূর সম্পর্কীয় ননদের ছবি। আমার স্বামী বলেছিলেন, বোনকে হত্যা করা হয়েছে।"

"না, না, মিথ্যা কথা। সে দৈব দুর্ঘটনায় মারা গেছে।" এই পর্য্যন্ত বলেই নিজেকে সামলে নিয়ে রাজীববাবু প্রশ্ন করলেন,—"এঁকে কে হত্যা করেছে বলে আপনাদের ধারণা ?"

নানী দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলে,—"এর স্বামী শ্রীরাজীব বোস।"

একটা তীব্র আর্ত্তনাদ করে চিত্রা দেবী দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকলেন।

তীক্ষ্ণ স্বরে রাজীববাবু চীৎকার করে উঠলেন, "মিথ্যা কথা। ষড়যন্ত্র। সে দৈবাৎ পড়ে গিয়ে মারা যায়। আমি তার মৃত্যুর জন্য দায়ী নয়। না, না, আমি খুন করি নি—"

নানী জোর গলায় উত্তর দিলে,—"আপনার আচরণই স্বীকারোক্তির শামিল।"

রাজীববাবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,—"মোটেই না। আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। অর্জুন রায়ের পরামর্শে আপনি আর আমার সাধ্বী স্ত্রী চিত্রা দেবীতে মিলে এই গল্প ফেঁদেছেন। কই, আপনার বা আপনার স্বামীর বিষয়ে আমি তো পূর্বে কখনও কোন কথা শুনি নি। আপনাদের দেখিও নি।"

ম্লান হেসে নানী উত্তর দিলে,—"আমাকে বিয়ে করার জন্য তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, তাই তিনি এই বাড়ীটা কিনে চিরটাকাল এইখানেই কাটিয়েছেন নির্বাসিতের মত। তবে তিনি সকলের খবরাখবর রাখতেন। আপনার বিয়ে, শ্বশুরের কাছ থেকে ক্রমাগত টাকা নেওয়া এবং শেষে দোহন বন্ধ হয়ে যেতে আপনার স্ত্রীর অকস্মাৎ মৃত্যু, সবই আমরা জানতুম। আপনার স্বর্গতা স্ত্রী নিজেই চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন।"

রাজীববাবু শ্লেষের সঙ্গে বললেন,—"এত লোক থাকতে আপনাকে জানাতে গেলেন কেন ?"

নানী জবাব দিলে,—"তার কারণ আমার মা তাঁর আয়া ছিলেন। আমি ও তিনি এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি। এক সঙ্গে স্কুলে পড়েছি। আপনার শ্বশুর মহাশয় এ বিষয়ে খুব উদার ছিলেন। তাঁরই বাড়ীতে আমার ভবিষ্যৎ স্বামীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মা কাজে অবসর গ্রহণ করে দার্জিলিং চলে আসার পর এইখানে আমার বিয়ে হয়। তারপর থেকে আমাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকে যায়। কিন্তু আপনার স্ত্রী আমায় ভোলেন নি। তিনি আমার চেয়ে বয়সে তিন চার বছরের ছোট হলেও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাই যে সকল কথা আর

কাউকে জানানো যায় না, তাই তিনি আমায় জানিয়েছিলেন।

রাজীববাবু আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না, নানীর ওপর উন্মত্তের মত লাফিয়ে পড়লেন। চীৎকার করে উঠলেন,—"তবে তুমিও মর।" এই বলে নানীর গলা টিপে ধরলেন। চিত্রা তাঁদের টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন, আর চেঁচিয়ে বুড়ো দরোয়ানকে ডাকতে থাকলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরোয়ানকে নিয়ে শ্রীঅর্জুন রায় ঘরে ঢুকলেন। দরোয়ান বাইরে থেকেই চিত্রার ডাক শুনতে পেয়ে "হুজুর" বলে সাড়া দিয়েছিল। ঘরে ঢুকে এই ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত। অর্জুন রায় তাড়াতাড়ি এগিয়ে রাজীববাবুর হাত থেকে নানীকে মুক্ত করলেন। রাজীববাবু উন্মাদের মত "খুন করব, সবাইকে খুন করব" বলে অর্জুন রায়কে আক্রমণ করলেন। চিত্রা যেন পাথর হয়ে গেছেন।

নানী চীৎকার করছে—"দরোয়ান, পুলিশ ডাক।" হঠাৎ রাজীববাবু হাত পা এলিয়ে ধপ করে মেঝেয় পড়ে গেলেন। সকলে এগিয়ে দেখলেন প্রাণহীন মৃতদেহ।

চিত্রা ক্ষীণকণ্ঠে বললেন,—"হার্ট খারাপ ছিল।"

অর্জুন রায় টেবিলক্লথ দিয়ে মৃতের মুখ ঢাকা দিয়ে বললেন, "ডাক্তারকে খবর দিতে হবে। কোন জিনিষে হাত দিও না! আমি এখনই আসছি।"

অর্জুন রায় বেরিয়ে গেলেন। চিত্রা নানীর বুকে মুখ লুকিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। বুড়ো দরোয়ান দরজার কাছে বসে পড়ল।

ইচ্ছাশক্তি

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ইচ্ছাশক্তি বা soul-force শুধু কথার কথা নহে। যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমরা অবিশ্বাস করি কিরূপে? এই সেদিন চোখের উপর যাহা দেখিলাম, যে অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তির পরিণতি দেখিয়াছি—মহাত্মা গান্ধী একক লোক—তাও খুব বলিষ্ঠ নহেন,—তাঁহার মধ্যে, সেই জীর্ণ শীর্ণ শরীরের মধ্যে যে অপূর্ব্ব প্রাণশক্তি দেখিয়াছি তাহা আমাদের মনকে মুগ্ধ, স্তম্ভিত, নির্ব্বাক করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই অদ্ভুত ঘটনার কার্য্যকারণ সম্পর্ক কেহ বিচার করিল না। হইতে পারে যে, তিনি রাজনৈতিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, হইতে পারে যে তাঁহার ইচ্ছায় জনসাধারণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হইয়াছিল। কিন্তু, তাহা হইলেও এই অপূর্ব্ব মানুষটির মাঝে এরূপ তেজ, এরূপ ইচ্ছাশক্তি বা এরূপ যোগবল কিরূপে আসিল, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ অনুসন্ধান করে নাই। এই একজন লোক যিনি যখন যাহা বলিয়াছেন, ইচ্ছাশক্তির বলে তাহাই সমাধান করিয়াছেন। যদি তাঁহার পরমায়ু এরূপ সাংঘাতিকভাবে নির্মম ঘাতকের হস্তে শেষ না হইত, তাহা হইলে আরোও কত কি দেখিতে পাইতাম!

সুফীরা বলেন যে, কতকগুলি লোক ভগবানের দর্পণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সুন্দরী যুবতী যেমন নির্মল দর্পণে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দলাভ করেন, ভগবানও সেইরূপ মানুষের মধ্যে নির্মল, পবিত্র এবং শুচি ও স্বার্থের দ্বারা অকলুষিত চিত্ত যেখানে দেখেন, সেখানেই তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়। ভারতবর্ষে এরূপ বহুলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যদিও তাঁহারা সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। কিন্তু আমরা এমন একজন লোক দেখিলাম যাঁহার নির্মল চরিত্র, শুচিশুদ্ধ চিত্ত এবং স্বার্থলেশশূন্য কর্ম ভগবানকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহা না হইলে এত শত সহস্রলোকের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি তিনি পাইতে পারিতেন না।

মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় যে অসহযোগ আন্দোলন ১৯০৬-৭ সালে আরম্ভ করেন তাহা রাশিয়ান গ্রন্থকার কাউণ্ট টলষ্টয়ের আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। মহাত্মা ইহাকে সত্যাগ্রহ নাম দিয়াছিলেন। আমাদের এই শতাব্দীর দুইজন মহাপুরুষ হইলেন—টলষ্টয় ও গান্ধী। এই দুই মহাজন একই কথা বলিয়াছেন। টলষ্টয়ের শিক্ষা এই যে, কোনও অবস্থায়ই হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে; বিশেষতঃ, প্রতিহিংসা হিসাবে কোনওরূপ শাস্তি বা হিংস্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। লেনিন (Lenin) টলষ্টয়ের মতের সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতেন। কিন্তু, তিনি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন হিংসার দিকে। পাপ বা অপরাধের বিরুদ্ধে কোনও হিংসামূলক প্রতিবিধান গ্রহণ করা টলষ্টয় এবং গান্ধীর উভয়ের মতেরই প্রতিকূল। জার্মাণ দার্শনিক নীটশেও (Niatshe) ইহাদের সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু, তাঁহার মত একেবারে ভিন্ন ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন—এমন এক সভ্যতার যুগ আসিবে, সে সময়ে পৃথিবীতে

একদল প্রভুশ্রেণীর লোক জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাই যে সমস্ত লোক দুর্ব্বল, তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিবে। সে জাতি হইবে জার্ম্মাণরা। ইহাদের নীতি হইবে সবলের নীতি। যীশুখ্রীষ্ট যে কথা বলিয়াছিলেন—কেহ যদি তোমার উপরে অত্যাচার করে তাহা হইলে অত্যাচার দ্বারা তার প্রতিশোধ দিতে চেষ্টা করিবে না। এই খ্রীষ্টীয় নীতি নীট্‌শের নিকট দুর্ব্বলের নীতি বা দাসের মনোবৃত্তি (Slave mentality) বলিয়া পরিগণিত হইল। এই দুর্ব্বলের নীতি সংসার-ত্যাগী বৈরাগীর নিকট আদরণীয় হইতে পারে কিন্তু সবলের নিকট নহে। নীট্‌শে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মারা যান। ইহারই অল্পদিন পরে মহাত্মা গান্ধী টলষ্টয়ের আদর্শে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন তাহা যীশুখ্রীষ্টের মতের সর্ব্বথা অনুযায়ী। অত্যাচার যতই হোক না কেন, নিপীড়ন যতই কঠোর হোক, তাহাকে সহ্য করাই অসহযোগ আন্দোলনের মূলমন্ত্র।

কিন্তু এ শুধু খ্রীষ্টীয় আদর্শ নহে বা টলষ্টয়ের অপ্রতিরোধ নীতিও নহে, ইহা ভারতবর্ষের সনাতন উপদেশ। বৌদ্ধ উপদেশ সমূহে ইহার বারম্বার উল্লেখ আছে :—

নহি বৈরাণি বৈরেণ শাম্যন্তি
অবৈরেণ চ শাম্যন্তি এষ ধর্ম্মঃ সনাতন॥ ধর্ম্মপদ

হিংসার দ্বারা কখনও হিংসার শান্তি হইতে পারে না। অহিংসার দ্বারা শত্রুতার সাম্য হইতে পারে।

শুধু তাহাই নহে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম বলে যে,—

উপকারিষু যঃ সাধুঃ সাধুত্বে তস্য কো গুণঃ।
অপকারিষু যঃ সাধুঃ সঃ সাধুঃ সদ্ভিরুচ্যতে॥

অর্থাৎ যে উপকার করে তাহার প্রত্যুপকার করিলে মহত্ব হইল না। যে অপকার করে তাহার প্রতিউপকার করিলে সাধু লোকেরা তাহাকেই প্রকৃত সাধুতা বলেন। ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে প্রাচীন-কাল হইতে এই যে ধারা চলিয়া আসিতেছিল, তাহাতেই গান্ধীবাদ এত সার্থকতালাভ করিয়াছিল।

টলষ্টয়ের মতবাদ রাশিয়ায় সেরূপ সার্থক হয় নাই। কারণ আমরা দেখি যে তাহারই সমকালে সাম্যবাদীদের (Communist) অভ্যুত্থান হইয়াছিল। এই কম্যুনিষ্টরা অহিংস প্রতিরোধে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন বর্ত্তমান সমাজনীতি ধনিকদের (Capitalist) নীতি। এই নীতির পরিবর্ত্তন সাধন করিতেই হইবে। তাহা না হইলে দরিদ্র নিঃস্ব শ্রমিকদের কোন উন্নতি সম্ভব নহে। সুতরাং ধনিকদের এই নীতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, যে কোন উপায়ে হোক। অসংখ্য নরবলির দ্বারা অরাজকতা ও লুণ্ঠন প্রভৃতি হিংস্র উপায়ে করিতে হইলেও, তাহা করিতে হইবে। টলষ্টয় এই ধনিকদের অত্যাচার দেখিয়া এবং দরিদ্র, নিঃস্ব শ্রমিকদের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতেন। কিন্তু তাহার মতের অনুসরণে রাশিয়ানরা হিংসা ভুলিতে পারিল না। ফলে এই হইল যে এই সব বলশেভিক ও কম্যুনিষ্টরা যে অত্যাচার করিল ও অরাজকতার সৃষ্টি করিল, ইতিহাসে তাহার তুলনা মেলে না। অথচ ঋষি টলষ্টয়ের বই দুই কোটি ষাট লক্ষ শুধু রাশিয়াতেই বিক্রি হইয়াছিল। যদিও কম্যুনিষ্টরা অহিংস প্রতিরোধের ভাবধারা অনুসরণ করে নাই, তাহা হইলেও টলষ্টয়ের লেখার একটি সুফল এই হইল যে রাশিয়ানদের মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকের সংখ্যা বাড়িয়া গেল। কম্যুনিষ্টরা কোন ধর্ম্ম মানে না। কিন্তু ইহাদের নিষেধ সত্ত্বেও রাশিয়ার গির্জ্জাসমূহে লোকের ভীড় বাড়িয়াই চলিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, রাশিয়ানদের মতো খৃষ্টধর্ম্মবিশ্বাসী লোক ইয়োরোপে বিরল।

টলষ্টয়ের লেখা এত সুন্দর যে তিনি ঋষি আখ্যা পাইয়াছিলেন। শুধু যে তাঁহার লেখার সৌন্দর্য্যগুণে তাহা নহে, তিনি ভারতবর্ষীয় ঋষিদের সঙ্গে সুর মিলাইয়া তাঁহার জীবনদর্শনে বৈরাগ্যের সুর আনিয়া ফেলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাহার একটি উদাহরণ অতি সুন্দর—একেবারে হুবহু প্রাচ্য আদর্শের অনুরূপ। তিনি উদাহরণ দিয়াছেন একজন পর্য্যটকের। পর্য্যটক এক ভয়ানক সিংহের দ্বারা তাড়িত হইয়া পড়িল গিয়া এক কূপের মধ্যে। কিন্তু দেখিল সে কূপটিও নিরাপদ নহে—এক ড্রাগন বা রাক্ষসের বাসস্থান। তখন সে চারিদিক চাহিয়া দেখিতে পাইল, একটি বৃক্ষের ডাল কূপের মাঝে প্রসারিত হইয়া আছে। সে তখন নিরুপায় হইয়া বৃক্ষের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল এবং কিছুক্ষণ পরে ডাল হইতে মিষ্ট রস ক্ষরিত হইতেছে দেখিতে পাইল। সে সেই মিষ্ট রসের দ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে সে দেখিল এক কালো ইঁদুর ও একটি সাদা ইঁদুর ডালটি কাটিয়া দিতেছে। তাহাতে সে বুঝিতে পারিল, ইঁদুর দুটির ডাল কাটা শেষ হইলে সে ড্রাগনের মুখে পড়িবে। এখন, ঐ বৃক্ষটি হইল জীবন-বৃক্ষ। কালো ইঁদুর ও সাদা ইঁদুর হইল দিন ও রাত্রি। এই দিন ও রাত্রি মিলিয়া তাহার পরমায়ু শেষ করিয়া দিতেছে। ডাল হইতে যে রসধারা পড়িতেছে, তাহা হইল জীবনের নশ্বর সুখ। এইরূপ উদাহরণের দ্বারা পাশ্চাত্ত্য জীবনের নশ্বরতা ও পরিণামে মৃত্যু বুঝাইতে চাহিতেছেন।

কিন্তু আমার এ স্থলে বক্তব্য যে তাঁহার প্রচারিত অপ্রতিরোধ (Non-resistance) যাহা গান্ধীজী সত্যাগ্রহ নামে কাজে লাগাইলেন, তাহা এক অপূর্ব্ব শক্তিশালী অস্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ এরূপ শক্তিশালী, বিনা অস্ত্রশস্ত্রে যুদ্ধ আর কখনও হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই।

ইহা যখনই মনে করি তখনই আমরা আমাদের সৌভাগ্য সম্বন্ধে শ্লাঘা বোধ করিয়া থাকি। মহাত্মা গান্ধীর সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব হইতেছে এই যে, তিনি যখন 'ভারত ছাড়' বলিয়া হুঙ্কার দিলেন—সে হুঙ্কারে সমগ্র দেশ কাঁপিয়া উঠিল এবং আসমুদ্র-হিমাচল তাঁহার অহিংস মতে চঞ্চল হইয়া উঠিল। বৃটিশ রাজের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য তখন প্রায় মধ্যাহ্ন গগনে বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু সে শক্তিও টলমল করিয়া উঠিল।

নাগপুরে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন বসে তখন মিষ্টার সি, আর,

দাশ তাঁহাকে ভোটে পরাস্ত করিবার মানসে অর্দ্ধ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে তিনি বহু প্রতিনিধি লইয়া কংগ্রেসে যোগদান করেন। একটি ঘটনা শুনিয়াছি এবং চমৎকৃত হইয়াছি। মহাত্মা গান্ধী মিষ্টার দাশকে একাকী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমন্ত্রণ করেন। মিষ্টার দাশের সঙ্গে নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বোধহয় জে, এম, সেনগুপ্তও ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর কাছাকাছি যাইতে সেদিনে তাঁহাকে বলা হইল যে, গান্ধীজী একাকী তাঁহার সহিত দেখা করিতে চান। তিনি তাঁর সঙ্গীদিগকে বলিলেন, আমি এখনই আসিতেছি এবং সম্ভবতঃ তোমাদের এখনই ডাকিয়া পাঠানো হইবে। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইল, কিন্তু মিষ্টার সি, আর, দাশের কোন সংবাদই নাই। সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া পাঠাইবেন বলিয়া জেদ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও আর ডাকিয়া পাঠানো হইল না। শেষকালে যখন দেশবন্ধু ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার চোখমুখ দেখিয়া বুঝা গেল মন্ত্র-দীক্ষা হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীকে যে ভোটে হারাইয়া দেওয়া যাইবে সে সংকল্প আর রহিল না।

সেইদিন হইতেই এদেশে বৃটিশ রাজের আসন টলিল।

সামাজিক সংহতি

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

ধরাপৃষ্ঠ হতে যে সব প্রাচীন সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, যার একমাত্র উল্লেখ হয়তো আছে সাহিত্য বা ইতিহাসের পাতায়, সেই সব সভ্যতার বিলুপ্তির অন্যতম কারণ হচ্ছে—শ্রেণী-বৈষম্য এবং সামাজিক সংহতির অভাব। মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ যখনই অস্বাভাবিক, বিকৃত ও বৈরকার হয়ে দাড়িয়েছে তখনই দেখা দিয়েছে সভ্যতার সৌধে ধ্বংসের বিরাট ফাটল। একটা খুব বড় দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় ভারতবর্ষের ইতিহাস হতেই। মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে তদানীন্তন হিন্দুসমাজে দেখা দিয়েছিল তেমন একটা অবস্থা। সনাতন গুণ-কর্ম-বিভাগ বা বর্ণাশ্রমপ্রথা বিকৃত হয়ে সঙ্কীর্ণ জাতিবিচারে পরিণত হয়েছিল। তথাকথিত উচ্চ বর্ণীয়দের উৎপীড়নে নীচজাতিদের মধ্যে জেগে উঠেছিল একটা ত্রাহি-ত্রাহি ভাব। সমাজের সংহতি প্রায় বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা মুক্তির আশায় আক্রমণকারী বিদেশীয়গণকে পর্যন্ত সাদরে বরণ করে নিতে কুণ্ঠা বোধ করে নি। বখ্‌তিয়ার খিলজীর বাংলা আক্রমণের পূর্বেই সারা দেশ ছদ্মবেশী পঞ্চমবাহিনীর চরে ছেয়ে গিয়েছিল। হিন্দুবিদ্বেষী বৌদ্ধ শ্রমণের দল অনুপ্রবেশ করেছিল সমাজের আনাচে কানাচে। আভ্যন্তরীণ অনৈক্য বৈদেশিক আক্রমণকারীর আগমন পথ অপেক্ষাকৃত সহজ করে তুলেছিল। বিদেশীর বিধর্মীর হাতে ব্রাহ্মণ-প্রমুখ উচ্চশ্রেণীর লাঞ্ছনা সেকালের প্রোলেটারিয়েট কবির কাব্যানুপ্রেরণা জুগিয়েছে। সেকালের সমাজচিত্রে দেশের এই শোচনীয় ঐক্যহীন অবস্থাটা বেশ প্রকট হয়ে রয়েছে। দেশ ও সভ্যতার সেই সঙ্কটের দিনে অভাব ঘটেছিল জাতীয় সংহতির, অভাব ঘটেছিল দেশাত্মবোধের, অভাব ঘটেছিল সমাজ-চেতনার। হিন্দুভারতের পতনের একটা বড় কারণ ছিল আভ্যন্তরীণ জাতি-বিরোধ ও শ্রেণী-বৈষম্য।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন দেশে শ্রেণী-বৈষম্যের বিভিন্ন অভিব্যক্তি দেখা যায়। কখনো দেখা যায় তথাকথিত উচ্চ বর্ণ ও নিম্ন বর্ণের মধ্যে বিরোধ—যেমনটা ঘটেছিল হিন্দুভারতের পতনোন্মুখ অবস্থায়, অথবা যেমনটা ঘটছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। কখনো দেখা যায় জাতি-বিরোধ বা ধর্ম-বিরোধ,—যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে বহুবর্ষব্যাপী ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যান্টদের ঝগড়া-বিবাদ, খৃস্টান-ইহুদী সংঘর্ষ এবং হিন্দু-মুসলমান বিরোধ। কখনো সংঘর্ষ ঘটেছে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে, পুঁজিবাদী ও শ্রমিকের মধ্যে, শোষক ও শোষিতের মধ্যে।

পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এক শ্রেণীহীন সমাজ (Classless Society) প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিচ্ছেন। শ্রেণীর আবার নানা জাত। রাজনীতিক বা দলীয় শ্রেণী, সামাজিক শ্রেণী, অর্থনীতিক শ্রেণী, বর্ণগত শ্রেণী ইত্যাদি। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে জাতিগত, ধর্মগত এবং স্ত্রীপুরুষ ভেদাভেদে সমান নাগরিকাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু আইনের সাহায্যে একদিক দিয়ে শ্রেণীবৈচিত্র্যের আংশিক বিলোপসাধন করা হলেও শ্রেণীবৈষম্যের আমূল বিলোপসাধন সম্ভবপর নয়। এই বিষময় সামাজিক ব্যাধি অনাবিষ্কৃত নূতন গুপ্তপথে আত্মপ্রকাশ করে। পলিটিক্যাল্ বা প্রোফেস্তন্তাল্ (Political and Professional) ক্ষেত্রে আইনের সাহায্যে শ্রেণী-বৈষম্যের টানা-পোড়েনের কিঞ্চিৎ লাঘব সম্ভব হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য ও সৌহৃদ্য ভিন্ন প্রকৃত শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠালাভ করে না। শ্রেণীহীন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা সার্থক করে তুলতে হলে সর্বপ্রথমেই চাই সামাজিক সংহতি।

মানুষে মানুষে মন-কষাকষি

জনবহুল শহর, যেখানে মানুষ অর্থের ধান্ধায় হন্তে হয়ে ঘোরে সেখানকার সমাজের রূপ এক, আর জনবিরল মন্দগতি জীবন পল্লীসমাজের চিত্র অন্যরূপ। শহুরে সমাজেও স্বার্থের ভিত্তিতে একপ্রকারের সংহতি গড়ে উঠে। রাজনীতির সভামঞ্চে এক মতের পোষক বহু মানুষ একত্র মিলিত হয়, এ একপ্রকারের সংহতি; আবার একই পেশার মানুষ পরস্পরের প্রতি কিছুটা দরদী হয়—সেও একপ্রকারের সংহতি। শহুরে হয়তো নিজের পাশের বাড়ীর বা ফ্ল্যাটের মানুষের খোঁজ রাখবার আদৌ

প্রয়োজন বা অবকাশ হয় না, কিন্তু বিশেষ স্বার্থের খাতিরে বহু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মধ্যেও একটা ঐক্যবোধ বা সংহতি গড়ে উঠে। কিন্তু এই ঐক্যবোধ একান্তই স্বার্থসাপেক্ষ এবং বাস্তবধর্মী। এর পিছনে মানুষের সুকুমার ভাবাবেগের অনুপ্রেরণা অতি সামান্যই আছে। পল্লীসমাজে নানা দলাদলি, নীচতা ও সঙ্কীর্ণতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেশীমূলক মনোভাব পল্লীসমাজের আওতায় যেরূপ সহজে গড়ে উঠে, জনাকীর্ণ, স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-কণ্টকিত শহরে জীবনে সেভাবে গড়ে উঠবার সুযোগ কোথায়?

বর্তমান শিল্পপ্রধান সভ্যতার অন্যতম প্রধান সমস্যা ধনী-নির্ধনের অর্থ খালি জীবনের আরাম-আয়েশ বিলাস-ব্যসনের উপকরণই জোগায় না, অর্থ-ই সামাজিক মর্যাদার মানদণ্ড, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল উৎস। অর্থের ভিত্তিতেই আজকার দিনের সমাজ-বিন্যাস। মানুষে মানুষে মনকষাকষির মূল কারণও আর্থিক অসাম্য। সাম্যবাদ বা স্যোসালিজ্‌মের মূল উপজীব্যই হচ্ছে জাতীয় ধনসম্পত্তির সমবণ্টন এবং মানুষের আর্থিক অবস্থার সমতা-বিধান।

অর্থনীতিক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে মন কষাকষি হ্রাস করবার একটা উপায়ের নির্দেশ দিচ্ছে সাম্যবাদী মতবাদ। রাজনীতি ক্ষেত্রে তেম্নি একটা প্রয়াস দেখা যায় গণতান্ত্রিক সংবিধানে। কিন্তু রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার বা অবস্থার সমতা বিধান করা হ'লেও যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের মনে মানুষের প্রতি সমভাবের উদয় হয় ততক্ষণ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোন কৌশলই সামাজিক মনকষাকষির (Social tension) স্থায়ী অবসান ঘটাতে পারবে না। প্রকৃত গণতন্ত্র এবং সাম্যবাদের ভিত্তি সংবিধানেও নিহিত থাকে না, জাতীয় সম্পদের সমবণ্টনেও নিহিত থাকেন—মানুষের মনই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি। সুষ্ঠু মনের গঠনের জন্য চাই সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা।

গণযুগের দিনে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা আজ আর মুষ্টিমেয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয়। প্রকৃতির দান আলোবায়ু ও জলের উপর যেমন মানুষ মাত্রেরই জন্মগত অধিকার, তেম্নি শিক্ষার উপরেও সকলের মৌলিক অধিকার আজ সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই সার্বজনীন স্বীকৃতির বাস্তব অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় জগতের প্রগতিশীল দেশগুলিতে—জনশিক্ষার বিচিত্র ব্যবস্থায়।

আমাদের এই প্রাচীন দেশে অতীতে এক মহিমময় সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল। সেই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারাই মানুষের মনের জমিনকে সরস সমৃদ্ধ রেখেছে যুগে যুগে। লোকরঞ্জনের নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই প্রধানতঃ এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হ'ত। কোন কালেই এদেশে ইস্কুল-কলেজের এত ছড়াছড়ি ছিল না, যেমনটা দেখা যায় আজকের দিনে। পল্লীপ্রধান সমাজ ব্যবস্থায় ইস্কুল-কলেজী পোষাকী শিক্ষার ততটা প্রয়োজনও তেমন ছিল না। গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ গ্রাম-শাসন লোকচিত্ত-বিনোদন ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রাম-গণ্ডীর অভ্যন্তরে গ্রামের লোক নিজেরাই ক'রে নিত। যেমন এদেশে তেমন অন্য বহু দেশেই অতি প্রাচীনকালে এমন একটা প্রতিষ্ঠান ছিল ব'লে জানা যায় যেখানে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে গাঁয়ের সকল লোকই একত্র মিলিত হবার সুযোগ পেত। গ্রাম্যসমাজের সম্প্রসারণ, শহরে ও শিল্পপ্রধান সমাজের গোড়াপত্তন, বিজ্ঞানের প্রসার এবং দ্রুতগামী যানবাহনের প্রচলন ইত্যাদি কারণে প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীর এবং সেই সঙ্গে পল্লী-প্রতিষ্ঠানগুলিরও বিলোপ বা বিকৃতি ঘটল। পল্লীসমাজের সংহতি বহুলাংশেই সংরক্ষিত হ'ত এই সকল প্রতিষ্ঠানের আধুনিক ইংরাজী নাম—Community Centre। এর একটি সুন্দর বাংলা প্রতিনাম খুঁজে বের করা দরকার। প্রাচীন দিনের চণ্ডীমণ্ডপ বা বারোয়ারীতলা হয়তো আধুনিক অভিরুচির মাপকাঠিতে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত নাও হ'তে পারে। আসাম অঞ্চলে একটি গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পাওয়া যায়,—নাম "মেলঘর"—গাঁয়ের লোকের একত্র মেলামেশার জায়গা। নামটি সুনির্বাচিত। উত্তর ভারতের বহু জায়গায় 'পঞ্চায়েৎ ঘর' দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও বা এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় চৌপল।

কম্যুনিটি সেণ্টার বা সার্বজনীন মিলনকেন্দ্র

নাম যাই হো'ক না কেন, প্রতি গ্রাম বা জনপদে এমন একটি প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন—যেখানে মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনীতিক দল, সামাজিক বা আর্থিক পদমর্যাদা নির্বিশেষে প্রতিবেশী হিসেবে পরস্পরের সহিত মিলিত হ'তে পারে; যেখানে জনপদের প্রত্যেক অধিবাসীর থাকবে সমান প্রবেশাধিকার। সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির সঙ্গে প্রত্যেক জনপদবাসীর থাকবে সানন্দ ও স্বেচ্ছাকৃত সংযোগ। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হবে এর সার্বজনীনতা। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হবে গোলটেবিল বৈঠকের নীতি অনুসারে (Round table technique)—অর্থাৎ সভাপতি, সম্পাদক বা অন্য কর্মকর্তার কোন বিশেষ মর্যাদা বা ক্ষমতা থাকবে না। প্রতিটি সভ্যই সম মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করবে। কম্যুনিটি সেণ্টার সমস্ত শ্রেণীগত বিভেদ-ব্যবধানের অবসান ঘটাবে—এমন একটা বড় দাবী করা যায় না। পরন্তু এই সকল বিভেদ ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও কম্যুনিটি সেণ্টারে সর্বসাধারণ একত্র মিলিত হ'তে পারবে ঐক্য ও সখ্যের ভিত্তিতে এবং এই একত্র মিলনের ফলেই tension বা মন কষাকষির ঘটবে লাঘব বা অবসান।

কাজ ও আনন্দ

একটি আনন্দ উপভোগ করা আর বহুজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করা,—এ দু'য়ের মধ্যে প্রভেদ অনেকখানি। যে আনন্দ অপর দশ জনের সাহচর্যে উপভোগ করা যায় তার সামাজিক মূল্য অনেক বেশী। সুস্থ সমাজগঠনের পক্ষে নির্দোষ লোকরঞ্জনের অপরিহার্যতা সার্বজনীন স্বীকৃতিলাভ করেছে। কম্যুনিটি সেণ্টারগুলির মাধ্যমে লোকচিত্ত বিনোদনের নানা আয়োজনই করা যেতে পারে। জনপদের বিভিন্ন সামাজিক বা আর্থিকস্তরের লোকই এ সকল

আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে। এখানে গান, অভিনয়, কথকতা, পাঠ, ছায়াচিত্র, প্রদর্শনী প্রভৃতি নানারূপ আনন্দানুষ্ঠানেরই ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বাইরে থেকে ভাড়াটে বা সখের থিয়েটারী দল না এনে এখানে স্থানীয় লোকেরাই নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

কেবল আনন্দানুষ্ঠানই না, শিক্ষা, সমাজসেবা শিল্প, ইত্যাদির অনুশীলনও হবে এই সব কেন্দ্রে। দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রাতঃকালে শিশুদের পাঠশালা দ্বিপ্রহরে মহিলা সমিতি, বৈকালে ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা ও সন্ধ্যায় বড়দের লেখাপড়ার আসর ও সান্ধ্য বৈঠক বসতে পারে। কম্যুনিটি সেণ্টারের সংলগ্ন থাকবে একটি গ্রন্থসংগ্রহ ও পাঠাগার। গাঁয়ের কারিগর তার যন্ত্রপাতি মেরামত করে নিতে পারবে কম্যুনিটি সেণ্টারের ছোটখাট কারখানায়। একটি ফার্স্ট এড্-বক্স বা প্রাথমিক শুশ্রূষার উপকরণ কম্যুনিটি সেণ্টারে সংগ্রহ করে রাখতে হবে। একটি ম্যাটারনিটি ব্যাগ বা প্রসবের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও এখানে রাখা উচিত। প্রয়োজন মত গাঁয়ের লোকেরা তাদের নানা আত্যন্তিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এই কম্যুনিটি সেণ্টারেই পেতে পারবে। একটি ছোটখাট সংগ্রহশালা বা মিউজিয়ম গড়ে তুলতে হবে এই কম্যুনিটি সেণ্টারে। সংক্ষেপে গ্রাম্য কম্যুনিটি সেণ্টারটি হবে গাঁয়ের লোকের শিক্ষা-কর্ম-আনন্দানুষ্ঠান কেন্দ্র। উৎসবের দিনে ধনীর দুয়ারে রবাহূত আগন্তুকের মতো অবাঞ্ছিত অবস্থার বদলে, গাঁয়ের সার্বজনীন অনুষ্ঠানে সবাই ভোগ করবে সমানাধিকার।

পরিচালনা

গাঁয়ের প্রাপ্তবয়স্ক সকল লোকের সম্মতিক্রমে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচালক মণ্ডলী কম্যুনিটি সেণ্টারের কার্য নির্বাহ করবেন। পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্যগণ হবেন অবৈতনিক এবং পালাক্রমে পরিবর্তনশীল।

কিন্তু কেন্দ্রের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান সূচির যথাযথ পরিচালনার জন্য থাকবে একজন সংগঠক এবং কাজের পরিমাণ অনুসারে একজন বা একাধিক সহকারী। বর্তমানে পাঁচশালা শিক্ষা পরিকল্পনায় গভর্ণমেণ্টের অর্থানুকূল্যে যে সব কম্যুনিটি সেণ্টার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তার ব্যয়ভার সবটাই অবশ্য সরকারী তহবিল হতে দেওয়া হয়। কিন্তু সমগ্র না হ'লেও অন্ততঃ আংশিক ব্যয়ভার স্থানীয় লোকের চাঁদা বা দানে নির্বাহিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

জাগো জাগো কংসারি

রমেন চৌধুরী

ঘন দুর্যোগ ছেয়েছে আকাশ থম্‌থমে আঁধিয়ার,
দীর্ঘশ্বাস থেকে থেকে রয় আলোড়িয়া চারিধার;
দিশা নাহি মিলে এ মহানিশায় তৃষায় কাতর জন,
অবিচার আর অত্যাচারের দুঃসহ বন্ধন
শতগ্রন্থীর নাগপাশে সরে জড়ায়ে ধরেছে আজ,
ছড়ায়ে অনল অবিরল হাঁকে মাথার উপরে বাজ!
পাশব বলের অশনি চমকে ঝলকে আগুন তারি;
অসুর দলন আশু-প্রয়োজন—জাগো জাগো কংসারি!

বন্দী-দশায় দিন কেটে যায় দেবকীর স্বামীসহ,
ননীর অঙ্গে দুখ-তরঙ্গ বাজিছে কী দুঃসহ!
চোখের সুমুখে সন্তানে হানি দানবের উল্লাস,
দর্প-অন্ধ দেখিতে না পায় স্বখাত সর্বনাশ!
নেহারিতে নারে মোহের আঁধারে ভ্রূকুটি কুটিল চোখ,
ভাগ্যদেবীর শত আয়োজন উপাড়িতে কণ্টক।
মদোন্মত্তে আয়ত্বে আনি প্রাণ দাও পৃথ্বারে,
জাগো কংসারি আজি দুর্দিনে ঘন ঘোর মেঘ চিরে!

শক্তির এরা মর্যাদা প্রতি পদে পদে করে হানি,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে রঞ্জিত হয় যাকিছু কলুষ গ্লানি;
রঞ্জিত হয় রক্ত-ধারায় অসহায় প্রাণীদের,
পরম সহায় দেখা দাও আজ—শোধ নাও শুধু এর!
বিধান তোমার দলিত করার সমুচিত প্রতিফল
তিলে তিলে তারে আঘাত হানুক এবার অনর্গল!
বলের অভাবে ছল হোলো যার আয়ুধ সুবাঞ্ছিত,
অ-কৃপণ হাতে মাটির ধরাতে করো তারে লাঞ্ছিত।—

যুগে যুগে আসো জনগণে দিতে নিরাপত্তার আলো,
আলোর স্বরূপ বিস্মৃত মোরা পুন তারে আজ জ্বালো;
অভাবে মোদের স্বভাবে এসেছে কলংক সবিশেষ,
অপমান আজ মাথার ভূষণ—লজ্জাবিহীন বেশ;
সামর্থ্য নেই, শক্তি হারায়ু ভক্তিবিহীন বলি',
নারীরে নারিনু সম্মান দিতে—অকপটে তাও বলি!
এর তরে দায়ী কেবা কোন্ জন খোঁজ নিয়ো শুধু তারি,
দুর্যোগমন অষ্টমী রাতে জাগো জাগো কংসারি॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

উমা দেবী চলে যাবার সময় একটু কাঁদলেন। পাঁচটি টাকা রমার হাতে দিয়ে বললেন, পেটে না ধরলেও তুই আমার মেয়ে—কষ্টে পড়লে যাস সেখানে।

রমা তাঁকে প্রণাম করে পায়ের কাছে টাকা পাঁচটি রাখলো। বললে, এ তুমি রাখ মা। যিনি তোমাকে ভরসা দিলেন—আমারও ভরসা তিনি।

উমা দেবী চলে গেলে সুরমা বললে, তুই আমার কাছে থাক রমা, থাকবি ?

রমা বললে, এখনও ঘরের মেয়াদ আছে চারদিন। এর মধ্যে ভেবে-চিন্তে তোমায় বলব।

সে কথা ভগবতীও বললেন, এখানে এই একরত্তি পাখীর বাসা—তবু মা, আমার কাছেই যদি থাক !

রমা সজল চক্ষে বললে, কাকীমা আমি জানি আপনারা একথা বলবেন। তবু আর দু'একটা দিন ভাবতে দিন আমাকে।

ভগবতী শুধোলেন,তোমাদের দেশের বাড়ীতে কেউ নেই ?

দেশের বাড়ী!···দেশ কোথায় তাই যে জানিনা কাকীমা। শুনেছি ঠাকুরদার আমল থেকে ভাড়া বাড়ীতে চলছে। যেবার বোমা পড়ল কলকাতায়—সেবার পাড়ার সব লোক চলে গেল—আমরা রইলাম।

সন্ধ্যার পর বিনয়বাবু আর সুরমা এল অমরনাথের সঙ্গে দেখা করতে।

বিনয়বাবু বললেন, দাদা, একটি পরামর্শ করতে এলাম আপনার কাছে। মফঃস্বলের কলেজে একটা অফার পেয়েছি—সরকারী কলেজ। মন টানছে সেইখানে—কারণ মাইনে মোটা—ভবিষ্যৎ ভাল। সুরমা বলে—কলকাতাতে সরকারী কলেজ তো আছে—

সুরমা বললে, না দাদা—আমিই বরঞ্চ বললাম—চাকরিটা নিয়ে নাও। শহরের ধোঁয়া আর অন্ধকার ভাল লাগে না।

অমরনাথ হাসলেন, তোমাদের সমস্যা দেখছি গুরুতর, দু'জনেই যখন একমত !

সবাই হেসে উঠল। বিনয়বাবু বললেন, তা নয়—আসল সমস্যা হ'ল—রমাকে নিয়ে—সুরমা চান ওকেও আমরা সঙ্গে নিই—আমি ইতস্ততঃ করছি।

কেন ?—অমরনাথ শুধোলেন।

বিনয়বাবুর হয়ে সুরমা উত্তর দিলে, পাড়াগাঁ—অনাত্মীয় মেয়েকে নিয়ে কথা উঠবে—এবং তাতে আমিই নাকি বেশী কষ্ট পাব !

বিনয়বাবু বললেন, অথচ ওর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা—

ভগবতী বললেন, তোমরা নিশ্চিন্ত হও ঠাকুরপো, রমাকে আমার কাছে থাকবার কথা বলেছি আমি। ও ভেবে উত্তর দেবে বলেছে।

ওকে আশ্রয় দেবার সাহস করেন ? বিবাহযোগ্যা মেয়ে—বিয়ের দায়িত্ব রয়েছে—

ও যদি আমারই মেয়ে হতো ঠাকুরপো ? মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন ভগবতী।

বিনয়বাবু বললেন, আমারই ভুল হয়েছে বউদি—একথা আপনারাই পারেন বলতে। যে দেশে দেবতার মধ্যে উমা মহেশ্বর সব দেবতার সেরা—মেয়েরা ছেলেবেলায় কামনা করে এই পরম-পুরুষের মত পতি—

সুরমা চুপিচুপি বললে, লেকচারের মত শোনাচ্ছে কিন্তু।

বিনয়বাবু ভ্রূকুটি করলেন।

রমা সব শুনলে। সুরমারা চলে যাচ্ছে। ভগবান বুঝি পরীক্ষা করছেন? দেখছেন রমার মনের বল কতখানি। সমস্ত আশ্রয় ঘুচিয়ে দিয়ে—এইভাবে পরীক্ষা করেন তিনি।···আশ্রয় হারিয়ে মেয়েরা কি থাকতে পারে? শৈশবে পিতা—যৌবনে স্বামী, আর বার্দ্ধক্যে পুত্র—এদেরই আশ্রয় পেয়ে নারীর মর্য্যাদা। কেন এই বিধান? নারী কি পণ্য যে রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া নষ্ট হয়ে যাবার ভয়? না পুরুষেরই স্বৈর-কামনার প্রকাশ এই বিধানে নিহিত রয়েছে? যাই হোক, রমা বুঝেছে—আশ্রয় একটা দরকার মেয়েদের। নিজেকে তৈরী করে নেবার জন্য কিছু সময়—কিছু চিন্তা আবশ্যক। পর-নির্ভরতায় মনোবল বাড়ায় না। সে চায়—কল্পনা রঙীন হোক—বস্তুর পরিচয়ও পাকা হোক সেই সঙ্গে।

কেষ্টর সঙ্গেই পরামর্শ করলে রমা। বলত ভাই—এখন কি করি?

প্রোফেসারবাবুর সঙ্গে যাবে না কি?

না ভাই—মন সরছে না। কাউকে আশ্রয় না করে যদি বাঁচবার চেষ্টা করি—কেমন হয় তাহলে?

খুব ভাল হয়। তুমি তো সেলাই জান—মাস্টারী করবে—এক জায়গায়?

রমার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, করব—যদি ভাল জায়গা হয়।

জায়গা ভালই। তাহলে সব খুলে বলি। যতীনবাবুকে জান তো—যিনি গান শেখাতে আসতেন এখানে। ওঁরই এক বোন সেলাই শিখতে চায়—

রমার কঠিন মুখের পানে চেয়ে কেষ্ট অবাক হয়ে গেল—একটু ভয়ও পেলে যেন। বললে, কেন দিদি—উনি তো লোক ভালই।

উনি লোক খারাপ একথা তো বলিনি ভাই, কিন্তু—ওখানে নয়। বাড়ীর বড্ড কাছে। একটু দূরে দেখ।

কেষ্ট ইতস্ততঃ করছে দেখে রমা বললে, আচ্ছা কেষ্ট, একটা কথা সত্যি বল তো? যতীনবাবুকে তুই বুঝি আমার কথা বলেছিস?

বাঃ—আমিই বললাম! তোমাদের কথা তো সবাই জানে।···যতীনবাবুই তো ডেকে আমাকে বললেন—ওই কথা। আমি বরঞ্চ বললাম—,

তোমার যতীনবাবুকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তাঁর কথা রাখতে পারলাম না কেষ্ট। যদি কোনখানে যেতে না পারি—তুই আমাকে সাহায্য করতে পারবি—যেমন করছিস?

বাঃ রে—আমি কি বলেছি পারব না? কেষ্ট অভিমান-ক্ষুণ্ণস্বরে বললে।

বাঁচালি ভাই—তোর ভরসাই আমার বড় ভরসা।

কিন্তু জামা সেমিজ তো আজকাল তেমন বিক্রী হচ্ছে না।

তোর চানাচুর আছে। আর একটা কাজ করব ভাবছি। এখন হাতে তো অনেক সময় পাব—বসে বসে ঠোঙা তৈরী করব। তুই পুরনো কাগজ এনে দিস।

বাঃ—বেশ হবে। আর—অর্ডার নিয়ে—উলের সোয়েটার বুনতে পার।

দেখা যাক—সে শীতকাল এলে ভাবব।

সন্ধ্যের পর কেষ্ট এসে বললে, আমায় বকবে না তো রমাদিদি—একটা অন্যায় কাজ করেছি।

জামার পকেট থেকে একখানি সুদৃশ্য লেফাফা বার করে বললে, যতীনবাবু আমায় ডেকে এখানা দিলেন। বললেন—এই আমার শেষ অনুরোধ—আর কিছু বলব না! দেবে তোমার রমাদিকে?

আচ্ছা দাও। নিরুৎসুক কণ্ঠে বললে রমা। চিঠিখানা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একবার দেখলে না পর্য্যন্ত—তাকের ওপর রেখে দিলে। কেষ্ট ঝোলা নামিয়ে চানাচুর বিক্রীর হিসাব করতে বসল। হিসাব শেষ হলে কেষ্ট উঠে গেল—রমা তাকের ওপর থেকে যতীনের চিঠিখানি হাতে তুলে নিলে। কি আশ্চর্য্য—একখানি খামে-আঁটা পত্রের এত শক্তি! মাথায় সব উদ্ভট কল্পনা জমিয়ে হাত পা আড়ষ্ট করে দিচ্ছে। বুকের ভিতর ধুক্ ধুক্ করছে। ভয়? না। আনন্দ? ঠিক নয়। চিরকালের রাজকন্যা—রাজপুত্রের স্পর্শ পেয়ে—এমনি রোমাঞ্চ-বিহ্বল হয়? বসন্তের মিষ্ট বাতাস—ঈষৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে—মানুষের মনো-আবাসে সে কি পরম সৃষ্টির ইঙ্গিত বয়ে আনে?

খাম খুলতে গিয়ে হাত কাঁপল। রমা সাদা কাগজখানা টেনে বার করলো লেফাফা-গহ্বর থেকে।

কি সুন্দর গোটা গোটা লেখা! সুন্দর—সোজা ছাঁদের হরপ—যদি মানুষের চরিত্র-গৌরব প্রকাশ করে—যতীনকে তাহলে অকারণ সন্দেহ করেছে রমা। যতীন কখনো অতটা নীচে নামতে পারে না। কি লিখেছে যতীন?

সুচরিতাসু,

আমি জানি আপনার মনে অকারণ সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। অন্যায় করেন নি। তবু বিশ্বাস করুন আমার সঙ্গে ইরার পলায়নের কোন সম্বন্ধ নাই। সঙ্গীত অত্যন্ত পবিত্র জিনিস, সাধনা না করলে এতে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। শুনেছেন বোধ করি—ঈশ্বরীয় মার্গে নিয়ে যাবার এ মস্ত বড় সহায়। আমরা অবশ্য—এই বয়সে ঈশ্বর নিয়ে মাতামাতি করিনি, কিন্তু অতি সাধারণ বিষয় থেকে এযে উচ্চ স্তরে পৌঁছে দেয়—বহুবার তা অনুভব করেছি। সংসারে অশান্তি চলছে—চলে আসুন সুরের রাজ্যে—সে রাজ্যে আপনি সম্রাট। এত কথা কেন বলছি জানেন? আমরা এমন সাধনার বস্তুকেও—কামনা-পুরণের উপায় বলে গ্রহণ করে থাকি! আমরা সুরের রাজ্যে মাতামাতিই করি—অমৃতলাভ আর ভাগ্যে ঘটে না। আপনাদের বাড়ীতে গান শেখাতে গিয়েই যে প্রথম বুঝলুম—তা নয়। গানের আসরে ছাত্রী-শিক্ষকে মালা বদল করেছে বহুস্থলে, আমি জানি। আপনি বলবেন—পুরুষরা প্রলোভন দেখায়—আমি বলব—মেয়েরাও কম অসংযত নয়। কোন্‌ক্ষেত্রে কে দোষী সে তর্কে বিষয়ের মীমাংসা হয় না। দোষ দু'পক্ষেরই। তবু বিশ্বাস করুন, কোন মন্দ মতলব নিয়ে আপনাদের বাড়ীতে ঢুকিনি। আপনাকে ভরসা দেবার কথা জানিয়েছি—মন্দ মতলব নিয়ে নয়। কেমন মনে হল—আপনাকে সাহায্য করা দরকার, তাই এ প্রস্তাব। এর মধ্যে দয়া দেখানোর ব্যাপার নেই—হৃদয় ভুলানোর বাষ্পবিন্দুও নেই। বলতে পারেন—পৃথিবীতে আরও অনেক অসহায় মেয়ে তো আছে। উত্তরে বলব—পৃথিবী অনেক বড়—সে তুলনায় ক'জনকেই বা জানি! যাকে জানি না—তার দুঃখ নিয়ে মন নরম হবে কেন! যাদের জানি? কিন্তু জানারও যে বহু রকম আছে। চোখে অনেক মানুষ পড়ছে প্রত্যহ—ছায়া-ছবির মত তাদের মিছিল। চোখ ফেরাই, আর নাই। কিন্তু দৃষ্টি আর একটু গভীর সন্ধানে মন পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেলেই—একটি ছবি আঁকা হয়ে যায়। প্রথমত রেখা-চিত্র—পরে বর্ণ-বিন্যাস—এবং তাই নিয়ে ভাঙ্গাগড়ার খেলা। সে যেন মনের বস্তু হয়ে ওঠে। তখন বাইরের মিছিলে আর তাকে নামিয়ে রাখা চলে না। এমনি অসংখ্য ছবির মধ্যে থেকে আমরা নির্ব্বাচন করি মাত্র কয়েকখানি ছবি। সে ছবির রং ফ্যাকাসে হতে দিই না, অযত্নে ফেলে রাখি না ময়লা জায়গায়, মহার্ঘ্য ফ্রেমে বাঁধিয়ে তাকে মহার্ঘ্যতর করে তুলি। এর সবগুলিকেই যে ভালবাসি—তাতে ভুল নেই। কিন্তু বাইরের লোকে এই ভালবাসাকেই অদ্বিতীয় বলে ভুল করে। অর্থাৎ—ভালবাসার যে সব বিচিত্র প্রকাশ—বিভিন্ন স্তরে ফুটে উঠতে পারে তা মানতে চায় না। ভালবাসা যে কামনার ওপরে ঠাঁই পায়—তাও বিশ্বাস করে না। যাই করুক, স্নেহ—সখ্য—বাৎসল্য—এগুলিও ভালবাসার অংশ বলে স্বীকার করেন কিনা! বৃন্দাবনের সবাই রন্ধনশালাতে গিয়ে ধোঁয়ার ছলনা করে কাঁদে না, কেউ কেউ ননী হাতে নিয়ে—দূর মথুরাপুরীর পানে চেয়ে চোখের জল ফেলতে পারে, কেউ বা বনফুলের মালা গেঁথে গোবৎসের গলায় পরিয়ে বুক ভাসাতে পারে। এরাও প্রেম—এই বাহু বলে আমরা বাতিল করে দিতে পারি না। তবে—এই ভালবাসার অংশ নিয়ে—আপনার মঙ্গল কামনা করে থাকি যদি—কি এমন অন্যায় করেছি—বলতে পারেন? উত্তর চাই না—কথাটা ভেবে দেখবেন শুধু। আপনার মনের বলকে তুচ্ছ করছি না—তবু পৃথিবী যে কত ভয়ঙ্কর—সে ধারণা হয়তো আপনার নাই। যেদিন ভুল ধারণা ভাঙ্গবে, ডাকবেন। না ডাকেন—তাতেও ক্ষতি নাই। আমার দ্বারা—আপনার যে বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না—এই কথাটাই শুধু জানিয়ে দিলুম। চিঠি বড় হল। ইচ্ছে করেই অনেক কথা লিখলাম—সামনে বলবার সুযোগ তো পাব না। আচ্ছা—নমস্কার। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী—যতীন মিত্র

রমার দু'চোখে দু'টি ধারা কখন নেমেছে—কখন শুকিয়েছে।

গল্পের রাজপুত্র প্রতারক নয়।

২২

অল্পায়ু বসন্ত ফুরিয়ে গ্রীষ্ম এল শহরে। প্রবল প্রভাবান্বিত গ্রীষ্ম—তাপে উত্তপ্ত করে তুলছে জীবকুলকে। তাপ যদি বা সহ্য হয়—গুমোট সহ্য হয় না। যে বাড়ীতে চন্দ্র সূর্য্য উঁকি মারে না, সেখানে পবনদেবও অসহযোগ চালান। হাত-পাখা টানতে টানতে হাত ব্যথা করে—তার উপরে মশা ছারপোকার উৎপাত।

ভগবতী বললেন, দিন কতকের জন্য দেশে চল।

ছুটি পাব না এখন।

কেন—? আমাদের যে এত কষ্ট হচ্ছে—সায়েব বুঝবে না?

ভগবতীর অবোধ প্রশ্নে অমরনাথ হাসলেন। বললেন, পরের কষ্ট কেউ বোঝে? ওরা তো ঘর বানিয়েছে দার্জ্জিলিং শিলঙে—তাই পাঁচটার পরও আফিস ছাড়ে না।

সন্তুর ইস্কুল বন্ধ হ'য়েছে—ও বলছে, দেশে যাব।

দেশে যাব বললেই কি যাওয়া হয়! দাঁড়াও চিঠি লিখে খবর নিই।

নিজের বাড়ী যাব—তার চিঠি লিখে খবর নিতে হবে?

বাস করলেই নিজের বাড়ী—না হলে সকলের। অমরনাথ হাসলেন। সাপ ব্যাঙ ইঁদুর আরশুলা গাছপালা পেঁচা-চামচিকে তাদেরও তো দখল-স্বত্ব আছে বাড়ীটার ওপর। দেখি চিঠি লিখে কি উত্তর আসে।

সপ্তাহের মধ্যে উত্তর এল। লিখছেন পাড়া-সম্পর্কে খুড়ো প্রমথ। গ্রামের সবাই গ্রাম ছেড়েছে বলে গ্রামের যে কি দুর্দ্দশা হয়েছে সেটা জানিয়ে লিখছেন:

তোমার বাস্তখানিও যায় যায় হইয়াছে। অচিরে চালা মেরামত না করাইলে আগামী বর্ষায় সেখানির চিহ্ন থাকিবে না। আট মাস হইল তোমরা গ্রাম ছাড়িয়াছ—চালার আর অপরাধ কি!

ভগবতী বললেন, তাহলে যেতেই হবে।

কোথায় যাবে—ভিটেয় চাল চাপা পড়ে মরতে?

টাকা পাঠিয়ে দাও—চাল মেরামত হোক।

হিসাব করে দেখা গেল—টাকা পাঠানো অসম্ভব। শহরের ধর্ম্ম অনুযায়ী মানুষ একটি মুখোস পরে থাকে। সে মুখোস অভাবের ছিদ্র ঢাকবার জন্যই পরে। কিন্তু মুখোসের মধ্যে যে মুখ থাকে তা ঢাকে না। তা দুঃখে কষ্টে রেখায় রেখায় আকীর্ণ হয়ে কুশ্রী হতে থাকে—মানুষকে টেনে এনে ফেলে জরার অধিকারে। শহরের ধর্ম্ম পালন না করে উপায় কি!

সন্তু শহরেই কাটালে গ্রীষ্মের ছুটি। ঘরের মধ্যে থাকতে কষ্ট হলে পথে বেরিয়ে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে বহু দূরে চলে যায়। সোজা চওড়া পথ—দুধারে আলো—বিচিত্র পণ্যপ্রবাহ, যান ও মানুষ অফুরন্ত—তাদের আসা-যাওয়ার দুই বিপরীত স্রোতে গতিটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। সব মিলিয়ে বেশ একটা লীলা চলে। মাথার উপরে দুপুরের জ্বলন্ত আকাশ আছে—পথের ধারে গাছ-পালা আছে—রেলিঙ-ঘেরা দিঘীতে আছে অথৈ জল। আছে শব্দের সমুদ্র—গতির উল্লাস। নতুন কেউ এলে তাকে অনায়াসে ভুলিয়ে দেয় মোহিনী নগরী।

সন্তু চলে—দাঁড়ায় কখনো। শহর যাদুকরী, বহু যাদু দেখায়। দেখা শেষ হ'লে চক্ষু বলে—সাবাস। মন খুঁত খুঁত করে। এ পাওয়ার পরও এতটুকু অতৃপ্তি থেকে যায়।

মাটির সঙ্গে গাছপালা ঘাস বা কাঁটালতা আর আকাশ মাথামাখি করে হৃদ্যতায়—এ সে দেশ নয়। এ দেশ সানবাঁধানো—চকচকে—বড় বেশী মাজা-মাজা ভাব। যেন নেমন্তন্ন বাড়ীতে এসে সঙ্গীহারা মানুষ এর ওর তার পানে চেয়ে আছে—সাহস করে পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারছে না। রহস্যপুরী শহরে আছে অফুরন্ত কৌতূহল। নতুন নতুন দিক চেনার উৎসাহে সন্তু পথের এ প্রান্ত ও প্রান্ত ঘুরে বেড়ায়। যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, কেল্লা, লাট-সাহেবের বাড়ী, সায়েব-পাড়া, কালীঘাট, অতিকায় জাহাজ আর নিয়ন আলোপ্লাবিত সিনেমা ঘর···সমস্তই মানুষ ভুলানো ব্যাপার। সন্ধ্যার শহরও তেমনি অপরূপ। রোজ রোজ দেখে—দেখার সাধ মেটে না।

সেনদিদির ঘরের ভাড়াটে-বাবুটির সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা। সন্তু এক মনে সিনেমা ঘরের দেওয়াল-ছবি দেখছে—পিছন থেকে উনি এসে কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালেন।

কি খোকা—ছবি দেখছ? কেমন লাগছে?

লজ্জায় মাথা নামিয়ে সন্তু উত্তর দিলে, ভালই।

আমাকে তুমি চেন না—নয়? ওই যে তোমাদের

ঘরের পর দুখানা ঘর ছেড়ে দিয়ে খালি ঘরটায় এলাম মাস তিনেক আগে—

সন্তু মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানালে।

সিনেমা তুমি ভালবাস?

কি জানি—আমি একবার দেখেছি ছবি।

মাত্র একবার! ভদ্রলোক সহানুভূতিসূচক স্বরে বললেন। কেন, তোমার বাবা, মা, এঁরা পছন্দ করেন না বুঝি?

সন্তু জবাব না দিয়ে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

বুঝেছি। আচ্ছা খোকা, ছবিতে ঐ যে ছেলেটি দেখছ—ওর বয়স তোমারই মত। ও কেমন পার্ট করেছে দেখছ তো! পার্ট করলে মেলাই পয়সা পাওয়া যায়।

সন্তুর উজ্জ্বল চোখের পানে চেয়ে বললেন, তুমি নামবে কোন বইয়ে? অনেক পয়সা পাবে।

আমি ইস্কুলে পড়ছি।

আরে—যারা পড়ে—তারা বুঝি অভিনয় করে না! তারাই তো বেশী আর ভাল অভিনয় করে। ছবির ওই ছেলেটি এবার ম্যাট্রিক দেবে।

আপনি জানেন ওকে?

জানি বই কি। আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে? চল না?

না—বাবাকে বলে আসি নি। সন্তু আপত্তি করে।

নাই বা বললে—যে সময়ে বাড়ী ফের—ঠিক সেই সময়ে পৌঁছে দেব তোমায়।

না—আজ থাক। সন্তু অন্য দিকে পা বাড়ায়।

লোকটি হেসে বলে, তুমি ভারি লাজুক। একখানি বইয়ে অমনি লাজুক ছেলের পার্ট আছে। তোমাকে দিয়ে চমৎকার হবে। সিনেমার ছোঁড়াগুলো একবার ভাল পার্ট করেই বকে যায়। এমন বকে যায় যে হাজার চেষ্টা করেও মুখে সিনসিয়ারিটি ফুটিয়ে তুলতে পারা যায় না। যাক—তাহলে কথা রইল—কাল আসবে। কেমন?

বাড়ীতে বাবাকে বলতে কেমন লজ্জা বোধ হল—ভগবতীকে বললে সন্তু, মা—উই যে আমাদের পাশের ঘরের ভাড়াটেবাবু—উনি আজ আমাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছিলেন।

কোথায় রে?

সিনেমার ছবি তোলে যেখানে, স্টুডিয়োয়। কাল যাব?

সেখানে কি আছে রে?

শহরে কত কি আছে—তুমি তো কিছুই দেখ নি! কত বড় বড় বাড়ী—বাগান—কেল্লা—লাটসাহেবের বাড়ী …চল না একদিন বাবাকে বলে।

আচ্ছা বলব'খন।

তাহলে কাল যাব?

তা যাস—এখন তো ইস্কুল নেই। তবে সকাল সকাল ফিরে আসবি।

আচ্ছা। সন্তু সেনদিদির ঘরের কাছে এসে উঁকি মারলে। ভিতরে বসে লোকটি চা খাচ্ছিলেন—দেখতে পেয়ে ডাকলেন, এদিকে এস তো খোকা। বস। চা খাবে?

না—চা আমরা খাই না।

সুধীন, এরই কথা বলছিলে বুঝি? সু-প্রসাধিতা মেয়েটি শুধোলে।

হাঁ—চমৎকার মুখ নয়? ফিল্ম-ফেস। একে যদি নিতে পারি—বইখানা চমৎকার উৎরে যাবে—, ফ্রেশ ফ্রম গার্ডেন। এ জিনিস শহরে দুর্লভ।

মেয়েটি হেসে বললে, তুমিও দ্বিতীয় চার্লি চ্যাপলিন হবে দেখছি! জ্যাকি কুগানকে আবিষ্কার করে তিনি নাম কিনলেন।

মিথ্যে কি—আমাদের দেশে এই সব কিশোর ছেলেদের চান্স দিলে এরাও এক একটি জিনিয়াস হয়ে উঠবে—তবে সিলেক্শানের বাহাদুরি চাই। তা তোমার মাকে বলেছ?

হাঁ আজ আপনার সঙ্গে যাব।

গুড। আচ্ছা মঞ্জু, তুমি কি! ছেলেটি চা খায় না বলে—কি আর কিছুই খায় না?

না—না—আমি এখন কিছু খাব না। সন্তু লজ্জিত প্রতিবাদ করলে।

আচ্ছা—সে বুঝব আমি। কেক আর বিস্কিট আন।

মঞ্জু তিনখানি প্লেটে কেক বিস্কিট সাজিয়ে নিয়ে এল।

নিয়ে এল আর এক পট চা। চিনি দুধ চামচ সব আলাদা আলাদা। টেবিলের ওপর ট্রে নামিয়ে বললে, খাও না একটু চা—চমৎকার ব্লেণ্ড—আসাম দার্জ্জিলিং।

বিস্কিটের প্লেটটা সন্তর হাতে তুলে দিয়ে বললে, খাও।

সন্ত সজ্জা করছে দেখে—মঞ্জু হেসে বললে, এই দেখ আমরা খাচ্ছি।—খাও।

ধীরে ধীরে লজ্জা কেটে গেল। মঞ্জু পাশের র‍্যাক থেকে খানকয়েক ছবির বই টেনে টেবিলের ওপর রাখলে। বললে, ছবি দেখ—কি সুন্দর দেশ-বিদেশের ছবি।

কৌতূহলী রূপসন্ধানী কিশোর-মন ছবির রাজ্যে হারিয়ে গেল কখন।

চমক ভাঙ্গল মেয়েটি ওর কাঁধে হাত দিয়ে ডাকতেই, তোমার মা ডাকছেন—বোধ করি খাবার হয়ে গেছে।

ওঃ—তাড়াতাড়ি বই ফেলে সন্ত চলে গেল। যাবার সময় কাউকে প্রণাম করলে না—ভদ্রতা করে বললে না পর্য্যন্ত—এখন আসি।

মঞ্জু বললে, চমৎকার তোমার সিলেকসান। ছেলেটি শহরে আছে এতদিন—মনে বা দেহে কোনদিকেই শহরের রং ধরেনি।

সুধীন আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললে, এই গ্রামে যখন ঢুকেছি—তখন এখানকার বাছাই করা ষ্টফ্ নিয়ে যাব। ইজিচেয়ারে বসা পেশাদারী মানুষ দিয়ে কখনো চাষী-মজুরের পার্ট হয়? কয়েকখানা গ্রামের ছবি জুড়ে দিলেই গ্রাম্য-জীবন দেখানো যায় না—রীতিমত আউটডোর স্যুটিংএর ব্যবস্থা চাই।

মঞ্জু বললে, একটা চমৎকার মেয়েও দেখলুম।

হাঁ—দেখেছি। এই ছেলেটিরই দিদি হবে—একদিন ভাব জমাও না?

বাধ-বাধ ঠেকে। কাকীমা বলে না হয় ডাকলুম, হাঁটু মুড়ে ময়লা মেঝেয় বসি কি করে—যা তা হাতে তুলে দিলে খেতেও পারব না।

তাই ত, তোমাকে বলে ভুল করলুম তাহলে!

মঞ্জু বললে, বড্ড বিশ্রী বাড়ীটা—দিনরাত চেঁচামেচি হৈ-হৈ লেগেই আছে! অদ্ভুত অদ্ভুত সব টাইপ! কস্টিউমএর চমৎকার নমুনা যোগাড় করতে পার।…

সুধীন হেসে বললে, আর এক কাপ চা দেবে? ভাল কথা—প্লে-ব্যাকের জন্য যে ক'খানা গান কম্পোজ করে দিলে স্বপন—সব ক'খানাই কি তুলে নিয়েছ?

ক'খানা? মাত্র দু'খানি গান দিয়েছেন—আর তার পরের দিনই তোলা হয়ে গেছে।

শোনাও তো দেখি—কেমন হ'ল।

মঞ্জু চায়ের পট এগিয়ে দিয়ে হারমোনিয়ামটা টেনে নিলে।

(ক্রমশঃ)

ধাত্রী-পান্না

রত্নেশ্বর হাজরা

নিবিড় রাত্রির বুকে নীরবে মিলাল আর্তনাদ
ধাত্রী-পান্না
এখন ঢেকোনা মুখ নিঃশব্দ কান্নায়।
উন্মুক্ত অসির তলে তোমার সন্তান হোলো লাল
প্রথম শহীদ।
তুমি আজ বীরমাতা
বীরাঙ্গনা কেঁদোনা এখন।
তুমি আজ বীরপ্রসূ ধরণীর মেয়ে।

*

এখনো যায়নি মিশে তোমার বুকের আর্তনাদ
ভারতের আকাশের কোণে জমা আছে থরো থরো,
হিমাচলে প্রতিধ্বনি জাগে—
'ধাত্রী-পান্না' :—
ইতিহাস ভোলেনি সে নাম।

বিদ্যাসাগর—রাষ্ট্রনৈতিক-মানসের ভূমিকা

শ্রীপ্রিয়তোষ মৈত্রেয়

উনিশ শতকের মানস-বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়েছিল সেদিন আত্মোপলব্ধি, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও জীবন জিজ্ঞাসার নূতন ধর্ম্মে—মানবধর্ম্মে, মানবতা-বোধে যার সার্থক পরিণতি ঘটে। শিল্পবিপ্লব ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা কিছুদিন থেকেই মানুষের ধর্ম্মান্ধতা ও অন্ধবিশ্বাসের মূলে যে আঘাত হানছিল তার ফলে প্রাচীন জীবনায়ন ও সমাজ মানসে অতীত জীবন-দর্শনের প্রভাব দ্রুতগতিতেই নিঃশেষ হ'য়ে চলেছিল। সেদিন যেমন বিজ্ঞানের বিকাশ ও শিল্প-বিপ্লবের ফলে জীবনসংগ্রামের পথ সুগম ও সুন্দর হ'য়ে উঠেছিল, অপরদিকে তেমনি নূতন পরিবেশ সৃষ্ট সমাজ মানসেও সত্য, সুন্দর ও মানব-মঙ্গলের প্রতিষ্ঠার উদ্যম ও সাধনা প্রায় সকল দেশের সমাজ সংস্কৃতির অন্যতম বিশিষ্ট রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিলো। ভারতীয় সমাজ-মানসেও সেদিন এই আকুতি নানাভাবে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল। তবে একথাও স্বীকার্য্য, এই মানব ও মানস মুক্তির উদ্যমের সাথে অতীতের সংস্কারাবদ্ধ জীবনায়ন ও 'বেদে আছে' মনোভাবের দ্বন্দ্ব ও প্রকট হ'য়ে উঠেছে। সেদিন বহুকাল অর্জ্জিত সংস্কার অন্ধ-সংস্কাররূপে জীবনকে পঙ্কিল ও শ্লথ করে তুলেছিল—এ কথা জানি। এর মূলে ছিল, একদিকে দেউলে-হওয়া বিগত দিনের গতিহীন জীবনায়নের প্রতি মোহগ্রস্ত সমাজ মানস এবং অপরদিকে সেদিনের বিদেশী শাসন ও শোষণ সৃষ্ট অর্থনৈতিক জীবন-যাত্রা কালের গতির সাথে এই জীবনযাত্রা গতিশীল না হ'য়ে সেদিনের বিদেশী শাসন চক্রান্তে মুমূর্ষ সামন্তযুগীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জীর্ণ উপাদানের জগদ্দল পাথরের তলে নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল। সমাজ-মানসে এই প্রতিক্রিয়া দু'টি ধারায় প্রবাহিত হ'ল—একটি নেতিবাচক ও অপরটি ইতিবাচক। সমাজ-দর্শনের প্রতিটি সংকটের প্রতিক্রিয়ার প্রবাহধারা সর্ব্বক্ষেত্রে ও সর্ব্বকালে প্রথমে এই দুইটি পথেই প্রকাশিত হয়—কিন্তু ক্রমশঃই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রকট হ'য়ে দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, সমাজ-সংস্কৃতি যেখানে গতিশীল সেখানে নেতিবাচক প্রবাহ ধারা ক্ষীণতর হ'তে হ'তে নিঃশেষ হ'য়ে যায়—অস্তিবাচক প্রবাহধারার সুরু হয় জয়-যাত্রা। তাই সেদিন যাঁরা উদ্যম হারিয়েছিলেন, আত্মোপলব্ধি যাঁদের হয়নি, গতানুগতিকে যাঁরা আস্থাবান ছিলেন তাঁরা সেদিনের সমাজের সেই মর্ম্মন্তুদ অবস্থায় আতঙ্কিত, উদ্যমহীন হয়ে "বৈরাগ্যমেবভয়ং" মনে ক'রে সংসার মায়া মোক্ষই উদ্ধারের একমাত্র পথ মনে ক'রে, সেদিনের দুঃখকে জয় করবার চেষ্টা থেকে পেছিয়ে পড়লেন—বোঝা গেল, তাঁদের মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঘটেছে—উত্তরকালের মানুষের কাছে তাঁদের বাণীর আর আবেদন রইল না। সত্যই তাঁরা আজ বিস্মৃত। আর ঠিক এর পাশাপাশি নবযুগের আদর্শ—জীবনকে জানা, মানব ও মানসমুক্তির প্রবল কামনা, প্রখর হ'য়ে উঠলো—মানুষের কাছে এঁদের আহ্বান পৌছল—এই যে প্রাচীনের সাথে নবীনের, মৃত্যুর সাথে জীবনের দ্বন্দ্ব এত চিরন্তন নব নব অবস্থায় তা' নব নব রূপ নেয়। একদিকে শাস্ত্র গুরু ও ব্রাহ্মণে ভক্তি এবং অন্ধ-সংস্কার—আর অপরদিকে মানব ও মানসমুক্তির যুদ্ধ ঘোষণা—এই দুই বিপরীত বৃত্তির দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়েই সেদিনের নবযুগের যাত্রা সুরু হয়। সেদিন দ্রষ্টা ছিলেন রামমোহন, আর পথিক ছিলেন বিদ্যাসাগর। এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, একদিকে স্বার্থপরতা, জড়তা, মূর্খতা অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদের ওপর সমাজের অত্যাচার, পুরুষের হৃদয়শূন্যতা, নিৰ্জ্জীব জাতির নিশ্চলতা, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুরীতির ফল, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, একদিকে নিৰ্জ্জীব, নিশ্চল তেজোহীন বঙ্গসমাজ, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "বিদ্যাসাগর" পুঁথি হইতে সংকলিত)।

ইংরেজ প্রবর্ত্তিত শাসন ব্যবস্থা ও সামাজিক রীতিনীতি এবং তাঁদের আনীত জীবনাদর্শ. তা যেন তাদের অনিচ্ছাতেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, প্রাকবৃটিশযুগীয় ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ও মানসে যে কি পরিবর্ত্তন সাধিত করেছিল তার একটি ক্ষুদ্র পরিচয় নেওয়া এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন—কেন না তবেই সেদিনের সেই পরিবেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগে ভারতের সমাজ সংস্থায় ব্যক্তির অন্য-নিরপেক্ষ কোন স্বাধীন সত্তা বা অস্তিত্ব অস্বীকৃত ছিল—পরিবার ছিল সেদিনের সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক ইউনিট বা একক। আর তাই ব্যক্তির মানস জীবনের সাক্ষাৎ প্রাথমিক নিয়ন্ত্রক অর্থাৎ পরিবারের শাসনাধীন এবং পরিবার নির্ভর ছিল সেদিন ব্যক্তি-মানস। আবার এই পরিবারের মানস-জীবন ছিল সেদিন গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ নিয়ন্ত্রিত—তার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। তাদের শাসনক্ষেত্রের চৌহদ্দি খুব বিস্তৃত ছিল না এবং সেই জন্য তার বিধি বিধান ছিল নির্ম্মম প্রতিবাদহীন—তার ন্যায় অন্যায়ের বিচারের বিরুদ্ধে "কোন আপীল ছিল না। কাজেই তার বাইরের আকৃতি গ্রাম্য হ'লেও, তাঁর চক্ষু গ্রাম্যদেবতার মত রক্তবর্ণ, দুর্ব্বার ইচ্ছা—অনিচ্ছার প্রেরণায় স্বৈরাচারী।" এই প্রকারের ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ জীবনযাত্রায় প্রতিবাদ বিহীন স্বৈরাচারী বিধিব্যবস্থা সৃষ্ট পরিবেশ সেদিন ইংরেজ প্রবর্ত্তিত শাসনব্যবস্থা সামাজিক বিধিব্যবস্থা, ল অ্যাণ্ড অর্ডারের নূতন বিধি, নূতন আদর্শ, নূতন ভূমি সম্পর্ক ইংরেজের ব্যক্তিগত সাহচর্য্য এবং তাদের আনা শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে নূতন জীবনাদর্শের অভূতপূর্ব্ব আস্বাদ লাভ ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায় ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেল। আমাদের সমাজ ইতিহাসে সেদিন ব্যক্তি প্রথম পরিবার তথা গ্রাম্যপঞ্চায়েতের শাসন চৌহদ্দর

নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করবার অধিকার লাভ করল। কোনপ্রকার বাধা বন্ধন রইল না। সেদিন মানুষ অনুভব করল—সেও মুক্ত এবং স্বতন্ত্র।

ইংরেজের অবিচার, অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং দাসত্বের বন্ধনের কথা বিস্মৃত হবার নয়—তবে একথাও সত্যি সেদিন তারা তাদের অজ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছায় যে মানব ও মানস মুক্তির বাণী বহন করে এনেছিল, ইংরেজী, সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাসের পুঁথিপত্র ও পঠন পাঠনের মাধ্যমে হিন্দুকলেজের ছাত্রবৃন্দ তার অপূর্ব্ব আস্বাদ লাভ করেছিলেন—আর এ ব্যাপারে প্রিয়তম শিক্ষক ডিরোজিওর সাহচর্য্যও মুখ্য ছিল। সেদিন তাঁদের এই প্রিয়তম শিক্ষকের দৃঢ় কণ্ঠ থেকে মানস মুক্তির ও সত্যনিষ্ঠার যে জীবনাদর্শের বাণী নিসৃত হয়েছিল তাই সেদিন এই তরুণদের চিত্তকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়ে বলেছিল, "তোমরাও স্বাধীন—সত্যনিষ্ঠায় তোমাদের জীবন পণ কর।" টম পেইনের Age of Reason সেদিন এই তরুণদের "বেদ" "বাইবেল" হ'য়ে উঠলো।

হিন্দুকলেজ সেদিন ছিল এই আবর্ত্তের কেন্দ্রস্থল এবং হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্রবৃন্দ ছিলেন তার নায়ক। তখন কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃত কলেজে একান্তভাবেই পাঠ-নিমগ্ন। অবশ্য সে আমলে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ একই গৃহে অবস্থিত ছিল। বিদ্যাসাগরকে তখন আমরা দেখি সংস্কৃত কলেজের একজন একনিষ্ঠচিত্তে অধ্যয়নরত ছাত্র হিসাবে। সেদিন অধ্যাপক শ্রেণী ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যাবত্তায় বিস্ময়ে হতবাক্। একথা শোনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র নাকি এসময় সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম বিস্মৃত হয়েছিলেন—জানিনা সেদিনের সমাজ বিক্ষোভের প্রভাব এতে কতটা।

কালের সেই তীব্র অন্তর-প্রেরণা, সেই যুগ-প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে তীক্ষ্ণধী তীব্র আত্ম-চেতনা সম্পন্ন ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌তে পারেন নি। বারবৎসরের সংস্কৃত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা নিষ্ফল হয়ে গেল। হিন্দু ধর্ম্মকর্ম্ম শাস্ত্রাদি ও জীবনায়ন বিদ্যাসাগর মানসপটে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হ'ল না। ইংরেজের মানব ও মানস-মুক্তির বাণী, সামাজিক বিধি-বিধানের মর্ম্মবাণী তাদের বলিষ্ঠ কুসংস্কার-জয়ী মনন ও মানবধর্ম্মের জীবনাদর্শ তাঁর চিত্তকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। তাই সংস্কৃত কলেজের সেরাছাত্র যখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তখন দেখি, তাঁর মনন কর্ম্ম ও জীবনধারার মধ্যে দিয়ে সেদিনের যুগপ্রবৃত্তি কালের অন্তর—প্রেরণা অধিকতর গভীর সামাজিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় মনন ও জীবনের মূল ভিত্তিই সমাজ। ভারতীয় সমাজ মানসেরও যেই ক্ষণে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সেইক্ষণে আমাদের সমাজ মানসে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার আবির্ভাব ঘটেছে। রাষ্ট্রনৈতিক সাধনা তখনও সুরু হয় নি। রামমোহন যখন যাত্রা সুরু করেছেন—য়ুরোপ তখন নূতন জীবনাদর্শের বাণী নিয়ে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছে। স্বৈরাচারী সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদসাধন ক'রে গণতন্ত্র এবং সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শের জয়যাত্রা সুরু হয়েছে। প্রথমে রামমোহন এবং পরবর্ত্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, কেশব সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম, মাইকেল প্রভৃতি নব্যযুগীয়েরা এই নূতন জীবনবাদকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। সেদিন য়ুরোপ জীবনাদর্শের যে নূতন বাণী বহন ক'রে এনেছিল বিদ্যাসাগর মহাশয় তা' শুধুমাত্র চেতনা দ্বারা মুক্তিদ্বারা উপলব্ধি ক'রেই ক্ষান্ত থাকতে পারেন নি। মানব-ধর্ম্মের তীব্র অনুভূতির প্রেরণায় তিনি সক্রিয়ভাবে সেদিন সকলপ্রকার বিরোধ বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে নূতন জীবনাদর্শকে সকল মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার মানসে ঝাঁপিয়ে পড়েন। একটা কথা, সেদিনের ভারতীয় সমাজ-মানসের ইতিহাসগত বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এই কথাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, যুগধর্ম্মের প্রভাবে এ জাতির উপরিস্তরে যত তরঙ্গই উত্থিত হোক, তলদেশে একটা গভীরতর আকুতি, উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল। এই আকুতিই বিদ্যাসাগর মানসে ও বাণীতে রূপ পেয়েছিল। এই যে আকুতি, এই যে উদ্দীপনা তার মূলে ছিল নূতন জীবনবোধ। এই জীবনবোধের বিশ্লেষণ করলে দেখি, মানব-জীবনে গৌরববোধ জীবন জিজ্ঞাসা, মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধান এবং মনুষ্য জীবনের মাহাত্ম্য ঘোষণা, মানুষই মানুষের আদর্শ ও মানবতাবোধের মহিমাই সকল আদর্শের মূল। বিদ্যাসাগর মানসে এই জাগরণ রূপায়িত হয়েছিল। উনিশ শতকের সমাজ-মানসের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার মাপ কাঠিতে বিশ্লেষণ করলে প্রধানতঃ দুটি উপাদান চোখে প'ড়ে, একটি বলিষ্ঠ মানবিকতা ও স্বজাতি সচেতনতা এবং অপরটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ। প্রথমটি রূপ নেয় জাতীয়তাবোধে এবং পরেরটি গণতান্ত্রিক বোধে ও ভাবধারায়। বিদ্যাসাগর মানসে এই দুই বোধই প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। রামমোহনের জীবিতকালেই বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন—তাই দেখি, বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ছিল রামমোহন প্রভাবিত। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য ধর্ম্ম প্রচার বা ধর্ম্ম সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করেননি—আধ্যাত্মিকতা, অলৌকিকতা, অজ্ঞানতা, ও অদৃষ্টবাদের পঙ্কিল আবর্ত্ত থেকে সেদিনের জন মানসের মুক্তির উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং মানবদরদী, চিন্তানায়ক ও কর্ণধার। সেদিন তাঁকে বিদেশী শাসক ও দেশী সমাজ—উভয়ের প্রতিকুলতার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল এবং এই উভয় শক্তির বিরুদ্ধে, অবিরাম সংগ্রাম ক'রে তাঁকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। যাঁরা একথা ব'লেন, ইংরেজের অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের দেশবাসীরা আধুনিক সংস্কৃতির আস্বাদন থেকে বঞ্চিত থেকে যেতেন—তাঁদের শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এই ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের সাথে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগ্রামের কাহিনীটী স্মরণ করতে বলি। ইংরেজী-শিক্ষা প্রসারের ফলে এদেশের মানুষের মনে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষের সহায়ক হ'তে পারে এই আশঙ্কায় ইংরেজ সরকার সেদিন পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবর্ত্তে দেশের প্রাচীন শিক্ষাকে এদেশে প্রচলিত রাখবার জন্য অর্থ-ব্যয়ের সংকল্প করেছিলেন। তখন রামমোহন এই

শিক্ষার অশুভ ফলের কথা স্মরণ ক'রে বিচলিত হ'ন এবং এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও শাসকবর্গের এই কুটিল অপচেষ্টার সম্মুখীন হ'তে হয় এবং তাঁর প্রতিবাদ সেদিন প্রতিরোধের পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়। সরকারী শিক্ষা-বিভাগে নিযুক্ত থেকেও সরকারী উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম ক'রে তাঁর স্বকীয় পরিকল্পনানুযায়ী বাংলা-শিক্ষার বিস্তারের চেষ্টা ক'রেছিলেন যা'তে এই পঠন-পাঠনের মাধ্যমে দরিদ্র অজ্ঞ দেশবাসী সেদিনের নূতন জীবনবোধ ও আধুনিক সংস্কৃতির আস্বাদন লাভ করতে পারে। সেই সময়কার শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট তিনি যে পদত্যাগ পত্র পেশ করেছিলেন তা একদিকে যেমন জাতীয় মর্য্যাদা বোধের পরিচায়ক—তেমনই মিশনারী মার্কা সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

জাতীয় মর্য্যাদা বোধ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মন ও ভাবধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই মর্যাদাবোধ তিনি আজীবন অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। যে দিন আমাদের সমাজ-জীবনে সাহেবীয়ানার প্রবল-বন্যা, সেদিন ইংরেজী শিক্ষার অনুরাগী য়ুরোপাগত জীবনাদর্শের পূজারী বিদ্যাসাগর কিন্তু এই বন্যায় ভেসে যান নি। নূতন-জীবনাদর্শের সত্যটিকে তিনি উপলব্ধি করে নিজের দেশের জল-হাওয়া-মাটির উপাদানে তার প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তাঁর চরিত্র-পূজা পুঁথিতে, "আমাদের দেশের প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরেজের অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহেবের হাত হইতে 'শিরোপা' লইবার জন্য কখনো মাথা নত করেন নাই। তিনি আমাদের দেশের ইংরেজ-প্রসাদ-গর্ব্বিত সাহেবানুজীবীদের মত" আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। একবার তিনি কার্য্যোপলক্ষে হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী সাহেব তাঁহার বুট বেষ্টিত দুই পা টেবিলের উপর উর্দ্ধগামী করিয়া দিয়া বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রতা রক্ষা করা বাহুল্য বোধ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার সাহেব কার্য্যবশতঃ সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর চটি জুতো সমেত তাঁহার সর্ব্বজন-বন্দিত চরণযুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া এই অহংকৃত ইংরেজ অভ্যাগতের সহিত আলাপ করিলেন।"

ইংরেজী শিক্ষা ও সেই শিক্ষা-বাহিত জীবনাদর্শের অনুরাগীই শুধু নন, তার প্রচারক ও বাস্তবে তার রূপায়নের সংগঠক বিদ্যাসাগরের ভাবধারায় ও জীবন-যাত্রায় কোন ক্ষেত্রে কোন দিনও বিদেশীর মিথ্যা অনুকরণ স্পৃহা কিন্তু স্পর্শ করতে পারেনি। তাই একথা বলা চলে—বিদ্যাসাগর মানস ও জীবন-যাত্রায় সেদিনের সদ্য উন্মেষিত জাতীয়তা-বোধ মূর্তি হয়ে উঠেছিল। তাই উত্তরকালের জাতীয়তাবাদের শিক্ষায় বিদ্যাসাগর অন্যতম ব্যক্তিত্ব।

বিদ্যাসাগরের রাষ্ট্র-নৈতিক-মানসের অন্যতম উপাদান তাঁর মানবতা-বোধ, যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ। মানবতাবোধের অন্ধ প্রেরণায় সেদিন যা কিছু কাজ সমাজমঙ্গলের জন্য করণীয় ও সত্য বলে তিনি মনে করেছেন, তা সম্পাদন করতে তিনি সামাজিক, ধর্ম্মীয়, শাস্ত্রীয়—কোন বাধাই সেদিন গ্রাহ্য করেন নি।

১৮৫৩ মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয়েই যে কাজটি করেছিলেন, তা একদিকে যেমন তাঁর বলিষ্ঠ মানসিকতার পরিচয় দেয়, অপরদিকে তেমনই তাঁর গণতান্ত্রিক মানসিকতার স্বাক্ষ্য বহন করে। সেদিন শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্ররাই সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ পেত; বিদ্যাসাগর মহাশয় অধ্যক্ষ হ'বার একবছরের মধ্যে ব্রাহ্মণেতর জাতির ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্যাসাগরচরিতে' লিখেছেন,…"তখন সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না। বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদিগকে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় সেদিন বলেছিলেন, শূদ্রেরা যদি সংস্কৃত চর্চ্চায় অনধিকারী, তবে তাঁরা রাজারাধাকান্ত দেবের সংস্কৃতচর্চ্চা বন্ধ করছেন না কেন? অর্থের প্রলোভনে ম্লেচ্ছ সাহেবদেরই বা সংস্কৃত পড়ান কেন?

গণতান্ত্রিক ভাবধারা এবং নূতন জীবনাদর্শের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রদ্ধা বড় গভীর ছিল। সেদিন তিনি সাংখ্য ও বেদান্ত পড়াতে বাধ্য হলেও জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি মণীষীদের রচিত ইংরেজী গ্রন্থের সংগে ছাত্রদের পরিচিত করতে চান, যাতে তাদের আদর্শ ও যুক্তিধারা বেদান্ত ও সাংখ্যের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে। বিদ্যাসাগর সেদিন স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করেছিলেন, "For certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankhya in the Sanskrit College. That the Vedanta and Shankhya are false is no more a matter of dispute. Whilst teaching these in the Sanskrit Course, we should oppose them by sound. Philosophy, in English Course to counteract their influence," বিদ্যাসাগর-মানসের কোথাও 'বেদে আছে' মনোভাবের কোন পরিচয় আমরা পাইনে। যুক্তি-বিচার ছিল তাঁর বিশ্বাস ও মননের মাপকাঠি। আধ্যাত্মিকতা, অদৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর যুদ্ধ-ঘোষণা। সকল দেশের রাষ্ট্রীয় চেতনার বিশ্লেষণ করলে দেখি, সকল দেশের রাষ্ট্রীয় চেতনা ও তার সাধনার মূল ভিত্তি উপরিউক্ত মানস কাঠামো।

বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সোমপ্রকাশ' কাগজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কাগজে তিনি সেদিনের কুখ্যাত নীলকরদের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারতের অর্থ-নৈতিক তথা সামাজিক-রাজনৈতিক অগ্রগতিকে মারাত্মক আঘাত হেনেছে বলে আজ আমরা উপলব্ধি করেছি বিদ্যাসাগর সেই দিনেই তা' উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদও জানিয়ে-ছিলেন তাঁর 'সোমপ্রকাশে'র মাধ্যমে। এ থেকেও সমাজ-সচেতন বিদ্যাসাগর মানসের পরিচয় আমরা পাই।

পঞ্চানন কর্ম্মকার

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চানন কর্ম্মকার !—নামটা শুনেই আপনারা হয়তো একটু দ্বিধায় প'ড়েছেন। ভাবছেন, কে এই পঞ্চানন? কেউ-কেউ হয়ত ইতিমধ্যেই মনে মনে ভেবে দেখ্‌ছেন—ভারতের যুগাবতার, সম্রাট, দেশ-নেতা, কবি প্রভৃতিদের দলে পঞ্চাননের নাম পাওয়া যায় কি না। কিন্তু আমি আগেই ব'লে রাখ্‌ছি—বৃথা চেষ্টার প্রয়োজন নেই, ঐসব ব্যক্তিদের নামের তালিকায় পঞ্চাননের নাম মিল্‌বে না !

তবে কি, আপনারা হয়তো এইবার ভাবছেন, তবে কি স্বনামধন্য মহাপুরুষদের জীবনী কেউ-না-কেউ লিখে ফেলেছেন ব'লে, আমি এই অপরিচিত পঞ্চানন কর্ম্মকারের জীবনী আলোচনা ক'রে, বিনা-প্রতিযোগিতায় প্যাতিলাভের চেষ্টায় আছি—অথবা ব্যক্তিগত কারণে—অর্থাৎ এই কর্ম্মকার নন্দনটি হয়তো একসময়ে বিনা-পারিশ্রমিকে আমার ব্যবহৃত ক্ষুর বা বাড়ীর বঁটি 'শান' দিয়ে দিয়েছিল—তার জীবন-কাহিনী প্রকাশ ক'রে কৃতজ্ঞতা জানাবার চেষ্টা করছি! কিন্তু জেনে রাখুন, সে-সব ধৃষ্টতা আমার নেই !—আপাততঃ এইটুকু মাত্রই ব'লে রাখছি—এই-যে নিত্য সকালে উঠেই আপনারা পরিষ্কার-ছাঁদে-ছাপা বাংলা খবরের কাগজে দেশের সংবাদ পাঠ করছেন, বাংলা-সাহিত্যের অসংখ্য পুস্তক ছাপার অক্ষরে প'ড়ে আপনাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার বর্দ্ধিত করছেন, আর, এমন কি, পঞ্চানন সম্বন্ধে দুর্লভ আলোচনা আমিও আপনাদের চোখের সামনে এইভাবে ধ'রতে পেরেছি—এ সবেরই মূলে আছে—পঞ্চানন।

পঞ্চানন কর্ম্মকার সম্বন্ধে কোন কথা ব'ল্‌তে গেলে আমাদের যেতে হবে প্রায় পৌনে দু'শো বছর আগেকার বাংলাদেশে,—যখন যাত্রা, তরজা, কথকতা, নাম-সংকীর্ত্তন প্রভৃতির মাধ্যমে সাধারণলোকের মানসিক উৎকর্ষতা ও সহজে উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের সুযোগ থাকলেও, পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষাপ্রচারের ব্যবস্থা একেবারেই অজ্ঞাত ছিল, আর তার একমাত্র কারণ হচ্ছে—বাংলা-ছাপাখানার তথা ছাপা-পুস্তকের সম্পূর্ণ অভাব।

পণ্ডিতগণ তাঁদের পুঁথিগুলি কাঠের মলাটে বেঁধে, পুরু ন্যাকড়া জড়িয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতেন। দেবীর আদেশে, পাঁচজনের শুধু মঙ্গলের জন্যই যাঁরা কাব্য লিখ্‌তেন—তাঁদের কাব্যও ক'খানাই বা আর অনুলিখিত হ'তো! অনুলেখকগণের স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত প্রক্ষিপ্ত ও বিকৃত অনুলেখনও বা ক'জনের হাতে পড়্‌ত!—যারাই পেত, তারাই সেটিকে ঠাকুরঘরে রেখে চন্দন ছিটিয়ে প্রায় দেবতার সামিল ক'রে তুল্‌তো!

এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'লো ইংরাজী ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে—যা'র বছর কুড়ি আগে পলাশী-মাঠে ফুটবল-ম্যাচ খেলার মত একটা যুদ্ধ হ'য়েছিল এবং ট্রফি ছিল সোনার বাংলা! এ-পক্ষ হাফটাইম পর্য্যন্ত বেশ চেপে খেললেও, ভাল 'স্কোরার'-এর অভাবেই হোক্‌, বা কোন-কোন খেলোয়াড় 'বেট্‌' খেয়েছিল ব'লেই হোক্‌—গোল দিতে পারলে না! আর ও-পক্ষ শেষদিকটায় একটু কায়দার ওপর খেলে, ব'ল্‌তে গেলে, একটা 'অফ-সাইড' গোল দিয়েই জিতে গেল!—সমবেত বাঙ্গালী দর্শক এতে বেশ আনন্দই পেয়েছিল—আর জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতি শ্বেত-গ্যালারীর দর্শকরা এতজোরে হাততালি দিয়েছিল যে তার রেশ সেদিন অবধিও, কণ্ট্রোলের লাইনে দণ্ডায়মান আমাদের কানে সজোরে বেজেছে!…সে যাই হোক্‌, বণিকজাতির হাতের ওজন-দাঁড়ি রাজদণ্ডের রূপধারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের দৃষ্টি কর্ম্মচারীদের দেশীয় ভাষা-শিক্ষার প্রতি নিবদ্ধ হলো। ঘোষণাপত্রগুলি দেশীয় ভাষাতেই শহরের বাজারে বাজারে লটকাবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল।…

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভাল নেই—কারণ, ভদ্রলোক এমন কতকগুলি কাজ ক'রেছিলেন—যা, যদিও প্রত্যেক ভাগ্যবান লোকই সুযোগ পেলে করে থাকেন কিন্তু ধরা পড়েন না—আর হেষ্টিংসের অপরাধ এই যে তিনি ধরা প'ড়েছিলেন, আর তাঁর বিচারও হ'য়েছিল! তবে, এই হেষ্টিংসের কাছে আমরা, বাংলা ভাষা-ভাষীরা, অন্ততঃ একটা দিকে বিশেষভাবে ঋণী।…হেষ্টিংসের নিজের লেখাপড়া কতদূর ছিল বলা যায় না, কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল, তা' অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই। 'গ্ল্যাড-উইন্‌', 'হ্যালহেড' প্রভৃতি পণ্ডিতদের বাংলা রচনায় উৎসাহ দিয়ে হেষ্টিংস্‌ যে সব পত্র লিখেছিলেন, তা' এখনো রক্ষিত আছে। সেগুলি পড়লেই বাংলাভাষা সম্বন্ধে তাঁর উদার মনো-ভাবের উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।…হেষ্টিংসের উৎসাহে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যাল্‌হেড ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাংগোয়েজ' পুস্তক রচনা সমাপ্ত করেন। কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ ক'রে তোলবার জন্য ঐ ব্যাকরণ রচনা ক'রে গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌কে তিনি এর মুদ্রণের ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ করেন।

হ্যালহেডের ব্যাকরণ মুদ্রণের কাজে বাংলা হরফ অত্যাবশ্যক হ'য়ে পড়্‌লো। তখনও পর্য্যন্ত বাংলা হরফ প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থা হয় নি। লণ্ডনে কিছু আগে একবার এ বিষয়ে চেষ্টা হ'য়েছিল কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নি। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের মনে পড়লো—পণ্ডিত চার্লস্‌ উইল্‌কিন্‌স্‌ একবার অবসর কাটাবার জন্য, সখ ক'রে, দু' একটা বাংলা অক্ষর তৈরী ক'রেছিলেন। তিনি তাঁকেই স্মরণ ক'রলেন। তখন উইল্‌কিন্‌স্‌ ও হ্যালহেড দু'জনেই থাকেন হুগলীর কুঠিতে। উইল্‌কিন্‌স্‌ বন্ধুর বই

ছাপানোয় সহায়তা করতে বেশ উৎসাহই বোধ করলেন। কিন্তু বাংলা হরফ তৈরী করবার শক্তি তাঁর আর কতটুকু! তাই তিনি এক স্থানীয় কর্ম্মকারের সন্ধান করতে লাগলেন।...কিন্তু কারও কাজ বা একাগ্রতা তাঁর পছন্দ হয় না! মাসের পর মাস কেটে যায়! তিনি ব্যাকুল হয়ে লোক খুঁজে বেড়াচ্ছেন! শেষকালে, একদিন চুঁচুড়ার প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কামারশালায় একটি যুবকের দেখা তিনি পেলেন। যুবকটি কৃষ্ণকায়। তার টানা-টানা চোখ ও উজ্জ্বল ললাটে রক্তচন্দনের তিলক। তার সুগঠিত চেহারা, প্রশস্ত বক্ষ আর প্রাণবন্ত দেহ-সৌষ্ঠব দেখ্‌লে মনে হয়—বিধাতা যেন বিরলে ব'সে তাকে কুঁদে তৈরী ক'রেছেন! উইল্‌কিন্‌স্ বুঝ্‌লেন—তাঁর কারিকর অনুসন্ধানের ব্যাকুল প্রয়াসের এইবার সার্থক অবসান হ'লো! যে রকম লোক তিনি চেয়েছিলেন—ঠিক সেই লোকই এবার তিনি পেয়েছেন।

এই যুবকটি আর কেউ নয়—আমাদের পঞ্চানন কর্ম্মকার। উইল্‌কিন্‌স্ সাহেব পঞ্চাননকে সাদরে আহ্বান ক'রে ছেনি দিয়ে কেটে অক্ষর খোদাই-কাজ করবার জন্য অনুরোধ করলেন। প্রথমটা পঞ্চানন একটু ইতস্ততঃ করেছিল—তার কারণ—কর্ম্মগ্রহণের ভীতি নয়—সে শুধু ভেবেছিল—পবিত্র পুঁথি, যা হাতেই লেখা হয়—ছাপার অক্ষরে প্রচার করবার উপলক্ষ হ'য়ে সে কোনও অন্যায় বা পাপ করবে না তো?...কিন্তু হালহেড সাহেব যখন তাকে রহস্যচ্ছলে বোঝালেন যে তা'তে পঞ্চাননের পাপ তো হবেই না, উল্টে, পরে যখন শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যকাহিনী পঞ্চাননের কল্যাণেই সাধারণে পড়্‌তে পারবে তখন তা'রা পঞ্চাননকে আশীর্ব্বাই করবে—তখন পঞ্চাননের মনে আর কোনও দ্বিধা রইলো না—সানন্দে সে কাজ নিতে রাজী হ'লো!...১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে উইল্‌কিন্‌স্ সাহেবের প্রেসের যাবতীয় অক্ষর নিরলস কর্ম্মী পঞ্চানন ক্ষোদাই করলে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দেই এই প্রেস থেকে হালহেডের 'হিষ্ট্রি অব্ বেঙ্গল ল্যাংগোয়েজ' ছাপা হ'য়ে বেরুলো। তারপরে, ছাপা হয় ইম্পের কোড।

পঞ্চাননের কাটা প্রথম অক্ষরগুলি তেমন সমান ও সুদৃশ্য ছিল না। তার উপর 'উ' 'ঊ' 'রেফ'—প্রভৃতি ফলাগুলি ও যুক্তাক্ষরগুলি লাইন থেকে এরূপ উঁচু-নিচু থাক্‌তো যে কিছু আগেও পণ্ডিতদের ধারণা ছিল যে প্রথম বাংলা অক্ষর বুঝি কাঠে ক্ষোদাই হয়। কিন্তু এ-ধারণা ভুল। প্রথম থেকেই, যাবতীয় বাংলা অক্ষর পঞ্চাননকৃত ছেনি-কাটা ছাঁচে ধাতু দ্রব্যে ঢালাই করা অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল।

কিছুদিন পরে হুগলীর প্রেস উঠে যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে পঞ্চানন বাংলা হরফ ক্ষোদাই-এর কাজে এরূপ দক্ষ হয়েছিল যে তার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়েছে। তাই পাদ্রী কেরি সাহেব যখন শ্রীরামপুরে একটি ছাপাখানা স্থাপন করলেন, তখন অনেক সম্বর্দ্ধনা ক'রে পঞ্চাননকেই সেখানে নিয়ে গেলেন। এখান থেকে পঞ্চাননকে ধ'রে বাংলা অক্ষর ঢালাই ক'রে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরি বাইবেলের বঙ্গানুবাদ বা'র করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বেরোয় রাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত। ১৮০১ সালে কেরীর 'কথোপকথন' এবং ১৮০২ সালে, গোলোক শর্ম্মার 'হিতোপদেশ' ছাপা হ'লো। তারপর, আরো নানা পুস্তকের সঙ্গে ছাপার অক্ষরে বেরুলো—পঞ্চাননের বহুবর্ষের প্রতীক্ষার ফল—জীবনের স্বপ্ন—কৃত্তিবাসী রামায়ণ! রামায়ণটি আদ্যোপান্ত সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার!

এইভাবে, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীরামপুর প্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে, ছাপা-বাংলা সাহিত্যের সেই আদিযুগে, পঞ্চানন বাংলা ভাষার বহু পুস্তক প্রচারে সহায়তা ক'রেছে।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ পঞ্চানন অবসর গ্রহণ করলে, তার স্থলে তা'র জামাই মনোহর ঐ কাজে লাগে।

সুদৃশ্য বাংলা হরফ সৃষ্টির কাজে পঞ্চাননের অবদান যে কতখানি তা আমরা আজ হয়তো বুঝ্‌তে পারবো না, কিন্তু যে সময় বাংলা হরফের কোন প্রচলিত আদর্শ সামনে ছিল না, এবং যে যুগের বাংলা হাতের লেখার যা নমুনা আমরা পাই—তার না-আছে মাত্রা, না-আছে ছন্দ এবং এতদূর অস্পষ্ট ও দুষ্পাঠ্য যে ফারসীতে লেখা ব'লেই মনে হয়,—সে সময় সুরুচি ও সু-ছাঁদের অক্ষর তৈরী ক'রে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সেগুলি সাজিয়ে একটি স্থায়ী আদর্শ খাড়া করা যে পঞ্চাননের অদ্ভুত প্রতিভা ও সৃজনী শক্তির পরিচায়ক তা'তে আর সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ বর্ত্তমানে এদেশে যে বাংলা-ছাপা-অক্ষর প্রচলিত আছে অর্থাৎ যে-অক্ষরে আধুনিক ও অগ্রগামী চিন্তাসূচক বাংলা পুস্তকগুলি ছাপা হয়, পঞ্চাননির্ম্মিত অক্ষরের আদর্শেই সেগুলি প্রস্তুত হ'য়ে থাকে।
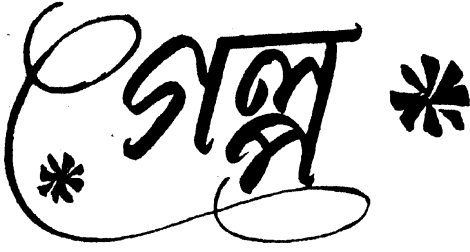
গোরস্থান

প্রশান্তকুমার চৌধুরী

আমাদের গত রবিবারের সন্ধ্যের আড্ডার আলোচনার বিষয় বস্তুটা ছিল সার্কুলার রোডের গোরস্থান। মহাকবি মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ নিয়ে হয়েছিল আলোচনার সূত্রপাত—তারপর বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভের গঠনচাতুর্য্য, ক্ষোদিত লিপির ভাষা, শব-সমাধি এবং শবদাহের ভাল-মন্দ ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে চলতে মাঝখানে বিনয়দা হঠাৎ বলে উঠলেন—'সার্কুলার রোডের গোরস্থানের ঐ নিচু রেলিং-এর জায়গায় ইঁটের উঁচু পাঁচিল হওয়া উচিত।'

'কোন প্রয়োজন নেই'—বলে উঠলো ফাজিল দেবু।

'প্রয়োজন নেই মানে?'—খিঁচিয়ে ওঠেন বিনয়দা—'তুই কি মনে করিস, যেভাবে ওটা ঘেরা হয়েছে তাতে জায়গাটা যথেষ্ট সুরক্ষিত হয়েছে?'

'দরকার কি সুরক্ষিত করবার?'—মুচ্‌কি হেসে বলে দেবু—'গোরস্থানের ভেতরে যাঁরা আছেন, তাঁরাও কেউ রেলিং টপ্‌কে বাইরে আসছেন না; আর বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁদেরও বোধহয় বিন্দুমাত্র সাধ নেই ভেতরে গিয়ে শয্যাগ্রহণ করবার। কি বল বিনয়দা?'

বিনয়দা কিছু বলবার আগেই ঘরশুদ্ধ সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে। হাসিটা থামতেই অনাথ অত্যন্ত গম্ভীর এবং শান্তকণ্ঠে বলে ওঠে—'এমনভাবে হাসিটা আমাদের উচিত হচ্ছে কি?'

বাইরে তখন বৃষ্টি চলেছে মুষল ধারায়। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো আড্ডাঘরের কাঁচের সার্সির ভেতর দিয়ে এসে পড়ছে দেয়ালের ওপর। থেকে থেকে গুড় গুড় করে গর্জ্জে উঠছে মেঘ। সদ্য-চর্ব্বিত পাঁপড় ভাজার তেলটা ঠোঁট থেকে মুছতে মুছতে মণ্টুবাবু বললেন—'কি বলতে চাও হে অনাথ?'

তেমনি গম্ভীর গলায় অনাথ বললে—'গোরস্থানের বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁরা সাধ করে কেউ যে ভেতরে শয্যা পাততে যাবেন না, দেবুর একথা মানলুম। কিন্তু ভেতরে যাঁরা আছেন, তাঁরা কখনো কোন অবস্থাতেই যে বাইরে আসেন না, এমন কথাটা খুব জোর করে বলা চলে কি?'

অনাথের কথাটা শুনে হেসে উঠল বটে অনেকেই, কিন্তু হাসির আওয়াজ বা ভঙ্গি কোনটাই তেমন জোর মনে হল না। নীহারবাবু একটু তফাতে বসে সিগারেট টানছিলেন, ফরাসের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দেবুর গা ঘেঁষে বসে বলে উঠলেন—'অনাথ কি ভূত বিশ্বাস কর নাকি হে?'

দেবু বললে—'আপনি?'

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়ে নীহারবাবু শুধু বললেন—'এইবার ঘরের আলোটা জ্বাললে হয় না?'

কথাটা এমন আস্তে বলা হল যে, ঠিক কানেই গেল না বোধহয় কারুর। অন্ধকার আড্ডাঘরে মণ্টুবাবুর গলা শোনা গেল—'অনাথের কি ভূত দেখার অভিজ্ঞতা আছে নাকি?'

'আজ্ঞে না'—অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বললে অনাথ—'সে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়নি আমার জীবনে।'

'তবে ফস্‌ করে ঐসব যাচ্ছেতাই কথাগুলো বলবার দরকার কি বাপু?'—নীহারবাবু দেবুর আরো গা ঘেঁষে বলে ওঠেন।

'যাচ্ছেতাই কথা ত বলিনি আমি নীহারবাবু!'—অনাথ শান্তকণ্ঠে বলে—'আমি শুধু বলেছি, গোরস্তানের ভেতরে যাঁরা থাকেন, তাঁরা কখনো কোন অবস্থাতেই যে একবারো বাইরে আসেন না; এমন কথাটা খুব জোর কোরে বলা ঠিক নয়।'

'নয়ই ত'—বেশ চীৎকার করেই বলে ওঠেন নীহারবাবু—'যাঁদের সম্বন্ধে আমাদের পুরোপুরি কিছুই জানা নেই, তাঁদের সম্বন্ধে ফস্‌ করে কিছু বলা ভাল নয়।'

বিদ্যুৎ চমকে উঠলো আবার—এবং ঘরের অন্ধকারটা যেন আরো ঘনীভূত করে তুললে। বঙ্কিমের গলা সেই অন্ধকারে যেন বিদ্যুতের মতই ঝলসে উঠল—'আরে, রেখে দিন মশাই—গোরস্থানের বাইরে তাঁরা আসেন, এমন প্রমাণ পেয়েছে অনাথ কোনদিন ?'

'পেয়েছি',—অনুত্তেজিত শান্তকণ্ঠ অনাথের।

'আহা-হা, আলোটা জেলে দিয়ে এসো না, একহাত পাশায় বসা যাক্। কি সব যে বিদ্ঘুটে···!!—নীহার-বাবুর বক্তব্য শেষ হবার আগেই সমস্বরে সকলে বলে উঠল—'সুরু হোক্ অনাথ।'

অনাথ সুরু করলো—'রাত তখন দুটো হবে। কলকাতার রাস্তা তখন নিথর নিঝুম্। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে—রাস্তার এখানে-ওখানে জল। আকাশে আবার আর এক পশলা জল ঢালবার তোড়জোড় চলছে তখনো। এক ট্যাক্সি-ড্রাইভার তার বেবী ট্যাক্সিখানা নিয়ে ফিরছিল যাদবপুরের দিক থেকে। নিকট-আত্মীয়ের সংকট-জনক অবস্থার খবরে উদ্বিগ্ন কোনো ভদ্রলোককে যাদবপুরের একটা থমথমে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসছিল বোধহয়। মনটাও বুঝি তাই তার থম্ থম্ করছিল কেমন। তাছাড়া সারাদিনের খাটুনির পর বড় ক্লান্ত লাগছিল তার নিজেকে। নিস্তব্ধ গভীর রাতে কলকাতার জনমানবহীন ফাঁকা রাস্তা দিয়ে গাড়ীখানা চালিয়ে আসতে আসতে তার চোখদুটো ঘুমের আঠায় যেন জড়িয়ে আসছিল বার বার। হঠাৎ তার চোখ পড়ল, গড়িয়াহাটার মোড়ে কে একজন যেন দাঁড়িয়ে আছে টেলিগ্রাফের পোস্টের নিচে—হাত বাড়িয়ে তার ট্যাক্সিটাকে থামাবার ইঙ্গিতও যেন করছে সে।

ট্যাক্সিখানাকে ঘ্যাঁচ্ করে এনে দাঁড় করালে সে সেই লোকটির সামনে। আসন্ন নিদ্রায় ক্লান্ত চোখদু'টো তুলে ভাল কোরে তাকিয়ে দেখলে লোকটিকে। ময়লা রং, অঙ্গে সাহেবী কোট-প্যাণ্ট—চেহারাটা দেখে মাদ্রাজী-মাদ্রাজী মনে হল। ট্যাক্সিখানা দাঁড়াতেই বিনা-বাক্য ব্যয়ে লোকটি গাড়ীর ভেতরে উঠে বললে—'চলো!'

গাড়ী ছুটে চললো। ঘুমন্ত কলকাতার নির্জ্জন রাস্তা। গভীর রাত। গাড়ী চালাতে চালাতে ড্রাইভারের নাকে আসতে লাগল কড়া চুরুটের গন্ধ। পেছনে বসে দিশী সাহেবটি খাচ্ছেন আর কি! চুরুটের গন্ধে ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল যেন ড্রাইভারের মাথা। গাড়ী ততক্ষণে সার্কুলার রোডে এসে পড়েছে।

গভীর রাত, নির্জ্জন রাস্তা, চুরুটের গন্ধ—সব জড়িয়ে কেমন একটা অনাস্বাদিত অনুভূতি ড্রাইভারকে পেয়ে বসেছিল। ভেতর থেকে হঠাৎ 'রোক্‌খো' শব্দটা শুনেই ঘ্যাঁচ্ করে গাড়ীটা থামিয়েই ড্রাইভার চেয়ে দেখলে—ডান দিকে তার সার্কুলার রোডের বিরাট গোরস্থানটা পড়ে আছে মড়ার মতন!

ছ্যাঁৎ করে উঠল ড্রাইভারের বুকের ভেতরটা। নিজেকে সামলে নিয়ে পিছন ফিরে হাত বাড়িয়ে গাড়ীর দরজাটা খুলে দিতে গিয়ে শিউরে উঠে সে দেখলে, গাড়ীর ভেতরে কেউ নেই!'

আড্ডাঘরের সার্সির ভেতর দিয়ে আবার এক ঝলক বিদ্যুৎ এসে ঢুকলো চকিতের জন্যে। দেখা গেল, ঘরের সবাই এক জায়গায় ঘেঁষে এসেছেন!

একটু থেমে অনাথ আবার সুরু করলে—ড্রাইভার প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে কোনক্রমে তাকালে আর একবার ডান দিকে। দেখতে পেলে, তার গাড়ীর আরোহীটি নির্জ্জন রাস্তাটা দিয়ে সটান্ হেঁটে চলেছেন গোরস্থানের দিকে!

'চলতে চলতে গোরস্থানের বাইরের রেলিং-এর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর, ড্রাইভারের মনে হল, সেই মূর্ত্তিটা হঠাৎ যেন লাফিয়ে মিলিয়ে গেল রেলিং-এর অন্ধকারের সঙ্গে!

'বিদ্যুৎ-বেগে ড্রাইভার ছুটিয়ে দিলে তার গাড়ী পাগলের মতো!

থামলো অনাথ। আড্ডঘরের কারুর মুখে কথাটি নেই তখনো। আরো একবার বিদ্যুৎ চমকে উঠতে দেখা গেল—নীহারবাবু কখন্ দেবুর কোলের ওপর গিয়ে উঠেছেন। অনাথ থামবার কিছুক্ষণ পর নীহারবাবু ক্ষীণ কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন,—'আলোটা এবার জ্বালা হবে কি?'

অনাথ বললে,—'গল্পটা আমার এখনো' কিন্তু শেষ হয়নি।—

'ট্যাক্সিখানা বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে চলে যাবার পরেই

গোরস্থানের রেলিং-এর ধার থেকে বেরিয়ে এল সেই লোকটি। রাস্তা পেরিয়ে সোজা এসে আনন্দ পালিত রোডের একটা বাড়ীর কড়া নাড়তে লাগল সজোরে।'

'আনন্দ পালিত রোড?'—নড়ে চড়ে উঠলেন সবাই,—'কত নম্বর বাড়ী হে অনাথ?'

'তিনশো তেরোর এইচ্'—অনাথ বিনীতকণ্ঠে বললে।

'সেটা ত তোমার বাড়ী!'—এতক্ষণে চীৎকার করে উঠলেন নীহারবাবু।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।—পিসির বাড়ী থেকে ডিনার পার্টির নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরেতে রাত হয়ে গেছল সেদিন, কি রকম একটা মজা করবার খেয়াল চেপে গেল মাথায়।'—অনাথ উঠে ঘরের আলো জ্বালাতে জ্বালাতে বলে।

আলোকোদ্ভাসিত কক্ষে অনেকগুলি হাসিমুখের মাঝখানে বিনয়দার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি নড়ে চড়ে ওঠে—'তাই ত বলছিলুম হে ভায়া তখন যে—গোরস্থানের রেলিং-এর জায়গায় উঁচু পাঁচিল হওয়া দরকার।'

সাহিত্যের রূপ

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

সকল দেশের সাহিত্যের রূপ বা আস্বাদ এক নয়। তথাপি এই বৈচিত্র্যই সকল দেশের সাহিত্যকে প্রাণ দিয়েছে। আমাদের দেশে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে অপূর্ব ভাষায় সাহিত্যের স্বরূপতত্ত্ব এবং বৈচিত্র্যের বিষয় যা' বহু প্রবন্ধে এবং পত্রাবলীতে বলে গেছেন তার উপর নতুন তথ্য বলার সাহস আমাদের নেই। যিনি নিজে স্বষ্টিকর্তা তিনিই অন্য কবিদের রচিত বস্তুর সঠিক গুণ পরিচয় এবং মর্যাদা দিতে পারেন, আর পারেন, যাঁর অন্তরে সৃষ্টি রসের উৎস সঞ্চারিত আছে। কালিদাসকে তাই বোঝাবার জন্য মল্লিনাথের প্রয়োজন হয়েছে। আজ বলতে লজ্জা করছে রবীন্দ্রনাথকে জানবার জন্য তাঁর নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। উরোপের কবি ও শিল্পী বন্ধুরাই তাঁকে জগতের সম্মুখে তুলে ধরলেন। দেশের রসিকদের প্রতি কটাক্ষ করে তাই কবি বলেছিলেন "উরোপই ভারতবর্ষের প্রবেশ দ্বার।" এক কথায় উরোপীয় কৃষ্টির বিচারে যা খাঁটি সোনা তাই হবে এদেশের বরণীয়।

এখন দেখা যাচ্চে আন্তর্জাতিক বিশ্বসাহিত্যের দিকে সবাই অনুরক্ত। কিন্তু কোনো দেশেরই সাহিত্য কেবল art for art sake হতে পারে না। প্রত্যেক দেশের সাহিত্য সেই দেশের জীবনধর্মের নাড়ীতে সংযুক্ত। জীবনধর্ম সংগঠিত হয় সমাজ, সংস্কার এবং ধর্মবিশ্বাসের উপর। একদিকে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক মার্গে হিন্দু-বৌদ্ধ-দর্শন-সংস্কার বিদগ্ধ, অন্যদিকে খৃষ্টধর্মগত নৈতিক আচার সংস্কার নিয়ে উরোপ দাঁড়িয়ে আছে। অথচ আধুনিক সাহিত্যিক চান মূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেতে; সংযত রাখতে চান দেশের সংস্কৃতিকে উরোপের বিশ্বজনীন সংস্কারের আওতায়। এইভাবে ইণ্টারন্যাশানাল ও secular সাহিত্য গঠন করতে চান উগ্র আধুনিকীরা। কিন্তু অন্যদিকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী মহাকবি রবীন্দ্রনাথ উরোপের নকল না করেও বিশ্বজনীন কীর্তি দেখাতে পেরেচেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সংস্কৃতের সংস্কৃতি এবং বাঙলা দেশের নিতান্ত নিজস্ব আদর্শকে গ্রহণ করেও বড় হয়েচেন জগতের সম্মুখে। তাঁর সমগ্র মূল্য বিচারের স্পর্দ্ধা ও আজ পর্যন্ত কারো হল না, আর তার অংকে একটি পূর্ণচ্ছেদ পড়েচে। পণ্যদ্রব্যের ফ্যাসানের মত আধুনিক বিলাতি Sur-realist চিত্রকলার যেমন নকল চলচে এদেশে, তেমনি আধুনিক বিলাতি মনোবিজ্ঞানতত্ত্ব সম্বল দিয়ে গঠিত সাহিত্য এদেশের সাহিত্যিকের আদর্শ হয়েচে।

এখন দেখা যাক সাহিত্যের রসবিচারের কথা। মানুষমাত্রেই কথা বলে বহু শব্দবিন্যাসে, কিন্তু বসন্তাগমে প্রাচীন তরু যেমন নবপ্রবাল কিশলয় রম্য নববাস পরিগ্রহণ করে তেমনি শব্দার্থসমূহ পূর্বে সকলের মুখে শ্রুত হলেও কাব্যে রস-পরিগ্রহণ নূতন ভাবে প্রতিভাত হয়। ইহাই রস সহজ সহজাত একটি বিশেষ গুণ। কেহই আজ পর্যন্ত কবির সেই প্রেরণা রস-উৎসের আদি তটের নির্দেশ করতে পারেন নি। মহাকবিদের বাক্যকে তাই বাণী বলা হয়। সাধারণ শব্দের উপরে তার যে 'প্রতীয়মান অর্থ' থাকে তাকে অলংকারশাস্ত্রে তুলনা দিয়ে বোঝানো হয়েচে রমণীর লাবণ্যের সঙ্গে। যেমন রমণীর লাবণ্য তার অঙ্গসৌষ্ঠব থেকে পৃথক ভাবে প্রতিভাত হয়, এও তেমনি অনুভবের বস্তু। লক্ষণ-নির্দেশ-কুশলী প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাই শব্দের এই ধ্বনিতত্ত্বকে অনির্বচনীয় বলেচেন! তা' কেবলমাত্র সহৃদয় হৃদয়সংবেদ্য। কাব্যের শরীর অর্থময় এবং শব্দগত অনুপ্রাস চারুত্ব, অর্থগত চারুত্ব, উপমা মাধুর্য প্রভৃতি নিয়ে প্রতীয়মান অর্থে—কাব্যকলা লাবণ্যমণ্ডিত হয়। ভাবের বিপরীতে অভাব। কবিদের কারবার ভাবলোক নিয়ে। এই ভাবের প্রকাশ-বাণী ছন্দে সুরে লয়ে হয়ে থাকে। আদিম মানুষ গুহাবাসী হয়ে বনারণ্যে ভ্রমণ করতে করতে কেঁদেচে, হেসেচে এবং গদগদ কণ্ঠে অব্যক্ত সুরে গান গেয়েচে। এখনো আদিবাসী টোডাদের গানে তার পরিচয় নিহিত আছে।

অন্নে মানুষ তুষ্ট নয়, কেবল শুধু খেয়ে প'রে সে বেঁচে থাকতে চায় না। মনেরও খোরাক তার চাই। তাই তার আদিমকালের অব্যক্ত গুঞ্জন থেকে ছড়াকাটা এবং পরবর্তীকালে মহাকাব্য রচনারও প্রয়োজন হয়েচে। বৈদিকযুগের ঋষিরা বল্লেন "ভূমৈব সুখম্নাল্পে সুখমস্তিঃ"—অনন্তেই সুখ, সীমায় সুখ নেই। তখন থেকে কেবল বহির্মুখী—সুখে তার আর তৃপ্তি নেই—চাই জানতে অনন্তকে অন্তরের মধ্যে নিবিড় ক'রে। সেইজন্যেই সে অন্তর্মুখী (Introvart হয়ে) অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাইল নিজের অন্তরে ভূমাকে। সাহিত্যের সূচনা হল এই ভাবে সেই বৈদিক যুগ থেকে। আলংকারিকেরা তাই সাহিত্যের বিচার করে বলেচেন "স-হিতস্য ভাবঃ ইতি সাহিত্য"—এই 'হিত' কথাটির তাৎপর্য শুধু তথ্যপঞ্জিকার সংকলন নয়—অপ্রকাশকে প্রকাশ, অসীমকে সীমার মধ্যে অনুভব করা—জীবনের ক্ষুদ্র সীমাকে প্রসার করে ধরাই হ'ল সাহিত্যের কাজ। আমাদের দেশেই দেখি আদি-কবি বাল্মীকির মুখে প্রথম উচ্চারিত শ্লোকের জন্ম হল শোক সংবেদন থেকেই। এই সংবেদনই সকল সাহিত্যের মূলতত্ব। সবার দুঃখে ব্যথিত বোধ করাকেই মহাকবি রবীন্দ্রনাথ কাব্যের বিশেষ গুণ বলে মেনে নিয়েই তাঁর একটি গানে আহ্বান করেচেন ঃ

"ব্যথার বেশে এল আমার দ্বারে,
কোন্ অতিথি, ফিরিয়ে দেবনারে।

ভাবরসের সংবেদন সঞ্জীবনীই সাহিত্য সৃষ্টির প্রসূতি বেদনা। প্রসূতি যেমন জানেন না কে ভূমিষ্ঠ হচ্চে—কেবল বেদনাই পান পূর্বে ; তেমনি কবির সৃষ্টি বেদনায় তাঁর দ্বারে যে কোন্ অতিথি এসে দাঁড়িয়েচে তাও তিনি জানতে পারেন না। এই অজানাকে জানার খেলা সাহিত্যের লীলা রচনা। কবি এই হিসাবে পথিক এবং তাঁর পাথেয় সংবেদনা এবং তাঁর যাকে চিরপুরাতনের মধ্যে নূতনের অন্বেষণ ক্ষুধা।

সংস্কৃত প্রাচীন সাহিত্যশাস্ত্রে আছে প্রধান দুইটি বিভাগ। শ্রব্য ও দৃশ্যকাব্য। এই দুটি বিভাগের মধ্যেই সমুদয় সাহিত্যশাস্ত্র আলংকারিকেরা সমবেশিত করেচেন। শ্রব্যকাব্যে তিনটি ভাগ করা হয়েচে, পদ্যময়, গদ্যময় এবং গদ্যপদ্যময়। পদ্যময় কাব্যও ত্রিবিধ ; "মহাকাব্য" ;—মহাকাব্যে অষ্টাধিক সর্গ (Canto) না থাকলে মহাকাব্য বলা হয় না। "খণ্ডকাব্য" অনতি দীর্ঘ এবং মহাকাব্যের গুণ তাতে বর্তমান থাকে—মেঘদূত তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। "কোষকাব্য" পরস্পর নিরপেক্ষ শ্লোকযুক্ত কাব্যকেই কোষকাব্য বলা হয়। শত শ্লোকাত্মক অমরুশতক একটি দৃষ্টান্ত। হিন্দী কবি বেহারীর সৎসাহীও এইরূপ একটি কাব্য। গদ্যময় কাব্যকে আলংকারিকেরা কথা বা আখ্যায়িকা বলেন। এরই কোঠায় পড়ে আধুনিক কালের উপন্যাস এবং ছোট গল্প। গদ্যপদ্যময় কাব্যকে "চম্পূ" বলা হয়। চম্পূকাব্যে কালিদাস, বাণভট্ট, ভারবী, ভবভূতি, মাঘ বা শ্রীহর্ষদেব হস্তক্ষেপ করে নি। দেবরাজ কৃত সংস্কৃত অনিরুদ্ধচরিত, ভোজদেবের চম্পুরামায়ণ, অনন্ত ভট্টের চম্পুভারত প্রভৃতি চম্পূকাব্যের দৃষ্টান্ত আছে। সংস্কৃত নাটকগুলিকেই দৃশ্যকাব্য বলা হ'তো। কাব্য কেবল শ্রবণ সাপেক্ষ, আর নাটকে শ্রবণ ও দর্শন দুয়েরই প্রয়োজন। শাস্ত্রে নাটকেরও বহু ভাগ করা হয়েচে—রূপক ও উপরূপক তার মধ্যে দুটি প্রধান বিভাগ। এ বিষয় আর অধিক বলতে চাই না এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে।

সাহিত্য যদি কেবলই আলংকারিক পণ্ডিতদের শাসনাধীনেই থাকত এবং তাদের নির্ণেতব্য বিষয়মাত্র হয়ে থাকতো ত তার প্রগতি পর্যন্ত হতো। অপর্যাপ্ত প্রগতির পথেই সাহিত্য চলেচে—সৌরমণ্ডল যেমন অর্কমালাহারে চলেচে অবিরত—অনন্তের পথে। জ্ঞানগর্ভ সমস্যার জটিলতা দূর করার মত কবির সৃষ্টিযজ্ঞে—কল্পনার কাছে যুক্তিতর্কের স্থান নেই। তার ভিতর আছে প্রগতি, সঙ্গতি এবং বিকাশ। কেবল একটি ঋজুরেখা বা বিন্দুতেই যেমন চিত্র রচনা হয় না, তার জন্য চাই বিচিত্র তরঙ্গায়িত রেখাভঙ্গিমার দোলা, তেমনি স্থায়িত্ববোধে, কোনো একটি বিষয়বস্তু বা ভাবকে আঁকড়ে বসে থাকলেও সাহিত্য মৃতকংকালে পরিণত হয়। এই সাহিত্য চর্চায় থাকা চাই সঙ্গতি। যেমন কোনো প্রাসাদ তৈরী করতে হলে চাই তার জন্য মালমশলা এবং পরিকল্পনার সঙ্গতি, তেমনি একটি সাহিত্যের স্বর্গসৌধ রচনা করতে হলেও সঙ্গতির প্রয়োজন। সঙ্গতি সহজে লাভ করা যায় না, তা' বিকাশ সাপেক্ষ। সঙ্গতিসম্পন্ন ধনী ব্যক্তি কৃপণ হলে যেমন চলে না, তেমনি সাহিত্যেও মনোবিকাশের জন্য বিদ্যা এবং কল্পনাসঙ্গতির কার্পণ্য অসহ্য। প্রথমভাগ প'ড়ে অ-আ ক-খ লেখাই চলে, কিন্তু সাহিত্য রচনায় বিকাশ হয় সমগ্র জীবনের সাধনা, শিক্ষা এবং কল্পনার উন্মেষে। এই মনোবিকাশের মধ্যে যাকে ত্রৈগুণ্য প্রকৃতি। আর রসরচনা কালে আরো সূক্ষ্মবোধ জন্মায় সত্বগুণাত্মক করুণ বাৎসল্য ও শান্তরসে ; রজগুণাত্মক বীর, শৃঙ্গার ও অদ্ভুতরসে, এবং তমগুণাত্মক, ভয়ানক বীভৎস এবং হাস্য প্রভৃতি এই নয়প্রকার রসে। সকল সাহিত্যে সকল দেশেই এই সাহিত্য রসের প্রকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এই রস বিতরণ কার্যে কবির জ্ঞান ও মনঃসংস্কার এবং সামঞ্জস্যপ্রীতির পরিচয় নিহিত থাকে। কোনো একটি ইচ্ছাকৃত যুক্তিতর্কের আশ্রয় নিয়ে কাব্য রচনা হয় না। বহু সমস্যার সমাধিত তাৎপর্য থেকে সারাংশ মাত্র গ্রহণ ক'রে কাব্যে তাকে ফুটিয়ে তুললে সেই রচনা কেবলই দুঃসাহসিক ব্যাপার নয়, রক্তহীন নির্জীব পদার্থে পরিণত হবে। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর রচনাকে বলেচেন "শ্রী পরিমিতি এবং রূপহীন বাক্যপিণ্ড। আরো বলেচেন—"উপকরণের বাহাদুরী তার বহুলতায় অমৃতের স্বার্থকতা তার অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যে।" উপকরণের আভিজাত্যে শিল্পকলার রস খর্ব হয়ে যায়। সেইজন্যে যে শিক্ষা রসবোধে এবং সামঞ্জস্য জ্ঞানে পুষ্ট তারই মধ্যে কবির মাহাত্ম্য সূচীত হয়। এই রসবোধের নির্দিষ্ট মাপকাটি কখনই তৈরী হ'তে পারে না। কোনো ইন্‌টেলেকচুয়াল পণ্ডিতের দ্বারাও তা' সম্ভব নয়। কাব্যের তাই সৌন্দর্য বিচার চলে না।

শনৈঃ শনৈঃ যন্নবতামুপৈতি
তদেব রূপম্ কমনীয়তাম্।

সৌন্দর্যের গুণই হল চিরনবীনতা। কেবল ধীরে ধীরে যার নবীনতা

উপলব্ধি করা যায়, তাকেই সৌন্দর্য বলে। এই সৌন্দর্য বলতে কোনো বস্তু বা চেহারার নিখুঁৎ বাহ্য সৌন্দর্য নয়। সত্য অনুভূতিই সৌন্দর্য। একটি কুৎসিৎ দীন দুঃখী বা বামনের মধ্যেও কবি ফোটাতে পারেন শাশ্বত সৌন্দর্যকে। সেক্সপীয়ারের ফলস্টাফ এবং অজন্তাচিত্রে রাজন্যমণ্ডলীর বৈঠকে বিকৃতবদন বামনের মতই সৌন্দর্য রসের মাত্রা বৃদ্ধি করেন কবি এই ভাবে। মিনি ও কাবলীওয়ালার গল্পে কবি তাঁর দৃষ্টিবাসরে যাকে তুলে ধরেচেন তার সম্বল বাইরের রূপের ঝলক নয়, কবির অন্তরের নিবিড় প্রতিমা সেই স্নেহশীল কাবলীওয়ালা। এই ভাবে যা' সকলের নিকট অব্যক্ত, কবি তাকেই ব্যক্ত করেন কাব্যে। রচনার এই অব্যক্ত অংশ ক্রমে যখন রূপ প্রকাশ ক'রে পাঠকের মনকে নিবিড় ভাবে আচ্ছন্ন করে, তখনই মনে জাগে সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ অনুভূতি। মায়ের স্নিগ্ধবিকাশ হয় যখন তিনি স্নেহভরে সন্তানের প্রতি ফিরে চান। সাহিত্যে তাই উচ্ছৃঙ্খলা বা নৈরাশ্যের স্থান নেই। বিদ্রোহ বিস্ময় উদ্রেক করতে পারে কিন্তু তার সার্থকতা স্থায়িত্বের মধ্যে নেই। আধিভৌতিক খেলা যাদুকরের পক্ষে খাটে, কবির পক্ষে স্পর্দ্ধার বিষয় নয়।

সাধারণ কথিত ভাষার উচ্ছৃঙ্খলাকে দমন ক'রে ভাষা ও ভাবের মিলন ঘটায় কাব্যের ছন্দ। প্রত্যেক শব্দের শুদ্ধগুণ বিচারে পরিবেশন দ্বারা—রসমাধুর্যের সৃষ্টি হতে পারে। আর অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করে এই বচনবিন্যাসের কৌশল। সংস্কৃতকাব্যে লঘুগুরু বাক্যবিন্যাসের যেমন একটি বিশেষ কৌশল আছে, তেমনি বাঙলা ভাষায় আছে তার স্বভাবসঞ্জাত কোমল ছন্দাভাস। তার মধ্যে সংগীতের অনির্বচনীয়তাও আছে এবং ভাষার হসন্তিক্ জোর বা ঝংকারও বিদ্যমান। কবি যখন সেই সংগীতের মুর্চ্ছনার সঙ্গে শব্দ ঝংকার মিলিয়ে বিরাম যতির দ্বারা মণ্ডিত করে কোনো কিছু রচনা করেন তখনই হয় তাতে ছন্দের বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ বলেচেন: "বচনের সঙ্গে অনির্বচনের এবং বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁট বেঁধে দিয়েছে ছন্দ।" এই ছন্দভাব বিশ্বরচনায়ও ওতপ্রোতভাবে বর্তমান।—কেবল তার সন্ধান জানেন কবি ও শিল্পী। আনন্দ পান যখন প্রকৃতির রূপ ও রোচনা একই সঙ্গে প্রকাশ পায় তাঁর রচনায়। এই ছন্দই কাব্যে চিত্রাভাস দেয় স্বচ্ছন্দগতিতে প্রগতির পথে। সারাজীবন কবির কথা চলে প্রকৃতির সঙ্গে এইভাবে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাই ফাল্গুনীতে বলেচেন: "যারা ম'রে অমর, বসন্তের কচিপাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগদিগন্তে তারা রটাচ্ছে—'আমরা পথের বিচার করিনি—আমরা পাথেয়র হিসাব রাখিনি—আমরা ছুটে এসেচি—ফুটে বেরিয়েচি।—আমরা যদি ভাব্‌তে বস্‌তুম তা'হলে বসন্তের দশা কি হত?" লণ্ডনের কুয়াশাকে রং দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন গুণী শিল্পী টার্ণার। সময় নিয়েছিল তাঁকে বুঝতে এবং জানতে সকলের। তেমনি বসন্তের গুণ কোকিলের কষায়কণ্ঠনিনাদে পর্যবসিত হ'তো যদি কবিরা ভাবতে বসত গবেষণা ক'রে জানতে তার সহসা আগমনের বৈজ্ঞানিক কারণ। প্রকৃতির মনের দ্বার উন্মোচন করাই কবির কারবার।

শিল্পীর মতই কবি কাব্যে দেন চিত্রাভাস। কাব্য রচনায় রূপ প্রকাশও তাঁর একটি কাজ। প্রত্যেকের নিজের সংস্কারগত শিক্ষা ও পরিণতি হিসাবে মনে এক এক বিশেষ বিচিত্র রূপকল্পনা জাগে। এই রূপকল্পনা আবার অনুপ্রেরণা দেয় নব নব রূপ রচনায়। সংস্কৃত মহাকাব্যের রূপকল্পনা রবীন্দ্রনাথকে যে প্রেরণা দিয়েছিল তা কি সংস্কৃত কবিদের সেই রূপকল্পনার ঐশ্বর্যের গুণে ঘটেনি?

এই রূপ সৃষ্টির সঙ্গে চাই আরো একটি গুণ—রোচনা। যে দীপ্তি প্রকাশিত না হলে সব রচনাই শোভাহীন এবং জ্যোতিবিহীন দশা প্রাপ্ত হয় সেই রোচনার কথাই এখন বলতে চাই। রোচনা কেবল কিরণ নয়—দিগোদ্ভাসিত দীপ্তিপ্রদ। তাকে ঋদ্ধিও বলা যায়। এই এই ঋদ্ধি বা দীপ্তিগুণে প্রজ্জ্বলিত না হলে কাব্য সম্পূর্ণ সুন্দর হয় না। এরজন্যে চাই শব্দের মাধুর্যবোধে শয়ন, ছন্দজ্ঞান এবং ভাবরসের ব্যঞ্জনা। কাব্যের রোচনা স্ফুট হয় যখন কমল প্রস্ফুটিত হয় এবং তাকে সাজিতে সাজিয়ে গ্রহণ করা হয়। কাব্যলোকে তা' আর তখন কারো নিকট সঙ্গোপন থাকে না। মহাকবি এই রোচনের কথাই একটি গানে গেয়েচেন—

"যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই
আমি ছিলাম অন্য মনে।
আমার সাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই
সে যে রইল সঙ্গোপনে।

সাহিত্যের চিত্রশালাকে রোচনদীপ্ত যে সব কবি করেচেন তাঁরাই এরূপ কথা স্পষ্টভাবে বলতে পারেন।

সকল রচনার আড়ালে থাকে স্রষ্টার রচনাকালের অহৈতুকি আনন্দ এবং তার রস উপভোগ করেন পরবর্তীকালে সকলেই তা' পাঠ ক'রে। প্রাণের খুশীর তুফান যখন বয় তখনই কবির কাব্য রচনা হয়। এই খুশী রচনার আনন্দ; এবং তা' জাগে দুঃখীর সমবেদনায়, বীর্যবানের সুকীর্তিতে, পুষ্পের অকারণ সৌরভ বিতরণে। তার কোনো জন্মগত নিয়ম শাসন নেই। গৌণভাবে তার ফলে সবার মনে আনে প্রগতির প্রেরণা। সকল দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় জাগৃতি দিয়েচেন কবিরা কাব্যে ও গানে। রুশোর Social contract সাহিত্যই ফরাসী বিপ্লবের সূচনা দিয়েছিল। আমাদের দেশেও কবি ঈশ্বর গুপ্ত, হেম বাঁড়ুয্যে থেকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রায় দেড়শত বৎসর ধরে দেশের জাগরণীর গান গেয়েচেন দেশ স্বাধীন করার অনুপ্রেরণা দেবার জন্য। ঈশ্বর গুপ্তের একটি কবিতা উদ্ধৃত করচি—তিনি অতি দুঃখে শত বৎসর পূর্বে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে লিখেছিলেন:

"হোলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তা ঘটে সর্বনাশ
কালসাপ কি কোনোকালে দয়াতে ভেকে পালে
টপ্‌টপাটপ্ অম্‌নি করে গ্রাস।
বাঙালী তোমরা কেনা, একথা জানে কেনা?
হয়েছি চিরকেলে দাস।
করি শুভ অভিলাষ

(কবি লণ্ডনের সম্রাজ্ঞী—মা ভিক্টোরিয়াকে বলচেন)

মা তুমি কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি সিং বাঁকানো
কেবল খাবো খোল বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙা আম্‌লা তুলে মাম্‌লা
গাম্‌লা ভাঙেনা।
আমরা ভুশি পেলে খুশী হব
ঘুশি পেলে আর বাঁচব না।"

এইভাবে 'পাগলাগারদ' জেলখানা সামাজিক ত্রুটি উচ্ছৃঙ্খল বিষয় কবি উপন্যাসিকেরা চোখের সামনে ধরে তুলে গৌণভাবে মানুষের মনে সংস্কারের বীজ বপন করচেন। আজ দেশ স্বাধীন। কিন্তু একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, রবীন্দ্রনাথের গান, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী দেশের চিত্তকে কিরূপভাবে দোলা দিয়ে সজাগ করেচে তার কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। বঙ্কিমের শত বৎসর পূর্বের রচিত বন্দেমাতরম আজ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। স-হিতস্য ভাবঃ ইতি সাহিত্যঃ এই কথার যে সার্থকতা আছে তা' ভুললে চলবে না। আজ আমরা রবীন্দ্রযুগের কথা যখনই বলি, তখনই তাঁর সকল শুভ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ কল্পনাকেই আমরা দেখতে পাই সকল বিষয়েই অগ্রবর্তী হয়ে আছে। তাঁর প্রত্যেক চিন্তা ও ভাবই কার্যে পরিণত হতে চলেচে একে একে। আজও কি তাঁর পূর্ণদৃষ্টির ইঙ্গিত আমরা যথার্থভাবে পেয়েচি?

সাহিত্যের কথা বা আখ্যায়িকার দান কম বড় নয়। কাব্য, নাট্যের মতই উপন্যাস বা মহৎব্যক্তির জীবনের আখ্যান কম বড় রচনা নয়। মানুষের আদর্শ মানুষের মধ্যেই আছে। এই নরচন্দ্রের বিষয় সাহিত্যে যত ব্যক্ত হয় ততই মানুষের মনে সদ্‌ চিন্তা সদ্‌ অভিপ্রায় জাগে। যা' শত উপদেশে হয়না তা' দৃষ্টান্তের আখ্যানের দ্বারা হয়। বস্‌ওয়েল জনসনের জীবনী না লিখলে তার চরিত্র মাহাত্ম্য আজ সকলের কাছে চিরদিনের জন্য অবিজ্ঞাত থাকত। বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারকালে তাই সর্বদা জাতক কাহিনী দিয়ে তাঁর বাণীকে হৃদয়গ্রাহী করতেন। অনেকের বিশ্বাস নভেল নাটক পাঠে কেবলই অবসর বিনোদন হয় এবং কবিরা দেশের কুলাঙ্গার না-হলেও অপকর্মা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এককালে ঈশ্বর গুপ্তর তীব্র কবিতার জোরে এবং দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাট্য রচনার ফলে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার বন্ধ হয়েছিল বাঙলাদেশে। মানুষের মনকে বিদ্রোহিত করেছিল নীলকরদের বিরুদ্ধে তখনকার এই সব সাহিত্য রসরচনা। আজও সেই সব কাব্য পাঠে মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। দুর্বলকে বীর্য দিতে, প্রবলকে সংযত করতে, উদ্ধতকে বিনীত করতে, ঐশী শক্তিকে শ্রদ্ধা করতে কি বাণীর প্রয়োজন নেই? সাহিত্য বাণীর বাহন এবং কবিকে বাণীই তাঁর সকল ভাবনা রসরঞ্জিতরাগে প্রেরণা দেন। এই বাণীই অমৃত বাণীর বরপুত্র কবিও অমর। সকল শুভ বাণীর মধ্যে এবং শুভকর্মের ভিতর প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান ভগবদশক্তি অনুভূত হয়। তার বাইরে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বোধের বাইরে মানুষ সে শক্তিকে দেখবে কি করে? তাই ব্রহ্মকন্যা বাণীর কথাই সাহিত্যের কথা। এর মধ্যে কোনো দুর্বলতার স্থান নেই। এর মধ্যে রাষ্ট্রপালদের সগৌরব অসহিষ্ণুতা বা দ্বন্দ্বের স্থান নেই, আছে—ছন্দ গতি, মাধুর্য্য ও সাম্য। সাহিত্য কেবল কলা-কৌশলেই পর্যবসিত নয়। মানুষের জীবনকে মধুর করতে উন্নত করতে পারে তার কথাও আমাদের ভুললে চলবে না।

মন-মেয়ে

শ্রীবিশ্বরূপ কাঁঠাল

এইখানে, এইখানে নয় এখানে আকাশ কালো,
কালবৈশাখী মেঘে-ঢাকা-চাঁদ নিভে গেছে হেথা আলো।
প্রাণ নেই বুঝি দেহ নিতে তাই হুঙ্কার দেয় যমদূত
তাইনানে বসে জার্মানী ঘেঁসে ছিঁড়ে খায় শব অদ্ভূত!

'বকের মুখেও ধর্মের কথা' বল্লে তায় নেই সন্দ,
যদিও চোখেতে লোলুপ-দৃষ্টি : নাক শোঁকে মাছ-গন্ধ।
তবুও তাদের ধার্মিক নাম রটে যায় হেথা মর্তে,
এখানে ওখানে ধর্মের-রাজ গড়ে দেয় তারা সর্তে।

ওখানে নয়, এখানে এস, এস সাগর কুলে।
উধাও ঢেউ। পালখ-সাদা মেঘের ছুটোছুটি।
তোমার চোখে নীলিম-রেশ আমায় যেন টানে,—
গোপন মনে কাঁপন লাগে। গোপন-ব্যথা ভুলে'
বাতাস-প্রেমে মাতন লেগে গাছের লুটোপুটি।
তোমাকে ডাকি : তোমার মনে জীবন খোঁজে মানে॥

রিক্তা

এ্যান্টন পাভলোভিচ শেখভ

অনুবাদ ঃ—সুভাষ সমাজদার

অনেকদিন আগেকার কথা। তখনও তার যৌবনে এতটুকু ভাটার টান পড়েনি, এতটুকু ম্লান হয় নি তার অপর্য্যাপ্ত স্বাস্থ্যের লাবণ্যভরা কমনীয়তা, গানের সুরের মত ছিল তার কণ্ঠস্বর। সেই সময় তার প্রেমিক নিকেল পেট্রোভিচ্ কলপাকভ সেই মেয়েটির গ্রীষ্মকালীন আবাসের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় দুপুরের খাওয়ার পর বিশ্রাম করছিল। সেদিন অসহ্য গরম পড়েছিল। অকারণে কলপাকভের মনটা বিরক্তিতে একেবারে বারুদঠাসা হয়েছিল। সে ভাবছিল, দুপুরের রোদের তেজ কমে এলেই, বেলা শেষের ঠাণ্ডা বাতাসে তারা দুজনে বেড়াতে যাবে। কিন্তু—

কিন্তু হঠাৎ সেই ভরদুপুরে বাইরের দরজায় ক্রিং ক্রিং করে বেল বেজে উঠল। কলপাকভ জামা কোট খুলে আরামে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছিল। বেলের শব্দ শুনে সে লাফিয়ে উঠল চেয়ার থেকে। পাশা নিস্তেজ গলায় বলল—নিশ্চয়ই পিওন। কিম্বা আমারই কোন মেয়ে বন্ধু এসেছে—সে যাই হোক। কলপাকভ চায় না তাকে এই সময়ে এইভাবে একটা বাঈজীর বাড়ীতে কেউ দেখুক। সে পাশের ঘরে চলে গেল। পাশা ছুটে গেল সদর দরজার দিকে। কিন্তু কী আশ্চর্য্য! দরজার চৌকাঠের ওপারে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে পিওন নয়, বা তার কোন মেয়ে বন্ধুও নয়! দামী পোষাকপরা কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরী তরুণী মেয়ে। আগন্তুক মেয়েটির চোখে বিষাদের ছায়া। হেঁটে আসার ক্লান্তিতে, উত্তেজনায় সে এমনভাবে হাঁফাচ্ছে যেন সাততালা দালানের সিঁড়ি ভেঙ্গে দ্রুত উঠে এসেছে।

কি চাই? তীব্র গলাতে বলল পাশা। তরুণী মেয়েটি কোন উত্তর দিল না। সে পায়ে পায়ে তার দিকে এগিয়ে এসে সন্দেহভরা চোখে তাকাল পাশের ঘরটার দিকে। হঠাৎ সে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বলল—আমার স্বামী কি এখানে এসেছে? লাল রক্তের ছিটেভরা বিশাল চোখ দুটো মেলে সে তাকালো পাশার দিকে।

—আপনার স্বামী! কে আপনার স্বামী? ভীত, অস্ফুট গলায় বলল পাশা। তার হাত পা গুলো যেন অবশ হয়ে আসছে। আবার কম্পিত গলায় বলল—কে স্বামী?

—নিকলে পেট্রোভিচ্ কলপাকভ—

কেঁপে উঠল পাশার বুকের ভেতরটা। কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল – না, এই নামে কাউকে আমি চিনি না—

অস্বস্তিকর নীরবতায় থম থম করতে লাগল বারান্দাটা। সেই তরুণী মহিলাটি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে তার বেগনী ঠোঁট দুটোর ওপরে আলতোভাবে বুলিয়ে নিয়ে বলল—তাহলে তুমি বলছ, সে এখানে নেই?

—না। আমি জানি না, কাকে আপনি খুঁজছেন?

—তোমরা অতি ভয়ঙ্কর জীব—অভিশাপ উচ্চারণের মত ধীরে ধীরে কেটে সে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি বলছি, তোমরা রক্ত থেকো জন্তুর মত হিংস্র আর ভয়াল—

বিশৃঙ্খল হয়ে গেল পাশার সমস্ত চেতনা। তার মনে হল, আগন্তুক মহিলাটির ছিপছিপে দীঘল দেহটা যেন একটা উদ্যত চাবুকের মত তার মনটাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। হঠাৎ একটা অসম্ভব বাসনার আগুন জ্বলে উঠল তার মনে। তার দেহাবয়ব যদি অমনি তন্বী

লীলায়িত হত, যদি নাকের ওপরে বিশ্রী কাটা দাগটা না থাকতো, তাহলে সে আজকে নিজের ঘৃণিত জীবনের পরিচয়টা আত্মগোপন করতে পারতো। এমনি ভয়ে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে না থেকে, এই অজানা, অচেনা, রহস্যময়ী মেয়েটার সম্মুখে মাথা তুলে কথা বলতে পারতো—

—অবশ্য আমার স্বামী যেখানে খুসী সেখানে যাক, আমি তা মোটেই গ্রাহ্য করি না—আপনমনে বলে চলেছে সেই ভদ্রমহিলা—তার যা খুসী, সে তাই করুক। কিন্তু আসল কথা কি—সে তার অফিসের তহবিল ভেঙ্গেছে। অফিসের কর্ত্তারা পেট্রোভিচকে খুঁজছে, তারা তাকে গ্রেপ্তার করবে। তুমি—তোমারই জন্য সে টাকা চুরি করেছে—উত্তেজিত হয়ে সে হিংস্র বাঘিনীর মত পায়চারী করতে লাগল। পাশার বুকের হাড়ে হাড়ে নিদারুণ একটা আতঙ্ক জমাট বেঁধে উঠল। সে এখন কি করবে, কিছুই ঠিক করতে পারল না।

—নিশ্চয়ই তাকে ওরা খুঁজে বের করবে, গ্রেপ্তার করবে—বলেই সেই মেয়েটি আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল। সেই তীব্র কান্নার ভেতর দিয়ে তার অস্পষ্ট কথাগুলো শোনা গেল—আমি জানি, কে তাকে এই দৈন্যদশায় নিয়ে এসেছে। ইস্ তোমরা—তোমরা কী, টাকার জন্য তোমরা সব পারো—তার গলা চড়ছে পর্দায় পর্দায়। কুটিল হিংস্রতায় তার চোখ দুটো দপ দপ করছে। তার টিকালো নাকের রক্তাক্ত শিরাগুলো কুঁচকে অসহ্য একটা জ্বালায় জ্বলে উঠে সে আবার বলল—শোন, আমি একটা অসহায় মেয়ে। আমার চেয়ে তোমার ক্ষমতা অনেক বেশী। কিন্তু মনে রেখ, মাথার ওপরে ভগবান আছেন, তিনি সব দেখছেন। আমার চোখের জলের প্রত্যেকটি ফোঁটার জন্য তোমাকে নিদারুণ শাস্তি পেতে হবে—হঠাৎ সে চুপ করলো। একটা জলন্ত আগ্নেয়গিরি যেন উত্তপ্ত লাভা স্রোত উদ্গীরণ করে শান্ত হয়ে গেল। পাশা বিমূঢ় চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ভয় পাওয়া আড়ষ্ট গলায় সে বলল—বিশ্বাস করুন, আমি এর কিচ্ছু জানি না—

—তবু তুমি মিথ্যা বলছো? ক্ষিপ্ত জন্তুর মত চীৎকার করে উঠল সেই মেয়েটি—তোমার কীর্ত্তিকলাপ আমার জানতে বাকী নেই। আমি জানি, আমার স্বামী গত মাসের প্রত্যেকটি দিন তোমার সঙ্গে কাটিয়েছে—

—বেশ, আমি তার জন্য কি করতে পারি? বলল পাশা—বহুলোক আমার এখানে আসে। আমি কাউকে মাথার দিব্যি দিয়ে আসতে বলি না—

সে কয়েক পা এগিয়ে এসে পাশার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্লান্ত করুণ গলায় বলল—শোন—তুমি যাই হও, মনুষ্যত্বও কি একেবারে বিসর্জন দিয়েছ? তুমিও তো মেয়েছেলে! ভেবে দেখ, যদি আমার স্বামীর জেল হয় তাহলে আমার দুধের শিশুরা না খেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে। এই তুমি চাও? একমাত্র তুমিই তাকে এবং আমাদের সবাইকে বাঁচাতে পারো, অফিসের কর্তৃপক্ষকে নয়শো রুবল দিলেই তারা তাকে রেহাই দেবে—

আপনার স্বামীর একটি আধলা পর্য্যন্ত আমি নেই নি—আপনি বিশ্বাস করুন—নরম গলায় বলল পাশা।

না, না, টাকা নয়—সে বলল—মূল্যবান দামী অলঙ্কার সবাই তোমাদের ভালবেসে উপহার দেয়। আমার স্বামী যে গয়নাগুলো তোমাকে দিয়েছে, তুমি শুধু সেগুলো ফেরত দাও—

—তিনি আমাকে কোন জিনিসই দেন নি—

তাহলে কোথায় গেল টাকা? চাপা ব্যাকুল গলায় সুন্দরী মেয়েটি বলল—তোমাকে অনেক কটুক্তি করেছি হয়তো তুমি আমাকে ঘৃণা করবে। তোমাকে মিনতি করে বল্‌ছি ভাই, আমার স্বামীর জিনিসগুলো ফেরত দিয়ে তুমি আমাকে বাঁচাও—

হা ভগবান! বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল পাশা। অস্ফুটগলায় সে আপন মনে বলল—সত্যিই যদি তিনি কিছু দিতেন, তাহলে আনন্দ করেই সেগুলো আপনার হাতে তুলে দিতাম—হঠাৎ সে চুপ করে মাটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ম্লান নিস্তেজ গলায় বলল—দেখুন তিনি দুটো অল্পদামের ঠুনকো জিনিস বহু-দিন আগে আমাকে দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই আমি সে-গুলো ফেরত দেব। যদি আপনি চান—

পাশা তার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটি পাথর বসানো সরু আংটি আর একটি দু আনি সোনার ব্রেসলেট বের করে তার হাতে দিল।

হঠাৎ লাল হয়ে উঠল সেই মহিলার মুখখানা। চীৎকার করে সে বলল—আমি তোমার দান নিতে এসেছি? কুৎসিত গান আর তোমার হাস্যলাস্য দিয়ে ভুলিয়ে আমার স্বামীর কাছ থেকে যে দামী গয়না পেয়েছ, সেগুলো দাও —একটু থেমে উগ্র গলায় সে আবার বলল—কোন একটা বৃহস্পতিবারে সমুদ্রের ধারে তোমাকে কলপাকভের সঙ্গে বেড়াতে দেখেছিলাম। তখন দেখেছি, তোমার কাঁধে সোনার দামী সেপ্টিপিন, দামী ব্রেসলেট। সেগুলো দেবে কি না বলো?—আপনি তো সত্যি বড় অদ্ভুত লোক—বলল পাশা—এত করে বলছি, তবু বিশ্বাস হচ্ছে না। নিকলের কাছে থেকে এই ঠুনকো আংটি আর ব্রেসলেট ছাড়া কোনোদিন কিছু পাই নি। তিনি এখন শুধু আমার জন্য কেক আনেন—

কেক! হেসে উঠল মেয়েটি। প্রখর হাসিটা ছোরার ধারের মত বয়ে গেল তার ঠোঁটের কোণায় কোণায়। দাঁতে দাঁত চেপে বলল—বাড়ীতে ছোট ছোট বাচ্চারা আছে না খেয়ে, আর তোমার জন্য সে আনে কেক! বাঃ বাঃ—

পাশার মুখে কোন কথা নেই। সম্প্রতি উন্নাসিক প্রকৃতির সেই তরুণীটি দেয়ালের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলতে সুরু করল—এখন কি করা যায়! নয়শো রুবল যদি না পাই, তাহলে আমাদের গোটা পরিবারটা ধ্বংস হয়ে যাবে। হে ভগবান, আমি কি করবো? এই নীচ, হীন, ঘৃণ্য মেয়েটাকে খুন করবো, না ওর পায়ের তলায় লুটিয়ে করুণ মিনতি-জানাবো—হাতের রুমালটা মুখে ঘসতে ঘসতে সে আবার অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

শোন ভাই, তোমার হাত ধরে অনুরোধ করছি—কান্না অবরুদ্ধ গলায় সে বলল—তুমি আমার স্বামীকে বাঁচাও ভাই। তার জন্য যদি তোমার কোন সহানুভূতি নাও থাকে, তবুও তুমি মেয়েছেলে···মায়ের জাত হয়ে আমার কচি ছেলেগুলোকে না খাইয়ে মেরে ফেলবে?

—আপনি বলছেন, আমি ঘৃণ্য মেয়ে—পাশা বলল—তবুও ভগবানের কাছে শপথ করে বলছি বিশ্বাস করুন—আপনার স্বামী কোন দামী জিনিসই আমাকে দেন নি। আমরা যারা পেশাদার গাইয়ে এবং লোককে একটু আনন্দ দিয়ে দু'পয়সা রোজগার করি তাদের সকলের আর্থিক অবস্থা আমারই মত খারাপ। কেবল আমাদের মধ্যে একজনের অবস্থা খুব স্বচ্ছল, কেননা তার একজন ধনী অনুরাগী আছে। আমরা সবাই দিন আনি, দিন খাই। আর নিকলে পেট্রোভিচ খুব উচ্চশিক্ষিত,—অভিজাত মনের মানুষ। এ ধরণের ভদ্রলোকদের কাছে কিছু না পেলেও ব্যবসার খাতিরেই তাদের আদর অভ্যর্থনা করতে হয়। বাজে কথা রাখো—রাগে ফেটে পড়ে সে বলল—তুমি জিনিসগুলো দেবে কি না বলো? আমি তোমার কাছে অনেক ছোট হয়েছি। যদি চাও, তো তোমার পাদুটো পর্য্যন্ত ধরতে পারি—বলেই সে পাশার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। আতঙ্কে হিম হয়ে গেল পাশার বুকের রক্ত। সে চীৎকার করে উঠল—ও কি? ও কি করছেন? থামুন—থামুন—

দু'হাতে ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে সে বলল—আমার যা আছে, সব দিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন। এর একটা জিনিসও পেট্রোভিচের নয়। আমি এগুলো অন্য এক ভদ্রলোকের কাছে পেয়েছি—সে ড্রেসিং টেবিলের উপরের ড্রয়ারটা টেনে খুলে ফেলল। একটি হীরে বসানো সেপ্টিপিন, প্রবালের একটি নেকলেস, কয়েকটি আংটি, এবং দুটো বহুমূল্য ব্রেসলেট সেই মহিলার হাতে দিল। আবার তীক্ষ্ণ চাপা গলায় বলল—যদি আপনি চান, তাহলে এগুলো নিতে পারেন, কিন্তু আবার বলছি, এই গয়নাগুলোর একটাও আপনার স্বামীর নয়। তবুও এগুলো নিয়ে আপনি বিপদ থেকে বাঁচুন—পাশার মাংসল দেহটা ক্রুদ্ধা সার্পিনীর মত দুলে উঠল। অসহ্য একটা জ্বালা কণা কণা জল হয়ে তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। সুন্দরী হয়তো বড় ঘরের অহঙ্কারী মেয়ে। তার পায়ে হাত দেবার প্রস্তাব করে তার মনে যেন বিষাক্ত ক্ষত সৃষ্টি করেছে···তাকে নিদারুণ ভাবে অপদস্থ করার জন্যই হয়তো ঐ জেদী মেয়েটা তার পা ধরতে গিয়েছিল··· হঠাৎ সে পাগলের মত চীৎকার করে বলল—যদি আপনি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে হন, আর যদি পেট্রোভিচের সহধর্ম্মিণী হন তাহলে আপনি আপনার স্বামীকে আগলে রাখবেন। আমি তাকে এখানে আসতে বলি না, তিনি নিজেই আসেন—কান্নাভেজা দুটো চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফুটিয়ে সেই সুন্দরী আগন্তুক মহিলা প্রত্যেকটি গয়না খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দেখে বলল—আমার মনে হয়, আরও কিছু আছে। সব মিলিয়ে এর দাম তো পাঁচশো রুবলও হবে না—

ধক্ করে জ্বলে উঠল পাশার দুটো চোখ। সে উন্মাদের মত ফর ফর করে টেনে তার ব্লাউজটা ছিঁড়ে ফেলে ঘড়ির সোনার চেন, স্কার্টের পকেট থেকে একটা সিগারেট কেস, একটা সোনার বোতাম বের করে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল—আর আমার কিছু নেই। ইচ্ছে হলে আমার ঘর খুঁজতে পারেন—

একটা গভীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই মেয়েটি কাঁপা হাতে প্রত্যেকটি গয়না রুমালে বেঁধে নিয়ে, একটিও কথা না বলে, পাশার দিকে একবারও না তাকিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাশের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল কলপাকভ। প্রচ্ছন্ন কোন অপরাধবোধের ছায়া পড়েছে তার মুখে। উত্তেজিত পায়ে সে ঘরের চারদিকে পায়চারী করতে লাগল।—বলুন কি উপহার আপনি আমাকে দিয়েছেন? উদভ্রান্তের মত তার বুকের কাছে ঝাঁপিয়ে এসে পাশা বলল—বলুন কবে আপনাকে আমি অনুরোধ করেছি আমাকে কিছু দিতে?

উপহার—না, না, সে কিছু নয়—আতঙ্কভরা চাপাগলায় চেঁচিয়ে উঠল কলপাকভ, হা ভগবান, শেষ পর্য্যন্ত এই আমাকে দেখতে হলো? সে তোমার কাছে এসে চোখের জল ফেলল—তোমার পায়ে ধরলো—

—কী উপহার আপনি আমাকে দিয়েছেন?

—গলা চিরে চীৎকার করে উঠল পাশা, কিন্তু পাশার কথা যেন তার কানেই পৌছল না। কলপাকভ স্থির জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট গলায় বলল—সে ফুলের মত পবিত্র, সুন্দর মেয়ে হয়ে এই রকম একটা নরকের কীটের পায়ে ধরল। হ্যাঁ হ্যাঁ আমিই তো তার এই দৈন্যদশা করেছি—হঠাৎ কাতরগলায় যেন সে আর্তনাদ করে উঠল—আমার এ পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। না, না—ভগবান যেন কখনো আমাকে ক্ষমা না করেন। এই ঘৃণ্য মেয়েটাই আমার এমনি সর্ব্বনাশ করেছে। সর সর—সরে যা হারামজাদী। অসহ্য একটা জ্বালায় যেন জ্বলে পুড়ে আগুনের একটা হল্কার মত বেরিয়ে যেতে যেতে বলল—ইস্ তোর মত একটা বেশ্যার পায়ে ধরল আমার স্ত্রী!

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল পাশা। সে কান্নার আর শেষ নেই। তীব্র একটা ব্যাথা যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে তার হৃদয়টা। নিদারুণ একটা অনুশোচনা কাঁটার মত বিঁধে গেল তার মনে—এত উত্তেজিত হয়ে সে তার নিজের জিনিসগুলো কেন দিতে গেল তাকে? তার মনে পড়ল, তিন বছর আগে এক ধনী ব্যবসায়ী নিষ্ঠুরভাবে তাকে মেরেছিল একেবার বিনাকারণে। সেই বিষাক্ত স্মৃতির পীড়নে একক নির্জন ঘরের স্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে সে আরও চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

জীবনায়ন

সনৎকুমার মিত্র

সেদিনের মিঠে রোদে খোলা ছাদে ঝির ঝির হাওয়া,—
খোলা মনে ঘুম চোখে উঠে এসে দাঁড়ালাম যেই
ভিজে ভিজে কালো চুলে চোখ তুলে মিটি মিটি চাওয়া :-
তারপর খুঁজে দেখি এই মন সেই মন নেই!
আর দিন লাল আভা—ঢ'লে পড়া সূর্য্য থেকে মেঘে
লেগেছিল গোধূলীতে! সেইক্ষণে কত মধু-গান
উড়ে এলো ভেসে ভেসে—এই মনে তার ছোঁয়া লেগে;
শিশিরের ছোঁয়া পেল, আবিরের রঙ্ পেল।

অন্যদিন সানায়ের কান্না শুনে কেঁদে ওঠে মন :
ধীর পায়ে হেঁটে যাওয়া—ভেঙ্গে যাওয়া পাঁজরের হাড় ;
পথের কাঁকড় নিয়ে অতীতের স্মৃতি আলোড়ন,
শেষ নেই সেই ছাদে সেই চাঁদে ঘুম হারাবার।
একদিন যে কথাকে হৃদয়ের পুরে অনুক্ষণ
ভাসিয়েছি বারবার—প্রকাশ হয়নি তবু তার,
সেই কথা শোনাবার অবসর মিলবে না আর,
বাঁধ ভাঙ্গা ব্যথা নিয়ে—তাই কাঁদে এ অবোধ মন।

সাধন সঙ্গীত

(রাগপ্রধান—একতাল।)

এমন করিয়া কেন তুমি মোরে
টানিছো নিঠুর তোমারি পায়;
চাহিনি তোমারে বাসিনিতো ভালো
তবু তব প্রেম হৃদয় ছায়।

পারিনা সহিতে তব সে আলোকে,
ধরার আঁধার ভালো লাগে চোখে,
মোহময় নীড়ে ঘুমায়ে পাখীরে
কেমনে সে তব আকাশে ধায়।

সে প্রেম আমারে জড়ায়ে নিবিড়ে,
টানিছে আলোক তীর্থের তীরে,
তবু এ-হৃদয় শুধু ফিরে ফিরে
মাটির ছায়ায় ঘুমাতে চায়।

চাঁদের চাহনি উতল সাগরে,
ঊর্মিরে ক্ষণে উন্মনা করে,
তবুও সে কীরে সঁপি শশধরে,
সাগরের কথা ভুলিয়া যায়।

কথা—নৃপেন্দ্রনাথ রায় ঃঃ সুর ও স্বরলিপি—তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

২´ | ৩ | ০ | ১
II ধা ধা ণা | গধা পা পা | পা পা পা | স্মা ধপা পা I
এ ম ন | ক রি য়া | কে ন তু | মি মো রে

I রা গরা গা | মধা পণা গধা | পমগা রা গা | রসন্‌া -সা -া I
টা নি০ ছো | নি০ ঠু০ র্ | তো০ মা রি | পা০ ০ য়্

I সা রা রা | রা রা গাম | রা গা মা | পা পা পা I
চা হি নি | তো মা রে | বা সি নি | তো ভা লো

I ধা না র্সা | র্রা র্সনা র্রর্সা | ধা ণা ণধা | পা -া -া I
ত বু ত ব প্রেং ম্ হৃ দ য় ছা ০ য়্
"টানিছো নিঠুর তোমারি পায়" II

২´ ৩ ০ ১
II পা পা -ধা | ধা নধা না | র্সা র্রা র্রর্গর্গর্রা | র্সনা র্সা র্সা I
সে প্রে ম্ আ মাং রে জ ড়া য়ে০০ নিং বি ড়ে

I নধা নধা না | র্সা র্রা র্রা | র্সনা -র্রর্সা ধা | ধাণ ধা পা I
টাং নিং ছে আ লো ক তীং র্ থে র তী রে

I মা মা মা | মগা মা -া | পা পা ধা | ধাণ ধা পা I
ত বু এ হৃং দ য়্ শু ধু ফি রে ফি রে

I ধা নর্সা -র্রা | র্সনা -র্রর্সা -না | ধা ণা ণধা | পা -া -া I
মা টিং র্ ছাং ০ য়্ ঘু মা তে চা ০ য়্
"টানিছো নিঠুর তোমারি পায়" II

২´ ৩ ০ ১
II সা ণা ধা | সণা ধা পা | পা ধা মা | পা পা পা I
পা রি না স হি তে ত ব সে আ লো কে

I রা রা -গা | মা পা -া | মা গা মা | রা সা সা I
ধ রা র্ আঁ ধা র্ ভা লো লা গে চো খে

I সা রা রা | -া রা গা | রা গা মা | পা পা পা I
মো হ ম য়্ নী ড়ে ঘু মা য়ে পা খী রে

I ধা না র্সা | র্রা র্সনা র্রর্সা | নধা ণা ণধা | পা -া -া I
কে ম নে সে ভং ব আ কা শে ধা ০ য়্

I পা পা -ধা | ধা নধা না | র্সা র্রা র্রর্গর্গর্রা | র্সনা র্সা র্সা I
চাঁ দে র্ চা হং নি উ ত লং০০ সাং গ রে

I নধা -নধা না | র্সা র্রা র্রা | র্সনা -র্রর্সা ধা | ধাণ ধা পা I
উ০ ০র্ মি রে ক্ষ ণে উ০ ন্ ম না ক রে

I মা মা মা | মা মগা মা | পা পা ধা | ধাণ ধা পা I
ত বু ও সে কীং রে সঁ পি শ শ ধ রে

I ধা না র্সা | -র্রা র্সনা র্রর্সা | ধা ণা ণধা | পা -া -া I
সা গ রে র্ কং থা ভু লি য়া যা ০ য়্

"টানিছো নিঠুর তোমারি পায়" II II

বৃটেনের সমাজ

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য এম-এ (এড্) এস-এ (লণ্ডন), টি-ডি (লণ্ডন)

খুব বেশী দিনের কথা নয়। সিন্ধুর বুকে বিন্দুর মত ছিল একটি প্রবাল দ্বীপ। একে একে গড়ে উঠল পল্লী—ভ'রে উঠল প্রান্তর। আর ভ'রে উঠল ইংরেজ জাতির প্রাণ নূতনের স্বপ্নে। ছুটলো সে দিকে দিকে পাগলের মত দিগ্বিজয়ের নেশায়। লুটল তার পায়ের তলায় কত ধনসম্পদ। বিদেশিনী ভাগ্যলক্ষ্মীর চোখের জলে—ভাগ্য ফিরল ইংরেজ জাতির।

ছোট্ট দেশ গ্রেট বৃটেন—কিন্তু তবুও সে গ্রেট এ জাতির কাছে। দেশের মাটিই তাদের মা'টি। আর সেই মাটিকে ঘিরে যে সাগর কল্লোল—তার দিকে সে কান পেতে শুনল—গতিবাদের মন্ত্র। তাই গতিবাদই হ'ল ইংরেজ জাতির জীবন দর্শন—আর সে কেবল সংগতিকে বাড়াবার জন্যে।

একে একে প্রতিষ্ঠা হ'ল—যন্ত্রের। নিয়োজিত হ'ল সব আয়োজন সৃষ্টির কাজে। কিন্তু সেখানেই গতি তার রুদ্ধ হ'ল না। ঐশ্বর্য্যকে আঁকড়ে ধরে রাখবে সে কি দিয়ে? ঐশ্বর্য্যের বোঝা যে একদিন যক্ষের ধন হ'য়ে উঠবে যদি তা'র অন্তরে জেগে না উঠে—শক্তি, জ্বলে না ওঠে—জ্ঞানের বাতি। তাই যন্ত্রের সাথে তন্ত্রের হ'ল প্রতিষ্ঠা, সৃষ্টির সাথে কৃষ্টির।

বহুদিনের সাধনায় রচিত হ'ল জাতির জীবন বেদ। গড়ে উঠলো সমাজ। সে সমাজ হ'ল স্থিতিশীল। বুনিয়াদ হ'ল পাকা। আর পত্তন হ'ল বুনিয়াদী শ্রেণী বিভাগের। আর সেই শ্রেণী বিভাগের প্রাচীর ঘিরে চ'লতে থাকল—জীবন পরিক্রমা।

জাতিভেদ না থাকলেও মানুষের মাঝে ব্যবধানের জন্যে চীনের প্রাচীর টানা হয়েছে। এই দেশে সে হচ্ছে ঐশ্বর্য্য ও আভিজাত্যের ওপর ভিত্তি করে।

বহু যুদ্ধ পার হয়ে গেল, বহু বোমাবর্ষণ হ'ল—কিন্তু আজও সে চীনের প্রাচীর খাড়া রয়েছে। তাই গণতন্ত্রের রাজ্যে আজও রাজা রাণীকে নিয়ে এরা পুতুল খেলতে ভালবাসে। আজ রাণীকে দেখবার জন্যে এ জাতি দিনের পর দিন প্রহর গুণতে থাকে।

মনে পড়ে সেদিনের কথা। তখনও রাণীর অভিষেকের দিন দুয়েক বাকী আছে। সারা বৃটেন যেন পাগল হয়ে উঠেছে। লণ্ডনের পথে ও প্রান্তরে দুদিন আগে থেকেই লোক জড় হ'তে সুরু হ'ল। কেউ বা ওয়াটারপ্রুফ নিয়ে, কেউ বা কম্বল বিছিয়ে বসে প'ড়ল গাছের তলায় পথের ধারে। কারও সঙ্গে তাস, কারও সাথে স্যাণ্ডউইচ। আকাশের নীচে রাত কাটলো কত যুবকযুবতীর, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার—এ যেন তীর্থযাত্রীর ভিড়।

চারদিক ছেয়ে গেছে পত্রপল্লবে ও পতাকায়।

অভিষেকের আগের দিন রাত্রি থেকে ঝিরঝির বৃষ্টি ঝরছিল। কিন্তু তাকে গ্রাহ্য করে কে? সারা রাত্রি সারা লণ্ডন শহর জাগল শুকতারার সঙ্গে। উষার আলো দেখা দিল—কিন্তু আকাশে তখন অরুণিমা দেখা দেয়নি। কারণ তখনও সূর্য্য মুখ লুকিয়ে আছে মেঘের আড়ালে। বেরিয়ে পড়া গেল পথে।

কিন্তু জনসমুদ্রের মাঝে পথ করে নেওয়া কঠিন হ'য়ে প'ড়ল। ভাবলুম, রাণীকে বুঝি দেখা হ'ল না। যাক, দুঃখ নেই—শহরের অবস্থা ত' দেখা গেল। সকাল থেকেই কয়েকটি টিউব স্টেশন বন্ধ। সে সব পথ দিয়ে নাকি রাণীর নগরী পরিক্রমা। অগণিত মানুষ নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছে—দুই তিন দিন ধরে আর একজন মানুষকে দেখবার জন্যে। বিস্ময় জাগে এ জাতির রাজভক্তি দেখে।

হঠাৎ জনসমুদ্রে ঢেউ জাগল। রাণী বেরিয়েছেন তাঁর সপ্তাশ্ব রথে চ'ড়ে। সামনে পেছনে—কত দেশের মুখ্যমন্ত্রীদের রথ—আর বিশিষ্ট প্রহরীদের শোভাযাত্রা। মাঝে মাঝে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর প্যারেড। কোথায় যে শোভাযাত্রার সুরু—আর কোথায় যে শেষ—সহজে ঠিক করা কঠিন হ'য়ে পড়ে। এঁকে বেঁকে নগরীর পথ বেয়ে চলেছে এই শোভাযাত্রা। বিচিত্র তার শোভা। রাণীর মুখে একটি মাতৃসুলভ প্রসন্নতা জনতার সব ক্লান্তি যেন হরে নিল। সব শ্রম যেন সার্থক হ'ল। পথের দুধারে গ্যালারীতে উচ্চ হারের সিট ভাড়া নিয়ে বসে আছেন উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা বা নাগরিকবৃন্দ। কামনা, আভিজাত্যটিকে আর একটু কায়েম করা। গণতন্ত্রের তুফানের মাঝে রাণী যেন তাঁদের কাছে বরাভয়ের মন্ত্র বহন করে এনেছেন। রাণীর রথ দূরে মিলিয়ে গেল। কিন্তু মুগ্ধ জনতা যেন তখনও ভাবছিল—"নয়ন না তিরপিত ভেল।" আর আমি ভাবছিলাম—এদের সমাজের কথা—আর জগন্নাথের রথযাত্রার কথা। যেন সবখানেই মিল।

রাণী যে এদেশে সত্যই ঠুটো জগন্নাথের মত। কোন ক্ষমতাই নেই তাঁর, তবুও যে তিনি তাঁদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মত। আর ধন্য এদের পুরাতনের প্রতি নিষ্ঠ—Love for tradition.

তাইত আজও টিকে আছে এদের শ্রেণী বিভাগ। কুলিমজুর যারা, তাদের জীবনে কোনও বৈচিত্র্য নেই। সকাল থেকে একটানা জীবনযুদ্ধ। দৈহিক শক্তিই সেখানে একমাত্র মূলধন। সন্ধ্যায় অবসন্ন দেহে ক্লান্ত মনে নীড়ে ফিরে আসা, তখন হয়ত গৃহিণী কারখানা বা কর্ম্মস্থল থেকে ফেরে নি—আবার পরদিন সকালে ওঠার জন্যে তাড়াতাড়ি শয্যা গ্রহণের আয়োজন। গতানুগতিক সুরে চ'লতে থাকে এই জীবনযাত্রা। হয়ত বা সন্ধ্যায় একটু বারে বসে দু' পেগ সুরা পানের মধ্য দিয়ে একটু সুর-বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা। সপ্তাহান্তে সাধারণতঃ শুক্রবারের শেষে যে যার দক্ষিণা পেয়ে মনের আনন্দে বাড়ীতে ফিরে—হয়ত বা একটু সিনেমায় যাওয়া। কেউবা শ্রীমতীর মনোরঞ্জনের জন্য কিছু একটা সওদা করেন। সপ্তাহের শেষে রবিবারে হয়ত বা বেরিয়ে পড়ল কাছাকাছি কোন একটা পার্কে। সারা দিন শুয়ে রইল ঘাসের ওপর স্বামী স্ত্রীতে। এইটুকুই তাদের সান্ত্বনা। সোমবার থেকে আবার জীবন সংগ্রাম। এইভাবে দিন কেটে যায় শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে। কোন উচ্চ আদর্শ নেই—এদের মাঝে, আর থাকবেই বা কি ক'রে! কেবল খাও দাও, স্ফূর্তি কর। অনেক কষ্টের মধ্য দিয়েই এদের দিন কাটে। শহরের মধ্যে কয়েকটি শ্রমিক পল্লীও গড়ে উঠেছে। সেখানে নাকি কোনও অভিজাত শ্রেণীর লোকের বসবাস করা সমাজের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় সব দেশেই মধ্যবিত্তদের একদশা। ঘরেও নহে পরেও নহে। বাইরের চালচলন, বেশভূষা ধোপদুরস্ত রাখতে গিয়ে বেড়ে যায় ঋণের বোঝা। এমন অনেক মধ্যবিত্ত আছে, যাদের নিজস্ব বাড়ীঘর নেই। আর গৃহ নেই বলে গৃহিনীকেও লাভ করা সম্ভব হয় না। বছরের পর বছর প্রেম চ'লতে থাকে—কিন্তু পরিণয়ে পরিণত হওয়ার পথে অন্তরায় হ'য়ে পড়ে এই গৃহাভাব। বাসা নিয়ে নাকি ভালোবাসাই চ'লতে পারে, ঘরসংসার চলে না। তাই অনেক প্রণয়ীই এই অক্ষমতাকে কেন্দ্র করে তাঁদের love policy renew ক'রে যেতে থাকেন—ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে। অনেক মধ্যবিত্ত সংসারের সাথে নিবিড় পরিচয় ঘটবার সুযোগও হয়েছে। দেখেছি এদের ঘরসংসারের সাথে আমাদের দেশের ঘরসংসারের মিলও আছে যথেষ্ট, আবার গরমিলও অনেক।

এমন অনেক গৃহিনী আছেন যাঁরা আমাদের দেশের মেয়েদের তুলনায় সংসারের জন্য কম পরিশ্রম করেন না। স্নানের ঘর থেকে সুরু ক'রে সব কিছু ঝক্‌ঝকে করে রাখবার জন্যে সকাল থেকে এদের প্রয়াসের যেন অন্ত নেই। তারপর বাজার হাট সব কিছুই। সত্যিই যারা বুনিয়াদী মধ্যবিত্ত, তাদের জীবনের গতিপথ নির্দ্দিষ্টই থাকে। স্বাধীন চলাফেরা থাকলেও তার মাঝে যেন একটা সংযম লক্ষ্য করা যায়। অনেক স্ত্রী আবার স্বামীকে আর্থিক সাহায্য করবার জন্যে—হয় অফিসে নয় অন্য কোথাও—অল্পসময়ের জন্য কাজ করে থাকেন। আবার কেউ কেউ ঘরে বসেই নানা হাতের কাজ করে সংসারের স্বাচ্ছল্য বাড়াবার চেষ্টা করেন। একটা জড়তা থেকে মুক্তি এদেশের মেয়েদের মধ্যে বিশেষ লক্ষ্যণীয়। এই জড়তা থেকে মুক্তির জন্য অভিভাবকদের চেষ্টার ত্রুটী নেই। ছেলেবেলা থেকেই তাই এদেশের মেয়েদের ছেলেবন্ধু (boy friend) ও ছেলেদের মেয়েবন্ধু জোটে। না জুটলেই সে অপদার্থ বলে বিবেচিত হয়।

অভিজাত শ্রেণীতে যারা পড়েন তাঁদের অবশ্য জীবনধারা স্বতন্ত্র। তাঁদের ঘরের মেয়েদের প্রধান কাজ অতিথি-আপ্যায়ন, বন্ধুআত্মীয়ের অভ্যর্থনা, ও দাসদাসীদের পরিচালনা।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই এখানে মর্য্যাদা পেয়েছে বেশী—তাই পরিবারের কথা এদের সমাজে স্বপ্নের মত। এমন কি পিতামাতারও ঠাঁই নেই পুত্রের সংসারে। ঘরে গৃহলক্ষ্মী আসবার পর থেকেই বিদায় নিতে হয় বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে চোখের জল চেপে, মুখে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা কোনমতে বজায় রেখে। এর পর থেকে তাঁরা অতিথি হ'ন মাঝে মাঝে পুত্রগৃহে। হয়ত বা পৌত্রের জন্যে একবাক্স চকলেট নিয়ে একদিন দেখা দিলেন সান্ধ্য চায়ের টেবিলে। কিছুক্ষণ ধরে হাসিগল্প চ'লতে থাকল। হয়ত বা রাতের অতিথি হবার জন্যে অনুরোধ এল পুত্রবধূর তরফ থেকে, এটা এদেশের স্বাভাবিক। পুত্রবধূর সংসারে থাকতে যে তাদেরও যেন আত্মমর্য্যাদায় বাধে। তাই বৃদ্ধ বয়সে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সামান্য পেনসন নিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে বাধ্য হন। হয়ত কোনও পল্লী প্রান্তে তাঁদের দিন কাটে। আবার যাঁদের কেউ নেই···নিরালম্ব যাঁরা, তাঁদের জন্য এদেশের সরকার রচনা করেছেন বার্দ্ধক্যের বারাণসী। এই সব কেন্দ্রে অগণিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা একসাথে সুখ দুঃখের কথা বলে, খুঁটি-নাটি কাজের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করে থাকেন।

বৃদ্ধদের জন্যে যেমন কেন্দ্র খোলা হয়েছে, তেমনি ব্যবস্থা আছে শিশুদের জন্যে। যারা অনাথ, অসহায় তাদের জন্যে রয়েছে এমন অনেক শিশুতীর্থ। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ভরণপোষণের ভার নিয়েছে রাষ্ট্র। এমনি আরও অনেক ভার নিয়ে রাষ্ট্র অনেক সমাজসমস্যা সমাধান করবার প্রয়াস করেছে।

ফলে রাষ্ট্রই হয়েছে জনসাধারণের একমাত্র অভিভাবক ও আশ্রয়। মানুষের যে সব বড় প্রয়োজন তা' মেটাবার ভার নিয়ে জীবনকে নিষ্কণ্টক ও পূর্ণাঙ্গ করবার প্রয়াসের যেন অন্ত নেই।

শৈশবে শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, কৈশোরে তাদের পূর্ণ-ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করা—কর্মনিরূপণ করা ও কর্মে নিয়োজিত করা, বার্দ্ধক্যে তাদের বৃত্তি দেওয়া—সব ব্যবস্থাই আছে এদেশে। ফলে শিক্ষা হয়েছে এদেশে আবশ্যিক ও অবৈতনিক। বেকার সমস্যা এদেশে নাই বললেই চলে। কারণ, যতদিন রাষ্ট্র প্রত্যেক যোগ্য মানুষকে কাজে লাগাতে না পারবে, ততোদিন তার বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা—প্রায় বিনা ব্যয়ে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা।

ব্যাধি, অভাব ও বেকারসমস্যার বিরুদ্ধে এমনিভাবে সংগ্রাম করে চলেছে এদেশের রাষ্ট্র। তাইতো এদেশে শৃঙ্খলা, নাগরিক চেতনা ও তুচ্ছ ব্যাপারে সততা গড়ে উঠেছে বহুদিনের সাধনার ফলে। তাইতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুশৃঙ্খলভাবে নিঃশব্দে কাগজ মুখে এ দাঁড়িয়ে থাকিতে পারে, তাইতো এদেশের রাস্তাঘাটে একটু করো কাগজও পড়ে থাকে না। তাইতো প্রহরের পর প্রহর—বাড়ীর দরজার বাইরে দুধের বোতল পড়ে থাকে—কেউ কারও জিনিস স্পর্শ করে না।

তাই এদেশ হচ্ছে Land of Qs.—Queen. Q লাইন, I.Q.—বা (Intelligence Quotient)। এই তিনটির প্রতি এদেশের বিশ্বাস অটল।

ত্যাগের মন্ত্র এদের আকর্ষণ ক'রতে পারে নি—এ জাতির মূলনীতি Eat. Drink, Be merry…বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—এ বাক্যকে ইংরেজ অনুসরণ করতে জানে। তাই বুকভরা সাহস, প্রাণশক্তি ও শালীনতা এদের কাছে শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক সম্পদ।

আজ রক্ষণশীল সমাজের পাকা বুনিয়াদ কেঁপে উঠেছে। ফলে গণতন্ত্রের আবহাওয়া প্রভাবিত করেছে…পুঁজীবাদী ও অভিজাতদের দৃষ্টিভঙ্গীকে। আজ শ্রমিকরা দাবী জানিয়েছে—জানিয়েছে মানুষের অধিকারের দাবী তাই পাল্টে গেছে মজুরদের প্রতি কর্তৃপক্ষের আচরণ। কলকারখানা, অফিসের বাইরে আজ শ্রমিক তাদের কর্তৃপক্ষের সাথে একটেবিলে বসে খোসগল্প করবার সুযোগ পায়। অফিসের বাইরে সবাই এক।

তাই মানুষের মর্য্যাদাকে ঠাঁই দিয়েছে—নূতনের মন্ত্র গণতন্ত্র। বাইরের আচরণে মনিব ভৃত্যের মধ্যে ব্যবধান কমে এলেও মনের কোনে ব্যবধান এখনও অটুট রয়েছে। যতদিন এ ব্যবধান দূরে না যাবে, ততোধিক সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সুদূর পরাহত।

হঠাৎ মৃত্যু

ডাঃ এস্ গঙ্গোপাধ্যায়

ভাদ্র ১৩৬২ সংখ্যার ভারতবর্ষে ডাঃ জে, এন্ মৈত্রের 'হঠাৎ মৃত্যু' প্রবন্ধ পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর দেহশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার সুযোগ লইয়া তিনি করোনারী ব্যাধি সম্বন্ধে এরূপ অবৈজ্ঞানিক ও অবান্তর প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন যে যাহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য মনে করি। আমার মত অনেক চিকিৎসকই তাঁহার নিকট এইরূপ প্রবন্ধ প্রকাশের কারণ জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইবেন।

করোনারী অক্লুশনকে কি হিসাবে তিনি নিজ নামের অনুসরণে 'মৈত্র ব্যাধি' নাম দিবার সাহস করিয়াছেন তাহা জানা প্রয়োজন। তিনি নিজেকে এই ব্যাধির সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কারক বলিয়া দাবী করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এই উদ্ভট দাবী অন্য কেহ মানিবেন কি না সন্দেহ। প্রসঙ্গতঃ তিনি কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের নাম করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা যে ডাঃ মৈত্রের এই দাবী সমর্থন করেন তাহার কোন প্রমাণ দেন নাই। হস্তরেখা বিচার বা নক্ষত্র পরীক্ষার সঙ্গে কোন ব্যাধি আবিষ্কারের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে, এবং শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া যে তিনি কি বলিতে চাহিয়াছেন তাহা বুদ্ধির অগম্য। অথচ যে বিষয়ে তিনি প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন এবং যাহার সম্বন্ধে পাঠকদের কিছু সত্যকথা জানাইলে উপকার হইত, সেই করোনারী অক্লুশন সম্বন্ধেই তিনি কিছুই বলেন নাই।

বৈজ্ঞানিক মতে মৃত্যু সব সময়েই হঠাৎই হইয়া থাকে, কিন্তু চিকিৎসকেরা সেইরূপ মৃত্যুকে সাধারণতঃ হঠাৎ বলিয়া থাকেন যাহা পূর্ব্বে কোনরূপ ঘোষণা না করিয়াই উপস্থিত হয়। মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ বা কয়েকদিন পূর্ব্বেই যদি জানা সম্ভব হয় যে মৃত্যু হইলেও হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে 'হঠাৎ মৃত্যু' বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না। ডাঃ মৈত্রের মতে করোনারী অক্লুশন পূর্ব্ব হইতেই জানা সম্ভব এবং তাহার প্রতিরোধও সম্ভব। অতএব তাঁহার মতে করোনারী অক্লুশনে মৃত্যু 'হঠাৎ মৃত্যু' নয়। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে ডাঃ মৈত্র কিরূপে পূর্ব্বাহ্নেই করোনারী অক্লুশন নিরূপণ করেন? যতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগী তাহার দেহযন্ত্রের কোন অস্বাভাবিকতা বা বিকলতা লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসকের কাছে না আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার রোগ নির্ণয় সম্ভবপর নহে। বুকে ব্যথা লইয়া যখন সে চিকিৎসকের কাছে আসে ডাঃ মৈত্রের মতে তখনও কি তাহার করোনারী অক্লুশন হয় নাই? তিনি কি মনে করেন করোনারী অক্লুশন হইলেই মৃত্যু অবধারিত? তাহার কোন মাত্রা নাই? রোগী বুকে

ব্যথা পাইবার আগে তিনি কি ভাবে জানিতে পারেন যে তাহার করোনারী অক্লুশন হইবে এবং কোন চিকিৎসা দ্বারা তিনি তাহা পিছাইয়া দিতে পারেন তাহা জানিতে পারিলে বাধিত হইব। পৃথিবীর সর্বত্র যখন এই বিষয় লইয়া নানারূপ গবেষণা চলিতেছে এবং এখন পর্য্যন্ত কোন সমাধান পাওয়া যখন যায় নাই তখন ডাঃ মৈত্রের এই দৃঢ় উক্তির পর তিনি এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে উত্তর দিতে বাধ্য।

ডাঃ মৈত্র করোনারী অক্লুশন ও করোনারী থ্রম্বোসিস্ দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যাধি বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—অথচ কোন কারণ দেখান নাই। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র মতে করোনারী অক্লুশন বা করোনারী ধমনীর মধ্য দিয়া রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার নানারূপ কারণ আছে যাহার মধ্যে করোনারী থ্রম্বোসিস্ বা রক্তপ্রবাহ জমাট বাঁধিয়া যাওয়া একটি প্রধান কারণ। কিন্তু ইহাই একমাত্র কারণ নহে। করোনারী ধমনীর অভ্যন্তরস্থ গাত্রে স্নেহজাতীয় পদার্থের সমাবেশ (atheroma) হইয়া এবং তাহা বৃদ্ধি পাইয়া রক্তচলাচল ক্রমশ বন্ধ করিতে পারে। এই স্নেহপদার্থের মধ্যে সহসা রক্তপাত হইয়া (haemonhaje in the atheromatons patch) রক্তচলাচল বন্ধ হইতে পারে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের সমস্ত ধমনীর সহিত করোনারীও কঠিন ও সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে পারে (arteriosclerosis) এবং রক্তপ্রবাহ কম হইতে হইতে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। সিফিলিস ব্যাধিও এইরূপ করিতে পারে। কারণ যাহাই হোক্ না কেন তাহার ফল একই হয় এবং তাহা করোনারী অক্লুশন। সম্পূর্ণ বন্ধ হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ের মাংসপেশীতে রক্তাল্পতার জন্য ব্যথা হয় এবং সম্পূর্ণ বন্ধ হইলে মৃত্যু হয়। সময় সময় করোনারীর কোন সূক্ষ্ম শাখা সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইলেও মৃত্যু হয় না—রোগী কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন যন্ত্রণা পাইয়া পুনরায় সুস্থ হইয়া ওঠেন—যদিও তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে না এবং রোগীকে সাবধানে থাকিতে হয়।

করোনারী ব্যাধিসমূহের জ্ঞান অল্পদিনের নহে। ইহা সত্যকথা যে সম্পূর্ণ কারণ নিরূপন আজও সম্ভব হয় নাই। কিন্তু নানা দেশে গবেষণা চলিতেছে এবং হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ কারণ জানা যাইবে এবং ইহার প্রতিরোধও সম্ভব হইবে। ডাঃ মৈত্র যদি সত্যই এ বিষয়ে কিছু নূতন জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া থাকিতে পারেন তাহা হইলে কোন্ কোন্ চিকিৎসাশাস্ত্র পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন জানিতে পারিলে সুখী হইব।

ডাঃ মৈত্রের আর একটি উক্তিতে সমস্ত চিকিৎসকগণেরই ঘোর আপত্তি থাকিবে। করোনারী অক্লুশনে মৃত্যুকে কখনো 'কি বীভৎস মৃত্যু' বলা যাইতে পারে না। অন্যান্য সব মৃত্যুর চাইতেও করোনারী অক্লুশনে মৃত্যু সহজ এবং প্রার্থনীয়। দীর্ঘদিন রোগশয্যায় শুইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করার চাইতে এইরূপ 'হঠাৎ মৃত্যু' অনেক বেশী বাঞ্ছনীয়—অবশ্য যদি মৃত্যু হয়।

নিজেকে সর্বপ্রথম আবিষ্কারক বলিয়া দাবী করিবার পর ডাঃ মৈত্র নিশ্চয়ই এ প্রতিবাদের যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিবেন। 'ভারতবর্ষে'র মত সাহিত্যপত্রিকায়—যাহার পাঠকগোষ্ঠি দেহশাস্ত্রে অভিজ্ঞ নন এবং সে সম্বন্ধে যাঁহাদের বিশেষ কৌতূহল থাকাও সম্ভব নয়—সেখানে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া অথচ কিছু না বলিয়া কেবল নিজের সম্বন্ধেই জানান আমার মতে বিজ্ঞাপন জাহির করা ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা চিকিৎসাশাস্ত্রের সম্পূর্ণ নীতিবহির্ভূত।

স্মৃতির শিশির

সন্তোষ দাস

স্মৃতির শিশির ঝরে
সারারাত কান্না শুনি তার
সে যেন বাজায় বসে
মৃদু হাতে করুণ সেতার
জানালার শিয়রে
অদূরে,
সে বুঝি এখনে বসে
হৃদয়ের চৌকাঠ জুড়ে।
স্মৃতির বিবর্ণ পাতা

কতবার ফেলে দেই ছুঁড়ি
জানালায় বেজে ওঠে
দ্রুত হাতে হাওয়ার হাতুড়ী,
স্মৃতির দুরন্ত ঝঞ্ঝনা—
তাকে তো যায়না ভোলা
তাকে ভোলা কখনো
যাবেনা।
স্মৃতির শিশির ঝরে
সারারাত তারি শব্দ হয়

রুদ্ধ ঘরে একটানা—
বুকচাপা স্বপ্নের সমর
দীর্ঘ হতে আরও দীর্ঘতর
স্মৃতির বিবর্ণ পাতা
উড়ে এসে হয় ফের জড়।
তাকে তো যায় না ভোলা
ঘুম ভেঙে দেখি রোজ ভোরে
সারা মাঠ ভিজে গেছে
ফোঁটা ফোঁটা স্মৃতির শিশিরে।

আমার গল্পটা শুনবে কি ?

অমরেন্দ্র ঘোষ

তুমি হয়তো ঘোর সন্ধ্যায় খেয়া-ঘাটে এসে দাঁড়াও নি, যখন পারাপারের নৌকাখানা ওপার চলে গেছে। তুমি হয়ত অনেক দিন বাদে বাড়ি ফিরে দেখনি যে ভদ্রাসন মহাশ্মশানের মত থম থম করছে। তুমি হয়ত কল্পনাই করতে পারছ না, এইমাত্র ফাঁসীর আসামীর পায়ের তলা দিয়ে তক্তাখানা টেনে নেওয়া হয়েছে। তেমনি একটা মনের ভাব নিয়ে আমি তখন কলকাতা সহরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

জিজ্ঞাসা করতে পার কেন ?

যদি রূপোর চামচে মুখে করে না জন্মে থাকো, যদি ইতিহাস কিম্বা অর্থনীতির অথবা রাজনীতির ছাত্র না-ও হও—উনিশ শ' পঞ্চান্নর ভরা দুর্যোগের এক শ্রাবণ সন্ধ্যায় চেয়ে দেখ, উত্তর তোমার চারপাশে ছড়ান।

এখনো বোধ হয় পরিষ্কার বুঝতে পারনি। মুস্কিল! তুমি কি একজন সেভ-ইজি পড়ে পাশ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ?

তোমার জন্য আমার এ অবস্থায়ও অনুকম্পা হচ্ছে।

তবে গল্পটা খুলেই বলি। যত গুরু গম্ভীর মনে করছ ঠিক তা নয়। এমন ঘটনা তোমার জীবনেও ঘটতে পারে। হয়ত কোন্ না ঘটেই গেছে। আমি পুনরুক্তি করছি মাত্র। তবু আশা করি ভদ্রতার খাতিরে অনুগ্রহ করে চুপ করেই শুনবে।

আমি অল্পদিন হল ভেসে ভেসে এসেছি কলকাতায়। সহায় নেই, অবলম্বন নেই—পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভাবছ চাকরী চাইছি ? তা নয়। এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেইঞ্জে তোমাদের ভিড় দেখেছি। এই দুর্যোগে ধাক্কাধাক্কি দেখেছি কোয়ালিফাইড্ ছেলে মেয়ের। আমার সে বয়সও নেই, সে শিক্ষাও নেই। যদিও বা একখানা ডিগ্রীর দলিল ছিল তা এখন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ব্যবহার না করে। অতএব আমাকে দিয়ে প্রতিযোগিতার ভয় নেই।

তোমরা এখন নিশ্চিন্তে আমার গল্পটা শুনতে পার।

আমি একজন প্রবাসী বাঙালী। সুখেই ছিলাম ব্রহ্মপুত্রের তীরে চাষ-আবাদ অরণ্যভূমির সম্পদ নিয়ে। আজকাল সুখে থাকা কঠিন কিন্তু আমি তা ছিলাম। এ তোমাদের স্বাধীনতার দান নয়, আমারই ধৈর্য এবং নিষ্ঠার ফল।

তোমাদের মত অত বড় না হলেও আগেই বলেছি আমি একটা ডিগ্রি পেয়েছিলাম অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে। তখন আর দেরি করলাম না, ভাগ্যান্বেষণে রওনা দিলাম আসামের প্রত্যন্ত প্রদেশে। তখন বিংশ শতকের প্রথম পর্ব, সামন্ত যুগ—দুনিয়াদারীর হালচাল ছিল আলাদা। এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেইঞ্জ তখনো জন্মায়নি। নাম শোনা যায়নি এত ইজম ও লাল গেরুয়া সবুজ নানা রঙের ঝাণ্ডার। তা হলে হয়ত ব্যক্তিগত আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করতে পারতাম না। আমার আসামের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য দেখা হয়ে উঠত না। ঝুঁকি না নিলে লাভের আশা কোথায় বলত ?

ক্ষমা করো—আমি তোমাদের কটাক্ষ করছি নে। শুধু ইতিহাসের মত একটা কাহিনী বলে যাচ্ছি। আমার বয়স হয়েছে, এসেছি জংলা দেশ থেকে, ঠিক তোমাদের মত মার্জিত করে বলতে পারছি নে। মাপা হাসি, মাপা কথা, মাপা প্রেমের আমার সুযোগ হয়নি। ছিঃ ছিঃ আবার কি একটা কথা বলে ফেলেছিলাম ! আমার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই আধুনিক প্রেমের। টেবিলের উত্তর মেরুতে একটি হাওয়াই পরা ছেলে, দক্ষিণ মেরুতে একটি লিপষ্টিক মাখা মেয়ে, মাঝখাতে ধূমায়মান চা। জুড়িয়ে যাচ্ছে তবু কেউ হিমশীতল ওষ্ঠ স্পর্শ করাতে পারছে না। এখানেও নাকি শুধু ইজম, এখানেও নাকি শুধু অর্থনীতি—মানুষ হারিয়ে ফেলেছে তার বর্বর সভ্যতা। এ আমি তোমাদের লেখা নাটক নভেল পড়ে জেনেছি। প্রশ্ন করে আমাকে আবার ফ্যাসাদে ফেল না।

তোমরা হয়ত বিরক্ত হচ্ছ। গল্প কোথায়? এতো কেবল ভনিতা। এ আমরা শুনতে রাজি নই। গল্প আরম্ভ করেই সোজা চলে আসতে হবে নাটকীয় সংঘাতে।

একথা তোমার নিশ্চয়ই বিলেতি একখানা নাম-করা সংকলনের ভূমিকায় পড়েছ—যে সংকলনে রয়েছে 'মমের' একটি বিশ্ববিখ্যাত গল্প 'রেইন'—যা পড়ে তোমরা হাপুস নয়নে কাঁদ। কিন্তু বেশ কিছুটা এগিয়েও তো নাটক পেলাম না! পেলাম না শরৎচন্দ্রীয় জমাটি গল্প। হ্যাঁ এক কথা বলতে পার, আপনি মশাই কিছু বুঝতে পারেন নি। অবশ্য এ জংলিকে আপনি সম্বোধন করবে কিনা সেটা তোমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।

যদি আমার সমালোচনা গ্রহণ করো তবে একটি অনুরোধ—আমি ভারতবাসী, তুমিও তাই। আমাদের আন্তর্জাতিক খ্যাতি নাই বা থাকল, একটু শিথিল ভংগি, একান্ত ধৈর্য ধরে শোনো। ঘরোয়া কথায়, ঘরোয়া বলায় বিশ্বজনীন সুর নেই কি?

ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে হুট করে ট্রেজার আর্থল্যাণ্ডে এসে উঠতে পারিনি। সে দুরাশাও আমার ছিল না। আমি তোমাদের মত অত সস্তা ক্রাইম-ড্রামা পড়িনি। ইদানীং দুটো একটা লাইব্রেরী দেখার সুযোগ হয়েছে। কোন্ শ্রেণীর বই অনর্গল ইস্যু হচ্ছে, তা লক্ষ্য করেছি। তাই মাঝে মাঝে ভাবি, হায় রবীন্দ্রনাথ, হায় শরৎচন্দ্র তোমরা কেন ক্রাইম-ড্রামা লেখনি? ইহকালে না বাঁচলে শাশ্বতকালে বাঁচার আশা আছে কি?

জিজ্ঞাসা করতে পারো, হ্যাঁ জংলি মশাই, আপনি যে সাহিত্যের এত খবর রাখেন, আপনার এত ইনটারেষ্ট কেন? বলবেন মামুলী গল্প, এসে ঢুকলেন বিষয়-রস-আঙ্গিক বিচারের ক্ষেত্রে। এ আমরা বরদাস্ত করব না। নিতান্তই ট্রেসপাসার আপনি। জানেন এ যুগে মানুষের সময় নেই—অ্যাটম এবং হাইড্রজেনের গতিতরঙ্গ আমাদের রক্তে। আর ক্ষমা করবেন, এখন প্রায় পৌণে ছটা। মিথ্যে বলছি নে—এই দেখুন হাত-ঘড়িটা। অনেক বলে-কয়ে সংস্কৃতি সংঘের বোনদের রাজী করিয়েছি। এই দেখুন টিকিটগুলো। এর জন্য অনেক কষ্টে পিকপকেট করতে হয়েছে বেচারা অভিভাবকদের। আজ লারে-লাপ্পার শেষ রজনী!

হাসছেন? আপনি হাসতে পারলেন?

না হেসে উপায় কি? অতি দুঃখেও হাসি পায়। মানুষের মনের এ এক রহস্যময় ধর্ম। কি যে বলছ—আশ্চর্য! আমার নাকি অধিকার নেই। আছে ভাই সে কথনও বলছি। এখনো পনর মিনিট বাকি। নিউজ রিলে বাদ দিলে প্রায় আধ ঘণ্টা। আমার কথা নাও, সংস্কৃতি সংঘের বোনরা এর মধ্যে কিছুতেই কাউণ্টার ছাড়বে না। সিনেমার চেয়ে সঙ্গসুখের মূল্য তারা কম বলে কাউণ্ট করে না!

তবে ভনিতা না করে তাড়াতাড়ি বলুন। দেখছি আপনি নাছোড়বন্দা!

আমার জামা জুতো দেখে, দাড়ি গোঁফ দেখে বুঝি ঘৃণা হচ্ছে?

কিন্তু এই সেদিনও আমি ইস্তিরি করা জামা ছাড়া একটি বেলা পরিনি। সেজন্য আমাকে কখনো ডাইং-ক্লিনিংয়ের সাহায্য নিতে হয়নি। দাড়ি গোঁফ কামিয়ে তো রোজ সকালেই স্মার্ট হয়ে বার হতে হত। জুতো ছিল আয়নার মত চকচকে। তোমাদের মত প্যাণ্টের ওপর সার্ট চড়িয়ে চপ্পল কিম্বা স্লিপার। কখনো নিজের দৈন্য জানাইনি। আয়েসী সেলুন ছিল না পাহাড়ী জংলা রাজ্যে।

আরো অনেক কিছুই সেখানে ছিল না। কিন্তু প্রেম ছিল আইভি লতার মত জড়ান। ভালবাসা ছিল দ্রাক্ষা-গুচ্ছের মত রসালো। সবই যেন লুকিয়ে ছিল—একদিন সে প্রেমের অতর্কিতে আবির্ভাব। চমৎকার গল্প তো! আসুন এই পার্কের কোণে বেঞ্চটায় ব'সে শোনা যাক।

ছিল অসীম বিতৃষ্ণা—তা তাঁর সাহিত্য সেবায় বিঘ্ন ব'লে। বংকিম যেমন বিরক্ত হয়ে বলতেন, My wife was a blessing and my service was a curse of my life—দ্বিজেন্দ্রলালও প্রায় তাই বলতেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল গয়া ছেড়ে খুলনা হয়ে কোলকাতায় এসে নিজ বাসভবন সুরধামে স্থায়ীভাবে বাস ক'রতে লাগলেন। এখানে তিনি "পূর্ণিমা মিলন" নামে একটি সাহিত্য বাসরের উদ্বোধন করেন। আর করেন ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকার সৃজন। প্রতিমাসের পূর্ণিমাতে এ অধিবেশন বোসত। ১৩১১ সালের দোল পূর্ণিমাতে প্রথম এই অধিবেশন যখন হয় রবীন্দ্রনাথ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু একটু একান্তে। সবাইকে যখন আবিরে লাল ক'রে দেওয়া হয়, রবীন্দ্রনাথ তখনও অরঞ্জিত শুভ্র বসনে এক কোণে দাঁড়িয়ে। তাই দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে রাঙিয়ে দেন আবিরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্ত, স্বভাব-সুমিষ্ট স্বরে ব'ললেন, দ্বিজুবাবু শুধু আমাদের হৃদয় মন রঞ্জন করেছেন তা নয়, তিনি আজ আমাদের সর্বাঙ্গ রঞ্জন ক'রে ছাড়লেন। দুজনে ছিলেন গুণগ্রাহী বন্ধু একে অন্যের। দুটি প্রতিভার সমাবেশ। এ নিয়ে সুরেশ সমাজপতি মশায় বলতেন, ভোলানাথ—দ্বিজেন্দ্র আর রবীন্দ্র দুই ইন্দ্র। একে অন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

কিন্তু মানুষের মন কি ভংগুর!—একদিন সাহিত্য নিয়েই দুই বন্ধুর মাঝে কালোমেঘ ঘনিয়ে আসে—আসে বিদ্যুৎ-বজ্র-ঝঞ্ঝা। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন লেখা দুর্নীতির প্রশ্রয়কারী মনে ক'রে ন্যায়নিষ্ঠ, অকলংক চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের ওপর বিরূপ হ'য়ে ওঠেন। তখন আবার বঙ্গবাসী কার্যালয় হ'তে 'বঙ্গভাষার লেখক' নামে একখানা বই বেরোয়। তাতে বরেণ্য কবি স্বরচিত আত্মজীবনীতে তাঁর ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার কথা লেখেন। তা প'ড়েই দ্বিজেন্দ্রলাল জানতে চান এ কথা সত্যি কিনা! রবীন্দ্রনাথ উগ্রভাবে এর জবাব দেন। এই ব্যক্তিগত রেশারেশি শেষে ভক্তদের কল্যাণে প্রকাশ্যেই চলে। মোটের ওপর রবীন্দ্রনাথের অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন উগ্র-কামোদ্দীপক কোন-কোন কবিতা নৈষ্টিক দ্বিজেন্দ্রের অংগে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাংলার আকাশ বাতাস কলুষিত হ'য়ে ওঠে মসীযুদ্ধে রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র ভক্তদের অতি-ভক্তি ও সহানুভূতি প্রাবল্যে। শেষে কবিবরের স্বর্ণ-লিখনী "সোনার তরী"র পর্যন্ত এমন বিরূপ সমালোচনা হয় যে, কেউ আর তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ক'রতে সাহসী হন নি। এই বিষ বাষ্প বাংলার আকাশ ছেয়ে ফেলে যখন রবীন্দ্র ভক্তরা দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে ইঙ্গিত করে। উনিও ধৈর্যের বাঁধ হারিয়ে ফেলে "আনন্দ বিদায়" নামে একখানা নাটিকা মঞ্চস্থ করেন, তাঁর জীবনী-লেখক দেবকুমারবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে। অভিনয়ান্তে যখন তাঁর মতামত জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন তখন দেবকুমারবাবু শুধু বলেছিলেন, এতদিনে আপনি আত্মহত্যা ক'রলেন। দ্বিজেন্দ্র অকুণ্ঠভাবে তাঁর দোষ স্বীকার ক'রে লিখলেন,—

ক'রেছি কর্তব্য যাহা,
সেটুকুই আমার যাহা জমা
ক'রেছি অন্যায় যাহা,
সেটুকুই খরচ—
দিও বাদ তোমাদিগের যেটুকু দিয়েছি দুঃখ
ক'রো ভাই ক্ষমা।—

ইহাই দ্বিজেন্দ্র চরিত্রের ছিল বৈশিষ্ট্য—তাঁর নৈষ্টিক দৃঢ় চরিত্রের পরিচায়ক।

দরিদ্র

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

কামনার রুদ্ধদ্বারে প্রতিদিন করি করাঘাত।
আপনারে প্রশ্ন করি হে অন্তর দেবতা!
দীনের কি নাহি হয় কভু সুপ্রভাত!
স্তব্ধ রহে চিরদিন দরিদ্রের ব্যথা॥
অভিশপ্ত এ জীবন ঘোর অন্ধকার!
সম্মুখে পশ্চাতে শুধু গভীর নিরাশা।
বেদনা ব্যথিত হৃদি করে হাহাকার।
গোপনে অশ্রুর বন্যা গুমরিছে ভাষা॥
সর্ব্ব চক্ষু অন্তরালে সতর্ক হইয়া।
হেয় হীন হয়ে থাকি কৃমি কীট প্রায়!
সঙ্কুচিত সদা চিত্ত অপটু ভাবিয়া!
মহাপাপে অপরাধী সদা মনে হয়॥
আশে-পাশে বিভীষিকা করে হাহা হিহি।
দুরারোগ্য ব্যাধি সম চিন্তাযুক্ত মন।
রাক্ষসী মায়ার মোহ বলে দেহি দেহি!
সর্ব্বদা বৃশ্চিক যেন করিছে দংশন॥
অবরুদ্ধ অভিমান গুমরিয়া কহে।
দরিদ্র করিলে যদি কেন দিলে আশা?
সকল কাম্যের 'পরে তপ্তশ্বাস বহে!
সমস্ত জীবন ব্যর্থ কেবল নিরাশা॥

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

আলোক পথ

ফটো : বিপ্লব মালিক
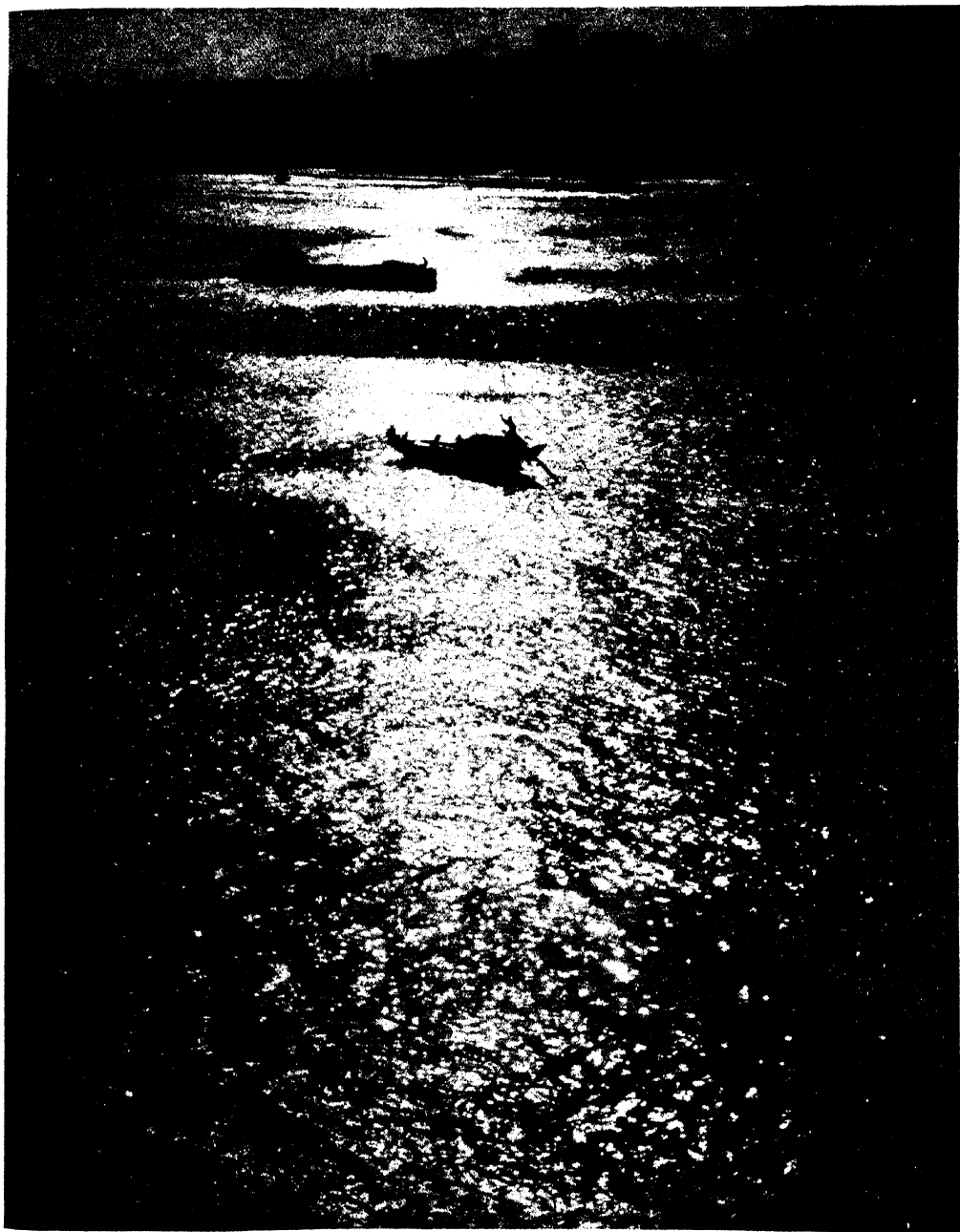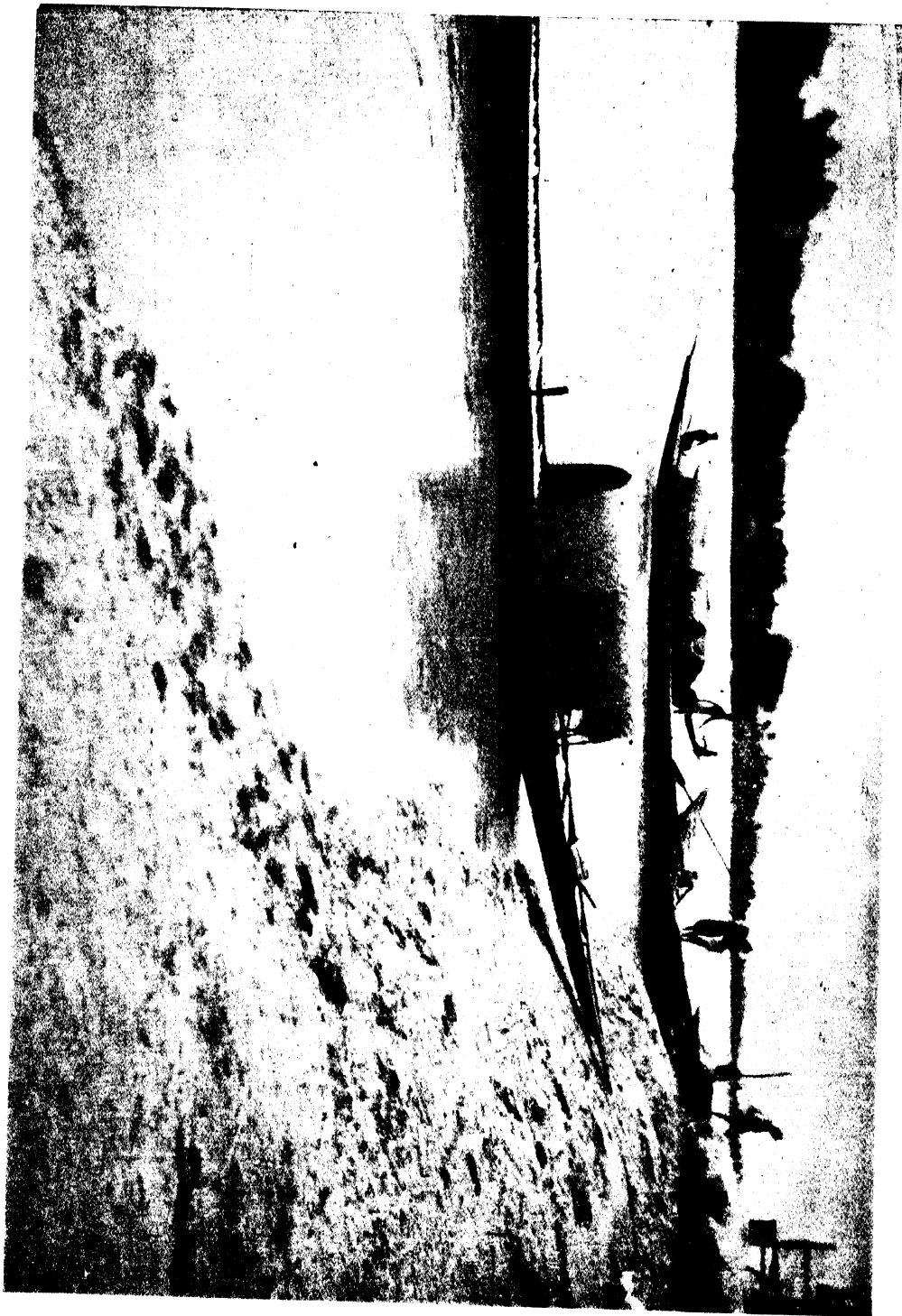
পশ্চিমবঙ্গের দাবী—

দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রী সম্মিলনের পর ২৩শে অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ-এন-ডেবর ও পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের দাবী জানাইয়াছেন—রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বিহারের যে অংশ পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা ছাড়াও তাঁহারা ধানবাদ সহর বাদে বাংলা ভাষাভাষী ধানবাদ মহকুমা ও জামসেদপুর বাদ ধলভূমের অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তির দাবী জানাইয়াছেন। তাহা ছাড়া মালদহের সহিত যোগাযোগের উদ্দেশ্যে কিষণগঞ্জ করিডরকে সম্প্রসারিত করিতে অনুরোধ করেন। মহানন্দা নদের পূর্বদিকের সমগ্র পুর্ণিয়া জেলা ও নিম্নে মহানন্দা যেখানে মালদহ জেলায় পৌঁছিয়াছে, সেই অঞ্চলই করিডরের পশ্চিম সীমানা হওয়া উচিত বলিয়া তাঁহারা জানাইয়াছেন। অজয় নদের তীরবর্তী সাঁওতাল পরগণার অংশ ও পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তির দাবী করা হইয়াছে, কারণ বীরভূম ও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য ঐ স্থান অত্যাবশ্যক।

রাজ্য পুনর্গঠনে কংগ্রেস সভাপতি—

গত ৭ই নভেম্বর দিল্লীতে কংগ্রেস-সভাপতি শ্রী ইউ-এন-ডেবরের সভাপতিত্বে প্রদেশ-কংগ্রেসসভা-পতি-সম্মিলনে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের নিম্নলিখিত রূপ দাবী উপস্থিত করিয়াছেন—

"কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন :—প্যারা ৬৩৩- ভারত বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বহু সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। পাকিস্থান হইতে প্রায় ৩৫ লক্ষ উদ্বাস্তুর আগমন ব্যতীতও ১৯৪৭ সাল হইতে বাঙ্গালার সমগ্র সংযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে প্রেসিডেন্সী বিভাগের উত্তরাংশের জেলাগুলিতে গমন পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আয়াসসাধ্য হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ এখন একটি রাজ্যের এরূপ একমাত্র অংশ যাহা ভৌগোলিক দিক হইতে অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন নহে।"

প্যারা ৬৩৪ :—"গঙ্গার উত্তরে রেলওয়ে সংযোগের ছেদ, আসাম রেল লিঙ্কের সীমাবদ্ধ পরিবহন ক্ষমতা এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলাদ্বয়ের পূর্বাংশের অপেক্ষাকৃত দুর্গমতা—তথাপি সমস্যা থাকিয়া যাইবে ; মোকামা পরিকল্পনা নিরপেক্ষ হইয়া এই সমুদয়ের সমাধান করিতে হইবে।"

প্যারা ৬৪২ :—"ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের 'অনেক—রাজমহল, মানভূম ও ধলভূমের খনিজ দ্রব্য সমৃদ্ধ ও শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গভুক্তির প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বলিয়া গণ্য হইবে। এই যুক্তি প্রদর্শিত হয় যে, ঐ সমস্ত অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হইলে অবশিষ্ট বিহারের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য বিপর্যস্ত হইবে।"

(১) উল্লিখিত প্যারাসমূহ হইতে দেখা যায় যে, কমিশন যথোপযুক্ত প্রশাসন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের অসুবিধা উপলব্ধি করিয়াছেন ; কিন্তু উপরে উদ্ধৃত ৬৪২ প্যারায় তাহারা বলিয়াছেন যে, বিহারের রাজমহল, মানভূম ও ধলভূমের অঞ্চলসমূহ পাওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ যে দাবী করিয়াছে, তাহা মঞ্জুর করা হইলে অবশিষ্ট বিহারের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য বিপর্যস্ত হইবে। এই প্যারাগ্রাফে এরূপ দুইটি পদসমষ্টি আছে, যাহা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের দাবীর অর্থ প্রকাশ করে না। আমরা রাজমহল, মানভূম ও ধলভূমের খনিজ দ্রব্যসমৃদ্ধ ও শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করার প্রস্তাব করি নাই। আমরা প্রস্তাব করিয়াছি যে মানভূমের জেলার শিল্পপ্রধান এলাকা ধানবাদ সহর বাদ দেওয়া হউক ; মানভূমের বাঙ্গলাভাষীপ্রধান অবশিষ্ট অংশ পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হউক। অনুরূপ ভাবে ধলভূমের বেলায়ও যে অংশে টাটার কারখানা অবস্থিত, সেই অংশ পশ্চিমবঙ্গের দাবী হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কমিশনের মতে ঐ অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গভুক্তি অবশিষ্ট বিহারের অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত করিবে।

পক্ষান্তরে আমরা জানাইতে চাহি যে, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর হইতে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা অতিশোচনীয়।

গত ৭।৮ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গকে সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কার্যের এবং রাজ্যের উন্নয়নের জন্য ৮৫ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। তাহাদিগকে রাজস্ব খাতে প্রভূত পরিমাণ অর্থ ঋণ করিতে হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে সর্বদাই আয় অপেক্ষা ব্যয় ৮ হইতে ১০ কোটি টাকা অধিক হইতেছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ অর্থনৈতিক দিক হইতে অতি দরিদ্র। যদি মানভূম ও ধলভূম অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করা হয় এবং তৎপর ঐ অঞ্চলের উন্নতিসাধন করা হয়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের আয় ও ব্যয়ের তারতম্য কতক পরিমাণে হ্রাস করিতে সাহায্য হইবে।

পক্ষান্তরে আমাদের মতে ১৯১২ সালে বিহার রাজ্য গঠিত হওয়ার পর হইতে গত ৪০ বৎসরকাল বিহার কর্তৃক উহার পূর্ব সীমায় অবস্থিত মানভূম, ধলভূম ও রাজমহল (সাঁওতাল পরগণা জেলা) এলাকাসমূহের উন্নয়ন সাধিত হয় নাই, কারণ এই সমস্ত এলাকার উন্নয়নের একমাত্র উপায় নদী পরিকল্পনা বিহারের পক্ষে স্বার্থকর নহে। এই সমস্ত এলাকায় নদী পরিকল্পনা প্রভূত ব্যয়সাধ্য ; অধিকন্তু উহা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে

বিহারের উপকার হইবে না; পশ্চিমবঙ্গের উপকার হইবে, কারণ পশ্চিমবঙ্গের নদীসমূহের অববাহিকা এই সমস্ত অঞ্চলে।

প্যারা ৬৪৬ :—আমরা মনে করি, পশ্চিমবঙ্গের দাবীর বিশেষ পটভূমিকা এবং উহার মনস্তাত্বিক দিক বাদ দিলেও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বর্তমানে যেভাবে এলাকাসমূহ বণ্টিত রহিয়াছে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে কয়েকটি এলাকা সম্বন্ধে শাসনবিষয়ক অসুবিধার উদ্ভব হইয়া থাকে। বিহার সরকারের যুক্তি অনুযায়ী বর্তমান সংবিধান ও শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে এই সমস্ত অসুবিধার লাঘব হওয়া সম্ভবপর। তথাপি কেন্দ্রীয় সরকারের দিক হইতে একটা মীমাংসার সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় আমাদের মতে অধিকতর স্থায়ী সমাধান উদ্ভাবন করা সঙ্গত।"

(২) পশ্চিমবঙ্গের শাসন কর্তৃপক্ষের রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ না থাকার অসুবিধার প্রতিকার করিতে হইবে।

প্রতিকারের জন্য কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন—"কিষণগঞ্জ মহকুমার কতক অংশ এবং গোপালপুর রাজস্ব থানা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হউক। ইহা দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় সড়কের সহিত উহার অন্যান্য এলাকার সংযোগ সাধন করিয়া রাস্তাসমূহ নির্মাণ করিতে এবং পরিহার্য বিলম্ব ও শাসনবিষয়ক অসুবিধাজনক ব্যবস্থাসমূহ রহিত করিয়া ও আবশ্যক হইলে পরিবহন সম্পর্কিত বর্তমান ব্যবস্থা শিথিল করিয়া উত্তর খণ্ডের দার্জিলিং ও অন্যান্য স্থানগামী যানসমূহ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ এই অঞ্চলের সমগ্র ভারত-পাকিস্থান সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিবে। শাসনমূলক দিক হইতে ইহা সুবিধাজনক ও বাঞ্ছনীয় হইবে।"

(৩) উল্লিখিত প্যারা হইতে দেখা যায় যে, কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অসুবিধাসমূহ উপলব্ধি করিয়া একটি করিডর দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ (ক) জাতীয় সড়কের সহিত উহার অন্যান্য অঞ্চলের সংযোগ স্থাপনকারী রাস্তাসমূহ নির্মাণ করিতে; (খ) উত্তর খণ্ডে রাস্তা দিয়া দার্জিলিং ও অন্যান্য স্থানে চলাচলকারী যানসমূহ নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং (গ) এই অঞ্চলে সমগ্র ভারত-পাকিস্থান সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হইবে।

(৪) ৬৫২ প্যারাগ্রাফে কমিশন পশ্চিমবঙ্গের দুইটি বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে ভৌগোলিক সংলগ্নতার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ণিয়া জেলার মহানন্দা নদীর পূর্বতীরস্থ সমগ্র এলাকা পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। অতঃপর কমিশন বলিয়াছেন :—(১) কিষণগঞ্জ মহকুমার মহানন্দা নদীর পূর্বে অবস্থিত অংশ এবং গোপালপুর রাজস্ব থানার যে অংশ (১)এ উল্লিখিত এলাকার সহিত সংলগ্ন ও দক্ষিণে এই থানায় জাতীয় সড়ক পর্যন্ত সম্প্রসারিত তাহা পশ্চিমবঙ্গে যাইবে। জরীপের পর নূতন সীমা নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৫) আমরা দেখাইতে চাই যে মহানন্দা নামে যাহা পরিচিত, তাহা ধরা হইলে দার্জিলিং জেলা ও দক্ষিণের জেলাসমূহের মধ্যে সংযোগ প্রায় সাধিত হইবে না। কিন্তু যদি কিষণগঞ্জ মহকুমায় মহানন্দা নদীতে পতিত মেঁচনদী এই অঞ্চলের পশ্চিম সীমা ধরা হয়, তাহা হইলে এই অঞ্চলের দার্জিলিং জেলার সমগ্র পাদদেশ দিনাজপুর ও মালদহ জেলা-দ্বয়ের সহিত সংযুক্ত হইবে। সুতরাং আমাদের অনুরোধ ওয়ার্কিং কমিটি নূতন সীমা নির্ধারণের প্রশ্ন বিবেচনার সময়ে অনুগ্রহপূর্বক মেচি নদীকে এই অঞ্চলের পশ্চিম সীমারূপে গ্রহণ করুন।

(৬) পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি আরও জানাইতেছেন যে, কমিশন বলিয়াছেন যে, পূর্ণিয়া জেলার যে এলাকা পশ্চিমবঙ্গে যাইবে, জাতীয় সড়ক উহার দক্ষিণ সীমা হইবে। কমিশনের রিপোর্টের ৭৫১ প্যারাগ্রাফের প্রস্তাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গকে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর হইতে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত সংযোজক পথ নির্মাণের সুযোগ দিবার জন্য গোপালপুর থানার যে অংশ মহানন্দা নদীর পূর্বে অবস্থিত ও মালদহ জেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত, তাহা পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হওয়া উচিত।

(৮) পূর্ণিয়া জেলার যে অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হইবে, সেই অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত যে স্থানীয় অধিবাসীদের সম্মতি ব্যতীত তথায় উদ্বাস্তুদিগকে বসতি স্থাপন করিতে দেওয়া হইবে না।

(৮) এখন আমরা সাওতাল পরগণার বিষয় বলিব। রাজমহল জেলার (সাঁওতাল পরগণা) সাওতালদের সহিত বীরভূম জেলার সাঁওতাল বাসিন্দাদের সাদৃশ্যের উপর কমিশন কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, অথবা সাঁওতাল পরগণা জেলার উপর বাঙ্গলার প্রভাবের যে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। অজয় নদের উৎপত্তি সাঁওতাল পরগণায়। অজয় নদের গতিপথ বরাবর অববাহিকা-অঞ্চল হস্তান্তর সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, কমিশন তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রাজমহল জেলার কয়লাখনিসমূহ গ্রহণের ইচ্ছা আমাদের নাই। আমরা কেবল এই অঞ্চলে (সাঁওতাল পরগণা)—অজয়নদ যেখানে বিহার অতিক্রম করিয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিতেছে, সেই সীমান্ত অঞ্চলে একটি বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধে অবরুদ্ধ জলরাশির দ্বারা একটা অঞ্চল প্লাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা চাই। ময়ূরাক্ষী বাঁধ নির্মাণ ও উহার কার্য শেষ করার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিজ্ঞতা এমনই তিক্ত এবং এমনই ব্যয়সাধ্য যে, আমরা মনে করি এই নদী-উপত্যকা-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার জন্য যে জমির প্রয়োজন, তাহা সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিকারে থাকা প্রয়োজন। এই নদীর বন্যায় প্রায়ই বীরভূম এবং বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হইয়া যায়। ঐ নদীকে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে ভূমিক্ষয় নিবারিত হইবে এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে। বীরভূম জেলার বহু স্থান ঐ নদীর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

(৯) কমিশন ৬৫৮ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন যে, মানভূম জেলাকে দুই ভাগে ভাগ করা হইবে। একটি অংশ হইবে দামোদর নদের উজানে এবং অপরটি হইবে দামোদর নদের ভাঁটির দিকে। কমিশন বলিয়াছেন যে, দামোদর নদের উজানের দিকে ধানবাদ সহরের চতুর্দিকে একটি

বৃহৎ এবং ক্রমবর্ধনশীল শিল্পাঞ্চল রহিয়াছে। তাঁহারা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ধানবাদকে পশ্চিমবঙ্গে দিবার কোন প্রশ্ন উঠে না। ধানবাদ সহরকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হউক, এই দাবী আমরা করি না। তবে দামোদরের উজানের দিকে অবশিষ্ট অঞ্চল—যাহা প্রধানতঃ বাঙ্গলাভাষাভাষী অঞ্চল, তাহা পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া উচিত। পুরুলিয়া জেলার চাষ থানাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না করার কোন কারণ দেখা যায় না। বলা হইয়াছে যে, চাষ থানা বাঙ্গলা-ভাষাভাষী অঞ্চল নহে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, ইহা প্রকৃত ঘটনা নহে। এখানে কমিশন সমগ্র মানভূম জেলার লোকসংখ্যার হিসাব অগ্রাহ্য করিয়া একটি থানার জনসংখ্যার বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন। যদি সমগ্রভাবে জেলার কথা ধরা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, উহা প্রধানতঃ বাঙ্গলাভাষাভাষী অঞ্চল।

(১০) এখন ধলভূম মহকুমার কথায় আসা যাউক। কমিশন স্বীকার করিয়াছেন যে, ভাষার দিক হইতে বিবেচনা করিলে সিংভূম জেলা একটি ভাষার মিলনক্ষেত্র; কিন্তু ৬৬৭ অনুচ্ছেদে এই বিষয়ে আলোচনার সময় কমিশন সমগ্র সিংভূমের অর্থাৎ সিংভূম সদর ও ধলভূমের সমস্যা আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইলেও সিংভূম সদর অথবা ধলভূম প্রধানতঃ হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চল নহে। খণ্ডজাতির লোকই তথায় সর্বাপেক্ষা বেশী, উহার পর উড়িয়া এবং তাহার পর বাঙ্গালী।

উড়িষ্যা—খরসোয়ান ও সেরাইকেলা এবং সিংভূমের সদর মহকুমা পাইবার জন্য দাবী জানাইয়াছে। খরসোয়ান এবং সেরাইকেলা সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি তাহা অবগত নহেন। ঐ দুইটি অঞ্চল যে প্রধানতঃ উড়িয়া-ভাষাভাষী অঞ্চল, এই সম্পর্কে দ্বিমত থাকিতে পারে না এবং ঐ দুইটি স্থান সম্পর্কে উড়িষ্যার দাবী সম্বন্ধে হয়ত পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখা হইতে পারে। যদি ঐ দাবী গৃহীত হয়, তবে ধলভূম মহকুমা বিহারের পক্ষে একটা ছিটমহলস্বরূপ হইবে।

কমিশন স্বীকার করিয়াছেন যে, পৃথকভাবে ধলভূমের কথা বিবেচনা করা হইলে দেখা যায় যে, তথায় বাঙ্গলাভাষাভাষী লোকই বেশী। পশ্চিমবঙ্গ বলিতে চাহে যে, কমিশন যখন উহা স্বীকার করিয়াছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার সহিত উহাকে যুক্ত না করার কোন কারণ নাই।

ভারতে নেপালের মহারাজা—

নেপালের মহারাজা মহেন্দ্রবিক্রম শাহদেব ও তাঁহার পত্নী ৬ই নভেম্বর বিমানে দিল্লী আসিয়াছেন। তাঁহারা ভারতে এক মাসকাল শুভেচ্ছা ভ্রমণ করিবেন। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সহিত মহারাজা সাক্ষাৎ করিবেন—মহারাজাকে নানাভাবে সম্বর্দ্ধনারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নেপাল ভারতের সীমান্তে অবস্থিত—উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রী রক্ষার ফলে উভয় দেশই উপকৃত হইবে। নেপালকে ভারতের অংশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই অর্থনৈতিক ব্যাপারে উভয় দেশের মৈত্রী হইলে উভয় দেশের সম্পদই বর্দ্ধিত হইবে।

কংগ্রেসকর্মীর শাস্তি—

কংগ্রেসের নীতি-বিরোধী কাজকর্মের অভিযোগে উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটী বিজনোর, বাদাউন ও আয়ানপুর জেলার ২৯ জন কংগ্রেসকর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে কংগ্রেসপ্রার্থীদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় ১০ জন কংগ্রেসকর্মীকে ৪ বৎসরের জন্য কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্য ১৮ জনকে ২ বৎসরের জন্য কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। এরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন। ইহা দ্বারা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষিত হইবে ও মর্য্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে নূতন শাসন—

রণবিধ্বস্ত দক্ষিণ ভিয়েৎনামে গত ২৪শে অক্টোবর হইতে ভূতপূর্ব সম্রাট বাও দাইয়ের শাসনের অবসান হইয়াছে ও আমেরিকান সমর্থিত প্রধান মন্ত্রী মিঃ দিয়েমকে রাষ্ট্রপ্রধান রূপে স্বীকার করা হইয়াছে। ২৩শে অক্টোবর দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যে গণভোট গৃহীত হয়, তাহাতে দেখা যায়, অধিকাংশ লোক বাও দাইকে গদীচ্যুত করিয়া মিঃ দিয়েমকে রাষ্ট্রপ্রধান করিতে চাহিয়াছে। বাও দাই ফরাসীদের দ্বারা সমর্থিত হইতেন। এখন উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম যাহাতে একত্র হয়, সেজন্য আলোচনার পথ প্রশস্ত হইল।

নেতাজীর মৃত্যু কাহিনী—

মাদ্রাজ হইতে নির্বাচিত ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্য শ্রী আর বেলায়ুধম সম্প্রতি জাপানে গিয়াছিলেন, তিনি তথায় শুনিয়াছেন—হিরোসিমায় আণবিক বিস্ফোরণের ৪ দিন পরে ১৯৪৫ সালের ১২ই আগষ্ট তাইওয়ানস্থিত একটি হাসপাতালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মারা গিয়াছেন। জাপানী সেনাবাহিনীর মেজর সুকিয়ামা ইহা বলিয়াছেন—তিনি নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ব্যাঙ্কক হইতে টোকিও যাইবার পর তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনায় তাহার সর্বশরীর পুড়িয়া যায়। মেজর সুকিয়ামা বিমান ঘাটিতে ছিলেন—নেতাজীকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়ার সাত ঘণ্টা পরে তিনি মারা যান। মৃতদেহের সৎকার করিয়া চিতাভস্ম টোকিও হইতে ৮ মাইল দূরে রেনকোজী মন্দিরে রাখা হয়। এই সংবাদের সত্যতা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা প্রয়োজন।

আত্মকলহ—

গত ২৩শে অক্টোবর বিকালে গয়া হইতে ১৫ মাইল দূরে গুড়ারু নামক স্থানে কংগ্রেসের দুইটি দলে কলহের ফলে, তিন জন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী নিহত হইয়াছে ও অপর ৩ জন হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর অধিক শক্তি লাভের আশায় প্রায়ই কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি ও বিবাদ দেখা যাইতেছে। কংগ্রেস যে ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের প্রতিষ্ঠান—সে কথা লোক ভুলিয়া যাইতেছে। তাই শক্তি লাভের জন্য এত আত্মকলহ। ইহার ফলে দেশ দিন দিন ধ্বংসের পথে যাইতেছে। কবে যে মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া এই কলহের অবসান ঘটাইবে, তাহা কে জানে?

ভারতে মাদক বর্জন—

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গঠিত মাদক বর্জন তদন্ত কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন যে আগামী ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিলের মধ্যে সমগ্র ভারতে মাদক নিবারণের ব্যবস্থা করা হইবে। সমগ্র দেশে মাদক বর্জনের নীতি প্রবর্তনের জন্য প্রত্যেক রাজ্যেরই বিশেষ সমর্থন পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অন্ধ্র, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও সৌরাষ্ট্রে মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং আসাম, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, উড়িষ্যা, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশে মাদক নিবারণ ব্যবস্থা আংশিক ভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে। ১৯৫৯ সালের ৩১শে মার্চের পর আফিম সরবরাহ বন্ধ করার নীতি গৃহীত হইয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষার কারণেও মাদক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইবে না। সামরিক বিভাগের তিনটি বাহিনী দেশব্যাপী মাদক নিবারণ নীতি সমর্থন করিয়াছেন। বিদেশী রাষ্ট্রদূতাবাসগুলিও মাদক নিবারণ বিষয়ে জাতীয় মনোভাব সমর্থন করিয়াছেন।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার—

আইসল্যাণ্ডের ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার মিঃ হালডুর কিলজান ল্যাক্সনেসকে ১৯৫৫ সালের সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। মিঃ ল্যাক্সনেসের বয়স ৫৩ বৎসর। ১৭ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম উপন্যাস প্রকাশ করেন। তিনি ১৩২১০ পাউণ্ড মূল্যের একখানি চেক, একটি সুদৃশ্য প্রশংসাপত্র ও একটি ভারী স্বর্ণপদক পাইবেন। তিনি বিশ্বশান্তি পরিষদের অন্যতম সদস্য।

পরলোকে খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ—

পুনানিবাসী খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত দত্তাত্রেয় বিষ্ণু পালুস্কর গত ২৬শে অক্টোবর মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বরের পুত্র এবং অল্পবয়সে খ্যাতিলাভ করেন। সম্প্রতি তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি মিশনে চীন দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন।

ইসরাইল মিশর সীমান্তে যুদ্ধ—

২৮শে অক্টোবর জেরুজালেম হইতে খবর আসিয়াছে—ইসরাইলী সৈন্যগণ একটি মিশরীয় ঘাঁটি আক্রমণ করিলে ইসরাইল-মিশর সীমান্তে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঐ যুদ্ধ এল আহুজার ২৫ মাইল দক্ষিণে এন-কুন্টিলায় সংঘটিত হয়। আবার যুদ্ধ?

গান্ধীজির ব্রোঞ্জমূর্তি—

গত ২৯শে অক্টোবর কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ-এন ডেবর বাঙ্গালোরে প্যারেড ময়দানে মহাত্মা গান্ধীর একটি ৮ ফিট উচ্চ ব্রোঞ্জ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। ভারতের সকল সহরে গান্ধীজির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠান—

গত ৩১শে অক্টোবর পুনায় বৈদিক মন্ত্র পাঠের সঙ্গে ৫ হাজার বৎসরের অধিক কালের পুরাতন বলিদানমূলক বৈদিক বাজপেয় যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে—যজ্ঞের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—বিশ্বশান্তি ও শিক্ষাদান। বৈদিক জীবনযাত্রা ও সাহিত্যের ছাত্রদের হাতে কলমে দেখাইবার জন্য বাজপেয় যজ্ঞের আচারাদির অনুষ্ঠান করা হইতেছে। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তথায় যোগদান করিয়াছেন। বোম্বায়ের রাজ্যপাল ডাক্তার হরেকৃষ্ণ মহাতাব যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। ৭ দিন ধরিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছে। যজ্ঞের সমগ্র অনুষ্ঠানের চিত্রগ্রহণের এবং মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শিল্পোন্নতি ও কর্মসংস্থান—

২রা নভেম্বর কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত কার্ভে কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য ২৫৯ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়সাপেক্ষ একটি কর্মসূচী ঐ কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন। ঐ কর্মসূচী কার্য্যকরী হইলে ৪৫ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান হইবে। যাহাতে বেকার ও আধা-বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়, প্রধানত এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য অধিক পরিমাণে সরবরাহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে জনগণের আগ্রহ ও সহযোগিতা ব্যতীত এই পরিকল্পনাকে সার্থক করিয়া তোলা সম্ভব নহে। শিক্ষিত ও আর্থিকসঙ্গতিসম্পন্ন যুবকের দল নিজ নিজ স্থান, কাল ও পাত্রোপযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করিলে সত্বর সে সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হইবে।

পূর্ববঙ্গ ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ—

গত অক্টোবর মাসে দার্জিলিং সহরে ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রীদের এক সম্মিলনে অত্যধিক সংখ্যায় উদ্বাস্তু সমাগম নিরোধকল্পে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। পূর্বপাকিস্তান হইতে ভারতে ও ভারত হইতে পূর্বপাকিস্তানে মণিঅর্ডারযোগে অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থার আলোচনা হয় এবং স্থির হয় অবিলম্বে এই সুযোগ দেওয়া হইলে পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মধ্যে আস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। সংস্কৃতি-প্রতিনিধি দল বিনিময়, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের ব্যবসার সুযোগ সুবিধা, জীবিকার সংস্থান, শিক্ষার ব্যবস্থা, পুনরায় অস্ত্রশস্ত্রের লাইসেন্স দান ও সম্পত্তি রিকুইজেশনের আদেশ প্রত্যাহার করিতে বলা হইয়াছে। উভয় দেশের মধ্যে ভ্রমণ সম্পর্কিত বিধিনিষেধ হ্রাসের সুপারিশ করা হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে উভয় দেশের লোক উপকৃত হইবে—বিশেষ করিয়া পাকিস্তানবাসী হিন্দুদের অবস্থা ভাল হইবে।

আজমীরে গান্ধী সরোবর—

গত ৩১শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ আজমীর হইতে ১৫ মাইল দূরে জালিয়া নামক স্থানে গান্ধী সরোবরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই বৃহত্তম সেচ পরিকল্পনা দ্বারা ৮ হাজার একর জমীতে চাষ সম্ভব হইবে। ঐ অঞ্চলে ভবিষ্যতে আর বন্যা বা অনাবৃষ্টির জন্য শস্যোৎপাদনের অসুবিধা হইবে না।

দমন হইতে ভারতাগমন—

গত ৩১শে অক্টোবর সংবাদ পাওয়া যায়, পূর্ব সপ্তাহে পর্তুগীজ অধিকৃত দমন হইতে প্রায় ৮ শত লোক দেশী নৌকায় করিয়া ভারতীয় অঞ্চলে উপনীত হইয়াছে। তাহাদের শতকরা ৬০ জন নারী ও শিশু। নারীরা বলিয়াছে যে তাহারা দমনে ফিরিয়া যাইবে না, কারণ সেখানে কোন খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না। তাহাদের অনশনে দিন কাটাইতে হইতেছিল। এই ত পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলের অবস্থা। ইহার পর ঐ সব অঞ্চল ভারতের অন্তর্ভুক্তির কি বাধা হইতে পারে?

বাঙ্গালীর সম্মান—

নয়াদিল্লীর রেলসমূহের অর্থ-কমিশনার শ্রী পি-সি ভট্টাচার্য্য কেন্দ্রীয় সরকারের (রাজস্ব ও ব্যয়) অর্থ-মন্ত্রীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়া গত ১লা নভেম্বর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ বিভাগে শ্রী ডি-এল মজুমদার আই-সি-এস অন্যতম সেক্রেটারী। স্বাধীনতা লাভের পর এই একমাত্র বাঙ্গালী এরূপ উচ্চপদ লাভ করিলেন। ১৯০৩ সালে মৈমনসিংহে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জন্ম হয় এবং গণিতে এম-এ পাশ করিয়া প্রথমে কিছুকাল অধ্যাপকের কাজ করেন ও পরে ১৯২৮ সালে কলিকাতায় এসিস্টাণ্ট একাউণ্টেণ্ট জেনারেল পদ পান। তাঁহার চেষ্টায় সরকারী অর্থবিভাগে বহু নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। তিনি কলম্বো পরিকল্পনার সহিত যুক্ত ছিলেন এবং সিডনী, লণ্ডন, কলম্বো ও করাচীতে সরকারী প্রতিনিধি ছিলেন।

মাসাঞ্জোর বাঁধের উদ্বোধন—

গত ১লা নভেম্বর বীরভূম জেলার সিউড়ী হইতে ২৩ মাইল দূরে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার অন্তর্গত প্রধান জলাধার মাসাঞ্জোর বাঁধের উদ্বোধন কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ পিয়ার্সন কর্তৃক সম্পাদিত হয়। কানাডার অর্থসাহায্যে ঐ বাঁধ নির্মিত হওয়ায় উহার নাম কানাডা বাঁধ রাখা হয়। বাঁধ নির্মাণে ৫ কোটি টাকাসহ সমগ্র পরিকল্পনায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ২১৭০ ফিট দীর্ঘ বাঁধ সম্পূর্ণ হওয়ায় ৮৪৭ মাইলব্যাপী ৬ লক্ষ একর জমীতে চাষ করা সম্ভব হইবে। শীতকালে রবিশস্যের সময় আরও ১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমীতে চাষ করা যাইবে। ২৭ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে জলাধার নির্মাণ করিতে ১৪ হাজার অধিবাসীর পুনর্বাসন ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। কানাডা বাঁধ হইতে ৪ হাজার কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রও খোলা সম্ভব হইবে। এই বিরাট ব্যবস্থা দেশের বিভিন্ন গঠনমূলক কার্য্যে নিযুক্ত কর্মীদিগকে দেখাইবার ব্যবস্থা করিলে দেশবাসীর মধ্যে সন্তোষ ফিরিয়া আসিবে।

মরক্কোয় সুলতান পরিবর্তন—

মরক্কোর বর্তমান সুলতান মহম্মদ বেন আরাফা গত ৩১শে অক্টোবর মরক্কোর সিংহাসনে তাঁহার সকল অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট মঃ বেনেকে তিনি জানাইয়াছেন—মুরজাতির সর্বসম্মত অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ঐ কার্য্য করিয়াছেন। দুই বৎসর কাল নির্বাসিত জীবনের পর ভূতপূর্ব সুলতান সিদ্দি মহম্মদ বেন ইউসুফ ফ্রান্সে ফিরিয়া গিয়াছেন ও তিনি প্রজাপুঞ্জ কর্তৃক পুনরায় সুলতান বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। মরক্কোর ভাবী প্রধান মন্ত্রী সিদ্দি বেন স্লিমানে প্যারিসে যাইয়া বেন ইউসুফকে জাতির পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন। এখন ফরাসীর সহিত স্থায়ী সহযোগিতার ভিত্তিতে ফরাসী সরকার মরক্কোর সকল প্রকার উন্নতিতে অবহিত হইবেন।

দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা—

আগামী বৎসরের শেষ ভাগে পশ্চিম বাংলার দুর্গাপুরে বৃটীশ ইস্পাত কারখানার নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। স্থান স্থির হইয়াছে, প্রাথমিক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে ও একদল অভিজ্ঞ ব্যক্তি দুর্গাপুরে পৌঁছিয়াছেন। আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যে বৃটীশ ইস্পাত মিশনের সহিত ভারত সরকারের শেষ চুক্তি সম্পাদিত হইবে। ঐ নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা কতকাংশে দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

লাসা যাইবার নূতন পথ—

চামদো হইতে তিব্বতের রাজধানী লাসা যাইতে ৬ সপ্তাহ লাগিত—এখন ২২৫৫ কিলোমিটার সিকিয়াং—তিব্বত পথ নির্মিত হওয়ায় ৫ দিনে চামদো হইতে লাসা যাওয়া যাইবে। ফলে চামদো বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে—তথায় যাত্রীনিবাস, রাস্তা মেরামত কার্য্যালয় প্রভৃতি তৈয়ার হইয়াছে। চামদো-লাসা পথের দুইধারের স্থানগুলিতে আমদানী জিনিষের দাম শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। নূতন নূতন পথ নির্মাণের ফলে জগতের মানুষের সুখ-সুবিধা বর্দ্ধিত হইতেছে।

পুস্তক আমদানী বন্ধ—

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে লোক সভায় স্বরাষ্ট্র বিভাগের সহকারী মন্ত্রী শ্রীবি-এন দাতার জানাইয়াছেন—গ্রেট বৃটেনে প্রকাশিত মিঃ আব্রে মেনন লিখিত 'রাম রিটোল্ড' নামক পুস্তকখানির ভারতে আমদানী, প্রচার ও বিক্রয় বন্ধ করা হইয়াছে। ঐ পুস্তকে সীতার চরিত্র অত্যন্ত জঘন্যভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। ঐরূপ আরও বহু পুস্তকে ভারতীয় সংস্কৃতির নিন্দা আছে—সেগুলির প্রচারও ক্রমে ক্রমে বন্ধ করা উচিত। পাঠকগণ ঐ সকল পুস্তকের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে এ কাজ সহজ হইবে।

চন্দননগরে স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠা—

মহাপূজায় অব্যবহিত পূর্বে চন্দননগর প্রবর্তক সংঘে সংঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়ের গৃহে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মুক্তিতীর্থ চন্দননগরে ১৯০৮ হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত যে সকল বিপ্লবী পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহাদের ১০১ জনের নামাঙ্কিত স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করেন। স্মৃতি-ফলকে বীরগণের একটি প্রশস্তির সহিত ১০১ জনের নাম লেখা আছে—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, বিজয়কুমার নাগ, সুরেশচন্দ্র দত্ত, কানাইলাল দত্ত, মতিলাল রায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, সৌরীন্দ্রমোহন বসু,

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, চারুচন্দ্র রায়, রাসবিহারী বসু প্রভৃতির নাম আছে। বাংলা দেশে একত্র বিপ্লবীদের কথা স্মরণের এই প্রথম স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রবর্ত্তক সংঘের কর্মীরা নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ডাঃ শচীন সেন—

পাটনার ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রের সম্পাদক ডাক্তার শচীন সেন ১৯৫৫-৫৬ সালের জন্ম নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। একমাত্র তাঁহার মনোনয়ন পত্র ছাড়া অন্য কোন মনোনয়ন পত্র দাখিল না হওয়ায় তিনি বিনাবাধায় নির্বাচিত হইয়াছেন। শচীনবাবু বাঙ্গালী এবং প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে ফরোয়ার্ড ও লিবার্টি কার্য্যালয়ে তাঁহার সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি পাটনায় বাঙ্গালী-সাংবাদিকদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত—তাঁহার এই সর্বভারতীয় সম্মানলাভে বাঙ্গালীমাত্রই গৌরব বোধ করিবেন।

বিনা টিকিটে যাতায়াত—

কলিকাতা ও সহরতলীর বহু নিত্য-যাত্রী ও সাময়িক-যাত্রী রেলে বিনা টিকিটে যাতায়াত করে। আমরা স্বাধীন হইয়াছি, দেশ ও রাষ্ট্র আমাদের, রেল রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন—এ অবস্থায় রেলকে ফাঁকি দিলে যে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হয়, ইহা বুঝিবার শক্তি বা মনোভাব আমাদের মধ্যে নাই। সম্প্রতি রেল কর্তৃপক্ষ বিনা টিকিটে যাতায়াতকারী যাত্রীদের গ্রেপ্তার করিয়া দণ্ড দিবার ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়াছেন, এক এক দিনে শত শত বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীকে ধরিয়া সাজা দেওয়া হইতেছে। অত্যন্ত পরিতাপ ও লজ্জার কথা—ঐ ভাবে একত্র বহু লোককে ধরা হইলে তাহারা লজ্জিত না হইয়া বরং সরকারী কর্মচারীদের প্রতি উদ্ধত ব্যবহার করে—ফলে কয়েক স্থানে পুলিসকে লাঠি চালাইতে বাধ্য করা হইয়াছে। ইহা জাতির পক্ষে ঘৃণার কথা। এক ত বিনা টিকিটে যাতায়াত অপরাধ—তাহার উপর অপরাধীর পক্ষে দণ্ড গ্রহণ না করিয়া পলাইবার চেষ্টা করা দ্বিতীয় অপরাধ। আমাদের বিশ্বাস, দেশবাসী বিষয়টি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

কৃষ্ণনগরে গোপাল ভাঁড় উৎসব—

নদীয়া কৃষ্ণনগর হইতে গত কয় বৎসর ধরিয়া 'হোমশিখা' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত পত্রের উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে সম্প্রতি কৃষ্ণনগর পৌর-সভা প্রাঙ্গণে 'গোপাল ভাঁড়' দিবস সাড়ম্বরে পালিত হইয়াছে। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ঐ উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং সাহিত্যিক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রধান অতিথি হইয়াছিলেন। ২ শত বৎসর পূর্বে গোপাল ভাঁড় কৃষ্ণনগরে বাস করিতেন—দেশবাসী যে তাঁহার কথা বিস্মৃত হন নাই এবং তাঁহার মত গুণীর কথা স্মরণ করেন, ইহাই দেশবাসীর গৌরবের বিষয়। ঐ উপলক্ষে শ্রীনির্মল দত্ত ও শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহের পরিচালনায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হইয়াছিল। হোমশিখার কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর গোপাল ভাঁড়ের কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়া একটি প্রায়-লুপ্ত গুণের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহারা সেজন্য সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

সড়ক পরিবহন শিল্প

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

চারি বৎসর পূর্ব্বে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকে আমাদের শিল্পোন্নয়ন ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। উক্ত পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল, দেশের সম্পদকে কাজে লাগাইয়া ন্যূনতম সময়ের মধ্যে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সকল দেশবাসীকে জীবিকা সংস্থানের ক্ষেত্রে সমান সুযোগদান। এই উদ্দেশ্যেই পরিকল্পনার মধ্যে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকারদান ও উৎপাদন লক্ষ্য স্থির করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যে সময় এই পরিকল্পনা রচনা করা হয় সে সময় দেশে তীব্র খাদ্যাভাব—কেবলমাত্র ১৯৫০ সনেই প্রায় ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের টান পড়িয়াছিল। তজ্জন্য পরিকল্পনার লক্ষ্যই ছিল খাদ্যব্যাপারে দেশকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা এবং সেজন্যই সেচ ও কৃষি ব্যবস্থার উপর সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

আজ পরিকল্পনার চতুর্থ বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়া পঞ্চম বর্ষ চলিতেছে। আমাদের অর্থনীতির সামগ্রিক অবস্থা ও আজ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। কৃষি উৎপাদন বাড়িয়াছে এবং শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন ও মোটামুটি উর্দ্ধগতি বজায় রাখিয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সনেই খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ১১৪ লক্ষ টন হইয়াছে। যুদ্ধোত্তরকালে দেশে ইহাই সর্ব্বাধিক উৎপাদন এবং পরিকল্পনার লক্ষ্য হইতে ইহা ৩৮ লক্ষ টন অধিক। ১৯৫৪ সনের ডিসেম্বর মাসে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের সর্ব্বোচ্চ সূচীসংখ্যা দেখা যায় ১৬৪·৫ এবং সে বছরের বার্ষিক গড় সংখ্যা ১৪৬·৩। উক্ত গড়সংখ্যা ১৯৫১, ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সনে ছিল যথাক্রমে ১১৭·২, ১২৮·৯ এবং ১৩৫·৩। নিম্নের তালিকা হইতেও দেখা যাইবে যে সমস্ত শিল্পেরই উৎপাদন আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

শিল্প	শতকরা উৎপাদন বৃদ্ধি	
	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪
বস্ত্রশিল্প		
সূতা	১০·৬	১৩·৮
বস্ত্র	১৫·৪	১৮·৭

শিল্প	শতকরা উৎপাদন বৃদ্ধি	
সিমেণ্ট	৭'০	২২'৭২
কাঁচদ্রব্য	১৩'০	১০৩'৮৫
কষ্টিক সোডা	১৩'৩	৬৬'৫৫
সেলাই কল	৮'৫	৫৫'৩৫
বাইসাইকেল	৭৩'০	১৩৫'৭৯
ট্রান্সফর্মার	১৪'৩	৬১'৭৩
লবণ	৩'০	৯'২৪

ইহা ভিন্ন, দেশের নানা স্থানে নূতন নূতন শিল্পের সংস্থাপন করা হইয়াছে এবং যে সব বহুমুখী উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হইয়াছে উহা সমাপ্ত হইলে দেশে আরও বহু শিল্পক্ষেত্র গড়িয়া উঠিবে।

কিন্তু শিল্প বা কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন এইরূপ সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পাইলেও, রেল বা সড়ক পরিবহন কোনটারই উন্নয়নের হার তদনুপাতে আশানুরূপ হয় নাই, বরঞ্চ অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, উৎপাদন ও পরিবহন ব্যবস্থার এই ব্যবধান বৈষয়িকক্ষেত্রে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য দূর দূরান্তে মালবহন ও যাত্রী চলাচলের জন্য আজিও রেলপথই আমাদের প্রধান বাহন। কিন্তু গত বিশ বছরে বিশেষতঃ যুদ্ধকালীন অবস্থায় রেলপথের উপর যে পরিমাণ চোট্ গিয়াছে, তাহার ধাক্কাই রেলপথ এখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। সীমাবদ্ধ উপকরণের দরুণ পুনর্ব্বাসনের কাজও তাহার এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হয় নাই। পুনর্ব্বাসনের জন্য ১৯৫১ সনেই আমাদের প্রয়োজন ছিল—২৫৫৪টি ইঞ্জিন, ৬৮৯৫টি যাত্রীগাড়ী ও ৪৭,২৫৬টি মালগাড়ী। আর সেক্ষেত্রে গড়ে বার্ষিক পাওয়া যাইতেছে মাত্র ১৯০টি ইঞ্জিন, ৬৫০টি যাত্রীগাড়ী ও ৫০০০ মালগাড়ী এবং আশা করা যাইতেছে যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ৩৫৯৬টি ইঞ্জিন, ৯৬১৬টি যাত্রীগাড়ী ও ৭৩,৩৭১টি মালগাড়ী পাওয়া যাইবে।

বর্ত্তমানে রেলপথের পক্ষে এককভাবে দেশের পরিবহন চাহিদা মিটানো সম্ভব নহে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে মাল চলাচল ও অকেজো মালগাড়ীকে বাতিল করিবার জন্য মোট চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াইবে প্রায় ১ লক্ষ ৯ হাজার। অথচ যেভাবে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে ১৯৫৬ সনের মার্চ্চমাস পর্য্যন্ত মাত্র ৬১ হাজার মালগাড়ী পাওয়া সম্ভব হইবে এবং বাকী ৪৮ হাজারের মত ঘাটতি থাকিয়া যাইবে। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে অতঃপর পরিবহন চাহিদা বছরে শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং পাঁচ বছরে বৃদ্ধি হইবে মোট ১০ ভাগ। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই রেলব্যবস্থা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। কিন্তু বেসরকারী হিসাবে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান পরিবহন ক্ষমতা অন্ততঃ শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। যদি বিশেষ ব্যবস্থার মারফৎ পরিকল্পনানুযায়ী রেলপথের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভবও হয়, তথাপি কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে ক্রমাগত বর্দ্ধিতহারে যে মাল উৎপন্ন হইতেছে তাহা বহনের জন্য রেল ছাড়াও অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রেলপথ উন্নয়নের জন্য প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ অর্থই ব্যয় হইতেছে পুরাণো সাজসরঞ্জাম বাতিল করিয়া নূতন বসানোর কাজে। গত বিশ বছর যাবৎ যদৃচ্ছ ব্যবহারের ফলে এ সবের অপসারণ আজ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে এবং উপরোক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা মাত্র ৫ ভাগ নূতন রেলপথ বসানোর জন্য ব্যয় হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ফলে, পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনানুযায়ী চলাচল ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাইতেছে না। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে আগামী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চাহিদা মিটানো একক রেলের পক্ষে সম্ভব নহে। আগামী পরিকল্পনায় মোট ৬০০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে শিল্পোন্নয়ন ব্যাপারে। নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, আগামী পাঁচ বছরে উৎপাদন হার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হইতে বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে।

শিল্প	পরিমাণ	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	শতকরা বৃদ্ধি
খাদ্যশস্য	লক্ষ টন-খাদ্য	৫৫০	৬৩৫	১৫'৪৫
—	— ডাইল	১০০	১১৫	১৫'০০
ইস্পাত	"	১৬	৩৫	১৮১'২৫
কয়লা	"	৩৭	৬০	৬২'১৬
সিমেণ্ট	"	৪৬	১০০	১১৭ ৩৯
তৈলবীজ	"	৫৬	৭০	২৫'০০
এলুমিনিয়ম	হাজার টন	১২	৪০	২৩৩'৩৩
কৃত্রিম সার	"	৪৫০	১৩৫০	২০০'০০
সোডা য়্যাস	"	৭৮	২০০	১৫৬'৪১
কষ্টিক সোডা	"	৩৩	১০০	২০৩'০৩
চিনি	"	১৪	২১	৫০'০০
কাগজ	"	১৪০	২০০	৪২'৮৫
বস্ত্রশিল্প	লক্ষ গজ	৪৭০০	৫৫০০	১৭'০২
বাইসাইকেল	হাজার	৫০০	১০০০	১০০'০০

বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উৎপাদন উপরোক্ত হারে বৃদ্ধি পাইলে তাহা পরিবহনের জন্য পর্য্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং একমাত্র রেলপথই যে সমস্ত মালচলাচল করিতে সক্ষম হইবে না তাহাও বলা নিষ্প্রয়োজন। আগামী পরিকল্পনায় সমগ্র রেলপথের ক্ষমতামাত্র শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব হইয়াছে। রেলওয়ে বোর্ড সমস্ত রাজ্যসরকারদের কাছ হইতে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, আগামী পাঁচ বছরে সমগ্র দেশে আরও প্রায় ১০,০০০ মাইল নূতন রেলপথ বসানো প্রয়োজন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত মাত্র ৬০০০ মাইল নূতন রেলপথ বসাইবার পরিকল্পনা হইয়াছে। তাহাও আবার কোন কোন পথে ডবল লাইন প্রবর্ত্তন করিয়া। কিন্তু যে বিরাট শিল্পোন্নয়নের কর্মসূচী রচনা করা হইয়াছে, তাহার তুলনায় উপরোক্ত বৃদ্ধি অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হইবে। ভারতবর্ষ অতি

বিরাট দেশ—আয়তনে প্রায় সোয়া দশ লক্ষ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা প্রায় ৩৬ কোটি। এই বিরাট দেশের পক্ষে ৩৪ হাজার মাইল রেলপথ বাস্তবিকই অতি সামান্য। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের সহিত তুলনা করিলেই তাহা সুপরিস্ফুট হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০০০ বর্গ-মাইল এলেকায় রেলপথের পরিমাণ ৭৫ মাইল, ইংল্যাণ্ডে ৫৫০ মাইল আর ভারতে মাত্র ২৯ মাইল।

উপরোক্ত সংখ্যা হইতে রেলব্যবস্থার অপ্রাচুর্য্য সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা ইহাপেক্ষাও শোচনীয়। তাহার কারণ, অতীতে সড়ক পরিবহনকে রেলপথের অবাঞ্ছিত প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়াই গণ্য করা হইত। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে ১৯২০ সনে যখন সামরিক বিভাগ হইতে বহু মোটর গাড়ী উদ্বৃত্ত পাওয়া গেল তখন হইতেই ভারতে মোটর গাড়ীর মারফৎ চলাচলের সূত্রপাত। ইহার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া যাত্রীবহন ব্যাপারে রেলগাড়ী ও মোটরগাড়ীর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। ১৯৩০ সনের কাছাকাছি মোটরপথ এত আকর্ষণীয় হয় যে অসংখ্য যাত্রী ইহার মাধ্যমে যাতায়াত করিতে থাকে। তখন সরকার রেলগাড়ী মোটর-গাড়ীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন যাহার ফলে ১৯৩৯ সনে মোটরযান আইন পাশ হয়। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য—উভয়ের মধ্যে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ এবং সুপরিকল্পিত উপায়ে মোটর যান ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। ১৯৪৬ সনে বেসরকারী মালিক, রাজ্য সরকার ও রেলকর্তৃপক্ষ—এই ত্রিদলীয় প্রতিনিধি লইয়া যানবাহন সংস্থা গঠনে উৎসাহ দিবার নীতি সরকার গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সনে সড়ক পরি-বহন কর্পোরেশন আইন (ইহা ১৯৫০ সনে সংশোধিত হয়) পাশ হইবার পরে কয়েকটি রাজ্য সরকার অনুরূপ পরিবহন সংস্থা গঠন করেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে অবস্থার জন্য মোটর যান আইনের প্রয়োজন হইয়াছিল, আইন পাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অবসান হয়। ১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইবার ফলে সমগ্র অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। চলাচলের জন্য বহু পরিমাণ যাত্রী বা মালপত্র মোটরযানের পথে স্থানান্তরিত হইলেও তদ্দরুণ রেলপথকে পূর্ব্বের ন্যায় কোন ক্ষতি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। বরঞ্চ যে পরিমাণ মালপত্র রেলপথে চলাচলের জন্য নির্দ্ধারিত হইল তাহা বহন করিতেই রেলপথের অসামর্থ্য প্রকাশ পাইতে থাকে। তদবধি রেলপথের এই অবস্থাই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ১৯৩৯ সনে মোটর যান আইন পাশ হইবার ফলে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার অনুসৃত নীতির ফলে সড়ক পরিবহন শিল্পের অগ্রগতি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয়।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৩৯ সনের মোটর যান আইনের অন্তর্ভুক্ত যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের বাধানিষেধগুলিই শিল্পের উন্নয়নের পথে অন্তরায়। আইনে আছে, পাশাপাশি রেলপথ চলিলেও ১৫০ মাইল অবধি দূরত্ব পর্য্যন্ত মোটর পথে মালচলাচলে কোন বাধা নাই। দূরত্ব উহার বেশী হইলেই রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্তৃপক্ষ মালের শ্রেণীবিচার করিয়া রেলের সুযোগ সুবিধা ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করিয়া মাল চলাচলের অনুমতি দিবেন। ১৯৩৯ সন অবধি বহু মোটরযান বোম্বাই, পেশোয়ার, দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি দূর দূর স্থানের মধ্যে চলাচল করিত। বর্ত্তমানে কোন যানেরই একটি রাজ্যের অভ্যন্তরেও সমগ্র এলাকায় চলাচল করিবার অনুমতি নাই। কোন কোন রাজ্যে ত' ৭৫ মাইলের বেশী চলাচল করিবার অনুমতিই দেওয়া হয় না এবং এই ৭৫ মাইল দূরত্বের জন্য ও নানারূপ বাধানিষেধ আরোপিত আছে। তদুপরি, রেজিষ্ট্রেশন খরচ, স্থানীয় কর ও অন্যান্য খরচ আজ শিল্পটির উপর এমন জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছে যে, লাভজনক উপায়ে পরিবহন শিল্প পরিচালনা করা অতিশয় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মোটরযান আইন প্রবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমানে বেসরকারী মালিকগণ আর যানবাহন চালাইতে উৎসাহ বোধ করিতেছে না। যে সব রাজ্যে পরিবহন শিল্প সরকারী পরিচালনাধীনে আসিয়াছে সেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি মোটরযান আইনের আওতায় আসিয়াছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেসরকারী মালিকগণ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার এলাকার বাহিরে চলা-চলের জন্য লাইসেন্স পাইতেছে না। অতীতে যে সব পথঘাট বেসরকারী মালিকদের চেষ্টার ফলে লাভজনক পথে পরিণত হইয়াছে, সরকারী পরিবহন তাহা সবই দখল করিয়া লইয়াছে। সরকারী কড়াকড়ি এবং বিলম্বিত নীতি অবলম্বনের ফলে পরিবহন শিল্পের উন্নয়ন বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। এইসব কড়াকড়ির একটি প্রত্যক্ষ কুফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, বেসরকারী মালিকগণ দূরে থাকার দরুণ বহু মালবাহী যানবাহন আজ অচল এবং কোন কোন রাজ্যে প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ যানবাহন বেকার পড়িয়া আছে। মোটরযান কর তদন্ত কমিটি এ ব্যাপারে আন্তঃ-আঞ্চলিক চলাচলের জন্য লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারকে অধিকতর উদারনীতি অবলম্বন করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে যাহাতে মোটরযান চলাচল বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য রাজ্যসরকারগুলিকে মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন।

রাজ্যসরকারগণ জাতীয়করণ নীতি গ্রহণ করিবার ফলে বেসরকারী মালিকদের মনে এক অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছে এবং তাহাও পরিবহন শিল্প উন্নয়নের পথে এক অন্তরায়। বিশেষতঃ রাজ্যসরকারগুলি যে 'পারমিট' বিতরণ করেন তাহা অতি স্বল্পমেয়াদী বলিয়া।

কর তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায়, ১৯৫২-৫৩ সাল পর্য্যন্ত দশটি রাজ্যে সরকারী পরিবহণ শিল্পের জন্য যে মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ প্রায় ১৭ কোটি টাকা। এই সব রাজ্যের হিসাবপত্র রাখিবার পদ্ধতি সর্ব্বত্র এক নহে এবং ক্ষয়-ক্ষতির (depreciation) জন্য যে ব্যবস্থা তাহাও বিভিন্ন। বিহার, আসাম, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে ত' এই ব্যবস্থা মাত্র ১৯৫৩-৫৪ সন হইতে সুরু হইয়াছে। অধিকাংশ রাজ্যেই ঋণ গ্রহণের পরিবর্ত্তে সাধারণ রাজস্ব হইতে এই শিল্পের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং আসাম, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত প্রভৃতি রাজ্যে শিল্পে লগ্নীকৃত

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	—	২১ পাই	প্রথমবার বিক্রয়ের উপর এই হার। পরবর্ত্তী বিক্রয়ে করহার টাকা প্রতি ৩ পাই ।
সৌরাষ্ট্র	৪ আনা	—	
আসাম, পেপস্থ, পাঞ্জাব, হায়দরাবাদ ও হিমাচল প্রদেশ	৩ আনা	—	
উত্তরপ্রদেশ ও কুর্গ	২ আনা	—	
মধ্যপ্রদেশ	—	২ আনা	
মধ্যপ্রদেশ ও বিন্ধ্যপ্রদেশ	—	১ আনা	
দিল্লী	—	½ আনা	

নিম্নে মোটর পরিবহন হইতে সরকারের মোট আয়ের পরিমাণ দেওয়া হইল—

(কোটি টাকা)

কেন্দ্রীয় সরকার	১৯৫১-৫২	১৯৫২ ৫৩	১৯৫৩-৫৪	'৫৪-৫৫ (সংশোধিত হিসাব)
আমদানী শুল্ক				
মোটর তৈল	২৬.০৪	২৭.৪৯	২৭.৫৩	২২.০০
মোটর যান ও অংশে	১২.৩৭	৮.৭০	৬.৩৭	৮.৩০
আবগারী শুল্ক				
মোটর তৈল	১.৯৮	১.৯৬	২.৪৭	৮.৫০
মোটর টায়ার	৬.০৮	৪.৩৮	৪.৯৫	৫.৩০
রাজ্যসরকার				
মোটর গাড়ী ও তৈলের বিক্রয়কর	১৪.৮৩	১৮,৪৬,	২১.৯৬	২২-৬৮
মোট	৬১.৩০	৬০.৯৯	৬৩,২৮	৬৬.৭৮

মোটরযান কর-তদন্ত কমিটির মতে, পৃথিবীতে একমাত্র ভারতই মোটর গাড়ীর উপর সর্ব্বোচ্চ কর দিয়া থাকে। গাড়ী প্রতি গড়ে বার্ষিক করের পরিমাণ এখানে প্রায় ১৯১৩ টাকা, অথচ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে উহার পরিমাণ মাত্র ৪০৯ টাকা। আরও দেখা যায়, তিনটন মালবাহী লরী প্রতি মাইলে টনপ্রতি গড়ে ২১.৯১ পাই কর দিয়া থাকে, আর উহার জন্য রেলপথ আদায় করে মাত্র ৯.১৮ পাই। এইরূপে যে কর আদায় হইয়া থাকে তাহা হইতে যানবাহী সড়কের জন্য মাইলপ্রতি ৪ হইতে ৪½ পাই খরচ করা উচিত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আদায়ীকৃত রাজস্বের শতকরা ৪.৫ ভাগ সরকার লইয়া থাকে আর ভারতে রাজ্য সরকারগুলি রাজস্বের শতকরা ৩৪ ভাগ লইয়া থাকে। তাছাড়া এই উচ্চহারের কর ব্যবস্থার দরুণ ভারতের যানবাহন সংস্থাগুলির পরিচালনা ব্যয়ও অত্যধিক—মাইলপ্রতি প্রায় ৪২.৩ পাই, আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে উহা ৩৪,০৩ পাই। অথচ সেখানে মজুরীহারও অত্যন্ত চড়া। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অত্যধিক করভারের জন্য পরিবহন শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হইতেছে। অতএব এই শিল্পের স্বার্থরক্ষাকল্পে করভার লাঘবকরা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে রেলকোম্পানী প্রতি টন মাল বহনের জন্য মাইলপ্রতি ১১ পাই আদায় করিয়া থাকে, কিন্তু মোটর পথে এই করের পরিমাণ ইহার প্রায় দ্বিগুণ। একথা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, রাজস্ববৃদ্ধি করার জন্যই সরকার মোটর-শিল্পের উপর কর বসাইয়াছেন! কিন্তু কর হার লাঘব করিয়া যানবাহনের সংখ্যাবৃদ্ধি করিলে করের পরিমাণ তাহাতে পূর্ব্ববৎ না থাকিয়া বরঞ্চ বৃদ্ধি পাইবারই সম্ভাবনা। অধিক-সংখ্যক যানবাহন হইতে স্বল্পহারে ধার্য্য করের দরুণ রাজস্ব আদায় এবং পরিমিতসংখ্যক যানবাহনের উপর চড়াহারে কর ধার্য্য করিয়া রাজস্ব আদায়—অবশ্যই পৃথক ব্যাপার। বরং শেষোক্তক্ষেত্রে জনসাধারণের যানবাহনের চাহিদা সঙ্কুচিত হয় বলিয়া উহা হইতে অধিক রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা অল্প। মোটরযানের উপর চড়াহারে করধার্য্যের ফলে গাড়ীর সংখ্যার উপর তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়াছে, নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বোঝা যাইবে।

বৎসর	মোটর সাইকেল	ব্যক্তিগত গাড়ী	ট্যাক্সি	বাসগাড়ী	মাল গাড়ী	মোট
১৯৫০	২৮,১৯৩	১৪৯৪৭৬	৮৪০৭	২৯৪৪৩	৭৪৪৭১	২৯৮,৬৬২
১৯৫১	২৭,১০৫	১৪৭৯৫৩	১১৪৮২	৩৪২৭১	৮৬৫০৯	৩১০১৪৫
১৯৫২	২৭০১২	১৪৭৯৮২	১১৭৮৮	৩৪৩৭২	৮২৪১৩	৩০৮২৬১
১৯৫৩	২৯১২৪	১৫৬১৫৪	১৩১৬১	৩৯৪৪৯	৯০০৭৫	৬৩৩২১৯

দেখা যাইতেছে, ১৯৫২ সনে মোট গাড়ীর সংখ্যা বস্তুতই হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫৩ সনে অবস্থার উন্নতি হইলেও প্রয়োজনানুরূপ নহে। মোটরযান কর তদন্ত কমিটি বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারদের মোটর যান সংক্রান্ত কর-নীতি পরিবহন শিল্পের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নয়নের অনুকূল নহে। সেজন্যই তাহারা সুপারিশ করিয়াছেন, বহুমুখাকর অপসারিত করিয়া কেবলমাত্র দুইটি খাতে করধার্য্য করা প্রয়োজন—একটি তৈলের জন্য অপরটি মোটর যানের জন্য। তৈলের কর গ্যালন প্রতি ছয় আনার বেশী হওয়া উচিত নহে এবং তাহা কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্কের খাতে আদায় করা উচিত। মোটরযান করের সর্ব্বোচ্চহার ও মাদ্রাজে বর্ত্তমানে বলবৎ হার অপেক্ষা নিম্নে স্থিরীকৃত হওয়া প্রয়োজন। তাহাদের মতে, অপরাপর করগুলি বৈষম্যমূলক ও বোঝা স্বরূপ বলিয়া সবই লোপ করা প্রয়োজন। কিন্তু কমিটির এইরূপ সুপারিশ সত্ত্বেও করভার লাঘব বা লোপ করিবার জন্য সরকার এ যাবৎ কিছুই করেন নাই। বরঞ্চ আরও নানাবিধ স্থানীয় করের বোঝা শিল্পটির পথে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

উক্ত কমিটি ভারতে চলাচল ব্যবস্থার জন্য কয়েকটি সাধারণ নীতির উল্লেখ করিয়াছেন। এই নীতিগুলি আন্তর্জাতিক বণিক সভা কর্ত্তৃক জাতি সঙ্ঘের নিকট পেশ করা হইয়াছিল—

১। দেশের উৎপাদনও বণ্টন ব্যবস্থা এবং সুষ্ঠু চলাচল ব্যবস্থা

একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। স্মুতরাং চলাচল ব্যবস্থার প্রশ্নটি এককভাবে না দেখিয়া এই দুইদিক হইতে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

২। এই নীতি কার্য্যে পরিণত করার জন্য যান ব্যবহারকারী কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থাগুলি যাহাতে পরিবহন কর্তৃপক্ষের সহিত ভাড়ার হার, কর হার ও সাধারণ পরিবহন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারেন তজ্জন্য ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৩। বিভিন্ন শ্রেণীর যানবাহন ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারী সংস্থাগুলির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন।

৪। প্রতি দেশে বিভিন্নধরণের যানবাহন পরিচালনা ব্যয় বা পড়তা খরচ কিরূপ, তাহা প্রণয়নের জন্য ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

৫। যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা উন্নয়ন যাহাতে ব্যাহত না হয়, তাহার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

৬। দেশের প্রতিরক্ষা বা সাধারণ স্বার্থরক্ষাকল্পে সময় সময় অতি অল্পসংখ্যক যানবাহন রাখা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তদ্দরুণ কোনরূপ লোকসানের সম্মুখীন হইলে তাহা মুষ্টিমেয় ব্যবহারকারী সংস্থাগুলির উপর না চাপাইয়া সমগ্র জনসাধারণের উপর চাপানো উচিত।

সম্প্রতি প্রকাশিত কর তদন্ত কমিশনের রিপোর্টেও বলা হইয়াছে যে, উপরোক্ত স্মুপারিশগুলি ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য, কারণ নীতির দিক দিয়া ইহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারদের পরিবহন শিল্প জাতীয়করণ নীতি পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে কর ব্যবস্থা, পারমিট ও লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থার ও আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই সঙ্গে রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্যও সক্রিয় ব্যবস্থা আবশ্যক। রাস্তাঘাট উন্নয়নের উপর পরিবহন শিল্পের উন্নয়ন বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। প্রতি বর্গমাইল এলাকায় ভারতে রাস্তার দৈর্ঘ্যমাত্র ০.২ মাইল, অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় ইহা অন্ততঃ ১ মাইল হওয়া প্রয়োজন। নিম্নেবিভিন্ন দেশের রাস্তায় দৈর্ঘ্যের একটি তালিকা দেওয়া হইল।

দেশ	প্রতি লক্ষ জনসংখ্যার অনুপাতে রাস্তার দৈর্ঘ্য	প্রতি হাজার বর্গ মাইল এলাকায় রাস্তার দৈর্ঘ্য (মাইল)
যুক্তরাষ্ট্র	২১১৪	১০০৮
ইংল্যাণ্ড	৩৮১	২০৭০
জাপান	৭২৮	৩৯৮৮
ভারতবর্ষ	৭৩	২০১

ইহাছাড়াও, ভারতে জেলা বোর্ড প্রভৃতির অন্তর্গত আরও প্রায় ২ লক্ষ ৪৫ হাজার মাইল পথ আছে। ইহার মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ রাস্তা সমতল হইলেও তাহাদের অবস্থা খুব সন্তোষজনক নহে। যুদ্ধোত্তর কালে দশবছরের মধ্যে সমগ্র ভারতের পথ উন্নয়নের জন্য নাগপুর পরিকল্পনা নিম্নলিখিত সূচী প্রণয়ন করিয়াছে।

শ্রেণী	বৃদ্ধি (হাজার মাইল)	ব্যয় (কোটি টাকা)
জাতীয় রাজপথ	২০	৪৮
প্রাদেশিক পথ	৫৯	১১৮
জেলাসমূহের পথ	১৩৫	১২২
পল্লী পথ	১৫০	৩০
	৩৬৪	৩১৮

নাগপুর পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে, কৃষি সমৃদ্ধ এলাকায় কোন গ্রামই প্রধান সড়ক হইতে পাঁচমাইলের বেশী দূরে হইবে না। বর্ত্তমান মূল্যমান অনুযায়ী পথ উন্নয়নের মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ৭৪৪ কোটি টাকা ও অন্যান্য পথের ব্যয় ৬১১ কোটি টাকা। অথচ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পথ উন্নয়নের জন্য মাত্র ১৩১.৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে 'ক' শ্রেণী রাজ্যে মোট পথের দৈর্ঘ্য ১৯৫০-৫১ সনে ১০,০০৭ মাইল হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫-৫৬ সনে ১২,৪৫৩ মাইলে দাড়াইবে এবং 'খ' শ্রেণী রাজ্যে ৭,৫৮৮ মাইল হইতে ৮,১২৯ মাইলে দাড়াইবে। বলা বাহুল্য, এই পরিমাণ বৃদ্ধি নাগপুর পরিকল্পনার নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য হইতে অনেক নিম্নে এবং দেশের প্রয়োজনানুযায়ী পর্য্যাপ্ত নহে। তাছাড়া, নূতন পথ নির্মাণ ব্যতিরেকে পথ সংরক্ষণ ও পথ সংস্কার ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব্বোক্ত মোটর যান কর তদন্ত কমিটি দেখাইয়াছেন, প্রত্যক্ষ করভার ছাড়াও জীর্ণ পথের দরুণ একটি যানের বার্ষিক পড়তা খরচ প্রায় ২৯০০ টাকা হইয়া থাকে। কমিটি তজ্জন্য নূতন রাস্তা নির্মাণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে মোটরযান কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের যে সামান্য অংশ পথ সংস্কারের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাও সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করা হয় না। সুখের বিষয়, বর্ত্তমানে কমিটির স্মুপারিশ অনুযায়ী সরকার বিষয়টি যত্ন সহকারে বিবেচনা করিতেছেন।

একদিকে পথের প্রসার যেমন ধীর গতিতে অগ্রসর হইতেছে, তেমনি পরিবহন শিল্পের অগ্রগতি আরও মন্থর। ১৯৫১ সনে মোট যান-বাহন সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ১০ হাজার ১৪৫। ১৯৫৩ সনে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ২১৯। মালগাড়ীর সংখ্যা ৮৬৫০৯ হইতে ৯০০৭৫ হয়, বাস গাড়ীর সংখ্যা হয় ৩৪,২৭১ হইতে ৩৯,৪৪৯। দেখা যাইতেছে, দেশের প্রয়োজনের অনুপাতে এই অগ্রগতি সন্তোষজনক নহে। ১৯৫১ হইতে ১৯৫২ সনের মধ্যে ত' মোটর গাড়ীর সংখ্যা প্রকৃত পক্ষে হ্রাস পায় ৩ লক্ষ ১০ হাজার ১৪৫ হইতে ৩ লক্ষ ৮ হাজার ৩৬১ তে; মাল গাড়ী ৮৬,৫০৯ হইতে ৮২,৪১৩ তে এবং বাসের সংখ্যা ৩৪,২৭১ হইতে সামান্য বাড়িয়া দাঁড়ায় ৩৪,৩৭২। কিন্তু পরিবহন শিল্পের অগ্রগতি যতই ধীরমন্থর হউক, যানবাহনের দুষ্প্রাপ্যতা তাহার কারণ নহে। পর্য্যাপ্ত চাহিদা থাকিলে এবং সড়ক উন্নয়ন আশানুরূপ হইলে এদেশে যানবাহন উৎপাদনের যথেষ্ট অবকাশ আছে। পরিকল্পনা কমিশনও এই শিল্প-প্রসারের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা বলিয়াছেন। বর্ত্তমানে দেশে মোট

গাড়ীর চাহিদা প্রায় ৩০ হাজার। ইহার অর্দ্ধেকই প্রায় বাণিজ্যিক ব্যাপারে প্রয়োজন। কিন্তু ইহার সামান্য অংশমাত্র বর্ত্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে। সড়ক উন্নয়নের ফলে যদি মোটর যানের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তবে দেশের কারখানা হইতেই তাহা পুরাপুরি মিটানো যাইবে।

অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা ও নূতন জীবিকা সংস্থানের দিক হইতেও সড়ক পরিবহন শিল্পটি বর্ত্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অল্প সময়ের মধ্যে এই শিল্পের মাধ্যমে দেশের বহুসংখ্যক বেকারকে কর্মে নিযুক্ত করা সম্ভব। নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, নিয়োজিত মূলধন, মোট পথের দৈর্ঘ্য প্রভৃতি বিষয়ে রেলপথ হইতে এই শিল্পের গুরুত্ব কত বেশী।

	রেলশিল্প	সড়ক পরিবহন শিল্প
১। নিয়োজিত মূলধন—	৮৩৮ কোটি টাকা	১২০০ কোটি টাকা
২। মোট পথের দৈর্ঘ্য—	৩৪,০৭৯ মাইল	২,২৬,৫৫৮ মাইল
৩। বার্ষিক জীবিকার সংস্থান—	১০ লক্ষ	৭৫ লক্ষ

উপরোক্ত হিসাবের মধ্যে অবশ্য গরুর গাড়ীর সংখ্যাও ধরা হইয়াছে এবং সরকারী হিসাব মতে, উহারা বছরে প্রায় ১০ কোটি টন মাল বহন করে। অদূর ভবিষ্যতে অবশ্য গরুর গাড়ীর সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন না-ও হইতে পারে। আরেক হিসাবে দেখা যায়, পরিবহন-শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্র ভিন্ন, অন্যান্য ক্ষেত্রে বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করে।

১৯৫২-৫৩ সনের ভিতর মোটর গাড়ীর সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার বৃদ্ধি পায়। এই হার যদি শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি করা যায়, তবে আগামী পাঁচ বছরে মোট গাড়ীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজার পর্যান্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। অন্যান্য শ্রেণীর যানবাহন ও সমপরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিলে আশা করা যায়, এই শিল্পে বছরে আরও ১৬ লক্ষ লোককে নতুন কাজ দেওয়া যাইবে। বর্ত্তমানে সড়ক নির্মাণ খাতে মোট ব্যয় ৪০ কোটি টাকা—তন্মধ্যে ২১ কোটি টাকা নূতন পথনির্মাণে এবং ১৯ কোটি টাকা পথ সংরক্ষণ বাবদ। যান বাহনের সংখ্যাবৃদ্ধি পাইলে ইহার পরিমাণ বাড়িয়া ৭০ কোটি টাকা হইবে আশা করা যায়। ইহার ভিত্তিতে হিসাব করিলে দেখা যায়, আগামী পাঁচ বছরে রেলপথ অপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ অধিক লোককে পরিবহন শিল্পে নিযুক্ত করা যায়। পরিকল্পনা কমিশনের মতে দেশে মোট মালিকের সংখ্যা ৪৭,৫৭৫ ; তন্মধ্যে ১০০ খানার উপর গাড়ী আছে মাত্র ২৫ জনের ; ৫০ খানা বা তদধিক গাড়ীর মালিক ৫০ জন এবং ১৫০০ মালিকের ৫ খানা হইতে ৫০ খানা পর্য্যন্ত গাড়ী আছে। অবশিষ্ট ৪৬,০০০ মালিকের প্রত্যেকের গাড়ীর সংখ্যা ৫ বা তাহার নিম্নে। অতএব অল্প পুঁজির মালিকদের এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার সুযোগ ও আকর্ষণ আছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই শিল্পে নূতন জীবিকা সংস্থানের সম্ভাবনা আছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে সড়ক পরিবহনশিল্প-প্রসার বাঞ্ছনীয়ই কাম্য।

জীবিকার প্রশ্ন ছাড়াও সড়ক পরিবহন শিল্প দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বিকল্প চলাচল ব্যবস্থা হিসাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। চলাচল ব্যবস্থার প্রয়োজনের পরিধি আজ এত বিস্তৃত যে, কোন পরিবহন মাধ্যমই একক ভাবে ক্রমবর্দ্ধমান যাত্রী চলাচল ও ব্যবসা বাণিজ্যের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম নহে। রেলপথ ব্যবস্থা যত বিস্তৃতই হউক, তাহার দ্বারা দেশের সম্যক প্রয়োজন মিটিতে পারে না। অথচ মোটরযান ভারতের ৫২ লক্ষ পল্লীর প্রতিটি গৃহদ্বারে পৌঁছিতে সক্ষম এবং এইজন্য পল্লীঅঞ্চলের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক। এমন কি, যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডে রেলপথ ব্যবস্থা আজ এত সুসংগঠিত হওয়া সত্ত্বেও তাহারাও আর অতিরিক্ত রেলপথ না বাড়াইয়া মোটর পথ বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। ব্যাপক ভাবে মোটর পথের ব্যবহার আমেরিকান অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্য। সেখানে রেলপথ ছাড়া, ৮০ লক্ষ মোটর ট্রাক কারখানা হইতে বাজার পর্যন্ত মালপত্র চলাচলে সাহায্য করে এবং শতকরা ৭৫ ভাগ মালপত্র ট্রাকে, ১৪ ভাগ রেলপথে এবং অবশিষ্ট ১১ ভাগ জলবাহী পথে চালিত হয়। বস্তুতঃ সড়ক পরিবহন শিল্পের উন্নয়নের ফলে মার্কিণ অর্থনীতির অগ্রগতি অত্যন্ত ত্বরান্বিত হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।

আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছে। অতএব সড়ক পরিবহন শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে স্তিমিত থাকিতে পারে না। দেশের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং পরিবহন শিল্পের প্রয়োজনও বাড়িতেছে। পল্লী ও শহরাঞ্চলের মাঝে এতদিন যে বৈষম্য ছিল তাহা দূরীভূত করিয়া উভয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। নূতন নূতন অঞ্চলে নূতন নূতন শিল্প সংস্থার প্রতিষ্ঠা হইতেছে এবং দেশের বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা-গুলি সমাপ্ত হইলে আরও অনেক শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল গড়িয়া উঠিবে। মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চল, বিহার, উড়িষ্যা ও বিন্ধ্যপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চল, খনিজ ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও এখনও রেলপথ হইতে বহুদূরে। এসব অঞ্চল মোটর পথের মারফৎ সংযুক্ত করিয়া দিলে শিল্পসমৃদ্ধির সম্ভাবনা যে কত উজ্জ্বল হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। দেশের চলাচল ব্যবস্থার চাহিদা মিটাইতে হইলে কেবলমাত্র বর্ত্তমান চাহিদা মিটাইলেই চলিবে না ; পরিকল্পনা সময়ের মধ্যে অধিকতর উৎপাদনের ফলে যে বিরাট চাহিদার সৃষ্টি হইবে তাহা মিটাইবার জন্যও তৈয়ারী থাকিতে হইবে। এ অবস্থায়, সড়ক পরিবহন শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে না পারিলে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা আছে।

পরিচালক—উপানন্দ

বিজয়া সম্মিলনে

বিজয়ার পর আবার আমরা তোমাদের সঙ্গে সম্মিলিত হচ্ছি, তোমরা আমাদের অন্তরের শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। তোমাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হোক্। সরলতা ভিন্ন মিলন হয় না, বিজয়া সম্মিলনে সেই কথাই মর্ম্মে জেগে ওঠে। মিলন ভিন্ন সংগঠন হয় না। মনের বিশ্বাস মত কার্য্য করাকেই সরলতা বলে। এর দ্বারা আত্মার প্রসার হয়। প্রসারণই জীবন। পরের মনস্তুষ্টির জন্য ভীত হয়ে বিশ্বাসের বিপরীত কাজ করাকে বলে কপটতা। কপটতার দ্বারা আত্মার সঙ্কোচন হয়। সঙ্কোচনই মৃত্যু। যেখানে সরলতা, সেখানেই পবিত্রতা। তোমাদের জীবনের এখন পূর্ব্বাহ্ন, এ সময়ে শিক্ষা, সাধনা ও অভ্যাসের দ্বারা নিজেদের সংস্কার কর্‌তে হবে, আর সংস্কারের দ্বারাই দ্বিজত্ব লাভ হয়। চরিত্র বিশুদ্ধ করার জন্যে প্রথম থেকেই সরলতার অভ্যাস কর্‌বে। তোমরা জেনো, কপট ব্যক্তি বহু ধন উপার্জ্জন করতে পারে, উচ্চ রাজপদ পেতে পারে, এমন কি রাষ্ট্রনায়ক হোতে পারে কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস ও স্নেহের পাত্র হোতে পারে না। মিথ্যাকে আশ্রয় করে স্বার্থসিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু সে সিদ্ধি জীবনের সমৃদ্ধি আন্‌লেও তা স্থায়ী হয় না। সরলতার সঙ্গে সত্যের নিগূঢ় সম্বন্ধ, আর ধর্ম্মের সহাবস্থান।

গুহক চণ্ডালের মনের সরলতাই শ্রীরামচন্দ্রকে তার প্রেমে আবদ্ধ করেছিল। কপট দুর্য্যোধনের রাজপ্রাসাদ ও উপাদেয় রাজভোগ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ কর্‌তে পারেনি, তাঁকে আকর্ষণ করেছিল বিদুরের কুটিরের তণ্ডুলকণা। হজরত মহম্মদ যে সময়ে একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রচার কর্‌ছিলেন, সে সময়ে নানাদিক থেকে শত্রুরা তাঁর প্রাণনাশ কর্‌বার জন্যে উদ্যত হয়। এ সংবাদটী মহম্মদের পিতৃব্য আবুতালাক অবগত হোলেন। হজরত মহম্মদকে তিনি বল্‌লেন—হৃদয়ের বিশ্বাস গোপন রেখে লোকের মন জুগিয়ে চলাই ভালো, চারিদিক থেকে তোমাকে হত্যা কর্‌বার চেষ্টা চল্‌ছে, এ সময়ে এ ভাবে ধর্ম্মপ্রচার স্থগিত রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ—হজরত পিতৃব্যকে বল্‌লেন—'স্নেহের বশীভূত হয়ে যা আদেশ কর্‌ছেন, তা পালন কর্‌লে সত্যের অপলাপ হয়, আর সম্পূর্ণ কপটতাই হচ্ছে প্রাণের ভয়ে লোকের মন জুগিয়ে চলা, বিশ্বাসকে বলি দিয়ে কপটাচরণ কর্‌তে পার্‌বো না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। যদি কেউ আমাকে এক হাতে সূর্য্য আর অন্য হাতে চন্দ্রকে দেয় তবুও আমি আমার বিশ্বাস নষ্ট কর্‌তে পার্‌ব না—'

একদা খৃষ্টধর্ম্ম সংস্কারক লুথারকে তাঁর বন্ধুরা বলেছিলেন—'লুথার! সাবধান হও, দেশের অধিকাংশ লোকই তোমার শত্রু হয়ে উঠেছে। যদি বাঁচতে চাও তো ধর্ম্মসংস্কার ছেড়ে দাও—' একথায় লুথার উত্তর দিলেন—'যা আমার মনের দৃঢ় বিশ্বাস—তা থেকে এক চুলও নড়্‌বোনা, সরল মনে সেই দৃঢ় বিশ্বাসের বলেই আমি ধর্ম্মসংস্কার করছি। এতে যদি এই মহানগরের সব ইঁটগুলো এসে আমার মাথায় পড়ে, তাতেও আমি কর্ত্তব্য থেকে বিমুখ হবো না—'

জগতের এই সব মহাপুরুষের আদর্শ যেন তোমাদের সরলতার অভ্যাস কালে প্রেরণা দেয়। বাল্যজীবনে তোমাদের মানসক্ষেত্রে যে অভ্যাসের বীজ রোপিত হচ্ছে, তাই একদিন প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়ে সমগ্র হৃদয়ভূমি অধিকার করবে, অতএব আমাদের কর্ত্তব্য সৎ অভ্যাসগুলি যাতে তোমরা অনুশীলন করো সেদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা, তোমরা জেনে রাখো, কদর্য্য অভ্যাস বদ্ধমূল হোলে মানুষ পশুত্বে ও পৈশাচিকতায় নেমে যায়। কদর্য্য অভ্যাসের বশবর্ত্তী হয়ে তোমরা যদি স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, নীতি ও সঙ্গতি হারিয়ে অশেষ দুর্দ্দশা ভোগ করো, তা'হোলে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি ভবিষ্যতে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে, পৃথিবীতে এই মহাজাতির অস্তিত্ব থাকবে না। যারা মুষ্টিমেয় থাকবে, তাদের অবস্থা হবে কাকের বাসায় কোকিলের লালিত পালিত হওয়ার মত, এজন্যেই তোমাদের জীবনের পূর্ব্বাহ্নে সতর্কতা করে দেওয়ার প্রয়োজন।

মঙ্গল কর্ম্মে মন নির্ম্মল হয়, আর ভাগবত-চেতনা প্রসারিত হয়। আমাদের সকল কর্ম্মে চিত্তের একাগ্রতাও বিশুদ্ধি আনবার জন্যে আমাদের ঋষিরা নানাভাবে পথ রচনা করে গেছেন, সেই পথ ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারলে, প্রাচীন ভারতের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, এজন্য বিজাতীয় পরানুকরণ বা মতবাদের প্রয়োজন হবে না। এর জন্য প্রয়োজন হবে সম্যক্‌ভাবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আর প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়ন, এ ছাড়া নিজেদের সমাজ সংস্কৃতি ধর্ম্ম ও সভ্যতার সম্বন্ধে তোমাদের কোন উপলব্ধি হবে না, কোন পরিচয়ও ঘটবে না, কেবল বিদেশী বুলি নিয়েই কপ্‌চাতে হবে। এদিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

জীবনযাত্রা সরল ও নির্ম্মল করবার যে সাধনা, সেই সাধনাই ভারতবর্ষ গ্রহণ করে এসেছে। জীবনের প্রথম ভাগেই সকলকে শিক্ষা দেওয়া হোতো ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে দূরে সরে থাকতে। যাতে মনের প্রবৃত্তিগুলি অসংযত আর দূষিত না হয়ে ওঠে তার জন্যে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হোতো। সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসের দ্বারা সেদিনের কিশোর জীবন গড়ে উঠ্‌তো সুপবিত্র হয়ে—ফলে বোধশক্তি বিকৃত হোতো না, অতি অল্প বয়সেই তত্ত্বগুলি বোধগম্য হোতো। তা না হোলে শঙ্করাচার্য্যের মত ব্যক্তি অতি অল্প বয়সেই জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ লাভ করে জাতির জীবনে নব আলোকসম্পাত করতে পারতেন না।

সেদিনের প্রত্যেকটী কিশোর ছিল শ্রুতিধর, যা শুনতো তাই মনে রাখতো, হুবহু বলতে পারতো—আর কোনদিন তা ভুলতো না। বুদ্ধিকে সরল করে পড়তে দেওয়া হোতো, এজন্য সহজে মানুষের চিত্ত ক্ষুব্ধ হোতো না, আর বিচার বুদ্ধির সামঞ্জস্য নষ্ট হোতো না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আমাদের শিক্ষা কেবল বিষয়-শিক্ষা নানা গ্রন্থ-শিক্ষা ছিল না, তা ছিল ব্রহ্মচর্য্য……কেবল কারখানায় দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল কলেজের পরীক্ষায় পাস করা নয়—আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে। আমাদের স্কুল কলেজেও তপস্যা আছে, কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা, বোধের তপস্যা নয়—'

বোধশক্তিকে জাগ্রত করবার জন্য তোমাদের পক্ষে প্রকৃতির পাঠশালায় কিছু কিছু পাঠ নেওয়া দরকার, তা'হোলে তোমাদের চিন্তাশক্তির ও অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির উন্মেষ হবে। পুস্তক যেমন তোমাদের পবিত্র সহচর, প্রকৃতির খেলাঘরের সামগ্রীগুলিও জ্ঞান আহরণের পক্ষে তোমাদের প্রদর্শনীর বস্তুসম্পদ। চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যে পঠিত বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখবার অভ্যাস করবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির কাছ থেকে যে ভাব অনুভাব, জ্ঞান ও বোধ লাভ করবে, তাই নিয়ে অনুশীলন, চর্চ্চা ও চিন্তা করে তোমাদের যে সব ভাব উদয় হবে, তাই প্রকাশ করবে। প্রকৃতির পাঠশালায় নূতন তাৎপর্য্য গ্রহণ করে তোমরা তোমাদের জীবনধর্ম্মকে নূতন বর্ণে রঞ্জিত করো এইটাই হচ্ছে আমাদের আন্তরিক কামনা। আজ ৺বিজয়ার শুভ আশীর্ব্বাদ তোমরা গ্রহণ করো। এই বিজয়া প্রসঙ্গে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'ঈশ্বরের কৃপায় আজ বিজয়ার মিলনকে আমরা নূতন করিয়া বুঝিলাম—এতদিন আমরা তাহার যথাযোগ্য আয়োজন করি নাই। আজ বুঝিয়াছি যে মিলন আমাদিগকে বরদান করিবে, জয়দান করিবে, অভয়দান করিবে সে মহামিলন গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে নহে, সে মিলন দেশে। সে মিলনে কেবল মাধুর্য্য রস নহে, সে মিলনে

উদ্দীপ্ত অগ্নির তেজ আছে—তাহা কেবল তৃপ্তি নহে, তাহা শক্তিদান করে।"

সকল স্বাতন্ত্র্যকে সকল বিচ্ছেদকে ঐক্যের ভিতর এনে তোমরা যেদিন মহামিলনের উদ্গাতা হয়ে ভারতীয় সভ্যতার শাশ্বত আত্মাকে বিশ্বে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, সেইদিনই সার্থক হবে আমাদের বিজয়া সম্মিলনের মহান্ আদর্শ। তোমাদের সেইদিনের জয়যাত্রা আমরা যেন দেখে যেতে পারি, এই আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই অপেক্ষা করবো দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে।

শিশু অপরাধীদের সম্বন্ধে গবেষণার সিদ্ধান্ত

শিশু-অপরাধীর দল কি ভাবে সৃষ্টি হয় এ সম্বন্ধে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার কয়েকটা নিয়ে দেওয়া গেল :—

যে পরিবারে পিতাকে অত্যন্ত মত্তপ দেখা গেছে, সেখান থেকে শতকরা ষাট জন শিশু-অপরাধী গড়ে উঠেছে।

শতকরা ৭৫ জন শিশু-অপরাধী এসেছে সেই সব পরিবার থেকে, যেখানে ছেলেমেয়েদের গতিবিধির উপর পিতামাতার কোন দৃষ্টি নেই।

শতকরা ৬০ জন শিশু-অপরাধীকে পাওয়া গেছে সেই সব পরিবার থেকে, যেখানে পিতামাতার মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ হয়, আর মতের ও মনের মিল নেই।

শতকরা ৭৮ জন শিশু-অপরাধীকে দেখা গেছে সেই সব পরিবারে যেখানে পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পিতামাতার খেলাধুলার কোন সম্বন্ধ নেই।

যে সব পরিবারের ভিতর পিতামাতা ছেলেমেয়েরা কার সঙ্গে মিশছে সেদিকে কোন খোঁজ খবর করেন না বা খেয়াল রাখেন না, সেই সব পরিবার থেকে পাওয়া গেছে ৮০ জন শিশু-অপরাধী।

শতকরা ৮০ জন শিশু-অপরাধী অভিযোগ করেছে যে, তারা মায়ের কাছ থেকে কোন যত্ন পায় নি।

শিশু-অপরাধীদের মধ্যে প্রায় সকলেই কোন প্রকারের নীতি, ধর্ম বা আদর্শ লাভ করে নি।

হে বীর কিশোর

(কিশোর রচনা)

শ্রীমান মঞ্জুল দাশগুপ্ত

মেদিনীপুরের প্রথম শহীদ
বীর শিশু ক্ষুদিরাম,
তোমার কাহিনী স্মরিয়া মোদের
শিহরিত হয় প্রাণ।
বাংলার ছেলে ওগো ক্ষুদিরাম
তুমি বিদ্রোহী বীর,
নত হয় নাই ব্রিটিশের কাছে
তব উন্নত শির।
বন্ধনহীন হে বীর কিশোর
তুমি চির দুর্জয়,
মুক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত সেনা,
তুমি চির নির্ভয়।
রক্তে তোমার ছিল যে অগ্নি,
হৃদয়ে অগ্নি ছিল;
তোমার জীবন দানেতে জনতা
নতুন জনম নিল।
প্রাণ দিয়ে গেলে হে বীর কিশোর
পরাধীন দেশ তরে,
এ কিশোর আজ দিতেছে প্রণাম
কিশোর-জনের 'পরে।

শহীদ ক্ষুদিরামের জন্মদিন, ১৮৮৯ সনের ৩রা ডিসেম্বর।

মনিয়া

ডাঃ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মহা বিপদেই পড়ে গেলাম। এর ওপর বেতো শরীর টেনে কোলকাতা গিয়ে মামলা করা। অথচ পরম বন্ধু করুণানিধানের শেষ কথাগুলি ভুলতে পারছিলাম না। তাই আমিও উইলের স্বপক্ষে সমস্ত মন দিয়ে লড়তে লাগলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও সুবিধাই কোরতে পারলাম না—মামলায় আমার হারই নিশ্চিত হয়ে দাঁড়ালো। কারণ আদালতে এই কথাটাই প্রধান হ'য়ে উঠলো যে—করুণানিধান বাংলার দার্শনিক, চিরকাল এই কোলকাতায় কাটালেন—তিনি হঠাৎ বিহারের এক অন্ত্যজ গ্রামে ঐ রকম বেহারী-নামে হাসপাতালের জন্য তাঁর সমস্ত টাকাকড়ি দিয়ে গেলেন—এটা কখনোই সুস্থ চিত্তে হ'তে পারে না। বিচারক আমায় জিজ্ঞাসা কোরলেন—"আপনি তো ও-দেশেরই মানুষ—আপনি এ-বিষয়ে কিছু নির্ভরযোগ্য বলতে পারেন?" আমি উত্তর দিলাম—"ধর্মাবতার। যদিও আমি এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনও প্রমাণই দিতে অক্ষম, তবু করুণানিধান যে উইল করবার সময়ে সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে ছিলেন তা আমি নিশ্চিত জানি।"

যাক্ আমার ও যুক্তি মামলায় টিকলো না। মামলা হারতেই বসেছিলাম। আরোগ্য-নিকেতন আর খোলা হোল না। জমি কেনার ব্যবস্থা কোরেছিলাম—সব বন্ধ কোরে দিলাম। মনটা খুব খারাপ হয়ে পড়লো। সামনের শুনানীতেই একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাবে মনে হলো। আমার কোলকাতার বাড়ীতেই তখন মাসখানেক ধরে আছি এই মামলার তদ্বিরে। করুণার বাড়ীর কাছেই ছিলো আমার বাড়ী—এবং আমাদের দুই পরিবারের প্রীতির বন্ধন যখন মামলার বিষে নষ্ট হয়ে গেলো, তখনও করুণার প্রথম নাত্নী রাণ্টু লুকিয়ে এক এক সময় আমার কাছে চলে আসতো। দাদুও যেমন ভালোবাসতেন তাকে—সেও তেমনই ভালোবাসতো দাদুকে। এখন দাদুর অভাবে আমার কাছে এসে তার অনেকটা সান্ত্বনা হতো। বাবার ভয়ে সামনে আসতে পারতো না—বাবা কাজে বেরিয়ে গেলে সে কখনও কখনও চলে আসতো আমার কাছে।

সেদিনও দুপুরে মনটা ঐ কারণেই খুব খারাপ হয়েছিলো—সামনেই নিশ্চিত হার। ভাবছিলাম করুণা যদি আরও একটু কিছু খুলে বলে যেতো—তাহলে গোড়াতেই সব পণ্ড হতো না। এই রকম নানান্ চিন্তায় ডুবে আছি এমন সময় চঞ্চল পায়ে রাণ্টু এসে আমার ঘরে ঢুকলো—পাঁচ মাস পরে দেখলাম ওকে—এর মধ্যেই বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। নীলাম্বরী শাড়ী পরে আর লম্বা বেণী ঝুলিয়ে ভারী সুন্দর লাগলো ফুটফুটে মেয়েটিকে। হেসে ঠাট্টা করলাম—"তুমি আবার এলে কি জন্য নাত্নী? তোমার দাদুর সমস্ত টাকাকড়ি আমি বেহারে নিয়ে পালাচ্ছি—তোমাকেও যদি নিয়ে পালাই তখন তোমার বাবা কাকা কি কোরবেন?"

রাণ্টু হেসে কাছে এসে বললো—"আহা দাদাজী যে কি বলেন! দাদামণিই তো চেয়েছিলেন যে আপনি এই হাসপাতালটি করেন। দেখুন না দাদাজী! আমার ক্লাসের মেয়েরাও বলে যে—আমার দাদামণি ভালো কাজের জন্য দান কোরলেন, আর আমার বাবা কাকা তাতে বাদ সাধচেন। আমাদের কি অভাবটা আছে? অথচ ওখানে শিশুদের অসুখ দেখবার কোন ব্যবস্থাই নেই।" আহা! রাণ্টু ঠিক দাদুর হৃদয়ই পেয়েছে। সস্নেহে ওর মাথায় হাত দিয়ে বললাম, "আচ্ছা রাণু—বেশ কথা! তুমি এখন ঠিক কোরে মনে ভেবে বলো তো—দাদু তোমাদের কখনোও গল্প কোরে বাড়ের কথা বলেন নি?—কিম্বা হাসপাতালের কথা?—কিম্বা মনুরামের কথা?"

রাণ্টু মাথা নেড়ে বললে—"না—তা কখনই বলেন নি! তবে তাতে কি হয়েছে? তাঁর নিজের টাকা তিনি যেখানে-ইচ্ছে—যা-ইচ্ছে কোরতে পারেন। এতে কার কি বলবার আছে? মা-মণিও তাই বলেন—বলেন 'ঠাকুর তো ছেলেদের যথেষ্ট দিয়ে গেছেন—তাঁর দান নিয়ে আবার টানাটানি কেন? কাকা তো ছেলেমানুষ, বাবা অন্ত

তলিয়ে বোঝেন না। বাবাকে নানান্ লোকে নানা কথা বুঝিয়ে এইটি করলো—জানেন দাদাজী ?"

আমি হতাশ হয়ে চুপ কোরে আবার ভাবতে লাগলাম। তারপর কি ভেবে বললাম,—"আচ্ছা নাত্নী! উনি অসুখের সময় আগে পরে কি-কি চিঠিপত্র পেয়েছিলেন আর লিখেছিলেন—তার কিছু খবর দিতে পারো ?" রাণ্টু একটু ভাবনায় পড়ে গেলো—খানিক পরে ছলছল চোখে বললো—"এইবার অসুখ কোরতেই দাদামণি আর কোনও চিঠিপত্র খুললেন না—বিলিতী চিঠিগুলোও না। বললেন —'আর কেন ? অনেক তো হলো।' কিন্তু···হ্যাঁ! তাড়াতাড়া চিঠির মধ্যে একটি তিন পয়সার পোষ্টকার্ড ওঁর চোখে পড়ে গিয়েছিলো, আমিই দাদামণিকে পড়ে শোনাই কার্ডটি, তারপর উনি নিজেও একবার চশমা লাগিয়ে কষ্ট কোরে পড়েন। কাঁচা হাতের বাংলা লেখা—কোথায় ভাগলপুরের একটি ছেলে জ্যাঠামি কোরে লিখেচে দাদুকে! প্রথম হ'তে মনে নেই—তবে একটা কথা বেশ মনে আছে—লিখেচে—'আপনার গুরুগম্ভীর লেখা এখন বুঝতে পারবো না—বড়ো হয়ে পারবো আশা রাখি। তবে আপনার গভীরতম অনুভূতি ও দৃঢ়তম বিশ্বাসটি কি যদি জানাতেন—তাহলে আমাদের জীবন গড়বার কাজে লাগে···!'—দাদামণিকে এই কথাটা পড়ে বলার পর নিজ হাতে চিঠিটা নিয়ে আবার পড়েছিলেন। চিঠি পড়া হলে কপালে হাত রেখে চুপ কোরে ভাবছিলেন। আমি তাঁকে ঠাট্টা কোরলাম—'দাদাভাই উত্তর দেবেন বুঝি একে ভাবছেন ?—বিলিতী ডাক সব পড়ে—' দাদু কিন্তু বাধা দিয়ে গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন—'দিতে পারবো কি দিদি ? —বড়ো শক্ত কথা জিজ্ঞাসা কোরেছে যে—!" বলে আবার ভাবতে লাগলেন।—পরদিন দাদু একটু ভালো ছিলেন। সকালে দেখি শুয়ে শুয়ে চিঠি লিখছেন। বললাম—'দাদু আমায় দিন—লিখে দিচ্চি—আপনি বলুন কাকে লিখচেন চিঠি ? দাদু বললেন, 'না এ আমি নিজের হাতেই লিখে দিই দিদি।—লিখচি সেই ভাগলপুরের ছেলেটিকে—আমার হাতের লেখাই ও চায় আসলে—খুসি হবে পেলে।' আমি তো অবাক—হঠাৎ দাদু আর সব দরকারী জিনিষ বাদ দিয়ে কোথাকার এক ছোকরাকে এতো বড়ো চিঠি এতো কষ্ট কোরে অসুস্থ শরীরে লিখছেন কেন ?—তারপর কখন চিঠি শেষ কোরে ফেলতে দিয়েছিলেন কিনা তা আমি ঠিক জানি না। স্কুলে যাবার সময়েও দাদুকে লিখতে দেখেছিলাম—ওঁর মুখ খুব গম্ভীর আর দুই চোখ ভাবময় হয়ে গিয়েছিলো!"—হঠাৎ আমি যেন নিবিড় অন্ধকারে একটু ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে পেলাম রাণ্টুর গল্পের ভেতরে। ব্যগ্রভাবে ওকে বললাম, "দিদি ভাই! তুই যদি সেই পোষ্টকার্ডখানি খুঁজে এনে আমায় দিতে পারিস—তাহলে হয়তো তোর দাদুর ইচ্ছা আমি পূর্ণ করতে পারি। নয়তো মনে হয়—কিছুই কোরতে পারবো না। বাঢ়ের শিশুরা বিনা চিকিৎসাতেই মরবে, আর তোমরা নতুন নতুন পোষাকে মোটরে চড়ে বেড়াবে।" রাণ্টু একটু হতভম্ব-মতো হয়ে গেছিলো—তারপর একটু সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "হয়তো সেটি আপনাকে এনে দিতে পারবো দাদাজী—কেননা মা দাদুর ঘরের কোনও জিনিষই সরাতে দেন নি!'

—এক ঘণ্টা পরেই রাণ্টু একটি পুরানো পোষ্টকার্ড নিয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে হাসিমুখে হাজির। পোষ্টকার্ড হ'তে ছেলেটির ঠিকানাটি ভালো কোরে টুকে নিলাম। সেই রাতেই ভাগলপুরে রওনা হয়ে গেলাম। সকালবেলা গলি খুঁজে নম্বর মিলিয়ে একটি বাড়ীতে দোরে করাঘাত কোরতে লাগলাম। একটি ষোলো সতেরো বছরের ছেলে এসে দোর খুলে দিলো। বললাম—"তোমার নাম কি অমিত কুমার সান্ন্যাল ?" সে বললে "হ্যাঁ।" ইতিমধ্যে ছেলেটির বাবা আমায় বসালেন মিনতি কোরে। তখন আমি অমিতকে করুণা-নিধানের চিঠির কথা জিজ্ঞাসা কোরতেই ও সগর্বে বললে, "হ্যাঁ তিনি আমায় খুব বড়ো চিঠি দিয়েছিলেন মারা যাবার আগে!—দেখবেন আপনি ?" বলেই ছুটে অমিত ওর পড়ার টেবিলের ড্রয়ার হ'তে সযত্নে রক্ষিত চিঠিখানি খাম-সমেত এনে আমার হাতে দিলো। খামের ওপরের ঠিকানাটি পর্যন্ত করুণা নিজ হাতে লিখেছিলেন—যাই হোক চিঠিখানি খুলে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতেই বুঝলাম কেল্লা ফতে। করুণার দান সার্থক হবেই—হবেই হাসপাতাল!—চায়ের তদারক হতে ফিরে এসে ছেলেটির বাবা আমার হাতে চিঠি দেখে বললেন, 'দেখুন না আমার ছেলের কাণ্ডটা। যতো বড়ো-বড়ো লোককে চিঠি লিখবে এটা-ওটা প্রশ্ন কোরে। তাঁরা প্রায়ই উত্তরও দেন দেখি

আর ওর তো মহাফুর্তি—'পরম যত্নে জমা কোরে রাখবে। —এ সবের কোনও মানে হয় মশাই?' আমি সহাস্যে বললাম, 'মশাই! আপাততঃ আপনার পুত্র আমার একটা মস্ত উপকার কোরেছে! ওকে আমি একবার কোলকাতা নিয়ে যেতে চাই—আবার ফিরিয়ে দেবো—ভয় নেই।" তাঁকে নিজের পরিচয় দিয়ে সব কথা বললাম।

—এতোক্ষণ আমি অবাক হয়ে লাল বাহাদুরের কাহিনী শুনছিলাম। উনি চুপ কোরতেই আমি বলে উঠলাম "তারপর?" তিনি বললেন, "তারপর আর কি? কোর্টে সেই চিঠি দেখালাম। করুণা-নিধানের হাতের লেখার সঙ্গে বিচারক সেটা মিলিয়ে নিলেন। অমিত কুমারের সাক্ষ্যও নেওয়া হলো। দুদিনেই রায় বার হয়ে গেলো।" আমি এবার বললাম, "সেই চিঠিখানায় কি ছিলো?" লাল বাহাদুর নীরবে তাঁর জেব হতে বার কোরে একখানি খাম আমার হাতে দিলেন। আমি খুলে পড়লাম। চিঠিটা এই:

"স্নেহাস্পদেষু—

তোমার ছোট পোষ্টকার্ডটী একটি শক্ত প্রশ্ন বহন কোরে এনেছে। এর উত্তর জোগাচ্ছিলো না। কিন্তু হঠাৎ ভগবৎ-কৃপায় উত্তর পেয়েছি। তাই লিখচি। অনেক কথার ভারে চাপা পড়ে গিয়েছিলো আমার জীবনের গভীরতম অনুভূতিটি, আর তার সঙ্গে আমার দৃঢ়তম বিশ্বাসটি—যা তোমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়লো।—

তখন আমার বয়স পাঁচ কি ছয় হবে। মনে পড়ে পেটের অসুখে ভুগতাম। সেবার পূজার ছুটিতে বাবা বললেন—বিহারে তাঁর এক বন্ধু বাঢ়ে ডাক্তার—সেখানে গিয়ে ছুটিটা থাকলে আমার শরীরটা সারতে পারে। তাই একদিন জিনিষপত্র গুছিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমার সে সব কথা আজ বেশ পরিষ্কার মনে পড়ছে। ভোরবেলা আমরা বাঢ়-ষ্টেশনে পৌঁছালাম। সেখানে বাবার বন্ধু অমরবাবুর বাসায় আমরা উঠলাম। চারিদিকে খোলামেলা—একটু শীত-শীত। একদিকে একটা মস্ত ভূট্টা-ক্ষেত। আমার খুব স্ফুর্তি লাগলো। কিন্তু কোলকাতা হ'তে গিয়ে এক ভারী মুস্কিল হলো—খেলার সঙ্গী পেলাম না। বাড়ীটা চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা—সুতরাং বাবার সঙ্গে বেড়িয়ে ফিরে এসেই মুখ বুঁজে বসে থাকতে হতো। অমরবাবু তখন বাঢ়ে একা থাকতেন, আর আমিও বাবার এক ছেলে। এইরকম মন-মরাভাবে ক'দিন কাটলো। তারপর একদিন আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তায় একটা লাল কাঠের গাড়ী নিয়ে, কয়েকজন গ্রামের গরীব ছেলে খুব হৈ-চৈ করচে দেখলাম। ওরা এক একজন গাড়ীতে বসচে আর বাকী সকলে ঠেলচে। কি আনন্দ যে করচে ওরা—আমার খুব ভালো লাগলো। আমি গেটের ভিতর হ'তে কিছুক্ষণ খেলা দেখলাম ওদের দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। তারপর আমারও বড্ড ইচ্ছা করতে লাগলো ওদের সঙ্গে খেলতে। ভয়ে ভয়ে বাবাকে বলতেই তো বাবা রেগে উঠলেন। মা কিন্তু বাবাকে বুঝিয়ে বললেন, "যাক্ না—খেলুক্ না একটু। একটু দৌড়োদৌড়ি করলে খোকনের হজমও হবে—মনের স্ফূর্তিতে শরীরও ভালো হবে।" আমি তো মহা আনন্দে গেট খুলে ছুটে ওদের কাছে বাইরে গেলাম। ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ওরা খেলা থামিয়ে আমায় অনিমেষ-নয়নে দেখতে লাগলো। তারপর ওদের মধ্য হতে একজন আমার কাছে এসে দেহাতী হিন্দীতে বললে, "চলো—গাড়ীতে বসবে চলো! আমরা তোমায় ঠেলবো।" আমি গিয়ে সেই গাড়ীতে বসলাম। গাড়ীটি একটি প্যাকিং-কেসে চারটি কাঠের চাকা লাগিয়ে তৈরী মাত্র—আর বাইরের কাঠের গায়ে লাল রং করা। আমার কিন্তু যা আনন্দ হলো! ওরা আমায় সেই কাঁচা ধূলার রাস্তায় খুব খানিকটা ঘোরালে। তারপরে আমিও খানিকটা গাড়ী ঠেললাম ওদের সঙ্গে।

ওদের মধ্যে ভারী বন্ধুত্ব হয়ে গেলো আমার গাড়ীর মালিক ছেলেটির সঙ্গে—যে আমায় প্রথমে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো। তার নাম মনিয়া। বেশ সুন্দর গোলগাল শ্যামল রঙের ছেলেটি! দাঁতগুলি কি ঝক্‌ঝকে সাদা, আর হাসলে গালে টোল পড়তো ওর। পরণে একটা ছোট্ট ময়লা টেনি মাত্র। সর্বাঙ্গে ধুলাবালি—তবু ওকে আমি প্রথম দেখেই যে কি ভালোবেসেছিলাম! বড্ড ভালো লাগতো মনিয়াকে। ওকে যেদিন প্রথম হাত ধরে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এলাম—মা দেখে বললেন—"ছাখো—ওরা কি বা খায়—কি বা পরে। তবু স্বাস্থ্য

দ্যাখো।—আর আমাদের খোকনকে দ্যাখো!" মনিয়াতে আমাতে খুব খেলা হতো—ও আমার সঙ্গে কখনও ঝগড়া করতো না। মা ওর হাতে কোনও একটা মিষ্টি দিতে গেলে কিন্তু মনিয়ার ভারী লজ্জা করতো। ও মুখ নীচু কোরে অস্পষ্টস্বরে বলতো, "ভূখ্ নেহি মাইজী!" তারপর ওর কাছে শেখা দেহাতী হিন্দীতে আমি যখন ওকে আদর কোরে পীড়াপীড়ি কোরতাম, তখন মনিয়া হাতের মিষ্টি খুশী মনে অল্প অল্প কোরে খেতো। তারপর আমায় একদিন ওদের ছোট্ট খাপরার ঘরে নিয়ে গিয়ে ওর মায়ের হাতের ভাজা ভূট্টার খই দিয়েছিলো। আমার তাই খেয়ে খুব পেটের অসুখ কোরেছিলো। খই খাওয়ার কথা বাবা-মাকে বলিনি—পাছে মনিয়াকে কিছু বলেন বা আমার তার সঙ্গে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। মলিন-বসনা, পরিশ্রমে ঘর্মাক্ত রুক্ষচুল মনিয়ার মার চেহারা আমার শিশু মনে যেন একটা বেদনার ছাপ এঁকে দিয়েছিলো। যাই হোক সেই হতে আমি আর ওদের ওখানে কিছুই খাইনি। মনিয়ার সঙ্গে আমার বড্ড ভাব হয়ে গেলো। গুলতি নিয়ে আমরা আমাদের বাড়ীর আশেপাশে ঘুরতাম, আর পাখী মারবার চেষ্টা কোরতাম। ইঁট জড়ো কোরে বাড়ী তৈরী কোরতাম। মাটি কেটে নালা তৈরী কোরে তাতে জল ঢেলে নদী-নদী খেলতাম। আরও কতো কি খেলা। আর রোজ বিকেলে গাড়ী নিয়ে খেলা তো ছিলোই! এমনি কোরে ভরা আনন্দে কাটতে লাগলো সেই পশ্চিমের শরতের সোনালী রৌদ্রে-ভরা স্বচ্ছ ঝকঝকে দিনগুলি। আমার শরীরও বেশ সেরে উঠলো। ক্রমে শরৎ শেষ হয়ে শীতের আমেজ এলো। আমার রাশীকৃত গরম কাপড়-চোপড় বার হলো। আমি মনিয়াকে জিজ্ঞাসা কোরলাম, "মন্নু তোর শীত করে না—এই ছাখ আমার কেমন ওভারকোট। তোর কিছু নেই?" মনিয়া অন্য দিকে চেয়ে বললে, "না!"—ও এরকম ধরণের সব প্রশ্নেই "না" বলতো। যদি বলি, "তোর বাড়ীতে কি খাস্ মন্নু? তোর পেঁড়া মেঠাই হালুয়া খেতে ভালো লাগে না?" ও অমনি বলতো, "না ওসব আমি খাই না—ভুট্টার খই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে, আর শীতকালে ভালো লাগে কাঁচা ছোলা পুড়িয়ে খেতে।"

যদি বলি—"তুই কি গায়ে দিস? তোষক বালিশে শুতে ভালো লাগে না?" ও অমনি বলতো—ও সবে ওর গরম হয়—ওদের গায়ে এতো জোর যে শীত করেই না! মনিয়ার বাবা যে মুটের কাজ করে—ওরা যে বড়ো গরীব—এসব জ্ঞান আমার তখন তেমন হয়নি।

যাইহোক শীত পড়াতে আমাকে বাবা মা খুব সাবধানে রাখতে লাগলেন। জুতা-মোজা না পরে বাইরে যেতে দিতেন না। তবু আমাদের দুজনের খেলাধূলা সমানে চলতে থাকলো।

তারপরে একদিন সন্ধ্যা হ'তে খুব ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হলো, আর দু তিন দিন একভাবে সেই থেকে থেকে প্রবল বর্ষণ আর অবিশ্রান্ত হাওয়ার ঝাপ্টা ফুঁশে বেড়াতে লাগলো। এই বিশ্রী আবহাওয়ায় আমার বেরুনো একেবারে বন্ধ হয়ে গেলো। শীতও খুব পড়লো। তারপর যেদিন একটু আকাশ ছাড়লো, বরফ-গলানো ঠাণ্ডা হাওয়া চলতে আরম্ভ করলো। আমি ভালো কোরে জামা টুপী এঁটে বাইরে রোদে দাঁড়িয়ে মনিয়ার খোঁজে এদিক ওদিক চাইছি—এমন সময় মনিয়ার বাবা অমরবাবুকে এসে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললে যে মনিয়া জ্বরে প্রায় বেহুঁশ। পরশু ভোর হতেই জ্বর এসেছে—তবে গত রাত থেকে জ্বরটা খুব বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে। চোখ লাল আর ভুল বকছে। অমরবাবু গিয়ে দেখে এলেন। বাবা মা ভেতরে ছিলেন—আমিও অমরবাবুর সঙ্গে চলে গেলাম ছুটে। দেখলাম ওদের সেই ছোট্ট অন্ধকার ঘরের কোণে একটা ঝুলেপড়া দড়ির খাটিয়ায় মনিয়া থলে পেতে শুয়ে আছে, আর গায়েও কয়েকটা থলে চাপা। থলেগুলো একটু ভিজে-ভিজেও মনে হলো। ওর চোখদুটো লাল আর মাঝে-মাঝে 'খোকাবাবু—খোকাবাবু!' বলে চেঁচিয়ে উঠছে। আমরা চোর-পুলিশ খেলবার সময়ে ও অমনি কোরে আমায় ডাকতো। আমি দরজার কাছে চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইলাম। অমরবাবু ওকে দেখে-শুনে গম্ভীরমুখে চলে এলেন। ভীত শুকনো মুখে মনিয়ার বাবাও পিছু-পিছু এলো। ডাক্তারবাবু একটা লাল ওষুধ কোরে তার হাতে দিলেন; বল্লেন—"শুকনো কাপড়-চোপড় দিয়ে ভালো কোরে ওকে ঢাকা দিয়ে রাখো—ঠাণ্ডা লেগেছে। একটু শেঁক-তাপ দিয়ো। একটু পরে বাবা বাইরে এসে বসতে ডাক্তারবাবু বললেন—"জানো

হে! মনিয়াটা বোধহয় আর বাঁচবে না—একেবারে দুটো 'লাংসে'ই নিমোনিয়া।" বাবা দুঃখিত হয়ে বললেন, "কোন উপায় হয় না অমর?" ডাক্তারবাবু বললেন, "এখানে থেকে আর কি বা চিকিৎসা হবে বলো ভাই? আর ওর বাপ সে সব ওষুধ-পত্রই বা কিনবে কোথা হতে? এক্ষুণি পাটনা নিয়ে গেলে হতে পারতো।—তবে তাই বা ওর বাপ বেচারী পারবে কি কোরে—আর হাসপাতালেও ওদের কেই বা গ্রাহ্য কোরবে?……এরা সব এই রকম কোরেই মরে।" বাবা চুপ কোরে রইলেন। আমার বুক ঠেলে কান্না উঠে এলো—ছুটে গিয়ে মার কাছে সব কথা বললাম, আর বলতে বলতে হু হু কোরে কেঁদে উঠলাম। মা ব্যস্ত হয়ে আমাকে কোলে বসিয়ে চোখের জল মোছাতে মোছাতে বললেন, "কাঁদে না সোনা! ভাবনা কি—ও ঠিক ভালো হয়ে যাবে—ওদের শক্ত হাড়। মনিয়া ঠিক সেরে উঠবে'খন!" আমি ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বললাম, "মাগো! ওর বিছানাপত্র কিছু নেই—এই শীতে—এতো জ্বরে ও ভিজে থলের ওপর শুয়ে আছে—বলো—এতে কি ওর কষ্ট হচ্ছে না? অসুখ এতে বাড়বে না ওর? আমার গা থেকে একটু লেপ সরে গেলে তুমি কি করো?" মা চুপ কোরে বসে উল বুনতে লাগলেন। পরে খাবার সময়ে মাতে বাবাতে কথা হলো। মা বললেন, "ওগো মনিয়ার অসুখ কি খুব বাড়াবাড়ি?

"হ্যাঁ, তাই তো অমর বলছে!" বাবা খেতে খেতে জবাব দিলেন।

"কোন উপায় হয় না?"

"কে করবে বলো? সব টাকার খেলা।"

"আহা! খোকনের বন্ধু—বড়ো ভালো ছেলেটা গো—বড্ড ভালোবাসে খোকন ওকে!—দ্যাখো না যদি পাটনায় নিয়ে গিয়ে কিছু হয়? কতোই বা লাগবে—এমন সুন্দর ছেলে বেঘোরে মরবে—গো?"

"লাগবে হয়তো এখন তেমন কিছু নয়!—তবে এসব কে করে? কুলীর কথায় তো কেউ কিছু কোরবে না!"

"সঙ্গে একজন তো গেলে হয় গো! ডাক্তারবাবু পারেন না?"

"অমরকে আমি কি কোরে বলি বলো তো? আর আমি এসব জায়গায় কাকেই—বা চিনি!"

"তোমরা দুজনে এখন গেলে হয় মনিয়াকে নিয়ে পাটনাতে। আহা বেচারী! কেই বা ওদের জন্য ভাবে?"

বাবা মা দুজনেই চুপ কোরে রইলেন। আমি জানলা দিয়ে মুখ বার কোরে ঝরঝর কোরে কাঁদতে লাগলাম—ভাবতে লাগলাম—এরা দুজনে কেন কিছু দেখছেন না—কেন এমন ভাবে মনিয়াকে কষ্ট দিচ্ছেন? ওর জন্য শুকনো কাপড়-চোপড় কি একটা বালিশও কি দিতে পারে না কেউ?

সেদিন রাতে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে আমি স্বপ্ন দেখলুম। মনিয়া এসে বলছে—'খোকাবাবু! আমি তোমাকে এতো ডাকচি—শুনছো না? আমার শীত করে, খিদে পায়, অসুখ হয়—কষ্ট হয়! এতোদিন তোমায় মিছে কথা বলেচি। দাও না তোমার গরম জামা একটা—এখন খুব শীতে কষ্ট পাচ্ছি, আর আমার খুব অসুখ করেছে—এ অসুখ ভালো হতে গেলে দামী ওষুধ চাই। আমার বাবুজী বলচে—সে সব এখানে নেই—পাটনায় আছে—বলচে আর বাবুজী আর মাইয়ার চোখে জল পড়চে। আমায় সেই ওষুধ আনিয়ে দাও না খোকাবাবু! তাহলে ভালো হয়ে যাই—আবার তোমার সঙ্গে খেলি—?" মনিয়ার সেই রুগ্ন করুণ মুখখানি আমার চোখের সামনে জ্বল জ্বল কোরতে লাগলো, আর আমি ঘুমের ঘোরেই গায়ের লেপখানি দুহাতে তুলে "মনু—মনু—!" বলে চেঁচিয়ে উঠে কেঁদে ফেললুম। ঘুম ভেঙ্গে গেলো—মা সারাগায়ে হাত বোলাতে বোলাতে আবার ভালো কোরে ঢাকা দিয়ে বললেন, "খোকনের বোধহয় পেট গরম হয়েছে—স্বপ্ন দেখেচে! মনিয়া ভালোই আছে মাণিক—ভেবো না! আজ গরম দুধ পাঠিয়েছিলাম ওর জন্য!"

—ভোর না হ'তে ওদিকে কান্নার রোল উঠলো।

আমাদের ছুটিও ফুরিয়েছিলো। কোলকাতা ফিরে এলাম। মনিয়ার মৃত্যুর পাঁচ সাতদিন পরেই আমরা রওনা হয়েছিলাম। ছোট্ট খাপরার ঘরখানির সামনে মনিয়ার বাবা মাথা নেড়া কোরে বসে আছে। তার পাশে সেই লাল গাড়ীটাও পড়ে আছে। আমায় দেখে কেঁদে ফেললো মনিয়ার বাপ—"বাবুয়া কেবল খোকাবাবু—খোকাবাবু বলে ডেকেছে।" ট্রেন ছেড়ে দিলে জানলা

দিয়েও আবার দেখতে পেলাম সেই নেড়া মাথা মটরু কুলীকে, আর মনিয়ার আদরের লাল গাড়ীটাকে!

আজ আমার মনের স্থির ধারণা যে এই কাহিনীর পেছনে আমার যে অনুভূতি—সেই হলো আমার বিশ্বাস—গভীরতম ও দৃঢ়তম—!" চিঠি পড়া শেষ কোরে বৃদ্ধের দিকে চাইলাম। লালবাহাদুর বললেন, "রাত হলো—শুয়ে পড়ুন—যা স্থির করেন কাল বলবেন।"

আমি বললাম, "না এথনই বলবো—আমি একাজ নিলাম!"

রূপকথার গল্প

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বসু

তুলতুলিদের ক্লাশে পড়ান সেদিন শেষ হয়ে গেছে। আর মিনিট পনের বাদেই স্কুল ছুটি হয়ে যাবে।

এমন সময়ে আকাশে কাল কাল মেঘ গোটাকতক এসে সারা আকাশটাকে অন্ধকার করে দিল। কড়কড় গড়গড় আওয়াজ করতে লাগল। তারপরই নেমে এল তর তর করে বৃষ্টি।

ক্লাশের মেয়েরা বসে বসে ভাবছে যে—যদি এই বৃষ্টি না ছাড়ে তা'হলে কি করে বাড়ী যাব! এমন সময়ে হঠাৎ তুলতুলি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—দিদিমণি, একটা গল্প বলুন না!

তুলতুলির কথা শুনে ক্লাশের সমস্ত মেয়েরা বায়না ধরে বসল—দিদিমণিকে গল্প বলতেই হবে।

দিদিমণি আর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে বল্লেন—আচ্ছা, বল্‌ছি শোনো! গল্পের নাম হ'ল—"রূপকথার গল্প"।

সূর্য্য আর চন্দ্র ছিল দুজনে ভাই আর বোন। আকাশের তারাগুলো তাদের ছেলেমেয়ে। সূর্য্যের ছেলেরা ছিল ভারি উজ্জ্বল আর গরম, কিন্তু চাঁদের ছেলেরা ছিল তেমনি ঠাণ্ডা আর স্নিগ্ধ। সূর্য্যের আর তার ছেলেদের প্রখর তেজে পৃথিবীতে কিছুই জন্মাতে পারত না।

চাঁদের খুব ইচ্ছে হল পৃথিবীতে প্রাণী জন্মান যায় কি ভাবে। যদি কিছুটা উত্তাপ কমান যায় তা'হলে সম্ভব। চাঁদ একদিন একটি ফন্দি এঁটে বসল।

একরাত্রে চাঁদ একটা আগুন জ্বালালো। আর সেই আগুনে যত অনিষ্টের গোড়া ঐ সূর্য্যের ছেলেগুলোকে ধরে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলল।

এই পোড়া ছেলেগুলোকে দিয়ে একটা সুন্দর থানা তৈরি করে নিল। তারই থানিকটা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সূর্য্যকে বললে—"ভাই,—খুব ভাল আলু পুড়িয়ে তোর জন্যে এনেছি—খুব মিষ্টি, খেয়ে দেখ খুব ভাল লাগবে।"

সূর্য্যের লোভ হ'ল, বল্লে—"বেশ বেশ, দাও আমাকে।" চাঁদ তথন সূর্য্যের ছেলে, পোড়াগুলো দিল, আর সূর্য্যও মিষ্টি আলু মনে করে খেয়ে ফেলল।

এদিকে ভোর হয়ে এল! চাঁদের ভয় হ'ল। এবার সূর্য্য সব জানতে পারবে। তাই সে নিজের ছেলেগুলোকে লুকিয়ে রেখে এল।

কিছুক্ষণ পরে যথন সূর্য্য দেখল যে—চাঁদের ছেলে আর ওর নিজের ছেলে কেউই আলো দিচ্চে না তথন চাঁদকে জিজ্ঞেস করলো—"বোন, তোর ছেলেরা কোথায়? এখনও আস্‌ছে না কেন?" চাঁদ উত্তর দিতে পারল না—কিন্তু কিন্তু করতে লাগলো। সূর্য্য চারিদিক খুঁজতে লাগল—কিন্তু কোথাও খুঁজে বের করতে পারল না। শেষে চাঁদকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। বেগতিক দেখে চাঁদ নিজের দোষ স্বীকার করে ফেললো।

সূর্য্য সমস্ত জানতে পেরে ভীষণ রেগে উঠল।—তবে রে—বলে একথানা ধারালো তরবারি নিয়ে ছুটলো চাঁদের দিকে। চাঁদ ও যত ছোটে—সূর্য্যও তত তার পিছনে ছোটে। শেষে সূর্য্য চাঁদকে ধরে একেবারে তরবারি দিয়ে দু-খানা করে ফেলল। চাঁদ কিন্তু দুভাগ হয়েও ছুটতে লাগলো।

সূর্য্য যথন সন্ধ্যে হলে বিদায় নেয়, তথন চাঁদ তার ছেলেগুলোকে লুকানো জায়গা থেকে বের করে আনে। এর ছেলেগুলো হচ্ছে তারা—যা আকাশে রাত্রে ঝিকমিক করে। সূর্য্যের ভয়ে আবার ভোরবেলায় চাঁদ তার ছেলেগুলোকে লুকিয়ে রেথে আসে। আজও চাঁদ তাই করে আস্‌ছে। সেইজন্যেই দিনের বেলায় আকাশে তারা দেখা যায় না। আর সূর্য্যকে একাই সারাদিন থাকতে হয়—সঙ্গে তার ছেলেপিলে থাকে না।

চাঁদের কাটা দাগটাই হচ্ছে সূর্য্যের তরবারির আঘাতের চিহ্ন। সময়ে সময়ে এই কাটা দাগ বা ঘা, সেরে যায় কিন্তু এমনিই ব্যবস্থা আছে যে, এই দাগ আবার মাঝে মাঝে বেড়ে উঠে।

এতে পৃথিবীর লোকেরা চাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা স্মরণ করে। এই জন্যই চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধি হয়—আর সূর্য্যের একইভাবে কিরণ পাওয়া যায়।

গল্প শেষ হতে দেখা গেল—বৃষ্টিও থেমে গিয়েছে, আর সমস্ত স্কুলও ছুটি হয়ে গিয়েছে।

দিদিমণি সকলকে বল্লেন—তোমরা আস্তে আস্তে করে যে যার বাড়ী চলে যাবে—কোথাও দাঁড়িয়ো না।

তুলতুলি আর তার বন্ধুরা স্কুল থেকে যে যার বাড়ী চলে এলো!

শিখগুরু তেগবাহাদুর

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মরণের ছায়া ফেলে ফেলে যেন দিবা হয় অবসান,
হৃদয়ের ঘট ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে বেদীতলে ;
হাজার হাজার অসহায় প্রাণী সঙ্কটে ম্রিয়মাণ,
উষ্ণ শোণিত ধমনীতে নাহি চলে।
অল্‌বোখারার গন্ধবিহীন
বনবীথিকায় বিহগ বিলীন ;
কত পলাতক জীবন মলিন
প্রতীকারহীন ক্ষণে!
মোগল বাহিনী ভীমভৈরবে মত্ত হয়েছে রণে।
তুষার-মৌলি কাশ্মীর আর পঞ্চনদের তীরে
রুধিরের স্রোত বয়ে যায় অবিরল।
মরমের গীতি থেমে আসে হেথা নারীর অশ্রুনীরে
ক্রন্দনধ্বনি করে মন চঞ্চল।
অযুত সৈন্য-তূর্য্য নিনাদে
শঙ্কিত সবে। সূর্য্য প্রভাতে
উদয়-তোরণে কেঁপে ওঠে যেন
মোগল-অত্যাচারে ;
মেঘ-জ্যোছনার তরী ডুবে যায় গগনের পারাবারে।

প্রজা-পুঞ্জের মহাদুর্য্যোগে শিখগুরুজীর কাছে
নিরুপায় হ'য়ে এলো ব্রাহ্মণগণ।
মাগিল শরণ দুঃস্বপনের অন্ধ তমসা মাঝে,
কহিল—'গুরুজি! বাঁচিব কতক্ষণ!
ধন আর মান গিয়াছে সকলি,
তুচ্ছ সে সব। ধরমেরে বলি—
কোন্ প্রাণে দিব,—সহিব কেমনে
—অপমান,—কহ তুমি?
কান পেতে শোনো কাঁদিতেছে আজ
মোদের জন্মভূমি—'
কহিলেন গুরু তেগবাহাদুর—'ক্রূর বাদশাহ জানি,
নিষ্ঠুর তার নির্য্যাতনের চাপে—
দিশাহারা সবে। রহে মৃন্ময়ী করাঘাত শিরে হানি ;
জানি মাতার বিলাপে সন্তান-পাপে
নিখিল ধরণী হয়েছে অধীর।
নিষ্পাপ সাধু আছে কোন্ বীর?
ডাক তারে,—যদি দেয় বলিদান
আপনার প্রাণ এবে,
ধর্ম্ম বাঁচাতে অত্যাচারের বেদনার কথা ভেবে,...
তবে হবে আশু উপশম হেথা মোগলের উপঘাত,
প্রতিশোধ নিতে লভিব শক্তি নব ;
কে আছে এমন সাধু দিবে প্রাণ করিয়া সিংহনাদ,
জনকল্যাণে তাহারে বরিয়া ল'ব।'
সবাকার আঁখি নত নির্ব্বাক,
তবুও গুরুজী দিতেছেন ডাক ;
কহেন—'এসো গো সাধু সজ্জন
ধর্ম্ম রক্ষা তরে,
ফুরাতে দিও না শুভ লগনেরে—' সহসা কোমল স্বরে,
কহিল বালক গোবিন্দ আসি—
'তুমি ছাড়া কেবা আছে—
নিষ্পাপ সাধু কাশ্মীর পাঞ্জাবে।
ফিরায়ে দিও না বিমুখ করিয়া যারা এলো তব কাছে
হাসিমুখে বলি আপনারে দিতে যাবে।
তুমি বিনা কার ধরমের ভার
শকতি আছে গো শিরে ধরিবার!—'
শুনিয়া এ কথা তনয়েরে বুকে
নিলেন গুরুজী টানি ;
কহিলেন তারে—'সংশয় মোর ঘুচায়েছে তোর বাণী—'

'—বুঝিলাম এবে—চলে গেলে আমি,মৃত্যুর মহারাত্রি—
স্বদেশের পথে দিবেনাক দেখা, জ্বলিবে জীবন বাতি।
আমার বিহনে র'বে যতদিন,
শিখেরা হবে না কভু গুরুহীন,
মরুর তৃষায় মৃগতৃষ্ণিকা
করিবে না দিশাহারা ;
ভাগ্য-গগনে রহিবে না মেঘ, উদিবে চন্দ্র তারা।
ধর্ম্মের জয় হবে নিশ্চয়, নাহি ক্ষয় ক্ষতি ভয়,
ঘরে ফিরে যাও দেশবাসিগণ! দেশ হবে দুর্জ্জয়!
চলিলাম তবে দিল্লীনগরে বলি দিতে মোর প্রাণ,
বিদায়ের ক্ষণে বন্ধু তোমরা!
গাও জীবনের গান—'

প্রতিভা-পরিচিতি

দুঃসাহসিক অভিযাত্রী রিচার্ড বার্টন্

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হজের দিনে মক্কা। পৃথিবীর চতুর্দ্দিক থেকে লাখ লাখ তীর্থযাত্রী দুঃসহ পথকষ্ট সহ্য ক'রে পরম-ঈপ্সিত স্থানে পৌঁছেচে। পবিত্র নগরে অগণিত মানুষের ভীড়ে পথ চলা দায়। প্রখর সূর্য্যকিরণে দিক-দিগন্ত যেন ঝল্‌সে যাচ্ছে। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তীর্থ-যাত্রীর দল কাবা-শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের প্রাণের আকুতি ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছে। সেই ভীড়ের মধ্যে সকল শ্রেণীর মুসলমান আছে। ধনকুবের আরব ব্যবসায়ীর পাশে দাঁড়িয়েছে তার দীনতম ভৃত্য, বাদশার প্রতিনিধির সঙ্গে গা-ঘেঁষে রয়েছে গাঁয়ের গরীব চাষী, এই পুণ্যতম প্রতিষ্ঠানের সামনে মানুষে মানুষে আজ পার্থক্য ভেদ নাই, সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার মুসলমান আজ একই পিতার সন্তান। সেই পরম পিতার কাছে সন্তানে সন্তানে ভেদ নেই।

এমনি দিনে কাবা-শরীফের চত্তরে একজন দীর্ঘাকৃতি পৌরুষ-ব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বসমন্বিত ভক্তকে দেখা গেল, ভিড় ঠেলে তিনি বেদীর দিকে তাঁর হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করতে এগিয়ে চলেছেন। অঙ্গে তাঁর দামী তীর্থ-যাত্রীর পরিচ্ছদ, তীক্ষ্ণ দুই চোখের দৃষ্টি, ঘন কালো গুম্ফ আর পাতলা দাড়ি তাঁর রৌদ্রদগ্ধ তাম্রাভ মুখ-মণ্ডলকে এক বিচিত্র রূপ দান করেছে। পবিত্র কালো পাথরের সামনে গিয়ে তিনি হাঁটুগেড়ে বসলেন, তারপর যেমন ক'রে ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান ভক্ত তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেন তেমনি ক'রে নিখুঁতভাবে তিনি তাঁর ধর্ম্মকর্ম্ম সমাপন করলেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন না মুসলমান। তিনি একজন ক্রিশ্চান, ইংরেজ! মুসলমানদের কাছে তিনি বিধর্ম্মী, কাফের! সেই বিধর্ম্মী ক্রিশ্চান মুসলমানদের পবিত্রতম তীর্থস্থানে পৌঁছে গোপনে ছদ্মবেশে তাঁদের ধর্ম্মকর্ম্মে অংশ গ্রহণ করলেন। তিনিই প্রথম ও শেষ বিধর্ম্মী যিনি এই চরম দুঃসাহসিক কাজ করতে পেরেছিলেন। সেই দেশের লোকের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল—মির্জ্জা আবদুল্লা অল্ বুশিরি। বহির্জগতে তাঁর নাম রিচার্ড ফ্রান্সিস বার্টন্।

রিচার্ড বার্টন্ যে কতখানি সাহসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আত্মবিশ্বাসী এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন তা তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের নানা সংঘাত-পূর্ণ পরিচ্ছেদে নানাভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর মক্কা-অভিযান বোধ করি সেই বর্ণাঢ্য জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা। সেই অভিযানে, মাসের পর মাস, তাঁর জীবনকে তিনি হাতের তালুর মধ্যে নিয়ে ফিরেছেন। একটিমাত্র পদস্খলন, একটি কথার ভুল উচ্চারণ, আচরণের সামান্যতম অসঙ্গতি যদি প্রকাশ পায়, ব্যস, তাহলেই আর দেখতে হবে না, প্রাণ যাবে অবধারিত! ভাগ্যবলে মক্কা-অভিযানে

এইরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করে বার্টন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন

তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মতো প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর ছদ্মভূমিকাটিকে জীবন্ত ক'রে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভ্রমণের নেশা, দুর্গম দেশে অভিযান, যে কাজে আছে দুঃসাহস আর প্রাণের-মায়া-ছেড়ে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত সেই সব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া—এমনি ধরণের অসাধারণ মনোবৃত্তি আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে রিচার্ড বারটন্ তাঁর জীবন আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর কাছে মক্কা-অভিযান আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এই অসম-সাহসিক ব্যাপারের জন্য তিনি অনেকদিন ধ'রে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন নিরলস অধ্যবসায় আর সাধনা নিয়ে। ভারতবর্ষে এক ইংরাজ সেনা-দলের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষই যেন ছিল তাঁর দেশ। মাতৃ-ভূমিতে মাঝে মাঝে ছুটিতে অবসর যাপন ক'রে এসেছেন শুধু।

তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, জীবনের একটি মুহূর্ত্তও তিনি বৃথা নষ্ট করেন নি। সকল সময় কাজে মগ্ন থেকেছেন তিনি। কর্ম্মের মধ্যে অবসর কা'কে বলে তা তাঁর জানা ছিল না। দৈনিক কাজের পর যে-সময় পেতেন তা যাপন করতেন লেখাপড়ায়। ভারতবর্ষে থাকাকালে তিনি তিরিশটি বিভিন্ন ভাষা শিখেছিলেন, ইতিহাসের বই পড়েছিলেন অজস্র, প্রাচ্যদেশের প্রাচীন সামাজিক ইতিবৃত্ত, রীতি-নীতি আর প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল যেমন বিস্তীর্ণ তেমনি গভীর।

ছদ্মবেশ ধারণেও তিনি ছিলেন পাকা ওস্তাদ। এই বিশেষ বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জ্জনে তাঁর চেহারা অনেকখানি সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। গায়ের রং ছিল তামাটে, দুই চোখ ছিল গভীর আয়ত এবং ঘনকালো, মুসলমান সওদাগর অথবা হিন্দু শেঠের বেশ পরিধান ক'রে যখন তিনি বাজারে ঘুরে বেড়াতেন তখন তাঁকে চেনা যেত না আদপেই। মক্কায় যাবার সাধ ছিল অনেকদিনের, তাই যখনই অবসর পেতেন তখনই বাজারে বাজারে ঘুরে তিনি মুসলিম তীর্থযাত্রীর গতিবিধি, মুসলমানদের আদব-কায়দা রীতি চাল-চলন এবং সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত চলতি কথা, গ্রাম্য শব্দ আর ধর্ম্মাচরণ সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করতেন, পাকা অভিনেতার মতো নিজের আচার-আচরণ কথাবার্ত্তা আর চলা-ফেরার মধ্যে তাদের রূপায়িত ক'রে তুলতেন।

অদ্ভুত অনন্যসাধারণ এবং বিচিত্র জীবন-যাপনের নেশায় মেতে উঠেছিলেন তিনি। সেই নেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ক্ষুরধার বুদ্ধি, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান। ১৮৫৩ সালের এপ্রিল মাসে সেনা-বিভাগ থেকে এক বছরের ছুটি নিয়ে তিনি প্রথমে গেলেন স্বদেশে। তারপর সেখানে আর-এক দফা নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিয়ে তিনি বেরুলেন তাঁর দুঃসাহসিক যাত্রায়, মেদিনা এবং মক্কা অভিমুখে। ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন এক পারস্য নাগরিকের। বহু দুর্গম পথ পার হোয়ে, দিন রাত্রির সর্ব্বক্ষণ সন্ত্রস্ত সচকিত অবস্থায় যাপন ক'রে প্রথমে পৌছোলেন মেদিনায়। গোপনে গোপনে সেখানকার ছবি এঁকে নিলেন, ডায়েরীতে লিখে নিলেন প্রতিদিনের ঘটনা, নানা খুঁটিনাটি বর্ণনা। তারপর সেখানকার পালা সাঙ্গ ক'রে দশদিন অবিরাম পথ চলার পর হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর সঙ্গে ঢুকলেন মক্কায়। ঢিপ্ ঢিপ্ করছে বুক, থেকে থেকে পা কাঁপছে! এগিয়ে গেলেন কাবা শরীফের দিকে। ধরা পড়লে রক্ষা নেই। কিন্তু আর পিছু ফেরবার উপায়ও নেই। পিছু ফিরলেই লোকে সন্দেহ করবে। কপাল ঠুকে মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁর সর্ব্বাঙ্গ উত্তেজনায় বার বার শিহরিত হচ্ছে। মিশে গেলেন ভীড়ের সঙ্গে। তারপর নিরাপদে ফিরে এলেন স্বদেশে!

উট-বাহিত পাল্কিতে ধনাঢ্য তীর্থযাত্রীরা মক্কার পথে চলেছেন

তাঁর এই অসম্ভব কাজ আর সাফল্যের সংবাদ যেন বিদ্যুতের মত চারিদিক ধাঁধিয়ে দিল। তেত্রিশ বছর বয়সে রিচার্ড ফ্রান্সিস বারটন্ জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে স্থান গ্রহণ করলেন। রাতারাতি তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল দেশ থেকে দেশান্তরে।

*　　*

১৮২১ সালের ১৯শে মার্চ্চ ইংলণ্ডের হার্টফোর্ড্শায়ারে জন্মগ্রহণ করে রিচার্ড বারটন বাল্যকাল অতিবাহিত করেন ফ্রান্স ও ইতালীতে। ছেলেবেলায় তাঁর দস্যিপনায় অভিভাবক থেকে মাষ্টার মশায়েরা সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্তেন। অল্প বয়সেই ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করেছিলেন বটে, কিন্তু স্কুল-কলেজের লেখাপড়ায় সুনাম লাভ করতে পারেন নি। অক্সফোর্ডের ট্রিনিটি কলেজ থেকে প্রায় একরকম বিতাড়িত হয়েছিলেন বললেই চলে।

যৌবনে পা দিয়ে রিচার্ড বার্‌টন নিজের ভবিষ্যত জীবন সম্বন্ধে অবহিত হলেন। চারিদিকে দেওয়াল আর সংকীর্ণ দেশের গণ্ডী। সেই গণ্ডী পার হ'য়ে সুদূর দিগন্তের পানে উধাও হোয়ে যাবার যে আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে দিন দিন প্রবলতর হয়ে উঠ্‌ছিল তারই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ১৮৪২ সালের জুন মাসে সেনাবিভাগে নাম লিখিয়ে ভারতবর্ষের উদ্দেশে পাড়ি দিলেন। তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ এক নতুন পথে প্রবাহিত হল! নিজের রুচি এবং খুসী অনুযায়ী পরিবেশ লাভ ক'রে তিনি প্রতিপদে প্রাণোচ্ছল কর্ম্মপ্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করতে লাগলেন। বোম্বাইএ সামরিক ও অসামরিক অনেকগুলি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। বহু দেশ ভ্রমণ করলেন এবং সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তগুলি একাধিক পুস্তকে সরস সুন্দর ভাষায় লিপিবদ্ধ করে সকলকে বিস্মিত ক'রে দিলেন। সেই সব কাহিনীর মধ্যে তিনি প্রাচ্যদেশের নর-নারীর মনস্তত্বকে এমন গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে অনুধাবন ও আলোকিত করবার পরিচয় দিয়ে গেছেন যার তুলনা অন্য কোন বিদেশীর লেখায় পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

রিচার্ড বার্‌টন কোনদিনই তাঁর কাজের দ্বারা জনসাধারণের সস্তা হাততালি পাবার প্রতি লোলুপ ছিলেন না। মক্কা-মেদিনার বিস্ময়কর অভিযান শেষ কোরে যখন তিনি বিলাতে পৌঁছলেন তখন চারিদিকে তাঁর নামে জয়ধ্বনি উঠেছে। অভূতপূর্ব্ব এক সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করা হয়েছে তাঁকে সম্মানিত করবার জন্যে। কিন্তু সেই সব আড়ম্বর আর সম্বর্দ্ধনাকে পাশ কাটিয়ে তিনি সোজা ফিরে এলেন সেনাবিভাগে, ভারতবর্ষে। কোন বড় কাজ করবার পর নিজেকে জাহির না করবার মতো মনের নির্লোভ প্রবৃত্তি সামান্য কথা নয়। চরিত্রের এই অসামান্য বৈশিষ্ট্য রিচার্ড বার্‌টনের জীবনকে এক বিশেষ মর্য্যাদা দান করেছে।

মুসাল্লা অল নবি। এই মসজিদে মহম্মদ প্রার্থনা করতেন। মক্কা-মেদিনা অভিযানকালে বার্‌টন ছদ্মবেশে এই মসজিদ পর্য্যবেক্ষণ করেন

* *

ভারতবর্ষে ফিরে এসে কিছুদিন শান্ত হয়ে রইলেন তিনি। তারপর আবার তাঁর অশান্ত মন দিক্‌বিদিকে ছুটে বেড়াবার জন্যে উন্মুখ হল, যে-দেশে কখনো কোন সভ্য-মানুষ যায়নি, সেই দেশ দেখবেন তিনি, যে-পথে পা বাড়াতে ভয় করেছে সবাই, সেই পথ মাড়িয়ে চলবেন তিনি, যে-আরণ্য জাতিকে কেউ বশ করতে পারেনি, তাদের বাগ মানাবেন তিনি। পৃথিবীর মানচিত্র দেখতে দেখতে পূর্ব্ব-আফ্রিকার প্রতি দৃষ্টি পড়ল। সোমালিল্যাণ্ড্! অজ্ঞাত, রহস্যময়, অনাবিষ্কৃত এক অসভ্য-দেশ। দেখতে হবে সেই দেশ, আলাপ করতে হবে সেই দেশের মানুষের সঙ্গে। কয়েকদিনের মধ্যেই তোড়জোড় সারা হল। তিনজন সহযাত্রী নিয়ে বার্‌টন রওনা হলেন নিরুদ্দেশের পথে।

বারবেরা বন্দরে বন্ধুদের অপেক্ষা করতে বলে বার্‌টন একাকী পূর্ব্ব আফ্রিকার অন্য একটি শহর অভিমুখে অগ্রসর হলেন। কাছেই ছিল এক রহস্যঘেরা জনপদ। তার নাম হারার। কোন বিদেশী ইতিপূর্ব্বে সে-দেশে ঢুকতে পারেনি। বার্‌টন স্থির করলেন, পথেই যখন পড়ল সেই অজানা অগম্য স্থান—তখন তার ভিতরটা একবার প্রদক্ষিণ ক'রে আসতে দোষ কি? জেনেশুনে এমন বেপরোয়াভাবে চরমতম বিপদের সামনে এগিয়ে যাবার যে দুর্জ্জয় সাহস দেখিয়েছিলেন তিনি—তা অতুলনীয় বলা যেতে পারে। একজন অভিনেতা যখন রাত্রিবেলা কয়েকঘণ্টার জন্যে অন্য এক মানুষের বেশ ও মূর্ত্তি ধারণ করে অভিনয় করেন তখন তাঁর সেই ছদ্মবেশ ও ছদ্মরূপের আমরা বাহবা দিই, তারিফ করি! কিন্তু বার্‌টন যে অভিনয় করেছিলেন, মাত্র কয়েকঘণ্টা সময় সে-জন্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। দিন রাত্রির সর্ব্বক্ষণ, চব্বিশ ঘণ্টা, দিনের পর দিন, কয়েক সপ্তাহ ধরে এক আরব সওদাগরের বেশ ও মূর্ত্তি ধারণ করে তিনি যে নিপুণ ও নিখুঁত অভিনয় করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ নটের কাছেও তা বিস্ময়ের বস্তু।

হারারের কাছাকাছি যখন পৌঁচেছেন তখন তাঁকে আটক করা হল। ছদ্মবেশ ধারণের জন্যে নয়, বলা হল, আরব সওদাগর হলেও তিনি একজন গুপ্তচর। মহা-মুস্কিলে পড়লেন তিনি। অবশেষে বিষম ক্রুদ্ধ হবার ভান

দেখিয়ে তিনি শিবিরে ঢুকে এক পত্র রচনা করলেন। পত্রখানি লিখছে যেন এক ইংরাজ এজেন্ট, সেই পত্রে আরব সওদাগরকে সেই দেশের সম্রাট প্রবল-প্রতাপ আমিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাল চিঠি। কিন্তু তিনি আরব সওদাগর, ইংরাজ এজেন্টের চিঠি তাই তারা সত্যি বলেই মনে করল। পত্রখানি গ্রেপ্তারকারী দারোগার হাতে দিয়ে বললেন—নিয়ে যাও তোমাদের বাদশার কাছে। তারপর মজা টের পাবে।

তাঁর বেপরোয়া ভাব আর কথা শুনে দারোগা ঘাবড়ে গেল। পত্র গেল যথাস্থানে। কিছুক্ষণ পরেই মহামান্য আমিরের কাছ থেকে ডাক এলো। বার্টন স্বপ্নেও বোধ করি ভাবেন নি যে তাঁর এত বড় ধাপ্পা

আফ্রিকার অরণ্য ভূমিতে হিংস্র আদিবাসী পরিবেষ্টিত বারটন। এক ভয়ংকর রক্তপিপাসু বন্যদলের নেতার সঙ্গে তাঁকে আলাপ করতে দেখা যাচ্ছে। পরে এই দল তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে।

এতখানি কার্য্যকরী হবে। কিন্তু ভয়ংকর এক সংকটকালে এমনি এক ভয়ংকর দুঃসাহসিক চালেরই প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীকালে তাঁর পত্নী স্বামীর যে প্রামাণ্য জীবনী লিখেছিলেন তার মধ্যে বার্টনের নিজের কথায় এই সাক্ষাৎকান্ডের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে। বারটন লিখেছেন—"দু'জন সশস্ত্র প্রহরী প্রথমে আমায় একটা প্রকাণ্ড হলঘরে নিয়ে গেল। লম্বা ঘরের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে বল্লমধারী বন্য সৈনিক। তাদের লাল লাল চোখগুলো দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। স্থানুর মতো তারা নিশ্চল। কিন্তু আদেশ পেলেই তারা যে তীরবেগে আমার দিকে ধেয়ে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঘাড় উঁচু করে আমি তাদের মধ্যিখান দিয়ে এগিয়ে চললাম। ভিতরকার জামার পকেটে ছিল একটি ছ'দমা পিস্তল। দরকার হলেই তার ব্যবহার করব এই ছিল পণ। যাই হোক, তার প্রয়োজন হল না। আমির সাহেব সহৃদয়তার সঙ্গেই আমায় অভ্যর্থনা জানালেন।"

অতঃপর দশদিন সেই রাজ্যে অতিবাহিত করে বারটন হারার পরিত্যাগ ক'রে বারবেরায় পৌঁছে তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। বহু বাধা বিঘ্ন আর বিপদ এড়িয়ে অভিযান সমাপ্ত ক'রে তাঁরা যখন দেশে ফিরলেন, তখন জনগণের যে বিপুল অভ্যর্থনা তাঁরা পেয়েছিলেন তা তখনকার দিনে অন্য কেউই বোধ করি পাননি।

* *

১৮৫৬ সালে বারটন তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরাট অভিযানের জন্য প্রস্তুত হলেন। অনেকদিনের পরিকল্পনা ছিল, মধ্য আফ্রিকার অজানা হ্রদগুলি পর্য্যবেক্ষণ করবেন এবং নাইল নদীর উৎসমুখ আবিষ্কার করবেন। পূর্ব্ব-অভিযানের সাথী স্পীক ও অন্য দু'জন সঙ্গী নিয়ে জুন মাসে বার্টন্ জান্‌জিবার থেকে গন্তব্যস্থান অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

পথে কয়েকবার বন্য জন্তুদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন, হিংস্র আদিবাসীরা বারবার তাঁদের তাঁবু আক্রমণ করলে। কয়েক বারই অতি অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেলেন তাঁরা। কিন্তু অদম্য বার্টনের উৎসাহ, দুর্জ্জয় তাঁর সাহস। মধ্য-আফ্রিকার বিশাল হ্রদ টাংগানাইকা যেদিন আবিষ্কার করলেন সেদিন প্রবল জ্বরে তাঁর সর্ব্ব শরীর পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই নবাবিষ্কৃত হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে নোট বইএ পাতার পর পাতা লিখলেন। শেষ পর্য্যন্ত শরীর এলিয়ে পড়ল। অসুস্থ হোয়ে বার্টন শয্যা নিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, টাংগানাইকা হ্রদই নাইল নদীর উৎস। কিন্তু তাঁর ধারণা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করলেন তাঁর সহযাত্রী স্পীক। অসুস্থ বার্টনকে তাঁবুতে রেখে স্পীক একাই আরও দূরান্তরে চলে গেলেন এবং আবিষ্কার করলেন পৃথিবীর বিরাটতম জল প্রপাত—ভিক্‌টোরিয়া নায়ান্‌জা, নাইল নদের প্রকৃত উৎস।

স্পীকের এই আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে বার্টনের একদল সমালোচক ও শত্রু রটনা করল যে সহযাত্রীর সাফল্যে বারটন তাঁর প্রতি দ্বেষান্বিত হয়েছেন। কেমন করে স্পীকের মনেও সে ধারণা জন্মেছিল তা বলা শক্ত, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সত্যিই বারটন এবং স্পীকের মধ্যে মনান্তর ঘটেছিল এবং বার্টনের আগেই স্পীক দেশে পৌঁছে বার্টনের বিরুদ্ধে যা-না-তাই বলে তাঁকে খাটো করবার চেষ্টা করেছিলেন।

তিন মাস পরে অসুস্থ শরীর নিয়ে বার্টন দেশে ফিরে দেখলেন, সমালোচকদের চক্রান্তে তাঁর এতদিনের সুনাম নষ্ট হ'তে বসেছে। তিনি দিশাহারা হলেন। সেই দারুণ দুঃসময়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁর হবু-পত্নী ইসাবেল আরুনডেল। আফ্রিকা অভিযানের পূর্ব্বে ইসাবেলের সঙ্গে বার্টনের পরিচয় হয় এবং প্রথম সাক্ষাতেই

পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু আরুনডেল-পরিবার এই বিবাহের ঘোরতর বিপক্ষে ছিলেন। তারপর বার্টনের বিরুদ্ধে যখন প্রখর সমালোচনার রব উঠ্‌ল তখন ইসাবেলের বাবা মা তো রীতিমত বেঁকে বসলেন। তাহলেও তাঁদের মিলনে কোন বাধাই শেষ পর্য্যন্ত টি কলো না। ১৮৬১ সালে তাঁদের বিবাহ হল।

বার্টনের যোগ্যা সহধর্ম্মিণী ছিলেন ইসাবেল। যেমন ছিল মনের জোর, আর তেমনি ছিল সাহস। সর্ব্বোপরি ছিল স্বামীর প্রতি তাঁর প্রাণঢালা ভালবাসা। কয়েক বৎসর পরে রাষ্ট্রের কাজে দামাস্কাসে কন্‌সালের পদ নিয়ে সেখানে গিয়ে কয়েক মাস অতিবাহিত করবার পর পুনরায় শত্রুদের চক্রান্তে বার্টন যখন দোষীর মতো দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন তখন ইসাবেল স্বামীর পক্ষ নিয়ে পররাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে দিনের পর দিন লড়াই ক'রে তাঁর সুনাম এবং পদমর্য্যাদা বজায় করেছিলেন ; শুধু তাই নয়, পররাষ্ট্র বিভাগকে সাধ্যরণ্যে স্বীকার করতে বাধ্য করিয়েছিলেন যে বার্টন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, ভুল বোঝার ফলে পররাষ্ট্র বিভাগ তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন।

কম বেশী আশিখানি বই লিখেছেন বারটন। তাদের মধ্যে "আরব্য-রজনী" সবচেয়ে নাম-করা বই। পৃথিবীময় এই বইখানির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। যদিও তাঁর সাহিত্য-কর্ম্ম আজো পর্য্যন্ত তার উপযুক্ত স্বীকৃতি এবং পুরস্কার লাভ করেনি তাহলেও সকল সমালোচকরাই বলেছেন, সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি কম ছিলেন না। ১৮৮৬ সালে তাঁকে নাইট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। তখন তিনি ট্রিয়েষ্টর কন্‌সালরূপে কাজ করছেন এবং চার বছর পরে ১৮৯০ সালের ২০শে অক্টোবর ট্রিয়েষ্টর কনসাল-পদে কর্ম্মরত অবস্থায় তিনি সেই দেশেই পরলোক গমন করেন।

ব্যঙ্গচিত্রীর তুলিকায় বার্টন

বন্‌

অধ্যাপক শ্রীরাধাভূষণ বসু

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পশ্চিম জার্ম্মেনীর "বন্" (Bonn) নামক সহরটী সকলের কাছে একরকম অপরিচিত ছিল বল্‌লেই হয় (তখনকার দিনে পৃথিবীর মানচিত্রে বন্‌এর পরিচিতি ছিল না—এমন কি জার্ম্মেনীর মানচিত্রেও বন্‌কে খুঁজে পাওয়া একটু শ্রমসাধ্য ব্যাপার ছিল। কিন্তু গত পাঁচ বছরে বন্‌এর মত অখ্যাত এবং ক্ষুদ্র সহরটীর নাম খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং এখন শুধু মানচিত্রে নয়, দৈনিক সংবাদপত্রেও বন্‌এর নাম প্রায়ই দেখা যায়। বন্ এখন বিশ্ববিখ্যাত স্থান বিশেষ—কারণ, এই বন্ হ'ল যুদ্ধোত্তর পশ্চিম জার্ম্মেনীর ফেডারেল্ রিপাবলিকের রাজধানী।

ইউরোপের বিখ্যাত রাইন্ নদীটীর জন্ম সুইজারল্যাণ্ডস্থিত আল্পস্ পর্ব্বত হ'তে। সুইস্-জার্ম্ম্যান্ সীমান্ত হ'তে আরম্ভ ক'রে এই নদীটী সমস্ত জার্ম্মেনীর দক্ষিণ হ'তে উত্তর পর্য্যন্ত প্রসারিত। রাইনের দুধারে সুদূরপ্রসারী শস্যশ্যামল কৃষিক্ষেত্র—মধ্যে মধ্যে শিল্প এবং বাণিজ্যপ্রধান সহরগুলি অবস্থিত। এক কথায় বল্‌তে গেলে রাইন্ হ'ল জার্ম্মেনীর কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের উৎস তথা প্রাণস্বরূপ। এ হেন রাইনের তীরে বন্ অবস্থিত। দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বন্ ছিল কৃষ্টি ও কলার কেন্দ্রস্বরূপ একটী গ্রামবিশেষ।

বন্‌এর এই আকস্মিক প্রসিদ্ধি সত্যিই বিস্ময়কর—তাই যুদ্ধোত্তর জার্ম্মেনীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণকালে এই শিশু রাজধানটী দেখার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না এবং শেষ পর্য্যন্ত ফ্রাঙ্কফুট থেকে কব্‌লেন্‌ৎস্ হ'য়ে নভেম্বরের এক অপরাহ্ণে বন্‌এ এসে পৌঁছালাম। ইউরোপে তখন বেশ শীত পড়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় শীতঋতুসুলভ বৃষ্টিও লেগে আছে। যথাসময়ে "ডয়েশ্ বুন্দেসবান্" (Deutsch Bundesbahn)

এর আধুনিকতম লাক্সারী কোচ্ হ'তে বন্ ষ্টেশনে নামলাম। এয়ার্ কণ্ডিশন্ করা কামরাতে বেশ আরামেই বসে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে আসছিলাম। গাড়ী হ'তে নেমে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলাম। ষ্টেশনটীর আকার এবং পরিবেশ দেখে মনটা আরও খারাপ হ'য়ে গেল। এই নাকি একটা রাজ্যের রাজধানীর একমাত্র রেলওয়ে ষ্টেশন! তার ওপর নাতিবৃহৎ প্ল্যাট ফরমের চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ বিচরণকারী আমেরিকান, বৃটিশ, ডাচ্ প্রভৃতি নানাদেশীয় Army of Occupationএর সৈন্য এবং তাদের ক্যান্টিন, বিশ্রামাগার প্রভৃতি দেখে বন্ সম্বন্ধে মনটা দ'মে গেল।

যাই হোক সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়—একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন। জার্ম্মেনীতে ভ্রমণকালীন পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা মত "ভোক্‌সব্যুরো (Valkes Bureau)র সন্ধানে লেগে যাওয়া গেল। এই ভোক্‌সবুরো প্রতিষ্ঠানটীকে ষ্টেট্ ট্যুরিষ্ট অফিস (State Tourist Office) বলা চলে। এগুলি জার্ম্মেনীর রেলওয়ে তথা গভর্নমেণ্ট দ্বারা পরিচালিত। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হ'ল সকলপ্রকার যাত্রীদের হোটেল অথবা অন্য কোনও থাকার স্থান ঠিক করা, রাস্তা-ঘাটের নির্দ্দেশ দেওয়া প্রভৃতি যাবতীয় সুখ-সুবিধা বিষয়ে সাহায্য করা। এক কথায় বল্‌তে গেলে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান যাত্রীদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য গাইড—বিশেষতঃ বিদেশী যাত্রীদের কাছে এবং এই রকম প্রতিষ্ঠানের কাছে যে কতপ্রকার সাহায্য পাওয়া যায় তা নিজের অভিজ্ঞতা না থাকলে সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। এখানে নানা ভাষাভাষী কর্ম্মচারী থাকেন—সুতরাং সেটী একটি মহাসুবিধা, বিশেষ ক'রে বিদেশীদের কাছে। জার্ম্মেনীর প্রায় প্রতি ষ্টেশনেই এই রকম ভোক্‌সবুরো আছে এবং এগুলি সাধারণতঃ প্ল্যাটফরমেরই এক অংশে অবস্থিত। ইতস্ততঃ খোঁজাখুঁজি ক'রে ভোক্‌সবুরোর হদিশ পেলাম না—মনটা আরও খারাপ লাগল। সঙ্গে গৃহিণী আছেন—আমরা কেউই জার্ম্মান্ ভাষায় বর্ণ পরিচয় পর্য্যন্তও জানিনে—চিন্তার কারণ নিঃসন্দেহ। সাহসে ভর ক'রে ইংরাজীতে এবং অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে ষ্টেশনের একজনকে ভোকসব্যুরো আছে কি না এবং থাকলে কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল যে ভোক্‌সব্যুরোটী ষ্টেশন হ'তে কিছু দূরে অবস্থিত—আশ্বস্ত হওয়া গেল। মালপত্র নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে প্রায় দু'রশি পথ যাওয়ার পরে ভোক্‌সব্যুরোটী আবিষ্কার করা গেল। জার্ম্মেনীর অন্যান্য সহরের তুলনায় এটী নিতান্ত পকেট সংস্করণ ব'লে মনে হ'ল। তা ছাড়া, সবে খোলা হ'য়েছে ব'লে তখনও গুছিয়ে বসতে পারেনি। যাই হোক্ "ইংলিশ স্পিকিং" কেহ আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করাতে একটী জার্ম্মান্ তরুণী মিষ্টি হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা ক'রে এগিয়ে এলেন। আলাপে বুঝলাম বন্ এ ভ্রমণবিলাসীদের জন্যে উপযুক্ত আয়োজন তখনও করা সম্ভবপর হয়নি। এ রকম অবস্থার প্রধান কারণ হ'ল স্থানাভাব। ইতিপূর্ব্বে বন্ এ নামমাত্র ভ্রমণকারীরা যেতেন ব'লে হোটেলের সংখ্যা ছিল একেবারে নগণ্য। বন্ এর প্রাধান্য ইদানীং বাড়তে থাকলেও যথেষ্টসংখ্যক এবং ভাল হোটেল তখনও স্থাপিত হয়নি। সাধারণতঃ ভ্রমণকারীরা স্থানীয় লোকেদের বাড়ীতে পেয়িং-গেষ্ট্ ভাবে থাকেন। অবশ্য জার্ম্মেনীর অন্যান্য সহরেও এই পেয়িং-গেষ্টের ব্যবস্থা আছে এবং আমরাও ফ্রাংফুর্ট ও কব্‌লেন্‌ৎস্‌এ জার্ম্মান্ পরিবারে পেয়িং-গেষ্ট্ ছিলাম। এ ব্যবস্থা বিদেশী ভ্রমণকারীর পক্ষে ভাল, কারণ তাতে ভাষাজনিত অসুবিধা থাকলেও স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয় মেলে—তাদের রীতি-নীতি সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞানলাভ হয়। আর খাওয়া-দাওয়া, আরাম প্রভৃতির দিক থেকেও স্বাচ্ছন্দ্য এবং আন্তরিকতার অভাব হয় না। খবর নিয়ে জানা গেল বন্‌এ পেয়িং-গেষ্টের তালিকা তখন পূর্ণ, সুতরাং আমাদের স্থান হওয়া অসম্ভব। অনেক খুঁজে ভোক্‌সব্যুরোর তরুণী কর্ম্মচারী শ্রীমতী সিরকি (Zierxie) সম্প্রতি খোলা হয়েছে এমন একটী হোটেলে আমাদের জন্যে একটা ঘর ঠিক ক'রে দিলেন। যাই হোক্ একটা আশ্রয় মিল্‌ল শেষ পর্য্যন্ত ভোক্‌সবুরোর সাহায্যে। শ্রীমতী সির্‌কিকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জানালাম এবং তাঁর কাছ হ'তে বন্ এর দ্রষ্টব্য স্থান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে, রাস্তার ম্যাপ্ নিয়ে হোটেলে আসা গেল।

হোটেলটি আট-দশ দিন মাত্র খোলা হয়েছে—তখনও তার সাজসজ্জা চলেছে—বাড়ীটি বেশ পুরানো মনে হ'ল। রাত্রি হ'য়ে গেছে—বাইরের আবহাওয়া অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্যকর। অল্প, অল্প বৃষ্টি, কুয়াশা এবং ঠাণ্ডা মিলে পরিবেশটী ভ্রমণপিপাসুর পক্ষে মোটেই সুখের নয়। রাস্তা প্রায় জনবিরল—বাইরে যেতে মন চাইল না—ঘরেও থাকতে ভাল লাগছিল না। শেষ পর্য্যন্ত নীচে লাউঞ্জ (Lounge) তথা ডাইনিং রুম্ (Dining Room)এ এসে বসলাম—কিছু আহারাদি এবং সময় কাটাবার চেষ্টায়। খাবারের "মেনু" দেখে হতাশ হ'তে হ'ল—সংখ্যায় অল্প হ'লেও তাদের বর্ণনা একেবারে বিশুদ্ধ জার্ম্মান্ ভাষায়। তার এক বর্ণও বুঝলাম না। হোটেলের বয় তথা মালিক বেচারা আকারৈঃ ইঙ্গিতৈঃ কত কি বোঝাতে চেষ্টা করল—আমিও অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে প্রত্যুত্তর দিয়ে যেতে লাগলাম, কিন্তু এত কসরৎ করেও যে তিমিরে সেই তিমিরে। ফ্রাঙ্ক ফুর্ট, কোলন্ প্রভৃতি স্থানের হোটেলে "লিত্‌ল্ ইংলিশ" জানা কেউ না কেউ এই রকম অসহায় অবস্থা হ'তে উদ্ধার করেছেন, কিন্তু বন্ এ মনে হ'ল সে আশা নেই। আমাদের অবস্থা দেখে হোটেলে উপস্থিত দু-চার জনের দৃষ্টি দেখলাম আমাদের দিকেই নিবদ্ধ। আরও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি নিঃসন্দেহ। হঠাৎ দেখি এক কোনে খবরের কাগজ পাঠরতা এক মহিলা এগিয়ে এসে ইংরাজীতে বল্‌লেন "আমি কি আপনাদের সাহায্য করতে পারি?" শুনে প্রায় চমকিত—মনটাও নিশ্চিন্ত আনন্দে ভ'রে গেল। যাক্ একেবারে অসহায় নই তাহ'লে। ভদ্রমহিলা আবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বললেন, ("Believe, you are from India")? তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম যে তাঁর অনুমান যথার্থ এবং আমাদের টেবিলে আহ্বান ক'রে তাঁকে দোভাষীর কাজে লাগালাম। ভদ্রমহিলা জার্ম্মান্—নাম ফ্রাউ শেরিং (Schering)—থাকেন হামবুর্গে ছেলের কাছে—বন্ এ এসেছিলেন বিষয়-সংক্রান্ত কাজে সরকারী দপ্তরে—ফিরে যাবেন পরদিন ভোরে। হামবুর্গে ছেলে ইউনিভারসিটির লেক্‌চারার্। আমাদের ভ্রমণ তালিকার মধ্যে হামবুর্গ

আছে জেনে খুব খুশী হ'লেন এবং তাঁর ঠিকানা দিয়ে নিমন্ত্রণ জানালেন। ফ্রাউ শেরিং দেখলাম ইংরাজী বেশ ভালই জানেন এবং তাঁর সঙ্গে যুদ্ধোত্তর জার্ম্মেনী সম্বন্ধে বহু আলোচনা হ'ল। কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম যুদ্ধ বিধ্বস্ত জার্ম্মেনীর এত শীঘ্র কি ক'রে আবার স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পাওয়া সম্ভবপর হ'ল। কারণ পশ্চিম জার্ম্মেনীর যেখানেই গিয়েছি কোথাও কাকেও খাওয়া পরার অভাব বোধ করছে বলে মনে হ'ল না। সকলেরই স্বাস্থ্য বেশ ভাল এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করে—অনশনক্লিষ্ট চেহারা ত দেখলাম না! পোষাক-পরিচ্ছদও বেশ দামী এবং রুচি-সম্পন্ন। একমাত্র বোমা-বিধ্বস্ত বাড়ী-ঘর এবং বিজয়ী বিদেশী সৈন্যবাহিনীর অবস্থিতি ভিন্ন দেখে মনে হয় না যে এই দেশে মাত্র কয়েক বছর পূর্ব্বে এত বড় যুদ্ধ হ'য়ে গেছে। ফ্রাউ উত্তর করলেন, "আমরা জার্ম্মান্—ভাবপ্রবণতা আমাদের মধ্যে খুব কম—বরং যা সত্য, যা বাস্তব তাকে মেনে নিতে আমরা অভ্যস্ত। আমরা ভুলে যাইনে যে আমরা পরাজিত জাতি এবং আমাদের আবার উঠ্‌তে হবে—স্বীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে। তা'র জন্যে আমাদের কাজ ক'রে যেতে হবে—জার্ম্মান্ জাতি কাজ ছাড়া বাঁচে না—পরাজয়ের গ্লানি কাজ করার এই সহজাত বিশেষত্বকে আরও বড় এবং প্রধান করেছে। সুতরাং প্রত্যেক সুস্থ, সবল জার্ম্মান্ নর-নারী নিজ নিজ ক্ষমতা মত কাজ করে চলেছে—তা'র পুরস্কার ত আছে! তাছাড়া ভাল পোষাক-পরিচ্ছদের একটা বিশেষ কারণ আছে—সেটি হল, মাত্র পঁচিশ বছর সময়ের মধ্যে উপর্য্যুপরি দুটো ভীষণ যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পরে ভবিষ্যতের নিরাপত্তা সম্বন্ধে জার্ম্মানরা কোনও আশা রাখে না। আপনি শুনে আশ্চর্য্য হবেন, যে কোনও জার্ম্মান্‌কে আপনি জিজ্ঞাসা করুন—তা'র সঞ্চয় ব'লে কিছু আছে কিনা—উত্তর পাবেন, সঞ্চয় ক'রে কি হবে—কাল কি হবে আপনি নিশ্চয় করে বল্‌তে পারেন কি? এই মনোভাব জার্ম্মান্ নর-নারীর মধ্যে খুব প্রবল এবং সাধারণ—সেই জন্যে তা'রা যা উপায় করে তা সবই খেয়ে, প'রে উড়িয়ে দেয়। খাওয়া-পরার অভাব এখন নেই বটে কিন্তু ঘর-বাড়ীর অবস্থা খুবই খারাপ। গৃহ-হীন মানুষ ত যাযাবরের সমান।"

ভদ্রমহিলার কথায় যুক্তি আছে নিঃসন্দেহ। কথায় কথায় রাত অনেক হ'ল—ভদ্রমহিলা পরের দিন ভোরে ট্রেণ ধরবেন হামবুর্গ অভিমুখে—আমরাও কিছু ক্লান্ত ছিলাম। ফ্রাইশেরিংকে "শুভ রাত্রি", ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। তিনি হামবুর্গে তাঁর বাড়ী যাওয়ার কথা বার বার করে বললেন। ভদ্রমহিলার অযাচিত ব্যবহার, সৌহার্দ্দ-পূর্ণ কথাবার্ত্তা জার্ম্মান্ জাতির প্রতি শ্রদ্ধা আনে। ভ্রমণপিপাসুদের পক্ষে বিদেশে এই রকম পথে বা পান্থশালায় ভিন্ন স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে মেশার বড় একটা সুবিধা হয়না এবং এইভাবে আলাপ-আলোচনার মধ্যে সেই দেশ বা জাতির সম্বন্ধে অনেক কিছু মনের মধ্যে রেখাপাত করে।

পরদিন সকালে বিশুদ্ধ জার্ম্মান্ প্রাতঃরাশের পরে সহর দেখ্‌তে যাওয়া গেল। সাধারণতঃ সহর বল্‌তে যা বুঝায় সে তুলনায় বন্‌কে আমাদের দেশের কোনও মফঃস্বল সহর বলা চলে। রাজধানীর দৃষ্টি-পাতে বন্‌কে হোমিওপ্যাথিক ডোজের রাজধানী বলা চলে। উল্লেখ-যোগ্য দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে নতুন "বুন্দেস্ হাউস্" (Bundes Houes) অথবা লোক-সভা, বিঠোফেন্ হাউস্, মুন্‌ষ্টার্ (Munster) বা একটী প্রাচীন গীর্জ্জা, বন্ বিশ্ববিদ্যালয়, একটী ছোট মিউজিয়ম্ এবং টাউন হল ও তা'র সামনের উন্মুক্ত আকাশের নীচে বাজার (Open Air Market)।

সহরের কৌলিন্য না থাকলেও বন্ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর। বন্‌এর চারিদিকে রাইনের ধারে ধারে ফুলবাগানের সমাবেশ, নানা প্রকার গাছ-পালা, পাখীদের কল-কূজন দেখে মনে হয় প্রকৃতি দেবী যেন বন্‌এর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। আবার রাইনের ওপারেনদীর ধার দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে পর পর কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়। দু ধারে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য—মাঝখানে ব'য়ে চলেছে রাইন আপন স্বচ্ছন্দ গতিতে—চারিদিকে অসংখ্য ছোট, ছোট ভিলা—সব মিলিয়ে স্থানটী কবিজনোচিত মনে হয়। সেই জন্যেই অমর কবি গ্যেটে (Goethe) এবং বায়রণ (Byron) বন্‌এর প্রাকৃতিক শোভার উচ্ছসিত প্রশংসাগান ক'রে গেছেন। সেই জন্যেই বোধহয় বিখ্যাত জার্ম্মান্ সুরস্রষ্টা বিঠোফেন্ (Beethoven) বন্‌এ জন্মেছিলেন এবং তাঁ'র জীবনের কর্ম্মমুখর দিনগুলি কাটিয়েছিলেন বন্‌এ। যা'র জন্যে বন্‌এর "বিঠোফেন্ হাউস্" এখনও নানাদেশ হ'তে বহু সঙ্গীতরসজ্ঞকে আকৃষ্ট করে। বন্‌এর বিশ্ববিদ্যালয় এবং গীর্জ্জাটী বেশ প্রাচীন এবং নাম করা। সমস্তদিক দিয়ে বন্‌কে আমাদের শান্তি-নিকেতনের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

ছায়া-ঘেরা শান্তিরনীড় এই ছোট সহরটী কৃষ্টি-কলার দিক্ দিয়ে বিখ্যাত হ'লেও মাত্র কয়েক বছর আগেও কেউ ভাব্‌তে পারেনি যে এটী অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রসিদ্ধি লাভ করবে। বন্‌এ নতুন রাজধানী স্থাপন করা যেমন বিস্ময়কর তেমনই আকস্মিক। কারণ কেউ ভাব্‌তে পারেনি যে বন্ রাজধানীর পক্ষে উপযুক্ত। এ বিষয়ে অবশ্য অনেক জার্ম্মান্ নরনারীকে প্রশ্ন করেছি—তাঁদের মধ্যে অনেকে ব্যবসায়ী, শিক্ষাব্রতী, দু-একজন রাজকর্ম্মচারীও ছিলেন। তাঁরা যে কারণ এ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন তা হয়তো কিছুটা ঠিক—সে সম্বন্ধে পরে বলছি। কিন্তু বন্‌এ রাজধানী স্থাপন যে আকস্মিক সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই—কারণ এই নতুন রাজধানী স্থাপনের পিছনে কোনও প্রস্তুতি ছিল না। রাজধানীর উপযুক্ত ঘর-বাড়ী পার্লামেণ্ট-হাউস প্রভৃতির জন্যে উপযুক্ত বাড়ী প্রভৃতি বন্‌এ সর্ব্বনিম্নতম প্রয়োজনেরও কম ছিল এবং যা ছিল বা এখনও আছে তা' অতি সাধারণ—তা'তে একটা রাজধানীর কাজ চলে না। তাই বন্‌এ অবস্থিত পশ্চিম জার্ম্মেনীর বুন্দেস্ হাউস্ অর্থাৎ লোক-সভা যে বাড়ীতে অবস্থিত সেটী তিন-চার বছর পূর্ব্বে এক স্কুল বাড়ী এবং তা'র সংলগ্ন জিম্‌নসিয়মের স্থান ছিল। তা'রই চতুর্দ্দিকে এবং উপরে এখন সুবৃহৎ আধুনিকতম বুন্দেস্ হাউস্ তৈরী করা হ'লেও মূল স্কুল বাড়ীটী ঠিকই আছে। গত তিন-চার বছরে কিছু কিছু নতুন বাড়ী তৈরী হ'লেও প্রয়োজনের তুলনায় তা এখনও অতি সামান্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে বিদেশী রাজদূত এবং

বিদেশী কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের আবাসস্থল সকল দেশেই রাজধানীতে অবস্থিত থাকে। কিন্তু পশ্চিম জার্ম্মেনীতে নিযুক্ত বিদেশী প্রতিনিধিরা সে সুবিধা পাননি। তাঁদের মধ্যে মাত্র দু-চারজন ভাগ্যবান্ ব্যতীত আর সকলেই থাকেন—কেউবা আট-দশ মাইল দূরে অন্য গ্রাম বা ছোট সহরে, কেউ বা আবার বিশ মাইল দূরে কোল্‌ন্ (Koln)এও থাকেন। তাঁদের সরকারী অফিসটুকু কেবল বন্‌এর এলাকায় অবস্থিত। আমাদের অফিস হ'ল বন্‌এ বুন্দেস্ হাউসের সন্নিকটে, কিন্তু তিনি থাকেন কোল্‌ন্‌এ। রাজদুত বেচারীকে প্রত্যহ রাজদূতাবাস হ'তে বন্‌এ যাতায়াত করতে হয় মোটরে। চল্লিশ মাইল প্রত্যহ মোটরে যাতায়াত করা খুব সুখের মনে হয় না—বিশেষ করে শীতকালের চার-পাঁচ মাস।

বন্‌এ রাজধানী স্থাপন সম্বন্ধে পশ্চিম জার্ম্মেনীতে যাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিল তাঁদের মতে পঁচিশ বছরের মধ্যে দুটী ভীষণ যুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্ম্মান্ জাতির এখন দীর্ঘকাল স্থায়ী শান্তির প্রয়োজন। তাই বোধহয় নতুন ফেডারেল্ রিপাবলিকের কর্ত্তারা যে কোনও সমৃদ্ধ সহর অপেক্ষা শান্তির পরিবেশপূর্ণ কোনও অখ্যাতনামা স্থানেই রাজধানী স্থাপন করতে ইচ্ছা করেছিলেন, যেখানকার পরিবেশ সমরোপকরণ বা যুদ্ধের প্রস্তুতির পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। সেদিক দিয়ে অবশ্য বন্ উপযুক্ত স্থান নিঃসন্দেহ, কারণ বন্‌এ একটী ফ্যাক্টরীও নেই। হয়তো এ কথা ঠিক—হয়তো বন্‌এর রাজধানী জার্ম্মেনীর দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তির পক্ষে অনুকূল। কিন্তু গত দু-তিন বছরের দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল পটভূমিকায় পশ্চিম জার্ম্মেনীর স্থান এত প্রধান হ'য়ে উঠেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও উঠবে যে মনে হয় শান্তি জার্ম্মান্ জাতির অদৃষ্টে নেই। ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্, আর একটী মহাসমরে জার্ম্মেনীকে জড়িয়ে পড়তে হবেই এবং তখন শান্তির নীড় এই বন্‌ই দ্বিতীয় বার্লিনে পরিণত হবে।

গোধূলি অনুরাগ

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মিত্র

দিবসের শেষক্ষণে বসে আছি,
বসে আছি
প্রান্তরের প্রান্ত সীমা ভূমি,
পশ্চিমের দিকচক্রবালে
সূর্য্য ডোবে
ধীরে ধীরে অলস মন্থর গতি—
নাহি তেজ, নাহি রশ্মি,
কর্ম অবসানে
ক্লান্ত আঁখি, শ্রান্ত রূপ তার,
ধীরে ধীরে অস্ত যায়
পশ্চিম অচলে,
যাবার বেলায়
শুধু তার শেষ বাণীটুকু
দিয়ে যায় ধরণীরে—
যেতে হবে, যেতে হবে
একদিন যেতে হবে ওরে।
আমি হেথা প্রান্তরের বুকে
জেগে দেখি
অবসন্ন বিদায়ের রূপ ;
সমাপ্তির শেষ মর্মবাণী
শুনি কানে কানে
অলস হৃদয়ে, নিঃসঙ্গ, একাকী,
দীর্ঘশ্বাস ভেঙে আসে
অন্তরের রুদ্ধ স্থল হতে—
যেতে হবে, যেতে হবে :
চিরন্তন বাণী
বারবার দেয় ডাক
জীর্ণ দীর্ণ প্রাণে,
সহসা গগন ভরি
মুঠো মুঠো রাঙা রঙ
ঝিকিমিকি করে ;
গোধূলির রাঙা রঙ,
মনে হয় হোল বুঝি
জীবনের নবসূত্র পাত !
জীবনের সীমারেখা শেষে,
ব্যক্ত হোল অভাবিত রূপ
জীবনের শেষে নাহি 'শেষ',
নাহি আঁকা সীমারেখা তার,
সমাপ্তির শেষ বাণী
আনে শুধু আরম্ভের সুর,
জীবনের আরো কিছু—
কিছু থাকে বাকী ;
আরো কিছু রয় অবশেষ,
আমার গোধূলি ক্ষণও
হোল রাঙা
গোধূলির রাগে, অনুরাগে,
আমার হৃদয় রুদ্ধ দ্বারে
দিল করাঘাত, দিল সাড়া
নবীনার নকতম রূপ,
আনিল সে বাণী অনুপম :
শেষ নাহি, শেষ নাহি—
জীবনের শেষ কিছু নাহি।

মেয়েদের কথা

নারী ও স্ত্রীশিক্ষা

শ্রীমতী তৃপ্তি চক্রবর্ত্তী বি. এ.

"জননীর জাতি, দেবতার সাথী, নারীরে বোলো না হেয়
অর্দ্ধজগতে কোরোনা গো হীন, জগতের মুখ চেয়ো"

ইহা ভারতেরই কবির উক্তি। অথচ এই দেশেই সুশিক্ষিত পুরুষ সম্প্রদায়ে এবং অশিক্ষিতা নারীর প্রাধান্য দেখা যায়। বর্ত্তমান জগতের প্রধান প্রধান সুসভ্য দেশে নারী ও পুরুষের একই অধিকার, একই শিক্ষা। রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে নারী ও পুরুষের সাম্য। নারী পুরুষের ন্যায় পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। বাহির জগতের দায়িত্ব পুরুষ ও নারী সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছে। সেজন্য নারী সে দেশে পুরুষের মুখাপেক্ষী নহে। তাহাদের রুচি, তাহাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার রাখে।

ভারতবর্ষে এখন অনাদৃতা নারীর ইতিহাস পথে ঘাটে ছড়াইয়া আছে দেখা যায়। কিন্তু ভারতের প্রাচীন কাহিনী-গুলি হইতে আমরা জানিতে পারি যে এদেশে যখন আর্য্য-সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন নারীকে সুশিক্ষা দিয়া শিক্ষিতা করা হইত। গাগা বেদ, দর্শন ও নানাবিধ তর্ক-শাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মবাদিনী আখ্যা পাইয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী ও লীলাবতী বহুশাস্ত্রে পারদর্শিনী হইয়াছিলেন এবং উভয়-ভারতী শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় মনীষীকে তর্কশাস্ত্রে পরাজিত করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া-ছিলেন। নারীর সম্মান রক্ষায় সেকালের পুরুষবৃন্দ যুগে যুগে আত্মোৎসর্গ করিয়া আসিয়াছে। সীতার উদ্ধারের জন্যই লঙ্কাকাণ্ড এবং দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ হইয়াছে কুরুক্ষেত্রের ভয়াবহ যুদ্ধে।

মধ্যযুগের ইতিহাসের পাতায় যে সকল বীর নারীর শৌর্য্য-কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, তাঁহারা রাণী দুর্গাবতী, রাণী লক্ষ্মীবাই, চাঁদ সুলতানা ও রাজিয়া। মেবারের বহু বীর রমণীর গাথা আজও মেবারের চারণদিগের গীতিতে শোনা যায়। রাণী কর্ণাবতী, রাণী কমলাবতী ও রাণী পদ্মিণীর মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

নারী মহীয়সী হইয়াছে শুধু তাহার বীরত্বে বা বিদ্যায় নহে। ভারতের নারী খ্যাতিলাভ করিয়াছে তাহার পতি-ভক্তি ও আত্মত্যাগে। সাবিত্রী দময়ন্তী সীতা চিন্তা বেহুলার আত্মবিলোপ এবং পতির মঙ্গলের জন্য সারা জীবনব্যাপী দুঃখের সহিত সংগ্রাম আজো তাঁহাদের নমস্যা করিয়া রাখিয়াছে। চিতোরের রাণীবৃন্দ জহরব্রতের অগ্নিতে আত্ম বিসর্জ্জন দিয়া যে অপূর্ব্ব পতিভক্তি, শুচিতা ও সাহসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা সত্যই—বিস্ময়কর। কত সহস্র বীর-পত্নীর আত্মত্যাগ ইতিহাস লেখে নাই। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

"কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সীঁথির সিঁন্দুর, লেখা নেই তার পাশে।

এক শতাব্দী পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে সহমরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। বালবিধবা জীবনের সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পতির সঙ্গে একই চিতায় জ্বলন্ত অগ্নিতে জীবন্ত দেহে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া দেখাইয়া গিয়াছে যে পতির আত্মা ও তাহার আত্মা এক, শরীর পৃথক হইলেও মনে প্রাণে তাহাদের পার্থক্য নাই।

শিক্ষা সভ্যতার প্রথম সোপান। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদেশে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষারও প্রসার বাড়িয়াছে। এখন ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারণের জন্য স্কুল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালাভে নারী ও পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেকক্ষেত্রে এদেশেও মেয়েরা নিজের নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছেন।

কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা এবং তাহার পরিণতিস্বরূপ অর্থো-পার্জ্জনই নারীর একমাত্র কাম্য উদ্দেশ্য নহে। বিধাতার

বিধান অনুযায়ী নারীর অন্য জগৎ। নারীর সুশিক্ষায় ও কার্য্যকলাপে গৃহ উন্নত হইবে, ইহাই নারীর প্রকৃত শিক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কালিদাস বলিয়াছেন "গৃহিণী সচিব মিথপ্রিয় শিষ্যা ললিতকলাবিধৌ।" নারী যাহাতে পুরুষের সর্ব্বকাজে প্রেরণা দিয়া তাহাদের মিলিত জীবনযাত্রাকে মধুর করিয়া তুলিতে পারে, সেই শিক্ষাই নারীর একমাত্র শিক্ষা।

শাস্ত্রে আছে "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে", অর্থাৎ গৃহিণীই গৃহ-স্বরূপা। নারীর সাম্রাজ্য অন্তঃপুরে। জননীরূপে সুসন্তান পালন করিয়া পত্নীরূপে সর্ব্বকার্য্যে স্বামীর সহযোগিতা করিয়া, দুহিতারূপে পিতাকে সেবা করিয়া ভগিনীরূপে ভ্রাতাকে স্নেহ করিয়া নারী নানা দিকে, নানাভাবে, পুরুষের কার্য্যের ভার লাঘব করিয়া থাকে। প্রতিটী সাংসারিক কার্য্যে অটুট ধৈর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়া আত্মীয় পরিজন সকলকে নিজের স্নেহপাশে বাঁধিয়া নারী যে দুরূহ কাজ লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধন করিয়া থাকে, তাহা আপাত-দৃষ্টিতে দেখা যায় না। পুরুষের শক্তি উৎস নারী। যদি আমাদের দেশের প্রতিটী নারী তাঁহার গৃহরাজ্যের সম্রাজ্ঞী-রূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপন বুদ্ধিমত্তায় সকল গার্হস্থ্য অভিযোগ মিটাইয়া সকল কাজে পুরুষকে উৎসাহ দিয়া জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে প্রেরণা দেন, তবে আত্ম-ত্যাগ ও কীর্ত্তি অসামান্য ফলপ্রসূ হইবে সন্দেহ নাই। এ কার্য্যের জন্য উচ্চশিক্ষা অথবা বিদেশী "ডিগ্রীর" প্রয়োজন নাই। ধৈর্য্য, ক্ষমা ও স্নেহ—এই তিনটী মহাগুণের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিবে নারীর শিক্ষা এবং যে রমণী এই সদ্‌গুণের অধিকারিণী, তিনি সকল যুগে, সকল দেশে, সকল জাতির প্রণম্য।

নারীর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ মাতৃত্ব। মাতার শিক্ষায় সন্তানের দীক্ষা। নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন, "Give me good mothers and I will give you good nations." জাতির ভবিষ্যৎ শিশু। এই শিশুকে শক্তিমান ও ধীমান নাগরিক করিয়া তুলিতে হইলে প্রধানতঃ প্রয়োজন শিক্ষা, এই শিক্ষা কেবল মাতার নিকট হইতে পাওয়া যায়। জননী যেরূপভাবে শিশুকে গড়িবেন ঠিক সেইরূপভাবেই সে গড়িয়া উঠিবে। গুণবতী মাতাই সুশিক্ষিত সন্তান দেশকে উপহার দিতে সমর্থা। এইরূপ গুণশালিনী জননীর ক্রোড়েই শিবাজী, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে।

মাতৃজাতিকে অবহেলা করিয়া যে জাতি অন্যবিষয়ে উন্নতি করিতে ব্যগ্র হয়, সে জাতির উন্নতি নাই। গাছকে যত্ন না করিলে যেমন ভাল ফল পাওয়া যায় না সেইরূপ মাতৃ-জাতিকে অবহেলা করিলে জাতির পতন অনিবার্য্য। স্বামী সন্তানের জন্য অকুণ্ঠিতভাবে স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জন, এ মহাদান মাতৃজাতির পক্ষেই সম্ভব।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

'মেয়েদের স্বাবলম্বন'

কুমারী জ্যোৎস্নারাণী দত্ত, কাব্যভারতী

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের দিনে মেয়েদের স্বাবলম্বী হ'বার প্রয়োজন যে কত বেশী বেড়ে গিয়েছে, তা আজ আর কোন সভা-সমিতিতে গলাবাজি করে অথবা কাগজে কাগজে ফলাও করে না লিখলেও আশা করি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মা-বোনেরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন।

আমাদের দেশের প্রায় অধিকাংশ মেয়েদের ভাগ্যে উচ্চশিক্ষা লাভ অর্থাৎ স্কুল কলেজের বিদ্যাশিক্ষা লাভ ঘটে উঠে না। তবে সহরে যাঁরা বসবাস করেন তাঁদের পক্ষে উচ্চশিক্ষার পথ সহজ ও সুগম হ'লেও যে সমস্ত কারণের মুখোমুখী হয়ে তাঁরা সে সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হন্ না তার মধ্যে আর্থিক অবনতিই হোলো প্রধানতম। তবে পিতামাতার উদাসীনতাও এর জন্যে কম দায়ী নয়। ছেলেটী নিরেট মূর্খ অথবা নেহাৎ হাবাগোবা হ'লেও এ ব্যাপারে তার পেছনে কিছু খরচ করবার সার্থকতা আছে। কিন্তু মেয়েটিকে আজ হোক্ কাল হোক্ বিয়ে দিয়ে যখন পরের ঘরে পাঠাতেই হবে—তখন মিছামিছি তার পেছনে কতকগুলো টাকা অপব্যয় করে লাভ কী? কথাটি সাময়িক বেশ সত্যি বলেই মনে হয়। কিন্তু বিধাতার অভিশাপেই হোক্ আর নিষ্ঠুর নিয়তির পরিহাসেই হোক্—মেয়েটীকে বিয়ে দেবার অল্প কিছুদিন পরে দু'একটা শিশু ছেলেমেয়ে রেখে যদি তার স্বামী-দেবতাটি মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয় তখন তার অবস্থাটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা এই সমস্ত পিতামাতা একটি বারের জন্যেও ভেবে দেখেন না। জোত জমি থাকলে হয়তো কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হতে পারে—কিন্তু সে সুযোগ থেকে যারা বঞ্চিত এমন কী যাদের ভাড়াটিয়া বাড়ীই একমাত্র সম্বল—মেয়ের অদৃষ্টকে দায়ী করে হয়তো তথাকথিত পিতামাতাগণ সাময়িক সান্ত্বনা লাভ করে থাকেন, কিন্তু অভাগিনী কন্যাটির সমস্যাসঙ্কুল জীবনে তাতে

কোন সমাধানই হয় না। তাঁরা একটি মুহূর্ত্তের জন্তেও ভেবে দেখ্‌তে চান্ না যে এই সত্ত-বিধবা মেয়েটীর ভাগ্যের জন্তে তাঁরাও অনেকাংশে দায়ী। সামান্ততম অর্থের লোভে আজও অনেক পরিবারের কন্তাদায়গ্রস্ত পিতামাতাগণ যেভাবে মেয়েদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন তা বলবার নয়। তবুও যদি সেই সমস্ত মেয়েদের 'কুমারী জীবনে' অন্ততঃ সাধারণ শিক্ষা লাভেরও সুযোগ দিয়ে থাকেন তা'হলে এমনি ভাবে তাকে আজ জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয় না! শিক্ষয়িত্রী, নার্স, অথবা ঐ ধরণের কোন একটা কিছু অবলম্বন করে বিলাসের জোয়ারে গা ভাসিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে না হোক্—কোন প্রকারে শিশু ছেলেমেয়েদের নিয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে যেতে পারে।

শুধু শিক্ষিতাদেরই নয়—অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়েদের যে স্বাবলম্বী হ'বার প্রয়োজন নেই একথা বললে নিছক ভুল বলা হবে। আমাদের দেশের মেয়েদের হাতের কাজের আদর কম নয়। দার্জ্জিলিং ও আসাম প্রদেশের মেয়েদের হাতে-বোনা সোয়েটার, ব্লাউজ প্রায়ই হাটে বাজারে সাদরে বিক্রী হতে দেখেছি। এ ছাড়া সূচী শিল্পও রয়েছে। দরিদ্র পিতামাতার গলগ্রহ হয়ে জীবন কাটানোর চেয়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করবার পক্ষেই এগুলো একমাত্র সহায়ক নয়; নিম্ন-মধ্যবিত্ত অভাব অনটনের সংসারে যথেষ্ট আনুকুল্যও বটে। তবে অনেক পরিবারের মেয়েরা একমাত্র লোক-লজ্জার ভয়ে আজও স্বাবলম্বী হ'বার কল্পনা করতে শেখে নি। অভাবের তাড়নায় তাঁরা পলে পলে শুকিয়ে মরছেন তবুও নিজেদের আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ করে ডালের বড়ি দিয়ে, চানাচুর বাদাম ভাজা তৈরী করে অথবা ঐ ধরণের কিছু করে তারা বেঁচে থাকার চিন্তা করতে নারাজ। পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিয়ে পূর্ব্ববঙ্গের যে ক'টা সহরের সঙ্গে পরিচয় করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তার মধ্যে দেখেছি পাবনা, বগুড়া, রাজসাহী ও রংপুর জেলার মেয়েরা অন্তান্ত দেশের তুলনায় অনেকাংশে স্বাবলম্বী।

তবে এক শ্রেণীর লোক রয়ে গেছেন যাঁরা হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ 'মনুসংহিতার' নির্দ্দেশ দেখিয়ে মেয়েদের স্বাবলম্বী হ'বার বিরুদ্ধে আজও তীব্র প্রতিবাদ করে থাকেন। কিন্তু আমার মনে হয়, 'মনুসংহিতার' নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য না করেও মেয়েরা অনায়াসে 'স্বাবলম্বী' হতে পারে যদি 'স্বাবলম্বী' শব্দের অর্থ 'স্বেচ্ছাচারিতা' অথবা 'উচ্ছৃঙ্খলতা' না হয়, সচরাচর যা কোলকাতার পথে ঘাটে প্রায় অধিকাংশ 'স্বাবলম্বী' মেয়েদের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁরা একাধারে শিক্ষিতা ও 'স্বাবলম্বী'!

খালি হাতে ব্যায়াম

শ্রীলাবণ্য পালিত

মেয়েদের দেহে চর্ব্বি বেশী হ'লে আসনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি শারীরিক কসরৎ করতে হয়। এর আগে কয়েকটি আসন আপনাদের দিয়েছি, এখন কয়েকটি free hand ব্যায়াম দিচ্ছি।

(১) বসে বসে পা ছুঁড়ে লাফানো :—

(ক) (প্রথমে এক একটি পা ছোঁড়া) :—

উবু হ'য়ে বসুন। এবার হাতের তালু দুটি মাটিতে রেখে, দু' পায়ের গোড়ালি তুলে নিন্; সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাকে মাটির দিকে একটু নীচু করুন (সামনের দিকে ঝুঁকে নিন্)।

এখন, ছবি দেখে, সেই অনুযায়ী যে কোন একটি পা পাশাপাশি ভাবে সোজা করে ছুঁড়ে দিন্। ছুঁড়ে দেবার

পায়ের ব্যায়াম

সময় ঐ অবস্থায় একটু লাফিয়ে ছুঁড়ে দেবেন। যখন ডান পা ছুঁড়বেন, তখন বাঁ পা গোটানো থাক্‌বে; আবার যখন বাঁ পা ছুঁড়বেন তখন ডান পা গোটানো থাকবে।

যে পা ছুঁড়বেন তাকে তখুনি আবার আগের পর্য্যায়ে আন্‌তে হ'বে। অর্থাৎ ঐ অবস্থায় আর একবার লাফিয়ে পাকে গুটিয়ে আন্‌তে হয়। এর পরেই অপর পা আগের মত লাফানোর সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে দিন্। আবার লাফানোর সঙ্গে সঙ্গে আগের পর্য্যায়ে গুটিয়ে আনুন্। তবে গুটিয়ে এনে লক্ষ্য করবেন, গোড়ালি দু'টি উঁচু আছে কিনা। আগেই বলেছি, গোড়ালি মাটি থেকে তোলা অবস্থায় থাক্‌বে। প্রথমেই বেশী বার অভ্যেস করবেন না, তাতে পায়ে ও পাছায় এবং উরুতে খুব ব্যথা হ'বার সম্ভাবনা। পরে সহ্যমত বাড়িয়ে নেবেন।

প্রথমে ১, ২ করে গুণে মোট ১০ বার করতে পারেন। প্রথম যে পা ছুঁড়বেন সেই সময় ১ গুণ্‌বেন, পরে সেই

পা গুটিয়ে আন্‌বার সময় ২ গুণ্‌বেন। এই ভাবে ১০ অবধি করতে পারেন। ১০ বলার সঙ্গে সঙ্গে দু' পা আগের মত গোটাতে হ'বে।

(খ) এবার আগের মত বসে সাম্‌নে ও পেছনে পা ছুঁড়তে হ'বে। আগে লাফানোর সঙ্গে সঙ্গে সাম্‌নে পা ছুঁড়ুন, তার পর সেই পা লাফানোর সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে আনুন। আবার অপর পা ঐ ভাবে ছুঁড়ে দিন্‌, এবার গুটিয়ে আনুন্‌ আগের মত। লাফানোর কথা যেন ভুলে যাবেন না, অনেকে শুধু পা ছুঁড়ে দেন বটে কিন্তু ভুলে যান্‌ যে বসে বসে লাফিয়ে এই ব্যায়ামটি করতে হয়।

এই ব্যায়ামটিও ১০ বার করতে পারেন প্রথম প্রথম। পরে বাড়িয়ে নেবেন।

(গ) জোড়া পায়ে বসে বসে লাফানো ঃ—

এইবার আগের মত উবু হ'য়ে বসে একবার বাঁ দিকে ও একবার ডান দিকে পা জোড়া করে পাশাপাশি ছুঁড়ে দিতে হ'বে। জোড়া পা প্রথমে ১ বলে পাশাপাশি ছুড়ে দেবেন লাফিয়ে, আবার আগের জায়গায় ২ গুণে আনুন, জোড়া পা এখন উল্টো দিকে আবার পাশাপাশি ছুঁড়ে দিন, ৩ গুনুন এখন তার পর আগের জায়গায় আনুন, এবার হোল ৪ বার। এইভাবে করবার চেষ্টা করুন। প্রতি বারেই বসে থেকে লাফানোর মত পা ছুঁড়ে দেবেন, ৮ বার না পারেন ৪ বার অন্তত করুন।

বসে জোড়া পায়ে লাফাতে বেশ কষ্ট হয় প্রথম প্রথম, তাই প্রথম শিক্ষার্থিনীর বেশী অভ্যেস করা ঠিক নয়। রোজ একটু সময় নিয়ে অভ্যেস করলেই ক্রমে ৮ থেকে ১২ বার, আবার ১২ থেকে ১৬ বার, এই ভাবে সহ্যমত বাড়িয়ে নিতে পারেন। এইভাবে পা জোড়া করে সাম্‌নে ও পেছনে ছুঁড়ে দিতে হ'বে। এইটিও লাফানোর মত করে পা দু'টি ছুঁড়বেন। একবার সাম্‌নে ছুঁড়ে পরে গুটিয়ে নেবেন, তারপর আবার পেছনে যতদুর পারেন ঐ ভাবে ছুঁড়ুন, শেষে আবার আগের জায়গায় আসুন।

(ঘ) এইবার শেষ ধাপ করুন ঃ—

আগে যেমন একবার পা ছুঁড়ে তারপর আগের জায়গায় নিয়ে এসে সেই সময় অপর পা'টি ছোঁড়া হয়েছে, এখন কিন্তু তার থেকে একটু অন্য ধরণের করতে হ'বে।

প্রথমে এক একটি পা নিয়ে ধরুন—উবু হয়ে বসে ডান পা ছুঁড়ে দিলেন পাশাপাশি ভাবে লাফানোর মত, তারপর ঐ পা-কে বসে বসে লাফিয়ে গুটিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁ পা ছুঁড়ে দিন লাফিয়ে পাশাপাশি ভাবে, আবার আগের মত লাফিয়ে গুটিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে ডান পা ছুঁড়ে দিন লাফিয়ে।

লাফানোর ভাবটা থাকলে ব্যায়ামটি ভাল ভাবে হয়।

এই রকম করে সামনে পেছনে পা ছুঁড়ুন। তারপর জোড়া পায়ে করবার সময় প্রথমে ধরুন ডান দিকে জোড়া পা ছুঁড়ে দিলেন আগের মত বসে বসে লাফিয়ে, তারপর আগের মত না করে একেবারে সোজা বাঁ দিকে জোড়া পা ছুঁড়ে দিন। এই ভাবে যতবার পারেন করুন। এটা একটু শক্ত ব্যায়াম।

লতা প্যাটার্ণ (১ম)

শ্রীভারতী সেনগুপ্ত

২ রংয়ের উল দিয়ে এই প্যাটার্ণটি করতে হবে, সোয়েটারের নীচের বর্ডারের উপরে অথবা ব্লাউজের পীঠে এই প্যাটার্ণটি দেওয়া চলতে পারে। নীল ও সাদা রংএর উল দিয়ে করতে হবে। নীল রং দিয়ে সমস্ত জামাটি বুনতে হবে, এটা একটি সেতার মত হবে তাই কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ঘর নেই। নীল (নী), সাদা (সা) বুনতে হবে।

১ম সোজা—১ (সা),* ১৩ (নী), ১ (সা),

২ উল্টা—৩ (সা), * ১১ (নী), ৩ (সা),

৩ সোজা—৫ (সা), * ৯ (নী), ৫ (সা),

৪ উল্টা—২ (সা), * ১ (নী), ১ (সা), ২ (সা), ৭ (নী), ২ (সা),

৫ সোজা—২ (সা), * ২ (নী), ১ (সা), ২ (নী), ২ (সা), ৫ (নী), ২ (সা)

৬ উল্টা—২ (সা), * ৩ (নী), ১ (সা), ৩ (নী), ২ (সা), ৩ (নী), ২ (সা)

৭ সোজা—২ (সা), * ২ (নী), ৫ (সা), ২ (নী), ২ (সা), ১ (নী), ২ সা)

৮ উল্টা—৩ (সা), * ২ (নী), ৭ (সা), ২ (নী) ৩ (সা),

৯ সোজা—১ (সা), * (নী), ২ (নী), ১ (সা),

১০ উল্টা—৩ (নী), * ১১ (সা), ৩ (নী),

১১ সোজা—৩ (নী), * ৩ (সা), ১ (নী), ৩ (সা), ১ (নী), ৩ (সা), ৩ (নী),

১২ উল্টা—১ (নী), * ১৩ (সা), ১ (নী),

১৩ সোজা—১ (নী), * ৩ (সা), ১ (নী), ৫ (সা), ১ (নী), ৩ (সা), ১ (নী),

১৪ উল্টা—১৩ লাইনের মত।

১৫ সোজা—৩ (নী), * ১ (সা), ৩ (নী), ৩ (সা), ৩ (নী), ১ (সা) ৩ (নী),

১৬ উল্টা—লাইনের মত।

১৭ সোজা—৬ (নী) * ৩ (সা), ১১ (নী),

১৮ উল্টা—৭ (নী) * ১ (সা), ১৩ (নী),

১৯ সোজা—১৮ লাইনের মত।

* অর্থে পুনরারম্ভ বুঝতে হবে।

ভূকৈলাস-বৃত্তান্ত

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

কলিকাতার নিক দক্ষিণে খিদিরপুরে ভূকৈলাস ; সাড়ে তিন হাজার অশ্বারোহী রাখিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত মহারাজ বাহাদুর জয়নারায়ণ ঘোষাল ইহার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়, ব্যবসা ও বিষয়বুদ্ধি বলে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন ও নিজ সঞ্চিত অর্থ হইতেই বিভিন্ন দেবমূর্ত্তি ও মন্দির-সুশোভিত পরিখাবেষ্টিত এই নন্দনপুরী বিশেষতঃ দীনদরিদ্রের উপকার সাধনের উদ্দেশ্যে স্থাপিত করেন।

জয়নারায়ণের পিতামহ কন্দর্প ঘোষাল হইতেই প্রকৃতপক্ষে এই বংশের সৌভাগ্যোদয়। তিনি লবণাদির ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন ও পরে রাজকার্য্য ব্যপদেশে নিজ বাসভূমি হাওড়া-বাকশড়া ত্যাগ করিয়া (ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রধান) গড়গোবিন্দপুরে (কলিকাতা) আসিয়া বাস করেন। কিন্তু এখানে ইংরাজের ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ গঠন করা স্থির হওয়ায় তাঁহাকে এ স্থান ত্যাগ করিতে হয়। তিনি প্রথমে গড়্যা-বেহালা ও শেষে (১১৬১ সনে) খিদিরপুরে আসিয়া বাসভবন নির্ম্মাণ করান। স্বর্গারোহণ কালে কন্দর্প ঘোষাল বহু সম্পত্তি ও তিন পুত্র রাখিয়া যান—কৃষ্ণচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র ও রামচন্দ্র। কনিষ্ঠ রামচন্দ্রের অল্পবয়সেই দেহাবসান ঘটে।

কৃষ্ণচন্দ্র বিষয়ী, উদ্যমশীল ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন—কিন্তু অধিকতর লাভবান হইয়াছিলেন রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া। গোকুলচন্দ্র তৎকালীন গভর্ণর ভেরেলিষ্টের দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, সুতরাং প্রকারান্তরে তিনি বাঙলাদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন এবং পদমর্য্যাদাবলে তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতেও অধিকতর খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সৌভাগ্য অর্জ্জন করেন।

ইনি দেওয়ান থাকাকালে কৃষ্ণচন্দ্র তীর্থভ্রমণে বাহির হন (১৭৬৯ খৃঃ) বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল বারাণসী, গয়া ও প্রয়াগ (ত্রীস্থলী) দর্শন। এই তীর্থযাত্রায় তিনি নিজ পরিবার, স্বগ্রামবাসী ও অনুচরবর্গ ব্যতিরেকে তাঁহার সঙ্গে নিজ খরচে বহু যাত্রীকে সঙ্গে লইয়া যান, যাবতীয় ব্যয় তিনিই বহন করিয়াছিলেন। সহোদর পরামর্শ দিয়াছিলেন—

"জত যাত্রী জায় সঙ্গে, লয়্যা জাবা নানা রঙ্গে,
সভারে করি দিবা গয়া॥

কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর মন্দির

জত জায় তত নিবা, পথের খরচ দিবা,
সভারে করিতে হবে দয়া॥"

যাত্রাকালে কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণ (পরে মহারাজা) বিনয়ের সহিত পিতাকে বলিতেছেন—

"পথে সাবধান হবা বলেন পিতারে॥
পথেতে লোকের পর না করিয়া জোর।

পর্ব্বতের উপরে আছে পাহাড়িয়া চোর ॥
সাবধান সদা হবেন করি নিবেদন।"

অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র (বড় মহাশয় নামে অভিহিত) গঙ্গাদ্বারে সমবেত আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির নিকট বিদায় লইয়া অগণিত যাত্রী সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। (ঘোষাল মহাশয়ের বাটীর নিম্নে যেখানে একটি খাল আসিয়া গঙ্গায় মিলিত ছিল, সেই স্থানটি 'গঙ্গাদ্বার' নামে উল্লিখিত হইয়াছে)। হালিশহরের সাধক রামপ্রসাদ এই পরিবারের অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং তিনিও কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত যাওয়া স্থির করিয় হুগলীতে মিলিত হইবেন এইরূপ ঠিক ছিল। কিন্তু রামপ্রসাদের অসুস্থতাবশতঃ তাঁহার যাওয়া হয় নাই। কৃষ্ণচন্দ্র হুগলীতে রাজকিশোর রায়ের বাটীতে মাধ্যাহ্নিকী কৃত্যাদি সমাপন করিয়া রওনা হইয়া গেলেন।

ঘোষাল মহাশয় বারাণসী পৌঁছাইয়া তাঁহার পিতার নামানুসারে তথায় "কন্দর্পেশ্বর" শিবলিঙ্গ স্থাপনা করেন এবং এ সম্পর্কে যথোপযুক্ত ভোজন করাইয়া উপযুক্ত দক্ষিণা দেন, তন্মধ্যে দেখা যায় পাঁচশত গঙ্গাপুত্র 'এক এক তঙ্কা' এবং অপরাপর সকলকে মর্য্যাদা অনুসারে "কেহ দুই তিন চারি কেহ তঙ্কা পাঁচ॥" বাঙ্গালী বিধবারাও বাদ পড়েন নাই, সকলকেই 'তঙ্কা এক এক' এবং শূদ্রের বিধবা পাইল "একৈক আধুলী॥" ১১৭৭ সনে ভাদ্রমাসে ঘোষাল মহাশয় গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের দেহাবসান ঘটিলে তাঁহার ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি গোকুলচন্দ্রের অধিকারভুক্ত হয়। গোকুলচন্দ্রের পাঁচ পুত্র—বৃন্দাবনচন্দ্র, রামনারায়ণ, হরিনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও গঙ্গানারায়ণ কিন্তু "বিধ্যধীনে পাঁচজনের বংশ হইল হীন।" কথিত হয় তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অধিকাংশ কন্যাগণের মধ্যেই বিভক্ত হইয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র রাজনারায়ণ ইহার অতি অল্প অংশ মাত্রই পাইয়াছিলেন। গোকুলচন্দ্রের অবর্ত্তমানে তাঁহার জামাতাগণই কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার ৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর সেবা অতি সামান্যরূপ রাখিয়া দেবোত্তর বিষয়ের সমুদায় উপস্বত্ব নিজেরা

খিদিরপুরের ঘোষাল বাটী

মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল

ব্যবস্থা করিয়া যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়া আসেন স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের উপর, বিশেষতঃ "সর্ব্বকর্ম্মাধিকারে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যে॥" এ সম্পর্কে তিনি কি আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা অনুমান করা যাইবে নিম্নোক্ত পদগুলি হইতে—

"কাশীতে আছেন যত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ।
সবাকারে মহাশয় কৈলা নিমন্ত্রণ॥
বসিলা বাঙ্গালী বিপ্র জেন সূর্য্যআভা।
স্মৃতি সাহিত্য ন্যায়শাস্ত্র বেদান্ত পুরাণ।
অপূর্ব্ব বিচারে সবে করেন বাখান॥"

এই সভায় ন্যায়ালঙ্কার, বিদ্যালঙ্কার, বাচস্পতি প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন। এবং—

"সাত শত বাঙ্গালী বিপ্র পায়্যা নিমন্ত্রণ।
অপূর্ব্ব সামগ্রী সবে করিলা ভোজন॥"

এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালী শূদ্রাদি, ফকির, বৈষ্ণব, পাঁচশত গঙ্গাপুত্র সকলকেই
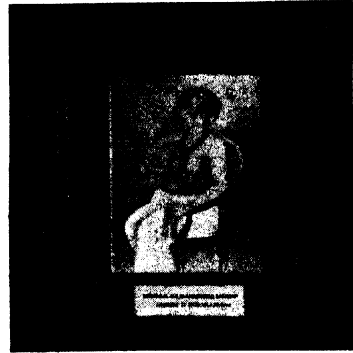
ভোগ করিতে থাকেন। (সমাচার দর্পণ পত্রিকা ১২৭৫ সনের ১লা আশ্বিন সংখ্যায় এ সম্পর্কে তিনটি নাম করিয়াছেন—গোবিন্দচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। যে বাটীতে কৃষ্ণচন্দ্র ও গোকুলচন্দ্র যৌথভাবে এক পরিবারভুক্ত হইয়া বসবাস করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ পুরাতন ডক ও বাকী অংশটুকু নূতন ডক নির্ম্মাণকালে উহার মধ্যে পড়ায় ভাঙ্গা গিয়াছে। খিদিরপুরের একস্থানে একটি রাস্তা নির্ম্মাণকালে ভূমি খননের সময় ভূগর্ভ হইতে একটি নাতিবৃহৎ মন্দির ও তন্মধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তরের শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়। এই মন্দিরের গাত্রে একখানি খোদিত লিপি ছিল—তাহা হইতে জানা গিয়াছিল যে ঐ মন্দির ও শিবলিঙ্গ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছিল। ডকের মধ্যে আর একস্থলেও সাধারণ কড়িপূর্ণ দুইটি মৃন্ময় জালা পাওয়া যায়। জালা দুইটি অভগ্ন ছিল কিন্তু কড়িগুলি জীর্ণ হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছিল।

বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন জয়নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন ১১৫০ সাল ওরা

আশ্বিন (১৭৫১ খৃঃ সেপ্টেম্বর)। তিনি যৌথপরিবারে প্রতিপালিত হন এবং পিতার উৎসাহে তিনি অল্পবয়সেই বিদ্যানুরাগী হইয়া উঠেন। বস্তুতঃ পনর বৎসর বয়সের মধ্যে জয়নারায়ণ বাঙ্গলা, সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, অথচ কোনদিনই রামপ্রসাদের গানের আসরে অনুপস্থিত থাকিতেন না। গুরুজনবর্গের সহিত বসিয়া গান শুনিতেন। নিজ চেষ্টায় তিনি একই কালে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এই দুই দিকেই বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার নবাব মবারক উদ্দৌলা রাজকার্য্যে সহায়তার জন্য যখন তাঁহাকে প্রথম আহ্বান করেন তখন জয়নারায়ণের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম করে নাই (মতান্তরে ত্রয়োদশ বর্ষ)। তিনি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিয়াছিলেন যে নবাবীর পতন ও ইংরাজের উত্থান অনিবার্য্য এবং আসন্ন। নবাবের অধীনে কার্য্য করায় তাঁহার কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে না, ইহা বুঝিয়া তিনি ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন ও দেশে ফিরিয়া আসিলেন ১১৭৫ সালে। তদবধি তিনি বিবিধ কার্য্যে ইংরাজের সহায়তা

রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর

করিয়াছেন। ১১৭৫ সাল হইতে ১২০৩ সাল পর্য্যন্ত তাঁহারা জয়নারায়ণের কার্য্যে এতটাই প্রীত হইয়াছিলেন যে গভর্ণর হেষ্টিংস স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে সাড়ে তিন হাজারী (মতান্তরে তিন হাজারী) মনসবদারী ও মহারাজ বাহাদুর উপাধি আনাইয়া দেন। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে মহারাজ বাহাদুর কোম্পানীর জন্য যাহা কিছু করিয়াছিলেন তজ্জন্য কোন দিন কোন বেতন বা পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই। গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিপত্তি ও স্বদেশীগণের উপকারার্থে বিনা স্বার্থে তিনি যাবতীয় কার্য্য করিতেন। লবণ, সুবর্ণ ও বস্ত্র প্রভৃতির ব্যবসায়ে তিনি নিজে যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সেই অর্থ হইতে তিনি খিদিরপুরে ও অন্যান্য বহুস্থলে ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। এই জমিদারী বিস্তৃত ছিল—ত্রিপুরা, ভুলুয়া, বাখরগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা ও ২৪পরগণা প্রভৃতি স্থানে এবং প্রধান কাছারী বাটী ছিল ঝালকাটিতে। তাঁহার মনোভাব ও চরিত্র সাধারণ হইতে ভিন্ন রকমের ছিল এবং যেমন একদিকে রামপ্রসাদের গানে অনুপ্রাণিত হন তেমনি অপরদিকে ভাগবত গীতার উপদেশ অনুসারে তিনি স্বয়ং অনাকৃষ্টভাবে জগৎ-সংসারের প্রতি কর্ত্তব্যপালন মাত্র করিতেন। তিনি এই সমুদয় জমিদারীর আয় নিজে উপভোগ করেন নাই বরং তাহার বৈপরীত্য সাধনই করিয়াছিলেন—নানা স্থানে দেবতা ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও তৎসঙ্গে দীনদরিদ্র আতুরজনের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়া। পরন্তু ইহাতেও তাঁহার হৃদয় তৃপ্তি পায় নাই। জয়নারায়ণের কর্ণকুহরে ঝঙ্কার দিতেছিল রামপ্রসাদের গান—

"ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোন জন।
দুরন্ত শমন বাঁধবে যখন, বিনে ঐ চরণ কেহ কার না ॥
দুর্গানাম মুখে বল একবার, সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার।
অনিত্য সংসার নাহি পারাবার, সকলি অসার ভেবে দেখ না ॥"

খিদিরপুরে জয়নারায়ণ যে শতাধিক বিঘা নিম্নভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন তাহা পরিখা বেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যে রাজপ্রাসাদ ও কয়েকটি

রাজেশ্বর শিব

দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ভূকৈলাস নির্ম্মাণ করেন—প্রতিষ্ঠার তারিখ ২৯ চৈত্র পূর্ণিমা তিথি, ১৭০২ শকাব্দা। ভূকৈলাসে প্রধান মন্দির।সিংহবাহিনী দশভুজা পতিত পাবনী (অষ্ট ধাতুর মূর্ত্তি) দেবী; এই মন্দিরের সম্মুখে চত্বর, ইহার পূর্ব্বদিকে কালভৈরব ও রাজেশ্বর শিবলিঙ্গ। এবং পশ্চিম দিকে বৃষারূঢ় চতুর্হস্ত পঞ্চানন ও তৎপার্শ্বে মকরারূঢ়া গঙ্গাদেবী (অনেকে বলেন এই দেবীর নাম 'কালীগঙ্গা' এবং এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার মূলে রামপ্রসাদ)। পতিতপাবনীর সম্মুখে চত্বরের পর সুবৃহৎ রাজবাটী। ইহার বাহিরে দক্ষিণ দিকে দুইটি বিরাট আকারের শিবলিঙ্গ দুইটি পৃথক্ মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন—কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর ও রক্ত কমলেশ্বর (তাঁহার পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ও মাতা রক্তকমল দেবীর নামানুসারে)। এই মন্দিরদ্বয়ের দক্ষিণে সুবৃহৎ পুষ্করিণী 'শিবগঙ্গার' পশ্চিম তীরে বড়ানন, সূর্য্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং পূর্ব্বদিকে গৌর নিতাই, গণেশ ও রামসীতা, এতদ্ভিন্ন হনুমান ও জগন্নাথদেবেরও

মূর্ত্তি ছিল বলিয়া শোনা যায়। জয়নারায়ণ এই বিবিধ বিগ্রহাদি স্থাপনা করিয়া শৈবশাক্ত বৈষ্ণব সৌর গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সমন্বয় ঘটাইয়াছেন ভূকৈলাসে। এই সম্পত্তির অর্পণনামায় (দেবোত্তর) লিখিত রহিয়াছে যে আয়গত অর্থ হইতে দেব সেবা ও মন্দির সংস্কারাদি প্রভৃতির খরচ বাদে অতিরিক্ত যাহা থাকিবে তৎসমুদায় ব্যয়িত হইবে দীন দুঃখী আতুর অন্ধ অঙ্গহীন ও অক্ষম যে সকল ব্যক্তি ভূকৈলাসে আসিবে তাহাদের জন্য। আমরা জানিনা এই সর্ত্ত প্রতিপালিত হইতেছে কিনা।

দীনবন্ধু জয়নারায়ণের দান সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া কিছু করেন নাই, তিনি জাতি ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রভৃতির গণ্ডীর বাহিরে ছিলেন। কাশীধামে 'শ্রীকরুণানিধান' নামে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ও জাতি ধর্ম্ম বর্ণাদি নির্ব্বিশেষে দরিদ্র পঠনেচ্ছু বালকদিগের জন্য প্রথম চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া অবৈতনিক পাঠশালা ও পরে পুনরায় আশী হাজার টাকা দিয়া

করুণানিধান মন্দির—কাশী

অবৈতনিক বিদ্যালয় এবং পৃথকভাবে আতুরজনের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা তাঁহার মানসিক প্রবৃত্তির প্রমাণ। তাঁহার বিশ্বাস ছিল মহান্ একের উপর, নিজেই বলিয়াছেন "চিন্তামণি কোথা পাব এই আশা করি। কাশীমধ্যে দেবালয়ে কিছুকাল ফিরি।" ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উহার পরিচালনার ভার দিয়াছিলেন খৃষ্টিয় চার্চ মিশনারী সোসাইটির উপর। এই বিদ্যালয়ে দুই শত ছাত্রকে শিক্ষা দিবার মত ব্যবস্থা ছিল এবং খৃষ্টীয় ও দেশীয় শিক্ষকবৃন্দ নিযুক্ত ছিলেন। পাঠ্য বিষয় ছিল—পাটিগণিত, ভূগোল, জ্যোতিষ এবং ভাষা। কেবল তাহাই নহে, ঐ সকল ছাত্র ও শিক্ষকগণের বসবাস ও আহারাদির এবং শিক্ষকগণের বেতনেরও চিরদিনের মত বন্দোবস্ত তিনি করিয়া দেন যদ্দারা স্বাধীনভাবে বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতে পারে। তদ্ভিন্ন দুর্গাকুণ্ডের নিকট এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে গুরুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন ও তন্নিকটে একটি বৃহৎ পুষ্করিণীও খনন করাইয়া দেন—এই দুই গুরুধাম ও গুরুকুণ্ড নামে অভিহিত। গুরুধামেই করুণানিধান বিগ্রহও প্রতিষ্ঠিত।

জয়নারায়ণের নির্দ্দেশমতই যাবতীয় বৈষয়িক কার্য্যাদি পরিচালিত হইত কিন্তু তাঁহার বৈশিষ্ট্য হইল সকলের সহিত বিনয় নম্র ব্যবহার এবং দীনতাপ্রকাশপূর্ব্বক নিজেকে ছোট প্রতিপন্ন করিবার বাসনা ও প্রয়াস। রামপ্রসাদ তাঁহার সুকুমার হৃদয়ে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন কাশীধামে ভাগবত রঘুনাথ ভট্ট তাহার পুষ্টি সাধন করেন। ইহাতেই তাঁহার হৃদয়ের আসর জমিয়া উঠিয়াছিল তাহাতেই তিনি যোগাসন আশ্রয় করেন এবং যোগফল উপভোগ করিয়া তিনি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন ১২২৮ সালে ২৫ কার্ত্তিক পূর্ণিমা তিথিতে বেলা দুই ঘটিকার সময়। তাঁহার জীবনকাহিনী এক অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনা। গোকুল ঘোষালের ত্রিশ লক্ষ টাকা মূল্যের "পান্না" রত্নয় শিবলিঙ্গ, অনুমান ১৪। ১৫ ইঞ্চি উচ্চ ও তদুপযুক্ত পরিধি বিশিষ্ট, জয়নারায়ণের পথ রোধ করিতে পারে নাই, স্বোপার্জ্জিত দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা মূল্যের

ভূ-কৈলাস—৺কালীগঙ্গার মূর্ত্তি

সম্পত্তির মোহ কাটাইয়া তিনি যোগীর বেশ ধারণ করিয়া, যোগীর অন্তঃকরণ লইয়া যোগী হইয়াছিলেন সেই দেশে যেখানে 'মহাযোগী' সদা বিরাজ করে। বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহদেব রায় এই সময় কাশীতে যান ও তাঁহার সংস্পর্শে আসেন। ইহার ফলে নৃসিংহদেবও বিষয়বৈভব তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন। বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির বস্তুত পক্ষে জয়নারায়ণের কল্পনা ও উৎসাহের ফল।

কাশীতে অবস্থান কালে জয়নারায়ণ নিম্নোক্ত গ্রন্থ কয়খানি রচনা করেন। তদ্ভিন্ন হিন্দী সাহিত্যের পোষকতারও তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা অকিঞ্চিৎকর নহে। ব্রজভাষায় কৃষ্ণলীলা কাব্য, কাশীখণ্ডের হিন্দী তরজমা এবং হিন্দীতে মহাভারতের অনুবাদ কার্য্যে কাশীরাজ উদিতনারায়ণকে সাহায্যদান উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থপরিচয়—

১। শঙ্করী সঙ্গীত (সংস্কৃত, একাম্রকাননে ভগবতীর লীলা বর্ণন)।

২। ব্রাহ্মণার্চ্চন চন্দ্রিকা (বেদপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ অর্চনার বিধি)।

৩। জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম (সংস্কৃত, শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণন)।

৪। কাশীখণ্ড (বঙ্গানুবাদ, ১১২০০ শ্লোকে পূর্ণ। রাজা নৃসিংহদেব ছিলেন প্রধান উদ্যোগী ও খসড়া লেখক)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইহার দুই খণ্ড ছিল, পরে ঐ দুইখানি পুস্তক মেটকাফ্ হলে নীত হয়।

৫। করুণানিধান বিলাস (বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ লীলা বর্ণন। ইহাতে ২৩৩টি লীলা বর্ণিত হইয়াছে। কবি জয়নারায়ণের ইচ্ছা ছিল শ্রীকৃষ্ণর দ্বাদশ বর্ষ বৃন্দাবন বাসের সমস্ত কয়দিনের (১২ বৎসর = ৩৬৫ দিন × ১২ বৎসর) অর্থাৎ ৪৩৮০ লীলা বর্ণনা করিবার কিন্তু তাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই।

রাজকবির পুত্র কালীশঙ্কর এক বৃহৎ তাম্রফলকে কবির জীবনী ইংরাজী ও পারস্য ভাষায় খোদাই করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ফলকখানি ২ হাত ১৭ অঙ্গুলী দীর্ঘ, ১ হাত ১৩ অঙ্গুলী প্রস্থ ও চারি সুতা মোটা। ইহার এককোণে ইংরাজীতে বি. সি, সি. এই তিনটি অক্ষর ও ৮০ আউন্স

৺সত্যভমোজ ঘোষাল

এই ওজন লিখিত আছে। কবি জয়নারায়ণের একখানি হস্তীদন্ত ফলকে চিত্রিত চিত্রও ছিল বলিয়া শোনা যায়।

জয়নারায়ণের অবর্তমানে তাঁহার বিরাট জমিদারীর স্বত্বাধিকারী হন তাঁহার একমাত্র পুত্র কালীশঙ্কর। ইনিও পিতার ন্যায় বিচক্ষণ, বিদ্যোৎসাহী, ধর্ম্মপ্রাণ ও দানশীল ছিলেন এবং লর্ড এলেনবারোর সময়ে সিন্ধু যুদ্ধে ইংরাজকে নানারূপে সহায়তা করায় "ইংলণ্ডীয় রাজানুমত্যানুসারে গত ১১ মার্চ্চ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে" রাজা উপাধি পান। তাঁহার দানের তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বারাণসীতে বিশহাজার টাকা ব্যয় করিয়া অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপন ও তাহাদের গ্রাসাচ্ছনের ব্যবস্থা। এতদ্ভিন্ন কলিকাতায় কুষ্ঠ রোগীগণের জন্য হাসপাতাল নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে নগদ পাঁচহাজার টাকা ও বার বিঘা জমি দান। অপরাপর দানের তালিকা দিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। কালীশঙ্কর অতি সরল প্রকৃতি ও নির্ব্বিবাদী লোক ছিলেন। তাঁহার মনোগত ভাব পরিষ্কার রূপে বোঝা যায় যখন "গৌড়ীয় সমাজের সভ্যবিধায়ক সভায় নিজে আসন গ্রহণ না করিয়া সভার অন্যতম সভ্যরূপে স্বীয় পুত্রকে যোগদান করিতে বলেন এবং রাধাকান্তদেব বাহাদুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই কালীশঙ্করের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার অনুরোধ স্বীকার করিয়া লন। তিনি "ব্যবহার মুকুর" নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"কামনা করিয়া গ্রন্থ প্রকাশিতে মতি।
লীন হই প্রভুপদে যাতে শুদ্ধ গতি॥

বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি লিপ্ত হইতে চাহেন নাই এবং একথা এতটাই ঠিক যে জয়নারায়ণ বারাণসীতে বসিয়া দেবোত্তর প্রভৃতি যে দলীল করেন তাহাতেও ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত সমাচার দর্পণ পত্রিকার (২৭ ভাদ্র ১২৩২ সংখ্যায় সম্পাদক মহাশয় কালীশঙ্করকে 'মহারাজ' আখ্যা দিয়াছেন। পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—"শ্রীযুত মহারাজ কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুরের আদেশে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ড শ্রীযুত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় রচিত হইয়া সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। পুস্তকের পরিমাণ আকটেবো পেজের ৪৩ পৃষ্ঠা। এই পুস্তক উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে ও পাটনাই কাগজে ছাপা হইয়াছে এবং তাহার মূল্য আটআনা স্থির হইয়াছে। যদ্যপি কাহার ঐ পুস্তক গ্রহণেচ্ছা হয় তবে কলিকাতায় চন্দ্রিকা যন্ত্রে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।" এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির তৎকালীন কার্য্যবিবরণীতে (পৃ ১২) দেখা যায় কালীশঙ্কর 'ব্যবহার মুকুর' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন (পৃ ৫৮)। জয়নারায়ণের 'করুণানিধান বিলাস' ও স্বীয় প্রণীত 'ব্যবহার মুকুর তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করেন।' (রাধাকান্তদেবের লাইব্রেরীতে দুইখানি পুস্তকের একখণ্ড করিয়া কীটদষ্ট অবস্থায় আছে)। কালীশঙ্কর ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া নামক ইংরাজী পত্রিকার আগষ্ট সেপ্টেম্বর ১৮২২ সংখ্যায় জয়নারায়ণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে কৌতুহলোদ্দীপক একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। লোকনাথ ঘোষ, ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতি লিখিয়াছেন—"রাজা কালীশঙ্করের সময়ে ভূকৈলাসে এক মহাপুরুষ আসেন। (হাওড়া) শিবপুরের চড়ায় জোয়ারের সময় এই মহাপুরুষের সমাধিস্থ দেহ ভাসিয়া আসিতে দেখা যাইত কিন্তু ভাটার সময় কোথায় লুকাইয়া যাইত কেহ জানিত না। কিছুদিন পরে এই দেহ ভূকৈলাসে নীত হয়। ইহার দর্শনার্থে বহু যাত্রীর সমাগম হইত। উলঙ্গ মহাপুরুষ বহুকাল সমাধিস্থ পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পানাহারের প্রয়োজন হইত না। অবশেষে নানা উপায়ে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল ; তিনি কেবল রাজবংশীয়গণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। তাঁহার পরিণাম কি জানা যায় না।" আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে ইহা প্রবাদ মাত্র নহে, ইহা সত্য ঘটনা।

রাজা কালীশঙ্করের মৃত্যুকালে তাঁহার সাতপুত্র বর্ত্তমান ছিলেন :— কুমার কাশীকান্ত, সত্যপ্রসাদ, সত্যকিঙ্কর, সত্যচরণ, সত্যশরণ, সত্যপ্রসন্ন ও সত্যভক্ত। ইঁহাদের নামের আদিতে সত্য শব্দ ব্যবহারের একটি বিশেষ কারণ আছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এইরূপ নামকরণ তাহা অধুনা প্রতিপালিত হইতেছে কিনা সে কথা জয়নারায়ণের বংশধরগণের বিবেচনার বিষয়। ঘটনাটি এই—গোকুলচন্দ্রের মৃত্যু ঘটিলে যখন সকলে (গোকুলচন্দ্রের প্রপৌত্রস্থানীয় ও কালীশঙ্করের পুত্র কাশীকান্ত তখন বালক) তাঁহার মৃতদেহ দাহ করিতে যান সে সময় জয়নারায়ণ স্বীয় গুরু-বংশীয় এক ব্যক্তির হস্তে ধনাগারের চাবিটি রাখিয়া শবযাত্রায় বাহির হন। সেই ব্রাহ্মণ ইত্যবসরে ধনাগার হইতে কিছু ধন অপহরণ করেন। গুরু-ভক্ত জয়নারায়ণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর এই কথা শুনিয়া স্বীয় বংশধরদিগকে সর্ব্বদা সত্য স্মরণ করাইবার অভিপ্রায়ে সকলের নামের আদিতে 'সত্য' শব্দের ব্যবহার আদেশ করেন। তদবধি ইহাই চলিয়া আসিতেছে।

কাশীকান্ত প্রভৃতি সাত ভ্রাতার মধ্যে সত্যকিঙ্কর প্রথম রায়বাহাদুর উপাধি পান ও গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করেন। ইনি "এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যাশিক্ষার উপকারার্থে ২০,০০০ বিংশতি সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন।" কিন্তু ইঁহারা প্রথম তিন সহোদর অর্থাৎ কাশীকান্ত স্বয়ং, সত্যপ্রসাদ ও সত্যকিঙ্কর অল্পায়ু হওয়ায় সত্যচরণ রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনিও দয়াদাক্ষিণ্যগুণে সর্ব্বপ্রকারে ভূষিত ছিলেন; জনসাধারণের উপকারার্থে বহুদান করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল বারাণসীর জয়নারায়ণ কলেজ পরিচালনার সুব্যবস্থার জন্য পুনরায় বহু অর্থ উক্ত কলেজের ট্রাষ্টী চার্চ্চ মিশনরীকে দান। এই ভাবে নিজবংশের পদগৌরব তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখানে ইহাও উল্লেখ করিতে বাধ্য যে এই বংশের যাবতীয় দান প্রভৃতি বাবদ যাবতীয় ব্যয় তৎসমুদায় সম্পত্তির বার্ষিক আয় হইতে ব্যয়িত হইত, মূল সম্পত্তি অটুট ছিল। সত্যচরণের দুই পুত্র, কুমারদ্বয় সত্যানন্দ ও সত্যসত্য। কিন্তু এই পুত্রদ্বয় বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও অবিভক্ত ও যৌথ সম্পত্তির প্রধান ব্যক্তি হিসাবে সত্যচরণের অবর্ত্তমানে তাঁহার চতুর্থ সহোদর সত্যশরণই 'রাজাবাহাদুর' রূপে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত হন।

রাজা সত্যশরণ একজন অভিজ্ঞ ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন ও গভর্ণমেণ্ট 'সি-এস্-আই' উপাধি দ্বারা তাঁহাকে সম্মান দিয়াছিলেন। ইঁহার এক কন্যা ব্যতিরেকে পুত্রগণ অল্প বয়সেই গত হন। ঐ কন্যার বিবাহ হইয়াছিল তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের অন্যতম অধ্যাপক মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত। মহেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ঈশানচন্দ্র হুগলী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠাকালের প্রথম শিক্ষক ও পরে অধ্যাপক হইয়াছিলেন। সত্যশরণের মৃত্যুর পর সত্যচরণের জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যানন্দ 'রাজা বাহাদুর' উপাধি পান এবং অপরাপর সকলে 'কুমার বাহাদুর' রূপে গণ্য হন। রাজা সত্যানন্দ প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সভার সভ্য ছিলেন এবং যথেষ্ট উদারতার সহিত সকল কার্য্য পরিচালনা করিতেন। পরন্তু ইঁহার সহোদর কুমার সত্যসত্য ঘোষাল ভূকৈলাসের বিরাট সম্পত্তির বিভাগ দাবী করিয়া প্রথিতযশা বংশের মূলে কুঠারাঘাত করেন।

এই বংশের অন্যতম মহিমময় কীর্ত্তি লক্ষাধিক মুদ্রার দাবী উপেক্ষা ও বর্জ্জন করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে ঋণভার হইতে মুক্তিদান—যদ্দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল 'চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন' প্রতিষ্ঠা। মিশনারী সোসাইটিকে খিদিরপুর 'অরফ্যানগঞ্জ বাজার' দান, কলিকাতা হিন্দু-স্কুল স্থাপনায় সাহায্য ও ব্রহ্মোত্তরাদি দান প্রভৃতি ভূকৈলাসের বিবিধ দানের তালিকাভুক্তমাত্র। এই বংশ চিরদিনই বিভিন্ন সকল সম্প্রদায়ের সহিত আন্তরিক সদ্ভাব ও হৃদ্যতা সহকারে স্বীয় প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ইহাও উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে যে এই বংশ প্রথমাবধি বাংলা দেশ, বাংলা ভাষা, বাংলা জাতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

ভগবতী শ্রীপতিতপাবনীর চরণে নমস্কার, "সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে মাং রক্ষ রক্ষাধুনা॥"

আমাকে মৃত্যু দাও

জয়চরণ সরকার

আমাকে মৃত্যু দাও, হে পৃথিবী রাত্রির মতন
শীতল, আঁধার ছায়া আমার রাত্রিকে ঢেকে দিক,
আমার সত্তার আলো নিভে যাক প্রদীপ যেমন
শূন্যগর্ভ নিভে যায়, চেয়ে থাকে অন্ধ নির্নিমেষ।
আমাকে মৃত্যু দাও প্রতি দিনে প্রতি রাতে রাতে
নিবিড় ঘুমের মত, পাখাদের বৈতালিক গানে
আবার জাগবে বলে, আর এক জন্মের প্রভাতে
দুচোখে আলোর হাসি ফুটে উঠে ভাসবেই প্রাণে।
তেমনি মৃত্যু দাও আমাকেও আজ মৃত্যু দাও,
নতুন আলোর জন্যে, আজ রাত্রিতেই নিয়ে যাও॥

পাট ও পীঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

ইতিপূর্ব্বে ভারত সরকার শিশুদের উপযোগী চলচ্চিত্র নির্ম্মাণের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে সম্প্রতি ভারতের সমস্ত ভাষার লেখকদের নিকট হইতে শিশুদের উপযোগী কাহিনী দাখিল করার জন্য সরকারীভাবে আবেদন জানান হইয়াছে। প্রত্যেকটি মনোনীত কাহিনীর জন্য লেখককে ২০০০৲ টাকা দেওয়া হইবে। বিশেষক্ষেত্রে ২০০০৲এর উর্দ্ধেও অর্থের পরিমাণ হইতে পারে। কাহিনী নির্ব্বাচন কমিটিতে শ্রীবি, জি, খের, শ্রীমতী কমলা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী পান্না মুখোপাধ্যায়, রামমুর্ত্তি ও সমর চট্টোপাধ্যায় আছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। অবশ্য প্রয়োজনবোধে কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে।

* * * *

এম পি প্রোডাকসনের 'সবার উপরে' কথাচিত্রের একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন

সম্প্রতি গৌহাটীতে আসাম বোলছবি কো-অপারেটিভ লিমিটেড নামে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। শ্রীকে, পি, বড়ুয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আসামের চলচ্চিত্র শিল্প ও ব্যবসার প্রসারই উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া উক্ত প্রতিষ্ঠান ছবির প্রযোজনাও করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

* * * *

গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও একটি তেলেগু নাট্য সম্প্রদায় পূজার ছুটিতে কলিকাতায় নাট্য-পরিবেশন করিতে আসেন। কলিকাতা সাউথ-ইণ্ডিয়ান ক্লাবের সাহায্যার্থে এঁরা পাঁচটি নাটকাভিনয় করেন। পঞ্চাশ জন শিল্পী ও কলাকুশলীদের দ্বারায় এঁদের দলটি গঠিত। 'থুপ্পারীযুম শম্বু 'শ্রীমান সুদর্শনম্' 'মাগুধপতি' 'কল্যাণী'ও 'পেন মানস' নামক যে পাঁচটি নাটক এঁরা অভিনয় করেন, তাহা দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। এবারের আগত দলটির নাম—'ত্রিপলিকেন ফাইন আর্টস ক্লাব।

* * * *

কলিকাতা থিয়েটার সেণ্টারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'একাঙ্কিকা' নাট্য-প্রতিযোগিতা সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় অনেকগুলি সৌখান নাট্য-সম্প্রদায় যোগদান করেন। দর্পণা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত নবজন্ম নামক একাঙ্কিকাটি অভিনয়ে ও নাটকীয় বিষয়-বস্তুতে

এদের প্রথম কলহ...
এরা নব-বিবাহিত, কিন্তু...
দেখো মা, এই ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে আমায় ঘুরতে হয়, আর...
আমি ওঁর জন্যে যথাসাধ্য করি, তবুও...
ঝগড়া কোরো না। আমি বুঝেছি গলদ কোথায়।
লক্ষ্মী, তোমার কাপড় কাচার ধরণেই রয়েছে গলদ
কিন্তু, কাপড় কাচতে খাটুনি তো আমি কম করি না!
কিন্তু কাপড় তুমি আছড়ে কাচো যে!
এ ছাড়া পরিষ্কার করে কাচার উপায়ই বা কী?
সানলাইট সাবান ব্যবহার কর—যা আমি বরাবর করেছি। সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনায় কাচলে কখনই তোমাকে কাপড় আছড়াতে হবেনা।
আছড়ালে কাপড়ের সুতো ফেঁসে যায়: সেইজন্যে অতো তাড়াতাড়ি কাপড় ছেঁড়ে।
(ছেঁড়া সুতো বড় করে' দেখানো হয়েছে)
আজই আমি সানলাইট সাবান কিনবো!
আরে: সানলাইট, সত্যিই, বিনা আছাড়ে সাদা আর ঝকঝকে করে কাচে। এখন—আমাদের কাপড় আরও বেশীদিন টেঁকে। তাই সানলাইট আমাদের পয়সা বাঁচিয়েছে।
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।

প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে যথাক্রমে শ্রীনাট্যমের 'প্রেত' এবং লোক্-ভারতীয় 'উলু'। ইহা ছাড়া তেলেগু নাটকের জন্য শ্রীনারায়ণ নাট্য-মণ্ডলীকে একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। থিয়েটার সেণ্টারের নাট্য-প্রতিযোগিতা প্রশংসনীয়। ইহার ফলে, একাধারে অভিনয় ও নাট্য সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইবে।

* * * *

সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারে শ্রীকমল মিত্র প্রমুখ কয়েক-জন নূতন নট-নটীর সমাবেশ ঘটিয়াছে। সুপরিচিত চিত্রাভিনেতা ও গায়ক অসিতবরণও এখানে মঞ্চাবতরণ করিতেছেন। 'মহানায়ক শশাঙ্ক' নামে একটি ঐতিহাসিক নাটক এখানে অভিনীত হইতেছে। মিনার্ভার নবতম প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক—এই কামনা করি।

* * * *

শারদীয়া পূজাবকাশে যে কয়টি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে এম্, কে, জি প্রোডাকসনের 'ব্রতচারিণী' হয়। নানা কারণে সে সময় 'ব্রতচারিণী' নাট্যামোদীদের আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর এই সর্ব্বজনসমাদৃত উপন্যাসটির চিত্র-নাট্য রচনার মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু ক্রটিবিচ্যুতি আছে। কিন্তু সিদ্ধরস-সমন্বিত কাহিনীর ঘটনা-বিপর্য্যয়ের মাঝে তাহা চোখে পড়িলেও সহজেই মন হইতে অপসৃত হইয়া যায় জ্যোতি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর প্রশান্ত যখন তাহাকে মাতৃ-বিয়োগের সংবাদ দেয়, তখন জ্যোতিকে যেরূপ বিচলিত হইতে দেখা যায়—পরে কিন্তু তাহার শোকের সূত্র সম্পূর্ণ হারাইয়া যায়। আমরা তখন বেহারীলালকে দেখি, পর পর অন্য ঘটনার মাঝে। এইরূপ কথঞ্চিৎ দোষক্রটি থাকা সত্ত্বেও সমগ্রভাবে ছবিটি দর্শকদের আকৃষ্ট করিয়া রাখে। প্রতিটি নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সু-অভিনয়ের দ্বারায় প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য চিত্রের অভিনয়ের দিক অন্যতম আকর্ষণ। সীতার ভূমিকায় শ্রীমতী সন্ধ্যারাণীর সংযত অভিনয় দীর্ঘকাল মনে রাখার মত। ইভা, দেবযানী

'ব্রতচারিণী' কথাচিত্রের একটি দৃশ্যে চন্দ্রাবতী ও শ্রীমতী অনুভা গুপ্তা

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিত্র সম্পাদক শ্রীকমল গাঙ্গুলী আলোচ্য চিত্রের পরিচালনা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে 'ব্রতচারিণী' স্বর্গত নট-নাট্যকার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক নাট্য-রূপায়িত হইয়া অধুনালুপ্ত নাট্য-নিকেতনে মঞ্চস্থ ও সীতা ছবির এই প্রধান তিনটি চরিত্র-চিত্রণে সমতার অভাব। সীতাকে একদিকে যেমন প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে অপরদিকে তেমনি দেবযানীর চরিত্রগত দোষক্রটী অধিক প্রতিফলিত করা উচিত ছিল। তাহা হইলে অসমাপ্ত
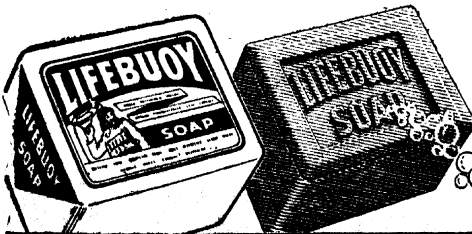
সীতার চরিত্র অধিকতর নাটকীয় হইত। চিত্রনাট্যে যেন কেবলমাত্র বেহারীলালের মুখ চাহিয়াই সীতা মহিমময়ী হইয়াছে। জ্যোতির প্রতি সীতার প্রেম-প্রকাশের যে সুযোগ ছিল তাহা গ্রহণ করা হয় নাই। ফলে, সীতার সেবা ও ত্যাগই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অভিনয়ের দিক হইতে প্রায় সকলেই চরিত্রানুগ অভিনয় করিয়াছেন। ইহার মধ্যে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীমতী সাবিত্রীর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এম, কে, জি প্রোডাকসনের 'ব্রতচারিণী' কথাচিত্রের একটি দৃশ্যে ঈশানী ও বিহারীলালের ভূমিকায়—অহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীমতী নলিনা দেবী

সর্ব্বসমেত মোট তিনখানি গান আছে আলোচ্য চিত্রে। গানগুলি রচনা করেন শ্রীপ্রণব রায়। গানগুলি সুরচিত। কিন্তু সঙ্গীত পরিচালক শ্রীকমল দাশগুপ্তের সুর-সংযোজনায় বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য না থাকায় গানগুলি গতানুগতিক হইয়াছে। কলা-কৌশলের দিক দিয়া সাধারণ স্তরের শ্রীকার্ত্তিক বসুর শিল্প-নির্দ্দেশনা রুচিসম্মত। শ্রীআর, আর, সিন্দের অঙ্কিত দৃশ্যপটগুলি নয়নাভিরাম। চিত্রের প্রথমাংশ অপেক্ষা দ্বিতীয়াংশ শ্লথ। ঐদিকে পরিচালক কমল বসুকে সম্পাদক কমলবাবুর দৃষ্টি লইয়া বিচার করার প্রয়োজন ছিল। কাহিনীর অনুকূলে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সৃষ্টি সার্থক হইয়াছে। পারম্পারিক নাটকীয় ঘটনা প্রবাহ ও তাহার অভিনয় 'ব্রতচারিণী' কথা-চিত্রের প্রধান আকর্ষণ একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

—আট—
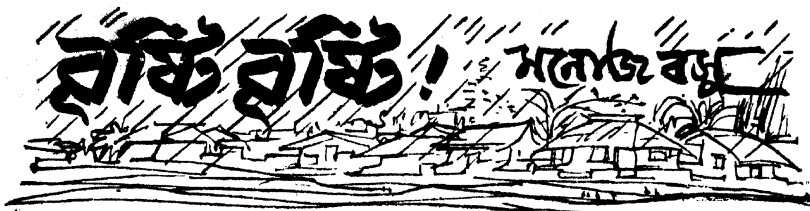
অরুণাক্ষ চলে গেলে ইরা ফেটে পড়ল, মা, কাণ্ডজ্ঞান হবে তোমার কবে? গরিব আমরা, তাতে লজ্জা নয়। কিন্তু তোমার ভিখারিবৃত্তি দেখে আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সরমা একটু কড়াভাবে বললেন, যত আধিক্যেতা তোর। কতটুকু কি বলেছি যে মুখ নাড়তে এলি? মেয়ে থাকলে অমন সবাই বলে থাকে। কিছু না বললে লোকে জানবেই বা কি করে? লাখ কথার কমে বিয়ে হয় না।

আমি বিয়ে করব না—

উঁহু, চিরকাল ধিঙ্গি হয়ে বেড়িও। তোর সাধবাসনা না থাক, আমাদের আছে। পেটের ছেলে ফাঁকি দিয়ে গেল, তাদের জায়গা খালি রয়েছে—

মায়ের ব্যথা বোঝে তো ইরাবতী, সে নরম হয়ে যায়। বলে, আমি তো আছি মা, আমায় ছেলে বলে ভেবে নিতে পারো না? করছি তো তোমাদের ছেলেরই কাজ—

হেসে উঠল সহসা। বলে, আঙুরফল বড্ড টক মা, নাগালের মধ্যে আসবে না। পাকা কথা হয়ে আছে। সে মেয়ের যেমন রূপ তেমনি রুপো। কোনটার সঙ্গে তোমাদের মেয়ে টক্কর দিয়ে পেরে উঠবে না।

দু-তিন দিন পরে অভাবিতভাবে মেয়ে সুনন্দা আর মা সাবিত্রী দেবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ইরা যথানিয়ম শোভাদি'র বাড়ি পড়াতে গিয়েছিল—ওঁরা কানপুরে চলে যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে আত্মীয়-বাড়ি বলে কয়ে যাচ্ছেন। অনেক আশা করে অসুস্থ স্বামী বয়ে নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। কোন দিকে সুরাহা হল না। না স্বামীর চিকিৎসা, না মেয়ের বিয়ে। অম্বুজাক্ষ প্রথম থেকে ফিরে এসে পয়মাল করে দিলেন। রোগি দেখে বললেন, বাতের অসুখ—দশ-বিশ দিনে সারবার বস্তু নয়। অষুধ লিখে দিচ্ছি, কমে যাবে, ভালই থাকবেন। বাড়বে, কমবে—এই রকমই চলবে, এই বয়সে একেবারে সারে না। আর সুনন্দার বিয়ের সম্পর্কে—ছেলে নাকি একেবারে রাজি নয়, উপযুক্ত ছেলে—তার মতের উল্টো কিছু করা যায় না, বিষম আপত্তি তার। ভারি লজ্জিত সেজন্য অম্বুজাক্ষ। সে যাই হোক, এমন চমৎকার মেয়ের জন্য ভাবনার কিছু নেই—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কথাটা ছাত্রীর মারফতে কানে এলো, কিসে কি হল, ইরা বুঝতে পারে না। ছাত্রী বলে, আচ্ছা বলুন তো, সুনন্দা-দি'র মতো মেয়েও অপছন্দ করে—কোন ডানা-কাটা পরী আনবে কে জানে?

ছাত্রী তো এমনিভাবেই গল্প করতে চায়, মাস্টার ইরা নিরস্ত করে। আজকে কি হল, সে-ও একটু গা ভাসিয়ে দেয় ঐ স্রোতে। হেসে বলে, পরী হতে পারে, পেঁচাও হতে পারে।

ঠিক বলেছেন। বড় বাছাবাছি করতে গেলে পেঁচাই জোটে শেষ পর্যন্ত। আমাদের এক জেঠতুত ভাই আছেন—শুনুন, তিনি তো—

ইরাবতী সহসা কর্তব্যে অবহিত হয়ে তাড়া দেয়, আচ্ছা আচ্ছা, কাজ করো এবারে তুমি। পরের কুচ্ছো করতে হবে না।

পঁচিশখানা 'ভারতে ইংরাজ'—প্রায় এক গন্ধমাদন। সেই বোঝা নিয়ে মহাস্ফূর্তিতে অম্বুজাক্ষ মণিরামপুর চললেন। একা গেলেন এবারে, সুহাসিনী যাচ্ছেন না। ঝুপঝুপে বৃষ্টি, ব্যাঙ ডাকে দালানের কানাচে ডোবার ভিতর, সুপারি-গাছ মাথা-ভাঙাভাঙি করে—ভেঙেচুরে ছাতের উপর পড়ে বুঝি বা। জোঁকের জন্য রোয়াকের নিচে এক-পা নামা

যায় না—সুহাসিনীর ভারি অস্বস্তি লাগে, রাত্রি হলে ভয়ে কাঁপেন। এই তো সেদিন একবার ঘুরে আসা হল, রোজ রোজ যেতে হবে কেন? রথের মেলার বন্দোবস্ত করে এসেছ—ভালই তো, কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও, গাঁয়ে দশজন মাতব্বর আছে—যা করবার তারাই করুকগে।

অম্বুজাক্ষ হাসেন। আসল ব্যাপার স্ত্রীর কাছেও ভাঙেন নি। মন্ত্র গোপন রাখলে তবেই খাটে; মনের গূঢ় মতলবও তেমনি আগেভাগে চাউর হতে দেওয়া ঠিক নয়। সুহাসিনীর ভরসা ছিল, তিনি বেঁকে বসলে শেষ অবধি যাওয়া বন্ধ হবে, অম্বুজাক্ষ একলা বড় কোথাও যেতে চান না। কিন্তু এখন গতিক আলাদা—কেউ না যেতে চায় তো একাই চললেন তিনি। বিয়ের পর থেকে সুহাসিনী মণিরামপুরের নাম শুনছেন, শ্বশুরদের তালুক মুলুক আছে—সেখান থেকে নায়েব এসে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা ইরশাল করে যায়। সেই গাঁয়ের অনেক পুরানো একতলা দালান—কাশীশ্বরের আমলের বাড়ি, তিনি কলিকাতায় ঘাঁটি করবার আগে বানিয়েছিলেন। কড়িবরগা নেই, খিলান-করা ছাত, পাক্কা আড়াই হাত পুরু দেয়াল, জানলা নয়—ছোট্ট ঘুলঘুলি দু-চারটে, দরজা দিয়ে একরকম গুড়ি মেরে ঢুকতে হয়। চোর-ডাকাতের ভয়ে সেকালের মুরুব্বিরা এমনি ব্যবস্থা করতেন। এতকাল পরে এবারে সুহাসিনী বাড়িটা চোখে দেখলেন, থেকেও এলেন মাস খানেকের উপর। গোটা দুই ঘর ভেঙেচুরে দু'য়োর-জানলা বড় করা হয়েছে আজকালকার মানুষের বসবাসের মতো। এতেই বোঝা যাচ্ছে, অম্বুজাক্ষের মতলব এখন মাঝে মাঝে গাঁয়ে গিয়ে থাকবার।

তাই। এই যেমন খেলার বন্দোবস্ত করেছেন। নিজে ঘোরাঘুরি করবেন তিনি মেলার মধ্যে, ব্যাপারিদের সুখ-সুবিধা দেখবেন, যাত্রার আসরে জলচৌকি পেতে বসবেন সকলের মাঝখানে, একরাশ হাঁড়ি বাঁশি ও আনারস কিনে বাচ্চাদের বিলোবেন। এই হল আসল, এই মেলামেশার জন্য যত উদ্যোগ-আয়োজন, আর সুহাসিনী বলেন কিনা—টাকা পাঠিয়ে দাও মাতব্বরদের নামে। মোটের উপর, রোগী দেখা এবং নোটে-টাকায় দু-পকেট ভরতি করে বাড়ি ফেরা—এই নিয়ে অম্বুজাক্ষ আর খুশি থাকছেন না। টাকা ঢের হয়েছে, নাম যশ চাই। দেশ স্বাধীন হয়েছে, কত রামাশ্যামা লাটবেলাট হয়ে গেল—আর তিনি চিরকাল শুধুমাত্র ডাক্তারবাবু হয়ে থাকবেন, এটা কেমন করে হয়। কৃতান্ত যা বলেছিল—বাঘ কিঞ্চিৎ রক্তের স্বাদ পেয়েছে, ভাঁটির গাঙে পুঁটিমাছ খেয়ে বেড়াতে তার মন চাচ্ছে না। করপোরেশনে ঢুকতে না পারুন, তার চেয়ে ঢের ঢের বড় মর্যাদা আছে। মাস চারেক পরে এসেম্বলির ইলেকশন। ইলেকশনে দাঁড়াবেন তিনি। দাঁড়াবেন এই এলাকা থেকে, কাশীশ্বর এসে প্রথম যেখানে বসতি করলেন। যে কাশীশ্বরের গৌরবে স্বাধীন দেশের মানুষের বুক ফুলে উঠবার কথা। গৌরবটা সর্বমানুষের মধ্যে খুব ভাল করে জানান দেওয়ার দরকার।

যাই হোক, এবারে গাঁয়ে বেশি দেরি হল না। উল্টোরথ চুকে যাবার পরেই অম্বুজাক্ষ ফিরে এলেন। বাড়িতে পা দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অরুণাক্ষের খোঁজ পড়ল, গিয়েছিলি নাকি রে?

অরুণ হকচকিয়ে যায়, কোথায় বাবা?

অম্বুজাক্ষ খিঁচিয়ে ওঠেন, এমন স্মরণশক্তি হলে পাশ করবি কি করে? 'ভারতে ইংরাজ' যিনি লিখলেন, ঠিকানা খুঁজে যাবার কথা ছিল না সেখানে? বিলকুল ভুলে বসে আছ।

অরুণ বলে, ভুলব কেন। ভদ্রলোক যেখানে থাকেন, গলির গলি তস্য গলি—

সাত সমুদ্দুর পার হয়ে কলম্বাস গোটা এক মহাদেশ আবিষ্কার করেছিলেন—

আমিও করেছি বাবা। খুঁজে খুঁজে হাজির হলাম সেই বাড়ি, বললামও অনেক করে। তা কলকাতা শহর ছাড়তে রাজি হচ্ছেন না তিনি। অনেক কাজ—

অম্বুজাক্ষ বলেন, ভাল করে বুঝিয়ে বলো। একবারের জায়গায় পাঁচবার যাও। গরজে পড়লে না গিয়ে উপায় কি? নিতেই হবে মণিরামপুরে। নিয়ে গিয়ে হৈ-হৈ করব, কাশীশ্বর রায়ের কথা বলবেন উনি—

ছেলে অতিশয় পিতৃভক্ত। ঐ যে বলে দিলেন একবারের জায়গায় পাঁচবার—তারপরে বাড়িতে অরুণের পাত্তা পাওয়া দায়। সুহাসিনী একদিন বললেন, দিনকতক মরীয়া হয়ে তো পড়াশুনোয় লাগলি। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ, মোটে বাইরে বেরুতিস না। এখন বেরুনো

ধরলি তো দিনরাত্রির মধ্যে টিকি দেখা যায় না। এই এক স্বভাব—যখন যা ধরবি, একেবারে চরম করে ছাড়িস।

অরুণাক্ষ বলে, কি করব মা। সে বুড়ো ভারি একগুঁয়ে—কিছুতে রাজি করানো যাচ্ছে না। বাবা নিজে যাবেন না, আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে খালাস। খোশামুদি করতে করতে প্রাণ যায়। অবিশ্যি, যে বই লিখেছেন—ঐ মানুষের কাছে একবার-দু'বার কেন, দিনরাত গিয়ে পড়ে থাকলেও অন্যায় হয় না। ঠাকুরদাদা রায় বাহাদুর—লোকে থ্যাক-থু করত, চিরকাল আমরা ইংরেজের পা-চাটা। ইংরেজ সরেছে, কাশীশ্বরের বৃত্তান্তও বেরিয়ে পড়ে সব দোষের খণ্ডন হয়ে গেল অমনি। যাই বলো মা, আমরা কিন্তু চিরকাল বড় ভালো কাটিয়ে গেলাম।

ও-বাড়িতে বিশ্বেশ্বর হচ্ছেন মেসোমশায়, সরমা হয়ে গেছেন মা। অরুণাক্ষ গিয়ে বলে, মেসোমশায় কোথায় মা?

সরমা বলেন, যেখানে থাকেন এ সময়টা। লাইব্রেরিতে।

কালকে তো চললাম আমরা সকলে। আমার মা-ও যাচ্ছেন। কোন রকম অসুবিধা হবে না মেসোমশায়ের।

সেটা কি আর বলে দিতে হবে বাবা? আমার কথা যাক—নইলে কি ইরাই ছেড়ে দিত তার বাপকে? কি রকম আগলে থাকে দেখ না—অমনি করে করেই তো আরও ওঁকে কাজের বা'র করে তুলেছে।

ইরা খুটখাট করছিল, এবারে উপরে বাপের তপোবন গোছাতে চলল। সেদিকে চেয়ে গাঢ়স্বরে অরুণ বলল, ইরার মতন সাধ্য নেই, কিন্তু এইটে জেনে রাখুন, মেসোমশায় আমাদেরও অতি-আপনার। একা আমি বলছি নে, বাবা-মা সর্বদা এই বলেন।

একটু হেসে বলে, বাবা বলেন—ফুলচন্দন দিয়ে ওঁকে পুজো করা উচিত। এই যে দেশের বাড়ি নিয়ে যাওয়া—সে-ও ঐ ব্যাপার, অঞ্চলসুদ্ধ মানুষ মিলে ওঁকে মাঝখানে বসিয়ে শাঁখ বাজিয়ে খৈ আর ফুল ছড়িয়ে আমোদ-আহ্লাদ করা।

সহসা গলা নামিয়ে অতি অন্তরঙ্গ সুরে বলে, বাবা বলছিলেন, কিছু যদি করতে পারতাম ওঁদের জন্যে, মনে শান্তি হত। আচ্ছা মা, কোন-কিছু চান না আপনারা? কোন দরকারেই লাগতে পারিনে?

সরমার দৃষ্টি সজল হয়ে উঠল। বললেন, চাইনে আবার! ভিখারির হাল দেখতে পাচ্ছ—তুমি তো বাবা বোকা ছেলে নও, সবই জানো, সমস্ত বোঝ। ওঁর ঐ গতিক। ছেলে ধরেছিলাম পেটে—একজন নয়, দু-দুটো। কেউ তারা নেই। দুই ছেলের পর কত সাধ-আহ্লাদের মেয়ে। সে আজকে টাকার ধান্দায় বাড়ি বাড়ি ট্যুইশানি করে বেড়ায়।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে আবার বললেন, কিন্তু একদিন হাত পেতে নিয়ে তো অভাব মিটবে না। তার চেয়ে একটা কথা বলি তোমায়। এঁদেরও বাড়ি মণিরামপুরে। ঘরবাড়ি নেই, শুনেছি পোড়ো-ভিটে আছে, আম-কাঁঠাল নারকেল-সুপারির বাগান আছে। ধানজমি কিছু ছিল, সে সব বারোজনে দখল করে নিয়ে খাচ্ছে। ফুল-খই না ছড়িয়ে, দেখো তো বাবা, হকের জমিজিরেত যা আছে সেইগুলো তারা যদি ছেড়ে দেয়।

অরুণাক্ষ বলে, আলবৎ দেবে। আপোষে না দিলে আমাদের পাইক-বরকন্দাজ লাঠি মেরে জমি থেকে উচ্ছেদ করবে। ওখানে বাবার খুব প্রতাপ।

সরমা তাড়াতাড়ি বলেন, উঁহু, গণ্ডগোল না হয়। এমনি তো বাপ-মেয়ে শহর ছেড়ে এক পা নড়তে চায় না। তার পরে হাঙ্গামা-হুজ্জুতের ব্যাপার শুনলে একেবারে বেঁকে বসবে।

অরুণ আশ্চর্য হয়ে বলে, গাঁয়ে চলে যাবেন আপনারা?

না গিয়ে উপায় কি? অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল। বই লিখে ফুল আর হাততালি খুব মেলে, তাতে পেট ভরে না। মেয়ে আইবুড় থেকে চিরকাল বাপ-মায়ের অন্ন জোগাবে, সে তো হয় না। তার সাধ-আহ্লাদ আছে, বিয়েথাওয়া দিতে হবে—

অরুণ ঘাড় নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, সে তো বটেই—

সেই তো ভাবনা বাবা। সকলের বড় ভাবনা—মেয়ে উপযুক্ত পাত্রে দেওয়া। উনি নিজের খেয়ালে মেতে আছেন। কে কি করবে—কোথায় টাকাকড়ি, কোথায় বা ছেলে।

অরুণাক্ষ বলে, আমি বলছি কি, এই ব্যাপারে বাবাকে একটুখানি বলুন মেসোমশায়। বাবা দিলদরিয়া, জোর করে ধরলে কোন-কিছুতে 'না' বলবেন না। বুঝলেন মা, ইরার বিয়ের কথা আমার বাবার কাছে অতি অবশ্য যেন পাড়েন, আপনি মেশোমশাইকে বিশেষ করে বলে দেবেন।

সরমা বললেন, না বাবা। সে হয় না। উনি কিছু বলবেন না, মেয়েও বলতে দেবে না।

অরুণাক্ষ মুখ শুকনো করে বলে, বিয়ের ব্যাপার—এমনি-এমনি হবে কি করে? কাউকে না কাউকে বলতেই হবে।

তা বলে অন্যের সাহায্য নিয়ে বিয়ে হবে। উনি তাতে কক্ষণো রাজি হবেন না। মেয়েও শুনতে পেলে ক্ষেপে যাবে। জানো তো ওকে।

জানি বই কি! অরুণাক্ষ জোর দিয়ে বলে, খুব ভাল করেই জানি। কিন্তু সাহায্য বলতে টাকাকড়ির কথা কেন ভাবছেন বলুন তো? সাহায্য কত রকমের হয়। বিয়ের ব্যাপারে ধরুন পাত্র চাই সকলের আগে!

হেসে উঠে বলে—না, গাছের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে? সে অবশ্য ভালই হয় মা। গাছকে গাল-মন্দ করুন, যত খুশি হেনস্তা করুন—চাই কি দু-এক ঘা বসিয়ে দিলেও গাছ কিছু বলতে পারবে না।

ইরাবতী নেমে এলো, এসে হুমকি দিয়ে পড়ল। তাকে দেখতে পেয়েই হয়তো অরুণাক্ষ শেষ কথাগুলো বলেছে। ইরা বলে, আমার কুচ্ছো হচ্ছে বসে বসে?

সরমা বলেন, মিথ্যে তো নয়! অরুণ তোকে ঠিক চিনে ফেলেছে। মেয়েমানুষের অমন মেজাজ—বলব কি বাবা, মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে হাতে পায়ে খিল ধরে আসে। বিয়েথাওয়া ওর কপালে নেই, দেখে শুনে কোন পাত্তোর ঐ মা-মনসা ঘরে তুলবে? ভরসাই পাবে না।

অরুণাক্ষ ভয়ে ভয়ে ইরার দিকে তাকায়। ইদানীং যত আসা-যাওয়াই করুক, তবু সে বাইরের লোক—আরও বড় অপরাধ, বড়লোক তার বাবা। কিন্তু পরমাশ্চর্য ব্যাপার, এত কথা-কথান্তরের পরেও হাসিমুখ ইরার। ও-মেয়ের মেজাজ বোঝা ভার। ভরসা পেয়ে তখন সে সরমার কথার প্রতিবাদ করছে, তাই কি বলা যায় মা? পাত্র কত রকমের আছে। মাথা-খারাপও থাকতে পারে—মিনমিনে মেয়ে নয়, সিপাহি-সান্ত্রী যার পছন্দ।

ইরা কলকলিয়ে ওঠে, ঐ হল। শুনলে তো মা, মাথাপাগলা ছাড়া তোমার মেয়ের গতি নেই। তার চেয়ে যেমন আছি, সেই তো বেশ ভালো। কি দরকার ঝামেলা জোটানোর?

হাসতে হাসতে সে রান্নাঘরে ঢুকল। ক্ষণপরে চা করে এনে বসে গেল একসঙ্গে।

এর পরে বুঝতে বাকি থাকে কিছু? ভোরে সূর্য ওঠার সময় সরমা ছাতে গিয়ে প্রণাম করে আসেন। অনেক কালের অভ্যাস। অরুণাক্ষ চলে গেলে এই আসন্ন সন্ধ্যায় তিনি ছাতে উঠে গেলেন, করজোড়ে ডুবন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কত কি কামনা করলেন। বিশ্বেশ্বর এসে বললেন, অরুণ এসেছিল। সকালবেলা ওদের মোটরে তোমায় তুলে নিয়ে যাবে।

বিশ্বেশ্বর গজর-গজর করছেন, শুধু ঐ মোটর? মোটর থেকে ট্রেনে নিয়ে তুলবে। কোথাকার কোন স্টেশনে নেমে তারপরে মোটরবাস। কাঁচা-রাস্তায় পড়লে তখন আবার গরুর গাড়ি। যা ফিরিস্তি দিল, শুনে ভয় হয়ে যাচ্ছে—হাড়-পাঁজরার জোড়গুলো পথের মধ্যে খুলে খুলে না পড়ে!

কিশোরীবালা পুরাণো ঝি। সে বলে, সভা তো এখানেও একটা হল। কর্তাবাবুর না গেলেই হত না অদ্দূর।

বিশ্বেশ্বর বললেন, শুধু সভা হলে কে যেত? ফুলের মালার ক'টা পয়সা দাম যে অত কষ্ট করতে যাবো? হেঁ-হেঁ, অন্য ব্যাপার আছে। বিষম এক লোভ দেখিয়েছে অরুণ। সৎছেলে—ও কখনো বাজে কথা বলবে না। ওর কথার উপরে যাচ্ছি।

সোল্লাসে সরমা বলেন, তোমাকেও বলেছে তাহলে? বড্ড ভাল ছেলে, ভাল হোক বাছার—

মুখ টিপে হেসে বলেন, ভাল ছেলে হোক যাই হোক, আজকালকার ওরা বড্ড বেহায়া কিন্তু। আমাকে বলে সোয়াস্তি হয় নি, আবার তোমা অবধি গিয়েছে। যেমন

"কী মদির নতুন সুগন্ধ!"
বলেন
"লাক্স টয়লেটের নতুন সুগন্ধ কতো তাজা ও ফুলের মতো আর ঘন্টার পর ঘন্টা এর রেশ চলে…"
কেবল চিত্র-তারকারাই নন সারা ভারতের সুন্দরী রমনীরা জানেন যে এই বিশুদ্ধ সাদা সাবানের সুগন্ধি সরের মতো ফেনা ত্বককে অতি সুন্দর মোলায়েম ও পরিস্কার রাখে।
বড় আকারেও পাওয়া যায়
LUX
TOILET SOAP
LUX
TOILET SOAP
লাক্স
টয়লেট সাবান
চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান
ভারতে প্রস্তুত
LTS. 450-X52 BG

যেমন বলে দিয়েছে, সেই সব কথা বোলো তুমি অরুণের বাপকে—

বিশ্বেশ্বর মাথা নাড়েন, নিশ্চয়—নিশ্চয়। যাচ্ছি তো সেইজন্তে।

স্বামীর উপর তবু সরমা পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারেন না।

কি ভাবে উত্থাপন করবে, বলো দিকি ?

বুদ্ধিমান বিষয়ী লোকের মতোই বিশ্বেশ্বর জবাব দেন, দেখ, ঘুরিয়ে বলতে গেলেই যত গোলমাল বাধে। আমি সোজাসুজি বলব। যে আমার বই সত্যি সত্যি যদি ভাল হয়ে থাকে, আরও যাতে ভালভাবে কাজ করতে পারি সেই সাহায্য করুন।

এ-ও তো ঘোরপ্যাচের হয়ে গেল। কত কি হতে পারে, কি বুঝবেন ওর থেকে ? স্পষ্টাস্পষ্টি বলবে, কন্যাদায় উদ্ধার করুন। অরুণের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বউ করে ঘরে তুলে নিন। নিশ্চিন্ত হয়ে যাতে লেখাপড়ায় লাগতে পারি। তাই বোলো।

বিশ্বেশ্বরের চোখে পলক পড়ে না, এ তুমি কি বলছ ?

সরমা হাসতে লাগলেন, বলছি ঠিক। অত ভাবনা করতে হবে না গো। যাদের গরজ, তারাই ভাবাভাবি করছে। তুমি শুধু কথাটা অরুণের বাপের কানে তুলে দিও, বুঝতে পারবে তখন।

বিশ্বেশ্বর ইতস্তত করেন, এ যেন কৈকেয়ীর বর চাওয়ার মতন হয়ে যাচ্ছে। তারা কত বড়লোক, খবর রাখো না তো ! গুণগ্রাহী মানুষ—সমাদর করে ডেকেছেন তো অমনি একেবারে বেয়াই হতে বলব।

সরমা বলেন, তোমরাই বা কম লোক কিসে ? রামনিধির নামে বাপ-মেয়ে এত দেমাক করো। সে তো আর মিথ্যে কিছু নয়।

তারাও কাশীশ্বরের বংশের। বংশগৌরবে এক তিল কম নয় আমাদের চেয়ে।

সরমা বলেন, জাতে তুলে দিয়েছ তুমিই। কি করে তার ঋণ শুধবে, ভেবে পাচ্ছে না। শোন তবে, কথাটা উঠেছে ঐ তরফ থেকেই। অরুণ এই যে ঘটা করে নিয়ে যাচ্ছে, মূলে তার ঐ। হ্যাঁ, বিয়েরই ব্যাপার।

বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস করতে পারেন না। বলেন, যাও—ভারি তুমি খবর রাখো ! কাশীশ্বরের আমল থেকে পুরাণো কাগজপত্র রয়েছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইতিহাসে নিষ্ঠা আছে ছোঁড়াটার—কোনটার কি দাম, ওরা তো ঠিক বোঝে না, তাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে—

সরমা হেসে বলেন—তাই বলেছে বুঝি ? ঐ সব না বললে তোমায় টেনে বের করা কি সোজা ?

বিশ্বেশ্বর অবাক হয়ে যান। বিয়ের সম্বন্ধ এক সাধারণ ঘটক দিয়েই হতে পারে। সেই কাজে তাঁকে কষ্ট দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—হতে পারে না, এমন ফন্দিবাজ অরুণাক্ষ কখনো নয়।

ক্রমশ

মহাপ্রয়াণ

'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স'—পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠান ও 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রের প্রাণস্বরূপ, —যিনি গত ৫৫ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া কলিকাতা সহরে এক সুবৃহৎ ব্যবসা—নিষ্ঠা, দক্ষতা ও অসাধারণ সততার সহিত পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন, যাঁহার সুমধুর ও সহৃদয় ব্যবহার তাঁহাকে সকল সাহিত্যিক, লেখক ও পুস্তকপ্রকাশক সমাজে সর্বজন-আদৃত করিয়াছিল—সেই তেজস্বী, নির্ভয়, কর্তব্যপরায়ণ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১২ই নভেম্বর সকাল সাড়ে ১০ টার সময় কলিকাতা বালীগঞ্জের নিজ বাসভবনে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই বয়সেও তাঁহার কর্মশক্তি অটুট ছিল। মহাপ্রয়াণের পূর্ব দিনও তিনি যথারীতি সকালে ও বিকালে দুইবার কর্মস্থলে আগমন করিয়া কর্মীদিগকে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দান করিয়াছিলেন। পরদিন শনিবার সকাল সাড়ে ৯টায় অন্যান্য দিনের মত তিনি স্নানাহার শেষ করিয়া মোটরে কর্মস্থল অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু অল্পদূর আসিয়া অসুস্থতা বোধ করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া যান ও কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার জীবন যেমন দীর্ঘকাল ঘড়ির কাঁটার মত সকল কর্ম সম্পাদন করিত, শেষ দিনেও যেন তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই—কর্মের অবসানে তিনি মহামতি ভীষ্মের মত যেন স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন।

তাঁহার পিতা স্বর্গত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুস্তক-প্রকাশ ব্যবসা আরম্ভ করিলেও কর্মবীর হরিদাসবাবুই ঐ ব্যবসাকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও সুবৃহৎ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার এই কার্যে তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ থাকিয়া সর্বদা তাঁহাকে সাহায্য করিতেন—তাই ১৫ বৎসর পূর্বে সুধাংশুবাবুর পরলোকপ্রাপ্তির পর হইতে তাঁহার শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যে যুগে পুস্তকপ্রকাশকের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল, যে যুগে এই ব্যবসা গ্রহণের জন্য লোকের আগ্রহ ও উৎসাহ অতি অল্প দেখা যাইত, সেই যুগে এইকাজ আরম্ভ করিয়া তাঁহারা যেরূপ সাহস ও ধৈর্যের সহিত ইহাকে উন্নতির পথে লইয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কর্তব্যনিষ্ঠা যেমন তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, সেই সঙ্গে সততা তাঁহাদের ব্যবসায়কে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছিল। দেয়-অর্থ প্রদানের জন্য তাঁহাদের মধ্যে যে ব্যাকুলতা ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত, তাহা অতি অল্প স্থানেই দেখা গিয়াছে।

পুস্তক-প্রকাশ-ব্যবসায় সুগঠিত করিয়া তাঁহারা ৪২ বৎসর পূর্বে স্বর্গত কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রেরণায় এবং ৺প্রমথনাথ ভট্টাচার্য, ৺জলধর সেন ও ৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়গণের সহযোগিতায় 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষ প্রথমবর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন কালেই দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়—সে সময়ে উপযুক্তভাবে ভারতবর্ষ প্রকাশ তাঁহাদের পক্ষে কিরূপ কষ্টকর ছিল, তাহা বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সে কালে ঐরূপ ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্রাদি সম্বলিত, চিত্রবহুল, ৮ আনা দামের মাসিক কাগজ ছিল না। চট্টোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয় সে সময়ে যে আদর্শের সূত্রপাত করিয়াছিলেন,

ভবিষ্যৎকালে তাহা সর্বত্র অনুকৃত হইয়াছে। কাজেই এ বিষয়ে তাঁহাদের পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। তাহার পর গত দীর্ঘ ৪২ বৎসরের ভারতবর্ষ প্রকাশের ইতিহাস বাঙ্গালার সুধীসমাজে সর্বজন-বিদিত। ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া দেশের তরুণ ও অখ্যাতনামা লেখকগণকে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহাদের নিত্যকর্ম ছিল। অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ভারতবর্ষের লেখকগোষ্ঠীতে টানিয়া আনিয়া তাঁহার প্রতিভা স্ফুরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, একমাত্র সেই কার্যই তাঁহাদিগকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থপ্রকাশ তাঁহাদের অন্যতম কীর্তি। শুধু শরৎচন্দ্র নহেন—ঐভাবে তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের কত সাহিত্যিককে পাঠক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। আজ তাই হরিদাসবাবুর মহাপ্রয়াণে চারিদিকে হাহাকার শুনা যাইতেছে—একজন সদয়হৃদয়, গুণগ্রাহী, কর্তব্যনিষ্ঠ, দরিদ্র-দরদী পুস্তক-প্রকাশকের অভাব সকল সাহিত্যিক অন্তরের সহিত অনুভব করিতেছেন। তিনি যে কত সাহিত্যিককে তাঁহাদের অভাবের সময় অর্থসাহায্য করিতেন, তাহার সংখ্যা ছিল না। যে কোন সাহিত্যিক, খ্যাতনামাই হউন, আর অখ্যাতনামাই হউন, দুঃস্থ হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহাকে রক্ষার ব্যবস্থা করিতেন এবং তাহার ফলে শুধু তাঁহারা নহেন, তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণও তাঁহার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিতেন। হরিদাসবাবু নিজে যৌবনে সুগায়ক ও সু-অভিনেতা এবং চিরকাল পরিহাস রসিক ছিলেন। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে তিনি আর্ট থিয়েটারের পরিচালকরূপে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের গৌরব ও উন্নতি বিধানে যত্নবান হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সুরুচি ও সৌন্দর্য-জ্ঞানের প্রভাবে রঙ্গমঞ্চ উপকৃত হইয়াছিল। তিনি নাটক পড়িতে খুব ভাল বাসিতেন এবং গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দ্র প্রভৃতির বহু নাটকের অংশ তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অসাধারণ ছিল—কোন্ গান কোন্ পুস্তকে আছে, অভিনয়ের কোন্ অংশ কোথায় প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার নিকট সর্বদা সঠিক সংবাদ পাওয়া যাইত। তিনি অভিনয় দেখিতে ভাল বাসিতেন, সেজন্য শেষ বয়সে রঙ্গমঞ্চে বা সিনেমায় অভিনয় দেখাই তাঁহার একমাত্র বিলাসিতা ছিল।

তিনি উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস, নাটক ও গল্পপুস্তকের প্রধানতম প্রকাশক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। নিজে ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন এবং হাজার হাজার হস্তলিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে উৎকৃষ্টতর পুস্তকগুলি নির্বাচন করিয়া প্রকাশ করিতেন। হরিদাসবাবুই সর্ব-প্রথম বাংলা ভাষায় সচিত্র কবিতা-পুস্তক প্রকাশ করিয়া উপহার দানের সুবিধা করিয়া দেন। ভারতবর্ষ প্রকাশের পর তাঁহারা নিজেদের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেদের ছাপাখানায় শুধু সুমুদ্রিত পুস্তক প্রকাশ করিতেন না, ত্রিবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্রও নিজেরাই মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন এবং সে জন্য ব্লক-নির্মাণ বিভাগও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুলভে সচিত্র রামায়ণ ও মহাভারত প্রচার, ভারতবর্ষে প্রতি মাসে একাধিক ত্রিবর্ণ চিত্র প্রকাশ, ভারতবর্ষের মলাটে দেশের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের ত্রিবর্ণ চিত্র প্রকাশ প্রভৃতি কার্যে হরিদাসবাবুর ঔৎসুক্য বাঙ্গালার প্রকাশক মহলে নূতন প্রেরণা দান করিয়াছিল। হরিদাসবাবুর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের ইতিহাস লেখা হইলে তাহাতে বাঙ্গালার শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের বহু নূতন তথ্য প্রকাশিত হইবে। তাঁহার গুণমুগ্ধ পরিচিতের সংখ্যা নাই। তন্মধ্যে সাহিত্যিক বা লেখকের সংখ্যাও কম নহে। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা ভবিষ্যতে সে সকল কথা প্রকাশ করিবেন।

আজ আমাদের এই দারুণ শোক মনপ্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। প্রত্যহ যাঁহার উপদেশ পাইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইতাম, আজ তাঁহার অভাব-বোধ যে স্বাভাবিক, তাহা বলার প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রার্থনা, তাঁহার অশরীরী আত্মার আশীর্বাদ আমাদের সুপথে পরিচালিত করুন—দেহে শক্তি ও মনে বুদ্ধি লাভ করিয়া আমরা যেন তাঁহার আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হই।

কৃষিকার্য্যে জরীপ পরিমিতি ও ক্ষেত্রের আয়তনপাত

রায় বাহাদুর রাজেশ্বর দাশগুপ্ত আই-এ-এস্, এম-আর-এ-এস (ইংলণ্ড)

কোন গ্রাম মাঠ কিম্বা বাড়ীর একটি শুদ্ধ নক্সা অঙ্কিত করিতে হইলে ঐ স্থানগুলি শুদ্ধরূপে জরীপ করিয়া লইতে হয়। কোন একটি স্থানের অবস্থা অর্থাৎ ঐ স্থানের চতুঃসীমানার মধ্যে যে সকল বাড়ী, ক্ষেত, পুকুর, নদী, নালা ইত্যাদি আছে তাহা পৃথক পৃথক ভাবে নক্সাতে দেখাইবার জন্য পরিমাপ করার নাম জরীপ।

জমি জরীপ করিয়া সেই জরীপের মাপ অনুযায়ী ঐ জমির যথাযথ অবস্থা কাগজে অঙ্কিত করিলে তাহাকে ঐ জমির ম্যাপ বা নক্সা বলে। কাগজে অঙ্কিত করার সময়ে জরীপের মাপগুলি একই অনুপাতে ছোট করিয়া লইতে হয়। যন্ত্রের সাহায্যে ঐ মাপগুলিকে বড় হইতে ছোট করা যায় তাহার নাম স্কেল বা ক্রমাঙ্কিত মানদণ্ড বা পরিমাণ দণ্ড।

জরীপ করার জন্য সাধারণতঃ কম্পাস অথবা প্লেন-টেবল নামক একটি যন্ত্র, একগাছা শিকল, শিকলের সংখ্যা ঠিক রাখিবার জন্য কয়েকটি লোহার লম্বা পিন, নিশান প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েকটি সরু লগী এবং জমিতে চিহ্ন রাখিবার জন্য কতকগুলি কাঠের ছোট খোঁটার আবশ্যক হয়।

গঠনভেদে কম্পাস দুইপ্রকার—সার্ভে কম্পাস এবং প্রিজ্‌মেটিক কম্পাস।

সার্ভে কম্পাস—ইহার প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি অঙ্গ থাকে—(১) গ্রাজুয়েটেড রিং বা ভাগচক্র (২) ম্যাগ্‌নেটিক নিড্‌ল বা চুম্বক শলাকা (৩) সাইড বা পার্শ্বফলক (৪) স্টেণ্ড বা ত্রিপয়া।

কম্পাসের গ্রাজুয়েটেড্ রিং বা ভাগচক্র তিন বা চারি ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি কলাই করা পিতলের চেপ্টা চাকার উপরিভাগকে সমান ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করিয়া ঐ ভাগগুলিকে ঘড়ির ডায়েলের বা ফলকের (Dial) ন্যায় রেখা টানিয়া পৃথক করা হয়। উহার এক একটি ভাগে পরিমাণ এক ডিগ্রি। উহার প্রতি পাঁচ ডিগ্রি অন্তর এক একটি অপেক্ষাকৃত লম্বা রেখা টানিয়া ঐ রেখাগুলির স্থানে ক্রমে ০, ৫, ১০, ১৫, ২০ অর্থাৎ পাঁচ পাঁচ ডিগ্রি অন্তর অঙ্ক বসাইয়া ৩৬০ ডিগি বা ০ পর্য্যন্ত অঙ্কপাত করা থাকে।

কম্পাসের ম্যাগনেটিক নিড্‌ল বা চুম্বক শলাকা

উল্লিখিত ভাগচক্রের ব্যাসের সমান লম্বা একটি লৌহ শলাকার এক মাথায় চুম্বক প্রয়োগ করিয়া চুম্বক শলাকা প্রস্তুত হয়। চুম্বক শলাকাটির ঠিক মধ্যস্থানে একটি ক্ষুদ্র গর্ত্ত থাকে এবং সেই গর্ত্তটিতে কাঁচ সংযোগ করা থাকে যেন কোন পিনের মাথা চুম্বক শলাকার ঐ গর্ত্তের মধ্যে থাকিলে শলাকাটি পিনের চারিদিকে অনায়াসে ঘুরিতে পারে।

তিন কিংবা চারি ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট একটি পিতলের অনুচ্চ গোল বাক্সের তলাতে (ভিতরের) উল্লিখিত ভাগচক্রটি স্থায়ীভাবে কীলক দ্বারা আবদ্ধ থাকে। ঐ বাক্সের ঠিক কেন্দ্রস্থানে একটি সূক্ষ্মাগ্র পিন আবদ্ধ করিয়া পিনের মাথা চুম্বক শলাকার উল্লিখিত কাঁচযুক্ত গর্ত্তে প্রবেশ করাইয়া শলাকটি পিনের মাথার উপরে বসাইয়া দিতে হয়। শলাকার যে মাথায় চুম্বক প্রয়োগ করা হইয়াছে সেই মাথাতে একটি কাটা চিহ্ন থাকে। চুম্বক শলাকাটি ঐ ভাবে স্থাপিত করিয়া বাক্সের উপরটি কাঁচ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয়।

সাইড বা পার্শ্বফলক—৩।৪ ইঞ্চি লম্বা, তিন পোয়া ইঞ্চি চওড়া দুই আনা পুরু পিতলের পাতের একখানার ঠিক মাঝখানে লম্বার দিকে একটি ফাঁক থাকে এবং ঐ ফাঁকের দুইটি ছিদ্র থাকে। একগাছা সরু সূতা অথবা ঘোড়ার লেজের চুল ঐ ফাঁকের ঠিক মাঝামাঝি আঁটাভাবে ঐ দুইটি ছিদ্রের সহিত আবদ্ধ করিয়া দিতে হয়। ঐ সূতা দ্বারা ফাঁকটি লম্বার দিকে সমান দুইভাগে বিভক্ত হওয়া চাই অর্থাৎ সূতাগাছা পাতের ঠিক মধ্যরেখার সহিত এক হইয়া থাকা চাই। দ্বিতীয় পাতটির লম্বার দিকে ঠিক মাঝামাঝি সূতার ন্যায় সরু একটি লম্বা ফাঁক থাকে।

প্রথমোক্ত পাতটি ভাগচক্রের ৩৬০ বা ০ চিহ্নিত স্থানে বাক্সের গায়ে বাহির পিঠে আড়ভাবে কীলক দ্বারা আবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয় পাতটি উহার ঠিক বিপরীত দিকে ১৮০ চিহ্নিত স্থানে ঐরূপ ভাবে আবদ্ধ থাকে। পাত দুইটি এইভাবে স্থাপিত হওয়ার ফলে প্রথম পাতটির মধ্যস্থ সূতা ৩৬০ বা ০ চিহ্ন ১৮০ চিহ্ন এবং দ্বিতীয় পাতের ফাঁক ঠিক একসমসূত্র হয়। এই পাত দুইটিকেই কম্পাসের সাইড বলে। কার্য্যের সুবিধার জন্য সাইড দুইটির গোড়ার দিক কব্জাতে পরিণত করিয়া দেওয়া হয়, যেন ইচ্ছামত উহা ভিতরের দিকে ভাঁজ করিয়া রাখা যায়।

কম্পাসের স্টেণ্ড বা ত্রিপায়া

চারি বা সাড়ে চারি ফিট্ লম্বা ত্রিকোণবিশিষ্ট তিনখানা সরু কাঠের মাথা পিতল দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন করিয়া ত্রিপায়া প্রস্তুত হয়। তিনখানা কাঠ এমন ভাবে সংলগ্ন থাকে যেন উহা ইচ্ছানুরূপ তিন দিকে ফাঁক করিয়া মাটির উপরে দাঁড় করিয়া রাখা যায়। ত্রিপায়ার মাথার পিতলের ঠিক মাঝখানে একটি মোটা পিতলের প্যাঁচ কাটা আল খাড়াভাবে সংযুক্ত থাকে। ঐ আলটি এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যেন উহা আবশ্যকমত ঘুরিতে পারে। কম্পাসের বাক্সটির নীচের কেন্দ্রস্থলে আলের মাপে একটি চোঙ্গ সংলগ্ন থাকে; চোঙ্গটির গর্ত্তের দিকে প্যাঁচ কাটা। কম্পাসের নীচে ঐ চোঙ্গের মুখ ত্রিপায়ার ঐ প্যাঁচকাটা আলের মাথায় রাখিয়া ঘুরাইলেই আলটি প্যাঁচে প্যাঁচে চোঙ্গের মধ্যে ঢুকিয়া যায়। এইভাবে কম্পাসটি ত্রিপায়ার উপরে ফিট করিয়া ইচ্ছানুরূপ চারিদিকে ঘুরানো যাইতে পারে।

ত্রিপায়ার উপরে কম্পাসটি ফিট করিয়া প্রথমেই দেখিতে হইবে কম্পাসের চুম্বক শলাকা কম্পাসের বাক্সের তলার (যাহার উপরে ভাগচক্র সংলগ্ন আছে) সহিত ঠিক সমতলভাবে আছে কিনা। সমতলভাবে না থাকিলে চুম্বক শলাকার এক মাথা নীচু হইয়া অথবা কম্পাসের তলাতে ঠেকিয়া থাকিবে। অপর মাথা উঁচু হইয়া কম্পাসের বাক্সের উপরিস্থিত কাঁচের আবরণের দিকে উঠিয়া থাকিবে। এই অবস্থায় চুম্বক শলাকার যে মাথা নীচু হইয়া আছে ঐ দিকের পায়ার গোড়া বাহিরের দিকে সরাইয়া পায়াটি নীচু করিয়া দিলেই চুম্বক শলাকাটি লেভেল বা সমতল হইয়া আলের উপরে ঘুরিতে থাকিবে। কিছুক্ষণ ঘুরিয়া চুম্বক শলাকা চুম্বকের ধর্ম্মানুযায়ী পৃথিবীর মেরুদণ্ডের ঠিক সমান্তরালভাবে উত্তর দক্ষিণে স্থির হইয়া থাকিবে। এখন কম্পাসের বাক্সটি যে দিকেই ঘুরানো থাক না কেন, চুম্বক শলাকা ঐ আলের উপর উত্তর দক্ষিণে ঠিক একভাবে স্থির হইয়া থাকিবে। চুম্বক শলাকার কাঁটা অর্থাৎ চিহ্নিত মাথা যে দিকে থাকিবে—উহাই উত্তর দিক এবং উহার বিপরীত মাথা দক্ষিণ দিক।

এখন কম্পাসটি ঘুরাইয়া ভাগচক্রের ৩৬০ বা ০ ডিগ্রির রেখাটি চুম্বক শলাকার কাটা মাথার ঠিক তলাতে লইয়া গেলে অপর মাথাটি ঠিক ১৮০ ডিগ্রির রেখার উপরে থাকিবে। কম্পাসটি এইরূপভাবে স্থাপন করিলে ভাগচক্রের ৯০ ডিগ্রির রেখা ঠিক পূর্ব্বদিকে এবং উহার বিপরীত ২৭০ ডিগ্রির রেখা ঠিক পশ্চিমদিকে আসিবে।

এখন কম্পাসটি বাম দিকে একটু ঘুরাইলে দেখা যাইবে ভাগচক্রের ৩৬০ ডিগ্রির রেখা চুম্বক শলাকার কাটা মাথার নীচু হইতে বামদিকে সরিয়া গিয়াছে এবং ঐ মাথাটির নীচে ভাগচক্রের আর একটি রেখা আসিয়া পড়িয়াছে। মনে করা যাক ঐ রেখাটি ভাগচক্রের ৩০ ডিগ্রির রেখা। পূর্ব্ববারে ভাগচক্রের উত্তর দক্ষিণ রেখা ঠিক পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ রেখার সহিত সমান্তরাল ভাবে স্থাপন করা হইয়াছিল তাহা এখন ৩০ ডিগ্রি পরিমাণ সরিয়া গিয়া পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ রেখার সহিত ৩০ ডিগ্রি একটি কোণ উৎপন্ন করিয়াছে। চুম্বক শলাকা অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ রেখার সহিত ভাগচক্রের উত্তর দক্ষিণ রেখার এইরূপ কৌণিক সংস্থানের নাম ব্যারিং (Bearing)। জরীপ করিবার সময় কম্পাসের ব্যারিং দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহা পরে লেখা হইতেছে।

প্রিসমেটিক কম্পাস

প্রিসমেটিক কম্পাস এবং সার্ভে কম্পাসের গঠনে একটু তফাৎ আছে। প্রিসমেটিক কম্পাসের ভাগচক্রটি বাক্সের তলাতে আবদ্ধ থাকে না। উহা আলগাভাবে থাকে। ভাগচক্রের ৩৬০ এবং ১৮০ ডিগ্রির স্থানের সহিত চুম্বক শলাকাটি স্থায়ীভাবে আবদ্ধ থাকে। এই অবস্থায় চুম্বক শলাকাযুক্ত ভাগচক্রটি বাক্সের কেন্দ্রস্থিত আলের উপর বসাইয়া দিলে উহা কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় সহজে ঘুরিতে পারে।

ইহা ছাড়া প্রিসমেটিক কম্পাসের দ্বিতীয় সাইড্‌টির গোড়াতে একটি প্রিজিম বা দৃষ্টিকাচ সংলগ্ন থাকে। কাচখানা একটি ত্রিপার্শ্ব পিতলের আবরণের মধ্যে সংবদ্ধ থাকে এবং ব্যারিং পড়ার জন্য কাচের আবশ্যক অংশ খোলা থাকে। উক্ত প্রিজমটি সংলগ্ন থাকে বলিয়াই উহাকে প্রিজমেটিক কম্পাস বলে।

প্রিজমেটিক কম্পাসের ব্যারিং পড়ার রীতি স্বতন্ত্র রকমের। সার্ভে কম্পাসের চুম্বক শলাকার কাটা মাথাটি দ্বারা ভাগচক্রের গায়ে অঙ্কিত ব্যারিং এবং রেখাগুলি নির্দ্দেশ হয়, কিন্তু প্রিজমেটিক কম্পাসের প্রিজম সংলগ্ন সাইডের বিপরীত দিকের সাইডটির ফাঁকে যে লম্বমান সুতাটি আবদ্ধ আছে তাহা দ্বারা ব্যারিং নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। একটি চোখ বন্ধ রাখিয়া অপর চোখ দ্বারা প্রিজমের কাচে দৃষ্টি করিলে ভাগচক্রের রেখা ও অঙ্কগুলি খুব বড় দেখায় এবং উল্লিখিত সাইড সংলগ্ন সুতাটি ভাগচক্রের কোন একটি রেখার সহিত মিলিত হইয়া আছে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যত ডিগ্রির রেখার সহিত সুতাটি সংলগ্ন থাকে তাহাই ব্যারিং বলিয়া গণ্য হয়।

শিকল

জরীপ করিবার জন্য সাধারণতঃ ১০০ ফিট এবং ৬৬ ফিট লম্বা শিকল ব্যবহৃত হয়। ৬৬ ফিট লম্বা শিকলকে গাণ্টার্স চেইন বলে। উভয় শিকলই ১০০ ভাগে বিভক্ত থাকে, উহার এক একটি ভাগকে লিঙ্ক বা কড়ি বলে। প্রতি ১০ কড়ি অন্তর এক একটি পিতলের ফুলি বাঁধা থাকে। ঐ ফুলি বাঁধা থাকাতে শিকলের কড়িগুলি গণনা করিবার সুবিধা হয়।

পরিমিতি

জমির কালি বাহির করিতে হইলে পরিমিতির নিয়ম সূত্রগুলি জানা থাকা আবশ্যক।

ত্রিভুজ

যদি পাদ ও লম্বের মাপ দেওয়া থাকে তবে ত্রিভুজের পাদের অর্দ্ধেক ও শীর্ষবিন্দু হইতে পাদের উপর লম্বের গুণফল ত্রিভুজের কালি। $\frac{\text{খ গ} \times \text{ক ঘ}}{২}$ যদি ত্রিভুজের মাপ দেওয়া থাকে তবে বাহুগুলির যোগফলের অর্দ্ধেক চ $= \frac{\text{ক ঘ} + \text{ক গ} + \text{খ গ}}{২}$ এবং কালি $=$

$$\sqrt{\text{চ}\,(\text{চ} - \text{ক ঘ})\,(\text{চ} - \text{ক গ})\,(\text{চ} - \text{খ গ})}$$

সমকোণ সমবাহু চতুর্ভুজের কালি	= একভুজ × অন্য একটি ভুজ
সমকোণ চতুর্ভুজের কালি	= দৈর্ঘ্য × প্রস্থ
অসমকোণ চতুর্ভুজের কালি	= পাদ × লম্ব (ক খ × চ ছ)
বৃত্তের কালি	= ব্যাস × ব্যাস × ·৭৮৫৪
ঐ	= ব্যাসার্দ্ধ × ব্যাসার্দ্ধ × ৩·১৪১৬
ঐ	= পরিধি × পরিধি × ·০৭৯৬
ঐ	= ব্যাস × ব্যাসার্দ্ধ × ১·৫৭
ঐ	= পরিধি × ব্যাস ÷ ৪

বৃত্তের পরিধি $= \text{ব্যাস} \times ৩\cdot১৪১৬$

" " $= \sqrt{\text{বৃত্তের কালি}} \times ৩\cdot৫৪$

" " $= \text{পরিধি} \times \cdot৩১৮৩$

" " $= \sqrt{\text{বৃত্তের কালি}} \times ১\cdot১২৮৩$

ব্যাসার্দ্ধ $= \text{পরিধি} \times \cdot১৫৯১$

" $= \sqrt{\text{বৃত্তের কালি}} \times \cdot৫৬৪$

চোঙ্গের কালি

চোঙ্গের কালি চোঙ্গের বহির্দ্দেশের কালি = দুই মুখের কালি + দৈর্ঘ্য × পরিধি।

= এক মুখের কালি × দৈর্ঘ্য।

চোঙ্গ বা পিরামিডের কালি

$= \text{পাদদেশের কালি} \times \frac{\text{দৈর্ঘ্য}}{২}$।

বক্রবাহু জমির কালি বাহির করিবার নিয়ম

মনে কর কখগঘ একটি ক্ষেত্র আছে। এখন কখ রেখা হইতে কগ ঘথ বক্র বাহুর প্রত্যেক কোণ হইতে কঘ রেখার উপর লম্ব টান; ইহাতে সমগ্র ক্ষেত্রটি কয়েকটি সমকোণী ত্রিভুজ ও অসমবাহু চতুর্ভুজে বিভক্ত হইবে।

$$\text{কালি} = \frac{\text{ঘট} \times \text{কট}}{২} + \frac{\text{ঘট} + \text{চঠ}}{২} + \frac{\text{চঠ} + \text{ছঢ}}{২} + \text{ঠঢ}$$
$$+ \frac{\text{ছঢ} + \text{জড}}{২} \times \text{ঢড} + \frac{\text{জড} + \text{গণ}}{২} \times \text{ডণ}$$
$$+ \frac{\text{গণ} \times \text{ণথ}}{২}$$

জমিকে সমকোণ করিতে হইলে চেইনের ৪০ লিঙ্ক মাপিয়া সোজা দাগ দিয়া দুই দিকে দুইটি গোঁজ পুঁতিয়া দেও। পরে একটি গোঁজ হইতে লম্বভাবে ৩০ লিঙ্ক এরূপ ভাবে লও যেন অপর গোঁজ হইতে ৩০ লিঙ্কের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ৫০ লিঙ্ক হয়। তাহা হইলে "ক" কোণ সমকোণ হইবে।

(১) কখ = খগ নদী বা জলাশয়ের প্রস্থ = কচ = গঘ নদী কিম্বা কোন জলাশয় চেইন দিয়া মাপা যায় না তাহা মাপিতে হইলে নদী বা জলাশয়ের অপর পারের কোন একটি দৃশ্যমান বস্তুর সহিত এক লাইনে একটি চিহ্ন দেও। পরে এখান হইতে সোজা কতক দূর পর্য্যন্ত যাইয়া আর একটি চিহ্ন দেও। আর কতক দূর অগ্রসর হও যে পর্য্যন্ত প্রথম চিহ্ন হইতে দ্বিতীয় চিহ্নের দূরত্ব দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় চিহ্নের দূরত্বের সমান না হয়। এই তৃতীয় চিহ্ন হইতে একটি লম্ব টান যে পর্য্যন্ত নদী বা জলাশয়ের অপর পারের বস্তু, দ্বিতীয় চিহ্ন ও লম্বের অগ্রভাগ এক লাইনে না হয়।

এখন তৃতীয় চিহ্ন হইতে লম্বের মাপ নদী, বা জলাশয়ের প্রস্থের মাপের সমান। জমি মাপিবার ও নক্সা আঁকিবার জন্য সার্ভে শিক্ষার প্রয়োজন। সাধারণতঃ দুইরকমের চেন বা শিকল ব্যবহৃত হয় (১) গাণ্টার চেইন (২) সার্ভেয়িং চেইন।

গাণ্টার চেইন ৬৬ ফিট লম্বা এবং সার্ভেয়িং চেইন ১০০ ফিট লম্বা। প্রত্যেক প্রকার ১০০ ভাগে বিভক্ত এবং উহারই এক এক ভাগকে লিঙ্ক কহে। জমি মাপিবার জন্য চেনই প্রশস্ত। কোন একটি জায়গার মাপমত নক্সা আঁকিতে হইলে ওই জায়গার যাবতীয় জিনিষের প্রতিকৃতি দেখান উচিত। সেইজন্য প্রথমতঃ এমন কয়েকটি সুবিধাজনক ষ্টেশন ঠিক করিতে হইবে যাহা হইতে চতুঃসীমানার মাপ ও অন্যান্য সকল বস্তু গাছ, বাড়ী, পুকুর, ক্ষেত ইত্যাদির অবস্থান নক্সাতে উঠানো যায়। এইরূপে ষ্টেশন ঠিক হইলে উহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া যথাক্রমে ক, খ, গ ইত্যাদি নাম দিয়া ক হইতে খ, ঘ হইতে গ, এইরূপ ভাবে যথাক্রমে সকলগুলি ষ্টেশন পরিভ্রমণ করিয়া এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশনের দূরত্ব মাপিবে এবং দুই ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী গাছ, বাড়ী ইত্যাদির চেন হইতে দূরত্ব ঠিক করিবে। চেন হইতে লম্ব টানিয়া ওই লম্বের মাপ নিবে, ইহাকে "অফসেট" নেওয়া বলে। একটি পুস্তকে ওই সকল মাপ লিখিয়া নিবে। পরিশিষ্টে একটি পুস্তকের মাপের নকলও তাহা হইতে প্রস্তুত করা নক্সা দেওয়া হইল। অনেক সময় কোণের পরিমাণ নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়।

কোণ মাপিবার জন্য একপ্রকার যন্ত্র আছে উহাকে "কম্পাস" কহে (চিত্র দেখ) নক্সা আঁকিতে হইলে মাপকাঠি ও যন্ত্রের দরকার। তোমাদের স্কুলে এ সকল যন্ত্র আছে তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, এখানে সেজন্য উহাদের নাম উল্লেখ করা হইল না।

চেন দিয়া এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনের দূরত্ব মাপিতে হইলে, উহাদের এক হইতে অপর পর্য্যন্ত সোজা লাইনে যাইবে, সেজন্য যাহারা চেন টানে তাহাদের গতি ঠিক করিবে। কোন দুইটি বস্তু এক লাইনে থাকিলে উহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সেই লাইনে চিহ্ন দেওয়া মোটেই কঠিন নহে। এরূপভাবে সোজা লাইন টানা সহজ এবং অল্প সময়-সাপেক্ষ।

যদি এই লাইনের মধ্যের কোন জায়গায় এমন নালা জলাশয় বা অন্য কোনরূপ প্রতিবন্ধক পড়ে যাহার অপর পার্শ্ব দেখা যায় তবে চেন যে পর্য্যন্ত টানা যায় সে সীমা পর্য্যন্ত, উহা হইতে একটি লম্ব টানিয়া পুনরায় লম্বের উপর লম্ব টান। এই লম্ব যতক্ষণ এই প্রতিবন্ধকের সীমা অতিক্রম না করে সে পর্য্যন্ত উহা টানিয়া নিয়া পুনরায় এই সীমা হইতে প্রথম লম্বের সমান একটি লম্ব টান। এখন গ, ঘ, ক, খ এর সমান।

যদি প্রতিবন্ধকের অপর ধার দেখা না যায় তবে চেনের একই ধারে দুইটি জায়গা হইতে দুইটি সমান মাপের লম্ব টান। এই দুইটি লম্বের যোগে যে লাইন হইল উহা সোজাভাবে চালাইয়া নেও। পরে এই নূতন লাইনের উপর পূর্ব্বের ন্যায় সমান মাপের লম্ব টান লম্ব দুইটির মাথা হইতে সোজা লাইন টানিয়া নেও। এখানে লেভেলিং সম্বন্ধে দুই একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জমির একস্থান অপর স্থান হইতে কত উঁচু বা নীচু তাহা ঠিক করিতে হইলে লেভেলিং ইনষ্ট্রুমেণ্ট নামক

ডাল্‌ডা আমার পক্ষে ভালো
সকলের পক্ষেই ভালো কারণ ইহা বিশুদ্ধ।
ডাল্‌ডা তৈরী করবার সময় হাত দিয়ে ছোঁয়া হয়না আর বিশুদ্ধ ও তাজা রাখবার জন্যে বায়ুরোধক শীলকরা টিনে প্যাক করা থাকে।
সকলের পক্ষেই ভালো কারণ ইহা পুষ্টিকর।
ডাল্‌ডা তৈরী ক'রতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদ্ভিজ্জ তেল ব্যবহার করা হয়—আর তাতে স্বাস্থ্যদায়ী 'এ' ও 'ডি' ভিটামিনও আছে।
সর্ব্বত্রই বুদ্ধিমতী মা'য়েরা ডাল্‌ডা বনস্পতি দিয়ে রান্না করেন, কারণ ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি ও শক্তির জন্য যে তাজা ও পুষ্টিকর স্নেহপদার্থের দরকার হয় ডাল্‌ডাতে তা পাওয়া যায়। রান্নার যে কোনও সমস্যায় বিনামূল্যে উপদেশের জন্য লিখে দিন —দি ডাল্‌ডা এ্যাডভাইসারি সার্ভিস, ইণ্ডিয়া হাউস (জি, পি, ও'র সামনে) বোম্বাই ১।
১/২, ১, ২, ৫ ও ১০ পাউণ্ড টিনে ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়
ডাল্‌ডা বনস্পতি
রাঁধতে ভালো—
খরচ কম
DALDA
ডাল্‌ডা

যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। যন্ত্রটি ঠিক সমতলভাবে বসাইয়া খাড়াই মাপিবার কাঠের ফলক বিভিন্ন জায়গায় বসাইয়া মাপ লিখিয়া নিবে। তৎপর যোগ অথবা বিয়োগ করিয়া আপেক্ষিক উচ্চতা বা নিম্নতা ঠিক করিবে। পরিশিষ্টে উদাহরণ দেওয়া গেল।

ক্ষেত্রের পরিমাণ বা আয়তনপাত

কোন জায়গায় ক্ষেত্রপাত করিবার পূর্ব্বে উহার একটি নক্সা আঁকা এবং কোন্ দিক উঁচু বা কোন্ দিক নীচু তাহা জানা দরকার। নক্সাতে সুবিধামত রাস্তা, নালা ইত্যাদি আঁকিয়া জমিতে সেইভাবে খুঁটি পাতিয়া রাস্তা নালা ইত্যাদির স্থান নির্দ্দেশ করিবে। পরে আবশ্যকমত ক্ষেত্রপাত করিবে। যতগুলি বড় বড় সমকোণ চতুর্ভুজ ক্ষেত্র করিতে পারা যায় তাহা করিয়া অবশিষ্টগুলি অন্য আকারের রাখিবে। ক্ষেত্রগুলি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থের প্রায় তিনগুণ হইলে চাষের পক্ষে বিশেষ সুবিধা এবং সুন্দর দেখিতে হয়। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান করা যায় কিন্তু তাহাতে চাষের তত সুবিধা হয় না।

১ একর = ৪৩৫৬০ বর্গ ফুট

১ বিঘা = ১৪৪০০ বর্গ ফুট

১ কাঠা = ৭২০ বর্গ ফুট = ৩২০ বর্গ হাত

এই কয়েকটি বর্গ মাপ মনে রাখিলে ক্ষেত্রপাত করিতে কোন অসুবিধা হইবে না।

দৃষ্টান্ত

মনে কর—রাস্তা বাহির করিবার পর দৈর্ঘ্যে ৪৯৪ ফুট ও প্রস্থে ৩৫২ ফুট একটি জমি বাহির হইল। এখন ইহাতে যতগুলি সম্ভব ১ একর পরিমাণ ক্ষেত্রপাত করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে কি পরিমাণ চওড়া আল রাখিয়া সুন্দররূপে ক্ষেত্রপাত করা যায়। ১ একর জমি ৪৩৫৬ বর্গ ফুট। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দৈর্ঘ্যে প্রস্থের প্রায় তিনগুণ হইলে ভাল হয়। এখন ৪৩৫৬ বর্গ ফুটকে সেই পরিমাণ বিভাগ কর। ৩৬ ফুট প্রস্থ ও ১২১ ফুট দৈর্ঘ্য হইলে ঠিক ১ একর জমি পাওয়া যায়। জমির প্রস্থ ৩৫২ ফুট, ইহাকে ৩৬ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ৯ ও ২৮ ফুট অবশিষ্ট থাকে এবং ৪৯৪ কে ১২১ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ৪ এবং ১০ ফুট অবশিষ্ট থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বসমেত ৩৬টি ১ একর ক্ষেত্রপাত করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রস্থের ২৮ ফুট ও দৈর্ঘ্যের ১০ ফুট জমি অবশিষ্ট থাকে। এই জমি আলের জন্য লইলে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রই বিভিন্ন হইয়া যাইবে।

প্রস্থে ৯ ভাগ সুতরাং ইহাতে ৮টী আল হইলে চলে, ২৮কে ৮ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ৩ ও ৪ ফুট অবশিষ্ট থাকে। এই ৪ ফুট জমি সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশেষ ক্ষেত্র বা জমিতে ভাগ করিয়া দিলে দুইদিকে ২ ফুট ও মাঝে ৩ ফুট করিয়া আল থাকিবে যে ১০ ফুট জমি অবশিষ্ট ছিল তাহা এই তিনটির ৩ ফুট করিয়া আল করিয়া দিলে ১ ফুট জমি অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু এইরূপ না করিয়া দৈর্ঘ্যের ৪ ভাগে ২ ফুট ৫টী আল দিলে মোট জমির চতুর্দ্দিকেই আল থাকিবে। এইরূপ যে কোন জমির মাপ দেওয়া থাকিলে এবং কি আয়তনের ক্ষেত্রপাত করিতে হইবে বলা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বনে ক্ষেত্র ভাগ করিবে।

বাড়ী ও বিদ্যালয় সংলগ্ন আঙ্গিনা

বাড়ী ও বিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানগুলি গাছগাছড়া লাগাইয়া সুন্দর রাখিলে কেবল প্রীতিপ্রদ হয় তাহা নহে, অধিকন্তু বালক-বালিকাদের উহাতে শিক্ষা দেওয়া যায়। গাছগাছড়া লাগাইতে চিন্তা ও অনুশীলন দরকার। ইহা করিতে হইলে দুইটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কি কি গাছ কোন জায়গায় লাগাইলে দেখিতে মনোরম হয় তাহা নির্ব্বাচন করিতে হইবে। কতকগুলি গাছ একজায়গায় লাগাইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। যে জায়গায় যে গাছ বসাইলে সুন্দর দেখায় ও অন্যান্য বস্তুর সহিত সামঞ্জস্য থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। মাটি কিরূপ তাহাও দেখিবে। মোট কথা গাছ বসাইবার পূর্ব্বে যাহাতে সমস্ত জায়গাটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় তাহা করিবে গাছ বসাইতে বিশেষ যত্ন লইবে, যেন উহা সহজে বৃদ্ধি পায়।

অনেক সময় অবহেলাবশতঃ গাছ মরিয়া গেলে পুনরায় সেখানে গাছ লাগাইবার ইচ্ছা হয় না; সুতরাং যে সকল গাছ সহজে মরে না সেই সকল গাছই লাগানো কর্ত্তব্য।

আঙ্গিনাতে রাস্তা বাহির করিয়া তাহার দুই পার্শ্বে সারবন্দি করিয়া গাছ লাগাইলে দেখিতে সুন্দর হয়। আঙ্গিনার মাঝে মাঝে গুল্ম বসানো যাইতে পারে। যে সকল গাছ খুব বড় হয় তাহা না লাগানোই ভাল। গাছগুলিকে সময়মত ছাঁটিয়া কাটিয়া (Prune) নানারূপ আকার দেওয়া যাইতে পারে। সৌন্দর্য্য বাড়াইবার উদ্দেশ্যে এরূপ করা যুক্তিসঙ্গত। চারা গাছ কিনিয়া আনিয়া অথবা বীজ হইতে গাছ উৎপন্ন করিয়া তাহা ছোট থাকিতেই জায়গামত কেয়ারী করিয়া বসাইবে। গাছ উঠাইবার সময় যাহাতে শিকড় কাটা না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক হইবে। বেশ বড় গর্ত্ত (৩ ফিট চওড়া ও ৩ ফিট খাড়াই) করিয়া মাটি তুলিয়া ফেলিবে। যদি এই মাটি শক্ত ও ভাল না হয় তবে জল, মাটি ও তাহার সহিত সার মিশ্রিত করিয়া গর্ত্ত পরিপূর্ণ করিয়া তাহার উপর গাছ লাগাইবে, মনে রাখিবে যেন শিকড়ে অযথা চোট না লাগে।

দেবদারু, কামিনী, বিলাতী ঝাউ, সিলভার ওক্, বটলপাম্, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, অশোক চাঁপা, নাগেশ্বর, কিংশুক ইত্যাদি গাছ লাগানো যাইতে পারে।

সব্জীবাগ ও ফুল বাগান

প্রত্যেক বাটীর অথবা কৃষি বিদ্যালয়ের সংলগ্ন বাগ বাগিচা থাকা আবশ্যক। ইহাতে বালক বা বালিকাগণ হাতে হেতেড়ে কাজ শিক্ষা করিতে পারে। এরূপ কাজে সৌন্দর্য্য এবং তত্ত্বানুসন্ধানের স্পৃহা জন্মে

অর্থাৎ জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বিদ্যালয়ে যদি এ সকল বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে তবে বালকগণ নিজ নিজ বাটীতে ছোট ছোট বাগান করিতে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হয়। সুন্দর জিনিষ সকলেই ভালবাসে, সুতরাং নিজের বাটীতে বাগবাগিচা করিয়া যে নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিতে পারে এরূপ আর কিছুতেই পারে না। নিজের যত্নে উৎপন্ন ফলফুল ইত্যাদির সহিত বাজারের কৃত জিনিষের তুলনা হয় না। বাগান রচনায় বালকদের সৌন্দর্য্য বোধেরও আভাস পাওয়া যায়। বিদ্যালয়সংলগ্ন বাগানে যে পরিমাণ জায়গা পাওয়া যায় উহাতে সুবিন্যস্তভাবে ফুলগাছ ইত্যাদি বসাইবে। কতকটা জায়গায় ঘাস লাগাইয়া তাহার চারিদিকে ছোট ছোট অথচ সুদৃশ্য কেয়ারী করিয়া তাহাতে ফুলগাছ বসাইতে পারা যায়। কেয়ারী নানাপ্রকারের করা যাইতে পারে যেমন গোল, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, চৌকা, ত্রিভুজ ইত্যাদি জ্যামিতিক নক্সা অনুযায়ী।

আর এক প্রকারে কেয়ারী করা যাইতে পারে উহা প্রস্তুত করিতে স্বাভাবিক পরিবেশের দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়, তবে এরূপ "স্বাভাবিক" কেয়ারী ছোট বাগানে চলে না—ইহার জন্য সুবিস্তৃত বাগিচার প্রয়োজন হয়।

এমন সকল জাতীয় গাছ লাগানো দরকার, যাহাতে বারমাসই ফুল পাওয়া যায়। মরশুমী ফুল শীতের প্রারম্ভে লাগাইবে। কেয়ারীর মাটি উত্তমরূপে কোপাইয়া খুঁড়া এবং হাল্‌কা করিয়া লইবে। পরে সার প্রয়োগ করিয়া জমি "পাট" করিবে। ফুলের চাষে বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক। কোনরূপ আগাছা জন্মিতে দিবে না। সব্জীবাগ সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য। ছোট ছোট কেয়ারীতে নানাপ্রকারের সব্জী লাগাইবে। তাহাতে প্রত্যেক জাতীয় ফসলের বৃত্তান্ত শিক্ষা করিতে পারিবে। হাতে হেতেড়ে কাজ করিয়া ও স্বচক্ষে সকল বিষয়ে দেখিয়া যে অভিজ্ঞতা জন্মে পুঁথি পড়িয়া তাহা সম্পূর্ণ হয় না। গোলাপ, বেলী, রজনীগন্ধা, জুঁই, চামেলী, গাঁদা, জবা, গন্ধরাজ, মল্লিকা, কলাপতি, টগর, দোপাটি নানারূপ মরশুমী ফুলের চাষ করা যাইতে পারে।

ফুলকপি, বাঁধাকপি, শালগম, গাজর, ওলকপি, ঢ্যাঁড়স, বিলাতী-বেগুন, আলু, বেগুন, লঙ্কা ও অন্যান্য নানাপ্রকারের শাক, সব্জী ছোট ছোট ক্ষেতে চাষ করিতে পার। বাগান করিতে হইলে ফুলগাছ ইত্যাদি যত্নসহকারে নির্ব্বাচন করিবে এবং সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গাছ লাগাইবে।

মৃত্যু-তীর্ণ

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

দেখেছি ঝড়ের রাত : সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন,
উত্তুংগ পাহাড় ধ্বসে মিশে গেছে মাটির জঠরে ;
দেখেছি দুর্ভিক্ষ মারী—মরণের তাণ্ডব নর্তন—
উলংগ পিশাচ-লীলা সভ্যতার চিতাভূমি 'পরে।

অবন্তী বিদিশা কতো, কতো কাঞ্চী কতোনা কোশল—
আজ ইতিকথা শুধু। কতো ট্রয় পুড়ে হলো ছাই !
নিষ্ঠুর মন্থনে ওঠে বারে বারে হিংসার গরল—
ভুলের মদের নেশা—তবু যেন এর শেষ নাই।

আবার শুনেছি আমি মেঘে মেঘে বজ্রের ঝঞ্ঝনা,
সমগ্র পৃথিবী কাঁপে থরো থরো—সে এক প্রলয় !
নিশান্তে আদিত্য হাসে, ঘাসে ফুলে আলোর আল্পনা ;
দুর্যোগ রাতের কথা মনে হয়, যেন কিছু নয়।

থাক ধ্বংস মহামারী কিংবা ক্ষয় ক্ষতি অফুরাণ ;
তবু মৃত্যুতীর্থে জানি, জীবনের শিখা স্বনির্বাণ।

স্বাগতম্—

স্বাধীন ভারতে নবযুগ আরম্ভ হইয়াছে। চীন-নেতা চো-এন-লাই, ব্রহ্ম-নেতা ইউ-নু, মার্শাল টিটো প্রভৃতির আগমনের ফলে এসিয়ার শক্তিগুলি সংহত হইয়াছিল। আজ সর্বাপেক্ষা প্রধান মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য রুশ-নেতা মার্শাল বুলগানিন, তাঁহার একজন প্রধান সহকর্মী মঃ ক্রুসেভকে সঙ্গে লইয়া গত ১৮ই নভেম্বর দিল্লীতে আসিয়াছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু রাশিয়া ভ্রমণে যাইলে তাঁহাকে যে অপূর্ব সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, ভারতবাসী আজ
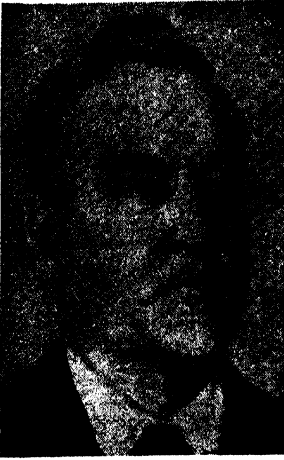
বুলগানিন

তাহা সিনেমার সাহায্যে দর্শন করিতেছে। বুলগানিনের সম্বর্দ্ধনাও সে জন্য বিরাটভাবেই করা হইতেছে। তাঁহার আগমন দিবসে দিল্লীতে যে লোক সমাগম দেখা গিয়াছে, দিল্লীর ইতিহাসে তাহা শুধু অভিনব নহে, অসাধারণ। আজ সমগ্র বিশ্বে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টায় নেহরু-বুলগানিনের মত দুইজন শক্তিশালী নেতার প্রচেষ্টা দেখিয়া জগতের লোক মনে আশ্বাস লাভ করিতেছে—অদূর ভবিষ্যতে জগতে আর যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিবে না। সমগ্র ভারতের অধিবাসী আজ বুলগানিন দর্শনের জন্য ব্যাকুল। তাঁহার আগমন যে ভারতে নূতন শক্তির সঞ্চার করিবে এবং
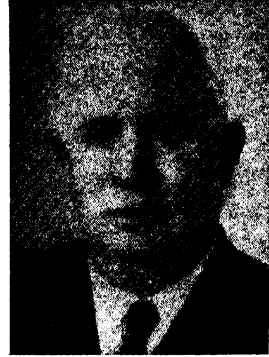
ক্রুসেভ

রাশিয়ার নেতার আদর্শে দেশকে গঠনকার্য্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন—

৮ই নভেম্বর দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় স্থির হইয়াছে যে আগামী ৮ই হইতে ১৩ই ফেব্রুয়ারী অমৃতসরে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী ৮ই ও ৯ই ফেব্রুয়ারী, বিষয়-নির্বাচন কমিটী তথা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী ৯ই ও ১০ই এবং কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন ১১ই, ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী, কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন একটি সর্ব-ভারতীয় জাতীয় মেলা—ইহার আড়ম্বর ও প্রয়োজনীয় উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। পাঞ্জাব-সীমান্তে ইহার অধিবেশন নানা দিক দিয়া ইহার প্রয়োজন বৃদ্ধি করিয়াছে।

বুদ্ধদেবের ২৫০০ জন্মোৎসব—

১৯৫৬ সালের মে মাসে বুদ্ধ গয়ায় বুদ্ধদেবের ২৫০০ তম বার্ষিক জন্মোৎসব পালিত হইবে। ঐ উপলক্ষে আগত যাত্রীদিগকে বাসস্থান ও যানবাহন প্রদানের জন্য

আরও মসৃণ, কমনীয় ত্বক্
দিনে দিনে...
ক্যাডিল্*যুক্ত রেক্সোনা'কে
আপনার অবগুণ্ঠিত রূপকে
উন্মোচন করতে দিন
রেক্সোনা'র ক্যাডিল্-সমৃদ্ধ ফেনা আপনার ত্বকে
মোলায়েমভাবে রগড়ে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন,
আপনার ত্বক্ দিনে দিনে মসৃণতর আর কোমল হয়ে'-
এক নতুন উজ্জ্বলতর কমনীয়তায় ভরে তুলেছে।

বিহার সরকার ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন, বুদ্ধদেবের এই জন্মোৎসব সর্বভারতীয় ও সমগ্র এসিয়া খণ্ডের উৎসব। ইহার জন্য সর্বত্র এখন হইতে উপযুক্ত আয়োজন হওয়া উচিত।

কবি রাসবিহারী মল্লিক—

গত ২০শে অক্টোবর উড়িষ্যায় পুরীধামে সামন্ত চন্দ্রশেখর কলেজ হলে কলিকাতা নিবাসী পুরাতত্ত্ব-বিশারদ ও কবি শ্রীরাসবিহারী মল্লিককে 'কবিচন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। রাসবিহারীবাবু পাথুরিয়া ঘাটার ৺যদুলাল
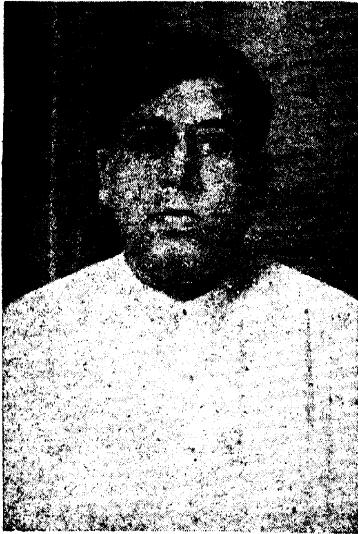
শ্রীরাসবিহারী মল্লিক কবিচন্দ্র

মল্লিকের পৌত্র ও ৺মন্মথনাথ মল্লিকের পুত্র। গুণীর এই সমাদরে, বিশেষত অন্য রাষ্ট্রবাসীদের দ্বারা সম্মান দানে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

পশ্চিমবঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা সমস্যা—

৮ই নভেম্বর দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সিদ্ধান্তে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সমস্যার কথা আলোচিত হইয়াছে। তিনটি রাজ্যের দাবী শুনিবার পর কমিটী নিম্নলিখিত ৪ জন নেতার উপর ঐ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত করিবার ভার দিয়াছেন—(১) কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ-এন-ডেবর (২) প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরু (৩) মৌলানা আবুলকালাম আজাদ ও (৪) পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ। পশ্চিমবঙ্গের দাবী সম্পর্কে কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত অতুল্য ঘোষ যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা না পাইলে পশ্চিমবঙ্গ সন্তুষ্ট হইবে না এবং যত দিন তাহা না পাওয়া যায়, ততদিন জোর আন্দোলন চালাইবে।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর এবং ১লা ও ২রা জানুয়ারী মাদ্রাজ সহরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে। খ্যাতনামা ভাস্কর ও শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ঐ সম্মিলনের মূল-সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও রেল কর্ত্তৃপক্ষ এক ভাড়ায় যাতায়াতের সুযোগ দিবেন। দশ টাকা প্রতিনিধি ফি দিলে অভ্যর্থনা সমিতি তথায় আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন। যাঁহারা যাইতে চাহেন, তাঁহাদের মাদ্রাজ মাউণ্ট রোড, এয়ার লাইন্স হোটেলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীবিরাজমোহন দাসের সহিত পত্রালাপ করিতে হইবে।

ডক্টর মোহিনীমোহন বিশ্বাস—

ভারতবর্ষের লেখক এবং বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেডের গবেষক—রাসায়নিক শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানে 'ডি-ফিল' উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র গবেষণাগারে কলয়েডস্ সিরাম ও এনজাইন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়—

গত ৪ঠা কার্তিক বাঁকুড়া সহরে স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্যোগে খ্যাতনামা কোবিদ আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সপ্তনবতিতম (৯৭) জন্মদিবসে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। যোগেশবাবু এখনও কর্মঠ জীবনযাপন করিতেছেন। তিনি বাঙ্গালা দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের মধ্যে বৃদ্ধতম। তাঁহার জন্মদিন স্মরণে আমরাও তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধাভিবাদন জ্ঞাপন করি।

শিবপুর বাগানের গুল্মশালা—

কলিকাতার নিকট হাওড়া শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেনের গুল্মশালাকে জাতীয় গুল্মশালা রূপে গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদ গবেগণার আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উহাকে সর্বভারতীয় গবেষণাগারে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভারতীয় ভেষজগুল্ম ও উদ্ভিদ সম্পদ সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধান ও গবেষণার পরিকল্পনা ঐ সঙ্গে স্থির হইয়াছে। ক্রমে উহাকে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার বৃহত্তম গবেষণা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হইবে। উহা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত থাকায় বাঙ্গালীরা উহা দ্বারা অবশ্যই অধিক উপকৃত হইবেন।

শিশির কলা কেন্দ্রম্—

গত ১৯শে কার্তিক শিশির কলা কেন্দ্রমের উদ্যোগে উহার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীদুর্গাপদ বাগচীর ২৭ উল্টাডাঙ্গা মেন রোডের বাটীতে বিজয়া সম্মিলন হইয়াছিল। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅখিল নিয়োগী প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও কলা-রসিক উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক বাগচী মহাশয় ঘোষণা করেন. যে কেন্দ্রমের দুইটি সাহায্য রজনী করিয়া সেই অর্থ তিনি রাজ্যপাল বন্যা সাহায্য ভাণ্ডার ও সাংবাদিক বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারে দান করিবেন।

শিশির কলা কেন্দ্রের বিজয়া সম্মেলনে—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅখিল নিয়োগী, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীদক্ষিণা বসু প্রভৃতি

ইলেকট্রোনিক ব্রেণ—

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিসটিকাল ইনষ্টিটিউট (পরিসংখ্যান সংস্থা) সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া হইতে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইলেকট্রোনিক্ ব্রেণ ক্রয় করিয়াছেন। ঐ যন্ত্রটির দ্বারা বিরাট বিরাট অঙ্ক ও হিসাবের কাজ নির্ভুলভাবে সমাধা করা যাইবে। এরূপ বৃহৎ ইলেকট্রোণ চালিত যন্ত্র এসিয়ায় এই প্রথম স্থাপিত হইতেছে। বিজ্ঞানকে এই ভাবে জনকল্যাণ কার্য্যে নিযুক্ত করিলে বিজ্ঞানের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। তবে এই সঙ্গে যান্ত্রিক সভ্যতা যাহাতে বেকার সমস্যা আনয়ন না করে, সে বিষয়ে সকলকে সাবধান থাকিতে হইবে।

অধিক ইস্পাত উৎপাদনে
রুশ পদ্ধতি—

ভারতের একটি সরকারী প্রতিনিধি দল ইস্পাত সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন দেশ পরিদর্শনের পর ভারত সরকারের নিকট রিপোর্ট দিয়াছেন; অধিক পরিমাণে ইস্পাত উৎপাদনের দিক দিয়া রুশ পদ্ধতি অধিকাংশ দেশ অপেক্ষা উন্নততর। রুশ যন্ত্রপাতিসমূহই অধিক পরিমাণে ইস্পাত উৎপাদনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। ঐ সকল যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতে তিনটি নূতন ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ইস্পাত উৎপাদন পদ্ধতি বহু উন্নত হইয়াছে—

বৃটীশ সেই পদ্ধতি অনুকরণ করিয়াছে। জার্মানীও এ বিষয়ে নূতন পদ্ধতিতে কাজ করিতেছে। কিন্তু প্রতিনিধিদলের মতে রুশ পদ্ধতি সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়াছে।

সংগীত-সাধক শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল সংবর্ধনা—সভাপতি শ্রীহেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ ও প্রধান অতিথি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

ফটো—মদন বসু

জাতি গঠনের কার্য্য—

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের কয়লার খনি অঞ্চলের মধ্যস্থল আসানসোলে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ২০০ শয্যাবিশিষ্ট এক নূতন হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন—জাতি গঠন করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির যাহাতে কল্যাণ সাধিত হয়, তাহার জন্য জনগণের আগ্রহশীল হওয়া আবশ্যক। কয়লার উপর সেস প্রদান করিয়া তদ্বারা জনকল্যাণ-মূলক তহবিল গঠন করিয়া সেই অর্থে এই হাসপাতাল নির্মিত হইয়াছে। এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জনকল্যাণ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। তদ্বারা দেশও যেমন উপকৃত হইবে, দাতাও তেমনই লাভবান হইবেন।

পাসপোর্ট ও ভিসার কঠোরতা হ্রাস—

কিছুদিন পূর্বে করাচীতে ভারতের মন্ত্রী শ্রীমেহের চাঁদ খান্না ও পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মেজর-জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার মধ্যে বৈঠকের ফলে স্থির হইয়াছে যে তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের সরকারের নিকট সুপারিশ করিয়া উভয় দেশের মধ্যে যাতায়াতের জন্য বর্ত্তমান ঝঞ্ঝাট-পূর্ণ পাসপোর্ট ও ভিসা ব্যবস্থার কঠোরতা হ্রাস করিবেন। ঐ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে ভারত-পাকিস্তান পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনেকটা বিশ্বের অন্যান্য স্থানের পাসপোর্ট ও ভিসার নিয়মাবলীর সমান হইবে। উভয় দেশে পৌছিবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ভারতীয় ও পাকিস্তানী নাগরিকদের পুলিসের নিকট তাঁহাদের আগমনের সংবাদ দিবার জন্য বিধানে রীতি রহিয়াছে। বৈঠকে সেই রীতিও বিলোপ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ইহার ফলে উভয় দেশে অধিবাসীদের গমনাগমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উভয় দেশই উপকৃত ও সমৃদ্ধ হইবে।

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত সংবর্ধনা

ফটো—রঞ্জন বিশ্বাস

পরলোকে ক্ষিতীন্দ্রনাথ নন্দী—

বিখ্যাত 'কাজল কালি' প্রস্তুতকারক মেসার্স কেমিক্যাল এসোসিয়েশনের অন্যতম পরিচালক এবং

পরলোকে ক্ষিতীন্দ্রনাথ নন্দী

কর্ম্মাধ্যক্ষ ক্ষিতীন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয় হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া গত ১২ই অক্টোবর পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৬৩ বৎসর। শ্রীযুক্ত নন্দী ছাত্রাবস্থায় শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে আসিয়া স্বদেশী আন্দোলনে নানা-ভাবে সহযোগিতা করেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

তিব্বতের ডাক ও তার বিভাগ—

১৯৫৪ সালে পিকিংএ যে ভারত ও চীনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহার ফলে গত ১লা এপ্রিল ভারত সরকার পরিচালিত তিব্বতের ডাক, তার ও টেলিফোন বিভাগ এবং বিশ্রাম ভবনগুলি চীনের হস্তে সমর্পণ করিয়া লাসায় এক ভারত-চীন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ কোনরূপ ক্ষতিপূরণ না লইয়াই সর্ববিধ যন্ত্রপাতিসহ ডাক ও তার বিভাগ হস্তান্তরিত করা হয়। আসবাবপত্র সহ ১২টি বিশ্রামাগার উভয় পক্ষ-সম্মত ৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৮ শত ২৮ টাকা লইয়া হস্তান্তরিত করা হইয়াছে। চীন ভারতকে ঐ টাকা প্রদান করিয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে উভয় দেশের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তিব্বতও উভয় দেশের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

গান

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়

খেলা না ফুরাতে
ভেঙ্গে গেল খেলাঘর
জীবনের পথে কেন অকারণে
বারে বারে ওঠে ঝড়॥

অভিশাপ যা'র জীবনের পুঁজি
বারে বারে তবু কি যেন কি খুঁজি ;
ভাঙনের তীরে নয়নের জলে
আশায় বাঁধি যে ঘর॥
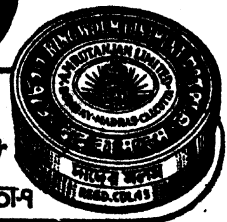
স্মরণে*
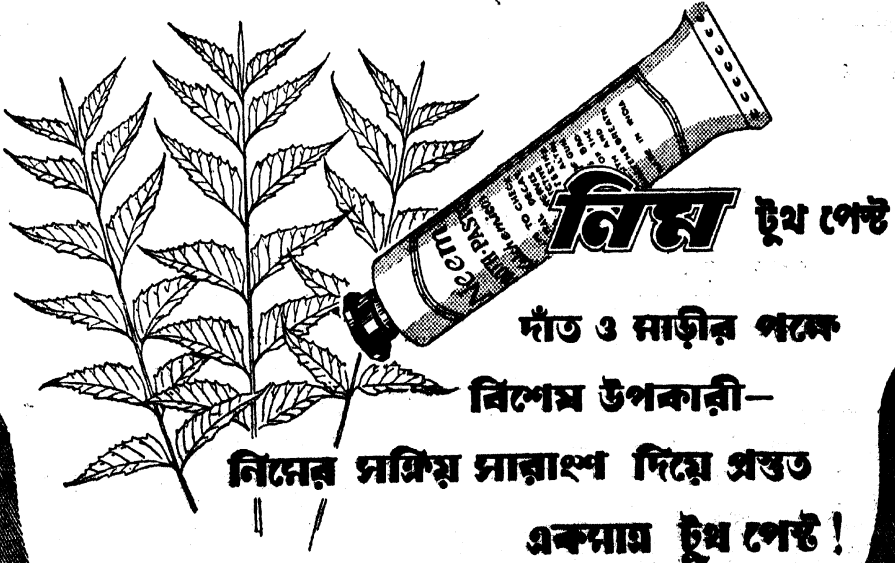
শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-অগ্রজ তুমি, প্রতিভা বিমল,
সুষমা আনন দীপ্ত বদন কমল,
হাস্যোজ্জ্বল, ধীর, স্থির গম্ভীর প্রকৃতি,
কৃতী, যতী, সদাচারী, তুমি মহামতি।
সদালাপী রঙ্গরসে রসিক সুজন
আর কি হেরিব কভু অগ্রজ এমন!

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত অকস্মাৎ শুনি
স্তব্ধ নেত্রে হতবাক বসিয়া আপনি
অতীত স্মৃতির তীরে হেরি বারংবার,
আজিও জাগিছে ধীরে বিস্ময় অপার,
যাও তবে অন্তলোকে, হেরি অবিরাম
মর্তের মানব যেথা লভিছে বিরাম,

ভ্রাতা, ভার্য্যা, আর কেহ পেয়েছ হেথায়?
অজানা, অচেনা প্রাতে নিয়েছ বিদায়!

* অগ্রজপ্রতিম হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুপলক্ষে রচিত

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রোভার্স কাপ ফুটবল ঃ

১৯৫৫ সালের ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব ২—০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত ক'রে রোভার্স কাপ জয়ী হয়েছে। রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে এ বছর নিয়ে দু'বার ক'লকাতার দুই ফুটবল দলের মধ্যে খেলা হ'ল। প্রথম খেলা হয় ১৯৪৯ সালে, ইস্টবেঙ্গল—ই আই রেল-দলের মধ্যে। এখানে উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় এবং বে-সামরিক দলের মধ্যে মোহনবাগান ক্লাবই সর্ব্বপ্রথম রোভার্স কাপের ফাইনাল খেলার যোগ্যতা লাভ করেছিল ১৯২৩ সালে। ঐ বছর রোভার্স কাপ টুর্ণামেণ্ট কমিটির নিমন্ত্রণে মোহনবাগান প্রতিযোগিতায় প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে যোগদান করে এবং ফাইনালে সে সময়ের দুর্দ্ধর্ষ ডারহামস দলের কাছে ১—৪ গোলে পরাজিত হয়। খেলার ৪৫ মিনিট সময় পর্য্যন্ত মোহনবাগান ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। এবার নিয়ে মোহনবাগান তিনবার রোভার্স কাপ ফাইনালে খেললো—১৯২৩, ১৯৪৮ এবং ১৯৫৫ সালে। ক'লকাতার ফুটবল দলগুলির মধ্যে রোভার্স কাপ জয়ী হয়েছে—মহমেডান স্পোর্টিং (১৯৪৯), বাটা স্পোর্টিং (১৯৪২), ইস্টবেঙ্গল (১৯৪৯) এবং মোহনবাগান (১৯৫৫)। গত পাঁচ বছরের (১৯৫০-১৯৫৫) রোভার্স কাপ বিজয়ী হায়দ্রাবাদ সিটি পুলিশ এবার প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে বোম্বাইয়ের বার্ম্মাসেল স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে প্রথম দিন গোলশূন্য ভাবে খেলা ড্র ক'রে ২য় দিনে ০—২ গোলে পরাজিত হয়। সেমি-ফাইনাল খেলার ফলাফল: মোহনবাগান ১, ১, ২ : ক্যালটেক্স (বোম্বাই) ১, ১, ১ : মহমেডান স্পোর্টিং ২ : বার্ম্মাশেল স্পোর্টস ক্লাব (বোম্বাই)—০

মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং দল বেশ বাধা পেয়ে রোভার্স কাপের ফাইনালে উঠে। মোহনবাগান ২য় রাউণ্ডে কটক সম্মিলিত দলের সঙ্গে প্রথম দিন খেলা ড্র করে (০—০); ২য় দিনে ২—০ গোলে হারায়, ৩য় রাউণ্ডে ইণ্ডিয়া কালচার লীগকে হারায় ২—১ গোলে এবং ৪র্থ রাউণ্ডে টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে ১—০ গোলে। সেমিফাইনালে ক্যালটেক্স দলের সঙ্গে দু'দিন খেলা ড্র ক'রে ৩য় দিনে ২—১ গোলে জয়ী হয়। মোহনবাগান দলের নিয়মিত খেলোয়াড় শৈলেন মান্না, সুভাষ সর্ব্বাধিকারী এবং এস দত্ত রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান না করায় মোহনবাগান তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে দলগঠন করতে পারেনি। দলগত সংহতি এবং জয়লাভের অদম্য জিদ্ মোহনবাগান দলের জয়লাভের প্রধান কারণ। ফাইনালের দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষ দিকের খেলায় তারা মহমেডান স্পোর্টিংকে জোর চেপে ধরে। তারা খেলায় গোল করার একাধিক সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট না করলে অধিক গোলের ব্যবধানে জয়ী হ'ত। মহমেডান স্পোর্টিও গোল করার সুযোগ নষ্ট করেছে।

প্রতিযোগিতার ৩য় রাউণ্ডে এ বছরের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী রা[illegible]—২ গোলে ওয়েষ্টার্ণ রেলদলের কাছে পরাজিত হয়।

মোহনবাগান ঃ এস চ্যাটার্জি ; এস গুহ এবং বড়ুয়া ; রতন সেন, এস গুহ (ছোট) এবং এস দত্ত ; ভেঙ্কটেশ, এস ব্যানার্জি, কে পাল, সত্তার এবং দলজিৎ সিং।

মহমেডান স্পোর্টিং ঃ সফরুদ্দিন ; নুরুল ইসলাম এবং নায়ার ; লতিফ, নবাব এবং ভানু ; বালসুব্রহ্মনিয়াম, আবিদ, আজম, রমণ এবং মাসুদ ফকরী।

ভারতীয় ভলিবল ঃ

চীন সফর ক'রে ভারতীয় ভলিবল টিম স্বদেশে ফিরে এসেছে। ভারতীয় দল সফরে ১০টি খেলায় যোগদান করে। খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে, ভারতীয়দলের পক্ষে জয় ৫ এবং হার ৫।

৪ × ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রীলে রেসে বিজয়িনী বাংলার মহিলা দল
ফটো :—ডি রতন

ধ্যানচাঁদ হকি ঃ

ধ্যানচাঁদ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে শিখ রেজিমেন্টাল সেণ্টার ২—০ গোলে এরিয়ান্স দলকে (লাহোর) পরাজিত করে।

দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল ঃ

নিউদিল্লীস্থ দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল টুর্ণামেণ্টের ২য় দিনের ফাইনাল খেলায় ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ষ্টেশন (নিউ দিল্লী) ২—০ গোলে এলাহাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট স্পোর্টস এসোসিয়েশনকে পরাজিত করেছে।

হুইলার শীল্ড ঃ

ফাইনালে ইস্টার্ণ রেলওয়ে (ক'লকাতার ১ম বিভাগের ফুটবল লীগদল) ১—০ গোলে কাঁচড়াপাড়া এক্স-এলুমনী এসোসিয়েশনকে পরাজিত করে।

পাকিস্তান-নিউজিল্যাণ্ড টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যাণ্ড দলের টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় পাকিস্তান ২—০ খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' লাভ করেছে। ঢাকার ৩য় টেষ্ট খেলা ড্র গেছে। সরকারী টেষ্ট সিরিজে পাকিস্তানের পক্ষে 'রাবার' লাভ এই প্রথম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সরকারী টেষ্ট ক্রিকেটে পাকিস্তানের যোগদান বেশী দিনের নয়। এ পর্য্যন্ত পাকিস্তান তিনটি দেশের সঙ্গে ৪টি টেষ্ট সিরিজ খেলেছে—ভারতবর্ষের সঙ্গে ২টি, ইংলণ্ড এবং নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে ১টি ক'রে। টেষ্ট সিরিজ খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে পাকিস্তানের পক্ষে জয় ১—নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে, হার ১—ভারতবর্ষের বিপক্ষে এবং ড্র ২—ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের বিপক্ষে।

আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে পাকিস্তান করাচির ১ম টেষ্ট খেলায় নিউজিল্যাণ্ড দলকে এক ইনিংস এবং ১ রানে পরাজিত করে।

২য় টেষ্ট ঃ

নিউজিল্যাণ্ড ঃ ৩৪৮ (ম্যাক্‌গ্রেগর ১১১, হার্ফোর্ড ৯৩, ম্যাক্‌গিবন ৬১। খান মহম্মদ ৭৮ রানে ৪ উইঃ) ও ৩২৮ (রীড ৮৬, হার্ফোর্ড ৬৪। জুলফিকার আমেদ ১১৪ রানে ৪ এবং কারদার ৪৭ রানে ৩ উইঃ)

পাকিস্তান ঃ ৫৬১ (ওয়াকার হাসান ১৮৯, ইমতিয়াজ আমেদ ২০৯। মোয়ির ১১৪ রানে ৪ উইঃ) ও ১১৭ (৬ উইকেটে। রীড ৩৮ রানে ৪ উইঃ)

লাহোরের ২য় টেষ্ট খেলায় পাকিস্তান ৪ উইকেটে

নিউজিল্যাণ্ড দলকে পরাজিত করে। এ খেলায় ২টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ওয়াকারহাসান এবং ইমতিয়াজ আমেদের ৭ম উইকেটের জুটিতে ৩০৮ রান (পাকিস্তানের পক্ষে টেষ্টে যে কোন উইকেটের রেকর্ড রান) এবং ইমতিয়াজ আমেদের ডবল সেঞ্চুরী (২০৯ রান)। ইমতিয়াজ ২৮টা বাউণ্ডারী করেন।

খেলার ৪র্থ দিনে, নিউজিল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের ৩৪৮ রানের উত্তরে পাকিস্তান ১ম ইনিংসে ৫৬১ ক'রে ২১৩ রানে অগ্রগামী হয়। ৪র্থ দিনের খেলার শেষে স্কোর বোর্ডে দেখা গেল, নিউজিল্যাণ্ডের ৪ উইকেট পড়ে ১৬৬ রান উঠেছে। ইনিংস পরাজয় থেকে তখনও নিউজিল্যাণ্ডের ৪৮ রান দরকার।

খেলার ৫ম অর্থাৎ শেষ দিনের চা-পানের ২০ মিনিট আগে নিউজিল্যাণ্ডের ২য় ইনিংস ৩২৮ রানে শেষ হয়। জয়লাভ করতে তখন পাকিস্তানের ১১৬ রান প্রয়োজন। হাতে সময় ১১০ মিনিট। খেলা শেষ হওয়ার নির্দ্ধারিত সময়ের ১৮ মিনিট আগে পাকিস্তান জয়লাভ করে, ৬ উইকেটে ১১৭ রান তুলে।

৩য় টেষ্ট ঃ

নিউজিল্যাণ্ড ঃ ৭০ (খান মহম্মদ ২১ রানে ৬ উইকেট) ও ৬৯ (৬ উইকেটে)

পাকিস্তান ঃ ১৯৫ (৬ উইকেটে ডিক্লেঃ। হানিফ মহম্মদ ১০৩)

ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৩য় টেষ্ট খেলা ড্র যায়। বৃষ্টির দরুণ প্রথম তিনদিন একেবারেই খেলা হয়নি। ৪র্থ দিন থেকে খেলা সুরু হয়। ৪র্থ দিন নিউজিল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস মাত্র ৭০ রানে শেষ হয়। পাকিস্তান ৫ উইকেটে ১১৩ রান করে। পাকিস্তান ৬ উইকেটে ১৯৫ রান ক'রে ৫ম দিনে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে।

'স্পোর্টসম্যান অফ্ দি ইয়ার' খেতাব ঃ

ইংলণ্ডের খেলাধূলায় 'স্পোর্টসম্যান অফ্ দি ইয়ার' খেতাব ১৯৫৫ সালে লাভ করেছেন ৩০০০ মিটার বৃটিশ ষ্টিপলচেজ চ্যাম্পিয়ান জন ডিসলি। ১৯৫৫ সালের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বৃটিশ সম্মান রক্ষার্থে জন ডিসলির দান যথেষ্ট। ইংলণ্ডের স্পোর্টস রাইটার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রতি বছর এই খেতাব দান করা হয়। যে ব্যক্তির নামে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুপারিশ আসে তিনিই এই খেতাব লাভ করেন। সেই অনুযায়ী ১৯৫৫ সালের ফলাফল—১ম জন ডিসলি, ২য় পিটার মে (ক্রিকেট), ৩য় ক্লিফ্ মর্গান (রাগবী), ৪র্থ ব্রেম হিউসন (এ্যাথলেটিক্স), ৫ম ষ্টানলি ম্যাথুজ (ফুটবল), ৬ষ্ঠ নর্ম্মাণ শীল (এ্যামেচার সাইকেল) এবং ষ্টির্লিং মস (মোটর রেসিং)।

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৫৫ সালে কলকাতার আজাদ হিন্দ বাগে ১২শ বাৎসরিক জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
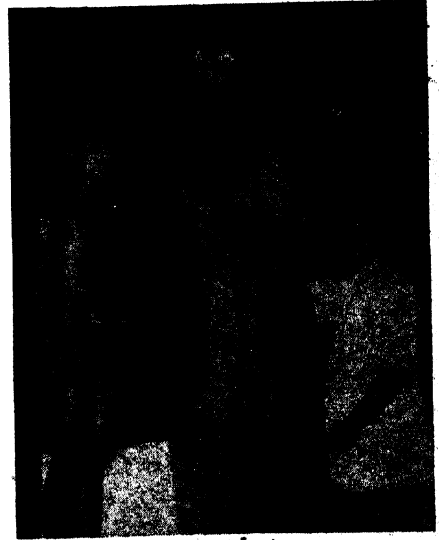
অবিরাম সন্তরণে বিশ্ব রেকর্ড স্রষ্টা শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের হাত থেকে শ্রীচাঁদ বাজাজ পুরস্কার নিচ্ছেন ফটোঃ—ডি রতন

বোম্বাই প্রদেশ পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে। আলোচ্য বৎসরের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ সাঁতারুর সম্মান লাভ করেন বোম্বাইয়ের এস বাজাজ এবং মহিলা সাঁতারু ডলি মাজির। যে যে অনুষ্ঠানে এই দুইজন যোগদান করেন তার প্রত্যেকটিতেই তাঁরা ১ম স্থান পান। বাজাজ ৪টি অনুষ্ঠানে জয়লাভ করা ছাড়াও ৩টিতে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। ডলি মাজির

৬টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পান এবং তার মধ্যে ২টিতে নতুন রেকর্ড করেন।

প্রতিযোগিতায় মোট ১৩টি নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়—পুরুষ বিভাগে ১১টি এবং মহিলা বিভাগে ২টি। মোট ৭টি প্রদেশের ৯৩ জন সাঁতারু (পুরুষ ৮২ এবং মহিলা ১১) প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে এত অধিকজন যোগদান করেন নি।
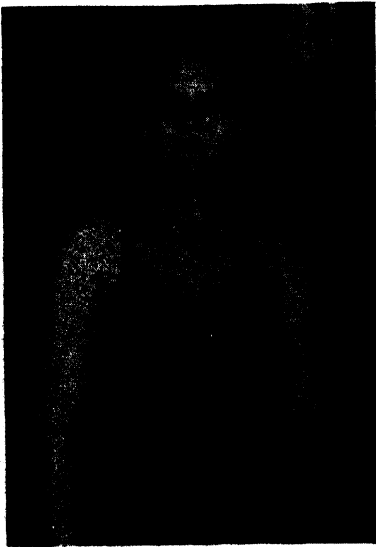
জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতার মহিলা বিভাগের সকল অনুষ্ঠানে বিজয়িনী ডলি নাজির (বোম্বাই)

ফটো :—ডি রতন

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ : পুরুষ বিভাগ : ১ম বোম্বাই ৭১ পয়েন্ট, ২য় সার্ভিসেস—৬৪ এবং ৩য় বাংলা ২৭।

মহিলা বিভাগ : ১ম বোম্বাই ৩৮, ২য় বাংলা ২৯ এবং ৩য় মহারাষ্ট্র ৩।

ওয়াটার পোলো : ফাইনালে বাংলা ৭—৪ গোলে বোম্বাই প্রদেশকে পরাজিত করে।

সাঁতারে নতুন রেকর্ড

পুরুষ বিভাগ

২০০ মিটার বাটার ফ্লাই : এস জি লাঠি (বোম্বাই); ২ মিঃ ৫৫.৩ সেঃ

২০০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোক : চন্দ্রশেখরণ (সার্ভিসেস); সময় : ২ মিঃ ৪৪.৪ সেঃ

২০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক : রামচন্দ্রণ (সার্ভিসেস); সময় : ৩ মিঃ ৪৪ সেঃ

৪ × ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রীলে : বোম্বাই ; সময় : ৪ মিঃ ২৬.৫ সেঃ

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় কৃতী সাঁতারু শ্রীচাঁদ বাজাজ (বোম্বাই)

ফটো :—ডি রতন

৪ × ২০০ মিটার রীলে : সার্ভিসেস ; সময় : ১০ মিঃ ১১.৪ সেঃ

৪ × ১০০ মিটার মিডলী রীলে : বোম্বাই ; সময় ৫ মিঃ ১৬ সেঃ

১৫০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল : এস বি বাজাজ (বোম্বাই); সময় : ২১ মিঃ ৮.৫ সেঃ

১০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক : কমল সাহা (বাংলা); সময় : ১ মিঃ ২২.৩ সেঃ

১০০ মিটার বাটার ফ্লাই : এস জি লাঠি (বোম্বাই); সময় : ১ মিঃ ১৩.৭ সেঃ

১০০ মিটার ফ্রি-ষ্টাইল : এস বি বাজাজ (বোম্বাই) ; সময় : ১ মিঃ ২.৭ সেঃ (হীট)

৪০০ মিটার ফ্রি-ষ্টাইল : এস বি বাজাজ (বোম্বাই) ; সময় : ৫ মিঃ ১৬২ সেঃ (হীট)

মহিলা বিভাগ

২০০ মিটার ব্রেষ্ট-ষ্ট্রোক : ডলি নাজির (বোম্বাই) ; সময় : ৩ মিঃ ২৮.৯ সেঃ

৪০০ মিটার ফ্রি-ষ্টাইল : ডলি নাজির (বোম্বাই) ; সময় ৬ মিঃ ৫২.২ সেঃ
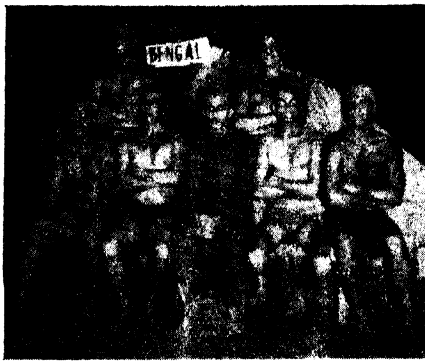
জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ওয়াটার পোলো বিজয়ী বাংলা দল

ফটো :—ডি রতন

বিশ্ব রেকর্ড ঃ

বিশ্ববিখ্যাত দৌড়বীর এমিল জেটোপেক (চোকো-শ্লোভাকিয়া) নিম্নলিখিত ছুই বিষয়ে নিজ প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্বের বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। নতুন রেকর্ড ছুটি সরকারীভাবে সমর্থনের অপেক্ষায় আছে।

২৫ কিলোমিটার দৌড় : সময়—১ ঘণ্টা ১৬ মিঃ ৩৬.৪ সেঃ (নতুন বিশ্বরেকর্ড)। পূর্ব্ব বিশ্বরেকর্ড : ১ঘঃ ১৯ মিঃ ১১.৮ সেঃ

১৫ মাইল দৌড় : সময়—১ঘঃ ১৪মিঃ ১ সেঃ (নতুন বিশ্বরেকর্ড)। পূর্ব্ব বিশ্বরেকর্ড : ১ ঘঃ ১৬ মিঃ ২৬৪ সেঃ

এখানে উল্লেখযোগ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়ার আলবার্ট আইভানয় ২৫ কিলোমিটার দূরত্ব ১ ঘঃ ১৭ মিঃ ২৪ সেকেণ্ডে দৌড়ে জেটোপেকের পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

বিশ্ব মডার্ণ পেণ্টাথলন

চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

গত বছরের বিজয়ী হাঙ্গেরী বিশ্ব মডার্ণ পেণ্টাথলন (World modern Pentathlon) প্রতিযোগিতায় এবারও দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। অশ্বারোহণ, ফেন্সিং, সুটিং এবং ক্রশ-কান্ট্রি রেস এই পাঁচটি বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭টি দেশের ৪৮ জন প্রতিযোগী সুইজারল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

দলগত বিভাগে চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম হাঙ্গেরী (১২,৬০৭ পয়েণ্ট) ২য় রাশিয়া (১১,৯৪২.৫) এবং ৩য় সুইজারল্যাণ্ড (১১,৪২৪.৫)

ব্যক্তিগত বিভাগে চূড়ান্ত ফলাফল : কে শালনিকোভ (রাশিয়া)—৪,৪৫৩.৫ পয়েণ্ট, ২য় ওলাভী ম্যান্নোনেন (ফিনল্যাণ্ড)—৪,৩০৫.৫ পয়েণ্ট এবং ৩য় আলাদার কোভাক্সি (হাঙ্গেরী)—৪,২৩৯.৫

টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের নামের তালিকা ঃ

আন্তঃর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশন বিশ্বের টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের নামের এক ক্রমপর্য্যায় তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকার পুরুষ বিভাগে বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান তোশিয়াকি তানাকা (জাপান) শীর্ষস্থান পেয়েছেন এবং মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেছেন মিসেস অ্যাঞ্জেলিকা রোজেনো (রুমানিয়া)। ক্রমপর্য্যায় তালিকাটি এইভাবে প্রস্তত করা হয়েছে—

পুরুষ বিভাগ

(১) তোশিয়াকি তানাকা (জাপান) ; (২) কার্লো ডলিনার (যুগোশ্লাভিয়া) ; (৩) আইভান আন্দ্রিয়াদিজ (চেকোশ্লোভাকিয়া) ; (৪) এফ সিডো (হাঙ্গেরী) ; (৫) ইচিরো ওগিমুরা (জাপান) এবং (৬) জোশেফ কোজিয়ান (হাঙ্গেরী)।

মহিলা বিভাগ

(১) অ্যাঞ্জেলিকা রোজেনো (রুমানিয়া) ; (২) লিণ্ডা ওয়ার্টল রাম্পলার (হাঙ্গেরী) ; (৩) রোজালিণ্ড রোইকর্ণেট (বৃটেন) ; (৪) কে ওয়াতানবি (জাপান) ; (৫) ইভা কচজিয়ান (হাঙ্গেরী) এবং (৬) ডায়ানে রোই (বৃটেন)।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল ঃ

১৯৫৫ সালের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ১৫—১১, ৫—১৫, ১৫—১০ ও ১৫—১৩ পয়েণ্টে মাদ্রাজকে পরাজিত করেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

১৯৫৫ সালের প্রতিযোগিতায় ইন্দোনেশিয়া এবং পাকিস্তানের নামকরা খেলোয়াড়রা যোগদান করেন।

চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : এডি ইউসুফ (ইন্দোনেশিয়া) ১৫—১০, ১৫—৯ পয়েণ্টে অমৃত দেওয়ানকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস : জি হেমাডী এবং মনোজ গুহ (ভারতবর্ষ) ১০—১৪, ১৫—৬ পয়েণ্টে সামসাদ আলী (পাকিস্তান) এবং ডি এন ডোঙ্গাডেকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস : সামসেদ আলী (পাকিস্তান) এবং কুমারী নীলিমা ঘোষ (ভারতবর্ষ) ১৭—১৬, ১৫—১১ পয়েণ্টে এডি ইউসুফ (ইন্দোনেশিয়া) এবং কুমারী মীরা দাসকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিস এম সুইনী ১১—৫ ১১-৮ পয়েণ্টে কুমারী মীরা দাসকে পরাজিত করেন।

ওয়াটার পোলো লীগ ঃ

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত সিনিয়ার ডিভিসন ওয়াটার পোলো লীগের খেলায় সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব অপরাজেয় অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। রাণার্স-আপ হয়েছে ন্যাশানাল সুইমিং ক্লাব।
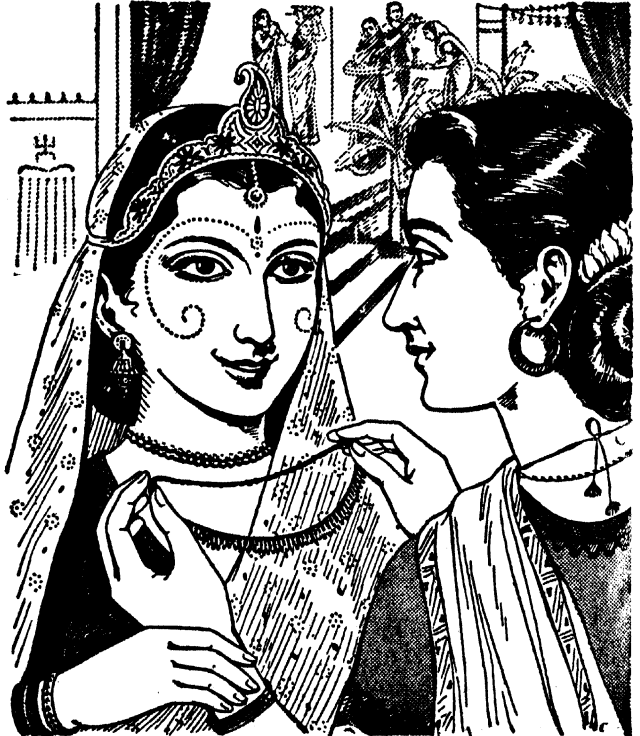
বিমান-বোটে বোম্বেটে : দীনেন্দ্রকুমার রায়

স্বর্গত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সম্পাদিত একখানি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। লণ্ডনের বেকার ষ্ট্রীটের ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেকের নাম বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে অপরিচিত নয়। দীনেন্দ্রবাবুর বহু গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর অত্যাশ্চর্য কার্যকলাপের সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। তবে তাঁর রবার্ট ব্লেক সংক্রান্ত সকল গ্রন্থের মধ্যে এ বইখানিই আকারে সর্ব বৃহৎ।

গোয়েন্দা কাহিনী বল্‌তে সাধারণভাবে আমরা বুঝি কোনও অপরাধী বা অপরাধকারী দল কর্তৃক অপরাধের সংঘটন এবং কোনও গোয়েন্দা কর্তৃক তৎসংক্রান্ত ঘটনার অনুসরণে শেষ পর্যন্ত অপরাধীর বা অপরাধকারী দলের আবিষ্কার ও ধৃতিকরণ। আলোচ্য বইখানি কিন্তু সে শ্রেণীর নয়—এটাই এ গ্রন্থের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থের প্রারম্ভে উড্ডায়মান বিমান থেকে যে লোকটি পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের জহরত অপহরণ ক'রে লাফ দিলে, তাকে অপরাধীরূপে গ্রহণ ক'রে গ্রন্থ আরম্ভ হ'লো বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-ই হ'য়ে উঠ্‌লো সমাজের প্রধান হিতকারী। যে অদ্ভুত উপায়ে সে তিনজন নরপিশাচের শাস্তি-বিধান ক'রলো, তা যেমন চমকপ্রদ, তেমনই রহস্যময়। এই শাস্তি-বিধানের বৈশিষ্ট্য এই যে শাস্তিবিধানকারী নিজে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে শাস্তিদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেনি। অপরাধীরা নিজেরাই নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করেছে বলা যায়। রবার্ট ব্লেক আছেন বটে—তবে এ গ্রন্থে তাঁর অবস্থিতি গৌণ ঘটনা।

এই অভিনব রহস্যোপন্যাসখানি পাঠক সমাজকে তৃপ্তি দিতে পারবে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস। ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদপট প্রথম শ্রেণীর।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—৫৲ টাকা।]

গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্য : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ, এম-এ, পি-এচ-ডি

বাংলা সাহিত্যে ধারাবাহিক ইতিহাস, তাহার ক্রমবিকাশ ও বঙ্গ ভাষাভাষী জনগণের সহিত তাহার সম্পর্ক আলোচনা গ্রন্থখানির মূল বিষয়বস্তু। বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস ছিল না। এ বিষয়ে স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন অগ্রণী হইয়া প্রথম তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচনা করিলেন। তাহার পূর্বে বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ ক্রমিক কোন ইতিহাস বা আলোচনা গ্রন্থ ছিল না। তৎকালীন প্রকাশিত গ্রন্থ ও অপ্রকাশিত পুথিপত্র অবলম্বন করিয়া স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে বাংলা সাহিত্যের আনুপূর্বিক সকল তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই ; তবুও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' একখানি মহামূল্য গ্রন্থ। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থে যে সকল আঙ্গিকের অভাব ছিল তাহা পূরণ করিলেন ডক্টর সুকুমার সেন। তাঁহার 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। তবে রামগতি ন্যায়রত্ন, দীনেশচন্দ্র সেন, মণীন্দ্রমোহন বসু ও সুকুমার সেন—ইঁহারা সকলেই প্রাচীন সাহিত্য ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য লইয়াই মুখ্যতঃ আলোচনা করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে ইঁহারা কেহই হস্তক্ষেপ করিলেন না। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থখানিতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি অংশ মাত্র লইয়া আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তবে, তাঁহার এই গ্রন্থখানিকে সাহিত্যের ইতিহাস, আলোচনা বা পর্যালোচনা—কোন পর্যায়েই ফেলা যায় না ; যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে ইহার বিশিষ্ট স্থান নির্ণীত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ডক্টর মনোমোহন ঘোষ মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু তিনিও আধুনিক যুগের সঙ্কটময় পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তবে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, অতি বিস্তার বর্জ্জন করিয়া লেখক প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের যে সুবিন্যস্ত ও স্বচ্ছ আলোচনা করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। বইখানি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে।

[প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান্ পাবলিসিটি সোসাইটী, ২১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪। মূল্য ১০৲ টাকা।]

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ম্যাজিক লণ্ঠন : পরিমল গোস্বামী

চোখের দোষের জন্য পড়ার শক্তি কমে গেছে, তবু 'ম্যাজিক লণ্ঠন' পড়েছি। খুব ভাল লাগল। আজকাল 'রম্য রচনা' নাম সর্বত্র শোনা যায়, তাতে কি বোঝায় জানি না। যা ভাল লাগে তাই রম্য, কবিতা আর গল্প রম্য রচনা না হবে কেন? পরিমলবাবুর বইটি বোধ হয় রম্য রচনার অন্তর্গত নয়। লেখকের যুগান্তরে লেখা 'ইতস্ততঃ'তে যা অতি সংক্ষিপ্ত, 'ম্যাজিক লণ্ঠন'-এ তাই বিস্তারিত হয়েছে। তিনি যে চিত্রাবলী দেখিয়েছেন তার অনেকগুলি বুঝতে কিছু বুদ্ধির দরকার হয়। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, রূপক, ব্যাজস্তুতি, আর উপহাসের মিশ্রণ। কয়েকটি চরিত্রচিত্র যা আছে তাও জীবন্ত। এ ধরণের রচনা দেখা যায়

[প্রকাশক : বিহার সাহিত্য ভবন, ২৫।২ মহোনবাগান রো, কলি :—৪। মূল্য—২॥৹ টাকা]

—রাজশেখর বসু

হুল্লোড় : স্বপন বুড়ো

ছেলেমেয়েদের উপযোগী কুড়িটী রসাল কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে এই আলোচ্য গ্রন্থে। গ্রন্থকার বাংলার শিশু সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট পথিকৃৎ এবং সাহিত্যে, কাব্যে, শিল্পে ও রস রচনায় সব্যসাচী। আলোচ্য গ্রন্থের চিত্তাকর্ষক প্রচ্ছদপট ও চিত্রাবলী অঙ্কিত করেছেন বিখ্যাত শিল্পী প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশিষ্ট কবি ও শিল্পীদ্বয়ের প্রতিভার মণিকাঞ্চন সংযোগে হুল্লোড় কাব্য গ্রন্থখানি অনবদ্য হয়েছে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়। প্রতিটি কবিতাই আমাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে, এক একটি কবিতা পড়তে পড়তে আমরা হাস্য সংবরণ করতে পারিনি, এম্নি মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন 'হুল্লোড়' কবি।

প্রাণ খুলে হাসবার বস্তু দিয়ে স্বপন বুড়ো আলোচ্য গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলার ছেলেমেয়েদের পুষ্টিকর মানসিক পথ্যের ব্যবস্থা করেছেন যাতে তারা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, এজন্যে তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। আমরা প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে 'হুল্লোড়' পড়ে হাসি খুসিতে 'হুল্লোড়' করতে পরামর্শ দিই। উৎকৃষ্ট কাগজে, স্বচ্ছ মুদ্রণে ও চিত্র-বৈচিত্র্যে গ্রন্থখানি উপহারোপযোগী হয়েছে।

[প্রকাশক : সত্যব্রত লাইব্রেরী ১৯৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য আড়াই টাকা]

অনেক আশা : অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত

'অনেক আশা' চার্লস ডিকেন্সের 'গ্রেট এক্সপেক্টেসন্স' এর সর্ব্ব প্রথম বঙ্গানুবাদ। কাহিনীর মূল কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে অধ্যাপক দত্ত বৃহৎ উপন্যাসখানিকে প্রয়োজনবোধে সংক্ষিপ্ত করেছেন কিন্তু বাহাদুরী এই যে এতে রস-সৌন্দর্য্য কোথাও ব্যাহত হয় নি। যে উদার মানবপ্রীতি, ডিকেন্স সাহিত্যের মূলমন্ত্র, তারি সন্ধানী আলোয় 'গ্রেট এক্সপেক্টেসন্সের' পাতায় ফুটে উঠেছে একটি ভাগ্যহীন মানুষের দীর্ঘজীবনের বেদনার রক্তাক্ত ছবি। গ্রন্থকারের সার্থক প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা যায় পাঠক পাঠিকা মহলে এই অনূদিত গ্রন্থের বিশেষ সমাদর হবে।

[প্রকাশক—কল্যাণব্রত দত্ত, ভুমি কলন ৩ ৪নং মধুগোল লেন' কলিকাতা—৫। দাম—]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "কাক-জ্যোৎস্না" (৫ম সং)—৩৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ছবি" (১২শ সং)—১॥৹
মন্মথ রায় প্রণীত নাটিকাগুচ্ছ "একাঙ্কিকা" (২য় সং)—৫৲
শ্রীতারকচন্দ্র রায় প্রণীত দর্শন-তত্ত্ব "সাংখ্য ও যোগ"—৪৲
শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ প্রণীত উপন্যাস "রাত পোহাল"—২॥৹
ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "স্বাক্ষর"—৩॥৹
দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত ছোটদের পূজা-বার্ষিকী "দেবালয়"—৪৲
শশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "কালোবাজারী-দমনে মোহন"—২৲,
"ঐন্দ্রজালিক মোহন"—২৲
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মধুযামিনী"—৩৲
শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "ব্যর্থ অভিযান"—॥৹
শ্রীহৃদয়রঞ্জন রায় প্রণীত "ভজনগীতিকা" (৩য় খণ্ড)—২।৹
শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত "রামায়ণী কথা"—॥৵৹
গুরুদাস সরকার প্রণীত "ইরাণের শিল্প ও সংস্কৃতি"
(প্রাক্ মুসলিম যুগ)—২৲
শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত প্রণীত "শ্রীচৈতন্যচন্দ্র চন্দ্রিকা"—১।৹,
"নন্দকুল-চন্দ্রমা"—১।৹
অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় প্রণীত সমালোচনাগ্রন্থ "সোনার তরী"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত